

রাজপুত বীরাঙ্গনা

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

৮ম বর্ষ | ভাদ্র ১৩২৩ সাল | ২য় খণ্ড
২য় খণ্ড | | ১ম সংখ্যা

সমালোচনার বর্ত্তমান স্বরূপ*

একখানি বিখ্যাত মাসিকপত্রিকায় এক অতি সুবিখ্যাত সাহিত্যিক অসহিষ্ণু হইয়া সমালোচককে "গোরু ছাগলের" সহিত তুলিত করিয়াছেন। সমালোচকের নিন্দার জন্য ইহা হইতে অন্য প্রকার ভাষাও যে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহার উদাহরণস্বরূপ বিহ্লণের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি :—

দ্রাঘীয়সা ধার্ষ্ট্যগুণেন যুক্তাঃ
কৈঃ কৈরপূর্ব্বৈঃ পরকাব্যখণ্ডৈঃ।
আড়ম্বরং যে বচসাং বহন্তি
তে কেঽপি কন্থাকবয়ো জয়ন্তি॥

আর, গালাগালির পথ ছাড়িয়া যদি বিচারের পথ গ্রহণ করেন—তাহা হইলেও মোটামুটি হিসাবে সমালোচনার হেয়ত্ব প্রমাণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না। আমরা সবাই বুঝি যে, বিজ্ঞান থাকিবার পূর্ব্বে জগৎ ছিল— নিউটনের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও পাকা ফল মাটিতে পড়িত, নিয়মমত সূর্য্যচন্দ্র উদিত ও অস্তমিত হইত, পাঁচটা ভূতের নামকরণের পূর্ব্বেও পঞ্চভূতে মিলিয়া জগতে মাধুর্য্যের ও সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি করিত; এখন দেখিতেছি যে পাঁচে আর কুলায় না—বৈজ্ঞানিক তাই পাঁচকে প্রায় অশীতি মৌলিক দ্রব্যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু যাহাকে লইয়া এই আশী খণ্ড সে এইরূপ ভাগাভাগির পূর্ব্ব হইতেই বিরাজ করিতেছিল। অলঙ্কার শাস্ত্রের সম্বন্ধেও এইরূপই দেখিতে পাই। আগে সাহিত্য—নানা প্রকারের সাহিত্য—পরে সমালোচনা! আলঙ্কারিক যে সকল সূত্র করিয়াছেন—তাহার উপাদান সাহিত্য। আগে হোমর, সফোক্লিস—পরে আরিষ্টটল, কুইন্টিলিয়ান। সমালোচক যে তত্ত্বের মন্দির রচিতে চান, তাহার সোপান কাব্য—নানা শ্রেণীর কাব্য। এই জন্য সহজেই বুঝা যায়, যে অতীত তাহার প্রাণ—

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের নবম অধিবেশনে পঠিত।

অতীতের সম্পদ্ লইয়াই তাহার ভাণ্ডার। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" কথা না চলিত থাকিলে লক্ষণা বা ব্যঞ্জনা শক্তির আবিষ্কার সম্ভব হইত না। রামায়ণের করুণ কাহিনী কর্ণে না প্রবেশ করিলে, মহাভারতের বিচিত্র ও বিপুল ভাবের স্রোতে না ভাসিলে, রসের স্বরূপ বা রসের সংখ্যা কোনটাই নির্দ্ধারিত হইত না। ভাষার অলঙ্কারে মুগ্ধ না হইলে—অলঙ্কারের তালিকা প্রস্তুত হইত না। বাধ্য হইয়া অতীতের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া, সমালোচকের দৃষ্টির পরিধি সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। সে অতীতপন্থী হইয়া পড়ে—পরিবর্ত্তনকে অঙ্গীকার করিতে রাজি হয় না। এদিকে অলঙ্কার স্থবির হইলেও সাহিত্য সৃজকের প্রাণ স্থবির হয় না। সে যুগের পর যুগ 'ফিনিক্স' পক্ষীর মত আপন ভস্মের ভিতর হইতে নব কলেবর পরিগ্রহ করিয়া নবীন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতেছে। কিন্তু অলঙ্কার অতীতের দিকে মুখ ফিরাইয়া—মরা সাহিত্যের কঙ্কালকে কোলে করিয়া—নূতন সৃষ্টির সহিত কলহ করে; নূতনকে নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে। সে বলে, সাহিত্যের পাকা ইমারতে প্রকোষ্ঠ বিভাগ চিরদিনের জন্য হইয়া গিয়াছে—পৈতৃক সম্পত্তির মত কবি ও অন্যবিধ শিল্পীকে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে এবং তাহারই এক একটি বাছিয়া লইয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে হইবে। এ মন্দিরের যে কোথাও সংস্কার আবশ্যক, একথা সে মানিতে রাজি নয়। কাজেই তাহার মন্দিরকে "অচলায়তন" বিশেষ বলিতে হয়। কিন্তু সাহিত্যে যাহারা "দাদা-ঠাকুরের দল"—অর্থাৎ যাহারা সৃজনী শক্তির চমৎকারিতায় মুগ্ধ হইয়াছে—তাহারা সমালোচকের এই প্রভুত্বকে—এই 'আচার্য্য' গিরিকে—কখনও খর্ব্ব কখনও অবসিত করিতে বাধ্য হয়। অতএব বলিতে হয় যে, সমালোচক সৃজক শিল্পীর পিছনে খোঁড়াইতে থাকে, [illegible] দেয় না। ইহাই যদি সমা- [illegible] থা হয়, তাহা হইলে সে যে [illegible] অধিকন্তু অশ্রদ্ধেয় ও অনিষ্ট- [illegible]

যাহার ভিতরে সত্যই এত গলদ থাকে—যাহা যথার্থই এত অকেজো—তাহার ধারা বজায় রহিল কিসে? এ প্রশ্ন স্বতই মনে উঠিতে পারে। বোধ হয়, সমালোচনা সর্ব্বাংশে দুষ্ট নহে, তাই আজও তাহা টিকিয়া আছে। জিনিষটা তলাইয়া দেখা উচিত—বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে।

সমালোচনার ব্যাপারকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; তাহার একটার নাম দিব-বিবৃতি, অপরটার নাম বিচার। সমালোচক কাব্য-সৌন্দর্য্যের আবিষ্কর্ত্তা ও ব্যাখ্যাতা। ওয়াল্টার পেটর বলিতেছেন যে, সমালোচকের কর্ত্তব্যের তিনটী স্তর আছে; তিনি কবি বা চিত্রকরের চমৎকারিতাকে অনুভব করেন, তাহার বিশ্লেষণ করেন, পরে তাহা সাধারণে বিবৃত করেন। এইজন্য তাঁহাকে লেখকের জীবন কথা ও আবির্ভাবের সময় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে হয়, লেখকের ব্যক্তিত্বকে সজীবভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, তাঁহার রচনার সহিত তাঁহার জীবনের ও যুগের যোগসূত্রটুকু আলোকে ধরিতে হয়। তবেই সমালোচ্য গ্রন্থের তাৎপর্য্য সমগ্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়। বিবৃতি মূলক সমালোচনার নিদর্শন বঙ্গসাহিত্যে বিরল নহে। একটা সুন্দর উদাহরণ, রবীন্দ্রনাথের "লোক সাহিত্য।"—"ছেলে ভুলান ছড়া" "কবি সঙ্গীত" ও "গ্রাম্য সাহিত্য" এ দেশে খুবই প্রচলিত থাকিলেও সাহিত্যের আসরে পরিচিত নহে। রবীন্দ্রনাথ সুচারুরূপে আমাদিগের সহিত এই সকল কাব্যকল্প রচনার পরিচয় ঘটাইয়াছেন। এ সকল প্রবন্ধে কল্পনার খেলা যথেষ্ট আছে, লেখনীশিল্পও মনোহর। পড়িতে পড়িতে আমরা অতীত জাতীয় জীবনের সম্মুখীন হই; সেই জীবনের অন্তরে যে সরলতা, সরসতা ও চমৎকারিতা সুপ্ত আছে তাহা জাগিয়া উঠিয়া আমাদিগকে হাত বাড়াইয়া যেন আমন্ত্রণ করিতে থাকে। ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃত কাব্য নাটকের আদর অল্প ছিল। সেই কারণে দেখিতে পাই যে তৎকালে, এই সকল বিস্মৃত প্রায় সৌন্দর্য্যের খনি

সাধারণে পরিচিত করিবার জন্য বহু অদ্ভুতকর্ম্মী লেখক ব্যাপৃত রহিয়াছেন। এবিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই পথ-প্রদর্শক বলিয়া মনে করি। বঙ্গ-সাহিত্যের অমর শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের "উত্তরচরিত" প্রবন্ধ এস্থলে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপর চন্দ্রনাথ বসুর "শকুন্তলাতত্ত্ব"। ইহাতে কালিদাসের সেই চির-উপভোগ্য নাটকের অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের নানাদিক্ হইতে ব্যাখ্যা আছে—বিশ্লেষণ ও চরিত্র-চিত্রণের বিস্তৃত সমাবেশ আছে। এ ক্ষেত্রে, প্রথিতনামা না হইলেও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিপুণতাও সর্ব্বথা অভিনিবেশের যোগ্য। আচার্য্য রামেন্দ্র-সুন্দর সত্যই বলিয়াছেন যে, "বয়সে বালকত্ব অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে তিনি প্রৌঢ়ের দুর্ল্লভ অন্তর্দৃষ্টি ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন।" "রত্নাবলী," "মৃচ্ছকটিক" "মালবিকাগ্নিমিত্র" প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া তিনি যে সকল সন্দর্ভ সহৃদয় সমাজকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতই তাহা বহুমূল্য। ইহাতে দেখি যে কবিসুলভ বাগ্বৈভবের সহিত তিনি প্রস্তুত গ্রন্থগুলির রস ও ভাব, ছন্দ ও ভাষা, সৌন্দর্য্য ও ঝঙ্কারের যথাযথ বিবরণ দিতেছেন। কিন্তু সমালোচক হিসাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্থান ইঁহাদের সকলের হইতেই একটু বিশেষিত করা সমীচীন। তিনিও রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিক এবং উত্তরচরিতের সমালোচক। কিন্তু সে সমালোচনায় যে পরিপাটী দেখি, রসগ্রহণের যে নিপুণতা দেখি, ব্রাহ্মণ-সুলভ বিমল প্রতিভার যে পরিচয় পাই, অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দ্দেশকে বজায় রাখিয়া সবল কল্পনার যে লীলা প্রত্যক্ষ করি, তাহা প্রকৃতই সমালোচনার রাজ্যে সুদুর্ল্লভ। এই সকল প্রবন্ধে উক্ত মনস্বিগণ যে কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাহার নাম বিবৃতি বা ব্যাখ্যা, তাহা উন্মোচন বা আবিষ্করণ। এই জাতীয় সমালোচনার প্রয়োজন হইতেই আধুনিক সময়ে নানা রকম সন্দর্ভের উৎপত্তি—সাহিত্যের ইতিহাস তন্মধ্যে অন্যতম, সমালোচ্য লেখকের জীবনী রচনা তাহার দ্বিতীয় প্রকার। এই দুই রকমের প্রবন্ধ আজ-কাল বহুল পরিমাণে প্রকাশিত হইতেছে এবং সমালোচনার ফলপ্রসূ পদ্ধতি রূপে সর্ব্ববাদিসম্মতস্বীকৃতও হইয়াছে। এবং দুয়েরই উদ্দেশ্য এক—বিশিষ্ট সময় ও সমাজের পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিশিষ্ট প্রকার প্রতিভা কি ভাবে আত্মবিকাশ করে—সার্থকতা লাভ করে—তাহা বুঝাইবার জন্য ইহাদের আবির্ভাব।

ইহা ছাড়া সমালোচকের আর একটি কর্ত্তব্য আছে—তাহার নাম কলাবিচার। এইটি অতি দুরূহ কার্য্য—এবং ইহা আবশ্যক কি না, এবং প্রকৃত পক্ষে ইহার সম্পাদন যথাযথভাবে সম্ভব কি না, তাহা লইয়াই যত মতদ্বৈধ। দেখিতে পাওয়া যায়, একযুগে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া রসিকগণ যাহা শিরোধার্য্য করেন, তাহাই আবার অধম কীর্ত্তি বলিয়া যুগান্তরের সমালোচকগণ কর্ত্তৃক অবহেলিত হয়; এবং অন্যদিকে প্রথম আবির্ভাব সময়ে যে কাব্য আদরেই আদর পায় না, ভবিষ্যদ্বংশধরগণ তাহাকেই সম্মানের স্বর্ণসিংহাসনে স্থান দেন। বৈদেশিক সাহিত্যেতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়—তবে তাহা উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইতে চাহি না। প্রাচীন ভারতবর্ষেও এ ঘটনা বহুবার ঘটিয়া থাকিবে। শ্রীহর্ষ ও ভবভূতির ভাগ্যবিপর্য্যয় একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং কালিদাসের "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি সর্ব্বং নবমিত্যবদ্যং" শ্লোকটীর ইঙ্গিতও লক্ষ্য করা উচিত। তবে এদেশের ইতিহাস স্বল্পভাষী। শুনিয়া থাকি, উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস এখনও বিশেষজ্ঞের সংকল্পরাজ্যেই ভ্রমণ করিতেছে। তাহা না হইলে, বিভিন্ন যুগে সমালোচনার খেয়াল পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্তের জন্য আজ বিদেশের মুখাপেক্ষা মোটেই থাকিত না।

সে যাহা হউক, পুনর্ব্বার রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার আর এক স্থলে মনোযোগ করা যাক্। বিচারাত্মক সমালোচনার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ হইতে পারে। এখানে স্বয়ং কবি কাব্যের সমালোচক—অতএব তাঁহার ভাবিতগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—এপিক্হিসাবে মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধের স্থান অতি নিম্নে—"হেম বাবুর বৃত্র-

সংহারকে আমরা এইরূপ নাম-মাত্র মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না—কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না।" এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে তিনি যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন—তাহার আশ্রয়-অতীত। রামায়ণ মহাভারত এবং ইলিয়ডের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে "এপিক" কাব্যের মূলে মহতী কল্পনা থাকা-চাই—এপিকের প্রাণ, একটা পরম পুরুষ একটা আদর্শ চরিত্র—একটা অভ্রভেদী বিরাট মূর্ত্তি—খটমট শব্দের সংগ্রহ বা বিশিষ্ট প্রকারের প্রস্তাবনা বা যুদ্ধবিগ্রহাদির আড়ম্বর থাকিলেই এপিকের সৃষ্টি হয় না। রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনার ফলে, মেঘনাদ-বধকাব্যের মহাকাব্যত্ব লইয়া মতদ্বৈধ যে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তাহা মনে করি না। তবে এস্থলে আমাদিগের আলোচ্য—কোন বিশিষ্ট মতামত নহে—সমালোচনার প্রণালী। স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, এ সমালোচনার উদ্দেশ্য বিচার—সমানজাতীয় প্রাচীন রচনার বিশ্লেষণ করিয়া মানদণ্ডের নিরূপণ এবং সেই মানদণ্ডের প্রয়োগে প্রস্তুত গ্রন্থের শ্রেণীনির্দ্দেশ।

সমালোচনার যে অংশ বিবৃতি বা ব্যাখ্যা সে অংশ সহজসাধ্য না হইলেও নিরাপদ এবং বাক্‌শিল্পি-গণেরও অনুমোদিত। চিন্তাশীল লেখকগণও একবাক্যে ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি কোন কোন পণ্ডিত বর্ত্তমান যুগে সমালোচকের কর্ত্তব্য ইহাতেই নিঃশেষিত বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সমালোচনার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা, শ্রেণীভুক্ত করা নয়—বিশ্লেষণ করা, দোষ দেখান নয়—ব্যাখ্যা করা, বিচার করা নয়। ম্যুল্টন বলিতেছেন যে, মনগড়া বা পুস্তকে পড়া কোন বাহ্য মানদণ্ডের প্রয়োগ করিয়া নূতন সৃষ্টির গুণদোষের নির্দ্ধারণ করিতে তিনি সমর্থ নহেন—নূতন সৃষ্টিকে নূতন সৃষ্টির দ্বারাই বিচার করিতে তিনি বাধ্য। দণ্ডবিধি আইনের মত কোন নিয়মের ধারা সাহিত্যরাজ্যে থাকিতে পারে না। যদি কোন বিধিনিষেধ থাকে—তাহা সাহিত্যেরই অন্তর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই সব বিধি অনেকটা জড়জগতের নিয়মের মত। নিউটনের আবিস্কৃত মাধ্যাকর্ষণ প্রকৃতির উপর যেমন বাহির হইতে আসিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করে নাই, সে নিয়ম যেমন জাগতিক ঘটনা-প্রণালীরই একটি সরল ও সাধারণ বিবরণ—অলঙ্কারের সূত্রগুলিও সেইরূপ। নিপুণ শিল্পীরা যে যে উপায়ে সৌন্দর্য্য সৃজন করিয়াছেন তাঁহা-দের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য সেই সেই উপায়ই প্রমাণ। এই-জন্যই বিভিন্ন জাতীয় শিল্পীর মধ্যে এককে অপরের সহিত তুলনা করা সম্ভব নহে, এবং যদি করা যায় তাহা ভ্রমাত্মক হইবে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এইরূপ তুলনা ও পরিগণনার দোষ দর্শাইয়া বলিতেছেন, "গুণ, রস, বা সৌন্দর্য্যাদি বিষয়ক জটিলভাব সম্বন্ধে কি বিধাতৃসৃষ্ট পদার্থে, কি তদনুকারী কবিসৃষ্ট কাব্যে, ঐরূপ অগ্রপশ্চাৎ, উচ্চ নীচ প্রভৃতি রূপ রেখাঙ্কপাত দ্বারা পর্য্যায়ক্রম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না" (বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ)। এ সকল যদি সত্য হয় তবে বিচার কি সমালোচকের কর্ত্তব্যের বাহিরে গিয়া পড়িতেছে?—অলঙ্কার শাস্ত্রের মত বাঁধাবাঁধি নিয়ম কি তবে একেবারে থাকিতে পারে না?

আমার ধারণা, বিচারাত্মক সমালোচনার এইরূপ উচ্ছেদে আমরা সম্মত হইতে পারি না। কারণ, বিচারকে সমালোচকের কর্ত্তব্য হইতে বহিষ্কৃত করিলে—বিবৃতিমূলক সমালোচনাও অঙ্গহীন, অযৌক্তিক এবং সময়ে সময়ে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ম্যাথ্যু আর্ণল্ড অপেক্ষা উদারভাবে সমালোচনার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তিনি বলেন যে সমালোচনা, "জগতের শ্রেষ্ঠজ্ঞান এবং চিন্তা আয়ত্ত ও প্রচার করিবার নিরপেক্ষ প্রয়াস।" যদি তর্কের খাতিরে এই আদর্শকেই আমরা গ্রহণ করি তাহা হইলেও আমাদিগের নিষ্কৃতি নাই—কারণ, কোন্ জ্ঞান ও চিন্তা শ্রেষ্ঠ তাহা নিরূপণ করিবার জন্য বিচার আবশ্যক। এবং বিচারের অর্থ যুক্তি প্রদর্শন—হেতুর উপস্থাপন। এই যুক্তি এবং হেতু আপনার আমার যথেচ্ছ রুচি হইতে পারে না

—কারণ "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"। এবং অশিক্ষিতের রুচি এবং শিক্ষিতের রুচি কখনও তুল্যমূল্য হইতে পারে না। স্পণ্ট' বোভে বলিতেছেন যে, কোন কাব্যপাঠে চিত্ত বিনোদন হইল কি না, আমরা তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইলাম কি না, এবং তাহার আমরা প্রশংসা করিলাম কি না—এ সকলের অপেক্ষা গুরুতর জ্ঞাতব্য হইতেছে ইহাই যে, আমাদের তৃপ্তি ও প্রশংসা উচিত হইয়াছে কি না। ঔচিত্য নির্দ্ধারণের জন্য কতকগুলি অবিসংবাদিত সত্যের—দেশকালনির্বিশেষে প্রযোজ্য নিয়মের—আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই সকল সত্য ও নিয়মকে যে শাস্ত্রে আমরা আবদ্ধ করি, তাহার নাম দিয়া থাকি অলঙ্কার। এইটি শাস্ত্র—যেমন তর্কশাস্ত্র; এবং সমালোচনা সেই শাস্ত্রের প্রয়োগবিজ্ঞান। যুগে যুগে অলঙ্কার শাস্ত্রের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা স্বীকার করি—কিন্তু সেই বিবর্ত্ত বা ক্রমপরিণতিকে কেবল মাত্র পূর্ব্বসঞ্চিত জঞ্জালের ক্রমে ক্রমে বর্জ্জনের ইতিহাস বলিয়া মানিতে পারি না। এবং ইহাও ভাবিতে পারি না যে, আজকাল অলঙ্কারের চর্চ্চা মাত্র কতকগুলি নিরর্থক ও প্রমাদবহুল আবর্জ্জনার সমাদর। কারণ, বহুযুগব্যাপী সমালোচনার ফলে প্রকৃতই কতকগুলি অবিসংবাদিত সত্য নির্ণীত হইয়াছে—শিল্পী মাত্রেরই তাহা জ্ঞাতব্য ও প্রতিপাদ্য—এবং তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে যথার্থই বিকলতা ও বিরসতা জন্মে। কারণ, অলঙ্কারশাস্ত্রকে মনোবিজ্ঞানের অঙ্গ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে—চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণে উহার সূত্রপাত। প্লেটো বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি অলঙ্কারের যথার্থ অধ্যাপনা করিতে চায় তাহাকে মানুষের আত্মার যথাযথ বিবরণ দিতে হইবে।—এই চেষ্টায় আলঙ্কারিকগণ যে কেবল অন্ধকারেই ঘুরেন নাই—তাহার প্রমাণ ইহাই যে, তাঁহাদিগের উদ্ঘাটিত অনেক মৌলিক তত্ত্ব এখনও অনিরাকৃত রহিয়াছে। প্রথমতঃ কাব্যসংজ্ঞার কথা মনে পড়ে—এবং দেখি যে, প্রতীচ্য সমালোচকগণের পরস্পরবিভিন্ন লক্ষণের দ্বারা তাহা তিরস্কৃত হয় নাই। ম্যাথ্যু আর্ণল্ডের প্রবর্ত্তিত Attic এবং Corinthian এর সহিত আমাদের বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। গুণপর্য্যালোচনার "ওজঃ প্রসাদো মাধুর্য্যং" সূত্রটির মূল্য এখনও অপরিহীন। "মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্ষ উপসংহৃতিঃ" নামক পঞ্চসন্ধির সহিত এখনও প্রচলিত Initial Incident, Rising Action, Crisis, Denouement, Conclusion চমৎকার মিলিয়া যায়। রসস্বরূপের যে ব্যাখ্যা আমরা মম্মটের নিকট পাইয়াছি—আজও তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। এমন কি দৃশ্য কাব্যের যে সমস্ত গৌণ উপাদান—যথা Interlude বা অর্থোপক্ষেপক, Dramatic Irony বা পতাকাস্থান, Soliloquy বা স্বগত, প্রস্তাবনা বা Prologue, প্রসঙ্গ বা Episode,—তাহাও নব্য নাট্যকারগণ কর্ম্মক্ষেত্রে ছাঁটিয়া ফেলিতে পারেন না। অতএব ইহাই প্রমাণ হয় যে, কলাবিচারের বাহ্য অঙ্গ সম্বন্ধে আমরা এখনও অনেকাংশে প্রাচীন রীতি প্রসিদ্ধি বা Convention এর দ্বারা আবদ্ধ। ইহার কারণ সাহিত্য একেবারে অশিক্ষিতপটুত্ব নহে—সাহিত্য রচনায় যেমন নির্দ্ধারিত রীতি, সাহিত্য আস্বাদনে তেমনি শিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচির আবশ্যক।

সমালোচনা ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিতে পারে না—সেই জন্যই অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রয়োজন। এই অলঙ্কারশাস্ত্র যুগে যুগে সংস্কৃত হওয়া উচিত এবং হইয়াও থাকে। অতীতোপাসক ভারতেও তাহা হইয়াছে। কিন্তু সে সংস্কারের ফলে অতীত আবিষ্কারগুলি একেবারে নিষ্প্রয়োজন হইয়া গিয়াছে—তাহা বলা যায় না। মানবের ইহাই ধর্ম্ম যে সে পূর্ব্বাপরাবলোকী। অতীতের সঞ্চয়কে ভিত্তি করিয়া, ভবিষ্যচ্চিন্তায় যথাসম্ভব অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে। ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের রুচি ও প্রবৃত্তি অবিকৃতভাবে আমাদিগেরই অনুগত করিব—এরূপ সংকল্প করিলে আমরা নিষ্ফলতাকেই আমন্ত্রণ করি। "কালো হি বলবত্তরঃ।" তবে উপস্থিত জ্ঞানের পরিধিকে যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া, ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হইতে যথাসম্ভব উচ্চগ্রামে উঠিয়া

নিরপেক্ষ যুক্তির সাহায্যে সমালোচনার আদর্শ ও মানদণ্ড নির্দ্ধারণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য, এবং আমার বিশ্বাস, এরূপ চেষ্টায় প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের চর্চ্চা আমাদিগের সমধিক সহায়তা করিবে। যুক্তিতর্কের বাঁধা ধরার ভিতর না যাইয়া, বিচ্ছিন্নভাবে, কালোপযোগী করিয়া, এইরূপ অলঙ্কারশাস্ত্রের পুনর্গঠনের চেষ্টা আধুনিক প্রসিদ্ধ লেখকগণও করিয়া থাকেন। স্যাণ্ট বোভের Classic বা চিরন্তনসাহিত্য-সংজ্ঞার কথা স্মরণ করুন। বঙ্কিমচন্দ্রের গীতিকাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ মনে করুন।

বিচার না করিয়া সাহিত্যের রস অনুভব করা কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব নহে,—তর্কের খাতিরে আমরা যে যাহাই বলি না কেন, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ কার্য্যে আমরা সততই ব্যাপৃত রহিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে বটতলার নভেলের সমান পদবীতে আমরা কখনও নামাই না। সফোক্লিস্ বা সেক্সপীয়রের নাটকগুলিকেও আমরা থিয়েটরের দিনগতপাপক্ষয়ের জন্য রচিত পুস্তকের সহিত তুলিত করি না। এরূপ ইতরবিশেষের মূলে বিচার। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বলেন যে, "বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ গাঢ় নয়"—কিম্বা বলেন্দ্রনাথ যখন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের সহিত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করিয়া, প্রথমটীকে "ক্ষরমাসে কাব্য" আখ্যাত করেন, এবং যখন বলেন যে, রামপ্রসাদের কথার দিকে যত দৃষ্টি, ভাবের দিকে তত নহে—তখনও বুঝি যে সেই বিচারের কারবারই চলিতেছে। শুধু তাহাই নহে—যাঁহারা সমালোচনাকে উদ্ভিদ্বিদ্যা বা জন্তুবিজ্ঞানের তুল্যজাতীয় বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে সাহিত্য শুধু মস্তিষ্ক চালনার উপায় নহে—সাহিত্য তর্কশাস্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। সাহিত্য আমাদিগের জীবনের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। সাহিত্যে সংসার মুকুরিত হইতেছে—সাহিত্যে বহুতর জীবন-সমস্যার অল্পবিস্তর সমাধান হইতেছে। শক্তিমান্ লেখক যেভাবে এই প্রতিবিম্বন ও সমাধান করিতেছেন তাহাতে আমাদের গভীর কৌতূহল—প্রাণের আকর্ষণ থাকিবেই। সেই কারণে সাহিত্যগ্রথিত এই যে তত্ত্ব, এই যে উপদেশ, ইহা লইয়া সমালোচনার আর একটী পথ—আর একটা লোক তৈয়ারী হইয়াছে। এইটী কারুবিচার হইতে স্বতন্ত্র—এইটী সমালোচকের তৃতীয় কর্ত্তব্য। এই পথের পথিক হইয়া এমার্সন, সেক্সপীয়রের প্রতিভার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কথা বিচার করিতে অধিকারী হয়েন; এবং যখন বলেন যে, কবি হইলেও তিনি ঋষি নহেন—তিনি কেবল চতুর অভিনেতৃরূপে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন—মানব জাতির আধ্যাত্মিক উপকার কিছু করেন নাই—তখন আমরা শ্রদ্ধাভরে উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনি। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের সাহিত্যের প্রকৃত গতি নিরূপণ করিতে যাইয়া বলিতেছেন—"সাহিত্যও ধর্ম্মানুকারী হইল, তাহাতে প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচার শক্তি ধর্ম্ম মোহে বিকৃত হইয়াছিল—প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধর্ম্মই তৃষ্ণা, ধর্ম্মই আলোচনা, ধর্ম্মই সাহিত্যের বিষয় হইল।"—ইহাকে শুধু বিবৃতি বা শিল্প-বিশ্লেষণ বলিলে সত্যের অপলাপ হয়—অপমান হয়—ইহাকে বিচার বলিতেই হইবে, তবে ইহা বাহ্য অবয়বের বিচার নহে—ইহা সাহিত্যের অন্তরতম শক্তির বিচার। এইরূপে বলেন্দ্রনাথ যখন বলিতে থাকেন যে, "জয়দেবে চির অতৃপ্ত প্রগাঢ়তা চোখে পড়ে না। গীতগোবিন্দ পাঠান্তে মনে হয়, ন্যায় শাস্ত্র বর্ণিত অন্ধের ন্যায় প্রেমের বিপুল বন্ধুল বহিরঙ্গে জয়দেব হাত বুলাইয়াছেন—তিনি খণ্ড খণ্ড সম্ভোগে প্রেমকে বিক্ষিপ্তভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। অন্তরের অসীমতার দ্বারে ধূলিস্তূপ উচ্চ করিয়া দ্বার রোধ করিয়াছেন, সে ধূলি পুষ্পরেণুর ন্যায় সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চতর সৌন্দর্য্যরাজ্যের পথে বাধা স্বরূপ"—তখন বুঝি যে একটী সুকুমার

সাহিত্য-অনুভূতি মার্জ্জিত ও পরিপক্ক হইয়া আমাদিগকে মনোবিজ্ঞানের শ্রেয়ঃসাধন অঞ্চলে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে—আনন্দের সাথে জ্ঞান মিলাইয়া মঙ্গলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহা শিল্পের বিচার ও বিবৃতি দুই হইতেই বিভিন্ন, তথাপি ইহা বিচার—ইহা বিচার হইলেও মস্তিষ্কের বিচার নহে, হৃদয়ের বিচার। হৃদয়ের বিচার বলিয়া একটি সজীব প্রক্রিয়া—ইহা একটি মৌলিক সৃষ্টি। এরূপ সমালোচনা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। যাহার পক্ষে সম্ভব তিনিও কল্পনা-কুশল, তিনিও সৃজক শিল্পী—তাঁহার সমালোচনাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়া থাকে যে, "প্রকৃত সমালোচনা জীবন হইতে তাহার উপাদান সংগ্রহ করে এবং আপনার ধরণে সেও সৃজনকার্য্যে ব্যাপৃত আছে।"

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য।

উদাসী

জানিনে তোর সব হারিয়ে কেমন ধারা সুখ,
ওরে আপন-ভোলা!—
আপন হাতে কুড়িয়ে নিয়ে সবার সেরা দুখ,
নিজের শিরে তোলা!
রত্ন ভূষণ ফেলে ধূলার মাঝে
কাঙালবেশে চল্‌বি রে কোন্ লাজে?
পথের লোকে বিলিয়ে দিলি সাগর সেঁচা ধন
কেমন করে হায়?
ওরে অবোধ! কোন্ নেশাতে মেতেছে তোর মন,
কিসের ভাবনায়?

ফুটে কাঁটা চরণতলে, তবু কাঁটার বনে
নিত্য রে তোর পথ!
আজ্‌গুবী কোন্ খেয়ালে হায় চলিস্ আপন মনে,
তৃপ্ত মনোরথ?
রাজার পথে হাজার লোকের মেলা,
নানান্ কথা, নানান্ হাসিখেলা,—
সেথা কি তোর ঠাঁই নাহি রে? কেন অপথ মাঝে
বেড়াস্ অবিরত?
ওরে পাগল! কহার লাগি ফিরিস্ ক্ষ্যাপার সাজে
লক্ষ্মীছাড়ার মত?

ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া! জানিনে কোন্ ছলে
সকল দিলি ডালি!
যা' ছিল তোর লুটিয়ে দিলি পথের ধূলার তলে
আঁচল করে' খালি!
অচিন্ দেশে অচিন্ পুরীর মাঝে
কোন্ আঁধারে মণিপ্রদীপ রাজে,
তারি লাগি হারালি সব? উদাস হয়ে হায়
ফিরিস্ দেশে দেশে!
তেয়াগ কি তোর ধন্য হবে লভিস্ যদি তায়,
সকল খোঁজার শেষে?

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

অপরাধিনী

(গল্প)

"বৌমা, একটা কথা বলি শুনে যাও।"

পীড়িত স্বামীর পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া বধূ আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল—"কি বল্‌ছেন জেঠাই মা ?"

"তুমি দেখ্‌ছি বাছা নিখিলকে বাঁচ্‌তে দেবে না। ডাক্তার কি বলে গেছে জান ?"

বধূ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কি ?"

"আর কি ? বলেছে, যদি ছেলে বাঁচা'ত চাও, বউকে সরাও। তা তুমি ত বাছা কারো কথা কাণে তুল্‌বে না।"

বধূ শিহরিয়া উঠিল ; দারুণ লজ্জায় তাহার অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তবু সে মুখ ফুটিয়া বলিল—"এবার থেকে আমি আর কাছে যাব না, আপনি থাক্‌বেন।"

"আমার, বাছা, সে সময় কোথা ? আর, সব সময় রোগীর মুখে মুখে থাকার কিইবা দরকার ? ওষধ আর পথ্যি নিয়ম মত দিলেই হ'ল।"

জেঠাই মা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। বধূ সেখানে বসিয়া পড়িয়া নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল।

পাঁচ বৎসর হইল এই শ্যামনগরে তাহার বিবাহ হইয়াছে। পিতৃগৃহে সে বিধবা মাতার দুর্ভাবনা ও সংসারের গলগ্রহরূপেই চতুর্দ্দশ বৎসর কাটাইয়া আসিয়াছে। শ্বশুরের অনুগ্রহেই সে এ গৃহে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল। তিনি বিনাপণে বালিকাকে পুত্র-বধূরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের গুণে শীঘ্রই এই পিতৃহীনার পিতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শাশুড়ী না থাকায় শ্বশুরের সেবাভার সমস্তই এই বধূ আন্তরিক আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর হইল তিনি তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র ও পুত্রবধূর হৃদয়ে সহনাতীত দুঃখ দিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র অনিল কলিকাতায় এক সওদাগরী আফিসে মোটা মাহিনায় কাজ করিতেন। কনিষ্ঠ তথায় এক গভর্ণমেণ্ট অফিসে ৩০৲ টাকা বেতনের এক চাকরী যোগাড় করিয়া লইয়াছিল। কলিকাতা হইতে যাতায়াত করিববার সুবিধা থাকায় প্রত্যহ দুই ভাতায় নিত্য যাতয়াত করে।

স্বামীগৃহে আসিয়া বধূ উমা ভাবিয়াছিল এতদিনে তাহার সকল দুঃখের অবসান হইল। কিন্তু বর্ষাদিনে একটীবারমাত্র সূর্য্যোদয়ের মত তাহার জীবনে একবার সৌভাগ্যের একটীমাত্র রশ্মি পড়িয়াছিল। পরক্ষণেই তাহা চিরদিনের মত মেঘাবৃত হইতে বসিয়াছে। শ্বশুরের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই তাহার স্বামীকে ম্যালেরিয়ায় ধরিল ; তাহার সহিত ক্রমে কাসি দেখা দিল, শেষে রোগ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার বলিলেন—থাইসিসের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আফিসে ছুটী লইয়া তাহার স্বামী নিখিল ছয়মাস শয্যাগত আছে।

(২)

সারারাত্রি স্বামীর পরিচর্য্যায় কাটাইয়া ভোরের দিকে উমা তাঁহার পায়ের তলায় একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর সম্বন্ধেই একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল ; দেখিল নিখিল তখনও নিদ্রিত। তাহার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া উমার চক্ষে জল আসিল। সে স্বভাবসুন্দর দেহের আজ কি দুরবস্থাই ঘটিয়াছে ! সে গলে বস্ত্র দিয়া শয্যাপার্শ্বে প্রণত হইয়া মনে মনে বলিল—"মা দুর্গা আমার মুখ রেখ মা। এ রোগ আমাকে দিয়ে ওঁকে ভাল করে দাও মা।" তাহার পর অতি সন্তর্পণে স্বামীর পদতলে একটীবার তাহার তৃষিত ওষ্ঠ বুলাইয়া নিঃশব্দে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

জেঠা-শাশুড়ীর দ্বারা স্বামীর কাছে যাইতে নিষিদ্ধ

হওয়ার পর উমা তিনদিন সে ঘরে আসে নাই। একটীবার গিয়া স্বামীর উত্তপ্ত ললাটে হাতখানি রাখিবার জন্য তাহার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তবু সে প্রাণপণ বলে আপনাকে সংযত রাখিয়াছিল। ঔষধ পথ্যের অনিয়ম হইতে দেখিয়াও সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। তাহাকে একটী বারের জন্যও না দেখিয়া স্বামীর মনে কি আঘাত লাগিতেছে, এই চিন্তা তাহাকে সব চেয়ে ক্লিষ্ট করিয়াছিল। জেঠাই মা বলিয়াছিলেন, তিনি পাশের ঘরেই থাকিবেন, নিখিল ডাকিবামাত্র উঠিয়া আসিবেন। কিন্তু উমা সে কথায় নিরুদ্বেগ হইতে পারে নাই। রাত্রে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তিন চারিবার সে লুকাইয়া নিখিলের দ্বারে কাণ পাতিয়া শুনিয়া যাইত, নিখিল ঘুমাইতেছে কি না। একরাত্রে সে নিখিলকে ঘুমের ঘোরে তাহার নাম বলিতে শুনিয়াছিল। সে সময়ে কি প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিয়াই সে যে নিজেকে দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

চতুর্থ রাত্রে সকলেই ঘুমাইয়া গেলে উমা নিখিলের ঘরের কাছে আসিয়া সভয়ে দেখিল, ঘরের দুয়ার খোলা, নিখিল বাহিরের অনাবৃত রোয়াকে হাতের উপর মাথা রাখিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া আছে।

দেখিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তাহার পর, নিখিলের গায়ে হাত দিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"কি সর্ব্বনাশ, তুমি কি বলে খালি গায়ে বাইরে এসে শুয়েচ!"

স্ত্রীর কথা শুনিয়াই নিখিল উঠিয়া বসিল। তিন দিন পরে উমা তাহার সহিত কথা কহিয়াছে। তাহার পানে চাহিতেই গূঢ় অভিমানে নিখিলের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল; বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অতি কষ্টে বলিল—"উমা, তুমিও আমায় ত্যাগ কল্লে?"

উমা কাঁদিয়া ফেলিল; নিখিলকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি, ঘরে চল।"

সে রাত্রে দুইজনের চক্ষের জলে যে অপূর্ব্ব সান্ত্বনা সৃজিত হইয়াছিল তাহা দুইটী হৃদয়কেই পরিতৃপ্তি করিয়াছিল।

(৩)

নিখিলের নিকট হইতে আসিয়া আপনার শয়ন ঘরে প্রবেশ করিতেই উমা দেখিল, জেঠাই মা সেখানে গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া। উমাকে দেখিয়াই সক্রোধে তিনি বলিলেন—"রোজ রাতে তা'হলে ওখানেই শোয়া হয়। এর চেয়ে একেবারে মুখে পূরে ফেল্লেই সব চুকে যেত!"

অপমানে ক্ষোভে উমার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সে কোনও মতে বলিল—"আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলছি জেঠাই মা, কাল রাতে বাইরে হিমে রাগ করে পড়ে ছিলেন, তাই গিয়েছিলাম।"

জেঠাই মা অন্যদিকে চাহিয়া শ্লেষের সহিত বলিলেন—"তাই বলি, এত যে ওষুধ, সব যেন ভস্মে ঘি ঢালা হচ্চে! আমি আজই অখিলকে বলছি—ডাকিনীকে যদি বাড়ী ছাড়া না কত্তে পারে তা'হলে ভায়ের আশা ছেড়ে দিক্।" জেঠাই মা আর বাক্যব্যয় না করিয়া সংবাদটী পুষ্প পল্লবে সুশোভিত করিয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীময় ও খুব নিকট দুই একটী ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর নিকট রাষ্ট্র করিয়া আসিলেন।

অখিল সব শুনিয়া বলিলেন—"বৌমাকে তাঁর মার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

উমা, অখিলের স্ত্রীর নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বলিল—"দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় তাড়িও না। তুমি বড় ঠাকুরকে বল, জেঠাইমা যেন ওঁর ঘরে শোন। তাহলে ত আমি যেতে পারবো না। আমি জেঠাইমার ঘরে থাকবো।"

বড়বধূ ভাবিয়া দেখিলেন, ছোট বৌ তাঁহার ছেলে মেয়েদের খুব যত্ন করে, সংসারের কাজেও উহার কোন আলস্য নাই; তাহার উপর সে চলিয়া গেলে দেবরের সেবার ভারও কিছু তাঁহার উপর পড়িতে পারে। কাজেই তিনি স্বামীর রায় উল্টাইয়া

দিলেন। স্থির হইল, রাত্রে জেঠাইমাই নিখিলের ঘরে থাকিবেন ও ছোটবৌ জেঠাইমার ঘর অধিকার করিবে।

(৪)

রোগের সময় মানুষের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবৃত্তিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মনের মধ্যে যে ইচ্ছা একবার প্রবল হইয়া উঠে, তাহাকে দমন করিবার যথোচিত শক্তি আর তাহার থাকে না। অখিল বা জেঠাইমা যদি সতর্ক থাকিয়া দিবাভাগে মাঝে মাঝে উমাকে নিখিলের নিকট আসিতে দিতেন—তাহা হইলে নিখিলের আকাঙ্ক্ষা এত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিত না। উমার যত্ন, উমার সেবা যতই তাহার নিকট দুর্লভ হইতেছিল, ততই সেগুলির জন্য তাহার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। প্রত্যহই সে ভাবিত, আজ উমা হয়ত একটিবার লুকাইয়া আসিবে। ফলে, দারুণ উৎকণ্ঠা ও মনোভঙ্গে তাহার রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল।

একদিন শেষ রাত্রে নিখিলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জেঠাইমা তখন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিত। পাশের ঘরে যাইবার দুয়ারটি ঈষৎ মুক্ত। নিখিল ভাবিল, এই সুযোগে উমাকে একবারটি দেখিয়া আসি।

অতি ধীরে ধীরে সে শয্যা হইতে নামিল। সেই পরিশ্রমটুকুতেই তাহার দুর্ব্বল বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিল, সে শব্দ আপনি যেন শুনিতে পাইতে লাগিল। সংলগ্ন দুয়ার দিয়া উমার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, উমা মাটীতে কম্বল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে; দূরে কেরোসিনের একটি ছোট আলো জ্বলিতেছে।

ধীরে ধীরে সে শয্যার উপর বসিল। কয়দিনে উমার মুখে এমন একটি বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছিল যে তাহা দেখিয়া নিখিলের চিত্ত তীব্র বেদনায় কাতর হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ সে উমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

অতিরিক্ত উত্তেজনার পর, তাহার শরীরে অবসাদ আসিয়াছিল। ক্রমে তাহার বসিবার শক্তি আর রহিল না। একটু বিশ্রাম করিয়া লইবার জন্য উমার পার্শ্বে সে শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল। নিদ্রার আবেশে কখন যে পুরাতন দিনের মত উমাকে আপনার বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়াছিল তাহা সে নিজেও জানিতে পারে নাই।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গিতেই জেঠাইমা দেখিলেন, নিখিল শয্যায় নাই অথচ বাহিরে যাইবার দুয়ারও বন্ধ। বিদ্যুতের মত একটা সন্দেহ তাঁহার মনে উদয় হইল। উমার ঘরের দুয়ার খুলিতেই তাঁহার সন্দেহ সত্যে পরিণত হইল।

বধূকে ডাকিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। রাগে তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—"হ্যাঁরে ও নিখিল, তোর কি মরণ বাড় বেড়েছে?"

দু'জনেই চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল। সম্মুখে জেঠাইমা এবং পার্শ্বে নিখিলকে দেখিয়া উমা কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া রহিল; তাহার পর তাড়াতাড়ি অবগুণ্ঠন টানিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

"জেঠাইমা, এতে বৌয়ের কোন দোষ নেই"—বলিয়া নিখিল কম্পিত পদে আপনার শয্যায় ফিরিয়া আসিল। উপর্য্যুপরি এইরূপ উত্তেজনার ফলে কিছুক্ষণ পরেই নিখিলের মুখ দিয়া অনেকখানি রক্ত উঠিল।

দশটা বাজিতেই তাহাদের গৃহদ্বারে ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল এবং অখিল উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"বৌমাকে এখনি বাপের বাড়ী যেতে হবে। আমি চোখের সামনে ভাইটাকে এমনি করে হত্যা করতে দিতে পারব না।"

তখন আর উমার দ্বিরুক্তি করিবার উপায় ছিল না। অশ্রুজলে রুদ্ধদৃষ্টি হইয়া সে গাড়ীতে উঠিল। স্বামীর নিকট গিয়া একবার বিদায় লওয়াও হইল না।

(৫)

নিখিলের নিকট হইতে আসিয়া উমার পিতৃগৃহবাস কারাগার অপেক্ষাও কষ্টকর হইয়া উঠিল। দুশ্চিন্তা ও

উদ্বেগে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে জোর করিয়া মনকে প্রবোধ দিত—আমি দূরে থাকিলে যখন তাঁহার মঙ্গল, তখন এই ব্যবস্থাই ভাল।

স্বামীর সংবাদের জন্য তাহার মা'কে তিন খানি পত্র লিখিয়া একখানির উত্তর পাইল। তিনি লিখিয়াছেন, নিখিল সেইরূপই আছে, চিকিৎসা ও সেবা যেমন হওয়া উচিত তাহাই হইতেছে। ডাক্তারের বিশেষ নিষেধ সে যেন এখন কিছুতেই শ্যামনগরে না আসে। আসিলেই নিখিলকে বাঁচান অসম্ভব হইবে।—শেষটুকু অখিল স্ত্রীকে লিখিতে বলিয়াছিল; তাহার ভয় ছিল, হয়ত উমা একদিন কোন সংবাদ না দিয়াই ছুটিয়া আসিবে।

এদিকে নিখিলের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দই হইতেছিল। উমা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে সে আর শয্যাত্যাগ করে নাই। সে নীরবে মৃত্যুর অপেক্ষাই করিতেছিল। অপর কেহ বড় একটা এ সংবাদ রাখে নাই। অনেক দিন ধরিয়া শুশ্রূষা করিয়া তাহারা রোগীর উপর বড় বিরক্তই হইয়াছিল।

সব চেয়ে বিপদ হইয়াছিল জেঠাইমার। বড়বধূ রোগীর দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। তিনি সম্প্রতি এক ঔষধ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কাল-রোগীর ঘরে পর্য্যন্ত যাইতে নাই। কাজেই যেটুকু সেবা করিতে হইত তাহা জেঠাইমার ভাগেই পড়িয়াছিল।

মাস খানেক পরে উমাকে আনিবার জন্য তিনি লুকাইয়া এক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোককে পাঠাইলেন।

উমা মাকে বলিল—"মা, বল আমি এখন যাব না।"

মা আভাষে ইঙ্গিতে ব্যাপার কিছু কিছু বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন—"এই তো সবে এক মাস এয়েছে, আর দিন কতক যাক্, তারপর পাঠাব।"—বর্ষীয়সী হাত উল্টাইয়া বলিল—"ওমা, সে কি! সংসার অচল! এদিকে স্বামীর অবস্থা এখন তখন, আর মেয়ে বল্লে—'আমি এখন যাব না'! তুমিও তাইতে সায় দিলে!"

সংসারের কর্ত্তা উমার বৈমাত্রের ভাই, কর্ত্রী ভ্রাতৃজায়া। কথাটা তাহাদের কর্ণে উঠিতেই তাহারা বিমাতাকে বিলক্ষণ দশ কথা শুনাইয়া দিল। এই অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্যে তাহারা মোটেই প্রীত ছিল না। তাহার উপর, ভালমন্দ কিছু হইলে, এ ভার স্থায়ী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। দুজনেই বলিল—"স্বামীর অসুখ শুনে যে মেয়ে বলে যাব না, আমরা তার মুখ দেখতে চাইনে।"

দুঃখে অভিমানে মা জোর করিয়া উমাকে গরুর গাড়ী করিয়া কাঁচড়াপাড়ায় তুলিয়া দিয়া গেলেন।

ষ্টেশনে আসিয়া পর্য্যন্ত কি এক অজ্ঞানিত আশঙ্কায় উমার বুক কাঁপিতেছিল।

উমা আসিতে অস্বীকৃত হওয়াতে বর্ষীয়সীর বিলক্ষণ ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিতেই সে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল—"বাবা, এমন মেয়ে মানুষ কখনও দেখিনি! সোয়ামী মরতে বসেছে, তবু বলে কি না যাব না!" সকলে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে গো?" বর্ষীয়সী সবিস্তারে সকলের কৌতূহল মিটাইয়া দিল। উমা কোন কথার প্রতিবাদ না করিয়া পাষাণমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শ্যামনগরে ঘোড়ার গাড়ী হইতে বাড়ীর সম্মুখে নামিতেই রোরুদ্যমানা জেঠাইমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওরে রাক্ষসি, এতদিনে তোর মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল রে!"

উমা ছুটিয়া নিখিলের ঘরে প্রবেশ করিতে গেল। ঘরের সম্মুখেই নিখিলের শীর্ণ নিস্পন্দ দেহ-বস্ত্রাবৃত হইয়া পড়িয়া ছিল। দূরে দুই এক জন প্রতিবেশী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

যাহার চক্ষু কিছু পূর্ব্বেও উমাকে দেখিবার জন্য শেষ অন্বেষণ করিয়া নিমীলিত হইয়াছে, যাহার কণ্ঠ একটু পূর্ব্বেও উমারই নাম উচ্চারণ করিয়া নীরব হইয়াছে—সেই মৃত দয়িতের পদতলে উমা লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

প্রেমোন্মাদ

ঐ কে এলরে কালো পথিক আমার আঙিনাতে,
ও রে, কে এলরে আজ ?
আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিল সজল আঁখিপাতে,
সে যে ভুলিয়ে দিল কাজ !
সখি, ঐ কি তোদের কালা ?
ঐ কালোর বুকে ঝিলিক মারে—
ঐ কি বনমালা !

আমার কানে কানে কত কথাই কইত কত লোকে
তারা কইত না মুখ ফুট',
শুনে ভয়ে আমি যাইনা ঘাটে, চাইনা কারে চোখে—
পাছে কলঙ্কনাম উঠে ;
সদাই পোড়া মনের ভয়—
কালার কালো বরণ যদি পাগল করাই হয় !

ওগো, সেই কি লো সই অতিথ হয়ে আপ্‌না হ'তে আজ
এল এ মোর গৃহদ্বারে,
ওরে, এমন রূপ ত দেখিনিরে, ওকি মোহন সাজ,
ওযে সব ভুলাতে পারে !
ঐ স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া—
যেন বুকের মাঝে চন্দনরস অঙ্গপরশ পাওয়া !

শোন মুহুর্মুহু মুহুর্মুহু মধুর মুরলীতে
সারা আকাশ ভরি',
এই গুরু গুরু বুকের মত মনের চারিভিতে
আমায় ডাক্‌ছে সহচরি !
সখি, ঐ ত শ্যামের বাঁশী,
সেই মন ভুলান' প্রাণ মাতান' মরণ সর্ব্বনাশী !

হের শিখিপাখার ইন্দ্রধনু পড়্‌ল বুঝি নুয়ে
এই মাথার পরে এসে ;
ওকি, অশ্রু তাহার ফোঁটায় ফোঁটায় পড়্‌ল বুঝি ভুঁয়ে
আমার বুকের তলদেশে !
আমি রইতে কি আর পারি,
আজ, গৃহদ্বারে এল যে মোর মানসকুঞ্জচারী !

ঐ ঝর্ঝরিয়া ঝর্ঝরিয়া ঝরছে আঁখিধার
তার কালো কপোল বেয়ে,
দুকূলহারা করে' আমার প্রাণের পারাবার
ঐ আস্‌ছে বুঝি ধেয়ে ;
একি পুলক ব্যথা প্রাণে—
কদম্ব ফুল উঠ্‌ল ফুটে অন্তর মাঝ খানে !

কালো তমালবনের কাজল কালী লাগল ঘরে দ্বারে
ওরে, লাগ্‌ল এ আঁখিতে,
ঐ যমুনাজল উচ্ছ্বসিয়া জাগ্‌ল পারে পারে
ওরে, লাগ্‌ল আচম্বিতে !
তারি শীতল কালো জলে,
দেখি আজকে রাধা পায় কিনা ঠাঁই মরণ মহাতলে !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর গঠন প্রণালী।

পৃথিবীর সাত ভাগের মধ্যে পাঁচ ভাগ জল এবং দুই ভাগ স্থল। আরও সূক্ষ্মতর গণনা অনুসারে ইহার শতকরা ৭২ ভাগ জল এবং ২৮ ভাগ স্থল। আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীর এই জলস্থল বিভাগকে আকস্মিক এবং বিশৃঙ্খল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর কোন কোন ভৌগলিক দৃশ্যের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে পৃথিবীর জলস্থল-সংস্থান কোন বিশেষ নিয়মানুসারেই সাধিত হইয়াছে।

পৌরাণিক যুগের পশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে পৃথিবী একটি চক্রাকার দ্বীপ এবং তাহার চারিদিকে বিশাল বারিধি। ভূমধ্য সাগর এই দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যযুগের যে সকল মানচিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেও মনে হয় যে তাঁহাদেরও ধারণা প্রায় প্রাচীন পণ্ডিতদের মতই ছিল। তাঁহারা জেরুজেলমকে পৃথিবীর কেন্দ্র স্বরূপ ধরিয়াছিলেন এবং চক্রাকার পৃথিবীর অরের পথে স্থলভাগ গুলিকে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার পর প্রাচীন পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়া গেল। কিন্তু পক্ষান্তরে ইহার ফলে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে অধিকতর সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হইল। প্রসিদ্ধ মনীষী লর্ড বেকন পৃথিবীর নানা দেশের মধ্যে আকারগত নানা সাদৃশ্য আবিষ্কার করিলেন।

ক্রমশঃ ভূগোল সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভের ফলে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে আকারগত সাদৃশ্য সমূহ আবিষ্কৃত হইল তাহা হইতে পণ্ডিতমণ্ডলীর মনে সুদৃঢ় ধারণা জন্মিল যে পৃথিবীর জলস্থল-সংস্থান কোন বিশেষ রীতি (plan) অনুসারেই সাধিত হইয়াছে। ইহা আকস্মিক বা নিয়মবহির্ভূত নহে।

বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভূগোল সম্বন্ধে যত দূর জ্ঞানলাভ করা গিয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত চারি প্রকারের ভৌগোলিক বিশেষত্ব সহজেই আমাদের চক্ষে পড়ে :—

(১) পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে স্থলের এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে জলের বাহুল্য।

(২) পৃথিবীর জলভাগ ও স্থলভাগ গুলি প্রায় সমস্তই ত্রিকোণাকার। মহাদেশ ও মহাসাগর গুলির অধিকাংশেরই আকার বিষমবাহু ত্রিভুজের মত।

স্থলত্রিভুজ গুলির ভূমি উত্তর দিকে এবং শীর্ষ দক্ষিণ দিকে। ইহারা উত্তর দিক হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে। উত্তর-আমেরিকা, দক্ষিণ-আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষ ইহার উদাহরণ স্থল।

মহাসাগর গুলির আকার ইহার ঠিক বিপরীত। ইহারা দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত এবং উত্তর দিকে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ। প্রশান্ত মহাসাগর, ভূমধ্য সাগরের প্রধান প্রধান অংশ, আরব সাগর এবং বঙ্গ সাগর ইহার উদাহরণ।

পুরাকালে গ্রীনল্যাণ্ড হইতে আইসল্যাণ্ড হইয়া স্কটল্যাণ্ড পর্য্যন্ত যে ভূমিখণ্ড বর্ত্তমান ছিল তাহা যদি সাগর-গর্ভে নিমগ্ন হইয়া না যাইত তাহা হইলে উত্তর অ্যাটলান্টিকের আকারেও এইরূপ সাদৃশ্য দেখা যাইত।

(৩) পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে স্থলভাগ প্রায় অবিচ্ছিন্ন চক্রাকারে স্থাপিত এবং ইহার দক্ষিণাংশ ছয়টি মহাদেশ রূপে দক্ষিণাভিমুখে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাকারে প্রসারিত।

উত্তর গোলার্দ্ধস্থিত স্থলচক্র কেবল দুই স্থানে

বিচ্ছিন্ন—ইহার একস্থানে বেরিং প্রণালী এবং অন্যত্র উত্তর অ্যাটলান্টিক।

এই বিচ্ছিন্নতা অধিক দিনের নহে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভৌগোলিক যুগেও স্কটল্যাণ্ড এবং গ্রীণল্যাণ্ড পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। স্থলচক্রের তিনটি দক্ষিণাভিমুখী রেখার দুই পার্শ্বে আমেরিকা, ইউরাফ্রিকা (ইউরোপ ও আফ্রিকা) এবং অষ্ট্রেলিয়া সংযুক্ত এসিয়া। পক্ষান্তরে মহাসাগর গুলি দক্ষিণ গোলার্দ্ধে অবিচ্ছিন্ন চক্রাকারে অবস্থিত এবং উত্তরে সূক্ষ্মাকারে স্থলভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট।

(৪) নিম্নলিখিত বিশেষত্ব সহজে চক্ষে না পড়িলেও ইহা বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ এই বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীর গঠন-প্রণালীর মূলসূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই বিশেষত্ব পৃথিবীর জলস্থলের অবস্থানের বৈপরীত্য-মূলক। ভূপৃষ্ঠের যেখানে স্থল তাহার বিপরীত দিকেই জল এবং যেখানে জল তাহার বিপরীত দিকে স্থল। ম্যাপের বদলে একটি গ্লোব লইয়া পরীক্ষা করিলে এই বিশেষত্ব সহজেই চক্ষে পড়ে। গ্লোবটি একটি টেবিলের উপর গড়াইলে দেখা যাইবে যে, যখনই গ্লোবটির উপর অংশে স্থল পড়িবে, তখনই তাহার টেবিল সংলগ্ন অংশে জল পড়িবে। এইরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে অষ্ট্রেলিয়ার বিপরীত দিকে উত্তর অ্যাটলান্টিক, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিপরীত দিকে মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ-মহাদেশের বিপরীত দিকে উত্তর-মহাসাগর, উত্তর-আমেরিকার বিপরীত দিকে ভারত-মহাসাগর এবং দক্ষিণ-মহাসাগরের অংশ বিশেষ, দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তরাংশের বিপরীত দিকে চীন-সাগর এবং পশ্চিম-প্রশান্ত-মহাসাগর। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল—দক্ষিণ-আমেরিকার দক্ষিণাংশের বিপরীত দিকে চীন দেশের অংশ বিশেষ। নিয়মের ব্যাপ্তির তুলনায় এই সামান্য ব্যতিক্রম ধর্ত্তব্য নহে।

উল্লিখিত চারি প্রকারের সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান কলের পণ্ডিত-মণ্ডলী পৃথিবীর গঠন-প্রণালীর প্রকৃত রহস্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর গঠন-প্রণালীর প্রধান বিশেষত্ব উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধে জলস্থল সংস্থানের গুরুতর পার্থক্য। এই পার্থক্য অবলম্বন করিয়াই প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত লোথিয়ান গ্রীন্ (Lothian Green) তাঁহার পৃথিবীর গঠনপ্রণালী সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা প্রচারিত করেন।

পুরাকালে লোকের ধারণা ছিল যে পর্ব্বতশ্রেণীর অবস্থান অনুসারেই দেশের গঠন-প্রণালী নিয়মিত হইয়া থাকে। আমাদের দেব প্রতিমার কাঠামোর মত পর্ব্বতশ্রেণী দেশের "কাঠামোর" কাজ করে এবং এই কাঠামোর উপরে মাটির স্তর পড়িয়াই দেশের পূর্ণ-প্রতিমা গঠিত হয়। এই জন্যই প্রাচীন কালে পর্ব্বতশ্রেণীর নাম ছিল "মহাদেশের মেরুদণ্ড।" আমাদের দেশে পর্ব্বতের "ভূধর" "মহীধর" প্রভৃতি নামও সম্ভবতঃ এই ধারণারই সূচনা করে।

প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত বোমণ্ট সাহেব (Elie de Beaumont) জন-সাধারণের এই ধারণাকে বৈজ্ঞানিক আকার দিবার প্রথম চেষ্টা করেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে পৃথিবীর গোলাকার পৃষ্ঠভাগ নিয়মিত এবং গভীর রেখার দ্বারা খণ্ডিত এবং এই রেখা শ্রেণীর অবস্থান অনুসারে সমস্ত পৃথিবী দ্বাদশটা পঞ্চভুজ-ক্ষেত্রে বিভক্ত।

বোমণ্টের সিদ্ধান্তের প্রধান অঙ্গহীনতা এই যে তাঁহার আবিষ্কৃত বিভাগ-প্রণালী উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে অবিকল এক প্রকার। কিন্তু পৃথিবীর গঠনরীতির আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্ব প্রথমেই দেখা যায় যে এই দুই গোলার্দ্ধের গঠনরীতি মূলতঃ বিভিন্ন।

এই বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া লোথিয়ান গ্রীন তাঁহার নবপ্রচারিত বিভাগ-রীতির আবিষ্কার করেন।

লোথিয়ান গ্রীনের সিদ্ধান্ত অনুসারে পৃথিবীর জলস্থল-সংস্থান-অনুযায়ী যে আকার নিরূপিত হয় তাহার

সঙ্গে দ্বাদশটি পঞ্চভুজের সমবায় অপেক্ষা "টেট্রাহেড্রন" ক্ষেত্রের সাদৃশ্য অনেক অধিক।

যে ত্রিভুজাকার ঘনক্ষেত্র চারি দিকে চারিটি সমবাহু ত্রিভুজ দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাহার নাম টেট্রাহেড্রন। এই ক্ষেত্রে চারিটি সমত্রিভুজাকার পৃষ্ঠ, ছয়টি উচ্চ "ধার" এবং চারিটি সূচগ্র চূড়া থাকে।

চারিটি সমত্রিভুজাকার কাগজ খণ্ডের প্রত্যেকের মধ্যস্থলে এক একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া যদি বৃত্তগুলিকে নীলবর্ণে এবং প্রত্যেক ত্রিভুজের অবশিষ্ট অংশ গুলিকে পীতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া কাগজগুলিকে এমন ভাবে পাশাপাশি জুড়িয়া লওয়া যায় যে সকল গুলি মিলিয়া দেখিতে একটি "পিরামিডে"র মত হয়, তাহা হইলে এই পিরামিডের মত ক্ষেত্রের (টেট্রাহেড্রনের) সঙ্গে পৃথিবীর গঠন প্রণালীর যথেষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়।

এই ক্ষেত্রটিকে টেবিলের উপর গড়াইলে দেখা যায় ইহার প্রত্যেক চূড়ার বিপরীত দিকে এক একটি ত্রিভুজাকার সমপৃষ্ঠ। এবং ইহার নীলবর্ণ বৃত্ত গুলির পরিমাণ সমস্ত ক্ষেত্রটির পরিমাণের সাত ভাগের পাঁচ ভাগ মাত্র। এই বৃত্তগুলিকে জল এবং অবশিষ্ঠ পীতাংশ গুলিকে স্থল বলিয়া ধরিয়া লইলে ইহাদের অনুপাত পৃথিবীর জলস্থলের অনুপাতের অনুরূপই হয়।

এক্ষণে ক্ষেত্রটীর একটী চূড়া এবং তাহার বিপরীত দিকে অবস্থিত সমতলটীর কেন্দ্রস্থলের মধ্যে দিয়া একটী লোহার কাঁটা চালাইয়া দিয়া সমতল পৃষ্ঠটি উপর দিকে রাখিয়া যদি ক্ষেত্রটীকে কাঁটার সাহায্যে টেবিলের উপর দাঁড় করান যায়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে যদি ক্ষেত্রটীর উপরের পৃষ্ঠে জল থাকিত এবং ক্ষেত্রটীর মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় কোন শক্তি থাকিত, তাহা হইলে ঐজল সর্ব্বাগ্রে পৃষ্ঠস্থ বৃত্ত মধ্যেই সঞ্চিত হইত। এবং যদি এই জলের পরিমাণ এরূপ হইত যে তাহার দ্বারা পৃষ্ঠদেশের সাতভাগের পাঁচ ভাগ মাত্রই আবৃত হইতে পারে, তাহা হইলে এই জলের দ্বারা কেবল উহার বৃত্তাংশটুকুই আবৃত হওয়া যাইত। ক্ষেত্রটীর প্রত্যেক পৃষ্ঠেই যদি এইরূপ পরিমাণ জল থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক পৃষ্ঠেই এইরূপ ব্যাপার ঘটিত এবং ক্ষেত্রেটীর অবশিষ্ট অংশগুলি তাহার স্থলভাগের সূচনা করিত। এইবার যদি ক্ষেত্রটীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ক্ষেত্রটীর জল-স্থল-বিন্যাস পৃথিবী পৃষ্ঠস্থিত জল-স্থল সংস্থানের অনুরূপ মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছে। এই ক্ষেত্রের উপরের পৃষ্ঠস্থিত গোলাকার অংশটীকে যদি উত্তর মহাসাগর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে ইহার চারিদিকে প্রায় অবিচ্ছিন্ন স্থলচক্র রচিত হইয়াছে এবং ইহার দক্ষিণস্থ অংশগুলি ত্রিভুজাকারে দক্ষিণ দিকে সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

উত্তর মহাসাগরের বিপরীত দিকস্থিত চূড়াটীর নিকট অবস্থিত স্থলভাগ দক্ষিণ মহাদেশের সূচনা করিতেছে এবং ইহার চারিদিকে চক্রাকারে মহাসাগর মালা বিরাজ করিতেছে।

সুতরাং এই ক্ষেত্রের জলস্থল-সংস্থান-প্রণালী অনেকটা পৃথিবীর জলস্থল-সংস্থান-প্রণালীরই অনুরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। এই কারণে পৃথিবীর জল-স্থল সংস্থানকে "টেট্রাহেড্রন" জাতীয় বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এই টেট্রাহেড্রন ক্ষেত্রের জলস্থল সংস্থান অনেকাংশে পৃথিবীর জলস্থল-সংস্থানের অনুরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য দৃষ্ট হয়:—

(১) টেট্রাহেড্রনের সকল পৃষ্ঠগুলিই যেমন অবিকল একরূপ, পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগরগুলির আকার ঠিক সেইরূপ একরূপ নহে।

(২) আমেরিকা যেরূপ এশিয়া হইতে সাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন, এশিয়া ও ইউরোপ সেরূপ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে।

অবশ্য শেষোক্ত পার্থক্যটী পরবর্ত্তীকালে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্ত্তন জনিত। ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বর্ত্তমানকালে যে সংযোগ দেখা যায় তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে সমুদ্রতল হইতে উত্থিত স্থলভাগের আবির্ভাব জনিত।

পূর্ব্বে ইউরোপ ও এশিয়া যে সমুদ্রদ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল, পারস্য-উপসাগর এবং কাস্পীয় হ্রদ আজিও তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। এবং সম্ভবতঃ তাহারা সেই বিলুপ্ত সাগরেরই অংশাবশেষ মাত্র। কাস্পীয় হ্রদে সীলমৎস্যের অবস্থিতি পূর্ব্বকালে ইহার উত্তর-মহাসাগরের সঙ্গে সংযোগই সূচিত করে।

সুতরাং রুশিয়ার এশিয়া প্রান্তস্থ নিম্নভূমি যদি পুনরায় সাগরজলে নিমগ্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে কাস্পীয় হ্রদ এবং পারস্য উপসাগরের মধ্যে একটা গিরিশ্রেণীমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই গিরিশ্রেণী ভূপৃষ্ঠের আকুঞ্চনজাত এবং ইহার বয়ঃক্রমও অধিক নহে।

ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্যে যে বিস্তীর্ণ বিচ্ছেদ দেখা যায় তাহাও অধিক কালের নহে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও উত্তর-আ্যট্‌লান্টিক উত্তর-মহাসাগর হইতে স্থলভাগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এই স্থলখণ্ড স্কটল্যাণ্ড হইতে ফারো দ্বীপপুঞ্জ এবং আইস্‌লাণ্ড হইয়া গ্রীণলাণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আজিও এই প্রদেশে সমুদ্রের অগভীরতা এই তথ্যের সূচনা করিতেছে।

সুতরাং টেট্রাহেড্রনের সঙ্গে পৃথিবীর সাদৃশ্য আলোচনাকালে এ ব্যতিক্রমটীকে একপ্রকার উপেক্ষা করা যাইতে পারে।

কিন্তু এ কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর যে প্রকার গঠন-প্রণালী দেখা যায় তাহা অনেকটা টেট্রাহেড্রনের অনুরূপ হইলেও ইহার আকার ঠিক টেট্রাহেড্রনের মত নহে। এইরূপ ব্যতিক্রমের কারণ আছে।

পৃথিবী যদি অচল হইত তাহা হইলে সম্ভবতঃ আজিও তাহার টেট্রাহেড্রনাকৃত অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিত। কিন্তু পৃথিবীর মত উপাদান-গঠিত কোন দ্রুত-আবর্ত্তনশীল গ্রহ ক্রমশঃ গোলাকার না হইয়া থাকিতে পারে না।

যদি কোন টেট্রাহেড্রনের ধারগুলি তিমি মৎস্যের স্থূল অস্থির ন্যায় কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থদ্বারা গঠিত হয় এবং ইহার পৃষ্ঠগুলিও তদ্রূপ কোন পদার্থ নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে এইরূপ ক্ষেত্রের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাইয়া দিলে ইহার ধার ও পৃষ্ঠগুলি ক্রমশঃ বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্রটী গোলকে পরিণত হয়। এইরূপে পুরাকালের টেট্রাহেড্রনাকৃতি পৃথিবী ক্রমশঃ গোলাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

পৃথিবীর এই পরিবর্ত্তনের জন্যই ইহার মহাদেশ ও মহাসাগর-সমূহের আকৃতিও ক্রমশঃ তাহাদের বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

লোথিয়ান গ্রীণের মতে যদি সরল টেট্রাহেড্রনের প্রত্যেক পৃষ্ঠে একটী করিয়া ষড়পৃষ্ঠ "পিরামিড" বসাইয়া দেওয়া যায় এবং টেট্রাহেড্রনের চারি পৃষ্ঠে যে চতুর্ব্বিংশতি পৃষ্ঠ বিশিষ্ট ক্ষেত্র উৎপন্ন হয় তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠকে বক্র করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে প্রায়-গোলাকার ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আকার অনেকটা তাহারই মত।

ভূগর্ভস্থ পদার্থরাশির আকুঞ্চনবশতঃ পৃথিবীকে ক্রমাগতই সঙ্কুচিত হইতে হইতেছে। কিন্তু ইহার অভ্যন্তর-ভাগ যে পরিমাণে সঙ্কুচিত হইতেছে, ইহার কঠিন পৃষ্ঠদেশ সে পরিমাণে সঙ্কুচিত হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় গোলাকার পদার্থ মাত্রেরই টেট্রাহেড্রনাকৃতি ধারণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। গোলাকার পদার্থের, তাহার অন্তর্গত সামগ্রীর তুলনায় পৃষ্ঠভাগের পরিমাণ নিতান্ত অল্প; টেট্রাহেড্রনাকার পদার্থে ঠিক ইহার বিপরীত।

এই কারণে, যখন কোন কঠিন আবরণ-বিশিষ্ট গোলাকার পদার্থকে তাহার অভ্যন্তরিক আকুঞ্চনের জন্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে হয়, তখন সহসা তাহার পৃষ্ঠদেশের পরিমাণের বাহুল্য ঘটে। এই বাহুল্যকে "চারাইয়া" দিবার জন্য ইহার চারি পৃষ্ঠকেই কিয়ৎ পরিমাণে সমতলাকৃতি অবলম্বন করিতে হয়। সুতরাং ইহার আকার টেট্রাহেড্রনের অনুরূপ হইয়া পড়ে।

স্ফীত "বেলুন" আকুঞ্চিত হইবার সময় এইরূপ

আকার ধারণ করে। ফাঁপা "বলে"র উপর চাপ দিলে তাহারও আকার এইরূপ হইয়া পড়ে।

একটা সরু নলের উপর বাহির হইতে চাপ দিলে তাহার যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা লক্ষ্য করিলে একথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ফেয়ারবার্ণ (Fairburn) পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এইরূপ নলের উপর চাপ প্রয়োগ করিলে তাহার তিন দিক নত হইয়া পড়ে এবং যে পৃষ্ঠ নত হয় তাহার বিপরীত পৃষ্ঠ উন্নত হইয়া উঠে। নলের যেরূপ তিন দিক নত হইয়া পড়ে, গোলকের সেইরূপ চারিদিক নত হইয়া পড়ে। এবং তাহারও যে পৃষ্ঠ নত হইয়া পড়ে, তাহার বিপরীত দিক উচ্চ হইয়া উঠে।

আভ্যন্তরিক আকুঞ্চন বাহিরের চাপের মতই কাজ করিয়া থাকে। এই কারণে আভ্যন্তরিক আকুঞ্চনের জন্য পৃথিবীর আকারেরও এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

ভূগর্ভের গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত প্রস্তর-স্তর সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানিতে পারি তাহা হইতে অনুমান হয় যে এই স্তর ভূপৃষ্ঠস্থ স্তর অপেক্ষা অধিকতর সঙ্কোচশীল। এই জন্য ভূপৃষ্ঠেরও কোন কোন অংশ টেট্রাহেড্রনের অংশবিশেষের মত সমতল হইয়া পড়ে। যদি পৃথিবী নিশ্চল হইত তাহা হইলে তাহার টেট্রাহেড্রনাকারই স্থায়ী হইয়া যাইত। কিন্তু তাহার আবর্ত্তনের বেগ তাহাকে প্রায় গোলাকৃতি করিয়া তুলে, কেবল তাহার চারিটী পৃষ্ঠ কিছু নত থাকিয়া যায়। এই অবনত অংশে জল সঞ্চিত হওয়াতেই মহাসাগরের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত কারণে যে পৃষ্ঠ অবনত হইয়া যায়, তাহার বিপরীত দিক উন্নত হইয়া উঠে।

উত্তর-মেরুর দিক অবনত হওয়ায় দক্ষিণ-মেরু চূড়ার মত উন্নত হইয়া উঠে এবং এই কারণে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধের আকারগত বিভিন্নতা উৎপন্ন হয়।

পৃথিবী যে ঠিক গোলাকার বা ডিম্বাকার নহে সে সম্বন্ধে আজ কাল পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আর কোন মত-ভেদ নাই। সেই জন্য সূক্ষ্মভাবে পৃথিবীর আকার নির্দ্দেশ করিতে গিয়া সার জর্জ্জ ডারউইন (Sir George Darwin) বলেন যে পৃথিবীর আকার কতকটা আলুর মত এবং সূক্ষ্মতর বর্ণনা দিতে গিয়া চার্শ্লেল সাহেব বলেন যে পৃথিবীর আকার "পৃথিবীরই মত"! আকুঞ্চনের ফলে ভূপৃষ্ঠ ক্রমশঃ সমতল হইতে থাকে। যখন আর সমতল থাকা চলেনা তখন তাহার ধারের উচ্চাংশগুলি বসিয়া গিয়া আবার তাহাকে গোলাকৃতি প্রদান করে। কিন্তু এই রূপে যে নূতন গোলক উৎপন্ন হয় তাহার আকারের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। পৃথিবীদেহের এই আকুঞ্চনের পরিমাণ কত, আজিও তাহার সুমীমাংসা হয় নাই। পৃথিবী পৃষ্ঠস্থ পর্ব্বত এবং সাগর-তলের উচ্চতা ও গভীরতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পৃথিবীর ব্যাস এতকালে প্রায় ১১ মাইল কমিয়া গিয়াছে। কেহ বলেন, হ্রাসের পরিমাণ ৬ মাইলের অধিক হইবে না।

সার জর্জ্জ ডারউইনের মতে পরিজ্ঞাত-যুগের মধ্যে পৃথিবীদেহ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে যে দূর-প্রসারিত গিরিশ্রেণী দেখা যায়, তাহাদের অনেক গুলিকে দেখিলেই মনে হয় যে, ভূপৃষ্ঠের আকুঞ্চন-জনিত পার্শ্ব-চাপের ফলেই তাহারা অনেকে অল্পপরিসর স্থানের মধ্যে একত্রীভূত হইয়াছে। পৃথিবীর আকুঞ্চন সম্বন্ধীয় এই অভ্রান্ত সাক্ষ্যকে ভূতত্ত্ববিদ্ কোন ক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং এ অবস্থায় সার জর্জ্জ ডারউইনের সিদ্ধান্তের উপর তেমন আস্থা স্থাপন করা চলে না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

কবির অধিকার

[Schiller]

"লহ এই ধরা"— স্বর্গ হইতে
কহিলেন ভগবান্
ডাকিয়া মানবে— "লহ এ ধরণী,
আমার স্নেহের দান।
এই বসুমতী তোমাদের তরে
র'বে চিরদিন ধরি',
ভাই ভাই মিলি' ভোগ করিবারে
লহ বণ্টন করি'।"

শুনি' সেই বাণী, যে ছিল যেথায়
ছুটিয়া আসিল ত্বরা,
বালক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া
বাঁটিয়া লইতে ধরা।
লইল কৃষক ধরা-জাত যত
বিবিধ শস্যফল ;
শিকারী লভিল মৃগয়ার তরে
আরণ্য মৃগদল ;
পণ্য আহরি' করিল বণিক্
পূর্ণ বিপণি তার;
ঘোষিল নৃপতি সবার অংশে
রাজকর অধিকার।

বণ্টন যবে হয়ে গেল সারা,
বাকি আর কিছু নাই—
বহু দূর হ'তে সকলের শেষে
আসে কবি সেই ঠাঁই।
ধাতার চরণে লুঠি কহে কবি
কাঁদিয়া—"বিশ্বরাজ,
শুধু এ ভক্ত- সন্তান তব
বঞ্চিত হ'ল আজ!"
কহিলা বিধাতা "কোথা ছিলে তুমি—
কোন্ স্বপনের পুরে,
সবাই যখন ধরা-ভাগে রত,
কেন তুমি ছিলে দূরে ?"

"নয়ন আমার ছিল অনিমেষে
চাহি' তব মুখ পানে,
শ্রবণ আমার আছিল মুগ্ধ
তোর-বীণার তানে।
তোমারি আলোকে মত্ত এ প্রাণ
ভুলে ছিল ধরাভূমি,
ছিলাম তোমারি কাছে"—কহে কবি—
"ক্ষমা কর মোরে তুমি।"

"কি দিব তোমায় ?" —কহিলা বিধাতা
করুণা-কোমল আঁখি,—
"ভূমি, অরণ্য, পণ্য, আপণ
কিছু হেথা নাহি বাকি।
এস পাশে মোর— পার্থিব কিছু
লহ নাই তুমি মাগি',
রহিবে মুক্ত মম গৃহ দ্বার
সতত তোমার লাগি'।"

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

প্রাচীন ভারত

["উবাসগ দসাও" (উপাসক-দশাঃ) নামক জৈন সপ্তম অঙ্গ হইতে আমরা কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি, ইহাতে পুরাকালের একজন ধনীব্যক্তির অবস্থা ও তাঁহার খাদ্যাদি সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারা যায়। এই গ্রন্থ শ্রীমহাবীর স্বামীর শিষ্য "সুধর্ম্ম"গণধর কর্ত্তৃক রচিত]

আর্য্য সুধর্ম্ম কহিলেন, "হে জম্বু (১) সেকালে ও সে সময়ে 'বানিয়াগাম'(২) নামক নগর ছিল। সেই বাণিজ্য-গ্রাম নগরের বহির্ভাগে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে "দূইপলাস" নামক চৈত্য ছিল। বাণিজ্যগ্রাম নগরে জিতশত্রু(৩) নামক রাজা রাজত্ব করিতেন এবং "আনন্দ" নামক গৃহস্থ তথায় বাস করিতেন। ইনি (আনন্দ) আঢ্য ও অপরাভবনীয় ছিলেন। গৃহপতি আনন্দের চারিকোটী সুবর্ণমুদ্রা ভূমিতে প্রোথিত ছিল, চারিকোটী স্বর্ণমুদ্রা বৃদ্ধিতে ন্যস্ত ছিল, চারিকোটী স্বর্ণমুদ্রা সম্পত্তিতে বিন্যস্ত ছিল (অর্থাৎ ধনধান্য দ্বিপদ চতুষ্পদাদি ছিল) ও প্রত্যেক ব্রজে দশ সহস্র করিয়া চারিটি গোব্রজ ছিল।

গৃহপতি আনন্দের নিকট রাজা, সার্থবাহ প্রভৃতি অনেকে বহু কার্য্যে, কারণে, মন্ত্রণাতে, সামাজিক বিষয়ে, গুহ্য বিষয়ে, কঠিন রহস্যে, সিদ্ধান্তে, বাণিজ্যে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তিনি তাঁহার স্বকুলের প্রধান স্তম্ভ, আধার, অবলম্বন, চক্ষুস্বরূপ ও সকল কার্য্যেই উন্নতির কারণ ছিলেন।

গৃহপতি আনন্দের "শিবানন্দা" নাম্নী অহীনা (৪) ও সুরূপা স্ত্রী ছিলেন। ইনি গৃহপতি আনন্দের অতি প্রিয়পাত্রী ছিলেন। ইনি অনুরক্ত, অবিরক্ত ও আসক্ত হইয়া মনুষ্য সম্বন্ধীয় পঞ্চপ্রকার (৫) কামভোগ আনন্দ গৃহপতির সহিত উপভোগ করিতে করিতে কালযাপন করিতেন।

সেই বাণিজ্যগ্রামের বহির্ভাগে উত্তর-পূর্ব্বকোণে 'কোল্লাগ' নামক সমৃদ্ধ ও প্রাসাদপূর্ণ সন্নিবেশ ছিল। এই 'কোল্লাগ' সন্নিবেশে গৃহপতি আনন্দের অনেক মিত্র, জ্ঞাতি, নিজক, স্বজন, সম্বন্ধী ও পরিজন বাস করিতেন—তাঁহারাও সমৃদ্ধ ও অপরাভবনীয় ছিলেন। সেকালে ও সে সময়ে শ্রমণ ভগবান মহাবীর আগমন করিলেন। বহুলোক তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে গমন করিল। "কূণিয়"(৬) নৃপতির ন্যায় (মহাড়ম্বরে) জিতশত্রু রাজাও গমন করিলেন এবং তাঁহার পর্য্যুপাসনা করিলেন।

তদনন্তর গৃহপতি আনন্দ এই সংবাদ বিদিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন—"নিশ্চতই শ্রমণ ভগবান মহাবীর আগমন করিয়াছেন, ইহা মহাপুণ্যফল-সম্ভূত ঘটনা। অতএব আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া পর্য্যুপাসনা করিব।"—এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্নান করিলেন

১। জম্বু—সুধর্ম্ম গণধরের শিষ্য।

২। Vaniyagam (Skr. Banijyagram) another name of the well-known city of Vesali (Skr. Vaishali) the Capital of the Licchavi country......The fact is that the city commonly called Vaishali occupied a very extended area, which included within its circuit (at the time of Hwen Thsang) of about 12 miles, beside Vaisali proper (now Besarh) several other places. Among the latter are Vaniyagam and Kundagam or Kundapura. These still exist as villages under the name of Baniya and Basukund.
-Uvasagdasao by A. F. R. Hoernle, pp—4.

৩। In the Suryaprajnapti Jiyasattu is mentioned as ruling over Mithila, the capital of the Videha country. Here he is mentioned as ruling over Vaniyagam or Vesali. On the other hand Chedaga, the maternal uncle of Mahavira, is said to have been King of Vesali and of Videha. It would seem that Jiyasattu and Chedaga were the same persons. The name Jiyasattu (Skr. Jitashatru) he may have received, as has been suggested, by way of rivalry with Ajatashatru, king of Magadha, who at first was also a patron of Mahavira, though afterwards he exchanged him for Buddha. To the Jains Ajatashatru is known under the name of Kuniya......
Uvasagdasao—pp-6.

৪। অহীনা—সর্ব্বপ্রকার সুলক্ষণযুক্তা ও সর্ব্বকলাভিজ্ঞা।

৫। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এই পঞ্চপ্রকার।

৬। কূণিয়=কৌণিক=অজাতশত্রু।

এবং শুদ্ধ ও মহার্ঘ বেশ পরিধান করিয়া অল্পভার অথচ বহুমূল্য আভূষণে শরীর অলঙ্কৃত করিলেন। (অতঃপর আনন্দ গৃহপতি) নিজের বাসগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। 'কোরিণ্ট' নামক পুষ্পমালা বিভূষিত ছত্র তাঁহার মস্তকোপরি ধার্য্যমান হইল এবং তিনি বহু মনুষ্য পরিবৃত হইয়া পদব্রজে বাণিজ্যগ্রাম নগরের মধ্যস্থল দিয়া নির্গত হইয়া যে স্থানে 'দুইপলাস' নামক চৈত্য, যেস্থানে শ্রমণ ভগবান মহাবীর ছিলেন তথায় উপগত হইয়া তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং বন্দনা ও নমস্কার করিয়া পর্য্যুপাসনা করিলেন।

তদনন্তর শ্রমণ ভগবান মহাবীর, গৃহপতি আনন্দ ও সমবেত পরিষদের সম্মুখে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। (উপদেশানন্তর) রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ প্রতিগত হইলেন।

অতঃপর গৃহপতি আনন্দ, শ্রমণ ভগবান মহাবীরের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট ও তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হে পূজ্য, আমি নির্গন্থ প্রবচনে শ্রদ্ধা করি; হে স্বামিন্, আমি নির্গন্থ প্রবচনে প্রত্যয় করি; হে দেব, ইহা আমার রুচিকর; হে ভগবন্, ইহা এইরূপই; হে পূজ্য, ইহা প্রকৃতই এইরূপ; হে নাথ, ইহা সত্য; হে প্রভো, ইহা আমার ঈপ্সিত; হে দেব, ইহা আমার প্রতীপ্সিত; হে প্রভো, ইহা আপনার কথিতরূপই। যদিও দেবানুপ্রিয়ের (আপনার) নিকট বহু রাজা, রাজপুত্র, তলবর, মাণ্ডবিক, কৌটুম্বিক, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ প্রভৃতি মুণ্ডিত হইয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি আমি সেইরূপ মুণ্ডিত হইয়া অনগার ধর্ম্ম (সাধুধর্ম্ম) গ্রহণ করিতে সমর্থ নহি। আমি দেবানুপ্রিয়ের নিকট পঞ্চ অনুব্রত ও সপ্ত শিক্ষাব্রত এই দ্বাদশ প্রকার গৃহীধর্ম্ম অঙ্গীকার করিব। * * * *

তদনন্তর গৃহপতি আনন্দ, শ্রমণ ভগবান মহাবীরের সম্মুখে প্রথমতঃ স্থূলরূপে প্রাণাতিপাত (৭) পরিত্যাগ করিলেন:—"যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত উভয় (৮) প্রকারে বা ত্রিবিধ (৯)উপায়ে ইহা (প্রাণাতিপাত) মনঃ, বচন ও কায়াদ্বারা করিব না বা করাইব না।"

অনন্তর স্থূলরূপে মৃষাবাদ(১০)প্রত্যাখ্যান করিলেন:—"যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত উভয় প্রকারে বা ত্রিবিধ উপায়ে ইহা—মনঃ, বচন, কায়াদ্বারা—করিব না বা করাইব না।"

অনন্তর স্থূলরূপে অদত্তাদান(১১) প্রত্যাখ্যান করিলেন —"যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত দ্বিপ্রকারে বা ত্রিবিধ উপায়ে ইহা —মনঃ বচন কায়াদ্বারা—করিব না বা করাইব না।"

তদনন্তর স্বদার-সন্তোষের পরিমাণ করিলেন:— "আমার একমাত্র ভার্য্যা শিবানন্দা ব্যতীত অন্য রমণী-সঙ্গ প্রত্যাখ্যান করিলাম।"

তদনন্তর ইচ্ছা পরিমাণ করিতে ('পরিগ্রহ পরিমাণ' পঞ্চম ব্রত) ঘটিত অঘটিত সুবর্ণ দ্রব্যের পরিমাণ স্থির করিলেন:—"চারি কোটী স্বর্ণমুদ্রা যাহা ভূমিতে প্রোথিত আছে, চারি কোটী স্বর্ণমুদ্রা যাহা বৃদ্ধিতে ন্যস্ত আছে ও চারি কোটী স্বর্ণমুদ্রা পরিমিত সম্পত্তি— এই সকল ব্যতীত আমি অন্যান্য সমস্ত ঘটিত অঘটিত সুবর্ণ প্রত্যাখ্যান করিলাম।"

অনন্তর চতুষ্পদ জন্তুর পরিমাণ স্থির করিলেন:— "প্রত্যেক ব্রজে দশ সহস্র করিয়া চারিটি গোব্রজ ব্যতীত অন্য সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু প্রত্যাখ্যান করিলাম।"

অনন্তর ক্ষেত্রবস্তুর পরিমাণ স্থির করিলেন:— "পঞ্চশত হল ও প্রত্যেক হলের জন্য এক শত নিবর্ত্তন(১২)ভূমি ব্যতীত অন্য সমস্ত ক্ষেত্রবস্তু প্রত্যাখ্যান করিলাম।"

৭। প্রাণাতিপাত—হিংসা।

৮। স্বয়ং করা ও অন্যদ্বারা করান—এই উভয় প্রকার।

৯। মনঃ, বচন ও কায়াদ্বারা, এই ত্রিবিধ উপায়।

১০। মৃষাবাদ—মিথ্যাকথন।

১১। অদত্তাদান—অদত্ত বস্তু গ্রহণ, চৌর্য্য।

১২। Nivarttana is a certain measure of land. It is said to be 20 rods or 200 Cubits or 40000 hasta square.—Uvasagdasao by A. F. R. Hoernle, pp. 14.

তৎপরে গো-শকটের পরিমাণ স্থির করিলেন :—"দেশান্তর গমনের জন্য পঞ্চশত শকট ও সংবহনের (১৩) জন্য পঞ্চশত শকট ব্যতীত অন্য সমস্ত শকট প্রত্যাখ্যান করিলাম।"

অনন্তর বাহনের (১৪) পরিমাণ স্থির করিলেন :—"দেশান্তর গমনের জন্য চারিটি ও (দেশে) সংবহনের জন্য চারিটি ব্যতীত অন্য সমস্ত বাহন পরিত্যাগ করিলাম।"

তদনন্তর উপভোগ পরিভোগের (১৫) বস্তু প্রত্যাখ্যান করিতে গাত্রমার্জ্জনীর পরিমাণ স্থির করিলেন :—"এক প্রকার সুগন্ধ রক্তবর্ণ গাত্রমার্জ্জনী ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার গাত্রমার্জ্জনী (গামছা) পরিত্যাগ করিলাম।"

তৎপরে দন্তমার্জ্জনীর পরিমাণ স্থির করিলেন :—"আর্দ্র যষ্টিমধু খটিকা ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার দন্তমার্জ্জনী পরিত্যাগ করিলাম।"

তদনন্তর ফলের (১৬) পরিমাণ স্থির করিলেন :—"একমাত্র সুমিষ্ট আমলকী ব্যতীত অন্য সকল প্রকার ফল পরিত্যাগ করিলাম।"

অনন্তর অভ্যঙ্গের পরিমাণ স্থির করিলেন :—"শত-পাক বা সহস্র-পাক তৈল ব্যতীত অন্য সকল প্রকার অভ্যঙ্গ পরিহার করিলাম।"

অতঃপর উদ্বর্ত্তন সমূহের পরিমাণ স্থির করিলেন :—"একপ্রকার সুগন্ধীকৃত গোধূম চূর্ণ ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার উদ্বর্ত্তন পরিত্যাগ করিলাম।"

তদনন্তর স্নান মার্জ্জনার্থ জলের পরিমাণ স্থির করিলেন :—"এক উষ্ট্রিকা (১৭) পরিপূর্ণ করিবার উপযোগী অষ্ট কলস জল ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত স্নান-মার্জ্জনার্থ জল প্রত্যাখ্যান করিলাম।"

তৎপরে বস্ত্রের পরিমাণ স্থির করিলেন :—"এক প্রকার কার্পাসিক বস্ত্রযুগল ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার বস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম।"

অনন্তর বিলেপন-দ্রব্যের পরিমাণ স্থির করিলেন :—"অগুরু, কুঙ্কুম, চন্দনাদি ব্যতীত অন্য সমস্ত বিলেপন-দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করিলাম।"

অতঃপর পুষ্পের পরিমাণ স্থির করিলেন :—"শ্বেত-পদ্ম বা মালতি-পুষ্পমালা ব্যতীত অন্য সকল প্রকার পুষ্প পরিত্যাগ করিলাম।"

তদনন্তর আভরণের পরিমাণ করিলেন :—"চিত্রিত কর্ণাভরণ ও নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার আভরণ পরিহার করিলাম।"

অনন্তর ধূপের পরিমাণ করিলেন :—"অগুরু ও তুরুষ্কাদি নির্ম্মিত ধূপ ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার ধূপ পরিত্যাগ করিলাম।"

অতঃপর ভোজন সম্বন্ধে আপনাকে পরিমিত করিবার জন্য পেয়-আহারের পরিমাণ স্থির করিলেন :—"মুদ্গাদির কাথ অথবা একপ্রকার ঘৃত-তলিত-তণ্ডুল-পেয় ব্যতীত অন্য সকল প্রকার পেয় আহার পরিহার করিলাম।"

তৎপরে পকান্ন সম্বন্ধে আপনাকে পরিমিত করিলেন :—"একমাত্র 'ঘয়পুন্ন' (১৮) অথবা 'খণ্ড

১৩। সংবহন—ক্ষেত্রাদি হইতে তৃণ কাষ্ঠাদি আনয়ন।

১৪। বাহন—জলযান, নৌকা। যানপাত্রঃ ইতি টীকা।

১৫। উপভোগ—যাহা বারংবার ভোগ করা যায় যথা :—বসন, গৃহ ইত্যাদি।

পরিভোগ—যাহা সকৃদ্ ভোগ করা যায় যথা :—আহার, বিলেপন ইত্যাদি।

১৬। এখানে ফলের পরিমাণ স্থির করিতে আহারীয় ফল ধরা হয় নাই। ইহা মস্তক ধৌত করনার্থ ব্যবহৃত ফল ও তজ্জন্য মাত্র আমলকী রাখা হইয়াছে।

১৭। উষ্ট্রিকা—বৃহৎ মৃণ্ময় ভাণ্ড বিশেষ। The Uttiya is a very large unglazed earthen jar, egg-shaped, measuring about 18 × 36 inches diameter. —Uvasagdsoo A. F. Hoernle, pp 16

১৮। ঘয়পুন্নত্তি ঘৃতপূরাঃ প্রসিদ্ধাঃ।—টীকা। (দেবঃ ?)

খজ্জ' (১৯) ব্যতীত অবশিষ্ট পকান্ন পরিত্যাগ করিলাম।"

তদনন্তর সিদ্ধান্নের (ভাত) ব্যবহার সম্বন্ধে আপনাকে নিয়মাবদ্ধ করিলেন :—"কলম-শালি ধান্যের অন্ন ব্যতীত অবশিষ্ট সকল প্রকার অন্ন অরিত্যাগ করিলাম।"

অনন্তর দ্বিদলের পরিমাণ স্থির করিলেন :—"মসুর, মুগ ও মাষ ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার দ্বিদল প্রত্যাখ্যান করিলাম।"

অতঃপর ঘৃতের পরিমাণ করিলেন :—"শরৎকাল সমুৎপন্ন উৎকৃষ্ট গো-ঘৃত ব্যতীত অবশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার ঘৃত পরিত্যাগ করিলাম।"

তৎপরে শাকের পরিমাণ স্থির করিলেন :—"বথু, সুখিয়, মণ্ডুক্কিয় শাক ব্যতীত অন্য সমস্ত শাক পরিত্যাগ করিলাম।"

তদন্তর 'জেমন' খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ স্থির করিলেন :—"মুদ্গাদি দ্বিদল মধ্যে নিষ্পন্ন তক্রযুক্ত একপ্রকার খাদ্য (দহিবড়া ?) ব্যতীত অন্য সমস্ত জেমন খাদ্য প্রত্যাখ্যান করিলাম।"

অনন্তর পানীয় জলের পরিমাণ করিলেন :—

১৯। 'খণ্ডখজ্জ'ং'তি খণ্ডলিপ্তানি খাদ্যানি অশোকবর্ত্তয়ঃ খণ্ডখাদ্যানি—ইতি টীকা। চিনিযুক্ত মিষ্টান্ন বিশেষ।

"একমাত্র অন্তরীক্ষোদক (বর্ষাজল) ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার পানীয় জল পরিহার করিলাম।"

তৎপরে মুখবাসের (তাম্বূলাদি মুখ শুদ্ধি দ্রব্য) ব্যবহার সম্বন্ধে নিজকে সীমাবদ্ধ করিলেন :—"পঞ্চ সুগন্ধিযুক্ত (২০) তাম্বুল ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত মুখবাস দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করিলাম।"

অতঃপর চতুর্ব্বিধ অনর্থ দণ্ড (২১) প্রত্যাখ্যান করিলেন :—"অপধ্যানাচরণ (২২), প্রমাদাচরণ, হিংস্রপ্রদান ও পাপকর্ম্মোপদেশ প্রত্যাখ্যান করিলাম।"

এ সময়ে শ্রমণ ভগবান শ্রীমহাবীর স্বামী আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে আনন্দ, শ্রমণোপাসক" ইত্যাদি।

শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা।

২০। এলা লবঙ্গ-কর্পূর-কক্কোল-জাতীফল লক্ষণৈঃ ইতি টীকা।

২১। অনর্থ দণ্ড—যে দণ্ড পাপ নিজ ধর্ম্মার্থকামের জন্য হয় না।

২২। অপধ্যানাচরণ=আর্ত্তধ্যান, রৌদ্রধ্যান করা। প্রমদাচরণ=বিকথা—পাপ কথা বলা ইত্যাদি।

হিংস্র প্রদান—হিংসাকারী শস্ত্র, তরবারী আদি অন্যকে প্রদান।

নিবেদন

এস সখি, লয়ে আজি আঁখিভরা হাসি,—
উষার আকাশ সম উজ্জ্বল অমল
কোমল-কিরণ মাখা আনন-কমল।
পরাণ ভরিয়া আজি উঠুক বিকাশি।

নিরাশায় হতাশায় আঁধারের রাশি
—অমা-নিশীথের ছিন্ন জলদের দল—
দূরে যাক্, সরে যাক্ ; হৃদয় তরল
নন্দন-পূর্ণিমালোকে উঠুক বিলাসি!

সে উদ্বেল হৃদয়ের সিন্ধু উপকূলে
দাঁড়াও লক্ষ্মীর মত আলোক প্রতিমা।
উচ্ছল চঞ্চল শত তরঙ্গ-অঙ্গুলে
পুলকে পরশি ওই অলক্ত-রক্তিমা,
রেখে দিই থরে থরে চরণের মূলে
আকুল বাসনা-ব্যথা, নাহি যার সীমা!

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।

বেহার-চিত্র

(নক্সা)

সিদ্ধার্থ।

১

বার বার তিনবার প্লীডারশিপ পরীক্ষায় বিফল হইয়া শ্রীযুক্ত রীতলাল চৌধুরী যখন স্থানীয় স্কুলে মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে মাষ্টারী গ্রহণ করিল তখন রীতোর আত্মীয় বন্ধুরা সকলেই একান্ত হতাশ ও দুঃখিত হইয়া পড়িল।

আইন-পড়া আরম্ভ করিয়া অবধি রীতলাল তাহার স্বগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিকাংশ মোকদ্দমারই তদ্বিরের ভার গ্রহণ করিয়াছিল। এবং তাহার কূটবুদ্ধি এবং কর্ম্মঠতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সকলেরই ধারণা জন্মিয়াছিল যে রীতলাল উকীল হইয়া বসিলে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিবে।

সুতরাং তাহার মাষ্টারী গ্রহণে সকলেরই আশাতরু উন্মূলিত হইতে বসিয়াছিল। কিন্তু Things are not what they seem। রীতলাল উকীল হইবার আশা আদৌ পরিত্যাগ করে নাই। তাহার মাষ্টারী গ্রহণের গভীর অভিসন্ধি ছিল।

এবারে পরীক্ষা দিতে যাইবার সময় রীতলাল পরীক্ষার ব্যয় ছাড়া আরও দুই শত টাকা হাতে লইয়া কলিকাতা রওনা হইল। পরীক্ষা হইয়া গেলেও এবার আর সে বাড়ী ফিরিল না। বাড়ীর লোকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া উত্তর পাইল যে, সে পাসের সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় "কারোয়াই"য়ে ব্যাপৃত আছে! পরীক্ষার ফল বাহির হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে রীতলাল বাড়ী ফিরিয়া আত্মীয় বন্ধুদের জানাইল, তাহার "কারোয়াই" সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে; এবার সে নিশ্চয়ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে।

বন্ধুবান্ধবেরা "কারোয়াইয়ে"র রহস্য শুনিবার জন্য রীতোকে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া বসিল। কিন্তু উত্তরে রীতো একটু চতুর হাস্য করিল মাত্র।

রীতোর ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইল। সত্য সত্যই রীতলাল এবারে প্লীডারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল।

২

সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করিয়া শুভদিনে ললাটদেশ দধি ও হরিদ্রায় রঞ্জিত করিয়া, বাসন্তী বর্ণের বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া বাবু রীতলাল চৌধুরী "সাইন্-বোর্ড" দেওয়া প্রকাণ্ড বাটীতে "গৃহপ্রবেশ" করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই পুরোহিতেরা হোমকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রীতলাল উপস্থিত হইবামাত্র "স্বস্তি" "স্বস্তি" বলিয়া সকলে তাঁহার ললাটে ভস্মলেপন করিয়া দিলেন। রীতলাল কলিকাতায় থাকিতেই বিস্তর মোটা মোটা বাঁধান কেতাব স্বল্প মূল্যে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশ্য এই সকল পুস্তক যে সমস্তই আইন সংক্রান্ত এমন কথা বলা যায় না। বাইবেল হইতে আরম্ভ করিয়া Asiatic Societyর পুরাতন Journal পর্য্যন্ত সমস্তই তাহার মধ্যে ছিল।

রীতলাল গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার "আফিস ঘর" সাজাইয়া ফেলিলেন। মেঝের উপর ফর্‌রাস বিছাইয়া মোটা মোটা তাকিয়া দিয়া নিজের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। বাঁধানো পুস্তকগুলি তাহার আসনের দুই পার্শ্বে স্তূপাকারে সজ্জিত হইল এবং দক্ষিণ দিকে কিছু দূরেই রজত-শুভ্র আলবোলা ও "ওগলদান" স্থাপিত হইল।

আফিসের সুব্যবস্থা করিয়াই রীতলাল মোকদ্দমার দালালগণকে হস্তগত করিয়া ফেলিলেন এবং চারিদিকে সংবাদ পাঠাইলেন যে বাবু রীতলাল মক্কেলগণের প্রবাস-দুঃখ দূর করিবার জন্য সহরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড বাসা লইয়াছেন—অতি অল্পব্যয়েই মক্কেলেরা তথায় বাস

পারিবে এবং বিনামূল্যে উকীলের পরামর্শ ...। দেখিতে দেখিতে বাবু রীতলালের বাসা কাক সমাকুল বটবৃক্ষের মত মক্কেল-সমাকুল হইয়া উঠিল।

সদাশয় রীতলাল মক্কেলদিগের সুবিধার জন্য বাসের ব্যয় দৈনিক ।৵৫ নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন—ইহার মধ্যে আহার্য্যের ব্যয় ।০, বাড়ীভাড়া ৴১০, মুন্সীজির লেখাই খরচ ৴৫ এবং পাচক ও ভৃত্যের বেতন ৴১০। মক্কেলদিগের আহার্য্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য "ওকীল সাহেব" বাহিরের একটি কক্ষে একটি মুদির দোকানও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সুতরাং কোন বিষয়েরই অসুবিধা ছিল না।

রীতলালের আত্মীয়বর্গ রীতলালকে ৪০৲ টাকা ভাড়ায় প্রকাণ্ড বাসা লইতে দেখিয়া কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু মাসান্তে রীতলাল যখন দেখাইয়া দিলেন যে মক্কেলদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থে কেবল যে বাড়ী-ভাড়া ও পাচকাদির বেতন উঠিয়া গিয়াছে তাহা নহে, ইহা হইতে ওকীল সাহেব এবং মুন্সীজির বাসা-খরচও নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে, তখন কেহই রীতলালের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

৩

বাসাখরচ সম্বন্ধে স্বপ্রতিষ্ঠ (Self Supporting) হইয়া রীতলাল ব্যবসায়ের উন্নতিতে মন দিলেন।

প্রত্যূষে স্নান করিয়া বাহিরের বারান্দায় বসিয়া রীতলাল পুষ্পপত্র এবং শঙ্খ ঘণ্টা সাহায্যে এক ঘণ্টা ধরিয়া মহাসমারোহে পূজা করিতে লাগিলেন এবং পূজান্তে ললাট-দেশ চন্দন ও তিলকে যথাসাধ্য সুচিত্রিত করিয়া আফিস কক্ষে প্রবেশ করিয়া মোটা মোটা পুস্তক লইয়া তন্ময় হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

বাসায় সমাগত মক্কেলেরা একাধারে প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং নিবিড় আইন চর্চ্চার পরিচয় পাইয়া ক্রমশঃ ওকীল সাহেবের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

প্রথম, প্রথম মক্কেলেরা একেবারে রীতলালকে মোকদ্দমা, না দিয়া তাঁহার পরামর্শ মাত্র লইতে আরম্ভ করিল। তাহারা তাহাদের উকীলদের মুসাবিদা তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল এবং মোকদ্দমা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত লইতে লাগিল। রীতলাল অতিশয় নিবিষ্ট চিত্তে সমস্ত কাগজপত্র এবং পার্শ্বরক্ষিত ১০।১২ খানি পুস্তক নাড়া-চাড়া করিয়া বিনীত ভাবে আপনার মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রীতো অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন, "আমরা অতি সামান্য ব্যক্তি, বড় বড় উকীলেরা যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর কথা কওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তবে কখনও কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ওকালতী করিতে বসিয়াছি বলিয়াই দু এক কথা বলিতে হয়—ইহাতে তোমরা যাহাই মনে কর—"

এইরূপে গৌরচন্দ্রিকা করিয়া বিনয়ের আবরণে বাবু রীতলাল অন্যান্য উকীলগণের যথাসাধ্য কুৎসা করিয়া সমস্ত মুসাবিদা কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে এবং তাঁহাদের মতের ভ্রম বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

কোন বড় বি-এল্ পাশ করা উকীলের ভ্রম প্রদর্শন কালে কোন মক্কেল আপত্তি করিলে রীতলাল চতুর হাস্য করিয়া বলিতেন, "যাহারা শতকরা ৫০ নম্বর মাত্র পাইয়া পরীক্ষা পাস করিয়াছে তাহাদের বিদ্যা, যাহারা শতকরা ৬৬ নম্বর পাইয়া পাস করিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক!" এইরূপে রীতলালের বিদ্যা বুদ্ধির খ্যাতি ক্রমশই প্রচারিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে একটী ঘটনায় এই খ্যাতি সহসা আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

৪

একদিন একজন মক্কেল একটী নিতান্ত "অচল" গোছের মোকদ্দমা লইয়া সদরে উপস্থিত হইল। খ্যাত অখ্যাত কোন উকীলই তাহার কাগজপত্র দেখিয়া তাহাকে আশ্বাস দিতে পারিলেন না। মক্কেল হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিবার উপক্রম করিল। এমন সময়ে

বাবু রীতলালের নিয়োজিত এক দালালের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ। দালাল তাহাকে বিস্তর আশা দিয়া রীতলালের নিকট লইয়া আসিল। বাবু রীতলাল তখন জলযোগান্তে আপনার পারিষদ-বর্গের নিকট আপনার সেদিনকার আদালতের নিজ কীর্ত্তিকাহিনী মহাসমারোহে বিবৃত করিতেছিলেন। কিরূপে তিনি তীক্ষ্ণধার জেরার সাহায্যে বিপক্ষ পক্ষীয় সাক্ষীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন, বিদ্রূপ বাণে অপর পক্ষের উকীলকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং প্রগাঢ় আইন জ্ঞানের "জ্ঞানাঞ্জনশলাকা" সাহায্যে কেমন করিয়া অন্ধ হাকিমের জ্ঞানচক্ষু "উন্মীলিত" করিয়া দিয়াছিলেন, উপযুক্ত অলঙ্কার সহযোগে তাহারই ব্যাখ্যা হইতেছিল। শুনিতে শুনিতে শ্রোতৃবৃন্দ বিস্ময়ে, কৌতূহলে, শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

নবাগত মক্কেলও একান্তে বসিয়া এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-কাহিনী নীরবে শ্রবণ করিতেছিল। শুনতে শুনিতে তাহার "নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠ" আশা-প্রদীপ ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

গল্প শেষ হইবামাত্র সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ওকীল সাহেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

ওকীল সাহেব সহাস্য মুখে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মুখে বসিতে বলিলেন। মক্কেল সংক্ষেপে তাহার মোকদ্দমার বিবরণ দিয়া মোকদ্দমা সম্বন্ধে অন্যান্য উকীলের মতামতও তাঁহার গোচর করিল।

—সমস্ত শুনিয়া ওকীল সাহেব তাহার কাগজপত্র চাহিয়া লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে তাহার আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া কাগজপত্র এবং রাশি রাশি বড় বড় কেতাব নাড়াচাড়া করিয়া রীতলাল উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "এই মোকদ্দমা চলিবে না বলিয়াছে! এমন মোকদ্দমা যদি না চলে তাহা হইলে কোন্ মোকদ্দমা চলিবে তাহা ত জানি না!" ওকীল সাহেব বিজয়ী বীরের ন্যায় সকলের দিকে চাহিলেন। দালাল চতুর হাস্য করিয়া মক্কেলকে ইঙ্গিতে জানাইল, "কেমন? যাহা বলিয়াছি তাহা ঠিক কি না?"

বর্দ্ধিত কৌতূহল মক্কেল জিজ্ঞাসা করিল, "আ... স্বপক্ষে কোন নজির আছে কি?" হাসিয়া রীত... বলিলেন, "নজির? কত চাও? কেন? তোমার উকীলেরা কি বলিয়াছেন?" মক্কেল বলিল, "তাঁহারা বলেন যে সমস্ত নজিরই আমার বিপক্ষে।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া রীতলাল বলিলেন, "বড় বড় উকীলদের ব্যাপারই এই! কোন প্রকার পরিশ্রম করিবেন না, কেবল মক্কেলকে ঠকাইয়া টাকা লইবার চেষ্টা। ছি, ছি, কি অন্যায়! ইঁহাদের জন্য ওকালতীর সম্মান মাটি হইতে বসিয়াছে। তোমার উকীলকে বলিও যত নজিরের আবশ্যক হয় আমি দেখাইয়া দিব।"—মক্কেল বলিল, "আমি আর কাহাকেও রাখিবনা! আপনিই আমার মোকদ্দমা গ্রহণ করুণ।"

রীতলাল স্বর খুব নীচু করিয়া চক্ষু টিপিয়া মক্কেলকে বলিলেন, "আজ কালকার হাকিমদের ধরণ দেখিতেছ ত! বড় উকীল দেখিলেই তাঁরা অভিভূত হইয়া যান। বিদ্যাবুদ্ধির দিকে লক্ষ্য করেন না। যে কথা আমরা বলিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, তাহাই আবার বড় উকীলের নিকট ঘাড় হেঁট করিয়া শুনেন। আমি ভিতর হইতে সব ঠিক করিয়া দিব, কিন্তু একজন বড় উকীল উপলক্ষ্য থাকা চাই।"

তাহাই স্থির হইল। মক্কেল ভক্তি গদগদ চিত্তে দুইটী টাকা বায়না দিয়া উকীল সাহেবের পদধূলি লইয়া চলিয়া গেল।

যথাকালে মোকদ্দমা "পেশ" হইল। বড় উকীল রীতলালকে বলিলেন, "কই রীতো বাবু, তোমার নজির কই?" চতুর হাস্য করিয়া রীতো বলিলেন, "সে জন্য চিন্তা নাই।" বড় উকীল বলিলেন, "তাহা হইলে 'বাহাস্' (বক্তৃতা) তুমিই করিও, আমি সাক্ষীদের এজাহার করাইয়াই ছাড়িয়া দিব।" রীতো নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

মোকদ্দমা শেষ হইল। বড় উকীল বলিলেন "রীতো বাবু, তাহা হইলে 'বাহাস্' আরম্ভ করুন।"

রীতো করযোড়ে বলিলেন, "হুজুর থাকিতে কি আমা...

...." করা শোভা পায় ? আপনি বাহাস করুন, ... যথাসাধ্য সাহায্য করিব।"

বড় উকীল বলিলেন, "তোমার নজির ?"

রীতো কাণে কাণে বলিলেন, "হুজুর ত সবই জানেন। নজির কোথায় পাইব ? শালা মক্কেল কোন প্রকারেই ছাড়ে না, কি করি বলুন !"

অগত্যা বড় উকীল বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। রীতো মধ্যে মধ্যে এক একখানি বই খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিতে লাগিলেন। এই সকল পুস্তকের সঙ্গে মোকদ্দমার কোন সংস্রবই ছিলনা। সুতরাং দুই চারি লাইন দেখিয়াই তাঁহাকে হাসিয়া পুস্তক সরাইয়া রাখিতে হইল। এইরূপে রীতো ক্রমাগত পুস্তক খুলিয়া দিতে লাগিলেন এবং বড় উকীল তাহা দেখিয়া সরাইয়া রাখিতে লাগিলেন। পশ্চাতে অবস্থিত মক্কেল প্রশংসমান দৃষ্টিতে রীতোর কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে লাগিল। রীতোও মধ্যে মধ্যে তাহার কাণে কাণে বলিতে লাগিলেন, "দেখিতেছ ত, নজির আছে কি না ?"

"বাহাস" শেষ হইল। রীতো বাহিরে আসিয়া মক্কেলকে ধরিয়া একান্তে লইয়া গিয়া বিষণ্ণ মুখে বলিল, "হায় হায়, এমন মোকদ্দমাটা কেবল বলিবার দোষে একেবারে মাটি হইল ! আজ হইতে কাণ মলিলাম, আর কখনো যদি কোন বড় উকীলকে সঙ্গে লই ! আমাকেও বলিতে দিলেন না নিজেও বলিতে পারিলেন না। ছি ! ছি ! ছি !" মক্কেল বলিল, "আমি ত কেবল আপনাকেই রাখিতে চাহিয়া ছিলাম।" অশ্রুপূর্ণ চক্ষে রীতো বলিলেন, "আমারই কুবুদ্ধি !"

যথাকালে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে রীতলালের খ্যাতি বৃদ্ধিই পাইল, তাহার হ্রাস হইল না !

৫

উদ্যোগীর সুযোগের অভাব হয় না। রীতলালের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্ম সুযোগ সত্বরেই উপস্থিত হইল।

সম্প্রতি আদালতে একটা মোকদ্দমা লইয়া হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। মোকদ্দমার ভিত্তি একখানি হাজার টাকার হাতচিঠা। বিবাদী নিরক্ষর। সুতরাং হাতচিঠায় তাহার অঙ্গুষ্ঠের ছাপ ছিল। তাহার সহি অন্যলোকে করিয়া দিয়াছিল।

বিবাদী বলিতেছিল, অঙ্গুষ্ঠের ছাপ তাহার নয়, হাতচিঠা জাল।

বাধ্য হইয়া বাদীকে গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া অঙ্গুষ্ঠের ছাপ পরীক্ষা করিবার জন্ম অভিজ্ঞ-সাক্ষী তলব করিতে হইয়াছিল। বিবাদী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল ; কারণ ছাপ প্রকৃতই তাহারই।

তাহার উকীলেরা মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিবার পরামর্শ দিতেছিলেন। বিবাদীও তাহাতেই সম্মত হইবার উপক্রম করিতেছিল। এমন সময় সে একদিন দালাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বাবু রীতলালের নিকট নীত হইল।

মন দিয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া রীতলাল বলিলেন, "যদি মোকদ্দমা আপনাকে জিতাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে কি দিবেন ?"

উচ্ছ্বাসে বিবাদী বলিল, "পাঁচ শত টাকা।"

রীতলাল মক্কেলের কাণে কাণে অনেকক্ষণ ধরিয়া উপদেশ দিলেন। শুনিতে শুনিতে আনন্দে তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পরামর্শ শেষ করিয়া রীতলাল হাসিয়া বলিলেন, "এখন নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া থাকুন। মোকদ্দমায় আপনার জয় অবধারিত।"

মক্কেল হাসিতে হাসিতে বিদায় লইল।

৬

আজ মোকদ্দমার তারিখ। কিন্তু আজ মোকদ্দমা হইবে না। অভিজ্ঞ-সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হইতে পারে নাই।

এই মোকদ্দমা লইয়া কিছু আন্দোলন হওয়ায় হাকিম সেরিস্তায় সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং সেরিস্তা হইতে নথি পাইবার উপায় ছিলনা। তাই আজ আদালতে বসিয়া বাবু রীতলাল অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া মোকদ্দমার নথি দেখিতেছিলেন।

মক্কেল কাতরভাবে উকীল সাহেবের পশ্চাতে মেঝের

উপর বসিয়া ছিল। অন্য মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছিল। আদালত গৃহ জনতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পেস্কার তন্ময় হইয়া নথি সাজাইতেছিল। রীতলালের প্রতি কাহারও লক্ষ্য ছিল না।

দেখিতে দেখিতে রীতলালের অজ্ঞাতসারে হাত চিঠা খানি টেবিলের পাশে মেঝের উপর খসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে উপবিষ্ট মক্কেল চিঠার ছাপের উপর আপনার কালিমাখা বামাঙ্গুষ্ঠের আর একটী ছাপ বসাইয়া দিয়া দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রীতলাল অনাসক্ত ভাবে ধীরে ধীরে চিঠা খানি তুলিয়া লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া আরও কিছুক্ষণ নথিটি নাড়াচাড়া করিলেন। অবশেষে পেস্কারের নিকট নথি ফিরাইয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বাহির হইতেই মক্কেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। উভয়েরই চক্ষু পরস্পরের দিকে চাহিয়া নীরবে উজ্জল হইয়া উঠিল।

যথাকালে অভিজ্ঞ আসিয়া উপস্থিত হইল। মোকদ্দমা আরম্ভ হইল।

আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য। প্রথমেই অভিজ্ঞ সাক্ষীর তলব হইল। তাঁহার হাতে হাতচিঠা প্রদত্ত হইল। যন্ত্রাদি লইয়া তিনি অঙ্গুষ্ঠের ছাপের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

উভয়পক্ষের উকীল সাক্ষীর অভিমত জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া অভিজ্ঞ বলিলেন, "এ ছাপ হইতে কিছুই নির্ণয় করিবার উপায় নাই। একবারের ছাপের উপর আবার কে ছাপ দিয়া দিয়াছে!" সমবেত জনতা বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বাদী ও তাহার উকীলেরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। বিবাদীর উকীলেরা সকৌতুকে হাকিমের দিকে চাহিল। বাবু রীতলাল নিবিষ্ট চিত্তে আইনগ্রন্থের পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন।

মোকদ্দমায় বাদীর পরাজয় হইল।

বাবু রীতলাল এসম্বন্ধে অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেও তাঁহার এই কীর্ত্তি কাহিনী অধিক দিন গোপন রহিল না। অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল যে বাবু রীতলালের আইনজ্ঞান যেরূপ প্রগাঢ়—তাঁহার "কারোয়াই"য়ের ক্ষমতাও তেমনি অসাধারণ। দেখিতে দেখিতে রীতলালের প্রতিপত্তি অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

৭

অল্পদিনের মধ্যে রীতলালের অসাধারণ প্রতিভার গুণে হাকিম এবং আদালতের মুহুরিগণ সকলেই তাহার অত্যন্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন। পেয়াদা হইতে সেরিস্তাদার পর্য্যন্ত সকলেই রীতলালের নিকট প্রচুর "তহরির" পাইতে লাগিলেন এবং দেশীয় হাকিমদের যাহার যাহা অভাব, রীতলাল তাহারই যথাসাধ্য মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে হাকিম নৃত্যগীতে অনুরক্ত, রীতলাল প্রতি শনিবারে তাঁহার জন্য নিজগৃহে "মোফিলের" বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; যিনি দধি ও মৎস্য প্রিয়, মক্কেলের দ্বারায় তাঁহাকে দধি ও মৎস্য আনাইয়া দিতে লাগিলেন; যাঁহার গাড়ীর অভাব, তাঁহাকে নিজে সঙ্গে করিয়া বাড়ী পৌছাইয়া দিতে লাগিলেন।

হাকিমদের সঙ্গে এই প্রকার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া মক্কেলেরা আরও নিবিড়ভাবে ওকীল সাহেবকে বেষ্টন করিতে লাগিল। দিনে দিনে তাঁহার পশার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কিছু দিনের মধ্যেই রীতলাল নিজের বাড়ী করিয়া ফেলিলেন। গাড়ী ঘোড়াও হইল।

এক্ষণে মক্কেল ভুলাইবার জন্য রীতলালকে আর কেতাব হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। এক্ষণে রীতলাল কাগজপত্র কিছু মাত্র না দেখিয়াই মোকদ্দমা চালাইতে পারেন। কেবল তিনি কোন্ পক্ষে আছেন ইহাই পেস্কার সাহেবকে সময়ে সময়ে মনে করাইয়া দিতে হয় মাত্র।

এক্ষণে আর রীতলালের কোন প্রকার নজিরের

...হন হয় না। রীতলাল বলেন, "Law is nothing but codified common sense"—সুতরাং তাঁহার নিজের বিবেচনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নজির। একবার রীতলালের একজন মূর্খ মক্কেল অপর পক্ষের উকীলকে বিস্তর নজির দেখাইতে এবং নিজের উকীলকে কেবল হাস্য করিতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি কোন নজির দেখাইতেছেন না কেন?" রীতো হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "উকীল যতদিন নূতন থাকে, ততদিনই তাহার নজির দেখাইবার প্রয়োজন হয়। সে যাহাই বলে তাহাতেই আদালত অবিশ্বাস করিয়া বলেন, 'নজির দেখাও'। কাজেই বেচারাকে নজির খুঁজিয়া খুঁজিয়া বিব্রত হইতে হয়। আমাদের উপর আদালতের অগাধ বিশ্বাস। আমরা যাহা বলি তাহাই আদালত গ্রাহ্য করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের নজিরের আবশ্যক হয় না।"—ওকীল সাহেবের নিকট এই নজির রহস্য শুনিয়া পর্য্যন্ত আর কেহ কখনো তাঁহাকে নজির না দেখানোর জন্য অনুযোগ করে নাই।

এক্ষণে রীতলাল আদালতে একজন প্রসিদ্ধ উকীল। হাকিমেরা তাহার নাম রাখিয়াছেন, 'রীতো the Ever Ready'. উকীলেরা নাম রাখিয়াছেন, 'রীতো the Successful.'

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

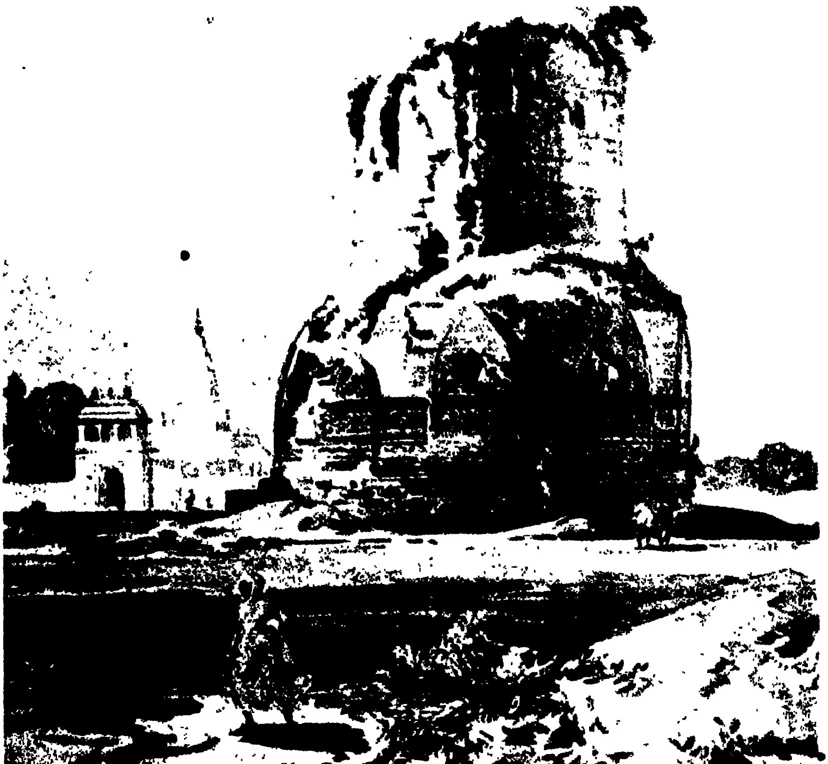
সারনাথের প্রাচীন নাম

সারনাথে আধুনিক ভূ-খননকার্য্য না হইলেও ঐ স্থানের অনেক কথা জানা যাইতে পারিত। তবে "সারনাথ" এই নামে পুঁথি পাঁজি খুঁজিলে কোনই প্রাচীন সংবাদ মিলিত না। কারণ, বৌদ্ধ সাহিত্যে 'সারনাথ' নাম পাইবার উপায় নাই। সর্ব্বত্রই উহার প্রাচীন নাম—**ইতিপতন মিগদায়** উল্লিখিত হইয়াছে। (১) এই নাম দুইটির উৎপত্তি লইয়াও নানা গোল আছে। আমরা নৈয়ায়িক মহাশয়দের তর্ক লইয়া হাসি তামাসা করি, কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের প্রায় সমস্ত কঠিন বিষয়ই যে মহা তর্কসঙ্কুল। তাহাতেও 'অনুগম নিগম' করিতে হয়, 'হেত্বাভাস' (fallacy), 'ছল সংশয়', 'উপমানানুমান' প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হয়। মনে হয়, ভাল করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের সংস্কার না লইয়া প্রত্নতত্ত্বে যাইতেই নাই। যাইলে নানারূপ হাস্যকর 'থিয়োরি' লোকের বিশ্বাস টলাইয়া দিতে থাকে। এই ধরুন্ অশোকানুশাসনের ব্যাখ্যা বিচার লইয়া বূলর, সেনার্, ফ্লীট্, ভিনিস কতই না মাথা ঘামাইয়াছেন—কিন্তু এখনও কোন আপোস্ হয় নাই ত!

'ইসিপতন' নামের মূল, এইবার আলোচ্য। খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে লিখিত প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবস্তু'তে এইরূপ আছে:—"দ্বাদশ বৎসরান্তে, বোধিসত্ত্ব 'তুষিত ভবন' হইতে অবতীর্ণ হইবেন। 'শুদ্ধাবাস' দেবগণ জম্বুদ্বীপস্থ প্রত্যেক বুদ্ধগণকে (২) সংবাদ দিলেন, 'বোধিসত্ত্ব অবতীর্ণ হইবেন, তোমরা বুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ কর।' অতঃপর ঐ সকল প্রত্যেক বুদ্ধ নিজের নিজের বক্তব্য সমাপ্ত করিয়া পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। বারাণসী হইতে অর্দ্ধ যোজন দূরস্থ মহাবনে পঞ্চশত প্রত্যেক বুদ্ধ

(১) বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লিখিত এই নামের একটা ধারাবাহিক আলোচনা "Some literary references to the Isipatana" নামে "Indian Antiquary" 1916, April সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেটি দেখিতে পারেন।

(২) বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের ভাষায় "পচ্চেক বুদ্ধ" "সম্মাসম্বুদ্ধ" (সম্যক্‌বুদ্ধ) নহেন। কারণ, বুদ্ধের সম্যক্ সংবুদ্ধরূপে আবির্ভাবের নিমিত্ত একটি বিশেষ তপস্যার প্রয়োজন হইয়াছিল।
—Buddha by Dr. H. Oldenberg, p. 120. footnote.



সারনাথ

MANASI PRESS

বাস করিতেন। (৩) তাঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভবিষ্যৎ-বাণী উচ্চারণ পূর্ব্বক নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের স্ব স্ব মাংস-শোণিতময় দেহ তেজোধাতুর দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া গেল। শরীরগুলি উর্দ্ধদেশ হইতে নিপতিত হইল। ঋষিগণ এখানে পতিত হইয়াছিলেন, অতএব ইহার নাম হইল 'ঋষিপতন'।" —ফরাসী পণ্ডিত সেনার (E. Senart) ঋষিপতন হইতে যে 'ইসিপতন' নাম হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন যে এই নাম ব্যতীত আরও দুইটি নাম জ্ঞাত হওয়া যায় যথা, ঋষি-পত্তন ও ঋষি-বদন। তাঁহার মত এই যে পূর্ব্বে সার-নাথের নাম ঋষিপত্তনই ছিল, কালক্রমে তাহা অপভ্রষ্ট হইয়া ঋষিপতন হইয়াছে। (৪) আমাদেরও মনে হয় যে সেনারের মতই যুক্তিযুক্ত। কারণ, মহাবস্তুতেই লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক বুদ্ধগণের পতনের পূর্ব্বে বারাণসীর অর্দ্ধ যোজন দূরে তাঁহারা মহাবনে বাস করিতেন। আর তাঁহারা একটি দু'টি নন্, যখন পঞ্চ-শত জন একত্র বাস করিতেন, তখন উক্ত স্থান ঋষি-গণের একটি পত্তন ছিল, ইহা অস্বাভাবিক নহে। পতন হইতে বদন অপভ্রষ্ট হওয়া শব্দশাস্ত্রের অনুকূল ব্যাপার। প্রাকৃতের "পো বঃ" "তো দঃ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা "প" স্থানে "ব" এবং "ত" স্থানে "দ" হইয়া থাকে। সুতরাং ঋষিপতন কোনো সময়ে ঋষি[illegible] উচ্চারিত হইত। মহাবস্তুতেও "ঋষিবদনে"র [illegible] পাওয়া যায়, যথা "ঋষিবদনস্মিং" (৪৩,৩০৭ পৃঃ) "ঋষি-বদনে মৃগদাবে" (৩২৩,৩২৪ পৃঃ) আবার ইহাতে "ঋষি পত্তনে"রও উল্লেখ আছে। (৩৬৬, ৬৮ পৃঃ) ললিত-বিস্তরের গাথাতেও এই নাম উক্ত আছে।

এইবার সারনাথের প্রাচীন নামের অপর অংশ— "মিগদাব" বা "মিগদায়" লইয়া বিচার। এই সম্বন্ধে সুবিখ্যাত "নিগ্রোধ মিগ-জাতকে"র (৬) অনুরূপ একটি উপাখ্যান মহাবস্তুতেও পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে বারাণসীর রাজার নাম ছিল ব্রহ্মদত্ত। মৃগদাবের সব মৃগ ধ্বংস হইবে বলিয়া মৃগাধিপতি ন্যগ্রোধের আত্মোৎ-সর্গের ফলে, তিনি মৃগগণকে নির্ভয়ে বিচরণের প্রতি-শ্রুতি দান করিয়াছিলেন। তাই, মহাবস্তুতে উপাখ্যানের অন্ত ভাগে আছে :—

"মৃগাণাং দায়ো দিন্ন মৃগদায়েতি ঋষিপত্তনো।" মৃগদিগকে দান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এই স্থানের নাম হইল "মৃগদায় ঋষিপত্তন।" (৭) এখন জিজ্ঞাসা স্বতঃসিদ্ধ—'দায়' শব্দের কোন্ অর্থটী এস্থলে প্রযোজ্য হইবে, দান অথবা বন? Childers এর পালি অভি-ধানে 'দায়" শব্দের "বন" অর্থেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেনার বা অন্য কোন বৈদেশিক পণ্ডিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। তাঁহারা শুধু এই ন্যগ্রোধ মৃগের আখ্যায়িকাটী কি কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া নানা প্রাচীন গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহারই একটী বিশদ ইতিহাস দিয়াছেন। (৮) আমাদের মনে

(৩) প্রাচীন পালিগ্রন্থাদি হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে যখন সম্যক সংবুদ্ধগণ অবতীর্ণ হন নাই অথবা তাঁহাদিগের দ্বারা কোন ধর্ম্মসংঘ স্থাপিত হয় নাই তখনই "প্রত্যেক বুদ্ধগণ" আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ("Apadana" folki of the Phayre Mss)। কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রন্থাদি হইতে বুঝা যায় যে "প্রত্যেক বুদ্ধগণ" যে শুধু সেই সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন। কারণ বুদ্ধ বলিয়াছেন, "সমগ্র বিশ্বে আমাব্যতীত প্রত্যেক বুদ্ধগণের তুল্য কক্ষ আর কেহ নাই।"

(৪) চীন দেশীয় গ্রন্থে ও দিব্যাবদানে ও "ঋষিবদন" উক্ত হইয়াছে। Divyav. p. 393। ইচিঙ্ (It-ing) ঋষি-পতনকে ঋষির পতনরূপে অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ফাহি-য়ান্ নিঃসন্দেহে বলিয়াছেন যে একটী প্রত্যেক বুদ্ধই "ঋষিপতন" এই নামকরণের প্রণেতা।

(৫) সিদ্ধ হেমচন্দ্র (ব্যাকরণ)।

(৬) Jataka I, 149 pp. এটী সারনাথপ্রসঙ্গে হয়েৎসাঙ-এর বিবরণেও উল্লিখিত হইয়াছে।

(৭) মহাবস্তু vol I p. 366। ইচিঙ্ (Itsing) এবং অন্যান্য চীনদেশীয় লেখকগণ মৃগদায়ের অনুবাদ করিয়াছেন "শি-লুয়ে" বা "শিলুলিন" অর্থাৎ মৃগদিগকে প্রদত্ত বনভূমি।

(৮) Benfey's Panchatantra p. 183. Also in the Memoirs of Hiuen-t-siang (R 36. 1) Jataka I, pp. 149

স্থানের সর্ব্বপ্রাচীন নাম ছিল—মৃগদাব (বন)। ...গের বিচরণ ক্ষেত্র বলিয়া সম্ভবতঃ ইহার এই সংস্কৃত ... হইয়া থাকিবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখনও এস্থান কাশীরাজের "রমনা" নামে প্রসিদ্ধ। কালক্রমে উচ্চারণ দোষে স্বাভাবিক প্রাকৃত ভাষার নিয়মানুসারে এই শব্দ "মিগদায়" রূপে পরিণত হয়। তখনও সম্ভবতঃ ইহার "বন" অর্থই প্রসিদ্ধ ছিল। কারণ বুদ্ধদেব তখনও এখানে আগমন করেন নাই বা পালিসাহিত্য সৃষ্ট হয় নাই। পরে যখন বুদ্ধদেবের সংসৃষ্ট প্রত্যেক বিষয়েরই এক একটা উপাখ্যান রচনা করিবার যুগ আসিল, তখন এই "ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন" স্থান বা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের আদি ভূমি সারনাথও ন্যগ্রোধ মৃগজাতকের ঘটনাস্থল হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময় হইতে "দায়" শব্দের প্রাচীন অর্থ বিলুপ্ত হইল এবং "দায়" দান অর্থেই এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে লাগিল। (৯)

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

জেনারেল কানিংহাম ভরহুতের উৎকীর্ণ চিত্রে এই ঘটনার চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই চিত্রের সঙ্গে "ইসিমিগজাতকম্"—এই লিপিও সংযুক্ত আছে। কিন্তু ডাঃ হর্ণলি সাহেব আবার "Indian Antiquary" তে কানিংহামের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

(৯) সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডি, আর, ভাণ্ডারকর ও অধ্যাপক ডাঃ এ, ভিনিস মহোদয় আমার এই মত সমর্থন করিয়াছেন —লেখক

মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেথুন সভার সম্পাদক। ডাক্তার মৌয়েট, মিষ্টার হজ্‌সন্ প্র্যাট্, কর্ণেল গুড্‌উইন, ডাক্তার বেড্‌ফোর্ড, মিষ্টার জেম্‌স্ হিউম্ প্রভৃতি মনস্বিগণ যথাক্রমে এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন দিবসে ডাক্তার ডফ্ এই সভার সভাপতি পদে বৃত হন। ডাক্তার ডফের সভাপতিত্বে এই সভার যথেষ্ট উন্নতি হয়। সভার প্রায় প্রারম্ভ হইতে * প্রেসিডেন্সী কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। ইনি অতি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। কৈলাসচন্দ্রের ভগ্নীর † সহিত রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র উমেশচন্দ্র মিত্রের বিবাহ হয়। কৈলাসচন্দ্রের বিদ্যাবুদ্ধি ও সরল স্বভাবের

* সর্ব্বপ্রথমে প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভার সম্পাদক নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি অধিককাল এই কার্য্য করেন নাই।

† ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা রমণী ছিলেন। বাল্যকালে উপস্থিত কবিতারচনাশক্তির দ্বারা ইনি অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। কথিত আছে,একবার কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহাকে "ভাইয়ের সহিত দেখা বৎসরের পরে" এই কবিতার পাদপূরণ করিতে বলেন। বালিকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "ঘটা করে দিব ফোঁটা অতি সমাদরে।" এই পূজনীয়া মহিলার নিকট হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক অনেক সাহায্য পাইয়াছেন এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ পাইবার আশা করিয়াছিলেন। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার সময়ে অকস্মাৎ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।—লেখক।

জন্য রামচন্দ্র তাঁহাকে পুত্রাধিক ভালবাসিতেন। তিনি অবসরগ্রহণকালে কৈলাসচন্দ্রকেই বেথুন সভার সম্পাদক পদের উপযুক্ত ভাবিয়া ডাক্তার ডফ্‌কে তাঁহার বিষয়ে বলেন। ফ্রিচার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনে তর্ক-বিতর্কের সময় হইতেই ডাক্তার ডফ্‌ কৈলাসচন্দ্রকে চিনিতেন এবং তাঁহার প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়াছিলেন। তিনি কৈলাসচন্দ্রকে সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। কৈলাসচন্দ্র মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় অষ্টাদশবর্ষ কাল এই সভার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সম্পাদকত্বকালে এই সভা প্রতিষ্ঠার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। সম্পাদকের কার্য্য অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। কৈলাসচন্দ্র কেবল দেশহিতের জন্য তাঁহার অধিকাংশ সময় নীরবে এই সভার উন্নতিকল্পে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অসামান্য পরিশ্রম করিতে হইত, তিনি অম্লান বদনে সকল কার্য্য সম্পাদিত করিতেন। বেথুন সভার সকল সভাপতিই মুক্তকণ্ঠে কৈলাসচন্দ্রের কার্য্যের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। এরূপ প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই প্রতিপত্তি সম্পাদকের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে। বেথুন সভার প্রতিষ্ঠা কৈলাসচন্দ্রের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বেথুন সভার সুযোগ্য ও সুধী সম্পাদকের নাম শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই সুপরিচিত ও সম্মানার্হ ছিল। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসের অভাবে আজি তাঁহার নাম বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে!

রাজকর্ম্মে উন্নতি। ১৮৬০-১ খৃষ্টাব্দে শাসনকার্য্যে ব্যয়সঙ্কোচের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য Civil Finance Commission নামক অনুসন্ধান-সমিতি নিযুক্ত হয়। মিষ্টার (পরে স্যর রিচার্ড) টেম্পল্‌ এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ডাক্তার ডফ্‌ কৈলাসচন্দ্রকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। ডাক্তার ডফ্‌ স্যর রিচার্ড টেম্পলের সহিত কৈলাসচন্দ্রের পরিচয় করাইয়া দিলে স্যর রিচার্ড কৈলাসচন্দ্রের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে Finance Commission অফিসের প্রধান নিযুক্ত করেন। কমিশনে কৈলাসচন্দ্র অতিশয় তার সহিত সকল কার্য্য সম্পাদিত করেন এবং স্যর রিচার্ড টেম্পল্‌ তাঁহার কার্য্যের অতি উচ্চ প্রশংসা করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তাৎকালীন রাজস্ব-সচিব মাননীয় মিষ্টার লেঙের প্রস্তাবানুসারে রাজস্ব-বিভাগে চারিটি উচ্চ পদের সৃষ্টি হইলে স্যর রিচার্ডের প্রশংসাবাক্য স্মরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কৈলাসচন্দ্রকে উহার একটি পদ প্রদান করেন। তিনি শেষ অবধি এই পদ অধিকৃত করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল কণ্ট্রোলার জেনারেলের সহকারী এবং অবশেষে মণি-অর্ডার আফিসের অধ্যক্ষের (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের) পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। স্যর রিচার্ড টেম্পল্‌ তাঁহাকে এত স্নেহ করিতেন যে শুনা যায় যে তিনি তাঁহাকে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটারীর পদের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই পদে বসিবার পূর্ব্বেই কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্রাদি। কৈলাসচন্দ্র দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্ম্ম এবং বেথুন সভার সম্পাদকের পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পাদিত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সাহিত্য-সেবা ও দেশ-সেবাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল। কৈলাসচন্দ্র-সম্পাদিত লিটারারী ক্রনিক্‌লের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তদীয় মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ "বেঙ্গল রেকর্ডার" নামক একখানি সংবাদ-পত্র প্রবর্ত্তিত করেন। সম্পাদকদ্বয় তরুণ বয়স্ক হইলেও তাঁহাদের প্রস্তাবাদি এরূপ সুচিন্তিত ও সারগর্ভ হইত যে 'ফ্রেণ্ড্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া' সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টার মার্শম্যান এই প্রস্তাবাদির উচ্চ প্রশংসা করিতেন। কলিকাতার তদানীন্তন কলেক্টর মিষ্টার আর্থার গ্রোট এই সকল রচনা পড়িয়া এতদূর প্রীত হন যে তিনি ডেপুটী কলেক্টর ৺শিবচন্দ্র দেব * মহাশয়ের নিকট

* ইনি অতি সাধু ও ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ইঁহার বাসস্থান কোন্নগরে ব্রাহ্মসমাজ, বালক ও বালিকা বিদ্যালয়,

...র পরিচয় লন এবং শ্রীনাথের অন্য কোনও ... নাই শুনিয়া তাঁহাকে একটি কর্ম্ম প্রদান করেন। শ্রীনাথ পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং শেষে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন। কৈলাসচন্দ্র "বেঙ্গল রেকর্ডারে" মধ্যে মধ্যে মনোহর প্রস্তাবাদি লিখিতেন। তিনি Morning Chronicle, Citizen, Phœnix প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত Indian Field পত্রে এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত Hindoo Patriot পত্রেও তিনি মধ্যে মধ্যে দেশোন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতেন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র Hindoo Patriot এর সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা কোনও কারণে সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিলে সত্বাধিকারী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে কৈলাসচন্দ্র বসু, নবীনকৃষ্ণ বসু ও কৃষ্ণদাস পাল এই তিনজন সুলেখকের হস্তে উহার সম্পাদন ভার অর্পণ করেন। কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদকত্বকালেও কৈলাসচন্দ্র নিয়মিতরূপে Hindoo Patriot এ লিখিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে দিবসে দরিদ্র প্রজা-পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র

পাঠাগার, ডাকঘর, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইনি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং উহার প্রথম সম্পাদক ও দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তৎপ্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত 'শিশুপালন' নামক গ্রন্থ এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ বলিলে বলা যাইতে পারে। ইঁহার সম্বন্ধে অমর কবি দীনবন্ধু লিখিয়াছেন :—

"কায়স্থ নিবাস কোন্নগর বিশাল,
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল,
শিশু পালনের পিতা প্রশান্ত স্বভাব,
সুশিক্ষিতা ছয় মেয়ে ভারতীর ভাব।"

শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়, সেই সূত্রে শিবচন্দ্র শ্রীনাথে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন।

'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। কৈলাসচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের 'বেঙ্গলী'তেও মধ্যে মধ্যে লিখিতেন এবং গিরীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও 'বেঙ্গলী'তে রীতিমত লিখিতেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'বেঙ্গলী'তে গিরিশচন্দ্রের জীবনকথা-সম্বলিত মৃত্যু-বিষয়ক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা কৈলাসচন্দ্রের রচনা। মৎ-প্রকাশিত 'Life' of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the 'Hindoo Patriot' and the 'Bengalee' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

যেখানে জনহিতকর সভা সমিতির অধিবেশন হইত, সেইখানেই কৈলাসচন্দ্র উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিতেন। সহপাঠী গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেলুড় স্কুল এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে তিনি প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং শিক্ষার উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভা। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমীদার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টায় উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। "দরিদ্রদিগকে শিক্ষাপ্রদান, অভাবগ্রস্তদিগকে সাহায্য প্রদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগীকে ঔষধদান, দরিদ্র বিধবা ও অনাথদিগকে সাহায্যদান" প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠান এই সভার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। এই সভা এককালে নীরবে যে সকল মহৎকার্য্য সংসাধিত করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় আনন্দে অভিভূত হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক কর্ণেল ম্যালিসন, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র, মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জননায়কগণ এই সভার বাৎসরিক অধিবেশনাদিতে উপস্থিত থাকিয়া ও বক্তৃতাদি করিয়া

সভার উৎসাহবর্দ্ধন করিতেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে এপ্রিল দিবসে এই সভার এক বার্ষিক অধিবেশনে কৈলাসচন্দ্র Claims of the poor বা 'দরিদ্রের দাবী' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে



ডাক্তার ডফ.

এই সভাদ্বারা অনুষ্ঠিত, কার্য্যের উপকারিতা প্রদর্শিত করিয়া তিনি দেশের লক্ষপতিদিগকে এই প্রতিষ্ঠানের পোষকতা করিতে আহ্বান করেন। দরিদ্র দেশবাসীকে শিক্ষা প্রদানের আবশ্যকতা প্রদর্শিত করিয়া তিনি বলেন যে, শিক্ষার অভাবই আমাদের দেশের দুরবস্থার প্রধান কারণ। দরিদ্র প্রজাদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে যে, জমীদারই লাভবান হইবেন তাহাও তিনি স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেন। তাঁহার সমগ্র বক্তৃতাটি উচ্চ নৈতিকভাবে পরিপূর্ণ, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি তাঁহার প্রতি বাক্যে পরিস্ফুট। এই বক্তৃতার উপসংহারে তিনি দেশের ধনী সন্তানগণকে অন্ধ, খঞ্জ, বধির, প্রভৃতি দুর্ভাগ্যগ্রস্ত দরিদ্রের ক্লেশনিবারণের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা পাইতে অনুরোধ করেন।

বক্তৃতার সময় সভাস্থলে প্রসিদ্ধ বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও ওজস্বিনী বক্তৃতায় কৈলাসচন্দ্রের মতের সমর্থন করিয়া তাঁহার বক্তৃতার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে সংবাদ-পত্রাদিতে উহা উচ্চপ্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 'কলিকাতা রিভিউ'য়ের তাৎকালীন সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল ম্যালিসন উহার সুদীর্ঘ সমালোচনায় কৈলাসবাবুর যথেষ্ট প্রশংসা করেন। আমরা কর্ণেল ম্যালিসনের সমালোচনার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The author of this address is, if we mistake not, the able and indefatigable Secretary of the Bethune Society. To see him come forward in the noblest of all causes,—the cause of the poor,—is calcu-



সার রিচার্ড টেম্পল

lated to make those hope, who had begun to despair of the effect of education upon

the natives of this great country,—for it is a striking proof of one, at least, of the tendencies which that education produces on the gentle nature of the Hindoo who may submit himself to its influence.

* * *

We have ourselves read the lecture with the greatest pleasure. *It is admirable in style, and excellent in its moral tone.* Baboo Koylas has set an example which, we believe, his countrymen will imitate and has made an appeal to which, we fervently hope, they may respond."



কিশোরীচাঁদ মিত্র

রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের স্মৃতিসভা।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৯ শে এপ্রিল দিবসে শ্রীবৃন্দাবন ধামে হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা, বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, কে, সি, এস, আই দেহত্যাগ করেন। ইহাতে দেশে জাতিসাধারণ-শোক উপস্থিত হয়। দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আহ্বানে ঐ বৎসর ১৪ই মে দিবসে এই স্বর্গগত মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনার্থ এক বিরাট স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। মনীষী প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি, এস, আই মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু (পরে মহারাজা স্যর) রমানাথ ঠাকুর, বাবু (পরে রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মিষ্টার জন ক্রেন, কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, মিষ্টার মণ্টিউ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু, রেভারেণ্ড মিষ্টার ডল্, রেভারেণ্ড মিষ্টার লঙ্, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্র, অধ্যাপক লব্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর প্রস্তাব করেন যে রাজা স্যর রাধাকান্তের স্মরণার্থে

তাঁহার একটি প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি কোনও প্রকাশ্য স্থলে প্রতিষ্ঠিত হউক। দরিদ্রের বন্ধু কৈলাসচন্দ্র এই প্রস্তাবের পরিবর্ত্তে প্রস্তাব করেন যে, দরিদ্র বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য একটি সাহায্য ভাণ্ডার



৺শ্রীনাথ ঘোষ

প্রতিষ্ঠিত করিয়া দয়ার সাগর রাধাকান্তের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি :—

"সভাপতি মহাশয়,—এই মাত্র যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত ও সমর্থিত হইল, তদ্বিষয়ে সভার সম্মতি গ্রহণের পূর্ব্বে আমি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আপনার প্রশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি ও এই বিষয়ে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। মহাশয়, স্বর্গীয় রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের স্মৃতি-পূজার জন্য আহূত এই সভা, আমার মতে একটি গভীর অর্থ-বহন করিতেছে তদ্বিষয়ে কোনও ভুল নাই। সকল বিষয়েই রাজা দেশীয় সমাজের নেতা ও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। যদিও তাঁহার মর্ত্ত্য জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি আত্মীয়, স্বজন ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর বৃন্দাবনের ছায়াস্নিগ্ধ পুষ্পসুরভিত কুঞ্জমধ্যে ভগবৎ-চিন্তায় অতিবাহিত করিতেছিলেন, তথাপি, তাঁহার অবস্থিতিতে যেরূপ, তাঁহার অনুপস্থিতিতেও সেইরূপ, তাঁহার নৈতিক প্রভাব আমাদের উপর অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইতে-ছিল। সমধর্ম্মী হউন বা বিধর্ম্মী হউন, উদারনীতিক হউন বা রক্ষণশীল হউন, সকলেই তাঁহাকে সমভাবে সম্মান করিতেন। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কোনও পরিবার বা জাতির বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে রুচি, মত বা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বৈষম্য থাকিলেও যথার্থ মহত্ত্ব সেই বৈষম্য সত্ত্বেও সেই পরিবার বা জাতির উপর তাহার মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তারিত করিতে পারে। আমাদের সমাজের নব্য সংস্কারকগণ, যাঁহারা আমাদের সামাজিক আচারাদির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত অসংখ্য সামাজিক দোষগুলি দূর করিবার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যমের সহিত প্রয়াস পাইতেছেন,—যাঁহারা বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তনের ও জাতিভেদ রহিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন এমন কি রাজবিধি দ্বারাও বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা পাইতেছেন, যাঁহারা মুমূর্ষু পিতামাতাকে 'অন্তর্জলী' করিতে দিতে অসম্মত এবং শবদাহের পরিবর্ত্তে সমাধির পক্ষপাতী—সেই সকল নব্য সংস্কারকগণের রুচি, অভিমত বা ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত রাজা রাধাকান্ত দেবের রুচি মত ও ধর্ম্মবিশ্বাসের একতা ছিল না। তথাপি, মহাশয়, যদি আমি ভুল বুঝিয়া না থাকি, তবে যাঁহারা বিধবা-বিবাহ এবং



স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব

অন্যান্য সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী, রাজা রাধাকান্ত আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহাদের মত ও কার্য্যের চিরবিরোধী ছিলেন, তাঁহারাই এই সভায় প্রধান উদ্যোগী। সুতরাং আমরা যে সকলে একভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করিতে এই স্থলে সমবেত হইয়াছি, ইহা কি একটি গভীরতম তাৎপর্য্যের সূচনা করিতেছে না? যখন কোনও ভিন্নমতাবলম্বী সংস্কারক আন্তরিকতার সহিত রক্ষণশীল বিরুদ্ধবাদীর পূজা করে তখন ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সকল প্রতিবিধায়িনী শক্তির অস্তিত্বসত্ত্বেও মহত্ত্ব সকল ধর্ম্ম ও সামাজিক মতদ্বৈধ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

মহাশয়, আমরা স্বর্গীয় মহাত্মাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতাম, কেবল তিনি সুবিদ্বান ছিলেন বলিয়া নহে কিম্বা তিনি শব্দকল্পদ্রুমের সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া নহে, তিনি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে কিম্বা তিনি সাধু ও মিষ্টভাষী ছিলেন বলিয়া নহে, কিন্তু তাঁহাতে হৃদয় ও মনের সেই সকল মহৎগুণের অধিষ্ঠান ছিল, যে সকল গুণ যে কোনও সময়ে যে কোনও জাতীয় ব্যক্তিকে



কুমারী মেরী কার্পেণ্টার

মহত্ত্ব প্রদান করিতে পারে। যদি এদেশের কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে তাঁহার স্বভাব রাজার ন্যায় উদার, যে তাঁহার প্রসন্ন আনন করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে সতত উদ্ভাসিত, যে তাঁহার হৃদয় দেশপ্রেমে আলোকিত ছিল—তবে সে কথা ন্যায় ও সত্যের সহিত এই প্রবীণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারিত—যিনি সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন, যাহার চিতাভস্ম পুণ্যসলিলা ভাগীরথী এখনও বহন করিতেছে এবং যাঁহার আত্মা চিরশান্তিময় রাজ্যে প্রয়াণ করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশে কেবলমাত্র প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলে চলিবে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহার বিষয় লোকে বিস্মৃত হইবে এবং অনাদৃত অবস্থায় উহা কোথাও পড়িয়া থাকিবে। তাঁহার দেশবাসী ও বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে তিনি যে অনন্যসাধারণ গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তাহার স্মৃতিচিহ্ন তাহার সেই গুণ স্মরণ করাইয়া দেয় ইহাই বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য, দানশীলতার জন্যই তিনি সমধিক বিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা কোনও সৎকার্য্যে দানের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত। যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হইয়াছে উহার পরিবর্ত্তে আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে দরিদ্র হিন্দুবিধবা ও অনাথদিগকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখা হউক।"

রাজা রাধাকান্তের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য যে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সংগঠিত হয়, কৈলাসচন্দ্র তাহার একজন উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন।

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে পুণ্যস্মৃতি কুমারী মেরী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষে আগমন করেন। কলিকাতায় আসিলে একদিন

প্রসঙ্গক্রমে রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ লঙ্‌ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইংলণ্ডে যেরূপ একটি সমাজ-বিজ্ঞান সভা আছে, এদেশে সেইরূপ একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কি না? মেরী কার্পেণ্টার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ এবং কেশবচন্দ্র সেন, প্যারিচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালী জননায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৭ই ডিসেম্বর দিবসে এসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে একটি প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করেন। মহামান্য গবর্ণর জেনারেল, লেফটেনাণ্ট গবর্ণর এবং বহু সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত হন। মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার অগ্নিময়ী বক্তৃতায় এদেশে একটি সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।



রামগোপাল ঘোষ

"জনসাধারণের সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগকে সম্মিলিত করিয়া বঙ্গদেশে সামাজিক উন্নতির সহায়তা করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।" প্রথম বৎসর মাননীয় মিষ্টার জষ্টিস্‌ ফিয়ার (পরে স্যর জন্‌বড্‌ ফিয়ার) এই সভার সভাপতি এবং মাননীয় মিষ্টার জষ্টিস্‌ নরম্যান ও বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র এই সভার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। মিষ্টার বিভার্লি ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র উহার সম্পাদক হন। কৈলাসচন্দ্র এই সভার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উহার একজন উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন। এই সভা চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল;—ব্যবস্থাশাস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং অর্থনীতি ও বাণিজ্য। কৈলাসচন্দ্র স্বাস্থ্যশাখার অন্যতম প্রধান সভ্য হইলেও অন্যান্য শাখার প্রতিও তাঁহার সহানুভূতি ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই দিবসে তিনি শেষোক্ত শাখায় 'হিন্দুদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা' ((Domestic Economy of the Hindus) শীর্ষক একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। উহাতে তিনি মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণের

গ্রন্থাদি হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার করেন, এবং বর্ত্তমান আচার ব্যবহারাদির দোষে আমাদের কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে বা হইতে পারে তাহা প্রদর্শন করেন। সন্তানদিগের প্রতি পিতামাতার অত্যধিক স্নেহ এবং তাহাদের বিলাসিতায় প্রশ্রয় দান, স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াও হিন্দুসন্তানগণ কর্ত্তৃক ভ্রান্ত পিতামাতার আদেশ অনুপালন, একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করিয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ, বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়ায় আয়ের অনুপাতে অত্যধিক ব্যয় প্রভৃতি দোষে কিরূপে আমাদের সমাজ অবনতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেন। পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকগণ নৃত্যগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যা শিখিতেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে বিরাট রাজান্তঃপুরে অর্জ্জুন নৃত্যগীতাদিতে শিক্ষা দিতেন—কিন্তু এক্ষণে হিন্দু-পরিবারে এই সকল নির্দ্দোষ কলাবিদ্যাশিক্ষা দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হয়, এই জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন এবং পুনরায় হিন্দু স্ত্রীলোকগণকে এই সকল বিদ্যায় শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। কুমারী মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার Six. months in India নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতার এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন।

রামগোপাল ঘোষের জীবনী। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ও সুলেখক মিষ্টার এস্, লব্, ছাত্রগণের তথা স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মানসিক উন্নতি বিধানকল্পে মধ্যে মধ্যে তাঁহার য়ুরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুগণকে কলেজ-গৃহে নীতিগর্ভ উপদেশ ও বক্তৃতাদি প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহারই আমন্ত্রণে একবার 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ হুগলী কলেজে বাঙ্গালী ক্রোরপতি রামদুলাল দের জীবন-কথা বিবৃত করেন। অধ্যাপক লব্ কৈলাসচন্দ্রকেও



গিরিশচন্দ্র ঘোষ (পরিণত বয়সে)

একটি বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৫ শে জানুয়ারী দিবসে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান নেতা, 'ভারতবর্ষের ডিমস্থিনিস্', 'স্বদেশরক্ষার ভীম' রামগোপাল ঘোষ নামশেষ হন। রামগোপালের জীবনীতে শিক্ষণীয় অনেক কথা আছে এই জন্য কৈলাসচন্দ্র রামগোপাল ঘোষের জীবন-কাহিনী বিবৃত

করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। দেশীয়দিগের অকৃত্রিম বন্ধু লব্ ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হন এবং কৈলাসচন্দ্রকে লিখেন :—

"I for one, am surfeited with Socrates, Milton, Bacon and such like stock subjects. It will be refreshing to hear the life and labors of one who is not a household word among us Europeans, to listen to the life of a real man who has benefited his countrymen by works of practical usefulness and by leaving behind him a good example, a noble ideal which all may try to imitate if they cannot thoroughly realise."

কৈলাসচন্দ্র রামগোপালের মৃত্যুর একসপ্তাহের মধ্যে তাঁহার চরিত-কথা রচনা করিয়া ১লা ফেব্রুয়ারি দিবসে হুগলী কলেজের গৃহে উহা বিবৃত করেন। কৈলাসচন্দ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ গিরিশচন্দ্র এই বক্তৃতার উপসংহারাংশ লিখিয়া দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাটী পরে রামগোপাল ঘোষের ছায়াচিত্রের সহিত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাৎকালীন সাময়িক পত্রাদিতে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীত হয় যে এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ কৈলাসচন্দ্র রামগোপালের স্মরণার্থ কার্য্যের আনুকূল্যে প্রদান করিয়াছিলেন :—

"আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মৃত বাবু রামগোপাল ঘোষের বান্ধবগণ তাঁহার স্মরণার্থ কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদাসীন নহেন। তাঁহারা সভা করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণে উদ্যত হইয়াছেন। আর একটি উদার অনুষ্ঠান দেখিয়া আমরা অধিকতর প্রীতিলাভ করিলাম। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু হুগলি কলেজে রামগোপাল বাবুর জীবনবৃত্তান্ত লইয়া এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহা পুস্তকাকারে বদ্ধ হইয়া মুদ্রিত ও বিক্রীত হইতেছে। মূল্য একটাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। উহা বিক্রীত হইয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা রামগোপাল বাবুর স্মরণার্থ কার্য্যের আনুকূল্যার্থ প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা ঐ পুস্তক ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগের কেবল যে কৈলাসবাবুর বক্তৃতা পাঠ করিয়া এবং রামগোপাল বাবুর জীবন চরিতগত সবিস্তার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৌতূহল বিনোদিত হইবে এরূপ নয়, তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থদ্বারা স্মরণার্থ কার্য্যেরও সবিশেষ আনুকূল্য হইবে। এক প্রযত্নে এই উভয়বিধ ইষ্টলাভ সামান্য সুখাবহ নহে।"

—সোম প্রকাশ, ১৩ই ফাল্গুন, সন ১২৭৪ সাল।

রামগোপাল ঘোষের স্মৃতিসভা। এই বৎসর ২২শে ফেব্রুয়ারি দিবসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার গৃহে বাঙ্গালার দেশনায়কগণ রামগোপালের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনার্থ ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এক বিরাট স্মৃতিসভা আহ্বান করেন। এই সভায় বাবু (পরে মহারাজা স্যর) রমানাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বক্তৃতাদি করেন। কৈলাসচন্দ্র এই সভাতেও একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। আমরা উহার মর্ম্মানুবাদ পাঠকগণকে উপহার দিতেছি :—

"ভদ্র মহোদয়গণ, অধিক দিনের কথা নহে, এখনও এক বৎসর অতীত হইয়াছে কি না সন্দেহ, আমরা এই গৃহে একজনের স্মৃতিপূজার জন্য সমবেত হইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সর্ব্ববাদীসম্মত নেতা ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের মহত্ব, অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, শিশুসুলভ সরলতা, স্বভাবসিদ্ধ দয়া ও বদান্য ব্যবহার, অপূর্ব্ব প্রতিভার সহিত সম্মিলিত হইয়া—যে প্রতিভা অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শী জ্ঞানে পরিণতি লাভ করিয়াছিল সেই প্রতিভার সহিত সম্মিলিত হইয়া, তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ের উপর তাঁহাকে এরূপ আধিপত্য প্রদান করিয়াছিল যে কি রক্ষণশীল কি উদারনীতিক, সকলেরই স্মৃতিপটে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকিবে। স্বর্গীয় স্যর রাজা রাধাকান্ত একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন—তিনি অতি মাত্রায় রক্ষণশীল ছিলেন এবং আমাদের পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক অত্যাচারিত গোঁড়া এবং কুসংস্কারাপন্ন দেশবাসিগণের মধ্যে আমরা যে সকল সামাজিক সংস্কার সাধিত করিতে প্রয়াস পাইতেছি তিনি তাহার অনেক গুলিরই বিরোধী ছিলেন। তথাপি স্যর রাজা রাধাকান্ত তাঁহার ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধবাদিগণের নিকট হইতে অল্প সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হন নাই। আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম

কারণ তিনি হৃদয়ের ও মনের সেই সকল গুণে ভূষিত ছিলেন, যে সকল গুণ দেশ ও কাল নির্ব্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকে। আজ আমরা আর একজনের স্মৃতি পূজার জন্য সমবেত হইয়াছি যিনি সম্প্রতি আত্মীয় ও প্রতিভামুগ্ধ জনসাধারণকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি রাজা রাধাকান্তের ঠিক প্রতিরূপ ছিলেন না, কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন। রাজা রাধাকান্তকে যদি দেশীয় সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতা বলা যায় তবে রামগোপালকে তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে উদার-নীতিক সম্প্রদায়ের ও শিক্ষিত সমাজের নেতা বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আমাদের আজিকার কার্য্য অসঙ্গত ও উপযোগিতা-রহিত কিম্বা আমাদের কোনও পাত্রাপাত্র বিচার নাই এবং কোনও রূপে কেহ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেই তাঁহাদিগকে আমরা নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহারা ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা আমাদের কার্য্যে কোনও অসামঞ্জস্য বা অবিবেকিতার নিদর্শন দেখিতে পাইবেন না। কারণ, যে বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিতেছি, তাঁহাদের ধর্ম্মমতে বিলক্ষণ বৈষম্য থাকিলেও তাঁহারা উভয়েই সেই সকল মহদ্-গুণে ভূষিত ছিলেন, যে সকল গুণ মানবচরিত্রের যথার্থ অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হয়---সাধুতা, অধ্যবসায়, বদান্যতা, দানশীলতা, ঈশ্বরে ভক্তি, মানবে প্রীতি, জনহিতৈষণা, পরোপকারের জন্য আত্মবিসর্জ্জনেচ্ছা। স্যর রাজা রাধাকান্ত ও বাবু রামগোপাল উভয়েই খুব অধিক মাত্রায় এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। আপনাদের অনেকেই শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে এই দুইজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, দুইটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াও ঈর্ষা বা ঘৃণার পরিবর্ত্তে পরস্পরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমি একটি ঘটনা জানি যাহাতে পরস্পরের এই শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব বিশেষ ভাবে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে টাউনহলে চার্টার সভায় রামগোপাল তাঁহার সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহী অগ্নিময় বক্তৃতা শেষ করিয়া বক্তৃতামঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইলে, সেই সভার সভাপতি স্যর রাজা রাধাকান্ত তাঁহার আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং রামগোপালকে তাঁহার সুললিত বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রেমভরে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, 'ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনি আপনার দেশের সেবায় আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হউন। আপনি আমাদের সমাজের মুখপাত্র, আপনি আমাদের জাতির অলঙ্কার স্বরূপ।' রামগোপাল নম্রভাবে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, 'আপনারা আমা হইতে যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা আপনার মুখে শুনিয়া আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। কিন্তু মহাশয়, আমি যতদূর করিতে পারিব, দেশ আপনার নিকট হইতে তদপেক্ষা অধিকতর কল্যাণের আশা করে।'

"পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তারা অগ্রেই বলিয়াছেন যে, রামগোপাল জীবনে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তিনি এতগুলি স্বভাবদত্ত গুণের অধিকারী ছিলেন যে তদ্দ্বারা তিনি তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠস্থান অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকথা মুদ্রিত হইয়াছে এবং সাধারণের নিকট সহজ লভ্য হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার দেশবাসীর সামাজিক, রাজনীতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির জন্য বিবিধ অনুষ্ঠানে তাঁহার অদ্ভুত পরিশ্রম---যে সকল কার্য্যের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় থাকিবেন এবং আমাদের উত্তর-পুরুষগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন—সে সকলের বিষয় বিস্তারিত ভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন।

"রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুতে বঙ্গমাতা তাঁহার একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সন্তানকে হারাইলেন। অদম্য উৎসাহ, প্রশংসনীয় সাধুতা, অসীম আত্মনির্ভরতা, অবিচলিত অধ্যবসায়, অনন্য-সাধারণ প্রতিভা ও উদারতম হৃদয় তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র, স্নেহশীল পিতা, আন্তরিক ও অকপট বন্ধু এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে বোধ হয় এমন কোনও যোগ্য ব্যক্তি নাই যিনি তাঁহার পরিত্যক্ত আসন অধিকার করিয়া উহা অলঙ্কৃত করিতে পারেন।"

ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর পরিচালক সমিতি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কৈলাসচন্দ্রের অসীম আগ্রহ ছিল এবং বহু বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে তিনি সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশাদি দিয়া এবং ছাত্রগণকে উৎসাহবাক্যাদি দ্বারা প্রোৎসাহিত করিয়া নীরবে শিক্ষার উন্নতি সংসাধিত করিতেন। তাঁহার শিক্ষাস্থল ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর উন্নতির প্রতি চিরদিন তাঁহার দৃষ্টি ছিল। মধ্যে কিছু অবনতি হওয়ায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে উন্নতির জন্য উহার পরিচালনভার একটি সমিতির উপর ন্যস্ত

মানসী ও মর্ম্মবাণী



৺কৈলাসচন্দ্র বসু

হয়। বেঙ্গলী সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার মধ্যম অগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ, যদুলাল মল্লিক, কৈলাসচন্দ্র বসু, 'বেঙ্গলী'র ম্যানেজার বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এবং বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ডব্লিউ সি, বনার্জী (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) এই সমিতির সদস্য নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য সমিতির সদস্যগণ সকলেই ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতেই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৈলাসচন্দ্র মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সমিতিতে থাকিয়া এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিসভা। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র একটি ভীষণ শোকের আঘাত প্রাপ্ত হন। এই বৎসর ২০শে সেপ্টেম্বর দিবসে তাঁহার শৈশবের বন্ধু, সতীর্থ ও সুহৃচর, সাহিত্যসেবার সঙ্গী, অত্যাচারীর চিরশত্রু, অত্যাচারিতের চির-সহায়, 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বদেশ-প্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৪০ বৎসর বয়সে জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই দারুণ দুর্ঘটনায় দেশব্যাপী শোক উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু কৈলাসচন্দ্রের হৃদয় যে কিরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। 'বেঙ্গলী'তে তিনি গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু বিষয়ক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐ বৎসর ১৬ই নভেম্বর দিবসে বাঙ্গালার জননায়কগণ গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য এক বিরাট স্মৃতিসভা আহ্বান করেন। শোভাবাজারের সুবিদ্বান রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই শোক সভায় যোগদান করেন। রাজা (পরে মহারাজা সার) নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কৈলাসচন্দ্র বসু, অধ্যাপক এস্, লব্, মৌলবী (পরে নবাব) আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত, ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ পত্রের প্রথম সম্পাদক মিষ্টার জেম্‌স্ উইলসন, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। এই সভায় কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতাটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। সকল সংবাদ পত্রে এই বক্তৃতাটী প্রশংসিত হইয়াছিল। আমরা এই বক্তৃতাটির ও* কয়েক স্থানের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

"রাজা কালীকৃষ্ণ এবং ভদ্র মহোদয়গণ—

যে মহৎ বিষয়ের আলোচনার জন্য আমরা এইস্থানে সমবেত হইয়াছি তাহার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, আমি সে আলোচনায় যথাযথভাবে যোগদান করিতে পারিব কিনা আমার মনে এই আশঙ্কা উদিত হইতেছে;—কারণ প্রথমতঃ যে পরলোকগত মহাত্মার সদ্গুণাবলী আজ আমরা কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তিনি আমার একজন প্রিয়তম ও স্নেহময় বন্ধু ছিলেন। শৈশবে আমাদের বন্ধুত্বের সূচনা হয় এবং তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। * * * এই ভীষণ ঘটনায় আমি একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি এবং আমার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই আমার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমাকে পালন করিতেই হইবে, এবং অতি ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণভাবে উহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইলেও আমি আপনাদিগের নিকট কয়েক মুহূর্ত্তের সময় ভিক্ষা করিতেছি। মহাশয়, এই সভায় উচ্চতম উপাধিভূষিত রাজা মহারাজা হইতে আফিসের নিম্নতম পদস্থ কেরাণী পর্য্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছেন—ইহা যে নিগূঢ় ভাবের সূচনা করিতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করা অসম্ভব। ইহাতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছে যে, পূর্ব্বের ন্যায় হিন্দুসমাজ এখন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা, জাতীয় অভিমান, ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব ও বংশাভিমান দ্বারা কলুষিত নহে, এক সৌভ্রাত্রবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি স্নেহ ও প্রীতিভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইহা আনন্দের বিষয় যে আভিজাত্য গর্ব্ব আজ এতদূর হ্রাস পাইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান সময়ের একটি আশাপূর্ণ ও আনন্দদায়ক লক্ষণ। যে শিক্ষা দেশের ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বিনষ্ট করিয়া দেয়, যে শিক্ষা সকল গর্ব্ব ও অভিমান বিদূরিত করিয়া দেয়, ইহা নিঃসন্দেহ সেই শিক্ষারই ফল।

* মূল ইংরাজী সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি মৎপ্রকাশিত "Life of Grish Chunder Ghose, the Founder and First editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee" নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

স্মুতরাং আমি পুনরায় বলি, এই সভা দেশের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির পরিচায়ক। যিনি ঐশ্বর্য্য বা পদগৌরবে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র ছিলেন না অথচ যিনি নিজ চরিত্রের মহত্ত্ব দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিনের জন্ত অঙ্কিত করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন, এরূপ একজন সাধারণ ব্যক্তির স্মৃতিসভায় যে সকল রাজা জমীদার ও ক্রোরপতি উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা গণনা করিলেই আমাদের দেশ যে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিয়া তাঁহারা নিজেরাই সম্মানিত হইয়াছেন।

* * *

"যিনি একদিনের জন্তও বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আনন্দের সহিত স্বীকার করিবেন যে তিনি সরল ও অকপট স্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। * * * আন্তরিকতা বাবু গিরিশচন্দ্রের কোমল হৃদয়ের চিরসঙ্গী ছিল এবং যাহা তাঁহার হৃদয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইত বা যাহাতে পরে অনুতাপ আসিতে পারে এরূপ কার্য্য তিনি কখনও করেন নাই। তিনি অনেক সাংসারিক বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, অনেক পারিবারিক দুর্ঘটনায় ব্যথা পাইয়াছিলেন, বাধ্য হইয়া মামলা মোকদ্দমায় অজস্র অর্থব্যয় করিয়া দারিদ্র্যে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র চিরদিন সাধু ও সারল্য মণ্ডিত ছিল। তাঁহার নৈতিক চরিত্র সর্ব্ববিষয়ে আদর্শস্থানীয় ছিল। তিনি ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন এবং সেই জন্ত দরিদ্রপালনে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইত। যদিও তিনি স্বয়ং দরিদ্র ছিলেন তথাপি তাঁহার সেই স্বল্প আয় অভাবগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সহিত ভাগ করিয়া লইতেন। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে বেলুড়ের অনেক বিধবা ও অনাথা বালক বালিকা তাঁহার সাহায্যে প্রাণধারণ করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় এবং তাঁহারই মুক্তহস্ত দানে তাহার বন্ধু ও সহযোগী স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বসতবাটী নীলাম হইতে রক্ষা পায়। তিনি দরিদ্রের বন্ধু বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং চিরদিন দরিদ্রের বন্ধু বলিয়া স্মরণীয় থাকিবেন। গত মহাঝটিকায় বেলুড় এবং তৎসন্নিহিত গ্রাম সমুহের সর্ব্বনাশ হয়। সেই সময় তিনি প্রাতঃকালে স্বয়ং পদব্রজে গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া সাহায্য-ভাণ্ডার হইতে এবং স্বীয় ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া গ্রামবাসীর অভাব মোচন করিয়াছিলেন।

"যাঁহাদের সহিত তিনি সংস্রবে আসিতেন তাহাদের সকলের প্রতি শিষ্ট ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল। তাহার জীবনে তিনি কখনও কাহারও প্রতি অন্যায় আচরণ করেন নাই। এরূপ ব্যবহার তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পক্ষান্তরে অপরিচিতকে মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিচিত এবং পরিচিতকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বন্ধুরূপে পরিণত করিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। পরিচিত বা অপরিচিত যে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতেন তিনিই তাহার নিকট সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু দরিদ্র ও নিরাশ্রয়ের প্রতিই তাহার গভীরতম সহানুভূতি ছিল এবং প্রজাপক্ষ সমর্থনই তাহার জীবনের ব্রত ছিল। * * *

"বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বয়ং একজন আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা এবং ধর্ম্মজ্ঞানের এরূপ সামঞ্জস্য ছিল যে তাহার কার্য্যে কোনও প্রকার অসংযম বা কপটতার চিহ্ন দেখা যাইত না। তিনি প্রখর কল্পনা-শক্তির অধিকারী ছিলেন কিন্তু এই শক্তি সর্ব্বদাই বিবেক-দ্বারা সংযত হওয়ায়, তিনি তাহার শক্তিশালী লেখনী অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি পরের দুঃখ তীব্রভাবে অনুভব করিতেন, সেই জন্ত তাঁহার ভাষাও ওজস্বিনী ছিল। "কিন্তু তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে বিদ্বেষের লেশ থাকিত না। কোনও ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ বা ঈর্ষার ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি আততায়ীর প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই ক্ষমতা তিনি অভ্যাস দ্বারা অর্জ্জন করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল না।

"তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন এবং তাঁহার রচনাবলী অতুলনীয় ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ। আমাদের মধ্যে এমন অনেক নবীন ব্যক্তি আছেন যাঁহাদিগকে তিনি নিজ রচনাপদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা এক্ষণে ইঁহাদের প্রতিভাশালী গুরুর সমকক্ষ হইবার আশায় তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত আছেন। বাস্তবিক তিনি অনেককেই বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার শেষজীবন তিনি বেলুড় নামক ক্ষুদ্র গ্রামের—যেখানে তিনি ইদানীং বাস করিতেছিলেন সেই গ্রামের—সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

"অতএব যে দিক্ হইতে দেখি, তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা কিছুতেই পূরণ হইবার নহে। একজন সাধু ধর্ম্মপ্রাণ, উদার, দেশহিতৈষী, শান্তস্বভাব, অকপট-হৃদয় পরদুঃখকাতর, সৎসাহস-সম্পন্ন, তীক্ষ্ণপ্রতিভাশালী, ভাবুক ও স্বাধীনচেতা কর্ম্মবীর দেশ হইতে অপসৃত হইলেন। দেশের

সেবা করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার অকাল-মৃত্যু জাতীয় দুর্ভাগ্যের বিষয়।" * * *

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য যে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়, কৈলাসচন্দ্র তাহার অন্যতম সম্পাদক হন। তাঁহার চেষ্টায় এই স্মৃতিসমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থদ্বারা গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাস্থান ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে একটি ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

পরলোক গমন। চরিত্র। কৈলাসচন্দ্রের স্বাস্থ্য বরাবর অটুট ছিল। তিনি দীর্ঘকাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন কিন্তু কখনও ছুটী লন নাই। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে এবং তিনি তিন মাস ছুটী লইতে বাধ্য হন। এই বৎসর ১৮ই আগষ্ট দিবসে বৃদ্ধা জননী, শোকাকুলা সহধর্ম্মিণী এবং অসংখ্য আত্মীয় ও বন্ধুগণকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কৈলাসচন্দ্র ৫১ বৎসর বয়সে অকালে পরলোক গমন করেন।

কৈলাসচন্দ্র দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তিনি অমায়িক, মিষ্টভাষী, নির্ম্মল চরিত্র, বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। কৈলাসচন্দ্রের জননীও যেরূপ বুদ্ধিমতী সেইরূপ করুণ-হৃদয়া রমণী ছিলেন। জননীর আদেশ কৈলাসচন্দ্রের নিকট বেদবাক্য ছিল। আমরা একটি ঘটনার কথা শুনিয়াছি,তাহাতে একদিকে যেমন কৈলাসচন্দ্রের মাতৃ-ভক্তির, অপরদিকে তেমনই তাঁহার জননীর উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে ঘটনাটি এই—সহকারী কণ্ট্রোলার জেনারেলের পদে উন্নীত হইবার পর একদিন কৈলাসচন্দ্রের জননী তাঁহাকে বলিলেন, "কৈলাস, এবার তুমি প্রথম যে মাহিনা পাইবে তাহা, আমাকে দিতে হবে।" পরে ঐ পদের প্রথম বেতন পাইলে কৈলাস-চন্দ্র গাড়ী হইতে অবতরণ না করিয়া জননীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মা, আজ মাহিনা পাইয়াছি, টাকা কিসে লইবে?" জননী বলিলেন, "এই আঁচলে দাও।" তিনি তৎক্ষণাৎ ৮০০৲ টাকা তাঁহার আঁচলে ঢালিয়া দিলেন। বৃদ্ধা সেই সমস্ত টাকা পাড়ার গরীব দুঃখীদের ডাকিয়া বিতরণ করিয়া বলিলেন, "আমার ছেলের মাহিনা বাড়িয়াছে তোমরা আশীর্ব্বাদ কর।"

তদানীন্তন প্রথানুসারে বাল্যকালেই শ্যামবাজার ষ্ট্রীট নিবাসী (এক্ষণে ছাপরার প্রবীণ উকীল) শ্রীযুক্ত যদুনাথ মিত্র মহাশয়ের ভগ্নীর সহিত কৈলাসচন্দ্র পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার দাম্পত্য জীবন অতি মধুময় ছিল। কিন্তু তাঁহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার সহোদর যদুনাথ বসু মহাশয়ের পুত্রদেরই তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। আর একজন বালক কৈলাসচন্দ্রের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত—তাঁহার খুল্লতাত নন্দলাল বাবুর দৌহিত্র। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিনবিহারী এবং ভাগিনেয় নরেন্দ্র-নাথ দত্ত ভবিষ্যতে যশস্বী হইবেন, দূরদর্শী কৈলাসচন্দ্র এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া জগতের ইতিহাসে তাঁহার উচ্চ-হৃদয়ের ও গভীর জ্ঞানের নিদর্শন রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। বিপিনবিহারী ভারত-গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে কার্য্য করিতেন, এবং ইংরাজীতেও কৃতবিদ্য ছিলেন কিন্তু জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তিনি অকালে পরলোকে গমন করিয়াছেন।

কৈলাসচন্দ্র বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অনেক দরিদ্রসন্তানকে অন্নদান এবং বিদ্যালয়ের বেতন ও পুস্তকাদি প্রদান করিতেন। একজন দরিদ্র সন্তান তাঁহারই সাহায্যে বি-এ পাশ করিয়া তাঁহাকে বলেন, "আমি আপনারই কৃপায় কৃতবিদ্য ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছি, এক্ষণে আপনার কোনও উপকার করিতে পারি?" তদুত্তরে তিনি বলেন, "তুমি নিজে যেমন কৃতবিদ্য হইয়াছ সেইরূপ চারিটি দরিদ্র সন্তান যাহাতে তোমার মত কৃতবিদ্য হয় তাহাই কর।"—বলা বাহুল্য, সেই কৃতবিদ্য ব্যক্তি কোনও কলেজের অধ্যাপক হইয়া তিন চারিজন দরিদ্রসন্তানকে আপনার বাটীতে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। সদ্‌গুণ সর্ব্বত্রই সদ্‌গুণের উত্তেজক।

কৈলাসচন্দ্র ইংরাজীতে সুলেখক ও বাগ্মী বলিয়া

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি মধুর ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া সর্ব্বজনপ্রশংসিত হইত। সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন, "In the early years of his life, he (Koylas Chandra) acquired the deserving reputation of being one of the sweetest and most fluent public speakers of the time." কৈলাসচন্দ্র ইংরাজীতে একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বিন্দুমাত্র পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল না।

কৈলাসচন্দ্র অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈষী ছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কিন্তু স্বজাতির উন্নতির জন্য তিনি অন্ধভাবে দেশাচারের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কারের তিনি একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি সকল বিষয়ে দেশের ও সমাজের গৌরবের বিষয়। তাঁহার স্মৃতি দেশবাসীর শ্রদ্ধার সহিত পূজনীয়। আজ, তাঁহার মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে এই অক্ষম লেখনী তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে লেখকের গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধার এই সামান্য অর্ঘ্য প্রদানের অবসর পাইয়া ধন্য হইল।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

স্পর্শমণি *

(উপন্যাস)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা।

দেবীনাথপুরের সুবিখ্যাত জমিদার রায় সাহেব রুদ্রকান্তের নাম কে না জানে? কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটে প্রকাণ্ড বাড়ীখানার জাঁকজমকে, চাকর-বাকরদের মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদে, আস্তাবলে অসংখ্য বহুমূল্য গাড়ী ঘোড়ায় ও সহিস কোচম্যানদের তকমা-আঁটা চামরবাঁধা জরিদার জমকালো উর্দ্দিতে অনেকের অন্তঃকরণেই তাঁহার অর্থ-স্বাচ্ছল্যের পরিমাণ-প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিত। ও জিনিষটার এমনি মোহিনী শক্তি যে, যাহার কোন প্রাপ্তি বা প্রাপ্তির আশা পর্য্যন্ত নাই সেও অহেতুকী ভক্তিতে একবার চাহিয়া দেখিতে বাধ্য হয়।

বাড়ীখানার বাহিরে ও ভিতরে কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সম্মুখভাগে কম্পাউণ্ড তাহা আবৃত করিয়া প্রকৃতিদত্ত সবুজের পুরু গালিচা পাতা। চারিধারে সুদৃশ্য রেলিংঘেরা, মাঝখানে বাগান। বাগানে দেশী বিলাতী, জানিত অজানিত, ফুল পাতার বিচিত্র বাহার; দেশীর অপেক্ষা বিলাতীরই আধিক্য। স্থানে স্থানে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত আসন-বেদিকা, কৃত্রিম প্রস্রবণ, শষ্পাবৃত কৃত্রিম শৈল, সুন্দর সুন্দর লতাকুঞ্জ এবং দুইধারে গাছের বর্ডার লাগান কঙ্করাবৃত পথ। পথের কোন কোন অংশে বৃত্তাকার, চতুষ্কোণ এবং অন্য নানা প্রকার জ্যামিতিক চিত্রের অনুকরণে গঠিত ভূখণ্ডে নানা জাতীয় সীজন্ ফ্লাওয়ারের বাহার। মর্ম্মরময়ী উড্ডীয়মানা অর্দ্ধনগ্না পরীমূর্ত্তিরও অভাব ছিল না।

রায় সাহেব রুদ্রকান্ত স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁহার

* এই উপন্যাসখানির প্রথম চারি পরিচ্ছেদ আষাঢ় ও শ্রাবণের মানসী ও মর্ম্মবাণীতে "সতীনাথ" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে লেখিকা মহাশয়ার অনুরোধে ঐ নামটি পরিবর্ত্তিত হইল।—সম্পাদক।

বিপুল অর্থ স্বোপার্জ্জিত। বাণিজ্য-লক্ষ্মী নিজ ধন-ভাণ্ডারের চাবি খুলিয়া এই ভক্ত সেবকটিকে দুইহাতে ধনরত্ন বিতরণে কৃপণতা করেন নাই। কয়লার খনি ও অভ্রের খনি হইতে তাঁহার মাসিক আয়ের পরিমাণ সাধারণের বিস্ময় উৎপাদনে সমর্থ হইলেও, যে কোন বড় ব্যবসাতেও তাঁহার নাম অ-জড়িত নহে। শুধু পশ্চিমাঞ্চলেই নয়—আমেরিকা, জাপান, জার্ম্মাণিতেও তাঁহার অর্থ বাণিজ্যে খাটিয়া থাকে।

কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। শৈশবে কৈশোরে ও যৌবনের প্রথমাংশে তাঁহাকে দুঃখ-দারিদ্র্য যথেষ্টই ভোগ করিতে হইয়াছিল। পিতার নিকট হইতে রুদ্রকান্ত উত্তরাধিকার-সূত্রে অসামান্য কৌলীন্য-খ্যাতি ও দৈহিক সৌন্দর্য্য ছাড়া অপর কোন সম্পত্তিই পান নাই।

কুলীনশ্রেষ্ঠ রুদ্রকান্তের পিতা ষষ্ঠীদাসের পৈত্রিক ভিটার সংবাদ কেহ জানিত না। কুলীন-কুমারের চিরন্তন অধিকারে মাতুল গৃহেই তাঁহার আজীবন বাস। কুলীনের কুল রক্ষা করাই ছিল তাঁহার একমাত্র পেশা। এ ব্যবসায়ে আয় বড় মন্দ ছিল না; বরং খরিদ্দার সংখ্যার আধিক্যে প্রাপ্য আদায়ের সময়াভাবই দৃষ্ট হইত। নদীপারের পথ ক্লেশ সহ্য করিয়া রাঢ় দেশে গিয়াও তিনি দুই একটি বিবাহ করিয়া আসিয়াছিলেন এইরূপ জনশ্রুতি ছিল।

কুলীন গৌরব ষষ্ঠীদাসের ষষ্টি সংখ্যক পত্নী গ্রহণের পর কোন রসিক পুরুষ তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'ষেটের ষষ্ঠীদাস'। এই নামকরণই তাঁহার পক্ষে কাল হইয়াছিল। এই জন্যই বলে শূন্য সংখ্যা রাখিতে নাই। ষেটের ষষ্ঠীদাসের শূন্যের ঘরে এক বসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মহাপ্রস্থানের ডাক আসিল। পরলোকগতা অনূঢ়া কুলীন কন্যাদের জন্য সেখান হইতে আবেদন পত্র আসিয়াছিল কিনা জানা যায় নাই কিন্তু বাক্‌শক্তিহীন হওয়ায় ও সময়াভাবে ইহলোকের দুইটি বাগ্‌দত্তা কুমারীকে আজীবন কৌমারীত্বই গ্রহণ করিতে হইল—ইহাঁদের পাণ্ডীঘর আর মিলিল না। সেই একমাত্র মহাপুরুষের মৃত্যুতে ষষ্টি সংখ্যক বৃদ্ধা প্রৌঢ়া যুবতী কিশোরী ও শিশু হিন্দুনারী একাদশী ব্রত-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার সম্যক সুযোগ পাইয়াছিলেন।

'ষেটের ষষ্ঠী দাসে'র একতমা পত্নী দ্রবময়ী দেবী রুদ্রকান্তের জননী।

মামার বাড়ীতেই রুদ্রকান্ত নিজ বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছিল। সে সময়, তাহার ন্যায় দুষ্ট ছেলে সে গ্রামে ত ছিলই না, সে অঞ্চলে ছিল কিনা সন্দেহ।

রুদ্রকান্তের ষোড়শ বর্ষ বয়স হইলে, একদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" উচ্চারণের সহিত দ্রবময়ীর জীবনের খেলা সাঙ্গ হইয়া গেল।

মাতৃবিয়োগের পর কিছুদিন রুদ্রকান্ত শান্ত হইয়া রহিল বটে, কিন্তু আবার পূর্ব্বস্বভাব প্রাপ্ত হইল। তাহার মাতুল ও মাতুলানীরা তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে, একদিন রুদ্রকান্ত গৃহ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

তখনও রেলপথ বহুদূর বিস্তৃত হয় নাই। কেমন করিয়া কপর্দ্দকহীন রুদ্রকান্ত গ্র্যাণ্ডট্রঙ্ক রোড ধরিয়া চলিতে চলিতে, কখনও ভিক্ষা করিয়া কখনও অতিথিশালায় খাইয়া, বহুদিন বহু অবস্থান্তরের পর বিন্ধ্যাচলে আসিয়া পৌঁছিল, এবং ক্রমে দ্বিতীয় কাবুলযুদ্ধের শেষাবস্থায় কমিসেরিয়েটের এক সাহেবের সুনজরে পড়িয়া সৈন্যদলের রসদ যোগাইবার চাকরি পাইয়া, সে কার্য্যে বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়া যুদ্ধাবসানে পেশোয়ারে বসবাস করিতে লাগিল এবং উপার্জ্জিত অর্থরাশি ব্যবসায়ে খাটাইয়া বৎসরের পর বৎসর একান্ত অধ্যবসায়ে মহাধনী হইয়া উঠিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজনীয়।

অর্থ ও যশ যখন রুদ্রকান্তের গলায় বরমাল্য পরাইয়া দিল, তখন হইতেই এই দুইটির স্পৃহা তাঁহার কমিয়া গেল। মানুষ যতক্ষণ না পায় ততক্ষণই তাহার পাইবার ব্যাকুলতা। আশা পূর্ণ হইলে অবসাদ অবশ্যম্ভাবী, তখন আর প্রাপ্তের প্রতি অনুরাগ থাকে না, অপ্রাপ্তের জন্যই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। সুখ

কিসে ? পাওয়ায় অথবা পাইবার আশায় ? অর্থ যশ ও সম্মানের উচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত হইয়াও রুদ্রকান্তের মনে সুখ ছিল না, প্রাণে শান্তি ছিল না। সুখের আশায় অসার আনন্দে ডুব দিয়া রুদ্রকান্ত দেখিলেন, তাহাতে ক্ষুধা মেটে না, তৃষ্ণা বাড়ে। তৃপ্তি নাই, অবসাদ আছে। যৌবনের অদম্য উৎসাহে তিনি যখন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন তখন সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়াছিলেন। সে সাধনা বৃথা হয় নাই, তপস্যায় সিদ্ধি মিলিয়াছে। কিন্তু জীবন-মধ্যাহ্নে তপ্ত-আকাশের তেজ সহিবার যে শক্তি ছিল, এখন তাহা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। এখন ক্লান্ত মন একটু স্নিগ্ধ ছায়া একটু শান্তির স্পর্শের জন্য ব্যাকুল। বাসনার বহ্নি রুদ্রতেজে জ্বলিয়া দাহিকা শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। মন তাই নূতন ভুলিয়া পুরাতনের জন্য—দেশের জন্য—ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সুখ দুঃখ আশা তৃষ্ণা, শৈশবের কৈশোরের কত মধুময় স্মৃতি এখনও বুঝি সেখানকার পথের ধূলায় ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, খুঁজিলে মিলিবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল, সত্যই কি মিলিবে ? যাহাদের ছাড়িয়া আসিয়াছেন, তাহারা এখনও তাঁহার প্রত্যাগমনের পথ চাহিয়া কি বসিয়া আছে ?

জীবনের পথে চলিতে গিয়া প্রথমেই রুদ্রকান্ত ভুল করিয়াছিলেন। তিনি ভাগ্যদেবীর বরপুত্র, সুতরাং সেই সুদূর পেশোয়ারেও প্রজাপতির আয়োজনে শিথিলতা দেখা যায় নাই। প্রবাসী বাঙ্গালী অনেকেই তাঁহাকে জীবন-সঙ্গিনী নির্ব্বাচনে অনুরোধও করিয়াছিলেন। রুদ্রকান্ত তখন স্বাধীন-জীবনের কল্পনায় সে সব অনুরোধ হাসিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, বিবাহের বেড়ী পায়ে দিয়া কেন নিজেকে অধীন করিয়া ফেলিব, এ বেশ আছি।—ক্রমে এই জীবনই অভ্যস্ত হইয়া গেল, বিবাহের কথা আর মনেও পড়িত না। কিন্তু জীবনের অপরাহ্নে যখন শূন্য ঘরের পানে ফিরিয়া চাহিলেন, তখন হৃদয় যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। সেখানে আদেশ-পালক ভৃত্য আছে, সুখের সহচর বন্ধু আছে, উপদেষ্টা সুহৃৎও হয়ত থাকিতে পারে, কিন্তু আপন বলিয়া বুকে টানিবার, শান্তি দিবার, তৃপ্তি দিবার, কর্ম্মক্লান্তি জুড়াইয়া দিবার প্রিয়জন নাই। তাই ক্রমে ব্যবসায় কতক গুটাইয়া, কতক সুবন্দোবস্ত করিয়া ক্রোরপতি রুদ্রকান্ত আবার একদিন তাঁহার জননী জন্মভূমির স্নেহের অঙ্কে ফিরিয়া আসিলেন। সে জননী তখন বৃদ্ধা, জীর্ণা শীর্ণা, কঙ্কালাবশিষ্টা, ম্যালেরিয়া বিষে জর্জ্জরিতা হইয়া গিয়াছেন। এ মাকে দেখিয়া রুদ্রকান্তের সেই শস্য-শ্যামলা পত্র-পুষ্পাভরণা লীলা মাধুর্য্য-মণ্ডিতা কমলদল খচিতা শৈশবের সেই আনন্দদায়িনী মা বলিয়া যেন মনে পড়িল না। পল্লী-জননী আজ রূপান্তরিতা হইয়া গিয়াছেন।

রুদ্রকান্ত যাহাদের ফেলিয়া গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আর তাহাদের দেখিতে পাইলেন না। শৈশবের খেলা-ধূলার সাথী হরকুমার ও নবকুমার—মামাতো ভাই দুইটির মৃত্যু হইয়াছে, মাতুলানীও স্বর্গগতা। পুরাতনের স্থান লইয়া এখন নূতন লোক সেখানে অধিকার স্থাপন করিয়াছে। হরকুমার ও নবকুমারের বিধবাদ্বয় কয়েকটি ছেলেমেয়ে লইয়া জীর্ণ ঘরে কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া বাস করিয়া আছেন। এ বধূ দুইটিই রুদ্র-কান্তের অপরিচিতা ; ছেলেমেয়েগুলিও ততোধিক। রুদ্রকান্তকে তাহারা কেমন করিয়া চিনিবে ? হরকুমারের পত্নী, স্বামী ও শাশুড়ীর কাছে রুদ্রকান্তের গল্প শুনিয়াছিলেন ; সে রাগ করিয়া দেশত্যাগী হইয়া গিয়াছে এই পর্য্যন্তই জানা ছিল। সেই রুদ্রকান্ত যখন লোক লস্কর সঙ্গে আসিয়া পৌছিলেন তখন বিস্ময়ে সম্ভ্রমে আনন্দে ক্ষুদ্র পল্লী তোলপাড় হইয়া উঠিল। দেশে নবীনদের অনেকেই অন্তর্হিত হইলেও, শিকড় বাহির করা জীর্ণ বটগাছের মত প্রাচীনদের এখনও কয়েকজনকে দেখিতে পাওয়া গেল। তাঁহারাও ম্যালেরিয়া-জীর্ণ, প্রতিদিন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। রুদ্রকান্তকে চিনিয়া তাঁহারাই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। রায়-পুকুরের তীরে দাঁড়াইয়া শৈবালাচ্ছন্ন পানাভরা পঙ্কিল পুষ্করিণীর সবুজ জলের

পানে চাহিয়া রুদ্রকান্তের মনে হইল, জল নাড়া দিয়া অতীতের সেই সব সুখের স্মৃতিগুলা আবার খুজিয়া পাওয়া যায় কি? রুদ্রকান্ত নবকুমারের রোগ-জীর্ণ প্লীহা লিবারে স্ফীতোদর অশিক্ষিত অপরিচ্ছন্ন অপরি-পুষ্ট ছেলেমেয়েগুলিকে, মনের সঙ্গে না পারিলেও, নিজের কাছে টানিতে চেষ্টা করিলেন। বসন ভূষণের অভাব ঘুচাইয়া অনেকখানি চেহারা বাহির করিতেও সক্ষম হইলেন। তবু এক গাছের শাখা ভাঙ্গিয়া অন্য গাছে জোড়া দিলেও যেমন অল্প দিনেই তাহার শুষ্কমূর্ত্তি স্পষ্ট হইয়া উঠে, রুদ্রকান্তের কাছে ইহারাও তেমনি ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া উঠিতেছিল। ভিতরের ব্যাপার কতটুকু কৃত্রিম এ তত্ত্ব বুঝিতে শিশু-প্রকৃতি অদ্বিতীয়। রুদ্রকান্তের স্নেহ তাই তাহারাও মন খুলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না।

পল্লীগ্রামের অনাড়ম্বর শান্ত জীবন রুদ্রকান্তের বেশী দিন ভাল লাগিল না। কলিকাতায় আসিয়া বাড়ী কিনিয়া বাস করিলেন। আসিবার সময় নব-কুমারের বড় ছেলেটিকে সঙ্গে আনিলেন। ছেলে আসিতে ভয় পাইতেছিল, মা বুঝাইলেন, "জেঠার মন যুগিয়ে ভাল করে চল্‌তে পার্‌লে তোরই সব, একটা রাজার ঐশ্বর্য্যি তোর জেঠার, কেন দুঃখে মর্‌বি, সঙ্গে যা।" ছেলে মুরারি এ কথার পর আর কোন আপত্তি করিল না। রুদ্রকান্ত তাহাকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া বাড়ীতে মাষ্টার রাখিয়া বিদ্বান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিলেন সে আশা দুরাশা। স্কুল পলাইয়া ঘুড়ি উড়াইয়া ছোট-লোকের দলে মিশিয়া আড্ডা দিবার দিকেই তাহার লোলুপ দৃষ্টি। রুদ্রকান্তকে সে ভয় করে, ভক্তিও দেখায়, —কিন্তু ভালবাসে না।

কোপন-স্বভাব রুদ্রকান্ত একদিন শাসনের মাত্রা বর্দ্ধিত করায় মুরারি কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়া গেল, সারাদিন তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময় একটা বারোয়ারীর যাত্রাস্থল হইতে চাকরেরা তাহাকে ধরিয়া আনিল। মুরারি পথে অনেক বাধা দিয়াছিল, তাহার বড়লোকের পোষ্যপুত্র হইবার প্রয়োজন নাই বলিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইবার যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছিল কিন্তু পালোয়ান গিরিধারী লালের হাত ছাড়াইতে পারে নাই। রুদ্র-কান্তের সম্মুখে যখন তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, সে ভিজা বিড়ালটির মত একান্ত নিরীহ ভাবে মুখ নিচু করিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণের তর্জ্জন গর্জ্জনের চিহ্নমাত্র ছিল না। যেন অত্যন্ত সুবোধ, বড়ই বাধ্য, বিনীত। রুদ্রকান্ত একবার মুখ তুলিয়া দেখিয়া, সংবাদ-পত্র পড়িতে লাগিলেন। কোন কথাই বলিলেন না। মুরারি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। রুদ্রকান্ত মনে করিয়া-ছিলেন শাসনের অপেক্ষা এই মৌন তিরস্কারে হয়ত অধিক ফল হইবে। মুরারি ছাড়া পাইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলে রুদ্রকান্ত বুঝিলেন, অভিমানেরও পাত্রাপাত্র আছে।

ইহার কিছুকাল পরে কয়লার খনি সম্বন্ধে এক মোকর্দ্দমা উপলক্ষে একদিন বর্দ্ধমানে গিয়া তাঁহার উকীল বন্ধু মন্মথ বাবুর নিকট কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিলেন, নিকটেই এক গ্রামে তাঁহার পিতার একটি বিবাহ ছিল, তথায় তাঁহার দুইটি পিতৃমাতৃহীন ভাইপো বর্ত্তমান।—পরদিন বন্ধুকে লইয়া রুদ্রকান্ত তাহাদের সন্ধানে বাহির হইলেন।

গ্রামে পৌঁছিয়া একখানা জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রুদ্রকান্ত যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি মুগ্ধ হইলেন।

রান্নাঘরের বাহিরে গোবর মাটী নিকান দাওয়ায় বসিয়া একজন প্রৌঢ়া নারী কড়ায় করিয়া দুধ জ্বাল দিতেছিলেন। তাঁহারই অল্প দূরে ছিন্ন মাদুরের উপর দাঁড়াইয়া গৌরতনু কোমলকান্তি তরুণ মহাদেবের মূর্ত্তি বার তের বছরের একটী বালক, একটি জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুদ্রকায় শিশুকে দোলাইয়া সুর করিয়া পাঠ্য পুস্তকের কবিতা আবৃত্তি করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত ক্ষুধাতুর শিশু কবিতার মর্ম্ম না বুঝিয়া কেবলি কাঁদিতেছিল। অপরিচিত

রুদ্রকান্ত ও পরিচিত গ্রাম সম্পর্কীয় মন্মথ কাকাকে দেখিয়া সে সবিস্ময়ে তাহার বড় বড় কালো চোখ দুটী রুদ্রকান্তের মুখের উপর স্থির করিতেই মন্মথ কহিলেন, "ইনি তোমার জেঠামশাই, তোমাদের দেখতে এসেছেন, এঁকে প্রণাম কর সতীনাথ।" সতীনাথ ক্রন্দনাতুর ভাইটিকে মাদুরে শোয়াইয়া রুদ্রকান্তের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। সেই মুহূর্ত্তেই রুদ্রকান্তের মনে হইল, আজিকার প্রণামই যেন তাঁহার জীবনের প্রথম প্রণাম পাওয়া। একরাশি কুন্দফুলের মত অনাবৃত-গাত্র সতীনাথের সঙ্কুচিত দেহ দুই হাতে ধরিয়া বুকে চাপিতেই যেন তাঁহার তৃষিত অন্তরের দাহ-তাপ জুড়াইয়া শরীর শীতল হইয়া গেল।

সতীনাথ কখনও জেঠামশায়কে দেখা দূরে থাকুক, নামও শুনে নাই, তবু তাঁহার স্নেহের স্পর্শটুকু সে তাহার শোকাতুর অন্তঃকরণের ভিতর অনুভব করিতে লাগিল। অপরিচিত ভদ্রলোকটীকে দেখিয়া সতীনাথের পিসীমা মাথায় একটু কাপড় টানিয়া দিয়া রান্নাঘরের ভিতর চলিয়া গিয়াছিলেন। রুদ্রকান্ত সতীনাথের জেঠামশায় শুনিয়া ভ্রাতৃসম্বন্ধের দাবী থাকায় তিনি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রুদ্রকান্ত কহিলেন, "আজ বিকেলের গাড়ীতে এদের আমি বাড়ী নিয়ে যাব দিদি। আপনাকেও সঙ্গে যেতে হবে। আমার ঘরে ত মেয়ে ছেলে নেই, কচি বাচ্চা মানুষ করবার ভার তাঁরা আপনাকে দিয়ে গেছেন, আপনি ত ফেল্‌তে পারবেন না।"

রুদ্রকান্ত এমন ভাবে কথা পাড়িলেন ও উপসংহার করিলেন যে দাক্ষায়ণী মনে যাই হোক্ মুখেও একবার লোক দেখান "সে কি হয়, আমি কি করে যাই" বলিতে সময় পাইলেন না। সংসারে তাঁহার নিজের বলিবার বন্ধন সবই কাটিয়া ছিঁড়িয়া ফুরাইয়া গিয়াছে, কাজেই মৌনে সম্মতি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন।

মন্মথ কহিল, "বাড়ী ঘরের ব্যবস্থা তা হলে কি রকম করা হবে?" রুদ্রকান্ত হাসিয়া কহিলেন, "সতীনাথের পৈত্রিক ভিটা বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে বৈ কি। গিয়েই টাকা পাঠিয়ে দেব, সংস্কার করিয়ো। কেউ বাস কর্‌তে চায় বাস কর্‌বে, ভাড়া টাড়া দিতে হবে না। সন্ধ্যের আলো পড়্‌বে তা হলেই হলো।"

সতীনাথ, সুধীর ও তাহাদের পিসীমাকে লইয়া রুদ্রকান্ত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। মনে হইল এতদিনে তাঁহার অর্থ সঞ্চয়, বিপুল ব্যয়ে উদ্যান অট্টালিকা নির্ম্মাণ, সমস্তই সার্থক হইয়াছে।

সেই বারো বছরের সুন্দর ছেলেটীর ভিতর এমন কি ছিল বলা যায় না, যাহাতে রুদ্রকান্তের প্রকৃতিও পিতৃবৎ স্নেহকোমল হইয়া উঠিল। স্নেহ প্রেম ভালবাসা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তিগুলাকে তিনি চিরদিন নারী-ভূষণ আখ্যা দিয়া ঠাট্টাই করিয়া আসিয়াছেন। তবু এই অনাস্বাদিত স্নেহের শিকল পায়ে পরিবার সময় তাঁহার ভারবোধ হইল না, অনুতাপ আসিল না। সতীনাথকে রুদ্রকান্ত সত্যই ভাল বাসিয়াছিলেন।

অবশ্য সতীনাথকে ভালবাসিয়া তাঁহার মেজাজ যে একবারে বদল হইয়া গিয়াছিল এমন নয়—শুধু একটা নিদ্রিত বৃত্তি জাগিয়াছিল মাত্র। বয়সের সঙ্গে রুক্ষতার ঝাঁজ রুদ্রকান্তের বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সতীনাথের ছোট ভাই সুধীর বিশেষ করিয়া রুদ্রকান্তের চক্ষুশূলই হইয়াছিল। মাতৃস্তন্য বঞ্চিত রুগ্ন শীর্ণকায় শিশুর ক্রন্দনে অনেক সময় তাঁহার ইচ্ছা হইত, পা দুইটা ধরিয়া মাটীতে আছাড় দিয়া তাহার মাতৃহীন জীবন শেষ করিয়া দেন। আর সেই অদম্য প্রলোভনটাকে দমন করিবার জন্য মুখে তিনি অবিশ্রাম গর্জ্জন করিতেন। তাঁহার উপর শত্রুতা সাধনের জন্যই যে তাহাদের জননী নিজ অকাল মৃত্যু ঘটাইয়াছে সে বিষয়ে রুদ্রকান্তের সংশয় না থাকায়, মৃতাও সে মিষ্ট আপ্যায়নে বঞ্চিত থাকিত না। কেবল সতীনাথের পিতার 'পরে তাঁহার কোন আক্রোশ ছিল না। বাড়ীর লোকে প্রাণপণে তাঁহার মন যোগাইয়াও অকারণ গালি হইতে নিস্কৃতি পাইত না। কেবল সতীনাথই সে সব ঝড় ঝাপটার হাত হইতে

এড়াইয়া যাইত। এই অসম পক্ষপাতিতার ফল সতীনাথের পক্ষে বড় মঙ্গলের হয় নাই।

রুদ্রকান্তের পক্ষপাতিতায় সবচেয়ে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল মুরারি। আর, বোধ হয় সে জন্য তাহাকে খুব বেশী অপরাধীও করা যায় না। শৈশবে মাতুল গৃহে পালিত রুদ্রকান্তের যখন পিতৃগৃহের সহিত কোনও পরিচয় ছিল না, তখন এক মাত্র আত্মীয় ছিল এই মুরারির পিতা। তখন কোথায় ছিল তাহার কুলীন পিতা এবং কোথায় ছিল এই সব উড়িয়া আসা বৈমাত্রেয় সংসার! স্নেহের দাবী আত্মীয়তার দাবী অন্নের ঋণ—সে সব কিছুই নয়, এখন আপন হইল বৈমাত্রেয় ভায়ের ছেলে? এ অবিচার ভগবান যে কেমন করিয়া সহিয়া থাকিলেন তাহা মুরারির বোধগম্য না হইলেও, সে যে নিজে সহিতে অসমর্থ, এটুকু ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল। একটা মেয়েলি কথা আছে, "যে এল চষে সে থাক বসে, যে এল হাত নেড়ে তারে দেও ভাত বেড়ে"—এ যেন তেমনি বিচার হইল। জন জামাই ভাগিনেয় যে কখনও আপনার হয় না, অকৃতজ্ঞ রুদ্রকান্তই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আপনার পল্লীবাসে দরিদ্র কুটীরে সে ত সুখেই ছিল; যদি সতীনাথের 'পরেই এতখানি টান, তবে তাহাকে সেখান হইতে খুঁজিয়া আনিয়া প্রলোভনে ভুলাইবার প্রয়োজন কি ছিল? ভবিষ্যৎ উত্তরাধীকারিত্বের আশা স্পষ্টতঃ রুদ্রকান্ত কখনও তাহাকে না দিন, তাঁহার কৌমার-জীবন স্বতঃই মুরারির মনে এই আশা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহার লোভাতুরা মাতাও এই আশাতেই স্বেচ্ছায় তাহাকে রুদ্রকান্তের অনুবর্ত্তী করিয়া দিয়াছিলেন। অকৃতজ্ঞ রুদ্রকান্ত নিজ শৈশব জীবন বিস্মরণ হইলেও তাহারা ত ভুলিতে পারে না!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কল্যাণী।

কয়েক বৎসর কাটিল। অসাধারণ মেধা ও অদম্য উৎসাহের বলে, সতীনাথ ২২ বৎসর বয়সে মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম-বি উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। চিকিৎসা-ব্যবসায় করিবার তাহার কোনই প্রয়োজন নাই। সে বাড়ীতেই বসিয়া থাকে এবং সুদীর্ঘ অবসর কাল নানা শাস্ত্র চর্চ্চায় অতিবাহিত করে।

ঘড়ির কাঁটার সহিত সমতা রাখিয়া প্রতিদিন বেলা দশটার সময় সতীনাথকে তাহার দ্বিতলের পাঠগৃহের রাস্তার ধারের জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যাইতে লাগিল। কোনদিন তাহার হাতে একখানা পাতা-খোলা পুস্তক, কোনদিন কিছু না-ও থাকিত। অফিস কলেজের সময় পথে গাড়ী চলার অন্ত নাই; তবু যতক্ষণ একখানা বিশেষ গঠনের পরিচিত গাড়ী রাস্তার অপরপারের একখানা ছোট দ্বিতল বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া সেখানকার আরোহিণীটীকে লইয়া চলিয়া না যাইত, ততক্ষণ হাজার কাজ থাকিলেও সতীনাথের সে স্থান ছাড়িয়া যাইবার তাড়া দেখা যাইত না।

ঘটনা ক্রমে একদিন সেই বিদ্যার্থিনী মেয়েটীর দুটী কালো চোখের কোমল দৃষ্টি অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত রূপে সতীনাথের মুখে নিবদ্ধ হইল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গেল না। তারপর কেন যে সতীনাথ নিজেদের প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড বাড়ীখানায় যথেষ্ট আরামের স্থান না পাইয়া প্রতিবাসিনীর স্বল্পায়ত ভাঙ্গাচুরা ভাড়াটীয়া বাড়ীখানায় যাতায়াত আরম্ভ করিল এবং কেমন করিয়া তাঁহাদের চিত্তের মধ্যেও অনেকখানি স্থান করিয়া লইল তাহা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে কল্যাণীর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ৺নবীনমাধব মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নী তারাসুন্দরী তাঁহার একমাত্র মেয়েটিকে লইয়া ঐ ১৭ নম্বর ভাড়াটীয়া বাড়ীখানায় বাস করিতেন। কন্যা কল্যাণী বেথুন স্কুলের ছাত্রী। আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফলতার আশায় কঠোর অধ্যয়নে সে তাহার ক্ষীণ দেহ খানিকে ক্ষীণতর করিয়া তুলিতেছিল। সে স্বভাবতই ক্ষীণাঙ্গী, দেখিলে মনে হয় হাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া আছে,—জগতের এতটুকু ঝড়

সহা ত দূরের কথা, একটু জোরে বাতাস উঠিলেই বুঝি এখনই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তবু সে যে সুন্দরী, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিত না।

তারাসুন্দরীর স্বামী নবীনমাধব যখন নিজের সমাজ ও আত্মীয়দের ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার তরুণী পত্নী স্বামীর অনুগামিনী হইতে স্বীকৃতা হন নাই। নবীনমাধবের পিতা তখনও বর্ত্তমান এবং তারাসুন্দরী সন্তানসম্ভবা হিন্দু কুলবধূ। পুত্রের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সংবাদে বৃদ্ধ ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় ক্রোধে জ্বলন্ত অগ্নির মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিলেন। নবীনমাধব স্ত্রীকে কাছে লইয়া যাইতে চায় শুনিয়া সে অনলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। ক্রুদ্ধ পিতা জানাইয়া দিলেন, এই নূতন ধর্ম্মের সহিত নবীন তাহার আত্মীয় বন্ধু পত্নী এবং উত্তরাধিকারিত্ব হইতে চির নির্ব্বাসিত হইল। স্ত্রীর মুখে ও সেই একই ধরণের কথা, "সে যাইবে না"। সে কাঁদিয়া মুখ চোখ ফুলাইয়া ফেলিল, তবু স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইতে চাহিল না। বাপ পিতামহের ধর্ম্ম ছাড়িয়া সে খৃষ্টানী ধর্ম্ম লইতে পারিবে না। অভিমানে নবীনমাধব স্ত্রীর উপর জোর করিলেন না; বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

কন্যা কল্যাণীর জন্মের পর নবীনমাধব আর একবার স্ত্রীকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়া, হাল ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

প্রথমে তারাসুন্দরী শ্বশুরের ভয়ে ও পরিজনবর্গের বিরাগ সম্ভাবনায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইতে সাহস করেন নাই। কিন্তু দুঃখের দিনে তিনি যখন তাঁহার নিজের ইষ্টদেবতাকেই অবলম্বন করিতে শিখিলেন তখন অস্বীকার নিজের মনের কাছেও প্রবল হইয়া উঠিল। স্বামীর পথই যে তাঁহার পথ সে কথা তিন কিছুতেই আর মানিতে পারিলেন না। স্বামীই স্ত্রীর ঈশ্বর, কিন্তু তাঁরও যে ঈশ্বর আছেন! ধর্ম্ম কি ব্যবসায়ের জিনিষ, যে স্বামীর সাহচর্য্য লোভে সে ধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন? অথবা মনে অন্য ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখিয়া বাহিরে ভান দেখাইবেন? ভিন্নধর্ম্মী স্বামী স্ত্রীর যে একত্রবাস ও একাত্ম হওয়া সম্ভব নয় তাহা নবীনমাধবও অস্বীকার করিলেন না। তাই পিতার মৃত্যুর পর নবীনমাধব যখন শেষবার স্ত্রীর মত চাহিলেন, তখন তারাসুন্দরী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া সানুনয়ে অসম্মতি জানাইলেন—এ জন্মের মত স্বামীপূজা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। নিজের ধর্ম্ম আচার বিশ্বাস, ঐহিক সুখের জন্য বেচিতে পারিবেন না। নবীনমাধব ক্ষুণ্ণ হইলেও মনে মনে স্ত্রীর প্রশংসাই করিলেন। এই ত তাহার যোগ্য পত্নী! তিনি যেমন পার্থিব কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে নিজের বিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই, ধর্ম্মকে শুধু ধর্ম্মের জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন,—স্ত্রীও যদি তেমনি ভাবে নিজের কেন্দ্রে নিজে স্থির থাকিতে পারেন, তাহাতে তিনি বাধা দিবেন কেন? তাঁহার মনে আঘাত না লাগিয়া তাহা বরং শ্রদ্ধায় আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ঘনশ্যামের মৃত্যুর পরেই তারাসুন্দরীর পৃথিবীর রঙ বদল হইয়া গেল। তিনি এখন শ্বশুর গৃহের অনাবশ্যক ভার মাত্র হইয়া উঠিলেন। দেবর ও ভ্রাতৃজায়াগণের অনাদর ও অবহেলা সহ্য করিয়া আরও কিছুদিন কাটাইলেন।

একদিন আকস্মিক বজ্রাঘাতের মত শুনিলেন, তিনি বিধবা। যে স্বামীকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, মরণ কালেও সেই স্বামী, স্ত্রী-কন্যার অসহায় অবস্থা স্মরণে রাখিয়া স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি তাঁহারই নামে দান পত্র লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর দেবরদের সহিত একত্র বাস যখন আর সম্ভব হইল না, তারাসুন্দরী তখন পুরাতন ভৃত্য ভজহরির সাহায্যে নবীনমাধবের কলিকাতার ভাড়াটীয়া বাসা বাড়ীতে মেয়ে লইয়া বাস করিতে আসিলেন। হুগলীতে তাঁহার গুরুর বাড়ী, একবার ইচ্ছা হইয়াছিল সেই খানেই যান, কিন্তু তীর্থকামী তীর্থবাসের সুযোগ পাইলে যেমন সহজে তাহার লোভ ত্যাগ করিতে পারে না, স্বামীর শেষজীবনের স্মৃতিতীর্থ-স্থানটীও তেমনি ভাবে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিল। কার্য্য কারণের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য যে বিধাতা অদৃশ্যে প্রতিনিয়ত অলক্ষ্য সূত্র যোগাইয়া চলিতেছিলেন, হয়ত

তাঁহারও অদৃশ্য ইঙ্গিত ইহার তলে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিয়াছিল। অদূরদর্শী মানব তাহার গোপন অবস্থান লক্ষ্য করিতে না পারিয়া কেবল সূত্রে জড়াইয়া পড়িল।

কলিকাতার সহস্র কোলাহলের মধ্যে তারাসুন্দরীর সমাহিত চিত্তকে খুব বেশী বিক্ষিপ্ত করিতে পারিল না। ভগবানের উপর অচল বিশ্বাসে, মেয়ের ভবিষ্যতের ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করিয়া, নিজের পূজার্চ্চনার কাল তিনি বাড়াইয়া দিলেন। স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলে তিনি তাঁহার কন্যার সম্বন্ধে কি ভাবে চলিতেন, এই চিন্তাটা যখন তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল, তখন অনেক ভাবিয়া মেয়েকে তিনি বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ঘনশ্যাম জীবিত থাকিতে, কল্যাণীর স্বাভাবিক জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা ও তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি দেখিয়া ঘনশ্যাম নিজেই তাহার শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। সে বাংলা, সংস্কৃত, ব্যাকরণ ভালই শিখিয়াছিল। তারাসুন্দরী এইবার তাহার ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিলেন। এখনকার দিনে লেখাপড়া ভাল জানাটা যে মেয়ের বিবাহের, একমাত্র না হউক, একটা প্রধান উপায় তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন।

মেয়ে বড় হইলে, তাহার বিবাহের জন্য তারাসুন্দরী সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি সহায়হীনা, তাঁহাকে কে সৎপাত্র আনিয়া দিবে!

একদিন হঠাৎ তারাসুন্দরীর কলেরা হইল। ভয়-বিহ্বল ভজহরি ভৃত্য, ডাক্তার ডাকিবার জন্য বাহির হইয়া পথেই সতীনাথকে দেখিতে পাইল। তাঁহাদের বাড়ীর দরোয়ান ও চাকরদের মজলিশে ভজহরি ছোট বাবুর অদ্ভুত নাড়ীজ্ঞান ও ঔষধের প্রত্যক্ষ ফল দর্শনের যথেষ্ট প্রশংসা পূর্ব্বাবধিই শুনিয়াছিল। সময় সময় বিনামূল্যে ঔষধকামী দুই চারিজন নরনারীকে তাঁহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া থাকিতেও সে দেখিয়াছে। সুতরাং ডাক্তারের শক্তিমত্তায় ভজহরির মনে যথেষ্টই শ্রদ্ধা ছিল।

ভজহরির আহ্বানে সতীনাথের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সে ভাবিল, অসুখ কার? তাহারই নহে ত? চটিজুতা পায়ে দিয়াই সে ভজহরির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ১৭ নম্বর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। উৎকণ্ঠা অধিকক্ষণ সহ্য করিতে হইল না। প্রবেশ পথেই দুইটী ভীতি-ব্যাকুল চক্ষুতে কাতর প্রার্থনা ভরিয়া সেই সুন্দর মুখখানাই সাগ্রহে আহ্বান করিল, "আসুন ডাক্তার বাবু; দেখুন ত, মা যেন বড় কাহিল হয়ে পড়েচেন, ডাক্‌লেও আর সাড়া পাচ্চিনে যে!"

সতীনাথ ব্যস্ত হইয়া রোগীর কাছে গেল, নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আশ্বাস দিল, "কোন ভয় নেই, ঘুমুচ্চেন।"

তারা সুন্দরীর রোগ কঠিন নয়, কলেরা বলিয়াও মনে হইল না। সতীনাথ নিজেই তাঁহার চিকিৎসার ভার লইল এবং দুই তিন দিনের মধ্যেই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিয়া তুলিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এ বাড়ীতে আসা যাওয়ার প্রয়োজনও তাহার ফুরাইয়া গেল।

তারাসুন্দরী যখন শুনিলেন সে ভিজিট লইবে না, পেশাদার ডাক্তারও সে নয়, বড় মানুষের ছেলে, তখন কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধায় পরিণত হইল। দুই একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া সুখী হইলেন। মধ্যে মধ্যে তাহাকে আসিবার জন্য অনুরোধও জানাইলেন। কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাইলে সে সহজে কখনও সরিয়া যায় না। সতীনাথ তারাসুন্দরীর অন্তরে ও গৃহে তাঁহার অজ্ঞাতেই অনেকখানি স্থান করিয়া লইল।

এই আত্মীয়-বর্জ্জিত সংসারে এমন একজন উদার ও স্নেহসম্পন্ন বন্ধু পাইয়া কল্যাণীও আনন্দের সহিত তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিল না। সাধারণতঃ পুরুষ জাতির সম্বন্ধে সতর্ক সাবধানতার উপদেশ পাইয়া পাইয়া তাহার বয়সী বঙ্গবালাদের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে, কল্যাণীর ভাগ্যে তেমন সুযোগ ঘটে নাই। দেশ ছাড়িয়া পর্য্যন্ত সে কাহারও বাড়ী যাইতে পাইত না। তাহাদের বাড়ীও কেহ আসিত না। ছাদে ছাদে যোগ রাখিয়া মেয়েদের ভিতর আত্মীয়তার যেটুকু সুবিধা পাওয়া যায়, কল্যাণীদের বাড়ীর ছাদের সিঁড়ী না থাকায় সে সুযোগও ছিল না। তা ছাড়া, সে গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যায়, পুরুষদের চক্ষে অদৃশ্য থাকে না এবং সেজন্য নিজের মনে তাহার কৌতূহল সঙ্কোচ বা লজ্জার

কোন কারণও সে বুঝিতে পারিত না। সে আপনার রাজ্যে বনবিহঙ্গিনীর মত আনন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। লেখাপড়া গান বাজনা হাসি খেলায় মার অন্ধকার বুকখানি উজ্জ্বল করিয়া রাখিত। স্কুলের গাড়ীতে সহপাঠিনীদের সহিত গল্প করিত। বাড়ী ফিরিয়া মার কাজের সাহায্য করিত। সন্ধ্যাবেলা তিনি কাজে বা সন্ধ্যাবন্দনায় থাকিলে সে নিজের পাঠ মুখস্থ করিত। রাত্রে কোনদিন বাগানে বসিয়া কোনদিন বিছানায় শুইয়া তাঁহার সহিত অনেক বিষয়ের আলোচনা করিত। আলোচ্য বিষয় বেশীর ভাগই সাহিত্য সম্বন্ধে। তারাসুন্দরী গল্পচ্ছলে তাহাকে সীতা সাবিত্রী চিন্তা দময়ন্তীর চরিত্র উল্লেখ করিয়া উপদেশ দিতেন, কল্যাণী মুগ্ধ হইয়া শুনিত। মা ঘুমাইয়া পড়িলেও সে সেই সকল মহীয়সী মহিলাদের বিষয় চিন্তা করিত। কি সে পতিপ্রেম, যাহার বলে যমের সহিত অন্ধকারে একা অগম্য পথে যাইতেও নারী ভয় করেন না! যাহার মোহিনী শক্তিতে, বিনাপরাধে বর্জ্জিতা হইয়াও স্বামীর উপর মনে মনেও রাগ দুঃখ ক্ষোভ জন্মায় না! স্বামীর নিন্দা শুনিলে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারা যায়! সতী-নারীর হস্তস্পর্শে অচল নৌকা জলে ভাসে, অঙ্গস্পর্শে জ্বলন্ত অনলও দাহিকা শক্তি হারায়, বাক্যে সূর্য্য উদয় হইতে পারেন না, সৃষ্টি স্তম্ভিত হইয়া থাকে! কল্যাণী ভাবিত, তা বুঝি আবার হয়?—এ সব কবির অত্যুক্তি, কাব্যের অলঙ্কার। অল্পায়ুজনে সাধ করিয়া বুঝি জানিয়া শুনিয়া কেহ কখনও বিবাহ করিতে পারে? সাধ করিয়া কেহ আবার বিধবা হইতে চায়? ও সব পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য কবির ছলনা। —যুক্তি যাহাই বলুক, মন বলিত, হউক ছলনা, ছলনার ভাবটুকু কি মধুর!

মনে যখন এমনি ভাব, সেই সময় সতীনাথের মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন বন্ধুলাভ হইল। সতীনাথ তাহার পাঠ বুঝাইয়া দেয়, সঙ্গীতের দোষ ত্রুটী শুধরাইয়া লয়, নূতন নূতন গৎ শিখায়, কাব্য সাহিত্য ইতিহাস গণিতের আলোচনা করে, তাহার বাগানের ফুলগাছের যত্ন লয়, কত নূতন নূতন মূল্যবান লতা পাতা ফুলের গাছ আনিয়া জোগায়, আবার মায়ের স্নেহের অংশ লইয়া কৃত্রিম কলহ মান অভিমান ও সন্ধি করে। একাধারে সর্ব্বগুণগ্রাহী এমন বন্ধু এমন সঙ্গী তাহার আর কখনও মিলে নাই, তাই কৃতজ্ঞতা কখন শ্রদ্ধায় এবং শ্রদ্ধা ভালবাসায় রূপান্তরিত হইয়া গেল, অনভিজ্ঞা কল্যাণী তাহা ভাল বুঝিতেই পারিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীইন্দিরা দেবী।

প্রকাশ

আজি আর নহ তুমি একান্ত আমার,
গোপন অন্তর তলে প্রেম-কল্পনার
শুধু চির-ছায়াময়ী মানসী প্রতিমা
স্বপনের সিংহাসনে; অতুল গরিমা
জাগিত বিপুল গর্ব্বে স্থির অচঞ্চল
হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রদীপ্ত উজ্জ্বল;
সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু মিলন বিরহ
নিভৃতে চরণ-প্রান্তে নিত্য অহরহ
সাজাইত অর্ঘ্যথালি; তুমি তারি মাঝে
রহিতে রাণীর মত নিত্য নব সাজে।
আজি তুমি কায়াময়ী, অপরূপ বেশে
নিখিল ভক্তের কাছে দাঁড়াইলে হেসে;
বিশ্বের অন্তরে আজি তব অভিষেক,
আমি শুধু অজানিত দীন ভক্ত এক।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

বিদ্যাসাগর *

শান্তি-সৌন্দর্য্য-সম্বলিত শান্ত-সাম-মুখরিত, নিভৃত-পুষ্প-পল্লবাস্তীর্ণ বনভূমিতেই স্বর্গসুন্দরী মেনকার কন্যা শকুন্তলা আজন্ম-ব্রহ্মচারী কণ্বঋষি কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়াছিলেন; বিকসিত পুষ্পৈশ্বর্য্যময় তপোবনের-কুঞ্জবীথিকাতেই পেলব-যৌবনাভরণা নবপ্রেম-বেপথুমতী লজ্জারুণা অপ্সরকন্যা সাগরান্তা ধরণীর একচ্ছত্রাধীপের অনঙ্গ-শর-রক্তারুণ হৃদয়পদ্মের উপর তাঁহার রাতুল চরণপদ্ম স্থাপিত করিয়া সূর্য্যবংশীয়-গণের সিংহাসনের বামপার্শ্ব অধিকার করিয়াছিলেন। স্বর্গ-সঙ্গীত-মধুরা সংস্কৃত-দুহিতা যে বঙ্গভাষা আজ লবণাম্বু-পরপারের বরণ-মাল্যে বিভূষিতা হইয়াছে, তাহার শৈশবের লালনকর্ত্তাও ঋষিকল্প লোকোত্তর মহাপুরুষ। আজ তাঁহারই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ-বাসর। পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে এই দিনে নরনারী-নির্ব্বিশেষে সমস্ত বঙ্গ-ভূমিকে শোকাশ্রুনীরে ভাসাইয়া দয়ার সাগর দেবোপম বিদ্যাসাগর পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে এইদিনে বর্ষে বর্ষে বঙ্গের কৃতবিদ্য ও কৃতজ্ঞ সন্তানগণ তাঁহাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধার পিণ্ড পরলোক-প্রবাসীর উদ্দেশে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত একত্র হইয়া থাকেন। জ্ঞানের সাগর, বিদ্যার সাগর, দয়ার সাগর, নির্ভীক কর্ম্ম-বীরের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার বিরাট চরিত্রের 'বিরাট' পাঠের ভার যোগ্যহস্তেই এতকাল সমর্পিত হইয়া আসিয়াছে। আজ এ অযোগ্যকে এ অকিঞ্চনকে সেই ভার দিয়া এখানে দাঁড় করানো কেন হইয়াছে তাহা আমি জানি না; জানেন আপনারা, এবং হয় তো জানেন তিনি, যাঁহার পরম ঐশ্বর্য্যময় লোকান্তর-নিবাসের অভিমুখে ভক্তির শ্রদ্ধার কৃতজ্ঞতার ধূপধূম উৎক্ষিপ্ত করিবার জন্য এতগুলি ভক্ত হৃদয় আজ একত্র সমবেত হইয়াছে। যে বিধাতার অখণ্ড নিয়মে বসন্ত শরতাদি ঋতু-পরিসেবিত আর্য্যাবর্ত্তের পয়স্বিনী সরস্বতী-তীরে উদাত্তাদি স্বরসংযোগে বেদমন্ত্র একদিন ধ্বনিত হইয়া আবার নীরব হইয়া গিয়াছে, যে অদৃষ্টদেবতার নির্ম্মম বিধানে অযোধ্যায় অভিষেক-সুখের পরিপূর্ণ আয়োজন ব্যর্থ হইয়া করায়ত্ত-সিদ্ধি স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং কুরুক্ষেত্রের শৌর্য্য-বীর্য্য-রাগ-দ্বেষ-হিংসা-প্রতিহিংসা প্রয়াস ও সিদ্ধির মহান কর্ম্মকোলাহলের মধ্য হইতে মহাপ্রস্থানের শ্মশানে হরিধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল; যাঁহার অপ্রতিবিধেয় বিধির বলে জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তিযোগের অদ্বিতীয় প্রবক্তা বাসুদেবের সুবর্ণ-দ্বারকার অতুল ঐশ্বর্য্য ও অপ্রমেয় গৌরব প্রভাসের বালুবেলায় ঋষি-কোপানলের ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে; যে অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসে ভদ্রাহৃদ্‌বিহারী কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনচারী সব্যসাচী, যাদব-রমণীর পরিরক্ষণে অসমর্থ হইয়াছেন; যাঁহার অবিচলিত ইচ্ছায় উজ্জয়িনীর রত্নসভার শ্রেষ্ঠ রত্নের স্বর্ণ-বীণায় অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে কুমারসম্ভবে ব্যর্থ-মনোরথা পার্ব্বতীর দুঃখ ও লজ্জার করুণ সুর, মদনান্তক দেবতার ললাটবিচ্ছুরিত রোষাগ্নিচ্ছটার দীপক-রাগ, মন্দাক্রান্তার স্রোতোবেগে বিচ্ছেদাশ্রুর মল্লার রাগিণী এবং একান্ত প্রেমবিমুগ্ধা নিরপরাধা জানকীর নির্ব্বাসন-ব্যথার অশ্রুসিক্ত গাথা একদিন ভারতের করুণ-হৃদ্‌পদ্ম মথিত করিয়া চিরদিনের জন্য নীরব হইয়া গিয়াছে; যাঁহার অপ্রতিহত বিধানে দ্বাত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যেই জগতের মোহজালের উপর সন্ন্যাসী শঙ্করের জ্ঞানসূর্য্য অপূর্ব্ব আভা বিস্তার করিয়া চির অস্তাচলের গুহাশায়ী হইয়াছে—সেই সর্ব্বকার্য্যকারণের নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি-প্রভাবেই আজ যাঁহার শ্রাদ্ধ-বাসরে আমরা সমবেত হইয়াছি, তাঁহার পরম মহিমময় আবির্ভাব এবং দুর্ব্বার শোকসমাকুল অকাল অবসান সংঘটিত হইয়াছে।

সহস্র দীপালোকে উজ্জ্বলিত উৎসব-ভবনের দুই একটি

* বিগত ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর-মৃত্যুবাসরে "কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুট" গৃহে পঠিত।

দীপ যদি নিবিয়া যায়, তাহার সন্ধান কেহই রাখে না, রাখিবার প্রয়োজনই হয় না ; কিন্তু যে গৃহের অন্ধকার নিবারণ করিবার জন্য বিধাতা কেবল একটিমাত্র প্রদীপের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, মেঘাচ্ছন্ন রজনীর প্রবল ঝটিকার নির্দ্দয় ফুৎকারে, সেই আঁধার ঘরের মাণিকের মত একমাত্র দীপালোক যদি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সেদিনে সেই তমান্ধ-কুটীরের দরিদ্র অধিবাসিজনে সর্ব্বগ্রাসী তিমির রজনীর প্রগাঢ় অন্ধকারে সভয়ে কেমন করিয়া সময়াতিবাহিত করে তাহা তাহারাই জানে। দরিদ্র অধ্যাপক পণ্ডিতের গৃহে চির-দারিদ্র্য-নিপীড়িত জনক জননীর অঙ্কে যে শিশু-শশধর উদিত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহার বিমল জ্যোতিঃ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন বঙ্গ-গগনে পূর্ণচন্দ্রের রাজতধারা ঢালিয়া দিয়াছে—সে পরিপূর্ণ চন্দ্রমা যেদিন অস্তমিত হইল, বঙ্গের সপ্তকোটি নরনারীর আনন্দ-বিকসিত হৃদয়-কুমুদ সেদিনে কেমন করিয়া মুহ্যমান হইয়াছিল, সে দুঃখ-বারতা স্মরণ করিতে ইচ্ছা হয় না। শশিহীনা অন্ধ-নিশীথিনীর নিবিড় তিমিরে বসবাস অভ্যস্ত হইয়া গেলে দুঃখের কাল একরূপে কাটিয়া যায়, কিন্তু রাকা-যামিনীর অখণ্ড চন্দ্রালোকের আনন্দ আস্বাদ একবার লাভ করিলে, কুহূরজনীর গাঢ় অন্ধকারে জীবন যাপনের দুঃসহ দুঃখ যে অসহ্য হইয়া উঠে—বঙ্গবাসীর হৃদয়-চন্দ্রমা ঈশ্বরচন্দ্রের অস্তগমনে সপ্তকোটি নরনারীর আজ সেই দুর্দ্দশাই হইয়াছে !

হতভাগ্য দেশের বন্ধুসংখ্যা অধিক হয় না। ইহজগতে নিজ স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণ-কল্পে জীবন উৎসর্গ করিবার লোক নিতান্তই মুষ্টিমেয়, দুর্ভাগ্য পীড়িত দেশে তাহার সংখ্যা আরও অল্প। উদয় অস্ত, উত্থান পতন জগতের নিয়ম। দুরদৃষ্টজনিত দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া যখন বঙ্গের বহু কোটি লোক কায়ক্লেশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, সেইদিনে লোক-বন্ধু মহাত্মা রামমোহনের অভ্যুদয় হয়। ইংরাজাধিকৃত বঙ্গদেশের শিক্ষা-সংস্কার কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিলে তাহা দেশকালের উপযোগী হইবে, এই প্রশ্ন লইয়া যখন দেশের শাসক ও শাসিতের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছিল, স্বীয় স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া রামমোহন সেদিনে লোক-হিত-কল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বদেশ স্বজন আত্মীয় বন্ধু সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তিনি অজানা দেশের অচেনা দীর্ঘপথে তাঁহার তরণী ভাসাইয়া, অর্দ্ধ সম্বৎসরে ভারতের অদৃষ্ট-বিধাতাগণের সন্নিহিত হন। তাঁহার আরব্ধকার্য্য সম্পূর্ণ শেষ না হইতেই তাঁহার অমূল্য জীবন শেষ হইল, তিনি অন্ধকার পথের অনির্দ্দেশ যাত্রায় বাহির হইলেন। বন্ধু-বিহীন বঙ্গ-সন্তানের দল অকৃত্রিম সুহৃদকে জন্মের মত হারাইয়া সেদিনে বড় বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিল। সেদিনে বঙ্গ-দেশবাসী জানিতে পারে নাই যে তাহাদের শ্যামাঞ্চলা জন্মভূমির নিভৃতপল্লিনিকেতনের দারিদ্র্য-পীড়িত নিরন্ন কুটীরে এক মহাপুরুষের জন্ম হইবে, যাঁহার সাগর তুল্য স্নেহবক্ষে নরনারী নির্ব্বিশেষে আটকোটি বঙ্গ-সন্তান-সন্ততির স্থান অনায়াসে হইতে পারিবে। সেই সাগরতুল্য স্নেহ বক্ষের অধিকারী আমাদের চির-আত্মীয়, চিরমঙ্গলেচ্ছু, চিরহিতাকাঙ্ক্ষী দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।

দরিদ্র স্বার্থান্বেষী হয় ইহাই আমাদের চিরন্তন বিশ্বাস। বিদ্যাসাগর আমাদের সে বিশ্বাস বিদূরিত করিয়া গিয়াছেন। যে ঠাকুরদাসের অর্দ্ধাশনে অনশনেও দিন কাটিয়াছে, সেই নিরন্নের সন্তান হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পঠদ্দশাতে প্রাপ্ত ছাত্রবৃত্তির অর্থে অপর দরিদ্র সহাধ্যায়ীর অপেক্ষাকৃত শোভন পরিচ্ছদ কিনিয়া দিয়া নিজে গৃহজাত 'চরকার' সূতার কাপড়ে কোন মতে স্বীয় লজ্জা নিবারণ করিয়া ছাত্রজীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বহুস্থানে বহুবার ঘটিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। দরিদ্রের আত্ম-মর্য্যাদার জ্ঞান প্রায়সঃই পরিক্ষীণ অবস্থায় থাকিয়া যায় ইহাই সাধারণের ধারণা। বিদ্যাসাগরের জীবনে—ছাত্র-জীবনে, কর্ম্মজীবনে সর্ব্বত্রই তাঁহার আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান অত্যধিক পরিমাণে উজ্জীবিত ছিল, তাঁহার জীবন-চরিত পাঠে আমরা সে কথা জানিয়াছি। একাদশ বর্ষীয়

বালক ঈশ্বরচন্দ্র যখন ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া সাহিত্যের শ্রেণীতে উন্নীত হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেন, তখন তাঁহার অল্পবয়স-প্রযুক্ত সাহিত্যের অধ্যাপক তাঁহাকে সে শ্রেণীতে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বালক বিদ্যাসাগর জেদ ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে সাহিত্যেই পরীক্ষা করা হউক। অধ্যাপক অগত্যা ভট্টিকাব্যের কঠিন কঠিন কয়েকটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে দিলেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণের বলে তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়া তবে সাহিত্যের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। কেহ তাঁহাকে কোন বিষয়ে হীন ভাবিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবে, ইহা তিনি কদাচ সহ্য করিতে পারিতেন না, এবং জীবনে কদাচ সহ্য করেন নাই। ছাত্রজীবনে যাঁহার দুই সন্ধ্যা উদর পূরিয়া অন্ন জোটে নাই, কোন সময়ে অন্ন জুটিলেও ব্যঞ্জনাদির অসদ্ভাবে যাঁহাকে লবণ সংযোগে অন্নপিণ্ড গলাধঃকরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে, প্রাপ্ত বয়সে ৫০০৲ শত টাকা বেতনের সংস্কৃত কলেজের সম্মানার্হ অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে কম ত্যাগ নহে।

একসময়ে পিতা ঠাকুরদাসের কলিকাতায় মাসিক দুই টাকা বেতনের কর্ম্মপ্রাপ্তির সংবাদে বীরসিংহায় যে দরিদ্র পরিবার উৎসবের আয়োজন করিয়াছে, সেই দুঃস্থ পরিবারের সন্তান মাসিক ৫০০৲ পাঁচশত টাকার কর্ম্ম অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে যে আত্ম-মর্য্যাদার জন্য, সে মর্য্যাদা কত বড় হইয়া ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুভব যোগ্য। কর্ম্মত্যাগের পর তাঁহার জনৈক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,"চাকুরী ত্যাগ করিলে, বিদ্যাসাগর, খাইবে কি করিয়া?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন,"বাটীর ভিটায় আলু পটলের চাষ করিয়া মাথায় করিয়া হাটে বিক্রয় করিয়া যাহা পাই তাহা দ্বারায় যেমন করিয়া হয় জীবন ধারণ করিব।" হায় রে, এই দুর্ভাগাপীড়িত দেশে নিজের স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রাকে উপেক্ষা করিয়া আত্ম-সম্মানকে এত বড় করিয়া দেখে, এমন লোক কয়টি আজ বর্ত্তমান আছেন জানি না; ভাবিতে ইচ্ছা করে যে আছেন, এবং প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয় যে তাঁহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি হইতে থাকুক।

অতি প্রাচীনকালে ছাত্রজীবন কেমন ছিল জানি না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দিনে জীবিত ছিলেন, সেদিনের ছাত্রজীবন এবং ছাত্র-শিক্ষকের সম্বন্ধ বড়ই প্রীতিপদ মধুর সম্বন্ধ ছিল ইহাই শুনিয়াছি। আজ ছাত্র সংখ্যা অধিক, একটি কক্ষে পরিমিত সংখ্যক ছাত্রের বসিবার স্থান হয়, একই বিষয় বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা করিতে হয়, সুতরাং সকল অধ্যাপক সকল ছাত্রের নাম জানেন না, এমন কি মুখ দেখিলেও চিনিতে পারেন না। এরূপস্থলে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ কেমন দাঁড়ায় তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সকলগুলি ছাত্রকে নিজে চিনিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। তিনি প্রতি ছাত্রের সহিত প্রতি অধ্যাপকের পরিচয় করাইয়া দিতেন; ছাত্রের দেহ মন ও আর্থিক অবস্থার প্রতি নিজের সতত জাগ্রত দৃষ্টি ধ্রুবতারার মত নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন, কেহ পীড়িত হইলে তাহার অধ্যাপককে সঙ্গে লইয়া সেই ছাত্রের বাসায় গিয়া তাহার বিষয়ে সস্নেহ অনুসন্ধান লইতেন, দরিদ্র হইলে তাহার চিকিৎসার ব্যয়ভার নিজে বহন করিতেন, এবং অবিভাবকতা কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা ছাত্রের অভিভাবককে শিক্ষা দিতেন। ফলে, ছাত্রে শিক্ষকে অভিভাবকে অধ্যা-পকে এবং বিদ্যাসাগরে এক পরিবার-ভুক্ত হইয়া যাইতেন; এবং এক বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চির জাগ্রত হিতৈষণার জন্য সেদিনে অধ্যাপক ও অন্তেবাসীর মধ্যে যে হৃদয়ের মধুর সম্বন্ধ বিরাজ করিত, সে সম্বন্ধের আজ একান্ত অভাব হইয়া নানা প্রকারে নানা বিপদপাত হইতেছে। ইহার উপযুক্ত চিকিৎসা কেমন করিয়া কত দিনে হইবে, ইহা ভাবিয়া আজ আকুল হইতে হয়। এই ছাত্র-শিক্ষকের দুর্দ্দিনে সাশ্রু নয়নে বারম্বার বলিতে ইচ্ছা করে, বিদ্যাসাগর, তোমার দিব্যধাম হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া

তোমার কার্য্য তুমিই কর, নতুবা এ দুর্দ্দশার পঙ্ক হইতে তোমার স্বজাতিকে উদ্ধার করিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি আজ জীবিত নাই!

বিদ্যাসাগরের চরিত পাঠে আজ আমরা জানিতে পাই যে, যে চরিত্রের বলে বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর, যে অপরিসীম দয়াগুণে বিদ্যার সাগর দয়ার সাগর রূপে সকলের নিকট চিরপরিচিত, সে চরিত্রের গঠনকল্পে জননী ভগবতীর দুইখানি অশ্রান্ত স্নেহহস্ত নিয়ত নিয়োজিত ছিল এবং সেই কল্যাণময়ীর কল্যাণ-আশীর্ব্বাদ তাঁহার ঈশ্বরচন্দ্রের শিরে সতত বর্ষিত হওয়ায় বীরসিঙ্গার দারিদ্র্য-নিপীড়িত শিশু পরিণত জীবনে সর্ব্ববিষয়ে যথার্থ বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর একথা বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যে জননীর ক্রোড়ে শিশু জন্মাবধি বহু বৎসর ধরিয়া লালিত পালিত হয়, যে জননীর মুখ হইতে ভাষা গ্রহণ করিয়া শিশু প্রথম কথা বলিতে শেখে, যে জননী হাত ধরিয়া শিশুকে প্রথম তাহার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিক্ষা দেন, সেই জননীদিগের সর্ব্ববিধ অবস্থার উন্নতি না হইলে তাঁহাদের সন্তানগণের উন্নতি দুরাশার দুঃস্বপ্নে পরিণত হইবে। অশেষ শাস্ত্রের অতলস্পর্শ জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন করিয়া বিদ্যাসাগর জানিয়াছিলেন—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"—কতবড় সত্য কথা! তাই ভাগ্য কর্ত্তৃক চিরবঞ্চিতাদিগের দুঃখের অশ্রু মুছাইয়া দিবার জন্য তাঁহার বীরবাহু সতত উদ্যত রহিয়াছিল, অজ্ঞান-তিমিরান্ধ বঙ্গজননীগণের হৃদয়-মন্দিরে জ্ঞানের রত্নদীপ প্রজ্জ্বালিত করিতে না পারিলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত বঙ্গসন্তানগণের মুক্তির দ্বিতীয় উপায় নাই একথা বিদ্যাসাগর তাঁহার সমস্ত হৃদয় মন দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার জীবনের শেষতম নিমেষ পর্য্যন্ত তিনি সহস্র বাধা বিঘ্ন নির্যাতন অপমান এবং প্রাণের ভয়কে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া ভারতের কল্যাণী জননীগণের কল্যাণার্থ তাঁহার সমগ্র দেহ মনের সমস্ত শক্তিকে প্রতিনিয়ত নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এই সর্ব্বজন প্রসংশিত নারীহিতৈষণার সহায় স্বরূপ তিনি আর দুইজন মহাপ্রাণ বন্ধুকে সঙ্গী পাইয়াছিলেন। এক-জন Drinkwater Bethune এবং অপরা কুমারী Mary Carpenter. পরহিতৈষণা প্রবৃত্তির এই ত্রিধারা গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমতীর্থে পরিণত হইয়াছিল! এবং আজ যতটুকু স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এদেশে আমরা দেখিতেছি, তাহা এই তীর্থস্বরূপ হিতৈষণাবৃত্তির ত্রিবেণী সঙ্গমের পুণ্য বলে। মহাত্মা Bethune ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে যে Bethune Female School স্থাপনা করিয়া যান, সেই স্কুলই আজ বেথুন কলেজে পরিণত হইয়াছে। যে ভূমিখণ্ডের উপরে এই বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ইহার সংগ্রহ সম্বন্ধে গতকল্য আমি একটি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। সরকার হইতে স্ত্রীশিক্ষার সৌকর্য্য-বিধান জন্য যখন এই বিদ্যামন্দির স্থাপনার পরামর্শ স্থির হইল, তখন স্থান-নির্ব্বাচনের ভার মহামতি Bethune স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এই স্থানের স্বত্বাধিকারী ছিলেন ৺হরচন্দ্র ঘোষ, আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পিতামহ। তিনি এই কল্যাণকর কর্ম্মের জন্য ঐ ভূমি বিনামূল্যে দান করিতে চাহিলেন। মহাত্মা Bethune বিনামূল্যে লইতে কিছুতেই স্বীকৃত নহেন। উভয়ে বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তৎকাল প্রচলিত একগাছি রূপার "বাউটী" মূল্য স্বরূপ চাহিলে,তাহাই দিয়া ঐ ভূমি ক্রয় করা হইল। শুনিয়াছি, বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিস্থাপন কালে স্বর্ণ রৌপ্য এবং নানাবিধ মণির সহিত, মূল্য স্বরূপে প্রাপ্ত ঐ রৌপ্য "বাউটী" গাছিও ভিত্তিতলে প্রোথিত করা হইয়াছিল। যে চিরায়ুষ্মতী কল্যাণকারিণীগণের শিক্ষা সৌকার্য্যার্থ ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, কল্যাণ ও সৌভাগ্যের চিহ্ন স্বরূপ "বাউটী" পুঁতিয়া তাহার ভিত্তি স্থাপনাও যথাযোগ্যই হইয়াছে। আরও শুনিয়াছি, বন্ধুবর অমূল্যচরণের পিতৃস্বসা ঐ বিদ্যালয়ের প্রথমা ছাত্রীরূপে ঐ মন্দিরে প্রথম প্রবেশ করেন।

বিদ্যাসাগর যে দিনে জীবিত ছিলেন, সেদিন অপেক্ষা

আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক অধিক, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয়, বিদ্যাসাগরের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সেদিনে সমাজ-সংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসরবৃদ্ধিকল্পে সকলে যেরূপ প্রাণপণ উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন, আজ তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় না। সে সৌভাগ্য হয় না বলিয়াই আজ সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ধীর মন্থর গতি আমাদের চক্ষেই পড়ে না। এ যেন চন্দ্র সূর্য্যের গতির মত—

"চলিতে না চলে পদ ঘোর ঘুমের ঘোরে।"

—এ ঘুমঘোর কতদিনে ভাঙ্গিবে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত আমাদের অর্দ্ধাঙ্গকে কবে শিক্ষায় সংস্কারে অপরার্দ্ধের সমকক্ষ করিবার চেষ্টায় আমরা বদ্ধপরিকর হইব, তাহা তিনিই জানেন, যিনি সর্ব্ব-দেশ-কালের সমস্তই নখদর্পণে দেখিতেছেন; তিনিই জানেন, যাঁহার নিয়ত জাগ্রত ধ্রুব-দৃষ্টি সতত অতন্দ্র থাকিয়া সর্ব্বদেশ-কাল-পাত্রের সমস্ত আশা অকাঙ্ক্ষা উদ্যম এবং গতিকে নিয়মিত করিতেছে; তিনিই জানেন, যিনি পুনরায় বিদ্যাসাগরের মত কর্ম্মের বীর, দয়ার আধার, জ্ঞানের পারাবারকে আমাদের মর্ত্ত্যলোকে পাঠাইয়া এই চিরবঞ্চিতগণের হৃদিস্থিত চির সঞ্চিত আশার সফলতাকে বরণ করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

হে চির-তপস্বী ঈশ্বরচন্দ্র, তুমি জানিতে, কেবল আশা আকাঙ্ক্ষায় সিদ্ধি ও সার্থকতাকে পাওয়া যায় না। তাই তপস্যা-নিরত হইয়া তুমি শ্রেয়কে, প্রেয়কে, বিধেয়কে চিরদিন আহ্বান করিয়া গিয়াছ। তোমার অব্যয় স্বর্গলোক হইতে আশীর্ব্বাদ করিও, যেন অচির-কাল মধ্যে আমরা অভিলষিত-লাভের কঠোর তপস্যায় নিজকে নিয়োজিত করিয়া শ্রেয় এবং প্রেয়-লাভের পথকে সুগম করিয়া তুলিতে পারি।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

বর্ষা উৎসব

১

বরষা দিয়াছে মাখি' মেঘের অঞ্জন
　নীল নভস্তলে,
ঢাকিয়া দিয়াছে তপ্ত ধরণীর দেহ
　শ্যামল অঞ্চলে।
স্নিগ্ধ ঘন সুচিক্কণ পল্লব-ভূষণে
　মণ্ডিত কানন,
বিকশিত কদম্বের মদির-সৌরভে
　অধীর পবন।
তটিনী কল্লোল তুলি' ছুটিছে গরবে
　যৌবন-চঞ্চল,
গুরু গুরু ডাকে মেঘ—ঝর ঝর ধারা
　ঝরে অবিরল।

২

চারি ধারে বরষার ঘোর ঘন-ঘটা;
　ওগো প্রিয়তম,
রহিবে কি এ হৃদয় শুধু, নিদাঘের
　শুষ্ক মরু সম!
নাহি দিবসের আলো, ঘেরা দশদিশি
　সঘন আঁধারে,
জনহীন বনপথে হে চির-বাঞ্ছিত,
　এস অভিসারে।
নিবিড় বরষা ধারা আন এ জীবনে,
　জীবন-বল্লভ,
নিভৃত কুটীরে মোর পূর্ণ হোক আজি
　বরষা-উৎসব।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

কবি ভূষণ ও শিবাজী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আপ্তবাক্য

শিবাজীর শক্তিমুগ্ধ, গুণভক্ত, গৌরবগর্ব্বিত, কৃপা-পুষ্ট ও স্নেহাশ্রিত সভাকবি ভূষণ ত্রিপাঠীর তুলিকায় তাঁহার কাব্যনায়ক, আদর্শ পুরুষ, বীরপুঙ্গব ছত্রপতির যে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা ঐতিহাসিকের চক্ষে অমূল্য না হইলেও বহুমূল্য। কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বদেশভক্ত নরপতি পুরু, দাহির, বাপ্পারাও, পৃথ্বীরাজ ও প্রতাপসিংহ জন্মভূমির গৌরব ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত যে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের স্মৃতি ভারতবাসীর জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খচিত হইয়া সর্ব্বগ্রাসী কালের দর্প চূর্ণ করিতে পারিবে। কিন্তু মহারাষ্ট্রকুলতিলক শিবাজী মধ্যাহ্নকরোজ্জ্বল মোগল গৌরব-রবির দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ অগ্রাহ্য করিয়া, মাওয়ালী ভীল ও দস্যুদল সহায় করিয়া ভারতব্যাপী হিন্দুজাতির আর্ত্তনাদ ও হাহাকারের প্রতিবিধান করিতে, উপেক্ষিত, নিগৃহীত ও বিজিত জাতির নষ্টগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে, পরাধীনতা প্রপীড়িত আত্ম-বিস্মৃত ভারতবাসীকে স্বাধীনতা মন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত করিতে অসাধারণ সাহস, পরাক্রম ও রণকৌশল প্রকাশ করিয়া ভারতবাসী হিন্দুর চিত্তে যুগপৎ বিস্ময় ও অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ্য চরণে অযাচিতভাবে, সঞ্জীবিত ভারতবাসীর ভক্তিশ্রদ্ধার কুসুমাঞ্জলি স্তূপীকৃত হইয়াছিল। তখন ভারতবর্ষ খণ্ডরাজ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া একপ্রাণতাশূন্য ও জাতীয়তা-বোধ-হীন হয় নাই। তখন মোগল শাসনে ভারতীয় হিন্দু জনসাধারণ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সমবেদনা, দীর্ঘনিঃশ্বাস ও সমভাগ্য-জ্ঞানের সূক্ষ্ম সূত্রের বন্ধনে কতক পরিমাণে একজাতিতে পরিণত হইয়াছিল। অতএব পুরু, প্রতাপ ও পৃথ্বীরাজ জীবদ্দশায় ভারতবাসীর নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞতা ও করতালি-ধ্বনি লাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই, শিবাজীর ভাগ্যে তাহা অনায়াসলব্ধ হইয়াছিল।* তাই সুদূর কান্যকুব্জ হইতে আকৃষ্ট হইয়া কবিভূষণ শিবাজীর কীর্ত্তিচ্ছটা অনুসরণ করিয়া রায়গড়ে উপনীত হইয়াছিলেন। উত্তর ভারতের ধনবলগর্ব্বিত, মোগল-পদলেহনকারী হিন্দুরাজগণের পরাশ্রয়-প্রসূত ক্ষমতার প্রতি মুখবিকার প্রদর্শন করিয়া, স্বভাবশিশু ভূষণ-কবি পুরস্কারের আশায় নিরাশ হইয়াও, বীরত্বের কীর্ত্তি গান করিয়া ধন্য হইতে দূরে দাক্ষিণাত্যের অরণ্যে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ত্যাগি-দাতা শিবাজী যখন ভূষণকে আশাতীত পারিতোষিকের পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা অভিভূত করিয়াছিলেন, তখন শিবাজীর স্তুতি-বন্দনায় একটু অতিরঞ্জিত ভাষার প্রয়োগ করিলেও, তাহা ভূষণের পক্ষে অপরাধের বিষয় হইত না। কিন্তু সত্য-প্রিয় স্পষ্টবাদী ভূষণ ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের যথাযথ চিত্র তাঁহার সম্মুখে অঙ্কিত করিতে যাইয়া দিল্লী দরবার হইতে বিতাড়িত হইয়াও, আত্মপ্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। তাঁহার বর্ণনা ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়াই, আজ চাঁদ-বর্দ্দাইর রাসো অপেক্ষাও ভূষণের কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য এত অধিক। "পৃথ্বীরাজ রাসো"তে পরবর্ত্তী বহু আবৃত্তিকারকদিগের স্বকপোলকল্পিত ভাবের ও ভাষার চিহ্ন সুস্পষ্ট রহিয়াছে। ভূষণের "ভূষণ-বাবনী"তেও যে অপরের তুলিকার টান ধরিতে পারা যায় না, এমন নহে। চন্দবর্দ্দাই মহাকাব্য রচনা করিয়া, ধারাবাহিক-ভাবে তাঁহার প্রতিপালক প্রভু বীরচূড়ামণি পৃথ্বীরাজের

* " * and every Hindu in the Deccan became at heart a partisan of the Mahrattas."

— M. Elphinstone.

চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে বাস্তবের সহিত কল্পনার এবং লৌকিকের সহিত অলৌকিকের অদ্ভুত সমন্বয় করা হইয়াছে। ভূষণ তাঁহার বর্ণিত বিষয়ে ঘটনার পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে আদৌ চেষ্টা করেন নাই; ইতিহাস রচনা তাঁহার উদ্দেশ্যও ছিল না। কিন্তু তাঁহার কবিতায়, তাঁহার রচনায়, তাঁহার উপমায়, তাঁহার শব্দ-যোজনায় যে বাস্তব সমসাময়িক ঘটনার ও সমাজচিত্রের ছায়া পতিত হইয়াছে, তাহা ঐতিহাসিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সুবর্ণরেখার বালুকা-স্তরে প্রচ্ছন্ন সুবর্ণ-কণিকার ন্যায় উজ্জ্বল ও মূল্যবান। ভূষণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিবাজীর জীবনের অনেক চাক্ষুষ কথা বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন, ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত মণিমুক্তার ন্যায় তাঁহার কবিতায় গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। ঐতিহাসিক তাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া কালপরম্পরা এবং ধারাবাহিক, অবিচ্ছিন্ন ঘটনাসূত্রের সহায়তায় মোতির মালা রচনা করিলে, উহা যে কোন সত্যান্বেষী সাহিত্য-রসিকের কণ্ঠশোভা সম্পাদন করিতে পারে। ভূষণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে মিশ্রভ্রাতৃগণ বলিতেছেন,—

"হর্ষকা বিষয় হৈ কি ভূষণজীকা বর্ণনা ইতিহাসকে বিরুদ্ধ নুহী হৈ ক্যোঁকি ভূষণজীকো ইতিহাসবিরুদ্ধ বনাকর বার্তেঁ লিখনা পসন্দ ন থা।"

রাষ্ট্র ভাষা।

ভূষণ হিন্দী কবি, হিন্দুস্থানে তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা হইয়াছিল। তথাপি মহারাষ্ট্রে তাঁহার আশাতীত সমাদর ও আন্তরিক অভ্যর্থনা আমাদিগের নিকট অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণ করিতেছে যে তখন হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা বা Lingua Franca ছিল, এবং উহা ভারতীয় আফগান-তুর্ক সাম্রাজ্যের বাঞ্ছনীয় পরিণাম—বিজিত-বিচ্ছিন্ন হিন্দু জাতির একতা-বন্ধনের অদ্বিতীয় উপায়স্বরূপ ছিল। বৌদ্ধযুগে সাম্রাজ্য গঠনের সুফল রাষ্ট্রভাষা পালি। তৎপরবর্ত্তী কালে পালিকে পদদলিত করিয়া পুঁথিগত সংস্কৃতকে রাষ্ট্র-ভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস সম্ভবতঃ ভারতীয় জন-সাধারণের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান ও একতা বন্ধনের উপায় অনেক পরিমাণে রোধ করিয়া দিয়াছিল এবং সুবিশাল ভারতসাম্রাজ্য খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইবার পথ সহজ ও সুগম করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তাপ্রবাহ ও জাতীয়তার গণ্ডী সৃষ্টি করিয়াছিল। বর্ত্তমান কালে বিদেশীয় ইংরাজী ভাষা সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দীর স্থান গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়া এযাবৎ বিফল-প্রযত্ন হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচলন হইলে হয় ত কালে রাজভাষা ইংরাজীই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে। আজকাল আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তিক ও প্রাদেশিক ভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য যে 'ভগীরথ প্রযত্ন' করা হইতেছে, তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবের ও স্বার্থের গণ্ডী সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবসম্পদ ও আধুনিক চিন্তাপ্রণালী বিভিন্ন ভাষার ভিতর দিয়া সমস্ত ভারতে একটা একতার ধ্বনি ও একপ্রাণতার স্পন্দন স্থাপন করিতেছে। যাঁহারা এখন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদের বাসনা কতদূর ফলবতী হইবে, বিধাতাই জানেন। কিন্তু অতীতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর আকরে যে সকল রত্নরাজি ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা উদ্ধার করিতে পারিলে, আমাদের বর্ত্তমান জীবনের অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষ নূতন আলোকে উদ্ভাসিত এবং আমাদের প্রাণ অনাঘ্রাতপূর্ব্ব আনন্দসৌরভে আমোদিত হইতে পারে।

ঐতিহাসিক উপাদান।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে যে যুগবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস অনেকে অনেকভাবে, আপন আপন প্রয়োজন ও স্বার্থ অনুসারে, যথাসাধ্য ভাষা-ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মহারাষ্ট্র বীরকেশরী শিবাজী এই বিপ্লবযুগে ভারতের নূতন শক্তিচক্রের কেন্দ্রে হিন্দুর চক্ষে উজ্জ্বল দেবমূর্ত্তি।

তৎকালবর্ত্তী বিভিন্ন জাতির স্বার্থদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার সেই অপরূপ মূর্ত্তি নানাভাবে বিকৃত হইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছে। মোগল সম্রাটের ঐতিহাসিকগণ শিবাজীর চরিত্র যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং ইচ্ছানুসারে তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাসকল যেভাবে সঙ্কুচিত, প্রসারিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে ঐতিহাসিককে নিরাশ অথবা একদেশদর্শী হইতে হয়। এজন্য শিবাজীর প্রকৃত ইতিহাস এতদিন পরে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার এত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া কতক পরিমাণে বুঝিতে হইলেও ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত হইতে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করা আবশ্যক। দেশীয় হিন্দু-মুসলমানের মুখের কথা বৈদেশিকের বর্ণনার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে। শিবাজীর জীবন আলোচনা করিতে হইলে উত্তর-ভারতের মুসলমানের উক্তি, দক্ষিণ-ভারতের মুসলমানের সাক্ষ্য, রাজপুতের কাহিনী, বৈদেশিক ইংরাজ-ফরাসী-পর্ত্তুগীজ-ওলন্দাজদিগের বিবরণ, কবির কাব্য, সমসাময়িক প্রদেশান্তরের হিন্দুর কথা এবং মহারাষ্ট্রের জনশ্রুতি, দলিলপত্র ও লিখিত বিবরণ একত্র করিয়া, তাহা হইতে সত্য উদ্ধার করিতে হইবে। টড্, এলিয়ট্,ডফ্,অর্ম্ম,উইল্‌কস্, রাণাডে ও ভাণ্ডারকর যে পথ অপেক্ষাকৃত সুগম ও সহজ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এখনও বহু নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর জীবনব্যাপী পরিশ্রমের প্রয়োজন। এখনও অনেক জনশ্রুতি উপেক্ষিত হইয়া শিক্ষার আলোক সহজ করিতে না পারিয়া কালের গর্ভে লীন হইতেছে। এখনও অনেক পাণ্ডুলিপি অমুদ্রিত অবস্থায় কীটদন্তের অপেক্ষা করিতেছে। এখনও অনেক কাব্যকথা ও পত্রাবলী ঐতিহাসিকের দৃষ্টি হইতে দূরে সন্তর্পণে অবস্থান করিতেছে। সে সমুদয়ের উচিত সম্মান ও সমন্বয় না হইলে সত্য নির্ণয় হইবে না।

কবিভূষণের কাব্য ও কবিতাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ঐতিহাসিক ডফ্ তাঁহার সুবিখ্যাত ইতিহাসের উপাদানে ভূষণের নামোল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্র-বিপ্লবের পর, ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্র দিল্লী হইতে পুণায় স্থানান্তরিত হইবার পর, মহারাষ্ট্রদেশে মরাঠীর মান হিন্দীর গৌরব অতিক্রম করিবার পর, হিন্দী কবি ভূষণের কথা সে দেশের অধিবাসীরা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল। কিন্তু ভূষণের পরিবারে ও দেশে কাব্যচর্চ্চা সাহিত্যে ভূষণকে চিরজীবী করিয়া রাখিয়াছে। শান্তিসুখ ও সমৃদ্ধির সময় এবং জাতীয় জীবনের অবসাদ কালে ধর্ম্মকাব্য ও আদিরসপূর্ণ কাব্য সাধারণ মানবের যেরূপ চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, যুদ্ধবিগ্রহ ও শৌর্য্যবীর্য্যের কথা ততদূর সময়োপযোগী ও রুচিকর হয় না। এজন্যও ভূষণের নাম কবীর, সুরদাস ও তুলসীর পশ্চাতে কতক পরিমাণে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এখন পুনরায় মহারাষ্ট্র দেশেই ভূষণ-কাব্যের বহুল প্রচার ও সমুচিত সমাদর আরম্ভ হইয়াছে। শিবাজীর সঙ্গী ও সহচর, উত্তর-ভারতের অধিবাসী, স্বাধীনচেতা, স্পষ্টবক্তা, সূক্ষ্মদর্শী ভূষণ, কাব্যের ভাষায় যে সকল ঐতিহাসিক সত্যের ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে এখন কেহ বুঝিতে পারে না—তাঁহার সমসাময়িক মহারাষ্ট্রগৃহসন্ধানী, শিবাজীর শিবির-সহচর, গুপ্ত-অস্ত্রভেদী ভিন্ন, তখনও কেহ সম্যক্ বুঝিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এরূপ অবস্থায় আমরা দুর্ব্বোধ্য প্রাচীন হিন্দী ভাষার বাধা অতিক্রম করিয়া, ভূষণকাব্য হইতে শিবজীবনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহের অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উপহাসাস্পদ হইয়াছি। কিন্তু প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইল মাত্র। হিন্দী ভাষাভাষী ও প্রাচীন হিন্দীসাহিত্যে অভিজ্ঞ কোন যোগ্যতর ব্যক্তি এই গুরুভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলে আমাদের চেষ্টা ও উদ্দেশ্য সফল হইবে।*

শিবাজীর সময়।

গ্র্যাণ্ট্ ডফ্ ও এলফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতি ঐতিহাসিকদিগকে অনুসরণ করিলে আমরা জানিতে পারি, শিবাজী

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী তাঁহার শিবাজী গ্রন্থে ভূষণের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

১৬২৭ খৃঃ মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৪৬ সনে তিনি টোর্ণা দুর্গ অধিকার করেন, তৎপর সিংহগড় এবং ১৬৪৭ খৃঃ পুরন্দর দুর্গ দখল করেন। তৎপরবর্ত্তী বৎসর রাজস্ব লুঠ করিয়া প্রকাশ্যভাবে তিনি বিজাপুরের বিদ্রোহী হন এবং আরও কয়েকটি দুর্গ ও কঙ্কণ প্রদেশ অধিকার করেন। ১৬৪৯ সনে 'ঘোরপরে' বিশ্বাস-ঘাতকতা পূর্ব্বক সাহজীকে বন্দী করিয়া শিবাজীর অবাধ্যতার জন্ম তাঁহাকে দায়ী করে। ১৬৪৯—১৬৫৩ পর্য্যন্ত শিবাজী শান্তভাব অবলম্বন করেন। সাহজীর মুক্তির পর তিনি পুনরায় নিজমূর্ত্তি ধারণ করেন। ১৬৫৫ খৃঃ ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিবাজী প্রথমতঃ তাঁহার সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মোগল নগরী 'জুনের' আক্রমণ করিয়া ঔরঙ্গজেবের বিরাগভাজন হন। তৎপর ১৬৫৮ খৃঃ বহু চেষ্টা করিয়া ঔরঙ্গজেবের সহিত পুনরায় মিত্রতা স্থাপন করেন। ঐ বৎসর ঔরঙ্গজেব পিতৃসিংহাসন অধিকার করিতে দিল্লী গমন করেন। ১৬৫৯ সনে আফজাল খাঁর সহিত শিবাজীর 'চতুরে চতুরে' মিলন ও প্রথমোক্তের প্রাণসংহার। ১৬৬০ সনে বিজাপুর হইতে প্রেরিত দ্বিতীয় সেনাদল শিবাজীকে অবরোধ করিয়াও আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। বিজাপুর-রাজ স্বয়ং সমরে অবতীর্ণ হইয়া শিবাজীকে সঙ্কটাপন্ন করিলেন বটে, কিন্তু পরাজয় করিতে পারিলেন না। দুই বৎসর পর শাহজীর মধ্যস্থতায় বিজাপুরের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল। ১৬৬১ সনে শ্রীমৎ রামদাস স্বামীকে তিনি ধর্ম্মগুরুর পদে বরণ করেন। ১৬৬২ খৃঃ মোগল নগরী ঔরঙ্গাবাদ লুণ্ঠন। তৎপর সায়েস্ত খাঁর সহিত শিবাজীর লুকোচুরী খেলা। যুবরাজ মোয়াজিম ও যশোবন্তসিংহ শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। মোগল সেনাপতিরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি করিয়া ক্ষীণবল হইলেন। ১৬৬৪ সনে অকস্মাৎ শাহজীর মৃত্যু হইল। শিবাজী সুরত বন্দর লুঠ করিলেন এবং লুণ্ঠন-লব্ধ ধনরত্ন রায়গড়ে সঞ্চিত করিয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন।* তৎপর ১৬৬৫ খৃঃ শিবাজীর জলপথে অভিযান। এই সময় রাজা জয়সিংহ ও দিলার খাঁ শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। ১৬৬৫ খৃঃ সিংহগড় দুর্গ জয়সিংহ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল, দিলার খাঁ পুরন্দর অবরোধ করিলেন। শিবাজী বিপন্ন হইয়া মোগলদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং বিজাপুরের বিরুদ্ধে তাহাদিগের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৬৬৬ খৃঃ শিবাজী ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মোগল দরবারে গমন করেন এবং তথায় অপমানিত ও অবরুদ্ধ হইয়া কৌশলে পলায়ন করেন। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে তিনি রায়গড়ে উপস্থিত হইলেন। ১৬৬৭ খৃঃ পুনরায় মোগলদিগের সহিত শত্রুতা করিয়া যশোবন্তসিংহ ও রাজকুমার মোয়াজিমের মধ্যস্থতায় সম্রাটের সহিত নূতন সর্ত্তে সন্ধি স্থাপিত করেন। তৎপর বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার নিকট কর আদায় করিয়া স্বরাজ্যের ব্যবস্থাতে তিনি পরবর্ত্তী দুই বৎসর অতিবাহিত করেন। চতুর ঔরঙ্গজেব কৌশলে শিবাজীকে বন্দী করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সহিত পুনরায় শত্রুতা ঘোষণা করেন। ১৬৭০ সনে শিবাজী সিংহগড় পুনরায় অধিকার করিয়া মোগলরাজ্য লুণ্ঠন করেন, সুরাত বন্দর দ্বিতীয় বার লুণ্ঠন করেন এবং সর্ব্বপ্রথম চৌথের দাবী করেন। ১৬৭১ সনে মহাবত খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, ১৬৭২ সনে খাঁ জহাঁ দাক্ষিণাত্যের সমর পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন। তৎপর উত্তর ভারতের অশান্তি সম্রাটের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং কিছুদিন মহারাষ্ট্র দেশ মোগলদিগের দৃষ্টি বহির্ভূত থাকে। এই সময়ে (১৬৭৪) যথারীতি শিবাজীর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ১৬৭৬-৭৭ খৃঃ শিবাজী কর্ণাট প্রদেশে তাঁহার পিতার জায়গীর অধিকার করেন। অতঃপর তিনি বিজাপুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া মোগলদিগের সহিত

* —"and set himself up as an independent Sovereign, with Raighar near Puna, as his Capital, coining money and assuming the title of Raja."—
A. D. Innes.

যুদ্ধ করেন। ১৬৭৯ খৃঃ শম্ভাজী পলায়ন করিয়া মোগল-দিগের দলভুক্ত হয়, এবং পরে পিতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৬৮০ খৃঃ ৫ই এপ্রেল হঠাৎ অসুস্থ হইয়া ৫৩ বৎসর বয়সে শিবাজী শেষলীলা সাঙ্গ করেন।

"শিবরাজ ভূষণে" ১৬৫৯ হইতে ১৬৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত শিবাজীর জীবনের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৫৯ সনের ৬ কবিতা; ১৬৬২ সনের ১২ কবিতা, ১৬৬৩ সনের ৩ কবিতা, ১৬৬৪ সনের ২ কবিতা, ১৬৬৬ সনের ১০ কবিতা, ১৬৬৯ সনের ১ কবিতা, ১৬৭০ সনের ৫ কবিতা, ১৬৭২ সনের ৭ কবিতা এবং ১৬৭৩ সনের ১২ কবিতা মিশ্রভ্রাতৃগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৬৬২ সনের ১২ কবিতায় রায়গড় বর্ণিত হইয়াছে। শিবা-বাবনীতে ১৬৫৮ হইতে ১৬৮০ সনের দ্যোতনা আছে। কিন্তু উহার শ্লোক সংখ্যা সর্ব্বসমেত ১৭ মাত্র। স্ফুট-কাব্যের ৯টি কবিতার ১৬৬৪ হইতে ১৭১৫ সন পর্য্যন্ত কোন কোন ঘটনার কথা বলা হইয়াছে।

ভূষণের তুলিকায় শিবাজী

ভূষণ বিরচিত কবিতাবলী হইতে উপাদান আহরণ করিয়া আমরা নিম্নলিখিত ভাবে ছত্রপতি শিবাজীর জীবনের রেখাচিত্র অঙ্কিত করিতে পারি—

সূর্য্যবংশে এক প্রতাপশালী নরপতি, শঙ্করের চরণে স্বীয় মস্তক (শিরঃ) উপহার প্রদান করিয়া শিসোদিয়া নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বংশে ভালমকরন্দ জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধর রাজা সাহজী ভোঁসলা। দানী রাজা সাহজীর পুত্র শিবরাজ ছত্রপতি বা শিবাজী। শিবাজী শ্রীশঙ্করদেবের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি অতিশয় উদার, দানী ও সাহসী ছিলেন। এই সময়ে দক্ষিণ দেশে কয়েকটি মুসলমান 'শাহী' রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং উত্তরে মোগলদিগের সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীনগর, নেপাল, মেওয়ার, ঢুঁঢার, মারবাড়, বুন্দেলখণ্ড, ঝারখণ্ড এবং পূর্ব্ব পশ্চিম প্রান্তের সকল রাজাই (অর্থাৎ রাণা, হাড়া, রাঠোর, কছবা, গৌর প্রভৃতি) মোগলদিগকে কর প্রদান করিতেন। এইরূপ অবস্থায় শিবাজীর মনে চক্রবর্ত্তী রাজ্য স্থাপনের উচ্চাভিলাষ জাগিয়াছিল। তিনি বাল্যাবস্থাতেই বীজাপুর গোলকুণ্ডা জয় করিলেন, যৌবনে দিল্লীশ্বরকে পরাজয় করিলেন এবং পুনরায় দিল্লী সাম্রাজ্যের হিন্দুপ্রজাগণ বেদপুরাণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল এবং দেবদ্বিজের প্রতি সম্মান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। শিবাজী সর্ব্বপ্রথম বিজাপুরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৬৫৫ খৃঃ অব্দে তিনি চন্দ্রাবনকে বধ করিয়া জাওলী দখল করেন। তৎপর ঔরঙ্গজেব সহোদর দারা ও মুরাদকে বধ করিয়া পিতা সাহজহাঁকে কারারুদ্ধ করিয়া সাহসুজাকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। আদিলশাহ সুবৃহৎ সেনাসহ আফজল খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আফজলের সহিত শিবাজীর নির্জ্জনে মিলিত হইবার কথাবার্ত্তা স্থির হয়। আফজল বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক শিবাজীর মস্তকে অস্ত্রাঘাত করে। শিবাজী ধূর্ত্তের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং তাহাকে বধ করিবার জন্য বর্ম্মাবৃত কলেবর হইয়া অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। অতএব আফজলের মুখে বীছু নামক অস্ত্র প্রহার করিয়া খড়্গা-ঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। তৎপর শিবাজী আফজলের সৈন্যদলকে পরাভূত করিলেন। শিবাজী শৃঙ্গারপুরী অধিকার করিলেন (১৬৬১)। তৎপর (১৬৬২) রাজগড় পরিত্যাগ করিয়া রায়গড়ে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি দক্ষিণদেশের প্রায় সমস্ত দুর্গই অধিকার করিয়াছিলেন এবং অনেক নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মোগলসম্রাট শিবাজীকে প্রবল হইতে দেখিয়া যোধপুরের মহারাজা যশোবন্তসিংহ এবং সাইস্তা খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন (১৬৬৩)। সাইস্তা খাঁ একলক্ষ সৈন্যসহ পুণা অধিকার করিয়া তথায় অবস্থান করিলেন। শিবাজী চতুরতা পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। তৎপর অহমদনগরের যুদ্ধে তিনি নৌশরী খাঁ (খানদৌরা) কে পরাস্ত করেন। পরবৎসর তিনি সুরাত বন্দর লুঠ করেন, এবং মক্কাযাত্রী অনেক সৈয়দ-

দিগের মানও লুণ্ঠন করেন। ঔরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হইয়া জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহের অধীনে বিপুল সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করেন। শিবাজী হিন্দুর শোণিতপাতে অনিচ্ছুক হইয়া অনেক দুর্গ জয়সিংহের করে সমর্পণ করিয়া সন্ধি করিলেন। তৎপর তিনি দিল্লী গমন করিলেন। ঔরঙ্গজেব অভিমান করিয়া শিবাজীকে পাঁচ হাজারী সরদারদিগের মধ্যে দাঁড় করাইলেন। শিবাজী অপমানিত হইয়া ক্রোধভরে ঔরঙ্গজেবকে 'সেলাম' করিলেন না এবং অবজ্ঞাভরে 'গোঁপে তা দিতে' লাগিলেন। তাঁহার বিক্রম দেখিয়া রাজসভার সকলে নিস্তব্ধ হইল। শিবাজীর হাতে তখন অস্ত্র ছিল না তাই রক্ষা। ঔরঙ্গজেব গোসলখানায় লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। তৎপর শিবাজী বন্দী হইলেন, কিন্তু কৌশল ও চতুরতা দ্বারা পলায়ন করিয়া রায়গড়ে উপনীত হইলেন।

ঔরঙ্গজেব হিন্দুদিগের মথুরা ও কাশী প্রভৃতি তীর্থ-স্থানের বহু মন্দির ধ্বংস করিয়া তথায় মসজিদ নির্ম্মাণ করাইলেন (১৬৬৯)। শিবাজী পুনরায় সুরাত লুঠ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলেন (১৬৭০) এবং উদয়ভাল রাঠুরকে বধ করিয়া সিংহগড় দুর্গ মোগলদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। মোগলেরা শিবাজীর ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া দিলের খাঁ ও ইখলাসখাঁর অধীন বিরাটসেনা প্রেরণ করে। কিন্তু শিবাজী সলহেরি নামক স্থানে এই সৈন্যগণকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করেন (১৬৭২)। এই যুদ্ধে দিল্লীশ্বরের ৩৩ জন সেনা-পতি শিবাজীর হস্তে বন্দী হন এবং কিশোর সিংহ, মোহকম সিংহ, ভাউ সিংহ, করণ সিংহ, সফদরজঙ্গ, তলব খাঁ প্রভৃতি বীর সেনাপতিগণ পরাজিত হন; তৎপর দিলের খাঁকেও পরাজিত করিয়া শিবাজী রাম-নগর এবং হবার নামক স্থানে শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করেন ও গুজরাতের দর্প খর্ব্ব করেন।

ইহার পর আদিল শাহার নাবালগ পুত্রের অভি-ভাবক খওয়াস খাঁর নিকট কিছু দেশ প্রার্থনা করিয়া শিবাজী বিফল মনোরথ হইলেন (১৬৭৩)। তাহাতে শিবাজী মাত্র দুই দিনে 'ধাওয়া' করিয়া পরনালের দুর্গ অধিকার করিলেন এবং কর্ণাটের সীমাপর্য্যন্ত সমস্ত দেশ পদদলিত করিলেন। ইহার পর খওয়াস খাঁ বহলোল খাঁকে শিবাজীর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি মরাঠাদিগের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া মুক্তি ক্রয় করিতে বাধ্য হন। অনন্তর করনাটক বশীভূত করিতে শিবাজীর দীর্ঘকাল অতি-বাহিত হইয়াছিল (১৬৭৬—৭৮)। এই সময়ই শিবাজীর প্রতাপ তুঙ্গস্থানে আরোহণ করিয়াছিল। ইরানী ও ফিরিঙ্গীরা (সম্ভবতঃ ইউরোপীয়ন) এবং পর্ত্তুগালবাসীরা ইঁহাকে 'নজর' (উপঢৌকন) পাঠাইতে ছিলেন। বীজাপুর এবং গোলকুণ্ডা ইঁহার ভয়ে সশঙ্ক ছিলেন এবং ঔরঙ্গজেবের রাজ্য নর্ম্মদা নদীর উত্তর সীমানা পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়াছিল। শিবাজীর দলশক্তি, নৌসেনা, অস্ত্রশস্ত্র, অভিষেক ধনরত্নের অক্ষয় ভাণ্ডার এবং তাঁহার দৈবশক্তি ও দেবত্ব যথাস্থানে ভূষণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা বারান্তরে ভূষণের মূল কবিতা উদ্ধৃত করিয়া এই সকল বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিতে অভিলাষ করি।

শিবাজীর শেষ, ভূষণের তুলিকা চিত্রিত করিতে বিরত হইয়াছে। অতএব এই খানেই ভূষণ বর্ণিত শিবাজীর আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইয়াছে। ভূষণ তাঁহার কাব্য নায়কের জীবনের উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা, প্রতাপ, বিক্রম ও গৌরব বর্ণনা করিয়াই সুখী ও পরিতৃপ্ত। তাঁহার লেখনী যাঁহাকে অমর করিয়াছে, তাঁহার মৃত্যু অসম্ভব। ভূষণ, রামাবতার শিবাজীর নশ্বর দেহের বিনাশের কথা উল্লেখ করেন নাই। আমরাও বিশ্বাস করি, শিব-সেবক-শিরসরোজা কীর্ত্তিশরীরে যুগ যুগান্তর ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইয়া, দেশবাসীর শ্রদ্ধা-ভক্তি-মণ্ডিত হইয়া, আমাদের স্মৃতির মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। (অসম্পূর্ণ)

৺রসিকলাল রায়।

পাটলীপুত্র ও ভারতে জরথুস্ত্রীয় রাজবংশ *

১৯১৫ সালের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডাক্তার ডি, বি স্পুনার এক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে পাটলীপুত্রের কুমরাহার পল্লীতে তথা কথিত চন্দ্রগুপ্তের প্রসাদ পারস্যসাম্রাজ্যের পার্সিপোলিস নামক নগরস্থিত ডেরায়াসের প্রাসাদের অনুকরণে নির্ম্মিত এবং চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি মৌর্য্যবংশীয় রাজগণ পারসীক ছিলেন—এমন কি বুদ্ধদেব পর্য্যন্ত পারসীক। তাঁহার এই চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে এ প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা প্রবন্ধটিকে নিম্ন-লিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিব। (১) কুমরাহার পল্লীতে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ ছিল কিনা? (২) যদি ছিল তবে তাহার সহিত পার্সিপোলিসের প্রাসাদের সাদৃশ্য আছে কিনা (৩) যুধিষ্ঠিরের রাজসভার সহিত চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের সাদৃশ্য ও ময়দানব কে? (৫) পারসীকগণই কি শক, যবন, দৈত্য, দানব, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতি? (৫) চন্দ্রগুপ্ত কি পারসীক? (৬) বুদ্ধদেব পারসীক কি না?

কুমরাহার পল্লীতে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ ছিল কি না আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান পাটলীপুত্র নগরের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

[পাটলীপুত্রের বর্ত্তমান চতুঃসীমা]

বর্ত্তমান পাটনা বাঁকীপুর নগরই পূর্ব্বের পাটলীপুত্র ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এখানে গঙ্গা নদী প্রায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিতা। নদীর সহিত সমান্তরাল ভাবে পশ্চিম হইতে বাঁকীপুর, মুরাদপুর, ভিখনাপাহাড়ী, মাহেন্দ্রু, গুলজারবাগ, পশ্চিম দরোয়াজা, পাটনা সহর প্রভৃতি পল্লীগুলি অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে বাঁকীপুর ষ্টেশনের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া একটা দীর্ঘ জলাভূমি, ইহার পূর্ব্বাংশে স্থানে স্থানে সংবৎসর ধরিয়া জল থাকে। ইহার দক্ষিণে রেলওয়ে লাইন। জলাভূমির দক্ষিণে স্থানে স্থানে উচ্চ ভূখণ্ড আছে, তাহার উপর দিয়া রেলওয়ে লাইন গিয়াছে। রেলওয়ের দক্ষিণে নাতি-বিস্তৃত উচ্চ ভূখণ্ডের পরেই আবার নিম্নভূমি আরম্ভ হইয়াছে। নগরের দক্ষিণের জলাভূমি ও রেলওয়ের দক্ষিণের নিম্নভূমি দিয়া একদিন শোণ নদ প্রবাহিত হইত। এজন্য এসকল স্থানকে "মরা শোণ" বলে। বাঁকীপুরের পশ্চিমেও আর একটি মরা শোণের খাত দৃষ্ট হয়। এই খাতের পশ্চিমে পাটনা হাইকোর্টের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। অধিক বর্ষার সময় এখনও এই সকল খাতে শোণের জলপ্রবাহ আসিয়া থাকে। বাঁকীপুর ও পাটনার মাঝামাঝি গুলজারবাগ নামক একটি ষ্টেশনে কয়েক বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গুলজারবাগ ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে অর্থাৎ বাঁকীপুর ষ্টেশনের প্রায় ৪ মাইল পূর্ব্বে রেল লাইনের কয়েকপদ দক্ষিণে কুমরাহার পল্লী অবস্থিত।

পুরাতন পাটলীপুত্রের চতুঃসীমা এখনও নির্ণীত হয় নাই। মেগাস্থিনিস সর্ব্বপ্রথমে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্রের বিবরণ প্রদান করেন।

[পুরাতন অবস্থান]

সেই বিবরণ হইতে জানা যায় পাটলীপুত্রের চারিদিকে কাঠের প্রাকার ছিল। নগর গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গমে অবস্থিত। প্রাকারের চারিপার্শ্বে ৪০০ হাত বিস্তৃত পরিখা ছিল। বর্ত্তমান নগরের দক্ষিণে যে জলাভূমি আছে অনেকেই তাহাকে নগরের দক্ষিণ পরিখা মনে করেন। ওয়াডেল সাহেবও বলিয়াছেন এই জলা স্থানে স্থানে ৪০০ হাত বিস্তৃত। সুতরাং ইহাই যদি নগরের দক্ষিণ পরিখা হয় তাহা হইলে কুমরাহার পল্লী নগরের বাহিরে হয়। ওয়াডেল সাহেব রেলওয়ের উত্তরে ভূগর্ভে কয়েক স্থানে যে কাষ্ঠ প্রাকারের চিহ্ন

* যশোহর নবম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

দেখিয়াছিলেন, সে প্রাকারগুলি পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। আবার এই ভিন্ন ভিন্ন স্থানগুলি একটি রেখাদ্বারা সংযুক্ত করিলে এই রেখাটিও পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জলাভূমিকে দক্ষিণ সীমানা ধরিয়া এই কাষ্ঠপ্রাকারকে নগরের দক্ষিণ সীমা ধরিলেও কুমরাহার-পল্লী নগরের বাহিরে পড়ে। স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কাষ্ঠ প্রাকারের ও রেলওয়ের ঠিক দক্ষিণে

চতুর্দ্দিকে চন্দ্রগুপ্তের শত্রু। কে কখন তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবে সেই জন্য তিনি এবং তাঁহার মন্ত্রী কৌটিল্য সর্ব্বদাই সতর্ক। এমন রাজা কি নগরের বাহিরে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে পারেন? চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর ১০০ বৎসরের অধিক কাল পরে আসিয়া ফাহিয়ান পাটলীপুত্রের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে

ফা হিয়ান ও যুয়ান চোয়াং



কুমারাহারে খনিত স্থানের দৃশ্য

এবং কুমরাহার পল্লীর উত্তরে ভূগর্ভ খনন করিয়া ১০০০ ফুট দীর্ঘ ঘাট পাইয়াছিলেন।

মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় বেশ বুঝা যায় যে সমস্ত নগর এই কাষ্ঠ প্রাকারের মধ্যে ছিল। মুদ্রারাক্ষসে দেখিতে পাই, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সুগঙ্গ প্রাসাদের একতালার ছাদে উঠিয়া গঙ্গা দেখিতে পাইতেছেন। সুতরাং যেমন করিয়াই ধরি, চন্দ্রগুপ্তের যুগে নগরের বাহিরে তাঁহার কোন প্রাসাদ ছিলনা ইহাই মনে হয়।

পাই, অশোকের ভ্রাতা মহেন্দ্রের জন্য নগরের মধ্যে পর্ব্বতগুহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গুহা নির্ম্মাণের প্রবাদ যদি সত্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, অশোকের প্রাসাদও নগরের মধ্যে ছিল। অবশ্য অশোক নির্ম্মিত স্তূপ, বিহার, নীলীনগর পাটলীপুত্র নগরের বহির্দ্দেশেই অবস্থিত ছিল। এই নীলীনগর যে অশোকেরই নির্ম্মিত তাঁহার লিখিত প্রমাণ ফাহিয়ান দেখিয়াছিলেন। এই কুমরাহারের প্রাসাদের ধ্বংসা-

বশেষ অশোকের হইলেও হইতে পারে কিন্তু ইহা কিছুতেই চন্দ্রগুপ্তের হইতে পারে না।

অশোকের পরলোক-প্রাপ্তির প্রায় ৭০০ বৎসর পরে ফাহিয়ান এদেশে আসিয়াছিলেন ; ইহার মধ্যে কত রাজা পাটলীপুত্রে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে অশোক যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ফা হিয়ান অন্য কোন রাজার পাহাড়ী-স্থিত স্তূপটিকে অশোকের প্রথম চৈত্য ধরিলে, তাহা নগর প্রাকার হইতে প্রকৃতই ৩ লি বা অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে হয়। কিন্তু কুমরাহারের ৩।৪ শত পদ দক্ষিণে কোন বিহারের চিহ্ন নাই, সমস্তই শোণের খাত। য়ুয়ান চোয়াং যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে কোন দূরত্ব দেওয়া নাই। সুতরাং অশোক-নির্ম্মিত স্তূপের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অশোকের প্রাসাদ ছিল ঠিক একথা না



অবিকৃত কাষ্ঠময় ছাদ বা ভিত্তি

নাম মাত্র করেন নাই। কেবল বৌদ্ধ রাজা অশোকের কীর্ত্তিকথাই ঘোষিত করিয়াছেন। সুতরাং ৭০০ বৎসর পরে লিখিত বিবরণের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায় না। তথাপি যদি ধরা যায় যে কুমরাহারের ধ্বংসাবশেষই অশোক নির্ম্মিত নীলীনগরের ধ্বংসাবশেষ, তথাপি সন্দেহ নিরাকৃত হয় না। কারণ, কুমরাহারের দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থিত 'ছোটি পাহাড়ী' ও 'বড়ি পাহাড়ী' নামক গ্রামদ্বয়ের মধ্যে আবিষ্কৃত স্তূপগুলির মধ্যে ছোটি থাকিলে কুমরাহারের ধ্বংসাবশেষকে অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলা যায় না। তবে যদি অন্য কোন প্রমাণ-বলে স্থিরীকৃত হয় যে, কুমরাহারেই অশোকের প্রাসাদ ছিল, তবে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ফা হিয়ান ওয়ুয়ান চোয়াং যে এই প্রাসাদের সম্পর্কে চন্দ্রগুপ্তের নাম-গন্ধ করেন নাই, ইহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

(২)

কুমরাহার পল্লীতে কি কি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং

তাহার সহিত পার্সিপোলিসের প্রাসাদের কোন সাদৃশ্য আছে কি না, এইবার তাহার আলোচনা করিব। স্পুনার সাহেব Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle, for 1913-14 নামক পুস্তকে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।



হেলিয়া পড়া অভগ্ন স্তম্ভ

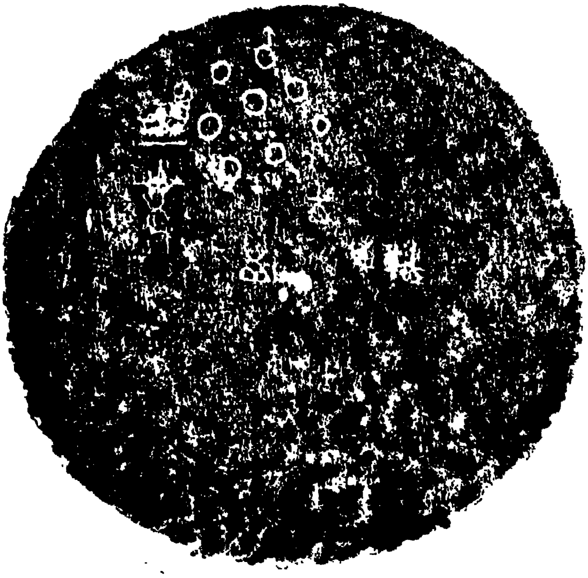
মৃত্তিকা খনন-কালে ৭ ফুট নিম্নে গুপ্তযুগের ইষ্টকালয়ের ভিত্তি পাওয়া যায়। তন্নিম্নে ২ ফুট গভীর মৃত্তিকায় পরিণত ভস্ম ও তাহার নিম্নে ৮ ফুট গভীর গঙ্গার* পলি-মাটি। ইহার নিম্নে পুষ্করিণীর পঙ্কের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকার স্তর। ইহার মধ্যে গলিত কাষ্ঠের অংশ পাওয়া গিয়াছে। স্পুনার সাহেব বলেন, এই খানেই মৌর্য্য যুগের ভিত্তি ছিল। যখন ভস্মের স্তর খনন করা হয়, তখন স্থানে স্থানে গোলাকার প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্নাংশ ভস্মের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়। প্রথমে ইহার আবিষ্কারে কোন শৃঙ্খলা দেখা যায় নাই। অবশেষে দেখা গেল, ২৫ ফুট অন্তরে এই ভগ্নাংশগুলি স্তূপাকারে আছে। তখন ১৫ ফুট ব্যবধানে খনন করিতে করিতে ৮২ টি স্থানে

[স্তম্ভের স্থান]

এইরূপ গোলাকার প্রস্তর-স্তম্ভের ভগ্নাংশ রাশিকৃত হইয়া আছে দেখা গেল। এই স্থানগুলির মধ্যে কয়েকটি স্থান খনন করিয়া মৃত্তিকায় পরিণত ভস্ম, স্তম্ভের ভগ্নাংশ ও ইষ্টক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ভস্মাদি সাবধানে খনন করিলে দেখা গিয়াছে যে, রন্ধ্রটি ঠিক কূপের ন্যায় হইয়াছে। কোন স্তম্ভাংশেই কোন খোদিত লিপি পাওয়া যায় নাই।

ইহা হইতে স্পুনার সাহেব অনুমান করেন, যেস্থানে ২৪ ফুট নিম্নে কৃষ্ণবর্ণের স্তর দেখা যাইতেছে, সেইখানে কাষ্ঠের ভিত্তির উপরে ২॥ ফুট ব্যাসের প্রস্তর-স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভগুলি, তাঁহার মতে, পাদপীঠ ও শীর্ষ-সমেত ২৫ ফুট উচ্চ। তাহার উপরে কাষ্ঠের ছাদ ছিল। শোণের বন্যায় এই গৃহের মধ্যে ৮ ফুট পলি সঞ্চিত হইবার পরে অগ্নি সংযোগে কাষ্ঠের ছাদ ভস্ম হইয়া যায়। অগ্নি-সংযোগের সময় কোন কোন স্তম্ভ ফাটিয়া যায়। কাষ্ঠের ভিত্তি গলিত হইলে যখন প্রস্তর-স্তম্ভগুলি বসিয়া গিয়া ভস্মস্তরের নিম্নে চলিয়া গেল, সেই সময়ে গুপ্তবংশীয় রাজগণ (ডাক্তার মার্শালের মতে) খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে ভস্মের স্তর ১ ফুট আন্দাজ রাখিয়া তাহার উপর ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করে। পরে স্তম্ভগুলি মৃত্তিকার নিম্নে আরও বসিয়া গেলে, উপর হইতে ভস্ম, ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড আসিয়া শূন্য রন্ধ্র পূর্ণ করিল।

* স্পুনার সাহেব ভুল করিয়াছেন। ইহা শোণের পলি হইবে।—লেখক।



স্তম্ভের ভিত্তিমূলস্থ ব্যাস

অন্ততঃ ছুইটি স্থানে স্তম্ভ বসিয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ বন্যার পরেই ১টা স্তম্ভ হেলিয়া পলি-মাটির মধ্যেই ডুবিয়া যায়। ইহা অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ইহার উচ্চতা ১৪ ফুট কয়েক ইঞ্চি। আর ভিত্তির এক স্থানে কাষ্ঠ নষ্ট হয় নাই। সুতরাং ধরিতে হইবে, এখানে স্তম্ভটি কেহ খনন করিয়া উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে।

এই রিপোর্ট যখন লিখিত হয়, স্পুনার সাহেব তখন ২৫ ফুট স্তম্ভের উপরে একটি ছাদই কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু "ভারতের জরথুস্ত্রীয় যুগ" নামক প্রবন্ধে তিনি ৩টি ছাদ কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং এতগুলি বন্ধন মুক্ত হইয়া যেখানে ১টি স্তম্ভ পড়িবে, সেখানে আরও ২।৪টি আকর্ষণে পতিত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যখন একস্থানে কাষ্ঠ অবিকৃত থাকিল, তখন অন্য স্থানের ভিত্তিগুলি একেবারে গলিত হইল কেন? * যখন দেখা যাইতেছে, পলির উপরে সর্ব্বত্র ১ফুট ভস্ম, তখন স্তম্ভের রন্ধ্রমধ্যে ৮ ফুট উচ্চ ভস্ম কোথা হইতে আসিল? যেরূপ বন্যাই হউক, অল্পদিনে কিছু ৮ ফুট পলি জমে না। যতদিনে ৮ ফুট পলি জমিবে, ততদিন কি কাষ্ঠের ছাদ ভস্ম হইবার মত উপযুক্ত অবস্থায় থাকিবে?

যাহারা বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিল, তাহারা কি প্রস্তর-ভিত্তি গড়িতে জানিত না? স্পুনার সাহেব বলিয়াছেন, প্রায় সমস্ত স্তম্ভই মৃত্তিকানিম্নে বসিয়া গিয়াছে, কারণ ৮ ফুট পলি জমিবার পরে এগুলিকে তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য পরিশ্রমও হইবে, অন্যত্র লইয়া যাইতে হইলে অর্থব্যয়ও হইবে। আর, তুলিয়া লইলে, রন্ধ্রগুলি ঠিক গোলাকার হইবে কেন? যাহারা স্তম্ভ তুলিয়া লইবে তাহারা ভস্ম ইষ্টক ও স্তম্ভের ভগ্নাংশ দিয়া রন্ধ্রগুলি বন্ধ করিবে কেন?—ইহার উত্তরে আমরাও তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে পারি, যাহারা গুপ্তযুগের ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া তিনি অনুমান করিতেছেন, তাহারাই বা ভগ্নস্তম্ভের অংশগুলি ঠিক স্তম্ভের উপরেই স্তূপাকার করিবে কেন? আর, রন্ধ্রপথে ৮ ফুট ভস্মই বা কোথা হইতে আসিবে? যদি মনে করা যায় যে পলির মধ্যে স্তম্ভ কিছুদূর বসিয়া গেলে তবে গুপ্তরাজগণের ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও এ সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ, যতবড় কাষ্ঠের ছাদই হউক, প্রত্যেক স্থানে ৮ ফুট গভীর ভস্ম কিছুতেই জমিতে পারে না। তিনি ৫৫ ফুট পর্য্যন্ত খনন করিয়া দেখিয়াছেন,—কোথাও কি অদৃশ্য স্তম্ভগুলির কোন চিহ্ন পাইয়াছেন?

[পার্সিপোলিসের সহিত সাদৃশ্য]

যাহা হউক, যদি তর্কের খাতিরে স্বীকারই করা যায় যে, যাহা তিনি স্তম্ভের স্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন, সেখানে প্রকৃতই একদিন স্তম্ভ ছিল, তথাপি এই স্তম্ভ-গৃহের সহিত পার্সিপোলিসের প্রাসাদের যে

* অন্যান্য স্থানে কোথাও কাষ্ঠ মৃত্তিকায় পরিণত হয় নাই। ওয়াডেল সাহেব ৫।৬ স্থানে কাষ্ঠ প্রাকারের চিহ্ন পাইয়াছেন। এই সমস্ত স্থান কুমরাহারের মৌর্য্য-ভিত্তির সহিত এক সমতলে অবস্থিত।

সাদৃশ্য তিনি কল্পনা করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই ভিত্তিহীন। এখানে তিনি ৮ সারিতে ১০টি করিয়া ৮০টি স্তম্ভের স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন। পরে আরও দুইটি বাহির হইয়াছে। এই স্তম্ভ-গৃহের মধ্যভাগের দক্ষিণে অৰ্দ্ধেক দৈর্ঘ্য ব্যাপিয়া একটি চতুষ্কোণাকার মৃন্ময় স্তূপ আছে। ইহার দূরত্ব ২০০ ফুট। এই স্তূপের ২৫০' ফুট উত্তর-পশ্চিমে আর একটি স্তূপ আছে।

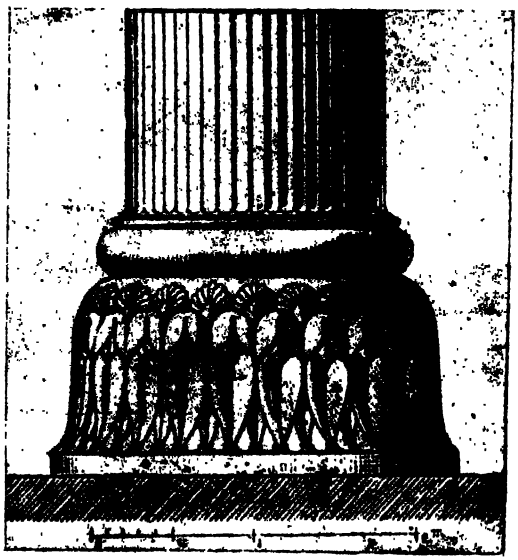
পার্সিপোলিসে ডেরায়াসের শত-স্তম্ভ সমন্বিত গৃহের ২০০ ফুট দক্ষিণে, উক্ত গৃহের দৈর্ঘ্যের এক-তৃতীয়াংশ দীর্ঘ একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহা জারাক্সীসের প্রাসাদ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার পশ্চিম পার্শ্বে দুইটি পৰ্ব্বত আছে। উত্তর দিক্‌বর্ত্তী পর্ব্বতের পশ্চিমে ও জারাক্সীসের প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিমে ৩৫০ ফুট দূরে ডেরায়াসের প্রাসাদ আছে।

পার্সিপোলিসের প্রাসাদাবলী পর্ব্বতের উপরে নির্ম্মিত একটি চত্বরের উপরে অবস্থিত। কুমরাহারের ধ্বংসাবশেষও একটা উচ্চ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত। কুমরাহারে প্রাপ্ত স্তম্ভের পালিশ নাকি পারসীক স্তম্ভের ন্যায়। আর পার্সিপোলিসের স্তম্ভে যেমন শিল্পীদিগের একরূপ চিহ্ন আছে, এখানেও, ঠিক সেরূপ না হউক, কতকটা সেইরূপ চিহ্ন স্তম্ভে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এইবারে আমরা দেখাইব, সাদৃশ্যের অভাব কতটা।

[সাদৃশ্যের অভাব] Perrot ও Chipiez প্রণীত History of Art in Persia নামক ফরাসী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদে পার্সিপোলিসের প্রাসাদের নক্সা আছে। [প্রাসাদ সংখ্যা] তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে চত্বরের উপরে মোট ৮টি প্রাসাদ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটি ডেরায়াসের শতস্তম্ভ-সমন্বিত সিংহাসন-গৃহ। জারাক্সীস ও ডেরায়াসের প্রাসাদ ব্যতীত আরও দুইটি স্তম্ভ-সমন্বিত বৃহৎ প্রাসাদের নক্সা আছে। সুতরাং কুমরাহারে ৩টি প্রাসাদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইলেই সাদৃশ্য সম্পূর্ণ হইল না। এখানে ৮২টি স্তম্ভের স্থান আবিষ্কৃত হওয়াতেই, অবশিষ্ট ১৮টি আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ডেরায়াসের শতস্তম্ভ-সমন্বিত সিংহাসন-গৃহের বারাণ্ডায় আরও ১৬টি স্তম্ভ আছে।

এখানে যে সকল স্তম্ভ বা স্তম্ভের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সমস্তগুলিই মসৃণ ও গোলাকার। [স্তম্ভের তুলনা] কিন্তু পার্সিপোলিসের প্রস্তর-স্তম্ভগুলি সমস্তই পল-তোলা এবং নিম্নের ব্যাস অপেক্ষা উদ্ধের ব্যাস অল্প। একথা স্পুনার সাহেব স্বীকার করিয়াছেন।



পার্সিপেলিসে স্তম্ভের নমুনা

পার্সিপোলিসের জারাক্সীস ও ডেরায়াসের প্রাসাদের স্থানে এখানে যে দুইটি মৃৎস্তূপ আছে, তাহার একটি খনন করা হয় নাই। আর একটিতে মৌর্য্য-যুগের প্রাসাদের যৎসামান্য চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

এখানকার স্তম্ভগুলির দূরত্ব ১৫ ফুট, আর পার্সিপোলিসে দুইটি স্তম্ভের মধ্যে ব্যবধান ২১ ফুট। তজ্জন্য [হস্তের পরিমাণ] স্পুনার সাহেব বলেন, কুমরাহারে মৌর্য্যদিগের ১৮ ইঞ্চি হাতের ১০ হাত ও পারসীকদিগের ২৫ এক-তৃতীয়াংশ ইঞ্চি ১০ হাত ধরিলেই এই সাদৃশ্যাভাব অন্তর্হিত হয়। ইংরাজ ভারতে ৩৬ ইঞ্চি ইয়ার্ড প্রচলন করিবার পূর্ব্বে এদেশে যে

গজ ব্যবহৃত হইত, তাহাতে ১৮ ইঞ্চি হাত কখনও ধরা হয় নাই। অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে, প্রাসাদ নির্ম্মাণে ৪২ অঙ্গুলিতে হাত ধরা হইত এবং ২৪ অঙ্গুলিতে প্রাজাপত্য হস্ত ও ২৮ অঙ্গুলিতে ১ হাত হইত।

[স্তম্ভের শীর্ষের পরিমাণ]

পার্সিপোলিসে নানারূপ মাপে ঠিক হইয়াছে, স্তম্ভের উচ্চতা, পাদপীঠ ও স্তম্ভ-শীর্ষ-সমেত ৩০ ফুট ও স্তম্ভের নিম্নের অংশের ব্যাস ২॥ ফুট। পার্সিপোলিসের এই অনুপাত কুমরাহারেও দেখাইবার জন্ত স্পুনার সাহেব স্তম্ভশীর্ষ ৫ ফুট বাদে এখানকার স্তম্ভের উচ্চতা ২৫ ফুট অর্থাৎ ব্যাসের ১০ গুণ ধরিয়াছেন। কিন্তু এখানে যে স্তম্ভটি অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তাহার মোট দৈর্ঘ্য ১৪ ফুট কয়েক ইঞ্চি। কোন পাদপীঠের বা স্তম্ভশীর্ষের কোন প্রকার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত না হইলেও তিনি পাদপীঠের উচ্চতা ৩ ফুট কয়েক ইঞ্চি ধরিয়া পাদপীঠ সমেত স্তম্ভ ১৮ ফুট উচ্চ ধরিয়াছেন। এরূপ ১৮ ফুট স্তম্ভের ১২ ফুট স্তম্ভশীর্ষ কখনও হওয়া সম্ভব কি? তিনি স্বয়ং পূর্ব্বে স্তম্ভশীর্ষের উচ্চতা ৫ ফুট ধরিয়াছেন। *



পার্সিপোলিস, সমাধি গৃহের প্রবেশদ্বার

শতস্তম্ভ সমন্বিত গৃহের অনেকগুলি দ্বার ও বাতায়ন পাওয়া গিয়াছে। কুমরাহারে তাহার কোন চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই।

অতঃপর স্পুনার সাহেব আর একটি কল্পনা

---

* যখন এই প্রবন্ধটি লিখিত হয় তখন ১৪ ফুট দীর্ঘ স্তম্ভটি জল নিমগ্ন ছিল। পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, স্তম্ভের তলদেশ সম্পূর্ণ মসৃণ, কেবল দুইটি চিহ্ন প্রায় কেন্দ্রের নিকটে আছে। ইহার একটী স্তূপ বা শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, সুমেরু চিহ্ন, অপরটি (রাখালবাবুর মতে) মিশরের জীবন চিহ্ন। সুতরাং এই চিহ্নগুলি পারসীক শিল্পীদিগের চিহ্ন নহে। তলদেশে এমন আর কোন চিহ্ন নাই, যাহাতে মনে হইতে পারে যে, কোন সংযোজক-কীলক পাদপীঠ ও স্তম্ভের মধ্যে ছিল। সুতরাং পাদপীঠের কল্পনা ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ হয়।—লেখক।

করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই এই স্তম্ভ-সমন্বিত গৃহ প্রকৃতপক্ষে সিংহাসন-গৃহের নিম্নতল। সর্ব্ব নিম্নতলে কতকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তি ৮ ফুট উর্দ্ধে একটি কাষ্ঠের ছাদ ধারণ করিয়া থাকিত। তাহার উপরে আরও দুই স্তবক কাষ্ঠের মূর্ত্তি ছাদ ধারণ করিত। এইরূপ ৩টি ছাদের উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট করিয়া হইলে, সর্ব্বোপরিস্থিত ছাদের উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট হয়। মূর্ত্তিগুলি দণ্ডায়মান অবস্থায় দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া ছাদ ধরিয়া থাকিত। সর্ব্বোপরিস্থিত ছাদের উপরে ক্ষুদ্রাকারের ৩ স্তবক মূর্ত্তি সম্বলিত সিংহাসন স্থাপিত থাকিত। এই সিংহাসনে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত বসিতেন।

[মূর্ত্তিধৃত ছাদের কল্পনা]

ইহার প্রমাণ সম্বন্ধে তিনি বলেন, কুমাহারে মৌর্য্য-ভিত্তির উপরে ১৫৮টি গোলাকার কৃষ্ণবর্ণের বৃত্ত দেখা গিয়াছে। এই বৃত্তগুলির উপর হইতে নীচে খনন করিলে, পার্শ্বে শূন্যগর্ভ দীর্ঘ-ঘণ্টার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকার স্তর দেখা যায়। গোলাকার পাদপীঠ-যুক্ত কোন প্রস্তর মূর্ত্তি মৃত্তিকা-নিম্নে বসিয়া যাওয়ায়, গলিত কাষ্ঠের কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকার স্তর নিম্নে গিয়া এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। একটি প্রস্তর মূর্ত্তির মস্তকও নাকি বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ৫৫ ফুট খনন করিয়াও অন্য কোন বৃত্তের মধ্যে আর মূর্ত্তি বা মূর্ত্তির ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হয় নাই।

স্পুনার সাহেব পূর্ব্বে বলিয়াছেন, বন্যার পলি জমিবার পরে কাষ্ঠের ভিত্তি পচিয়া গেলে স্তম্ভগুলি মৃত্তিকা নিম্নে বসিয়া যায়, তজ্জন্য উপর হইতে রন্ধ্রপথে ভস্ম আসিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। যদি ধরা যায়, স্তম্ভগুলির ফাঁকে ফাঁকে মূর্ত্তি ছিল, আর পলি সঞ্চিত হইবার পরে সেগুলি মৃত্তিকা নিম্নে বসিয়া গিয়াছিল, তাহা হইলে পলির উপরিস্থিত ভস্মের স্তরও পলির সহিত কিঞ্চিৎ নিম্নে বসিয়া যাইবে। কিন্তু ভস্মের স্তর এ সকল স্থানে এক সমতলেই অবস্থিত।

পর্সিপোলিসের প্রাসাদগুলি অবশ্য এখন ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্তম্ভশীর্ষে কতকগুলি খাঁজ দেখিয়া ও অন্যান্য কারণে স্থির করিয়াছেন, স্তম্ভের উপরে কাষ্ঠের ছাদ ছিল। ৩০ ফুট উচ্চ ১০০টি স্তম্ভের গৃহে চতুঃপার্শ্বস্থিত দ্বার ও বাতায়ন হইতে যথেষ্ট আলোক আসিতে পারে না, তজ্জন্য তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, মধ্যের ছাদ কিঞ্চিৎ উচ্চ ছিল এবং আধুনিক স্কাই-লাইটের ন্যায় উচ্চ ছাদের পার্শ্বের বাতায়ন-পথে আলোক আসিত। স্পুনার সাহেব বলেন, যখন আলোক আসিবার ব্যবস্থার কোন প্রমাণ নাই, তখন উহা অগ্রাহ্য। তজ্জন্য তিনি কল্পনা করিয়াছেন, নিম্নতলে কোন কাজ হইত না; ইহার উপরিস্থিত ছাদেই সিংহাসন স্থাপিত ছিল। এরূপ কল্পনার কারণও তিনি দেখাইয়াছেন।

[প্রাসাদে আলোকাভাব]



পার্সিপোলিস্ অহুর মজ্‌দ-মূর্ত্তি

পারস্য রাজ্যের "নথ্‌শ-এ-রুস্তম" নামক স্থানে হখামনিসিয় রাজগণের সমাধি-গৃহের প্রবেশ-দ্বারের

উপরে প্রস্তরের খোদিত একটি চিত্র আছে, ইহাতে চারিটি স্তম্ভের উপরে ছাদ। ছাদের উপরে উপরে এক এক স্তবকে ১৪টি করিয়া দুই স্তবক মূর্ত্তি কর্ত্তৃক ধৃত ছাদের উপরে একপার্শ্বে নাতি-উচ্চ সিংহাসনোপরি রাজ

[পারস্ত দেশের মূর্ত্তির চিত্র]



শতস্তম্ভ গৃহের প্রবেশ দ্বার

ডেরায়াস বা দারিয়াবুষ উপবিষ্ট। সম্মুখে বেদীর উপরে প্রজ্বলিত অগ্নি এবং মধ্যভাগে ঊর্দ্ধে সপক্ষ অহুর-মজ্দের প্রতিকৃতি। ডেরায়াসের শতস্তম্ভ-সমন্বিত সিংহাসন গৃহের দ্বারপার্শ্বে আর একটি চিত্র খোদিত আছে। ইহার সর্ব্ব নিম্নতলে ৫টি এবং সর্ব্বোপরি ৪টি ৩ স্তবকে মোট ১৪টি মূর্ত্তি মস্তকোপরি হস্ত সাহায্যে ছাদ ধারণ করিয়া আছে। সর্ব্বোচ্চ ছাদের উপরিস্থিত সিংহাসনে রাজা ডেরায়াস উপবিষ্ট, মস্তকে সম্ভবত চন্দ্রাতপ, উপর্য্যুপরি দুই স্তবক সিংহের মধ্যে ১টি করিয়া অহুর মজ্দের মূর্ত্তি। সকলের উপরে বৃহদাকারের অহুর মজ্দের মূর্ত্তি। ১ম চিত্রের খোদিত লিপি হইতে বুঝা যায়, ছাদধারী বা সিংহাসনধারী মূর্ত্তিগুলি রাজা ডেরায়াসের বিভিন্ন প্রদেশের প্রজার প্রতিরূপ। দুই চিত্রেই ১৪টি করিয়া মূর্ত্তি থাকায় বুঝায় যে ১৪টি প্রদেশ ডেরায়াসের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই মূর্ত্তিশ্রেণীর মধ্যে কোন স্তম্ভ নাই। আর, মূর্ত্তিগুলির সাজ সজ্জা মুখাকৃতি বিভিন্ন—যেন দেখিলে বোধ হয় ইহারা বিভিন্ন দেশের লোক।

স্পুনার সাহেব এইখানে একটি সাধারণ সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন যে, বাহিরের চিত্র দেখিয়া, প্রাসাদের ভিতরের কক্ষ কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তাহা বুঝা যায়। যথা, বাহিরে প্রহরীর চিত্র থাকিলে বুঝিতে হইবে, কক্ষটি প্রহরীদিগের কক্ষ। সেইরূপ বাহিরে যখন ৩ স্তবক মূর্ত্তির উপরে সিংহাসন অঙ্কিত আছে, তখন বুঝিতে হইবে, গৃহের ভিতরের ৩ স্তবক মূর্ত্তির উপরে সিংহাসন ছিল।

[চিত্রের অর্থে সাধারণ সূত্র]

এখন, ইহার সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। সমাধি-গৃহের বাহিরে যেমন চিত্র আছে, ভিতরে তাহার অনুরূপ কিছুই নাই। আর, যখন দুই স্থানেই ১৪টির অধিক মূর্ত্তি নাই, তখন শতস্তম্ভ গৃহের মধ্যে শত শত মূর্ত্তি কেন থাকিবে? ১ম চিত্রে যখন ১৪টি মূর্ত্তির মধ্যে কোন স্তম্ভ নাই, তখন স্তম্ভের মধ্যে মধ্যে মূর্ত্তি থাকা সম্ভব নয়। শতস্তম্ভ গৃহের দ্বারে আরও বহুরূপ চিত্র ছিল, তন্মধ্যে ৫ স্তবকে ৫০টি মূর্ত্তি-ধৃত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রাজা ডেরায়াসের চিত্র

অন্যতম। যখন একস্থানে দুই স্তবক, একস্থানে তিন স্তবক ও একস্থানে পাঁচ স্তবক মূর্ত্তি পাইতেছি তখন কুমরাহারের কল্পিত স্তবক মূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্য থাকিবে বলিয়াই কি সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, পার্সিপোলিসের প্রাসাদে তিন স্তবক মূর্ত্তি ছাদ ধরিয়া ছিল? তিনি কুমরাহারে মূর্ত্তির একটা মস্তকও না হয় পাইয়াছেন কিন্তু পার্সিপোলিসের ভগ্নাবশেষ মধ্যে যে কিছুই অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। পার্সিপোলিসের কোন কোন প্রাসাদের সোপানের অস্তিত্ব দেখিয়া অনুমিত হইয়াছে যে, প্রাসাদগুলি দ্বিতল বা ত্রিতল ছিল। কিন্তু শতস্তম্ভ সমন্বিত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে সেরূপ কোন সোপানের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই।

এখানে স্পুনার সাহেব ১৪ ফুট স্তম্ভের এক প্রান্তের ৪ ফুট দূরে দুই স্থানে পালিসের অভাব দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ৩।৪ ফুট পাদপীঠ যোগ করিলে স্থানটি কক্ষতল হইতে ৮ ফুট উচ্চে থাকিবে, সেখানে একটি ছাদ থাকা সম্ভব। যে প্রান্তে পাদপীঠ ছিল সেই প্রান্তের ১২ ফুট দূরে তাহা হইলে আরও একটি এইরূপ স্থান থাকা উচিত ছিল, কিন্তু স্তম্ভে সেরূপ চিহ্ন নাই। এতদ্ভিন্ন পার্সিপোলিসের স্তম্ভে এমন কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই, যাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্তম্ভের মধ্যভাগে দুইটি ছাদ ছিল। কুমরাহারের মূর্ত্তির যে অন্ততঃ ২ ফুট ব্যাসের পাদপীঠ কল্পনা করিয়াছেন, সেরূপ কোন পাদপীঠের অস্তিত্ব চিত্র মধ্যে নাই।

শতস্তম্ভ সমন্বিত গৃহের মধ্যে কাষ্ঠমূর্ত্তিধৃত সিংহাসনোপরি অহুরমজ্দ্-লাঞ্ছিত চন্দ্রাতপতলে ডেরায়াস উপবেশন করিতেন, ইহা মনে করিলে আর কোন কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। স্পুনার সাহেবের সাধারণ সূত্রেরও মান বজায় থাকে।

(কার্ত্তিক সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীরাখালরাজ রায়।

বৈদেশিকী

গণতন্ত্রের ফলাফল।

("Nineteenth Century", June.)

য়ুরোপে লঙ্কাকাণ্ড বাধিবার পর, এক দল লেখক ধুয়া ধরিয়াছে যে, পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ও দৌত্যকার্য্যে, জার্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ান সম্রাটদ্বয় জনসাধারণের অভিমতে কার্য্য করিতে বাধ্য হন নাই বলিয়া, প্রান্ত অনেক দূর গড়াইয়াছে। ইহার উত্তরে, মিসরের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড ক্রোমার, "Democracy and Diplomacy" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, স্বৈরশাসন (autocracy) সকল সময়ে যুদ্ধ-লোলুপতার পোষক নহে এবং গণতন্ত্রের (democracy) ফলে আবালবৃদ্ধ অবৈত গোস্বামী হইয়া উঠে না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান হইতে আধুনিক জার্ম্মান পর্য্যন্ত সকল ক্ষমতাবান জাতিই ছলে বলে প্রতিবাসীর রাজ্য গ্রাস করিয়াছে। গ্রীক মনীষী এরিষ্টটল্ বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, দুর্ব্বল জাতিদিগকে বশীভূত করিবার জন্য বলপ্রয়োগ নিন্দনীয় নহে, কেননা অক্ষম জাতি সমর্থের গোলামি করিবে, ইহা স্বয়ং প্রকৃতিদেবীর ইচ্ছা। ("War is strictly a means of acquisition to be employed against wild animals and against inferior races of men, who, though intended by Nature to be in subjection to us, are unwilling to submit.") রোমে যখন প্রজাতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন তাহার দিগ্বিজয় ("aggressive imperialism") পূরা মাত্রায় চলিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, সাধারণতন্ত্রের আমলে, স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রী মন্ত্র জপিতে জপিতে, ফরাসীজাতি পররাজ্য হরণের জন্য উন্মত্ত

হইয়া উঠিয়াছিল। চতুর্দ্দশ লুইয়ের অনিয়ন্ত্রিত শাসনকালেও তাহারা এতদূর বর্গীভাবাপন্ন হয় নাই।

সকল দেশেই ধূর্ত্ত রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের মুখোস পরিয়া স্বৈরতন্ত্রের পালা গাহিয়াছে। সকল জাতিই কোন না কোন প্রকারে ভাবের ঘরে চুরি করিয়াছে। মেক্সিকোর কিয়দংশ আত্মসাৎ করিলে য়ুনাইটেড ষ্টেট্‌সের প্রভূত সুবিধা ইহা সকলেই বোঝেন। কিন্তু Buchanan ও Polk নামক দুইজন মার্কিন আন্দোলনকারী, এ সম্বন্ধে কলমবাজি করিবার সময়, এই সুবিধার কথাটা একেবারে চাপা দিয়া, গম্ভীরভাবে বলিয়াছিল, আমরা দুই দেশ একত্র বিধাতার উদ্দেশ্য সাধন করিব। ("We must fulfil that destiny which Providence may have in store for both countries.") মানুষের এই প্রকার আত্মবঞ্চনা ও পর-প্রতারণা সম্বন্ধে উদাহরণ দিয়া, লর্ড ক্রোমার দার্শনিক হেলভেশিয়াসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, মানবজাতির উপর প্রীতি রাখিতে হইলে, তাহাদের নিকট কিছু আশা করিতে নাই। ("In order to love mankind, we must expect little from them.")

"American Diplomacy" নামক গ্রন্থ প্রণেতা অধ্যাপক ফিশ (Fish) গর্ব্ব করিয়াছেন যে, গণতন্ত্রের ফলে মার্কিন জাতির যুদ্ধের বাতিক খর্ব্ব হইয়াছে। একজন চিন্তাশীল লেখক তদুত্তরে বলিয়াছেন, জার্ম্মানির বুকে পিঠে যেমন প্রবল শত্রু, য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের কখনও সেরূপ ছিল না বলিয়াই, মার্কিন জাতি কামান ও কেল্লা অপেক্ষা বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কে অধিক মনোযোগ দিতে পারিয়াছে।

দৌত্যকার্য্য ও পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় অনেক ব্যাপার, সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে, বিশেষজ্ঞের দ্বারা সাধিত হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড গ্র্যানভিল তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, দৌত্যকার্য্যই সত্যের অপলাপ ও কপটাচরণে ওস্তাদ হইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। ("The diplomatic service is a school for falsehood and dissimulation.") গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া, ঐ সকল গুরুতর কার্য্য অর্ব্বাচীনের হস্তে ন্যস্ত করিলেই যে পৃথিবী হইতে যুদ্ধবিগ্রহ নির্ব্বাসিত হইবে, ইহা মনে করা ভুল। ("It would be a mistake if in a fit of anti-absolutist enthusiasm, we were to imagine that democratic diplomacy can assuredly inaugurate an era of universal peace.")।

তুরুস্ক প্রসঙ্গ।

("Nineteenth Century," June.)

তুরুস্ক দেশ, য়ুরোপ এসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তুরুস্কের অধিপতি তিন মহাদেশেই সৈন্য প্রেরণ করিতে পারেন, তিন মহাদেশের সঙ্গেই তাঁহার আমদানী রপ্তানির সুবিধা। ("The Asiatic Turkey occupies the most important strategical position in the world.") কৃষ্ণ সাগর, ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর, দুস্তর মরুভূমি, পারস্য উপসাগর এবং উচ্চ পর্ব্বতমালা, এই কয় প্রাকারে এসিয়ার তুরুস্কের চতুর্দ্দিক সুরক্ষিত। তুরুস্কের সুলতানের বস্ফোরস, ডার্ডেনেল্‌জ্ ও সুয়েজ এই তিনটি প্রকাণ্ড তালায় চাবি দিবার সুযোগ আছে। এই তালাচাবি অধিকারের জন্য গত কয়েক মাসে রক্তের নদী বহিয়াছে।

বেলজিয়াম হইতে মেসোপটেমিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তারের জন্য জার্ম্মানি বহুকাল হইতে চাল চালিতেছে। জার্ম্মানির উদ্দেশ্য এই যে, ইহার পশ্চিম ভাগ তাহার খাসে থাকিবে, এবং মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগ অনুগত নৃপতিগণের অধীনে থাকিবে। এই বিরাট রাজ্যসংঘের নাম হইবে বৃহত্তর জার্ম্মানি ("Greater Germany.")। ১৮৯৮ সালে ডামাস্কাস নগরে গিয়া জার্ম্মান সম্রাট বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর ত্রিশ কোটী মুসলমান তাঁহার 'দোস্ত'। ("May the three hundred million Mahomedans be

assured that the German Emperor will be their friend for all time.")।

সুয়েজ খাল দিয়া যে বিপুল পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ হয়, তাহার পরিমাণ ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতেছে, যথা :—

১৮৭০	সাল	৪, ৩৬, ৬০৯	টন।
১৮৭৬	"	২৫, ৯৬, ৭৭১	"।
১৮৮২	"	৫০, ৭৪, ৮০৮	"।
১৯০১	"	১০৮, ২৩, ৮৪০	"।
১৯১২	"	২০২, ৭৫, ১২০	"।

(এক টন=কিয়দূন ২৮ মণ)।

এই বাণিজ্য-সম্ভারের অধিকাংশ যাহাতে তুরুস্কের ভিতর দিয়া স্থলপথে যায়, জার্মানি তজ্জন্য বাগদাদ পর্য্যন্ত রেল পাতিয়াছে। এই রেলওয়ের উপরস্থ কোনিয়া (Konia) নগর, বার্লিন হইতে করাচি পর্য্যন্ত সরলরেখার মধ্যবিন্দুর সন্নিকটে।

এসিয়ার তুরুস্কের আয়তন, বিলাত, ফ্রান্স ও জার্মানি একত্র করিলে যাহা হয় তদপেক্ষা অধিক, অথচ ইহার লোকসংখ্যা বিরল।

	বর্গ মাইল	লোকসংখ্যা
তুরুস্ক	৬৯৯, ৩৪২	১৯, ৩৮২, ৯০০
গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড	১২১, ৬৩৩	৪৫, ৩৭০, ৫৩০
জার্মানি	২০৮, ৭৮০	৬৪, ৯২৫, ৯৯৩
ফ্রান্স	২০৭, ০৫৪	৩৯, ৬০১, ৫০৯

বর্ত্তমান যুদ্ধ না বাধিলে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই peaceful penetration অর্থাৎ 'বেমালুম সাবাড়ের প্যাচ' তুরুস্কের হাড়ে হাড়ে বসিত। এখন জোর যার মুলুক তার হইবে।

লেখক জে. ই. বার্কারের (Barker) মতে, তুরুস্ক বিভাগ উপলক্ষে, য়ুরোপের কর্ত্তাদের মধ্যে কলহ অপরিহার্য্য। ঐ দেশে কাহার কিরূপ "অধিকার", তিনি তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণস্থ আর্মিনিয়ার জন্ত রুসিয়ার প্রাণের টান আছে ("Is greatly interested")। স্মির্ণা (Smyrna) বন্দরের অধিকাংশ অধিবাসী গ্রীক, সুতরাং উহা গ্রীসের প্রাপ্য। এসিয়া মাইনরের নিকটস্থ রোড্স (Rhodes) দ্বীপটি উদরসাৎ করিয়া, অপর পারের জন্য ইটালীর রসনা আর্দ্র হইয়াছে। ("Is desirous of obtaining a piece of main-land.")। সিরিয়া প্রদেশের উপর ফ্রান্সের "ইতিহাস-লব্ধ অধিকার" ("historic claims") আছে, কেননা ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের তাৎকালীন নৃপতি, প্রাচ্য দেশের খৃষ্টানদের এবং সিরিয়ার অন্তর্গত খৃষ্টানদের তীর্থ-স্থানের অভিভাবক ("Protector") নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

চারি দিক হইতে হিতাকাঙ্ক্ষীদের আলিঙ্গনে পোলাণ্ডের যেমন নিশ্বাস বন্ধ হইয়াছে, তুরুস্কেরও সেইরূপ ঘটিতে পারে।

কুলক্ষয়।

(*"Hibbert Journal", July*,
এবং *"Nation," 24th June*).

গত দুই বৎসরে যুবক-মেধ যজ্ঞের জন্ত পাশ্চাত্য হোতৃমণ্ডলী যেরূপ সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন, তাহার ফলে ঐ সমাজে রুগ্ন ও বিকলাঙ্গের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং ভবিষ্যৎ বংশের জনক হইবার উপযুক্ত যুবকের স্থান বালক ও বৃদ্ধের দ্বারা অধিকৃত হইতেছে।

য়ুরোপের শিক্ষিত নরনারী ষোড়শোপচারে মন-সিজের পূজা করিয়াও, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় অপত্যোৎপাদনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতেছে। ("Information laid before the National Birth-rate Commision makes it very clear that … … … injurious interferences with the natural birth-rate are in extensive use, especially in the industrial districts.")। বিলাতের ১৯১১ সালের আদমসুমারির ফলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, প্রতি এক শত বিবাহিত পুরুষের বাৎসরিক অপত্য সংখ্যা, চাষাভূষা ও মুটেমজুরের মধ্যে ২১৩, কারিকরদিগের মধ্যে ১৫৩, এবং মধ্যবিত্ত ও

ধনী লোকদিগের মধ্যে ১১৯,—এই হারে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভিষক, শিক্ষক ও যাজক সম্প্রদায়ের অপত্যের হার কয়লার খনির মজুরদের অর্দ্ধেক। লক্ষ্মী প্রসন্না হইলেই ষষ্ঠীর কৃপা অল্প হয়। ("Speaking generally it is now well established, that the birth-rate falls as the income rises.")। অশিক্ষিত দরিদ্র সম্প্রদায় সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব বহন করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, কিন্তু শিক্ষিত ধনী উহার ভয়ে শিহরিয়া উঠে। পাশ্চাত্য 'ভদ্র' সম্প্রদায়ের এই কাপুরুষতা দর্শনে, হিবার্ট জার্ণালে, Countes of Warwick লিখিয়াছেন, "I cannot help realising that in many cases sterility is not the deliberate protest of the wage-slave : it is the selfish protest of the pleasure-seeker," অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে সন্তান নিরাকরণ দারিদ্র্যের অবশ্যম্ভাবী ফল নহে—মধু লুটিব কিন্তু মৌমাছির দংশন সহিব না, উহা এই স্বার্থপরতা প্রণোদিত। উক্ত মহিলা দুঃখ করিয়াছেন যে, অনেকগুলি বংশধরের জননীকে, পাশ্চাত্য সমাজের কেহ কেহ "দায়ে পড়ে মা" ("women condemned to fertility") বলিয়া বিদ্রূপ করে। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সভ্যদেশমাত্রেই দেশের জনসংখ্যা বর্দ্ধনের উপায় নির্দ্ধারণার্থ, একজন মহিলা সচিব ("Minister of Maternity") নিযুক্ত হওয়া উচিত।

"Nation" নামক সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ষষ্ঠীদেবীর কৃপালাভই জাতির শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্য নহে। জনসংখ্যার অল্পতা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর ইহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু পাপিষ্ঠ নির্ব্বোধ ও রুগ্নের আধিক্য যে সর্ব্ববিধ অকল্যাণের প্রসূ ইহাও যথার্থ। সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে সংখ্যার মোহ ছুটিয়া যায়, এবং দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল এই প্রবাদের যাথার্থ্য স্পষ্টীকৃত হয়। ("Even from the military standpoint it is by no means evident that numbers are strength, still less can it be assumed that the value and success of a nation in the wortheir activites of life are either measured or promoted by the density of population. On the contrary, the presumption surely is that in the collective art of creation, as in every other art, quality counts far more than quantity and should be the prior consideration.")।

শ্রীগৌরহরি সেন।

আলোচনা

ভারত-ভারতী।

গত আষাঢ়ের 'প্রবাসী' পত্রিকায় আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'পুরাতন গ্রীসে ভারতের ভারতীর অজ্ঞাতবাস' শীর্ষক একটি অতি উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এ ধরণের সরস অথচ সহজবোধ্য দার্শনিক ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ রচনা আমাদের সাহিত্যে অত্যন্ত বিরল। শুধু যদি একখানা মাসিক পত্রিকার পাতার মধ্যে উহা ঢাকা পড়িয়া যায় তাহা হইলে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইবে। আশা করি সকলেই দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন, বোধ হয় একটু আধটু নূতন আলোকও পাইবেন। আমি এস্থলে কেবলমাত্র তাঁহার যুক্তি-তর্কের পোষকতার জন্য দুই একটি কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

প্রথমেই দ্বিজেন্দ্র বাবু লিভিংষ্টন্ নামক জনৈক ইংরাজ পণ্ডিতের পুস্তকবিশেষ হইতে দুইটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—'তবে ত দেখিতেছি পুরাতন গ্রীসের জগৎপ্রথিতা আথেন্‌স্ নগরী ভারতের চিরপরিচিতা যুনানীরই আদরের কন্যা।' উদ্ধৃত ছত্র দুইটি এই—Ionian philosophers were the prospectors : but Athens made roads and opened the Country. Ionians conceived of thought, Athens developed it.

এ কথাটা এখন সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ঐ দুই ছত্রের টীকা যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে বোধ হয় ইংরাজ ইতিহাস-রচয়িতা ও অডিসির অনুবাদক মিঃ কটিল-এর (H. B. Cotterill M. A.) একখানি পুস্তক হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি বলিতেছেন—

'Although when we speak of Greek art and literature and philosophy (the three priceless legacies that Greece has left us) we instinctively think of Greece itself and especially of Athens, which in the so called classic era was the 'eye of Hellas', the fact is that Greece owes much of its fame to its colonies. Of colonial origin were Homer, Archilochus, Terpander, Arion, Alcaeus, Sappho, Stesichorus, Simonides, Anacreon, the younger Simonides Theocritus and other Greek poets. The historian Herodotus was born at Halicarnassus. All the great early philosophers were Ionians. Thales, Anaximander, and Anaximenes were of Miletus, Heracleitus of Ephesus, Pythagoras of Samos, Xenophanes of Colophon. Of the seven sages four were colonials......The arts of working in marble and bronze casting came, it is said, from Chios and Lesbos ; sculpture came from Crete...... and lastly, many of the magnificent temples in Ionia, Sicily and southern Italy, of which some are still standing, were built long before the Parthenon.' অর্থাৎ, যখন আমরা গ্রীক সুকুমার কলা, সাহিত্য ও দর্শনের কথা বলি, আমরা আসল গ্রাস-এর কথা ভাবি, বিশেষতঃ আথেন্সের কথা মনে করি। আথেন্সকে 'গ্রীসের চক্ষু' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রীস তাহার উপনিবেশগুলির নিকটে তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য অনেক অংশে ঋণী। হোমর, আর্কিলোকস্, টার্প্যাণ্ডার, আরিয়ণ, আল্‌কায়ুস, সাফো, ষ্টেসাইকোরস, সিমনাইডিস, আনাক্রিয়ণ, ছোট সিমনাইডিস্, থিওক্রাইটস্ প্রভৃতি গ্রীক কবিগণ গ্রীসের একটা না একটা উপনিবেশ ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাস-রচয়িতা হেরোডোটস আইওনিয়ার দক্ষিণে হালিকার্ণেসস্-এ জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম যুগের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত আইওনিয়াবাসী ছিলেন। থেলিস্, আনাক্সিমন্দর এবং আনাক্সিমিনিস্ আইওনিয়ার মিলেটস্ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন; হিরাক্লাইটস্ এফিসস্ নগরীতে, পিথাগোরস্ স্যামস্ নামক আইওনীয় দ্বীপে, জেনোফেনিস কলোফন-নাম্নী সমৃদ্ধিশালিনী আইওনীয় নগরীতে ভূমিষ্ঠ হয়েন। কায়স ও লেস্‌বস্ নামক আইওনীয় দ্বীপদ্বয় হইতে পাষাণ ও ধাতুর উপর বিচিত্র কারুকার্য্যের কৌশল গ্রীসের অধিবাসীরা শিক্ষা করে। ভাস্কর্য্য ক্রীট্ দ্বীপ হইতে আসিয়াছিল।......আথেন্সের পার্থেনন্ গঠিত হইবার বহুপূর্ব্বে আইওনিয়াতে সুন্দর সুন্দর মন্দির গঠিত হইয়াছিল।

এ-সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক কিছু বলা অনাবশ্যক। উক্ত প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্র বাবু এ প্রশ্নের উপর বেশী কালক্ষেপ না করিয়া একেবারে গ্রীস-দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানের আদিগুরু থেলিস্-এর কথা পাড়িয়াছেন। থেলিস্ বলিলেন—'আদিতে জল ছিল, জল হইতে সমস্ত চরাচর উদ্ভূত।' দ্বিজেন্দ্র বাবু দেখাইতেছেন—'আমাদের দেশের বহু পুরাতন যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতার এই যে একটি কথা 'আপো বা ইদমগ্র আসীৎ'-ভারতের এই পুরাতন ঋষিবাক্যটি থেলিসের নূতন আবিষ্কার বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলে সুপ্রসিদ্ধ।' কিন্তু অধিকাংশ য়ুরোপীয় পণ্ডিত বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অন্ধ। দ্বিজেন্দ্র বাবু ঠিকই বলিতেছেন,—এই সকল তথাকথিত পণ্ডিতের কথায় আস্থা স্থাপন করা যায় না। ইঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের নিকটে ঋণস্বীকার করিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত। কেহ কেহ একটু আধটু স্বীকার করিতে গিয়াও যেন মোড় ফিরিয়া Or Egypt, or Chaldea-য় আসিয়া চিন্তার ভার লঘু করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুর তীব্র অথচ সরস বিদ্রূপ ইঁহাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে।

আমি কটিলের পুস্তক হইতে একটু আধটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি যে এই ভদ্রলোকটি Or Egypt, or Chaldea-য়,হাত এড়াইতে পারেন নাই, কিন্তু তবুও যেন বোধ হয় ঐ মিসর ও ক্যাল্‌ডিয়াকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখেন, এবং যথাসম্ভব আর্য্য ঋষির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। খৃঃ পূঃ ৫৮৫ অব্দে মিডিয়ার নরপতি আস্ত্যাজিস-এর সহিত লীডিয়ার রাজার যুদ্ধ হয়। হঠাৎ সূর্য্যগ্রহণ হওয়ায় যুদ্ধ থামিয়া গেল। ঐ বৎসরে ঐ সময়ে সূর্য্যগ্রহণ হইবে, থেলিস্ তাহা পূর্ব্বেই গণনা করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। মিঃ কট্রিল্ লিখিতেছেন—'কথিত আছে যে-থেলিস্ মিশরদেশে গিয়াছিলেন; এবং সেখানে তিনি জ্যামিতি ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া এই সূর্য্যগ্রহণের কথা অনেক আগে বলিতে

পারিয়াছিলেন।' এই স্থানে লেখক টিপ্পনী করিয়া বলিতেছেন—'The Chaldeans from whom possibly (but not probably) the Egyptians learnt their astronomy, are said to have registered, or calculated, eclipses from about 720 (B. C.). They are said to have believed the world to have existed for 172,000 years. But the Indian sages claim an antiquity of two million years for their astronomical tables, and doubtless the most ancient names of the constellations are of Indian origin.' পুনশ্চ দেখিতে পাই, লেখক বলিতেছেন,—থেলিস ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক মিশরে, ও সম্ভবতঃ প্রাচ্য ভূখণ্ডে ভ্রমণ করিয়া কয়েকটি তত্ত্বকথা শিক্ষা করিয়াছিলেন, যথা—doctrine of transmigration এবং আত্মার অমরত্ব। লেখক বলিতেছেন—the belief in the immortality of the soul, which we find so strongly asserted by Socrates, was not evolved by Greek thought, but introduced from Eastern sources: moreover in Vedanta philosophy there are doctrines of 'abstraction' and of the triune nature of the Deity (as Intelligence, Matter and Multitude) which have a singular resemblance to the Socratic doctrine of the 'release and purification of the body' and to the Monad and Triad doctrine of Pythagoras, and others that closely resemble the Eleatic denial of the reality of the sensible world. ইনি অবশ্যই Egypt or-এর মোহ ভুলিতে পারেন নাই; আর বেদান্ত যতটুকু বুঝিয়াছেন তাহাতে কতকটা যেন ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের নিকটে ঋণস্বীকার করিতে পারা যায় এই রকম ভাবটা ইঁহার দেখা যায়। পরক্ষণেই লেখক নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিতেছেন—স্বাধীনভাবে একই তত্ত্ব গ্রীক ও ব্রাহ্মণ আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা অসম্ভব নয়। * * এই শ্রেণীর লেখকদিগের উপর দ্বিজেন্দ্রবাবুর তীব্র কষাঘাত সমুচিত শাস্তি বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর পাশ্চাত্য লেখকের দোষ এই যে ইঁহারা ভারতবর্ষের প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের সহিত বিশেষভাবে পরিচয় করাটা আবশ্যক মনে করেন নাই। Oriental বা প্রাচ্য শব্দটা যেন পারস্যসাম্রাজ্য পর্য্যন্ত পৌঁছিলেই যথেষ্ট হইল। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লাইটস্ অগ্নিকে তাঁহার দার্শনিক arche সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। ইংরাজ লেখক মিঃ কট্রিল অনুমান করিলেন যে ইহাতে বোধ হয় প্রাচ্য অর্থাৎ পার্শী প্রভাব বিদ্যমান। তিনি লিখিতেছেন—Heracleitus held fire to be the prime element. Possibly he was led to the choice by Oriental (Zoroastrian) influence. এখন স্বনামধন্য ডাক্তার স্পুনারের কল্যাণে ঐ Zoroastrian কথাটা আমাদের পাঠক পাঠিকাবর্গের বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। হিরাক্লাইটসের করস্থ-তত্ত্ব (All is in flux') যে আদৌ zoroastrian নহে তাহা দ্বিজেন্দ্রবাবু সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

পিথাগোরাস সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের সকলেরই প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত। জ্যামিতির কথা আসিয়া পড়িতেছে। কারণ পিথাগোরসের তত্ত্ব জ্যামিতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। ইংরাজ লেখক বলেন—The sensible universe according to this theory, is number realised in space; and when number is realised in space, it is geometry. Therefore we find that with Pythagoras, as with Plato, geometry was the foundation of all true science. সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন যে ইউক্লিড্-এর প্রথম সর্গের ৪৭শ সিদ্ধান্তটি পিথাগোরসের আবিষ্কার। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে পিথাগোরাসের জন্মিবার বহু পূর্ব্বে আমাদের দেশে ইউক্লিড্-এর ঐ ৪৭শ সিদ্ধান্তটিকে যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণের কাযে লাগানো হইত। পিথাগোরাসের সংখ্যা দর্শনের মূলতত্ত্ব পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংক্ষেপে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন;—The Universe (both the sensible and the intellectual) is an imitation or realization of the laws of number, where Deity is the omnipresent Unit, or Monad—of which all numbers consist though it is itself no number—and prime (brute, chaotic) matter is the Duad, and the ordered Cosmos (formed by the addition of the Creative Monad to the chaotic Duad) is the Triad. আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর মহাশয় জোড় বিজোড় লইয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেরূপ ব্যাখ্যা আর কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আবার Physics হইতে Ethics এ পৌঁছাইবার জন্য পিথাগোরাস যে সঙ্গীতের সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন, তাহাও পিথাগোরাসের নিজের

আবিষ্কার নহে ; নিশ্চয়ই তিনি ভারতবর্ষে অঙ্কশাস্ত্র ও সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে ভারত-ভারতীর দাবি এতটা জোর করিয়া করা যায় কি না বলা যায় না। কারণ ক্রীটীয় সভ্যতা বা Aegaean Civilizationএর যুগে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগের মধ্যে সপ্তস্বরা বীণার আবির্ভাব হইয়াছিল; ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। স্তর আর্থর এভান্স প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান করিবার মানসে ক্রীট দ্বীপে গত ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে খনন করিতে আরম্ভ করিয়া রাজা মাইনসের Knosos পুরী আবিষ্কার করেন। অনেক জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। অনেক দেবমূর্ত্তি, রাজপ্রাসাদ, রাজকন্যা আরিয়াদনীর নৃত্যাগার, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে একটি sarcophagusএর উপর একটি গায়কের মূর্ত্তি খোদিত করা আছে; তাহার হাতে একটি বীণা, সেই বীণার তার সাতটি! এখন আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে এই ক্রীটীয় সভ্যতা খ্রী: পূ: পঞ্চদশ শতাব্দীর এক মহাপ্রলয়ে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তবে কি আইওনীয় গ্রীকগণ ক্রীটীয় সভ্যতার নিকটে সঙ্গীতবিদ্যার জন্ত ঋণী?

দ্বিজেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—'পুনর্জ্জন্মবাদ ফিনিসীয়, ইহুদী, আরব্য প্রভৃতি সেমীয় জাতিদিগের কোনও শাস্ত্রেই লেখে না।' কথাটা ঠিক। কিন্তু একটা বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিব্রু জাতির মধ্যে যখন mysticism-এর প্রাধান্ত লক্ষিত হয়, তখন কোথা হইতে এই আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি-তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিল? হিব্রু সমাজের প্রধান যৌড়ল (Chief Rabbi) Dr. J. H. Hertz সম্প্রতি লিখিয়াছেন—Here we meet with the doctrine of metempsychosis, the transmigration of souls, of which there is not a trace in Bible or Talmud. All souls, we are told, are pre-existent. Each is destined to be subjected to the test whether, after its earthly sojourn, it returns uncontaminated to the Divine Source. If tainted, the soul is doomed to re-inhabit a body till through repeated trials its purification is complete. এ তত্ত্ব কোথা হইতে আসিল? লেখক বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ইহা ব্যাবিলনীয়, জুরাথস্ত্রীয়, Gnostic কিম্বা সুফি নয়; খুব সম্ভব ইহা Neo-platonic। Dr. Hertz একস্থলে 'echoes of Hindu teaching even' শুনিতে পাইয়াছেন। হিব্রু পণ্ডিত তাঁহাদের এই সমস্ত কাবালার মধ্যে যে হিন্দু দার্শনিক তত্ত্বের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও কখনও কখনও শুনিতে পান ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা না করিয়া, ব্যাপারটা কি, তাহা তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করা উচিত। আবার দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহুদী Mystic-পণ্ডিত কর্ত্তৃক সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক একখানি পুস্তক রচিত হয়। Dr. Hertz বলিতেছেন, সে তত্ত্ব ঠিক আমাদের বোধগম্য হয় না। সংখ্যা এবং ভাবা, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক জগতের সীমান্তপ্রদেশে দাঁড়াইয়া দেশ কাল ও মানবাত্মার মধ্য দিয়া বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছে। প্রথম দশ সংখ্যা; তিনটী অদ্বিভূত,—বায়ু অগ্নি ও অপ্ এবং কাল, ইহারা সৃষ্টির মূলীভূত কারণ। তার পর ভগবান হিব্রু বর্ণমালার বাইশটি অক্ষর রচনা করিয়া তাহাদিগকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, মিলাইয়া মিশাইয়া ওজন করিয়া যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। আধুনিক হিব্রু পণ্ডিত এই mystic তত্ত্বটী ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এই যে alphabet হইতে জগৎ সৃষ্টি, ইহা কি অক্ষর হইতে ক্ষরণ-বিসৃষ্টির Symbolism নহে?

শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটী বায়ু অগ্নি ও অপ্-এর ভিতর দিয়া লঘু ললিত নৃত্যে চলিয়াছে। অনেক কূট সমস্যার অবতারণা করিতে হইতেছে। আমরা অনেক নূতন কথা শুনিতে পাইব, এ আশা আছে বলিয়া প্রবন্ধের মাঝখানে এই আলোচনার সূত্র ধরিলাম।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রসঙ্গ।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় গত বৎসর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তিনি দুঃখবাদী (Pessimist) ও ঈশ্বরবিশ্বাসহীন ছিলেন। আমরা তাঁহার এ মন্তব্য ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। যিনি 'পরপারে' নাটক লিখিয়াছেন, এবং মহাসিন্ধুর ও-পারের সঙ্গীতের আভাস পাইয়াছিলেন, তিনি কখনও নাস্তিক হইতে পারেন না। তবে এক সময়ে হয়ত তিনি অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) ছিলেন। 'মন্দ্রে'র একটি কবিতায় তিনি বলিতেছেন—

"মরণের পাছে
কি জগৎ লুক্কায়িত আছে!
এই কৃষ্ণ জলধির পারে
কোন্ দেশ আছে! * *
কিম্বা এইখানে শেষ সব।"

কিন্তু তিনি প্রথম ও শেষ জীবনে যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার রচনাবলীতেই রহিয়াছে। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্য্যগাথা'র ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন—"যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতি-রচয়িতার অনন্ত মহিমায় স্তব্ধ হইয়া থাকেন, * * * 'আর্য্যগাথা' তাঁহারই আদর চাহে।" ইহা কি অবিশ্বাসীর কথা? যদি কেহ বলেন যে তরুণ যৌবনে তাঁহার এরূপ ভাব থাকিলেও, পরে একেবারে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তদুত্তরে 'মেবার পতন' নাটকের ভূমিকা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলিতেছেন,—"'আমি' হইতে যতদূর প্রেমকে ব্যাপ্ত করা যায়, ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়। ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই ঐশ-প্রেম এখানে দেখানো হয় নাই। নাটকান্তরে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।" যিনি ঐশ-প্রেম বুঝাইবার জন্য নাটক পর্য্যন্ত লিখিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি যে ঈশ্বরে আস্থাহীন ছিলেন, এরূপ কথা কি করিয়া মানিয়া লওয়া যায়? মনে রাখিতে হইবে, 'মেবার পতন', দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত বয়সের রচনা। সুতরাং যদি বা কোন সময়ে তাঁহার মনে ঈশ্বর বা পরকাল সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে, সে সংশয় যে স্থায়ী হয় নাই তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। তবে এ কথা সত্য যে তিনি লৌকিক হিন্দু ধর্ম্মের স্বর্গ, নরক, দেবদেবী বিশ্বাস করিতেন না, এবং তাঁহার মধ্যে ভক্তিভাবটা বোধ হয় তেমন প্রবল ছিল না।

কিন্তু ইহা যে নাস্তিকতার লক্ষণ, তাহা অবশ্য কেহই বলিবেন না। কারণ, অনেক শিক্ষিত হিন্দু স্বর্গ নরক দেবদেবী প্রভৃতিকে কবি-কল্পনা মাত্র বলিয়াই মনে করেন, ঈশ্বর-বিশ্বাসের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ তাঁহারা স্বীকার করেন না।

ভক্তির অভাববশতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করেন নাই, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ তাঁহার মৃত্যুর দেড় বৎসর পূর্ব্বে 'বাণী' পত্রিকায় তাঁহার যে একটি গান প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা শুধু আধ্যাত্মিক নহে, তাহার প্রেম গদ্‌গদ আত্মসমর্পণের ভাবটি এমনই মধুর যে এখানে সেটির কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। গানটি এই—

"তুমি যে আমার হৃদয়েশ্বর
তুমি যে প্রাণের প্রাণ;
কি দিব তোমায়, যা আছে আমার
সকলি তোমারই দান।
চরণের লঘু ভক্তির স্তুতি,
হৃদয়ের বেগ কম্পিত অতি,
অধরের হাসি নয়নের জ্যোতি,
কণ্ঠের মৃদু গান;
সকলি তোমারই দান—সে যে সখা
সকলি তোমারই দান।

* * * *

চেয়ে দেখ ঐ সন্ধ্যা আকাশে
দিবসের আলো ম্লান হয়ে আসে,
মিশে যায় আশা হতাশের শ্বাসে,
থেমে যায় হাসি গান;
ফুরায়ে গিয়াছে যা ছিল আমার,
আর কেন বঁধু—চেয়োনাক আর,—
আর কিছু নাই তোমায় দিবার,
হ'ল দিবা অবসান
আর কেন বঁধু?—লহ লহ তবে
এ জীবন বলিদান।"

দ্বিজেন্দ্রলাল আর কোন ভগবদ্‌-বিষয়ক গান বা কবিতা রচনা করিয়াছেন কি না তাহা জানি না। কিন্তু এই একটি গানেই তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভক্তি তাঁহার 'প্রাণের প্রাণ' 'হৃদয়েশ্বরের' দিকে উচ্ছ্বসিতভাবে ছুটিয়া গিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে দুঃখবাদী ছিলেন না তাহা তাঁহার কাব্য ও প্রবন্ধ হইতে প্রদর্শিত হইতে পারে। একটি কবিতায় তাঁহার নবজাত সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"এস ধরাধামে বৎস। হেথা বিশ্বময়
সর্ব্বৈব কদর্য্য নহে। নহে সমুদয়
ঝটিকা, অশ্রান্তগর্জ্জী বজ্র, অন্ধকার,
কণ্টক, অরণ্য, শুষ্ক মরুভূমি সার।
আছে ঊর্দ্ধে নীলাকাশ—শান্ত দিব্যস্থির,
অনন্ত অভয় ভরা স্নিগ্ধ সুগভীর
স্নেহে বক্ষে ধরি' ধরণীরে। *
নহে সবই কালসর্প কীট ও কণ্টক,
নহে সবই প্লীহা, যক্ষ্মা, জ্বর, বিস্ফোটক
হেথা।—আছে বিশ্বে নব শৈশবের মত্ত
উচ্ছৃঙ্খল ক্রীড়া, যৌবনের চিরস্বত্ব—
প্রেমের রাজত্ব, বার্দ্ধক্যেও ক্ষীণ আশা;
আছে চিরপবিত্র মাতার ভালবাসা,
চির প্রবাহিত নির্ঝরের ধারাসম
অবারিত, উৎসারিত, নিত্য মনোরম,



ধ্যানমগ্না

চিরস্নিগ্ধ ; সেই স্নেহ কভু নাহি চাবে
প্রতিদান। হেথা দুঃখ আছে, সুখ আছে,
মিথ্যা আছে, সত্য আছে, উদ্বেগ ও ভয়
আছে ; শান্তি ও ভরসা আছে। 'বিশ্বময়
সবস্থানে তুঁষ মধ্যে ধান্য আছে। তবে
শুধু সেইটুকু, বৎস বেছে নিতে হবে।"

ইহা দুঃখবাদীর উক্তি নহে! অপর একটি কবিতায় তিনি বলিতেছেন—

"কে চাহে করিতে ত্যাগ এমন ধরণী,
এমন জগৎ আমাদের ?"

আর যিনি পৃথিবীর সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া গাহিয়াছেন—

"একি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ মন্থর—
একি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্ম্মর।"

তিনি কখনও দুঃখবাদী হইতে পারেন না।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে পড়িতেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল একবার রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত ব্যাখ্যা সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে দুঃখবাদী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি নিজে পৃথিবী দুঃখময় মনে করিতেন না। এই প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন—"পৃথিবীর সম্বন্ধে মানুষের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা কবিজনোচিত কি না বলিতে পারি না। * * * আমি ত বিবেচনা করি যে মর্ত্ত্যের মানুষ একটা মহামহিমান্বিত সৃষ্টি। সে ধূলির উপর দাঁড়াইয়া সদর্পে সূর্য্যের পানে চাহিয়া বলিতে পারে—'তুমি সূর্য্য বটে, কিন্তু মানুষ নও।' মানুষের স্নেহ দয়া কৃতজ্ঞতা, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের ত্যাগ পরম সুন্দর। তাহার কাছে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত ছার।" *

রবীন্দ্রনাথকে দ্বিজেন্দ্রলাল ভুল বুঝিয়াছিলেন। যিনি দুঃখকে ঈশ্বরের মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করিয়া গাহিয়াছেন—

"দুঃখের বেশে এসেছ বলে'
তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেথায় ব্যথা সেথায় তোমা
নিবিড় করে ধরিব হে।"

তিনিও দুঃখবাদী নহেন। দেবকুমার বাবুও দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ অন্তরঙ্গ এবং ভক্ত হইয়াও তাঁহার সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

* অর্চ্চনা," ১৩১৭ সাল।

দেবকুমার বাবুর মন্তব্য।

"দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য" প্রবন্ধটি আমার কয়েক বৎসর পূর্ব্বের রচনা। তখনো দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনরূপ বিশ্বাসের সূত্রপাত হয় নাই,—তৎকালে তিনি সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) তো ছিলেনই, পরন্তু তখন তাঁহার তর্কে ব্যবহারে ও কোন কোন রচনায় তাঁহাকে প্রায়ই Pessimist বলিয়া আমাদের ধারণা হইত।

যাহা হৌক ক্রমে নানা কারণে, তাঁহার যুক্তিপ্রিয় মনে অজ্ঞাতরূপেও ধীরে ধীরে একটি বিশ্বাসের বীজ উপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল সত্য ; কিন্তু, তাঁহার নাটকের স্থানে স্থানে কোন কোন চরিত্রের বাক্যে ও ব্যবহারে এই পরিবর্ত্তনটি স্পষ্টতর প্রতিপন্ন হইয়া থাকিলেও, মুখে কোন দিনও তিনি তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শেষ জীবনে, ভক্তি-রসাত্মক কোন সঙ্গীত বা কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি জলভারে নত হইয়া পড়িয়াছে, বহুদিনই ইহা লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—"তোমাদের ঈশ্বরকে না দেখিলে আমি মানিতে পারি না ; তবে যে এই কীর্ত্তন শুনিলে আমার প্রাণটা কেমন যেন আকুল হইয়া ওঠে, তার কারণ বোধ হয় এই যে, আমার মা অদ্বৈতপ্রভুর বংশে জন্মিয়াছিলেন।" —কীর্ত্তন শুনিলে তাঁহার কি হয় জিজ্ঞাসা করায় একদিন তিনি আমায় বলিলেন—"ঐ সুর শুনিলে আমার কেন যেন ভয়ানক 'মন কেমন' করে ; যেন তখন আমার লজ্জাসঙ্কোচ ভুলে গিয়ে লাফিয়ে উঠে নাচতে সাধ যায় ; সত্যি সত্যি আমার প্রাণটা তখন এমনি করে যে, যেন ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারলে আমি বেঁচে যাই।" একদিন কোথায় কাহার একটি কীর্ত্তন গান শুনিয়া, তিনি বালকের মত শয্যাগ্রহণ করিয়া, লেপের আড়ালে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বহুক্ষণ যাবৎ কাঁদিয়াছিলেন এ কথাও একদিন শ্রীচৈতন্যদেবের কথা-প্রসঙ্গে আমাকে তিনি বলিয়াছিলেন। যদি বলা যাইত, "আপনার বেশ মত-পরিবর্ত্তন হইয়াছে" ; তিনি অমনি সে উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন,—"ওকথা আমি স্বীকার করি না—তবে কীর্ত্তন সম্বন্ধে আমার স্বভাবে কেমন একটা যেন দুর্ব্বলতা আছে।"

কিন্তু তা'হইলেও, অর্থাৎ তিনি তাঁহার ধারণামত সত্যের খাতিরে যতই কেন অস্বীকার করুন না, একথা খুবই ঠিক যে, শেষ বয়সে (মৃত্যুর ৩।৪ বছর পূর্ব্ব হইতে) তিনি ঈশ্বরে ও সাধু মহাপুরুষে আস্থাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

'তীর্থ-ভ্রমণ'

ভ্রমণ-কাহিনী। ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সম্পাদিত। কলিকাতা "বিশ্বকোষ প্রেসে" মুদ্রিত এবং "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ" কর্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজি, ১৫+৬৪৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ২॥০, পরিষদের সদস্য পক্ষে ১৲

সাড়ে একষট্টি বৎসর পূর্ব্বে, আটচল্লিশ বৎসর বয়সে, স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় চারি বৎসর কাল পদব্রজে নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একখানি খাতায় রোজনামচা আকারে—আজকাল যাহাকে যাহাকে 'ডায়ারি' বলে—প্রাত্যহিক ঘটনাগুলি তিনি যথাযথভাবে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই রোজনামচাখানি 'তীর্থ-ভ্রমণ' নামে মুদ্রিত হইয়া বাহির হইয়াছে। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে রোগক্লিষ্ট শরীরেও অবসন্ন মনঃ লইয়া এই সুবৃহৎ পুস্তকখানি সমস্ত পড়িয়া ফেলিয়াছি,—ক্লান্তি আসে নাই,—পড়িবার জন্য উত্তরোত্তর উৎসাহই আসিয়াছে। পড়িবার সময় আনন্দে হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে। এক নিঃশ্বাসে পড়ি নাই, ধীরে সুস্থে রস গ্রহণ করিতে করিতে প্রত্যেক পংক্তি পড়িয়াছিলাম।

বাল্যকালে পিতামহীর ক্রোড়ে বসিয়া বা রাত্রে তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাঁহার মুখে তীর্থপ্রসঙ্গ শুনিতে কত যে আনন্দ পাইতাম, অনধ্যায়ের রাত্রিতে বৃদ্ধ অধ্যাপকের মুখে তীর্থ ভ্রমণ শুনিতে কত যে আগ্রহ জন্মিত; সে আমোদ সে আগ্রহ এখনকার বালক বালিকায় যুবক যুবতীর কি আর আছে! এক্ষণে কি আর তীর্থে ভক্তি, গুরু দেবতা ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধা, শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে? যে ভক্তি, যে শ্রদ্ধা, যে বিশ্বাস বুকে করিয়া ভারতের নরনারী মিলিয়া মিশিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, কোন বাজিকরের এক ফুৎকারে আজ তাহা ভারত হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল!

অভিজাত্যে ও ঐশ্বর্য্যে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সর্ব্বাধিকারী বংশ বঙ্গদেশে চিরপ্রসিদ্ধ। যে বংশের প্রকৃতরাজ-রত্নেশ্বরের ও তাঁহার বংশধরদিগের মস্তকে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে গমন কালেও অনুচরবর্গ ছত্রধারণ করিত; যে বংশে মুন্সি রামনারায়ণের জন্ম, রাজা হরিপ্রসাদের জন্ম; সেই সম্পৎসম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র রাজা সীতানাথের ভ্রাতা হইয়া, যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী যে বাল্যে ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই লালিত পালিত হইয়াছিলেন, একথা বোধ করি কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। সেই মহাপ্রাণ যদুনাথ যে পদব্রজে তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, দাণ্ডীর সাহায্য না লইয়া বিপৎসঙ্কুল একান্ত বন্ধুর তুষারাচ্ছাদিত পথে পদব্রজেই পুনঃ পুনঃ হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গ আরোহণ ও অবরোহণ করিয়া কেদার বদরীনারায়ণ দর্শন ও গঙ্গোত্তরীর হিমানীশীতল ধারায় স্নান তর্পণ করিয়াছিলেন; ইহা যে কেবল অর্থকষ্ট জন্য—তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আসিবার পথে যিনি নৌকা-পথে গৃহে আসিয়াছিলেন; পদব্রজে তাঁহার তীর্থ ভ্রমণের কারণ যে অর্থাভাব নয়, ইহা হইতেই আমরা তাহার অবধারণ করিতে পারি। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; তাই তিনি যান-বাহনের সহায়তায় তীর্থভ্রমণ করেন নাই। শাস্ত্রে আছে,—যান-বাহনে আরোহণ করিয়া তীর্থে গমন করিলে তীর্থপ্রাপ্তি, তীর্থস্নান ও তীর্থ-দেবতার দর্শনে কোন ফল হয় না, প্রত্যুত পাপ হয়।

যে ভাবে তীর্থযাত্রা, তীর্থপ্রাপ্তি, তীর্থকৃত্য করিতে হয়, সর্ব্বাধিকারী মহাশয় শাস্ত্রের শাসন মানিয়া, গৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহ প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত নিখুঁত ভাবে সর্ব্বত্র যথাবিধি তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গৃহে শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে ভোজন করাইয়া তিনি তীর্থযাত্রা করেন। যেদিন তিনি যে তীর্থে গিয়াছেন, সেদিন তিনি সে তীর্থে উপবাস করিয়াছেন ও তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্ত শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রকৃত তীর্থযাত্রাও নাই, সে সকল অনুষ্ঠানও নাই।

মহাত্মা সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে কেবল তীর্থ-ভ্রমণ করিতে যাইয়াই শাস্ত্রের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন তাহা নয়। গৃহে অবস্থিতি করিবার সময়েও তিনি শাস্ত্রের নিদেশগুলি পালন করিতেন। পিতৃপক্ষে গঙ্গায় তর্পণ করিবার উদ্দেশে প্রতি বৎসর কলিকাতায় আসিয়া তিনি পোনের দিন বাস করিতেন। "ভাক্তদিবা"—এই একটি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিয়া তিনি তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহার দৈনন্দিন ব্যাপারেও শাস্ত্রানুশাসন প্রতি-পালিত হইত। তিনি লিখিয়াছেন,—

"নিজ গ্রামে যাহা আছে, তাহার ভরসা নাই, সর্ব্বদা বন্যা জলেতে হাজে; কেবল মুড়াগাছাতে ঠিকা জমির মধ্যে কিঞ্চিৎ আছে, তাহাতে যে মুনাফা আছে, কায়ক্লেশে শ্রীজিউর নিজ অংশের সেবা আর বার্ষিক শ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণ কয়েকটি গুছাইয়া করিলে হয়।"

পাঠক পাঠিকা, একবার এই অংশ পড়িয়া দেখুন, বুঝিবেন,—পুণ্যাত্মা সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্মগুলির প্রত্যেক কর্ম্মটিতেই প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাই তিনি বার্ষিক শ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছেন। আজ কালকার "সার্ব্ব-জনীন স্মৃতি সভায়" বক্তৃতা-কোলাহলের দিনে বার্ষিক শ্রাদ্ধ কাহাকে বলে, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কাহাকে বলে, —কয়জনে বা বুঝিবেন? বৎসরে কয়বার পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়,—তাহারই বা কে খোঁজ রাখেন?

ধর্ম্মপ্রাণ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই আয়ে পরিবার-বর্গের প্রতিপালনের কথা না তুলিয়া শ্রী৺জিউর সেবার কথা, বার্ষিক শ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কয়েকটির কথা তুলিলেন। ইহাদ্বারা সেকালের একটি আদর্শ হিন্দু পরিবারের চিত্র, একটি আদর্শ হিন্দু গৃহের চিত্র স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়। সেকালে শাক্ত বৈষ্ণব নির্ব্বিশেষে সকলের গৃহেই অন্ততঃ একটি শালগ্রাম-চক্রের অবস্থান ছিল। সেইটিই গৃহস্বামী, সেইটিই গৃহদেবতা, সেইটিই গৃহের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। বিধবার ত কথাই নাই, গৃহের বাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সেই গৃহদেবতার সেবা লইয়া ব্যস্ত থাকিত। গৃহিণীরা গৃহস্বামীকে কখনই এরূপ প্রশ্ন করিতেন না, "আজ আপনার জন্য কি রাঁধিতে দিব?" জিজ্ঞাসা করিতেন, "আজ ঠাকুরের ভোগের কিরূপ ব্যবস্থা করিব?"

এক্ষণে আর সে ভাব নাই, সে ভক্তি নাই, সে উন্মাদনা নাই, সে অনুষ্ঠান নাই। কাহারও কাহারও গৃহে পিতৃপিতামহের স্থাপিত দেববিগ্রহ বা শালগ্রাম-চক্র থাকিতে পারেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার পূজা, ভোগ আরতির সহিত গৃহকর্ত্তার সেরূপ সম্বন্ধ আর দেখিতে পাই না। সায়ংকালে আরতির সময়ে শঙ্খ ঘণ্টা কাংস্যের কঠোর ধ্বনিতে বন্ধুগণের সহিত বৈঠকখানার উপবিষ্ট কর্ত্তার বিশ্রম্ভালাপে বিঘ্ন হইবে বলিয়া, নীরবে আরতি করিবার আদেশ প্রচারিত হইয়া থাকে। দেবতার পূজার ভার এখন 'উড়ে ব্রাহ্মণ ও বেহারার উপরে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত। উড়ে বেহারা কলাপাতার ঠোঙাতে রাস্তার ধারের কাঠ-মল্লিকার গাছ হইতে দুই চারিটি পোকাকাটা ফুল আনিয়া দেয়, আর উড়ে ঠাকুর আরশুলার নাদি ও মৃত-জীবিত পোকায় পূর্ণ চাউলে নৈবেদ্য সাজাইয়া, কি মন্ত্রে জানি না, সেই ফুলে ও সেই নৈবেদ্যে মুহূর্ত্তে পূজা সারিয়া শঙ্খ বাজাইয়া পূজাশেষের সংবাদ সকলকে জানাইয়া দেয়। এখন আর সুরভি পুষ্পরাশির মৃগমদ পরিমল-মিশ্রিত অগুরু চন্দনের, ষোড়শাঙ্গ ধূপ ধূমের, কর্পূরদীপ ঘৃত-প্রদীপের, হৈয়ঙ্গবীন ধারাস্নাত শালিতণ্ডুল নির্ম্মিত নৈবেদ্যের ও উপাদেয় ফল, কন্দ মিষ্টান্নের সৌগন্ধে কেবল দেবমন্দির নয়, গৃহস্বামীর গৃহ নয়, পূর্ব্ববৎ সমস্ত পল্লী ভরপুর হইয়া যায় না। ভক্তির দৃষ্টান্ত নাই, কি করিয়া বালক বালিকা দেবভক্তি শিক্ষা করিবে? কি করিয়া খাঁটি হিন্দু হইবে? কি করিয়া তীর্থভক্তি হইবে? কি করিয়াই বা তাহাদিগের তীর্থবিশ্বাস তীর্থগমনে প্রবৃত্তি জন্মিবে? কাজেই এখনকার তীর্থভ্রমণ প্রকৃত তীর্থভ্রমণ নয়, সখের ভ্রমণ বা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য জলবায়ু পরিবর্ত্তনের ভ্রমণ। "কাশীপুর বৰ্দ্ধমান ছমাসের

পথ, ছয়দিনে উত্তরিল অশ্বমনোরথ"—অশ্বমনোরথের ন্যায় বাষ্পরথে চড়িয়া একদিনে কাশী, দুইদিনে মথুরা, তিনদিনে কাঞ্চী গেলে ঠিক তীর্থভ্রমণ হয় না। রহিয়া রহিয়া, সহিয়া সহিয়া, জিরাইয়া জিরাইয়া, চটীতে চটীতে অবস্থিতি করিয়া, কখনও সুখে কখনও দুঃখে পড়িয়া তীর্থে গেলে, তীর্থে আসিয়াছি বলিয়া যেমন একটা ভাব, যেমন একটা বোধ জন্মে; রেলের গাড়ীতে চড়িয়া তড়ীঘড়ী তীর্থপ্রাপ্তিতে সে ভাব, সে বোধ আসিতে পারে না। রেলযাত্রীর পক্ষে যেমন তীর্থস্থানে তীর্থদেবতার দর্শনেও কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না, তাহাদ্বারা সেইরূপ দেশভ্রমণ-জনিত কোনরূপ জ্ঞান বুদ্ধিরও আশা করা যাইতে পারে না। ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে তীরের মত গাড়ী ছুটিল। দুইদিকে হাট, মাঠ, ঘাট, গিরি, নদী, নদ, হ্রদ, তড়াগ, তরু, গুল্ম, লতা, গ্রাম, পল্লী, নগর—সমস্তই চোখের উপরে ভাসিয়া চলিল, মনে কিছুরই ছাপ পড়িল না। এরূপ ভ্রমণ ভ্রমণ নয়, পণ্ডশ্রম মাত্র, ট্যাঁকের পয়সা খরচ মাত্র। পদব্রজে ভ্রমণই প্রকৃত ভ্রমণ।

ভ্রমণকাহিনীতে এখনকার সাহিত্যিক বাজার সরগরম। দুই একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত মাসিক পত্রিকায় ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রায়ই বাহির হয়। তাহাতে থাকে কেবল—ট্রেণখানি হুস হুস শব্দে ছুটিল, দুই পার্শ্বের মাঠ দেখিতে দেখিতে চলিলাম, হরিদ্বর্ণের ঢেউখেলান ধান্যক্ষেত্র দেখিয়া মনে আরাম আসিল, অমুক ষ্টেশনে পঁহুছিয়া চা পান করিলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহাতে একটিও জ্ঞাতব্য বিষয় খুজিয়া পাওয়া যায় না। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের এই পুস্তকে খুঁজিতে হয়না, সমস্তই জ্ঞাতব্য বিষয়; জ্ঞাতব্য বিষয়ে পুস্তক খানি পরিপূর্ণ। যখন তিনি যে তীর্থে গিয়াছেন, তখনই তিনি সেই তীর্থের যেন একখানি ছবি আঁকিয়া ফেলিয়াছেন। শুধু তীর্থের নয়, পথের পর্য্যন্ত ছবি আঁকিয়াছেন। একমাত্র ছবি আঁকিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই। কোথায় কোন জিনিস পাওয়া যায়, কোথায় কো‍্ন জিনিসের বাজার দর কত, তাহা পর্য্যন্ত লিখিতে তাঁহার ভুল হয় নাই। তিনি তীর্থের পৌরাণিক ইতিহাস লিখিয়াছেন, যথাসম্ভব দেশ প্রচলিত ইতিহাসেরও সংগ্রহ করিয়াছেন, দেশের নরনারীর ও রাজারও যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন।

গোলাপ ফুল এদেশে ছিল না,অন্য দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছে—এই কথাই ত সকলের মুখে শুনিয়াছি; কিন্তু আজ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মুখে শুনিয়া সে সংস্কার তিরোহিত হইয়াছে। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন—"কেদারনাথ গমনে চারিদিকের পথ কেবল গোলাপের গাছ, পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া বন, পর্ব্বত সুশোভিত, গন্ধে আমোদিত। বদরীনারায়ণ যাইবার পথে, দুই দিবসের পথ গোলাপ পুষ্পের বন।"

অনেকের বিশ্বাস, বাঙ্গালাদেশেই তন্ত্রের জন্ম, বাঙ্গালাদেশেই কালী, দুর্গা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবীগণের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের এই তীর্থভ্রমণ পাঠ করিলে সে ভ্রম দূরীভূত হইবে। তাঁহার পুস্তকের নানাস্থানে ব্রজেশ্বরী, অম্বিকা, অঞ্জনী, জয়ন্তী মহিষমর্দ্দিনী, কালী, ছিন্নমস্তা, অষ্টভুজা কালিকা, যোগমায়া, মনসাদেবী, শ্যামা, চতুর্ব্বিংশতি বাহুবিশিষ্টা মহিষমর্দ্দিনী, দশভুজা দুর্গা প্রভৃতি দেবীদর্শনের উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশে নয়, বঙ্গদেশের নিকটেও নয়, সুদূর দিল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয়ের নানাশৃঙ্গে ও নানাস্থানে তিনি এই সকল দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে ভারতবাসী ইষ্টক প্রস্তুত করিতে জানিত না, পাকাবাড়ী অধিক ছিল না, যে দুই একটি ছিল তাহাও তাহাও প্রস্তর নির্ম্মিত—এইরূপ যাঁহাদিগের বিশ্বাস, তাঁহারা সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের লিখিত, "থানেশ্বরের পূর্ব্ব দক্ষিণ ৪ ক্রোশ চক্রব্যূহ যথায় অভিমন্যুকে সপ্তরথীতে বধ করে, ঐ ব্যূহের ইঁট ওজনে ২ মণ পর্য্যন্ত আছে; ইটে অঙ্গুলি-চিহ্ন আছে।"—এই অংশটুকু পাঠ করিয়া কি বলিবেন?

"থানেশ্বর-শিব—পাণ্ডবের শিবিরে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের রক্ষার্থ দ্বারী ছিলেন।"—সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের এই লিপি পড়িয়া স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, থানেশ্বরের প্রকৃত নাম স্থাণ্বীশ্বর। স্থাণু, মহাদেবের এক নাম। শিবির

রক্ষার্থ মহাদেব সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; সেই জন্যই স্থাণু শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

সেকালে শাক্তের বাড়ীতেও শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, সম্পন্ন শাক্ত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহেরও প্রতিষ্ঠা করিতেন, বৈষ্ণবগণও ধুমধামের সহিত বর্ষে বর্ষে দুর্গাপূজা করিতেন। শান্তিপুরের গোস্বামি-গৃহে আমি বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ দেখিয়াছি, প্রতিষ্ঠিত মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি দেখিয়াছি। আস্তিক হিন্দুগণের কথনই দেব-বিদ্বেষ আসিতে পারে না। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়েরও শ্যাম, শ্যামাতে ভেদবুদ্ধি ছিল না। তাহার প্রমাণ পুস্তকের সর্ব্বত্র জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, এমন কি, গোগাপীরের আস্তানা দেখিয়া সেই পীরকেও জাগ্রৎ বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রেমভক্তি ও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তয়িতা চৈতন্যদেবেরও যে শিবমন্দিরে যাইয়া শিব-দর্শনে অশ্রু, পুলক, মূর্চ্ছা হইত, দক্ষিণাপথে গণেশ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াও যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, এ সমস্ত কথা ত তাঁহার প্রকৃত জীবনচরিত চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই। তিনি শাস্ত্রের অনুশাসন মানিতেন না, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম,বর্ণাশ্রাম ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন,—এ সমস্ত আজগুবি কথা শিক্ষিত সম্প্রদায় কোথায় পাইলেন? আমরা ত খুঁজিয়া পাই না। তিনি যবন হরিদাসের সহিত এক পংক্তিতে কখনও আহার করিয়াছেন—কেহ কি দেখাইতে পারেন? ম্লেচ্ছ যবনেরও যে হরিনামে অধিকার আছে, ভগবদ্‌ভক্তিতে অধিকার আছে, ইহা ত শাস্ত্রেরই উপদেশ।

সে সময়ে ধর্ম্মের জন্য কত পুণ্যাত্মা যে কিরূপ কঠোর তপস্যা করিতেন, সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার পুস্তকে পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সকল তপস্বীদিগের মধ্যে আমরা একটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-বিধবাকে দেখিতে পাই। এই বিধবাটি সাবিত্রী পর্ব্বতে চল্লিশ বৎসর একাসনে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। রাত্রিতে সেই শ্বাপদসঙ্কুল শৃঙ্গে কেহই থাকিত না, সেই ব্রাহ্মণকন্যা একাকিনী সেইখানে বসিয়া তপস্যা করি-তেন। পতিভক্তির কি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! সেকালে রমণীরা কবিতায় প্রেমপত্র লিখিয়া পতিপ্রেম ব্যক্ত করিতেন না। পতিপ্রেম তাঁহাদের অন্তরমধ্যে লুকায়িত থাকিত। তাঁহারা পতিদেবতার চরণে দেহ, মন প্রাণ, আত্মা সমস্ত উৎসর্গ করিয়া দিতেন, নিজের দেহ, মন, প্রাণ, আত্মায় নিজের কোন অধিকার রাখিতেন না। তাই তাঁহারা দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরায় পড়িয়াও কদাচ আত্মহত্যা করিতে অগ্রসর হইতেন না। কারণ, তাঁহারা জানিতেন, দেহে নিজের কোন স্বত্ব নাই। দেখিতে দেখিতে কি হইল,—বুঝিনা। অন্তঃপুর হইতেও কি আজ ধর্ম্মভাব, ধর্ম্মবিশ্বাস উঠিয়া গেল? কুল-রমণীগণের আর বুঝি আত্মায় বিশ্বাস নাই, স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস নাই, জন্মান্তরে বিশ্বাস নাই—নহিলে, সমস্ত পাপ হইতে যে অতিগুরুতর মহাপাপ—আত্মহত্যা—যাহার ফল ভীষণ নরক—আজ কেরাসিন তৈলের সাহায্যে রমণীকুল সেই মহাপাপ আত্মহত্যায় কেমন করিয়া লিপ্ত হইতেছেন?

এই সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ও দুঃসহ রোগযন্ত্রণায় পড়িয়া, সেই যন্ত্রণার সময়ে প্রসুপ্ত পত্নীকে ডাকিয়া জাগাইতে না পারিয়া, ক্রোধমিশ্রিত বৈরাগ্যে আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অধীরতার সময়েও তিনি গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের শ্রীমন্দিরদ্বার-দেশের আশ্রয় গ্রহণ করেন; তাহাতেই তাঁহার মনের সেই সাময়িক পৈশাচিক ভাব বিদূরিত হইয়া যায়, তাঁহার "মধ্যমা মাতাঠাকুরাণী"—বিমাতা—তাঁহাকে ডাকিয়া হাত ধরিয়া মন্দির দ্বার হইতে উঠাইয়া লইয়া আসিলেন। এ চিত্র কেমন মনোহর! আটচল্লিশ বৎসর বয়সের সপত্নী-পুত্রের উপরে বিমাতার কেমন আধিপত্য! বিমাতা-বিদ্বেষও আমাদের দেশে নূতন। দুষ্টগ্রহের তাড়নায় এক কৈকেয়ীর মতিভ্রম ঘটিয়া-ছিল,—দেখিতে পাই; আর ত সপত্নী-পুত্রের উপরে বিমাতার দুর্ব্ব্যবহার কোন পুরাণে, সংস্কৃত কোনও কাব্যে দেখিতে পাই না। মাদ্রী,

সপত্নী কুন্তীর উপরে নিজ পুত্রদ্বয়ের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে স্বামীর জলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কুন্তীও নিজের পুত্র অপেক্ষা মাদ্রীপুত্রে অধিক অনুরক্ত ছিলেন। সেকালের একটি গল্প আছে—কোন এক সপত্নীপুত্র তাহার বিমাতাকে বলিয়াছিল—"তুমি ত আমার সৎমা।" বিমাতা হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন, "উত্তম, আমি তোর সৎমা, সৎ হওয়া ত ভাল কথা। যার পেটে হইয়াছিস্, সে তোর সৎ মা নয়, অসৎ মা"—তাহাই ত শুনিয়া আসিতেছি। বিমাতার হাতে পড়িয়া সপত্নীপুত্রের যারপর নাই নিপীড়ন হয় এবং সপত্নী-পুত্রের হাতে পড়িয়া বিমাতার একশেষ লাঞ্ছনা হয়—এরূপ ত পূর্ব্বে শুনিতাম না। নূতন শিক্ষার প্রভাবে, স্বার্থপরতার প্রবলতায়, মহিলামহলে পর্য্যন্ত পাপ প্রবেশ করিয়াছে; কোমল প্রকৃতি স্ত্রীজাতি পর্য্যন্ত কঠোর হইয়া পড়িয়াছেন; দেবীভাবের পরিবর্ত্তে তাঁহারা রাক্ষসী ভাবের পরিপোষণ করিতেছেন; আর কি বলিব?

সেকালে সুকবি সর্ব্বাধিকারী মহাশয় চিন্তা না করিয়া যেরূপ বাঙ্গালা লিখিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ ভাষায় একটুকুও আবিলতা নাই, আড়ম্বর নাই, তীব্রতা নাই। সর্ব্বত্র বিমলতা, সর্ব্বত্র সরলতা।

স্নেহাস্পদ কল্যাণভাজন শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মুখবন্ধ ও টীকা লিখিয়া পুস্তকখানির উপাদেয়তা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। স্বচ্ছ কাচপাত্রে স্থাপিত হইয়া উজ্জ্বল আলোক যেন উজ্জ্বলতর হইয়াছে। পাথরের ষ্টেচু জড়পিণ্ডের আংশিক প্রতিকৃতি মাত্র, তাহা দ্বারা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। এই পুস্তকখানি সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রকৃত প্রতিকৃতি। ইহাদ্বারা সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে চিনিতে পারা যায়, ভালরূপ বুঝিতে পারা যায়। নির্ব্বাক ষ্টেচু নির্ম্মাণে অগ্রসর না হইয়া, যিনি এই পুস্তকখানির প্রচার করিয়াছেন, তিনি সাধারণের একান্ত ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই।

শ্রীযাদবেশ্বর শর্ম্মা।

খেয়া ঘাটে

আকুল মরমোচ্ছ্বাস;—লীন হয়ে যায়
আলোকের রেখা,
আজি, হে জীবনস্বামি, সাগর-বেলায়,
বসে আমি একা;
চিরদিন শ্রান্তিহীন, পদে পদে ছুটি',
কামনার পাছে,
হিয়ার বাঁধন আজ পড়িতেছে টুটি',
তবু তাই যাচে।
একি ভ্রান্তি! একি তৃষা!—দুশ্ছেদ্য বন্ধন
একি মোহময়!
শত ঘাত, নিষ্পেষণ, ব্যর্থতা, ক্রন্দন—
তবু তারি জয়;
আজীবন কামনার পশরা বহিয়া,
জীবনের শেষে
পারের সম্বলহীন,—এসেছি ফিরিয়া,
রিক্ত দীন বেশে।
আনিবে কি বাহি, ওগো, তোমার সে তরী?
সকল ভুলিয়া—
স্খলন, পতন যত,—শান্তি-পূত করি,'
নেবে কি তুলিয়া?
এস তবে, হে নির্ম্মল, হে চির সুন্দর,
ওগো আকাঙ্ক্ষিত,
পূর্ণ করি' দিতে আজি শূন্য এ অন্তর,
এস গো বাঞ্ছিত;
ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি লুপ্ত হ'য়ে যাক্
পরশে তোমার,
পুলক-স্পন্দিত হিয়া শুধু জেগে থাক্,
হে প্রিয় আমার।

শ্রীঅমিয়াময়ী দেবী।

সে

সে আমার রূপহীনা, গৃহকার্য্য-ধূলায় মলিন,
বক্ষে বাঁধি বসন-অঞ্চল
মাঘে তার শীত নাহি, জ্যৈষ্ঠ দ্বিপ্রহরে
নাহি মানে রৌদ্র বা অনল।
গৃহ ও অতিথি তরে অন্নপূর্ণা, অন্নজল করে
ব্যস্ত সে যে আপ্রাত নিশীথ
কণ্ঠে তার সান্ত্বনা ও করুণার নিত্য মধু ক্ষরে
জীয়াইতে ক্ষুধিত তৃষিত।
হাসি তার সুশীতল, শব্দহীন, শুভ্র সরলতা
সর্ব্ব অঙ্গ সরম সুন্দর—
বিরহে দেবতাদ্বারে নিবেদি' সে মর্ম্ম আকুলতা
নিত্য পতি-কল্যাণ-কাতর।
মিলনেও তার সেই দৈন্য-ভরা মৌন নিবেদন
সেবা রাগে রাঙা চিত্তখানি;
নহে দেবী, নহে সে গো শকুন্তলা উর্ব্বশী যেমন,
সে যে শুধু ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য প্রাণী।

নহে সে গো অসামান্যা, জ্যোতির্ম্ময়ী রূপের বিজুরী,
তীব্রগতি ধধূপের মত,
নহে সে তো দোষশূন্যা, নিরুপমা, কেবল মাধুরী
কল্পলোকবাসিনী-কল্পিত;
পাদক্ষেপ-ক্ষেপণীতে তার ভরা তনু তরীখানি
নৃত্যতালে নহে বিলসিত;
কণ্ঠস্বরে ঝরে নাক' মোহমাখা গীতময়ী বাণী—
কোকিলের কাকলি ললিত।
হাস্যে তার সুর স্বপ্ন উদ্ভাসিয়া বুঝি বা উঠেনা—
নাহি দেহে পদ্মের সুবাস;
মিলন তৃষ্ণায় শুষ্ক বিরহের উষ্ণায় ফুটেনা—
প্রণয়ের কৃত্রিম উচ্ছ্বাস!
বাদলে পাগল হয়ে' অশ্রুজলে থাকেনা তন্ময়
গুরুজনে করি অবহেলা,
প্রেমের রাজস্ব তার কথাচ্ছন্দে শোধ নাহি হয়
পরিপূর্ণ মিলনের বেলা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বায়ু-চক্র (WIND MILL)

প্রকৃতির অফুরন্ত শক্তিপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সে বিরাট্ শক্তিরাজির ক্ষুদ্রতম কণাও আমাদের কার্য্যে ব্যয় হইতেছে কিনা সন্দেহ। সূর্য্যালোকের কথা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অনন্ত আকাশপথে বিচ্ছুরিত বিরাট্ আলোকরাশির কতটুকু আলোক পৃথিবীর উপর আসিয়া নিপতিত হইতেছে! এই প্রচণ্ড আলোকের প্লাবন-পথে পৃথিবীটি একটি ক্ষুদ্র সর্ষপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। সুতরাং প্রাকৃতিক শক্তির এই অপচয় আমাদের চক্ষে ক্ষতি বলিয়াই মনে হয়। পৃথিবীতে নিপতিত সূর্য্যালোকের কতকাংশ গাছপালার বর্দ্ধন ও পোষণ কার্য্যে ব্যয় হইয়া থাকে। কতকটা মানুষের শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ম ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট নদী ও সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া মেঘের সৃষ্টি কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। এ ছাড়াও যে কত কার্য্য করিয়া সূর্য্যালোক নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকে তাহা বলা যায় না।

সূর্য্যালোকের এই অপচয় শূন্যমার্গ হইতে নহে, পরন্তু আমাদের পৃথিবী হইতে অপচয় হইতেছে। সেইজন্যই একজন বৈজ্ঞানিক, আলোকের এই অপচয় দেখিয়া সূর্য্যালোকদ্বারা মোটর চালনার কৌশল (Solar motor) উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। শূন্যে বিকীর্ণ সূর্য্যরশ্মিকে যদি কোনক্রমে আতসী কাঁচদ্বারা

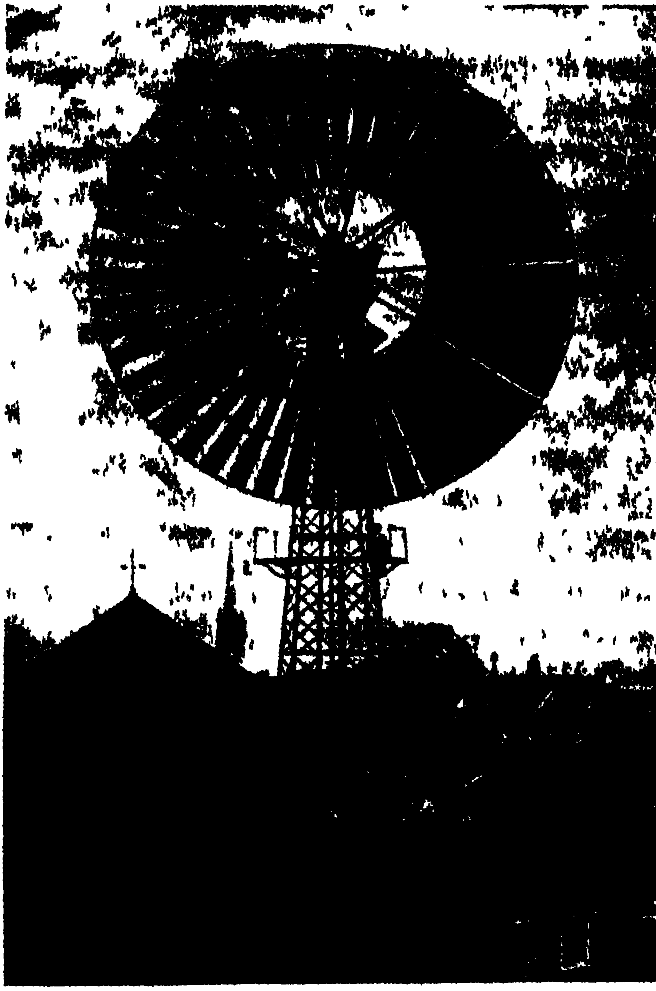
কেন্দ্রীভূত করা যায় তবে সমবেত আলোকরশ্মি এমন উত্তাপ প্রদান করিতে পারে যদ্দ্বারা জল ফুটিতে বিলম্ব হয় না। জলের বাষ্প দিয়া বড় বড় এঞ্জিন্ পরিচালিত করিয়া নানা কর্ম্মের সুবিধা হইয়াছে। এইরূপে ধরাপৃষ্ঠে পতিত সৌরশক্তির কিয়দংশ কৌশলে মানব স্বীয় কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সৌরশক্তির ন্যায় কত শক্তিই যে প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রকাশিত হইয়া মানুষকে তাহার নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের কৌশল উদ্ভাবনে আহ্বান করিতেছে তাহার ঠিক নাই। সৌরশক্তির বলে আজকাল সমগ্র সভ্যজগতের কল-কারখানা পরিচালিত হইতেছে। ট্রাম, ট্রেণ হইতে আরম্ভ করিয়া ময়দার কল পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারেই পাথুরিয়া কয়লা দগ্ধ করিয়া শক্তি সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। এই পাথুরিয়া কয়লার দাহিকা-শক্তি একমাত্র সূর্য্যের গুণ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পাথুরিয়া কয়লা যখন গাছ আকারে পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া সূর্য্যালোক হইতে সৌরশক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, সেই শক্তি তাহার বৃক্ষ-দেহের মধ্যে গুপ্ত ছিল। তাহার পর যখন ভূমিকম্প বা অন্য কোন নৈসর্গিক কারণে সেই বনভূমি ভূগর্ভে প্রস্তরমৃত্তিকার চাপে কৃষ্ণবর্ণ পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হইল, তখনও তাহার দেহ হইতে সৌরশক্তি দূরীভূত হয় নাই পরন্তু সঞ্চিত হইয়া ছিল। সেই গুপ্ত-শক্তির পরিচয় এখন একটি এঞ্জিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

পাথুরিয়া কয়লার ব্যয় আজকাল বড় কম নহে। রত্নগর্ভা ধরণী তাঁহার সন্তানগণকে যে রত্নের খনি দেখাইয়া দেন তাহার ভাণ্ডার পর্য্যাপ্ত নহে, এবং কয়লার খনির ভাণ্ডারও যে অফুরন্ত নহে, এই কথাটা তাঁহার সন্তানগণ আজও বুঝিতে পারেন নাই। পাথুরিয়া কয়লা বৈজ্ঞানিকেরা ঘরে বসিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রচনা করিতে পারেন না, তাহার আকর ভূগর্ভে—সুতরাং সেই আকরের বস্তুপরিমাণ যে অসীম একথা বলা চলে না। এইজন্য বৈজ্ঞানিকগণ সন্দেহ করিতেছেন যে, পৃথিবীর কয়লার খনি কদাপি অক্ষয় নহে সুতরাং শীঘ্রই সেগুলি ফুরাইয়া যাইতে পারে। দিন দিন পাথুরিয়া কয়লার ব্যয় যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে, সেদিন দূরবর্ত্তী নহে যেদিন কলিয়ারীর কুলীরা হতাশভাবে কয়লা খনির শূন্য ভাণ্ডারের বার্ত্তা সভ্য জগতে ঘোষিত করিবে। সমস্ত এঞ্জিন্‌গুলিকেই যে পাথুরিয়া কয়লা দিয়া পরিচালিত করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আমাদের হাতের কাছে যে জল, বায়ু এবং আলোক রহিয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, তাহারাই আমাদের কার্য্য করিবার পক্ষে যথেষ্ট। নিত্য বিচ্ছুরিত সূর্য্যালোককে কেন্দ্রীভূত করিয়া বৃহৎ এঞ্জিনকে অথবা বায়ুর গতি দ্বারা চাকা ঘুরাইয়া wind millকে পরিচালিত করিতে পারা যায়। তা'ছাড়া বৃহৎ বৃহৎ জলপ্রপাতের জল-পতনের শক্তিকে কৌশলে যন্ত্রবদ্ধ করিয়া আজকাল আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বৃহৎ তড়িৎ-উৎপাদক-যন্ত্র (Dynamo) চালিত হইতেছে। মানুষের এত সহজ সাধ্য এবং সুলভ উপায় থাকিতে, সে কেন যে একমাত্র পাথুরিয়া কয়লার উপর দৃষ্টি দিল তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যে বায়ু অনবরত পৃথিবীর উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই প্রবহমান্ বায়ুর শক্তি যে সকল সুবৃহৎ চাকা ঘুরাইয়া এঞ্জিনের কার্য্য করিতেছে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়! ষ্টীম এঞ্জিনের আবিষ্কারের পূর্ব্বে সমস্ত জাহাজই, সমুদ্রের হাওয়া পালে লাগাইয়াই সমুদ্র পাড়ী দিত। এখনও যে পবনদেব নাবিক মহলে উপেক্ষিত তাহা নহে। অনুকূল বায়ু উঠিলেই অনেক নাবিক পাল উঠাইয়া জাহাজ চালাইয়া থাকে।

বিজ্ঞানরথী লর্ড কেলভিন্ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, নৌবিভাগে চল্লিশ হাজার অর্ণবপোতের মধ্যে দশ-হাজার মাত্র ষ্টীমার, অর্থাৎ ষ্টীম্-এঞ্জিনে পরিচালিত হয় এবং অবশিষ্ট ত্রিশ হাজার পালের সাহায্যে যাতায়াত করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অপরাপর দেশেও বহু ষ্টীমার ও পাল-পরিচালিত-অর্ণবপোত রহিয়াছে। সুতরাং পাল দিয়া অর্ণবপোত চালনাটা এখন সভ্য সমাজে একান্ত

উপহাসের ব্যাপার নহে।

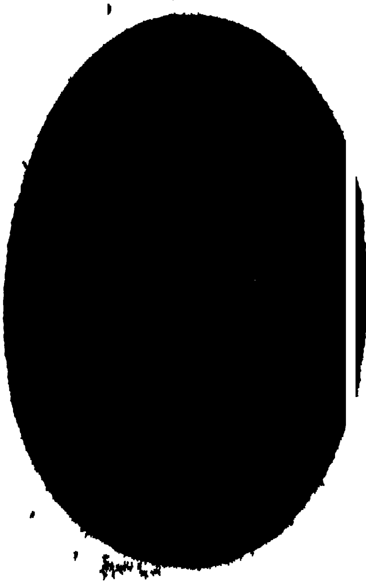
বায়ুদ্বারা চক্রচালিত কল বা wind mill পাশ্চাত্য দেশের গ্রাম্য সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে, সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায় বায়ু-চালিত কলের আদর আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তা'ছাড়া বায়ুকে কদাপি টাকা দিয়া ক্রয় করিতে হয় না, ইহা একটা কম সুবিধা নহে। পাথুরিয়া কয়লা যেস্থানে দুষ্প্রাপ্য বা দুর্লভ সেস্থানে ভাগ্যক্রমে বায়ুর গতি থামিয়া নাই। একটা Wind mill অনায়াসেই চালান যাইতে পারে। জলপ্রপাতের সাহায্যেও কার্য্য উদ্ধার করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু জল-প্রপাতের সংখ্যা অত্যল্প! নায়াগ্রার জল প্রপাত-গুলি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বজন-বিদিত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত (Victoria falls) উল্লেখযোগ্য। তদ্ব্যতীত



বর্ত্তমান সময়ের একটি বায়ুচক্র

এবং সুইট্জারল্যাণ্ড প্রদেশে জলপ্রপাতের সংখ্যা অনেক বেশী। অপরাপর প্রদেশে তদ্রূপ জলপ্রপাতের বাহুল্য নাই। সৌরশক্তিকে কৌশলে প্রয়োগ করিবার জন্য মিশর প্রদেশ বিখ্যাত। নিরবচ্ছিন্ন সূর্য্যালোক একমাত্র গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ব্যতীত অপর কোন দেশে সম্ভব নহে। কিন্তু প্রবল বায়ু প্রবাহ শীত বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশনির্ব্বিশেষে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই উন্মুক্ত বায়ু প্রবাহ নদী বা প্রপাতের জলপ্রবাহের ন্যায় শীতকালে জমিয়া যায় না বা গ্রীষ্মকালে মন্দগতি লাভ করে না। সুতরাং বায়ুর শক্তি সমগ্র বিশ্বব্যাপী, অনন্ত ও অক্ষয়।

আধুনিক নব সভ্যতার যুগেও মানুষ তাহার চতুর্দ্দিকে বায়ুর শক্তির পরিচয় লাভ করিয়াও তদ্বিষয়ে মনোযোগী নহে। তাহার কারণও



লর্ড কেলভিন

আছে। সহরের মধ্যে তিন চার তলা বাড়ীতে দেওয়ালের উপর দেওয়াল গাঁথিয়া বায়ুর প্রবেশপথ যতদূর সম্ভব বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গ্রামবাসিগণের অধিকাংশ, বায়ুর হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পচাপুকুরের ধারে বাঁশঝাড়ের সুবিস্তীর্ণ পত্রাশ্রয়ের মধ্যে কোনরূপে লুকাইয়া দিন-যাপন করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের ধাতুটাই হইতেছে বায়ুহীন। এইরূপ অবস্থায় একটু বায়ুগ্রস্থ হইলে মন্দ হয় না। সাধারণ বায়ুর গতি একটি এক্সপ্রেস্ ট্রেণের গতির অনুরূপ।

বায়ু যে আমাদের মাথার উপর বৎসরের ৮৭৬০ ঘণ্টার মধ্যে ৬১৮২ ঘণ্টা অনবরত দ্রুতগতিতে হাত বুলাইয়া দিয়া চলিয়া যায় তাহা আমাদের মনেই আসে না। বৎসরের অধিকাংশ সময়ে বায় সাধারণত ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে। বায়ুর বেগ যখন এইরূপ তখন তদ্দ্বারা অনায়াসে সুবৃহৎ Wind mill চালান যাইতে পারে। ঘণ্টায় দশ মাইল হইতে সাড়ে ছয় মাইল বেগ করিয়া আসিলেও বায়ুদ্বারা কল-চালনায় কোন ব্যাঘাত হয় না। এই বায়ু চালিত কল দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় এবং অন্যান্য নানা কার্য্যে এঞ্জিনের ব্যবহার হইয়া থাকে। একশত বৎসর পুর্ব্বে ইংলণ্ডের পূর্ব্ব অঞ্চলের প্রদেশ সমূহের ড্রেন্ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া, যব ভাঙ্গিবার এবং করাতের কার্য্যে Wind mill ব্যবহৃত হইত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজগণ তাহাদের দেশের সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভূভাগের অনেকটা বায়ুচালিত কলের "পাম্পদ্বারা জল শোষণ করিয়া বাসোপযোগী



কিরূপে চৌবাচ্চায় জল পাম্প করিয়া আনিয়া আবার তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয়

শুষ্ক ভূভাগে পরিণত করিয়াছিল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে একজন স্কচ কর্ত্তৃক এই বায়ুচালিত কলের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। তিনি নূতন আবিষ্কার দ্বারা যন্ত্রে এমন একটি কৌশল করিয়াছিলেন; যাহাতে যন্ত্রের চক্র বায়ুপ্রবাহের দিক্ পরিবর্ত্তন অনুযায়ী স্বতঃই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই নূতন আবিষ্কারটি কম মূল্যবান্ এবং শ্রমলাঘবকর নহে। কারণ ইতিপুর্ব্বে বায়ুর দিক পরিবর্ত্তন অনুযায়ী যন্ত্রটিকে একজন ব্যক্তি বায়ুর অনুকূল অবস্থায় রাখিয়া দিত। ইহার পর

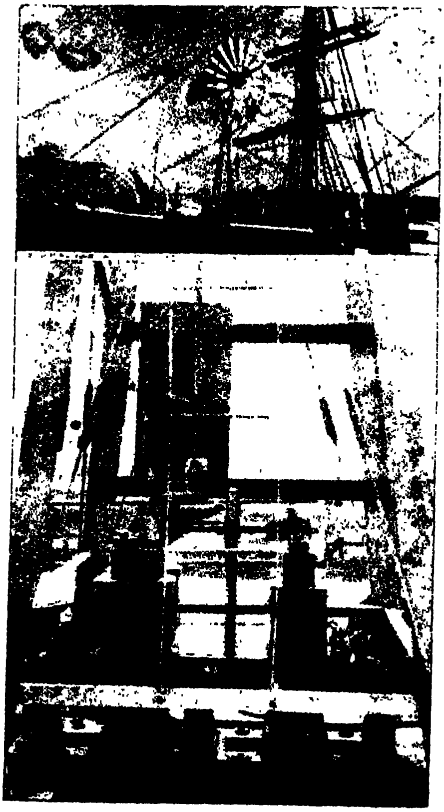
ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ আবিষ্কারকগণ এই যন্ত্রের নানা উন্নতি সাধিত করিয়াছিলেন। প্রবল বাত্যার সময় কিরূপে কলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, যাহাতে যন্ত্রও চলে অথচ কোন ক্ষতি না হয়, ইত্যাদি নানা বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া বায়ু-চক্রকে বিশেষ কার্য্যকরী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কালের ষ্টীম্ এঞ্জিনের ন্যায়ই সে সময় বায়ু-চক্র লোকের নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "তাহাই যদি হইবে, তবে বর্ত্তমান সভ্যতার যন্ত্রাবলীর মধ্যে Wind mill-এর নাম পাওয়া যায় না কেন?"—কারণ, ইহার দোষ আছে অনেক। অত্যন্ত আবশ্যকের সময়েও বায়ুর গতি মন্দ বলিয়া হয়ত যন্ত্র অতি ধীরে ধীরে চলিতেছে। ইহাতে ক্ষতি কম নহে। সুতরাং বিনাপয়সায় কল চালাইতে যাইলে যথেষ্ট লোকসান হয়। কাজেই পাথুরিয়া কয়লা ও ষ্টীম্ এঞ্জিনের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই। বায়ুচালিত এই কলের প্রচলন মার্কিন প্রদেশে অত্যন্ত অধিক। আমেরিকার জলহীন অনুর্ব্বর অনেক ভূভাগে দূরবর্ত্তী নদী হইতে এই কলদ্বারা জল পাম্প করিয়া আনা হইয়া থাকে। যেস্থানে শ্যামলতার চিহ্ন-মাত্র ছিল না, এই যন্ত্রযোগে সেস্থান উর্ব্বর ও বাসোপ-যোগী হইয়াছে। কৃষকগণের পক্ষে ইহা কম মূল্যবান্ নহে। আমেরিকার নেব্রাস্কা (Nabraska) নামক কৃষি-প্রধান স্থানে জলের অভাব নাই, কিন্তু কূপে জল এত নিম্নে অবস্থান করে যে শস্যাদির পক্ষে বৃদ্ধি পাওয়া কঠিন। এই অঞ্চলে অনবরত বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই নিরবচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহকে কৃষকেরা তাহাদের জলযন্ত্রের চক্র ঘুরাইবার কার্য্যে নিয়োগ করিয়া সুফল লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক দরিদ্র কৃষকের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেক কৃষক এই বায়ু-কল সাহায্যে জল ত পাম্প করেই, তাহার উপর আবার ইহা দ্বারা গোরু বাছুরের খড় বিচালী কর্ত্তন এবং গৃহ আলোকিত করিবার জন্য বৈদ্যুতিক তরঙ্গও উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। এইরূপে একমাত্র বায়ুতাড়িত কল চালনা দ্বারা কৃষকগণ সুখে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। যে কৃষকের গৃহে বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখা বর্ত্তমান্ সে কৃষক সভ্যসমাজ হইতে দূরে বাস করিলেও সভ্যসমাজের অন্তরদেশে অবস্থান করিতেছে। জর্ম্মান প্রদেশে বায়ু-চক্রের খুব প্রচলন ছিল। ইহার উন্নতির জন্যও উহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল।

কিরূপ করিয়া নদী বা সমুদ্রতীরের বায়ুচালিত কলদ্বারা তাড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করা যাইতে পারে তাহা পাঠকগণ অনেকেই জানেন। নদীতীরবর্ত্তী বা সমুদ্র-তীরের উচ্চ পর্ব্বতের উপর বায়ুচক্র বসাইয়া সুবৃহৎ চৌবাচ্চায় জল শোষণ করিয়া ভর্ত্তি করা হয়। অতঃপর সেই সকল জল-পরিপূর্ণ চৌবাচ্চার মুখ খুলিয়া দেওয়ায় সেই জল প্রবলগতিতে নিম্নভূমিতে পড়িবার সময় যন্ত্রযোগে তড়িৎ উৎপাদক কল পরিচালিত করিয়া থাকে। এইরূপে তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা বৈদ্যুতিক আলোক বা বৈদ্যুতিক পাখা অনায়াসে পরিচালিত করা যাইতে পারে। এই উপায়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উৎপাদন-কৌশল লইয়া প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ বহুবৎসর ধরিয়া মাথা ঘামাইয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহারা যে সুফল লাভ করিয়াছিলেন তাহাও বৈজ্ঞানিকগণের চক্ষে অমূল্য। লর্ড কেলভিন্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ Wind mill প্রবর্ত্তনের যথেষ্ট পক্ষপাতী ছিলেন। ইহাদ্বারা সুলভ মূল্যে তড়িৎ-শক্তি সংগ্রহ করা যায় দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, কৃষকগণের স্ব স্ব গ্রামে এক একটি করিয়া বায়ু-চক্র থাকা একান্ত আবশ্যক। কৃষকসমাজে ইহার প্রচলন যত বৃদ্ধি পাইবে, শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার ততই অধিক হইবে।

জলপথে জাহাজ ও ষ্টীমারের উপর বায়ুচক্র বসাইয়া তদ্দ্বারা প্রভূত কাজ পাওয়া যাইতে পারে।

হিমপ্রধান দেশে জলযাত্রা করিবার সময় কাপ্তান স্কট তাঁহার "Discovery" নামক ষ্টীমারের উপর বায়ু-চক্র বসাইয়াছিলেন। এই কল, ষ্টীমার আলোকিত করিবার জন্য বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপন্ন করিতে নিয়োজিত



কাপ্তান স্কটের ষ্টীমারে Wind mill ও তাহার যন্ত্র-কৌশল

ছিল। কিন্তু সমুদ্রে বায়ুরগতি নির্দ্দিষ্ট নহে বলিয়া তথায় wind mill চালান মুস্কিল; বিশেষতঃ ভূমধ্য মহাসাগরে বায়ুর দিক্ পরিবর্ত্তন এত অধিক যে তথায় বায়ু-চক্র খাড়া করা বিড়ম্বনা মাত্র। কাপ্তান স্কট্ তাঁহার ভুবন বিখ্যাত মেরুযাত্রা কালে জলপথে তাঁহার ষ্টীমারে কি উপায়ে বায়ুচক্র দিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতেন তাহার ছবি প্রবন্ধসন্নিবিষ্ট করা হইল।

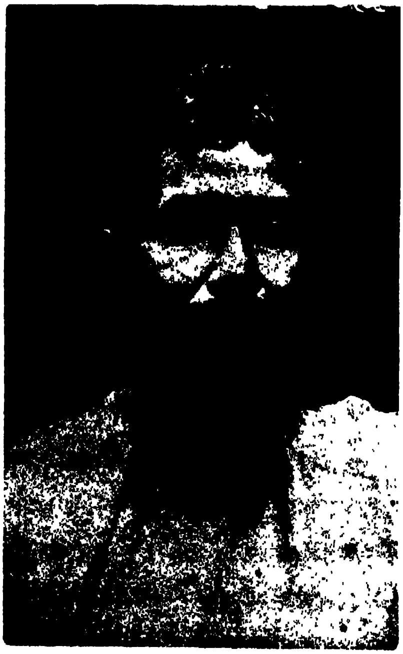
আমাদের দেশে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই সুনির্দ্দিষ্ট পথে বায়ু চলাচল করিয়া থাকে। সেই বায়ু-শক্তিকে কৌশলে বায়ুযন্ত্রের চাকা ঘুরাইবার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে, দেশের অনেক শ্রমলাঘব হইতে পারে। বিশেষতঃ কৃষকমহলে এই বায়ু চালিত কলের প্রচলন করিতে পারিলে সর্ব্ববিষয়েই উন্নতি আছে। বৈদ্যুতিক শক্তি দূরে থাকুক্ আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় কর্ম্মগুলি ঐ যন্ত্রে অনায়াসে সাধিত হইতে পারে। ময়দার কল, সুরকির কল অথবা খড়বিচালী কাটিবার জন্য বায়ু-কলের প্রবর্ত্তন উপকারী হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এবিষয়ে দেশের কৃষকগণকে উৎসাহিত করিতে পারিলে উপকার হইবে। এইরূপ পরীক্ষা আমাদের দেশে হয় নাই সুতরাং ইহাকে অসম্ভব বলা যায় না। একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ দেখি না।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

৺রসিকলাল রায়

বিগত ১৫ই শ্রাবণ, বেলা দুইটার সময়, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক রসিকলাল রায় মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে ফাঁকি দিয়া রসিকলাল মহাপ্রস্থান করিলেন। কাহাকেও বিদায় লইবার অবসরটুকুও দিলেন না। যে দেবীপ্রসন্ন বাবু তাঁহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সবলে মৃত্যুকে প্রত্যাখ্যান করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তিনিও বিদায় লইবার অবসর পাইলেন না; রসিক বাবুর মৃত্যুর সময় তিনি কলিকাতায় ছিলেন না। বড় সাহস করিয়া দেবীবাবু বলিয়াছিলেন, 'একে একে প্রায় সমস্ত বন্ধু আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, আপনাকে আমি মরিতে দিব না।' বন্ধুপ্রীতির দম্ভ কালস্রোতে ভাসিয়া গেল। আমাদের দুর্ভাগ্য, বঙ্গসাহিত্যের ও হিন্দুসাহিত্যের দুর্ভাগ্য।

আমরা ভাগ্যবিধাতাকে ধিক্কার দিতেছি না। তাঁহার কুলিশাঘাত নতশিরে নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়া আমাদের যন্ত্রণা হয়। রসিকবাবু ভাগ্যবিধাতার সহিত আপোষ করিয়া লইয়াছিলেন।



৺রসিকলাল রায়

আড়াই বৎসরের একমাত্র শিশু পুত্রকে কোলে করিয়া বিপত্নীক রসিকলাল দীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া, নিষ্কলঙ্ক আদর্শচরিত্রের স্মৃতিটুকু রাখিয়া, চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমান সুধীন্দ্রলাল এবার বি-এ পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া মুমূর্ষু পিতার হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

'মানসী ও মর্ম্মবাণীর' বেদনা হয় ত সকলে বুঝিবে না। 'মানসী' যখন ছোট ছিল, তখন হইতে তাহার প্রীতিবন্ধনে আঘাত পড়িয়া আসিতেছে। ইন্দুপ্রকাশের স্নেহঋণ সে কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে না। ইন্দুপ্রকাশ মানসীর, মানসী ইন্দুপ্রকাশের,—এই রকমই ত জানা ছিল। কত মান অভিমান, কত বিচ্ছেদ মিলনের ভিতর দিয়া উভয়ের প্রীতি পরিপুষ্ট হইয়াছিল। সমস্ত সংসারভার বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া ইন্দুপ্রকাশ লুসিটানিয়া জাহাজের সহিত জলমগ্ন হইলেন। মানসীর সে বেদনা আজ নূতন করিয়া বাজিতেছে।

কিছুদিন গেল। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাইয়া, মানসী তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া 'অভয়ের কথা' ও 'ঠাকুরাণীর কথা' শুনিয়া চরিতার্থ হইল। যখন মনে করিলাম যে এইবার দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিব 'আপনি আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন—কঃ পন্থা! জ্ঞানমার্গ, না ভক্তিমার্গ?' তখনই তিনি আমাদিগকে প্রশ্ন করিবার তিলমাত্র সময় না দিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি কি ছিলেন? বৈদান্তিক? বৈষ্ণব? জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে, তিনি 'মানসীর' বুকের উপর বেদনার রেখা টানিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

তা'র পর 'রোগশয্যার প্রলাপ' বকিতে বকিতে ব্যোমকেশ মানসীর নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইলেন। আজ তাঁহাকে বড় বেশী মনে পড়িতেছে; কারণ তাঁহার সাধের সাহিত্য-পরিষদ্ আজ টলমল করিতেছে। বঙ্গসাহিত্যের ও সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ব্যোমকেশ আজ কোথায়?

যিনি "বাম হাত হ'তে ডান হাতে লন্, ডান হাত হ'তে বামে", তিনিই কেবল বলিতে পারেন ইহাঁরা আজ কোথায়। আমরা তাঁহাদিগকে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম।

রসিক বাবুর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় খুব বেশী দিনের না হইলেও, তাঁহার রচনাবলীর সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় বহু পূর্ব্বেই হইয়াছিল। হিন্দী সাহিত্যের কত কথা তাঁহার বলিবার ছিল। কেবল মাত্র "ভূষণ কবি"র কথা আরম্ভ করিতে না করিতে তিনি চলিয়া গেলেন। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য।

জীবনের মূল্য

(উপন্যাস)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্বশুর ও জামাই।

পরদিন প্রভাতে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া রাজকুমার হরিপদকে বলিল—"বাবার সম্বন্ধে তুমি কিছু শুনেছ ?"

"শুনেছি।"

"আমি কাল রাতে পটলির কাছে শুন্‌লাম। তুমি ত কিছুই আমায় বলনি ভাই!"

হরিপদ বলিল—"আমিই কি জানতাম ? কাল রাত্রে বাড়ী ফিরে, শুতে যাবার সময় মার কাছে শুন্‌লাম।"

"উপায় কিছু ভেবেছ ?"

হরিপদ নীরবে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

রাজকুমার বলিল—"আমি কিন্তু একটা উপায় ঠিক করেছি।"

হরিপদ নীরবে ভগ্নীপতির পানে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল। রাজকুমার বলিল—"আমি ভেবেছি কি জান ? সেই চন্দ্রগড়ের চাকরি আমি নিই। বাবা, মা আমার সঙ্গে চলুন।"

হরিপদ বলিল—"সে একটা উপায় বটে। কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?"

"কিন্তু—বাবা—রাজি হলে হয়।"

রাজকুমার একটু বিষণ্ণ হইয়া বলিল—"কেন, বাবা রাজি হবেন না ?"

হরিপদ বলিল—"বলে' দেখা যাক্।"

আসল কথা এই যে, হরিপদ গতরাত্রেই পিতা মাতার নিকট এ প্রস্তাব করিয়াছিল। বলিয়াছিল, রাজকুমার চন্দ্রগড়ে চাকরি পাইতেছে, সেখানে সরকারী বাসা পাইবে, চাকর পাইবে, প্রতিদিন রাজ-সরকার হইতে প্রচুর পরিমাণ সিধা আসিবে—কোনও কষ্ট হইবে না। শুনিয়া, মাতা যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা বলিতে লাগিলেন—"শেষে জামাইয়ের ভাত খেতে হবে ? এও কি অদৃষ্টে ছিল ? না, ছি! সে আমি বেঁচে থাক্‌তে পারব না।"—কিন্তু হরিপদ এ কথা এখন ভগ্নীপতির নিকট প্রকাশ করিল না।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। আজ আর আকাশে মেঘ নাই, রৌদ্র উঠিয়াছে। হঠাৎ জগদীশ আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রাজকুমার দেখিল, একরাত্রেই ব্রাহ্মণের আকৃতি ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। তাঁহার মুখ শুষ্ক ও অত্যন্ত বিষণ্ণ, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে। অন্যদিন তিনি বেশ সিধা হইয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেন—আজ যেন একটু কোঁজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

জগদীশ বলিলেন—"হরিপদ, আজ বাজারটা তুমি করে আন্‌তে পারবে বাবা ? বেশী কিছু নয়, দু'পয়সার পাণ, ছ'পয়সার তরী তরকারী—এই শাগ, আলু, পটল, ফালি দুই কুমড়ো, আর আনা দুইয়ের মাছ। পারবে বাবা ?"

হরিপদ বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে এই সিকিটে নাও।"—বলিয়া জগদীশ ট্যাঁক হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া পুত্রের হাতে দিলেন। বলিলেন—"কাল সমস্ত রাত আমার ভাল ঘুম হয়নি; যাই, সকালে সকালে গঙ্গাস্নানটা সেরে আসি। এখনও বাজার ভাল বসেনি—আর আধ ঘণ্টা খানেক পরেই বরং যেও।"—বলিয়া তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজকুমার বলিল—"চল, আমিও তোমার সঙ্গে বাজারে যাব।"

হরিপদ বলিল—"তুমিও কেন বাবার সঙ্গে গিয়ে স্নানটা সেরে এস না।"

রাজকুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"কেন, জামাই মানুষকে বাজার যেতে নেই বুঝি ? অপমান হয় ?"

হরিপদ বলিল—"না, তা বল্‌ছিনে। বাবা আজ একলা গঙ্গাস্নানে যান সেটা আমার ভাল লাগছে না।"

রাজকুমার বিস্মিত হইয়া হরিপদ'র মুখের পানে চাহিল। শেষে বলিল—"ওঃ—আচ্ছা, আমি বাবার সঙ্গে যাচ্ছি।"

রাজকুমারের ইচ্ছা ছিল, গঙ্গাস্নানে যাইতে যাইতে পথে শ্বশুরকে চন্দ্রগড়ের চাকরির কথা বলিবে এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিবে। কিন্তু সারাপথ, বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। স্নানকালে, ঘাটে আসে পাশে অন্য অনেক লোক, বলার সুযোগ হইল না। স্নানান্তে ফিরিতে ফিরিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রাজকুমার নিজ চাকরির কথা বলিল। শুনিয়া জগদীশ বলিলেন—"তা বেশ ত। এত বেশ ভাল চাকরি বলেই বোধ হচ্ছে। ভাল করে কাযকর্ম্ম করতে পারলে ক্রমেই উন্নতি হবে। তুমি এ চাকরি নাও।"

রাজকুমার বলিল—"প্রথমে আমার এ চাকরি নেবার ইচ্ছে ছিল না। মনে হচ্ছিল, চাকরি নিলে, বি-এ পাস করে' আইন পরীক্ষা দেবার যে মৎলব ছিল, সে সব কিছুই হবে না। কিন্তু আপনি যখন মত করছেন, তখন চাকরি নেওয়াই স্থির করলাম।"

জগদীশ বলিলেন—"ওকালতীর চেয়ে ও তোমার ঢের ভাল হবে। উকীল হয়ে বেরুতে, যেমন করে' হোক, এখনও তোমার চার পাঁচ বছর বিলম্ব। তারপর পসার হ'তে যে কত বছর লাগবে, তা কে জানে! এই ত সব উকীল দেখছি। আমাদের গ্রামেরই, দেখনা কেন, হরিশ ভট্টচায্যির ছেলে রয়েছে, উপেন রায়ের ভাইপো সুধীর, তারপর গিয়ে তোমার, রাম সরকারের ছেলে ইন্দু—কেউ ছ' বছর, কেউ পাঁচ বছর, কেউ সাত বছর হুগলিতে ওকালতী করছে,—বাসাখরচ চলে না—বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে খায়। ও, চাকরিই ভাল। পশ্চিমে রাজা রাজড়ার এষ্টেটে বাঙ্গালী যারা ঢুকেছে—সবাই উন্নতি করেছে"—বলিয়া জগদীশ তিন চারিটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া, জলযোগ সারিয়া রাজকুমার বৈঠকখানায় বসিয়া ছিল, হরিপদ বাজার হইতে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা কোথায়?"

"আহ্নিক করতে বসেছেন।"

"কতক্ষণ ফিরেছ?"

"মিনিট পনেরো হবে।"

"বাবার সঙ্গে কোনও বিষয়ে কথা হয়েছিল?"

"হয়েছিল। জিনিষগুলো রেখে এস, বল্‌ছি।"

হরিপদ ফিরিয়া আসিলে, শ্বশুরের সঙ্গে রাজকুমারের কথাবার্ত্তা যাহা যাহা হইয়াছিল, সমস্তই সে বলিল। শেষে বলিল—"আসল কথাটাই কিন্তু বল্‌তে সাহস হল না ভাই। আমি ভাব্‌ছি কি জান? মাকে বলি, বাবাকে বল্‌তে আমার সাহসে কুলচ্ছে না। কখন বলি তাঁকে বল দেখি?"

হরিপদ বলিল—"এখন ত মা রান্নায় ব্যস্ত রয়েছেন, খাওয়া দাওয়ার পর বোলো এখন।"

আহারাদির পর হরিপদ গিয়া মাকে বলিল—"মা, রাজকুমার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

গৃহিণী এতদিন জামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বড় বেশী কথাবার্ত্তা কহেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

"কাল বাবাকে আমি যে কথা বলেছিলাম, সেই কথা তোমাকে সে বল্‌তে চায়।"

"আমাকে বলে কি হবে? উনি যে রাজি হন না!"

"তোমার সঙ্গে বাবার সে কথা হয়েছিল?"

"হয়েছিল। উনি বল্লেন, রাজকুমার যে এ প্রস্তাব করেছে—তার উপযুক্ত কাযই করেছে। ছেলের মত কাযই করেছে। কিন্তু আমি পুরুষ মানুষ হয়ে, সপরিবারে গিয়ে জামাইয়ের অন্নদাস হব কি করে? তার চেয়ে, ভিক্ষে করে' খেতে হয়, গাছতলায় থাকতে হয়, সেও যে আমার ভাল।—আচ্ছা ডাক রাজকুমারকে।"

হরিপদ গিয়া রাজকুমারকে ডাকিয়া আনিল।

রাজকুমার আসিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত শাশুড়ীর নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিল। গৃহিণী এইমাত্র হরি-

পদকে যাহা বলিয়াছিলেন, জামাতাকেও ধীরে ধীরে সেই সকল কথাগুলি বলিলেন।

শুনিয়া রাজকুমার বলিল—"বাবা এই কথা বলেছেন? আচ্ছা, চল্লাম আমি বাবার কাছে।"

পাশের ঘরে মাদুর বিছানায় জগদীশ বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ পুত্রসহ জামাতাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে তাহাদের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। উভয়ে মাদুরে তাঁহার নিকট বসিল।

রাজকুমার বলিল—"বাবা, আমি কি আপনার ছেলে নয়?"

জগদীশ বলিলেন—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ বাবা? আমার হরিপদ যেমন, তেমনই তুমি।"

"হরিপদর যখন চাকরি হবে, ও যখন আপনাকে আর মাকে ওর চাকরিস্থানে নিয়ে যেতে চা'বে, তখন আপনি কি তাতে আপত্তি করবেন? যাবেন না?"

জগদীশ একটু বিপন্নভাবে বলিলেন—"তা—সে তখন—"

রাজকুমার বলিল—"হরিপদ আর আমি আপনার কাছে যদি ভিন্ন নই,—তাহলে আপনি অমন কথা কেন বলেছেন বাবা? শুন্‌লাম নাকি বলেছেন আপনি, জামাইয়ের অন্ন খাওয়ার চেয়ে আপনি ভিক্ষে করে খাবেন সেও ভাল, গাছতলায় বাস কর্‌বেন সেও ভাল। এমন নিষ্ঠুর কথা আপনি কি করে বল্লেন বাবা?"—কথাগুলি বলিতে বলিতে রাজকুমারের চক্ষু দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

জগদীশ হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া, জামাতার হাত-দুটি ধরিয়া, বলিলেন—"বাবা, তুমি কাঁদতে লাগলে? কেঁদনা, কেঁদনা। আমার কথা আগে শোন।"—বলিয়া তিনি পার্শ্বস্থিত গামছাখানি লইয়া জামাতার অশ্রু মুছাইয়া দিলেন।

রাজকুমার শ্বশুরের মুখের পানে আকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। জগদীশ হুঁকাটি উঠাইয়া লইয়া আবার ধূমপান করিতে করিতে, জামাতাকে কি বলিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার বলিল—"আমি সমস্তই শুনেছি। আপনার কি বিপদ তা আমি জানি। এই বাড়ীখানি, জমিগুলি গেলে আর ত অন্য কোন উপায় নেই। আমার বাপ নেই, মা নেই,—আপনাদের পেয়ে আমি বাপ মা আবার পেয়েছি বলে' মনে করছি। আপনিও বলছেন, হরিপদ আর আমি ভিন্ন নাই। তবে কেন—"

জগদীশ এইবার কথা কহিলেন। বলিলেন—"দেখ বাবা, এটি আমার পৈত্রিক ভিটে। এই বাড়ী-তেই আমি জন্মেছি—আমার বাপ, ঠাকুরদাদা এই বাড়ীতে জন্মেছেন, এখান থেকেই তাঁদের গঙ্গালাভ হ'য়েছে। বাড়ীখানি আমার যাবে, সেকি আমার প্রাণে সহ্য হয় বাবা? তবে যদি জিজ্ঞাসা কর, এই ত নালিস হয়েছে, আজ বাদে কাল বিক্রী হবে—বাড়ী নীলেম হ'য়ে যাবে, আপনি রক্ষে কর্‌বেন কেমন করে'? —কোন উপায় এখন দেখ্‌ছিনে বটে। আমার মনের অভিপ্রায় কি জান? আজ কালের মধ্যেই আমি কোন একটা চাকরির সন্ধানে বেরুব। কাছাকাছি যে সকল জমিদারেরা আছেন, কারু জমিদারীতে যদি একটা চাকরি বাকরী যোগাড় করতে পারি, তা হলে উপস্থিত আপাততঃ ছেলেপিলে নিয়ে মাথা গোঁজবার স্থান পাব। তারপর, ঈশ্বর যদি দিন দেন, যে এই বাড়ী নীলেমে কিন্‌বে, তার কাছ থেকে কিনে নিতে পারব,—আমার পৈত্রিক ভিটেটি বজায় থাকবে।"

রাজকুমার বলিল—"নীলেমে ত ঐ গিরিশ মুখুয্যেই কিন্‌বে। সে, ধরুন, আপনার যে রকম শত্রু, আপনি টাকা দিয়ে কিন্‌তে গেলে আপনাকে দেবে কি?"

জগদীশ বলিলেন—"ও বেঁচে থাকতে ছেড়ে না তা জানি। মনুষ্যের শরীর, পদ্মপত্রের জল—গিরিশ মুখুয্যের বয়স হয়েছে। ওঁর অবর্ত্তমানে, ওঁর ছেলেরা সে রকম ব্যবহার আমার সঙ্গে করবে না। ছেলে দুটি ভাল।"

গৃহিণী দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। স্বামীর এই উক্তি শুনিয়া, উঁহার [illegible]

উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন—"নারায়ণ নারায়ণ, অপরাধ নিওনা ঠাকুর। সবাইকের মঙ্গল কোরো।"

চাকরী পাওয়া সম্বন্ধে যখন স্থিরতা কিছুই নাই—দুই মাস চারি মাস ছয় মাসও বিলম্ব হইতে পারে—ততদিন কোথায় সকলে থাকিবেন, হয়ত এই গোলমালে হরিপদর পড়াও বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, অবশেষে চাকরি হইলেও, চাকরি স্থানে সুবিধা মত বাসা যদি না পাওয়া যায়—ইত্যাদি প্রকার সম্ভাবিত নানা অসুবিধার উল্লেখ করিয়া রাজকুমার শ্বশুরকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। হরিপদও পিতাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। প্রায় একঘণ্টা কাল এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, অবশেষে জগদীশ বলিলেন—"তা তোমাদের যখন এতই জেদ, গিন্নীকে আর প্রভাকে না হয় চন্দ্রগড়ে নিয়ে যাও। আমি এদিকে একটা চাকরির চেষ্টা করি।"

অগত্যা রাজকুমার তাহাতেই সম্মত হইল। সেই-দিনই বৈকালে, চাকরী স্বীকার করিয়া চন্দ্রগড়ে পত্র লিখিয়া দিল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া দুইজনে কলিকাতা যাত্রা করিল।

দুইদিন পরে হুগলির আদালত হইতে পেয়াদা আসিয়া সমন দিয়া গেল। দাবীর পরিমাণ ২৩৫৮।৵০—আগামী ১২ই আগষ্ট জবাব দাখিল ও ইসুধার্য্যের দিন স্থির হইয়াছে। সমন সহি করিয়া লইয়া জগদীশ পাঁজি দেখিলেন—ঐ ইংরাজি তারিখ, বাঙ্গালা ২৮শে শ্রাবণ, এখনও বোল দিন বিলম্ব আছে।

পর সপ্তাহে একদিন রাত্রি আটটার সময় হঠাৎ রাজকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার সে একাকী আসিয়াছে। বলিল, চন্দ্রগড় হইতে তাহার নিয়োগ-পত্র আসিয়াছে; দেওয়ান লিখিয়াছেন, 'যত শীঘ্র পার আসিয়া পৌঁছিবে।' সেই রাত্রেই জগদীশ পাঁজি দেখিয়া, সম্মুখের শনিবারে জামাতার যাত্রার দিন স্থির করিয়া দিলেন। রাজকুমার টাইমটেবেল সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। বলিল, সন্ধ্যার গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া, রাত্রি আটটার সময় বর্দ্ধমানে গিয়া নামিতে হইবে, সেখানে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া, ডাকগাড়ী ধরিতে হইবে, সে ডাকগাড়ী পরদিন প্রাতে বক্সারে পৌঁছিবে।—হরিপদকে সঙ্গে করিয়া শুক্রবার সন্ধ্যার গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিবে প্রতিশ্রুত হইয়া, পরদিন রাজকুমার কলিকাতা চলিয়া গেল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

"পদ্মপত্রের জল।"

ভাদ্রের শেষ। বেলা তিনটার সময় জগদীশ, হাতে একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ লইয়া, পুরাতন ছিন্ন ছাতি মাথায় দিয়া, নগ্নপদে ধীরে ধীরে সরকারী পাকা রাস্তায় পাণ্ডুয়া হইতে বৈঁচি যাইতেছেন। রেলে গেলে পাঁচটি পয়সা ভাড়া লাগিত, সেই পাঁচটি পয়সা বাঁচাই-বার জন্য পদব্রজে যাইতেছেন।

এখন আর জগদীশের সে পূর্ব্বের চেহারা নাই। দেহ শুকাইয়া আধখানি হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী কন্যাকে জামাতার সহিত চন্দ্রগড়ে পাঠাইয়া আজ একমাস কাল চাকরির চেষ্টায় নানা স্থানে ঘুরিয়াছেন, কোথাও কিছু জুটে নাই। এ অঞ্চলে অনেকগুলি জমিদারী সেরেস্তায় চেষ্টা করিয়াছেন, কোথাও সুবিধা হইল না। আবুইহাটির জমিদার ২৫৲ টাকা বেতনে একটি নায়েবী দিতে প্রস্তুত ছিলেন, মহালটিও ছিল ভাল, কিন্তু তিনি নগদে অথবা ভূসম্পত্তিতে ৫০০৲ জামিন চাহিয়াছিলেন। সুতরাং চাকরি হইল না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, "পূজার পরে আসিবেন, দেখা যাইবে।"—কিন্তু পূজার ত এখনও অনেক বিলম্ব। এবার আশ্বিনের শেষে পূজা।

ইতিমধ্যে জগদীশ দুইবার ত্রিবেণীতে গিয়াছিলেন। প্রথমবার গিয়া, জিনিষপত্র কতক বিক্রয় করিয়া গুটি কয়েক টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। দ্বিতীয়-বার গিয়া দেখিলেন, বাড়ীর দরজায় নীলামী ইস্তাহার লটকাইয়া দিয়াছে,—ধার্য্য তারিখের মধ্যে ডিক্রীর টাকা না দিলে বাড়ী, জমিজমা সমস্তই আদালতে নীলাম হইবে। ইহা দেখিয়া, বাড়ীতে দুই চারিটা জিনিষপত্র

যাহা ছিল, তাহা জগদীশ এক প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া আসিয়াছেন।

ভাদ্র মাসের পড়ন্ত রৌদ্রে দেড় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। নিকটে একটা সাঁকো রহিয়াছে, তাহার পাশেই একটা বড় পাকুড় গাছ থাকায় তাহার কতকটা স্থানে ছায়াও পড়িয়াছিল। জগদীশ গিয়া সেই সাঁকোর উপর বসিলেন। বসিয়া একটু বিশ্রাম করিলেন। সাঁকোর নিম্নে এবং দুইদিকে খানিকটা স্থান অবধি জল জমিয়া ছিল। পিপাসাতুর কণ্ঠে জগদীশ অনেকক্ষণ সেই জলের পানে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, জলের নিকট গেলেন। জলে নামিয়া, হাত পা মুখ ধুইয়া, অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া সেই জল পান করিতে লাগিলেন।

সাঁকোর উপর ফিরিয়া আসিয়া, ব্যাগটি খুলিয়া চশমা খানি ও ডাকের একখানি পত্র বাহির করিলেন। চশমাটি চোখে দিয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। এখানি, এবার বাড়ী গিয়া পাইয়াছেন, চন্দ্রগড় হইতে আসিয়াছিল। রাজকুমার লিখিয়াছে—"বাবা, আজ পর্য্যন্ত আপনার কোথাও চাকরির সুবিধা হইল না জানিয়া আমরা সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আপনি নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী বলিতেছেন যে এরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করা আপনার কোনও দিন অভ্যাস নাই; তিনি আশঙ্কা করেন, আপনি হঠাৎ পীড়িত হইতে পারেন। ঈশ্বর না করুন, বিদেশে যদি আপনার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে তাহা হইলে কি উপায় হইবে? মা সর্ব্বদা কাঁদেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধ, আপনি আর কালবিলম্ব না করিয়া এখানে চলিয়া আসুন। আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এখানে কিছুরই অভাব নাই। আমাকে আপনার সন্তান বলিয়া মনে করিয়া, আমার এই প্রার্থনাটি রক্ষা করুন। এখানকার দেওয়ানজি অত্যন্ত ভাল লোক, আমায় অত্যন্ত স্নেহ করেন। মাস পূর্ণ হইতে এখনও বিলম্ব থাকা সত্ত্বেও আমায় তিনি বেতন বাবদ ১০৲ দিয়াছেন, তাহা এই পত্রমধ্যে পাঠাইলাম।"—তাহার পর রেলভাড়া কত লাগিবে, কোন গাড়ীতে আসা সুবিধা, বন্দরে নামিয়া কি উপায়ে চন্দ্রগড়ে পৌছিতে হইবে—সমস্ত বিষয় রাজকুমার লিখিয়াছে।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে জগদীশের চক্ষু সজল হইয়া আসিল। নোটখানি খুলিয়া তিনি দেখিতে লাগিলেন। ইহা আজ চারি পাঁচ দিন তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, এত অভাবের মধ্যেও এখানিকে তিনি ভাঙ্গান নাই। প্রতিদিনই ভাবিয়াছেন, ঈশ্বর যদি মুখ তুলিয়া চাহেন,—কোথাও একটা কিছু সুবিধা হয়,—তবে পূজার সময় এই নোটখানির সঙ্গে আর একখানি দিয়া, জামাতাকে পূজার ধুতি চাদর কিনিয়া লইবার জন্য পাঠাইয়া দিবেন।

বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিতে লাগিল। এখনও দেড় ক্রোশ পথ বাকী। বৈঁচিতে পৌছিয়া, কোনও একটা দোকানে বা ঠাকুরবাড়ীতে আশ্রয় লইবেন—কল্য প্রাতে জমিদারী সেরেস্তায় গিয়া চাকরির জন্য আবেদন জানাইতে হইবে। তাই আর বিলম্ব না করিয়া, উঠিয়া ধীরে ধীরে জগদীশ আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন।

বৈঁচিতে প্রবেশ করিয়া শুনিলেন, বাবুদের একটি অতিথিশালা আছে। পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সেখানে পৌছিয়া, তথাকার ম্যানেজার বাবুর নিকট নিজ পরিচয় দিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

ম্যানেজার বাবু একটি ঘর দেখাইয়া দিলেন। সেখানে আর কেহই ছিল না। একখানি মাদুর লইয়া, পথশ্রমবশতঃ ব্যাগটি মাথায় দিয়া জগদীশ শয়ন করিয়া রহিলেন।

রাত্রি নয়টার সময় ভৃত্য আসিয়া অতিথিগণকে খাইতে ডাকিল। জগদীশ উঠিয়া গিয়া পাতের কাছে বসিলেন বটে, কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না।

সেই রাত্রে তাঁহার জ্বর হইল। কম্প দিয়া জ্বর।

পরদিন, সারাদিন জ্বর ছাড়িল না। তবে বৈকা-

লের দিকে অনেকটা কমিয়া আসিল বটে। ভাণ্ডারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর, ক্ষিধে পেয়েছে ?"

জগদীশ ক্ষীণস্বরে বলিল—"হ্যাঁ ।"

"কি খাবে ? সাবু করে দেব ?"

"তাই দাও। বাবা, আমায় একটু ধর ত—উঠে, একবার মুখে একটু জল দিই।"

ভাণ্ডারী উঠিতে সাহায্য করিল। বলিল—"এ দুর্ব্বল শরীর, পুকুরঘাটে আর গিয়ে কায নেই। রসুই ঘরের বারান্দায় চল, জল দিচ্ছি, মুখ হাত ধুয়ে নেবে।"

রসুইঘরের বারান্দায় বসিয়া জগদীশ মুখ হাত ধুইলেন। সম্মুখে তুলসীমঞ্চ ছিল। বলিলেন—"আজ সন্ধ্যা আহ্নিক কিছুই হল না, তুলসী তলায় একটা প্রণাম করে যাই।"

তুলসী তলায় গিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া, আঙুলে করিয়া, তাহার একটু মাটি খুঁটিয়া খাইলেন। তাহার পর, ধীরে ধীরে গিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

বারান্দায় চালের বাতা হইতে একটা লণ্ঠন ঝুলিতেছিল। তাহারই সামান্য আলোক খোলা দরজা দিয়া জগদীশের ঘরে প্রবেশ করিতেছে। রাত্রি নয়টার সময় সাবুর বাটি হাতে করিয়া ভাণ্ডারী আসিয়া ডাকিল—"ঠাকুর—ও ঠাকুর—ওঠ। সাবু এনেছি।"

কোন উত্তর নাই।

ভাণ্ডারী একটু বিরক্তভাবে আবার ডাকিল—"বলি শুনছ ?—ওঠ—সাবুটা খেয়ে নাও।"

তথাপি কোন উত্তর না পাইয়া ভাণ্ডারী উচ্চতর স্বরে ডাকিল—"আঃ কি জ্বালাতেই পড়লাম গা!—ডাকাডাকি করে ওঠাতে হবে!—ওঠনা—সাবুটুকু খেয়ে নিয়ে যত পার ঘুমিও, কেউ মানা করবে না। ও ঠাকুর"—বলিয়া, ঝুঁকিয়া বামহস্তে ভাণ্ডারী জগদীশের হাতখানি ধরিল। ধরিবামাত্র, ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"ইস্—গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে! আবার জ্বর বেড়েছে দেখছি যে! গোবরা—ওরে ও গোবরা, লণ্ঠনটা এখানে আন ত।"

ভৃত্য গোবর্দ্ধন লণ্ঠন আনিয়া দিল। আলোকের সাহায্যে ভাণ্ডারী দেখিল, অতিথির চক্ষু মুদ্রিত। নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছে। বুকে হাত দিয়া দেখিল, বুক আগুনের মত। বলিল—"জ্বরে যে বামুন অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। ইস্—তাইত! শিঙে ফুঁকবে না কি ?"

অতিথিশালার নিয়ম, কোনও পান্থ পীড়িত হইয়া পড়িলে, বাবুদের বেতনভোগী ডাক্তারকে সংবাদ দিতে হইবে। ভাণ্ডারী গিয়া ম্যানেজার বাবুকে বলিল। ম্যানেজার ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ডাক্তার আসিয়া, ষ্টেথিস্কোপ দিয়া বক্ষ পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"হার্টের অ্যাকসন্ বড়ই উইক দেখ্‌ছি।" নাড়ী দেখিলেন। তাহার পর রোগীর বগলে থার্ম্মমিটার দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে থার্ম্মমিটার বাহির করিয়া দেখিয়া বলিলেন—"১০৬ ডিগ্রী। আচ্ছা, আমি গিয়ে একটা ফীভার মিক্‌শ্চার তৈরি করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিন ঘণ্টা অন্তর সমস্ত রাত্রি খাওয়াতে হবে। কাল সকালে আবার আমি আসব এখন।"

ডাক্তার বাবু বাড়ী গিয়া একটা শিশিতে করিয়া তিনদাগ ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন। ম্যানেজার বাবু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, একদাগ ঔষধ রোগীকে সেবন করাইলেন। রাত্রি তখন দশটা। ভৃত্যকে বলিলেন—"দেখ গোবরা, তুই আজ এখানে থাক্—বুঝলি ? দু' দাগ ওষুধ রইল, রাত একটার সময় এক দাগ আর ভোর চারটের সময় একদাগ খাইয়ে দিস্।"

গোবরা বলিল—"আজ্ঞে।"

"ঘুম ভাঙবে ত ? ঠিক একটার সময় উঠে এসে, একদাগ ওষুধ খাইয়ে দিবি। বুঝলি ?"

"আজ্ঞে।"

"তুই না হয় এক কায কর। আজকের রাতটে এই ঘরেই শো। ভারি জ্বরাপ হয়েছে, রাত্তিরে উঠে

যদি জল চায়, কিছু চায়। একজন লোক কাছে থাকা ভাল।"

"যে আজ্ঞে।"

ম্যানেজার বাবু নিজ আপিস বন্ধ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। ভাণ্ডারী ভাণ্ডার বন্ধ করিয়া স্বস্থানে গিয়া শয়ন করিল। গোবরা কিছুক্ষণ রোগীর অনতিদূরে শয়ন করিয়া রহিল। কিন্তু মশার কামড়ে তাহার ঘুম হইল না। নিজ শরীরের নানাস্থানে চপেটাঘাত করিতে করিতে ঘণ্টাখানেক ছট্‌ফট্‌ করিয়া, সে উঠিয়া বসিল। মনে মনে বলিল—"কটা বাজলো কে জানে! একটা বোধ হয় বাজেনি এখনও। তাহোক—এখনি আর এক দাগ খাইয়ে দিই। পেটে গেলেই কায দেখবে। ভোরবেলা তখন উঠে এসে বাকী দাগটা খাইয়ে দেব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া গোবর্দ্ধন শিশি লইয়া ঔষধ ঢালিল। দাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, একদাগের স্থানে অর্দ্ধদাগ ঔষধ মাত্র শিশিতে রহিয়াছে। তখন সে বাকী ঔষধটুকুও গেলাসে ঢালিয়া মনে মনে বলিল—"দিই সবটুকুই খাইয়ে। যে রকম শক্ত জ্বর, ও ছিটে ফোঁটার কায নয়। একটু বেশী করে খাওয়ানই ভাল।"

এরূপ ভাবিতে ভাবিতে রোগীর মুখ ফাঁক করিয়া ঔষধটুকু ঢালিয়া দিল। কতক রোগীর উদরস্থ হইল, বাকী গড়াইয়া শয্যার উপর পড়িল।

নিজ কর্ত্তব্য এইরূপে শেষ করিয়া, নিদ্রাতুর গোবর্দ্ধন রোগীর ঘরের দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া, নিজের ঘরে গিয়া মশারি টাঙাইয়া শয়ন করিল।

পরদিন ভোরবেলা গোবর্দ্ধন আসিয়া দেখিল, ঘরের দ্বার খোলা। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল,রোগীর ব্যাগ, ছাতা ও গাত্রবস্ত্র পড়িয়া আছে—রোগী সেখানে নাই।

দেখিয়া গোবর্দ্ধন প্রথমে বিস্মিত হইল। তাহার পর ভাবিল, রাত্রে বোধ হয় জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল, উঠিয়া মুখ হাত ধুইতে পুকুরঘাটে গিয়াছে।

অতিথিশালার পশ্চাতেই পুষ্করিণী। পুকুরঘাটে গিয়া গোবর্দ্ধন দেখিল, সেখানেও কেহ নাই।

অঙ্গনে ফিরিয়া আসিয়া পাকশালার দিক হইতে গোবর্দ্ধন একটা গোলমাল শুনিতে পাইল। কৌতূহলবশতঃ সেখানে গিয়া দেখিল, পাকশালার সম্মুখস্থিত তুলসীমঞ্চের নিকট কে পড়িয়া রহিয়াছে, পাঁচ সাত জন লোক সেখানে দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে।

গোবর্দ্ধন নিকটে গিয়া দেখিল, গতকল্যকার সেই রোগীর মৃতদেহ। অনাবৃত বক্ষে ও যজ্ঞোপবীতে কাদার চিহ্ন। মাথায় কাদা, কপালে কাদা। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলিও কাদায় মাখা।

একজন বলিল—"ঐ দেখ, তুলসী তলায় পাঁচটা আঙ্গুলে আঁচড়ানোর দাগ। খাবল খাবল করে, তুলসী মাটী নিয়ে নিজের মাথায় গায়ে মেখেছে।"

অপর এক ব্যক্তি বলিল—"অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছিল, ব্রাহ্মণ বোধ হয় টের পেয়েছিল। ঘরের ভিতর মরবে—তার চেয়ে তুলসীতলায় এসে মরেছে। লোকটা পুণ্যাত্মা ছিল হে।"

ভাণ্ডারী বলিল—"আহাহা! কাল সন্ধ্যাবেলা সাবু তৈরি করেছিলাম, যেমন বাটি তেমনি রয়েছে। জ্বরটা খুবই হয়েছিল বটে, কিন্তু রাত্রের মধ্যে যে মরে যাবে তা কে জানত?"

ম্যানেজার বাবু আসিয়া পৌছিলেন। সকল শুনিয়া বলিলেন—"আহাহাহা! মরে গেল বামুন? আত্মীয় স্বজন কেউ খবরটাও পেলে না! মানুষের শরীর পদ্মপত্রের জল! কিছু বিশ্বাস নেই, কিছু বিশ্বাস নেই! নারায়ণ নারায়ণ।"

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

'হেঁয়ালি'

কবিতাগ্রন্থ—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ডবলক্রাউন ষোলপেজী ১১০ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের সম্প্রতি অন্ধাবস্থায় একখানি চিত্র আছে।

বিগত কয়েক বৎসর হইতেই বিজয়বাবু চক্ষুরোগে ভুগিতেছিলেন। এখন আর সে রোগও নাই, জ্বালাও নাই, তিনিও নিরুদ্বিগ্ন—কারণ তাঁহার দৃষ্টিশক্তি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গিয়াছে, তিনি অন্ধ। তাই ক্ষোভ এবং হতাশ্বাসে তিনি জোর করিয়া বলিতে পারিয়াছেন—

"যাক্ তৃণের মত পুড়ে
যত শুষ্ক ব্যথা আমার ;
থাক্ ভস্মরাশি জুড়ে
এই বিশ্ব-গ্রাসী আঁধার।
ওগো শবের বাড়া শীতল !
ওগো জীর্ণ, ওগো কাল !
গাঢ় পাতাল হ'তে অতল
ঘন আঁধার রাশি ঢাল !"

চক্ষুই মানুষের সমস্ত সুখের একমাত্র রচয়িতা। যাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে নিবিড় অন্ধকারের জমাট পর্দ্দা একমুহূর্ত্তের জন্যও সরে না, বহির্জ্জগতের সৌন্দর্য্য সুষমা দূরে থাকুক, এতটুকু আলোককেও যাহার কল্পনা করিয়া লইতে হয়, এতবড় দীন দরিদ্র, এতবড় দুঃখী তাহার মত আর কে? তাই আজ অন্ধকবি আক্ষেপ করিতেছেন—

"পাখী আমার সাক্ষী আছে,
ঊষা অরুণ এসেছিল।"

অরুণ-রথের আগমন সংবাদের জন্যও যাঁহাকে আজ পাখীর মুখ অপেক্ষা করিতে হয়,তিনি এ "ঐশীলীলা"কে নিশ্চয়ই বলিবেন—

"ছড়াও শ্যামল-প্রান্তরে মরু,
কুসুম-কাননে কঙ্কর।"

যেহেতু—"স্পন্দনহীন অন্ধকারের
রন্ধ্রে ডুবেছে পৃথ্বী,
শূন্য মাঝারে খসিছে প্রাণের
চেতনারহিত ভিত্তি।"

চক্ষু নাই, কাযেই—

"নাহিক কণ্ঠে দাহ পিপাসার,
বুকে নিরাশার জ্বালা নাই ;
তীব্র তরল ধারা লালসার,
কামনা নদীতে ঢালা নাই।"

এবং— "বিনা সাধনায় বেদনার বলে
ছিঁড়েছি গ্রন্থি হৃদয়ের,
স্তব্ধ অন্ধ শূন্যের তলে
বাজুক ডমরু বিজয়ের।"

আর— "রুদ্ধ আঁধারে শ্বসে অনুভূতি,
ভস্মে বিলীন অম্বর।
মাখিয়া অঙ্গে বিশ্ব বিভূতি
বাজাও ডমরু শঙ্কর।"

চক্ষুহীনের চির-আঁধার কারাকক্ষের এই যে কাতরোক্তি, বিজয়চন্দ্রের আজ ইহাই কবিতার প্রস্রবণে উৎসারিত হইতেছে। বিজয় বাবুর পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে সম্প্রতি তাঁহার কাব্যে সুরান্তর ঘটিয়াছে। কবি তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—এ তাঁহার এক নবজীবন। তিনি হাসিতে চান, হাসাইতে চান—কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াস ছাপাইয়া, অন্তরতম প্রদেশ হইতে কে যেন বলিয়া ফিরিতেছে—

"মলিন করে' বিশ্বভরা প্রফুল্লতার আলো
ওরে রে তুই শোকে পোড়া !
ফেলিসনে তোর বক্ষ জোড়া
ছায়াটুকু কাল !

"কারো প্রাণ নয় এত নরম, তোমার ব্যথায় গলে !
পর যে তোমার সুখের জ্ঞাতি !
পরের কাছে তোমার খ্যাতি
হাস্‌তে পার বলে।

* * * * *

ওরে বুড়া, নিজের মনে
মুখ লুকিয়ে ঘরের কোণে
কাঁদনা যত পারিস্।"

এই কান্নাতেই বিজয়চন্দ্রের কবিতা আজ উদ্বেলিত। বেদনার নিবেদনই সকল কালে সকল যুগে কবিতার প্রাণসঞ্চার করিয়া আসিতেছে। কবির কাব্য একটি সুগভীর বেদনার আত্মপ্রকাশ মাত্র। ব্যথার সুর, সুরের মূর্চ্ছনা, মূর্চ্ছনার মোহ এবং ঐ মোহের পরম চরিতার্থতাই কাব্য। বিয়োগ, বিরহ ও অপ্রিয়-সম্মিলনের বেদনাই কবির চিত্তকে বিগলিত ও আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া দিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। মিলনসুখ এবং তৃপ্তি-সুখের হাসি এ পৃথিবীতে কখনও কখনও আসে বটে, কিন্তু তাহাকে চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারে—এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এ সংসারে কয়জন ? কাযেই অমাবস্যার গাঢ়তিমির-রাশিই যেখানে নিশা-দিবসের নিত্য সহচর, সেখানে পৌর্ণমাসীর স্নিগ্ধ অভিরাম কৌমুদীপ্লাবনের জন্য অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকিয়া আত্মক্ষয় করা কি সঙ্গত ? অন্ধকারকেই আলোক করিয়া লইতে হইবে। আলোকের কায সেই অন্ধকারেই পরিসমাপ্ত করিতে হইবে। ব্যথার মুখে হাসি ফুটাইয়া, দুঃখের শিরেই বোঝা চাপাইয়া, বেদনার সুরেই গান মিলাইয়া দিনাতিপাত না করিলে যে নয় ! তাই সেই অনাদিকাল হইতেই বেদনার সুরে লয়ে তালে, গমকে মূর্চ্ছনার ভঙ্গিমায়, চন্দ্র-করোজ্জ্বল সিন্ধুবক্ষে শুভ্রচলোর্ম্মিমালার শিরে শিরে ইন্দুশোভার ন্যায় কবিতা ফুটিয়া টুটিয়া লুটিয়া বেড়াইতেছে।

বেদনাকে আতুর চিত্ত যে বরণ করিয়া লয় তাহারই আবাহনমন্ত্র কবির কাব্য। বেদনার রক্তস্ফীতিই সৌন্দর্য্য এবং ব্যথাই আনন্দ। তাই সৌন্দর্য্য ও আনন্দই কবিতার প্রাণ। বেদনার চিত্তপীঠেই এই কাব্যদেবতার চির অধিষ্ঠান। সৌন্দর্য্য এই চিত্তদেবতার দূত, আনন্দই তাঁহার প্রসাধক, সজ্জাকর, মালাকর।

ক্রৌঞ্চবধূর বিলাপে যাহার জন্ম, আষাঢ়ের নব বারিদ-দর্শনে কান্তাবিরহবিধুর প্রেমিকের বিরহ-ব্যথায় যাহার অভিব্যক্তি—সেই কাব্যই যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন বেদনার মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া নিখিলের অনন্ত কাব্যসম্পদ রচনা করিয়াছে। সে আপনার আজন্ম-অর্জ্জিত সমস্ত পুণ্যসম্ভার বিশ্বজনের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া একাকীই বাঁচিয়া আছে।

যেখানে ব্যথা যেখানে বেদনা, কবিতা সেই খানেই ছুটিয়া যায়। সেই খানেই যেন তাহার ঈপ্সিত আশ্রয়। বিজয় বাবুর চক্ষের সম্মুখ হইতে যখন এই বিশ্বশোভার মহাসমারোহটি ধীরে ধীরে প্রয়াণ করিল তখন তিনি বুঝিলেন যে—

"গভীর দুঃখের অনুভূতি, ভাগ্যে ঘটে জীবনে।"

—তাঁহার কবিতার স্রোত ফিরিল। কাব্যের গাঙ্গে চড়া পড়িতেছিল, আবার শ্রাবণের অজস্র বারিসম্পাতে শতপথ সমাগত জলস্রোতে—সেই শীর্ণতটিনী কলকল্লোল-ময়ী, রক্তোজ্জ্বল গৈরিক ধারায় স্ফীত হইয়া নূতন পথে নূতন বেশে ছুটিয়া চলিল।

"হেঁয়ালি" কাব্যগ্রন্থের এই গেল একটা দিক। এ গ্রন্থের আরও দুইটি অংশ আছে, তাহার একটির নাম "দ্বাদশী স্মৃতি"। সেটিও ব্যথার কথা, বেদনার নিবেদন, এবং প্রীতির স্মৃতি। এদিকেও

"জেলে শোকের রক্ত সন্ধ্যা, সুখের দিবা যায় টুটে—
এযে আলোক আঁধার আনে ডেকে !
ভরা সন্ধ্যার ডাকিনীটি স্মৃতির পথে ধায় ছুটে—
তাম্র অঙ্গে শ্মশান ভস্ম মেখে।"

আর তৃতীয় অধ্যায়টিকে কবি "বেজায় হেঁয়ালি" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মুখে হাসি চোখে জল যাহাতে—সেটা বেজায় হেঁয়ালি নহে ত কি ?

"জীবন-তত্ত্বের সহজ অর্থের চল্‌ছে তবু দীর্ঘ টীকা"—সুতরাং জীবনই এক হেঁয়ালি—আবার তার সম্বন্ধে কোনও মতামত বা সেই জীবনের মালা গাছটির ফুল কয়টাকে অশ্রান্ত ভাবে গণনা করিয়া শেষ করিতে না পারা আরও জবর হেঁয়ালি—কাযেই বেজায়। যেটা সব চেয়ে সহজ, সেইটাকে তাল পাকাইয়া অনর্থক অনাবশ্যক রকমে জটিল করা আমাদের স্বভাব। "সৃষ্টির উদ্দেশ্য" কবিতায় মানব জাতির এই সমস্যার কবি এক কথায় অতি সুন্দর সমাধান করিয়াছেন—

"ধর সাঁচ্চা মেরীর বাচ্চা, কিংবা ধ্রুব প্রহ্লাদে ;
বাজাও ঢাক, টান নাক, আল্লা বল আহ্লাদে—
নেইক' ক্ষতি ; কিন্তু যদি ছাড়' ভড়ং বুজ্‌রুকি
দেখবে মজা—সবাই বাজায় একই তালে ডুগ্‌ডুগি।"

"খাঁটি হেঁয়ালি"র অধ্যায়টি যেন বেজায় "হেঁয়ালি"র উল্টা পিঠ। ওখানে তাহারা "একই তালে ডুগ্‌ডুগি" বাজায় ;—এখানে—

"লোকের হাটে প্রেমিক সেজে, ঢোল পিটিয়ে
করি আত্মজারি ;
আহাম্মকের মুখে শুনি, আমি নাকি পর উপকারী।"

এখানে—

"ঢেউয়ে ঢেউয়ে আস্‌বে বয়ে' মাধুরী
* * * *
জাগরণে জাগ্‌বে যাদুর চাতুরী।"

আবার—

"স্বচ্ছ গভীর জলে রবির
দ্বিপ্রহরের কিরণ পড়ে,
ললাট-ভাগের চিন্তা দাগের
মতন কাটা রেখার পরে।"

এ হেঁয়ালিতে কবির বিশ্ব নূতন, সুন্দর, মনোহর। এখানে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বৈচিত্র্য, পদার্থে পদার্থে মায়া, চিন্তায় চিন্তায় মোহ। এখানে সব অভিনব, গম্ভীর এবং চটুল। এ অধ্যায়ের হিমাচলে,

"জলে শৈলে সূর্য্য কিরণবিম্ব
দলিত ছিন্ন কুজ্ঝটি-
যেন তুষারে ধবল গিরির শৃঙ্গ
ধেয়ান মগ্ন ধূর্জ্জটি।
অই সানুর সোপানমালার ঊর্দ্ধে
শৃঙ্গ চরণ-রঞ্জিকা,
শোভে অভ্র-সুষমা, যেন রে শুদ্ধা
গৌরকান্তি অম্বিকা!
তথা অর্দ্ধ ধূসর ভূধরখণ্ড
দাঁড়ায়ে প্রান্ত গৌরবে
যেন নন্দীর মত রুদ্র প্রহরী
দলিছে চরণে রৌরবে।
সেথা স্তব্ধ চপল বাসনা মানসে,
হত লালসার উগ্রতা,
রাজে মৌন মুক্ত শঙ্করপদে
তাপসীর চারু শুভ্রতা।"

একদিকে এই গাম্ভীর্য্য—অন্যদিকে

"হাওয়ায় চড়ে ছাওয়ায় ছাওয়ায়
সবুজ বনের কোল দিয়ে"

পরীর ছানা সোনার ডানায় দোল দিয়াও যাইতেছে।

বোধ হয় "হেঁয়ালি" কাব্যের এই তিনটিই বিশেষত্ব, এবং ইহাই এ কাব্যের পরিচয়।

এতদ্ভিন্ন "যজ্ঞভস্ম" ও "ফুলশর" নামক বিজয় বাবুর পূর্ব্ব প্রকাশিত দুইখানি কাব্যের বাছাই করা কয়েকটি কবিতাও এ পুস্তকে আছে। ভূমিকা দৃষ্টে জানা গেল যে বিজয় বাবু পূর্ব্বোক্ত কাব্য দুখানির আর সংস্করণ করিবেন না বলিয়া, উহাদের মধ্যে যে কয়টি রচনা রক্ষণীয় মনে করিয়াছেন, সেই কয়েকটিই এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এগুলির সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন।

এ ছাড়া কতকগুলি সংস্কৃত কবিতাও আছে। অশ্বঘোষ রচিত "বুদ্ধচরিত্রে"র এবং "ধনিয় সুক্তে"রও অতি প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি লিখিত থাকায়, পাঠকের

মূলের সহিত মিলাইয়া পড়িবার সুবিধাও করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হেঁয়ালির পরিচয় প্রসঙ্গে বিজয় বাবুকে আমরা যেমন একজন খাঁটি কবি রূপে দেখিতেছি, বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যদিকেও তাঁহার তেমন প্রতিপত্তি। তিনি প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি নীরস ব্যাপারেও সুবিখ্যাত। উড়িষ্যার প্রায় যাবতীয় প্রত্ন-পরিচয় তাঁহারই দেওয়া। ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, সমালোচনাতেও তিনি সূক্ষ্মদর্শী। ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্বেও তাঁহার জ্ঞান বিস্তৃত। যাঁহার অধ্যয়নলিপ্সা দিবারাত্রের চব্বিশ ঘণ্টাতেও মিটিত না—আজ আর তাঁহার একটি অক্ষরও পড়িবার সামর্থ্য নাই। বঙ্গভারতীর দুর্ভাগ্য যে এমন একজন কৃতি যোগ্যতম সাধক আজ তাঁহার চরণসেবা হইতে বঞ্চিত।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাজপুরীতে প্রবেশ করিলাম। দিন যায় রাত্রিও আসে, রাত্রি যায় আবার দিনও ফিরে, কিন্তু অতি প্রাচীন রাজবংশের বংশধরের জীবন-যাত্রার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন প্রবেশ করিবার কোন সুযোগই হয় না। আমার দিনরাত্রিগুলা বাইশ মণ ভার পাথরের মত আমার বুকের উপর যেভাবে চাপিয়া থাকিত, তখনও তেমনি থাকিতে লাগিল,—তাহার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হইবার কোন সুযোগ কোথাও দেখা গেল না। বৈদ্যনাথে আহারাদির অনিয়মে শূল ব্যথা ধরিয়া শরীর যেটুকু খারাপ হইয়াছিল, তাহা দুই চারি দিনে ভাল হইয়া গেল। তখন বিপুল স্বাস্থ্য, কর্ম্মপটু দেহ এবং জীবনের তারুণ্য লইয়া সারা দিনমান কি করি ভাবিয়া পাই না; সুতরাং আহার করি, নিদ্রা যাই, অল্প স্বল্প বই পড়ি, জলে সাঁতার কাটি, লাঠি খেলা শিখি, তলোয়ার ভাঁজি, কুস্তি করি এবং আমাদের আস্তাবলে যতগুলি চড়িবার ঘোড়া ছিল, আমাদের বাড়ীর পুরাতন বৃদ্ধ "চাবুক সওয়ার" জানি মিঞার সঙ্গে মিলিয়া সেগুলাকে সকাল বিকাল ফেরি করিয়া আনি। জানি মিঞা সে দিনে বৃদ্ধ হইয়াছিল, অতগুলি ঘোড়ার প্রাতে এবং সায়াহ্নে শ্রম দেওয়া তাহার একার কর্ম্ম নহে। মাঝে মাঝে আক্ষেপ করিয়া বলিত, "আজকালকার 'সাগিরত্' দিয়া নিজের কোন উপকারই হয় না, না দুই পয়সার উপপত্তি আছে, না তাহাদের কাহারও দ্বারা নিজের শ্রমেরও কোন লাঘব করাইয়া লওয়া যায়।" এখানে প্রকাশ থাকে যে আমিও জানি মিঞার একজন 'সাগরিত্'। আমি পঁচাত্তর টাকা মাসিক বৃত্তি পাইতাম, তদ্দ্বারা অনেক ছাত্রের স্কুলের বেতন, পুস্তকের মূল্য এবং অল্প বেতনের কর্ম্মচারীর সংসার খরচের সাহায্য করিতে হইত, সুতরাং আমার "ঘোড়সওয়ারির" ওস্তাদ জানি মিঞার আর্থিক বিশেষ আনুকূল্য আমার দ্বারা হইত না; বৃদ্ধের সেই করুণ আক্ষেপোক্তি যে আমাকেই লক্ষ্য করিয়া বর্ষিত হইত সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। জানি মিঞা যত্ন করিয়া আমাকে ঘোড় সওয়ারি বিদ্যাটা শিক্ষা দিয়াছিল। অর্থানুকূল্যে যখন তাহার উপকার করা অসম্ভব হইল, তখন শরীর দিয়া ওস্তাদের ঋণ শোধ করিয়া দিব মনে করিয়া সকাল বিকাল অশ্বের ব্যায়ামচর্চ্চার বিধানে মন দিলাম। কেবলমাত্র জানি মিঞার সাহায্যার্থ নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণে আমার প্রবৃত্তি জন্মিল এরূপ কেহ

মনে করিবেন না। সময় আমার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল, কালহরণের একটা সুযোগ পাইলাম, কতকটা সময় আলস্যে কাটাইতে হইবে না। এ প্রলোভন আমার পক্ষে সে দিনে কম প্রলোভন ছিল না। সে নৈষ্কর্ম্মের দিনে, করিবার একটা কিছু পাইলেই তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিতাম। তাই লাঠি খেলা, তলোয়ার ভাঁজা কুস্তি লড়া, ঘোড়ায় চড়া, জলে সাঁতার কাটা এবং মাঝে মাঝে সঙ্গীত বিষয়ের কথঞ্চিৎ চর্চ্চা করা— এইরূপ যে কোন সুযোগ আমার হস্ত-প্রসারের মধ্যে আসিয়া পড়িত, তাহার কোনটিকেই অবহেলা করিতাম না। জানি মিঞা পরমানন্দে দিন কাটাইবার সুযোগ পাইলেন। প্রাতে আসিয়া ঘোড়ার পিঠে জিন দিয়া আমার প্রতীক্ষায় তিনি আস্তাবলের ভিতর বাহির করিতে থাকিতেন। কোন দিন আমার যাইতে কিছু বিলম্ব হইলে তিনি তাঁহার অতি বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের কথিত খাস উর্দ্দূভাষায় আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, "কুঙর্ সাহাব্, ঘোড়েঁওকা সওয়ারি সুবা—ইয়ানে আফতাফ্ জাহির হোনেকা পেস্তরিহি হোনা চাহিয়ে।" আমি স্বেচ্ছায় তাহার শ্রম লাঘব জন্য এ কার্য্য স্বীকার করিয়াছি বৃদ্ধ মিঞা সে কথা যেন ভুলিয়া যাইত;—আমাকে আস্তাবলের Riding boy-এর মত শাসন করিতে চাহিত। আমি বৃদ্ধের কোন ত্রুটী বা অপরাধ না ধরিয়া, নিজেই যেন নিজের অপরাধে নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছি এরূপ ভাবে একলম্ফে অশ্বে আরোহণ করিয়া বৃদ্ধের দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যাইতাম। সে অশ্বটি ঘর্ম্মপরিপ্লুত হইলে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতাম। আসিয়া দেখিতাম আর একটি সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। আসিবামাত্র বৃদ্ধ জানি মিঞা সজ্জিত অশ্বের প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া, যেন তাহাকে শাসন করিবার জন্য বলিত, "আভি মরদ্‌কা বাচ্চা আয়াহ্যায়, অব্ দেখোগে তুম্‌হারা কিস্তরহ্ হাজামৎ বনেগা।"—এই বলিয়া স্মিতমুখে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিত, "কুঙর্ সাহাব্, ইয়ে বদমাস টাট্টু আজ ছয় রোজ বয়ঠা হ্যায়, বৈঠা বৈঠা ইস্কা মস্তী হুয়া হ্যায়। ইয়ে হারামজাদ্‌কো জেরা হাথপর্ নাচাকে লাইয়ে গা, এতুনেই মেহের-বানী আপ্‌সে মাঙ্গতাহুঁ।" আমার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ হয় ত মনে করিবেন, ঘোড়াকে হাতের উপর নাচান ত মানুষের সাধ্য নহে, আর নাটোরের কুঙর সাহেব "রামমূর্ত্তি" নহে যে, অনায়াসে ঘোড়াকে হাতের উপর নাচাইবে বা হস্তীকে বুকের উপর দিয়া যাইবার জন্য অবলীলায় বক্ষ-পঞ্জরের উপর লোহ লোষ্ট্র কাষ্ঠাদির সাহায্যে এক অপূর্ব্ব সেতু একমুহূর্ত্তে প্রস্তুত করিবে। মানুষের বক্ষপঞ্জরে অনেক সহ্য হয়, তথাপি তাহার একটা সীমা নাই এমন কথা আমি বলিতে পারিব না; এবং যাহা দেখিতে মনে হয় সহ্য হইয়া গিয়াছে, তাহাও যে কেমন করিয়া হইয়াছে, তাহা যাহার বক্ষপঞ্জর সেই জানে, আর তাহার অন্তর্যামী দেবতা যিনি তিনিই জানেন। যাক্ সে কথা। ঘোড়াকে "হাথপর্" নাচাইবার অর্থ (জানির মতে) তাহাকে শ্রমজলাভিষিক্ত করিয়া আনা। আমার সে দিনে শারীরিক শ্রমে 'না' বলিবার অভ্যাস ছিল না, (আজও বিশেষ নাই) আমি জানির অভিলাষ অবিলম্বে পূর্ণ করিতাম; এইরূপে সে বেলার মত তিন চারিটি অশ্বের "হাজামৎ" (জানির ভাষায়) শেষ হইলে আমি বিশ্রাম পাইতাম, কিন্তু ছুটি পাইতাম না। অশ্ব এবং আমার শ্রম জানি মিঞার অভিপ্রায়মত শেষ হইয়া গেলে, নাটোর রাজবংশের প্রথমাভ্যুদয় কালে সেই বংশসম্ভূত কোন্ এক পৃথ্বীপতি বাহাদুর, জানির কোন্ অত্যতিবৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপিতামহকে রায় বেরিলি, বাঁশ বেরিলি, রামপুর, মোরাদাবাদ, শাজাঁহাপুর, বুলন্দগড় বা রোহিলখণ্ড—এমনিই কোনই একটি অখ্যাত বা প্রখ্যাত স্থানের "রহিসের" সন্তান আলিমর্দ্দন খাঁ রেশালদারকে আনিয়া কেমন "ইজ্জৎ" ও "হুরমতের" সহিত অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক করিয়া কোন্ কোন্ পরগণার ওয়াশীল তহসীল, তছরুপের—এমন কি সেই সেই পরগণার জনগণের জীবন-মরণের "এখ্তিয়ার" পর্য্যন্ত

দিয়াছিলেন, তাহারই রসসিঞ্চিত কাহিনী আমাকে শুনিতে হইত। উত্তর-বঙ্গের রাজসাহী জেলার মহকুমা নাটোরে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়াও মিঞা সাহেব তাহার পূর্ব্বপুরুষের শ্রুতিসুখকর সঙ্গীতবৎ মাধুর্য্য পরিপূর্ণ উর্দ্দু ভাষা একটুও বিস্মৃত হয় নাই; অনর্গল জলস্রোতের মত সুমার্জ্জিত, সুসংস্কৃত, শিষ্টতা পরিপূর্ণ ভাষায় নাটোর রাজবংশের এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষের গৌরব-ইতিহাস, রাজস্থানের চারণ কবির মত সগর্ব্বে গাহিয়া যাইত, আর ঝলমলায়মান প্রাতঃসূর্য্যের কিরণসম্পাতে সমুজ্জ্বল জলস্থলের চিত্রের সহিত বিগত গৌরবের প্রোজ্জ্বল চিত্র আমার মানসক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব আরব্যোপন্যাসের আনন্দরাজ্য সৃজন করিয়া তুলিত। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়া যাইতাম, কোন তর্ক তুলিতাম না, কোনও বিষয়ের সত্যতায় সন্দিহান হইতাম না। বৃদ্ধ মিঞাও এরূপ ধৈর্য্যশীল শ্রোতা পাইয়া বহু কর্ম্মহীন অলস দিনের এবং উন্নিদ্র রজনীর বহুযত্ন-নির্ম্মিত কল্পনাময় মায়াপুরীর সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তাহার মনঃকল্পিত উপন্যাসকে প্রত্যক্ষদৃষ্টবৎ বর্ণনা করিয়া যাইত। পরলোকগত জানির এক পুত্র ফজ্‌লা মিঞা নাটোর রাজবংশের ছোটতরফে আজও কাজ করিতেছে। অশ্বারোহণ বিদ্যা তাহার পিতার নিকট সেও শিক্ষা করিয়াছিল। জানির বহু সাগিরতের মধ্যে আজ আমি ও ফজ্‌লাই জীবিত আছি, কিন্তু উভয়েই অশ্বারোহণ ত্যাগ করিয়াছি। ফজ্‌লা এখন ছোটতরফের রাজকুমার শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথের মোটর-গাড়ী চালায়। আমার বিশ্বাস, জানি মিঞা আজ জীবিত থাকিলে তাহাকে দিয়া Chauffeur-এর কার্য্য করাইবার ক্ষমতা কাহারই হইত না। আজীবন দুর্দ্দমনীয় জীবন্ত জন্তুকে বশে আনিয়া এবং স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের সামরিক গৌরবের গাথা গাহিয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছে, সে সুবিন্যস্ত সুসংযত কল চালাইয়া কোন মতে জীবিকা অর্জ্জন করিবে, ইহা বোধ করি তাহার দুঃস্বপ্নেরও অতীত ছিল। তাহারই একমাত্র বংশধর আজ শিষ্ট, শান্ত, লক্ষ্মী ছেলেটির মত একাসনে যোগীর ন্যায় বসিয়া নিশিদিন কল চালাইয়া যাইতেছে—"কালো হি বলবত্তরঃ।"

করিবার কিছু নাই, সেই জন্যই কষ্টে কাল কাটে, এই ভাবিয়া অনেকগুলি কর্ম্মহীনের কাজ জোটাইয়া লইলাম যথা;—অশ্বারোহণ, কুস্তি প্রভৃতি; কিন্তু তথাপি দেখিলাম দিন আশানুরূপ আরামে কাটে না। শ্রমখিন্ন গাত্রে সুনিদ্রার আশায় শয্যার আশ্রয় লইতাম, কিন্তু শ্রমজনিত গাত্রবেদনাই ভোগ করিতাম, নিদ্রা আমার নিকট হইতে সযত্নে বিদায় গ্রহণ করিত। অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া কোন দিন তাঁহার দর্শন কিছুকালের জন্য পাইতাম, কোন দিন বা শয়ন-সময় হইতে উষার আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত চক্ষু চাহিয়াই রাত্রি প্রভাত করিতাম। সমস্ত বিশ্বভুবন নিদ্রাভিমগ্ন, কেবল মাত্র একাকী আমি প্রকৃতির সর্ব্বতাপহারী নিদ্রার অমৃতলেপের অভাবে শয্যার উপর কায়ক্লেশে রাত্রি যাপন করিতেছি। এ অবস্থা দুঃসহ বলিলে কিছুই বলা হইল না, সে যে কি কষ্ট তাহা কেবল আমিই জানি। পশু পক্ষী, জীবজন্তু, জল স্থল, বৃক্ষ বল্লী সমস্তই নিদ্রার অঙ্কে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া আরামে রাত্রিযাপন করিতেছে, কেবল গতনিদ্র আমি একাকী বিস্ফারিত নেত্রে আমার দুঃখের কাল কোন মতে কাটাইতেছি। সঙ্গী কেবল বিমানচারী অগণিত নক্ষত্ররাজি এবং কোন দিন বা খণ্ড শীর্ণ পীতাভ, কোন দিন বা পর্ব্বনিশীথিনীর অভিসারযাত্রী ষোড়শকলায় পরিপূর্ণ পূর্ণিমার হাস্যোজ্জ্বল চন্দ্রমা। তিনি কাহার সুনীল চেলাঞ্চলের মৃদুমন্দ অনিলস্পর্শ, কিম্বা কাহার ধূপবাসিত নিবিড় কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশগন্ধ, অথবা কোন প্রিয়হস্তের লীলারবিন্দের আকাঙ্ক্ষিত মন্দতাড়নের অভিলাষে গগনাঙ্গনে দ্রুতপাদক্ষেপে চলিয়াছেন জানি না, তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার রাত্রি নিরুদ্বেগে কাটিবে কেন? আমি হয়ত তাঁহার যাত্রাপথের দিকে কখনও বা লুব্ধনেত্রে, কখনও বা দ্বেষদুষ্ট চক্ষে চাহিয়া থাকিব; কিন্তু প্রিয়সম্মিলন-হর্ষোৎফুল্ল শশলাঞ্ছন আমার দিকে সেদিন দৃক্‌পাতও করেন নাই;—স্বর্গের

দেবতা হইতে মর্ত্ত্য মানব-মানবী পর্য্যন্ত কেহই দুঃখীর প্রতি ফিরিয়াও চাহে না।

এমনি করিয়া কয়েক মাস কাটিল। রাজপুরীর কারাপ্রাচীরের বাহিরে যাইবার জন্য প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত, কিন্তু কোন উপলক্ষ খুঁজিয়া পাইতাম না, তাই মাতার নিকট সে প্রস্তাব করিবার সাহস হইত না। ইতিমধ্যে আমার খুল্লপিতামহী (৺রাজা চন্দ্রনাথের জননী) স্বর্গারোহণ করিলেন। আমাদের বাটী হইতে শ্মশানভূমি প্রায় আট মাইলেরও অধিক দূর। বৈশাখের খরসূর্য্যের দুঃসহ করস্পর্শে চতুর্দ্দিক অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছে। এমন দিনে মধ্যাহ্নকালে নগ্নপদে আতপত্রহীন অবস্থায় পূজনীয়া পিতামহীর শবদেহের সঙ্গে দীর্ঘ আট মাইলেরও অধিক পথ অতিবাহিত করিতে হইল। তাহার উপর মাঝে মাঝে শব-বহন কার্য্যেও যথাসাধ্য যোগ দিতে হইয়াছিল। শবদাহ শেষ করিয়া, শ্মশানকৃত্য সমস্ত সমাধা হইলে, চিতা সংস্কারান্তে যখন গৃহে ফিরিলাম তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। যদিও সৎকারান্তে নদীতে স্নান করিয়া আসিয়াছিলাম, তথাপি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, আমাদের দেড়শত বৎসরের সংস্কারহীন দুর্গপরিখার নিশ্চল জলে পুনরায় স্নান করিতে হইল। সে দিন এবং রাত্রি অনশনে কাটিল; এবং অতি নিকট সম্বন্ধ বলিয়া মাতাঠাকুরাণী আমার হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অশৌচান্ত পর্য্যন্ত এইরূপ নানা কঠোরতার ফলে আমি পীড়িত হইয়া পড়িলাম। জ্বর এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্রমধ্যে একপ্রকার বিষম ব্যথা—যাহার যন্ত্রণায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চেতনা লোপ হইবার উপক্রম হইত। প্রায় সপ্তাহ কাল স্থানীয় ডাক্তারগণের চিকিৎসায় রহিলাম, ফল কিছুই হইল না। উপরন্তু বেদনা-নিবারণকল্পে ক্লোরাল হাইড্রাস এবং মরফিয়ার প্রাচুর্য্যে সময় সময় দেহে বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিত, তথাপি রোগের উপশম কিছুই হইল না। গতিক মন্দ দেখিয়া চিকিৎসকগণ সিভিল সার্জ্জনকে আনাইবার জন্য মতপ্রকাশ করিলেন। মাতাঠাকুরাণী ব্যস্ত হইয়া রাজসাহীর ডাক্তার সাহেবকে আনাইয়া আমার চিকিৎসার ভার তাঁহার উপরে সমর্পণ করিলেন। তিনি অন্ত্রের মধ্যে বিদ্রধি হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া অস্ত্রে অস্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন, এবং ক্লোরোফর্ম্মের সহায়তায় আমাকে হতচেতন করিয়া অস্ত্র করা হইবে তাহারই উদ্যোগ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। সে দিনে আমাদের দেশে ক্লোরোফর্ম্মের অধিক প্রচার ছিল না; উপরন্তু ঐ সময়ের দুই তিন মাস পূর্ব্বে আমাদের দেশের গণ্যমান্য একটি ভদ্রসন্তানের অস্ত্রচিকিৎসার্থ তাঁহাকে হতচেতন করিয়া অস্ত্রপ্রয়োগ করা হয়, অস্ত্র চিকিৎসা সুসম্পন্ন হইলে পর দেখা গেল যে চিকিৎসিত ব্যক্তির পুনঃ-চেতনা-সঞ্চারের কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে! চিকিৎসকগণ অস্ত্রপ্রয়োগের সৌকর্য্যার্থ "সম্মোহন" ঔষধি এত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, সেই ভদ্রসন্তান সে ব্যাধি এবং অনাগত ভবিষ্যতের সমস্ত আধিব্যাধির হস্ত হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। আমার উপরেও সেই সম্মোহন বাণ প্রয়োগ করা হইবে শুনিয়া মাতা অতিমাত্রায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। অস্ত্র-চিকিৎসা না হইলে মারা যাইব, এরূপ আশঙ্কা চিকিৎসকগণ প্রকাশ করিয়াছেন;—অস্ত্র-প্রয়োগ করিতে হইলে হতচেতন না করিয়া অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত অসম্ভব, ইহাও সকলেই বুঝিতে পারিলেন। নানালোকের নানামত হইয়া কোন কিছুই স্থির হইতেছে না;—কেবল আমি যাতনায় ত্রাহি ত্রাহি করিতেই লাগিলাম। অতঃপর রাজধানীর মন্ত্রিবর্গ সকলে মিলিয়া আমার রোগশয্যার পার্শ্বে আসিয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির আমাকেই করিতে বলিলেন। আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, যাহার অন্ত্রমধ্যে দারুণ ব্যথায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছে, নিদারুণ যন্ত্রণায় যাহার মুহূর্ত্তকালের জন্য স্বস্তি নাই—সেই কিনা বুদ্ধি স্থির করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া দিবে! যে কর্ত্তব্য, স্থিরবুদ্ধি শুক্লকেশ প্রাচীনগণ সুস্থদেহে অবধারণ করিতে

অপারগ হইতেছেন, তাহাই বিষম রোগে কাতর, যন্ত্রণায় মুহ্যমান রোগী অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া স্থির করিবে ইহা কি সম্ভব? প্রাচীন মন্ত্রিবর্গ আমার শয্যার চারি পার্শ্ব ঘিরিয়া বসিয়া বলিলেন, "দৈব দুর্বিপাকে আজ আমরা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি। তুমি বিদ্বান, বয়স্ক—এ সমস্যা হইতে তুমি ভিন্ন কেহ উদ্ধারকর্ত্তা নাই। তুমি স্থিরচিত্তে ভাবিয়া বল, তোমার অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধে আমরা কি করিব?"

আজি এই প্রথম আমি 'বয়স্ক' উপাধি পাইলাম!!! ঐ দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও আমার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখে ঈষৎ না হাসিয়া আমি পারিলাম না—সে হাসি কি হাসি, তাহা যে হাসিয়াছে সেই জানে! মনে মনে ভাবিলাম, হায়, এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন একজন মানুষও নাই, যে আমার এই প্রাণটাকে নিজের প্রাণের মত দেখিয়া, এই দুঃসহ যন্ত্রণার দিনে, এই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির সময়ে আমার ব্যবস্থাটা করিয়া অন্ততঃ পক্ষে আমাকে চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি দেয়! সে দিনে নূতন করিয়া আমার বালক কালের অন্ধতার দিনের কথা মনে পড়িল; নূতন করিয়া বহুকাল-পর-লোকগত পূজ্যপাদ প্রত্যক্ষ ভূদেবতা পিতৃদেবের কথা মনে পড়িল; আমার শৈশবের অন্ধতার দিনে তিনি কেমন করিয়া ব্যবস্থার ভার স্বীয় হস্তে লইয়াছিলেন সে কথা মনে পড়িল। আমি হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে পারিলাম না,—আমার দুই গণ্ড বহিয়া নিতান্ত দুঃখের অশ্রু নীরবে দরবিগলিত ধারায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কক্ষান্তরে আমার মাতাঠাকুরাণী (মহারাণী) এবং কুটীরবাসিনী আমার দুঃখিনী জননী বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের সশব্দ রোদনধ্বনি আমার কাণে প্রবেশ করিয়া আমাকে অধিকতর অস্থির করিয়া তুলিল। আমি মন্ত্রিবর্গ, চিকিৎসক সংঘ এবং পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে স্থানান্তরে যাইতে বলিলাম এবং স্নেহকাতরহৃদয়া আমার মাতৃদেবীদ্বয়কে আমার নিকটে আসিতে বলিলাম। অবিলম্বে রোরুদ্যমানা মূর্ত্তিমতী স্নেহস্বরূপিণী মাতৃদ্বয় আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি হস্ত বাড়াইয়া তাঁহাদের পদধূলি আমার মাথায় লইয়া, বিশেষ চেষ্টায় জোর করিয়া একটু-খানি হাসি আমার রোগশীর্ণ ওষ্ঠাধরের উপর টানিয়া আনিয়া বলিলাম, "মা, আমি নিদারুণ রোগযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আরোগ্য কামনায় চিকিৎসার অনুবর্ত্তী হইতে যাইতেছি। তোমরা প্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ কর, দুই হস্তে তোমাদের পদধূলি মাথায় তুলিয়া লওয়া এই যেন আমার শেষবারের জন্য না হয়।" আজও স্পষ্ট মনে আছে, এই কথাগুলি শুনিয়া আমার প্রত্যক্ষ দুই দেবীমূর্ত্তি, তাঁহাদের চারিখানি স্নেহ-হস্তের নিবিড় বন্ধনে আমার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। আমার মনে হইল, জগজ্জননী চতুর্ভুজা আমার মাতৃমূর্ত্তিতে তাঁহার বিশ্বপালন স্নেহহস্তে আমাকে অভয়বর দান করিতে আসিয়াছেন। রোগের যন্ত্রণায় পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম, অস্ত্র চিকিৎসার এবং তদানুসঙ্গিক সম্মোহন ঔষধের প্রয়োগে দ্বিধা করিব না। তদুপরি এই চারিখানি স্নেহহস্তের নিবিড়স্পর্শে এবং দুইটি স্নেহ পরিপ্লুত হৃদয়ের শুভাশীর্ব্বাদ লাভে, যাহা কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব মনে ছিল, সব অন্তর্হিত হইল। মাতৃদ্বয় আমার কথা শুনিয়া নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা তুই শতায়ুঃ হইয়া থাক্, আমাদের স্তন্যের বল যেন তোকে সর্ব্বাপদ হইতে রক্ষা করে। বাবা, জগজ্জননী মহামায়ার কাছে আমাদের সর্ব্বান্তার এই নিবেদন সর্ব্বদা জানাইতেছি।"

আমি আর তাঁহাদিগকে কালবিলম্ব করিতে দিলাম না। আমি যে ঘরটায় ছিলাম, সেটা সদর ও অন্দরের মধ্যস্থান বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই। সেখান হইতে তাঁহাদিগকে অন্দরে যাইতে বলিয়া, আমি ডাক্তার সাহেবকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম এবং ক্লোরোফর্ম্ম ও অস্ত্রপ্রয়োগে আমার কোন বাধা নাই, এবং তখনই সে কার্য্য যদি হইতে পারে, তবে আর কালবিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, একথা তাঁহাকে জানাইলাম।

উদ্যোগ অনুষ্ঠান প্রস্তুতই ছিল। তখন বেলা প্রায়

দশটা হইবে। সেই সময়ে অস্ত্রচিকিৎসার উপযোগী শয্যায় আমাকে ধরাধরি করিয়া শয়ন করান হইল। স্থানীয় এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দুই তিন জন, আমাদের গৃহ-চিকিৎসক প্রাচীন কবিরাজ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয় এবং আমার ভূতপূর্ব্ব গৃহশিক্ষক—এই কয়জন সে কক্ষে রহিলেন। চিকিৎসকদিগের মধ্যে কেহ আমার নাড়ী ধরিয়া বসিলেন, কেহবা বস্ত্রাবৃত তুলার মধ্যে সম্মোহন-আরক (Chloroform) ঢালিয়া আমার নাসাপুটের নিকট ধরিয়া সজোরে ঘ্রাণ লইবার জন্য আমাকে বারম্বার উপদেশ দিতে লাগিলেন। আমার সে সময়ের চিত্তবৃত্তি ভাল করিয়া বিশ্লেষ করিয়া আমার পাঠক পাঠিকাকে বুঝাইতে পারি এরূপ ক্ষমতা আমার নাই। যে ভদ্র-লোককে অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য অজ্ঞান করাইয়া আর জ্ঞানসঞ্চার করা যাইতে পারে নাই, সেই উপলক্ষ ধরিয়া মাস তিন চারি পূর্ব্বে আমি আমাদের দেশের সার্জ্জনগণের অনেক মুণ্ডপাত করিয়াছিলাম, ডাক্তার-গণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই কোন না কোন ছলে সেই কথা তুলিয়া ঠাট্টায় ব্যঙ্গে বিদ্রূপে তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতাম, সেই আমিই এমন নিরুপায়ভাবে তাঁহাদের সেই 'চির সম্মোহন আরক' আর 'ভব-রোগ-হারী ছুরিকা'র উপর প্রাণরক্ষার্থ একান্ত নির্ভর করিয়া নিঃসহ ভাবে শয্যাশায়ী হইব ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাহা ভাবি নাই তাহাই সংঘটিত হইল, এমনই আমার জোর কপাল! এ যে দিনের কথা, সে দিনে আমি অনুত্তীর্ণ-বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক, কেবল মাত্র যৌবনের আদিপ্রান্তে পাদক্ষেপ করিয়াছি; এমন দিনে কেহ মৃত্যুর জন্য নির্ব্বিকার ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে না। এ দিনে জীবন বড় মধুময় বলিয়া মনে হয়। জলস্থল অন্তরীক্ষ বৃক্ষবল্লী ফলপুষ্প—সকলের মধ্য হইতে যেন মধু ক্ষরিত হইয়া পড়িতে থাকে। আশার ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটা আমাদের নয়ন মন মোহিত করিয়া তোলে। অনন্ত স্বাস্থ্য, বিমোহন রূপ ও মধুগর্ভ জীবনের মোহরসের মাদকতায় আমরা বিমূঢ়েন্দ্রিয় হইয়া প্রিয় দয়িতার বাহুপাশনিবদ্ধ দশাননজিৎ রাজাধিরাজের মত বারবার বলিতে থাকি—

"বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমুবিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।"

"দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে" মালঞ্চের পুষ্পৈশ্বর্য্য যেমন একদিনে বিকসিত হইয়া ওঠে, তেমনি জীবনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে, কি জানি কোন্ মলয়ের দক্ষিণস্পর্শে আমাদের হৃদয়মালঞ্চের সবগুলি ফুল একদিনে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার মধুবাসের মাদকতায় আমাদের দেহমন মাতাল করিয়া তোলে। সেদিনে হৃদয়ের সেই মহৈশ্বর্য্যের দক্ষিণদানে ত্রিভুবনকে তৃপ্ত করিয়া দিতে আমাদের বড় ইচ্ছাই করে; বারম্বার বলিতে ইচ্ছা যায়, "ওগো, তোমাদের যাহা কিছু আমাকে দাও, আর আমার এই মধুভার-প্রপীড়িত, বসন্তের মধুচক্রের মত হৃদয়ের মধু-ভাণ্ডারে আজ যে সদাব্রত খুলিয়া গিয়াছে, যাহার যাহাই প্রয়োজন সেখান হইতে তোমরা দুইহাত ভরিয়া তাহা লইয়া যাও; এ অফুরন্ত অলকার ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের দ্বার জানি না আজি কোন লক্ষ্মী আসিয়া আপন হাতে খুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন;—তাঁহার নিকট আজ অদেয় কিছুই নাই।"

জীবনের দিবার ও নিবার এই পরমমুহূর্ত্তে বিশ্বভুবনকে নশ্বর জানিয়া কেহ প্রস্তুত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে না। অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় যাহাকে তাহা করিতে হয়, তাহার দুরদৃষ্ট যে কত বড়, তাহার যথাযথ অনুমান করা আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকার পক্ষে বোধ করি কঠিন হইবে না। তাঁহারা বুঝিয়া দেখিবেন যে সেই সদ্যসমাগত যৌবনের আদিপ্রান্তে দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে, জীবনের যাবতীয় আশা আকাঙ্ক্ষাগুলির একটিরও আংশিক পূরণ হইবার বহু পূর্ব্বে, যেদিন সদ্যঃ প্রভাতের মধুময় স্নিগ্ধালোকের দিকে বিমুখ হইয়া আমাকে অন্ধকার পথের অনির্দ্দেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া স্বেচ্ছায় শেষশয়ন বিছাইতে হইয়াছিল,

সেদিন আমার পক্ষে কি দিন! শুনিয়াছি, রণ-ভেরী নিনাদে যুদ্ধোন্মত্ত বহু অক্ষৌহিনী সেনা একত্রে যখন প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য অগ্রসর হয়, তখন মৃত্যুভয়ে তাহারা কাতর হয় না, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত শবরাশির উপরে সদর্পে পাদবিক্ষেপ করিয়া অকুতোভয়ে হাস্যমুখে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। রাজকবির অপূর্ব্ব ললিত ছন্দের উপাদেয় গাথা পাঠে জানিয়াছি, সাক্ষাৎ শমন সদৃশ অগ্নিবর্ষী কামানের মুখে রণোন্মত্ত অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী বীরমদে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া বায়ুবেগে অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু সে সকলের কোন প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার নাই। প্রায় অবধারিত মৃত্যু জানিয়া জীবন-প্রভাতে কেহ অবিকম্পিত হৃদয়ে তাহার দিকে অবি-চলিত পদে অগ্রসর হইয়াছে, এমন আমি দেখি নাই। সুতরাং সে দিনে আমি ভয়শূন্যমনে মৃত্যুশয়ন বিছাইয়া দিয়াছিলাম, এত বড় মিথ্যাকথা বলিতে পারিব না। সেদিনে ভাবিয়াছিলাম, এই সুন্দরী ধরণী, এই পরিপূর্ণ চন্দ্রকরোদ্ভাসিত উপাদেয় ফাল্গুন-পূর্ণিমার সুখ-যামিনী, এই শরৎ-শেফালীর গন্ধামোদিত অমলিন-জ্যোৎস্না-প্লাবিত শারদ-নিশীথিনী—এ সমস্তই রহিয়া গেল, কেবল আমিই আমার অতৃপ্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষাগুলিকে হৃদয়তলে বৃথা লালন করিয়া আমার এই ব্যর্থ জীবন অকালে শেষ করিয়া চলিলাম—কোথায়—কে জানে! জীবনে তখন এমন কিছুই পাই নাই, যাহা ফেলিয়া যাইতে সাশ্রুনেত্রে পশ্চাতে ফিরিয়া অতৃপ্ত হৃদয়াবেগে বারম্বার চাহিয়া দেখিতে হয়। কিন্তু পাইবার আশা যে তখন অপরিসীম, সেই আশার মোহকরী শক্তি যে তখন দুর্ব্বার! তখন ত আমার মঞ্জরিত আশার আনন্দ-লতিকা সফলতার স্নিগ্ধ সিঞ্চনাভাবে ছিন্ন শুষ্ক ধূলিম্লান হইয়া মাটির উপরে তাহার শেষ শয়ন বিছায় নাই। তখনও যে আমার জীবনাপরাহ্ণের চিরবঞ্চিত প্রাণপ্রিয় চরম-সিদ্ধি দুর্ভাগ্যের কাল বৈশাখীর উন্মাদ তাণ্ডবে ত্রস্ত ভ্রষ্ট ও হস্তস্খলিত হইয়া, আমার হতাশ-হৃদয়ে বজ্র বেদনা দিয়া, আমাকে জীবন্মৃত করিয়া ফেলে নাই। সেই সময়ে "মৃত্যুদূত সম্মুখে আসিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে যদি গন্তব্য পথ দেখায়, তাহার সে সংকেতপথে সেদিন অভিসারে যাত্রা করিতে মন কি স্বেচ্ছায় চাহে?

চিকিৎসকের মতে আমি সেদিনে গত্যন্তর-বিহীন হতভাগ্য রোগী। রোগ লইয়া বিনা চিকিৎসায় পড়িয়া থাকিলে বাঁচিব না; পক্ষান্তরে এই ভয়ভীষণ আসুরিক চিকিৎসার গভীরান্ধকারের মধ্যে জীবনাশার ক্ষীণতম রশ্মিটুকু দেখা যাইতেছিল—সেই আশার অমৃত-আশ্বাসটুকু আমার বুকের মধ্যে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া মাতৃপদ-ধূলি মাথায় লইয়া, আসুরিক চিকিৎসার হস্তে নিজেকে কোনও মতে সমর্পণ করিতে পারিয়াছিলাম। 'সম্মোহন' ঔষধের মোহোৎপাদনকরী শক্তির সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলাম তাহা আজ আমার স্মরণ নাই। নিতান্ত কম সময় নহে। ক্রমে ক্রমে হস্তপদ অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল, একয় দিবস ধরিয়া রোগের যে দুঃসহ যাতনার মধ্যে আমার দিনরাত্রি কোনও মতে অতি-বাহিত হইয়াছে, সে দারুণ যন্ত্রণা মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল এবং কি একপ্রকার প্রফুল্লতা আসিয়া আমার মনকে অধিকার করিল তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। কিন্তু 'সম্মোহনের' প্রথমাবস্থা বেশ আরামপ্রদ মনে হইল। ডাক্তার সাহেব ঘন ঘন আমার চক্ষুর মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া উন্মেষ নিমেষের পরীক্ষা করিতেছিলেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু কিছুই বলিবার ক্ষমতা নাই,—জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার অতি অল্পকাল পরেই মনে হইল, যেন আমাকে জোর করিয়া জলের মধ্যে ডুবানো হইতেছে। শৈশবে একবার আমার জলে ডুবিবার উপক্রম হইয়াছিল, কোনও মতে সেবারে সমবয়স্ক একটি বালকের সাহায্যে আমার প্রাণ-রক্ষা হয়; এবং বাল্যে যখন সাঁতার শিখি তখন দুইচারি বার জলে ডুবাইয়া আমার শিক্ষক ভয় ভাঙাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে অবস্থা আমার মনে ছিল, তাই বুঝিলাম, সম্পূর্ণ চেতনা বিলোপের পূর্ব্বে 'সম্মোহনে'র ক্রিয়া জলে ডুবিবার ক্রিয়ার মত। এই পর্য্যন্তই মনে আছে। তাহার পর হইতে আবার চেতনা ফিরিবার সময়

পর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণরূপে মরিয়া গিয়াছিলাম, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। জাগ্রত হইয়া জানিলাম, হতচেতনাবস্থায় অন্ত্রমধ্যে যথেষ্ট অস্ত্র প্রয়োগ হইয়াছে। শোণিতস্রাবে বিছানা ভাসিয়া গিয়া কক্ষতলে রক্তের স্রোত বহিয়াছে। আমার শরীরে নির্ম্মম অস্ত্রাঘাত চলিতেছে দেখিয়া, আমার গৃহ শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্যাকুল হইয়া ডাক্তার সাহেবের হাত ধরিয়া তাঁহাকে বিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার সমবয়স্ক মাতুল, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়, দরজার ছিদ্রপথে রক্তনদী দেখিয়া আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। যোগেশের ব্যাকুলতায়, সব শেষ হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া, আমার মাতাঠাকুরাণী এবং আমার জননীদেবী দুইজনে পাগলিনীর মত আমার কক্ষের রুদ্ধদ্বারে, শিরে করাঘাত করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন—এ সকল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। এই অবস্থাটাকে আয়ুর্ব্বেদীয় ভাষায় "মৃতাদপ্যপরোমৃতঃ" বোধ করি অনায়াসে বলা যাইতে পারে। যখন চেতনা ফিরিয়া পাইলাম তখনও কি হইয়াছে, কোথায় আছি, সে সকলের সম্যক জ্ঞান আমি ফিরিয়া পাই নাই। চক্ষে ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না, কাণের মধ্যে এক প্রকার সঙ্গীতের ধ্বনি অনবরত ধ্বনিত হইতেছিল—যাহার আতিশয্যে অন্য শব্দ ভাল করিয়া কাণে পঁহুছিতে পারিতেছিল না। কি যেন এক জড়ভরতের ভাবে আমি বহুক্ষণ পড়িয়া রহিলাম। আমি চক্ষুরুন্মীলন করিলে দ্বার খুলিয়া চিকিৎসকগণ এবং অপরাপর পুরুষ সকলে বাহিরে চলিয়া গেলে, মাতাঠাকুরাণীরা আমার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন এবং আমার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন—এইটুকু আমি সেই অসম্পূর্ণ চেতনার মধ্যেও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। স্নেহের এমন অনির্ব্বচনীয় মহিমা যে, হতচেতন-জীবও স্পর্শানুভূতির দ্বারা বুঝিতে পারে, ইহা স্নেহের করস্পর্শ। হায়, দেবতার দান এই দুর্ল্লভ স্নেহকে সমাদর করিবার যাহার অবসর হয় না, এ ধরায় তাহার মত হতভাগ্য কি কেহ আছে ?

চিকিৎসায় প্রাণ যাইবার আশঙ্কা বিদূরিত হইল। সকলের মনে আশা হইল, এখন ধীরে ধীরে সঙ্কট ব্যাধি আরোগ্যের পথে চলিবে। আমিও সেই আশায় আশান্বিত হইয়া সেই দিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম—যেদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া সাধারণ মানুষের মত যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারিব। ব্যাধির নিদারুণ যাতনার সময়ে মনে হইতেছিল, কোনও প্রকারে যদি যাতনা একটু কম হইয়া যায় এবং প্রাণে মরিব না এই আশ্বাসটুকু পাইতে পারি, তবে যত দীর্ঘ সময়ই কেন লাগুক না, আরোগ্যের জন্য ধীরভাবে তাহার প্রতীক্ষা করিতে আমার কোন ক্লেশই হইবে না। কিন্তু হায়, মানুষের অনন্ত আশার কি শেষ আছে! যদি প্রাণভয় দূর হইল, তখন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম; এবং সন্ধ্যা সকাল দিনরাত্র ডাক্তার সাহেব এবং তাঁহার সহকারিদিগকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া এবং শীঘ্র যাহাতে আরোগ্য লাভ করি, সেই মত করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ পুনঃ পুনঃ জানাইয়া, নিতান্ত উদ্বেজিত করিয়া তুলিলাম। আকাঙ্ক্ষিত লাভের জন্য মানুষ যতই অধীর হইয়া উঠে, ঈপ্সিত ততই যেন সুদূরে সরিয়া যাইতে থাকে। এক একটি দিন রাত্রি সেদিনে এক যুগ বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল। সেই সময় হইতে আজ এই জীবনের পরিণত দিন পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ দেখিয়া আসিতেছি যে, অভিলষিত লাভে কৃতার্থ হওয়া বিধাতা আমার অদৃষ্টে লিখেন নাই। সকল হৃদয় দিয়া যাহা কামনা করি, সকল মনঃপ্রাণ দিয়া যে সফলতা লাভের জন্য তপস্যা করি, তাহা আমার অদৃষ্টের দোষে এবং গ্রহবৈগুণ্যে যেন ক্রমশই দূরে সরিয়া যায়। অবশেষে সমাসন্ন-সিদ্ধির বিমলানন্দে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা হইতে উঠিয়া জানিতে পারি, আমার একান্ত আশার, আমার

পরম আকাঙ্ক্ষার, আমার জীবন ভরা অভিলাষের পরম প্রিয়পদার্থ আমার বক্ষতলে নিদারুণ বেদনা দিয়া এ হতভাগ্যের হস্তপ্রসার হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে—আমার ব্যর্থজীবনের অনাবশ্যক ভার ভস্ম-স্তূপে পরিণত হইয়া পথের ধূলির উপর অন্তিম-শয়ন বিছাইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

ভারতের শ্রমশিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

কিসে দেশের অবস্থা স্বচ্ছল হয়, অধিকতর ধনাগম হয়, তাহা লইয়া শিক্ষিত সমাজের সকলেই অল্পবিস্তর ব্যস্ত। ধনাগমের সহিত দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি এত ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট যে, দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেককেই এই এক কেন্দ্রীভূত সমস্যায় আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। দেশের ম্যালেরিয়া দূর করিব, পল্লিস্বাস্থ্যের উন্নতি করিব, দুর্ভিক্ষের উপশম করিব এবং সর্ব্বোপরি দেশের জনসাধারণকে শিক্ষাদান করিব—ইহার প্রত্যেকটীর কেন্দ্রেই এক কথা—অর্থের প্রয়োজন, দেশের ধনবৃদ্ধির প্রয়োজন। দেশের ডাক্তার ও উকীল মহাশয়েরা যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাহাতে ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও ধনবৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু দেশের ধনবৃদ্ধি হয় না। চাষের উৎকর্ষদ্বারাই হউক আর শ্রমশিল্পের বিস্তার দ্বারাই হউক, যাহাতে অধিকতর অর্থ উপার্জ্জিত হয় তাহাই দেশের ধনবৃদ্ধি করে। আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান, এখানে যে অধিকসংখ্যক লোক কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তাহাই প্রয়োজন ও তাহাই স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধির পরিচালনা ও বিশেষজ্ঞের কার্য্যের জন্য লোকের আবশ্যক এবং সে লোকেরও অভাব নাই। যে সমস্ত ভদ্রলোকগণ আজ এক একটি অর্থকরী শিল্পের জন্য নিজেদের কর্ম্মজীবন উৎসর্গ করিয়া নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ও দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে পারিতেন, তাঁহারাই আজ কেরাণীগিরি ও ওকালতীতে ভিড় করিয়া ঢুকিতেছেন।

শিল্প কর্ম্মে উপার্জ্জন করিতে মূলধনের অভাব হয় না। শ্রমশিল্প আমাদের দেশে ছোটখাট-ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। বেশী মুনাফা হইত, সুতরাং ক্ষুদ্রভাবে কায করিয়াও পোষাইত। কিন্তু আজ সমস্ত জগতের শিক্ষিত ও সভ্যজাতির সহিত প্রতিযোগিতায় সে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান টিকিল না। ইহা আমরা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছি। বড় করিয়া কারবার না করিলে শিল্প ব্যবসায় দাঁড়াইবে না তাহা জানিয়াছি। জানিয়াও আমরা মোহগ্রস্তের মত আমাদের দুর্ব্বলতা ও আমাদের কর্ত্তব্য পূর্ণ অনুভব করিতে পারিতেছি না। কিন্তু বেদনার মাত্রা ক্রমেই উচ্চে উঠিতেছে; এবং আমাদেরও তন্দ্রাত্যাগের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ছোট ছোট ব্যক্তিগত চেষ্টাকে বৃহৎ অনুষ্ঠানের মধ্যে কৃতকার্য্যতায় আনিয়া ফেলা প্রয়োজন। ইহা আমাদের কায এবং বাহির হইতে কেহই আমাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবে না। কেবল চাই প্রেরণা চাই নিষ্ঠা, চাই অভিজ্ঞতা। যদি কর্ম্মে নিষ্ঠা থাকে তবে কৃতকার্য্যতা ত হাতের মুঠার মধ্যে। এই তেরোখা কর্ম্মের তিনদিক সমান না থাকাতেই যত গোল হইয়াছে। যদি বা অর্থ সংগৃহীত হইয়া একজনার

তত্ত্বাবধানে কার্য্য আরম্ভ হইল, তবে হয়ত অভিজ্ঞতার অভাবে সমস্ত উদ্যোগ ও অর্থ পণ্ড হইল। যদি আমাদের অকৃতকার্য্যতার মূল অনুসন্ধান করি তবে এই প্রকার কোনও না কোন সাধারণ গলদ বাহির হইয়া পড়িবে। জাতীয়-জাগরণের প্রথম চেষ্টাতে যে কারবার-গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার অনেকগুলি আজ না টিকিয়া থাকিলেও, আমরা বৃহদাকার শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব্ব হইতে অধিকতর প্রস্তুত হইয়াছি তাহা নিশ্চিত। বিফলতার মূল্যেই আমরা অভিজ্ঞতা ক্রয় করিয়াছি। যে কয়টি কারবার দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাদের ক্রমোন্নতি হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইবার আশা আছে।

যাঁহারা পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করতঃ শিল্পব্যবসায়কে লাভবান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নিজের উপর যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছে তাহা দেশের একটা বৃহৎ সম্পৎ। আমরা কিছু করিতে পারি, আমাদের শক্তি আছে, প্রতিযোগিতার মধ্যে দাঁড়াইয়াও আমরা স্থিরভাবে নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিতে পারি—এই আত্মপ্রসাদের মূল্য বড় কম নহে। এই প্রকার দুই একটি দৃষ্টান্ত অনেক নিষ্ফলতাকে ঢাকিয়া ফেলে এবং জাতীয় উদ্যমকে বাঁচাইয়া রাখিবার খাদ্য যোগায়।

রাসায়নিক শ্রমশিল্পেরই আজ দিন। যে দিকেই তাকাই না কেন,রাসায়নিক শ্রমশিল্পের এত বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে যে তাহার আশে পাশেও আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি একথা বলিতে পারি না। অন্যদিকে যদিও কিছু কার্য্য হইয়া থাকে তথাপি রাসায়নিক শিল্পে আমরা বড়ই পিছনে পড়িয়া আছি। সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জার কথা এই যে আমাদের দেশ হইতে এত খনিজ পদার্থ তুলিয়া লইয়া পৃথিবীময় লোকে কাযে লাগাইতেছে, আর আমরা কেবলই নিম্নতম কর্ম্ম করিতেছি এবং আমাদের অজ্ঞ দেশবাসীরা কেবল কুড়াল, খন্তা, গাঁতিদ্বারা খনন করিতেছে ও খনিজ পসরা বহিয়া লইয়া জাহাজ বোঝাই দিতেছে। অন্য বিষয় ছাড়িয়া দিয়া এই খনিজ পদার্থ সম্বন্ধেই আমি দুই একটি কথা বলিব।

খনিজ পদার্থের সন্ধান দেন জিওলজিষ্ট আর কার্য্যে লাগান বিশেষজ্ঞ কেমিষ্ট। এই উভয়ের অগ্র পশ্চাতে ক্যাপিটালিষ্ট বা ধনী বর্ত্তমান থাকা চাই। আমাদের দেশে প্রতিবৎসর কয়েকটি করিয়া জিওলজিষ্ট তৈয়ারী হইতেছেন। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পঠদ্দশায় নানা-স্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক খনিজ পদার্থ দেখিয়া ইঁহারা উপযুক্ত হইয়াই কলেজ হইতে বাহির হয়েন। আর কেমিষ্ট্রতে এম্-এ'র ত অভাবই নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজের এক দ্বার হইতে কতক সংখ্যক জিওলজিষ্ট বাহির হইতেছেন এবং অপর দ্বার হইতে কতক সংখ্যক কেমিষ্ট বাহির হইতেছেন, কিন্তু ইঁহাদের পরস্পর কাহারও সহিত কাহারও কার্য্যতঃ সংস্রব নাই। আমি ঠিক জানি না, কিন্তু মনে হয়, যেন এই উভয় দলই দেশের খনিজ পদার্থ ও তাহার শিল্প ব্যবসায় সম্বন্ধে অজ্ঞ। কলেজে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে প্রোফেসর হইতে পারা যায় কিন্তু ভারতবর্ষের খনিজ সম্পৎ ও তাহা হইতে অর্থকরী শিল্প-ব্যবসা সম্বন্ধে কোনও শিক্ষা ছেলেদেকে দেওয়া হয় না, এবং সকল অধ্যাপকের সে জ্ঞান আছে কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ প্রেসিডেন্সী বা অন্য কোনও কলেজের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। বিশেষভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিম্বা বিশেষভাবে শিল্প ব্যবসায় সম্বন্ধে কোনও আলোচনা পাঠ্যের বহির্ভূত। Pure science শিক্ষা দেওয়া যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে applied science সম্বন্ধে শিক্ষার প্রত্যাশা করা যায় না; এবং তাহার আয়োজন সরঞ্জামও নাই। টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য অনেকটা এই প্রকার ছিল, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, তাহাতে আর সে শিক্ষার বন্দোবস্ত এক্ষণে নাই। পূর্ব্বেকার টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটের স্থানে পালিত ও ঘোষ মহাশয়দের বদান্যতায় যে সৌধ ও সায়েন্স-কলেজ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে pure science লইয়াই অধ্যাপনা ও গবেষণা চলিবে। মৌলিক গবেষণার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার আগে আরও প্রয়োজন জীবন-ধারণ করা। দেশে যে কি জিনিষ পাওয়া যায় আর কি কি সামগ্রী বিদেশে গিয়া সোণার

মূল্যে আমাদেরই কাছে ফিরিয়া আসে, আমাদের এম-এ, এম্-এস-সি'রা তাহার আভাষও পান না। এম্-এ, এম্-এস্-সি অবধি পড়াইয়া যে জমী তৈয়ারী হইল, তাহার উপর মৌলিক গবেষণা বপন করা ভাল কিন্তু আরও ভাল, সেই জমীতে শিল্পজ্ঞানের বীজ বপন করা। অনেক সোজা বিষয়, একটু ইসারা পাইলে, একটু হাতড়াইলেই কাযে লাগান যায়। সেই ইসারা, সেই initiation-এর অভাবে আমরা মরিয়া আছি। আমরা জানি, জিপসম্ পোড়াইয়া Plaster of Paris হয়, কত তাপে পোড়াইতে হইবে তাহা মুখস্থ আছে এবং কত তাপে 'ডেড্ বার্ণট্' হইয়া জিপসম অকেজো হয় তাহা বেশ মনে আছে। কিন্তু—জিপসম দেখিয়াছেন কি? হাঁ, বোধ হয় দেখিয়া থাকিব। পোড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছাঁকিয়া দেখিয়াছিলেন কি, কেমন প্ল্যাষ্টর তৈরী হয়? না, তা দেখি নাই আর দেখার দরকার সে কথা ভাবিও নাই। এদেশে কত প্ল্যাষ্টর আমদানী হয় তাহার খবর রাখেন কি, আর এদেশে যে প্রচুর জিপসম পাওয়া যায় সে সংবাদ কি রাখেন? না, সে সব কথা কখন ভাবি নাই। ও সবে আমার দরকার নাই। অমুক কলেজ একটা ভেক্যান্সী আছে, সেইখানে প্রোফেসারির চেষ্টায় আছি।—এইত গেল আমার কেমিষ্ট-বন্ধুর কথা। আর যদি জিওলজিষ্ট ভায়াকে ঐ জিপসমের কথা জিজ্ঞাসা করি, তবে বেশ বলিয়া দিবেন, হাঁ, বেহারে ঐ অমুক যায়গায় আর পাঞ্জাবে অমুক যায়গায় পাওয়া যায়। সে গুলির ব্যবসায় চলিতেছে, কি quarried হইতেছে, তার কোন খবর রাখ কি? না, সে সব কে জানে।—কিন্তু এই জিপ্সম দেশে সহজেই পাওয়া যায়, ইহা হইতে প্ল্যাষ্টর তৈরীর চাইতে সোজা কাজ কিছুই নাই। এই যে অর্থাগমের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে, ঐ পথে কি আমাদের কেমিষ্ট ও জিওলজিষ্ট ভ্রাতাগণ একত্র প্রবেশ করিবেন না? সত্য, আমাদের অভিজ্ঞতা নাই, যে কার্য্যে হাত দিব তাহাই হয়ত পণ্ড হইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য ঐ ত সায়ান্স এসোসিয়েসনের ল্যাবোরেটরী রহিয়াছে, নাম মাত্র ফী দিয়া পরীক্ষা-কার্য্যগুলি করা যায়। আর ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা কাযে নামিতেই আইসে—মাষ্টারী বা ওকালতী করিলে কখনও আসিবে না। একার টাকায় যদি না কুলায়, আর, না কুলাইবারই কথা, তবে যৌথ কারবার করা যাইতে পারে। অনেকে হয়ত বুদ্ধিমানের ন্যায় হাসিয়া বলিবেন যে, বলা সোজা কিন্তু করা বড় কঠিন। সত্যই কঠিন, একটা শিল্প-ব্যবসা দাঁড় করান বড়ই কঠিন, বিপদ ও ভ্রান্তির অন্ত নাই—কিন্তু কঠিন বলিয়াই করিতে হইবে। অবশ্য সমস্ত খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ই শক্ত; জিপ্সমের মত সোজা কায কমই আছে,কিন্তু তবুও আছে—যেমন ধরুণ আরো সোজা কায "সোপষ্টোন" গুঁড়াইয়া টাক্ পাউডার তৈয়ারী করা। টাক্ পাউডারের কাট্তি খুব আছে; আর এহেন জিনিষও বিলাত হইতে আসিত। কিন্তু "ক্রোমাইট" হইতে বাইক্রোমেট্ তৈয়ারী করা উচ্চ অঙ্গের কার্য্য, এসব কাযের পথ স্বতন্ত্র। তবে যিনি এ পথের পথিক হইবেন, নাড়াচাড়া করিতে করিতেই পথের সন্ধান মিলিবে। এসব কেহ কাহাকেও শিখাইয়া দিতে পারে না, আগ্রহ হইলে নিজেই খুঁজিয়া লইতে হইবে। মূল্যবান খনিগুলির লীজ প্রায় সমস্তই বিদেশীর হাতে। মহীশূর সিংহভূমের ক্রোমাইট্; ভিজগাপটম্, ত্রিবাঙ্কুর ও সিংহল দেশের গ্রাফাইট; সালেমের ম্যাগ্নেসাইট্; মধ্য ভারত-বর্ষময় ম্যানগ্যানিজ খনি সকল, মূল্যবান্ উলফ্রামের খনি সকল, বক্সাইট, এস্বেস্টস্, এন্টিমণি, হরিতাল, মনছাল ইহাদের খনিসকল—বিদেশীরাই লীজ লইয়া কর্ম্ম করিতেছে ও বিদেশে রপ্তানি করিতেছে। কিন্তু কর্ম্মী পুরুষের দ্বার অবারিত, চেষ্টা করিলে এখনও ভিতর ভিতর প্রবেশ করিয়া কিম্বা উৎপন্ন খনিজ পদার্থ কিনিয়া লাভজনক শিল্প ব্যবসায়ের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। ঐ সালেমে ম্যাগ্নেসাইট্ পোড়াইয়া দগ্ধ ম্যাগ্নেসাইট্ বিলাতে পাঠান হয়, এবং এই প্রক্রিয়াতে প্রত্যহ ৫।৭ টন কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড্ হাওয়াতে ছাড়া পায়। এমন কি কেহ নাই যে ঐস্থানে গিয়া বসিয়া ঐ কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যবসায় খোলে? সোডাওয়াটার কলের সিলিণ্ডারগুলিতে ঐ গ্যাসই পোরা থাকে। এ ধরণের

ব্যবসায়ের experiment ছোট ল্যাবোরেটরীতে বসিয়া করা যায় না, কিন্তু ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে যোগাযোগ ঘটাইয়া experiment-এর সুবিধা করা যায়। গিরিডিতে রেল কোম্পানি কারখানা খুলিয়া কোক্ পোড়াইতেছে ও উৎপন্ন গ্যাস হইতে এমনিয়া সাল্‌ফেট্ করিতেছে, এ দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের সাম্‌নে থাকা সত্ত্বেও একটী ঐ ধরণের দেশী কারবার প্রতিষ্ঠিত হইল না।

আজকাল ইন্‌ক্যান্‌ডেসেন্ট ম্যাণ্ট্‌ল্ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তাহার কারণ জর্ম্মণি হইতে ঐগুলি আসিত এবং অনেকটা জর্ম্মণির একচেটিয়া ছিল। ভঙ্গপ্রবণ ম্যাণ্ট্‌ল্ ছুঁইতে ভয় হইতে পারে কিন্তু জিনিষটাতে ভয়াবহ কিছুই নাই। প্রথমতঃ কার্পাস অথবা রামি ফাইবারের তৈরী সূতা দ্বারা নলের মত জাল বুনান হয়। সেগুলিকে পরিষ্কার করিয়া, টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া, মাথার দিকটা এসবেস্‌টস্ সূতায় বাঁধা হয়, তারপর থোরিয়াম ও সিরিয়াম নাইট্রেটের জলে ভিজান হয়। তারপরে শুকাইয়া পোড়াইলেই ম্যাণ্টল্ হইল। উহাকে স্থানান্তরে পাঠাইতে ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া একবার সেলুলইড সল্যুশনে ডুবাইয়া লইলেই হইল। ম্যাণ্ট্‌লের প্রধান উপকরণ থোরিয়ামের জন্যই একথাগুলি বলিলাম। মোনাজাইট্ নামক খনিজ পদার্থে থোরিয়াম ও সিরিয়াম আছে। পূর্ব্বে কেবল ব্রেজিল প্রদেশের মোনাজাইট্ ও মোনাডাইট বালুকা হইতে থোরিয়াম নাইট্রেট প্রস্তুত হইত। কিছু দিন হইল ত্রিবঙ্কুরে মোনাজাইট পাওয়া গিয়াছে। এই মোনাজাইটে থোরিয়ামের ভাগ ব্রেজিল-মোনাজাইটের ভাগের প্রায় দ্বিগুণ। জর্ম্মণি হইতে সিণ্ডিকেট খুলিয়া ত্রিবঙ্কুরের মোনাজাইট লীজ্ লয় এবং উৎপন্ন মোনাজাইট্ জর্ম্মণিতে প্রেরিত হইতেছিল। জর্ম্মণ যুদ্ধের জন্য ঐ কার্য্য প্রায় বন্ধ রহিয়াছে। কিছু কিছু থোরিয়াম্ নাইট্রেট্ কি আমাদের ভ্রাতারা তৈয়ারী করিতে পারেন না। একবৎসরে প্রায় ছয় লক্ষ টাকার মোনাজাইট এদেশ হইতে রপ্তানি হইয়াছে। ইহার অতি ক্ষুদ্রতম অংশের মোনাজাইট যদি আমরা দেশে রাখিয়া ম্যাণ্ট্‌ল্ তৈয়ারীতে লাগাইতে পারি, তবে ভারতবর্ষের সমস্ত ম্যাণ্ট্‌লের বাজার বোধ হয় সরবরাহ করিতে পারি। বোম্বের একটী দেশী কারবার ম্যাণ্টল্ করিতেছেন; কিন্তু বোধ হয় তাঁহারা তৈয়ারী থোরিয়াম নাইট্রেট্ কিনিয়া আনেন।

দেশমধ্যে খনিজ পদার্থ ব্যবহারের প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে, এ ক্ষেত্রে ভারতবাসী যে একেবারেই নাই তাহা নহে। জব্বলপুরে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক অনেকটা নিজের চেষ্টাতে সিমেণ্টের কারবার খুলিয়াছেন এবং ম্যাঙ্গানিজ ও বক্সাইট্ হইতে ব্লীচিং পাউডার ও এলুমিনিয়াম্ তৈয়ারী করিবেন এপ্রকার আশা আছে। কিন্তু এ সমস্ত প্রশংসনীয় উদ্দমেও একটী ক্ষোভ থাকিয়া যায় যে,এই সকল বৃহৎ অনুষ্ঠানে ভারতবাসীর পরিকল্পনা বা পরিচালনার হস্ত লক্ষিত হয় না। আমরা বরাবর ইংরেজের কাছে শুনিয়া আসিয়াছি যে, আমরা বৃহৎ অনুষ্ঠানের অনুপযুক্ত। শুনিয়া শুনিয়া আমরা নিজেরাও তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছি। আমাদিগকে এই প্রকার ভাবিতে শেখানতে বিদেশীর পূরা স্বার্থ। এবং বিদেশীর সুবিধার জন্য তাহাদের কর্তৃক প্রচারিত মিথ্যাটা আমরা এতদিন বালকের মত বিশ্বাসের সহিত পোষণ করিয়া আসিয়াছি। যাঁহাদের লৌহস্তম্ভের নির্ম্মাণ-কৌশল এখনও অনুকৃত হয় নাই, পরন্তু বিস্ময়ের কারণ হইয়া রহিয়াছে, যাঁহাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য জগতের শীর্ষে কল্পনার ও কর্ম্মকুশলতার আদর্শ হইয়া রহিয়াছে, সেই জাতি আজ আমরা নিজেকে এতদূর অশ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি যে আহারে, বিহারে, বসনে পর্য্যন্ত বিদেশীর অনুকরণ করিতেছি এবং ব্যবসায় বাণিজ্যাদি অর্থাগমের ব্যাপারে মুটে, মজুর ও কেরাণীর কর্ম্মমাত্র করিয়া স্বীকার করিতেছি,—না, আমাদের জাতির দ্বারা ইহার বেশী আর আশা করা যায় না।

পরিশেষে আজ এইটুকু আমি বলিতে চাই যে, আমি ইহা বেশ জানি, আমাদের মধ্যে এমন লোক বিস্তর আছেন যাঁহারা যে কোন জাতির শিল্পব্যবসায়ের-সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারেন। অসামান্য কৃতিপুরুষ থাকিতেও আমরা বড় একটা কিছু গড়িয়া

তুলিতে পারি নাই। কিন্তু আমার আশা আছে, আমরা যে শক্তির অনুভব করিতেছি তাহা আমাদিগকে গৌরবান্বিত ভবিষ্যতের পথে লইয়া যাইবে; আমাদের যুবকগণ গৌরব ও কল্যাণের পথেই একান্ত চিত্তে ধাবমান হইবেন। মুহূর্ত্তের ক্ষুধা, দৈনন্দিন পরিতাপ ও অভিমানকে চাপা দিয়া দেশের যুবকেরা স্থির কল্যাণের পথেই চলিবেন। শিক্ষিত যুবকগণের চেষ্টায় দেশ তাহার পরিচয় পাইবে ও দিবে। ভারতবাসী যে ক্ষেত্রেই সমস্ত হৃদয় মন দিয়া নামিয়াছে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছে। জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পথে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, ভারতবাসী তাঁহাদের সমকক্ষ হইয়াছে। শিল্প ব্যবসায়েও তাহাই হইবে; আর যাহাতে সেইরূপ হয় তাহাই আমাদের কর্ম্ম, তাহাই আমাদের আলোচনীয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ফরাসী গল্প। শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচী প্রণীত। কলিকাতা—কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত এবং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি ১৭৬ পৃষ্ঠা কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বাগচী কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত "ফরাসী গল্পে"র চারিটি গল্পই বেশ বাছা বাছা। সব গল্পগুলিই ঈষৎ বিষাদ-রঞ্জিত—একটু করুণরস-সিক্ত, ও বেশ হৃদয়গ্রাহী। অনুবাদের ভাষায় উৎকট বিলাতী গন্ধ নাই,--ভাষাটি বেশ সহজ সুন্দর; অনুবাদে গলদ্‌ঘর্ম্মের চিহ্ন লক্ষিত হয় না।

ফরাসী-গল্পের অনুবাদে একটা মুস্কিল এই, লোকের ও গ্রাম নগরাদির খটমটো নামগুলা পাঠকের পক্ষে বড়ই বিরক্তিকর। প্রত্যেক নামের কাছে আসিয়া হোঁচট্ খাইতে খাইতে গল্প পড়া আয়েসী সাধারণ পাঠকের পোষায় না। এই কারণে কাহারো কাহারো এইরূপ বিদেশী গল্প পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না, অথবা শেষ পর্য্যন্ত পড়িবার ধৈর্য্য থাকে না। তবে যিনি এই সমস্ত দেশ-কালের অপরিহার্য্য বাধা সহ্য করিতে পারিবেন, ভিতরের শাঁসটুকু খাইবার জন্য উপরের খোলাটা ভাঙ্গিবার কষ্ট স্বীকার করিতে পারিবেন, তাঁহার কষ্ট যে সার্থক হইবে তাহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে এই গ্রন্থে তেমন-কোন্ দুরুচ্চার্য্য নাম নাই। আসল কথা, মানব স্বভাব সর্ব্বত্রই সমান; তাই এই সুরচিত বিদেশী গল্পগুলি সহজেই আমাদের মর্ম্মস্পর্শ করে। এই গল্পগুলি পাঠ করিয়া পাঠক বেশ একটু আনন্দ পাইবেন, ইহা নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে।

প্রথম গল্পটির প্রথম পরিচ্ছেদের স্থানে স্থানে ভাষার ব্যবহারে একটু শৈথিল্য ও অনবধানতা প্রকাশ পায়। স্থানে স্থানে "ঝাটপোরে" ও "পোষাকী" বাঙ্গালার অসঙ্গত মিশ্রণ ঘটিয়াছে। এইরূপ প্রয়োগ রুচিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এই দোষ কেবল প্রথম পরিচ্ছেদেই লক্ষ্য করা যায়—অন্যত্র নাই।

মিশ্রণের দৃষ্টান্ত যথা:—

"আপনি কে এসে দাঁড়িয়েছেন তা জানিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন।"

"আমাদের ছোট বাড়ীটির উপরে সেই সব বরফ এসে পড়িল।"

"যেমন আমার মাকে লইয়া বাহির হইবেন, অমনি হুড়হুড় করে বাড়ী ভেঙ্গে তাঁহাদের উপর পড়িল।"

"বছরের পর বছর চলিয়া গিয়াছে কিন্তু আল্‌পসের বিরাট গাম্ভীর্য্য টলেনি।"

এই সামান্য ত্রুটিগুলি মার্জ্জনীয়,—দ্বিতীয় সংস্করণে সহজেই সংশোধিত হইতে পারিবে।

ফল কথা, এই গ্রন্থখানি বেশ সুখপাঠ্য। ইহার ছাপা ও মলাটটিও সুন্দর।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নূরজাহান।—(ইতিহাস) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, "মানসী" প্রেসে মুদ্রিত এবং কর্ণওয়ালিস্ বিল্ডিং হইতে মিত্র এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পাঁচখানি হাফটোন চিত্র সংযুক্ত। মূল্য ৸৹

বঙ্গভাষার এমন একটা যুগ গিয়াছে যখন স্কুল কলেজের ছাত্র ব্যতীত সাধারণ পাঠকের খাঁটি ইতিহাসে রুচি ছিল না। তাই উপন্যাসিকের দল ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া সত্য ঘটনা ও কল্পনায় মিশাইয়া একরূপ "মিক্‌শ্চার" করিয়া সাধারণ

পাঠকের সম্মুখে ধরিতেন। যে সকল পাঠকের সত্যানুসন্ধিৎসা বা জ্ঞান-পিপাসা ছিল তাঁহারা ঐতিহাসিক উপন্যাসে তৃপ্ত হইতেন না। যিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম পথ-প্রদর্শক, তিনি তাই বাঙ্গালী জাতিকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা প্রকৃত ইতিহাস চর্চ্চা কর।" যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিলেন তাঁহারা আজ সত্যই ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত হইয়া বাঙ্গালীর নাম জগতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছেন।

• "নূরজহান"-এর গ্রন্থকার শ্রীমান ব্রজেন্দ্রনাথ মুসলমান যুগ লইয়া ইতিহাস চর্চ্চায় ব্যাপৃত আছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে "বাঙ্গালার বেগম" লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। নূরজাহানের জীবন-কথা প্রকৃত ইতিহাস হইলেও উপন্যাস অপেক্ষা কম বিচিত্র নহে। সেই নূরজাহানের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে হইলে পাঠককে শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথের "নূরজহান" পাঠ করিতে হইবে। ইহা ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে, খাঁটি বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও গ্রন্থকারকে ইহার জন্য অল্প পরিশ্রম করিতে হয় নাই। পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রদত্ত প্রমাণপঞ্জী হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, পুস্তকখানি লিখিবার জন্য গ্রন্থকারকে অন্ততঃ ১০ খানি ফার্সি ও ইংরেজী ইতিহাস হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

"নূরজহানের" ভাষা মার্জ্জিত ও সুমিষ্ট। তবে কোথাও কোথাও অনুবাদে ইংরেজীর গন্ধ আছে। খুব মনোযোগ সহকারে পাঠ না করিলে তাহা ধরা যায় না। ভাষার আর একটি গুণ এই যে, ইহা সাধু হইলেও, ঘটনা বুঝিতে পাঠককে ভাষার জন্য কোথাও এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে হইবে না। ইহা ঠিক ইতিহাসেরই উপযোগী হইয়াছে।

তবে "নূরজহানে"র গ্রন্থকার ব্যক্তি ও স্থানের নামের বর্ণবিন্যাসে বাঙ্গালার চিরাচরিত পন্থা ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া আমার আপত্তি আছে। গ্রন্থকার এই নূতন পন্থা অবলম্বন করিবার কোন হেতু প্রদর্শন করেন নাই। • •

আমরা আবাল্য বাঙ্গালায় পড়িয়া আসিয়াছি—"আকবর," "সের আফগান", "নূরজাহান," "জাহাঙ্গীর," "মহম্মদ" ইত্যাদি। কিন্তু গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"অকবর," "শের অফকন্," "নূর-জহান," "জহাঙ্গীর", "মুহম্মদ" ইত্যাদি। যেখানে গ্রন্থকার "আকার" স্থানে "অকার" করিয়াছেন সেখানে ফার্সিতে কিছুই থাকে না, শিক্ষকের উচ্চারণের অনুকরণে উচ্চারণ করিতে হয়। আমরা "অ" উচ্চারণ করিতে কণ্ঠ ও ওষ্ঠ উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করি, কিন্তু শুধু কণ্ঠের সাহায্য গ্রহণ করিয়া "অ" উচ্চারণ করিতে হইলে মুখবিবর সামান্য খুলিয়া ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিন্মাত্র না নাড়িয়া কণ্ঠ হইতে "অ" উচ্চারণ করিলে যাহা হইবে, তাহাই প্রকৃত "অ"। "অ" কারের এরূপ উচ্চারণ বাঙ্গালীর সাধারণ উচ্চারিত "অ" ও "আ"র মাঝামাঝি। ইহা "আ"কারের হ্রস্ব উচ্চারণ সুতরাং "জাহান" লিখিলে বরং প্রকৃত উচ্চারণের কাছাকাছি হয়। "জহান" লিখিলে যদি বাঙ্গালীর সাধারণ উচ্চারণের ন্যায় উচ্চারণ করা হয় তবে প্রকৃত উচ্চারণ হইতে বহুদূরে পড়িবে। আরও একটি কথা বলিবার আছে—বাঙ্গালার "কৃষ্ণনগর" ইংরেজীতে "কৃষ্ণগর"। ভারতবর্ষের স্থানের নাম ইংরেজীতে লিখিবার বর্ত্তমান প্রণালী যখন প্রচলিত হইল, তখন নিয়ম হইল, যে নামগুলির ইংরেজী বানান্ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহা আর বদলাইয়া কাজ নাই। সেইরূপ আমরাও চাহি যে আমাদের "নূরজাহান", "জাহাঙ্গীর", "আকবর", "মহম্মদ" থাকুক। এ সকল নাম পরিবর্ত্তনে কোনরূপ লাভ হইবে না।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

মাধবী।—(কবিতা গ্রন্থ) শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত। চট্টগ্রাম, ছুনহরা যতীশ লাইব্রেরী হইতে শ্রীমণীন্দ্রবিনোদ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ।৵০ + ১০০ পৃষ্ঠা—মূল্য ১৲।

এখানি কবিতা-পুস্তক। লেখিকার ভাষায় দখল আছে, ভাবও স্নিগ্ধ এবং পবিত্র—তবে এখনো তাহা পরিপক্ক হয় নাই, কালে হইতে পারে। সমস্ত কবিতাগুলি ভগবানের উদ্দেশে লিখিত; স্থানে স্থানে বেশ কবিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায়। তবে ছন্দে ও মিলে লেখিকার তেমন শক্তি বা অধিকার কোথাও দেখিতে পাই-লাম না। বিশেষতঃ কবিতায় মিল যদি দুষ্ট হয়, তাহা হইলে অনেক স্থলে ভাল ভাব ও কবিত্বও যেন বিস্বাদ ঠেকে। আমরা ২।১টি মাত্র উদাহরণ দিতেছি—(পৃঃ ৩৩)—সহেনা + ছলনা, যাতনা + করুণা, (৩৮) রেখা + মাখা ইত্যাদি। অনেকগুলি কবিতায় অনাবশ্যক এবং অসংগত দীর্ঘতাও লক্ষিত হয়—তাহাতে কবিতা জমাট বাঁধে নাই। আরও মনে হয়, একই ভাব ভিন্ন কথার আবরণে একাধিক কবিতায় লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠকের মনকে অকারণ ভারাক্রান্ত করে। কবিতা সন্নিবেশ কালে এ গুলির পানে একটু দৃষ্টি রাখিলে পুস্তকখানি অপেক্ষা-কৃত ক্ষুদ্র হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু আরও ভাল হইতে পারিত।

লেখিকার হাত আছে, ক্ষমতাও আছে, কল্পনাও উৎকট নয়। বলা বাহুল্য যে গ্রন্থখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই ইহার সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম।

পুনশ্চ। এই সমালোচনা লিখিত হইলে শুনিলাম, পুস্তকখানি

প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পরেই লেখিকা ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। পরিতাপের বিষয়।

"ঋতুরাজ।"

হরপার্ব্বতী। শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকে চারিখানি পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি আছে। কাপড়ে বাঁধাই, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২৫৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।৷০।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পৌরাণিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।—দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ—মহাদেবের ক্রোধ—যজ্ঞ নষ্ট—সতী-শোকে শিবের বিশ্বকার্য্যে ঔদাসীন্য—শিবের তপ আরম্ভ গিরিরাজগৃহে সতীর পুনর্জ্জন্ম—মনোমত পতিলাভ আকাঙ্ক্ষায় শিবের আরাধনা—অবশেষে ত্রিকালজ্ঞ ভোলা মহেশ্বরের সহিত মিলন—এই সমস্ত ঘটনাই গল্পাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সত্যচরণ বাবু মামুলী প্রথায় রাবিশ উপন্যাস রচনা না করিয়া যে পৌরাণিক কাহিনীতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—ইহা সুখের বিষয়। তবে দুই এক বিষয়ে আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। পুস্তকখানির প্রতি পৃষ্ঠায় বর্ণাশুদ্ধির ছড়াছড়ি। স্থানে স্থানে ভাসা ইংরাজী-বাঙ্গালার আকার ধারণ করিয়াছে, 'গুরুচণ্ডালী' দোষ ঘটিয়াছে।

আশা করি গ্রন্থকার পরবর্ত্তী সংস্করণে এই সকল ভ্রম সংশোধন করিবেন।

"দেবদত্ত।"

"সইমা"—ও "ছোটবউ"। শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ প্রণীত। কর্ণওয়ালিস বিল্ডিং হইতে মিত্র এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। "সইমা" রেশমী কাপড়ে বাঁধাই, ১১৩ পৃষ্ঠা। ইহাতে সইমা, গৃহলক্ষ্মী প্রভৃতি নয়টী ক্ষুদ্র গল্প আছে। "ছোটবউ" কাগজে বাঁধা ৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য যথাক্রমে ১।০ ও ।৵০

আধুনিক প্রথানুসারে "সইমার" প্রারম্ভে বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এক ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

ফণীবাবুর গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে, সে গুলি বড়ই ভাবপ্রবণ ও করুণরস-পূর্ণ। ভাল গল্প বারবার পড়িয়াও ক্লান্তিবোধ হয় না। যতবার পড়া যায়, তাহাতে যেন নূতন কোন মিষ্টত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। বিষবৃক্ষ ৫০ বার পড়িয়াছি, পড়া শেষ হয় নাই। চন্দ্রশেখর বোধ হয় ১০০ বার পড়িয়াছি তৃপ্তি হয় নাই। এটী কি গুণ তাহা জানিনা, কিন্তু ইহা জানি, এ গুণ যে গল্পে যত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান, সে গল্প তত শ্রেষ্ঠ। "সইমা"র মধ্যে অনেকগুলি গল্প আছে যাহা একাধিকবার পড়িবার যোগ্য।

তাহার পর আর একটী কথা—যাহা জলধর বাবু বিশেষ-ভাবে লিখিয়াছেন—এস্থলে আমরা পুনরুল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—"পাপের চিত্র দেখাইয়া তাহার বিষময় ফল দেখাইয়া, লোককে সাধুতার প্রতি অনুরাগী করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা, পুণ্য ও পবিত্রতার, সাধুর আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করা কি প্রার্থনীয় নহে?" প্রথমটী যেন সেকালের গুরু মহাশয়ের পাঠশালা। দ্বিতীয়টী যেন কিণ্ডার-গার্টেন। ফণীবাবুও শেষোক্ত প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন—এবং সফলকাম হইয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি।

"সইমা," "গৃহলক্ষ্মী," "হৃদয়ের পরিচয়," "অষ্টমীর সন্ধ্যা," "স্নেহের পরশ," গল্প কয়টী সুন্দর হইয়াছে। সুহাস ও প্রফুল্লকে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অনেক উচ্চ আদর্শে অঙ্কিত করা হইয়াছে। এইরূপ আদর্শ বরেণ্য ও প্রশংসনীয়—তবে যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তাহা বলিতে পারি না। দুটী একটী গল্প রবিবাবুর ধরণে আরম্ভ ও মধ্যপথে শেষ হইলেও রচনা প্রণালীটী লেখকের নিজস্ব, ভাষা সরল ও সম্পূর্ণ ভাবে কুরুচি-বর্জ্জিত।

ফণীবাবুর উপর বঙ্গ সাহিত্য অনেক দাবী রাখে। তাঁহাকে ঠিক সমালোচনা হিসাবে নহে, ভবিষ্যৎ লেখক হিসাবে, আমরা একটী কথা বলিতে চাই। ছোট গল্প যেন যারত-পক্ষে বিয়োগান্ত না হয়। চারিদিকে নানারূপ কষ্ট, তাহার উপর বিশ্রাম সময়েও যদি কাল্পনিক ব্যক্তির জন্য হা হুতাশ করিতে হয়, তাহা হইলে আর বাঁচা যায় হয়। সংস্কৃত নাট্যকারেরা এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা বেশী সমঝদার ছিলেন। কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিতে, পারেন, যখন কপালকুণ্ডলা, Romeo and Juliet, King Lear সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত—তখন ক্ষুদ্র গল্পই বা বিয়োগান্ত না হইবে কেন? আমার উত্তর এই—হ্যাটটী মাথায় দিলেই সমস্ত পোষাকটী খাঁটী সাহেবের মত হওয়া দরকার, হ্যাটটী মাথায় না থাকিলে পোষাক যেমন তেমন হইলেও চলিতে পারে। বিয়োগান্ত লিখিতে হইলে, গল্পটী সর্ব্বাংশে নিখুঁত হওয়া আবশ্যক, মাঝামাঝি গোছের হইলে চলিবে না।

ছোট বউ। ইহাও ছোট গল্পের শ্রেণীভুক্ত। উপাখ্যান-ভাগ অতি সুন্দর। ছোট বউএর চরিত্র সুনিপুণ ভাবে অঙ্কিত—যেন একটী জীবন্ত ছবি। তবে উপাখ্যানাংশে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বিন্দুর ছেলের" ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল।

"অঘাসুর।"

মুরলী।—(সঙ্গীত) শ্রীসারদাপ্রসাদ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা শাস্ত্রপ্রচার প্রেসে মুদ্রিত এবং ২নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে জে, এন, বোস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ৫৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥৹

এখানি কবিতারই বহি, তবে প্রত্যেক কবিতায় সুর-তাল সংযুক্ত আছে, সুতরাং এগুলিকে সঙ্গীত বলিতে হইল। সকল-গুলি ধর্ম্মভাব লইয়া রচিত। মাঝে মাঝে এক একটি গান ভাল লাগিল, কিন্তু বেশীর ভাগ গানেই কোনও রচনানৈপুণ্য পাওয়া গেল না।

তারার হার। (কবিতা গ্রন্থ) শ্রীচণ্ডীদাস মজুমদার, বি-এ, বিদ্যারত্ন প্রণীত। কলিকাতা,ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল হইতে শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৮২ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥৹

নূতন কবির কাব্য সমালোচনার্থ পাইলে আমরা ভয়ে ভয়ে তাহার পত্রোদ্ঘাটন করিয়া থাকি। এই গ্রন্থখানির প্রথম কবিতা "শ্রীশ্রীসরস্বতী বন্দনা" পড়িয়াই বুঝিলাম, ভয়ের কোন কারণ নাই। অনেকগুলি কবিতাই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ভাষা ভাল, ছন্দের প্রবাহ আছে, স্থানে স্থানে কবিত্বও লক্ষ্য করিলাম—পূর্ব্বগামী কবিগণের কবিতার চর্ব্বিত চর্ব্বণ নহে। আর একটা মস্ত কথা এই যে, কবিতাগুলি বেশ বোঝা যায়—ভাবগুলি স্পষ্ট,—ধোঁয়াটে নহে। মাঝে মাঝে ভাবের মুন্সিয়ানাও আছে। একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাই।

কোকিল।

আকৃতি প্রকৃতি তব নিরখি নয়নে,
মনে ভাবি তুমি, পিক, শ্রীনন্দ-নন্দন।
কুহুরবে, শুনি সেই মুরলীর ধ্বনি;
সেই ঘনশ্যামরূপ মানসমোহন;
শৈশবে পরের ঘরে বসতি তোমার,
গোকুলে গোপের গৃহে বাসুদেব যথা;
কোন মথুরায় তুমি কর পলায়ন
সবার পরাণে দিয়ে দুর্ব্বিসহ ব্যথা?
কখনও তমালশাখে বসি গাহ গান,
কভু মঞ্জু কুঞ্জবনে কর বিচরণ,
কখনও বিনয়নম্র মধুর বচনে
মানিনী কামিনী-মান কহ ভঞ্জন।

"তারার হার" বোধ হয় চণ্ডীদাস বাবুর প্রথম কবিতা গ্রন্থ। তাঁহার দ্বিতীয় কবিতা গ্রন্থ দেখিবার বাসনা রহিল।

মুরজ-মুরলী। (কবিতা গ্রন্থ) শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। কলিকাতা লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৭৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥৹

মলাটে বিজ্ঞাপন দেখিলাম মুনীন্দ্র বাবু অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই মুরজ-মুরলী বহিখানিতে তিনি কিন্তু তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই। সকল কবিতার বিষয় নির্ব্বাচনে তিনি পটুতার পরিচয় দেন নাই। তাঁহার "ভেক-গাথা" পড়িয়া Pickwick Papers‌এ প্রকাশিত Lines to an expiring frog কবিতাটি মনে পড়িল। "ডাক্তার বাবু বলছ বটে আমি রোগে কাবু, তবু আমি পারিনা গো খেতে জলসাবু" —এ সব লইয়াও কি কবিতা হয়? কোন কোন কবিতায় একটু ভাবের ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু লেখক সেগুলিকে ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। এই গ্রন্থে কেবল দুইটি কবিতা আমাদের ভাল লাগিয়াছে—উৎসর্গের কবিতাটি এবং সর্ব্বশেষ কবিতা, "রেণুর স্মৃতি।" উভয় কবিতাই গ্রন্থকারের পরলোকগতা শিশুকন্যা রেণুর উদ্দেশে রচিত, পড়িলে চোখে জল আসে।

অনার্য্যের উপকথা। (শিশুপাঠ্য) শ্রীশ্যামাচরণ দে প্রণীত। কলিকাতা মেট্‌কাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত এবং ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে সিটি বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২২০ পৃষ্ঠা, কাপড়ে হাফ বাইণ্ডিং মূল্য ৸৹

লুসাই-কুকি গারো কাছারী সাঁওতাল ভীল প্রভৃতি জাতি-গণের মধ্যে প্রচলিত অনেকগুলি উপকথার সংগ্রহ। আর্ট পেপারে ছাপা কয়েকখানি সুমুদ্রিত চিত্রও আছে। ছাপা বাঁধাই ও ছবির হিসাবে ৸৹ মূল্য খুব সুলভ হইয়াছে সন্দেহ নাই; বালকবালিকাগণ এ পুস্তকখানি পাঠে আমোদ পাইবে।

বিদেশী পৌরাণিকী। (শিশুপাঠ্য) শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী প্রণীত। ঢাকা "ভারতমহিলা" প্রেসে মুদ্রিত এবং "সাধনা লাইব্রেরী" হইতে শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৮৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ে হাফ্ বাইণ্ডিং, মূল্য ॥৹

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "শিশু হৃদয়কে বিশ্বের সৌন্দর্য্যের সহিত যোগ করিয়া দিতে হইবে; সে শুধু স্বদেশীয় কাহিনীরই রসসিঞ্চন লাভ করিবে আর বিদেশীয় কাহিনীর সুধাধারা তাহার কাছে অজ্ঞাত থাকিবে, এ অবস্থা তাহার হৃদয়কে সুস্থ ও সম্প্রসারিত করিবার পক্ষে অনুকূল নহে।" তাই য়ুরোপীয় পুরাণাদি অন্তর্গত কতকগুলি গল্প সংগ্রহ করিয়া তিনি এই পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। গল্পগুলি সুলিখিত; কয়েক-

খানি হাফ্‌টোন চিত্রও আছে। পুস্তকখানি শিশুজনের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

শুভদৃষ্টি। (গল্প) শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা "মানসী" প্রেসে মুদ্রিত ও অন্নদা বুকষ্টল হইতে শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৩ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ॥৹

এখানি 'অন্নদাবুকষ্টলে'র আট আনা সংস্করণের প্রথম গ্রন্থ।

আলোচ্য পুস্তকখানি আটটি গল্পের সমষ্টি। সমস্ত গল্পগুলিই পূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিকপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

ছোট গল্পে শ্রীপতি বাবুর বেশ হাত আছে। চর্চ্চা রাখিলে ক্রমে তিনি আমাদিগকে আরও ভাল জিনিষ দিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়।

"নিদয়া" গল্পটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু আপত্তি আছে। স্থিধর নামক একজন কৃষক, বুড়া বয়সে চঞ্চলা নাম্নী কোনও বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিল। স্থিধর চঞ্চলাকে খুব ভালবাসে কিন্তু চঞ্চলা তাহার বৃদ্ধ স্বামীকে গ্রাহ্য করে না। স্থিধরের তজ্জন্য বড় অভিমান।—উভয়ের মুখে যে সকল কথাবার্ত্তা লেখক বসাইয়াছেন, তাহা কিন্তু মোটেই "চাষাভুষা"র কথাবার্ত্তা নহে। স্থিধর যেন কলেজপাঠী যুবক এবং চঞ্চলা যেন নভেলপড়া নব-যুবতী, এইরূপ ভাবেই তাহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছে—ইহা ঠিক হয় নাই। চঞ্চলার জন্য গহনা সংগ্রহ করিতে গিয়া, বাড়ী ফিরিয়া স্থিধরের সন্ন্যাস রোগ হইল। মরিবার সময় সে বলিতে লাগিল—"কিন্তু কেমন—বুক ভেঙ্গে গেল,—চেপে রাখতে পার্‌লাম না তবু চঞ্চল। তোকে ছেড়ে যেতেও ইচ্ছা নাই। এখনও ইচ্ছা হচ্চে, আমার এই ভাঙ্গা বুকের রক্ত দিয়েই তোর পা দুখানি রাঙিয়ে দিয়ে যাই।"—স্থিধর কি রবিবাবুর কাব্য-গ্রন্থাবলী পড়িয়াছিল?—আর একটা কথা। স্বামীর মৃত্যুর পর চঞ্চলা নিজ বস্ত্রে নিজে আগুন ধরাইয়া দিয়া পুড়িয়া মরিল। আজকালকার কেরাসিন তৈলের সাহায্যে বাঙ্গালী রমণীর আত্মহত্যার যুগে, লেখক এ চিত্র আঁকিয়া ভাল করেন নাই। আত্মহত্যা করা মহাপাপ—সে মহাপাপের চিত্র যদি আঁকিতেই হয়, তবে এমনভাবে আঁকিতে হইবে যে তাহা দেখিয়া পাঠকের মনে যেন যথেষ্ট ঘৃণার উদয় হয়—এ কার্য্যকে যেন অতি গর্হিত বলিয়াই তাহাদের ধারণা জন্মে। আত্মহত্যা ব্যাপারটি বাহাদুরী বা বাহবার বিষয় স্বরূপ চিত্রিত করা কোনও লেখকের উচিত নহে।

সাহিত্য-সমাচার

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের "আশীর্ব্বাদ" নামক একখানি সচিত্র গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য পাঁচসিকা। তাঁহার "দশদিন" নামক আর একখানি সচিত্র গল্পগ্রন্থ "মানসী" প্রেসে ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম্-এ, বি-এল প্রণীত একখানি নূতন গল্পগ্রন্থ যন্ত্রস্থ, পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "মন্দিরা" নামক কবিতা গ্রন্থের ২৫০ খণ্ড ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে"র হস্তে প্রদান করিয়াছেন। পরিষৎ ঐ পুস্তকগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যোমকেশ বাবুর পরিবারবর্গকে দিবেন। প্রতি খণ্ড পুস্তকের মূল্য ॥৵৹।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত, মহাকবি শেক্সপিয়রের "ওথেলো" নাটকখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতেছেন, শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু সি-আই-ই মহাশয়কে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। বসুজ মহাশয় উক্ত পদ গ্রহণে স্বীকৃতও হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী প্রণীত "রাকা" নামে একখানি কবিতা-গ্রন্থ পূজার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইবে।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের শরীর মাস খানেক হইতে কিছু অসুস্থ হইয়াছিল। সেই কারণে এ সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে তাঁহার শিরোমণির দর্শন পাওয়া গেল না। আশা করিতেছি, কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে শিরোমণি মহাশয় আবার আসরে নামিবেন।



যৌবনে যোগিনী

চিত্রকর—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

৮ম বর্ষ ২য় খণ্ড	আশ্বিন ১৩২৩ সাল	২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা

জৌগড়

ভারতবর্ষের যে সাতটি বিভিন্ন স্থানে মৌর্য্যরাজ অশোকের 'চতুর্দ্দশ গিরিলিপি' আবিষ্কৃত হইয়াছে, 'জৌগড়' তাহাদের অন্যতম। তিন বৎসর পূর্ব্বে গ্রীষ্মাবকাশে মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বেরহামপুর নামক স্থানে মদীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট গিয়াছিলাম। তিনি তখন বেরহামপুর সাব্‌ডিভিজনের সরকারী ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে জৌগড় ঐ সাবডিভিজনেরই অন্তর্গত এবং আমার ইচ্ছা হইলে ঐ স্থানে অশোকের শিলালিপি দেখিতে যাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে।* জৌগড়-যাত্রা নিতান্ত সহজ নহে এবং স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীর সাহায্য ব্যতিরেকে এক প্রকার অসম্ভব। সুতরাং উপস্থিত সুযোগ পরিত্যাগ করা কোনমতেই যুক্তি-যুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া আমি জৌগড়ে যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। বহুদিন হইতেই অশোকের গিরিলিপি প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, এই-রূপ অপ্রত্যাশিত উপায়ে তাহা চরিতার্থ হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। সুতরাং পদব্রজে দশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে শুনিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলাম না।

একদিন বেলা ৫টার সময় দুই ভ্রাতায় বেরহামপুর হইতে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ১২ মাইল দূরবর্ত্তী "টাঙ্গানাপল্লী" নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এইখানে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের এক ডাক-বাঙ্গলা ছিল। রাত্রিতে সেইখানে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

ডাকবাঙ্গলায় পা দিতে দিতেই প্রাণ-বিয়োগের উপক্রম হইয়াছিল। আমি কেবলমাত্র পৌঁছিয়া ডাকবাঙ্গলার বাহিরে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিতে যাইতেছি, এমন সময় "মহাপ্রভু, বিট বিট"—এই ভীষণ চীৎকার শুনিয়া, চীৎকারের অর্থ কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, সভয়ে কয়েকপদ পশ্চাতে সরিয়া আসিলাম। তখন আমার দাদার যে মাদ্রাজী পিয়ন ঐরূপ চীৎকার করিয়াছিল, সে দেখাইয়া দিল, আমি যে চেয়ারে উপবেশন করিতে যাইতেছিলাম, আমার পূর্ব্ব হইতেই তথায় আর একটি জীবের অধিবেশন হইয়াছিল—এটি

একটি বৃহদাকার বৃশ্চিক! তাহার অধিকৃত স্থানে উপবেশন করিতে গেলে সে আর কিছু না করুক, অন্ততঃ কবি-বর্ণিত বৃশ্চিকদংশন যাতনা যে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করাইয়া দিত,সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাস্তবিক, অত বড় বৃশ্চিক আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। স্থানীয় পিয়নটি বলিল যে, ইহার দংশনে বহুদিনব্যাপী নিরতিশয় যন্ত্রণা তো হয়ই, সময়ে সময়ে লোকের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। বৃশ্চিকটি মারিয়া ফেলা হইল, কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মনের আতঙ্ক দূর হইল না। ঐ দেশে বৃশ্চিককে 'বিট' বলে, আর, কোন মাননীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিতে হইলে 'মহাপ্রভু' শব্দ ব্যবহার করে। বৃশ্চিকটির দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্তই পিয়ন ঐরূপ চীৎকার করিয়াছিল। ইহা তখন বুঝিতে পারি নাই, পরে শুনিয়াছিলাম।

টাঙ্গানাপল্লীতে আমরা ৫।৬ দিন অবস্থান করিলাম। চেয়ার খাট প্রভৃতি আসবাবপত্র, ঠাকুর চাকর ও আহার্য্য দ্রব্যাদি পূর্ব্বেই বেরহামপুর হইতে প্রেরিত হইয়াছিল, সুতরাং কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নাই। ঐ দেশীয় ডাকবাঙ্গলাতে আহারাদির কোন ব্যবস্থা নাই, সুতরাং সমুদয় ব্যবস্থাই নিজেদের করিতে হয়।

টাঙ্গানাপল্লী একটি অতি সুন্দর নিভৃত পল্লী। কয়েক ঘর কৃষক ব্যতীত অন্য কোন লোকের বসতি নাই। চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ মাঠ, আর তাহার মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত—বাঙ্গালীর চক্ষে এই দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়। কয়েকদিন বেশ আনন্দে কাটান গেল, কেবল সর্পভীতি এই আনন্দের পূর্ণতার ব্যাঘাত ঘটাইত। এত সাপ আমি আর কোথাও দেখি নাই। ডাক বাঙ্গলার পাশেই গবর্ণমেন্টের 'Irrigation Canal' বা কৃষিখাত। এই খাতের মধ্যে কত সর্পের ক্রীড়া দেখিয়াছি। একদিন রান্নাঘরে একটি অতি ভয়ানক সাপ মারা হইল। আর একদিন খাতের পাড় দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি, একটি গাছের তল দিয়া যাইতে হইবে, এমন সময় দেখা গেল যে ঠিক রাস্তার উপরে গাছের এক ডালে একটি সাপ ফণা ধরিয়া বসিয়া আছে। এই সাপের ভয়ে প্রত্যহ রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে, ঘরের মধ্যে, বিশেষতঃ খাটের চারিপাশে বহু পরিমাণ কার্ব্বলিক এসিড ঢালা হইত।

টাঙ্গানাপল্লীতে যাইয়া শুনিলাম যে জোগড়ে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং সেখানে যাওয়া সম্বন্ধে দাদা একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে জিনিষপত্র টাঙ্গানা-পল্লীতেই থাকিবে, আমরা জোগড়ে গিয়া শিলালিপি দেখিয়াই ফিরিয়া আসিব; আহার্য্যাদি তো দূরের কথা, জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করিব না।

টাঙ্গানাপল্লী হইতে জোগড় ত্রিশ মাইল। প্রথম পঁচিশ মাইল ভাল রাস্তা আছে, তাহারই পরে ঋষিকুল্যা নদী। নদীর ওপারে রাস্তা নাই, মাঠের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া পাঁচ মাইল গেলে জোগড়ে পৌঁছান যায়।

খুব ভোরে টাঙ্গানাপল্লী হইতে মোটর সাইকেলে আমরা রওয়ানা হইলাম। দাদা সাইকেল চালাইতে লাগিলেন, আমি এক মোটা লাঠি লইয়া 'সাইড কারে' উপবেশন করিলাম। কারণ, এ অঞ্চলে রাস্তার দুই পার্শ্বে অনেক মহিষ চরে; মোটর সাইকেলের শব্দ শুনিলেই ইহারা শিং উঁচাইয়া গুঁতা মারিতে আসে। দূর হইতে লাঠি উঠাইলে ইহারা পলাইয়া যায়, অন্য কোন রকমে ইহাদিগকে তাড়ান যায় না। অনেক সময় এক একটা মহিষ এমনভাবে গাড়ী আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসে যে, গাড়ী থামাইয়া লাঠি দিয়া তাহাদিগকে তাড়াইতে হয়।

প্রায় ৬॥ টার সময় ২৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ঋষিকুল্যা নদীতীরে আমরা উপনীত হইলাম। ঋষিকুল্যা নদী অতি প্রাচীন কাল হইতেই পবিত্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। মহাভারতে বনপর্ব্বে 'পুলস্ত্য-ভীষণ সংবাদ' উপলক্ষ করিয়া দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট যে ভারতের তীর্থাদির বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে। এই উপলক্ষে উক্ত হইয়াছে—

"ঋষিকুল্যাং সমাসাদ্য নরঃ স্নাত্বা বিকল্মষঃ।
দেবান্ পিতৄংশ্চার্চ্চয়িত্বা ঋষিলোকং প্রপদ্যতে॥

যদি তত্র বসেন্মাসং শাকাহারো নরাধিপ।
ভৃগুতুঙ্গং সমাসাদ্য বাজিমেধফলং লভেৎ॥"

বনপর্ব্ব ৮৪।৪৮ ৪৯ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৩৬৩)

পূর্ব্ব হইতেই গো-যানের ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে নদী পার হইলাম, কারণ এ সময়ে নদীর জল খুব কম ছিল। নদীর ওপারে রাস্তা নাই, ইচ্ছা করিলে গরুর গাড়ীতে মাঠের মধ্য দিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু আমরা হাঁটিয়া যাওয়াই সুবিধা মনে করিয়া, গাড়ী ঐস্থানে পরিত্যাগ করিয়া, পদব্রজে অগ্রসর হইলাম। প্রাতঃকালের এই ভ্রমণটি বেশ রমনীয় বোধ হইল। মাঠের মধ্য দিয়া, কখনও বা আমবাগানের পার্শ্ব দিয়া, দূরে 'পূর্ব্বঘাটের' গিরিশ্রেণী দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম। এইরূপে দেড়ঘণ্টা কাল চলিয়া প্রায় সাড়ে আটটার সময় অদূরে জৌগড় পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হইল।

কিছুদূর চলিতেই পথপ্রদর্শক পিয়নটি বলিল যে এইখানে গড়ের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে তাহার কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কারণ, জৌগড় যে একটি গড় বা দুর্গের নাম, তাহা আমার জানা ছিল না। দাদার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যে পর্ব্বতে অশোকের শিলালিপি খোদিত আছে তাহাকে কেন্দ্রবর্ত্তী করিয়া চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দুর্গের উচ্চ মৃৎপ্রাচীর (Rampart) দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমরা যে উচ্চভূমির উপর দিয়া চলিয়াছি ইহা তাহারই অংশবিশেষ। মধ্যে মধ্যে কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, ইহা যে একটি সুবিস্তৃত প্রাচীর তাহা সহসা উপলব্ধি করা যায় না।

আমরা সোজা পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, কিন্তু এই দুর্গের সন্ধান পাইয়া, ইচ্ছা করিয়াই কেন্দ্রস্থিত পর্ব্বত দক্ষিণে রাখিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। প্রায় পোয়া মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দেখিলাম, একস্থানে প্রাচীর শেষ হইয়াছে, এবং প্রায় ৫০।৬০ গজ দূরে পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান এখন সমতলভূমিতে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের অনুমান হইল যে এককালে এইখানে দুর্গের দরজা ছিল। এইস্থান হইতে একটি রাস্তা ঋষিকুল্যা নদীর দিকে গিয়াছে। ঐ রাস্তার সোজাসুজি দুর্গের ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলে ঠিক মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। এই সমুদয় দেখিয়া অনুমান হয় যে, এককালে কেহ এইস্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ মৃৎপ্রাচীর উঠাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া প্রতীতি হয়, এই প্রাচীরের পরিধি প্রায় ৩।৪ মাইল ছিল। দাদার নিকট শুনিলাম, গবর্ণমেণ্টের পুরাতন সার্ভে ম্যাপে দেখা যায় যে ঋষিকুল্যা নদী পূর্ব্বে এই স্থানের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিল অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে ইহা ক্রমশঃ সরিয়া প্রায় দুই মাইল দূরে গিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং কোন সময়ে যে ইহা ঋষিকুল্যা নদীর তীরেই অবস্থিত ছিল, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। নদীর তীরে প্রাচীরবেষ্টিত এইস্থান দুর্গ বলিয়াই মনে হয়—কিন্তু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কারণ, প্রাচীনকালে সাধারণতঃ নগরের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরের বেষ্টন থাকিত, যদি জৌগড়ের মৃৎপ্রাচীর খুব প্রাচীন কালের নিদর্শন হয়, তাহা হইলে ইহার অভ্যন্তরে দুর্গের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র একটি নগরী থাকাও অসম্ভব নহে। কিন্তু দুর্গই থাকুক আর নগরীই থাকুক, এক্ষণে তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুর্দ্দিকে মৃৎপ্রাচীরের মধ্যে অশোকের অনুশাসন-খোদিত পর্ব্বত—আর এতদুভয়ের মধ্যে যতদূর চক্ষু যায়, কেবল ছোট পাথরের টিলা এবং সমতল শস্যক্ষেত্র—ইহাই অতি প্রাচীন জনপদের একমাত্র ধ্বংসাবশেষ!

এই স্থানটি যে কত প্রাচীন, পর্ব্বতগাত্রে খোদিত অশোক অনুশাসনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রাচীরের উপর আরও কিছুদূর চলিয়া আমরা অবশেষে এই পর্ব্বতের অভিমুখে চলিলাম। বোধ হয় আধ মাইলেরও কিছু বেশী চলিয়া, এই পর্ব্বতের নিম্নভাগে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতটি খুব বেশী উচ্চ নহে, সুতরাং উঠিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। বিশেষতঃ সেই সুদূর অতীতের একটি নিদর্শন দেখিবার আগ্রহে কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই

মনে হইতেছিল না। অবিলম্বে পর্ব্বতের সানুদেশে উঠিয়া খোদিত লিপির অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

পরীক্ষায় পড়া যেমন করিয়া পড়িতে হয়, অশোকের লিপি তেমনই করিয়া পড়িতে হইয়াছিল—তৎপরে ইহার সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক পাণ্ডিত্য এবং গবেষণাও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু তথাপি প্রত্যক্ষ যাহা দেখিলাম তাহাতে মন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল।

সেই পর্ব্বতের সানুদেশে এক অতি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড—কত বৃহৎ তাহা ঠিক নিরূপণ করিবার উপায় নাই, কারণ ইহার এক অংশ মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। মহাকবি হিমালয়ের বর্ণনা উপলক্ষে বলিয়াছেন, "পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ"—এই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডকেও সেইরূপ এই পর্ব্বতের মানদণ্ড বলা যাইতে পারে, কারণ, ইহা পর্ব্বতের সানুদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রস্তরখণ্ডের এক অংশ পালিশ করিয়া লইয়া তাহার উপর লিপি খোদিত হইয়াছে। যে অংশ পালিশ করা হইয়াছে, অনুমান হইল তাহা প্রায় ১৫।১৬ হাত দীর্ঘ এবং ৮।১০ হাত উচ্চ। এই অংশে সুদীর্ঘ পংক্তিতে সুবিন্যস্ত অক্ষরে লিপিগুলি খোদিত হইয়াছে। সহসা এই সুবৃহৎ শিলালিপিখানি দৃষ্টি-গোচর হওয়ায় মনে স্বতঃই একটি সম্ভ্রমের ভাব উদয় হইল। শিল্প-সৌন্দর্য্যে মানুষের মন আকৃষ্ট হয় কেন, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া রাস্কিন বলিয়াছেন যে, শিল্পকার্য্যের মধ্যে শিল্পীর যে নিপুণতা ও আয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সহিত মানবহৃদয়ের আন্তরিক সহানুভূতিই শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ। জৌগড় পর্ব্বতের এই শিলালিপি দেখিলে রাস্কিনের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। সৌন্দর্য্য বলিতে যাহা বুঝি, তাহার কিছুই এই লিপিতে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু তথাপি যে বিপুল আয়াস সহকারে এই বিশাল প্রস্তর খণ্ড পালিশ করিয়া, সূক্ষ্ম নিপুণতার সহিত তাহার উপর অক্ষরশ্রেণী সজ্জিত করা হইয়াছে, তাহার অনুভূতি বিস্ময় ও সম্ভ্রমের সহিত চিত্তকে ইহার দিকে আকৃষ্ট করে।

জল বায়ু ও মানুষের ধ্বংসকরী শক্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে এই স্থানটি টিনের ছাদ ও লোহার গরাদে দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে, কিন্তু ইহার ফলে লিপিখানি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছে। টিনের ছাদের স্ক্রুর গোড়া দিয়া জলধারা পড়ায় লিপিখানির উপর অনেকগুলি কালো কালো দাগ হইয়াছে, এবং ঐ সমুদয় স্থানের অক্ষরগুলি কোন মতেই আর পড়িবার যো নাই। ঐ সমুদয় দাগের বিস্তৃতি ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই ভাবে ধ্বংস হইতে চলিলে আর শতাব্দী পরে জৌগড় লিপির চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে কিনা তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। দাদা বলিলেন যে এই বিষয় তিনি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন এবং একপ্রকার পেটা সীসা দিয়া স্ক্রুর গোড়াগুলি ঢাকাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিছু দিন হইল গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব ও ইহার ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি কিন্তু ইহা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে জানি না, কারণ দাদা এখন অন্যত্র বদলি হইয়া গিয়াছেন।

দর্শন মাত্রেই লিপি পাঠ করিবার ইচ্ছা হইল। অবশ্য এই লিপির ফোটোগ্রাফ ও পাঠ বহু পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে * সুতরাং ইহাতে নূতন কিছুই ছিল না, তথাপি স্বয়ং ইহা পাঠ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। লিপি এত উচ্চে যে দাঁড়াইয়া পাঠ করা অসম্ভব। পূর্ব্বেই 'মই'য়ের বন্দোবস্ত ছিল, লিপি পাঠ করিবার জন্য তাহার সাহায্য লইলাম। দাদা বলিলেন, একটু বিশ্রাম করিয়া পরে উঠিও। কিন্তু 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'—আমি অশোক-অক্ষর পড়িতে পারি, সেই বিদ্যার পরিচয়ে বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটে ইহা অসহ্য—সুতরাং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু কয়েক অক্ষর পড়িতে পড়িতেই শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, শত

* Ind. Ant., 1890, pp., 84.
A. S. S. I., 1887. pp. 125-31.

চেষ্টা সত্ত্বেও 'মই'য়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইল। প্রাতঃকাল হইতে, এ যাবৎ ২৫ মাইল মোটর সাইকেলে, এবং ৬৷৭ মাইল পদব্রজে আসিয়াছি, তাহারই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। তখন সেই বাইবেলের কথা মনে পড়িল—"Spirit indeed is willing but the flesh is weak"। অচিরাৎ নামিয়া চা প্রভৃতি সেবন করিয়া, একটু সুস্থ হইয়া পুনরায় মই বাহিয়া উঠিয়া লিপি পড়িতে চেষ্টা করিলাম। ইচ্ছাটা এই যে, এখান হইতে পড়িয়া কলিকাতায় গিয়া মুদ্রিত পাঠের সহিত মিলাইয়া দেখিব কতদূর ঠিক হইল—অর্থাৎ এই প্রস্তরখণ্ড যেমন পর্ব্বতের মানদণ্ড, তেমনই ইহার বক্ষস্থিত লিপিও আমার জ্ঞানের মানদণ্ড স্বরূপ হউক। মইএর উপরে দাঁড়াইয়া লিখিবার সাধ্য নাই, তাই আমি বলিয়া যাইতে লাগিলাম, দাদা নীচে বসিয়া লিখিতে লাগিলেন।

সেই "দেবানাং পিয় পিয়দসি"—এবং তাঁহার উদার ধর্ম্মমত ও লোকশিক্ষার প্রতি প্রবল ও আন্তরিক অনুরাগ—জগতে অতুলনীয়, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার মানদণ্ড স্বরূপ। কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়, সেই রাজচক্রবর্ত্তীর অমর কীর্ত্তি-কাহিনী এখানে 'অক্ষরের শৃঙ্খলে পাথরের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে'। কোন মহাশিল্পী এই কৌশলে সুদূর 'অতীতকে বর্ত্তমানে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে,' 'অতলস্পর্শ কাল সমুদ্রের উপর কেবল একখণ্ড প্রস্তর দিয়া সাঁকো বাধিয়া দিয়াছে'!

অশোকের গিরিলিপির মর্ম্মার্থ সাধারণের নিকট সুপরিচিত, সুতরাং তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটি বিষয়ে জোগড়ের বিশেষত্ব আছে। শাহবাজগড়ী, গির্ণার প্রভৃতি স্থানে যে চতুর্দ্দশ সংখ্যক লিপি বর্ত্তমান, তাহার প্রথম দ্বাদশটি মাত্র জোগড়ে আছে। অপর দুইটির পরিবর্ত্তে দুইখানি নূতন লিপি সংযোজিত হইয়াছে। সাধারণতঃ অশোকের লিপি তাঁহার ধর্ম্মজীবনেরই কাহিনী মাত্র, কিন্তু এই দুইখানি লিপি হইতে আমরা তাঁহার অপূর্ব্ব রাজমহিমার পরিচয় পাই। অশোক তাঁহার রাজত্বের নবম বৎসরে ভীষণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ করিয়া কলিঙ্গ প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। এই নববিজিত কলিঙ্গ প্রদেশ এবং স্বাধীন প্রত্যন্তবাসিদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, এই বিষয়ে আলোচ্য লিপি দুইখানিতে রাজকর্ম্মচারিদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে রাজা ও প্রজার সম্বন্ধের কি আদর্শ ছিল, এই লিপি দুইখানিই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

জোগড়ের নিকটবর্ত্তী 'সমাপা' নামক নগরী অশোকের রাজ্যকালে কলিঙ্গ প্রদেশের অন্যতম শাসনকেন্দ্র ছিল। এই সমাপাস্থিত মহামাত্র নগর ব্যবহারক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদিগকে লক্ষ্য করিয়া অশোক বলিতেছেন—

"(তু) কে হি বহুসু পানসহসেসু আ(য়তা) পন(য়ং) গচ্ছেম সুমুনিসানং। সবে মুনিসে পজা (মম) অথ পজায়ে ইছামি কিংতিমে সবেন হিতসুখেন যুজেয়তি হিদলোগিক পাললোকিকায়ে হেমেব মে ইছ সব মুনিসেসু।"*

"আপনারা বহুসহস্র জীবের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। আপনারা যেন সজ্জনগণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন। সকল মনুষ্যই আমার পুত্রতুল্য। আমি যেরূপ ইচ্ছা করি যে আমার পুত্রেরা ঐহিক ও পারলৌকিক সকল মঙ্গল ও সুখের অধিকারী হউক; তেমনই প্রার্থনা করি, সকল মনুষ্যই সেইরূপ হউক।"

এই অল্প কয়েকটি মাত্র কথায় অশোক প্রজার প্রতি কর্ত্তব্যের যে আদর্শ নিরূপণ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। প্রজাগণ পুত্রতুল্য, সুতরাং পুত্রের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য পিতার যেরূপ সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য, প্রজাগণেরও উক্ত উভয়বিধ মঙ্গলের জন্য রাজার সেইরূপ যত্ন করা কর্ত্তব্য। অশোকের এই অমূল্য রাজনীতি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হইবার উপযুক্ত। অন্যত্র অশোক লিখিয়াছেন, শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

* Ind. Ant, 1890, pp., 84.

† শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসুকৃত "অশোক অনুশাসন," পৃঃ ৬৬

যেরূপ উপযুক্ত ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হয়, তিনিও তেমনই প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন।

অশোকের লিপি পাঠ করিলে প্রাচীন কালের কত কথাই যে মনে আসে তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। সেই লিপি বক্ষে ধারণ করায় জৌগড় পর্ব্বত আমার নিকট পবিত্র তীর্থভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইল। প্রত্যক্ষ সেই লিপি দর্শন করিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিলাম।

বেলা বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিলাম। নামিবার পূর্ব্বে পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম। দূরে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল শ্রেণীবদ্ধ গিরিমালা আর চতুর্দ্দিকে নয়নরঞ্জন শস্যক্ষেত্র। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে যাহা কলিঙ্গ প্রদেশের অন্যতম রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইত, আজ তাহা প্রায় জনশূন্য প্রান্তরে পর্য্যবসিত হইয়াছে,—কালের এমনই বিচিত্র গতি!

পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় একটি লোক একটি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিল। কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পুরস্কারে তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া ক্রমে তাহার নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, প্রায় তিন পোয়া মাইল দূরে অবস্থিত জৌগড় পর্ব্বতের নিকটতম গ্রামে এইরূপ আরও অনেক মুদ্রা পাওয়ার সম্ভাবনা, কারণ, কৃষকেরা জৌগড় পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বস্থ জমী চাষ করিবার সময় এইরূপ বহুসংখ্যক মুদ্রা পাইয়া থাকে। আমরা যে মুদ্রাটি ক্রয় করিয়াছিলাম তাহা এতই অস্পষ্ট যে, তাহা কোন্ সময়কার মুদ্রা তাহা নিরূপণ করিবার উপায় ছিল না। অন্য প্রাচীন মুদ্রা পাইলে কোন ঐতিহাসিক-তথ্য উদ্ধার হইতে পারে, এই আশায় আমরা উল্লিখিত গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলাম। গ্রামে পৌছিয়া আমাদের সঙ্গী লোকটি মুদ্রার অধিকারিগণকে ডাকাইয়া আনিল। প্রথমে তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিবে না যে তাহাদের নিকট মুদ্রা আছে। অনেক প্রকারে বুঝাইয়া এবং অর্থের লোভ দেখাইয়া অবশেষে আমরা ১৫।১৬টি মুদ্রা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম। এই মুদ্রাগুলি ভিনসেণ্ট স্মিথের 'Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta" নামক গ্রন্থের চতুর্দ্দশ সংখ্যক প্লেটে অঙ্কিত চতুর্দ্দশ সংখ্যক মুদ্রার অনুরূপ।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে এলিয়ট সাহেব Madras Journal of Literature and Science (Vol xx)* নামক পত্রিকায় গঞ্জাম জিলায় প্রাপ্ত এইরূপ একটি মুদ্রার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, —"যেস্থলে এই মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহার পার্শ্বে একটি পব্বতে এলাহাবাদে আবিষ্কৃত লিপির ন্যায় 'লাট' অক্ষরে লিখিত একটি সুদীর্ঘ লিপি আছে।" তিনি যে জৌগড় পর্ব্বতস্থিত অশোক লিপি লক্ষ্য করিয়াই এই কথা লিখিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে উহা যে অশোক লিপি তাহা তৎকালে তিনি জানিতেন না। সুপ্রসিদ্ধ কানিংহাম সাহেবও জৌগড়ের নিকটে কুশান মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রা পাইয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন, সম্ভবতঃ ঐ সমুদয় মুদ্রাও এই শ্রেণীর। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে পুরীতে এই জাতীয় বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। হোর্ণালি সাহেব তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন (Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1895, p. 61, pl. II.) সম্প্রতি 'ভিটা' নগরীর ধ্বংসাবশেষ খননকালে এইরূপ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে (Annual Report of the Archæological Survey of India, 1911-12, p. 71)। এতদ্ব্যতীত আর কোথাও এইরূপ মুদ্রার আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এই মুদ্রাগুলিতে কুশানরাজগণের মুদ্রার প্রভাব বর্ত্তমান। (Rapson, Indian Coins—sec. 54; V. Smith,

* এই পত্রিকাখানি দুষ্প্রাপ্য—কলিকাতার কোন লাইব্রেরীতে নাই। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন আই-সি-এস্ মহাশয় বোম্বাই লাইব্রেরী হইতে আনাইয়া আমাকে ইহা পাঠ করিবার জন্য দিয়াছিলেন।

Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta, Volume I, pp. 64, 65) কিন্তু কুশানরাজগণের মুদ্রা পুরী বা গঞ্জাম জিলায় সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে র‍্যাপসন অনুমান করেন যে, এগুলি বাস্তবিক মুদ্রা নহে—কুশান সম্রাটের কোন প্রজা পুরী মন্দিরে আসিয়া প্রচলিত কুশান মুদ্রার অনুকরণে এগুলি প্রস্তুত করাইয়া দান করিয়াছিল। *

র‍্যাপসন যে সময় উক্ত মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সে সময় এলিয়টের পূর্ব্বলিখিত আবিষ্কার ব্যতীত এক পুরী ভিন্ন আর কোন স্থানে এইরূপ মুদ্রার আবিষ্কার হয় নাই। কিন্তু জৌগড়ে আমি প্রায় ২০।২৫টি মুদ্রা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তথায় এরূপ বহু সংখ্যক মুদ্রা প্রায়ই পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ভিটায়ও এইরূপ মুদ্রা আবিষ্কার হইয়াছে। সুতরাং এগুলি যে পুরীর তীর্থযাত্রিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, র‍্যাপসনের এই অনুমান তাদৃশ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। ভিনসেণ্ট, র‍্যাপসনের অনুমান সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু ইহাও অনুমান করিয়াছেন যে, এগুলি সম্ভবতঃ কলিঙ্গরাজগণের মুদ্রা। এই শেষোক্ত মতই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

এই মুদ্রাগুলি হইতে যে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

* 'In the case of the chief recorded discovery of these coins in the Puri district they were found in company with bronze Kushan coins struck in the ordinary manner. From this it would seem probable that the two classes were in circulation at the same time. It appears, however, to be a fact that Kushana coins are not as a rule found so far east or south of India as Puri and Ganjam and it has been suggested that their occurrence in these districts may be due to pilgrims who brought them from a distance as offerings at the shrines of Puri. It is therefore possible that the cast imitations in question may have been made for the same purpose and that they should be regarded not as coins, but like the Ramatankas of a later date, as temple offerings (Rapson—Indian Coins, Sec. 54

যাহাদের নিকট এই মুদ্রা পাইয়াছি, আমি তাহাদের প্রত্যেককে বিশেষভাবে এই মুদ্রার আবিষ্কার স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছে যে জৌগড় পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বস্থ জমীতে চাষ করিবার সময় ইহা পাওয়া গিয়াছে। প্রশ্নদ্বারা ইহাও জানিয়াছি যে,ঐ পর্ব্বত হইতে এক মাইল বা দেড় মাইলের অধিক দূরে যে সমুদয় জমী আছে—তাহা হইতে এপর্য্যন্ত কখনও ঐরূপ মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই পর্ব্বতের সন্নিকটে একটি প্রাচীন নগরী বর্ত্তমান ছিল।

সমতল ভূমির কিঞ্চিৎ নিম্নেই এই সমুদয় মুদ্রা পাওয়া যায়—ইহাতে বোধ হয় যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর অনতিদীর্ঘ কাল পরেই এই নগরীর ধ্বংস হয়। জৌগড় পর্ব্বতের শিলালিপি সমাপা নগরীর কর্ম্মচারিদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে ইহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এই পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বেই যখন একটি প্রাচীন নগরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন ইহাই প্রাচীন সমাপা নগরী, এইরূপ নির্দ্দেশ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। * এই অনুমান যথার্থ হইলে বলিতে হইবে যে, অশোকের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ ছয় শত বৎসর পরেও এই স্থানে একটি নগরী বর্ত্তমান ছিল। পরে কালক্রমে ইহার চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং উহার স্থানে পুনরায় আর কোন নগরী নির্ম্মিত হয় নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এই সুদূর প্রদেশে কুশানগণের মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রার প্রচলন হইল কিরূপে। সাধারণতঃ, কোন রাজার অধিকারভুক্ত প্রদেশেই তাঁহার মুদ্রা প্রচলিত থাকে। বাণিজ্যব্যপদেশে বা

* ভিনসেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন, "The ancient ruins among which the Jaugada record stands presumably represent the town of Samapa (Asoka, p. 77) প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান থাকিলে এইরূপ অনুমান করা সঙ্গত। কিন্তু জৌগড়ে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ("ancient ruins") কিছুই নাই।

অপর কোন কারণেও এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে যাইতে পারে কিন্তু জৌগড়ে বিভিন্ন সময়ে যেরূপ বহুসংখ্যক মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এইরূপ কোন কারণ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। অনুমান হয়, কুশানরাজগণের প্রভাব এই সুদূর প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মগধ ও বঙ্গের নানা স্থানে কুশানরাজগণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তৃতীয় খৃষ্টাব্দীতে লিখিত চীনদেশীয় গ্রন্থে মগধে কুশান-রাজগণের অধিকারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। * ইহা হইতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে মগধ কিছুকাল কুশান রাজগণের অধীনে ছিল। সুতরাং পুরী বা গঞ্জাম জিলা পর্য্যন্ত কুশান রাজগণের প্রভাব বিস্তৃত থাকা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এতএব পুরী এবং জৌগড়ে যে সমুদয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহা মন্দির-যাত্রীর দান অথবা অন্য কোন কিছু এইরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া, তাহা ঐ সমুদয় স্থানে কুশান রাজগণের প্রভাবের পরিচয় প্রদান করে, এইরূপ অনুমানই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। র‍্যাপসন যখন লিখিয়াছিলেন তখন তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই সমুদয় মুদ্রা প্রধানতঃ পুরী-তেই পাওয়া গিয়াছে। জৌগড়ে এই জাতীয় মুদ্রা বহু সংখ্যক পাওয়া যায় ইহা তিনি জানিতেন না। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাহার অনুমানের উপর খুব বেশী নির্ভর করা চলে না। এই মুদ্রাগুলি কোন সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল তাহাও নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নহে। এগুলি যে কুশান রাজগণের পরবর্ত্তী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে এগুলির তারিখ খৃষ্টীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দী। কিন্তু গুপ্তরাজগণের কলিঙ্গ অধিকারের পরেও যে তথায় কুশানরাজগণের মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং এই মুদ্রাগুলি তৃতীয় অথবা চতুর্থ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত ছিল, এইরূপ অনুমানই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

* বিস্তৃত বিবরণ ১৩২২ সালের ভাদ্র মাসের "প্রতিভা" পত্রিকার ১৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোল্লিখিত চীনদেশীয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। কুশানরাজগণ ইহা-দিগকে পরাজিত করিয়া কর দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। আলোচ্য মুদ্রাগুলি হইতে অনুমান হয় যে, অন্ততঃ পুরী হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি রাজ্যও ঐ সময়ে বিদ্যমান ছিল এবং ঐ রাজ্যও কুশানরাজগণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অশোকের সময়ে বর্ত্তমান জৌগড়ের নিকটবর্ত্তী সমাপানগরী কলিঙ্গ রাজ্যের অন্যতম শাসনকেন্দ্র ছিল। উক্ত মুদ্রাগুলি হইতে অনুমিত হয় যে কুশান রাজগণের অধীনে ইহাও একটি বিশিষ্ট নগরী ছিল।

এইরূপে জৌগড় পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে যে মুদ্রাগুলি পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে বিশিষ্ট কোন ঐতি-হাসিক তথ্য উদ্ধার না হইলেও কতকগুলি ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধান পাইয়াছি। ভবিষ্যতে অন্য প্রমাণের সাহায্যে সম্ভবতঃ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক-তথ্যেরও স্থাপনা করা যাইতে পারে। আমার জানা ছিল যে অনেক স্থলে প্রাচীন মুদ্রা জাল করা হয়—চণ্ডুলাল নামক এই শ্রেণীর একজন প্রসিদ্ধ জালিয়াতের নাম অনেকেই জানেন। জৌগড় হইতে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি খাঁটি কি না, এ বিষয়ে দাদার নিকট সন্দেহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন—"এখানকার লোকের বুদ্ধিবৃত্তি যেরূপ, তাহাতে এই প্রকার ধারণা করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে —আমি তোমাকে হাতে হাতে ইহার প্রমাণ দিতেছি।" নিকটেই একটি লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিল। দাদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর বয়স কত?"—সে উড়িয়াতে বলিল যে তাহার বয়স প্রায় এক কুড়ি হইবে। তৎপরে প্রশ্ন হইল, "তোর ছেলে আছে?" উত্তর— "আছে।"—"তাহার বয়স কত?" অম্লান বদনে বৃদ্ধ উত্তর করিল, "সে প্রায় তিরিশ বছরের হবে।" মুদ্রাগুলি যে জাল নহে, অতঃপর সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় পদব্রজে ঋষিকুল্যা

নদী অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। অর্দ্ধপথ গিয়াছি এমন সময় মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চষা মাঠে জল পড়িয়া অবিলম্বে কাদার সৃষ্টি হইল। কয়েক পদ অগ্রসর হই আর কাদায় ভারে বুট তুলিতে পারি না—কাদা ঝাড়িয়া তবে আবার চলিতে আরম্ভ করি। ক্রমে বুট ছাড়িয়া হাঁটু পর্য্যন্ত প্যাণ্টালুন একেবারে কাদা মাখা হইয়া গেল। সর্ব্বশরীর যে একেবারে ভিজিয়া গেল তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ ভাবে চলিতে চলিতে ঋষিকুল্যা নদী পার হইয়া পুনরায় আমরা মোটর সাইকেলে চড়িলাম। জনশূন্য মাঠের মধ্য দিয়া ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে চলিয়া, বেলা প্রায় একটার সময় টাঙ্গানা-পল্লীতে পৌছিলাম। প্রাতঃকালে বাহির হইয়া পঞ্চাশ ষাট মাইল ভ্রমণ ও প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা করিয়া প্রায় নিয়মিত সময়েই স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলাম।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্গনারী

পুণ্যে তোমার ধন্য গেহ, বিত্ত তোমার চিত্তহারী,
কর্ম্ম তোমার মর্ম্মবীণা, শান্তিময়ী বঙ্গনারী!
হাসিতে তোর প্রাণ ফোটেগো, অশ্রু প্রেমের মন্দাকিনী,
আনন্দ তোর আত্মদানে, ধন্যা অয়ি সন্ন্যাসিনী!
মরুর বুকে ফুল ফুটালো প্রেমের পূত গঙ্গাবারি;
চরণে তোর বিশ্ব নত, শান্তিময়ী বঙ্গনারী!

ভগ্নীরূপে কন্যারূপে আনন্দেরি মূর্ত্তি তুমি,
চঞ্চলা, তোর নূপুর সদা গুঞ্জরিত চরণ চুমি;
অভিমানের অশ্রু কভু, পলকে তোর মুক্ত হাসি,
'পাগলা ঝোরা'র ঝর্ণা বেগে পড়িস্ কভু বক্ষে আসি;
আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে অঙ্গনে তোর দীপ্তি, মরি;
কন্যারূপে মাতৃসমা, শান্তিময়ী বঙ্গনারী!

বধূর বেশে কল্যাণী গো, দেখালে কি অতুল শোভা;
হেরি গৃহের লক্ষ্মীরূপে দেবী তোমার দিব্য বিভা।
গৃহকোণের স্বর্গে তোমার গৌরবেরি আসন রাজে,
কল্পলোকের বাঞ্ছিতা গো, মূর্ত্ত তুমি চিত্তমাঝে।
বইছ নিখিল ক্লান্তিহরা অমৃতেরি স্বর্ণঝারি,
সর্ব্বসুখের উৎস তুমি, শান্তিময়ী বঙ্গনারী!

বক্ষে তোমার লক্ষধারে উচ্ছলে গো প্রেমের ধারা,
গুণ্ঠনেরি অন্তরালে কোন্ খেয়ানে আত্মহারা?
পত্রপুটে পুষ্পসম গুপ্ত তুমি বঙ্গবধূ,
ফুলের বুকে গন্ধপারা মর্ম্মে তোমার পূর্ণ মধু;
কোন্ অমিয়া সিঞ্চিলে গো বিশ্বহৃদয়-স্নিগ্ধকারী?
পরশে তোর ধন্য ধরা, শান্তিময়ী বঙ্গনারী!

মাতৃরূপে চিত্তমাঝে হেরি জগৎ-ধাত্রী তোমা,
স্নেহ দয়ার গৌরবে তোর বক্ষ আমার পূর্ণ, ও মা!
সর্ব্বসহা ধরার মত অচঞ্চলা দুঃখসুখে,
সইছ সদা কতই মাগো পরের লাগি হাস্যমুখে;
পিয়ালে গো স্তন্যধারা, জিয়ালে গো বক্ষে ধরি',
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি, শান্তিময়ী বঙ্গনারী!

বিশ্বে তোমার রূপ হেরি গো—বিশ্বমায়ের দীপ্ত ছবি;
আকাশে তোর স্নিগ্ধ আঁখি, সীমন্ত তোর প্রভাত রবি।
আঁচল দোলে শস্যক্ষেতে, স্তন্যধারা নদীর জলে,
তৃপ্তি তোরি বক্ষে মা গো, মুক্তি তোরি চরণতলে;
স্বর্গ নামে চরণযুগে কল্পনারি স্বর্গ ছাড়ি;
মাতৃরূপা চিন্ময়ী গো, শান্তিময়ী বঙ্গনারী!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

নাগপাশ

(গল্প)

"ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্। ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্।"

কাছারী হইতে আসিয়া সাহেবী ধড়াচূড়া ছাড়িয়া বৈঠকখানার বারান্দাটিতে একখানা ঈজি চেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে সটকা টানিতেছি, এমন সময় শব্দ হইল—

"ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্। ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্।"

বাড়ীর ভিতর হইতে আমার মেয়ে দৌড়াইয়া আসিল। আব্দারের সুরে বলিল, "বাবা, ভালুক নাচ দেখ্‌ব।"

আমি বলিলাম, "ও আর কি দেখ্‌বি? কত দেখেছিস্ ত।"—অমনি অভিমানে কন্যার স্বর অনুনাসিক হইল; ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "না, বাবা—আমি দেখ্‌ব। ডাক না।"

আমি।—পয়সা কিন্তু আমি দিতে পারব না। তোকে দিতে হবে।

খুকীর একটি নিজস্ব তহবিল ছিল। আমার কাছে ও তাহার মাতার কাছে সময় সময় কিছু কিছু পয়সা পাইয়া সে এই তহবিলটি সঞ্চয় করিয়াছিল। আমি ও তাহার মা যখন তখন তাহার তহবিল হইতে খরচের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতাম।

আমার কথা শুনিয়া খুকী বলিল, "ইস্ দেব বই কি?"

আমি।—তা হবে না। দিতেই হবে। গঙ্গা, ডাক্ ত রে ভালুক নাচওয়ালাকে।

অযোধ্যানিবাসী গঙ্গাদীন ভৃত্য আসন্ন মজার লোভে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইয়া লম্ফপ্রদানে ভালুক-নাচওয়ালাকে ডাকিতে ছুটিল।

ভালুক-নাচ-ওয়ালা আসিল। স্কন্ধে ঝুলি। হস্তে দীর্ঘ যষ্টি ও দড়ি। একটা দড়ির প্রান্তে একটা বুড়া কাল ভালুক ও আর এক দড়িতে ছুইটা বাঁদর বাঁধা। অপর হস্তে ডুগ্‌ডুগি বাজাইতেছে। পিছনে ছেলের দল।

লোকটা মুসলমান। বয়স বেশী হইবে না। ত্রিশ কি বত্রিশ বৎসর হইতে পারে। কিন্তু বোধ হয় অনবরত পর্য্যটনে, আহার ও অবস্থানের ক্লেশে তাহার শরীর এই বয়সেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার ঔৎসুক্যপূর্ণ চঞ্চল দৃষ্টি দেখিয়া মনে হয়, সর্ব্বদাই সে যেন কি অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। মলিন বস্ত্র মেরজাই টুপি, অসংস্কৃত কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি থাকিলেও লোকটাকে তেমন নিতান্ত নিকৃষ্টশ্রেণীর বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। তাহার চলা ফেরার ভঙ্গীতেই কেমন একটা তেজের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল।

বারান্দার সম্মুখে আসিয়া হাত তুলিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত নিবে রে?"

সে বলিল, "যা দেবেন হুজুর।"—বলিয়াই ঝুলি নামাইয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিল।

প্রথমে নানা ভঙ্গীতে উচ্চরবে ডুগ্‌ডুগিটি বাজাইতে লাগিল। সেই শব্দে চারিপাশে লোক জমিতে লাগিল। ছেলের দল ত আগে হইতেই পিছনে জুটিয়াছিল, যাহারা পূর্ব্বে জুটিতে পারে নাই তাহারাও এখন আসিতে লাগিল। তা ছাড়া চাকরের দল, বেকার লোক, বাজার করিতে যাইতেছে বা বাজার হইতে আসিতেছে এমন জনকতক লোক, কাছারী-ফেরৎ মামলার পক্ষগণ প্রভৃতি বহুরকমের লোক জড় হইয়া গেল। তাহাদের একটা মস্ত ভরসা যে এখানে খেলা দেখিলে পয়সা দিতে হইবে না, কারণ হাকিম বাবুই খেলা দেখাইতেছেন।

রীতিমত লোক জমা হইলে খেলা আরম্ভ হইল।

আমার মেয়ে ত হাসিয়াই আকুল। ভাল্লুক যখন যষ্টির উপর ভর দিয়া দুই পায়ে হেলিয়া দুলিয়া শ্বশুর-বাড়ী যাত্রা করিল ও যখন জ্বরের প্রকোপে কাঁপিতে লাগিল তখন তাহার খুব কৌতুক বোধ হইল। তার পর বাঁদরের নানাবিধ ক্রীড়ার সময় সে বাড়ীর ভিতর হইতে দৌড়িয়া গিয়া কয়েকটা কলা লইয়া আসিল ও খেলা হইয়া গেলে বাঁদর দুটিকে কলা খাওয়াইতে লাগিল।

খেলা দেখাইবার সময় ভাল্লুক-নাচওয়ালা ডুগ্‌ডুগি বাজাইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তখন তাহার চঞ্চল দৃষ্টি দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল যেন খেলা দেখান তাহার ছলমাত্র। যথার্থই সে কিছু খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বিশেষ, যেদিকে ছেলের দল সেদিকেই তাহার অধিক উৎসাহ দেখা যাইতে লাগিল। মাথা নাড়িয়া হাত ঘুরাইয়া ডুগ্‌ডুগি বাজাইয়া যেমন সে ছেলের দলকে খুসী করিতে লাগিল তেমনি সে নিজেও খুব খুসী হইতেছে বলিয়া বোধ হইল। প্রত্যেক ছেলের দিকেই সে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল ও স্ফূর্ত্তির সহিত ডুগ্‌ডুগি বাজাইতে লাগিল।

তাহার এই প্রকার আচরণে আমার কেমন একটা কৌতূহল হইল। মনটা নিতান্ত ভাবপ্রবণ না হইলেও, গল্প ও উপন্যাস নিতান্ত অল্প পড়া ছিল না। ভাল্লুক নাঁচওয়ালার ভঙ্গী দেখিয়া একটা রোম্যান্টিক ধরণের গল্প কল্পনায় খাড়া করিয়া ফেলিলাম। বোধ হয় লোকটার ছেলে হারাইয়া গিয়া থাকিবে, তাই দেশে দেশে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। অথবা রবি বাবুর 'কাবুলীওয়ালা'র মত হয়ত নিজ কন্যার স্মৃতি তাহাকে বিশ্বের বালক বালিকার সহিত আত্মীয়তা স্থাপনে আকাঙ্ক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে।

এখন মনে হইলে হাসি পায়, কিন্তু তখন এইরূপ একটা ভাব আমাকে এতদূর অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, খেলা সাঙ্গ হইলে যখন দর্শকের দল চলিয়া গেল, তখন আমি ভাল্লুক-নাচওয়ালাকে ডাকিয়া বসিতে বলিলাম।

জিনিসপত্র ঝুলির ভিতর পুরিয়া বাঁদর দু'টা ও ভাল্লুকটাকে লইয়া সে বসিল। বুড়া ভাল্লুকটা খেলা দেখাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এখন হাঁফাইতে লাগিল। বাঁদর দুইটা গায়ের উকুণ বাছিতে প্রবৃত্ত হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ছেলেদের দিকে, অমন করিয়া চাহিতেছিলে কেন? দেখিয়া মনে হয়, কি যেন খুঁজিতেছ। তোমার কি কোনও ছেলে হারাইয়াছে?"

ভাল্লুক নাচওয়ালা বলিল, "হুজুর, আমার বিবাহই হয় নাই, তা আবার ছেলে?"

আমি।—তবে ওরকম করিয়া কি দেখিতেছিলে?

ভা।—হুজুর, মেহেরবানি করিয়া যদি শোনেন ত বলি।

ভাল্লুকওয়ালা বলিতে লাগিল—

হুজুর, আপনি হাকিম, কিছু মনে করিবেন না, কিন্তু আদালত ও আইন কানুনে আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। যাহার পয়সা আছে তাহার সুবিধার জন্যই আইন। আইন গরীবের জন্য নয়। আদালত ন্যায় অন্যায় দেখেন না, বোধ হয় দেখিতে পারেনও না। যে পয়সা খরচ করিতে পারে, বড় বড় উকীল কৌন্সুলি দিতে পারে, তাহারই জয়। গরীবের কোন উপকার নাই। তাহার সম্বল কেবল কান্না আর ভগবানকে ডাকা।

আমার বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। আমাদের গ্রামখানিতে মুসলমানেরই বাস। দুই একঘর মাত্র নীচ শ্রেণীর হিন্দুর বাস আছে। আমাদের বেশ জমীজমা ছিল। তাহাতে আমাদের বসিয়াই চলিত। দাদা ফরিদপুর জেলাকোর্টে উকীলের মুহুরিগিরি করিতেন, আমি আর দাদা, বাবার এই দুইটিমাত্র সন্তান।

ছেলেবেলায় আমি গ্রামের মক্তবে মৌলবী সাহেবের কাছে পড়িতাম। কিছু কিছু শিখিয়াও ছিলাম। বাবার ইচ্ছা ছিল, অল্প স্বল্প কিছু শিখাইয়া আমাকে বাড়ীতেই রাখিবেন। জমীজমাগুলি দেখিয়া

শুনিয়াই সংসার চালাইতে পারিব। দাদা পূজা ও বড়-দিনের ছুটিতে মাত্র বাড়ীতে আসিতেন, কাজেই তাঁহার উপর কোন ভরসা ছিল না।

আমার বয়স যখন সতের বৎসর, তখন আমাদের গ্রামের পার্শ্বের কাসেম আলির কন্যা ফাতেমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইল। কাসেম আলি হাটে দোকান দিত। তাহার ঐ একটি মাত্র কন্যা। বিশেষ পয়সাকড়ি তাহার কিছু ছিল না, কেবল মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী বলিয়াই বাবা এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। কাসেম আলি সাহেবও খুবই আহ্লাদের সহিত এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন; কারণ, আমাদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহার কন্যার কোন ক্লেশ পাইতে হইবে না এ বিশ্বাস তাঁহার সুদৃঢ়ই ছিল।

ফাতেমা আমায় দেখিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম। সে আমার পত্নী হইবে এ কথায় আমার ন্যায় বালকের চিত্তও উল্লসিত হইয়াছিল। বিবাহের প্রসঙ্গের পরও আমি গোপনে দুই তিনবার তাহাকে দেখিয়াছিলাম।

বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়া গেল। পূজার বন্ধে দাদা বাড়ী আসিলে একটা পাকাপাকি কথা হইবে এই স্থির হইল। আমার মনটিও পূজার ছুটির প্রতীক্ষায় ব্যগ্র হইয়া রহিল।

কিন্তু নসীবের ফেরে সব গোলমাল হইয়া গেল। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। আমি সংসারের কর্ত্তা হইয়া বসিলাম। দাদা ত বছরে দুইবার মাত্র আসিতেন।

হুজুর, লুকাইলে আর কি হইবে? অল্প বয়সে টাকা হাতে পাইয়া কর্ত্তা হওয়া যে আল্লার অভিশাপ, তাহা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছি। আমার এই সময় অধঃপতন আরম্ভ হইল। ইয়ারের হল্লায় বৈঠকখানা কাঁপিতে লাগিল। দুই চারজন মুরুব্বি (তাঁহাদের মধ্যে আমার ভাবী শ্বশুর মহাশয়ও ছিলেন) আমাকে উপদেশ দিতে আসিয়া অপমানিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

লোকমুখে শুনিলাম, কাসেম আলি সাহেব নজরুদ্দিনের সহিত কন্যার বিবাহ দিতেছেন। নজরুদ্দিন জুতার মিস্ত্রীর কাজ করিত। তাহার সংসারে আর কেহ ছিল না। কয়েক বিঘা জমী, দুই তিনখানা খড়ের ঘর ও গোটাকতক গরু মাত্র তাহার সম্বল ছিল। কিন্তু কাসেম আলি আমাদের পাকা ইমারৎ ও টাকার সিন্দুক উপেক্ষা করিয়া, সেই অভিভাবকহীন নজরুদ্দিনকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন।

শুনিয়া বড় রাগ হইল। নিজের চরিত্রহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার কথা একবারও মনে হইল না। কাসেম আলিই দোষী, কেবল তাহাই মনে হইতে লাগিল। ইয়ারগণও সরাবের নেশায় মশ্‌গুল হইয়া বুঝাইল, "দু একটা ধমক দিলেই সিধে হয়ে যাবে।"

ধমক দিবার জন্য আমার দূত হইয়া ফজুল সেখ গেল। কি ধমক দিয়াছিল জানি না, কিন্তু ফিরিয়া আসিলে শুনিলাম, কাসেম আলি বলিয়াছে, "ওরকম ছন্নছাড়ার হাতে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়েটাকে বিষ খাওয়ান ভাল।"

আরও দুই চারটা কটু গালি আমায় সে দিয়াছে তাহাও ফজুলসেখ জানাইতে ভুলিল না।

আমি বলিলাম, "বটে? এত তেজ! আচ্ছা দেখে নিচ্ছি।"

ইয়ারের সহিত নিত্য পরামর্শ চলিতে লাগিল, —কিরূপে কাসেম আলিকে জব্দ করা যায়। কেহ বলিল, 'উহার ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হউক।' কেহ বলিল 'চোরাই মাল উহার অজ্ঞাতসারে উহারই বাড়ীর মধ্যে রাখিয়া পুলিসে ধরাইয়া দেওয়া হউক।' কেহ বলিল 'না। উহাকে রাত্রিতে উত্তম মধ্যম দেওয়া হউক।' কিন্তু এসব মতলবের কোনটিই আমার পছন্দ হইল না।

এই সময় একবার দাদা কিছুদিনের ছুটি লইয়া বাড়ীতে আসিলেন। তিনি আসাতে একটা সুবিধা হইয়া গেল। আমাদের পারিবারিক মান সম্ভ্রম সম্বন্ধে তাঁহার বড় খড়দৃষ্টি ছিল। আমার ইয়ারেরা যখন তাঁহাকে বুঝাইল যে বিনা কারণে কাসেম আলি

কন্যার বিবাহ আমার সহিত না দিয়া নজরুদ্দিনের সহিত দিতেছে, তখন দাদাও খুব চটিয়া গেলেন। "কি! আমাদের কি যে সে বংশ পেয়েছে? কাসেম আলির ভাগ্য যে আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার কথা তাকে বলা হয়েছিল। আচ্ছা, দিচ্ছি ঠিক্ করে।"

কিন্তু ঠিক করা আর হইল না। নজরুদ্দিনের সহিত ফাতেমার বিবাহ শীঘ্রই হইয়া গেল। আমাদের নিমন্ত্রণ হইল না।

তখন একটা প্রতিশোধের মৎলব আঁটিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে আবার সভা বসিল। এবার দাদাই অগ্রণী। আমার চেয়ে এবার দাদার উৎসাহই অধিক দেখা যাইতে লাগিল।

বাড়ী পোড়ান, চোরাই মাল লুকান প্রভৃতি প্রস্তাব দাদা পাগলামি বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, "ও সব কিছু হবে না। উল্টে নিজেরা ফ্যাসাদে পড়তে হবে। তার চেয়ে আমি যে মৎলব দিচ্ছি,—এক ঢিলে দু পাখী মারা যাবে।"

আমরা উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম, "কি রকম?"

দাদা ফরাস চাপড়াইয়া বলিলেন, "আরে, বৃথাই কি এতদিন উকীলের মুহুরুগিরি করে এলাম? নতুন উকীলরা এখনও আমার কাছে পরামর্শ নিতে আসে। আমি যা মৎলব দিচ্ছি, এ একেবারে অব্যর্থ। কাসেম আলির নামে মোকদ্দমা কর্‌তে হবে।"

আমরা মামলা মোকদ্দমার কথা কিছু জানিতাম না। নামমাত্র শুনিয়াছিলাম। দাদা সে বিষয়ে যে একজন পাকা ওস্তাদ তাহাতে আমাদের এক জনেরও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে, মোকদ্দমাটা কি রকম হইবে তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিসের মোকদ্দমা?"

দাদা আমায় বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে ডেপুটি বাবুর কাছে দরখাস্ত দেবে যে তোমার স্ত্রী ফাতেমাকে তার বাপ কাসেম আলি নজরুদ্দিনের সহায়তায় তোমার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে গেছে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "আমার স্ত্রী ফাতেমা!"

দাদা হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, তোমার স্ত্রী।" তারপর আমাদের বিস্ময় দেখিয়া বলিলেন, "তোমার কোনও চিন্তা নাই। ফাতেমা যে তোমার স্ত্রী তা' আমি সাক্ষীসাবুদ দিয়ে প্রমাণ করে দোব।"

পরদিন মহকুমা কোর্টে মোকদ্দমা রুজু হইয়া গেল। ডেপুটি বাবু আমার জবানবন্দী লিখিয়া লইলেন। আমি দাদার কথা অনুযায়ী বলিলাম, "ফাতেমা আমার স্ত্রী। তাহাকে তাহার বাপ ও নজরুদ্দিন নামে একটা বদ্‌মাস্ লইয়া গিয়াছে। কাসেম আলির অভিপ্রায়, আমার সহিত ফাতেমার বিবাহ অস্বীকার করিয়া নজরুদ্দিনের সহিত তাহার আবার বিবাহ দিবে।"

জবানবন্দী লেখা হইয়া গেলে ডেপুটি বাবু কাসেম আলি ও নজরুদ্দিনের নামে সমন হুকুম করিলেন ও ফাতেমাকেও হাজির হইবার জন্য আদেশ দিলেন।

আমাদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে! এইবার বাছাধন যাবা কোথায়? নির্দ্ধারিত দিনে যখন কাসেম আলি ও নজরুদ্দিন আসামীর কাঠগড়ায় উঠিল এবং আমার ডাক হইল, তখন আমি অম্লানবদনে হলফ্ লইয়া বলিয়া গেলাম যে ইহারাই আমার স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছে। ফাতেমাও অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া আদালতের এককোণে দাঁড়াইয়া ছিল।

দাদা আমাদের পক্ষে এক জবরদস্ত উকীল দিয়াছিলেন। আসামীর উকীলও নেহাৎ খেলো ছিল না। আমার জবানবন্দী হইয়া গেলে, আসামীর উকীল আমাকে বহু প্রকারে জেরা করিয়া নাস্তানাবুদ করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু আদালতের ব্যাপার দাদার কিছুই অগোচর ছিল না। কোন্ কোন্ প্রশ্ন হইবে এবং তাহার কি উত্তর দিতে হইবে তাহা দাদা আমায় আগে হইতেই শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই উকীল বহু চেষ্টা করিয়াও আমাকে ঠকাইতে

পারিলেন না। দুই একটা অপ্রত্যাশিত প্রশ্নও হইল বটে কিন্তু আমি সেগুলিরও ঠিক ঠিক উত্তর দিয়া দিলাম।

ডেপুটি বাবু তখন ফাতেমার এজাহার লইতে আরম্ভ করিলেন। প্রকাশ্য আদালতে অত লোকের সম্মুখে অবগুণ্ঠনবতী বালিকা কাঁপিতে কাঁপিতে সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিতা ও স্বামী ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। ফাতেমা মৃদুস্বরে জবানবন্দী দিল। বলিল, নজরুদ্দিনই তাহার স্বামী, আমার সহিত তাহার কোনও দিন বিবাহ হয় নাই।

আমাদের পক্ষের জবরদস্ত উকীল বাবু তখন ফাতেমাকে জেরা করিতে উঠিলেন। দাদা তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। কখনও চোখ্ রাঙ্গাইয়া কখন ধমকাইয়া উকীল বাবু এমন সব প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যে, কাসেম আলি ও নজরুদ্দিন লজ্জায় অধোবদন হইয়া গেল। ফাতেমাও কাঁদিয়া ফেলিল। আমি ভাবিলাম, আর কেন? ইহাই যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে।

আইন যে এইরূপ তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এত সহজে একজন নির্দ্দোষ লোককে প্রকাশ্য আদালতে আনিয়া অপমানিত করা যাইতে পারে, ইহা আমার কল্পনারও অতীত ছিল। আট আনার একখানা ষ্ট্যাম্প কাগজে দরখাস্তের ফল এমন সাংঘাতিক! বড় বড় পণ্ডিতেরা নাকি আইন তৈয়ার করিয়াছেন!

আমি স্তব্ধ হইয়া এই কথা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় ডেপুটি বাবু রায় দিলেন, "আসামী খালাস।" ফাতেমা যখন আমার সহিত তাহার বিবাহই স্বীকার করিতেছে না তখন কাসেম আলি ও নজরুদ্দিনের বিরুদ্ধে কোনও মামলা চলিতে পারে না।

কাসেম আলি ও নজরুদ্দিন ডেপুটি বাবুকে সকৃতজ্ঞ সেলাম করিয়া, আমার দিকে একটু ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাসি হাসিয়া, ফাতেমাকে লইয়া আদালত পরিত্যাগ করিল। আমার ও আমার ইয়ারগণের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। এ কি হইল! দাদা আমার হাত ধরিয়া আদালত হইতে বাহিরে আসিলেন। আমি দাদাকে বলিলাম, "দাদা, এ কি হ'ল?"

মোকদ্দমা হারিয়াও দাদা হাসিলেন,—তাঁহার প্রফুল্লতা কিছু মাত্র কমে নাই। বলিলেন, "এ রকম ঘট্‌বে তা আমি আগে থাকৃতেই জানতাম। তুমি কি আজকেই ফাতেমাকে অন্দরে নিয়ে যাবে এঁচেছিলে নাকি? এ কেবল ভিত্ গাড়া হ'ল। আসল ইমারৎ গড়া এইবার আরম্ভ হ'বে। ফৌজদারীতে হবে না, দেওয়ানী করতে হ'বে।"

দাদার কথায় আমরা আশ্বস্ত হইলাম। দাদার উপর আমাদের এতই বিশ্বাস ছিল যে, কাসেম আলির বাড়ীতে মোকদ্দমা জয়ের পর সিন্নি চড়ান ও খানার কথা শুনিয়াও আমরা কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হইলাম না। এই পরাজয়কে ভবিষ্যৎ জয়ের প্রথম সোপান ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

সত্যই এবার ফৌজদারী নহে, দেওয়ানী আদালতে মুন্‌সেফ্ বাবুর নিকট ফাতেমার সহিত আমার দাম্পত্য স্বত্ব সাব্যস্তের মোকদ্দমা রুজু করা হইল। এবার আর দাদার তাড়া নাই। জবরদস্ত উকীল বাবুকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়া দাদা কার্য্যক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন, মোকদ্দমার কেবলই দিন পড়িতে লাগিল।

সেও আমার কাছে এক নূতন ব্যাপার। মোকদ্দমার যে এত দিন পড়িতে পারে, এত রকমারি ওজর তুলিয়া যে মোকদ্দমা মুলতুবি লওয়া যাইতে পারে, তাহা আমার কিছুমাত্র জানা ছিল না। জবাব দাখিলের জন্য দিন পড়িল, ইস্যু ধার্য্যের জন্য দিন পড়িল, সাক্ষীর নামে সমনের জন্য দিন পড়িল, সাক্ষীর নামে ওয়ারেন্টের জন্য দিন পড়িল, সাক্ষীর মাল ক্রোকের পরওয়ানা জারির জন্য দিন পড়িল—আরও কত-কির জন্য দিন পড়িল তাহা আমার মনে নাই। হুজুর হাকিম, বুঝিতে পারবেন। কাসেম আলি ও নজরুদ্দিন সাক্ষী সাবুদ সঙ্গে আদালত আর ঘর করিতে লাগিল। উকীলের মুহুরিকে বক্‌সিস্, পেস্কারকে মোকদ্দমার দিন জানিবার জন্য উৎকোচ, উকীলের ফীজ্, সাক্ষীগণের খোরাকি,

কোর্ট ফী প্রভৃতিতে কাসেম আলির অর্থ জলের মত ব্যয় হইতে লাগিল। আমার পয়সার ভাবনা ছিল না, যত দিন পড়িতে লাগিল, তত কাসেম আলি ও নজরুদ্দিনের মুখ শুকাইতে লাগিল। বুঝিলাম, এতদিনে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষপ্রায়। আমরাও জবরদস্ত উকীল বাবুর দ্বারা কেবলই মুলতুবী লইতে লাগিলাম।

প্রায় সাত আট মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। আমরা হাসি কিন্তু বিপক্ষ যতদূর নাকাল হইবার তাহা হইতেছিল, কাসেম আলির অনুপস্থিতেতে দোকানও ভালরূপ চলিতেছিল না। নজরুদ্দিনের মিস্ত্রীর কাজও বড় সুবিধার ছিল না। মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে বিরক্ত হইয়া সহজে আর কেহ তাহাকে কাজ দিত না।

শুনিতাম, ফাতেমা এই সময় অসাধারণ পরিশ্রম করিত। কৃশানদের সহায়তায় ফসল দেখা, ধান ঘরে আনা, চাউল তৈয়ার করা প্রভৃতি পুরুষের কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধন, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল আনা, বাসন মাজা প্রভৃতি মেয়েদের সকল কাজই সে করিত। সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া গেলে তাহার সামান্য যে দুই চারখানি অলঙ্কার ছিল তাহাও সাগ্রহে সে খুলিয়া দিয়াছিল। আমরা এ সকল কথা শুনিয়া হাসিতাম। বলিতাম "এবার ? কেমন মজা টের পাচ্ছ ত ?"

অবশেষে সত্য সত্যই আর মুলতুবি লওয়া গেল না। মোকদ্দমা আরম্ভ হইল।

ইহার পূর্ব্বেই দাদাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। দাদা আসিয়া পড়িলেন। তখন প্রত্যহ রাত্রিতে আমাদের বাড়ীতে সাক্ষীদের বৈঠক বসিতে লাগিল। টাকা দিয়া জন পাঁচ ছয় সাক্ষী হাত করা হইয়াছিল। দাদা নিজে তাঁহাদের শিখাইবার ভার লইলেন। দশ পনর দিন অনবরত শিখানর পর দাদা তাহাদিগকে 'তৈয়ার' বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তাহারা একেই পাকা লোক, বহুবার মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার উপর দাদার শিক্ষায় একেবারে 'ওস্তাদ' হইয়া উঠিয়াছিল।

মুন্সেফ্ বাবুর আদালতে মামলা আরম্ভ হইল। প্রথমে আমার জবানবন্দী হইয়া গেল। দাদার শিক্ষামত আমি বলিয়া গেলাম, অমুক মাসে অমুক তারিখে আমার সহিত ফাতেমার বিবাহ হয়; মৌলভী তায়েবুদ্দিন মোল্লা ও ইয়াকুদ্দিন উকীল ছিলেন। গাওয়াদের নামও বলিয়া দিলাম।

তারপর একে একে এই মোল্লা, উকীল ও গাওয়াদের সাক্ষ্য গৃহীত হইতে লাগিল। বিপক্ষ পক্ষের উকীল বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু আমার ও আমাদের সাক্ষীদের জবানবন্দীর মধ্যে কোনও অনৈক্য বাহির করিতে পারিলেন না। দাদার আইন জ্ঞানের উপর আমার যে কতদূর শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল তাহা আর কি বলিব! সাক্ষীদের এজাহার শুনিয়া আমারই মনে হইতে লাগিল, যেন সত্যই ফাতেমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে।

মামলা চলিতে লাগিল। দিনের পর দিন সাক্ষ্য গৃহীত হইল। আমাদের সাক্ষীদের জবানবন্দী হইয়া গেলে প্রতিবাদীরা সাক্ষী দিল। তাহারা গ্রামস্থ নিরীহ লোক। যথার্থ কথাই বলিয়া গেল।

হাকিম বলিলেন, "সাতদিন পরে রায় প্রকাশিত হইবে।"

আমরা বাড়ী আসিলাম। জবরদস্ত উকীল বাবু পকেট ভরা টাকা পাইয়াছিলেন, কাজেই উৎফুল্ল চিত্তে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "কুছ ডর্ নেই।"

রায় বাহির হইবার দিন আদালত আমাদের গ্রামবাসীতে পূর্ণ হইল। এগারটায় সময় হাকিম আসিয়া এজলাসে বসিলেন। প্রথমেই গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "মেহেরুদ্দিন বাদী, কাসেম আলি ও নজরুদ্দিন বিবাদী।"

জবরদস্ত উকীল বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিপক্ষ পক্ষের উকীলও উঠিল। হাকিম রায় পড়িয়া গেলেন। আমি ইংরাজী জানি না, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পড়া শেষ হইলে যখন জবরদস্ত উকীল বাবু হাস্যমুখে হাকিমকে সেলাম করিলেন ও বিপক্ষ পক্ষের উকীল শুষ্ক মুখে বসিয়া পড়িল, তখন বুঝিলাম

আমাদেরই জয় হইয়াছে। বাহিরে আসিতেই সোরগোল শুনিলাম। দেখিলাম কাসেম আলি মূর্চ্ছিত। একটি গাছের তলায় তাহাকে শোয়ান হইয়াছে। নজরুদ্দিন তাহার মুখে জল দিতেছে ও বাতাস করিতেছে।

দাদা আমায় বলিলেন, "দেখ্‌লি ? এ আইনের নাগপাশ। সাক্ষী যদি না ঘাব্‌ড়ায়, তা হ'লে হাকিমের সাধ্য কি হারায় ? এবার পেয়াদা দিয়ে ফাতেমাকে ধরিয়ে আনাব।"

সত্য কথা বলিতে কি, আমার তখনও বিশ্বাস হইতে ছিল না যে আমি ফাতেমাকে পাইব। আদালত হুকুম দিয়া ফাতেমাকে আমার স্ত্রী সাব্যস্ত করিয়া দিলেন, ইহা স্বপ্ন না সত্য! দেখিলাম, সেই মিথ্যা সাক্ষীরা—সেই মিথ্যা বিবাহের মিথ্যা মোল্লা, মিথ্যা উকীল, মিথ্যা গাওয়া—হাসিতেছে ; দাদার নিকট বক্‌সিসের জন্য হাত পাতিতেছে। বাঃ—আইন ত বেশ। আদালত ত বেশ মজার! দাদার কথাই সত্য, সাক্ষী যদি না ঘাবড়ায় তা হলে হাকিমের সাধ্য কি ডিক্রি না দিয়ে যায় ?

কলরব করিতে করিতে ইয়ারেরা আমার সঙ্গে বাড়ীতে ফিরিল। গ্রামের কেহ আমার সঙ্গে কথা কহিল না। মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। মামলার ফলের কথা আগেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

পরদিন সকালে শুনিলাম কাসেম আলি মারা গিয়াছে। একবার তাহার বাড়ীর সামনে দিয়া ঘুরিয়া আসিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু লজ্জায় পারিলাম না। তবু কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, যেন কাসেম আলির মৃতদেহের উপর ফাতেমা লুটাইয়া কাঁদিতেছে, নজরুদ্দিন তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে।

কাসেম আলির মৃত্যুর জন্য আমরা কিছুদিন চুপচাপ রহিলাম। কয়েকদিন পরে দাদার সহিত আদালতে গিয়া আমার সত্ব সাব্যস্তের জন্য কি করা উচিত তাহা জানিতে গেলাম। এক বিবাদী ত মরিয়া এড়াইয়াছে। নজরুদ্দিন তখনও আছে। সে ফাতেমাকে ফিরাইয়া দিক্।

আদালতে গিয়া খোঁজ লইয়া দাদা যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। ইতিমধ্যেই নজরুদ্দিন আপীল করিয়াছে ও আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ফাতেমাকে আমায় সমর্পণ করা হইবে না, এই হুকুম আনাইয়াছে। দাদা ত চটিয়া লাল। বলিলেন, "আচ্ছা। চালা'ক্ না মামলা। কে হারে দেখাই যাবে।"

আবার সেই মামলার তদ্বির আরম্ভ হইল। মুন্‌সেফের আদালত তবু কাছে ছিল, এ একেবারে সদরে, জেলায় গিয়া মামলা করিতে হইবে। কাসেম আলি ও নজরুদ্দিনের সঞ্চিত অর্থ ও ফাতেমার অলঙ্কার অনেক দিন পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। এবার নজরুদ্দিন, কাসেম আলির বাড়ী ও জমী জারাত বেচিয়া ফেলিল। ফাতেমা নজরুদ্দিনের বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিল।

আবার সেই মোকদ্দমার দিন পড়িতে লাগিল। এবার দু'মাস তিনমাস অন্তর দিন পড়ে। আমরা যত পারি মুলতুবি লই, নজরুদ্দিন ততই হয়রাণ হয়। তাহার দেহ কঙ্কালসার হইয়া গেল, চক্ষু কোটরগত হইল। লোকে বলিত, সে ও ফাতেমা একবেলা খাইয়া মোকদ্দমার খরচা যোগাইতেছে। না যোগাইয়াই বা কি করিবে ? এ যে আইনের নাগপাশ, সহজে মুক্তি কোথায় ?

আবার মামলা আরম্ভ হইল। আবার সেই সব। সেই উকীলের বক্তৃতা, হাকিমের ভ্রূভঙ্গী, পক্ষদের ছুটাছুটি, মুহুরিদের উপরি লাভ, চাপরাসীদের বক্‌সিস্। আবার রায় প্রকাশের জন্ত হাকিম সময় লইলেন।

পনের দিন পরে রায় বাহির হইল। সর্ব্বনাশ—আমরা হারিয়া গিয়াছি! বিবাদীর সমস্ত খরচা আমাদের দিতে হইবে!

সেদিন দাদা জজ সাহেবকে যে গালাগালিটা দিলেন, তাহা আর কেহ জানিলে বোধ হয় সেই দিনই দাদার ফাটকে বাস ঘটিত। আমরা বিষণ্ণমুখে গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম। গ্রামের সকলেই দেখি আজ

উৎফুল্ল। কেহ কেহ আমাদের শুনাইয়াই বলিল "ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।"

উহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া বলিল, "আর শুনেছ, ফাতেমার কাল এক ছেলে হয়েছে। তার নাম ফতে-উদ্দীন।"

এরই মধ্যে ফাতেমার ছেলে! আশ্চর্য্যই বা কি? বিবাহের পর প্রায় আড়াই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এর মধ্যে কত মামলা মোকদ্দমা! শেষে আমার পরাজয়ের জীবন্ত সাক্ষী কি মূর্ত্তি ধরিয়া আসিল? আমাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই কি 'ফতে-উদ্দীন' নাম ধারণ করিল?

দাদা বলিলেন, "আচ্ছা ফতে কে করে দেখা যাক্। এখনও হাইকোর্ট আছে।"

আমরা হাইকোর্টে আপীল করিলাম। এবার আর সহজ ব্যাপার নয়। মুঠা মুঠা টাকা খরচ। কৌন্সুলি নিযুক্ত হইয়া গেল। এবার আমাদেরও টাকার টানাটানি হইল। জমীজমা কতক বন্ধক দিলাম। আইনের নাগপাশ এবার আমাদেরও বেশ করিয়া জড়াইয়া ধরিল। নজরুদ্দিনের আর কিছুই নাই। সে একজন উকীল পর্য্যন্ত দিতে পারিল না।

একবৎসর অতীত হইয়া গেল। আমাদের মামলা নিষ্পত্তি হইল না। ফাতেমা এখন শিশুটিকে কোলে করিয়া মাঝে মাঝে গ্রাম-পথে যাতায়াত করে দেখিতে পাই। ছেলেটি বেশ গোল গাল মোটাসোটা। কে বলিবে দুঃখীর ঘরের ছেলে পেট ভরিয়া দুধ খাইতে পায় না।

একদিন টেলিগ্রাম আসিল আমাদের মোকদ্দমার এতদিনে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে। আমরাই জিতিয়াছি। হাইকোর্টের জজেরা মুন্‌সেফের রায়ই বাহাল রাখিয়াছেন। আহ্লাদে দাদা লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এইবার কার ফতে? হাইকোর্টের উপর আর আপীল নাই।"

কথাটা চাপা রহিল না। গ্রামের মধ্যে প্রচার হইয়া গেল। আমরাও আদালতের সাহায্যে ফাতেমাকে পাইবার উপায় করিতে লাগিলাম।

অবশেষে একদিন পরওয়ানা হস্তে আদালতের পিয়নের সহিত আমরা নজরুদ্দিনের গৃহে উপস্থিত হইলাম। গ্রাম ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়া জুটিয়া গেল। মেয়েরাও কিছু দূরে দূরে গাছের আড়াল বা ঝোপের পাশে অবগুণ্ঠন দিয়া দাঁড়াইয়াছে ও উঁকি দিতেছে! ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আমাদের গা ঘেঁসিয়াই তামাসা দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। গ্রামের কেহ ক্রুদ্ধ, কেহ বা বিষণ্ণ।

দাদা ডাকিলেন, "কই, নজরুদ্দিন সাহেব বাড়ীতে আছেন নাকি?"

নজরুদ্দিন বাহিরে আসিল। তাহার শরীর সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বুকের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পাঁজরাগুলি বোধ হয় এক একখানি করিয়া গণা যায়। কোটরগত চক্ষুর চারিদিকে কালিমা। কেশ রুক্ষ, পরিধানে একটা মলিন লুঙ্গী।

দাদা বলিলেন, "এই আদালতের পেয়াদা। ফাতেমা বিবিকে তাহার স্বামীর হাতে দিবে কি না বল?"

'তাহার স্বামীর' কথাটা শুনিয়া গ্রামস্থ দুই একজন 'ছি, ছি' করিয়া উঠিল। দবির সেখ গ্রামের নৌকার মাঝি ছিল। সে নজরুদ্দিনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল, "কত্তা, হুকুম দেন ত এই হালার পুতের মাথাটা দোফাক করে দিই। হালা মুসলমান নয়—কাফের।" দুই তিনজন কৃষকও অগ্রসর হইয়া বলিল, "ঠিক্ বলেছ ভাই, দাও শালাদের ঘা কতক।"

তিন চারিটা লাঠি উঁচু হইয়া উঠিল। নজরুদ্দিন হাত তুলিয়া তাহাদের থামিতে বলিল। তাহার হাত কাঁপিতেছিল।

নজরুদ্দিন ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "ফাতেমা।"

ফাতেমা ছেলে কোলে করিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরিধানের বস্ত্র মলিন, দুই তিন জায়গায় ছিন্ন। তাহার ভিতর হইতে তাহার অপরূপ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনেকদিন দেখি নাই, আজ নিকটে

পাইয়া দেখিলাম। সে রূপ বাইজীর রূপ নহে। আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

ফাতেমার ছেলে অত লোক দেখিয়াও ভীত হইল না। আমি তাহার নিকটেই ছিলাম। সে দিন বেশ-ভূষা করিয়া গিয়াছিলাম। আমার লাল কিঙ্খাবের জামাটার দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

নজরুদ্দিন আমায় সম্বোধন করিয়া বলিল, "মেহেরুদ্দিন সাহেব! আমার বিশ্বাস ছিল যে আদালতে ন্যায় বিচারই হবে। এ রকম হবে তা' স্বপ্নেও ভাবি নি। তা যাই হোক্, এখন আমার একটা কথা। এই আমার স্ত্রী এই আমার ছেলে। আদালতের বিচার যাই হোক্, আল্লা সাক্ষী এ আমারই স্ত্রী, আমারই ছেলে। আপনি মুসলমান, আল্লার নাম নিয়ে বলুন, এ কি আপনি ভাল কচ্ছেন?"

আমার মনটা কেমন করিতে লাগিল। দাদাকে বলিলাম, "আর থাক্, যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, চল আমরা যাই।"

দাদা বলিলেন, "যাব কি? এতদিন মামলা লড়ে জমীজমা বন্ধক দিয়ে শেষে কি একটু কাঁদুনিতেই গলে গেলে নাকি? ও সব মায়াকান্নায় আমি ভুলি না। আর তুমি ছেড়ে দিলেই বা কি হবে? আদালত থেকে সাব্যস্ত হয়েছে ও তোমার স্ত্রী। এখন নজরুদ্দিনের ছেলে জারজ বলে গণ্য হবে।"

শেষ কথাগুলি শুনিয়া নজরুদ্দিন কপালে করাঘাত করিল। ফাতেমা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। অবগুণ্ঠনের ভিতরই গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার ছেলেটি দুই একবার তাহার মুখের দিকে চাহিল। পরে ঠোঁট ফুলাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আদালত থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে ফাতেমা আমার স্ত্রী। আমি ফাতেমাকে তালাক দিলাম। আমি ফাতেমাকে তালাক দিলাম। আমি ফাতেমাকে তালাক দিলাম। আজই তালাকনামা লিখে কাল রেজিষ্ট্রি করে দোব।"

দাদা স্তম্ভিত। হুজুর ত জানেন, তিনবার তালাক বলিলেই আমাদের বিবাহ রদ হয়। ইয়ারেরা কেহ বলিল 'বেকুব,' কেহ বলিল 'আহাম্মুক।'

কিন্তু চটুন দাদা—রাগুক ইয়ারেরা—ফাতেমা ও নজিরুদ্দিন আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িল এবং আমার পায়ের ধূলা লইয়া ফাতেমার ছেলের মাথায় দিল। আমি বলিলাম, "ফতে-উদ্দীনই আজ কাজ ফতে করেছে।"

আর কি বলিব হুজুর। তাহার পরদিনই রেজিষ্ট্রি করা তালাক-নামা লিখিয়া লইয়া নজিরুদ্দিনের বাসায় গেলাম। দেখিলাম বাসা শূন্য। রাত্রিতে নজিরুদ্দিন স্ত্রীপুত্র লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

দাদার সঙ্গে ঝগড়া হইল। তাঁহার সঙ্গে মামলা করিয়া বিষয় উদ্ধার করিতে পারিব না সে বিশ্বাস আমার হইয়া গিয়াছিল। আর আইন ও আদালতের ছায়া মাড়াইতেও ইচ্ছা হইল না। সব দাদাকে ছাড়িয়া দিয়া রিক্তহস্তে পথে বাহির হইলাম।

তারপর একজন ওস্তাদ পাইলাম। তাঁহার কাছেই এই ব্যবসা শিখিলাম। সেই অবধি এই ভালুক নাচাইয়া খাইতেছি আর তালাক-নামাখানা সঙ্গে করিয়া ঘুরিতেছি যদি কোনও দিন ফতেউদ্দীনের দেখা পাই, আদালতের রায়ে তাহার জন্মে যে কলঙ্কের ছাপ মারিয়া দিয়াছে, তাহা এই তালাক-নামায় মুছাইয়া দিই।

* * * * *

"কি রমেশ বাবু! হচ্ছে কি?" বলিয়া সিনিয়ার ডেপুটিবাবু দর্শন দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইজন ভদ্রলোক।

তাঁহাদের দেখিয়াই ভালুকনাচওয়ালা উঠিল। আমি তাহাকে একটা টাকা দিলাম। সে সেলাম করিয়া বলিল, "আইন আদালতের নিন্দা করেছি হুজুর। কিছু মনে করবেন না।" বলিয়া আবার সেলাম করিয়া ঝুলি কাঁধে করিয়া ভালুক ও বাঁদর দুইটা লইয়া চলিয়া গেল।

সিনিয়ার ডেপুটি বাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি? আইন আদালতের নিন্দা? আমরা এর জন্যই দুমুঠো

ভাত পাচ্ছি। এমন জিনিষের নিন্দা? এ দেশেও সোসিয়ালিজ্‌ম্‌ ঢুক্‌ল নাকি?"

অন্য সময়ের মত হাসিয়া ডেপুটিবাবুর কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। কারণ আইন আদালতের কীর্ত্তির একটি জীবন্ত নিদর্শন তখন দূর হইতে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করিল—

"ডুগ্‌—ডুগ্‌—ডুগ্‌—ডুগ। ডুগ্‌—ডুগ্‌—ডুগ্‌—ডুগ্‌।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

লাভ ও ক্ষতি

(গল্প)

১

বনিয়াদ পাকা করিয়া ধীরে ধীরে এণ্ট্রান্স ক্লাশে উঠিতেই বেচারা রাজেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটিল।

পৈতৃক সম্পত্তি যাহা ছিল তাহাতে সংসার চলে না। সুতরাং বিদ্যালয় ছাড়িয়া রাজেন্দ্রকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের চেষ্টা করিতে হইল। পল্লীগ্রামে কর্ম্ম মিলে না। কাজেই একজন দূর আত্মীয়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়াই রাজেন্দ্রকে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়সে কলিকাতায় উমেদারীর অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইল। উমেদারীর মর্ম্ম যিনি কিছুমাত্র অবগত আছেন তিনিই জানেন আজিকার দিনে উমেদারের জীবন কি গভীর লাঞ্ছনা ও হতাশাময়। আফিসের বাহিরে No Vacancyর সমুজ্জল "সাইন বোর্ড" এবং ভিতরে বড়বাবু ও বড় সাহেবদের বিভীষিকা ও বিরক্তি-ব্যঞ্জক ভ্রূকুটি-কুটিল মুখশ্রী!—হতভাগা উমেদারকে যুগপৎ ভীত ও অবসন্ন করিয়া ফেলে!

রাজেন্দ্রনাথের ভাগ্যেও এই "চিরন্তন সত্যে"র কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। দিনের পর দিন সে আফিস হইতে আফিসান্তরে কেবল তাড়না ও গঞ্জনা লাভ করিয়া শুষ্কমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোথাও কিছুমাত্র আশা বা সান্ত্বনা পাইল না।

কিন্তু যে সুশিক্ষা অতি কিশোর বয়স হইতেই রাজেন্দ্রনাথকে তাহার ছাত্রজীবনে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহাই এই দুঃসময়েও তাহার সহায় হইল। রাজেন্দ্র বাল্যকালেই শিখিয়াছিল যে অধ্যবসায় এবং দৃঢ় প্রযত্নই সকল সার্থকতার ভিত্তিভূমি। সুতরাং পুনঃ পুনঃ তাড়া খাইয়াও সে অবশেষে "গ্রেহাম কোম্পানি"র স্থূলোদর বড়বাবু শ্রীযুক্ত হারাধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেই আপনার উমেদারি-সমুদ্রের ধ্রুবতারা বলিয়া অবলম্বন করিতে দৃঢ় সংকল্প হইল।

বলা বাহুল্য এই নবীন উমেদারকে হারাধন বাবু কিছুমাত্র আশা বা উৎসাহ দেন নাই। বরং নিতান্ত সরল ভাবেই তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে আজিকার কালে কর্ম্মপ্রাপ্তি বড়ই দুরূহ ব্যাপার; বিশেষ মুরুব্বির জোর বা পুণ্যবল না থাকিলে এ ব্রতে সিদ্ধিলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু দৃঢ়-ব্রত রাজেন্দ্রনাথ ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহাকে আপনার মুরুব্বি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। সে কিছুদিন আফিসে হাঁটাহাঁটি করিয়া অবশেষে হারাধন বাবুর বাড়ীর সন্ধান করিয়া লইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেখানেই নিয়মিত ভাবে "হাজিরি" দিতে আরম্ভ করিল।

২

উন্নতির জন্য চিরদিন যাঁহাদের পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়, বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে

তাঁহাদের দৃষ্টি স্বভাবতঃই ঊর্দ্ধমুখী হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই ঊর্দ্ধমুখী বক্র দৃষ্টিকে অনুগ্রহপ্রার্থী উমেদারের নত মস্তকের উপর ফিরাইয়া আনিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয়।

এই নিগূঢ় তত্ত্ব রাজেন্দ্রনাথের অবিদিত ছিল না। সুতরাং হারাধন বাবুর ঊর্দ্ধদৃষ্টি প্রতিদিন উপেক্ষাভরে তাহার একান্ত-স্থাপিত এবং সঙ্কুচিত শীর্ণশরীরকে অতিক্রম করিয়া গেলেও সে ধৈর্য্যচ্যুত হইল না।

দিনের পর দিন যথাসময়ে তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনটিকে অধিকার করিয়া সে একান্ত ভাবে বড়বাবুর অনুগ্রহলাভের সাধনা করিতে লাগিল। বাবু কোন প্রকার রসিকতা করিলে সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিল এবং তিনি কোন উপদেশ দিলে করযোড়ে উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল। রবিবারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে বাবুর বাজার করিয়া দিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে মিষ্টান্ন দানে বাবুর অস্পষ্ট-ভাষী এবং লালাস্রাবী পুত্রবরের লালাবৃদ্ধি এবং চুড়ী ও খেলানা-দানে তাঁহার ভেকশিশুহন্ত্রী, ব্যাবৃতাননা, উচ্চ চিবুকাস্থিবিশিষ্টা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যারত্নের বদনবিবরের বিস্তার বৃদ্ধি সাধনেও ত্রুটি করিল না।

তিন মাসের পর এই একান্ত সাধনার কিছু অপ্রত্যক্ষ ফল দেখা দিল। যে কঠোর সত্য প্রভাবে রাজেন্দ্রনাথ বড় বাবুর অনুগ্রহ দৃষ্টি-লাভে অসমর্থ হইল, সেই অলঙ্ঘনীয় সত্যই তাহাকে বড়বাবুর স্ত্রীর স্নেহদৃষ্টি লাভের অধিকারী করিয়া দিল। গৃহিণী শ্রীমতী ভবতারা দেবীর জগতে কাহাকেও উন্নত দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস ছিল না—উচ্চদর্শী স্বামী-দেবতাকেও নহে।

সুতরাং তাঁহার স্বাভাবিকী নিম্নমুখী কৃপাদৃষ্টি একদিন সহজেই এই অধ্যবসায়শীল বিনীত ভক্তটিকে খুঁজিয়া বাহির করিল। একদিন তিনি খোকাকে দিয়া খোকার প্রিয়বন্ধু "লম্ভন" বাবুকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া পাঠাইয়া তাহার পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং সমস্ত শুনিয়া সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে তাহার জন্য কর্ত্তাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

রাজেন্দ্র নবোদ্যমে তাহার কঠোর উমেদারি ব্রতের সাধনায় আত্মসমর্পণ করিল।

৩

"স্বাবলম্বন যাহার মূলমন্ত্র, ভগবান তাহার সহায়"—জ্ঞানীজন প্রচারিত এই অমূল্য উপদেশবাণী যেন সত্য সত্যই রাজেন্দ্রনাথের ভাগ্যে যথাযথ খাটিয়া গেল।

সেদিন প্রাতঃকাল হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল, আফিসের ছুটি হইলে পাচটার পর বৃষ্টি আরও জোর করিয়া আসিল। সুতরাং নিরুপায় হারাধন বাবুকে অগত্যা নিতান্ত অপ্রসন্ন চিত্তে ট্রাম গাড়ীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

ট্রামগাড়ী ভবানীপুরে জগুবাবুর বাজারের নিকট উপস্থিত হইতেই হারাধন বাবু ট্রাম থামাইবার জন্য সবলে ট্রামের দড়ি ধরিয়া টানিলেন। ট্রাম থামিল কিন্তু হারাধন বাবু আপনার বিশাল উদর, লুণ্ঠিত উত্তরীয় এবং বৃষ্টিসিক্ত ছত্রকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া কর্দ্দমাক্ত ধরণী-পৃষ্ঠে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই গাড়ী হঠাৎ ছাড়িয়া দিল। ফলে চাপকান উত্তরীয় ছত্র এবং উদর দ্বারা বিপন্ন বড়বাবু সবেগে দধিবৎ পঙ্কের উপর অকস্মাৎ ধরাশায়ী হইলেন। সহযাত্রীবৃন্দ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু কেহই বিপন্ন বড়বাবুকে উঠাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না।

ঠিক এই সময়ে প্রবল বৃষ্টিধারা উপেক্ষা করিয়া, মসীমলিন পঙ্কের নিবিড় আলিঙ্গন তুচ্ছ করিয়া, দৃঢ় চিত্ত রাজেন্দ্রনাথ বিষন্নমুখে বড় বাবুরই গৃহে তাহার নিয়মিত সান্ধ্য উপস্থিতি রক্ষা করিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। বড় বাবুকে এই প্রকার বিপন্ন দেখিয়া রাজেন্দ্র তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া ত্রস্তভাবে তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইল।

উত্থানের পরেই বড়বাবু বুঝিতে পারিলেন যে প্রতিকূল দৈব তাঁহাকে কেবল সহযাত্রীগণের উপহাস-

ভাজন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহার দক্ষিণ চরণটীকেও যথেষ্ট আহত করিয়া গিয়াছে।

সুতরাং পায়ের উপর ভর দিতে গিয়াই ব্যথিত হারাধন গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

সুতরাং রাজেন্দ্রকে বড়বাবুকে ফুটপাথের উপর বসাইয়া রাখিয়া পাল্কীর অন্বেষণে বাহির হইতে হইল।

পাল্কী আসিলে বেহারাদের সাহায্যে বড়বাবুকে পাল্কীর মধ্যে শোয়াইয়া দিয়া রাজেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিল।

দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া বড়বাবু গভীরতর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। রাজেন্দ্র একজন ভৃত্যের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া বাবুকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। চীৎকার শুনিয়া গৃহিণী কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

বড়বাবু বিপুল আর্ত্তনাদ ও বিলাপ সহকারে বুঝাইয়া দিলেন যে ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া পড়িয়া তাঁহার পা মচ্‌কাইয়া গিয়াছে।

শুনিয়া ঘৃণায় ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া গৃহিণী কহিলেন, "মরুক ছাই—এরই জন্যে এত! আমি মনে করি না জানি কি হ'য়েছে! তা একখানা গাড়ী বুঝি আর জুটলো না? পয়সা বাঁচাবার জন্যে ট্রামে আসা হচ্ছিল! তা এখন আর ষাঁড়ের মত চেঁচালে কি হবে? যাই চুণ হলুদের যোগাড় করিগে। পয়সা খরচ ক'রে ওষুধ কেনা—সে ত আর তোমার কুষ্টিতে লেখেনি!"

গৃহিণী উদাসীনভাবে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু বেচারা রাজেন্দ্রনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে বড়বাবুর পায়ে "জলপটি" বাঁধিয়া দিয়া বাবুকে বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি ডাক্তারখানা থেকে—ওষুধ নিয়ে আস্‌চি।" বড়বাবু কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "আনো বাবা, তা—কত দাম লাগ্‌বে? উঃ কি যাতনা!"

রাজেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিল, "দামের জন্ম চিন্তা নেই। আমি এখনি আস্‌চি!"

সেই গভীর যন্ত্রণার মধ্যেও বড়বাবুর মুখে যেন একটু ক্ষীণ আনন্দরেখা ফুটিয়া উঠিল। রাজেন্দ্র দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যেই রাজেন্দ্র ঔষধ লইয়া আসিয়া স্বহস্তে বড়বাবুর পদসেবায় প্রবৃত্ত হইল।

শুশ্রূষার গুণে একঘণ্টা পরেই বড়বাবুর নিদ্রাবেশ হইল। রাজেন্দ্র নিশীথ রাত্রে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় দিনে বড়বাবু সুস্থ হইয়া উঠিলেন। রাজেন্দ্রনাথ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া বড় বাবুর সেবা করিতে লাগিল।

বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বড় বাবুর ঊর্দ্ধদৃষ্টি নিম্নগামী হইল। তিনি রাজেন্দ্রকে ১লা তারিখে আফিসে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলেন।

রাজেন্দ্রের উমেদারী-জীবনের অবসান হইল; বহুসংখ্যক পুরাতন উমেদার এবং উন্নতিপ্রার্থী নিম্নতন কর্ম্মচারীকে হতাশ করিয়া রাজেন্দ্র একেবারে ৩০্ টাকা বেতনে এক অস্থায়ী কর্ম্মে নিযুক্ত হইল।

৪

অনেকে ছাদে উঠিয়া আর সিঁড়ির মর্য্যাদা রক্ষা করে না। দূরদর্শী রাজেন্দ্রনাথের এ ভ্রান্ত-নীতির প্রতি আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না। রাজেন্দ্রনাথ তাহার উমেদারী জীবনের নিত্য কর্ম্ম, কর্ম্ম পাইয়াও পরিত্যাগ করিল না। সে দৃঢ়তর প্রযত্নে কর্ত্তা ও গৃহিণীর হৃদয় আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রবিবারের অপরাহ্ণ। কর্ত্তা চিরআকাঙ্ক্ষিত মধ্যাহ্ন নিদ্রার পর এইমাত্র উঠিয়া দর্পণের সম্মুখে বসিয়া একান্তচিত্তে কলপের সাহায্যে আপনার চামরশুভ্র গুম্ফরাজির যৌবনশ্রী ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; এমন সময়ে ঝন্ ঝন্ শব্দে কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। স্বয়ং গৃহিণী শ্রীমতী ভবতারা দেবী সিংহবিক্রমে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কর্ত্তা অপ্রস্তুত হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে যৌবনলাভের উপকরণগুলি সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সেগুলি গৃহিণীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না।

গৃহিণী ঘৃণাভরে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "মরণ আর কি! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকলে, এখনও খোকা সাজবার সাধ গেল না!"

কর্ত্তা বিব্রত হইয়া সরিয়া বসিয়া বলিলেন—"না—না—তা নয়—আরও বছর দুই চাকরি করতে হ'বে কিনা—তা কি বল্‌চো?"

গৃহিণী গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কি বল্‌চি? বলি বুদ্ধি সুদ্ধি কি লোপ পেয়েচে? মনাকে তো আর রাখা যায় না। তোমার জন্যে আমার যে লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠলো!"

কর্ত্তা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "তা—তা সে জন্যে চেষ্টার ত ত্রুটি করচিনে—চারিদিকে ঘটক লাগিয়ে দিয়েচি। তা পাত্র না পেলে কি করি বল?"

গৃহিণী হুঙ্কার করিয়া বলিলেন,"পাত্র কি আর এমনি পাওয়া যাবে? আজকালকার দিনে কে আর একটি হত্তুকি নিয়ে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে আসবে? দর ধরালে ছেলে পাওয়া যায় না? দুনিয়ায় আর কারও ছেলে মেয়ের বিয়ে হচ্চে না?"

কর্ত্তা সঙ্কুচিতভাবে মস্তকের কেশমধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে করিতে বলিলেন, "তা আমি ত খরচ করতে নারাজ নই—কিন্তু বরেদের যে বেজায় কামড়! একটু সুবিধা দরে পেলেই—!"

গৃহিণী নিকটে সরিয়া আসিয়া, সহসা স্বর কিছু কোমল করিয়া বলিলেন, "দেখ, একটা কথা কদিন থেকে আমার মাথায় ঘুরচে। তোমার আফিসের ওই রাজেন ছোকরার সঙ্গে একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হয় না? ও তো আমাদের পালটি ঘর। স্বভাব চরিত্রও ভাল বেশ নরম সরম—!"

হতাশমগ্ন হারাধন সূচিভেদ্য অন্ধকারে সহসা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর আলোক দেখিয়া উল্লাসে একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তাও ত বটে! এ কথাটা আমার মাথাতেই আসে নি! রাজেনকে বল্‌লেই সে রাজি হবে। বছরখানেক হোলো তার বৌ মারা গিয়েছে—ছেলে পিলেও নেই—ছোকরা কাজকর্ম্মেও ভাল। বাঃ, বেশ প্রস্তাব করেচ।" কর্ত্তা আনন্দে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "রামা!"

রামা ধূমান্বিত "কলিকা" নিকটবর্ত্তী গড়গড়ার উপর বসাইয়া দিয়া গেল। সেই সুরভিত তাম্রকূট-ধূম সাহায্যে স্বামী স্ত্রীর পরামর্শ মতে স্থির হইল, আগামী রবিবারে রাজেন্দ্রনাথকে মধ্যাহ্ন-আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া সেই দিনই এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে। রাজেন্দ্রের বাপ মা কেহই নাই। রাজেন্দ্রই বাড়ীর কর্ত্তা। সুতরাং তাহার মতই এ বিষয়ে যথেষ্ট।

গৃহিণী সন্তুষ্টচিত্তে রন্ধনশালা অভিমুখে চলিয়া গেলেন। কর্ত্তা প্রসন্নমুখে বৈঠকখানায় আসিয়া উপবেশন করিলেন।

৫

শনিবারে আফিসের ছুটি হইলে বড়বাবু স্নেহভরে রাজেন্দ্রকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন,"বাবা, কাল দুপুরবেলা আমাদের ওখানে দুটি আহার কর্ত্তে হবে। তোমার মার বিশেষ অনুরোধ।"

শুনিয়া রাজেন্দ্র ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। আজ এক বৎসর ধরিয়া রাজেন্দ্র বড় বাবুর চরিত্র আলোচনা করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাতে এই অপ্রত্যাশিত নূতনত্ব তাহার পক্ষে নিতান্ত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইল। সে স্বীকৃত হইয়া চিন্তামগ্নচিত্তে ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

যথাকালে স্নান সমাপন করিয়া রাজেন্দ্র মধ্যাহ্নকালে ধীরে ধীরে বড়বাবুর কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই বড়বাবুর পরিজনবর্গের তাহার প্রতি আচরণে সহসা গভীর পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে বিস্ময় ও উদ্বেগে অধিকতর আকুল হইয়া উঠিল।

ভৃত্য রামা—যে বাজারের পয়সা হইতে তাহার বহুকালের প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজেন্দ্রের জাতক্রোধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাকে আসিতে দেখিলে ক্রোধে ও ঘৃণায় তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইত, সে আজ দ্রুতবেগে সম্মুখে আসিয়া গলায়

গামছা দিয়া গভীর শ্রদ্ধাসহকারে তাহাকে করযোড়ে প্রণাম করিল।

যথেষ্ট পরিপাট্য সহকারে সংসাধিতবেশা মনোরমা, আঁচড় কামড় এবং বিকট মুখভঙ্গীদ্বারা তাহার নিয়মিত অভ্যর্থনা না করিয়া আজ সঙ্কুচিতভাবে তাহার দিকে অপাঙ্গে চাহিতে চাহিতে দ্বারপার্শ্বে সরিয়া গেল।

পাটালি-লেহন-রত বৃদ্ধ খোকা লালাস্রাব করিতে করিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া বলিল, "ওরে থালা দামাই!"

গৃহিণী স্বয়ং একমুখ মিষ্ট হাসি লইয়া অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কর্ত্তা ব্যস্তভাবে তাহার অভ্যর্থনার জন্য হুঁকাহস্তে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়া রাজেন্দ্রনাথের হৃৎপিণ্ড দ্রুত কম্পিত হইয়া উঠিল। আহারের সময়ে আহার্য্যের আয়োজন-বাহুল্য, গৃহিণীর আগ্রহ এবং কর্ত্তার স্নেহাধিক্য তাহাকে অধিকতর বিচলিত করিয়া তুলিল। সে কোন প্রকারে আহার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া বাসায় ফিরিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল।

সুতরাং হস্তে তাম্বুল পাইবামাত্র বড়বাবুকে নমস্কার করিয়া সে দ্রুতবেগে দ্বার অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু আজ স্নেহপরায়ণ বড়বাবু তাহাকে সহজে নিষ্কৃতি দিলেন না। স্নেহের হাসি হাসিয়া বড়বাবু বলিলেন, "সে কি, এত রোদে কি বাসায় যাওয়া হয়! ওই ঘরে শুয়ে একটু আরাম করগে। বেলা পড়লে তখন যেও। তোমার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা আছে। যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যেও।"

বলিতে না বলিতে রামা রাজেন্দ্রকে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে লইয়া গিয়া সুসজ্জিত শয্যা দেখাইয়া দিল।

অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যতা সম্বন্ধে মনে মনে নিষ্ফল আলোচনা করিতে করিতে রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

৬

বেলা ৪টা বাজিতেই হুঁকাহস্তে স্বয়ং বড়বাবু রাজেন্দ্রনাথের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজেন্দ্র-ব্যস্ত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। "আহা থাক্ থাক্—!" বলিতে বলিতে বড়বাবু সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করিলেন।

ক্ষণকাল নীরবে ধূমপান করিয়া অন্যান্য কথার পর বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ভাই বোন ক'টী?"

রাজেন্দ্র বলিল, "আজ্ঞে ভাই বোনের মধ্যে আমিই। একটি ছোট বোন ছিল সেও মারা গেছে।"

কর্ত্তা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আহা হা, তা হ'লে তোমার বাড়ীতে এখন আছেন কে?"

রাজেন্দ্র বলিল, "আছেন কেবল এক পিসিমা আর এক পিস্তুতো ভগ্নী।"

কর্ত্তা অধিকতর দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে তোমার আর ত বিবাহে বিলম্ব করা উচিত নয়। সংসারটা একেবারে নষ্ট হ'তে বসেচে দেখ্‌চি।"

রাজেন্দ্র এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারের ঈষৎ আভাস পাইয়া ব্যাধভয়ে ভীত হরিণের মত চকিত হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি নতমুখে বলিল, "আজ্ঞে বিবাহে আর আমার মোটেই প্রবৃত্তি নেই। যে দিন-কাল পড়েচে, নিজেরই পেট চলে না, তার উপর আর বোঝা বাড়ান্তে আছে?"

শুনিয়া কর্ত্তা সশব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আজ কাল ছেলেদের মুখে প্রায়ই ওই রকম কথা শোনা যায়। ওটা কি একটা কাজের কথা? ছেলে-পিলে-পরিবার এই নিয়েই হ'ল সংসার। তারাই যদি না রইল ত কার জন্যেই বা খাটুনি—আর কার জন্যেই বা রোজগার? সংসার খরচের জন্যে তোমায় ভাবতে হ'বে না। আমরা যত দিন আছি ততদিন তোমার কোন চিন্তা নেই। তা ছাড়া সাহেব আমায় বিশেষ একটু অনুগ্রহ ক'রে থাকেন। আমি থাক্‌তে থাক্‌তে যতটা পারি তোমার সুবিধা ক'রে দিয়ে যাব।

তা—তোমরা আমাদের পালটি ঘর, আর মনাকে ত তুমি ভাল করেই জান!—বুঝেছ কি না—!"

রাজেন্দ্রের শরীরের সমস্ত রক্ত সহসা তাহার হৃৎপিণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুৎসিৎ, কুচরিত্র, কলহ প্রিয় নিষ্ঠুর মনোরমা—তাহার সঙ্গে বিবাহ? রাজেন্দ্র ব্যাকুল হইয়া বলিল "আপাততঃ বিবাহে আমার আদৌ ইচ্ছে নেই—নইলে আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা—সে ত আমার পরম সৌভাগ্য।"

শুনিয়া কর্ত্তা কিছু নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িলেন এবং কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে তাম্রকূট ধূমাকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন সহসা সশব্দে পার্শ্বের দ্বার খুলিয়া গেল। ধরাতল কম্পিত করিয়া স্বয়ং গৃহিণী ভবতারা দেবী দ্রুতপদে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজেন্দ্র চকিত হইয়া উঠিল। গৃহিণী প্রবেশ করিয়াই কর্ত্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পর কখনও আপনার হয়? তুমি যতই খোসামোদ কর না পর কখনো আপনার হয় না। সাধ্য থাকে পরের উপকার কোর, কখনো প্রত্যুপকারের আশা কোরো না। আমি আগেই জানি—"

কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন, "না না, তুমি ভুল করেচ। রাজেন তেমন ছেলে নয়। বিয়ের কথায় ছেলে ছোকরারা সকলেই প্রথম প্রথম অমন ক'রে থাকে। ও সব কিছু নয়। যাই হোক সুমুখেই ব'শেখ মাস। আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আজই একটা দিনস্থির ক'রে ফেলা যাক। কি বল?"

গৃহিণীর তাড়নায় বেচারা আর কি বলিবে?

তখনি পাঁচজন ভদ্রলোকের সাক্ষাতে পঞ্জিকা সাহায্যে বিবাহের দিনস্থির হইয়া গেল।

ফাঁসির হুকুমপ্রাপ্ত আসামীর ন্যায় পাণ্ডুমুখে সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া রাজেন নিজের অন্ধকার কক্ষে চাদর মুড়ি দিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

* * * * *

যথাকালে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। দুই বৎসর যাইতে না যাইতে রাজেন্দ্র ৫০৲ টাকা বেতনে স্থায়ীপদ প্রাপ্ত হইল। বিবাহের পর একমাস যাইতে না যাইতে রুক্ষমূর্ত্তি, আত্মসর্ব্বস্ব, কলহপ্রিয় মনোরমা তীক্ষ্ণ কণ্টকের মত তাহার হৃৎপিণ্ডপার্শ্বে বিদ্ধ হইল। রাজেন্দ্র বিনিদ্র নিশীথে তাহার স্বর্গগতা প্রথমা পত্নীকে স্মরণ করিয়া নীরবে চক্ষু মুছিতে লাগিল।

দ্রুত উন্নতির জন্ম রাজেন্দ্রনাথ তাহার সহকর্ম্মচারীদের সকলেরই হিংসাভাজন হইয়াছিল। সুযোগ পাইলেই সকলে তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া নানা কথা বলিত। কেহ বলিত, "খুব কপাল যা হোক বাবা।" কেহ বলিত "বাবা, একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ। লোকের দুবছরে ১৫৲ টাকা হয় না একেবারে ৫০৲ টাকা!"

শুনিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া রাজেন্দ্র বলিত, "ঠিক বল্‌তে পারিনে ভাই! আজও লাভ লোকসানের হিসেব নিকেশ ঠিক করে উঠ্‌তে পারলুম না।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

পূজা

যে পারে না নরপূজা করিতে সাধন,
নর দেবতার পূজা তার বিড়ম্বন;
লোকহিতে যার চিত্ত না হয় তৎপর,
আপন কল্যাণ তার দূর দূরান্তর;
স্বার্থচিন্তা ছাড়া চিত্তে কিছু নাই যার,
চিন্তামণি চিত্ত মাঝে স্থান কোথা তার!

শ্রীঅনন্তনারায়ণ সেন

মলয় উপদ্বীপে পরিণয়-প্রথা

ব্রহ্মদেশ হইতে যে ভূমিখণ্ড দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহার শেষাংশ মলয় উপদ্বীপ। উত্তর দক্ষিণে এই উপদ্বীপ মোটামুটী ৬০০ মাইল লম্বা, প্রস্থে (পূর্ব্ব পশ্চিমে) ২০০ মাইলের অধিক হইবে না। নানা-স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, দেশের অনেক অংশ এখনও জঙ্গলে আবৃত। এখানকার নদীতে সোনা পাওয়া যায়, তবে বেশী নহে।



১। মলয় যুবতী। বিবাহ হইবে শুনিয়া ভারি খুসী।

এই উপদ্বীপের অধিবাসিগণও বিভিন্ন ধরণের। উত্তরভাগে শ্যাম ও ব্রহ্মদেশবাসীরই প্রাধান্য। মাঝ খানটায় জঙ্গলে অসভ্য মালয়ীরা বাস করে। দক্ষিণাংশে মালয়ীরা য়ুরোপীয় সংস্পর্শে আসিয়া কতকটা সভ্য হইয়াছে।

মালয়ী জাতি শ্রম পরাঙ্মুখ। চীনেম্যান আসিয়া এখানে আড্ডা গাড়িয়াছে—পরিশ্রমের কাযগুলি তাহারাই করিয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করে। মালয়ীগণ বসিয়া বসিয়া দেখে এবং পাণ খায়। পাণ খাইতে তাহারা বড়ই ভালবাসে।

তাহারা শ্রম-বিমুখ, কিন্তু বড় ক্রোধী। তাহাদের এক-প্রকার বক্র সর্পাকৃতি ছুরি আছে—তাহার নাম ক্রিস্। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হইলে তাহারা সেই ক্রিশ দিয়া খুনোখুনী করে। মলয়দেশই Running amok ব্যাপারটার আদিস্থান। এক এক সময় তাহারা এমনই উন্মত্ত হইয়া উঠে যে সম্মুখে যাহাকে পায় তাহা-কেই হত্যা করে। তাহাদের জন্য পুলিসের এক প্রকার হুক্-দেওয়া লম্বা লাঠি আছে। পুলিস গিয়া, ওরূপ ব্যক্তিকে তাহা দিয়া কোনও একটা দেওয়ালে ঠাসিয়া ধরে।

এখন, তাহাদের দেশে প্রচলিত বিবাহপ্রথার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি।

মলয় উপদ্বীপের বহু স্থানেই পর্দ্দা-প্রথা প্রচলিত। তাহাতে যুবক-যুবতীর পরস্পর পরিচয়ের সুবিধা হয় না। তবে মাঝে মাঝে সামাজিক বৈঠক হয়, তখন পর্দ্দা-নিয়ম কতকটা শিথিল করা হয়।

মেনাঙ্কাবু প্রদেশে পর্দ্দার কড়াকড়ি নাই। সে প্রদেশে স্ত্রীলোকেরই প্রাধান্য—তথাকার লোক মাতৃপরিচয়ে পরিচিত হয়।

যে ব্যক্তি কন্যাদান করিবে, সে ত সব সন্ধান করিবেই,—ছেলেটীর স্বভাব চরিত্র কেমন, 'বিদ্যাসাধ্যি' কতদূর, এমন আরো কত কি! অনেক স্থলে বরকন্যার মধ্যে পূর্ব্বাবধি জানাশুনা থাকে। সেজন্য একটু মুস্কিল হয়। বঙ্গদেশের এক ঘটক চূড়ামণিকে দুঃখ করিতে শুনিয়াছিলাম—"হায়! ব্যবসা আর চলে না; পছন্দ আর হয় না! এর হয় ত ওর হয় না,—ওর হয় ত এর হয় না।" বঙ্গ হইতে বহুদূরে অর্দ্ধসভ্য মলয়দেশে পাত্রীপক্ষীয় ঘটককেও এইরূপ খেদোক্তি করিতে শুনা যায়। বঙ্গদেশে আজকাল কোন কোন পাত্রকে নিজ বিবাহে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে দেখা যায়, দুর্ভাগ্য-বশতঃ (সৌভাগ্য?) পাত্রী নীরবতাই অবলম্বন করিয়া থাকেন। মলয়ের কোর্টশিপে পাত্রীর মন না হইলে বিবাহ হওয়া অসম্ভব। স্বয়ং পাত্রীর মতামতের উপর নির্ভর করিতে হয়। পাত্রীর উপরেই দিনস্থির করিবার ভার। সে যদি বলিল—"না, উহাকে আমার পছন্দ হয় না," কিম্বা "এখন আমার বিবাহের ফুরসৎ নাই, হইলে খবর দিব"—পাত্রপক্ষ বেচারারা হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।

সাধারণতঃ বরকন্যার পিতামাতাই প্রথমে উদ্যোগী হয়। বরের পিতা, কন্যার পিতার নিকট লোক পাঠাইয়া খবর লন, মেয়েটী অন্য কোথাও বাগ্‌দত্তা হইয়াছে কিনা। যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে অভিভাবক পক্ষে কথাবার্ত্তা কহিবার একটা দিন স্থির হয়। ছেলের অভিভাবকেরা, মেয়ের বাড়ী যায়। সঙ্গে একটা পাণের বাটা লইয়া যায়—তাহাতে পাণ, সুপারি, চূণ, খয়ের প্রভৃতি সমস্তই সজ্জিত থাকে। সেই দিন, কন্যা-পণটা কত হইবে, অনেক দর দস্তুরের পর তাহা স্থির হইয়া যায়। বরেরা, পণ হিসাবে, অগ্রিম কিঞ্চিৎ কনেদের লোককে দিয়া বাড়ী চলিয়া আসে। য়ুরোপীয় প্রথানুসারে তাহাদের অঙ্গুরীয়-বিনিময় হয় না। কেবল একস্থানে প্রথা আছে, পাত্র নারিকেল-ফুল আকারের দুইটী অঙ্গুরীয় আনিয়া একটী পাত্রীকে, অন্যটী পাত্রীর জনক বা জননীকে দান করে।



২। নানা পক্ষীর আকৃতি ঝুড়ির মধ্যে চাউল ভরিয়া, বিবাহার্থিনী মলয় যুবতী তাহার ভাবী পতিকে উপহার পাঠায়।

বিবাহ পাকা হইবার পর, কোন কোন প্রদেশে বর কন্যা পরস্পরকে কতকগুলি উপঢৌকন প্রেরণ

করে। নানা জাতি পাখীর আকারের ঝুড়ির মধ্যে চাউল ভরিয়া, কন্যা বরকে পাঠায়। বর কন্যাকে পাণ, ডিম্ব ও ফলমুল উপহার পাঠায়।

পাত্র কোন কারণে চুক্তি ভঙ্গ করিলে যৌতুক উপহারাদি সমস্ত বাজেয়াপ্ত হয়, কন্যা না-মঞ্জুর করিলে পণের দ্বিগুণ পাত্রকে খেসারৎ দিতে হয়।

বিবাহে গ্রামের মণ্ডলগণ সাক্ষী থাকে, মোল্লা-দিগকে উপস্থিত থাকিতে হয়। অধিকাংশ সময় উঁইটিপির সম্মুখে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়; পাত্রী উঁইটিপির চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া বলে—'আমি তোমার! তোমার! তোমার!' কোন কোন প্রদেশে অগ্নি রাখিতে দেখা যায়। আসলে, তাহাদের ধর্ম্ম মহম্মদীয় ও হিন্দুধর্ম্মের একটা মিশ্রণ। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে উভয় ধর্ম্মেরই প্রভাব দৃষ্ট হয়।

বিবাহে বঙ্গদেশের কুমারিগণের মনে কিরূপ আনন্দ সঞ্চার হয়, তাহা আমার জানা নাই, (আমাদের কোন পাঠিকার তাহা স্মরণ থাকিতে পারে, তিনি যদি সাহস করিয়া বলিয়া ফেলেন, মন্দ হয় না) মলয়-কুমারীগণ যে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তাহা এই সুন্দরীর (১নং চিত্র) অম্লান-বিকশিত-হাস্যে ও মুখের ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। হয়ত সে উৎকর্ণ হইয়া কখন বাঁশীটি তাহার কাণের ভিতর দিয়া অন্তরে পশিবে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে; মধুর-মিলনের, প্রিয়-সমাগমের আশায় সে আনন্দরাশিকে অন্তরে অবরুদ্ধ রাখিতে অক্ষম—তাহার সর্ব্বাঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছে। আমাদের যুবকের কাছে সে দিন হয়ত বা কোন্ সুদূর অমরার বর্ণ-গন্ধ-বাসিত, নন্দনের আলোকে উদ্ভাসিত, হয় ত সে প্রিয়ার রাজ্যে রাজা হইবার কল্পনায় বিভোর হইয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সেই শুভদিনটিকে স্বপ্নময় করিয়া তুলে। মলয় যুবকেরা সে সুযোগ পায় না। বিশেষতঃ তাহারা পণ দিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছে, দয়িতা-গ্রহণের ঋণশোধ সারা জীবন ভরিয়া তাহাকে করিতে হইবে, সে চিন্তা তাহার অত্যল্প নহে। কাজেই সে বেচারা আমাদের মত, তার 'মুখখানি ভাবিয়ে সারা' হইয়া পড়ে না। তাহার জন্য দ্বারে চতুরশ্ব-বাহিত যান-ও থাকে না, বিবাহ-বাটীতে রৌপ্যপাত্র সজ্জিত তোষাখানার সদ্যঃপ্রসূত অগণিত পক্ষীশাবক-ও থাকে না, চির প্রথামত তাহার ভাবী বধূ মাত্র থাকে!

উপদ্বীপে এমন অনেক অংশ আছে যেখানকার অধিবাসীরা অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য। বিসাইসি জাতির মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে—

গ্রামের মধ্যে কোনও একটী প্রকাশ্য স্থানে, উঁইটিপি হইলেই ভাল হয়, উভয় পক্ষ মিলিত হইলে পাত্র দেখা হইয়া থাকে। সেই সময় কন্যাপক্ষীয়গণ গম্ভীরভাবে বসিয়া পাণ চিবাইতে প্রশ্ন করেন—"বাবাজী, নলে



৩। মালয়ী বর-কন্যা "সভাস্থ" হইয়াছে।

ফুঁ দিয়া হাপর জ্বালাইতে পার? গাছ কাটিতে পার? সিগারেট খাইতে জান ত?"

বাবাজী যদি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন, শেষ প্রশ্নটীর তখন কার্য্যতঃ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বাবাজীবন একটি সিগারেট পাত্রীকে দেন এবং স্বয়ং একটি অগ্নি-সংযুক্ত করেন। তখন আদেশ হয়, "কনেকে ধর দেখি।" কন্যা সিগারেট খাইতে খাইতে ছুটিয়া পালায়; এইরূপ। প্রায়ই মোল্লাগণ বিবাহের পূর্ব্বে মস্‌জিদে একটু ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা তাহাদের বিবাহের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে। বিবাহ অনুষ্ঠান কয়েক দিন ব্যাপী। প্রায়ই প্রথম তিনদিন বর ও কন্যাকে নিজ নিজ গৃহে হেনা-রঞ্জিত করা হয় (আমাদের যেমন গায়ে হলুদ) রাত্রে ভূতপ্রেত প্রভৃতির অমঙ্গলজনক প্রভাব দূরীকরণার্থ অনুষ্ঠানাদি হইয়া থাকে। উভয় গৃহে বিশেষ বিশেষ



৪। মাঝখানে কৃত্রিম "পাণের গাছ"। বর যখন বিবাহ করিতে যায়, এইরূপ "পাণের গাছ" শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে যায়। পাণের গাছের দুই পার্শ্বে, নিম্নে, নিমন্ত্রিতগণকে "মর্য্যাদা" দিবার ডিম্ব।

উইটিবির চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, "বর" পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করে। কৃতকার্য্য হইলে বিবাহ পাকা হইল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অক্ষম হইলে, পরে আবার কোনও দিন পুনরায় পরীক্ষা চলিতে পারে।

অপেক্ষাকৃত সভ্য মলয়বাসিগণের বিবাহ ব্যাপার আত্মীয় বন্ধু মিলিত হইয়া, বর অথবা কন্যাকে মলয়-প্রথা অনুসারে অভিবাদন করিয়া জাফরাণে রঙ-করা মুঠা মুঠা ভাজা চাল ছড়াইয়া দেয়, তাহার পর পিঠুলি গোলা লইয়া বরকন্যার কপালে মাথাইয়া দেয়, তাহার পর বরের বা কন্যার হাতে পায়ে মেহদি পাতা বাঁটা লাগাইয়া দেয়। চতুর্থ দিনে বর শোভাযাত্রা



৫। মালয়ী বিবাহের অলঙ্কারের নমুনা।

করিয়া কন্যার গৃহে গমন করে। রঙীন কাপড়ে সাজাইয়া একটি পানের গাছ সঙ্গে সঙ্গে যায়। ৪ নং চিত্রে এইরূপে ব্যবহৃত পাণগাছটি দেখা যাইতেছে। যাহারা প্রাচীনপন্থী তাহাদের অগ্রে অগ্রে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গমন করে। পাড়াগাঁয়ে বর কোন আত্মীয় বা ভৃত্যের স্কন্ধে চাপিয়া যায়। যাহারা আধুনিক এবং সহুরে তাহারা মোটর কার চড়িয়া যায়। সঙ্গে বাজনা বাজে, বোমা ফোটে। এইরূপে ক্রমে তাহারা কন্যার বাড়ী গিয়া পৌছে।

কন্যাপক্ষীয়েরা তখন দ্বার ধরিয়া দাঁড়ায়—বলে, "দেশের রাণীকে (অর্থাৎ কনেকে) রাজকর দাও, তবে প্রবেশ করিতে দিব।"—বরকর্ত্তা তাহাদের কিছু অর্থ দিলে তবে তাহারা দুয়ার ছাড়ে। কতকটা আমাদের দেশের "গ্রামভাটির" ব্যাপার আর কি! কিন্তু আজকাল মলয় দেশে এ প্রথা উঠিয়া যাইতেছে।

সেখানে পৌছিয়া বর, কন্যাকে বামে লইয়া "সভাস্থ" হয়। বসিবার সময় বর চেষ্টা করে যাহাতে সে কন্যার পোষাকের কতক অংশ চাপিয়া বসিতে পারে। তাহাদের বিশ্বাস, এরূপ করিতে পারিলে, বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব অক্ষুন্ন থাকিবে—স্ত্রী তাহার প্রভু হইয়া উঠিবে না।

বিবাহ সভার যে চিত্রটি প্রদত্ত হইল তাহাতে বর মক্কা গিয়া "হজ" করিয়া আসিয়াছিল—তাহার পাগড়ী পোষাকে বুঝা যাইতেছে যে সে একজন "হাজি"।

এ দিনে বর কন্যাকে এক "দিনের রাজা ও রাণী" অভিহিত করা হয়। সকল দেশের সকল সমাজেই এই একটি রাত্রির জন্য বর যে সৌভাগ্যবান পুরুষ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সেদিন বায়ু উতলা, ধরণী পুলক চঞ্চলা, দিগন্ত সৌরভময়। বাঁশের বাঁশী, সানাই অথবা গোরার বাদ্যির কোনটিই সেদিন অল্প অভ্যর্থনার সামগ্রী নহে। এমন দিন জীবনে বড় বেশী আসে না। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে ধরিত্রী যখন মধুময়ী তখন এই মধু-বাসরের দ্বার তরুণ হৃদয়ের জন্যই উন্মুক্ত হইয়া যায়। তাহার ভিতরে কবির ভালবাসায় সে দিন জগৎ কোলাকুলি করিতে থাকে, বিশ্বের বীণে ঝঙ্কার উঠে, শত চন্দ্রমার জোছনা নিংড়াইয়া পড়ে। সে সুসভ্য দেশেই হৌক, আর অসভ্য দেশেই হৌক!

তবে সভ্যতার পরিমাণে সেই আনন্দ-ক্ষণের পুর্ণ ব্যবহার হইয়া থাকে—সভ্যতা-বর্জ্জিত দেশে তাহার সম্ভাবনা নাই।

বর কন্যাকে ঘিরিয়া অনেক অবিবাহিত যুবক যুবতী ঈর্ষাক্ষুব্ধ নেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া থাকে। এই দিল্লীকা লাড্ডুর আশে পাশে

তাহারা মক্ষিকার মত গুণ গুণ করিয়া বেড়ায়। তাহাদের সম্মুখে আরব্য ধর্ম্ম সঙ্গীত হইতে থাকে; নাটকাদি অভিনয়, তরবারি ক্রীড়া ও অন্যান্য প্রকার উৎসবেরও আয়োজন হয়।

তাহার পর বিবাহ। বরক'নে পরস্পরের সম্বন্ধ-সূচক প্রতিজ্ঞা বিনিময় করে। তাহার পর, পরস্পরকে ভাত খাওয়াইয়া দেয়। এই ভাত বিশেষ তদ্বিরের সহিত প্রস্তুত হয়, ইহার নাম "রাজকীয় অন্ন"। তিন-তালা একটি আটকোণা পাত্রে এই অন্ন রক্ষিত থাকে। তাহার ভিতর রং করা চিত্রকরা অনেকগুলি কৃত্রিম ডিম্বও থাকে। সেই সকল ডিম্ব নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে মর্য্যাদা স্বরূপ বিতরিত হয়। ৪ নং চিত্রে "পানের গাছে"র উভয় পার্শ্বে, নিম্নে দুইটি করিয়া যে পদার্থ রহিয়াছে, ঐগুলিই "ডিম্ব"। পূর্ব্বকালে কোনও বিবাহিত ব্যক্তি বিবাহ-নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিয়া, স্ত্রীকে এইরূপ একটি ডিম্ব না দিতে পারিলে, স্ত্রীরা স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ ভঙ্গের নালিশ করিবার অধিকারিণী হইত। ভাবটা বোধ হয় এই, "তুমি অতি নীচ অন্ত্যজ লোক, নহিলে তোমায় তাহারা ডিম্ব দিল না কেন? এমন নীচ লোকের ঘর আমি আর করিব না।" ডিম্ব না পাইয়া অপমানিত বোধ করিয়া, কেহ কেহ ক্রিস্ লইয়া খুনোখুনী ব্যাপার বাধাইয়া দিয়াছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

ইহার পরে বর কন্যাকে মন্ত্রপূত জলে স্নান করান হয়। তখন বালক ও যুবকেরা বাঁশের পিচকারি সাহায্যে জল ছাড়িয়া নিমন্ত্রিতগণকেও বেশ করিয়া ভিজাইয়া দেয়—ইহা একটা আমোদ।

বরের সঙ্গে, অন্য দেশের মতই বরযাত্রীরা আসিয়া আহারের অন্বেষণে কন্যাকর্ত্তার গৃহে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। আহার্য্য প্রস্তুতের বিলম্ব থাকিলে, বেচারারা অস্থির হইয়া উঠে, সে সময় আর কাটিতে চায় না।

দেখা যাইতেছে, সভ্য মালয়ীদের সহিত আমাদের বিবাহপ্রথার কিছু কিছু মিল আছে। কিন্তু একটা বিষয়ে তাহারা আমাদের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। এমন বিবাহ যে, ছাই, দু'দশটা 'স্নেহোপহার', 'আশীর্ব্বাদ' 'মনের কথা', 'প্রাণের কথা'—কিছুই থাকে না। বেচারা-দের দেশে ছাপাখানা নাই, কবিও নাই। মেয়ের এবং ছেলের পিসিমা, মাসিমা, খুড়ীমা, ধাই-মা, নেইমার অভাব নাই, কিন্তু তাহারা একান্তই অকবি। ছাপাখানা নাই, এ একটি বাজে অজুহাত! আজ যদি আমাদের দেশে ছাপাখানা উঠিয়া যায়, তবেই কি বিবাহ-কবিতা বন্ধ হইবে বলিয়া কেহ মনে করেন? মোটেই না। কবিতার দুই একশত নকল হাতে লিখিয়া বিবাহ বাটীতে বিতরণ করিতে পারেন, এমন কবির অভাব বাঙ্গলা দেশে নাই।

কবি গাহিয়াছেন—"বিয়ে হয় না লুচি ভিন্ন"—আজকাল লুচি ভিন্নও বিবাহ হইতে পারে; কবিতে কিন্তু না হইলে বিবাহ একদম না-মঞ্জুর! হায় দুভাগ্য মলয়! তোমাদের দেশে বিবাহের প্রধান উপকরণই নাই!

বঙ্গদেশের তুলনায় মলয়ের বিবাহ সংঘটনে অনেক ত্রুটি আছে। তন্মধ্যে যে কয়টি প্রধান, তাহার উল্লেখ করিতেছি। কোন বিশ্ববন্ধু সেগুলি নিরাকরণার্থ সচেষ্ট হইলে তাহাদের পরম কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

পাঠক পাঠিকাগণ লক্ষ্য করিবেন—এই কয়টি প্রধান ত্রুটি—

বিবাহে (১) কবিতার দুর্ভিক্ষ; (২) বাসর ঘরের অনুষ্ঠান নাই; এবং (৩) পাত্র পণ পায় না, উল্টা পণ দিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে হয়। পুত্রের ব্যবসা যে আজকালের বাজারে বেশ লাভজনক ব্যবসা তাহা কি তাহারা অবগত নহে?

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

রত্ন-কণিকা

(১)

প্রিয়ায়া বিরহে রামো ববন্ধ সরিতাং পতিম্ ।
ময়া নয়নজং বারি বারিতুং নৈব শক্যতে ॥

জানকী বিরহে রাম বেঁধেছিল সাগর অপার,—
পারিনা রোধিতে আমি বিচ্ছেদের অশ্রু-বারিধার ।

(২)

যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তা সখি যোষিতঃ ।
অস্মাকন্তু গতে নাথে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী ॥

ভাগ্য তার যে বিরহে স্বপ্নে পায় প্রিয় সম্মিলন,
বিধি বিড়ম্বনে মোর নাথ সনে নিদ্রা অদর্শন ।

(৩)

নিরর্থকং জন্ম গতং নলিন্যা
যয়া ন দৃষ্টং তুহিনাংশুবিম্বম্ ।
উৎপত্তিরিন্দোরপি নিষ্ফলৈব
দৃষ্টা প্রফুল্লা নলিনী ন যেন ॥

বৃথা জন্ম নলিনীর না হেরিয়া চাঁদের বদন ;
শশাঙ্ক জনম ব্যর্থ সরোজের না পেয়ে দর্শন ।

(৪)

কমলিনি কলয় বিকাশং
মা কুরু নিরাশং সমাগতং মধুপং ।
যদি বাধা মধুদানে
সৌরভদানে কা তব হানিঃ ॥

সমাগত মধুপেরে ক'রোনা নিরাশ
হে নলিনী, খোল তব আঁখি,
মধু বিতরণে যদি লাগে মনে ত্রাস,
রেখোনা সুরভি তব ঢাকি ।

(৫)

যান্তু মে দধিদুগ্ধানি প্রাণা যান্তু ন শোচনম্ ।
অখ্যাতিরিতি তে কৃষ্ণ মগ্না নৌর্নাবিকে ত্বয়ি ॥

দধিদুগ্ধ ডুবে থাক্, যাক প্রাণ, নাহি খেদ তায় ;
ডুবিলে তোমারি নিন্দা, কর্ণধার, তুমি যে নৌকায় !

(৬)

নহিচ্ছায়াদানৈঃ পথিকজনসন্তাপহরণং
ফলৈর্বা পুষ্পৈর্বা ন সুরমনুজপ্রীণনবিধিঃ ।
অতস্তাং মন্দারদ্রুম সহজমেতৎ অনুচিতং
বৃতির্ভূতো রক্ষস্যপরমপরেষাং ফলমপি ॥

পথশ্রান্ত পথিকের ছায়াদানে শ্রান্তি নাহি হর,
ফলপুষ্পে দেবনরে, হে মন্দার, তৃপ্ত নাহি কর,
অপরের দানব্রতে বৃতি হয়ে হও প্রতিবাদী—
খলের স্বভাব এই চিরন্তন অনন্ত অনাদি ।

(৭)

কিন্তেন হেমগিরিণা রজতাদ্রিণা বা
যত্র স্থিতা হি তরবস্তরবস্ত এব ।
বন্দামহে মলয়মেব যদাশ্রিতানি
শাখোটনিম্বকুটজা অপি চন্দনানি ॥

ওগো হেমগিরি, রজত-শিখরী
কি গুণ তোদের হায় !
যে তরু জন্মে তোদের অঙ্কে
কি ফল তাহারা পায় ?
শাখোট নিম্ব কুটজ যেথানে
চন্দন গুণ ধরে,
বার বার করি বন্দিছে কবি
সে মলয় গিরিবরে ।

(৮)

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্ ।
সমুদ্রমন্থনে লেভে হরির্লক্ষ্মীং হরো বিষম্ ॥

কপালের বলে সব ফল ফলে,
বিদ্যা ও পৌরুষ কিছুই নহে,
সাগর সেঁচিয়া লক্ষ্মী পান হরি
হলাহলে হরকণ্ঠ দহে ।

(৯)

কিং ক্রমঃ শশিনো ভাগ্যঃ হরস্য শিরসি স্থিতিঃ ।
অভাগ্যমপি কিং ক্রমঃ স্থিত্বা তত্রাপ্যপূর্ণতা ॥

চন্দ্রমার শুভাদৃষ্ট, হরশিরে বসতি যাহার,
সেখানেও অপূর্ণতা, কপালের লেখা যাগ্য নার !

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় ।

নিঠুর শমন

মরণরে !

হেথাও আসিয়া তুমি দিয়ে গেছ দেখা ?
দু'টি প্রাণ এক সনে,
জেগে ছিল ফুল্ল মনে,
ফুটিল আনন্দ প্রীতি কনকের রেখা ;
কোথাও ছিলনা শ্রান্তি,
ছিল শুধু সুখ শান্তি,
হায়, মানবের ভ্রান্তি কপালের লেখা !
হেথাও নিঠুর, তুমি দিয়ে গেছ দেখা ?

একটু কাঁপেনি কর কেড়ে নিতে তা'য় ?—
এত ভক্তি প্রীতি স্নেহ,
এমন সুখের গেহ,
হেলায় চরণে দলি' নিয়ে গেলে হায় ?
কতগুলি কচি হিয়া
তাপে গেল শুকাইয়া,
চেয়ে দেখিলে না তাও—খেয়ালে স্বেচ্ছায়,
নিবা'লে সৌভাগ্য-দীপ, ছেলে-খেলা প্রায় ?

এই সব চন্দ্রাননে শুষ্ক ম্লান হাসি,
ক্ষুব্ধ স্তব্ধ হিয়া হায়,
যা' চাহে তা' নাহি পায়,
নিবিড় আঁধার ভরা পরাণ উদাসী !
না হ'তে অষ্টমী পূজা,
বিসর্জ্জিতা দশভুজা !—
শূন্য বৃন্দাবন হায়, স্তব্ধ হ'লো বাঁশী !
হা মরণ ! নিবায়েছ হেন আলোরাশি !

বোঝ না কি মানবেরো আছে প্রয়োজন ;
আছে তার স্নেহ প্রেম,
সেও চাহে শুভ, ক্ষেম,
তারো আছে সাধ আশা প্রাণের বন্ধন ;
"ক্ষুদ্র" ক্ষোভ নহে তার,
সীমা আছে সহিবার,
তারো আছে অনুভূতি আছে প্রাণ মন ;
সত্য সে পাষাণ নহে,
আগুনে ফেলিলে দহে,
ব্যথা পেলে আঁখি ঝরে, সুখে তৃপ্ত মন ;
সেও সদা সুখে দুখে
চেয়ে থাকে প্রিয়মুখে,
সেও চাহে সহযোগী আপনার জন ;
তারো মনে সাধ আশা,
তারো প্রাণে ভালবাসা,
তথাপি সে নিরুপায় কেন গো এমন—
কি হেঁয়ালি, হে খেয়ালী নিঠুর শমন ?

শ্রীমানকুমারী বসু

ননী খানসামার ছুটি যাপন

(চিত্র)

(১)

বর্ষাকাল; সমস্ত দিনই ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। থাকিয়া থাকিয়া এক একবার বৃষ্টি ধরিতেছিল বটে, কিন্তু তাহা পুনর্বর্ষণেরই নবোত্তম সূচনা জন্য। সমস্ত আকাশটা বৃষ্টি-সম্ভাবিত 'আমানি' মেঘে ধূসর-মলিনতায় লিপ্ত হইয়া ছিল। মাঝে মাঝে হু হু রবে এক একটা দমকা বাতাস, শীতকম্পিত ওষ্ঠে আকুল হুঙ্কার ছাড়িয়া যাইতেছিল। সদ্য-বিগত গ্রীষ্মের তপ্ত-আলিঙ্গন-মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতি, এখন যেন নীরবে, নিশ্চিন্ত আরামে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া বর্ষার জলে স্নান করিতেছে।

মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিয়া, বাম হাতে জুতা ও ছাতা লইয়া, এবং ঘাড়ে রঙীন টিনের ট্রাঙ্কসহ বিবিধ দ্রব্য-সামগ্রীপূর্ণ প্রকাণ্ড মোট বহিয়া, বলিষ্ঠ যুবক ননী হাজরা বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে সদর ঘাটে আসিয়া, নৌকাযোগে নদী পার হইয়া, চারি ক্রোশ পাকা রাস্তা হাঁটিয়া যখন তাহার নিজ গ্রামে যাইবার মেঠো পথে 'আলের' মাথায় নামিল, তখন বেলা প্রায় পড়িয়া গিয়াছে।

সমস্ত দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা ও সুদীর্ঘ পথশ্রমে, ননীর সেই অসুরের মত কঠিন শক্ত দেহ যেন কাবু হইয়া আসিয়াছিল। বিশেষতঃ মাঠের পথে নামিয়া, পিচ্ছিল কর্দ্দমাক্ত আইলের উপর দিয়া সাবধানে সতর্ক পদক্ষেপে চলিতে চলিতে, তাহার পা দুইটা যেন ক্লান্তিতে অবশ হইয়া পড়িতেছিল,—কিন্তু হায়, তখন পায়ের খবর কে রাখে? ননী সামনের দিকে চাহিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে, নবোত্তমে চলিতে লাগিল।

ছাতা এবং জুতা মাঝে মাঝে হাত বদলাইয়া বহন করার জন্য হাতে সে বিশেষ কিছু ক্লান্তি অনুভব করে নাই, কিন্তু ঘাড়ের মোটটা তো সেরূপ ভাবে বহন করিবার সুবিধা ছিল না। কাজেই, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড হইতে ঘাড়ের সমস্ত অংশ ব্যাপিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।—পথে আসিতে আসিতে ননী অনেকবার ভাবিয়াছে যে এইবার কোন একটা চটিতে বা গাছতলায় মোট নামাইয়া একবার একটু বিশ্রাম করিয়া লইবে, তারপর পুনশ্চ চলিবে,—কিন্তু পরক্ষণেই বাটী পৌছান'র বিলম্ব কল্পনা করিয়া সে সমস্ত আরামের অভিলাষ, পরিত্যাগ করিয়াছে!—'নাঃ, মরিয়া বাঁচিয়া যেরূপেই হউক যদি একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে বাটী পৌছান যায় তো এক মুহূর্ত্ত পরে গিয়া কাজ নাই, আরাম-স্বস্তির লোভ মাথায় থাক', এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনকে শক্ত করিয়া ছুটিতে ছুটিতে ননী সারা-পথটা এড়াইয়া আসিয়াছে।—প্রতি পদক্ষেপেই সে ক্লান্তি পীড়িত মনকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছে—'আর কি, এইবার তো পথ ফুরাইল!'

বৈকালের মেঘাচ্ছন্ন মলিন আলো ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। বৃষ্টি ঝিন্ ঝিন্ করিয়া পড়িতেছিল। কোনরূপে মাঠের পথ পার হইয়া ননী যখন গ্রামের পথে আসিয়া উঠিল,—তখন সহসা আবার সজোরে ঝম্ ঝম্ করিয়া জল পড়িতে আরম্ভ হইল! ননী প্রমাদ গণিল,—

—এইবার বুঝি কোন গৃহস্থ বাড়ীর দাওয়ায় উঠিয়া আশ্রয় না লইলে চলে না, বড় জোর বৃষ্টি আসিয়াছে!

—কিন্তু বাড়ী পৌছাইতে যে বিলম্ব হইবে! ভাবিল, নাঃ থাক, এতটা পথ যখন আসিয়াছি তখন এইটুকুতে আর মরিব না!—ননী হন্ হন্ করিয়া চলিল, বৃষ্টির ছাটে পথ ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না, তথাপি সে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, ছুটিল।

(২)

পশ্চিম পাড়ায় ননীর বাড়ী। বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে

আসিয়া, দ্বার ঠেলিল,—দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। ননী উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল,"চারু, চারু—ওরে চারু, কবাটটা খুলে দে!"

চারুচন্দ্র ননীর একমাত্র ছোট ভাই, এই ভাইটি ছাড়া তাহার আর কোন সহোদর বা সহোদরা নাই। ননীর জননী এই দুইটি সন্তান লইয়া বিধবা হইয়াছিলেন, তারপর অনেক দুঃখ ধান্ধা করিয়া বিধবা রমণী ছেলে দুইটিকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন—এখন দুই ছেলে রোজগারী হইয়া সংসারটা বেশ গুছাইয়া লইয়াছে। বড় ননীলাল বিদেশে মাসিক আট টাকা মাহিনার চাকরীতে, বখ্‌শীস ও পার্ব্বণী প্রভৃতি বাবদে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। ছোট চারুচন্দ্র বাড়ীতে থাকিয়া চাষ আবাদ করিয়া সম্বৎসরের ধান, কলাই ও গুড়টা জুটাইয়া লইতেছে। মাস কতক হইল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এক সমশ্রেণীর উগ্রক্ষত্রিয় গৃহে তাহার বিবাহ হইয়াছে। ননীর বিবাহ তৎপূর্ব্বেই হইয়াছে—এখনও বধূর সন্তান হয় নাই।

ননীর আহ্বানের উত্তরে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, সে আবার চীৎকার করিয়া ডাকিল। পরক্ষণেই ভিতর হইতে হড়াশ্‌ করিয়া হুড়কা খুলিয়া, ঘোমটা পরা একটি সুশ্রী শ্যামবর্ণ তরুণী ব্যগ্র বিস্ময়ে ঝুঁকিয়া উঁকি দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে যুবতীর মুখে একটা আকস্মিক আনন্দের ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিল,—ননী সস্মিত বদনে বলিল, "আমি,—দোর খোল।"

দ্বার মুক্ত হইল,—মোট মাথায় ননীলাল হেঁট হইয়া সাবধানে ছোট চৌকাট পার হইয়া, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল; বলিল, "চারু মাঠ থেকে এসেছে?"

"এসেছিল, ফের বেরিয়ে গেছে।"

"মা কোথা?"

"মা গোপালপুরের খুড়ীর বাড়ী গেছে।"

"দাঁড়িয়ে ভিজো না, দোর বন্ধ করে দাওয়ায় এস" —বলিয়া ননীলাল অগ্রসর হইল। পত্নী সুষা দ্বার ভেজাইয়া দিয়া স্বামীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ননী রোয়াকে উঠিয়া হাতের জুতা জোড়াটা এক পাশে ফেলিয়া, ইতস্ততঃ চাহিয়া বলিল, "তাইত, চারু বাড়ীতে নেই,—মোটটা—"

"তুমি একটু হেঁট হও না, আমি ধরে নামাচ্ছি।"

"পারবে? ভারি মোট কিন্তু।"

"তা হোক; দেখি-ই না"

ননী হেঁট হইল, দুইজনে ধরাধরি করিয়া মোটটা নামাইল; সে তখন একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্লান্তভাবে খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িয়া, ঘাড়ের পিছনে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "ওঃ ঘাড় ফেরাতে পাচ্ছি না,—আড়ষ্ট হয়ে গেছে। ছ ঘণ্টা মোটটা ঘাড়ে বইছি, সাধারণ কথা, বাপ্‌! তুমি পার?" —বলিয়া ননী পত্নীর মুখপানে চাহিয়া পরিহাস ভরে একটু হাসিল।

সুষা সে কথায় কান দিল না। আগ্রহান্বিত মুখে প্রশ্ন করিল, "তুমি কটার গাড়ীতে এসেছ? সারাদিন কিছু খাওনি?"

"না, কিছু খেয়েছি। বর্দ্ধমানে নতুনগঞ্জের বাজার থেকে জলটল খাবার কিনে খেয়েছি। ইচ্ছে করলে হোটেলে ভাত পেতুম,—কিন্তু মোট বইতে হবে বলে তা আর খাইনি।"

"পা ধুয়ে এস, তামাক সেজে দিই—"

"না না,তামাক থাক,পকেটে বিড়ি আছে তাই খাচ্ছি।" —বলিয়া ননী পকেট হইতে বিড়ি ও দেশালাই বাহির করিল,—কিন্তু দেশালাইটা জলে ভিজিয়া গিয়াছিল, জ্বলিল না। ননী দাঁতে বিড়ি চাপিয়া, ব্যর্থ চেষ্টায় দেশালাই কাঠি বাক্সটার গায়ে ঘসিতে ঘসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে দেশালাই আছে?"

"আছে—দিই"—বলিয়া সুষা ঘরে ঢুকিয়া শয্যা-নিম্ন হইতে দেশালাই বাক্স বাহির করিয়া আনিয়া ননীকে দিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি যে ভদ্দর নোক হয়ে পড়েছ, এখন আর তামাক খাও না?"

"ভূতের আবার জন্মবার!—বারমাসই হল ঘুরে বেড়ান, তামাকের সরঞ্জাম কত সঙ্গে করে ঘুরি

বল!"—বলিয়া ননী দেশালাই জ্বালিয়া বিড়ি ধরাইয়া টানিতে আরম্ভ করিল।

"আচ্ছা তুমি ক'টার সময় বর্দ্ধমানের ইষ্টিশানে এসেছিলে!"

"বেলা দশটায়।"

"তোমার মনীব যে এখন তোমায় ছেড়ে দিলেন! সে দিন ঠাকুরপো বল্লে, চিঠিতে তুমি লিকেছ যে এখন তুমি মনীবের সঙ্গে খড়গ্‌পুর যাবে, এখন আর আসবে না, সেই পূজোর পর তবে। তা হলে কি রকম হল?"

"মনীবের খুসী।"

"আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনে প্রথমে চম্‌কে উঠেছিনু।"

"ভেবেছিলে বুঝি আর কেউ এল?"

"আহা, যাও।—আমি মনে করেছিনু বুঝি ঠাকুর-পোই মিছি মিছি ফিরে এসে দুষ্টুমি করছে, শ্বশুরবাড়ী যায়নি—আমি ঠাট্টা করেছিনু কিনা, তাই ফিরে এসেছে!"

"চেরো শ্বশুরবাড়ী গেছে বুঝি?"—বলিয়া মুখ হইতে বিড়ি নামাইয়া ননী পত্নীর মুখপানে চাহিল; সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "সে আজ আর বাড়ী আসবে না?"

"বাড়ী আবার আসবে কি!"

"শ্বশুরবাড়ীতে রাত্তির বাস ধরেছে বুঝি?"

সলজ্জ স্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সুষা বলিল,"ধরবে না!" তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে অনেকখানি ওকালতীর সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। ননী বিস্মিত হইয়া বলিল, "এর মধ্যে কি গো, ছেলেমানুষ!"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া অস্ফুট স্বরে সুষা বলিল—"কচি খোকা!"

ননী সে কথায় কান দিল না, অন্যমনস্কভাবে বিড়ি টানিতে টানিতে বলিল, "আচ্ছা, সে কদিন অন্তর শ্বশুরবাড়ী যায়?"

"মাসে পাঁচ সাত দিন।"

"পাঁচ সাত দিন!—এইবার উচ্ছন্ন যাবে আর কি!"

"তুমি বোকোনা বাবু! শ্বশুরবাড়ী গেলেই মানুষ অমনি উচ্ছন্ন যায়! আর বউ যদি এখানে থাকত?"

"থাকত, থাকতই; লাট সাহেব হত নাকি? এই যে আমি, বছরে ক'দিন এসে বাড়ীতে থাক্‌তে পাই! তুমি বল্‌তে পার না?—তা তুমি বলবে কেন, তুমিই ত আস্কারা দিয়ে তার মাথা খাচ্ছ—বাস্তবিক, এখনকার ছেলেপিলেরা সব কি হল গো!"

ব্যঙ্গস্বরে সুষা বলিল, "তুমি কবেকার গো? তুমি কি ছিলে?"

"আমি!—কই আমার মুখপানে চেয়ে সত্যি করে বল দেখি আমি কি ছিলুম!"—ননী ঘাড় উঁচাইয়া পত্নীর পানে চাহিল।

"আমি জানি না, যাও!"—বলিয়া সুষা হাসিতে হাসিতে মুখ ফিরাইল। বলিল, "তা এখন ঘাট থেকে হাত পা ধুয়ে এসে কিছু খাবে,না বসে বসে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে?"

নিঃশেষ-প্রায় বিড়িতে একটা দীর্ঘ টান দিয়া, জ্বলন্ত বিড়িটা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ননী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "গামছাটা দাও, জল ধরে এসেছে, ঘাট থেকে কাপড়টা কেচেই নিয়ে আসি—"

"আহা থাক না, আমি এর পর—"

"না না, কেন অনর্থক কষ্ট করবে, দাও আমিই কেচে আনি। কিন্তু সত্যি বলছি, চেরো কি অন্যায় করছে ভাখ দেখি! এবার তাকে একটু কড়্‌কে দিয়ে যাব—"

"সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না কি?"

"সঙ্গে করে?"—চিন্তিত ভাবে ননী বলিল, "ভাখ, এ চাকরী পয়সার চাকরী বটে, যদি বুঝে চালাতে পারা যায়। কিন্তু সঙ্গ বড় খারাপ কি না, ঐ সব অবুঝ ছেলে মানুষকে এ সব মন্দ সঙ্গের সীমানায় যেতে দিলেই সর্ব্বনাশ হয়ে যায়। বিনোদ চাটুজ্যে সবজজের ছেলে নীরদ চাটুজ্যে মস্ত উকীল, তাঁর খাস খানসামা আমি, এ লোকের কাছে পরিচয় দিতেই ভাল। কিন্তু আসলের খবর যদি শোন, তো, আমার সে মেহনতের

পয়সা ছুঁতে তোমাদের ঘেন্না করবে! বাপ্, সে সব জায়গায় কি জেনে শুনে আপনার লোককে ঢুকতে দিতে আছে? একেবারে বয়ে যাওয়া, জাহান্নম যাকে বলে!"

"নিজে তো বারমাস তিরিশ দিন নিশ্চিন্দি হয়ে তাই করছ?"

"এখন অভ্যাস দুরন্ত হয়ে গেছে, জাহান্নমের তোয়াক্কা আর বড় রাখি নে।"

"হ্যাঁগা তুমি যে বলতে তোমার মনীব মহাদেবের মত—"

"এখনও তাই, তুষ্ট থাকলে সদাশিব,—আর রুষ্ট হলে ব্রহ্মাণ্ডে আগুন ধরিয়ে দেবেন, একেবারে যমের বাবা বীরভদ্র!"

"ওগো কথা ছেড়ে ওঠ, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ থাকবে?"

"যাই—যাই। ভাল কথা, মোটের ভিতর একতাড়া পাণ আছে দাও তো, ঘাট থেকে ধুয়ে আনব।"

"কেন, আমার হাতে কি 'কুট' হয়েছে?"

"ওগো তা হয়নি জানি। কিন্তু গোলামের হাতে অত নবাবী বরদাস্ত হবে কেন? আমার মনীব বাড়ীতে বলে, এর চাইতেও কষ্ট"......বাকী কথাটা উহ্য রাখিয়া ননী হেঁট হইয়া নিজেই মোট হইতে পাণের তাড়া বাহির করিয়া লইয়া ঘাটের উদ্দেশ্যে, দাওয়া হইতে নামিয়া খিড়কি দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। সুষা কয় মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তারপর একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল, স্বামীর পরিধেয় বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিতে মনোনিবেশ করিল।

অল্পক্ষণ পরে ননীলাল ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিল। ধৌত পাণগুলা সুষার হাতে দিয়া বলিল, "গোটা কতক সাজ দেখি।"

"সাজছি, আগে তোমায় খেতে দিই, কি খাবে? মুড়ি, চালভাজা, ছোলা ভাজা সব আছে, নারকেল আছে কেটে দেব?"

"না না এখন নয়, মা আসুক আগে, তা পর—মা তো এখুনি আসবে। ততক্ষণ একটু ভাল করে তামাক সেজে খাই, তুমি পাণ দাও।"

ননী চাকর হুঁকা কলিকা লইয়া তামাক সাজিয়া, দেশালাইয়ে কাঠকয়লা ধরাইয়া হুঁকা টানিতে আরম্ভ করিল। সুষা পাণের বাটা চূণের ভাঁড় প্রভৃতি ঘর হইতে বাহির করিয়া—অদূরে বসিয়া পাণ সাজিতে লাগিল। ননীলাল সুখের আবেগে তামাক টানিতে টানিতে তাহার আকস্মিক আগমনের সুযোগ কেমন করিয়া ঘটিল, তাহারই কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিতে আরম্ভ দিল। তাহার মনীব মেদিনীপুর হইতে কার্য্যোপলক্ষে আসানসোলে আসিয়াছিলেন, সেখান হইতে ফিরিবার পথে সেকিরূপ কৌশলে তাহার অন্যতম সহযোগী মোহনচাঁদের মারফৎ মনীবের নিকট ছুটির আবেদন করাইয়া কার্য্যোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছে, সে সমস্ত বলিয়া শেষে যখন তাহার বাড়ী আসার আগমন উপলক্ষে সহকর্ম্মীগণের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কাহিনী বলিতে লাগিল,—তখন সুষা লজ্জারক্ত মুখে অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল,—"ছি ছি, থাম বাবু। তোমরা বড়—ওর নাম কি, এ হয়েছে!"

বাড়ীর দ্বার ঠেলিয়া কে ভিতরে প্রবেশ করিল। সুষা তখন মাথায় কাপড় টানিয়া বধূ হইয়া বসিল। ননী চাহিয়া দেখিল মাতা আসিতেছেন, সে হুঁকা নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

(৩)

ননীর মাতা রোয়াকের পৈঠায় উঠিতে উঠিতে বিস্ময় আনন্দপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"তুই কতক্ষণ এসেছিস?"

ননী মাতার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া, দুই হাতে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া ললাটে বক্ষে ও জিহ্বায় দিল। হাসিমুখে বলিল, "এই খানিক্ষণ আসছি। তোমার শরীর বেশ ভাল আছে মা?"

মাতা পুত্রে স্বাগত প্রশ্নাদি বিনিময় অন্তে অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আলাপ হইল। মাতা ননীর আহারাদির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "সমস্ত দিন ভাত খাসনি? তা হলে এখুনি উনুন জ্বেলে দুটি ভাতে ভাত চাপিয়ে দি। ওবেলাকার ঝালের মাছ রান্না আছে, মৌরলা মাছের টক আছে, সন্ধে হলে সকাল সকাল খেয়ে নিবি। এখন তা হলে দুটি জল খা—"

"চাল ভাজা আছে বলছিল না?—দাও না তাই খাই, অনেকদিন ওসব খাইনি,—মুড়িই খেতে পাই না, তার আর—"

ইতিমধ্যে বধূর পাণ সাজা হইয়া গিয়াছিল, সে একটা পিতলের রেকাবী করিয়া গোটাচার পাণ আনিয়া শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর হাতে দিল। স্বামীর হাতে দিল না, কারণ গুরুজন নিকটে থাকিলে সেরূপ হাতাহাতি দেওয়াটা নিন্দাজনক অশিষ্টতার কাজ!—খাশুড়ী পাণ লইয়া বধূকে বলিলেন, "পাণ এখন থাক বাছা, আগে তুমি ননীকে জল খেতে দাও। চারুর সেই রেকাবীটে করে দুটি চালভাজা তেল মেখে দাও। আর কাঁচা লঙ্কা আছে, দেবে রে ননী?"

"দিক না।"

"তবে দাও, হেঁসেল ঘরে বেদীর ওপর লঙ্কা আছে। সেইখানেই কাটারীটে আছে, নিয়ে আয়ত বাছা, মাচায় নারকেল আছে পেড়ে দিই।"

"আমায় বল না কোথায় আছে, পেড়ে নিচ্ছি"—বলিয়া ননী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"না থাক আমি নাগাল পাব।"

"হ্যাঁ মা, চেরো শ্বশুর বাড়ী গেছে?"

"তোকে কে বল্লে?"—মাতার কণ্ঠস্বর একটু খাটো হইয়া গেল। ননী নখে মাটী খুঁটিবার ছলে হেঁট হইয়া রান্নাঘরের দিকে গোপন দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল সেখান হইতেও একজন প্রচ্ছন্ন হাস্যভরা মুখে, কৃত্রিম কোপব্যঞ্জক কটাক্ষে তাহাকে নিঃশব্দ ভর্ৎসনায় শাসন করিতেছে! তাই সহজ ভাবে হাসিয়া বলিল—"আর কিছুর জন্যে নয়, তবে কি না চাস বাসের সময়টা অনর্থক—"

মাতা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না, তা সেখানে একটি দিনও কামাই করে থাকে না। ভোর না হতেই চলে আসে। রাত থাকতে আসার জন্যে আমি বরং কত বকে মরি—"

বধূ রান্নাঘর হইতে চালভাজায় তৈল মাখাইয়া কাঁচা লঙ্কা ও গুড়সহ এক ঘটি জল লইয়া আসিয়া শাশুড়ীর নিকটে নামাইয়া দিল। শাশুড়ী ঘরে ঢুকিয়া মাচার উপর হইতে নাড়িকেল পাড়িয়া লইয়া আসিলেন; ননী নারিকেল ভাঙ্গিয়া কাটারির দাগ করিয়া মালা হইতে নারিকেলের শস্য ছাড়াইতে ছাড়াইতে হেঁট মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "চারুর শরীরটা এখন সেরেছে মা? একটু মোটা সোটা হয়েছে?"

"কই আর! তেমনিই রোগা আছে। আর বাবা, যে খাটুনী পড়েছে মাঠে—"

"হুঁ"—ননী খানিকটা নারিকেল ছাড়াইয়া লইয়া বাকীটা সরাইয়া দিয়া বলিল, "রেখে দাও মা, রাত্তিরে তোমার মুড়ি খাবার সময় ছাড়িয়ে দেব।"

"তুই আর একটু নে।"

"না, আমি ঢের নিইছি"—বলিয়া ননী জলযোগ করিতে বসিল; উঠানে ও-পাশে গোয়াল ঘরের চালার দিকে চাহিয়া বলিল, "হেলে দুটোকে চারু খড়-জাব দিয়ে গেছে?"

"সে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে গেছে। আহা দেখ ননী, এবার বক্না বাছুরটি যা হয়েছে, বড্ড পরিষ্কার! ঠিক ওর মার মত।"

"ক দিনের হোল মা?"

"ও মাসের দশরার দিন হয়েছে, আর আজ মাসের পনেরই, এই ঠিক একমাস পাঁচ দিন।"

"দুধ কতটা করে দ্যায়?"

"দু বেলায় প্রায় আড়াই সের। ডেড়সের করে বাঁড়ুজ্যেদের রোজ দিই, আর এক সের করে ঘরে রাখি। তিন মনিষ্যির ঢের হয়, আর ঐ দুধের সাথে খোল

ভুষী কিনি, রাখালের চরাণী পয়সা দিই।—হ্যাঁরে তুই সেখানে দুধটুধ পাস ?"

"দুধ বড় একটা পাই নে, তবে অন্য পাঁচ সামিগ্রীর তো অভাব নেই—"

"আহা তাত বটেই বাবা, সে হোল রাজার ভাণ্ডার! তা হ্যাঁরে ননী, মনীবরা যত্ন ছেদ্দা করে? ভালটাল বাসে কেমন ?"

চালভাজা চিবাইতে চিবাইতে লঙ্কায় কামড় দিয়া ননী বলিল, "চাকরকে ভালবাসা, মা, কাযের খাতিরে। গা ঘামিয়ে, প্রাণ উচ্ছুগ্যু করে যতক্ষণ খাটব, ততক্ষণই আদর, তার পর একটু এদিক ওদিক হলে পাঁচ বছরের ছেলেটিও চোখ রাঙিয়ে খেঁপে উঠবে। তবে আমায় বড় একটা কেউ কিছু বলবার বাগ পায় না,—আমি ত গতর রেখে খাটি না। আমি হামেহাল খাড়া থাকি, দিনকে দিন বলি না, রাতকে রাত বলি না। ধর, দুপুর রাত্রে খেটে খুটে শুইচি, হয়ত তন্দ্রাটি এসেছে, এমন সময় বাবু ডাকলেন। তক্ষুণি উঠে পড়নু। ঘুমে চোখে দেখতে পাচ্ছিনা—চোখে এক ঝাপটা জল দিনু, বাবুর ঘরে গেনু—হয়ত বল্লেন সোডা ভেঙ্গে দে। সোডা ভাঙ্গনু, গেলাসে ঢাললু, বাবুর খাওয়া হোল, তার পর চুরুট ধরিয়ে দিনু—তবে ছুটি। আবার সেই ভোর পাঁচটা হোতে না হোতে এক ডাকে উঠে কাযে লাগতে হবে। পয়সা কি আর অম্নি হয় মা!"

"আহা তা নয় বাবা!"—দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সকরুণ ছল ছল নয়নে মাতা পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ননী একটু সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল যে, পুত্রের দাসত্ব জীবনের এই সমস্ত দুঃখ কাহিনী মাতার পক্ষে মোটেই আনন্দদায়ক নহে। আবার—ননী উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, গৃহ মার্জ্জন-রত আর একজনের ঝাঁটার শব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—সম্ভবতঃ সেও কাণ ঠাড় করিয়া তাহার কথা শুনিতেছে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা উল্টাইয়া লইয়া ননী বলিল, "আমি এখন খুব মোটা হইচি, নয় মা ?"

"কি সে খুঁড়িস বাবু! কোথায় মোটা হইচিস ?"

"না মা, মোটা হইচি বইকি। এবার অনেক ভাল ভাল জায়গা বেড়িয়ে এনু কি না কটক—পুরী।"

"দক্ষিণ গিয়েছিলি? জগবন্ধু দর্শন করে এলি ?"

"জগবন্ধু দেখা হয় নি বটে, তবে দূর থেকে মন্দিরটে দেখে এসেছি।"

"ওমা! জগবন্ধু দেখলিনে কিরে ?"

"ফুরসুৎ পেনু না মা। সাতদিন ছিনু বটে, কিন্তু হলে কি হবে, চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কখন কি হুকুম হয়। আর, আমার মনীব সায়েবী মেজাজের লোক, ওসব মোটেই মানেন না। একদিন এক পাণ্ডা দেখা করতে এসেছিল, ওরে বাবা, তাকে যা করে উঠেছিলেন! আমরা বলি এইখানেই বুঝি নিকেশ হল—"

"হ্যাঁরে, ওঁরা ও সব মানেন না কেন ?"

"ওরা মানে উনিই; মেয়েদের তো ঠাকুর দেবতায় ভক্তি ছেদ্দা আছে। উনি বলেন, আমি যতক্ষণ ঠাকুর দেখব ততক্ষণ আমার বিলিয়ার্ড খেলা হবে,—বিলিয়ার্ড খেলা সে এক রকম সায়েবী খেলা, তুমি মেয়ে মানুষ বুঝবে না।"

ননী উঠিয়া ছাচার জল বহিবার নালীর কাছে গিয়া ঘটির জলে হাত ধুইয়া, ঢক্ ঢক্ করিয়া জল খাইল। তার পর ঘটিটা নামাইয়া রাখিয়া মাতার নিকট হইতে পাণ লইয়া মুখে পুরিল।

বধূ বিছানা ঝাড়িয়া ঘর দ্বার ঝাট দিয়া সমস্ত ওজ্‌লা জড় করিয়া বাহিরে আসিয়া উচ্ছিষ্টপাত্রে ফেলিয়া, সেই বাসনগুলা সব গুটাইয়া লইয়া, দাওয়ায় গোময় লেপন করিয়া দিল। তার পর রান্না ঘর হইতে ঘড়া ও ঘটি বাহির করিয়া উঠানে রাখিল। ননীর মাতা পুত্রকে বলিলেন, "তুই তা হলে বসে থাক, আমরা কাপড় কেচে আসি।"

"যাও।"—বলিয়া ননী তামাক সাজিতে বসিল।

(৪)

গা ধুইয়া আর্দ্র বস্ত্রে জলপূর্ণ কলস লইয়া বধূ যখন

বাড়ী ঢুকিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। দাওয়ায় উঠিয়া বধূ দেখিল, ইতিমধ্যে দীপ জ্বালা হইয়াছে, এবং দীপালোকের নিকট বসিয়া ননীলাল রাশিকৃত ফুল লইয়া স্ঁচ সূতায় নিবিষ্টচিত্তে মালা গাঁথিতেছে। ননী পদশব্দ পাইয়া মুখ ফিরাইল, বধূর হাস্যরঞ্জিত মুখপানে চাহিয়া বলিল,"বসে থাকি না ব্যাগার খাটি। একটা হাস্নুহেনার চারা এনেছিনু, পাঁদাড়ে পুঁতে দিতে গেনু, দেখি বিস্তর যূঁই আর বেলফুল ফুটে রয়েছে, চাট্টি তুলে নিয়ে এনু। আহা সহর বাজার হলে এই ফুলগুলির দাম চার আনা তো বটেই!"

"তা কুঁড়িগুলো তুলে এনেছ কি কর্ত্তে?"

"কুঁড়ি নয়, এগুলো ফোটবার মুখী হয়েছে। এই যূঁইয়ের কুঁড়িতে মালা গেঁথে জলে ভিজিয়ে রাখলে সন্ধ্যার পর এ একেবারে টোপ্‌পর হয়ে ফুটে উঠবে দেখো। দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন, কাপড় ছাড়। মা কই?"

"মা রাত্তিরে খুড়ীর কাছে শোবে, তাই বলতে গেছে।"

"ওঃ"—ননী দুই মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তারপর মৃদু স্বরে বলিল, "তাইত একবেড়ে ঘরে আর চলছে না। মরে বেঁচে যা করেই হোক এবার অন্ততঃ একখানা ঘরও তুল্‌তে হবে।"

"না তুল্লে চলবে কেন? দুদিন পরে, ধর, ছোট বৌটি আসবে। আজ না হয় ঠাকুরপো দত্তদের বৈঠকখানায় শুচ্ছে, এর পর তো আর তা হবে না।"

"তাত বটেই। আর ঘর না হলে ঘরের লক্ষ্মী ঘরেও আন্‌তে পাচ্ছি না। যা করেই হোক, অঘ্রাণ মাসের মধ্যেই ঘরটা তুলে ফেলতে হবে। মাঘ মাসে ছোট বউকে আনা হবে, আর বেশীদিন কি বাপের বাড়ীতে ফেলে রাখা যায়?"

"তাকি যায়? বিয়ের জল পেয়ে ছোট বউ মস্ত বড়টা হয়ে পড়েছে। রথের সময় মা এনেছিল, দেখলাম প্রায় আমার মত মাথায় হয়ে গেছে।"

"সত্যি নাকি? তা হোক, তুমি এখন কাপড় ছাড় দেখি।"

"দাঁড়াও উনুনে আগুনটা দিয়ে আসি, মাচা থেকে ঘুঁটে পাড়্‌তে হবে।"

"আচ্ছা আমি দিয়ে আসছি"—বলিয়া ননী ফুল মালা স্ঁচ সূতা সব ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বধূ বিব্রতভাবে বলিল,"আঃ কি যে ছেলে মানুষী কর, মা দেখলে এখুনি কি বলবে বল দেখি।"

"মাকে সে আমি বুঝিয়ে দেব,তুমি এখন কাপড় ছাড় তো"—বলিয়া ননী সত্য সত্যই রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। বিপন্না বধূ মিনতি করিয়া ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু ননী সে কথা কাণে তুলিল না, রান্নাঘরে গিয়া মাচার উপর হইতে দুড় দাড় শব্দে ঘুঁটে নামাইয়া উনান ধরাইতে বসিয়া গেল।

অগত্যা বধূ কাপড় ছাড়িয়া, তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া, শঙ্খধ্বনি করিয়া, গোহাল ঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া, মশক দংশনে বিক্ষুব্ধ গোরুগুলির জন্য একটু ধোঁয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সেখান হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় ননী রান্নাঘর হইতে ডাকিল, "উনুন ধরে গেছে গো!"

মাতা তখন বাড়ীর চৌকাঠ পার হইয়া উঠানে ঢুকিয়াছিলেন। তিনি রান্নাঘর হইতে পুত্রের আহ্বান শুনিতে পাইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "বউ কোথা? তুই ওখানে কেন রে?"

"একটু আগুন নিতে এসেছি"—বলিয়া ননী তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বধূ গোশালা হইতে দীপ হস্তে বাহির হইলে শাশুড়ী একটু মিষ্ট ভৎর্সনার স্বরে বলিলেন, "আমি এসে গোয়ালে সাঁজালি দিতুম বাছা, তোমার এত তাড়াতাড়ি করা কেন! যাক, বেশ হয়েছে, তুমি এখন দুধটা আগে আউটে নাও, তাপর ভাতের হাঁড়ি আমি এসে চড়াচ্ছি।"

বধূ মাথা নাড়িয়া নীরবে তথাস্তু জ্ঞাপন করিয়া আসিয়া রান্না ঘরে ঢুকিল; শাশুড়ী কাপড় ছাড়িতে দাওয়ায় উঠিলেন। ননীলাল মাতাকে আগুন লওয়ার কৈফিয়ৎ দিলেও, বাস্তবপক্ষে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু চাড় না থাকায় আসিয়া আবার ফুলের মালা গাঁথিতে

বসিল। মাতা বলিলেন, "তুই যে এখন ফল নিয়ে বসলি ননী!"

"কি করব মা, একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই। চেরোটা বাড়ীতে নেই, যে দণ্ড পাঁচটা কথা কই। বাড়ী যেন খাঁ খাঁ কচ্ছে। এবার যে বাড়ীতে এসেছি তা যেন মোটেই বুঝতে পাচ্ছি না; তাই ভাবছি একবার হেরিকেনটা নিয়ে দুগ্‌গো ডাঙায় যাব কি?"

"না বাবা, এই রাত্তিরে! একে বর্ষাকাল, তাতে আওলের দিন, চাদ্দিকে বন বাদা,—কাল সকালেই তো সে আসবে।"

"তা'ত আসবেই—কিন্তু আজ"—কয়েকমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ননী সহসা বলিয়া উঠিল, "ভাল কথা মনে পড়েছে মা। ঐ ধামার মোটের মধ্যে পঁচিশটে বোম্বাই আর পঞ্চাশটে ভূতো বোম্বাই আম আছে। আমাদের পাড়াগাঁয়ে তো ওসব ভাল আম চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, তাই নিয়ে এনু গোটাকতক। কাল ঠাকুরদের ছুটো দিও, খুড়ীকে গোটা চার দিও আর এবাড়ী ওবাড়ী যাকে যা দিতে হয় দিও। কাশীর প্যায়রাও গোটাকত আছে, একটা একটা সব দিও। আর দ্যাখ মা, ইষ্টিসনে নতুন বেগুন আর মূলো বিক্রি হচ্ছে দেখে, আট আনায় আধসের বেগুন আর মূলো কিনে নিয়ে এসেছি।"

"বেশ করেছিস্। আজ রাত্তিরে তা হলে মূলো বেগুনের একটু তরকারী হোক।"

"না না, সে তরকারী কাল দিনের বেলা হবে; তোমার শুদ্ধ হবে, চেরো থাকবে। আজ সে বাড়ী নেই আজ ওসব তরকারী কেন? শুধু ছুটি ভাতে ভাত ফুটিয়ে দিতে বল, খাব এখন।"

"তা হলেই বা।"

"না মা, আজ ওসব হ্যাটা কোর না। চেরো থাকলেও বা যা হোক হোত, কিন্তু শুধু আমার জন্যে—না, সে আমি খাব না। বিদেশে পাঁচ-পুজ্যির বাড়ীতে থাকি মা, সময় শিরে কত ভালমন্দ সামগ্রী খেতে পাই, কিন্তু সে সব মুখে তুলতে আমার মন কেমন করে।"—ননীর কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। মাতা মৃদুনিঃশ্বাস ফেলিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "তা হোক, তুইত বাবা আমাদের কিছু অভাব রাখিস না, যখন বাড়ী আসিস্ তখন তো আশ পূরিয়ে সামিগ্‌গীরি আনিস্।"

বহুক্ষণ ধরিয়া এইরূপ নানা প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তা চলিল। তার পর ননীর আহার্য্য প্রস্তুত হইলে, পুত্রকে আহার করাইয়া মাতা নিজে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন এবং বধূকে আগারে বসাইয়া দিয়া প্রতিবেশিনী গৃহে শয়ন করিতে চলিলেন। ননী আলো ধরিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইয়া রাখিয়া আসিল।

সমস্ত দিনের ক্ষুধা ও শ্রমক্লান্তির পর ছুইটি অন্ন উদরে পড়িতেই, গভীর নিদ্রায় ননীলালের সমস্ত দেহ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বিছানার উপরে সে দেহ ঢালিল। বধূর তখনও রান্নাঘর নিকান ও অন্যান্য খুচরা কাজ বাকী ছিল সে তাহাই সারিতেছিল,—ননী চেষ্টা সত্ত্বেও আর চক্ষু খুলিয়া রাখিতে পারিল না, ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পদতলে কাহার তপ্ত কোমল কর-সংঘর্ষণ অনুভব করিয়া 'ছ্যাৎ' করিয়া ননীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—অভ্যস্ত সংস্কারবশে মনে হইল প্রভু বুঝি কক্ষান্তর হইতে ডাকিতেছেন। সে নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, "আজ্ঞে যাই।"

পরমুহূর্ত্তেই ত্রস্তভাবে ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল। সহসা দীপালোকে পদপ্রান্তে উপবিষ্টা তরুণীমূর্ত্তি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। তাহার তন্দ্রাঘোর ছুটিয়া গেল, বিস্ফারিত চক্ষে ভাল করিয়া চারিদিক চাহিল,—নাঃ, এত প্রভু-নিবাসের ধব্ ধবে চুণকাম করা প্রকাণ্ড হল ঘর নয়, এ যে তাহার নিজের সেই আবাল্যের পরিচিত গোময়লিপ্ত ক্ষুদ্র মৃৎকুটীর!—আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ছুই হাতে চোখ রগ্‌ড়াইয়া ননী বলিল, "ওঃ বড্ড ঘুমিয়ে গেছনু—তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

"এই ত আস্‌ছি। তুমি ঘুমুচ্ছ দেখে পায়ে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছিনু, তুমি শোও না।"

"না, আর ঘুম হচ্ছে না। থাক, পায়ে আর তেল দিতে হবে না তুমি শোও, অনেকটা রাত হয়ে গেছে না?"

"না, রাত আর কই বেশী হয়েছে? তুমি শোও শোও, আমি পায়ে একটু তেল দিয়ে দিই। সমস্ত দিনটা পথ হেঁটে এসেছ!"

"তা হোক, ও সব বদ্ অভ্যেস কিছু দরকার নেই, ওসব কি আমাদের পোষায়? তুমি শোও, আমি একটু চোখে মুখে জল দিয়ে আসি"—বলিয়া ননী বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত আকাশ তখন মেঘশূন্য ও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। সেদিন শুক্লাদ্বাদশী, নির্ম্মল আকাশে তখন চন্দ্রদেব পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্যোৎস্না ছড়াইতেছিলেন। বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী বন হইতে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত বনমল্লিকা ও রজনীগন্ধার মৃদু মধুর সৌরভ বর্ষার বাতাসে ধীরে ধীরে বহিয়া আসিতেছিল। চারি দিক একটা স্নিগ্ধ শীতলতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, সময়টা বড় মধুর বড় নিবিড় শান্তিপ্রদ মনে হইল। ননী গভীর আরামে আলস্য ভাঙ্গিয়া হাই তুলিয়া একটা নিগূঢ় তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল,—আঃ এই সুষুপ্ত রজনীতে এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তে ক্ষুদ্র বাড়ীখানার মধ্যে সে এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত! এই দুর্ল্লভ আনন্দময় অবসর টুকুর মূল্য যে কত তাহা মর্ম্ম দিয়া উপলব্ধি করিতে পারে শুধু দাসত্ব পীড়িত দরিদ্রের অন্তরাত্মা! যাঁহার অজস্র শক্তি স্বাধীনতা আছে, তিনি এ আনন্দের অবিকৃত আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন কি না তিনিই জানেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বিকৃত দারিদ্র্যের বুক শুধু এই আনন্দের প্রলেপেই সান্ত্বনায় সুস্থ হইয়া উঠে—ইহাই তাহার অমৃত, ইহাই তাহার নির্জ্জীব অসাড়তায় চেতনাসঞ্চারের মৃতসঞ্জীবনী, ইহারই বলে সে সমস্ত জীবনব্যাপী নিন্দা তিরস্কার দুঃখ বেদনা অপমান লাঞ্ছনা হাসিমুখে বুক পাতিয়া লইয়া দিন কাটাইয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহাই তাহার নিবিড় তৃপ্তির মর্ম্মভরা—আঃ।

(৫)

পরদিন প্রাতঃকালে ননী উঠিয়া গ্রামস্থ লোকজনের সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া গেল। বধূ তৎপূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া বাসিপাট সারিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছিল। শাশুড়ী প্রতিদিনই প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করেন, কিন্তু আজ পরের বাড়ীতে শুইতে গিয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, তাঁহার আসিতে বেলা হইতেছে দেখিয়া বধূ রান্নাঘরে দাওয়ায় দাঁড়াইয়া উনান ধরাইবে কি না ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

সন্তর্পণে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া গেল। বধূ উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিল, শাশুড়ী আসিতেছেন বুঝি;—না শাশুড়ী নয়, দেবর। ছাতা ও চাদর হাতে গেঞ্জি গায়ে চারুচন্দ্র দ্বারের পাশ হইতে উঁকি দিয়া চারিদিকে চাহিতেছে দেখিয়া ভ্রাতৃজায়া হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই ভয় নেই, এস।"

চারু কুণ্ঠিতভাবে একটু হাসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কই?"

"দাদা তোমার বেড়াতে বেরিয়ে গেছে, তোমায় এর মধ্যে খবর দিলে কে ঠাকুরপো?"

"গাঁয়ে ঢুকছি, ভট্‌চাজ্ মশাই বল্লেন"—বলিয়া চারু রোয়াকে উঠিল। 'শাঙার' উপর ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া গেঞ্জি চাদর ও ছাতাটা ফেলিল। কোঁচার কাপড় খুলিয়া কোমরে ফাঁশ দিয়া বাঁধিয়া হাটুর কাপড় গুটাইয়া বলিল, "বৌঠান, গাই-দোয়া বোক্নোটা দাও তো, গরুটা আগে দুয়ে নি।"

"ও গো কর্ত্তা থাম। এই এলে, একটু বসে জিরোও।"

চারু লজ্জিতভাবে একটু হাসিল। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বৌঠান, একটা কথা জিজ্ঞেসা কর্‌ব, ঠিক বলবে?"

বৌঠান বুঝিল কথাটা কি, কষ্টে হাস্য দমন করিয়া বলিল, "কি বলবে বল না?"

চারু রোয়াকের খুঁটিতে নখের আঁচড় কাটিতে

কাটিতে ঘাড় হেঁট করিয়া সলজ্জভাবে বলিল, "আচ্ছা, দাদা কাল আমার না দেখে কি বল্লে ?"

বধূ কপট গাম্ভীর্য্যে বলিল, "কি আর বলবে, আমি বল্লু তোমার ভাদর বৌয়ের জন্যে মন কেমন করছিল, তাই দেখা করতে গেছে। শুনে চাট্টি ফুল তুলে একটি মালা গেঁথে বল্লে, যাই ভাইকে দিয়ে আসি। বেরুচ্ছিল, তা মা বারণ কল্লে, বল্লে 'আওলের দিন পথে সাপ খোপ আছে, রাত্তিরে আর যাস্‌নি।' শুনে আর গেল না। হয় না হয় দেখে এস, তোমার সেই বিয়ের টোপরের মাথায় এখনও যুঁইয়ের মালা টাঙ্গান আছে।"

কুণ্ঠিত হাস্যে চারু বলিল, "সত্যি বল না।"

"আমি মিছে কথা বলছি ? আচ্ছা মা আসুক, সুদিও।"

"কি কথা বউ"—বলিয়া গৃহিণী দ্বার ঠেলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বধূ তৎক্ষণাৎ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ মা, ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কাল রাত্তিরে চুগ্‌গোডাঙ্গা যাচ্ছিল না মা ?"

"কে ননী তো ? হ্যাঁ যাচ্ছিলই তো। আমি বারণ কল্লু তাই গেল না। তোর সঙ্গে ননীর দেখা হয়েছে চারু ? তুই কতক্ষণ এসেছিস ?"

"আমি এই আস্‌ছি, পথে আসতে আসতে পশ্চিমের মাঠটা ঘুরে দেখে এনু কি না, তাই দেরী হয়ে গেল। ঁ দু কিতে এবার বেশ ফুলিয়ে উঠেছে। এবার ওখানে খাসা ধান হবে। বৌঠান, বোক্নো দাও, আমি গাই বের করি।"—চারু সেখানে আর দাঁড়াইল না, পাছে ভ্রাতৃজায়া মাতার সমক্ষেই আর কিছু ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলিয়া তাড়াতাড়ি সে গোহাল ঘরে ঢুকিল।

গাভী দোহন শেষ হইলে চারু গোহাল হইতে বলদ দুইটিকে বাহির করিয়া উঠানে বাঁধিল, তারপর ছানি কাটিতে বঁটি লইয়া বসিল। মাতাও ইতিমধ্যে গৃহের অন্যান্য কায সারিয়া গোহাল মুক্ত করিতে আসিলেন। প্রত্যহ গোশালা পরিষ্কার করিয়া স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের পুণ্য হয়,পল্লী অঞ্চলে এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেই জন্য ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বাটীর গৃহিণী, দাস দাসী সত্ত্বেও প্রত্যহ স্বহস্তে গোশালা মার্জ্জন করিয়া থাকেন।

ভীমপরাক্রমে ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ করিয়া প্রচুর পরিমাণে খড় কাটিয়া, ভিজা খইল মাখাইয়া গরুকে জাব দিয়া, দুই হাতে প্রকাণ্ড দুই বাল্‌তী লইয়া খিড়কির ঘাট হইতে জল তুলিয়া আনিয়া, গরুর ডাবা ভর্ত্তি করিয়া দিয়া,ঘাট হইতে হাত পা ধুইয়া আসিয়া গামছায় দেহের ঘাম মুছিতে মুছিতে চারু বাড়ী ঢুকিল। ধীরে সুস্থে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া রান্নাঘরের দাওয়ার নিকট আসিয়া বলিল, "বৌঠান একটু আগুন দাও!"

বৌঠান তখন হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়া উনানে জ্বাল ঠেলিয়া বঁটি লইয়া বসিয়া তরকারী বনাইতেছিল। দেবরের কথায় বঁটি হইতে উঠিয়া উনান হইতে একখানা জলন্ত কাঠ বাহির করিয়া দেবরের সম্মুখে সরাইয়া দিল। চারু কাঠখানা ঠুকিয়া কতকগুলা জলন্ত অঙ্গার ভাঙ্গিয়া লইয়া সেটা আবার ফিরাইয়া দিল। কলিকায় আগুন তুলিয়া ফুঁ দিতে দিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "বৌঠান সত্যি কথা বলবে ?"

"কি বলব, বল না ভাই।"

"না তামাসা নয়, সত্যি সত্যি বলতো বলি।"

চারুর কথার ভিতর একটা অনুনয়ের কাতরতা ফুটিয়া উঠিল। স্নেহবিগলিত-হৃদয়া বৌঠান তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভুলিয়া সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না না ঠাকুরপো, আমি তোমায় রাগাচ্ছিনু। তোমার দাদা কিছু বলে নি।"

বৌঠানের কথার মধ্যে পরিহাসের গন্ধ নাই দেখিয়া আশ্বস্ত চারুচন্দ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি বল্‌ছ, দাদা রাগ করে নি ?"

"ক্ষেপেছ তুমি ; পাগল! এর ভেতর রাগ করবার কি আছে ? তবে বাড়ী এসে আদুরে ছোট ভাইটির মুখখানি না দেখে মনটা বোধ হয় একবার কেমন কেমন করেছিল, তাই একবার চুগ্‌গোডাঙ্গা যাবার ঢেউ উঠে-



শাইলক মোকদ্দমা হারিয়া বাড়ী ফিরিতেছে

MANASI PRESS

ছিল। তা সেও তখুনি থেমে গেছল, মার কাছে আর কিছু বলে নি।"

"তোমার কাছে ?"

"আমার কাছে ?"—বৌঠান হাসিল, বেগুন বনাইয়া বেগুনের ভিতরটা পরীক্ষা করিতে করিতে উত্তর দিল—"আমার কাছে যদি কিছু বলে থাকে সেটা নেই বা শুন্‌লে ঠাকুরপো। তবে মনে রেখো, তার জবাবও তোমার দাদা পেয়েছে।"

"ছুটো একটা কথা শুনতে পাই না বৌঠান!"

"শুনবে, আচ্ছা একটা কথা বলি শোন—" বলিয়া ভ্রাতৃজায়া মাঘ মাসে ছোট বধূর আনয়ন ও গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ক আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া গেল। চারু হুঁকা আনিবার জন্য আর উঠিতে পারিল না, সেই খানেই বসিয়া তুই হাতে কলিকা টানিতে টানিতে সাগ্রহে গল্পটা শুনিল।

এই তুইটি দেবর ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে বয়সের পার্থক্য খুব বেশী ছিল না, কিন্তু 'একলার ঘর' বলিয়া বধূ বয়সে দেবরের অপেক্ষা তুই চারি বছরের ছোট হইলেও কথা কহিত,—কেন না না, কহিলে চলিবে না। মান বাঁচাইয়া কথা কহিতে জানিলে কাহারও সহিত কথা দূষণীয় নহে। এই তুইটি দেবর ও ভ্রাতৃজায়া, পরস্পরের পরিহাস-সম্পর্কীয় হইলেও,—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি গভীর স্নেহের অন্তরঙ্গতা ছিল। চারুচন্দ্র যে আব্‌দার মাতা ও ভ্রাতার নিকট জানাইতে সঙ্কুচিত হইত, সে আবেদন বৌঠানের নিকট স্বচ্ছন্দে জানাইয়া, পূর্ণ বিশ্বাসে তাঁহার শরণাগত হইতে দ্বিধা বোধ করিত না,—'বৌঠান'ও তাই নিশ্চিন্ত-নির্ভরশীল দেবরটির ভার পরম যত্নে বহন করিত। তা ছাড়া আর একটা কথা ছিল, স্বামীর অত্যন্ত স্নেহাস্পদ বলিয়া বৌঠান দেবরটিকে একটু বেশী রকম স্নেহই করিত।

চারুচন্দ্র দাদার অপেক্ষা বছর পাচের ছোট ছিল, কিন্তু দাদার ব্যবহারের গুণে মনে হইত, সে যেন তাহার অপেক্ষা আরও অনেক ছোট। তুই ভায়ের মধ্যে চেহারার বৈসাদৃশ্যও ছিল অদ্ভুত ধরণের। ননীর চেহারা হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ গঠনের; বার মাস সহরে বাস করার জন্য তাহার রংটাও বেশ কাঁচ-কাঁচ উজ্জ্বল বর্ণের ছিল। মোটের উপর তাহাকে বেশ নধর গঠনের যুবাটি দেখাইত। কিন্তু চারু ছিল, ননী অপেক্ষা লম্বায় চার আঙ্গুল বড়, এবং চওড়ায় তাহার দ্বিগুণ সরু,—সুতরাং ননীর পাশে সে দাঁড়াইলে তাহাকে যেন ননীর ভাই বলিয়া মনেই হইত না। তাতে বার মাস মাঠে ঘাটে ভ্রমণ এবং পল্লীবাসের জন্য তাহাকে অত্যধিক ময়লা ও কঠিন 'শিক্‌রে' গঠনের লোক দেখাইত। তবে তাহার মুখে চোখে একটি সরলতা ও নম্র কোমলতার বেশ সুন্দর শ্রী ছিল, সেই জন্য তাহার মুখ দেখিয়া বয়স 'ঠাহর' করা কাহারও পক্ষে শক্ত কাজ ছিল না।

দেবর ও ভ্রাতৃজায়া বসিয়া কথা কহিতেছে, এমন সময় ননীলাল, "মা—"বলিয়া বাড়ী ঢুকিল।

বধূ ঘোমটা টানিল; চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া কলিকা রাখিয়া অগ্রসর হইয়া দাদাকে প্রণাম করিল; দাদা সস্নেহে ভাইকে বুকে টানিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "কতক্ষণ এইছিস রে? সেখানকার খবর সব ভাল ত?"

চারু মাথা হেঁট করিয়া ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "হ্যাঁ, সব ভাল। আমি অনেকক্ষণ এইচি।"

ভ্রাতার শরীরের উপর একবার স্নেহার্দ্র দৃষ্টির স্পর্শ বুলাইয়া ননীলাল ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "তুই এমন কাহিল হয়ে যাচ্ছিস কেন রে চারু?—এমন সা-জোয়ান ছেলে, দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন?"

"চারিদিকে যে অসুখ বিসুখ হচ্ছে,—সময় তো ভাল নয়"—বলিয়া চারু আর গোটাকতক বাজে কথা পাড়িয়া সে কথা চাপা দিয়া বলিল, "তুমি বেশ ভাল ছিলে দাদা?"

"হ্যাঁ ভাই"—বলিয়া ননী আসিয়া দাওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইল বলিল, "কলকেটা কোথা গেল রে?"

"আমি সেজে আনছি,"—চারু তামাক সাজিয়া

আনিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বলিল—"তুমি কোথা গেছ্‌লে দাদা ?"

"এই একবার চারিদিকে ঘুরে আসতে গেছনু। শেষে অধম্মের ভোগ, বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীতে গিয়েছি, ছোট কত্তা ডেকে নিয়ে বসালে, তা পর মা ব্যাটায়, আঃ! ছি-ছি ছি কি কেলেঙ্কারীর ঝগড়া গো! ছোট কত্তা পুরুষ মানুষ, কিন্তু এমন মেয়েমুখো, ছিঃ ছিঃ!—কাল বড় ভাই মরেছে, আর আজ সচ্ছন্দে বড় ভাজকে, মাকে সব 'ভেন্ন' করে দিয়েছে! ওরে বাপু, কদিনের জন্তে এইছিস! মর্ত্তে কি একদিন হবে না? আমার তো গা বিষ্‌ বিষ্‌ কর্ত্তে নাগল। একবার মনে কন্নু বলি, তাপর ভাবনু, শুরু পুরুতের দ্বন্দ, উভয়ে সমান সম্বন্ধ কাকে বলি ভাল মন্দ!—চুপই আচ্ছা!"

হুঁকার মাথায় কলিকা বসাইয়া হুঁকাটি দাদার হাতে তুলিয়া দিয়া চারু বলিল—"তুমি জাননা দাদা, ওদের সবাই সমান, আর গাঁয়ের নোকই কি কম? নাগ বাবুদের এই টেকো বুড়োটা আছেন,—উনি যত মোটা মোটা মালাই গলায় দিয়ে বেড়ান, উনি বড় কম পাত্তর নন। বকাউল্লা মোচরমান সাধ করে বলে যে কত্তা সুদের সুদ হিসেব করে, এক এক মালা আঁাকার দেন,—আর খাতকদের নিব্বংস করেন!—তা মিছে কথা নয়, উনিই তো বাঁড়ুয্যেদের ছোট কত্তাকে নাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে এত খানি করালেন। নইলে বড় কত্তা বেঁচে থাকতে কেউ একদিন ওদের একটি টুঁ শব্দ শুনেছিল!"

"বটে! তাইত বলি যে ছোটকত্তা তো বড় মন্দ নয়—"

"দাদা, হাতী হেন জন্তু সেও কাণ ভাঙ্গানীতে বশ হয়, ও ত ছেলেমানুষ। ঐ যে বাস্তু ঘুঘুগুনি আছেন, ওঁরাই ত ঝগড়া বিরোধ বাঁধিয়ে ভায়ে ভায়ে ভেন্ন-বেলোগ করিয়ে গাঁয়ের সর্ব্বনাশ কচ্ছেন, কোন ঘরটা ওদের জন্তে আস্ত আছে দেখ ত!"

'দ্যাখ চেয়ো"—ননী হুঁকা নামাইয়া পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল—"দ্যাখ চেয়ো, এই আমি তোকে বলে রাখ্‌ছি,—আমি যদি মরে যাই তো,—তোর ভাজকে আর মাকে এক মুটো ভাত দিতে যেন কক্ষণো কাতর হসনি। কারুর কথা শুনে, আপনার নোককে পর করবার জন্তে নাচিস নি—"

"তাহা কি যে বল দাদা"—চারু হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল। ননীলাল দৃঢ়স্বরে বলিল—"নারে, মরণ কথা গাল নয়,—তাই তোকে আগে থেকে বলে রাখ্‌ছি।" ননী হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"এ বেলা আর মাঠে যেতে হবে না?"

"এ বেলা না গেলেও চলে কিন্তু ও বেলা যেতে হবে, খান কতক জমী নিড়ুতে হবে"—

ননী রান্না ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—"আচ্ছা ও বেলা যাস। "এবার সব জমীতেই তো দেখনু বেশ ধান হয়েচে—"

"হুঁ, সময়ে যদি বৃষ্টিটুকু হয় তো এবার চারপো ধান নিশ্চয়!"—বলিয়া চারু হুকা লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ননী রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল বধূ উনানে কড়ায় তরকারী সাঁৎলাইতেছে—ভাত হইয়াছে, তরকারী হইতেছে, অতঃপর ডাল চড়িবে। ননীকে রান্না ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বধূ হাসিয়া বলিল, "ভাইকে বুঝি সব তত্ত্বকথা শোনান হচ্ছিল?"

"তুমিও শুনেছ তো ভালই হয়েছে, মনে রেখো। —এখন চারুকে কিছু জল টল খেতে দাও দেখি, কালকের সেই বর্দ্ধমানের মেঠাই আছে, আর আম টাম আছে ছাড়িয়ে দাও।"

"দিই"—বলিয়া বধূ তরকারীতে জল ঢালিয়া তাহা ফুটিতে দিয়া উঠিয়া পড়িল, যথানির্দ্দেশ মত দেবরের জল-যোগের আয়োজন করিতে করিতে বলিল—"তুমি শুদ্ধু খাও না কিছু!"

"না, আমায় তেল দাও, আগে চান করে আসি।

মার এত দেরী হচ্ছে কেন? কতক্ষণ মা নাইতে গেছে?"

"অনেকক্ষণ, তবে মা বোধ হয় একেবারে জেলে বাড়ী থেকে মাছের ভাগা কিনে নিয়ে আস্‌ছে, তাই দেরী হচ্ছে।"

"ওঃ, আচ্ছা। মার জন্তেও কিছু বানিয়ে রাখ,—আম, শশা, পেয়ারা—তুমিও এবার জল খাও না।"

"আচ্ছা সে হবে এখন, তুমি খাও তো।"

"চারুকে এই খানেই জল খেতে দাও না, সে সামনেটায় বসে জল খাক, আমি এই খানে বসে তেল মাখি—"

"তবে ডাক ঠাকুরপোকে। কিন্তু দ্যাখ, তুমি যেন আর ওকে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার কথা নিয়ে কিছু বোলো না। বেচারী লজ্জায় মাটি হয়ে আছে, বাড়ী ঢুকছে চোরের মত উঁকি ঝুঁকি দিয়ে। ভাগ্যে তুমি ছিলে না,—না হলে বোধহয়, ···আচ্ছা এখানে ঠাকুরপোকে ডাক—" বলিয়া বধূ জলখাবারের পাত্র ও একঘটি জল রাখিয়া দিল। ননীলাল—"চারু—চারু" শব্দে দুই ডাক দিতেই, চারুচন্দ্র তাড়াতাড়ি আসিয়া রান্না-ঘরের নিকটস্থ হইল। ননীলাল বলিল, "ঢের বেলা হয়েছে জল খা।"

চারু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এর মধ্যে? তুমি খাবে না?"

"নাঃ, আমি আগে চান করে আসি ভাই,—তুই খেয়ে দ্যাখ দেখি আমগুলো মিষ্টি কেমন।"

বধূ উনানের ফুটন্ত ব্যঞ্জন খুন্তি দিয়া নাড়া চাড়া করিতে করিতে ঘোমটার ভিতর হইতে দেবরের দিকে ব্যঙ্গপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "নতুন বিয়ের পর থেকে মুখে সবই মিষ্টি লাগে,—কিছুই মন্দ লাগে না, না ঠাকুরপো?"

চারু কিছু বলিল না, লজ্জিত মুখে ঘাড় হেঁট করিয়া আহারে বসিল। ননীলাল একবার গোপনে হাস্ত রুদ্ধ অধরে স্ত্রীর সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়া, তৈল মাখিতে বসিল।

এইরূপে একটি একটি করিয়া ছুটির দিনগুলি ফুরাইয়া আসিল।

গ্রামের জমীদার পরাণ সিংহ বড় 'দুঁদে' লোক। পাশাপাশি দশ বার খানা গ্রামের তালুকদার তাঁহাকে যমের মত ভয় করিয়া চলে! মিথ্যা মামলা সাজাইতে, সত্যকার খুন জখম ঢাকিয়া ফেলিতে,—এবং নির্ব্বিবাদে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাইয়া দিতে তাঁহার মত সুদক্ষ লোক আর ছিল না।

ননীর প্রভু নীরদ চাটুজ্যে মহাশয়ই পরাণ সিংহের প্রধান উকীল,—কেন না তিনি—'বোকতিতে কোরে দিনকে রাত বানাইয়া' বিপক্ষ পক্ষের উকীলের পিতৃপুরুষের নামও ভুলাইয়া দিতে পারিতেন কি না,—সেই জন্য পরাণচন্দ্র তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত, এবং নীরদ চাটুজ্যের প্রসঙ্গ কোথাও উত্থাপিত হইলে পরাণচন্দ্র বলিতেন, "আহা, মানুষ গাঁটের কড়ি খরচ করে' যদি কোন বিদ্যে শেখে তো, সে যেন ওকালতি শেখে।—হাঁাঃ, সার্থক শিক্ষে বটে!—আমার হয়ে আর কেলোকে আমি ওকালতী শেখাবই। আহা কত মানের ব্যবসা বল দেখি, রাজা উজীর এসে পায়ে তেল মালিস করে, জজ সাহেব হুকুমের ইসারায় কলম চালায়, এমন বিদ্যে কি আর আছে গা!—"

যাত্রার পূর্ব্বদিন ননীলাল তাই জমীদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিল। পরাণচন্দ্র তাহাকে প্রথামত খাতির যত্ন করিয়া,—শেষে ফিরিবার সময়, বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার মেদিনীপুরের সেই সঙ্গীন মামলাটির সম্বন্ধে উকীল কতদূর কি করিতেছেন,—সে বিষয়ে সন্ধান লইয়া ননীলাল সেখানে পৌছিবার পর দিনই যেন তাঁহাকে আমূল বৃত্তান্ত খুলিয়া লেখে, তিনিও দিন দশ পরে মেদিনীপুর যাইবেন—কিন্তু তাহার আগে 'নিট' খবরটা জানিতে পারিলে তিনি আশ্বস্ত হন। ননী স্বীকৃত হইয়া, বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

পরদিন চারুর জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া, গৃহস্থালীর সমস্ত বন্দোবস্ত গুছাইয়া দিয়া, রোদনোন্মুখী জননীকে প্রণাম করিয়া, ভ্রাতাকে আলিঙ্গ-

করিয়া এবং দুইটি অশ্রুসিক্ত সকরুণ চক্ষুর নিকট নীরব বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ননী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কর্ম্মস্থানে যাত্রা করিল। তাহার মনীব তখন মেদিনী-পুরে ছিলেন, ননী সেই খানেই চলিল। বাড়ীতে বলিয়া গেল,—সেখানে যাইয়াই সে পৌঁছান সংবাদ পাঠাইবে।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

সবুজ-সয়তান

(Gourdon de Genonillac-এর ফরাসী হইতে)

সে একজন চিত্রকর।

তাহার বেশ একটু ক্ষমতা ছিল; "আধুনিকী" নামক একটা মাসিক পত্রে তার দুই তিনখানা মজার ছবি বাহির হইয়াছিল মাত্র, তাহাতেই সমস্ত সচিত্র মাসিক পত্রের সম্পাদকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং এক সময়েই চারিদিক হইতে "নামজাদা লেখকদিগের" ছবি জোগাইবার জন্য তাহার উপর তাগিদ আসিতে লাগিল; আর তাহারা জানাইল, উহার জন্য যে পারিশ্রমিক সে চাহিবে, তাহাই তাহারা দিতে প্রস্তুত। তাহার ছবির বিশেষত্ব এই ছিল, নামজাদা লেখকদের সহিত অবিকল সাদৃশ্য না থাকিলেও, তাহাদের মুখের ভাবটুকু বেশ নিপুণভাবে প্রকাশ করিতে পারিত।

চিত্রকরের নাম বোর্দ্দিয়ো। দস্তুরমত কাজের উপর বোর্দ্দিয়োর ভয়ানক বিদ্বেষ ছিল। প্রতি সপ্তাহে, বা প্রতিপক্ষে বা প্রতিমাসে একখানা করিয়া ছবি জোগাইতে হইবে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছবি যোগাইতে হইবে, এ কল্পনাটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। তাহার নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে হইলে, সময়ের মেয়াদ না করিয়া, তাহার স্বেচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত। তাহার সুবিধা মত, যেদিন খুসী সে ছবি আঁকিয়া আনিত।

কোন কাজ না করিবার পক্ষে তাহার অনেক ছুতা ছিল।

প্রথমতঃ উৎকৃষ্ট শিল্পসামগ্রীর সে একজন পরম ভক্ত ছিল। যদি কোন মাসিকপত্রে, বিশেষতঃ যে মাসিকপত্রের সহিত তাহার সংস্রব ছিল সেই মাসিকপত্রে, কোন খারাপ ছবি বাহির হইত, তখন সে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিত; সেই মাসিকপত্রের সম্পাদককে শুধু নহে, সেই মাসিকপত্রের পাঠকদিগকেও গালাগালি দিয়া ভূত ভাগাইত।—সে বলিত—"কতকগুলা আস্ত গাধা, গোমূর্খ! এমন বিশ্রী জিনিস কেউ কখন আঁকৃতে পারে। আর যারা ঐগুলি দেখে তারাও কি বোকা! * * * আর আমি কি না * * * সেই সব মাসিকের জন্য ছবি আঁকি যারা এই সব অপদার্থ জিনিষ জনসমাজে প্রচার করতে সাহস করে—না আর কখ্‌খন না।"

যতদিন না সেই কাগজে আর একটা ভাল ছবি দেখিত ততদিন সে আর পেন্‌সিল ধরিতে কিছুতেই রাজি হইত না। গোঁ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।

তার পর কুঁড়েমির দিকে তার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। আমোদ প্রমোদের কোন একটা উপলক্ষ্য পাইলে সে সুযোগ সে ছাড়িত না। কখন বা তার কোন সঙ্গী প্রাতর্ভোজন বা সায়াহ্ন ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে আনিত। কোথাও বা কাফির আড্ডায় এক বাজি বিলিয়ার্ড খেলা হইত, কোথাও বা পায়চারি করিয়া বেড়ান হইত, কোথাও বা দেখা সাক্ষাতের জন্য কোন সংকেত-স্থানে যাওয়া হইত। এইরূপে কত সপ্তাহ কাটিয়া যাইত, কাজ করিবার শুভমুহূর্ত্ত তাহার নিকট আর আসিত না।

স্বভাবতঃ তাহার অন্যান্য আমোদপ্রমোদের মধ্যে প্রেমের লীলাখেলাটাও ছিল। কেন না, তার পক্ষে প্রেম জিনিষটা একটা আমোদের বিষয় বই আর কিছুই ছিল না। যাহারা তাহাকে ছেলেবেলা হইতে জানিত তারা বলিত যে, ২৫ বৎসর বয়সে তাহার মন প্রেমে একেবারে ডগমগ করিত। এই সময়ে সকলে তাহাকে একজন সুবেশী "ফিট্ বাবু" বলিয়া জানিত; তাহার চোখের দৃষ্টি গর্ব্বিত ও বুদ্ধিব্যঞ্জক; সমস্ত মুখের ভাবটা খোলা-খালা ও সৌম্যমধুর; খুব ধনী না হইলেও তার অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল; সে খুব উঁচু চালে চলিত। সর্ব্বদাই পরিপাটী বেশভূষা করিত। প্রতিবৎসরই সে সরকারী চিত্রশালায় তাহার আঁকা একখানি চিত্রপট দান করিত,—সে বলিত, আমি জনসাধারণের জন্যই প্রতিবৎসর এই দান করিয়া থাকি।

তাহার পর এমন একদিন আসিল যখন সবই পরিবর্ত্তিত হইল।

প্রায় দেড়বৎসর হইল, কাহাকে না বলিয়া বোর্দ্দিয়ো কোথায় চলিয়া গিয়াছিল; তাহার যাহারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাহারাও জানিত না, তাহার কি ঘটিয়াছে; আবার যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহাকে আর চেনা যায় না। বুড়াইয়া গিয়াছে, শ্রান্ত ক্লান্ত; বেশ-ভূষায় অমনোযোগী; কাজ এড়াইবার চেষ্টা; কেবল কাফির অড্ডায় ও ছোট ছোট থিয়েটারে গিয়া সময় কাটায়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এখন রীতিমত বর্ণচিত্রের বদলে সে এখন "মুখ ভেংচান" বিকৃতাকার ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন তাহার মেজাজটা যেরূপ বিদ্রূপ-কঠোর ও নির্দ্দয় হইয়া পড়িয়াছে, এই সকল ছবি তাহারই উপযুক্ত খোরাক জোগাইতেছে। অবশ্য এইরূপ রচনায় তাহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ও নৈপুণ্য থাকায় এবং এই প্রকার রচনার খুব একটা পসার ও কাট্তি হওয়ায় সে বেশ পারিশ্রমিক পাইতে লাগিল, তাহার অভাবের তুলনায় সে যথেষ্ট টাকা পাইতে লাগিল। কিন্তু উপার্জ্জনের দিকে তার মন না থাকায় সে তার নিজের খেয়াল অনুসারে চিত্রকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত। কোন প্রকারে তাহার খাইখরচ ও কাফির আড্ডার খরচটা চলিয়া গেলেই সে নিশ্চিন্ত; আর কিছুরই জন্য সে ভাবিত না।

বিশেষত কাফির আড্ডার খরচ।

প্রায়ই দেখা যাইত, সে কাফির আড্ডাতেই সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত গেলাস গেলাস সবুজ-সুরা (absinthe) পান করিতেছে।

প্রথমে সে প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে অভুক্ত অবস্থায় এক গ্লাস করিয়া পান করিতে আরম্ভ করে; তাহার পর মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে আর এক গ্লাস; তাহার পর দুই হইতে চারে, চার হইতে আটে আসিয়া পৌঁছিল; তাহার পর সে সংখ্যা-গণনায় একেবারে বিরত হইল। ভীষণ তৃষ্ণায় সে আক্রান্ত হইল। এই তৃষা-রাক্ষসী তার মনকে একেবারে দখল করিয়া বসিল। কখন কখন সে তাহার দাসত্বের জোয়ালটা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত। যদি কখন সে এই মারাত্মক সুরার হাত হইতে একদিন এড়াইত,—তবে তার পরদিনই আবার দ্বিগুণ উন্মত্ততার সহিত তাহার হাতে আত্মসমর্পণ করিত।

এই সবুজ সুরাপানের অভ্যাসটা যে কতটা মারাত্মক তাহা বুঝাইবার জন্য ফ্রানেজ নামক তাহার এক ভাস্কর বন্ধু তাহাকে নানাকৌশলে বুঝাইবার চেষ্টা করিত। বোর্দ্দিয়ো তার প্রত্যুত্তরে এইরূপ বলিত :—"তা সত্যি! কিন্তু ভাই, তুমি কি তবে আমাকে একজন রীতিমত মাতাল ঠাওরেছ? আমি অন্য দশজনের মত খিদে চাগাবার জন্য আহারের পূর্ব্বে ২।৪ গেলাস সবুজ-সুরা পান করে থাকি। তুমি যাকে বল অনিষ্টকর সুরা সেই সুরার যারা অপব্যবহার করে তাদের জন্য তোমার এই সকল কথাগুলি রেখে দাও—আমি তোমাকে ভাই অনুনয় করচি, আমার কাছে এ সব কথা বোলো না,—আমাকে রেহাই দেও।"

এই কথার উত্তর আর কিছুই ছিল না। ফ্রানেজ চুপ করিয়া রহিল।

শীঘ্রই সবুজ-সুরা বোর্দ্দিয়োর একরূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী

হইয়া দাঁড়াইল যে, সে যেন সবুজ সুরার জোরেই বাঁচিয়া আছে মনে হইত। এখন এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে সবুজ-সুরা নৈলে আর তার চলে না।

প্রাতঃকালে ভোজনের পূর্ব্বে তাহার জড়তাচ্ছন্ন চিত্ত কিছুরই ধারণা করিতে পারিত না, কিছুই বুঝিতে পারিত না। তাহার ক্ষীণ দৃষ্টি পদার্থ-সকলকে অসম্পূর্ণ রূপে দর্শন করিত, তাহার পাকস্থালী কোনপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করিতে রাজি হইত না।

কোন নিকটবর্ত্তী কাফির আড্ডায় গিয়া যেই সে দুই গ্রাস সবুজ-সুরা পান করিত,—আর অমনি তার অত্যুত্তেজিত মস্তিষ্ক আবার চিন্তা করিতে,অনুভব করিতে সমর্থ হইত; তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, তখন হইতে তাহার একটা কৃত্রিম জীবন আরম্ভ হইত। আর সেই সময় যদি তাহার অর্থাভাব থাকিত, তখন ছবি আঁকিতে তার মন যাইত, এবং পেনসিলের দুই চার আঁচড়ে এমন উৎকৃষ্ট ছবি আঁকিত যাহার বাস্তবিক একটা নিজস্ব মূল্য আছে। সেই রচনার মধ্যে, একটা স্নায়ব উত্তেজনার লক্ষণ, আকারের সৌকুমার্য্য, একটা আমোদের ভাব, একটা বিদ্রূপের ভাব প্রকাশ পাইত; যাহারা এই চিত্রশিল্পীকে জানিত, যাহারা তাহার এই শোচনীয় দুর্ব্বলতার জন্য আক্ষেপ করিত, তাহারাও বলিত, তাহার এই অত্যুত্তেজনার সময়কার রচনাগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কিন্তু বোর্দ্দিয়ো যতই সুরাপান করিত, ততই তাহার চিত্রকর্ম্ম আয়াসসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে ইহা একটা বিষম যন্ত্রণা হইয়া দাঁড়াইল।

তাছাড়া নিতান্ত অনিচ্ছা ও অরুচির সহিত সে এই কাযে প্রবৃ হইত। বরং এখানে ওখানে দুই একটা টাকা ধার করিবে তবু ছবি আঁকিয়া উপার্জ্জন করিতে তার প্রবৃত্তি হইত না। অথচ তাহার এক একখানা ছবি ১০০৲ টাকায় বিকাইত।

ক্রমে লোকে তাহাকে এড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

শেষবার যখন ভাস্কর ফ্রানেজ্ একটা রাস্তার বাঁক ফিরিবার সময় বোর্দ্দিয়োর সম্মুখে আসিয়া পড়ে, বোর্দ্দিয়ো তামাক কিনিবার জন্য তাহার নিকট কিছু পয়সা চাহিয়াছিল।

একটা সিগারেটের জন্য কিছু তামাক, আর কাফির আড্ডায় গিয়া এক গেলাস সবুজ-সুরাপান—চিত্রশিল্পী শুধু এই দুইটি সামগ্রীর অভাব অনুভব করিত।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই জঘন্য অভ্যাসটা ক্রমেই বাড়িয়া চলিলেও কখন কখন তাহার চিত্তমাঝে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় বুদ্ধির বিকাশ হইত, কখন কখন ভীষণ নৈরাশ্য আসিয়া উপস্থিত হইত; তখন সে বুঝিত কোন্ রসাতলে সে নামিয়াছে, এবং এই বদ্ধমূল মত্ততা রোগের কুফল প্রতিরোধ করিবার জন্য, সে তাহার শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিত।

এই যুবকটিকে দেখিলে বড় দুঃখ হয়। এখনও বয়স অল্প। ত্রিশবৎসর মাত্র। কিন্তু ত্রিশবৎসর হইলেও ৪০ বৎসর বলিয়া মনে হইত। তাহার মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত; কখন কখন চক্ষু হইতে অনলশিখা ছুটিতেছে, কখন কখন চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে ও কাচের মত দীপ্তি-হীন, অশ্রুবৎ একপ্রকার তরল পদার্থে যেন ডুবিয়া রহিয়াছে; চুলে এরই মধ্যে পাক ধরিয়াছে; গলার আওয়াজ ভাঙ্গা। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কেবল সম্মুখে এক গেলাস সবুজ-সুরা। তাহা ধীরে ধীরে পান করিতেছে। যেই এক গ্রাস শেষ হইতেছে অমনি আর এক গ্রাস ভরিয়া লইতেছে! এবং কুণ্ডলাকারে সমুত্থিত সিগারেটের অবিরাম ধূম একমনে ধ্যান করিতেছে।

একদিন সে একেবারেই গৃহ হইতে বাহির হইল না।

কে একজন তার দরজায় ধাক্কা মারিল, কিন্তু চিত্রকর কোন উত্তর দিল না। কেবল হুড়কো দিয়া দরজাটা বন্ধ ছিল। বোর্দ্দিয়োর কোন বন্ধু দরজা ভাঙ্গিয়া জোর করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

চিত্রশিল্পী তাহার শয্যার উপর নিশ্চলভাবে অবস্থিত; দাঁতে দাঁতে লাগিয়া গিয়াছে; চোখ খুব খোলা,—এক-



শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

Manasi Press

দৃষ্টে যেন চাহিয়া আছে। মরিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনা হইল; ডাক্তার বলিলেন, "লোকটার একেবারে চৈতন্য লোপ হইয়াছে।" নিকটবর্ত্তী মিউনিসিপাল পল্লীর স্বাস্থ্যনিবাসে তাহাকে অবিলম্বে পাঠান হইল।

২

যুবক মার্শলার যখন পিতৃবিয়োগ হয়, সে উত্তরাধিকারসূত্রে দুই লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইল। তার বয়স ২১ বৎসর কয়েক মাস। বালকটি বড়ই সৌখীন; পারীনগর-সুলভ সমস্ত আমোদ উপভোগের জন্য তাহার একটা বলবতী তৃষা ছিল; এমন লোক কেহই ছিল না যে, তাহাকে সুপরামর্শ দিতে পারে—অন্ততঃ সুপথে লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং অভিজ্ঞতাহীন অপরিণত বয়স্ক যুবকদিগের যতপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধিতা হইতে পারে,—সেই সমস্তের মধ্যে সে "ঘাড়মোড় ভাঙ্গিয়া" ঝাঁপাইয়া পড়িল।

স্বভাবতই, এই সকল আমোদের মধ্যে রমণীই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল; সে রমণীদিগকে যতটা ভালবাসিত, তাহাদের নিকট হইতেও সে ততটা ভালবাসা পাইবার আশা করিত।

পূরা একবৎসরকাল তাহার জীবনটা কেবলই উৎসবের জীবন ছিল, সর্ব্বপ্রকার আতিশয্যে রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হইত। কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে মার্শলা যেরূপ অনাচার অত্যাচারে অপব্যয়ের পথে সবেগে চলিয়াছে তাহাতে পৈতৃকধনের শেষ কপর্দ্দকে না আসিয়া ঠেকিলে সে আর থামিবে না —এবং তাহারও বড় বিলম্ব নাই। কিন্তু ভোগবিলাসীর জীবন যাপন করা বড় সহজ নহে। সে ক্ষমতা সকলের নাই। তার জন্য বলিষ্ঠ ধাতুর দরকার। রাত্রির পর রাত্রি বিবিধ দুষ্পাচ্য মুখরোচক সামগ্রী আহার করিতে হইলে এবং প্রত্যহ বস্ত্রপরিবর্ত্তনের ন্যায় প্রেয়সী পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, যে নীরেট শরীরের প্রয়োজন তাহা মার্শলার ছিল না।

মার্শলার মাতা, মার্শলার শরীর অত্যন্ত সুকুমার ও "ঠুন্‌কো" ধরণের জানিতেন বলিয়াই, তাহাকে অত্যন্ত "আতুপুতু" করিয়া সযত্নে মানুষ করিয়াছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর, সে আপনাকে বয়স্ক বালক বলিয়া মনে করিতে লাগিল, এবং শীঘ্রই সে ফ্যাকাসে হইয়া যাইতে লাগিল, রোগা হইয়া যাইতে লাগিল, যক্ষ্মারোগীর মত অল্প অল্প কাসিতে আরম্ভ করিল।

প্রকৃতির উপর জবরদস্তি করিয়া বরাবর এইভাবেই সে জীবন যাপন করিবে বলিয়া বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে দুর্ব্বলপক্ষ,—এই যুঝাযুঝিতে সে জয়ী হইবে কি করিয়া?

একদিন তার থুৎকারের সহিত এতটা রক্ত দেখা দিল যে দেখিলে ভয় হয়। তাহার নিকটে যে তরুণীটি ছিল সে অনুকম্পাসহকারে বলিল—"তুমি মনে করচ তোমার তেমন কিছুই হয়নি; কিন্তু আমার মনে হয় তোমার একটা কঠিন রোগ হয়েছে।"

—"যেতে দেও যেতে দেও! ও কিছুই নয়, একটু ক্লান্তিমাত্র।"

—"আমি বলচি, আমার কথা বিশ্বাস কর—তোমার শরীরের দিকে একটু মনোযোগ দেও—শরীরের একটু সেবা যত্ন কর।"

—"ছোঃ! আমাকে তা হলে তুমি একটু পাচন ও পল্‌তার ঝোল খাইয়ে রাখ না কেন? ওসব রেখে দাও ডিয়ার—আমি সেদিন কুমার বাহাদুরের টেবিলে ৩৬ ঘণ্টা বসেছিলেম, খাঁ সাহেবের বাড়ী ৬ বোতল কোয়ার্ট পার করেছিলেম; সেই খাঁ সাহেবকে চেনো ত ডিয়ার?" যুবক আপনার বাহাদুরী দেখাইবার জন্য সেই সব মজলিসের আরও তন্নতন্ন বিবরণ কি-সব বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহাকে বাধ্য হইয়া থামিতে হইল। ফ্যাকাসে রঙের কতকটা রক্ত উছলিয়া উঠিয়া আবার তাহার ঠোঁটকে আচ্ছন্ন করিল।

তাহার সঙ্গিনী এক ফোঁটা চোখের জল মুছিবার জন্য মুখ ফিরাইল।

দুইদিন পরে সেই রমণীর চেষ্টায় একজন ডাক্তার

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রোগীর জন্য খুব কড়াক্কড় নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু তরুণীর নিকট কিছুই ঢাকিলেন না, বলিলেন—"রোগীর যেরূপ অবস্থা তাতে বাঁচবার বড় আশা নেই।"

তরুণী বলিল,—"মশায়, আমি ত ওকে চিনি,—ও মুখে বলবে, 'সব নিয়ম পালন করব'—কিন্তু আসলে কিছুই করবে না।"

—"একটা কিছু করা চাই; আমার ত বড় একটা আশা ভরসা নেই। তবে, বয়স অল্প, সেবা শুশ্রূষা ও যত্নে যদি" * * *

—"তা হলে মশায় ওকে আর কোথাও নিয়ে যাওয়া আবশ্যক। এখানে থাক্‌লে কিছুই হবে না।"

—"সে ত সহজেই হতে পারে? ওকে মিউনিসিপাল হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্।"

—"হাঁসপাতাল!"

—"না ঠিক্ হাঁসপাতাল নয়, একটা স্বাস্থ্যনিবাস; কিছু টাকা দিলেই সেখানে নিজের ইচ্ছেমত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পাবে।"

—"আচ্ছা, আমি কি তা হলে ওকে দেখ্‌তে পাব?"

—"ইচ্ছে কর ত প্রতিদিনই দেখ্‌তে পাবে।"

—"আমি নিশ্চয়ই রোজ দেখা করতে যাব * * * আহা বেচারী মার্শলা!"

যখন মার্শলাকে এই সঙ্কল্পের কথা জানান হইল, তখন সে তার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ করিতে লাগিল। যখন ডাক্তার দেখিলেন আর কিছুতেই বাগ মানাইতে পারেন না, তখন তিনি তাহার আসল অবস্থাটা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"সেই স্বাস্থ্যনিবাসে গেলে তোমার রীতিমত সেবাশুশ্রূষা হবে, যত্ন হবে; আর যদি না যাও, একমাসের মধ্যেই তোমার সব শেষ হয়ে যাবে।"

—"আমার অবস্থা এতটা সঙ্গিন নয় বোধ হয় ডাক্তার?"

—"খুবই সঙ্গীন!"

মার্শলা উদাসীনভাবে বলিল:—"আচ্ছা যদি যেতেই হয় ত যাওয়া যাবে; কিন্তু ডাক্তার আমার কাছে একটা করার করতে হবে; সে করারটা রাখ্‌তেই হবে।"

—"কি করার?"

—"হাসপাতালের রোগীদের মত মার্কামারাসাদা টুপি পরতে আমাকে না বাধ্য করে। বরং তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল!"

ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকাইয়া গুন্ গুন্ স্বরে বলিলেন,—"কি ছেলেমানুষ! এই কথা ও?"

—"হাঁ, এই কথা।"

এইরূপে মার্শলা ও বোদ্দিয়ো দুজনেই একই আতুরাবাসের বাসিন্দা হইল।

৩

মার্শলার গৃহে যে তরুণীকে ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছিলাম, তাহার নাম জুলি। জুলি নটীশ্রেণীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত সৎচরিত্র; "মন-ভোলান" কারবার তার ছিল না। মার্শলার আত্মীয়দিগের সহিত তার পরিচয় ছিল। যখন মার্শলা আমোদ উপভোগের জন্য থিয়েটারে যাইত, তখন জুলিকে সেখানে একবার দেখিয়াছিল, এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছিল। জুলি একটু কল্পনাপ্রবণ লোক ছিল। মার্শলার আমুদের ভাব, মার্শলার হৃদ্যতা, মার্শলার অল্প বয়স, এই কল্পনাপ্রবণ তরুণীর মনের উপর একটা ছাপ দিয়াছিল। মুগ্ধচিত্ত প্রেমোন্মত্ত এই যুবকের প্রেম সে কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। মার্শলা কোন রমণীর সহিত পাঁচ মিনিটকাল থাকিলেই সেই রমণীর নিকট শপথ করিয়া বলিত, সে তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে।

মার্শলার ভালবাসা কিরূপ হাল্‌কা ধরণের তাহা বুঝিতে জুলির বিলম্ব হইল না। মার্শলা অকপটে জুলির নিকট স্বীকার করিত যে, একমাত্র নারীর উপর প্রেম স্থির রাখিতে সে একেবারেই অসমর্থ; তাই জুলি তাহার উপর বড় একটা পীড়াপীড়ি করিত না;

জুলি মার্শলার সহিত প্রেয়সী অপেক্ষা বন্ধুভাবেই ব্যবহার করিত। জুলি তাহার সব দোষ ক্ষমার চক্ষে দেখিত। মার্শলা তাহাকে একবার মনেও করিত না—তাহাকে আপনার নিকট রাখিতে চাহিত না, অন্য দুশ্চরিত্রা রমণীদের সহিত আমোদ প্রমোদে অর্থনাশ করিত, তখনও জুলি প্রতিদিন তাহাকে হৃদয়ের সহিত আদর অভ্যর্থনা করিত।

জুলি যখন দেখিল, মার্শলা, ধ্বংশের মুখে যাইতেছে, তখন নির্ভয়ে সে মার্শলার গৃহে গিয়া তাহার উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে সমস্তই পণ্ডশ্রম হইল।

তথাপি সে একটুও পিছপাও হইল না। এবং যখন মার্শলা মিউনিসিপাল স্বাস্থ্যাশ্রমে যাইতে স্বীকৃত হইল, তখন সে তাহার শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিল এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বাস্থ্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিন সেইখানেই কাটাইত।

তখন বৈশাখের মাঝামাঝি। স্বাস্থ্যাশ্রমের উদ্যানটি বাসন্তী শোভায় বিভূষিত। যে সকল রোগীর মুক্ত বায়ু সেবন করিবার অবস্থা হইয়াছে তাহারা এইখানে আসিয়া মধ্যাহ্ন সৌরকিরণে স্বাস্থ্যপ্রদ কুসুম-সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইত।

এই রোগীদের মধ্যে বোদ্দিয়ো একজন। চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার গুণে সে যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। এইখানে আসিয়া অচৈতন্য অবস্থা হইতে যখন সে মুক্তিলাভ করে, সে সর্ব্বপ্রথমেই সবুজ-সুরা চাহিয়াছিল। কিন্তু সবুজ-সুরা যাহাতে সে একটুও না পায় তজ্জন্য ভৃত্যদের প্রতি বিশেষ আদেশ ছিল। সবুজ-সুরার অভাবে প্রথম প্রথম তাহার ভয়ানক কষ্ট হইত। কিন্তু ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া পানেচ্ছার বেগটা কমিয়া আসিল। স্বাস্থ্যপ্রদ বলপ্রদ খাদ্য আহার করিয়া শরীরে একটু বল আসিল। এবং যে পরিমাণে তাহার সুরা-পান-জনিত মূঢ়তা অন্তর্হিত হইল, সেই পরিমাণে তাহার মন তাজা হইয়া আবার পূর্ব্ববৎ হইয়া উঠিল; আর সে সবুজ-সুরার নাম করিত না; বলিত, সবুজ-সুরা সে আর কখন পান করিবে না। এখন সে আরোগ্য-লাভ করিয়াছে মনে করিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইবার কথা হইল। কিন্তু তাহার বন্ধুরা—যাহারা তার হইয়া স্বাস্থ্যাশ্রমের বেতনাদি দিত—তাহারা স্বাস্থ্যাশ্রমবাসের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাদের এই বন্ধুত্বের কাজটাকে অসম্পূর্ণ রাখিতে ইচ্ছা করিল না। তাহারা আর একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল, এবং তাহাকে স্বাস্থ্যাশ্রমে আরও কিছু কাল রাখিতে চাহিল—যাহাতে পুরাতন কু-অভ্যাসটা আবার ফিরিয়া না আসে।

উহাকে সিগারেট ব্যবহার করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। এখন সে সবুজ-সুরা ভুলিয়া গিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

এখন প্রায়ই দেখা যায়, বোদ্দিয়ো বাগানে বসিয়া বই পড়িতেছে কিংবা ছবি আঁকিতেছে। মার্শলা যখন স্বাস্থ্যাশ্রমে আসিল, সেই সময় হইতে বোদ্দিয়ো তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। মার্শলার অসুস্থ অবস্থা; আর বোদ্দিয়ো একটা উপলক্ষ্য পাইলেই রসিকতা করিতেছে, স্ফূর্ত্তি করিতেছে। এই উভয়ের মধ্যে বেশ একটা বৈপরীত্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে দুইজনই পারী নগরের একই সমাজে যাতায়াত করিত; একই ভাষা ব্যবহার করিত—অর্থাৎ সেই ইতর ইয়ারকির ভাষা যাহা সহরের সৌখিন রাস্তায়, রঙ্গশালার নেপথ্য-কক্ষে, শিল্প-কারখানায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে স্বাস্থ্যাশ্রমে আসিয়া উহারা পরস্পরকে অন্বেষণ করিত, এবং বরাবর এক সঙ্গেই থাকিত।

জুলি এই আতুরাশ্রমে বোদ্দিয়োকে দেখিয়া খুসী হইল। মনে মনে ভাবিল, বোদ্দিয়ো তাহার প্রাণ-সখা মার্শলার সঙ্গী হইতে পারিবে। এবং তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়াও সে আমোদ পাইত, কেন না সে বেশ একটু রসাইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত।

বোদ্দিও প্রথমেই তাহাদের নিকট তাহার সমস্ত ইতিহাস বলিয়াছিল, এবং আপনার সম্বন্ধে কতকগুলা

দুঃশ্রাব্য বিশেষণ প্রয়োগ করিতেও বিরত হয় নাই। সে তাহাদের নিকট এইরূপ বলিল :—"আমাকে ত ভাই এখন এই রকম দেখ্‌ছ; একমাস পূর্ব্বে, আমি পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত নিতান্তই অসাড় ও বিকলাঙ্গ ছিলেম, দুর্ব্বলচিত্ত বিলাসী ছিলেম, সবুজ-সুরা পানে মত্ত হয়ে পশুর মত জীবনযাপন করতেম। ওঃ! এখন ওকথা মনে করলে এয়াল্পি দেশের জনশূন্য প্রান্তরে লুকিয়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে!"

—"এখন ত দেখ্‌চ, এ ব্যামো সারে। চিকিৎসার অসাধ্য নয়।" বোর্দ্দিয়ো বলিল,—"এই রোগে মরেও লোকে, আমি মরতে মরতে রয়ে গেছি।"

—"এই মারাত্মক সুরা আর কখন তুমি পান করবে না?"

—"কখ্‌খন না!"

বোর্দ্দিয়ো "কখ্‌খন না" এই কথা দুটি যে ধরণে উচ্চারণ করিল, তাতে মনে হয়, উহার মধ্যে কোন কাপট্য নাই। সে বলিল, সুরাপান করিতে তাহার আর ইচ্ছা হয় না; পূর্ব্বে ঐদিকে যেরূপ একটা ভয়ানক ঝোঁক ছিল, এখন আবার উল্টা ভয়ানক বিতৃষ্ণা হইয়াছে। চিত্রকর বোর্দ্দিয়ো যেমন সম্পূর্ণ আরোগ্যের পথে আসিয়াছিল, মার্শলার সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে সে কথা বলা চলে না। অজস্র সেবা শুশ্রূষা সত্ত্বেও, তাহার ক্ষয়রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। উহার শেষ পরিণাম সম্বন্ধে জুলির আর কোন সন্দেহ ছিল না। তবু,সে নিজের আশঙ্কা ও মনোবেদনা মার্শালার নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিবার জন্য যারপর নাই চেষ্টা করিত। নানা প্রকার অত্যাচারের ফলে বন্ধুর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, বোর্দ্দিয়ো অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল।

বোর্দ্দিয়ো তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইল—"দেখ আমি এখানে এসে বাস্তবিকই নব-জীবন লাভ করেছি।"

কিন্তু মার্শলা ও কথায় ভুলিল না। যে ব্যক্তি অসাধ্য রোগকে সাধ্য বলিয়া তাহাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতেছে, সেই অন্তিমের বন্ধুর প্রতি তাহার:প্রীতির মাত্রাটা যেন দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।

একদিন বোর্দ্দিয়ো, সময় কাটাইবার জন্য মার্শলার ছবি আঁকিবে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

মার্শলা ঈষৎ হাসিয়া, প্রসন্নভাবে সম্মতি দিল। ইতিপূর্ব্বে একবার জুলিও তাহার একটা ছবি তুলাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে। মার্শলা বুঝিয়াছিল তাহার মৃত্যু আসন্ন, তাই এই প্রস্তাবে আর দ্বিরুক্তি করিল না।

ছবি আঁকা শেষ হইলে মার্শলা, চিত্রকর বন্ধুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল :—"ভাই তোমার নিকট আমার একটা স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাব, রাখবে কি?" বোর্দ্দিয়ো আকুল হইয়া একটা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মার্শলা বলিল,—"ভাই কাতর হোয়ো না, আমাকে শুধু একটা কলম আর কাগজ দাও। আমার অন্তিম কালের জন্য একটা বন্দোবস্ত করতে চাই।"

—"মার্শলা, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?—ত্বরা করবার মত কিছুই হয় নি।"

"—তা হোক্, একটু আগে থাক্‌তে গুছিয়ে রাখা কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?"

কিন্তু * * * তারপরেই আর একটু ম্লান হাসি হাসিয়া মার্শলা আরও এই কথা বলিল :—

—"তা ছাড়া নিয়তির ডাক্ না আস্‌লে এতেই কি আমার মৃত্যু আরও এগিয়ে আস্‌বে মনে কর?"

মুমূর্ষু ব্যক্তি যাহা চাহিতেছিল তাহা আনিয়া দেওয়া হইল।

কাগজের উপর অতিকষ্টে সে দুইচারি ছত্র লিখিল। পরক্ষণেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মনে হইল, বুঝি সব শেষ হইয়াছে। কিন্তু একটু পরেই আবার জ্ঞান হওয়ায় সে একজন পাদ্রিকে আনিতে বলিল। তার পরদিনই সমস্ত ভবযন্ত্রণার অবসান হইল।

৪

মার্শালার মৃত্যুর একমাস পরে, বোর্দ্দিয়ো একদিন

সহরের বেড়াইবার পথে পায়চারি করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

আর এখন ভবঘুরের মত তার আঙ্গুলগুলা সিগারেটের ধোঁয়ায় হলদে হইয়া যায় নাই, তার কাপড়-চোপড় এখন আর ধূলায় আচ্ছন্ন নহে, তার চোখ এখন আর কাচের মত নিষ্প্রভ নহে, তার নিঃশ্বাস এখন আর সবুজ-সুরার গন্ধে ভরপুর নহে।

এখন তার হাসি হাসি মুখ, সাদা ধপধপে কাপড়, উত্তম ছাঁটের কোর্ত্তা, নূতন দস্তানা, হাতে একটা ছড়ি। তার বয়স যেন দশ বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে।

তাহার সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ হইল, তাহারা অতি কষ্টে তাকে চিনিতে পারিল। কিন্তু বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্তটা চলিয়া গেলে, তাহারা প্রীতিভরে তাহার হাত টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে অভিনন্দন করিল।

—"ভাই বোর্দ্দিয়ো তোমাকে দেখে বড় খুসী হলেম। বাস্তবিক তোমাকে এমন সুস্থ আর কখন দেখি নি।"

—"শুনেছিলেম তোমার নাকি ব্যামো হয়েছিল; সে কথাটা তবে কি সত্যি নয়?"

বোর্দ্দিয়ো একটু হাতে রাখিয়া, এই সকল সহানুভূতির নিদর্শন গ্রহণ করিল। তাহারা বুঝিতে পারিল, এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে তাহার ইচ্ছা নাই; কিন্তু তাহার মৎলবটা জানিবার জন্য তাহার বন্ধুদের কোন আগ্রহ ছিল না। তাহাদের সখা ভালোয় ভালোয় ফিরিয়া আসিয়াছে, নিজ পদমর্য্যাদার উপযুক্ত অবস্থা আবার লাভ করিয়াছে—ইহাতেই তাহারা সুখী। তাহারা আর কিছু চাহে না।

এইখানেই বলিয়া রাখি, বোর্দ্দিয়ো ধনশালী হইতে পারে নাই। কেবল মার্শলা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাহাকে তাহার আসবাবপত্র ও তাহার কাপড়ের আলমারীটা দিয়া গিয়াছিল। এই সূত্রে অনেক রকমের পরিধান বস্ত্র তাহার হস্তগত হইয়াছে—নানা ফ্যাশানের নানা রঙের পেণ্টুলেন, কামিজ, কোর্ত্তা ইত্যাদি।

বাইশটা ছড়ি সে পাইয়াছে। আর দেরাজভরা অসংখ্য নেকটাই;—ইংরেজি কালো নেকটাই, লাল নেকটাই, ফিঁকে গাঢ় সকল রঙের নেকটাই। টুপিরও অভাব ছিল না; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে টুপিগুলা তার মাথায় ঢুকিত না বলিয়া, অনেকগুলা টুপির বিনিময়ে সে একটা নূতন টপী সংগ্রহ করিয়াছিল।

এই সকল জিনিষ তাহার হস্তগত হইবার পর সে ভাল কাপড় চোপড় পরিয়া প্রথমেই জুলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল; সেই বিধবা রমণী অন্তরের সহিত তাহার অভ্যর্থনা করিল। এবং তাহাকে ভদ্রলোকের বেশে আসিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, এই কি সেই দরিদ্র চিত্রকর, যাকে সে আতুরাশ্রমে দেখিয়াছিল।

বোর্দ্দিয়ো খুব কৌশলী ও উপায়জ্ঞ ছিল। কি করিয়া তার উপর জুলিয়ার একটু দরদ হয়, কি করিয়া তার মন ভিজান যাইতে পারে তাহা বোর্দ্দিয়ো জানিত। এবং কাজেও তাহা করিল। প্রথম সাক্ষাতেই জুলিয়া তাহাকে আবার আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল।

বোর্দ্দিয়ো এই সুযোগ ছাড়ে নাই। এই রমণী ইতিপূর্ব্বে তাহার মনের উপর একটা গভীর রেখাপাত করিয়াছিল; তাহার প্রতি একটা অকৃত্রিম ভালবাসার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিল; তাহার চোখের সামনে যখন তাহার বন্ধু মার্শলার মৃত্যু হয়, সেই সময়ে এই জুলিয়াকে প্রাণ ঢালিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে দেখিয়াছিল। বোর্দ্দিয়ো মনে মনে ভাবিত, এমন বন্ধুর ভালবাসা ও সুপরামর্শ পাইলে, বেশ ভালভাবে জীবন যাপন করা যাইতে পারে। আর বোর্দ্দিয়ো যেরূপ খোলা-প্রাণা সরল প্রকৃতির লোক ছিল, সে জুলিয়াকে এই কথা বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করে নাই। জুলিয়া উত্তর করিল:—"তাতেও ত মার্শলার বদ্‌খেয়ালি ঘোচে নি। বেচারা যদি আমার কথা শুনত তাহলে আরও কতকাল বেঁচে থাকত।"

বোর্দ্দিয়ো বলিল—"আমি যদি তোমার মত কোন রমণী পেতেম, তাহলে আমি কখনই অধঃপাতে যেতেম না।"

"না আপনি ওকথা বল্‌বেন না। আপনি একটা বদ্‌অভ্যাস একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন না ?"

এই কথা বলিবার সময় জুলিয়া বোর্দ্দিয়োর চোখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বোর্দ্দিয়ো সেই প্রখর দৃষ্টির সম্মুখে একটুও টলিল না। বুঝা গেল বোর্দ্দিয়ো সত্য কথাই বলিতেছে।

বস্তুত আতুরাশ্রম হইতে বাহির হইবার পর হইতে বোর্দ্দিয়ো একবারও সবুজ-সুরা পান করে নাই। জুলিয়া নেত্র অবনত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। বোর্দ্দিয়ো আবার বলিল :—

"একজন আর্টিষ্টের উপর এইরূপ ভালবাসার কি সুখজনক প্রভাব তা কি আপনি বুঝ্‌তে পারেন ? এক বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম আমাকে ধারণ করে আছে ; একটি প্রেমপূর্ণ হৃদয় আমার পাশে থেকে আমার নিরাশার মুহূর্ত্তে আমাকে সান্ত্বনা দিতে প্রস্তুত রয়েছে ; আমার হস্ত, এক করুণাময়ী দেবীর স্নেহ হস্তের অবলম্বন পেয়েছে —এইরূপ অনুভব করতে কত সুখ তা কি আপনি বোঝেন ?"

—"মশায় আমি"—

—"না না, ওরকম বলাটা আমার ভারী ভুল; এইরূপ আনন্দের স্বপ্ন দেখা পাগলামি বই আর কিছুই নয় ; আমি এমন রমণী কখন পাব কি, —যার হৃদয়-ভাণ্ডার ক্ষমার ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ, যে আমাকে অমন করে ভালবাসতে পারবে—যাই হোক্‌ যদি এমন একটি রমণী পাই যে সম্পূর্ণ আমার উপর বিশ্বাস করে' আমাকে এই কথা বল্‌তে পারবে : —'ওগো, তুমি একটু উন্নতির চেষ্টা কর, একজন বিখ্যাত লোক হয়ে পড় ; পরিশ্রম কর, আপনার নাম জাহির কর ; তোমার জীবনের অর্দ্ধাংশভাগী হতে আমি রাজী আছি ; তোমার দুঃখ, তোমার সুখ আমার হবে।' কিন্তু দেখুন, ওরকম ভালবাসার যোগ্য হতে এখনও আমার অনেক দিন লাগ্‌বে।

"দেখ জুলিয়া ওরকম রমণীকে আমি সর্ব্বান্তকরণে ভালবাসব, প্রাণ ঢেলে ভালবাসব। আমি তার গোলাম হয়ে থাক্‌ব। আমার সমস্ত মন, সমস্ত হৃদয় ...জুলিয়া আমার জীবন তোমার হাতে সমর্পণ করচি।"

এই কথা বলিয়া, বোর্দ্দিয়ো তরুণীর পদতলে বসিয়া পড়িল এবং তাহার হস্ত চুম্বনে চুম্বনে ছাইয়া ফেলিল।

জুলিয়ারও হৃদয় বিচলিত হইল, ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। চিত্র-শিল্পীর সেই আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাস তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। হঠাৎ জুলিয়া বোর্দ্দিয়োর হাত ছাড়াইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। আর এইরূপ বলিল :—"দেখ বোর্দ্দিয়ো, তুমি যদি সচরাচর লোকের মত বাঁধিগৎ আউড়ে আমার সাধ্যসাধনা করতে তা হলে তখনই আমি প্রত্যাখ্যান করতেম ; কিন্তু তুমি আর্টিষ্টের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা পেড়েছ—ঐ কথাই আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। আমি বল্‌ছি তোমাকে, আমি আর্টিষ্টের আমোদের ভাগী, আর্টিষ্টের মত্ততার ভাগী হতে চাই না। যার বুদ্ধি অন্য লোকের বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে উঠেছে তার কাছ থেকে ভালবাসা পেলে আমি গর্ব্ব অনুভব করব, তার সুখে আমি সুখী হব—এই মাত্র। তুমি বল্‌ছিলে তোমার একজন বন্ধুর প্রয়োজন, একজন অনুরক্ত সঙ্গীর প্রয়োজন, এমন এক স্ত্রীর প্রয়োজন যে তোমার আর্টিষ্ট-জীবনের দুর্ব্বলতা সামলাতে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে ; আচ্ছা বেশ তাই হবে, আমিই তোমার সেই স্ত্রী হব।"

—"জুলিয়া ! একি সম্ভব ? তুমি রাজি হবে ?"

"—হাঁ, কিন্তু একটা কথা তোমায় বলি শোন—সেই কথাটি তোমার স্মৃতিপটে মুদ্রিত করে রাখ্‌তে হবে।"

—"আচ্ছা, সে কথাটা কি—আমাকে বল।"

—"আজ থেকে আমার দেহ মন তোমাকে সমর্পণ করচি ; তোমার সমস্ত ইচ্ছা আমার ইচ্ছা হবে ; এবং কখন আমার মুখ থেকে একটি কটু কথা, বা তিরস্কারের কথা শুনতে পাবে না।"

—"তুমি দেবী ! সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ! "

—"কিন্তু যে দিন—কালই হোক্‌, দশবৎসরের পরেই হোক্‌—যে দিন দেখ্‌ব, এক গেলাস সবুজ-সুরা তোমার ঠোঁটে ঠেকিয়েছ সেই দিনই—মন দিয়ে শুনচ ত ? সেই দিনই একটি টুঁ শব্দ না করে',

কোন বাদ প্রতিবাদ না করে', তোমাকে ছেড়ে চলে যাব। তখন তুমি যতই অনুরোধ উপরোধ কর না কেন, অঙ্গীকার কর না কেন, আমি তোমাকে মার্জ্জনা করব না; তোমার আর মুখ দর্শন করব না। আমি এই শপথ করচি!"

—"এই করারে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মতি দিচ্চি, তার জন্য আমার কোন ভয় নাই...সবুজ সুরা—সে-ত চিরজীবনের মত আমি ত্যাগ করেছি। আমি একথা শপথ করে বল্‌ছি।"

ছয় মাস কাল বোদ্দিয়োর জীবনটা বেশ সুখে কাটিল। বোদ্দিয়ো জুলিয়াকে সাক্ষাৎ গৃহলক্ষ্মী বলিয়া মনে করিল। জুলিয়া শিল্প কলার মর্ম্ম বেশ বুঝিত; শিল্প সম্বন্ধে তাহার একটা স্বাভাবিক বোধ-শক্তি ছিল, তাই সে বোদ্দিয়োর চিত্র রচনা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত খুব অনুরাগের সহিত দেখিত। বোদ্দিয়ো দেখিত, জুলিয়ার ওষ্ঠে সর্ব্বদাই একটু হাসি লাগিয়া আছে, তাহার দৃষ্টি স্নেহ ও প্রেমরসে পূর্ণ; এবং জুলিয়া বোদ্দিয়োর জীবনকে ও জীবনের সমস্ত কার্য্যকে এমন নিজের করিয়া লইয়াছে যে, দেখিয়া মনে হয় যেন কত বৎসর ধরিয়া উহাদের বিবাহ হইয়াছে।

বড় রাস্তার ধারে বোদ্দিয়ো এক প্রস্থ কামরা ভাড়া লইয়াছে। তন্মধ্যে একটা কামরা চিত্রকর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট। জুলিয়া তাহার সঙ্গিনী। কিন্তু জুলিয়া, বাড়ী ভাড়ার মেয়াদ এখনও একবৎসর আছে এই ছুতা করিয়া নিজের বাসা-বাড়ী এখনও ত্যাগ করে নাই।

বোদ্দিয়োর নিকট দেদার কাজ আসিতে লাগিল। সমস্ত সচিত্র মাসিকগুলা তাহাকে ছবির জন্য ফরমাস করিতে লাগিল, কিন্তু সকলকে সন্তুষ্ট করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে প্রাতঃকাল হইতেই কাজে লাগিত; এবং বেলা ৪টার সময়, হয় মাসিক পত্রের ম্যানেজারদিগের নিকট যাইত, নয় বেড়াইবার সরকারী উদ্যান-পথে বেড়াইতে যাইত; এবং আর্টিষ্ট মহলে কি-কি নূতন ব্যাপার চলিতেছে তাহার খোঁজ-খবর লইত।

একদিন, কোন এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হওয়ায় তাহাকে কোন এক কাফির আড্ডায় দেখিতে যাইবে মনে করিয়া সেইখানে ঢুকিয়া পড়িল; যার তল্লাসে গিয়াছিল তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ও তাহার অপেক্ষায় বসিয়া-বসিয়া অধীর হইয়া উঠিল। গরম বোধ হওয়ায়, একটা গেলাসে 'গুস্‌বেরীর' রস জলে মিশাইয়া ঠাণ্ডা সর্ব্বৎ প্রস্তুত করিয়া লইল।

হঠাৎ মাথা তুলিয়া একটা গন্ধের আঘ্রাণ পাইল। তাহার পাশেই, এক ভদ্রলোক সবুজ-সুরা তৈরী করিয়া গেলাসে গেলাসে ভরিবার উদ্যোগে ছিল। ঘোলা-ঘোলা দুধোলো একপ্রকার সবুজ-সুরা, যার তীক্ষ্ণ গন্ধ একটু বরফ জলের যোগে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে; সেই গন্ধটা চারিপাশে ছড়াইয়া পড়ায় বোদ্দিয়োর নাসারন্ধ্রকে একটু উত্তেজিত করিল।

বোদ্দিয়ো নড়িয়া উঠিল এবং সেখানকার ভৃত্যকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া, সর্ব্বতের দামটা চুকাইয়া দিয়া, সর্ব্বৎ পান না করিয়াই প্রস্থান করিল। ঐ দিন একটু মুখভারী করিয়া গৃহে ফিরিল।

জুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল:—"বোদ্দিয়ো, তোমার হয়েছে কি?"

—"কিছুই না! একটা লোকের উপর আমি ভারী চটে গেছি; সে আমাকে বলেছিল, কোন একটা কাফির আড্ডায় তার সঙ্গে দেখা হবে; আধ ঘণ্টা তার জন্য মিছিমিছি সেখানে আমায় বস্‌তে হল। অথচ আমাকে বলেছিল প্রতিদিন সেখানে সে যায়।"

তার পর দিন, বোদ্দিয়ো আবার সেই কাফির আড্ডায় উপস্থিত হইল। সেই লোকটা সেখানে ছিল। বোদ্দিয়োকে সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি নেবে? এক গেলাস সবুজ-সুরা? এখন সাড়ে পাঁচটা এই ঠিক্ সময়।"

বোদ্দিয়ো খুব জোরের সহিত বলিল—"না। তুমি ত জান, আমি আর ওসব পান করি নে।"

—"আঃ! ছোঃ! একবার পান করলেই বা! এ-ই, ছোক্‌রা! দু গ্লাস সবুজ-সুরা নিয়ে আয়।" বোদ্দিয়োর

চখের সাম্‌নে দিয়ে যেন একটা মেঘ চলিয়া গেল। এক গেলাস সবুজ-সুরা তাহার হাতে আসিলেও, অতিকষ্টে তাহা ঠোঁট পর্য্যন্ত লইয়া গেল; তার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হইতে লাগিল।

ভালবাসার ধনকে কোন প্রেমিক ফিরিয়া পাইলে যেরূপ তাহার আনন্দ হয়, বোর্দ্দিয়ো সবুজ-সরাপ পাইয়া তদপেক্ষা বেশী আনন্দ অনুভব করিল।

কিন্তু এক গেলাস সরাপ পান করিবার পরেই, তাহার শপথের কথা মনে পড়িল। তাহার বন্ধুকে সে বলিল:—"এখন আমরা যদি একটু কুল্পি বরফ খাই তাহলে"—

—"সবুজ-সরাপের উপরে আবার কুল্পি বরফ; ঠাট্টা করচ নাকি?"

—"না, সত্যি বল্‌চি, এখন কুল্পি বরফ আমার বেশ লাগ্‌বে।"

—"তোমার যা খুসি; আমি কিন্তু আমার সবুজ-সরাপ নিয়েই থাক্‌ব।"

—"ছোক্‌রা! একটা কাফি-জমান কুল্পি-বরফ।" কুল্পিবরফ আনা হইলে, বোর্দ্দিয়ো উহা লইল, তারপর তার বন্ধুকে এইরূপ বলিল:—"দেখত ভাই, আমার মুখ দিয়ে সরাপের গন্ধ বেরুচ্চে কি না"—এই বলিয়া তাহার মুখের উপর ফুঁ দিল।

—"বুঝিচি, তুমি চাও…ওহে…তুমি তবে বুঝি কাউকে ভালবাস?"

—"হাঁ।"

বন্ধু আবার বলিল:—

—"তা বেশ! তোমার কোন ভয় নেই; সবুজ-সরাপের গন্ধ আছে বলে একটু সন্দেহ পর্য্যন্ত হচ্চে না।"

—"ভাই; তোমার কথা শুনে বাঁচলুম।"

যখন বোর্দ্দিয়ো ডিনার খাইবার জন্য বাড়ী ফিরিল, অন্যদিন যেমন স্ত্রীর মুখ চুম্বন করে আজ তাহা না করিয়া, এবং মুখ হইতে সিগারেট্টা না নামাইয়া, তাহার দিকে তাকাইল না। জুলিয়া চকিতের মধ্যে এক নজরেই তাহাকে দেখিয়া লইল; কিন্তু কিছুই বলিল না। তারপর দিন বোর্দ্দিয়ো বেলা ৫টার সময় আবার কাফির আড্ডায় চলিয়া গেল। এবার সে নিজে বন্ধুকে সবুজ-সরাপ পান করিতে অনুরোধ করিল। তাহার বন্ধু বলিল:—"কিন্তু ভাই তোমার প্রাণেশ্বরী তাহলে কি বল্‌বেন?"

—"আঃ রেখে দেও! ক্রমে তার অভ্যাস হয়ে যাবে।"

ঐ দিন সে দুই গ্লাস সবুজ-সরাপ পান করিল—তারপর মুখে একটু জল লইয়া কুল্‌কুচি করিয়া ফেলিল। আর বেশী কিছু করিল না। তারপর মুখের ভাব অবিকৃত রাখিবার জন্য সে মাথা খুব উঁচু করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই জুলিয়ার মুখ শাক হইয়া গেল। বোর্দ্দিয়ো জিজ্ঞাসা করিল:—"এখনো ডিনার প্রস্তুত হয় নি?" এই কথাটা এমন একটা খাপছাড়া ভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল যে ওরকম ভাবে বলা তার কখন অভ্যাস ছিল না।

—"এক মিনিটের মধ্যেই হবে ভাই; দাসী লুইজা এখনই নিয়ে আস্‌বে।"—এই কথা বলিয়া জুলিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল।

সোয়া ঘণ্টা অতিবাহিত হইল; বোর্দ্দিয়ো কতকগুলি ছবি গুছাইয়া রাখিতেছিল—তাই ওদিকে তার খেয়াল ছিল না। আধঘণ্টা পরে, সে ডিনারের জন্য অধীর হইয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল—"লুইজা, ডিনার কৈ?"

—"আমি মা ঠাকরূণের জন্য অপেক্ষা করছিনু, তিনি হুকুম দিলেই ডিনার আনি।"

—"দেখ্‌ দিকি তিনি শোবার ঘরে কি কচ্ছেন?… আমার ভয়ানক খিদে পেয়েছে!"

ঝী, শোবার ঘরে ঢুকিয়া তখনই আবার বাহির হইয়া আসিল।

—"মা ঠাকরূণ ওখানে নেই।"

—"কি! তিনি ঘরে নেই?"

বোর্দ্দিয়ো তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে প্রবেশ করিল। শোবার ঘর খালী। কেবল একটা ছোট টিপায়ের মাঝখানে একখানি পত্র ছিল। যন্ত্র-চালিতের মত

বোর্দ্দিয়ো উহা গ্রহণ করিল ; চিঠিখানা বোর্দ্দিয়োর নামে। থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উহা খুলিল। উহাতে এই কথাগুলি মাত্র ছিল :—

"তুমি তোমার শপথ রক্ষা করিলে না, আমি আমার শপথ রক্ষা করিব ; আমি ও সবুজ-সরাপ—এই দুইয়ের মধ্যে একটা তোমার বাছিয়া লইবার কথা ছিল। তুমি সবুজ-সরাপকেই পছন্দ করিয়াছ।

"আমার সহিত আর কখন তোমার দেখা হইবে না।"

বোর্দ্দিয়ো একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। —"জুলিয়া! জুলিয়া!"

কেহ উত্তর দিল না।

—"চলে গেছে! না, না, তা সম্ভব নয়··· সে কখনই তা করবে না! আমি তাকে ফিরে পাবই পাব ··· আমি এখনই তার বাড়ী যাচ্ছি।"

সে তখনই দৌড়িয়া তাহার বাসায় গেল। দ্বারপাল বলিল, ঐ তরুণী ছয় সপ্তাহ হইল, সেখানে আর আসে নাই।

বোর্দ্দিয়ো কিছুই বুঝিতে পারিল না ; সে অচল হইয়া একদৃষ্টে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। দরোয়ান আবার বলিল, জুলিয়া বাড়ীতে নাই।

তখন সে আবার রাস্তায় বাহির হইল। কিন্তু তার পা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; মাতালের মত চলিতে লাগিল ; কি করিতেছে তাহার সে জ্ঞান ছিল না ; বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আর একটু সাহস পাইল ; মনে মনে ভাবিল, —আমি বুঝতে পারচি জুলিয়া আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছে। বোধ হয় আমাকে ভয় দেখাচ্চে, কালই সকালে ফিরে আসবে। আমি আবার তার বাড়ীতে যাই। তাকে আমায় ফিরে পেতেই হবে।

কিন্তু তারপরদিনও জুলিয়া আসিল না।

বোর্দ্দিয়ো যখন আবার তার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল, দরোয়ান তাহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিল না। তাহাকে বলিল, সে কি তামাসা পাইয়াছে, কাল তাহাকে সে দশবার বলিয়াছে জুলিয়া বাড়ী নাই, আরও কতবার বলিতে হইবে!

বোর্দ্দিয়ো আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া ফিরিয়া গেল।

সে বুঝিয়াছিল,সব শেষ হইয়াছে। সে সোজা কাফির আড্ডায় গিয়া এতখানি সবুজ-সরাপ পান করিল যে আনন্দ-উল্লাসের স্থানে একটা মারাত্মক বেদনা আসিয়া তাহার অন্তরাত্মার অন্তরতম প্রদেশকে অধিকার করিল।

সে গান গাইতে লাগিল, অনর্গল প্রলাপ বকিয়া যাইতে লাগিল, হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চরবে হাসিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বুক ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তখন আবার বলিয়া উঠিল :—"ছোক্‌রা, আর এক গ্লাস সবুজ-সরাপ!"— যখন সে কাফির আড্ডা ত্যাগ করিল, তখন সে "চুর-চুর" মাতাল।

পর দিনও জুলিয়া আসিল না।

বোর্দ্দিয়ো আবার কাফির আড্ডায় গিয়া হাজির হইল।

ঐ দিন হইতে কাফির আড্ডা হইতে আর নড়িল না—সেইখানেই পড়িয়া রহিল। তার পরেই আবার পূর্ব্বের ন্যায় কাফির আড্ডা হইতে শুঁড়ীর দোকানে গিয়া মদ্যপান করিতে লাগিল।

একেবারে উন্মত্ত হইয়া মদ্য পান করিতে লাগিল— শুধু আমোদের জন্য নয়, মাতাল হইবার জন্য। যখন এক-একবার সেই আনন্দের দিন মনে পড়িতেছিল— জুলিয়ার সহিত কেমন সুখে কাল কাটাইয়াছিল, তখনই সে এক-এক গ্লাস মদ্য পান করিয়া সেই চিন্তাটাকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিন দেখা গেল সে নিজ গৃহের দ্বারদেশে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে উঠাইয়া লইয়া হাঁসপাতালে পাঠান হইল।

সে 'মদাতঙ্ক' (Delerium tremens) রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

হাঁসপাতালে আসিলে পর, সেখানকার সেবকেরা অনুকম্পার সহিত তাহাকে দেখিতে লাগিল।

—"এই দেখ আবার একজন সবুজ-সরাপের কবলে পড়িয়াছে—হায় হায়! ও ত সবুজ-সরাপ নয়, ও সবুজ সয়তান!"

এবার আরোগ্যের আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। লোকটার তখন অন্তিম দশা। চোখ দুটা কোটর হইতে যেন বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মুখ খোলা—তাহা হইতে অসাড় নিস্পন্দ জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

খুব কড়া-কড়া ঔষধ সেবন করাইয়া বাঁচাইয়া তুলিবার অশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল।

কিন্তু তারপরদিনই একটা মৃগীরোগসুলভ তড়কা উপস্থিত হইয়া তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিল।

মৃত্যুর পরেই একটি অবগুণ্ঠিতা তরুণী উপস্থিত হইয়া তাহার মৃতদেহ লইবার দাবী করিল এবং যথোপযুক্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মেঘের খেলা

মুক্ত-আকাশ পানে চাহি আজি
সারাটি বেলা,
মুগ্ধ-নয়নে হেরি গৃহ-হারা
মেঘের খেলা।
কেহ বা ধূসর—কেহ বা ধবল—
কেহ ঘননীল—কেহ বা শ্যামল,
উৎসবে মাতি যেন ছুটাছুটি
করিছে খেলা।

তুষার-শুভ্র মেঘ মিশে আসি'
নীলের গায়,
নীল মেঘ ছুটি' ধূসরের সাথে
মিশিতে চায়।
মানব মনের বাসনার মত
কোন্ মায়ালোক পানে অবিরত
চঞ্চল বেগে দলে দলে যত
মেঘেরা ধায়।

পুঞ্জ পুঞ্জ কাল মেঘ আসি'
পবন-ভরে
মসী দিল মাখি' সহসা রঙীন
মেঘের স্তরে।
যতদূরে চাহি—গগন আঁধার,
রহি' রহি' শুধু ঝরে বারিধার,
সঘন বিষাদ আসিল নামিয়া
ধরণী 'পরে।

কৃষ্ণ মেঘের ঘন আবরণ
নিমেষে টুটি'
রবির দীপ্ত-কিরণ ভুবনে
পড়িল লুটি'।
শ্যামল বনের পল্লব দল
স্বর্ণ-আলোক করে ঝলমল,
দিক্-বালিকার মুখে সুধা-হাসি
উঠিল ফুটি'।

শুভ্র অমল কিরণে মগন
গগন-তল,
দূরে ভেসে যায় স্বপনের প্রায়
মেঘের দল।
শান্ত সুদূর অতল আকাশে,
চপল মেঘের উর্দ্ধে, বিকাশে
চির দিবসের গভীর নীলিমা
অচঞ্চল।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

সারমদ সহীদ

সারমদ একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধক। এদেশে এমন এক সময় ছিল, যখন অনেক সংসারত্যাগী ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-মুসলমানকে ধর্ম্মের জন্য আত্মপ্রাণ বলি দিতে হইয়াছিল। স্বেচ্ছাচারী বাদসাহগণ ছলে বলে নিরীহ ফকিরেরও প্রাণ বিনাশ করিতেন, ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ফকির সারমদকে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের কোপানলে কিরূপে জীবনাহুতি দিতে হইয়াছিল, তাহা এক বিচিত্র ঘটনা। দিল্লীর জগদ্বিখ্যাত জুম্মা মস্‌জিদের সম্মুখে পথপার্শ্বে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন বলিয়া তিনি মুসলমান সমাজে সহীদ (Martyr) নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

তুরস্কের অন্তঃপাতী বুখারা নগরে কোনও এক সম্ভ্রান্ত য়িহুদীবংশে সারমদ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই আরব্য ও পারস্য সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল এবং কালে ইহাতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া একজন কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাগুলি এত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী যে আজও পর্য্যন্ত লোকমুখে উহার আবৃত্তি হইয়া থাকে। তাঁহার পিতার ইচ্ছানুসারে যৌবনে তাঁহাকে বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়, এবং এই সূত্রে তিনি দিল্লী নগরে আগমন করেন। তাঁহার অমায়িকতা এবং আরব্য ও পারস্য সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া দিল্লীর অধিবাসিগণ মুগ্ধ হয় এবং অচিরেই তিনি লোকসমাজে বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠেন। য়িহুদীধর্ম্মের সহিত তাঁহার জন্মগত সম্বন্ধ থাকিলেও, ইহার প্রতি তাঁহার আন্তরিক আস্থা ছিল না। সকল সমাজেই তাঁহার গতিবিধি ছিল। অধিকাংশ সময় তিনি মোল্লাগণের নিকট মুসলমান ধর্ম্মের আলোচনা শুনিতেন। ক্রমে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইল এবং তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

এক অনাথ হিন্দু বালক সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। তিনি বালকটীকে অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিলেন। ক্রমে এই ভালবাসা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, বালকটীকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে তাঁহার প্রাণ চাহিত না, তিনি নিশিদিন তাহাকে কাছে কাছে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। বালকটীর দূর সম্পর্কীয় এক মাসী অভিভাবক ছিল। তিনি বালকটীর প্রতি সারমদের ঈদৃশ ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বালককে সারমদের নিকট যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। সুতরাং বালক সারমদের নিকট যাতায়াত বন্ধ করিল। সারমদের কিন্তু ইহা অত্যন্ত অসহ্য হইল। তিনি কৌশলে একদিন বালককে ভুলাইয়া লইয়া স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিলেন। পথিমধ্যে বালকটী সাংঘাতিক জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মৃত্যুকালে বালকটী সারমদকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেন আমায় এরূপে লইয়া আসিলেন?" সারমদ উত্তর করিলেন, "তোমায় এত ভালবাসি যে ক্ষণমাত্র না দেখিয়া থাকিতে পারি না, তাই সর্ব্বদা কাছে রাখিবার জন্য লইয়া আসিয়াছিলাম।" বালক তখন কহিল, "হায়! এই ভালবাসাটা যদি আপনি ভগবানে অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে আপনি মনে শান্তি পাইতেন, আর আমাকেও এভাবে মরিতে হইত না।" বালকের এই অন্তিম-উক্তি সারমদের মনে ভাবান্তর উপস্থিত করিল। তিনি ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া নানা দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পর প্রায় তিন চারি বৎসর কাল সারমদের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। এদিকে জুম্মা মস্‌জিদের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইল। মস্‌জিদ্ প্রতিষ্ঠার উৎসবও শেষ হইয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে সারমদ হঠাৎ একদিন দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন তাঁহার আর সে বণিক বেশ নাই। তিনি এখন উলঙ্গ ফকির। তাঁহার এ বেশ দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অনেকে অনেক প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। যে স্থানে এখন তাঁহার সমাধিস্তম্ভ বিদ্য-

মান রহিয়াছে, সেই স্থানে খোলা মাঠের উপর উলঙ্গ দেহে, কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই সমভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কাহারও গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন না।

কোথায় এবং কিরূপে তিনি এরূপ আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই জানিতে পারা যায় না। মুসলমানদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর সাধক আছেন, তাঁহাদিগকে সুফি বলে। ইঁহারা ঈশ্বরকে সকল পদার্থের প্রাণরূপে দর্শন করেন এবং প্রেম, নির্জ্জন-সাধন, উল্লাস, স্পর্শ ও মিলনের দ্বারা তাঁহার সহিত লীন হইয়া যাইতে চেষ্টা করেন। সারমদকে কতকটা এই শ্রেণীর সাধক বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বর-তন্ময়তাও তাঁহার অসাধারণত্বের একটী প্রধান উপাদান। সাধনায় মানুষ কতটা আত্মজয় করিতে পারে, সারমদই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সদা ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। তাঁহার উদার প্রেম বিশ্বসংসারকে আপন করিতে শিখিয়াছিল। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ সমবেত হইত। জগতে বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার কার্য্য ছিল। হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে বিদ্বেষভাব দূর করিয়া দিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। তিনি হিন্দুগণকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, এবং সময় সময় তাহাদের সহিত হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনাও করিতেন। তাঁহার এই বিশ্বপ্রেম এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি কতিপয় মোল্লাগণের চক্ষে দূষণীয় বোধ হইল। তাহারা প্রথমে সারমদকে নিরস্ত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিল এবং শেষে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার উচ্ছেদ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। সহরের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিগণ সারমদের অনুরাগী থাকায়, তাহারা প্রকাশ্যভাবে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না।

সম্রাট্ সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশেকো প্রত্যহ সারমদের নিকট অতি আগ্রহসহকারে ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে আসিতেন। ক্রমে তিনি সারমদের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, শেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তিনি আকবরশাহের পথাবলম্বী ছিলেন। স্বাধীন চিন্তার সহিত তিনি সকল ধর্ম্মের আলোচনা করিতেন এবং সারসত্যগুলির সমন্বয় সাধন করিয়া কয়েকখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সারমদের বিশ্বপ্রেমধর্ম্ম তাঁহার অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল এবং তিনি তৎপ্রবর্ত্তিত পথাবলম্বনে জীবন পরিচালিত করিয়াছিলেন। সারমদও ভারতের ভাবী সম্রাট্ দারাকে সহায় পাইয়া উৎসাহের সহিত স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন, মোল্লাগণের বিদ্রূপ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না।

চিরদিন কাহারও সমান যায় না। দারা ভারতের ভাবী সম্রাট্, কিন্তু তাঁহাকে যেরূপ কঠোর ভাগ্যবিপর্যয়ে পড়িতে হইয়াছিল তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। সম্রাট্ সাজাহান পীড়িত হইলে ধূর্ত্ত আওরঙ্গজেব ছলে বলে পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। দারা পরাজিত হইয়া আশ্রয় লাভের জন্য নানাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে ধান্দারের অধিপতি মালিক জিওয়ানসাহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দারাকে আওরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করিল। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে এক অতি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করাইয়া প্রকাশ্য-রাজপথে ভ্রমণ করাইলেন এবং এক গুপ্ত সভার অনুষ্ঠান করতঃ তথায় তাঁহাকে বিধর্ম্মী প্রতিপন্ন করিয়া, ধর্ম্মের নামে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

দারাকে দীনবেশে রাজপথে পরিভ্রমণ করাইবার সময় যখন তাঁহাকে সারমদের সম্মুখ দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন দারা অতি কাতর নয়নে তাঁহার গুরু সারমদের পানে চাহিয়াছিলেন। সে দৃষ্টি কি করুণ! কি বেদনা পূর্ণ! ভারতের ভাবী সম্রাট্ দারার ঈদৃশ দুর্দ্দশা দেখিয়া ফকির সারমদও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "ভয় নাই দারা, উপরের দিকে দৃষ্টি রাখ, তুইই প্রকৃত বাদসাহ হইবি।"

সারমদের শত্রুপক্ষীয় মোল্লাগণ এবার সুবিধা পাইল। তাহারা দারার প্রতি সারমদের এই উক্তি অতিরঞ্জিত করিয়া আওরঙ্গজেবের কর্ণগোচর করিল। আওরঙ্গজেব সিদ্ধান্ত করিলেন যে দারার পক্ষপাতী কতকগুলি লোকের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটি ষড়যন্ত্র চলিতেছে এবং সারমদ সেই ষড়যন্ত্রকারিগণের নেতা। সুতরাং সারমদের বিনাশসাধন করা তাঁহার একান্ত প্রয়োজন বোধ হইল।

দারার প্রাণদণ্ডের অল্পদিন পরে একদা আওরঙ্গজেব জুম্মা মস্‌জিদে নামাজ পড়িতে আসিলেন। ঘটনাচক্রে মস্‌জিদের প্রবেশদ্বারে সারমদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আওরঙ্গজেব তখন বিদ্রূপ করিয়া সারমদকে কহিলেন, "কি হে! তুমি যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলে, দারা দিল্লীর বাদসাহ হইবে! এখন দেখ কে দিল্লীর বাদসাহ হইয়াছে।" সারমদ তৎক্ষণাৎ অবজ্ঞাভরে উত্তর করিলেন, "দারা শয়তানের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ রাজ্যের বাদসাহ হইয়াছে।" প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। আওরঙ্গজেব সারমদের বিনাশ-সাধনের অভিপ্রায়ে ছল খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি সারমদকে প্রশ্ন করিলেন, "ধর্ম্মশাস্ত্রে কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিবার আদেশ আছে; তবে তুমি কেন নগ্নপদে থাকিয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ?" সারমদ উত্তর করিলেন,—

"টানে উরিয়ানি সে বেতর নেহি দুনিয়ামে লেবাস
এও জামা হায় নেহি জিস্‌কো হায় সিধা উল্‌টা।"

অর্থাৎ "নগ্নাবস্থা অপেক্ষা জগতে উৎকৃষ্টতর পোষাক আর নাই, কেননা এই পোষাকের সকল দিকই সমান, ইহার সিধা উল্‌টা নাই।"

আওরঙ্গজেব তখন মোল্লাগণকে আহ্বান করিয়া সারমদের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদিনে মোল্লাগণের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তাঁহারা সারমদের ধর্ম্মমতের আলোচনা করিয়া তাঁহাকে বিধর্ম্মী প্রতিপন্ন করিলেন। আওরঙ্গজেবও ইহাই চাহিতেছিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সারমদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

জুম্মা মস্‌জিদের সম্মুখেই তাঁহাকে হত্যা করিয়া, সেইস্থানেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তাঁহাকে হত্যা করিবার সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ঘাতক তাঁহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়া ফেলিলে, তিনি তাঁহার ছিন্নমুণ্ড দুই হস্তে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠেন। এমন সময় অন্তরীক্ষে এক স্বর শ্রুতিগোচর হইল। কে যেন তাঁহাকে বলিল, "সারমদ, চলিয়া আইস, ফকিরের ক্রোধ করা উচিত নয়।" ইহা শুনিয়া সারমদ তাঁহার ছিন্ন মস্তক পরিত্যাগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহও ভূমিলুণ্ঠিত হয়।

মুসলমানগণের বিশ্বাস নামাজের পূর্ব্বদিন বৃহস্পতিবার (জুম্মারাত) মৃতব্যক্তিগণের আত্মা তাঁহাদের সমাধিক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। সেই হেতু ভক্ত মুসলমানগণ প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে সারমদের সমাধিস্থল পুষ্পহারে সজ্জিত করেন, এবং 'কোরাণ সরিফ' পাঠ ও উপাসনাদিদ্বারা তাঁহার পবিত্র আত্মার প্রতি আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। *

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

---

* প্রবন্ধটি আমি কয়েকখানি বহু পুরাতন উর্দ্দু ও পারস্য গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি। তন্মধ্যে অভিনোৎ-উল-আসফিয়া নামক বিখ্যাত পারস্য পুস্তক এবং আবদুল খালাম আজদ প্রণীত 'সারমদ' নামক উর্দ্দু পুস্তক আমার প্রধান অবলম্বন। সারমদের মৃত্যুকালীন অলৌকিক ঘটনাটি একমাত্র আবদুল খালাম আজদ লিখিত উর্দ্দু পুস্তকেই দৃষ্ট হয়।—লেখক।

প্রিয়া

(Burns হইতে)

যত দিক হতে বায়ু বহে আসে, তার মাঝে
দখিনেরে বাসি ভালো,
সেই দিকে মোর মানসমোহিনী প্রিয়া রাজে,
সেই দিক করে আলো।
বন প্রান্তর পুর জনপদ খনি খাত
দোঁহা মাঝে রহে কত,
তারি সাথে তবু মম কল্পনা দিবারাত
ঘুরিতেছে অবিরত।

আমি হেরি তার হিমানী-লুলিত প্রাণে, তবু
হেরি তারে মধুভরা,
আমি শুনি তার বারতা বিহগ-কলতানে,
গগন মগন করা।
যত ফুটে ফুল সুরভি-আকুল, নামহীন,
জলে উপবনে বনে,
যত পাখী গায় তরুর শাখায় নিশিদিন
তাকে শুধু আনে মনে।

আয় রে সুধীর দখিনা সমীর, বহে' আয়,
গাছে গাছে ফোটা ফুল,
জুড়ায়ে হৃদয় বনপথময় লয়ে আয়
মধুবাহী অলিকুল,
এনে দে' ফিরায়ে হৃদয়-কুলায়ে প্রিয়ধনে,
তার তুলা কিছু নাই ;
আন তার হাসি সব জ্বালারাশি বিমোচনে
—তাই যেয়ে আমি চাই।

কত ধন শ্বাস কত যে শপথ দুঁহু মাঝে
কত যে সে কাতরতা,
সেই বাঞ্ছিত মিলনের শেষে আজো রাজে
বিদায়ের সেই ব্যথা।
হৃদয়ের কথা আর কেবা জানে,—ভগবান,—
তিনিই জানেন শুধু
কত ভালবাসি ; তাহার বিহনে মম প্রাণ
মরু সম করে ধু ধু।

শ্রীকালিদাস রায়।

বারাণসী ধামে চৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অন্বেষণ

প্রতি বৎসর ঘড়িটা অয়েলিং ক্লিনিং না করিলে ভাল চলে না, বিশেষ পুরাতন ঘড়িতে অয়েলিং ক্লিনিং নিতান্ত আবশ্যক। আমি এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতি বৎসর পূজার পর এই দেহ-ঘড়িটাকে লইয়া কোন না কোন স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে যাইয়া মেরামত ও অয়েলিং করিয়া আনি। ষাট (৬০) বৎসর ধরিয়া একাদিক্রমে চলিতেছে। সুতরাং কলগুলি শিথিল-প্রায়। মেরামত করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় লাগে। পূর্ব্বে দুই এক সপ্তাহেই বেশ চলিত, এখন দুই এক মাস না থাকিলে আর ভাল চলে না। আমি সেই উদ্দেশ্যেই ইংরাজী ১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে বারাণসী ধামে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করিতেছিলাম ; সঙ্গে আমার অপেক্ষা ছয় মাসের বড় জ্ঞাতিভ্রাতা ও বাল্যবন্ধু ঠাকুরদাস দাদাও ছিলেন। সমবয়সী হইলেও আমার নাম না ধরিয়া তিনি আমাকে 'ব্রাদার' বলিয়া ডাকিতেন। আমি তাঁহাকে কেবল দাদাই বলিতাম।

দাদার প্রাণটা অতি সরল। আমরা পেন্‌সন্ লইয়া অবধি অনেক স্থানে একত্র বেড়াইয়াছি, পুরাতন উড়িয়া বৈষ্ণব ভৃত্য নিধিরাম আহারাদির সকল বন্দোবস্তই

করিত; আমরা নিশ্চিন্ত মনে বেড়াইয়া বেড়াইতাম। সকাল বেলাটা প্রায় মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা, ললিতা, কেদার ও দশাশ্বমেধ ঘাটে ভ্রমণ করিতাম। কোন দিন বা বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, কেদারেশ্বর, তিলভাণ্ডেশ্বর, দুর্গাদেবী প্রভৃতি দর্শন করিতে যাইতাম। কোন কোন দিন মানমন্দির অথবা 'মাধোজীকা ধারারায়' চড়িয়া উচ্চস্থান হইতে গঙ্গা ও সহরের উন্মুক্ত শোভা দেখিতাম। এখান হইতে সূর্য্যোদয় কত সুন্দর দেখায়, তাহা যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহারা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। এক একদিন নৌকা করিয়া পাষাণবিরচিত নানা কারুকার্য্যখচিত ঘাট-মন্দির-মণ্ডিত বারাণসীধামের অতুল শোভা নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণ-মন পুলকিত করিতাম। অপরাহ্নে প্রায় অহল্যা-বাই নির্ম্মিত দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া বসিতাম। সেখানে অনেকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিতেন। পাঁচজন জড় হইলে যেরূপ সচরাচর ঘটিয়া থাকে,—সাংসারিক, সামাজিক, কখনও বা রাজনৈতিক কথাবার্ত্তাও চলিত। কেহ কেহ বা কলিকাতা হইতে প্রেরিত বাঙ্গালা সংবাদপত্র পড়িয়া শুনাইতেন। সময়টা বেশ আমোদেই কাটিয়া যাইত। দুই একজন গৈরিক বসনধারী বাঙ্গালী দণ্ডী বা সন্ন্যাসী আসিয়া ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনাও করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের কথাই বলিব। তাঁহার আসল নাম কি জানি না, আমরা 'জ্ঞানসাগর' বলিয়াই জানিতাম এবং 'স্বামীজী' বলিয়া ডাকিলে তিনি কিছু খুসী হইতেন; আমরা তাই স্বামীজী বলিয়াই তাঁহাকে সম্বোধন করিতাম। বয়স প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর হইবে। গায়ে গেরুয়া রঙের আলখেল্লা বা পা পর্য্যন্ত লম্বিত জামা, পায়ে দড়ির জুতা, মাথায় গেরুয়া রঙের রেশমী পাগ্‌ড়ী, চক্ষে সোনার চশমা, মুখে গুম্ফ শ্মশ্রু সাহেবী ধরণে ছাঁটা, কুঞ্চিত কেশগুলি পাগ্‌ড়ীর নীচে দিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত। ঘাটে রাণার উপর একটী কাঠের বড় বাক্সে বসিয়া শঙ্করাচার্য্যের মতে বেদান্তদর্শনের বিষয়ে তিনি লেক্‌চার দিতেন। তাঁহার মুখে সায়নাচার্য্য, কুমারীলভট্ট মেধাতিথি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম শুনিতাম। কখন কখন মোহমুদ্গর, বিজ্ঞানষট্‌ক প্রভৃতি সুললিত সংস্কৃত শ্লোকও আওড়াইতেন। তিনি বুঝাইতেন এজগৎ কেবল মায়ার প্রপঞ্চ, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ মাত্র, বস্তুতঃ অভিন্ন। আমরা আপনাদিগকে ক্ষুদ্র জীব বলিয়া ভাবি, যোগাদি সাধনার দ্বারা আমরা পুনরায় পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারি। প্রতিমাদি অর্চ্চনা কোন কাজেরই নয়। এ সাধনায় আত্মার কোনরূপ উন্নতিই হইতে পারে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদিগের সহিত পূর্ব্বদেশীয় একজন বৃদ্ধের আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার বয়স ৭০।৭৫ বৎসর হইবে। নাসামূল হইতে কপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত তিলক, কণ্ঠে মোটা তুলসীর মালা, শ্বেত শিখাগুচ্ছ পশ্চাতে বিলম্বিত, গায়ে মোটা ময়লা বোম্বাই চাদর, গলদেশে একটী বৃহৎ হরিনামের ঝুলি, বাবাজী তন্মধ্যে হাত রাখিয়া সর্ব্বদা নাম-মালা জপ করিতেন। ঝুলিটি 'মনিব্যাগের' কাজও করিত। কখন কখনও ইহার ভিতর হইতে ছোট হুঁকা, কলিকা এবং দিয়াশালাই বাহির হইতেও দেখিয়াছি। পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার কি নাম ছিল জানি না। আমাদের কাছে গোপীদাস বাবাজী নামে পরিচিত ছিলেন। বাবাজীর উপযুক্ত পুত্র মরিয়া গেলে জ্ঞাতিগণ আসিয়া বিবাদ বাধাইল, তিনি বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া শেষ জীবন ব্রজধামে কাটাইতে যাইতেছেন। গ্রহণ-স্নান করিবার অভিপ্রায়ে সে সময় কাশীতে ছিলেন। ইনি বাল্যকালে যাত্রার দলে থাকিয়া সঙ্গীত অভ্যাস করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ কণ্ঠস্বর কমিয়া গেলেও তাঁহার দন্তহীন মুখে হরিনাম গান বড়ই সুমিষ্ট শুনাইত। গীতকালে দুই এক বিন্দু অশ্রুও ঝরিতে দেখিয়াছি। যে যে দিন স্বামীজী প্রতিমাপূজা নিরর্থক, সাধ্য সাধক অভেদ—সুতরাং কে কাহার পূজা করিবে, ইত্যাকার মত ব্যক্ত করিতেন, সেই সেই দিন বাবাজীর সহিত স্বামীজীর মহাগণ্ডগোল বাধিয়া যাইত। আমরা এইরূপে মায়াবাদী ও ভক্তিবাদীর বাগ্‌যুদ্ধ সকৌতুকে শুনিতাম। একদিন বাবাজীর সহিত

স্বামীজীর বিষম তর্ক বাধিয়া গেল। মুখোমুখি হইতে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। বাবাজী সক্রোধে বলিলেন, "তুমি ত কাল্‌কের ছেলে, কিইবা জান! মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইবার সময় কাশীধামে যখন আসিয়াছিলেন, তখন তোমাদের মায়াবাদী দলের চাঁই প্রকাশানন্দ স্বামীকেই তর্কে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, তুমি কোন্ ছার।" স্বামীজীও রুখিয়া বলিলেন, "রেখে দোও! ওসব তোমাদের বৈষ্ণবদের রচা কথা, শাস্ত্রে কোথাও এইরূপ উল্লেখ নাই।"

আমি বলিলাম, "না স্বামীজী, ও কথা আপনি কেন বলিতেছেন? চরিতামৃতে স্পষ্ট ও কথা লেখা রহিয়াছে।"

স্বামীজী বলিলেন, "কোথায় চরিতামৃত, বাহির করুন।"

বাবাজী তৎক্ষণাৎ তাঁর পুঁটুলী হইতে একখানি জীর্ণশীর্ণ বটতলার ছাপা চরিতামৃত বাহির করিয়া বলিলেন, "এই নিন্। মায়াবাদী প্রকাশানন্দ স্বামীর এই কাশীতে কিরূপ দর্প চূর্ণ হইয়াছিল * পড়িয়া দেখুন।"

স্বামীজী পুঁথিখানি লইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত আগ্রহের সহিত পড়িয়া বলিলেন, "এ সকল অতিরঞ্জিত কথা, বৈষ্ণবদের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য কল্পিত রচনা। যদি সত্যই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই কোন না কোন্ নিদর্শন অথবা স্মৃতিচিহ্ন কাশীতে আজিও বিদ্যমান থাকিত। শঙ্করাচার্য্যের এখানে দুইটি মঠ ও মূর্ত্তি আছে। তিনি যে এখানে আসিয়াছিলেন ইহাই তাহার সাক্ষী। বুদ্ধদেব কাশীতে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন সারনাথে রহিয়াছে। হিন্দী রামায়ণ রচয়িতা তুলসীদাসের মঠ ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রামমূর্ত্তি দেখিয়া আসুন। চৈতন্যদেবের ঘটনা যদি সত্য হয় তবে তাহার কোন স্থানীয় প্রমাণ আমাকে আনিয়া দেখান, তবেই বিশ্বাস করিব।"

শেষ কথাগুলা আমাদিগকে উল্লেখ করিয়াই বলিলেন। আমি চরিতামৃতখানি লইয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক কিছুক্ষণ পাঠ করিলাম। পরে সকলকে ধীরে ধীরে বলিলাম, "অনুমান ইংরাজী ১৫১৫ বা ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন ও চৈত্রমাসে চৈতন্যদেব কাশীধামে আসিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রকাশানন্দ স্বামীকে তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এখানে চৈতন্যদেব বৈদ্যজাতীয় চন্দ্রশেখর নামক কোন বাঙ্গালীর বাসায় থাকিতেন এবং রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর পিতা তপন মিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ অর্থাৎ ভোজন করিতেন।—গ্রন্থ দেখিয়া এইরূপ বুঝিতে পারিতেছি। সে আজ প্রায় ৪০০ বৎসরের পুরাতন ঘটনা। সুতরাং দুই এক দিনে বাহির করা দুঃসাধ্য, ইহাঁদের ঠিকানা বাহির করিতেও কিছুদিন সময় লাগিবে।"

জ্ঞানসাগর স্বামী ও অপর সকলে আমাকে ও ঠাকুরদাস দাদাকে বয়োবৃদ্ধ দেখিয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার দিলেন।

সেদিন সভাভঙ্গ করিয়া আমরা বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম। পথে দাদা বলিলেন, "ব্রাদার! পুরীধামে চৈতন্যদেব বহুকাল ছিলেন, তাই জগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে তাঁহার চরণচিহ্ন আছে। শ্বেত গঙ্গার দক্ষিণে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বাটীতে ষড়ভুজ মহাপ্রভুর একখানা চিত্রপট দেখিয়াছি, কাশী মিশ্রের বাটীতে গম্ভীরা মধ্যে কন্থা, করঙ্গ ও কাষ্ঠ-পাদুকা রক্ষিত আছে। টোটার গোপীনাথের জানুদেশে চৈতন্যদেবের তিরোধানের চিহ্ন স্বরূপ স্বর্ণরেখা আজিও বিদ্যমান আছে। জগন্নাথবল্লভ-বাগানে ও যবন হরিদাসের সিদ্ধবকুল-মঠে কিছু কিছু চিহ্নও আছে। সে সব তুমি ও আমি একত্রে দেখিয়া আসিয়াছি। শৈব শাক্ত প্রধান এই কাশীধামে, বৈষ্ণবদের কিছু পাইব কি? মিছা কেন ঘুরিয়া বেড়াইব? কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র।"

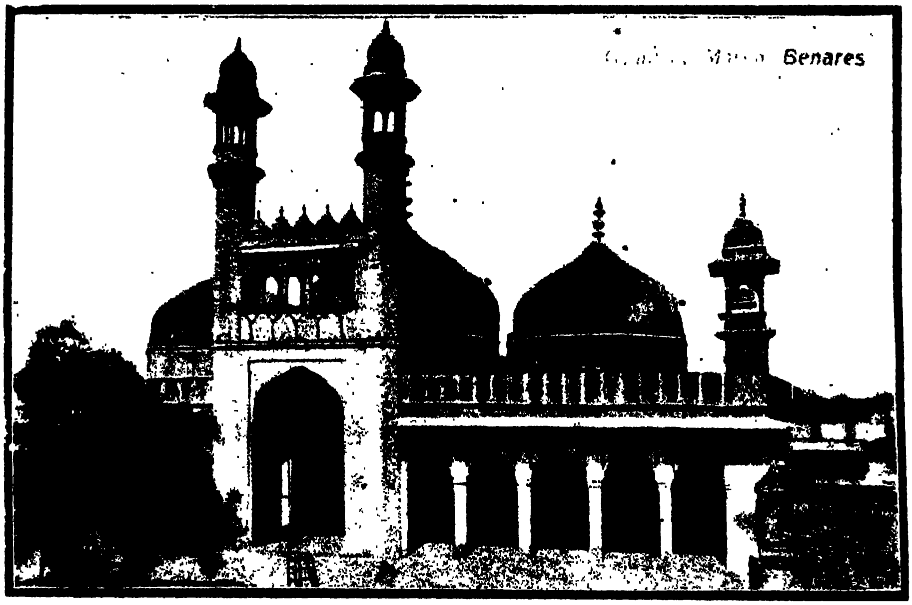
* চরিতামৃত, আদিলীলা, ৭ম পরিচ্ছেদ ও মধ্যলীলার ২৫তি পরিচ্ছেদ দেখুন।

আমি বলিলাম, "দাদা! এখানে তো আমাদের অন্য কোন কাজকর্ম্ম নাই, না হয় এই কাজটা লইয়াই সময় যাপন করিলাম।"

মুখে একথা বলিলাম বটে, মনে কিন্তু ঘোর সন্দেহ রহিল। কাশীতে তো কেবল শিব-লিঙ্গেরই ছড়াছড়ি। বিন্দুমাধব ব্যতীত অপর কোন বৈষ্ণব বিগ্রহ এখানে তখনও দেখি নাই।

বাসায় আসিলে নিধিরাম চাকর বলিল, কোম্পানীর বাগানে যাইবার পথে, সেতুয়া বাবার মঠে মহাজনদিগের ঠাকুরবাটী। তথায় গোপালজী, মুকুন্দজী ও শ্রীনাথজী নামে তিনটি কৃষ্ণমূর্ত্তি আছেন। অতি সমারোহের সহিত পূজার্চ্চনা হয়। সোণা রূপার ছড়াছড়ি, নানা কারুকার্য্যেরও অভাব নাই। আরতির সময়ে দর্শকের বড় ভীড় হয়। শুনিলাম, ঠাকুরদের প্রসাদ নাকি বিক্রয় হইয়া থাকে। এটি হিন্দুস্থানীদিগের ঠাকুরবাটী। তাঁহারা চৈতন্যদেবের কোন খবরই রাখেন না। ক্ষুণ্ণমনে বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন গোপাষ্টমী, কাশীর পিঁজরাপোল বা



বারাণসী—জ্ঞানবাপু মসজিদ। পুরাতন বিশ্বেশ্বর মন্দির এই স্থানে দণ্ডায়মান ছিল।

রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি আছেন—সে প্রতিদিন স্নান করিয়া সেখানে ঠাকুর-প্রণাম করিয়া আইসে। ভাবিলাম, রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি যেখানে যেখানে আছেন, সেই সকল স্থানগুলিতে গিয়া অনুসন্ধান করিলে, কোনও না কোনও তথ্য মিলিতে পারে। তাই পরদিন প্রাতে বেড়াইতে গিয়া সেতুয়া বাবার মঠে ও বিন্দুমাধবের মন্দিরে সন্ধান জানিতে গেলাম, কিন্তু কিছুই পাইলাম না।

বৈকালে গোপালজীর মন্দিরের নাম শুনিয়া সেখানে সন্ধান করিতে গেলাম। এ মন্দিরটি গুজরাট দেশীয় ধনী গোশালা দেখিতে গেলাম। গাভীবৎসগণকে সজ্জিত রঞ্জিত করিয়া সেদিন উৎসব হইতেছিল। তথাকার অধ্যক্ষকে চৈতন্যদেবের নানা নাম—গৌরাঙ্গ, নিমাই, গোরাচাঁদ, নদেরচাঁদ ও বিশ্বম্ভর প্রভৃতি শুনাইয়া কোন ফল পাইলাম না। পরিশেষে যখন 'মহাপ্রভু' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, "যতন বট মহল্লায় মহাপ্রভুর গাদী বা মঠ আছে, সেখানে গেলে কৃষ্ণমূর্ত্তিও দেখিতে পাইবেন।"

আমরা অনেক খুঁজিয়া, ক্ষুদ্র একটি গলির ভিতর

মহাপ্রভুর মঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাটীটি একতালা, ক্ষুদ্র হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দালানে রাধাবিহীন কৃষ্ণমূর্ত্তি রহিয়াছেন, নাম মদনমোহন। পূজারী ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রণামী পাইয়া আমাদিগকে মহাপ্রভুর গাদী ও গম্ভীরা প্রভৃতি দেখাইলেন। গাদীটিতে বেশ ধোপদস্ত শয্যা বিছান, তাকিয়ার উপর একছড়া মোটা হরিনামের মালা রক্ষিত। গম্ভীরাটি অতি ক্ষুদ্র গৃহ। শুনিলাম, সেখানে বসিয়া মহাপ্রভু ধ্যান করিতেন। আমি পুরুষোত্তম ধামে, কাশী মিশ্রের বাটীতে তাঁহার আর একটি গম্ভীরা দেখিয়াছি। সেটিও এইরূপ গবাক্ষাদি বর্জ্জিত ক্ষুদ্র গৃহ। এখানেও গম্ভীরা দেখিয়া, চৈতন্যদেবের নিদর্শন পাইলাম বলিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইলাম। পূজারী ঠাকুর অবশেষে দ্বারের উপর ঝুলান একখানি চিত্র দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখুন মহাপ্রভু ও তাঁহার পুত্রেরা রহিয়াছেন।"



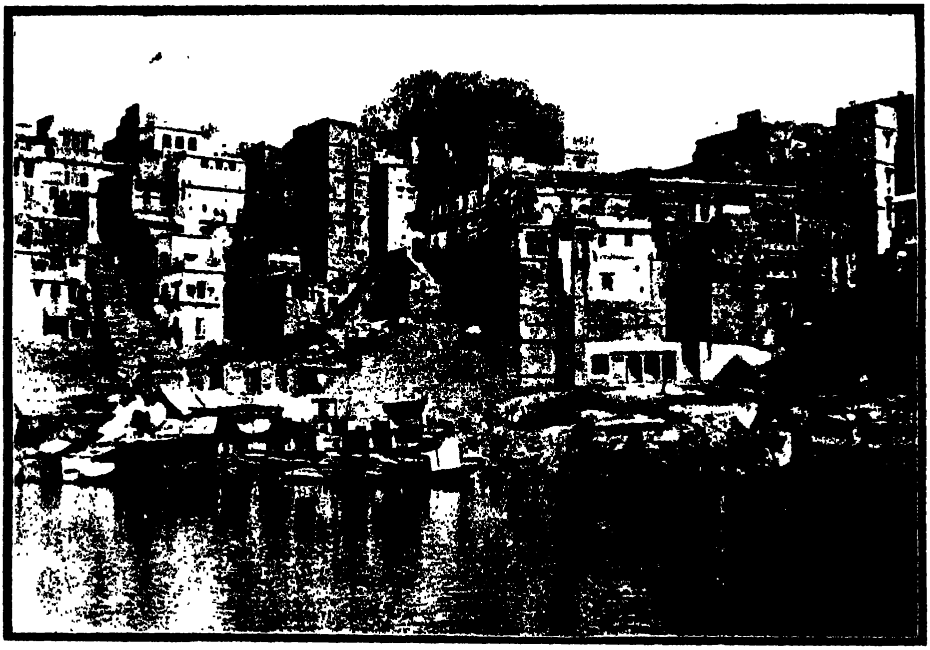
আওরঙ্গজেবের মসৃজিদ—চূড়া দুইটিকে "মাধোজীকা ধারারা"ও বলে। বিন্দুমাধবের মন্দির পূর্ব্বে এই স্থানে ছিল। পরে ইহার বামভাগে বিন্দুমাধবের নূতন মন্দির গঠিত হইয়াছে।

আমি তো চিত্র দেখিয়া অবাক! মহাপ্রভুর দাড়ি গোঁপ জটা, আবার সঙ্গে সঙ্গে চারিটি পুত্র! সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কোন্ মহাপ্রভু?" পূজারী বলিলেন, "বল্লভাচার্য্য।" তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। কাশী চুনার প্রভৃতি স্থানের লোকেরা বল্লভাচার্য্যকেই 'মহাপ্রভু' বলিয়া থাকেন, সুতরাং নিরাশ হইয়া পুনরায় অনুসন্ধানে বাহির হইলাম।

পথে দুইটি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক পরস্পর বলাবলি করিয়া যাইতেছিল, "আজ গোপাষ্টমী, রাধারমণের বাটীতে সন্ধ্যার সময় হরিনাম সংকীর্ত্তন হইবে, শুনিতে যাইব।"

আমি জানিতাম, রাধারমণ বৃন্দাবনের ঠাকুর। এখানে রাধারমণের নাম শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সিদ্ধমাতামহল্লায় রাধারমণের মন্দির আছে। সন্ধান করিয়া সেই ঠাকুরবাড়ীতে গেলাম; সেখানকার পূজারী প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চন্দ্রশেখর, তপন-মিশ্র, এবং প্রকাশানন্দের বাটী এখানে কোথায় ছিল, অথবা আজিও বিদ্যমান আছে কি না?" পূজারীরা একবাক্যে বলিলেন, তাঁহারা এ সকল নাম কখনও শুনেন নাই, বাটী জানা ত দূরের কথা।

পুনরায় নিরাশ হইয়া ফিরিতেছি, এমন সময় একজন গৈরিক বসনধারী দীর্ঘাকার সৌম্যমূর্ত্তি গৌরকান্তি পুরুষ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন, এবং আমাদিগকে ডাকিয়া উপরকার গৃহে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম, কক্ষটি বেশ প্রশস্ত, বিস্তৃত শতরঞ্চের উপর বসিয়া ১০।১৫ জন যুবা বৃদ্ধলোক—কেহ বেদান্ত, কেহ পাতঞ্জল, কেহ পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেছেন। আমাদের আহ্বানকর্ত্তা জটাজূটমণ্ডিত অথচ গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন সন্ন্যাসী ঠাকুরটি মধ্যে কম্বলাসনে বসিয়া উঁহাদিগকে নিজ নিজ পাঠ শিক্ষা দিয়া থাকেন। গৃহের চতুর্দ্দিকের প্রাচীরে ব্র্যাকেট্ দেওয়া। তাহাতে বহুসংখ্যক মুদ্রিত পুস্তক ও



বারাণসী পঞ্চগঙ্গা ঘাট। 'চরিতামৃতে' লেখা আছে, এই ঘাটে শ্রীচৈতন্যদেব স্নান করিতেন।

বস্ত্রাবৃত পুঁথি সাজান রহিয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ হইল। তিনি বেশ বাঙ্গালা কহিলেন। যে সকল কথাবার্ত্তা হইল তাহার মর্ম্ম এই :—

"বুঝিয়াছি, আপনারা চৈতন্যদেবের তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য নিম্নে অনুসন্ধান লইতেছিলেন। দুঃখের কথা বলিব কি, আমি বহুদিন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়াও এ বিষয়ের কিছুই ঠিকানা করিয়া উঠিতে পারি নাই। এখানে 'যতন বট' বলিয়া একটি মহল্লা আছে। পূর্ব্বকালে সেখানে একটী সুবৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে যেমন আম্লীতলায় বসিয়া ভক্তগণের সহিত আলাপ করিতেন, এখানেও সেইরূপ ঐ বটতলায় বসিয়া জন-সাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। সেইজন্য তাঁহার নামানুসারে ঐ বৃক্ষটির নাম চৈতন্যবট হইয়াছিল। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে 'জৈঠন বড়' বলে। 'যতন বট' শব্দটি তাহারই অপভ্রংশ মাত্র। যবন বিপ্লবে যখন বিশ্বেশ্বর, বিন্দুমাধব প্রভৃতি দেবতার সুরম্য মন্দিরগুলি ভিন্নাকার হইয়া মসজিদে পরিণত হইয়াছে, তখন প্রকাশানন্দের মঠ বা তপনমিশ্রের বাটী এই চারিশত বৎসরে কোথায় মিশিয়া গিয়াছে, তাহা জানার সম্ভাবনা কি? আর, বাঙ্গালীবৈদ্য চন্দ্রশেখর এখানে মুহুরীগিরি চাকরী করিতেন; হয়তো তিনি কোন ভাড়াটিয়া বাসায় থাকিতেন, তাঁহার ঠিকানা পাইবেন কি করিয়া? আপনারা চরিতামৃত হইতে কেবল প্রকাশানন্দ স্বামীর বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা পর্য্যন্তই জানিয়াছেন। তাহার পর কি হইল তাহা হয়ত জানেন না। কাশীতেই সনাতন গোস্বামীর সহিত তাঁহার সখ্যতা হইয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর তাঁহার নাম প্রবোধানন্দ সরস্বতী হয়। তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া সনাতন গোস্বামীর সহিত একত্রে মদনমোহনজীর মন্দিরে থাকিতেন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মাহাত্ম্য বিষয়ক, 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শেষে সিদ্ধিলাভের (মৃত্যুর) পর শ্রীমন্দিরের পশ্চাতে সনাতন গোস্বামীর সমাধির নিকট তাঁহারও সমাধি হইয়াছিল। কাঞ্চিনগর যেমন শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চি নামে ' দুইটি

পৃথকখণ্ডে বিভক্ত, কাশীতেও সেইরূপ অসীসঙ্গম হইতে বিন্দুমাধবের মন্দির পর্য্যন্ত দক্ষিণভাগটা শিবকাশী এবং বিন্দুমাধবের মন্দির হইতে বরুণাসঙ্গম পর্য্যন্ত উত্তর ভাগটা বিষ্ণুকাশী, পূর্ব্বকালের লোকেরা এইরূপই মনে করিতেন। চৈতন্যদেব এই বিষ্ণুকাশী মধ্যে যতন বটের নিকট কোনও স্থানে থাকিতেন, ইহাই আমার অনুমান। এখন যেখানে আওরাংজেবের মসজিদ, পূর্ব্বে সেখানে বিন্দুমাধবের মন্দির ছিল। আওরাংজেব মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া মসজিদ গড়িয়াছিলেন। তাহার পরে, মসজিদের নিকট নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বিন্দুমাধবকে পুনঃস্থাপন করা হয়। নিকটেই পঞ্চগঙ্গা ঘাট। বোধ হয় যতন বটও ইহার অনতিদূরেই ছিল। চৈতন্যচরিতামৃতে আপনি দেখিতে পাইবেন, যতন বটের সন্নিহিত পঞ্চগঙ্গা ঘাটে শ্রীচৈতন্যদেব স্নান করিতেন। এতদ্ভিন্ন আমি আর কিছু বলিতে পারি না।"

এই সন্ন্যাসী ঠাকুরের নাম দামোদর গোস্বামী। বৃন্দাবনে গোপালভট্ট প্রতিষ্ঠিত রাধারমণ ঠাকুরের পূজারিগণের বংশে ইঁহার জন্ম। ইনি সংস্কৃত বিদ্যায়, বিশেষতঃ দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইনি নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্র শিখিয়া গিয়াছেন। কখনও কাশীতে কখনও বৃন্দাবনে কখন বা আলোয়াড়ে থাকেন। আলোয়াড়ের রাজা ইঁহার শিষ্য। দাদা ও আমি ইঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

পরদিন প্রাতে যতন বটের সন্ধানে গিয়া দেখিলাম, একটী ছোট বেদীর উপর দুইটি নিমগাছ আছে। স্থানীয় বৃদ্ধ লোকেরা আমাদিগকে বলিল যে, পূর্ব্বে সেই বেদীর উপর অতি পুরাতন একটি বটবৃক্ষ ছিল, তাহা ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে ঝড়ে বিনষ্ট হইয়াছে। এখন যে দুইটী নিমগাছ আছে সে দুইটী ২০।২৫ বৎসরের অধিক পুরাতন বলিয়া বোধ হইল না।

ইহাই আমার চৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অন্বেষণের বিফল প্রযত্ন। তাহার পর আর আমি কাশী যাই নাই। শুনিয়াছি যে আজকাল যতন বট মহল্লায় নাকি চৈতন্যদেবের একটি মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। সেটি আমি চক্ষে দেখি নাই।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

নিবেদন

তোমার বিচারে যাহা হয়, মোরে
তাই দিও ওগো দিও তাই!
শুধু তুমি মোর এই টুকু রেখ—
তোমা ছাড়া যেন নাহি চাই।
ছিঁড়ি জগতের মায়াবন্ধন
হৃদয়ে জ্বালায়ে চিতা-ইন্ধন
তোমারে পরাতে শুভ-চন্দন
ভস্ম-তিলক লহ তাই।
তোমার কাজের করিতে বিচার
দাওনি ত মোরে কোন অধিকার,
সাঁতারিয়া যেন দুঃখ-পাথার
তোমার প্রেমের কূল পাই!
তোমার বিচারে যাহা হয় মোরে
তাই দিও ওগো দিও তাই!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

ভারতীয় গজদন্ত শিল্প

সম্প্রতি নিয়োজিত ভারতীয় শিল্প কমিসনের অধিনায়ক সার টমাস হলাণ্ড সেদিন বলিয়াছেন, "আগে দেখ কি তোমার রক্ষা করিবার আছে, তারপর রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিও।" কথাটা লইয়া অবাধ-বাণিজ্যের পরিপোষক দলের সহিত রক্ষণশীল দলের একটা বাগ্‌যুদ্ধ চলিয়াছে। সে যুদ্ধের ফল যাহাই হউক, কথাটার মধ্যে এমন একটা ধাক্কা আছে যাহাতে আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইবার কথা। আমাদের দেশে এমন অনেক শিল্প ছিল যাহা আজ নাই, কিম্বা যদি থাকে, জীবন্মৃত অবস্থায় আছে। যে সব শিল্প আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর বিষয়ীভূত, তাহাদের উত্থান পতন প্রসার সঙ্কোচ আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাইতেছি এবং সে সম্বন্ধে আলোচনাও করিয়া থাকি। ধনাগম মানসে অথবা কেবলমাত্র স্বদেশী শিল্পের উন্নতিকল্পে সে সম্বন্ধে চর্চ্চাও আমরা করিয়াছি ও করিতেছি। তাহাতে লাভ লোকসান উভয়ই হইয়াছে। অধুনা এই জীবন সংগ্রামের দিনে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী শিল্পই আমাদের দৃষ্টিপথ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে সুকুমার শিল্পের অভাব ছিল না এবং আজও উহা একেবারে লোপ পায় নাই। আমাদের দেশের গজদন্তের প্রস্তুত নানাপ্রকার দ্রব্য আছে যাহা প্রয়োজনও সাধন করে অথচ শিল্প-সৌন্দর্য্যের এবং রচনা নৈপুণ্যের এমন পরিচয় দিয়াছে যাহা বর্ত্তমান সভ্য জগতের অন্যান্য দেশেও দুর্ল্লভ বলিতে সঙ্কোচ করিবার কোন কারণ নাই।



গজদন্তনির্ম্মিত বটপত্রে ভাসমান বিষ্ণুমূর্ত্তি।

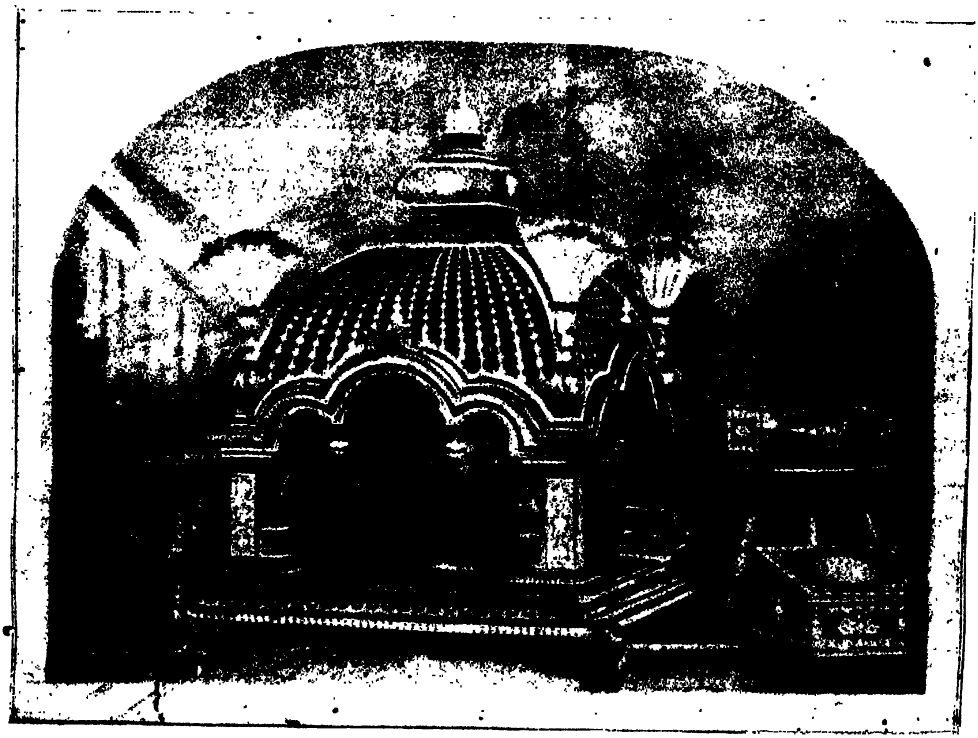


গজদন্ত নির্ম্মিত একটি বাক্সের ডালা।

তসর গরদের কাপড় আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। লর্ড কারমাইকেলের রুমালের ইতিহাস প্রচারিত হইবার



হস্তিদন্তনির্ম্মিত দেবাঙ্কুরদিগের তাঞ্জাম।



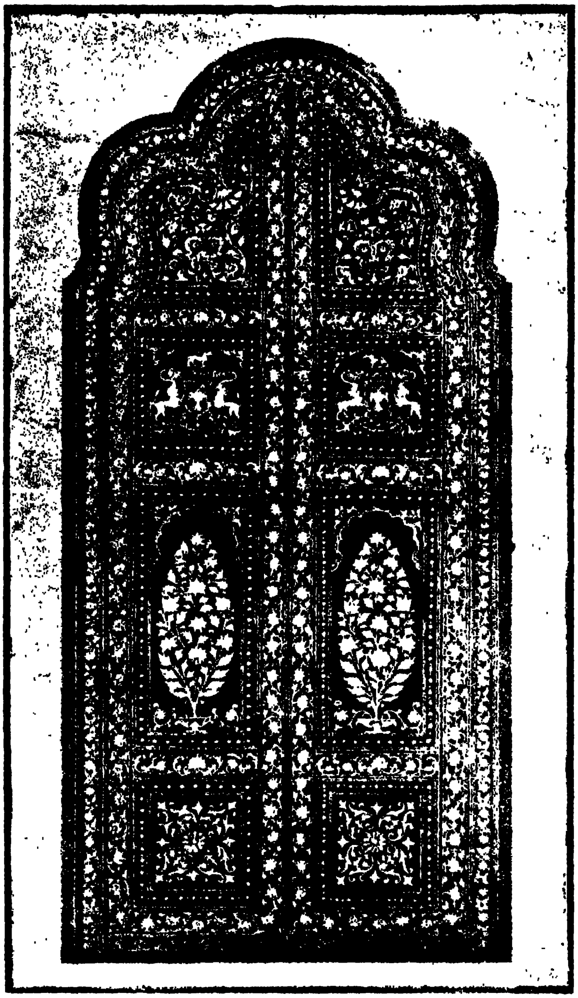
পর হইতে আমি স্বদেশী ও ইংরাজী দোকানে মুরশিদাবাদের অসংখ্য রুমাল বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। তৎপূর্ব্বে ইহা একরূপ অজ্ঞাত ছিল। মুরশিদাবাদের গজদন্ত নির্ম্মিত বহুবিধ সৌখিন দ্রব্য সুকুমার শিল্পামোদী সুরসিক ধনাঢ্যগণকে আজ Curio-dealerএর বিপণী হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। ইহার কারণ আছে। তাহা বিজ্ঞাপনের অভাব। চৌদ্দ আনায় হৃত গোধনের পুনরুদ্ধার অথবা পাঁচ সিকায় যাবতীয় রোগশান্তির বিজ্ঞাপন পড়িয়া পড়িয়া এই ব্যাপারের উপর আমাদের একটা স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইলেও, বিজ্ঞাপনের উপযোগিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লর্ড কারমাইকেলের রুমাল সম্বন্ধীয় বক্তৃতা উহার প্রমাণ। আমাদের গভর্ণর চারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষক। মুরশিদাবাদের রুমালের সঙ্গে তিনি যদি তথাকার গজদন্তশিল্পের উল্লেখ করিতেন তবে আমাদের দৃষ্টি যে সে দিকেও বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইত, তাহা বলা বাহুল্য। লর্ড কারমাইকেল যাহা করিয়াছেন আমরা সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।



মহীশূর রাজবাটীতে গজদন্তনির্ম্মিত একটি দ্বারের ছবি

কেবল মাত্র মুরশিদাবাদ কেন? ত্রিপুরা রাজ্যেও এই গজদন্ত শিল্পের চর্চ্চা আজও বর্ত্তমান আছে। তথাকার প্রস্তুত একখানি শীতল পাটির রচনা নৈপুণ্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। উক্ত পাটি লর্ড কার্জ্জনের দিল্লীদরবার সংসৃষ্ট প্রদর্শনীতে ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব ভূপতি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছিল। ত্রিপুরায় আমি বহুবিধ গজদন্ত নির্ম্মিত ব্যবহারোপযোগী অতি সুন্দর সুন্দর দ্রব্য দেখিয়াছি। ত্রিপুরানরেশ স্বর্গীয় রাধাকিশোর মাণিক্য স্বয়ং এই শিল্পের অতি দক্ষ অধিকারী ছিলেন। তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত কাগজ কাটিবার ছুরি প্রভৃতি দুই একটি দ্রব্য বোধ করি তদীয় বন্ধু নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ এখনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। ত্রিপুরী শিল্পের বিশেষত্ব উহার Simplicity.

ব্যবসায়ের হিসাবে গজদন্ত শিল্পের চর্চ্চা বর্ত্তমানে প্রধানতঃ ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, ভাইজাগাপটম এবং গোদাবরী জেলায় হইয়া থাকে। মাদ্রাজে সরকারী যাদুঘরের অধ্যক্ষ মিষ্টার এডগার থার্ষ্টন এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার রিপোর্ট গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই রিপোর্ট হইতে মোটামুটি জানা যায় যে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের নরপতিগণের বিশেষ উৎসাহে এই শিল্পের বিস্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।



রাজবাটীতে গজদন্তনির্ম্মিত অন্য একটি দ্বারের ছবি

গজদন্ত-শিল্প অতি প্রাচীন শিল্প। চতুর্থ-উপবেদ শিল্পবিদ্যা-বিসয়ক। উহাতে গজদন্ত একটি উপযোগী দ্রব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের স্বর্ণকারগণ বহু প্রাচীনকাল হইতে গজদন্তের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছিল। হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি রচনা করিয়া তাহারা আনন্দোপভোগ এবং ধন সংগ্রহ করিত। যতদূর জানা যায় তাহাতে বহুপূর্ব্বে পালকী তাঞ্জাম প্রভৃতি নরযানের সৌন্দর্য্য-সাধন কল্পে গজদন্ত ব্যবহার হইত। গজদন্তকে এক ইঞ্চির অষ্টমাংশ পাতলা করিয়া চিরিয়া, কাঠের উপর বসাইয়া দেওয়া হইত এবং তাহাতে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়া পরে রং করা হইত। ইহার প্রণালী অতি সহজ হইলেও, সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের অপেক্ষা রাখিত। পাতখানির উপর মোম লেপন করিয়া তাহার উপর চিত্র আঁকা হইত। পরে উহার উপর টাটকা নেবুর রস ঢালিয়া দিয়া "খাওয়াইয়া" লওয়া হইত। তারপর খোদিত স্থানে নিপুণতার সহিত নানা প্রকার স্থায়ী রং ভরিয়া দেওয়া হইত।

কত রকম চিত্র খোদিত হইত মিষ্টার থার্ষ্টন তাহার একটা তালিকা দিয়াছেন

১। মানবাকৃতি। ইহার মধ্যে নানা বিভাগ ছিল।

২। পশ্বাকৃতি।

৩। পক্ষীর আকার।

৪। মৎস্যের আকার।

৫। ফল, ফুল, লতা, পাতা ইত্যাদি।

আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাতে দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইত না।

ত্রিবাঙ্কুরে আজও এই শিল্পের চর্চ্চা হইয়া থকে। ত্রিবাঙ্কুরাধিপতির তাঞ্জামের চিত্র দ্রষ্টব্য। ইহা ঐ প্রকার উৎকীর্ণ দন্তে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৮২৯-৩০ সালে) কয়েকজন নাম্বুরী ব্রাহ্মণ উত্তর ত্রিবাঙ্কুর হইতে নরপতিকে দেখাইবার জন্য গজদন্ত নির্ম্মিত কতকগুলি দেবদেবী এবং 'পবিত্র পশু'র প্রতিমূর্ত্তি লইয়া আসেন। এই সকল মূর্ত্তি এত ক্ষুদ্র ছিল যে এক একটিকে অনায়াসে এক একটি তুষের ভিতর পুরিয়া রাখা যাইত। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ব্রাহ্মণগণ এই সকল মূর্ত্তি কেবলমাত্র সামান্য একখানি ছুরির সাহায্যে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি-

উহা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং বিপ্রগণকে সুবর্ণবলয় উপহার দিয়াছিলেন।

রাজা রামবর্ম্মার সময় হইতেই ত্রিবাঙ্কুরে গজদন্ত শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। রামবর্ম্মার মৃত্যুর পরে রাজা মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি বহু মণিরত্নখচিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্য সম্পন্ন গজদন্ত নির্ম্মিত একখানি সিংহাসন ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপঢৌকন প্রদান করেন। এই সিংহাসন সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিকল্পনা হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। উহা বর্ত্তমানে উইণ্ডসর রাজ-প্রাসাদের দরবার-কক্ষে রক্ষিত আছে। ইঁহার মৃত্যুর পরে ত্রিবাঙ্কুরপতি এবং তদীয় প্রধান মন্ত্রী সার টি, মাধব রাও উভয়ে স্ব স্ব কারিকর নিযুক্ত করিয়া এই শিল্পচর্চ্চা করিয়াছিলেন। এই সময়ে ত্রিবাঙ্কুর গজদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠিল এবং সরকার হইতে একটি গজদন্ত-শিল্প-নির্ম্মাণ-বিভাগ খোলা আবশ্যক হইল। জনৈক রাজকর্ম্মচারীকে মাদ্রাজ আর্টস্কুলে প্রেরণ করিয়া খোদায়ের কাজ শিখাইয়া আনা হইল এবং তাঁহার অধীনে ত্রিবান্দ্রম রাজধানীতে একটি আর্ট স্কুল খোলা হইল। তদবধি এই আর্টস্কুলের কাজ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরের আধুনিক গজদন্তের দ্রব্যাদি শিল্প সৌন্দর্য্যে উচ্চস্থান অধিকার করিলেও, জনৈক ভূতপূর্ব্ব শিল্পী নির্ম্মিত বিষ্ণুর বটপত্রে ভাসমান মূর্ত্তির সহিত তাহাদের তুলনা হয় না।

মাদ্রাজ, ভাইজাগাপটম প্রভৃতি স্থানে বাক্স, কলম-দানি কাগজ লেফাফা প্রভৃতি রাখিবার সরঞ্জাম, পুস্তকাধার, দাবার ছক ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। এই সকল দ্রব্যের কাটতি বোম্বাই এবং মাদ্রাজেই অধিক।

মহীশূরে মহারাজের তত্ত্বাবধানে সামান্য গজদন্তের কারখানা আছে। মহীশূর প্রাসাদের দুইটি গজদন্ত-খচিত দ্বারের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল।

এতদ্ভিন্ন দিল্লী এবং ব্রহ্ম দেশেও এই শিল্পের চর্চ্চা আছে। ব্রহ্মের মৌলমেন সহরের ডাইনটনকুইন পাড়ায় কয়েকটি শিল্পী-পরিবার এই কাজে বিশেষ পারদর্শী।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

দুর্য্যোগ

(গল্প)

পাহাড়ের মধ্য দিয়া সরু পথ। মাঝে মাঝে কোথাও ঘন জঙ্গল, কোথাও-বা মুক্ত প্রান্তর ধূ-ধূ করিতেছে।

আষাঢ়ের বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। মাথার উপর ভীষণ কালো মেঘ সংহারোদ্যত দৈত্যের মত রুদ্ধ আক্রোশে দাঁড়াইয়া; নীচে সারা পৃথিবী দারুণ ভয়ে নিস্পন্দ, চেতনা-হীন।

পাহাড়ের পথে রাজকন্যার তাঞ্জাম চলিয়াছে—রূপার ঝালর দোল খাইয়া আঁধারের বুকে শাদা পাড় বুনিয়া দিতেছে। তাঞ্জামের আশে-পাশে সমুখে-পিছনে সশস্ত্র প্রহরী,—কেহ ঘোড়ার পিঠে, কেহ-বা হাঁটিয়া চলিয়াছে। প্রহরী ও বাহকের দলে মুখে কোন কথা নাই—আসন্ন ঝড়ের ভয়ে সকলেরই গতি দ্রুত, মন উদ্বিগ্ন।

তাঞ্জামের মধ্যে বসিয়া রাজকন্যা ইরা, সখী চম্পাকে কহিলেন, "পর্দ্দা সরিয়ে দে চম্পা, হাঁফ ধরে!"

চম্পা ভয়ে শিহরিয়া কহিল, "বল কি রাজকুমারী—এই পাহাড়ের ধারে মুঞ্জ ডাকাতের আস্তানা, তার উপর এই আকাশের শ্রী!"

রাজকন্যা ইরা কহিলেন, "আসুক ডাকাত! সে একরকম নতুন মজা দেখা যাবে। তা বলে এত আব্রু বরদাস্ত হয় না!"

সহসা অদূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা গেল।

একটা নয়, দুইটা নয়, অসংখ্য ঘোড়া—শব্দ চঞ্চল,—ক্ষণে ক্ষণে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

প্রহরীর দলে মুহূর্ত্তে কলরব ছুটিল —"হুঁসিয়ার!"

শব্দ খুব নিকটে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে বাজের হুঙ্কারের মত একটা রব শুনা গেল, "খবরদার!"

চম্পা ভয়ে তাঞ্জামের পর্দ্দা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। রাজকন্যা সখীর হাত ঠেলিয়া পর্দ্দার বাহিরে মুখ বাড়াইলেন। কোথায় আঁধার! পাহাড়ের গায়ে মেঘের ছায়ার উপর কে যেন আলোর রঙ লাগাইয়া দিয়াছে। অসংখ্য মশাল রক্তনেত্রে চারিধারে লোলুপ-দৃষ্টি হানিতেছে। সে আলোয় রাজকন্যা সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার প্রহরীর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। চম্পা রাজকন্যাকে সবলে টানিয়া পর্দ্দা ফেলিয়া দিল।

তাঞ্জাম তখন দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। পর্দ্দার বাহিরে আদেশের স্বর ধ্বনিত হইল, "অলঙ্কার-পত্র যাহা কিছু আছে, এখনই দিতে হইবে, সহজে না দিলে"—

রাজকন্যা একেবারে পর্দ্দা ঠেলিয়া তাঞ্জামের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, গর্জ্জিয়া কহিলেন, "না দিলে কি?" সে স্বরে চম্পা শিহরিয়া উঠিল—সখীর কণ্ঠে এমন স্বর সে পূর্ব্বে আর-কখনও শুনে নাই!

যে আদেশ করিয়াছিল, সে মুঞ্জ; সে বলিল, "না দিলে, এই হাতে জোর করে সব খুলে নিতে হবে!"

রাজকন্যা তেমনই কঠিন স্বরে উত্তর দিলেন, "রমণীর অঙ্গস্পর্শ করে—তাকে অপমান করে?"

মুঞ্জ সম্পূর্ণ অবিচলিত ভাবেই উত্তর দিল, "সে রমণীর ইচ্ছা।"

"ইচ্ছা!" রাজকন্যা কহিলেন, "তোমার নাম?"

"মুঞ্জ।"

"মুঞ্জ! ডাকাতের সর্দ্দার মুঞ্জ! জানো, কার তাঞ্জাম আটকেছ, কার সামনে দাঁড়িয়ে এ নির্লজ্জ আদেশ করছ?"

"জানি। রাজকন্যা ইরা!"

"জেনেও তুমি এ স্পর্দ্ধা প্রকাশ করছ?"

মুঞ্জ হাসিয়া কহিল, "আমি বর্ব্বর ডাকাত।"

"কিন্তু রাজপুত তুমি!"

"রাজপুতানাই আমার জন্মভূমি।"

"রাজপুতানার কলঙ্ক তুমি! রাজপুত বলে পরিচয় দাও,—অথচ অসহায় স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করতে কুণ্ঠিত নও! তাকে একলা পেয়ে এমন-ভাবে তার অমর্যাদা কর! তোমার লজ্জা হয় না?"

আজ বিশ বৎসর মুঞ্জ ডাকাতি করিতেছে—রাজার সৈন্য ফাঁদ পাতিয়া অস্ত্র হানিয়া মুঞ্জকে কায়দা করিতে পারে নাই! বড় বড় ফৌজ—সে ফৌজের বিরুদ্ধে মুঞ্জ অটলভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আসিয়াছে—সে মাথা কখনও নত হয় নাই—সে বুক কখনও কাঁপে নাই! এমন কথাও সে পূর্ব্বে কাহারও মুখে কখনও শুনে নাই! মুঞ্জ ঈষৎ বিচলিত হইল। তাহার মুখে কথা ফুটিল না।

রাজকন্যা কহিলেন, "মাথার উপর ঝড় আসন্ন হয়ে এসেছে। আমার রুগ্ন ভাই—দেশের রাজ-পুত্র,—তার মঙ্গলের জন্য শ্মশানেশ্বরীর পূজা দিতে গেছলুম—জানি না, প্রাসাদে এখন কেমন আছে সে। এ সময় এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করা যায় না! আমি প্রস্তুত আছি, তুমি এই সব-অলঙ্কার নাও। কিন্তু আমার লোকজন তোমার বীরত্বের বহর দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে কে কোথায় সরে পড়েছে।—আমি তোমায় সমস্ত অলঙ্কার খুলে দিচ্ছি, কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে—তুমি যেমন করে পার আমায় প্রাসাদে পৌঁছে দাও—এই রাত্রেই।"

মুঞ্জ একবার রাজকন্যার পানে চাহিল,—অপূর্ব্ব রূপ! মশালের তীব্র আলোর মাঝে সে রূপের জ্যোতি এক অপরূপ স্নিগ্ধ দীপ্তিতে হাসিয়া উঠিল। মুঞ্জ আর চাহিতে পারিল না, নতশিরে থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজকন্যা হাসিয়া কহিলেন, "কি—সন্দেহ হচ্ছে, এই ছলে রাজধানীতে পেয়ে তোমায় ধরিয়ে দেব?

না, কোন ভয় নেই! আমি রাজপুতের মেয়ে— মিথ্যা বলিনি।"

মুঞ্জ এবার কথা কহিল, বলিল, "সে ভয় করি না রাজকুমারী, তবে এই ঝড়ে তাঞ্জাম নিরাপদ নয়—দেরীও হবে। যদি ঘোড়ায় চড়ে—"

রাজকন্যা কহিলেন, "কিন্তু পথ ত চিনি না—"

"যদি অনুমতি হয়, আমি নিজে সঙ্গে যাব—"

"বেশ!"

রাজকন্যা অলঙ্কার খুলিতে লাগিলেন—চম্পা সজল চোখে দাঁড়াইয়া রহিল; আর মুঞ্জ ছুটিল, সকলের-চেয়ে তেজী ঘোড়াটাকে বাছিয়া আনিবার জন্য। ঘোড়া লইয়া ফিরিয়া সে দেখে, পথের ধারে ওড়নার উপর বিস্তর অলঙ্কার জড়ো করা—হীরা মণি-মাণিক্যের স্তূপ—মশালের চঞ্চল আলো লাগিয়া তাহা হইতে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িতেছে!

মুঞ্জ কহিল, "এ কি রাজপুত্রী?"

রাজকন্যা কহিলেন, "সমস্ত অলঙ্কারই খুলে দিয়েছি।"

মুঞ্জ কহিল, "কিন্তু আমি ত অলঙ্কার চাই না। এ অলঙ্কার, যেখানে ছিল, সেইখানে রাখো, এদের সে সৌভাগ্য থেকে যে বঞ্চিত করতে চায়, সে মানুষ নয়!"

এমন সময় কক্কড় শব্দে মেঘ ডাকিল। কালো দৈত্যের লেলিহান রসনা লক্‌লক্ করিয়া উঠিল—তারপর দুই হাত সবলে ঘুরাইয়া সে ভীষণ ঝড় তুলিল। চারিধার কাঁপিয়া উঠিল। মুঞ্জ কহিল, "রাজপুত্রী, এই ঝড় মাথায় করে যেতে পারবে?"

রাজকন্যা কহিলেন, "যাওয়া চাইই—"

"তোমার সখী?"

"আমরা দুজনে এক ঘোড়ায় চড়বো, আগে আগে তুমি ঘোড়া ছুটিয়ে যাবে—"

"এই ঝড়ের মুখে?"

রাজকন্যা হাসিয়া কহিলেন, "উপায় কি!"

"এক উপায় আছে। তোমায় নিয়ে এক ঘোড়া আমি ছুটিয়ে যাই—আর আমার লোক তোমার সখীকে নিয়ে পিছনে আসুক।"

মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে—চারিধার আবার সেই আঁধারে ভরা। সেই আঁধারের মধ্য দিয়া দুইটা ঘোড়া বৃষ্টির অজস্র তীর বুক দিয়া ছিট্‌কাইয়া ফেলিয়া প্রাণপণ শক্তিতে প্রাসাদের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

প্রাসাদের দ্বারে পৌছিয়া রাজকন্যা ঘোড়া হইতে নামিলেন। মুঞ্জ ঘোড়ার রাশ ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "একটা কথা আছে।"

"কি কথা?"

"আজকের রাত্রিটাকে মনে রাখবার জন্য কিছু যদি আমায় দিতে পারতে, অতি—তুচ্ছ কিছুও—?"

"কি চাও, বল! এই হার—" রাজকন্যা কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য হার খুলিলেন। আঙুলের আংটিটা দ্বারের বাতির আলোয় ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। মুঞ্জ কহিল, "ঐ আংটিটা?—"

"বেশ! এ আংটির হীরার পাশে আমার ছবি আঁকা আছে।"

রাজকন্যা আংটি খুলিয়া দিলেন; মুঞ্জ সেটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল। রাজকন্যা কহিলেন, "আমারও একটা কথা আছে—ডাকাতি ছাড়ো তুমি—। এমন বীরত্ব, এমন লোক তুমি—"

মুঞ্জ কহিল, "তোমাকে যখন আজ স্পর্শ করেছি, তখনই আমার পুনর্জন্ম হয়েছে। মুঞ্জ দস্যু মরেছে, রাজপুত্রী!"

"কি করে জানব, যে তুমি দস্যুতা ছেড়েছ?"

"সে পরিচয় আমিই দেব। কিন্তু আবার দেখা পাবার আশা রাখতে পারি?"

"জগতে দুরাশার বস্তু কিছুই নেই!"

"সে আশা কবে মিটবে?" মুঞ্জ নতশিরে দাঁড়াইয়া ছিল। ইরা কহিলেন, "যে-দিন আমার সাম্‌নে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে—মাথা যে-দিন নুয়ে পড়বে না!"

চম্পার ঘোড়া আসিয়া পড়িল। দুই সখীতে মুঞ্জকে

অভিবাদন জানাইয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র ঘুমাইতেছিল। রাজকন্যা আসিয়া প্রসাদী ফুল তাহার মাথায় স্পর্শ করাইয়া বাতায়নের ধারে দাঁড়াইলেন। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের মধ্য হইতে চাঁদের ম্লান আলো রোগীর মুখের হাসির মতই ঝরিয়া পড়িয়াছে। সেই ম্লান আলোয় রাজকন্যা দেখিলেন, পথের বাঁকে নহবৎখানার আড়ালে একটা সাদা ঘোড়া আরোহীকে পৃষ্ঠে লইয়া অত্যন্ত অনিচ্ছুক মন্থর গতিতে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

২

এক বৎসর পরের কথা বলিতেছি।

রাজপুত্রের দুর্লভ প্রাণটুকুকে কিছুতেই ধরিয়া রাখা গেল না। পুত্রশোকে রাজা পাগল হইলেন—রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটিল। সুযোগ পাইয়া সেনাপতি যবনের সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র চালাইতে লাগিলেন।

আবার এক আষাঢ়ের ঘন-ঘোর সন্ধ্যা। পাহাড়ের নীচে ছোট কুটীরে মুঞ্জ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। হাতের মুঠির মধ্যে রাজকন্যার সেই ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু। মুঞ্জর মনের মধ্যেও আজ আষাঢ়ের মেঘ ঘন হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যুতের চকিত-চমকে আংটির পাথরে বসান ছোট একটি মুখ উজ্জ্বল দীপ্তিতে মনের মেঘে ফুটিয়া উঠিয়া আবার পরক্ষণেই মিলাইয়া যাইতেছিল। তাহার কেবলই মনে জাগিতেছিল, আর-এক আষাঢ়ের এমনই এক সন্ধ্যার কথা! সেই যেদিন একটি কণ্ঠের কঠোর তিরস্কার তাহার সমস্ত বুক-টাকে কাঁপাইয়া ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল!—আবার দেখা হইবে! এ আশা দুরাশা নয়! রাজপুতানী মিথ্যা বলে না।

পাহাড়ের কোলে ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠিল। এই দুর্য্যোগে এ পথে ঘোড়া আসে, ও কার? মুঞ্জ উৎকর্ণ হইল। শব্দ কাছে আসিল—আরও কাছে! মুঞ্জ উঠিয়া দাঁড়াইল—ঐ যে ছোট-একটা মশাল হাতে পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া খুব সতর্ক গতিতে এক সওয়ার আসিতেছে! মুঞ্জ আগাইয়া পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। সওয়ার কাছে আসিয়া ঘোড়া থামাইল, কহিল, "কে তুই?"

"আমি মুঞ্জ। তুই কে?"

"আমি সেনাপতির প্রধান চর।"

"এই দুর্য্যোগে কোথা চলেছিস্?"

"সে খবরে তোর কি কাজ?"

"আছে কাজ।" ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধে কাণাঘুষা রাজধানীতে না পৌছিলেও এধারে মুঞ্জর দলে একদিন তার একটু যেন সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। মুঞ্জ সে কথাটাকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইয়া চাপা দিয়াছিল। তাই আর সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য দ্বিতীয়বার শুনা যায় নাই। সেই কাণাঘুষার কথাটাই চট্‌ করিয়া মুঞ্জর মনে পড়িয়া গেল।

চর দেখিল, মুঞ্জ একা, কিন্তু কে জানে, ঐ পাহাড়ের আড়ালেই হয়ত উহার প্রকাণ্ড দল উদ্যত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাছে গোল বাধে, এই আশঙ্কায় সে আর কথা বাড়িতে না দিয়া সহসা ঘোড়ার রাশে টান দিল। ঘোড়া পা তুলিল। মুঞ্জ অমনি ক্ষিপ্র-গতিতে রাশ ধরিয়া ফেলিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "জবাব চাই—না হলে এগুতে পাবিনে।"

চর কহিল, "বিদ্রোহী দস্যু—"

"নিমকহারাম নফর—"

মুহূর্ত্তে মুঞ্জর আকর্ষণে চর ঘোড়ার পিঠ হইতে পথে ঠিকরিয়া পড়িল। মুঞ্জ তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া বলিল, "তোর মনে নিশ্চয় কোন অভি-সন্ধি আছে—না হলে তোর এ-রকম ব্যবহার হত না! বল্, কোথায় চলেছিস—"

চরের মুখে কথা ফুটিল না। ব্যাপারটা এমনই অতর্কিত, এতই অসম্ভব রকমের যে, তাহার ঠিক খেয়ালই হইল না, এটা সত্য না স্বপ্ন!

সে ভ্রম বেশীক্ষণ রহিল না। মুঞ্জর বাহুর কঠিন স্পর্শে চর শেষে সঠিক কথাটাই বলিয়া ফেলিল,—চান্দেলীর বনে মোগলের চর সেনাপতির পত্রের প্রতীক্ষা করিতেছে—সেই পত্র লইয়া সে চলিয়াছে। তাহার

কি দোষ! সেনাপতি প্রভু—দুইবার সেনাপতি তাহাকে বড় রক্ষা করিয়াছিল—তাই সেনাপতির আদেশে—

চরকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়া মুঞ্জ কহিল, "রাজার সর্ব্বনাশ করতে চলেছিস্! বার কর্ সে চিঠি!"

চর ইতস্তত করিল। মুঞ্জ কহিল, "না হলে এখনই প্রাণ হারাবি!"

চরটা সদ্য বিবাহ করিয়াছিল। হঠাৎ কিশোরী পত্নীর কাজল-টানা চোখ দুটি তাহার মনে পড়িল—আসিবার সময় সেনাপতির তাড়ায় উদ্যত চুম্বনটাকেও ফেলিয়া আসিতে হইয়াছে! জীবনের সাধই তার পূর্ণ হয় নাই! আহা, কিশোরী পার্ব্বতী—প্রাণের প্রেয়সী! না, না, মরা হইবে না। ভাল করিয়া বাঁচিতে চায় বলিয়াই ত এই দুর্য্যোগে সে এই অসমসাহসিক কাজে বাহির হইয়াছে!

চর বলিল, "না ভাই, প্রাণে মেরো না—এই নাও, চিঠি দিচ্ছি।"

মুঞ্জ চিঠি লইয়া আঙ্রাখার মধ্যে পুরিল। তারপর চরের কাণ ধরিয়া সজোরে টানিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "যে পথে এসেছ—সেই পথে চলে যাও। আর এগুনো হবে না। হুঁসিয়ার—তোমার মনিবকেও বলো, মুঞ্জ বিদ্রোহী ডাকাত, রাজার নিমক ও সে খায়নি কখনও, কিন্তু ফিরে বার এ চেষ্টা করলে তাকেও এমনি কাণমলা খেতে হবে! যাও—"

চরের কাণ ছাড়িয়া মুঞ্জ কুটীরে চলিয়া গেল। চর কাণে হাত বুলাইয়া কুটীরের পানে একবার তীব্র দৃষ্টি হানিয়া ঘোড়ার খোঁজ করিল। সওয়ারের অদ্ভুত ও আকস্মিক তিরোধানে ঘোড়া ভড়কাইয়া এক দিকে ছুট দিয়াছিল।

৩

ফন্দী ফাঁসিয়াছে শুনিয়া সেনাপতি রাগিয়া বলিল, "তুই চলে এলি! তোর হাতে হাতিয়ার ছিল না? সে বেটা একলা—"

চর কাণের জ্বালা তখনও ভুলিতে পারে নাই। সে উত্তর দিল, "কিন্তু এমন আচমকা ঘোড়া থেকে ঠিক্‌রে পড়লুম, যে হাতিয়ার বার করবার সময় মিলল না যে মোটে! তার উপর কাণমলা—আজও জ্বালা আছে।"

সেনাপতি কহিল, "অপদার্থ!"

চর কহিল, "কিন্তু সে কাণমলা ত আমায় হয় নি, সে কাণমলা—"

কথাটা শেষ হইল না। সেনাপতি রুদ্র গর্জ্জনে কহিল, "চুপ কর্। যোদ্ধা, শোধ চাই। ও বেটা যখন জেনেছে, তখন পাঁচ কাণ হতে কতক্ষণ! তাকে ধরা চাই।"

চর কহিল, "এ-পর্য্যন্ত ঐটুকুই ত কেউ পেরে ওঠেনি। ও গায়ের জোরে হবে না—কৌশল চাই!"

"কি কৌশল?"

"সে আমি ঠিক করেছি। বেটা এখন ভারি সাধু হয়েছে। ওরই এক লোক বলছিল, ডাকাতি প্রায় বছর-খানেক হল ছেড়ে দিয়েছে—মনে অনুতাপ করে। বলে, রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়াব, বিচারের জন্য—যা-কিছু অপরাধ করেছি, তার দণ্ড মাথা পেতে নেব।"

"ঠিক?"

"বেঠিক হলে কি আর বলি! কাণের জ্বালা ত এখনও রয়েছে।"

সেনাপতি কহিল, "তবে এক কাজ করা যাক্! রাজাকে দিয়ে এক পরোয়ানা বার করা যাবে—এসে বিচারের জন্য দাঁড়াও—অপরাধ করে থাকো, দণ্ড নাও।"

"বেশ হবে। কিন্তু একটা কথা আছে—সে পরোয়ানা আর-কারও হাতে পাঠাবেন—আমার সাহস হয় না—"

"সাহস হয় না?"

"সাহস—আজ্ঞে, সে কথা ঠিক নয়! তবে কি জানেন, বেটা সন্দেহ করতে পারে।"

"কিন্তু তুই না গেলে নিশেনদারী করবে কে?"

"তার জন্যে নয় সঙ্গে যেতে পারি—কিন্তু পরোয়ানা-খানা আর কারও হাতে দেবেন।"

মুঞ্জ কহিল, "রাজার পরোয়ানা এনেছ! আমার বিচার—অপরাধের দণ্ড নিতে হবে? চল দূত, আমি প্রস্তুত।"

মুঞ্জ তখনই কুটীর ছাড়িয়া বাহির হইল। বিচার—রাজার প্রাসাদে বিচার হইবে। সেই প্রাসাদ! বাঃ, রাজকন্যা ঠিকই বলিয়াছিল, সে আশা দুরাশা নহে। সে প্রাসাদে আবার যখন পদার্পণ ঘটিবে, তখন কে জানে, দেখাই বা কেন না হইবে! এই এক বৎসর এই মূক ছবির কাছে প্রাণের সব অপরাধ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি, তবু কৈ প্রায়শ্চিত্ত হইল না ত! এ জীবনে, পাপের, অত্যাচারের স্মৃতিতে-ভরা এ জীবনে—না, সে কথা মুখে আনা হইবে না! মনে আছে, মনেই তাহা থাকিয়া যাক্! কাহাকেও জানানো হইবে না—অসহ্য কষ্টে বুক যদি ভাঙ্গিয়া যায়, যাক্—তবু সে কথা মুখে ফুটিবে না! কখনও না!

৪

রাজার সভা। পাত্রমিত্রে সভার শোভা সমুজ্জল। রাজা নামে শুধু রাজা সাজিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন—সেনাপতি বড় যোগ্য ব্যক্তি—রাজকার্য্যের ভার তাঁহার উপর।

বন্দী মুঞ্জকে আনিয়া সভার সম্মুখে অপরাধীর মঞ্চে দাড় করানো হইল। প্রহরীর দল অস্ত্র খুলিয়া উদ্যত সতর্কভাবে দাঁড়াইল। সেনাপতি কহিল, "মহারাজ, এই সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু মুঞ্জ—যার অত্যাচারে সহস্র গৃহে বিলাপ উঠিয়াছে, সহস্র প্রাণী প্রাণ হারাইয়াছে—এই সেই নরাধম মুঞ্জ!"

মুঞ্জ কহিল, "হাঁ মহারাজ, আমিই সেই দস্যু মুঞ্জ—রাজার ফৌজ যাহাকে বন্দী করিতে পারে নাই। অপরাধের দণ্ড লইবার জন্য যে আকুল হইয়া উঠিয়াছে, স্বেচ্ছায় যে আজ দণ্ড লইতে আসিয়াছে—"

সেনাপতি রাজার পানে চাহিয়া আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল, "অপরাধ স্বীকার কর।"

মুঞ্জ কহিল, "রাজার কাছে স্বীকার করিব—কিন্তু তুমি কে?"

স্বর শুনিয়া পাত্রমিত্র শিহরিয়া উঠিল। বৃদ্ধ মন্ত্রী শশব্যস্তে কহিলেন, "উনি সেনাপতি মকরন্দ। শোকার্ত্ত রাজার প্রতিনিধি উনি—"

"ইনিই সেনাপতি!" নিমেষের জন্য তীব্র দৃষ্টিতে মুঞ্জ সেনাপতির পানে চাহিয়া দেখিল। চোখ তাহার জ্বল্-জ্বল্ করিতেছিল। সেনাপতির মনে হইল, ও চোখে সূর্য্যের দীপ্তি,—তেমনই তীব্র, তেমনই উজ্জ্বল! দীপ্ত সূর্য্যের পানে মানুষ যেমন চাহিয়া থাকিতে পারে না—সে দৃষ্টির পানে সেনাপতিও তেমনই চাহিয়া থাকিতে পারিল না—চকিতে চোখ নামাইল। সেনাপতির শরীরময় একটা বিদ্যুৎ-শিখা বহিয়া গেল। মুঞ্জ হাসিয়া আঙরাখার মধ্যে হাত পুরিয়া কি বাহির করিল। সেনাপতি বক্র কটাক্ষে চাহিয়া বুঝিল, সে কি! ভয় হইল, যদি কথাটা এখনই প্রকাশ করিয়া দেয়! সভয়ে সে মুঞ্জর পানে চাহিয়া কহিল, "যদি ক্ষমা চাও ত মহারাজ তোমায় ক্ষমা করতে পারেন!"

"ক্ষমা!" সেনাপতির মনে হইল, এই একটা স্বরে রাজ্যের বিদ্রূপ যেন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। মুঞ্জ কহিল, "যখন দণ্ড নেবার জন্য মাথা বাড়িয়েছি, তখন ক্ষমার কথাও মনেও রাখিনি, সেনাপতি মকরন্দ,—না, কোন ভয় নেই তোমার। কিন্তু একটা কথা বলি, নিমকের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করো না—আকাশের বাজ এখনও জেগে আছে।" সেনাপতি ভাবিল, আর না। এ আগুন লইয়া খেলা ঠিক হইতেছে না। সে একখানা কাগজে রাজার দস্তখত লইল—তারপর গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "দস্যুর শাস্তি, প্রাণদণ্ড। একে নিয়ে যাও!"

শান্ত অচপল স্বরে মুঞ্জ কহিল, "মহারাজের জয় হোক!"

মুঞ্জ দীর্ঘ দেহ লইয়া প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় সভার বাহিরে আসিল। শোক-বিহ্বল প্রাসাদে আজ একটা উত্তেজনার ঢেউ ছুটিয়াছিল। পুর-রমণীরা দুর্দ্দান্ত দস্যুকে দেখিবার জন্য গবাক্ষে ছাদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চম্পা ইরাকেও ডাকিয়া আনিল।

বাহিরে আসিয়া মুঞ্জ চারিধারে চাহিয়া দেখিল, সেই প্রাসাদ দ্বার। একদিন মেঘ-ভাঙ্গা আলোর মাঝখানে রাজকন্যার হাত হইতে অমূল্য উপহার সে লাভ করিয়াছিল—সে দিন হইতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত সুরু হইয়াছিল—আজ রাজার-দেওয়া মৃত্যু-দণ্ডে সে প্রায়শ্চিত্তের শেষ!

সহসা একটা স্বর মুঞ্জর কানে গেল। এ সেই বীণার সুর! স্বপ্নে কতদিন এই সুর তাহার কাণে বাজিয়াছে। রাজকন্যা সখীকে বলিতেছিলেন, "মুঞ্জ? এ যে চেনা যায় না।"

মৃদু হাসিয়া মুঞ্জ মুখ তুলিল, কহিল, "হাঁ রাজপুত্রী, আমি মুঞ্জ, ডাকাত মুঞ্জ—"

রাজকন্যার মুখের উপর একটা ম্লান ছায়াপাত হইল। মুঞ্জ স্পষ্ট তাহা লক্ষ্য করিল। তখন তাহার প্রাণের মধ্যে চকিতে একটা ঝড় বহিল।

ডাকাত, নীচ বর্ব্বর ডাকাত বলিয়াই সে তাহার পরিচয় রাখিয়া যাইবে? না, না, আর যে কেহ ডাকাত বলিয়া ঘৃণা করে করুক, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে একটা সাধ যে মনে উঠে! বাঁচিয়া থাকিতে কোন সাধ নাই, মরিয়া গেলে রাজকন্যার একটি করুণ দীর্ঘশ্বাসও যদি তাঁহার উদ্দেশে বাতাসে ভাসিয়া উঠে, তাহা হইলে তাহার ইহজীবনের সমস্ত পাপ যে নিমেষে ঝরিয়া যাইবে!

মুঞ্জ কহিল, "কথা রেখেছি, রাজপুত্রী! একবৎসর ধরে প্রায়শ্চিত্ত করেছি! পরিচয় চেয়েছিলে,এই নাও—" সবলে মুঞ্জ সেই চরের হাতের পত্রখানায় আংটিটা মুড়িয়া রাজকন্যার দিকে ছুড়িয়া দিল। বীরের হাতের অব্যর্থ লক্ষ্য গিয়া রাজকন্যার বুকের উপর পড়িল। রাজকন্যা তাড়াতাড়ি পত্র খুলিলেন।

আংটিটি—এ যে তাঁহারই-দেওয়া সেই আংটি! আর পত্র! রাজকন্যা শিহরিয়া উঠিলেন, এ কি, এ যে শোকবিহ্বল রাজার উদাসীন শিথিল দৃষ্টির অন্তরালে মোগলকে সাদর-নিমন্ত্রণ-পাঠানোর পত্র! কাহার কাজ এ! হস্তাক্ষর—এ যে বড় চেনা! না, না,—হাঁ, ঠিক, ঠিকই—এ যে সেনাপতির হস্তাক্ষর! নরাধম, বিশ্বাস-ঘাতক!

রাজকন্যা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মুঞ্জ—"

কৌতূহলী দর্শকের কোলাহলের মধ্য দিয়া মুঞ্জর দীর্ঘ দেহ তখন আবার সেই নহবৎখানার আড়ালে আর-এক রাত্রির মতই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মীরা

যে প্রেমে করিয়া তুচ্ছ রাজসিংহাসন,
হে সুন্দরী রাজরাণি, হলে সন্ন্যাসিনী;
শ্যামপদ-রেণুকার স্নিগ্ধ আলেপন
যে প্রেমে মাখিয়া বুকে, হলে গরবিনী;
যে অক্ষয় অনবদ্য প্রেমামৃত পানে
ছুটিল তৃষিত কণ্ঠে কোটি নারীনর;
যে প্রেমে গাহিলে নাচি' উচ্ছ্বসিত প্রাণে
"হে হরি! হে গিরিধারী! হে শ্যামসুন্দর!"
—কোন্ প্রীতি-কালিন্দীর বিমল পুলিনে
প্রথম লভিলে তুমি যাদুস্পর্শ তা'র?
কোন্ স্বপ্ন-বৃন্দাবন-তমাল-বিপিনে
বাঁধিলে গোলোকনাথে হিয়ার মাঝার?
আজি তুমি কোথা মীরা?—সে প্রেমের লাগি
ল'য়ে শূন্য হৃদিপাত্র আছে কবি জাগি।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

আগ্রা

সে বৎসর পূজার সময় ভ্রমণে বাহির হইয়া আমরা আন্দাজ বেলা দশটার সময় আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। আগ্রায় তোতারামের হোটেল বিখ্যাত—আমরা সেইখানেই উঠিব ঠিক করিয়াছিলাম। ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে তোতারাম-হোটেলের তকমা-আঁটা এক ব্যক্তি ঘুরিতেছিল—আমরা তোতারামের হোটেলে যাইব শুনিয়া—সে অতি আগ্রহের সহিত আমাদের সঙ্গে করিয়া উক্ত হোটেলে লইয়া গেল।

ষ্টেশনের বাহির হইয়া দেখি, আগ্রা ফোর্টের বিরাট প্রাচীর। ফোর্টটি রেলওয়ে লাইনের এক পার্শ্বে, তাহার অপর পার্শ্বেই ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে তোতা-রামের হোটেল। আমরা গিয়া হোটেলটির একখানি কক্ষ দখল করিলাম। উঠানের এক পার্শ্বে একটি জলের কল—গত কয়েক দিবস হইতে স্নান করিবার সুবিধা হয় নাই—কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সেই কলের নীচে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করা গেল।

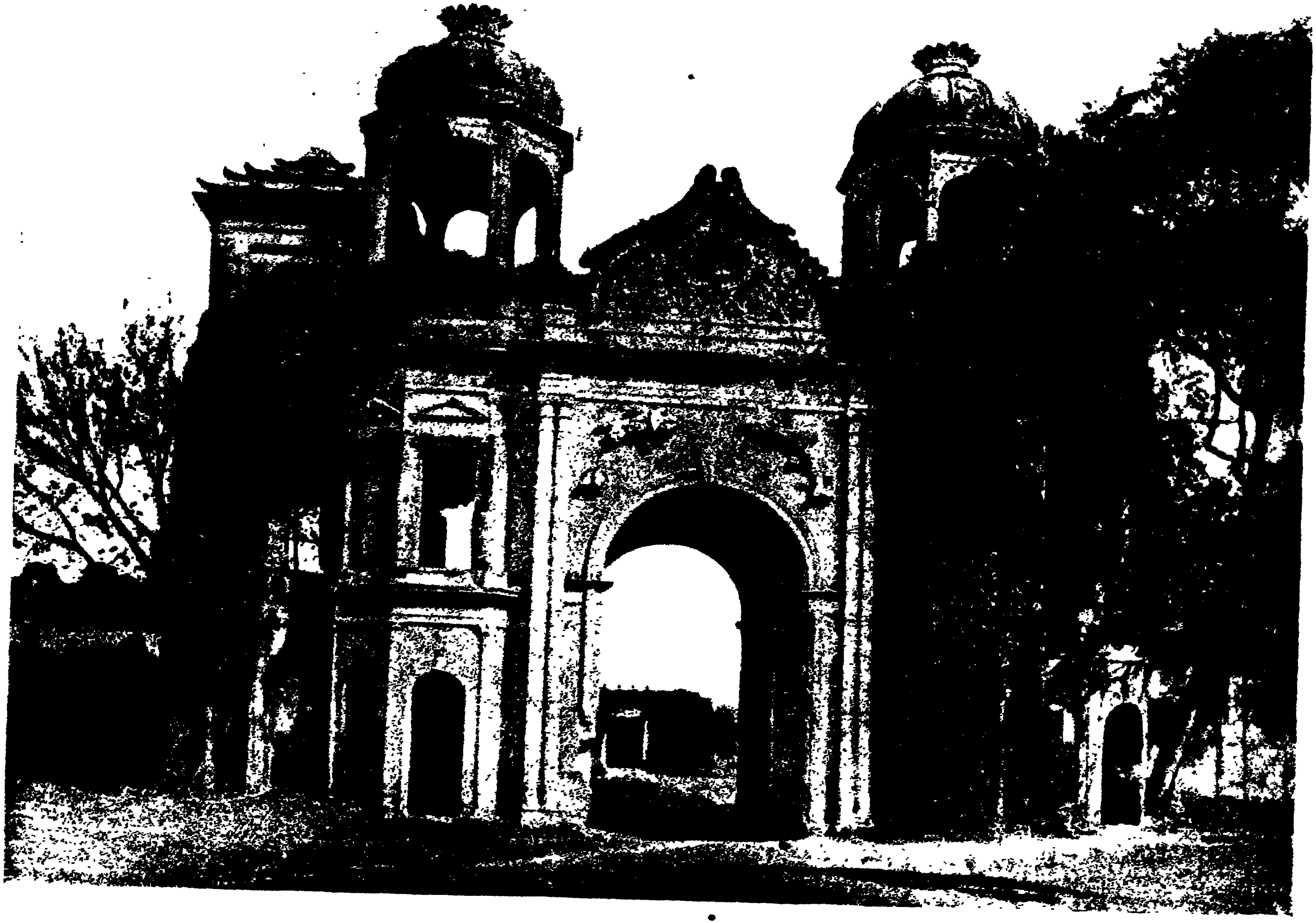
মার জন্য বাজার হইতে ফলমূলাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া, হোটেলেই আমরা আহারাদি করিলাম।

যে ব্যক্তি আমাদিগকে ষ্টেশন হইতে আনিয়াছিল, সে ইতিমধ্যে গিয়া এক গাইড যোগাড় করিয়া আনিয়া-ছিল। সে আমাদের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাহা কিছু দ্রষ্টব্য তাহা দেখাইবে। পারিশ্রমিক বোধ হয় একটাকা কি পাঁচসিকা এইরূপ। ফোর্ট দেখিবার জন্য পাশ প্রয়োজন—গাইড তাহাও যোগাড় করিয়া দিবে। সমস্তদিনের জন্য একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা সহর দেখিতে বাহির হইলাম।

প্রথমে আমরা আগ্রা হইতে পাঁচমাইল দূরবর্ত্তী সিকান্দ্রা গ্রামে সম্রাট আকবরের সমাধি দেখিতে গেলাম। এই পথের স্থানে স্থানে একক্রোশ অন্তর এক একটি ছোট মিনার রহিয়াছে—তাহার নাম "কোশ-মিনার।" আগ্রা সহর পার হইয়া রাস্তার ধারে একটি ভগ্নপ্রায় বৃহৎ ফটক দেখিলাম—গাইড গাড়ীর উপর হইতে চেঁচাইয়া বলিল—এই ফটকটির নাম দিল্লী গেট্। পূর্ব্বে আগ্রা সহর পরিবেষ্টন করিয়া যে প্রাচীর ছিল—এই দিল্লী গেট সেই প্রাচীরেই অন্যতম প্রবেশদ্বার ছিল। সিকান্দ্রা যাইবার রাস্তায় আরও কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান ছিল তাহা ফিরিবার সময় দেখা যাইবে ভাবিয়া আমরা প্রথমে বরাবর সিকান্দ্রায় গিয়া পৌঁছিলাম।

আকবরের সমাধি। উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত এক বিস্তীর্ণ বাগানের মধ্যস্থলে, আকবরের সমাধি। চারিদিকের দেওয়ালে চারিটি প্রবেশদ্বার। তন্মধ্যে পশ্চিম দিকের দরজাটিই প্রধান। পশ্চিমের দেউড়ীর উপরে পারস্য ভাষায় খোদিত লিপি—তাহা পড়িয়া (অথবা না পড়িয়াই) গাইড মুখস্থ বলার মতন অনেক কথাই বলিয়া গেল—তাহার সারমর্ম্ম এই, সমাধি-ভবনের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সপ্তমবর্ষে সম্পূর্ণ হইয়াছিল।—সমাধি ভবনের চারিকোণে চারিটি মিনার ছিল—ভরতপুরের জাঠেরা তাহা নাকি ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিকের সেই দেউড়ীর উপর খিলানওয়ালা একখানি ঘর ও সামনের দিকে একটু বারান্দা—ইহার নাম "নক্কর-খানা"—অনেকটা নহবৎ-খানার মত—এখানে পূর্ব্বে প্রতিদিন উষার ও সূর্য্যোদয়ের এক ঘড়ি পরে সমাধিস্থ মৃতের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ দামামা ও ভেরী বজিত। এখন আর তাহার কিছুই হয় না

সম্রাট আকবর স্বয়ং এই সামাধিভবনের নির্ম্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। এই সৌধের নির্ম্মাণ কার্য্যে মুসলমান শিল্প অপেক্ষা হিন্দু শিল্পেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর এই সমাধি-ভবনের অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে সিংহাসনে আরোহন করিয়া তিনি প্রথম যখন সিকান্দ্রা দেখিতে যান, তখন সমাধিভবনের



সিকান্দ্রায় আকবর সমাধিভবনের তোরণদ্বার

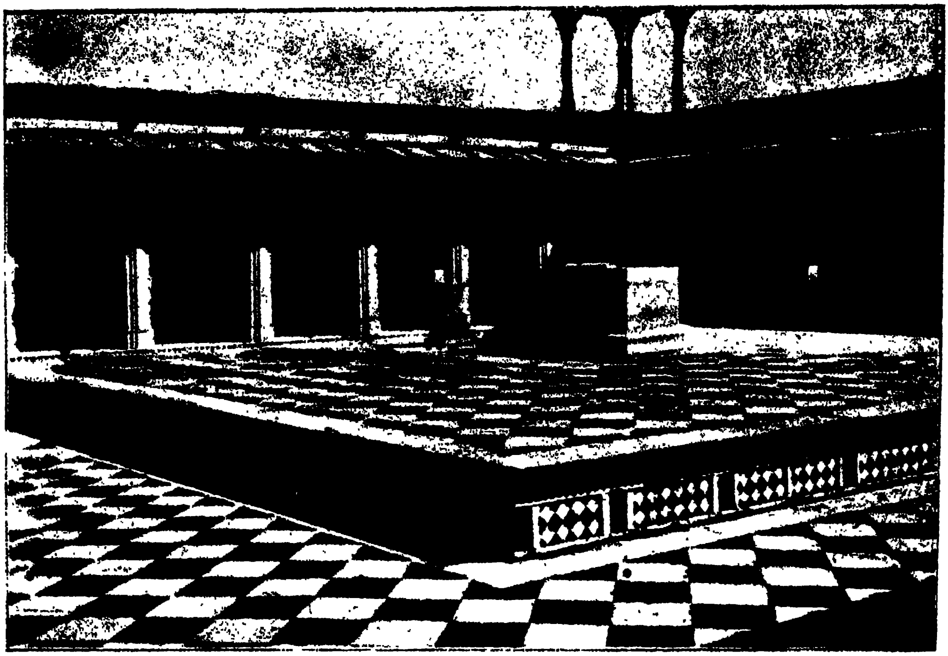
Manasi Press, Calcutta

নির্ম্মাণকার্য্য তাঁহার পছন্দ হয় নাই। অনেক স্থান আবার নূতন করিয়া তৈয়ারী করাইয়াছিলেন।

সিকান্দ্রায় পৌছিয়া আমরা বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া মোগলসম্রাট আকবরের সমাধি দেখিতে চলিলাম। একতলার ঠিক মধ্যস্থলে একটি কক্ষ—সেখান হইতে একটি ঢালু রাস্তা ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সেই রাস্তা দিয়া নামিয়া গিয়া আমরা নীচে একটি প্রয়ান্ধকার হলে প্রবেশ করিলাম। হলের মধ্যস্থলে শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত আড়ম্বরশূন্য একটি ছোট সমাধি—তাহারই মধ্যে সম্রাট্ আকবরের নশ্বর দেহাবশেষ রক্ষিত।

অন্ধকারের সহিত পবিত্রতার বোধ হয় কোনও একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে—আমাদের হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ও ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের মন্দিরাভ্যন্তর অন্ধকারময়। যে মন্দিরের ভিতর যত অন্ধকার, সেই মন্দিরের দেবতার প্রতি ততই যেন বেশী ভক্তির ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়।

একে মাটির নীচে সেই অন্ধকার ঘর, একটি কথা কহিলে চারিদিক হইতে গম্ভীর প্রতিধ্বনি—সমাধিরক্ষক মোল্লা একটি ক্ষীণ প্রদীপ হস্তে লইয়া, অন্ধকারকে যেন আরও ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে—আমাদের মাথা স্বতঃই নত হইল। সেই পবিত্রস্থানের সংস্পর্শে আমরা নিজেকে পবিত্র মনে করিতে লাগিলাম। কিছু ফুল ও দক্ষিণা সমাধির উপরে সাজাইয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম।



আকবরের সমাধি

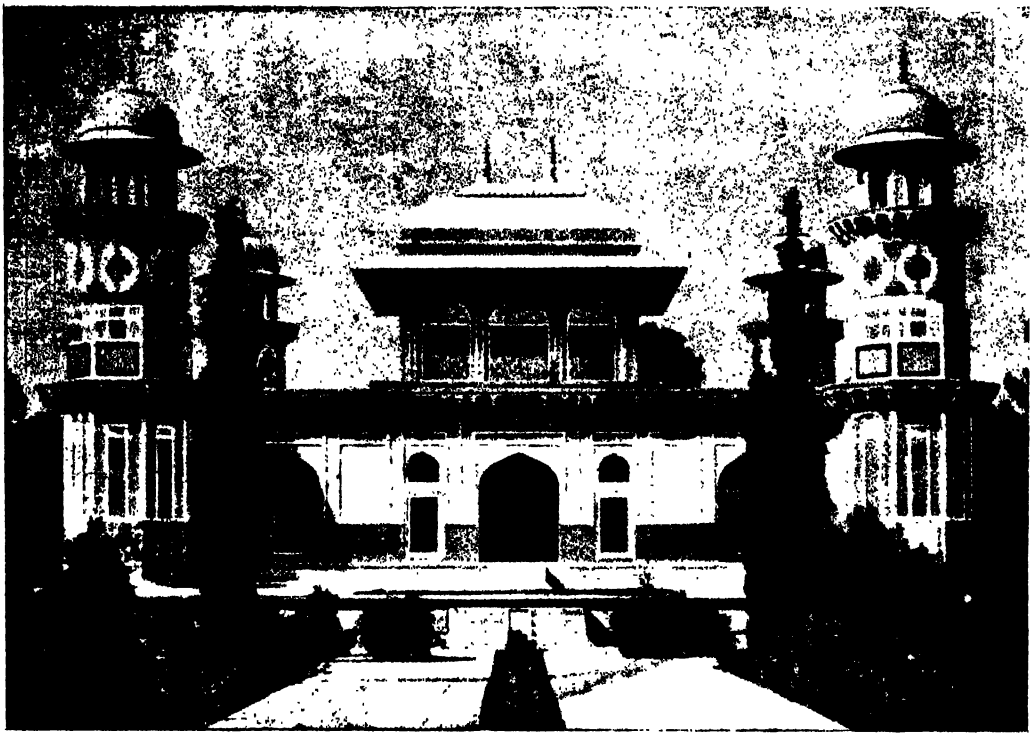
শুনিলাম পূর্ব্বে এই সমাধি পার্শ্বে সম্রাট আকবরের অস্ত্রশস্ত্রাদি, পোষাক ও তাঁহার আদরের পুস্তকাদি রক্ষিত ছিল—কিন্তু দুঃখের বিষয় ভরতপুরের জাঠ দস্যুগণ সেই ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন গুলি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

এখানে আকবরের সমাধি ছাড়া আরও তিনটি সমাধি রহিয়াছে—তন্মধ্যে দুইটি আকবরের দুই কন্যার ও তৃতীয়টি সম্রাট সাহ আলমের পুত্রের।

একতলের উপর আরও তিনতলা রহিয়াছে।

ছাদের উপর উঠিয়া দেখিলাম, চারিদিকে ছোট ছোট কক্ষ, সেই কক্ষগুলির বাহিরের দিকের দেওয়ালে অতি সুন্দর মার্ব্বেলের জাল। একতলার নীচে যেখানে আসল সমাধি আছে, তাহার ঠিক উপরে চারিতলার ঘরে—শ্বেত মার্ব্বেল নির্ম্মিত একটি নকল সমাধি—তাহার গাত্রে সুন্দর সুন্দর পুষ্প ও "বয়েৎ" খোদিত করাইয়াছিলেন—তাঁহারই নাম হইতে "সিকান্দ্রা" এই নামের উৎপত্তি।

পুষ্করিণীর ধারে একটি অদ্ভুত জিনিষ দেখিলাম। তাহা—রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত একটি অশ্ব ও আরোহীর মূর্ত্তি। কিম্বদন্তী, জনৈক ওমরাহের ঘোড়া এইখানে মরিয়া যায়। সেই ওমরাহ তাঁহার প্রিয় অশ্বটির



এৎমাদ-উদ্দৌল্লা

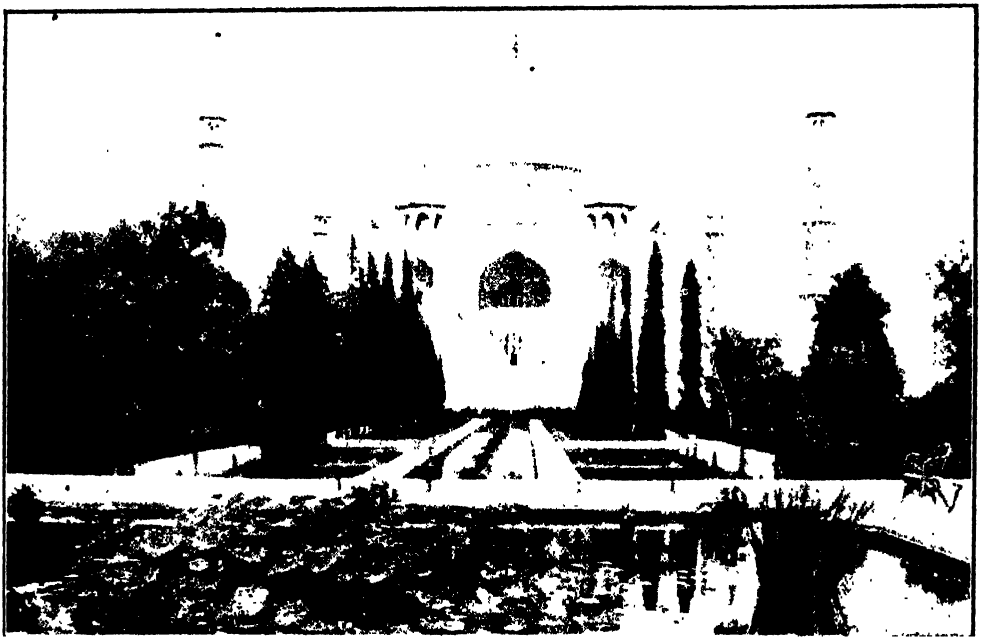
রহিয়াছে। নকল সমাধির পদতলে মার্ব্বেল নির্ম্মিত একটি স্তম্ভ—সেখানে পূর্ব্বে ধূপাধার থাকিত। সমাধির গাত্রে ঈশ্বরের নিরানব্বইটি নাম আরবী ভাষায় খোদিত রহিয়াছে।

সিকান্দ্রা হইতে ফিরিবার পথে আমরা আরও কয়েকটি জিনিষ দেখিলাম। সিকান্দ্রা গ্রামে একটি বৃহৎ শুষ্কপ্রায় পুষ্করিণী রহিয়াছে, তাহার নাম শুনিলাম—গুরু-কা-তাল। এই পুষ্করিণী ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি ধ্বংসপ্রায় অট্টালিকা নাকি সিকান্দ্রা লোদি নির্ম্মাণ

স্মৃতিরক্ষার্থ এইখানে এই প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পাশেই একটি সমাধি রহিয়াছে—তাহা নাকি সেই অশ্বের সহিসের—সে বেচারীও অশ্বের সহিত এখানে মারা পড়ে।

আরও কিছুদূর যাইয়া একটি বৃহৎ বাগান দেখিলাম—তাহার নাম কান্দাহারী বাগ—সেই বাগানের মধ্যে মুজফর হোসেনের কন্যা, সম্রাট সাজাহানের প্রথমা পত্নীর সমাধি রহিয়াছে।

আগ্রা সহরে পৌছিবার মাইল খানেক থাকিতে

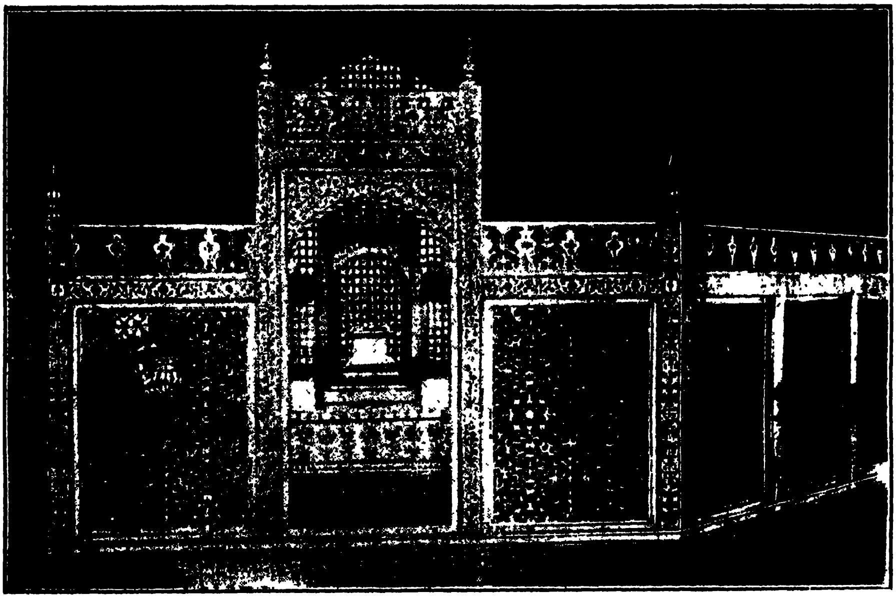


তাজমহল

একটি বৃহৎ বাগানের মধ্যে গাইড্ আমাদের নামাইয়া লইয়া গেল। বাগানটির চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর। এখানে দেখিবার মধ্যে একটি সুন্দর মার্ব্বেল মণ্ডপ। তবে এই স্থানটি ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। এখানে পূর্ব্বে আকবরের মন্ত্রী ও তাঁহার জীবনচরিত-লেখক আবুল ফজলের ভগ্নী লঠ্‌লি বেগমের সমাধি ছিল। তাহা ছাড়া উক্ত বেগমের পিতা সেখ মোবারক ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ফৈজীর সমাধিও ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সমস্ত বাগানখানি মথুরানিবাসী এক ধনী হিন্দু ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। উক্ত ব্যবসায়ী তাঁহার ব্যবসায়-বুদ্ধি-প্রাবল্য বশতঃ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোকের সমাধিগুলির চিহ্ন লোপ করিয়া, সেই সকল মাল-মশলাদ্বারা এই আধুনিক মার্ব্বল মণ্ডপটি তৈয়ারী করিয়াছেন।

সিকান্দ্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা **এৎমাদ-উদ্দৌলা** দেখিতে গেলাম। ইহাও একটি সমাধিভবন। যমুনা নদীর পূর্ব্বতটে ইহা অবস্থিত। এই সমাধি-ভবনটি জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা পত্নী নূর মহলের আদেশে নূরমহলের ভ্রাতা মির্জ্জা ঘিয়াস্ বেগের সমাধির উপর নির্ম্মিত। ইঁহার অন্য নাম ছিল এৎমাদ-উদ্দৌলা। সমাধি-ভবনের মধ্যস্থলের কক্ষে এৎমাদ ও তাঁহার পত্নীর সমাধি রহিয়াছে। চারিকোণের চারি কক্ষে এৎমাদের ভ্রাতা ভগ্নী ও পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তির সমাধি আছে। ছাদের উপর যে সুন্দর মর্ম্মরনির্ম্মিত মণ্ডপটি রহিয়াছে—সেটিই প্রধান দেখিবার জিনিষ। মণ্ডপটি ঘিরিয়া ঘিরিয়া ঢেউ খেলান পুষ্পখচিত মর্ম্মরনির্ম্মিত মালাটি নয়ন-বিমোহন। এই মণ্ডপে নীচের আসল সমাধিদ্বয়ের অনুকরণে দুইটি নকল সমাধিও রহিয়াছে। এই ইমারাৎটি তৈয়ারী করিতে ছয় বৎসর লাগিয়াছিল।

এই অট্টালিকার শিল্পকৌশল আকবর-নির্ম্মিত অন্যান্য অট্টালিকাগুলি হইতে বিভিন্ন। ইহার কারণ অনুধাবন করিতে গিয়া কেহ কেহ বলেন যে, যেহেতু জাহাঙ্গীর বিদেশীয়দের পক্ষপাতী ছিলেন—সেইজন্য হয়ত এই সমাধি-ভবনের নির্ম্মাণকার্য্যভার তিনি কোনও



তাজের মর্ম্মর যবনিকা

ইটালীনিবাসী শিল্পীর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে এৎমাদ-উদ্দৌলার শিল্প-চাতুর্য্যের সহিত ইটালীয় শিল্পের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এৎমাদ-উদ্দৌলার শিল্প পারস্য শিল্পের চূড়ান্ত। এখানে যে সকল পুষ্প, পুষ্পাধার, আসবাধার, গোলাপপাশ প্রভৃতির প্রতিকৃতি রহিয়াছে—তাহা পারস্যশিল্পের নিজস্ব।

সে যাহা হউক, আমরা এৎমাদ-উদ্দৌলা ছাড়িয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া চিনি-কা-রোজা নামক এক সমাধি-ভবনের ভগ্নাবশেষ দেখিতে গেলাম। ভগ্নাবশেষ যাহা দেখিলাম, তাহা অতি সুন্দর, না জানি—যখন অবিকৃত ছিল—তখন কি সুন্দরই ছিল! শুনা যায় এইখানে পারস্য কবি আফজল খাঁর সমাধি ছিল। আফজল খাঁ প্রথমে জাহাঙ্গীরের সভায় প্রবেশ করেন—তৎপরে নিজের বুদ্ধি প্রভাবে সম্রাট সাজাহানের প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চিনি-কা-রোজার কিছুদূরে রামবাগ নামক বিস্তীর্ণ উদ্যান বাটিকা। ইহা একসময়ে সম্রাট বাবরের প্রমোদ-উদ্যান ছিল। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার শবদেহ সমাধিস্থ হইবার জন্য কাবুলে নীত হইবার পূর্ব্বে এখানে কয়েকদিনের জন্য রাখা ছিল। এখানে অনেক ফোয়ারা, জল লইয়া যাইবার প্রস্তর নির্ম্মিত প্রণালী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। একটি বহু পুরাতন ইন্দারা রহিয়াছে—তাহা হইতে জল তুলিয়া প্রস্তর প্রণালীতে ঢালিয়া দেওয়া হইত—সেই জল বাগানের সমস্ত ফুলের গাছ পর্য্যন্ত পৌঁছিত। পরে ইহা সম্রাজ্ঞী নুরমহালের উদ্যানবাটিকা হইয়াছিল।

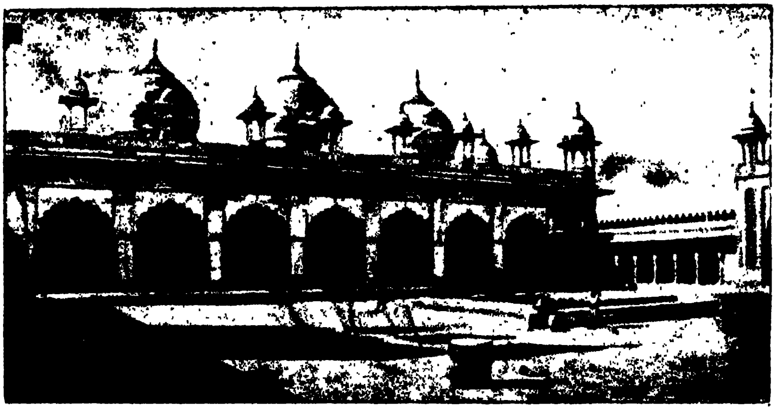
চিনি-কা-রোজা ও রামবাগের মধ্যবর্ত্তী স্থলে একটি প্রকাণ্ড প্রাচীর বেষ্টিত বাগান—জোহরা-বাগ। সম্রাট বাবরের কন্যা জোহরা-বেগমের উদ্যানবাটিকা। পূর্ব্বে ইহা আগ্রার বৃহত্তম প্রমোদবাটিকা ছিল ও প্রায় চল্লিশ ইন্দারা এই বিস্তীর্ণ উদ্যানকে জল সরবরাহ করিত। এৎমাদ-উদ্দৌলা ও নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি দেখিবার পর আমরা সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত তাজমহল

দেখিতে গেলাম। তাজমহল যাঁহারা দেখিয়া আসিয়াছেন—তাঁহারা বলেন তাজমহলের পূর্ণ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে, জ্যোৎস্নালোকে দেখা কর্ত্তব্য। চন্দ্রালোকে তাজের সৌন্দর্য্য দেখিবার সুযোগ (বা অদৃষ্ট) আমাদের ঘটে নাই। তবে সূর্য্যালোকেই যাহা দেখিয়াছি তাহা কখনও ভুলিব না।

বহুদূর বিস্তৃত এক বাগানের মধ্যে তাজমহল নির্ম্মিত। প্রথম প্রবেশদ্বারের সম্মুখে চতুষ্কোণাকৃতি এক বৃহৎ অঙ্গন, তাহার চারিদিকে ছোট ছোট কক্ষ। এখানে পূর্ব্বে একটি পান্থশালা বা সরাই ছিল—এখানে গরীব লোকদিগকে আহার ও বিশ্রামস্থান দেওয়া হইত

লিখিয়াছিলেন, তাহা "মর্ম্মর-স্বপ্ন" নামে সে বৎসর "মানসী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহার প্রথম কয়েক চরণ এই—

"বাঁশীর রাগিণী মূরছি রয়েছে
মর্ম্মর রূপ ধরি'—
বঁধুর পরশে ঘুমায় হরষে
মমতাজ সুন্দরী।
ভালবাসা তা'র গোলাপ-শয়ন
কেশর পরাগে করিয়া বয়ন
জেগে বসে' আছে শিয়রের কাছে
যুগ যুগান্তর ভরি'।



মোতি মসজিদ

ও মমতাজমহলের মৃত্যুর বার্ষিক দিনে বিস্তর অর্থ দরিদ্রগণকে বিতরিত হইত। প্রবেশদ্বারের উপর কৃষ্ণবর্ণ-মর্ম্মরের অক্ষরে কোরাণ হইতে উদ্ধৃত 'বয়েৎ'; আরও যাহা যাহা লেখা রহিয়াছে তাহার অর্থ শুনিলাম, "যদি পবিত্রচেতা হও, তবে এই স্বর্গ কাননে প্রবেশ কর।"

আমরা স্বর্গকাননে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিয়া তাজের যে স্বর্গীয় দৃশ্য আমাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল তাহা অবর্ণনীয়। কবি নহি, ভাবুক নহি, যে তাজমহলের শোভা বর্ণনা করিব। তবে সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের কবিসঙ্গ লাভ হইয়াছিল—করুণানিধানবাবু ফিরিয়া আসিয়া যে প্রাণস্পর্শী কবিতা

ঋতুরাজ নিজে পুষ্প সুরায়
ভরিয়াছে তা'র প্রাণ,
যৌবন তাপে সুখ-ঝরণায়
করায়েছে তা'রে স্নান;
মণি-কিশলয়ে কল্প-লীলায়
ফুটেছে লতিকা বিলাস-শিলায়,
পড়ে ঢলি' ঢলি' প্রতারিত অলি
ভুলি' গুঞ্জর গান।"

জনৈক ইংরাজ ভাবুক সত্যই বলিয়াছেন—

"The Taj is India's noble tribute to the grace of Indian Womanhood"—প্রেমের এরূপ

মর্ম্মস্পর্শী সাক্ষ্য কোনও দেশে আর কেহ রাখিয়া যাইতে পারিয়াছে কি ?

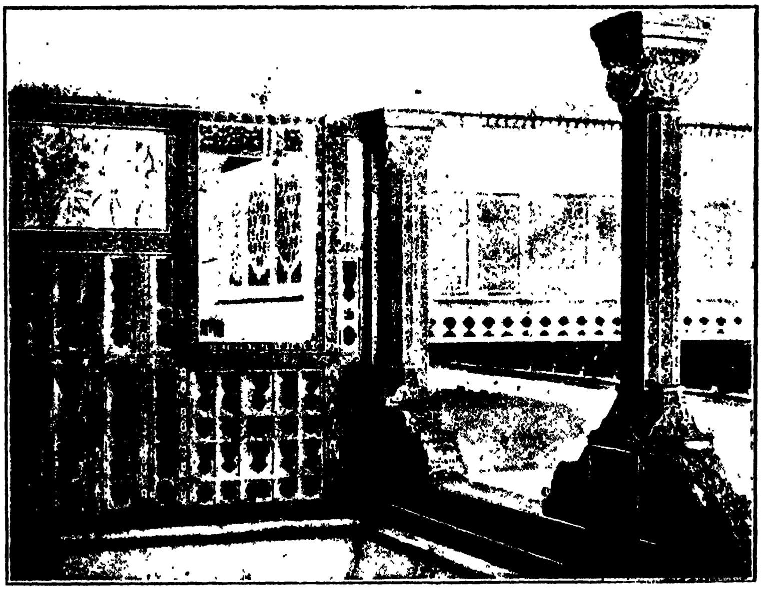
বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া আমরা ভক্তিপূর্ণ চিত্তে মধ্যস্থলস্থ কক্ষে প্রবেশ করিলাম। মমতাজমহল ও সাজাহানের সমাধির মাঝখানে, তাহার চারিদিক ঘিরিয়া মার্ব্বল নির্ম্মিত এক অপূর্ব্ব অনতিউচ্চ বেষ্টনী—এই বেষ্টনীর কারুকার্য্য জগদ্বিখ্যাত। শুধু এই বেষ্টনীটি নির্ম্মাণ করিতেই সাজাহানের সমস্ত কারিগরগণের দশ বৎসর লাগিয়াছিল।

মমতাজের শ্বেত মার্ব্বলের সমাধিগাত্রে শিল্পিগণ পারস্য দেশের গোলাপ ফুল ফুটাইয়াছে। কি সুন্দর সে কৃত্রিম ফুলের গঠন প্রণালী !

পাশের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আমরা আসল সমাধি কক্ষে নীত হইলাম। উপরের সমাধি দুটি নকল—তাহা সমাধির উপর ছড়াইয়া দিয়া আমরা উপরে উঠিয়া আসিলাম।

মধ্যস্থলস্থ সমাধিকক্ষটি ঘিরিয়া আরও আটটি ছোট ছোট কক্ষ। সেখানে মোল্লাগণ থাকেন; তাঁহাদের কায কোরাণপাঠ করা। পূর্ব্বে নিম্নতলস্থ আসল সমাধিকক্ষটি মমতাজের শুধু মৃত্যুর বার্ষিক দিনে খোলা হইত। সেদিন এখানে এক বৃহৎ উৎসব হইত তাহাতে সম্রাট সাজাহান ও তাঁহার সভাসদগণ যোগদান করিতেন। পূর্ব্বে বৎসরের অন্যান্য দিনেও মুসলমান ব্যতীত আর অন্য কোনও ধর্ম্মাবলম্বিগণক এখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। এখন অবশ্য সে হুকুম রদ্ হইয়াছে।

যে প্রকাণ্ড চত্বরের উপর তাজমহল প্রতিষ্ঠিত তাহার চারিকোণে চারিটি মিনার। আমরা একটি



আকবরী মহল

নীচের সমাধি দুটিতে মমতাজ মহল ও সাজাহানের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। প্রায়ান্ধকার শীতল কক্ষে সাজাহান তাঁহার প্রিয়তমা মমতাজের পার্শ্বে চিরনিদ্রায় অভিভূত। এই আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকার সমাধি স্পর্শ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম। কিছু ফুল সঙ্গে ছিল—

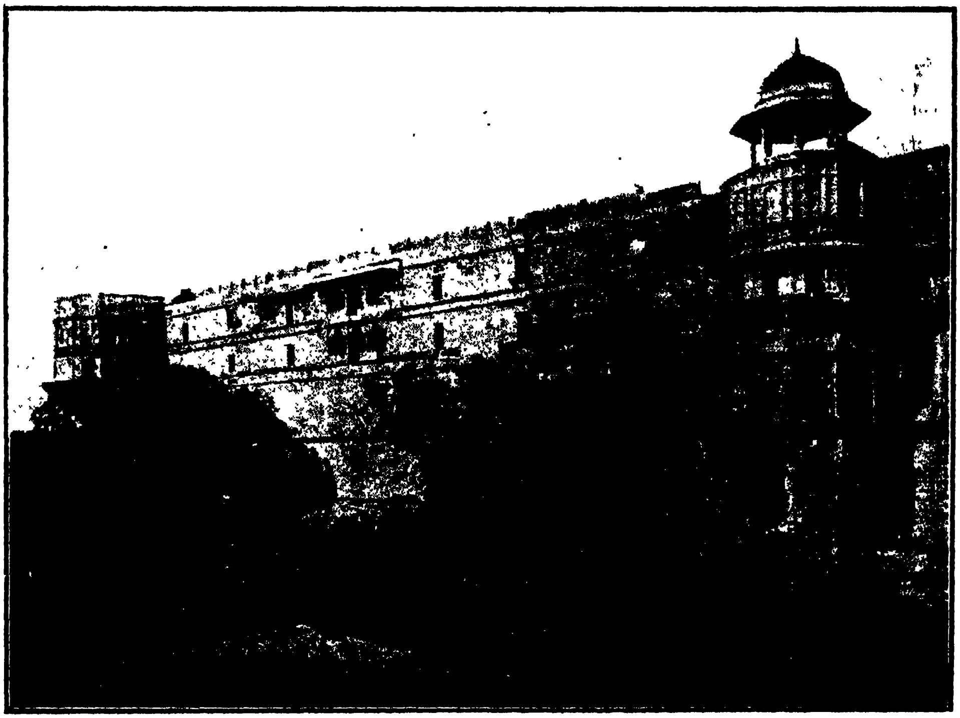
মিনারের শিখরদেশে আরোহণ করিলাম—সেখান হইতে সমস্ত আগ্রা সহরের Bird's eye view দেখিতে পাইলাম।

তাজের দুইপার্শ্বে রক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত ছোট ছোট দুইটি মসজিদ রহিয়াছে। পশ্চিমের মসজিদটিতে শুধু

নামাজ পাঠ হইত— তাহাতে প্রত্যেক লোকের বসিবার জন্য স্বতন্ত্র স্থান চিহ্নিত রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকের মসজিদটি "জমায়েৎ খানা" অর্থাৎ নমাজ করিতে যাইবার পূর্ব্বে সকলে এখানে সমবেত হইতেন।

তাজমহল দেখা হইলে আমরা কিয়ৎক্ষণ বাগানে বেড়াইয়া ও যমুনার ধারে বসিয়া যমুনাবক্ষে প্রতিফলিত তাজের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। তাহার পর তাজের দিকে একবার শেষবার দৃষ্টি করিয়া আমরা গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম।

সেদিন বাসায় ফিরিয়া বিশ্রাম করিয়া, পরদিন আমরা আগ্রা ফোর্ট দেখিতে গেলাম। সের শাহের পুত্র প্রথমে এইখানে এক দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। সেই অসমাপ্ত দুর্গটি সম্রাট আকবর ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ করিতে আরম্ভ করেন। দুর্গের প্রধান ফটক "দিল্লী গেট" উত্তরদিকে ষ্টেশনের নিকট। আমরা লৌহসেতু পার হইয়া প্রথমদ্বার অতিক্রম করিলাম। তাহার পরেই এক ক্রমোচ্চ রাস্তা—সেই রাস্তার শেষে "হাতী পোল" নামক দ্বিতীয় ফটক অবস্থিত। এই ফটকটির উক্ত নাম হইবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে এই ফটকের বহির্দ্দেশে দুইপার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত হস্তী রক্ষিত ছিল—পরে ঔরঙ্গজেব তাহা ভাঙ্গিয়া দেন। এই ফটকটির উপরে একটি নহবৎখানা—সেখান হইতে ডঙ্কা বাজাইয়া সম্রাটের আগমন বা বহির্গমন বার্ত্তা ঘোষিত হইত। প্রদর্শক বলিল ইহার নাম "দর্শন দরোয়াজা"—অর্থাৎ পূর্ব্বে এখানে নীচের প্রশস্ত অঙ্গনে ওমরাহগণ ও প্রজাবর্গ সমবেত হইত—সম্রাট জাহাঙ্গীর উপর হইতে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ে তাঁহার প্রজামণ্ডলীকে দর্শনদান করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম যে তথা কথিত দর্শনদরোয়াজা এখানে ছিল না, যমুনার তীরে দুর্গের যে দিক, সেই দিকে ছিল। সে কথা পরে বলিতেছি।



সমুন বুরুজ

সিঁড়ি দিয়া 'হাতী পোলে'র উপরে উঠিলাম। চারিদিকে কি মনোহর দৃশ্য! আর দূরে—যমুনার ওপারে সেই চিরসুন্দর তাজমহল!

হাতীপোল পার হইয়া বামদিকের রাস্তা দিয়া মোতি মসজিদ অভিমুখে চলিলাম। মোতি মসজিদ দুর্গের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত। এই রাস্তায় যাইতে যাইতে বামদিকে প্রদর্শক একটি বাড়ী দেখাইল—তাহার নাম বলিল দংশ জাঠের বাড়ী—জাঠেরা যখন এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিল তখন ভরতপুরের রাজগণ এইখানে থাকিতেন। এখন ইহা বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষগণের আবাস স্থল।

গঠনপ্রণালী এরূপ চমৎকার যে—দূর হইতে দেখুন, ঠিক মনে হইবে যেন তিনটি স্ফুটনোন্মুখ ফুলের কুঁড়ি। মসজিদের চারিকোণে অষ্টকোণাকৃতি চারিটি মণ্ডপ আর মসজিদের অঙ্গনের খিলানগুলিই বা কি কারুকার্য্য-বিশিষ্ট!

মসজিদের দুই পার্শ্বে ছোট ছোট কক্ষ। তাহার জানালায় মার্ব্বল-জাল—এই কক্ষগুলিতে বেগমগণ ও হারেমের অন্যান্য মহিলাগণ বসিয়া উপাসনা করিতেন। মসজিদের কার্ণিশের নীচে কৃষ্ণপ্রস্তরে পারস্য ভাষায় লিখিত লিপি হইতে জানা যায় যে, সম্রাট সাজাহান এই মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; নির্ম্মাণ কার্য্য সাত-



যশোবন্ত সিংহের ছত্রী

মোতি মসজিদের প্রবেশদ্বার অতি সাদাসিধা ধরণের—ভিতরে যে মসজিদের এরূপ অনুপম শোভা তাহার বাহির এরূপ কারুকার্য্যবিহীন কেন?

ধন্য সেই শিল্পী, যে মোতি মসজিদ তৈয়ারী করিয়াছিল। সাতটি খিলানের উপর তিনটি গম্বুজ—তাহার

বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল ও তিনলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

মসজিদের অঙ্গনের দুইদিক দিয়া সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে—তাহা অন্তঃপুর বা হারেমে যাইবার পথ।

এইবার আমরা আসল "দর্শন দরোয়াজা"

দেখিলাম। মোতি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যে পথে আসিয়াছিলাম সেই পথে ফিরিতে দক্ষিণে এক ঢালু রাস্তা চলিয়া গিয়া এক পুরাতন ফটকের নিকট পৌঁছিয়াছে। এই ফটকই "দর্শন দরোয়াজা।" ফটক পার হইয়া যমুনা নদীর তীরে তীরে দুর্গ প্রাকারের ভিতরেই এক প্রশস্ত স্থান। এইখানে পূর্ব্বকথিত ওমরাহগণ ও প্রজাবর্গ সম্মিলিত হইয়া জাহাঙ্গীরকে তস্‌লিম্ করিতেন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে এখানে "তামাসা" হইত। "তামাসা" অর্থে, হস্তী, সিংহ, মহিষ প্রভৃতির লড়াই—সম্রাট উপর হইতে এই তামাসা দেখিতেন।

দর্শন দরোয়াজা হইতে বাহির হইয়া কিছু দূরে "মিনা বাজার" অর্থাৎ চক। এখানে ব্যবসায়িগণ জহরৎ, মণি, মুক্তা প্রভৃতি বিক্রয় করিত। এই মিনা-বাজারের মধ্য দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া চলিয়া আমরা দেওয়ান-ই-আমের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলাম। এই দুর্গ অধিকার করিবার পর দেওয়ান-ই-আম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কক্ষগুলি ইংরাজের অস্ত্রশস্ত্রাদি রক্ষার জন্য বহুকাল ব্যবহৃত হইয়াছিল।

তিন সারি স্তম্ভের উপর খিলান করা ছাদ—চারিদিক খোলা। রাজসভার উপযুক্ত স্থানই ছিল। এই বিরাট মণ্ডপটির নির্ম্মাণ কার্য্য সাজাহান আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের সপ্তবিংশতি বর্ষের পূর্ব্বে সে নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয় নাই। দেওয়ানী-আম-রক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত—সে প্রস্তর আবার উত্তমরূপ পালিশ করা—তাহার উপর নানাবর্ণের কারুকার্য্য। দেওয়ান-ই-আমের প্রশস্ত দালানের একদিকে প্রকাণ্ড এক মার্ব্বল নির্ম্মিত খিলানের নীচে পূর্ব্বে সম্রাটের রাজ-সিংহাসন থাকিত। এই সিংহাসনে বসিয়া সম্রাট বিচারকার্য্য পরিচালনা করিতেন। সিংহাসনের পাদ-দেশে চতুষ্কোণাকৃতি মার্ব্বল খণ্ড রক্ষিত আছে; তাহার উপর দাঁড়াইয়া মন্ত্রী সসম্ভ্রমে সম্রাটের আদেশ ঘোষণা করিতেন। সিংহাসনের দক্ষিণে ও বামে মার্ব্বল-জাল মণ্ডিত ছোট ছোট কক্ষ, সেখানে বেগমগণ বসিয়া রাজ-কার্য্য পরিদর্শন করিতেন।

দেওয়ানী আমের সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহা "জাহাঙ্গীরের হৌজ্"; চৌবাচ্চার ভিতর যাইবার জন্য বাহির ও ভিতরে সিঁড়ি রহিয়াছে। চৌবাচ্চার চারি পার্শ্বে পারস্য ভাষায় বিস্তর লিপি খোদিত রহিয়াছে যেটুকু পড়িতে পারা যায় তাহা হইতে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীর ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত "হৌজ" নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

চৌবাচ্চার নিকটেই একটি সমাধি। তাহার সমাধিলিপি পাঠ করিয়া জানিলাম যে সমাধিটি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর কল্‌ভিন্ সাহেবের। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

দেওয়ান-ই-আমের পশ্চাতে অন্তঃপুর-প্রাসাদ। অন্তঃপুরের প্রবেশ পথে একটি প্রশস্ত অঙ্গন, ইহাও মিনাবাজার, তবে পূর্ব্ব কথিত মিনাবাজারটি বাহিরের ও এইটি অন্তঃপুরের। এখানেও ব্যবসায়িগণ বেগম-গণের নিকট মণি মুক্তাদি বিক্রয় করিত।

এই স্থানের আকবরের সেই বিখ্যাত "নওরোজ" মেলা বসিত। "নওরোজ" মেলায় কি কি কাণ্ড ঘটিত তাহা "মাধবীকঙ্কণের" পাঠকগণ জানেন। "নওরোজ" মেলায় স্ত্রীলোকগণই দোকানদার ও স্ত্রীলোকগণই খরিদ্দার। এইদিন কোনও পুরুষের এই মেলায় "প্রবেশ নিষেধ" ছিল। আগ্রার ও নিকটবর্ত্তী স্থানের আমীর, ওমরাহগণের অন্তঃপুরিকা সুন্দরীগণ এইখানে আসিয়া মিলিত হইতেন আর সম্রাট আকবর নিকটবর্ত্তী এক গোপন কক্ষে বসিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূদের রূপ-সুধা পান করিতেন। এই মিনাবাজারের বামদিকের রাস্তা দিয়া যাইলে "চিতোর গেট" দেখিতে পাওয়া যায়। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর ধ্বংস করিয়া আকবর সেই ধ্বংসের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ চিতোর হইতে আনীত কতকগুলি দ্রব্য সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। চিতোর গেট—মচ্ছি ভবনের প্রবেশদ্বার।

চিতোর গেট দিয়া প্রবেশ করিয়া একটি হিন্দু দেব-মন্দির দেখিলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভরত-

পুরের রাজগণ আগ্রা ধ্বংস করিয়া এই দুর্গে দশদিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারাই এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

মচ্ছি-ভবন আর কিছুই নহে—ক্ষুদ্র বাগান বিশেষ—জল যাইবার রাস্তা, কয়েকটি ফোয়ারা ও একটি বৃহৎ চৌবাচ্চা—তাহাতে পূর্ব্বে নানারঙের মাছ থাকিত।

জাঠেরা এই মচ্ছি ভবনের অধিকাংশ দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া লইয়া গিয়া ডীগে সূর্য্যমলের প্রাসাদে রাখিয়াছে।

দেওয়ান-ই-আমের বামে একটি অপ্রশস্ত রাস্তার প্রান্তে একটি দুয়ার তাহার ভিতরে একটি ছোট মসজিদ। ঔরঙ্গজেব অন্তঃপুরিকাগণের ব্যবহারের জন্য মোতি-মসজিদের অনুকরণে এই মসজিদটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার নাম "নগিনা মসজিদ"। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে বিশেষত্ব কিছুই নাই।

এই মসজিদ ছাড়াইয়া একপ্রান্তে একটি কক্ষ। গাইড বলিল এইখানে ঔরঙ্গজেব সাজাহানকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাজাহানের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে এখান হইতে সরাইয়া "সমন বুরুজে" লইয়া যাওয়া হয়, সে কথা পরে বলিতেছি।

দেওয়ান-ই-খাস—মোগল সম্রাটগণের গুপ্ত মন্ত্রণা-গার ছিল। এই মণ্ডপের কারুকার্য্য দেখিলে বুঝা যায় যে, যেখানে এত চিত্রিত পুষ্পের ছড়াছড়ি, সেখানকার শিল্প পারস্যদেশ ব্যতীত আর কোথাকার নহে। এইরূপ পুষ্পের ছড়াছড়ি আমরা এৎমাদ-উদ্দৌলাতে দেখিয়াছিলাম। পারস্য শিল্পিগণ ফুল বড় ভালবাসে—পূজা করে বলিলেই হয়।

দেওয়ান-ই-খাসের সম্মুখে বারান্দায় দুইটি সিংহাসন রক্ষিত রহিয়াছে—একটি শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত মচ্ছি ভবনের দিকে মুখ আর একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের যমুনার দিকে মুখ—এই দুইটি সিংহাসন জাহাঙ্গীর ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নিজের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

এই স্থানে গাইড্ দেওয়ান-ই-খাসের দেওয়ালে একটি ফাটলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে বলিল, ইংরাজেরা যখন দুর্গ অধিকার করেন, তখন কামানের গোলা লাগিয়া এই মার্ব্বল ফাটিয়া গিয়াছিল।

কৃষ্ণপ্রস্তরের সিংহাসনটিতেও একটি প্রকাণ্ড ফাটল রহিয়াছে। গাইড্ বলিল "বাবুজী—এই ফাটলটিও ইংরাজের গোলা লাগিয়া হইয়াছিল। কিন্তু 'গাঁওয়ার আদমী লোগ' বলে যে জাঠরাজা জহরসিং যখন কেল্লা দখল করিয়া এই সিংহাসনের উপর পদস্পর্শ করিয়াছিলেন, তখন এই সিংহাসন ফাটিয়া যায় এবং ইহা হইতে দুই জায়গায় রক্ত ছিটকাইয়া বাহির হইয়াছিল।"

অন্তঃপুরের দিকে স্নানঘর বা "হামাম" দ্রষ্টব্য। পঞ্চাশ হাত নীচে হইতে জল তুলিয়া এই হামামে জল সরবরাহ করা হইত। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ যখন বড়লাট ছিলেন, তখন তিনি এই স্নানকক্ষের একটি সুন্দর মার্ব্বল নির্ম্মিত চৌবাচ্চা উঠাইয়া লইয়া গিয়া ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ জর্জ্জকে (তখন তিনি যুবরাজ ছিলেন) উপ-ঢৌকন প্রেরণ করেন। দেওয়ান-ই-খাসের পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যমুনার তীরে দুর্গপ্রাকারের এক বুরুজের উপর নির্ম্মিত এক দ্বিতল হর্ম্ম্য দেখিলাম। ইহার নাম "সমন বুরুজ"। এখানে পূর্ব্বে সম্রাজ্ঞী নূর-মহল ও পরে মমতাজমহলের আবাস স্থান ছিল। আর এইখানেই সম্রাট সাজাহানের অন্তিমকাল কাটিয়াছিল।

দূরে যমুনার ওপারে অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত তাজমহল। সম্রাট সাজাহান মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া একদৃষ্টে সাশ্রুনয়নে তাজমহলের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন—নিকটে শুশ্রূষাপরায়ণা কন্যা জাহানারা। শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত—সন্ধ্যার অন্ধকারে তাজমহল ঢাকা পড়িয়াছে—স্বকৃত পাপ কার্য্যের মার্জ্জনার জন্য ভগবানের নিকটে একমনে প্রার্থনা করিয়া ও কন্যা জাহানারাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সম্রাট চিরনিদ্রায় মগ্ন হইলেন এই ছবিটি আমাদের মনে বারবার জাগিতে লাগিল।

দুর্গের পূর্ব্বদিকে **খাসমহল**। এখানে দেওয়ালে কয়েকটি শূন্য স্থান রহিয়াছে—সেখানে পূর্ব্বে মোগল-

সম্রাটদের ছবি রক্ষিত ছিল জাঠরা তাহা লুণ্ঠন করিয়া লয়। ইহা ছাড়া আর কিছু দ্রষ্টব্য খাস-মহলে নাই।

খাসমহলের দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন কয়েকটি কক্ষ দেখিলাম। কক্ষগুলি খুব শীতল। ইহার মধ্যে কয়েকটি কক্ষ মোগল সম্রাট ও বেগমগণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে ব্যবহার করিতেন। দক্ষিণের কোণে একটি প্রকাণ্ড ইঁদারা ঘিরিয়া কয়েকটি কক্ষ, তাহার নাম বাওলি। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি অন্ধকার কারাগৃহ রহিয়াছে—একসময়ে কত দোষী, নির্দোষী ক্রীতদাস কত অবিশ্বাসিনী বেগমের অন্তিম ক্রন্দনে এই কারাগৃহ মুখরিত হইয়াছিল।

খাসমহলের সম্মুখে বিস্তীর্ণ বাগান, আঙ্গুরীবাগ—তাহার তিনদিক প্রাচীরবেষ্টিত। খুব সম্ভবতঃ এই "বাগ" আকবর তাঁহার অন্তঃপুরিকাদের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড ফোয়ারা, সেখান হইতে চারিদিকে শানবাধান রাস্তা চলিয়া গিয়াছে—রাস্তায় দুই পার্শ্বে ফুলগাছ। আঙ্গুরীবাগের উত্তরে শীশ মহল—অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের কক্ষ। তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা আর চারিদিকের দেওয়ালে ছোট ছোট রঙীন আর্শির টুকরা আঁটা। বড় সুন্দর দেখিতে। গাইড একটি মোমবাতি জ্বালিল—চারিদিকের দেওয়ালে সেই রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

আগ্রা ফোর্টে দ্রষ্টব্য যাহা কিছু ছিল সব দেখিয়া আমরা সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রি ১২ টার সময় ট্রেণ—সমস্তদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া শরীর বড়ই পরিশ্রান্ত ছিল—সকাল সকাল আহার করিয়া আমরা শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি ১১ টার সময় হোটেলওয়ালা আসিয়া আমাদের জাগাইয়া দিল। তখন জিনিষপত্র বাধিয়া আমরা আগ্রাফোর্ট ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে উঠিলাম।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

শাপমুক্তি

(গল্প)

সাইমন্ ছিল জাতিতে মুচি। ছোট্ট একখানি কুঁড়ে ঘরে সে আর তার স্ত্রী থাকিত। ছেলে-পিলেও দুইটি তিনটি ছিল। সাইমন বড় গরীব; রোজগার সে যাহা করে তাহা অতি সামান্য—কোনও রকমে টায়ে টায়ে তাদের পেটের ভাতটা চলে মাত্র। পরণের কাপড়ের কথা উঠিলেই মুস্কিল। সাইমন্ প্রতিবৎসর পেটে না খাইয়া কিছু কিছু করিয়া জমায়—শীতকালে একটি গরম আংরাখা কিনিবে বলিয়া, কিন্তু সেটা কোনও বৎসর আর ঘটিয়া উঠে না। সেই শততালিযুক্ত পুরানো খল্‌খসে দুর্গন্ধ জামাটাতেই বৎসরের পর বৎসর শীত কাটাইতেছে।

এবার শীতের কিছু আগে হইতেই সে একটা গরম আংরাখা কিনিবার বন্দোবস্ত আরম্ভ করিল। যেমন করিয়া হোক্—কিনিবেই। তার নিজের কাছে কিছু জমিয়াছিল, স্ত্রীর কাছেও তিন টাকা সাত পয়সা হইয়াছিল—আর খরিদ্দারদের কাছেও কিছু সে পাইবে।

আজ সকালে সে আংরাখার জন্য কাপড় কিনিয়া আনিবে স্থির করিল। শীত বেশ পড়িয়াছিল; স্ত্রীর পরিত্যক্ত একটা ছেঁড়া জ্যাকেট, কোটের নীচে গায়ে দিয়া, একটা ডাল কাটিয়া একগাছা লাঠি তৈরি করিয়া লইয়া সাইমন্ বাহির হইল। মনে মনে

ঠিক করিল যে তার স্ত্রীর দরুণ তিন টাকা, আর তার খরিদ্দারদের কাছে যে সাড়ে-চারি টাকা পাওনা আছে, এই সাড়ে সাত টাকাতে তার খুব ভাল একটি জামা নিশ্চয়ই হইবে। যদি তারও উপর কিছু লাগে, তো নিজের জমা হইতে দিবে।

এখানে আসিয়াই সাইমন্ প্রথমে তাহার একজন খরিদ্দারের বাড়ী গেল। গৃহস্বামী বাড়ী ছিলেন না। কর্ত্রীঠাকুরাণী জানাইলেন যে তাঁর স্বামী বাড়ী আসিলেই, তিনি তাঁহাকে আগে সাইমনের টাকা শোধ করিয়া দিতে অনুরোধ করিবেন; এবং দু'এক দিনের মধ্যে যাহাতে সাইমন্ তাহার প্রাপ্য টাকা পায়, তাহার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন। মাত্র দু'দিন সবুর করিতে হইবে, দুটি দিন মাত্র।

অন্য আর এক খরিদ্দারের বাড়ী গেল। সে শপথ করিয়া বলিল যে আজ সে কপর্দ্দক-শূন্য।

পথে এক জায়গায় একটা কায মিলিল। এক-জনের জুতায় হাফ্‌সোল লাগাইয়া দিয়া সাইমন্ আটআনা পারিশ্রমিক উপার্জ্জন করিল।

খরিদ্দারের কাছে বাকী আদায় হইল না বলিয়াও সাইমন্ দমিল না। ভাবিল—"কাপড়টা না হয় ধারেই কিনে নিয়ে যাই।"

দোকানী ধার দিল না। বলিল—"ফ্যালো কড়ি মাখো তেল। ধার ধোর বুঝি না বাবা! টাকা আদায় কর্‌তে কে তোমার দোরে রোজ রোজ ধন্না দেবে? তুমি কি জান না—বিলেৎ আদায় করা কত মুস্কিল?"

সাইমন্ ফিরিল, তার কাপড় কেনা আর হইল না। একজন একজোড়া বুট জুতা দিল, মেরামত করিয়া তাহাকে পৌছাইয়া দিতে হইবে। সাইমন্ সেই বুট জুতা জোড়াটি দুলাইতে দুলাইতে বিষণ্ণ মনে বাড়ীর পথে ফিরিল।

মনটা খুবই খারাপ। পথে আসিতে আসিতে একটা মদের দোকানে ঢুকিয়া সে সকাল বেলার উপার্জ্জিত আট আনার মদ খাইয়া, বাড়ীপানে চলিল। মনটাও কতক ভাল হইল, শীতবোধও কম হইতে লাগিল। সে খোস্ মেজাজে জোরে জোরে লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে, হাতের জুতা জোড়াটি দোলাইতে দোলাইতে আপন মনে চলিল।

"বাঃ—এই কোর্ত্তাতেই তো বেশ গরম হচ্ছে! তবে আর গরম কোর্ত্তার দরকার কি? কি হবে গরম কাপড়ে?...কিসের অভাব আমার?...ভাবনাই বা কি?...আমি ত গরম জামা না কিনেও বেশ চালাতে পারি!...দুঃখ কিসের?...না, না, দুঃখ আছে বৈ কি —ঐ বৌটা। ওটা ভারি খিট্ খিট্ করে! হয় তো বাড়ী গিয়ে দেখবো! সে তোফা খেয়ে দেয়ে হেঁসেল তুলে বসে আছে। আমার জন্যে একটা দানাও ফেলে রাখেনি।"

—এমনি নানা রকম আবোল তাবোল ভাবিতে ভাবিতে সাইমন্ একবারে গির্জ্জা ঘরের কোণের কাছ দিয়া যে রাস্তাটা বাঁকিয়া গিয়াছে, সেই মোড়ের মাথায় আসিয়া হাজির।

হঠাৎ রাস্তা হইতে গির্জ্জার পিছনে তার নজর পড়িল। দেখিল একটা সাদা কি যেন বসিয়া আছে। বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল—ভাল করিয়া বোঝা গেল না, ঠিক ওটা কি!

"ওটা কি ওখানে?...সাদা পাথর তো ওখানে নেই!...তবে বুঝি গরু?......গরুই বা কি করে হবে?... মাথাটা দেখা যাচ্ছে যে ঠিক মানুষের মাথার মত!...মানুষ তবে ওখানে অমন করে বসে কি করচে?"

সাইমন্ দেখিবার জন্য গির্জ্জার ধারে সরিয়া গেল।... "ওমা, তাইত!...এ তো মানুষই বটে!...সত্যিই তো মানুষ!...মানুষটা কি মরা, না জ্যান্ত?...গির্জ্জার দেওয়ালে একবারে হেলে পড়ে'—একি?"—সাইমন্ খুব বিস্মিত হইয়া সেই মনুষ্যটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

"হয়েছে, বুঝিচি—কেউ ও লোকটাকে মেরে, সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে পালিয়েছে! বোঝা গেছে—

আর কাছে গিয়ে কায নেই! গেলেই এখুনি মহা মুস্কিল……সরে পড়াই ঠিক……আমি যেন ওসব দেখিনি! সেই ভাল।"

—ভাবিয়াই সাইমন্ মোড় ফিরিল। মোড় ফিরিয়া খানিক দূরে গিয়া একবার পিছনে ফিরিয়া চাহিল—লোকটাকে আর দেখা গেল না। না দেখিতে পাইয়া সে দ্বিগুণ কৌতূহলী হইয়া সেইদিকে চাহিয়াই রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখে যে সে লোকটা একটু সরিয়া বসিয়া, সাইমনের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে।

ভয়ে সাইমনের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। ভগবানের নাম জপিতে লাগিল। কিন্তু এখন কি করা যায়—এই তাহার প্রধান চিন্তা হইল। লোকটার কাছে যায়, না দৌড়িয়া পলায়?

ভাবিল—"যদি এখন ওর কাছে যাই, তাহলে তো দেখ্‌চি আর রক্ষা নাই! কে জানে বাবা, ও কেমন লোক! ও নিশ্চয়ই কোনও বদ্‌মাইস্, তা নৈলে ওখানে অমন করে বসে থাকবে কেন? উঁহু, ভাল বোধ হচ্ছে না। হয় তো যেমনি আমি ওর কাছে যাব, আর অমনি ও আমার টুঁটীটা চেপে ধর্‌বে। আমার টুঁ শব্দটি কর্‌বার সাধ্য থাকবে না!…আর ধর, টুঁটি না-ই ধরলো। আমি ওখানে গিয়ে কি কর্‌ব? ও ন্যাংটা! ওকে আমি কি করে এ অবস্থায় সাহায্য কর্‌তে পারি বল? ওর উপকার কর্‌তে, আমি আমার এই সবেমাত্র সম্বল পোষাকটি তো আর দান কর্‌তে পারি নে! কি হবে তখন গিয়ে?"

সাইমন্ দ্রুতপদে বাড়ী পানেই ফিরিল। কিন্তু একটু যাইতে না যাইতেই আবার থমকিয়া দাঁড়াইল। কে যেন কহিল—

"এ কি সাইমন্! এ তুমি কচ্চ কি? ওখানে একটা লোক মরে যাচ্চে, আর তুমি কেবল তোমার নিজের স্বার্থটুকুরই হিসেব কর্‌চ! তুমি কি এতই বড় লোক? তোমার কি কখনও কোনও জিনিষ ক্ষয় হবে না, লোক্‌সান্ যাবে না? ছি, সাইমন্—এ তুমি ভাল কায কর্‌চ না!"

সাইমন্ ফিরিল, একবারে সোজা গির্জ্জা ঘরের কোণে সেই লোকটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কাছে আসিয়া সাইমন্ দেখিল যে, ইহার বয়স অল্প; বেশ হৃষ্টপুষ্ট নধর কান্তি! কৈ গায়েও তো কোন রকম মা'র ধোর বা অস্ত্রঘাতের দাগ নাই! তবে দেখিয়া মনে হইল, সে যেন শীতে কাঁপিতেছে, আর খুব ভয়ও পাইয়াছে!

সে যেমন দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল, তেমনি অটল অবিচলিত হইয়া বসিয়াই রহিল। সাইমন্‌কে একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিল না। বোধ হইল—সে এত দুর্ব্বল যে চোখ মেলিয়া চাহিতেও যেন তার কষ্ট হইতেছিল।

সাইমন্ তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল। মাথা তুলিয়া চোখ খুলিয়া সে সাইমনের মুখপানে একবার চাহিল।

যেমন চারি চক্ষের মিলন—অমনি এই লোকটির জন্য সাইমনের ভিতরটা এক অপূর্ব্ব করুণায় ভরিয়া উঠিল। সাইমন থাকিতে পারিল না। হস্তস্থিত বুট-জোড়াটি, নিজের ওয়েষ্ট কোট ও একমাত্র কোটটি সেই অপরিচিতকে দিয়া বলিল—"নাও দিকিন্, এই-গুলো পরো! পরে' আমার সঙ্গে চলে এস! নাও, নাও!"

এই বলিয়া সাইমন্ তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া পায়ের উপর তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিল। সাইমন্ সেই স্বল্প অবসরে তাহার সুগঠিত দেহ, শুভ্র বর্ণ, এবং করুণ মুখখানি দেখিয়া মনে মনে খুবই পুলকিত হইল; তার বুকের মধ্যেও স্নেহের বান ডাকিয়া উঠিল। সে এত দুর্ব্বল যে জামার মধ্যে হাত ঢুকাইবার বলও ছিল তাহার না। সাইমন্ তাহাকে জামা পরাইয়া, বোতাম আঁটিয়া দিয়া, নতজানু হইয়া সেই জুতা-জোড়াটি পায়ে চড়াইয়া দিয়া, সস্নেহে বলিল—"বাস, এইবার এসো ভাই।…চল্‌তে পার্‌বে না? আচ্ছা,

আস্তে আস্তে একটু চলে' রক্তটা একবার গরম করে নাও দিকিন, তা হলেই হবেখ'ন্।"

নিজের মাথার ময়লা ছেঁড়া টুপিটাও এই লোকটির মাথায় পরাইয়া দিবার জন্য খুলিয়া ভাবিল—"না, এ ছেঁড়া টুপি আর ওরকম কালো কালো বাব্‌ড়ি চুলের ওপর চাপিয়ে কায নেই। এ আমার মাথাতেই থাক্।"

অপরিচিত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার সাইমনের পানে কাতরদৃষ্টিতে চাহিল, কিন্তু কোনও কথা বলিল না। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলে নাই।

"কি গো তুমি কি বোবা? কথা বল্‌চ না যে! তা মরুক্ গে, যা হোগগে—এখন চল বাড়ী যাই—এখানে তো এই শীতে রাত্রিবাস করা যাবে না! —তা যদি বেশী দুর্ব্বল ব'লে বোধ কর তো আমার এই লাঠি গাছটাই নাও না হয়, এতে ভর দিয়ে এস! এখানে তো আর দাঁড়ানো যায় না। চল!"

—বলিয়াই সাইমন্ পা বাড়াইল। অপরিচিতও তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

সাইমন্ জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর, তুমি আস্‌চ কোথা থেকে?"

"অনেক দূর থেকে।"

"তা তো বুঝতেই পার্‌চি! এর আশে পাশের সব গাঁয়ে আমার তো আর কেউ অচেনা নেই! তা, তুমি ও গির্জ্জাঘরের পিছনে এসে পড়্‌লে কি করে?"

"সেটা বল্‌তে পার্‌ব না।"

"কেউ কি তোমায় মেরেচে?"

"না, কেউ মারেনি। ভগবান আমায় মেরেচেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—তা তো বুঝ্‌তেই পার্‌চি। ভগবানই তো যত নষ্টের জড়! তবু কোনও একটা বিশেষ জায়গা হতে তো তুমি আস্‌চো? না, তা-ও না? আর যাবেই বা কোথা?"

"যেখানে হয়—যাবারও আমার কোনও স্থিরতা নেই।"

এ উত্তরে সাইমন্ চমকিয়া উঠিল।—ভাবিল—"জোচ্চোর বলেও তো বোধ হচ্চে না। গলার আওয়াজ যার এত মিঠে, সে কি কখনও প্রতারণা করতে পারে?···তবে এ কোন কথা খোলাশা করে বলে না কেন? এ কি অদ্ভুত জীব?"

সাইমন্ ঠিক করিল—হয় তো এর জীবনে এ সব গোপন কথা কাহাকেও বলিবার ইচ্ছে নাই।

"বেশ—তা চল এখন আমার সঙ্গে আমার বাড়ী! শীতের হাত হতে তো আগে নিস্তার পাও—তারপর সে পরের কথা পরে হবে।"—বলিয়া এই নবীন সাথীটির পাশে পাশে সাইমন্ চলিতে লাগিল।

কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস সাইমনের কামিজ ফুঁড়িয়া তাহার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত জমাইয়া দিতেছিল। সরাব যেটুকু খাইয়াছিল, তাহার নেশা এখন কাটিয়া গিয়াছে। কাজেই ঠাণ্ডাটা সাইমনের অধিকতর তীব্র বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

···"খুব কায কর্‌লাম যা হোক্! শীতের জন্যে গরম কোর্ত্তা করাতে বাড়ী হতে বের হয়ে, যা-ও একমাত্র একটা কোট সম্বল ছিল, খয়রাৎ করে, একটা উলঙ্গ রাস্তার লোক ধরে নিয়ে বাড়ী ফির্‌চি! বাহবা, বাহবা!···মাত্রিনা কিন্তু এতে নিশ্চয়ই খুসী হবে না।··· সে তো এই দেখে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌বে।"

—স্ত্রীর কথা মনে পড়াতেই সাইমন্ যেন পাঁচ হাত দমিয়া গেল। কাতর নয়নে একবার সাথীটির পানে চাহিল, আর গির্জ্জাপ্রাঙ্গণের সেই চারি চক্ষের মিলন মনে পড়িল। অমনি সাইমনের হৃৎপিণ্ড এক অপূর্ব্ব অহেতুকী পুলক-প্রীতিতে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

(২)

সাইমনের স্ত্রীর কাযকর্ম্ম সেদিন খুব সকাল সকালই সারা হইয়া গিয়াছিল। দুই বাল্‌তি জল তুলিয়া রাখিয়া, আগুন জ্বালাইবার জন্য কাঠ কিছু কাটিয়া, ছেলেপিলেগুলিকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া, মুচিনী ভাবিল—"রান্না কর্‌ব নাকি?···নাঃ, আর পারি নে

শরীরটা বড় এলে গেছে…সে নিশ্চয় খেয়েই আস্‌বে…ঐই একখান রুটি থাক্‌লো মোটে কাল সকালবেলা-কার জন্তে…এতে কাল হবে না ?…সকালবেলা কি ?…কাল সারাদিনই তো যাবে…মস্ত রুটি যে! ঘরে ময়দাও কিছু আছে, এতেই শুক্রবার পর্য্যন্ত চলে যাবে কোনও রকমে।"

এই রকম ভাবিতে ভাবিতে ঘরকন্না সারিয়া, মাত্রিনা সাইমনের একটা জীর্ণ কামিজে তালি লাগাইতে বসিয়া গেল। সেলাই করে আর ভাবে…"না জানি কেমন কাপড়ই বা সে কিনে আন্‌চে! ভগবান করুন, এখন ঠকে না এলে বাঁচি! আহা সে বড় ভালমানুষ, …একটা পাঁচ বছরের ছেলেও তাকে ঠকাতে পারে। তাকে ঠকান কি শক্ত? সাড়ে সাতটা টাকা—নিতান্ত অল্প কথা নয়, সাড়ে সাত টাকা! আহা বেচারী শীতে কি কম কষ্ট পাচ্ছে? আমার ছেঁড়া জ্যাকেটটা গায়ে দিয়ে গেছে!—এখন আমি বেরোই কি করে? বোকা, অতি বোকা—কি কচ্চে সে সারাদিন? এখনো যে ফেরে না।"

সাইমনের পদশব্দ শোনা গেল। মাত্রিনা হাতের সেলাই ফেলিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। দেখিল সাইমন্ একা আসে নাই, আর একজন কাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। তার মাথায় টুপি নাই, অথচ পায়ে ভাল একজোড়া বুট।

মাত্রিনা বুঝিল, তাহার স্বামী খুব মদ খাইয়া আসিয়াছে। অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে বলিল—"ঠিক, যা ভেবেচি!"

তারপর খানিকক্ষণ চাহিয়া যখন মাত্রিনা দেখিল যে নূতন জামা করানো তো দূরের কথা সাইমনের গায়ে তার নিজের সে কোর্ত্তাটা পর্য্যন্ত নাই, তখন তাহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিল।

—"দেখ দেখি, দেখ দেখি একবার হতভাগা মিন্সের কাণ্ড! রাস্তার লোকের সঙ্গে বসে সারাদিন মদ মেরেছে—আবার তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে এসেচে! এখনো আশা মেটে নি?"

কি করে? মাত্রিনা উভয়কেই পথ ছাড়িয়া বাড়ী ঢুকিতে ইশারা করিল, কোন কথা বলিল না। কিয়ৎ-ক্ষণ সে এই মলিন কৃশ আগন্তুকের আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল, ইহার গায়ে কামিজ পর্য্যন্ত নাই। আগন্তুক মাটীর পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্থির অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এইরূপে কিছুক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া মাত্রিনা সিদ্ধান্ত করিল—ইহারা কিছু একটা গুরুতর গোছের করিয়া আসিয়াছে তার আর ভুল নাই—তাই ভয় পাইয়াছে!

মাত্রিনা মুখ ভার করিয়া, রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে ষ্টোভের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; ভাবিল—দেখি কি করে এরা!

সাইমনের মুখটি চূণ! সে অপরাধী ছাত্রের মত গুরুমহাশয়ের সম্মুখে আসন্ন বিপদাশঙ্কায় সম্মুখের বেঞ্চি-খানায় গিয়া আস্তে আস্তে বসিয়া বলিল—"বলি, দাঁড়িয়ে দেখ্‌চ কি? দুটো খেতে টেতে দেবে? ক্ষিধেয় যে প্রাণ বেরিয়ে গেল!"

পত্নী দাঁত কড়্‌মড়্ করিতে করিতে কি বলিল, তাহা সাইমন বুঝিতে পারিল না। মাত্রিনা যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই একবার ইহার একবার উহার মুখপানে কটমট করিয়া চাহিতে লাগিল।

এ দৃষ্টির অর্থ সাইমন্ বিলক্ষণই বুঝিল। কিন্তু কি করে?—তাহার যে উভয় সঙ্কট! যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবটা দেখাইয়া, আগন্তুকের হাতটি ধরিয়া কাছপানে টানিয়া লইয়া বলিল—"বোস, ভাই বোস—দাঁড়িয়ে রইলে যে? কিছু খাও!"

আগন্তুক নীরবে সেই কাষ্ঠাসনে বসিল।

"বলি, ও—গো! আজ কি আর রান্নাবান্না কিছু হয় নি না কি?"

এইবার ঝড় উঠিল।

—"রান্না হবে না কেন? রান্না হয়েছে বৈ কি! কিন্তু সে তোমার জন্তে হয় নি। আ মর্ ডেক্‌রা!

শুধু তো মদ খেয়ে এসো নি, নিজের বুদ্ধি সুদ্ধি পর্য্যন্ত খেয়ে এসেচ! কথা শোন একবার হতভাগার! মরণ নেই? শীতের জন্যে গরম কাপড় কিনতে বেরিয়ে, যা'ও একটা পুরোণো ধুরোণো জামা ছিল সেটাও বিলিয়ে দিয়ে—রাস্তা থেকে এক ন্যাংটা মাতালকে এনে ঘর ঢুকিয়ে, কোন্ মুখে খেতে চাইচিস্? আ মরণ খালভরা! বল্‌তে লজ্জা করে না? মাতাল ফাতালদের জন্যে এখানে খাবার টাবার নেই।"

"দেখ, সাবধান হয়ে কথা বোলো, বল্‌চি। ভাল হবে না, বলে রাখ্‌চি!—জান এ লোকটি কে?"

"রেখে দিগে তোর লোকটি কে! আগে আমার টাকা কি কর্‌লি বল্!"

সাইমন্ তাহার পেণ্টুলনের পকেট হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়া ঠং ঠং ঠং করিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—"ঐ নে তোর টাকা! কাপড় কেনা হলো না! খদ্দেররা আজ কেউ টাকা দিতে পার্‌লে না!"

ইহাতেও মাত্রিনার রাগ পড়িল না। সে কেন তাহার একমাত্র পুঁজি এই জামাটি এই লোকটাকে দিল? আর পাওনা টাকা, তাই বা আদায় না হইবে কেন? পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে কি আর টাকা উশুল্ হইত না?

মাত্রিনা টাকা তিনটা কুড়াইয়া লইয়া বাক্সে রাখিতে রাখিতে রাগে গরগর করিতে করিতে বলিল—"বেশ কথা! তা খাবার টাবার এখানে কিছু নেই। তুমি যে মনে করচ যে রাস্তার মাতাল ধরে ধরে এনে বাড়ীতে পুর্‌বে, আর আমি তাদিকে রেঁধেবেড়ে খাওয়াব—সেটি হচ্চে না! লোক দেখ্‌লেই চেনা যায় কে কেমন লোক। ভাল লোকই এ যদি হবে, তা হলে কি আর এমনি ন্যাংটা হয়ে পথে পথে বেড়ায়? আমি কি আর তোমার এসব চালাকী বুঝি না মনে করচ?—কে এ?"

"সেই কথাই তো বল্‌চি! একটু স্থির না হলে কি মাথামুণ্ডু শুন্‌বে? আমি গির্জ্জে ঘরের পাশ দিয়ে আস্‌ছিলাম, দেখি যে এই লোকটি সেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে-একবারে উলঙ্গ অবস্থায়, এই দারুণ শীতে মর-মর। —আমি যদি একে না দেখ্‌তাম তো এই রাত্রেই যে মরে যেত!—ভগবান্ আমাকে এর কাছে যেতে বল্লেন! আমি গেলাম! যা' পারলাম, নিজের পোষাক খুলে একে দিলাম, দিয়ে এখন বাড়ী নিয়ে এসেচি।—নৈলে যে লোকটা বেঘোরে মরছিল।—বুঝ্‌লে? একটু ঠাণ্ডা হও, মাত্রিনা, একটু ধীর হও। চব্বিশ ঘণ্টা অমন রণচণ্ডী হয়ে, ফাল্ হয়ে থেকো না! রাগ্‌তে নেই, রাগা পাপ! আমরা সবাই একদিন মর্‌বো—এটা যেন মনে থাকে।"

মাত্রিনা কি বলিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

অপরিচিতের পানে সে আর একবার চাহিল। দেখিল সে হাঁটুর উপর হাত দুটি যোড় করিয়া, নত নয়নে ঠিক সেইভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এইবার মাত্রিনা একটু নরম হইল।

সাইমন্ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার বুক থেকে দয়া মায়া কি ভগবান্ কেড়ে নিয়েছেন, মাত্রিনা?"

মাত্রিনা কোনও উত্তর করিল না। সে একদৃষ্টে সেই নবাগত লোকটির পানেই চাহিয়া রহিল। অতিথি হঠাৎ মাথা তুলিয়া মাত্রিনার পানে চাহিল। মাত্রিনার হৃদয় স্নেহ করুণায় এবং অনুতাপে ভরিয়া উঠিল। সেখানে আর সে দাঁড়াইতে পারিল না। একটি শব্দ পর্য্যন্ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। আস্তে আস্তে মাত্রিনা গিয়া উনান জ্বালাইল এবং আহারের বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

অত্যল্পকাল মধ্যেই মাত্রিনা রন্ধনাদি করিয়া, খাবার পরিবেষণ করিয়া ডাকিল—"এস খাবে এস।"---কণ্ঠস্বর কোমল স্নেহার্দ্র এবং অনুতপ্ত।

"এস ভাই, খাই গে, এস"--বলিয়া সাইমন্ অতিথিকে লইয়া গিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

মাত্রিনা উভয়ের সম্মুখে বসিল। তাহার চক্ষু সেই

হইতে এই সুকুমার কিশোর অতিথিকে ছাড়িয়া আর কোথাও ফিরিতে চাহিতেছিল না।

মাত্রিনার সমস্ত মাতৃস্নেহ এই হতভাগ্য সুন্দর মৌন কিশোরটিকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

অতিথির চিন্তা-তমসাচ্ছন্ন বিমর্ষ মুখমণ্ডলে একটা প্রফুল্লতার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে মাথাটি তুলিয়া মাত্রিনার মুখের দিকে চাহিয়া একবার একটু হাসিল।

ভোজন শেষ হইলে, মাত্রিনা একটু পূর্ব্বে সাইমনের যে কামিজটিতে তালি লাগাইতেছিল সেইটি এবং সিন্দুক খুলিয়া একটা পুরাতন পেণ্টুলন্ আনিয়া অতিথিকে দিয়া বলিল—"এই দুটো তুমি পর। তোমার কাপড় চোপড় তো কিছুই নেই! আপাততঃ এইতেই কায চালাও।—আর রাত্রে, এই বেঞ্চিতে সুবিধা হয় এখানেই, কিম্বা যদি গরম চাও তো রান্নাঘরে, যেখানে তোমার ইচ্ছে সেইখানেই শুয়ো। কেমন? এইবার তবে আমি যাই, শুইগে?"

অতিথি সেই কামিজ গায়ে দিয়া পায়জামাটি পরিয়া সাইমনের দেওয়া কোর্ত্তাটি খুলিয়া মাটিতে রাখিয়া নীরবে সেই বেঞ্চির উপরেই শুইয়া পড়িল। মাত্রিনা কোর্ত্তাটি উঠাইয়া বাতিটি নিবাইয়া দিয়া শয়ন করিতে গেল।

মাত্রিনা সেই কোর্ত্তাটি মুড়ি দিয়া শুইল; কিন্তু ঘুম আর আসে না। কেবল বারে বারে এই নবাগতের তরুণ ঢল ঢল মুখখানিই মনে পড়ে! সে চিন্তা যদি যায় তো ভাবে, কাল সকালে আহারের কি হইবে?, যাহা ছিল সব যে খরচ হইয়া গেল। ময়দা আছে, তাই দিয়া না হয় আবার সে রুটিই তৈরি করিবে। কিন্তু এ সে কি করিল? সাইমনের বহু কষ্টের সেই তোলা পায়জামাটা আর কামিজটা—কামিজটা না হয় একটু পুরানোই হইয়াছিল—একবারে এই কোথাকার কে লোকটাকে দিয়া ফেলিল? ছি ছি ছি—এটা সে অত্যন্ত খারাপ কায করিয়াছে। এখন উপায়? মাত্রিনার অত্যন্ত কষ্টবোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সেই তরুণ ঢল ঢল করুণ মুখখানি, সেই একটু সরল হাসি, সেই একান্ত নির্ভরের স্নিগ্ধ চাহনি!—মাত্রিনার হৃদয় অনুকম্পায় আনন্দে পুলকে ভরপুর হইয়া পড়িল।

প্রাতে উঠিয়া সাইমন্ দেখিল, তাহার স্ত্রী পাড়ার কিছু ময়দা ধার করিতে বাহির হইয়াছে, ছেলেপিলে-গুলি তখনও ঘুমাইতেছে, আর সে নবাগত একাকী তেমনি বিমর্ষ মুখটি নীচু করিয়া বেঞ্চিখানির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করিতেছে। তবে মোটের উপর কালকের চেয়ে আজ যেন তার মুখমণ্ডল সামান্য একটু—অতি সামান্য—প্রসন্ন বলিয়া বোধ হইল।

সাইমন জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর—তুমি কি কায করতে পার? খেতে হবে, পরতে হবে—তার কোনও একটা উপায় করতে হবে তো?"

"আমি তো কোন কাযই করতে পারি নে।"

"অ্যাঁ:"—বলিয়া সাইমন একবারে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"সেকি? মানুষের অসাধ্য কায আছে? সে যদি মনে করে যে আমি অমুক কায করব,—তা হ'লে তাকে ঠেকায় কে?"

"বেশ, তবে আমিও করব। সবাই যখন করে, তখন আমিই বা না করব কেন?"

"বেশ! খুব ভালকথা।—আচ্ছা তোমার নামটি কি?"

"মিচেল।"

"আচ্ছা মিচেল, তুমি তোমার পরিচয় তো কিছুই আমায় দিলে না? তা যদি কোন আপত্তি থাকে, দিও না। কিন্তু তুমি আমার কথা যদি বরাবর শোন তো তোমার সমস্ত ভার আমি নিই।"

"নিশ্চয় শুনব। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন্। আমায় কি কায করতে হবে, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দাও, শিখিয়ে দাও—আমি তা করব।"

সাইমন্ খানিকটা সেলাইকরা সূতা আনিয়া মিচেলকে দিয়া, বুঝাইয়া দিল কেমন করিয়া সূতা পাক্

দিয়া কাঠিমে জড়াইতে হয়। তারপর কি করিয়া জুতার মাপ লইতে হয়, কেমন করিয়া চামড়া কাটিতে হয়, কি ভাবে ফর্ম্মা চড়াইতে হয়, সোল নির্ম্মাণের কারিগরী কোথায়, কি করিয়া তালি লাগাইতে হয়—ইত্যাদি বিষয়ে সাইমন্ মিচেলকে তালিম দিতে লাগিল।

দুইদিন পরেই সাইমন্ দেখিল যে, মিচেলকে কোন কায একবার বুঝাইয়া দিলে দ্বিতীয় বার আর সে কায দেখিতে পর্য্যন্ত হয় না। তা ছাড়া, এত শীঘ্র এবং সহজে সে কায করিতে লাগিল, যেন চিরজীবন সে কেবল এই মুচির কাযই করিয়া আসিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত কখনও সে কামাই করিত না। খাইতও খুব কম—ইহাতে সাইমন্ তাহার উপর বেশ সন্তুষ্টই হইল। যখন সে কোনও কায করিত না, তখন ঘরের কোণটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। কথা এত কম বলিত যে তাহাকে এক রকম বোবা বলিলেও ভুল হয় না। ঘরের বাহিরে বেড়াইতে যাওয়া অথবা বিনা কাযে এখানে ওখানে ঘোরার বালাইও তাহার ছিল না। কায হাতে না থাকিলে সে গম্ভীর ও বিমর্ষ হইয়া উপর পানে চাহিয়া শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। তাহাকে হাসিতে পর্য্যন্ত কখনও দেখা যায় নাই; কেবল প্রথম দিন যখন মাত্রিনা তাহাদিগকে খাওয়াইতেছিল, সেই সময় কেবল সে একবার ঈষৎ একটু হাসিয়াছিল মাত্র। তারপর তাহার মুখে আর কেহ কখনও হাসি দেখে নাই।

একবৎসর চলিয়া গেল। মিচেল সাইমনের কায করিয়া দেয়, তাহার সঙ্গে থাকে। ক্রমে দেখা গেল, এই অল্পদিনের মধ্যেই সাইমন্ একজন নামজাদা মুচি হইয়া উঠিল। তার তৈরি জুতা দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি টেঁকসই। সাইমনের যশ গ্রামের চারিদিকে প্রায় দশ বার ক্রোশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। বেশ দু'পয়সা পাইতেও লাগিল।

শীতকাল। সাইমন্ ও মিচেল উভয়েই কাযে খুব ব্যস্ত। এমন সময়ে দর্ দর্ করিয়া ভাল একখানি চক্চকে জুড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল। গাড়ী থামিবামাত্র সহিস ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া দিল।

বহুমূল্য পরিচ্ছদে আবৃত একজন ভদ্রলোক গাড়ী হইতে নামিলেন। বিনা বাক্যে তিনটি পৈঠা পার হইয়া তিনি একবারে সাইমনের বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মাত্রিনা সসম্ভ্রমে দুয়ার দুইপাট ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আগন্তুক মাথাটি নত করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সোজা হইয়া যখন তিনি দাঁড়াইলেন, মনে হইল যেন তাঁহার মাথা ঘরের ছাদ স্পর্শ করিতেছে। সেই ক্ষুদ্র কুটীরটি তাঁহার বিশালায়তন দেহখানিতে একবারে যেন ভরিয়া গেল।

সাইমন্ একবারে থতমত খাইয়া আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল। এরকম লোক সে ইতিপূর্ব্বে বড় একটা কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। সাইমন্ নিজে ছিল খুব বেঁটে কিন্তু এদিকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট! মিচেল, সেও বড় ক্ষীণ ও কৃশ। মাত্রিনা তো যেন এক আঁটি শুকনো কাঠ। সাধারণ মনুষ্য হইতে আগন্তুকের দেহায়তনের যেন কিছু বিশেষত্ব ছিল।

লোকটি খুব জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেছিলেন। সম্মুখস্থিত বেঞ্চের উপর কোটটি খুলিয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোদের দু'জনের মধ্যে কারিগর কে রে?"

সাইমন্ একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—"আজ্ঞে আমি, হুজুর।"

আগন্তুক তাঁহার ভৃত্যকে আদেশ করিলেন—"ফেড্কা, চামড়াটা নিয়ে আয়।"

ভৃত্য একটি পুলিন্দা আনিয়া পার্শ্বস্থ টেবিলে রাখিল।

"খুলে ফেল্ দিকিন্।"

"এই যে চামড়াটা দেখ্‌চিস্"—বলিয়া ভদ্রলোকটি সাইমন্‌কে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

"হুজুর—"

"আচ্ছা, বল্‌তে পারিস্ এ কেমন চাম্‌ড়া?"

সাইমন্ খুব মনোযোগ করিয়া চাম্‌ড়াটি নাড়িয়া

চাড়িয়া বলিল—"এ খুব সেরা চাম্‌ড়া, হুজুর! খুব ভাল চাম্‌ড়া!"

"কেমন, খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে তো?···সত্যি সত্যিই এ খুব ভাল চাম্‌ড়া! এমন চাম্‌ড়া হয়ত তুই জীবনে কখনো দেখিস্‌ই নি! এইটুকুর দাম পনের টাকা!"

সাইমন্‌ বিস্মিত হইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—"আমরা এমন মাল কোথায় আর দেখ্‌বো, হুজুর! আমরা গরীব—"

"হাঁ, তা' ঠিক, ঠিক। এখন এই চাম্‌ড়াতে আমার একজোড়া বুটজুতো কর্‌তে হবে, পার্‌বি?"

"কেন পার্‌ব না হুজুর? নিশ্চয় পার্‌বো।"

"নিশ্চয় পার্‌বি? তা বেশ! কিন্তু মনে থাকে যেন কি চাম্‌ড়ায়, কার জুতোর ফর্‌মাস্‌!···জুতো আমার পূরো একটি বছর যাওয়া চাই। এক বছরের মধ্যে যেন এতে কিছু কর্‌তে না হয়। বুঝ্‌লি? পূরো এক বছর যাওয়া চাই। যদি বুঝিস্‌ যে পার্‌বি, তবে নে, চাম্‌ড়া কাট্‌—নৈলে আমায় সাফ্‌ জবাব দে যে পার্‌বনা।···আমি এখন থেকেই বলে রাখ্‌চি যে, একবছরের মধ্যে আমার জুতোর যদি কোন কিছু খারাপ হয়, তো তোকে জেলে দেব। আর যদি বেশ টেঁকে, বছর বাদে আমি তোকে এর দশটাকা মজুরী দেব।"

এই লম্বা বক্তৃতা শুনিয়া সাইমন্‌ একটু দমিয়া গেল। কি যে উত্তর দিবে, ভাবিয়া পাইল না। মিচেলের পানে একবার তাকাইল, তাহাকে কনুই'য়ের এক খোঁচা দিয়া, এ ফর্‌মাস লইবে কিনা ইশারায় জিজ্ঞাসা করিল।

মিচেল ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

সাইমন্‌ আগন্তুককে জানাইল যে সে এ প্রস্তাবে রাজি। একবৎসরে তাহার তৈরি জুতার কিছুই হইবে না। দেখিতেও ঠিক নূতনের মতই থাকিবে।

অভ্যাগত তাঁহার ভৃত্যকে ডাকিয়া, পা উঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়া বলিলেন—"বেশ কথা! তবে এখন মাপ নাও!"

এত বড় পা সাইমন্‌ ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখে নাই। দুইখানি কাগজে পায়ের ভিতর ও বাহির ছকিয়া লইয়া সাইমন্‌ মাপ শেষ করিল। এই সময়টা আগন্তুক মিচেলের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সাইমনকে জিজ্ঞাসা করিল—

"ঐ যে কাষ কর্‌চে—ও কে?"

"ও আমার কর্ম্মচারী, হুজুর। আপনার জুতো ঐ-ই বানাবে।"

গ্রাহক মহাশয় মিচেলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মনে রেখ একবছরের মধ্যে আমার জুতোয় যেন হাত না লাগাতে হয়।"

সাইমন্‌ দেখিল যে মিচেল আগন্তুকের মুখপানে না চাহিয়া, তাঁহার মাথার উপর একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সেখানে বিশেষ দেখিবার মত সে যেন কিছু পাইয়াছে। কিছুক্ষণ ঐরূপে তাকাইয়া থাকিয়া মিচেল এই অপরিচিতের ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তা খুব মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে করিতে, হঠাৎ ফিক্‌ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল।

খরিদ্দার মহাশয় মুচির কর্ম্মচারীর হাসিতে বিষম চটিয়া উঠিয়া, গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"হাস্‌চিস্‌ কি দেখে রে, হতভাগা? হাসি কিসের? যে কাষ নিলি, সে কাষ কি করে তামিল কর্‌বি—তাই আগে ঠাওরা।"

মিচেল বিনয়-নম্র স্বরে উত্তর করিল—"যে সময়ে দেওয়ার কথা, ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই আপনার জুতো পেলেই ত হল মশায়? তা' পাবেন।"

আগন্তুক ওভারকোটটি গায়ে দিতে দিতে বলিলেন—"হ্যাঁ, তাই যেন মনে থাকে।"

তিনি ফিরিলেন। তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইবার সময় এবার মাথাটি নোয়াইতে ভুলিয়া গেলেন। ফলে, দুয়ারের চৌকাঠে কপালে এক বিষম ধাক্কা লাগিয়া গেল। আহত স্থানটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে, গৃহস্বামীকে গালি দিতে দিতে তিনি বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন।

যেমন তিনি চলিয়া গেলেন, সাইমন্‌ অমনি কহিল

—"বাপ্, মানুষ বটে! খুব শক্ত লোক, যা'হোক্! এখনি আমার চৌকাঠখানাই ভেঙ্গে গেছিল আর কি? ওর কপালের আর এতে কি হবে?"

মাত্রিনা কহিল—"লোকটা যেন কেমন ধরণের! সুবিধের নয়!···যেন লোহায় তৈরি···মরণও যেন ওর কাছে আস্তে ভয় করে!"

(৪)

"তার পর, হাঁ ভাই মিচেল, ফরমাস্ তো নেওয়া গেল; কোনও বিপদে টিপদে পড়্বো না তো? এই নাও চাম্ড়াটা—আর এই নাও পায়ের মাপ। ভাল করে বেশ হুঁশিয়ারির সঙ্গে কেটো ছেঁটো, ভাই। চাম্ড়াটা খুব দামী—আর ও লোকটাও তেমন ভাল নয়! এ কাযটা একটু সাবধান হয়ে কোরো। তা, তোমার নজরও ভাল, বুদ্ধি সুদ্ধিও ভাল, কায কর্ম্ম তো বেশ ভালই শিখেচ। তোমায় আর বেশী কি বল্ব? এটা এখনি আরম্ভ করে ফেল তুমি। আমি আমার হাতের কাযগুলো সেরে ফেলি।"

মিচেল কায করিতে বসিয়া গেল। চাম্ড়াটা খুলিয়া সে কাটিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মাত্রিনা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। বহুদিন হইতে কাটা ছাঁটা সেলাইয়ের কায দেখিয়া দেখিয়া সে প্রায় সমস্তই শিখিয়া ফেলিয়াছিল। যে ভাবে বুটজুতার জন্য চাম্ড়া কাটিতে হয়, সে রকম না করিয়া অন্য রকম করিয়া মিচেল চাম্ড়াটি কাটিয়া ফেলিল দেখিয়া মাত্রিনা অবাক্ হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ মিচেলকে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সাম্লাইয়া লইল। ভাবিল—"হয়ত আমিই ভুল বুঝেচি! লোকটা বোধ হয় মামুলি বুটের ফর্মাস্ দেয় নি! অন্য কোন রকমের কাট বলে দিয়ে থাক্বে!···মিচেল আমার চেয়ে ভালই বোঝে! কায কি আমার এতে কোন কথা বলে?"

মাত্রিনা কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে মিচেল সেই চাম্ড়া হইতে একজোড়া 'বাধ্া' (Sandals) তৈরি করিয়া ফেলিল।

খাইবার সময় সাইমন্ আসিয়া দেখে যে মিচেল বুট না করিয়া একজোড়া 'বাধা' তৈরি করিয়া বসিয়া আছে! সাইমনের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। দুঃখে ও ভয়ে তাহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল।···"অ্যাঁ, শেষে মিচেল—যে কখনো এতটুকু চুক্ করে নি—তার এই কায?"···আর সাইমন্ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল—"এ কর্‌লে কি, মিচেল? এখন আমি সে ভদ্রলোককে কি বলে' জবাব দিই? চাম্ড়াটাও তো গেছে একেবারে দেখছি! এখন উপায়? এ চাম্ড়া তো অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না!···এখন কি করি?·· আজ তোমার হয়েছে কি? ছি ছি ছি ছি! এইবার আমায় তুমি মজালে, দেখচি!·· তিনি বুট জুতোর ফর্‌মাস দিয়ে গেলেন, তুমি 'বাধা' তৈরি কর্‌লে কোন্ খেয়ালে?···"

দুয়ারে ঘন ঘন করশব্দ শ্রুত হইল। জানালার ফাঁক দিয়া তাহারা দেখিল একজন পাইক, তাহাদের দুয়ারের কড়ায় ঘোড়া বাঁধিতেছে।

সাইমন্ তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া দিতে গেল। পাইক হাঁফাইতে হাঁফাইতে প্রবেশ করিয়া বলিল—

"আদাব, মিস্ত্রি ভাই।"

"আদাব। কি চাই?"

"আমাদের গিন্নি-মা আমায় সেই বুটের জন্যে পাঠালেন।"

"বুট? কোন্ বুট?"

"কর্ত্তার সে বুটের আর দরকার নেই।. বুট পরা' তাঁর হয়ে গেছে।"

"কার? কি?···আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌চিনে! কি বল্‌চ স্পষ্ট করে' বল।"

"কর্ত্তা পথে গাড়ীতেই মারা গেছেন। বাড়ী পৌঁচে গাড়ীর দরজা খুলে যখন আমি দাঁড়ালাম, দেখি যে তিনি গাড়ীর ভিতর মরে' কাঠ হয়ে বসে আছেন। তখন সবাই মিলে তাঁকে ধরাধরি করে নামালাম। তাই গিন্নী-মা বলে' পাঠালেন মুচিকে গিয়ে বলগে যে বুট আর কর্‌বার দরকার নাই, সেই চাম্ড়ার একজোড়া কবরের জন্যে 'বাধা' তৈরি কর্‌তে হবে। তুমি সেখানে

বসে থেকে যত শীগ্‌গির পার 'বাধা'-জোড়াটি করিয়ে নিয়ে তবে আস্‌বে। আনা চাই-ই।"

মিচেল সদ্যপ্রস্তুত 'বাধা' জোড়াটি ও উদ্বৃত্ত চাম্‌ড়াটুকু একটি কাগজে মুড়িয়া ছোট খাট একটি পুলিন্দা বাঁধিয়া আনিয়া পাইকের হাতে দিল। পাইক পাইবামাত্রই "আদাব, ভাই, আদাব আদাব"—বলিয়া তাড়াতাড়ি তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

(৫)

মিচেল আজ ছয়বৎসর হইল সাইমনের পরিবারভুক্ত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত মিচেল কখনও ঘরের বাহিরে যায় না। খুব কম কথা বলে। যেমন দিন যাইতেছিল তেমনিই দিন কাটিতেছে। কেবল দুইবার মাত্র সাইমনেরা মিচেলকে সামান্য একটু হাসিতে দেখিয়াছে। প্রথম সেই যে দিন মাত্রিনা তাহাকে পরিবেষণ করিতেছিল, আর সেই দিন যখন ভদ্রলোকটি বুটজুতার ফর্‌মাস দিতে আসিয়াছিলেন।

ক্রমশ মিচেলের উপর সাইমনের স্নেহ ও শ্রদ্ধা বাড়িতেছিল। আজ আর সাইমন্ এ অপরিচিতের পরিচয়ের জন্য ব্যাকুল নয়। এখন তাহার সদাই আশঙ্কা, কবে এ ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

সকলে মিলিয়া একদিন সেই কুটীরে বসিয়া নিজের নিজের কায করিতেছে। ছেলেগুলি জানালার উপর চড়িয়া নামিয়া লাফালাফি করিয়া খেলা করিতেছে। মাত্রিনা ছেলেদের ময়লা কাপড়গুলি কাচিতেছে, সাইমন্ একটা জুতার সোল ঠুকিতেছে, আর মিচেল জানালার সম্মুখে বসিয়া প্রস্তুত প্রায় একজোড়া জুতার গোঁড়ালিতে মোম ঘষিতেছে। সাইমনের এক পুত্র মিচেলের কাঁধে হেলিয়া পড়িয়া কহিল—"দেখ দেখ মিচেল কাকা, কেমন ছোট দু'টি মেয়ে আস্‌চে। আহা, একটি বুঝি খোঁড়া, নয় মিচেল কাকা? এইদিকেই তো আস্‌চে? এখানেই আস্‌বে বুঝি?"

মিচেল হাতের কায নামাইয়া রাখিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিল। সাইমন্ মিচেলের এই ভাবান্তরে আজ একবারে হতভম্ব হইয়া গেল। এতদিন যে মিচেল এখানে আছে, কখনও সে একবার ভুলিয়াও কখন পথের পানে চায় নাই—আজ তাহার একি? সে যে একদৃষ্টে তাকাইয়াই রহিয়াছে! সাইমনও ব্যাপার কি জানিবার নিমিত্ত পথের দিকে চাহিল। দেখিল একজন সুবেশা মহিলা ছোট ছোট দুইটি মেয়ের হাত ধরিয়া তাহার বাড়ীর পানে আসিতেছেন। মেয়ে দু'টির প্রত্যেকেরই গায়ে একটি করিয়া গরম জ্যাকেট ও তাহার উপর একটি শালের ওড়্‌না। মেয়ে দুটি খুবই ছোট; কিন্তু দুটির চেহারায় এত মিল, যে একটি যদি খোঁড়া না হইত, তবে কোন্‌টি কে চিনিতে মহা মুস্কিল বাধিত।

মহিলাটি মেয়ে দুটিকে আগে করিয়া আস্তে আস্তে দুয়ার ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন।

"কৈ গো মিস্ত্রী কোথায়—"

"আসুন্, আসুন্, আস্‌তে আজ্ঞা হোক্। বসুন্, বসুন্। হুকুম?"

মহিলাটি বেঞ্চের উপর বসিলেন। মেয়ে দুটি ভয়ে ভয়ে তাঁহার হাঁটু দুটিতে ঠেস্ দিয়া কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"আমি এই মেয়ে দুটির জন্যে দু'জোড়া জুতো চাই।"

"তা বেশ। তবে এত-ছোট জুতো আমরা এর আগে কখনো করি নি। সেই জন্যে...মোটের উপর চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি।...হাঁ, এর ভিতরটায় কি শুধু চাম্‌ড়াই থাক্‌বে, না একটা কাপড় বসিয়ে দেব? আপনার যা পছন্দ বলুন। এই যে মিচেল্, আমার কর্ম্মচারী—এ খুব ভাল কারিগর।"

সাইমন্ পিছন ফিরিয়া দেখিল যে মিচেল সেই মেয়ে দু'টির পানে নিস্পলক নেত্রে চাহিয়া আছে। ইহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। মেয়ে দু'টি বাস্তবিক বেশ সুন্দরী। বয়স প্রায় ছয় সাত বৎসর।—কেমন টল্‌টলে গোলাপফুলের মত গাল দুটি—কেমন কালো কালো চোখ দুটি,—কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরা—যেন দুখানি ছবি! কিন্তু

মিচেল এদের পানে এমন করিয়া চাহিয়া কেন?—ওর মৎবলটা কি?—মিচেলের চাহনি ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া সাইমন্ ভাবিল, বুঝি এরা এর পরিচিত!

রমণী সেই খোঁড়া মেয়েটিকে হাঁটুর উপর তুলিলেন। মিচেল তাহাদের মাপ লইল। রমণী বলিলেন—"মাপ দুটো নিলেই হবে। তিনপাটি জুতো তো একই মাপের, আর একপাটি কেবল এর খোঁড়া পায়ের।—এরা দু'টি যমজ কিনা, পা দু'টির মাপও তাই একই।"

সাইমন্ জিজ্ঞাসা করিল,—"এ মেয়েটি খোঁড়া কি করে হল মা ঠাকরুণ? জন্ম থেকেই কি এম্‌নি?"

"না, ওটা ওর মার দোষে হয়েচে।"

মাত্রিনার কৌতূহল আর বাধা মানিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে এ দুটি কি আপনার মেয়ে নয়? আমি ভেবেছিলাম আপনিই এঁদের মা।"

"না মুচিবৌ, আমি এদের মা তো নই-ই, কোনও সম্বন্ধ পর্য্যন্ত এদের সঙ্গে আমার নেই। এরা আমার পুষ্যি মেয়ে।"

"সে কি? আপনি এদের কেউ নন্ অথচ মানুষ কর্‌চেন?"

"না করে কি করি, মা? আমি এ-দিকে মানুষ কর্‌বারই ভার নিয়েচি যে! আমারও একটি ছেলে ছিল; ভগবান্ তাকে কেড়ে নিলেন। কিন্তু তাকেও কখনও আমি এদের চেয়ে বেশী ভালবাসি নি।"

"এরা তবে কার সন্তান?"—বলিয়া মাত্রিনা সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মহিলা যাহা বলিলেন তাহা সংক্ষেপত এই :—

"আজ ছ' বছর হলো এরা বাপ মা হারিয়েচে। এক মঙ্গলবারে এদের বাপ মারা গেল, ফিরে শুক্রবারে মায়েরও পরমায়ু শেষ হল। এরা ভূমিষ্ঠ হবার পর এদের মা কয়েক ঘণ্টা মাত্র বেঁচে ছিল। আমি আর আমার স্বামী ছিলাম এদের খুব নিকট প্রতিবেশী। এদের বাপ জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে মাথায় গাছ পড়ে মরে যায়—এত সাংঘাতিক রকমে আঘাত লেগেছিল যে বাড়ী নিয়ে আসার পর খুব অল্পক্ষণই বেঁচে ছিল। এই দুর্ঘটনার দু'দিন পরেই এদের জন্ম হয়। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় প্রাণী কেউ ছিল না, কেই বা দেখে, কেই বা শোনে, কেই বা প্রসূতির সেবা শুশ্রূষা করে! তাতে আবার প্রসবের কয়েক ঘণ্টা পরেই প্রসূতিও মারা পড়ল। আমি খোঁজ নিতে গেলাম। গিয়ে দেখি যে এই মেয়েটিও মরার মত হয়ে পড়ে আছে। বৌটি এর একটা পা চেপে, মরে পড়ে আছে। কাযেই তখন একটা মহা সমস্যা উঠ্‌লো, কি করে এই নিরাশ্রয় শিশু দু'টিকে বাঁচান যায়? কে এদের ভার নেয়? গাঁয়ে সে সময় একমাত্র ছেলে-কোলে আমিই ছিলাম। আট মাস আগে আমার খোকা হয়েছিল। ঠিক হলো যে আমাকেই এ দুটির ভার নিতে হবে।

"বাড়ী নিয়ে এলাম; এ খোঁড়া মেয়েটি যে বাঁচবে এ ভরসা আমার ছিল না বলে আমি এর দিকে বড় একটা চাইতাম না। এক পাশে ফেলে রেখে দিতাম। কিন্তু শেষে ওর মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল! আমি তিনটি শিশুরই মা হলাম—আমার খোকাও তখন বেঁচে ছিল কি না। আর সে সময় আমার বয়সও কম ছিল, শরীরে সামর্থও ছিল, আর ভগবানও মুখ তুলে চাইলেন—তিনটি শিশুকেই আমি মানুষ করে তুল্‌তে লাগ্‌লাম। কিন্তু দু'বছর বয়সে ভগবান আমার খোকাকে কেড়ে নিলেন—আর আমার ছেলেপিলেও হল না। কাযেই এ-দিকে আমি পেটে না ধরলেও—তেম্‌নিই ভালবাসি। এরাই এখন আমার চোখের আলো, বুক্ জুড়োনো মাণিক!"

রমণী উঠিলেন। সাইমন্ ও মাত্রিনা উভয়েই তাঁহাকে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিয়া মিচেলের কাছে গিয়া বসিল। মিচেল তখন বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হইয়া হাত দুটী যোড় করিয়া হাঁটুর উপরে রাখিয়া, ঊর্দ্ধ মুখে ঢুলু ঢুলু নয়নে চিত্রার্পিতের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল! তাহার অধর প্রান্তে খানিকটা স্নিগ্ধ হাসি জমাট হইয়া লাগিয়াছিল।

সাইমন্ জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাই মিচেল, তুমি অমন করে বসে' আছ যে?"

মিচেল হাতের যন্ত্রপাতি নামাইয়া গায়ের জামা কাপড় খুলিয়া, আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সাইমন ও মাত্রিনাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কহিল—

"ভগবান্ আমায় ক্ষমা করেছেন; তুমিও আমায় ক্ষমা কর বন্ধু।"

মিচেলের দেহ হইতে যেন একটা জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

সাইমন তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া সসম্ভ্রমে মাথা নত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল—"মিচেল, তুমি তো ভাই আমাদের মত মানুষ নও দেখচি।—তোমার পানে আর চাইতে পার্‌চি নে। কোনও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস হচ্ছে না।—যে দিন আমি তোমায় প্রথম দেখি আর বাড়ী নিয়ে আসি, সে দিন তোমায় অমন বিমনা ও বিমর্ষ কেন দেখেছিলাম; ভাই? তারপর, যখন আমার স্ত্রী তোমায় খেতে দিলেন, তখন তোমায় যেন অনেকটা প্রসন্ন বলে বোধ হয়েছিল। তুমি সেদিন একটু হেসেওছিলে। তার পর কতদিন পরে, যখন সেই ভদ্রলোকটি জুতোর ফরমাস্ দিতে এসেছিলেন—সে দিনও তোমায় বেশ একটু খুসী খুসী দেখেছিলাম। আর আজ এই স্ত্রীলোকটি যখন মেয়ে দুটিকে নিয়ে এল—তখন আনন্দে তোমার তোমার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠেছিল।—একি! তোমার গা হতে এ সমস্ত আলো বেরুচ্চে কেন ভাই?—আর এই এত দিনের মধ্যে তোমার মুখে কেবল তিন দিনই কেন বা হাসি দেখলাম?"

সে উত্তর করিল—"আমার আনন্দ আর আজ ধর্‌ছে না গো—আমার সুখের আর সীমা নেই! ভগবান্ আমায় ক্ষমা করেচেন্। তিনটি জিনিষ শিক্ষা কর্‌বার জন্যে ভগবান্ আমায় আদেশ করেন; আজ সে আজ্ঞাপালন শেষ হল—সে তিনটি বিষয়ের শিক্ষা আজ আমার সমাপ্ত হল। সেই জন্যে আমি কেবল তিনটিবার মাত্র হেসেচি। আজ আমার শিক্ষা শেষ!"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া সাইমন বলিল—"মিচেল, তুমি কি বলচ'? ভগবান্ তোমায় ক্ষমা করেচেন! তবে কি তিনি তোমায় সাজা দিয়েছিলেন? কেন সাজা দিয়েছিলেন ভাই? আর, সে আদেশ তিনটিই বা কি? দয়া করে' আমাদিকেও বল'—আমরাও তা' শিখি!"

সে বলিল—"হাঁ, ভগবান্ আমায় শাস্তি দিয়েছিলেন; কারণ আমি তাঁর কথার অবাধ্য হয়ে, তাঁর আদেশ অমান্য করেছিলাম।—আমি একজন স্বর্গদূত ছিলাম। ভগবান্ একদিন একটি স্ত্রীলোকের আত্মা নিয়ে যেতে আমায় বলেন। পৃথিবীতে নেমে এলাম। এসে দেখি রমণীটি খুবই পীড়িত। তার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই, সে আবার দুটি যমজ কন্যা প্রসব করেছে। সদ্যঃ-প্রসূত সেই শিশু দু'টি তার কোলের কাছে পড়ে' পড়ে' কাঁদচে, অথচ তার এমন শক্তি নেই যে বুকে তুলে নিয়ে স্তন দেয়। আমায় দেখেই সে স্ত্রীলোকটির আর বুঝ্‌তে বাকী রইল না যে আমি কে, বা কেন এসেচি! আমায় করুণ স্বরে সকাতরে সে বল্লে—'দূত, ওগো ঈশ্বরের দূত,—তিন দিন হল, গাছ চাপা পড়ে আমার স্বামী মারা গেছেন।—আমার আর ভাই ভগ্নী, আত্মীয়, স্বজন—আপনার বল্‌তে একজনও পৃথিবীতে নাই।—পিতৃহীন এই দু'টি মেয়ের আমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই।—আমায় রক্ষা কর' এখন আমার আত্মা হরণ কোরো'না! আগে এ দুটি মানুষ হোক্—আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াতে শিখুক্—তারপর তুমি এসো, স্বর্গদূত!—না বাপ, না মা, এই কচি ছেলে নইলে কি করে বাঁচবে?'

"রমণীর কথায় আমার বুক ফেটে গেল। ভগবানের আদেশও ভুলে গেলাম। রোরুদ্যমানা শিশু দুটির একটিকে তার বুকে, অপরটিকে তার বাহুর উপর তুলে দিয়ে, আমি শুধু হাতে স্বর্গে ফিরে গেলাম।—ভগবৎ চরণে নিবেদন কর্‌লাম—'প্রভু, সে স্ত্রীলোকটির আত্মা আন্‌তে আমি পার্‌লাম না। তিন দিন হল তার স্বামী মারা গেছে—আপাততঃ তার দুটি যমজ কন্যা হয়েছে—তার উপরে নিজেও সে খুব রুগ্ন। সে

বড় বিব্রত। তাই সে এই শিশু ছুটিকে মানুষ কর্‌বার জন্তে আমার কাছে তার জীবন ভিক্ষা কর্‌ল।'

"ঈশ্বর বজ্র গম্ভীর স্বরে আবার সেই আদেশ দিলেন—'ফিরে যাও, এক্ষুণি আবার ফিরে যাও—সেই স্ত্রীলোকটির আত্মা নিয়ে এসে অবিলম্বে হাজির কর। এখনও তুমি বুঝতে পারনি আমার আদেশ কি!—তুমি জাননা, মানুষের মধ্যে কি আছে ; মানুষকে কি দেওয়া হয় নি ; এবং মানুষ কি করে বাঁচে!—এই তিনটি বাক্যের অর্থ তোমার শেখা প্রয়োজন। যতদিন না এ তিনটি বিষয় শিখ্‌চো, ততদিন তোমার কাছে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়ে থাকবে।"

"আবার আমি পৃথিবীতে নেমে এলাম। এবার আর কোনও কথা শুন্‌লাম না—সে রমণীর আত্মা বহন করে নিয়ে গেলাম।—তার বুক ও বাহু হতে সর্‌ সর্‌ করে শিশু ছুটি মাটিতে পড়ে' গেল। যাবার সময় স্ত্রীলোকটি বাঁ' দিকে যেমন একটু ফিরলো, অম্‌নি একটি মেয়ের কি করে পা চাপা পড়ে' গিয়েছিল।—আমার বোঝা নিয়ে আমি আকাশ পথে উঠেচি, তখনও গাঁয়ের সীমা পার হইনি, হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়ায় আমার পাখাগুটি খসে গেল, আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। রমণীর আত্মা একাই স্বর্গপুরীতে চলে গেল। মাটিতে পড়ে আমি রাস্তার ধারে বসে রইলাম।"

সাইমন্‌ ও মাত্রিনা এতক্ষণ একাগ্র বিস্ময়ে চুপ করিয়া শুনিতেছিল। এতক্ষণে বুঝিতে পারিল যে এত দিন ইহারা কাহাকে খাওয়াইয়াছে পরাইয়াছে। পুলকে বিস্ময়ে এবং ভক্তিতে তাহাদের চক্ষু ভরিয়া আসিল।

স্বর্গদূত বলিতে লাগিলেন—"রাস্তার ধারে সেই আমি একা উলঙ্গাবস্থায় বসে রইলাম।—কি করি, নিরু-পায়! মানুষের আচার ব্যবহারও তো কিছুই জানতাম না! ক্ষিদে ও শীতও আমার কাছে সেই প্রথম। কারণ আমি তখন মানুষ, পুরোপুরি মানুষ! কাযেই পেটের জ্বালায় ও শীতেই আমি সবচেয়ে বেশী কাতর হয়ে পড়্‌লাম। কি করি, মহা মুস্কিলে পড়ে গেলাম। নিকটেই একটা গির্জ্জা ঘর দেখে মনে একটু ভরসা হল যে এ ঘরটি ঈশ্বরের নামে তো পবিত্র, এখানে গেলে একটু আশ্রয় পাবই ;—ঠাণ্ডা হ'তে বাঁচ্‌ব। ও হরি, সে বাড়ীর দোরে তালা বন্ধ! ঢুকৃতে পেলাম না। কাযেই কোণ ঘেঁসে বসে কোনও রকমে শীত নিবারণ করতে লাগ্‌লাম। এমন সময় হঠাৎ মানুষের পদশব্দ পেলাম—দেখ্‌লাম একজন মানুষ একজোড়া বুট জুতো হাতে করে দোলাতে দোলাতে সেই দিকে আস্‌চে। আমি মানুষ হ'য়ে সেই প্রথম মানুষের মুখপানে চেয়ে দেখলাম। মনে আমার কেমন একটা ভয় হল! সে তুমি, সাইমন। তুমি বিড়্‌ বিড়্‌ করে' কি বক্‌ছিলে, সে ভাষা আমার বোধশক্তির সম্পূর্ণ অতীত না হলেও আমি শুন্‌তে পেলাম, তুমি বল্‌চ—'কি করে আমি আমার স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াই? এই এই দুরন্ত শীত থেকে পরিত্রাণ পাবার মত গরম কাপড় চোপড়ই বা কোথায় পাই?'

তুমি আমায় দেখ্‌তে পেলে। আমাকে দেখেই, কপাল কুঁচ্‌কে, মুখখানা বিষ করে, চলে গেলে। আমি হতাশ হ'য়ে পড়লাম। খানিক পরেই দেখি, তুমি আবার ফিরে এসেচ। আমি তোমার মুখপানে চাইলাম। দেখ্‌লাম যদিও সে মুখে মৃত্যুর ছাপ পরিস্ফুট, তবুও তাতে প্রাণের আলো কম নেই। আর সেই আলোতে ভগবানের মহিমা প্রতি-বিম্বিত হয়ে তাকে আরো শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। তুমি আমার কাছে এলে, আমায় নিজের কাপড় খুলে দিয়ে আবৃত করলে,তারপর আমার হাতটি আস্তে আস্তে ধরে' তার নিজের বাড়ীতে এনে আশ্রয় দিলে। তোমার পত্নী দো'র খুলে দিতে এল! আমাদের সঙ্গে কথাও কইলে ; তবু পুরুষ হ'তে নারীকেই আমার বেশী ভয় হতে লাগ্‌ল। পুরুষ মানুষকে যখন প্রথম দেখে-ছিলাম, তখন তাকে এত ভয়ানক মনে হয় নি।

"ক্ষিদের হিমে এবং দুর্ব্বলতায় আমি দাঁড়াতে পর্য্যন্ত

পারছিলাম না, তা দেখেও মাত্রিনা, তুমি আমায় গৃহে একটু স্থান দিতে অনিচ্ছুক হয়েছিলে।—সেই শীতের রাতে ক্ষুধিত ও হিমার্ত্ত অতিথিকে আবার নিরুদ্দিষ্ট পথে তাড়িয়ে দিতে চাইলে। বুঝ্‌লাম, আমায় তাড়িয়ে নিজের মৃত্যুকে নিজেই তুমি ডেকে আন্‌চ। এমন সময়ে তোমার স্বামী যখন তোমাকে ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, তখন তুমি ঠাণ্ডা হলে। অকস্মাৎ তোমার সব পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। তুমি আমায় খেতে দিয়ে যখন অপেক্ষা করছিলে, তখন তোমার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হল। দেখ্‌লাম যে তুমি আর সে-নারী নও! তোমার মুখে তখন ভগবানের মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব। অমনি আমার ভগবৎ-বাক্য মনে পড়্‌ল—'মানুষের মধ্যে কি আছে।' আমি আগে জান্‌তাম না, সে দিন জান্‌লাম—**মানুষের মধ্যে আছে প্রেম, দয়া ও স্নেহ।**

"অধঃপাতের প্রথমদিনেই একটা সমস্যার ভঞ্জন হলো, একটা বিষয় শিখে ফেল্‌লাম—তাই মনের আনন্দে সেই দিন একটু হেসে ফেলেছিলাম।

"আমার সব শিক্ষা একদিনে হবার নয়। তখনও দুটি কথা আমার শিখ্‌তে বাকী—মানুষকে কি দেওয়া হয় নি এবং মানুষ কি-করে বাঁচে!

"তারপর একদিন দেখি যে এক ধনী, বিষয়-মদে মত্ত, অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—একজোড়া জুতার ফরমাস্ দিতে এসেচে। সে চায় তার বুট জোড়াটি এক বছরের মধ্যে যেন আর সারাতে না-হয়—এম্‌নি মজবুত একজোড়া বুট! আমি তো তার খুব কাছেই ছিলাম—তবুও আমি তার মুখ দেখ্‌তে পেলাম না। দেখ্‌লাম তার মাথার উপরে আমার একজন স্বর্গসাথী মৃত্যুদূত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি ছাড়া তাকে আর কেউই দেখ্‌তে পায় নি, পাওয়া সম্ভবও নয়। তখনি বুঝ্‌লাম যে আজকের সূর্য্যেরও যেটুকু পরমায়ু, এ ব্যক্তির তাও নেই। ভেবে হাসি পেল যে, যার আর কয়েক ঘণ্টামাত্র জীবন, সে-ও এখনো এক বছরের জন্যে সব আয়োজন কর্‌চে! সে নিজেও জানে-না যে এখনি তার সব ফুরিয়ে যাবে, সব ফেলে যেতে হবে।

"ভগবানের দ্বিতীয় অনুজ্ঞাও বুঝ্‌তে পারলাম—'মানুষকে কি দেওয়া হয় নাই'। **মানুষকে কেবল ভবিষ্যৎটা জানতে দেওয়া হয় নি।** তাকে আশা ও মায়া দিয়ে ভুলিয়ে খুব খুসী করেই রাখা হয়েছে। কাযেই সেদিন সেই দ্বিতীয়বার একবার হেসে ফেলেছিলাম।

"তবুও আমার শিক্ষা শেষ হল না। তৃতীয় অনুজ্ঞা—'মানুষ কি করে' বাঁচে'—আমার তখনও শেখা হয় নি। দিনের পর দিন চ'লে যায়—আমি পরমপিতার শেষ আজ্ঞা পালনের প্রতীক্ষায় বসে রইলাম।

"ছয় বৎসর আমি স্বর্গভ্রষ্ট, আজ ঐ মহিলা, দুটি যমজ মেয়ে নিয়ে এলেন। আমি মেয়ে দুটিকে দেখেই চিন্‌তে পেরেছিলাম। পরে যখন শুন্‌লাম যে আজও কি করে' তারা বেঁচে আছে—তখনি আমার শেষ শিক্ষাও সমাপ্ত হল!

"যখন সেই প্রসূতি এই দুটি নিরাশ্রয় মেয়ের মুখ চেয়ে, আমার কাছে তার প্রাণ ভিক্ষা করেছিল, আমি আমার স্বর্গচ্যুতি নিশ্চয় জেনেও মুমূর্ষু মাতার সে অনুরোধ রক্ষা করতে সাহসী হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যে, সে দুটির বাঁচা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু কৈ, তাতো হয় নি! এই নারী, এদের সম্পূর্ণ অপরিচিতা ও অনাত্মীয়া, আপনার বুকের রক্ত দিয়ে এদের বাঁচিয়ে তুলেচেন্। আপনার শরীর মাটি করে' এদের শরীর গড়িয়ে দিয়েছেন! এই মহিলাটির মুখে করুণাময় ভগবানের প্রতিচ্ছবি দেখে আমি আজ বুঝ্‌তে পার্‌লাম—'মানুষ কি করে' বাঁচে!' মার্‌বার বা বাঁচাবার মালিক যে কে, তাও আমার এই সঙ্গে শেখা হয়ে গেল।

"কাযেই, আজ সম্পূর্ণ শিক্ষার প্রবল আনন্দে আমি প্রাণ ভরে হেসেচি! আজ কি আমার কম সুখ, কম সৌভাগ্য? আজ ঈশ্বর আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করেছেন, আজ আমার শিক্ষা সমাপ্ত।

বলিতে বলিতে স্বর্গদূত মর-ধরণীর জীর্ণ বাস খুলিয়া, ফেলিয়া, এক অসহ্য তীব্র জ্যোতির্ম্ময় বসনে সজ্জিত হইলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্রমশ ভাব গদগদ ও শ্লথ হইয়া আসিতেছিল। বলিলেন—"বুঝেচি, **মানুষ বাঁচে প্রেমে।** বাঁচবার জন্যে চেষ্টা করলে বাঁচা যায় না!"—আওয়াজ ক্রমশ মধুরতর হইয়া আসিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ যেন ঘরের ছাদ ফাটিয়া গেল। স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত এক অপূর্ব্ব আলোকময় পথ দৃষ্ট হইল। স্বর্গদূত, ভগবানের নাম গান করিতে করিতে সেই পথে যাত্রা করিলেন। সাইমন্ সপরিবারে মেঝের মাটিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র কক্ষ মধ্যে তখনও স্বর্গদূতের সেই অমৃতময় কণ্ঠরব প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

সাইমনের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে সে দেখিল যে, ছাদ যেমন তেমনিই অটুট রহিয়াছে। সে তাহার ছেলে পিলে লইয়া আগে যেমন ছিল, তেমনিই আছে। কেবল মিচেল নাই।*

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কবির প্রতি

বিশ্বের কাছে মুক্ত করিলে
কিসের উৎস দ্বার,
সুধাসিঞ্চিত চির বাঞ্ছিত
কোন মধু অমরার?
নন্দন হতে মন্দার হরি,
রাখিয়াছিলে কি অন্তর ভরি;
ভরা ছিল কি সে গোপন হিয়ায়
হরষের সম্ভার?

সোনার খাঁচার আড়ালে তোমার
বন্দী ছিল যে পাখী,
ছাড়া পেয়ে আজ দিগ্‌দিগন্ত
ছুটিয়া বেড়ায় নাকি?
মৌন ছিল যে কণ্ঠের বীণা,
চির বিষণ্ণ সঙ্গীতহীনা;
আজি নব নব ঝঙ্কার তার
ধরারে ফেলেছে ঢাকি।

কল্পপুরীর সিংহ-দুয়ার
দিলে কি মুক্ত করি!
অন্ধকারের ঘন আবরণ
কোথায় পড়িল ঝরি'।
ছড়ায়ে পড়িল রঙীন আলোক
মুগ্ধ করিয়া দ্যুলোক ভূলোক;
কোন্ সম্পদ এনে দিলে আজ
বিশ্ব-হৃদয় ভরি?

কোন্ সে লোকের যবনিকা খানি
মোচন করেছ কবি—
ফুটিয়া উঠিল চির আনন্দ
মোহন মধুর ছবি।
সুরলোক হতে এনেছ কি হরি,
স্পর্শমণির পরশ আহরি—
চুম্বনে যার নন্দন হ'ল
ধরার কানন-ভূমি!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ।†

* কাউণ্ট টল্‌ষ্টয়ের একটি গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে।

† বিগত জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী" ৪৭৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "শুভলগ্ন"-শীর্ষক কবিতাটিও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ-রচিত; ভুলক্রমে সে কবিতার নিম্নে ভিন্ন নাম মুদ্রিত হইয়াছে। —সম্পাদক।

ভিখারী

(গল্প)

(১)

"হ্যাঁগা ! কিছু পেলে কি ?"

আষাঢ় মাস।—সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় কলিকাতা মেছুয়াবাজারের রাস্তায় এক হাঁটু জল। সন্ধ্যা হইল, তবু বৃষ্টি থামে না। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। এই দারুণ বর্ষার দিনে একটি অর্দ্ধবয়স্কা রমণী এক একবার তাহাদের জীর্ণ খোলার ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, আবার ঘরের ভিতর যাইতেছিল।—গৃহের মধ্যে জল দাঁড়াইয়াছে, একটি জীর্ণ দড়ির খাটের উপর রমণীর রুগ্ন শিশু পড়িয়া জ্বরের ঘোরে ছট্‌ফট্ করিতেছে, আর পার্শ্বে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছে একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা। বালিকার বসন তার মায়ের মত জীর্ণ, মুখ আষাঢ়ের ঘনঘোর আকাশের ন্যায় মলিন, বিষাদাচ্ছন্ন।—অভাগিনীদের আজ সারাদিন আহার হয় নাই। তাহাও সহ্য হয়, কিন্তু ঐ যে রুগ্ন শিশুটি জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতেছে, সে আজ দুই দিন ঔষধ পায় নাই, সারাদিন কোন পথ্যও পায় নাই।—রমণীর স্বামী সকাল হইতে বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া কতবার ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকবারেই শুধু হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে, কেহ তাহাকে একটি পয়সাও ভিক্ষা দেয় নাই।

স্বামী ফিরিয়া আসিলে—রমণী আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা ! কিছু পেলে কি ?"

স্বামী মাথায় হাত দিয়া দ্বারে বসিয়া পড়িল, হতাশ কণ্ঠে বলিল, "এইবার তোমরা আপন আপন পথ দেখ। আমার আশা ছাড়। স্ত্রী পুত্রের মুখে দিনান্তে একমুঠা অন্ন দিই ভগবান আমার অদৃষ্টে তাও লেখেন নি।"

রমণীর স্বামীর নাম রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্দ্ধমান জেলায় ইহার বাড়ী।—দেশে দুই চারি বিঘা জমী ছিল, দুই চারিঘর যজমান ছিল, তাহাতেই কষ্টে স্বষ্টে তাহার সংসার চলিত।—রামদাস কিছু লেখাপড়া জানিত, প্রথম প্রথম চাকরীর জন্য অনেক চেষ্টা, অনেক উমেদারী করিয়াছিল—কিন্তু, তাহার ভাগ্যে চাকুরী জোটে নাই। রামদাস বাড়ীতে চাষবাস করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। সংসার বাড়িল, কিন্তু আয় বাড়িল না—কাজেই রামদাস ক্রমে ঋণজালে বদ্ধ হইতে লাগিল।—তাহার উপর ১৩২০ সালে দামোদরে ভীষণ বান আসিল। সেই বানে সহস্র সহস্র সংসার একেবারে নিরাশ্রয় হইল। বাসের গৃহ পড়িল, গোলার ধান ভাসিয়া গেল, মাঠের জমী দামোদর আত্মসাৎ করিল।—বানের পর রামদাস স্ত্রী ও সন্তানদের হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইল। আর মাঠে জমী নাই যে চাষ করিবে। যজমানেরাও সর্ব্বস্বান্ত, সেদিকেও আর কিছু আশা রহিল না। বাসগৃহ পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিতে টাকা চাই, সে টাকা কে দিবে ? দামোদরের বানে কত শত লোকের রামদাসের মত দশা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে।

রামদাস সহায়হীন, আশ্রয়হীন, অর্থহীন।—অথচ তাহাকে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। কন্যা বয়স্থা হইয়াছে তাহার বিবাহ না দিলে ধর্ম্ম যাইবে, জাতি যাইবে। পুত্র দুইটিকে মানুষ করিতে হইবে, সকলের উদরান্নের সংস্থান করিতে হইবে।

রামদাসের স্ত্রী বলিল—"চল, কল্‌কাতা কল্‌কাতায় গেলে আমাদের একটা উপায় হতে বানের সময় কলকাতা থেকে খাবার বয়ে এনে আমাদিকে খাইয়েছে, কলকাতার লোক না

আমরা কি এতদিন বেঁচে থাকতাম ? তারা বড় দয়ালু. চল আমরা কলকাতা যাই।"

বড় আশা করিয়া তাহারা কলিকাতায় আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের উদরান্নের সংস্থান হইল না। দেশের সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া যে কয়টি টাকা আনিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। যে খোলার ঘরে তাহারা বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তদপেক্ষা বন্যার পর তাহারা দেশে যে পর্ণকুটীর বাঁধিয়াছিল তাহা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।—বড় ছেলেটির জ্বর হইল, জ্বর বিকারে দাঁড়াইল, কিন্তু চিকিৎসা করাইবার সঙ্গতি নাই। রামদাস তাহাকে হাঁসপাতালে দিল,—হাঁসপাতালেই ছেলেটির দুঃখময় জীবনের অবসান হইল। হতভাগ্য পিতা মাতা মৃত্যুকালে তাহাকে দেখিতে পায় নাই, মুমূর্ষু পুত্রের মুখে একটুকু জল দিতে পারে নাই—তাই ছোট ছেলেটির যখন জ্বর হইল তখন তাহারা স্থির করিল যাহা হয় হইবে, ছেলেকে আর কোলছাড়া করিবে না।

কোথাও চাকরী মেলে নাই। রামদাস ভিক্ষা করিয়াই এতদিন অতি কষ্টে সংসার চালাইতেছিল এবং ছেলেটির ঔষধের মূল্য সংগ্রহ করিতেছিল। কিন্তু আর বুঝি চলে না। রামদাসের স্ত্রী বলিল, "ওষুধ নেই, দুধ নেই, ছেলে অচিকিৎসায় অনাহারে কেমন করে বাঁচবে ? হা ভগবান! শেষে একেও কি যমের হাতে তুলে দোব ?"

রামদাস উঠিল—আবার সে ভিক্ষায় যাইবে। অনাহারে, শোকে, নিরাশায় তাহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছে—তথাপি সে সাহসে ভর করিয়া আবার উঠিল। —হায় পুত্রস্নেহ! অক্ষম নিঃসম্বল দরিদ্রের বুকেও তোমার এত আধিপত্য কেন ?

(২)

হইয়াছে। ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়ি-
মদাস ভিজিতে ভিজিতে যাইয়া একটি
উপস্থিত হইল।—সেদিন মেসে খুম ধুম, বাদ্লার দিন বলিয়া ফীষ্ট হইতেছে। মাংস পোলাও প্রভৃতির লোভনীয় গন্ধ পাকশালা হইতে বাহির হইয়া সমগ্র বাড়ীটিকে আমোদিত করিতেছে। তাই, ছাত্রদের আজ অধ্যয়নে মন বসে নাই, সকলে দলে দলে এক এক ঘরে বসিয়া কোথাও বা তাস খেলিতেছে আবার কোথাও বা গল্প করিতেছে।—একটা ঘরে "ভূত আছে কি না" এই বিষয় লইয়া তর্ক হইতেছিল।—তর্কটা বেশ জমিয়াছিল, এমন সময় জীর্ণ মলিন সিক্ত বসন পরিহিত, কম্পিত-কলেবর, কঙ্কালসার রামদাস দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।—তাহার মুখে কথা নাই। পাছে সেই চিরপরিচিত নিদারুণ "না" কথা শুনিতে হয়, সেই ভয়ে সে মুখ ফুটিয়া কিছু চাহিতে পারিতেছিল না। একজন মাত্র ছাত্র রামদাসকে লক্ষ্য করিল। সে তখন তাহার সঙ্গীদিগকে বলিল—"ভূত যে আছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি এখনই দিতে পারি।"

"প্রত্যক্ষ প্রমাণ!"

"হ্যাঁ! ঐ দেখুন!"

ভূত দেখিবার আশায় সকলেই ফিরিয়া চাহিল। তখন তাহাদের মধ্যে উচ্চ হাস্যের রোল পড়িয়া গেল। রামদাস বেচারা অপ্রতিভ হইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। অপর একটা ঘরে একজন ছাত্র সিগারেট কিনিবার জন্য চাকরকে পয়সা দিতেছিল, রামদাস তাহার নিকট একটি পয়সা ভিক্ষা করিল। ছাত্রটি অম্লানবদনে বলিল, "আমার কাছে কিছু হবে না।"—কাহারও নিকট কিছু হইবে না, রামদাস! দেশ ছাড়িয়া ভিক্ষার জন্য কেন কলিকাতায় আসিয়াছ!

রামদাস ভাবিতে লাগিল সে শুধু হাতে কি করিয়া ফিরিয়া যাইবে? তাহার স্ত্রী যখন কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিবে, "হ্যাঁগা, কিছু পেলে কি?" তখন সে কি উত্তর দিবে? আর তাহার শিশুপুত্র? সে কথা ভাবিতেও তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

রামদাস ভিক্ষার নিমিত্ত আর একটি ছাত্রের কামরায় প্রবেশ করিল।—বাদলার হাওয়ায় নিদ্রার আবেশ সহজেই হয়।—ছাত্রটি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া

পড়িয়াছে।—টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে, আর আলোর নিকট—রামদাস, ওদিকে তাকাইও না। যদি ভাল চাও ত ও প্রলোভন সংবরণ কর।—তাহার আর ভাল মন্দ কি? যে আগুন অহর্নিশি তাহার বুকের ভিতর জ্বলিতেছে, তার বেশী সাজা দেওয়া মানুষের ক্ষমতার বাহিরে।

রামদাসের সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল।—তখন সে যাহা করিল, হতভাগ্য স্বপ্নেও কখনও তাহা ভাবে নাই।—টেবিলের উপর দুইটি টাকা পড়িয়া ছিল। হায়, টাকা! দরিদ্রের চখের সামনে তুমি অমন্ করিয়া "চক্ চক্" কর কেন? রামদাস একটি টাকা নিঃশব্দে হস্তগত করিল। কিন্তু, যেমন সে বাহির হইবে, অমনি দুইজন ছাত্র গলায় কাপড় দিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

ছাত্রেরা পূর্ব্বেই তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া অলক্ষে তাহার অনুসরণ করিয়াছিল।—"চোর" "চোর" শব্দ শুনিয়া মেসের সকল ছাত্রই তথায় সমবেত হইল। অজস্র কিল, ঘুঁসি, লাথি সেই শবপ্রতিম দেহের উপর পড়িতে লাগিল।—দারুণ প্রহারের যন্ত্রণায় হতভাগ্য রামদাসের শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাহার মুখে কথা নাই, চখে জল নাই—সে শূন্য নয়নে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে দুইজন পুলিশ তথায় উপস্থিত হইল। পুলিশ দেখিয়া রামদাসের চৈতন্য হইল, সে শরীরের যেন শেষ ক্ষমতাটুকুসংগ্রহ করিয়া বলিল, "ওগো আমাকে ছেড়ে দাও, তাদের যে আর কেউ নেই।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে কনেষ্টবলের দারুণ রুলের আঘাত তাহার পৃষ্ঠে পড়িল—যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে পড়িয়া গেল। তখন পুলিশ তাহাকে টানিতে টানিতে মেসের বাহির করিয়া লইয়া গেল।

ছাত্রদের বড় পরিশ্রম হইয়াছিল।—যখন সকলে আপন আপন গৃহে যাইয়া শ্রমনিবারণার্থ বরফ দিয়া লেমনেড্ পান করিতেছিল, পুলিশ তখন হতভাগ্য রামদাসকে রাস্তার উপর দিয়া টানিয়া থানায় লইয়া যাইতেছিল। রাস্তার লোক "চোর" নামক অপরূপ জীবকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতেছিল।

(৩)

যাহার টাকা চুরি করিয়া রামদাস হাজতে গেল, সেই ছাত্রটির নাম সুবোধকুমার। গোলমাল মিটিয়া গেলে সে আপনার ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"লোকটা কি সত্য সত্যই চোর? তার মুখ দেখিয়া তা ত বোধ হইল না।—চুরি করিয়া মানুষ কি অমন করিয়া উর্দ্ধদিকে চাহিতে পারে? আচ্ছা, টেবিলে দুইটা টাকা ছিল, সে একটি মাত্র লইল কেন? পুলিশ দেখিয়া লোকটা বলিয়া উঠিল—'ওগো আমায় ছেড়ে দাও, তাদের যে আর কেউ নেই।' অমন কাতর স্বর আমি আর কখনও ত শুনি নাই, অমন শূন্য দৃষ্টি আমি কখনও দেখি নাই!—তবে হইতে পারে সবই ভণ্ডামি, নির্দ্দোষিতার ভাণ মাত্র। মানুষের মনের কথা কে জানে?"

সুবোধ নিজের মনকে অনেকরকম বুঝাইতে চেষ্টা করিল, তবু মনে যে একটা খট্কা লাগিয়াছে তাহা আর কিছুতেই ঘুচে না।—সে যে বিশেষ কোন একটা অন্যায় কায করিয়াছে তাহা ত যুক্তি তর্কে স্থির হয় না। একটা চোর তাহার টাকা চুরি করিয়াছিল, পুলিশ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল,—তাহাতে সুবোধের দোষ কি? না—দোষ কিছুই নাই—তবু কেন মন মানে না?

রাত্রি যাইয়া দিন আসিল, দিন যাইয়া আবার রাত্রি আসিল—সুবোধ সকল কার্য্যের মধ্যে সেই টাকাচোরের রক্তশূন্য উদাস মুখখানা দেখিতে পাইল! নানাকার্য্যে সে সারাদিন ব্যস্ত থাকিত, কিন্তু, যখন রাত্রির সহিত অবসর আসিত তখন সেই চোরের কথা তাহার সমস্ত হৃদয়খানা ঘিরিয়া ফেলিত। সুবোধ আর গৃহমধ্যে থাকিতে পারিল না, কে যেন তাহাকে [illegible]
সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়া [illegible] লাগিল। কোথাও যাইতে হইবে বলি[illegible] চলিতে হইবে বলিয়াই যেন সে চলিতেছিল

ফুটপাথের উপর একজন বারাঙ্গনা দাঁড়াইয়াছিল। গ্যাসের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে।—রংটা ফর্সা, চেহারা এক সময় খুব সুন্দর ছিল বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু বহুদিনের অনাচার সে মুখ হইতে সকল সৌন্দর্য্য মুছিয়া দিয়াছে।—সে মুখে সুখের লেশ নাই, আশার ছায়া নাই। একজন যুবক তাহার নিকট দাঁড়াইল—রমনী কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল।—সুবোধকুমার চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল—ইহাদের জীবন কি কঠোর! স্বভাবের সুন্দর ফুল হইয়া যে একদিন ফুটিয়াছিল, সমাজের দোষে সে আজ তীব্র হলাহল।—সমাজ তাহার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সে কি আজ তাহারই প্রতিহিংসা লইতেছে?

সুবোধ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় সে সহসা শুনিল—করুণকণ্ঠে কে বলিতেছে—

"বাবু! গরীবকে একটা পয়সা দেবেন?"

সুবোধকুমার থমকিয়া দাঁড়াইল, দেখিল গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া একটি বালিকা ভিক্ষা করিতেছে।—তাহার মুখখানা দেখিয়া সুবোধের সেই টাকাচোরের মুখটা মনে পড়িল। এমন ভিখারিণী সে কখনও দেখে নাই। পরিধানে একটা ছিন্ন মলিন বসন।—কিন্তু তাহা এত ছোট যে বালিকা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার বক্ষস্থল সম্যকভাবে ঢাকিতে পারিতেছে না। সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্র্যের ছাপ মারা, কিন্তু তথাপি যেন তাহার রূপরাশি উথলিয়া পড়িতেছে। সুন্দর মুখ, চক্ষু দুটী জলে ভরা।

সুবোধকুমার দাঁড়াইতেই বালিকা লজ্জায় মুখ অবনত করিল। ভিখারিণীর এত লজ্জা! সুবোধ পকেটে হাত দিয়া দেখিল কিছুই নাই।—বাসায় যাইয়া কিছু আনিবে কি না এই কথা যখন সে ভাবিতেছিল, [illegible] য যুবক বেশ্যার সহিত কিছু পূর্ব্বে কথা [illegible] সে এই দিকে আসিতেছে।—সুবোধের [illegible]ল হইল। সে একটু দূরে যাইয়া একটা [illegible]লে দাঁড়াইল।

[illegible] নিকটে আসিবামাত্র বালিকা কাতরকণ্ঠে তাহাকে বলিল, "বাবু! গরীবকে একটা আধলা দেবেন? আমার ভাইটি না খেয়ে মর্‌চে।"

লোকটা ফিরিয়া দাঁড়াইল।—সেই অনাথা বালিকার বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর, স্ফুটনোন্মুখ যৌবন, অতুলনীয় রূপরাশি লম্পটের হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিল।—সে লোলুপ-দৃষ্টিতে বালিকার দিকে চাহিয়া রহিল।—বালিকা মুখ নামাইয়া অতি কাতরস্বরে বলিল, "বাবু! একটি আধলা দেন!"

লোকটা পকেট হইতে কি বাহির করিয়া বালিকার হস্তে দিল। গ্যাসের আলোতে তাহা চক্ চক্ করিয়া উঠিল। বালিকা বিস্ময়ের সহিত বলিল, "এ যে টাকা!"

লোকটা অঙ্গভঙ্গী করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল, "যাদু! তুমি যদি আমার কথা শোন, তবে তুমি যত টাকা চাইবে, তাই দিব।"

ভয়ে বালিকার হাত হইতে টাকাটি পড়িয়া গেল।—সে কাঁপিতেছিল।—লোকটা বালিকার হাত ধরিল, গলির ভিতর টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল—বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল।

সুবোধকুমার অন্তরালে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল। রাগে তাহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল।—সে ত্বরায় যাইয়া সেই দুর্ব্বৃত্তের পৃষ্ঠে সজোরে এক লাথি মারিল।

হঠাৎ এরূপভাবে আক্রান্ত হওয়ায় লোকটা দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। বালিকা "মাগো" বলিয়া দৌড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু, পারিল না।—তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।—সে পড়িয়া যাইবে, এমন সময় সুবোধ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।—মিষ্টস্বরে বলিল, "তোমার ভয় নেই, কোথায় তোমার বাড়ী বল, আমি তোমাকে সঙ্গে করে রেখে আসব।"

বালিকা যেন একটু সাহস পাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এই গলির মধ্যেই আমাদের বাসা।"

সুবোধ তাহাকে সঙ্গে করিয়া চলিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার অল্প বয়স, তুমি কেন একা ভিক্ষা করতে বেরিয়েছ?"

বালিকা বলিল, "বাবু! আমরা বড় গরীব!"

"তোমার কে আছে?"

"বাসায় আমার মা আছে। একটি ছোট ভাই আছে, তার বড় অসুখ। তারই জন্যে ভিক্ষা করতে এসেছিলাম। বাবা কাল সন্ধ্যার পর বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি।"

"তিনি কোথায় গিয়েছেন?"

"আমাদের জন্যে ভিক্ষা করতে গেছেন।—আহা! আমাদের জন্য বাবা কত কষ্টই না সহ্য করেছেন।"

বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল। সুবোধের মন বড় অস্থির হইল, সেই চোরটাকে মনে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা দেখতে কেমন?"

বালিকা যতদূর সাধ্য তাহার পিতার বর্ণনা করিল, শেষে উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, আপনি তাঁকে কোথাও দেখতে পেয়েছেন?"

সুবোধকুমার কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল—"না দেখেছি বলে ত মনে হয় না।"

বালিকার একটু আশা হইয়াছিল—সুবোধের এই উত্তরে সে দমিয়া গেল। বলিল, "মাও বুঝি আর বাঁচবে না।"

বালিকা একটা জীর্ণ কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইল। দ্বার খোলা ছিল উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিল।

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুবোধকুমার দেখিল, একটি রুগ্ন শিশু মলিন শয্যার উপর নিদ্রা যাইতেছে—আর একটি প্রৌঢ়া রমনী তাহার পার্শ্বে বসিয়া আকুল নয়নে শিশুটির পানে চাহিয়া আছে।

একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে কন্যার সহিত দেখিয়া রমনী বলিল, "কে তুমি?"

সুবোধের চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সে বলিল, "মা, আমি তোমার ছেলে।"

রমনী কিছু উত্তর না করিয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুবোধ বলিল, "মা আপনি স্থির হোন।—চিরদিন কখনও এম্নি যাবে না।"

এক একটি করিয়া সুবোধ তাহাদের সমস্ত ইতিহাসই শুনিল। তাহার পর সেখান হইতে বাহির হইয়া একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিয়া রুগ্ন শিশুটিকে দেখাইল—ঔষধ পথ্যের যোগাড় করিয়া দিল। কিছু ফলমূল ও লুচী সন্দেশ প্রভৃতি খাবারও বাজার হইতে সে কিনিয়া আনিয়াছিল।

মেয়েটি খাবার খাইল। মাতা কিন্তু কিছুতেই খাইতে চাহিলেন না। অনেক অনুরোধ উপরোধে শেষে দুই একটি ফলমাত্র খাইলেন। অনেক রাত্রে সুবোধকুমার মেসে ফিরিয়া আসিল।

তাহার কোনই সন্দেহ ছিল না যে সেই চোর এই বালিকার পিতা। পরদিন সুবোধ একজন উকীল নিযুক্ত করিয়া হাজতে গিয়া রামদাসের সহিত দেখা করিল। তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বুঝিল, তাহার অনুমানই ঠিক। সকল কথা শুনিয়া বাসার সকলেই বড় দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিল।

তখন মেসে এক নূতন হুজুক পড়িয়া গেল। কি করিয়া রামদাসকে বাঁচানো যায়, দিবারাত্রি এই পরামর্শ চলিতে লাগিল। ছেলেরা রামদাসের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল না বলিয়া রামদাস খালাস পাইল। যাহারা রামদাসকে পুলিশে দিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়াছিল, তাহারাই রামদাসের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। চাঁদার খাতা খোলা হইল—ছেলেরা মেসে মেসে ঘুরিয়া প্রায় ৫০৲ টাকা সংগ্রহ করিল। তাহারা স্থির করিল, কলিকাতায় রামদাস সৎপথে থাকিয়া সংসার চালাইতে পারিবে না, তাই কয়েকদিন সুচিকিৎসাতে রামদাসের ছেলে[illegible] উঠিলে সকলে তাহাকে পরামর্শ দিয়া সপরিব[illegible] পাঠাইয়া দিল।

শ্রীঅনিল

অভাগীর আশ্বিন

শরতে এই সোনার রোদে
হাসছে আকাশ, তরু, লতা ;
আমার প্রাণে আঁধার ঘন,
হৃদয় যুড়ে গভীর ব্যথা ;
বুক্‌টা যেন উঠছে কেঁপে
অমঙ্গলের দীর্ঘশ্বাসে,
আবার বুঝি হারিয়ে ফেলি
কারে এমন শুভ মাসে !

প্রবাস থেকে ফিরছে ঘরে
সবার আজি আপন জনে,
কত শিশুর আস্‌ছে পিতা,
নিচ্ছে কোলে বুকের ধনে।
দুধের বাছা খোকা আমার
দুয়ার পথে আছে চেয়ে—
এগিয়ে নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
কাহার বুকে যাবে ধেয়ে !

মনে পড়ে যখন সেদিন
বিসর্জ্জনের সেই প্রদোষে,
জন্মের শোধ মুছে এলাম
সীঁথির সিঁদুর ঘাটে বসে।
খোকা তখন পড়ে আছে
একলা শুয়ে’ রোগের ঘোরে
“বুড়ি-ঝি” তায় আগ্‌লে ছিল
বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে।

একুশ দিনে বিধির কৃপায়
ছা আমার উঠল জিয়ে,
ানিক চণ্ডীতলায়
ায়ের পূজা এলাম দিয়ে ;
জড়িয়ে ধরে গলা সেদিন
খোকা হঠাৎ জিজ্ঞাসিল—
“বাবা কই মা ? কোথায় গেল ?
—সেই যে হেথা শুয়ে ছিল ?”
অনেক কষ্টে অশ্রু বেঁধে,
বলেছিলাম আমি তারে
“ওরে আমার বোকা মাণিক,
চাকরি কর্‌তে যাবেন না রে ?
“পূজার ছুটী ফুরিয়ে ছিল,
তাইত তিনি গেলেন চলে
“লুকিয়ে সেদিন ভোরে ভোরে,
পাছে রে তুই কাঁদিস্‌ বলে।
বছর পরে আশ্বিনেতে
মায়ের যখন পূজা হবে—
আপিস থেকে ছুটি পেয়ে
বাড়ী আবার আসবেন তবে ;
রেশমী পোষাক, জরীর টুপী
নতুন জুতো দেবেন তোরে,
খোকারে তাঁর কোলে নিয়ে
চুমো খাবেন বুকে করে।”

—এত বড় মিথ্যা কথা
বলেছিলাম দীর্ঘশ্বাসে,
অবোধ সরল কচি ছেলে
আজো আছে সে বিশ্বাসে ;
এবার তারে কেমন করে
বলব আমি আপন মুখে,—
“ওরে বাছা, তার কাছে তোর
সকল দাবী গেছে চুকে !”

শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

কুকুর-ছানা

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেলা দুইটার সময়, সেণ্ট জন্‌স্ উড্ নামক লণ্ডনের একটি ছোট ষ্টেশনে শরৎকুমার রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিল। জানুয়ারি মাস, আকাশ তুষারবর্ষী ধূসর মেঘে সমাচ্ছন্ন, দিবালোক অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। গাড়ীর ভিতর, প্ল্যাটফর্ম্মে, আফিস ঘরে বিদ্যুতের আলোক জ্বলিতেছে। শুধু আজ বলিয়া নয়, প্রায় তিন সপ্তাহ একাদিক্রমে লণ্ডনে সূর্য্যদেবের দর্শন পাওয়া যায় নাই।

ফটকে টিকিট দিয়া, বারান্দায় বাহির হইয়া শরৎকুমার দেখিল, তুষারপাত হইতেছে– কে যেন আকাশমার্গ পরিপ্লাবিত করিয়া অনবরত-ধারায় শুভ্র মল্লিকারাশি বর্ষণ করিতেছে। অল্প অল্প বায়ু বহিতেছে। শরৎকুমার কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া এই তুষারপাত দেখিতে লাগিল। তুষারপাত দেখিতে সে বড় ভালবাসে। বংশাবলীক্রমে হাজার হাজার বৎসর যাহারা রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া আসিতেছে, আকাশে মেঘ উঠিতে দেখিলে তাহাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে;—তুষারপাতও তাহাদের চক্ষে পরম রমণীয় দৃশ্য।

শরৎকুমার দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক—বৎসরাবধি সে বিলাতে রহিয়াছে। গৃহ হইতে যাত্রা করিবার মাস দুই পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল—পিতা ও শ্বশুর উভয়ে মিলিয়া তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছেন। সে এখানে ব্যারিষ্টারি পড়িতেছে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্যও প্রস্তুত হইতেছে। লণ্ডনের 'মেডা ভেল্' নামক অংশে তাহার বাসা।

ষ্টেশনের নিম্নে যে রাস্তাটি, তাহা অম্‌নিবস চলাচলের পথ। শরৎ প্রায় পাঁচসাত মিনিট অপেক্ষা করিল, কিন্তু একখানিও অম্‌নিবস আসিল না। তখন সে বিরক্ত হইয়া পদব্রজেই বাসায় যাওয়া স্থির করিল। পকেট হইতে পাইপটি বাহির করিয়া তাহাতে তামাক ভরিল। দন্তে তাহা চাপিয়া ধরিয়া, মোটা ওভার-কোটের কলারটা বেশ করিয়া উঠাইয়া দিয়া তাহার বোতাম বন্ধ করিল। একটা থামের আড়ালে সরিয়া গিয়া দুই তিনটি কাঠি খরচ করিয়া পাইপ ধরাইয়া লইল। তাহার পর ছাতা মাথায় দিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

রাজপথ দিয়া যাইতে হইলে একটু ঘুর হয়, নিকটেই রীজেণ্টস্ পার্ক নামক সুবিস্তৃত সরকারী বাগান—তাহার ভিতর দিয়া যাইলে পথ একটু সংক্ষিপ্ত হয়, সেই জন্য শরৎ পার্কে প্রবেশ করিল। আকাশ যে দিন পরিষ্কার থাকে,—রৌদ্র উঠিলে ত কথাই নাই,—সেদিন এই পার্কের ভিতর শিশুরাজ্যের মেলা বসিয়া যায়। যুবতী নার্সারি গভর্ণেসগণ চটুলবেশে সজ্জিত হইয়া মুনিবের ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলিকে এখানে "হাওয়া খাওয়াইতে" লইয়া আসে। এক একখানি বেঞ্চিতে দুই তিনজন বসিয়া মনের সুখে গল্পগুজব করে, ছেলে মেয়েগুলি চারিদিকে হাস্যকলরবের সহিত ছুটাছুটি খেলা করিতে থাকে। অনেক স্ত্রীলোকও এই পার্কে বেড়াইতে আসে;—পুরুষের সংখ্যা কম।

আজ কিন্তু পার্কটি জনশূন্য। ফুলগাছগুলি নিতান্ত নির্জীব, অধিকাংশ বড় গাছগুলির পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, কেবল এখানে ওখানে দুই একটি ওক্-বৃক্ষ আছে, তাই একটু সবুজ রঙ চক্ষে পড়ে। পাখী—তাহারা শীত পড়িতেই পলাইয়া গিয়াছে।

বরফ যেমন পড়িতেছিল, তেমনি পড়িতে লাগিল। পথের উপর আধ হাত উচ্চ পেঁজাতুলার মত বর[ফ] জমিয়াছে, রক্ত কঙ্করগুলি সম্পূর্ণভাবে সমাহিত। শরৎকুমার সেই বরফ মাড়াইয়া ঘস্ ঘস্ শব্দে চলিতেছে, তাহার বুটজুতার চাপে চাপে, একটি একটি করি[য়া] ছাঁচ তৈয়ারি হইয়া যাইতেছে, আবার নূতন বরফ

পড়িয়া সে গর্ত্তগুলিকে ভরিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। বাতাসে বরফ উড়িয়া উড়িয়া তাহার ওভারকোটের গায়ে আসিয়া বসিতেছে, কিন্তু কাপড় ভিজিতেছে না। ছাতার উপর বরফ জমা হইয়া ছাতাকে ভারি করিয়া তুলিতেছে। ছাতা হইতে ওভারকোট হইতে বরফ ঝাড়িয়া ফেলিয়া শরৎ আবার অগ্রসর হইতেছে।

এই মনুষ্যহীন পশুপক্ষীবর্জ্জিত পার্কের প্রায় মাঝামাঝি আসিয়া শরৎকুমার যাহা দেখিল, তাহাতে সে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। দেখিল, পথপার্শ্বে প্রকাণ্ড একটি ওক-বৃক্ষ, তাহার নিম্নে একখানি বেঞ্চি, সেই বেঞ্চির উপর একটি শাদা-কালো রঙের কুকুর-ছানা পশ্চাতের পা দুখানির উপর উবু হইয়া বসিয়া, শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। শরৎ সেখানে দাঁড়াইল। কুকুরটি তাহাকে দেখিয়া, চারি পায়ে ভর দিয়া সেই বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া উঠিল এবং প্রাণপণে লাঙ্গুলটি আন্দোলিত করিতে লাগিল। তাহার ভাবটা যেন—"ওগো, আমার বড় বিপদ্। শীতে যে মারা যাইতে বসিয়াছি, আমায় রক্ষা কর।"

শরৎ কুকুরটির নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার মাথায় দুইটি অঙ্গুলির মৃদু আঘাত করিয়া বলিল—"Hello, whose little doggie are you ?" (তুমি কার কুকুরটি ?)

কুকুর ছানা তাহার লম্বা জলসিক্ত কাণ দুইটি পশ্চাৎভাগে গুটাইয়া ব্যাকুলনয়নে শরৎকুমারের প্রতি চাহিয়া রহিল। ভাবটা যেন—"ঈশ্বর কি আমায় কথা কহিবার ক্ষমতা দিয়াছেন যে উত্তর দিব ? যারই কুকুর হই না কেন, এখন আমার প্রাণ ত বাঁচাও!"

কুকুরটির গায়ে বড় বড় লোম। কাণ দুইটির অগ্রভাগ, চক্ষুর চারিধার, পিঠে একস্থান এবং লাঙ্গুলের মূলদেশ কালো, বাকী সমস্ত অংশ শাদা। গাছের পাতা [illegible] রিয়া ঝরিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে, [illegible] সে বরফ গলিয়াছে, জলে কুকুরটি ভিজিয়া [illegible] দাঁড়াইয়াছে। চক্ষু দুইটি লাল টক্ টক্ [illegible] বয়স চারি পাঁচমাসের অধিক হইবে না। [illegible] সুন্দর।

শরৎকুমার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—যদি কুকুরের মালিককে কোথাও দেখিতে পায়। কিন্তু পতনশীল তুষারে দৃষ্টিচক্র অবরুদ্ধ। শ্রবণচক্রের মধ্যে যদি কেহ থাকে, এই আশায় শরৎ বার দুই তিন উচ্চস্বরে হাঁকিল—"I say, whose dog is this ? Has any one lost her dog ?"

কিন্তু কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না।

পালিত কুকুরের গলায় প্রায়ই একটা করিয়া কলার থাকে, সে কলারে কুকুরের নাম ও গৃহের ঠিকানা খোদিত থাকে। শরৎ দেখিল ইহার গলায় কোন কলার নাই।

শরৎ কুকুরের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"What are you going to do, you poor devil ? Will you come home with me ?" (তুই এখন কি করবি বল দেখি, আমার সঙ্গে বাড়ী যাবি ?)

কুকুর তাহার ঠাণ্ডা কালো নাকটি শরতের হস্তে ঘষিয়া, কর্ণ চক্ষু ও লাঙ্গুলের সাহায্যে উত্তর করিল—"সেই হলেই ত ভাল হয়।"

শরৎ তখন পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বেশ করিয়া কুকুরটির গা মুছিয়া দিল। তাহার পর সেই কৃষ্ণের জীবকে তুলিয়া লইয়া, নিজ ওভারকোটের বৃহৎ পকেটের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, আবার হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

১২ নং মন্মাউথ্ রোডে শরৎকুমার বাস করিত। ল্যাণ্ডলেডির নিকট হইতে একটি বসিবার এবং একটি শয়ন করিবার ঘর সে বন্দোবস্ত লইয়াছিল।

কুকুর পকেটে করিয়া বাসার দ্বারে পৌছিয়া শরৎ দেখিল, ল্যাচ্-কী নাই। বাহির হইবার সময় তাড়াতাড়িতে চাবিটি লইয়া যাইতে ভুলিয়াছে। সুতরাং দ্বারে আঘাত করিতে হইল। অল্পক্ষণ পরে স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়বয়স্কা ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

শরৎকুমার প্রবেশ করিয়া হলে দাঁড়াইয়া টুপী খুলিতেছে, তাহার ল্যাণ্ডলেডি চীৎকার করিয়া উঠিল—

"Oh Lud Mr. Bagchi ! What's that peeping out of your pocket ?" (বাগ্‌চী মশায় আপনার পকেট থেকে উঁকি মারছে ওটা কি ?)

শরৎ বলিল—"একটা কুকুরছানা"—বলিয়া সেটিকে টানিয়া পকেট হইতে বাহির করিল।

ল্যাণ্ডলেডি শরতের হাত হইতে কুকুর লইয়া বলিতে লাগিল—"Isn't he a beauty ! Isn't he a darling ! আচ্ছা মিষ্টার বাগ্‌চী, এটি আপনি কোথায় পাইলেন ? My sweetie ! My dearie ! My popsie wopsie nopsie ! এটি আমায় দিবেন মিষ্টার বাগ্‌চী ? আহা দেখুন দেখুন, কেমন লাল লাল চোখ দুটি ! গায়ের লোমগুলি কি সুন্দর ! Oh don't, don't kiss me, you naughty naughty naughty boy !"—বলিয়া ল্যাণ্ডলেডি কুকুর-ছানাটিকে টেবিলের উপর নামাইয়া দিল ;—সে এই আদরে উৎসাহিত হইয়া তাহার কচি জিহ্বাটি বাহির করিয়া আদরকারিণীর মুখ চাটিয়া দিয়াছিল !

শরৎকুমার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। কুকুর-ছানার ইতিহাসটুকু অপ্রকাশ রাখিয়া বলিল—"ও যে ক্ষুধায় মরিতেছে। বাড়ীতে দুধ আছে ?"

ল্যাণ্ডলেডি বলিল—"আছে। আপনার ঘরে পাঠাইয়া দিব কি ?"

"তাই দাও।"—বলিয়া শরৎকুমার দ্বিতলে নিজ শয়নকক্ষে উঠিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা ৯টার সময় শরৎকুমার প্রাতরাশে বসিয়াছে। দিবালোক অত্যন্ত ক্ষীণ—বাহিরে বিষম কুয়াসা। অগ্নিকুণ্ডে দাউ দাউ করিয়া কয়লার চাঙড় জ্বলিতেছে। আগুনের দিকে পিঠ করিয়া বসিয়া কুকুর-ছানাটি শরতের চর্ব্বণরত মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। গলায় তাহার খানিকটা লাল রেশমী ফিতা বাঁধা। কলার নাই, 'হারা হারা' দেখায় বলিয়া ল্যাণ্ডলেডি গতকল্য এটি বাঁধিয়া দিয়াছিল। ইতিমধ্যে তাহার নামকরণও হইয়া গিয়াছে—শরৎকুমার তাহার নাম রাখিয়াছে "টেবি"।

মাঝে মাঝে শরৎ একটু বিস্কুট ভাঙ্গা ফেলিয়া দিতেছে, টেবি তৎক্ষণাৎ তাহা খাইয়া ফেলিতেছে। প্রাতরাশ শেষ হইলে, খানিকটা শুক্‌না টোষ্টে চায়ের বাকী গরম দুধটুকু ঢালিয়া টেবিকে দিবে এইরূপ অভিপ্রায়।

প্রাতরাশ যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া শরৎকে সুপ্রভাত অভিবাদন করিল। কুকুরটিকে কোলে উঠাইয়া লইয়া বলিল—"কাল রাত্রে এ ত আপনাকে বেশী বিরক্ত করে নাই মিষ্টার বাগ্‌চী ?"

"না, বিরক্ত করে নাই। ইহার শুইবার জন্ত তুমি যে পুরাতন কম্বল দিয়াছিলে, তাহাতে কিন্তু ও শোয় নাই। খানিক রাত্রে আমার খাটের কাছে আসিয়া কুঁই কুঁই করিতে লাগিল। আমি আবার উহাকে কম্বলে শোয়াইয়া দিলাম। খানিক পরে আবার আসিয়া কুঁই কুঁই করিতে লাগিল। তখন আমি বুঝিলাম, ছেঁড়া কম্বলে শুইয়া থাকিতে ও রাজি নয়। নিজের বিছানায় তুলিয়া লইলাম—তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে লাগিল।"

ল্যাণ্ডলেডি বলিল—"কাগজে আজ বিজ্ঞাপন দিবেন ত ?"

"হাঁ, দিতে হইবে বৈ কি ! পরের কুকুর, ক'দিন রাখিব।"

কুকুরটিকে আদর করিতে করিতে ল্যাণ্ডলেডি বলিল—"যাহার কুকুর সে যদি না আসে ত বেশ হয়। খাসা কুকুরটি, এইখানে থাকুক।"

প্রাতরাশ শেষ করিয়া, কুকুরটিকে ল্যাণ্ডলেডির জিম্মায় রাখিয়া শরৎকুমার বাহির হইল। টেম্পল যাইবার পথে একটি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র কার্য্যালয়ে গিয়া তিনদিনের জন্ত একটি বিজ্ঞাপন ছাপাইতে দিল।

পরদিন প্রাতে সেই সংবাদ পত্রে নিম্ন লিখিত ইংরাজি বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইল :—

কুড়াইয়া পাইয়াছি

একটি কুকুর। কুকুরের বর্ণ, জাতি, নাম, বয়স, সনাক্তের কোনও বিশেষ চিহ্ন, কোথায় হারাইয়াছিল – এই সমস্ত বিবরণ সহিত যাঁহার কুকুর তিনি আদেন করুন। বাক্স নং ৬০৪২, কোয়ার অব ডেলি টেলিগ্রাফ্।

তাহার পরদিন সেই সংবাদপত্রের আফিস হইতে এক বাণ্ডিল চিঠি শরৎকুমারের নিকট আসিয়া পৌছিল। লণ্ডন ও সহরতলীর দশ বারজন কুকুর-হারা রমণী ব্যাকুলতা-পূর্ণ পত্র লিখিয়াছে। কোন কোন রমণী পত্র মধ্যে ছয়পেনির টিকিট পাঠাইয়া লিখিয়াছে "এই বর্ণনার সহিত যদি মিলে তবে দয়া করিয়া পত্রপাঠ মাত্র আপনার ঠিকানা তারযোগে আমায় জানাইবেন, আমি গিয়া কুকুরটিকে লইয়া আসিব।--বড় উদ্বিগ্ন রহিলাম" —ইত্যাদি।

পত্রগুলি পড়িয়া শরৎ বুঝিল, এ কুকুর ইহাদের কাহারও নহে। যাহারা তারের মাসুল পাঠাইয়াছিল তাহাদের সেই মর্ম্মে তার করিয়া দিল— বাকী সকলকে পত্র লিখিয়া জানাইল।

পরদিন আরও কয়েকখানি পত্র আসিল। এক রমণী লিভারপুল হইতে তাঁহার হৃত কুকুরের বর্ণনাদি করিয়া লিখিয়াছেন—কুকুর হারাইবার পরদিন তিনি বাধ্য হইয়া লণ্ডন ছাড়িয়া গিয়াছেন, ফিরিতে এখনও এক সপ্তাহ বিলম্ব আছে। প্রাপ্ত কুকুরটি যদি তাঁহারই সেই কুকুর হয় তবে এ কয়দিন কুকুরটিকে ভাল করিয়া খাওয়াইবার জন্য পত্রমধ্যে পোষ্টাল নোট পাঠাইয়াছেন। কি কি খাইতে কুকুরটি ভালবাসে এবং কোন কোন দ্রব্য খাইলে তাহার অসুখ করে [illegible] একটি ফর্দ্দ দিয়াছেন। কিন্তু কোন পত্র- [illegible] কই কুকুরের ন্যায্য অধিকারিণী বলিয়া শরতের [illegible] ইল না। যিনি টাকা পাঠাইয়াছিলেন, [illegible]ার তাঁহার টাকা ফেরৎ দিল, বাকী [illegible] পত্র লিখিয়া সংবাদ দিল।

আরও দুই তিন দিন এইরূপ পত্র আসিতে লাগিল কিন্তু কুকুরের কোনও কিনারা হইল না।

ইতিমধ্যে কুকুরটির উপর শরৎকুমারের অত্যন্ত মায়া বসিয়া গিয়াছিল। আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল—"যাক্--বাঁচা গেল—কুকুরটি তা হলে আমারই হয়ে গেল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ মাস চলিয়া গিয়াছে। শীত গিয়া বসন্তকাল আসিয়াছে। এখন আর প্রতিদিন সে বৃষ্টি নাই, সে তুষারপাত নাই, সে কুয়াসা নাই। দিবাভাগে ঘরে আর আলো জ্বালিতে হয় না। গাছে গাছে নূতন পাতা গজাইতেছে, বাগানে বাগানে ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে। সূর্য্যদেব এখন আর দর্শন-দুর্ল্লভ নহেন।

কুকুরটি এ পাঁচ মাসে অল্প একটু বড় হইয়াছে—তবে জাত ছোট, বেশী বাড়িবে না। সে এখন মাংস খাইতে পায়। শিকারী হইয়াছে। রান্নাঘরে গিয়া ঘুপটি মারিয়া বসিয়া থাকে, নেংটি ইঁদুর বাহির হইলে তাহাকে ধরিতে ছোটে। মাঝে মাঝে এক একটা ধরিয়াও ফেলে। বাগানে রবিন পাখীর ঝাঁক আসিয়া বসিলে টেবি ছুটিয়া যায়। তাহারা কিঁচিমিচি করিতে করিতে ফর ফর শব্দে উড়িয়া পালায়।

সেদিন রবিবার ছিল। বেলা দুইটার সময় শরৎকুমার ডিনার শেষ করিয়া, নিজের ঘরে গিয়া বসিল। গৃহস্থ ঘরে ডিনারটা অন্যান্য দিন সন্ধ্যার পরেই খাইতে হয়, কেবল রবিবারে তাহা নহে। রবিবারের বিকাল বেলাটা দাস দাসীদের ছুটি দেওয়া হয়, তাহারা ইচ্ছামত বেড়াইয়া চেড়াইয়া আবার সেই রাত দশটার সময় গৃহে ফিরে। তাই রবিবারে সন্ধ্যায় আর উনান জ্বলে না; রাত্রে লোকে ঠাণ্ডা খাবারই খাইয়া থাকে।

বসিবার ঘরে সোফায় হেলান দিয়া পাইপ খাইতে খাইতে ঘুমে শরতের চোখ জড়াইয়া আসিতে লাগিল। টেবি চঞ্চল হইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, হঠাৎ সে জানালার উপর লাফাইয়া উঠিয়া বাহিরে একটা

কিছু দেখিয়া ভেক্ ভেক্ করিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার ডাকে শরৎকুমারের তন্দ্রাটুকু ছুটিয়া গেল। বাহির পানে চাহিয়া দেখিল, একজন কাফ্রি যাইতেছে, তাহাকে দেখিয়াই কুকুর ডাকিয়া উঠিয়াছে। বাহিরে বেশ রৌদ্র।

শরৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া রুমালে মুখ চোখ মুছিয়া বলিল—"কিরে টেবি, বেড়াতে যাবি?"—প্রথম দুই চারিদিন টেবির সহিত সে ইংরাজি কহিয়াছিল; কিন্তু যখন দুইজনে ভাব হইয়া গেল তখন শরৎকুমার বাঙ্গালা ধরিল। মনের কথা কি মাতৃভাষা ভিন্ন কহা যায়? সুতরাং টেবি এখন বেশ বাঙ্গালা বোঝে।

টেবি লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া এ প্রস্তাব সমর্থন করিল।

শরৎকুমার তখন কাবার্ড খুলিয়া তামাকের টিন বাহির করিয়া, পাউচ্‌টি ভরিয়া লইল। একটা নূতন দেশালাই লইল। অর্দ্ধপঠিত একখানা উপন্যাস বগলে করিয়া, ছড়ি লইয়া, টেবির সহিত বেড়াইতে বাহির হইল।

বাহির হইয়া শরৎকুমার রীজেন্টস্ পার্কের পথই ধরিল। প্রভুর সহিত সেই পার্কে মাঝে মাঝে টেবি বেড়াইতে গিয়াছে—সেখানে গিয়া খেলা করিতে তাহার বড়ই ভাল লাগে। সে কিছুদূর মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া, তাহার পর অগ্রবর্ত্তী হইল। কুকুরের উচিত মনিবের পিছু পিছু যাওয়া, ইহাই সুসভ্য-কুকুর-সমাজের দস্তুর বা 'এটিকেট' তাহা টেবি বিলক্ষণ জানিত, কিন্তু আনন্দের আবেগে সে আজ আর এটিকেট বজায় রাখিতে পারিল না—আগে আগেই চলিল। টেবি আগে আগে ছুটে, আর মাঝে মাঝে পিছু ফিরিয়া দেখে মনিব আসিতেছে কি না। এইরূপ কয়েক মিনিট চলিয়া উভয়ে রীজন্টস্ পার্কে উপনীত হইল।

একে রবিবার, তায় কয়েকদিন পরে আজ রৌদ্র উঠিয়াছে, পার্কে একবারে মেলা বসিয়া গিয়াছে। সুসজ্জিতবেশা বহু বালিকা কিশোরী ও যুবতীতে স্থানটি পরিপূর্ণ। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। অনেকে বেঞ্চির উপর বসিয়া জটলা করিতেছে, কেহ কেহ বহি পড়িতেছে।

মাঝে মাঝে খানিকটা স্থান ঘিরিয়া ফুলের ক্ষেত। কোথাও ফর্গেট-মি-নট্‌স্ ফুটিয়া সেখানটা একেবারে নীলে-নীল হইয়া গিয়াছে, কোথাও লালে-লাল হইয়া জিরেনিয়ম ফুটিয়া রহিয়াছে, কোথাও অজস্র সবুজ পাতার মধ্যে প্রিমরোজ বায়ুভরে মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

টেবিকে লইয়া শরৎকুমার প্রথমে খানিক চক্র দিয়া বেড়াইল। সুন্দর কুকুরটি দেখিয়া কোন কোন সাহসী বালক বালিকা তাহাকে ধরিতে আসিল, টেবি ছুটিয়া ছুটিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণের পর শরৎ সেই বেঞ্চিটার কাছে আসিয়া পৌঁছিল, যেখানে চারিমাস পূর্ব্বে টেবিকে সে পাইয়াছিল। বেঞ্চি খালি আছে দেখিয়া শরৎ সেখানে বসিল—কুকুরও লাফাইয়া উঠিয়া তাহার পাশে বসিল।

শরৎ পকেট হইতে পাইপ ও তামাক বাহির করিয়া পাইপটি সাজিল। তাহার সম্মুখে, পথ দিয়া রৌদ্রসেবন-রত কত লোক যাইতেছে আসিতেছে। পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া, আরামে ধূমপান সে করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শরৎ দেখিল একজন সুবেশা বর্ষীয়সী মহিলার সহিত, বারো তেরো বছরের একটি সুন্দর মেয়ে, মৃদু মৃদু পদক্ষেপে সে দিকে আসিতেছে। নিকটে পৌঁছিয়া, সেই মেয়েটি শরতের কুকুরের পানে একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে গেল। ইহা দেখিয়া শরৎ কিছুই আশ্চর্য্য হইল না, কারণ কুকুরটি দেখিতে ভাল বলিয়া অনেকেই, বিশেষতঃ বালিকারা, তাহার পানে চাহিয়া দেখিত।

ইহাঁরা শরৎকে ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, মেয়েটি সেই বর্ষীয়সীকে কি বলিল।
দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। কি
লাগিলেন। তাঁহারা দুইজনে, কঙ্কর
নামিয়া, ধীরে ধীরে শরতের বেঞ্চির
পৌঁছিলেন।

বৃদ্ধা শরতের পানে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিলেন—"বড় সুন্দর কুকুরটি ত!"

শরৎ তৎক্ষণাৎ টুপি খুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল—"I'm glad you think so"—(আপনি এরূপ মনে করেন শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম)

বৃদ্ধা বলিলেন—"আমরা এখানে একটু বসিতে পারি? কুকুরটিকে একটু আদর করিতে পারি?"

শরৎ বলিল—"Oh certainly. Nothing would give me greater pleasure." (নিশ্চয়। ইহার চেয়ে আর কিছুই আমাকে অধিক আনন্দ দান করিবে না)—বলিতে বলিতে শরৎ হস্তস্থিত পাইপটি উবুড় করিয়া বেঞ্চির গায়ে ঠুকিল, খানিকটা আধপোড়া তামাক ঘাসের উপর পড়িয়া ধূমত্যাগ করিতে লাগিল।

মনিবকে দাঁড়াইতে দেখিয়া কুকুরটিও বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। মহিলাটি বালিকা সহ বেঞ্চিতে বসিলেন—শরৎও বেঞ্চির প্রান্তভাগে বসিল। বৃদ্ধা কুকুরটিকে কোলে করিয়া লইলেন, মেয়েটি তাহার গায়ে নীরবে হাত বুলাইতে লাগিল।

টেবি বৃদ্ধার কোল হইতে নামিয়া মনিবের কাছে আসিবার জন্য একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রহিলেন। টেবি প্রশ্নপূর্ণ নয়নে শরতের দিকে চাহিতে লাগিল—তাহার ভাবখানা যেন—"কে এরা? আমায় এমন করছে কেন? নামতে দিচ্ছে না যে!—দেব ঘ্যাঁক্ করে এক কামড়? সেটা বোধ হয় একটু অসভ্যতা হবে—না, কি? কিছু বল না কেন?"

মেয়েটি ইতিমধ্যে কুকুরের বামকর্ণটি ধরিয়া, তাহার প্রান্তভাগের লোমগুলি সরাইয়া, বলিল—"মা, দেখ।"

[illegible] দেখিতে লাগিলেন। শরৎও দেখিল, [illegible] টি দুয়ানির পরিমাণ কাটা। লোমে [illegible] দেখা যায় না। মহিলাটি কন্যার [illegible] রে বলিলেন—"ঠিক।"

শরৎ কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল—তবে কি ইহাদেরই কুকুর না কি?

টেবিকে কোল হইতে নামাইয়া মহিলাটি অতি ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি একজন ভারতবর্ষীয় ছাত্র?"

কুকুরটি হারাইবার আশঙ্কায় শরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। সে ঢোক গিলিয়া বলিল—"আজ্ঞা হাঁ।"

"কি পড়েন আপনি?"

"আইন পড়ি।"

"কোথা? লিন্‌কন্স ইন? সেখানে আমার একটি ভাইপোও পড়ে।"

"না, আমি গ্রে'জ ইনে পড়ি।"

"বেশ বেশ। কতদিন এ দেশে আছেন?—আপনাকে এসব জিজ্ঞাসা করিতেছি বলিয়া আপনি বিরক্ত হইতেছেন না ত?"

"না না—বিরক্তির কথা কি! আমার সম্বন্ধে আপনি জিজ্ঞাসু হইয়াছেন ইহা ত আমার গৌরবের বিষয়। আমি এ দেশে আঠারো মাসের উপর আছি।"

মহিলাটি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন। শরৎ ভাবিতে লাগিল, এইবার বোধ হয় কুকুরের কথা জিজ্ঞাসা করিবে!

মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, এ কুকুরটির বয়স কত?"

"তাহা ত ঠিক জানি না। বছর খানেকের হইবে বোধ হয়।"

"কুকুরটি বেশ শান্ত! আচ্ছা, এটি কি আপনি কিনিয়াছিলেন? না, কোনও বন্ধু আপনাকে উপহার দিয়াছিলেন।"

শরৎকুমার বুঝিল, এইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে প্রলোভন হইল—মিথ্যা করিয়া বলি, কিনিয়াছিলাম। আমায় ধরে কে? কিন্তু সে প্রবৃত্তি তাহার হইল না। সে বলিল—"কুকুরটি আমি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম।"

মেয়েটি এতক্ষণ শরতের সঙ্গে কোনও কথা কহে

নাই। এবার আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল—"কোথায় পাইয়াছিলেন ?"

শরৎ গম্ভীরভাবে বলিল—"এইখানেই পাইয়াছিলাম। এই বেঞ্চির উপর, পাঁচ মাস হইল, কুকুরটি বসিয়া ছিল। তখন ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বরফ পড়িতেছে। কুকুরটি এই বেঞ্চির উপর বসিয়া ছিল, কাছে কোথাও জন-প্রাণী কেহ ছিল না। আমি কুকুরটিকে বাড়ী লইয়া গিয়াছিলাম—নহিলে এখানেই সেদিন ও মরিয়া যাইত।"

শরৎ নীরব হইল। তাহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছিল। তাহার মনে হইল সে যেন চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত—আদালতে জবাব দিতেছে। মেয়েটি ও তাহার মাতা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করিলেন।

শরৎ তখন তাড়াতাড়ি বলিল—"আমি উহাকে বাড়ী লইয়া গিয়া, আগুনের কাছে রাখিয়া, খাবার দিয়া উহার প্রাণ বাঁচাইলাম। পরদিন ডেলি টেলিগ্রাফ্ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলাম। তিন দিন উপর্য্যুপরি সে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, অনেক চিঠি পাইয়াছিলাম, কিন্তু যাঁহার কুকুর তাঁহার কোনও সন্ধান হইল না।"

শরৎকুমারের মুখ তখন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা তাঁহার মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"কুকুরের গলায় কলার ছিল না, নয় ?"

শরৎ বলিল—"না। কলারে যদি কুকুরের মালিকের নাম ঠিকানা লেখা থাকিত, তাহা হইলে কাগজে আমায় বিজ্ঞাপন দিতে হইত না।"

মেয়েটি বলিল—"কুকুর শিকলে বাঁধা ছিল। কলার একটু ঢিলা ছিল।"

শরৎ বলিল—"কুকুর কি আপনার ?"

মহিলাটি বলিলেন—"হাঁ। আমার কন্যারই এ কুকুর। শুধু চেহারা দেখিয়া আমি বলিতেছি না। যখন কুকুর হারাইয়াছিল, তাহার মাস দুই পূর্ব্বে একটা বিড়াল ইহার বাঁ কাণে কামড়াইয়া দিয়াছিল। সেখানে ঘা হয়। Vet-এর কাছে পাঠাইতে হইয়াছিল, কাণটি সে কাটিয়া দিয়াছিল। এই দেখুন না"—বলিয়া টেবির কাণটি হইতে লোম সরাইয়া সেই দুয়ানি পরিমাণ কাটাটুকু তিনি দেখাইলেন।

বৃদ্ধা বলিলেন—"কুকুর হারাইবার পর Times এ এক সপ্তাহকাল আমরা বিজ্ঞান দিয়াছিলাম কিন্তু কুকুরের কোনও সন্ধান পাই নাই। তাহার পর কুকুর পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া আমরা দক্ষিণ ফ্রান্সে চলিয়া গেলাম। এক সপ্তাহ মাত্র আমরা সেখান হইতে ফিরিয়াছি।"

শরৎ বলিল—"আমি Times দেখি নাই।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"নিশ্চয়ই আপনি দেখেন নাই। দেখিলে, তখনই আমরা কুকুরটি ফিরিয়া পাইতাম। এখন কুকুরটি কি—"

শরৎ বলিল—"নিশ্চয়। আপনাদের কুকুর—আপনারা লউন।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"কিন্তু—আপনি— কুকুরটিকে এই পাঁচমাস পুষিয়াছেন, উহার উপর নিশ্চয়ই আপনার মায়া বসিয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে, কুকুরটি আপনার নিকট হইতে লওয়া ত আমাদের উচিত হইবে না। কি বলিস ফ্লোরা ?"

ফ্লোরা কুকুরটিকে বুকে চাপিয়া, ব্যাকুল নয়নে শরতের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল—"কুকুরটি ছাড়িতে আপনার কি বড় দুঃখ হইবে মহাশয় ? তা যদি না হয় তবে আমায় দিন। ইহাকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম—এ পাঁচমাস ধরিয়া ইহার জন্য আমার মন কেমন করিয়াছে।"

বৃদ্ধা বলিবেন—"তা যথার্থ, কুকুর হারাইবার পর দুইদিন ও খায় নাই। সেই অবধি যখন তখন কুকুরটির কথাই বলে। আজ প্রাতেও—"

শরৎ বলিল—"বেশ ত, কুকুর লউন।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"কিন্তু ফ্লোরা—সেট হইবে ? এ কুকুর উনি অতদিন পুষিয় রাখুন। আমি তোকে খুব ভাল কুকুর কিনি চেয়েও খুব সুন্দর।"

ফ্লোরা চক্ষু ছল ছল করিয়া বলিল— না মা, অন্য

কুকুর আমার চাইনা। এই কুকুরই আমার সব চেয়ে ভাল। উনি ত দিতেছেন। ওঁর কিছুই দুঃখ হইবে না বলিতেছেন। নয় মহাশয়?"

শরৎ বলিল—"না, দুঃখ কিসের? তোমার কুকুর তুমি লও।"

বৃদ্ধা তখন শরৎকে মিষ্ট কথায় অনেক ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। নিজের নাম ঠিকানা-যুক্ত একখানি কার্ড বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। শরতের সঙ্গে কার্ড ছিল না—তাহার নাম ঠিকানা বৃদ্ধা লিখিয়া লইলেন। শেষে বলিলেন—"আপনি এখন কোন কাযে ব্যস্ত আছেন কি?"

"না।"

"Will you do us a very great favour?" (আপনি কি আমাদের উপর খুব একটা অনুগ্রহ করিবেন?)

"I'm at your service." (আমি আপনার আজ্ঞাবহ)

"আমাদের যদি বাড়ী পৌছাইয়া দেন, তবে বড় উপকৃত হই।"

"বেশ ত। যখন বলিবেন।"

"তবে আসুন। আমার কার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।"

ফ্লোরা কুকুরটিকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। তখন সকলে ফটকের দিকে চলিলেন।

মহিলাটিকে হাত ধরিয়া শরৎ মোটরকারে উঠাইয়া দিল। তাহার পর টেবিকে উঠাইয়া দিল, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে সে তুড়ুক করিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িল। দ্বিতীয়বার তাহাকে শরৎ ধরিবামাত্র, সে আঁচড় [illegible] করিতে লাগিল—কিছুতেই উঠিবেনা। আকুল [illegible] পানে চাহিয়া যেন বলিতে লাগিল [illegible] আমায়?"

[illegible] নাম মিসেস্ কলিন্স—বলিলেন— [illegible] আপনি উঠিয়া বসুন, কুকুর আপনি উঠিবে।"

শরৎ তখন কারে উঠিল। টেবিও তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া পা-দানে উঠিল, পা-দান হইতে ভিতরে উঠিয়া মনিবের পায়ের কাছটিতে বসিয়া রহিল।

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"পথে একস্থানে এক মিনিটের জন্য একটু কায আছে।"—বলিয়া চালককে একটা ঠিকানা বলিয়া দিলেন।

গাড়ী ছুটিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল—বাহিরে সাইন বোর্ড রহিয়াছে

Mr. GEORGE RANDALL
Veterinary Surgeon.

অর্দ্ধ মিনিট পরে র‍্যাণ্ডাল আসিয়া টুপী খুলিয়া দাঁড়াইল।

মিসেস্ কলিন্স তাহাকে বলিলেন—"মিষ্টার র‍্যাণ্ডাল, তোমার মনে পড়ে কি, একটি ছোট কুকুর তোমায় চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়াছিলাম?"

"মনে পড়ে বৈ কি।"

"কবে সে।"

"বোধ হয় নভেম্বর মাসে।"

মিসেস কলিন্স বলিলেন—"কি হইয়াছিল কুকুরটির বল দেখি?"

"কাণে ঘা হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম, বিড়ালে তাহাকে কামড়াইয়া দিয়াছিল। কাণটি খানিক আমি কাটিয়া দিয়াছিলাম।—এইটিই কি সেই কুকুর?"

"তোমার কি বিশ্বাস?"

"আমার বিশ্বাস, এইটিই। ঠিক সেই রকম দেখিতে—তবে এখন একটু বড় হইয়াছে।"

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"হাঁ মিষ্টার র‍্যাণ্ডাল, এই কুকুটিই বটে।—আচ্ছা, ধন্যবাদ। গুড্ আফ্‌টারনুন।"

র‍্যাণ্ডাল পুনর্ব্বার অভিবাদন করিল।

মিসেস্ কলিন্স চালককে হুকুম দিলেন—"বাড়ী।"

মোটর আবার ছুটিল।

শরৎ এতক্ষণ নত মস্তকে বসিয়া ছিল। এবার বলিল—"মিসেস্ কলিন্স, ইহার কিছুই প্রয়োজন ছিল

না। আপনি বলিয়াছিলেন আপনার কুকুর, ইহাই যথেষ্ট ছিল।"

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"নিশ্চয়—নিশ্চয়। তবে কি জানেন, আমরা আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেই জন্যই—"

মোটরকার বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। শরৎ দেখিল, ইহা রীজেণ্টস্ পার্কের অতি নিকট—রাস্তার এ পার ওপার।

বৃদ্ধা বলিলেন—"আজ আমরা আপনাকে বড়ই কষ্ট দিলাম, মিষ্টার বাগচী। আসুন একটু চা খাইয়া যান।"

শরৎ প্রথমে আপত্তি করিল। অবশেষে সম্মত হইয়া ইহাঁদের সহিত বাড়ীর মধ্যে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই চা আসিল। টেবি এতক্ষণ শরতের কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া ছিল। পরের বাড়ী আসিয়া নূতন লোকের মাঝে পড়িয়া সে ভারি অপ্রতিভ হইয়া রহিয়াছে। বাড়ীতে চা পানের সময় এত যে তাহার লম্ফ ঝম্ফ—এখানে তাহার কিছুই নাই।

শরৎ মাঝে মাঝে টেবির পানে চাহিতেছে আর তাহার বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিতেছে। যদি সে প্রথমাবধি জানিত পারিত যে পাঁচ মাস পরে কুকুরটিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তবে তাহার প্রতি এতখানি মায়া জন্মিতে দিত না—যাক, এখন আর গতানুশোচনা করিয়া কি হইবে?

মিসেস্ কলিন্স শরতের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চা পান শেষ হইলে কন্যাকে তিনি কক্ষান্তরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া আবার অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু ফ্লোরা কিছুতেই তাহার দাবী ছাড়িতে চাহিল না। ইতিমধ্যে চেন ও কলার কিনিবার জন্য দাসীকে সে দোকানে পাঠাইয়া দিয়াছে।

চেন ও কলার আসিবামাত্র ফ্লোরা টেবির গলা হইতে পুরাতন কলারটি খুলিয়া শরতের হাতে দিল। নূতন কলার পরিতে টেবি খুব আপত্তি করিতে লাগিল, কিন্তু ছোট কুকুর, অত বড় মেয়ের সঙ্গে সে জোরে পারিবে কেন? ফ্লোরা তাহার গলায় নূতন চেন ও কলার দিয়া, সোফার পায়ায় তাহাকে বাঁধিল।

শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"মিসেস্ কলিন্স, এখন তবে বিদায় লই।"

মিসেস্ কলিন্স বলিলে—"এখনি যাইবেন?

টেবির দিকে শরৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ফ্লোরা আসিয়া তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিল—"আপনার দয়া কখনও আমি ভুলিব না। কুকুরটি লইলাম বলিয়া আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, মিষ্টার বাগচী।"

শরৎ বলিল—"অপরাধ কিসের?"—তাহার ইচ্ছা হইল, কুকুরকে যত্নে রাখিবার জন্য ফ্লোরাকে একটু অনুরোধ জানায়, কিন্তু তাহার বুকটা কেমন করিতে লাগিল, মুখ দিয়া কথা বাহির করিতে পারিল না।

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"গুড্‌বাই মিষ্টার বাগচী। আপনার সৌজন্যে আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইলাম। আপনাকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আমার কার অপেক্ষা করিয়া আছে।"

শরৎ বলিল—"ধন্যবাদ। কারে প্রয়োজন নাই, আমি হাঁটিয়াই বাড়ী যাইব। এই কাছেই ত। গুড্‌বাই।"

শরৎ কক্ষের বাহির হইবামাত্র টেবি ঝড়াং ঝড়াং করিয়া চেনে হ্যাঁচকা টান দিতে দিতে উচ্চ চীৎকার আরম্ভ করিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে শরতের পা কাঁপিতে লাগিল। সিঁড়ির 'ব্যানিষ্টার' ধরিয়া কোনও মতে সে নামিতে লাগিল। টেবির ব্যাকুল চীৎকার তাহার কর্ণে যেন গলিত লৌহের মত প্রবেশ করিতেছিল। ত্রিতল হইতে দ্বিতলে, দ্বিতল হইতে একতলে নামিয়া, টুপি ও ছড়ি লইবার জন্য শরৎ হলে গিয়া দাঁ টেবির স্বর তখনও তাহার কাণে আসিতেছে।

গৃহভৃত্য টুপী ও ছড়িটি তাহার হাতে দ্বার খুলিয়া, তাহাকে অভিবাদন করিল। পৌঁছিয়া, দ্রুতবেগে শরৎ বাসার দিকে চলিতে করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাসায় পৌছিয়া, ল্যাচ্-কী দিয়া দরজা খুলিয়া, টুপী ছড়ি হলে ছাড়িয়া শরৎকুমার একবারে দ্বিতলে নিজ শয়ন-কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। দর্পণে হঠাৎ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবিল, "কারু সঙ্গে যে দেখা হয়নি সে ভালই হয়েছে।"—তাহার চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, ছলছল করিতেছে, ওষ্ঠযুগল কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কোট এবং কামিজের কলার খুলিয়া ফেলিয়া, একটা আরাম চৌকিতে শরৎ এলাইয়া পড়িল। তাহাদের বাড়ী সিঁড়ি নামিবার সময় হলে দাঁড়াইয়া টেবির যে হৃদয়বিদারক ক্রন্দন সে শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহাই অবিশ্রান্তভাবে ভাবে তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। খানিকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া শরৎকুমার চেয়ারে পড়িয়া রহিল। কল্পনায় দেখিতে পাইল, তাহাদের বাড়ীতে টেবি বাঁধা রহিয়াছে, বসিয়া হো হো হো করিয়া ক্রমাগত কাঁদিতেছে, কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে শরতের চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তাড়াতাড়ি শরৎ রুমাল বাহির করিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল—আমি এ কি করিতেছি!—কাঁদিতেছি!—পুরুষ মানুষ হইয়া, দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের মত কাঁদিতেছি!—ছি ছি।—

শরৎ তখন ঝাড়া দিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল। পকেট হইতে পাইপ ও তামাক বাহির করিয়া, জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সাজিতে লাগিল। যেন কিছুই হয় নাই, এই ভাবটা মনের ভিতর আঁকড়িয়া ধরিয়া গুণ্ গুণ্ করিয়া একটা ইংরাজি হাসির গান গাহিতে গাহিতে তালে তালে কার্পেটের উপর পা ঠুকিতে লাগিল।

...জ্জা হইলে, দেশলাইয়ের জন্য কোটের পকেটে ... টেবির কলারটি হাতে ঠেকিল। সেটি ... ম্যাণ্ট্ল্ সেল্ফের উপর রাখিতে রাখিতে ...র চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। সাজা পাইপটি ...ঝর উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, চেয়ারে বসিয়া পড়িল দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল।

* * * *

রাত্রি সাড়ে সাতটার সময়, ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া শরতের শয়ন-কক্ষের দ্বারে আঘাত করিয়া বলিল—"মহাশয়, আপনার খাবার লইয়া আসিব কি?"

শরৎ পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বাসায় আজ খাইবে না;—পরিবেষণ করিবার সময় ল্যাণ্ডলেডি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিবে টেবি কোথায় গেল, কি হইল, ইত্যাদি। সে সময় যদি নিজেকে সামলাইতে না পারে?—ল্যাণ্ডলেডির সাক্ষাতে—সে বড় লজ্জা। কাল তখন যাহা হয় হইবে। তাই শরৎ উত্তর করিল—"না মিসেস্ জোন্স—আমি এখনই বাহিরে যাইতেছি, বাড়ীতে খাইব না।"

ল্যাণ্ডলেডি মনে করিল, বোধ হয় বাহিরে কোথাও নিমন্ত্রণ আছে। খাবারটা বাঁচিয়া গেল—সে খুসীই হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"টেবির জন্য কিছু খাবার রাখিব কি?"

"না, প্রয়োজন হইবে না।"

ল্যাণ্ডলেডি মনে করিল, টেবিও তবে মনিবের সঙ্গে যাইবে, সেইখানে খাইয়া আসিবে। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার ফিরিতে কত রাত্রি হইবে মহাশয়?"

"এগারোটা।"

"আচ্ছা, তবে দরজায় তালাবন্ধ করিব না। হলে মোমবাতি জ্বালিয়া রাখিব।"

"ধন্যবাদ, মিসেস্ জোন্স।"

মুখ হাত ধুইয়া শরৎকুমার বাহির হইল। ভাবিল, যাই, হাইড্পার্কে গিয়া বসিয়া থাকি। সেইদিকের একখানা অমনিবস্ যাইতেছিল, শরৎ লাফাইয়া তাহাতেই আরোহণ করিল। রীজেণ্টস্ পার্কের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার কি মনে হইল, অম্নিবস্ হইতে সে নামিয়া পড়িল। মিসেস কলিন্সের বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল।

সে বাড়ীর সম্মুখে পৌছিয়া রাস্তার অপর পার হইতে ত্রিতলে যে ঘরটিতে সে বসিয়া চা পান করিয়াছিল, সেই ঘরটির পানে চাহিয়া রহিল। খোলা জানালা দিয়া আলোক বাহির হইতেছে, কে পিয়ানো বাজাইতেছে, সে শব্দ আসিতেছে। টেবির কান্নার শব্দ আসিতেছে না।

শরৎ ভাবিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া এতক্ষণে বোধ হয় চুপ করিয়াছে। চিরদিন কি কেহ আর কাঁদে? মানুষই কাঁদে না, তা কুকুর!

শরৎ ধীরে ধীরে গৃহদ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। দ্বারলগ্ন বিদ্যুতের বোতামটি টিপিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একজন দাসী বাহির হইয়া আসিল।

শরৎ জিজ্ঞাসা করিল—"এ বাড়ীতে একটি নূতন কুকুর আজ আসিয়াছে, জান ত?"

দাসী বলিল—"জানি।"

"সেটি—পূর্ব্বে—আমার কাছেই ছিল। আমিই বিকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম—"

দাসী বাধা দিয়া বলিল—"জানি মহাশয়! আপনাকে দেখিয়াছি। আমিই চা আনিয়াছিলাম।"

"ওঃ—তুমি? আচ্ছা, দেখ—আমি চলিয়া যাইবার সময় কুকুরটি বড়ই কাঁদিতে লাগিল। এখন আর কাঁদিতেছে না ত?"

"না, এখন আর কাঁদিতেছে না। আপনি চলিয়া যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কাঁদিয়াছিল। মিস্ ফ্লোরা তাহাকে কত আদর করিতে লাগিলেন, কেক্, বিস্কুট এ সব খাইতে দিলেন, কিছুই সে খাইল না। খানিক পরে চুপ করিল বটে—কিন্তু মাঝে মাঝে এখনও এক একবার হো হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।"

কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া শরৎ জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কিছু খাইয়াছে কি?"

"তাহা ত আমি জানি না মহাশয়। তবে মিস্ ফ্লোরা রান্নাঘরে আসিয়া খানিকটা কোল্ড ফাউল আর খানিকটা রাইস্ পুডিং এই কতক্ষণ হইল লইয়া গিয়াছেন।—আপনি কি ভিতরে আসিবেন? গৃহিণী ঠাকুরাণীকে সংবাদ দিব?"

শরৎ তাড়াতাড়ি বলিল—"না—না—এখন আমি ভিতরে যাইব না। আমি অন্য কাযে যাইতেছি। গুড্ নাইট।"

"গুড্ নাইট মহাশয়"—বলিয়া দাসী দ্বার রুদ্ধ করিল। শরৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরপদে একটি ফটক দিয়া রীজেন্টস্ পার্কের ভিতরেই প্রবেশ করিল। এ সময় হাইড্ পার্কে যেরূপ জনতা, এখানে সেরূপ নহে। তবে আলোও জ্বলিতেছে, এখানে ওখানে লোকজনও বেড়াইতেছে। শরৎ খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই বেঞ্চিতেই গিয়া বসিল। বসিয়া ভাবিল—"আশ্চর্য্য! এখানেই তাকে পেয়েছিলাম, এখানেই হারালাম।"—রুমাল বাহির করিয়া শরৎ চক্ষু মুছিল।

বসিয়া বসিয়া কত কথাই সে ভাবিতে লাগিল। এই পাঁচ মাস কুকুরটি কবে কি করিয়াছিল, সমস্ত একে একে তাহার স্মরণ হইতে লাগিল। প্রতিদিন যখন সে প্রাতরাশের পর বাহির হইত, টেবিও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে চাহিত। জোর করিয়া তাহাকে ভিতরে পূরিয়া দরজা টানিয়া দিতে হইত। প্রতিদিন বিকালে যখন সে বাড়ী ফিরিত, দ্বার খুলিয়াই দেখিত, হলে টেবি চুপ্টি করিয়া বসিয়া আছে। সে প্রবেশ করিবামাত্র টেবির কি আনন্দ—কি লম্ফ ঝম্প! ঠিক পাগলের মত ব্যবহার করিত। চায়ের সময় বসিয়া বসিয়া বিস্কুট খাইত। প্রথমে শরৎ টেবির জন্য সস্তা দামে dog biscuits কিনিয়া আনিয়াছিল। তাহার পর শুনিল, বিস্কুটের কারখানায় দিনান্তে ঘর ঝাঁট দিয়া যে সকল টুকরা ও গুঁড়াগাঁড়া জমা হয়, তাহা দিয়া কুকুর-বিস্কুট প্রস্তুত হয়। সেই কথা শুনিয়া অবধি আর সে টেবির জন্য কুকুর-বিস্কুট কিনিত না—অধিক মূল্য দিয়া, মানুষ যে খায়, তাহাই কিনিত। ডিনারের সময় টেবিলে টেবি চুপ করিয়া তাহার পায়ের কাছটিতে থাকিত। তাহার আহার শেষ হইবামাত্র কি রকম জানিতে পারিত—বাহির হইয়া দাঁড়াইয়া লেজ ন্যাড়তে

থাকিত। শরৎ তখন টেবির খাবারের প্লেট নামাইয়া দিত—টেবি খাইত। রোষ্ট ফাউ্ল তাহার একটি প্রিয় খাদ্য ছিল। দাসী বলিয়াছে, ফ্লোরা তাহার জন্য রান্নাঘর হইতে ফাউল লইয়া গিয়াছে—কিন্তু টেবি খাইবে কি? সন্দেহ। একদিনের কথা মনে পড়িল, তখন মাসখানেক টেবি আসিয়াছে। শরতের বাহিরে ডিনারে নিমন্ত্রণ ছিল। রাত্রি দশটার সময় যখন বাড়ী ফিরিল, ল্যাণ্ডলেডি তাহাকে বলিল—"মহাশয়, আপনার কুকুরটি অদ্ভুত। আমরা খাইয়া, প্লেট ভরিয়া খাবার আনিয়া টেবিকে দিলাম, সে স্পর্শও করিল না। খালি বাড়ীময় আপনাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। শেষ আপনার বসিবার ঘরে, খাবারশুদ্ধ তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি, এখন যদি খাইয়া থাকে ত বলিতে পারি না।"—শরৎ বসিবার ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র টেবি মহা লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল। শুধু লম্ফ ঝম্ফ নয়—উল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে লম্ফ ঝম্ফ—যেন বলিতেছে—"কোথায় গিয়েছিলে বল দেখিন!—আমি ত মনে করেছিলাম—আমার চিরদিনের জন্যে ফেলে চলে গেছে—আর তোমায় দেখ্‌তে পাব না।"—উত্তেজনা কতকটা প্রশমিত হইলে, তখন টেবি আহারে মন দিল। পূর্ব্বে তাহা স্পর্শও করে নাই। শরৎ আবার অশ্রুমোচন করিল।

ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি প্রায় ১১টা বাজে। ১১টার সময় ফটক বন্ধ করিয়া দিবে। শরৎ উঠিল।

বাড়ী গিয়া সে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। ঘুম কি আসিতে চায়? প্রায় সমস্ত রাত্রি ছটফট করিয়া, শেষে ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন বেলা ৮টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে, অভ্যাসমত গৃহকোণস্থিত টেবির শুইবার টুকরীটির দিকে ...। সেটি আজ শূন্য! অন্যদিন দেখে, ...ধ্য গুটিসুটি হইয়া ঘুমাইতেছে। শরৎ ... -টেবি—ট্যাব্।"—টেবি অমনি ছুটিয়া ... আসে, আগের পা ছুটি বিছানার ধারে ... ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে থাকে, শরৎ তাহাকে একটু আদর করে। আজ আর আদর লইতে আসিবার কেহ নাই।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শরৎ শয্যা ত্যাগ করিল। মুখ হাত ধুইয়া, পোষাক পরিতে আরম্ভ করিল। কোটটিতে স্থানে স্থানে টেবির শাদা রোঁয়া লাগিয়া রহিয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে বুরুষ দিয়া সেই রোঁয়াগুলি ঝাড়িয়া কোটটি শরৎ গায়ে দেয়। আজও রোঁয়া ঝাড়িতে লাগিল। ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাহার মনে হইল—"আজই শেষ—কাল থেকে আর কারু রোঁয়া কোট থেকে ঝাড়তে হবে না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সারাদিন শরৎকুমারের যে কেমন করিয়া কাটিল, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। টেম্‌প্লে গিয়া আইনের লেকচার শোনা, লাইব্রেরীতে গিয়া পাঠ, কমন-রুমে গিয়া বিশ্রাম,—প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট সকল কর্ম্মগুলিই যন্ত্রচালিত মত সে করিয়া গেল। যখন বাড়ী ফিরিবার সময় হইল, তখন মনে হইল আজ ত দ্বারটি খুলিবামাত্র টেবি আমার গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না!—তাই বাড়ী যাইতে তাহার প্রাণ চাহিল না, একটা রেষ্টোরাঁয় চা পান করিয়া হাইড্ পার্কে বেড়াইতে গেল।

সেখানে পৌছিয়া, একখানা বেঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। ঘণ্টা খানেক থাকিয়া বড়ই বিরক্তি বোধ হইল। একবার ভাবিল, বাড়ী যাই,—কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই, গিয়া ডিনার খাইয়া সকালে সকালে শুইয়া পড়ি। কিন্তু তাহাও ভাল লাগিল না। আজ ত খাইবার সময় টেবি আসিয়া তাহার পায়ের কাছটি ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকিবে না!

ধীরে ধীরে শরৎকুমার হাইড পার্ক হইতে বাহির হইল। তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। দেওয়ালে থিয়েটরের একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহার মনে হইল, থিয়েটরে যাই, ঘণ্টা তিনেক ভুলিয়া থাকিব; তাহার পর কোনও রেষ্টোরাঁয় কিছু খাইয়া, বাড়ী গিয়া শয়ন করিব।

আটটার সময় শরৎকুমার একটা থিয়েটরে গিয়া পৌছিল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে অভিনয় আরম্ভ হইল। শরৎ বসিয়া দেখিতে লাগিল—কিন্তু কি অভিনয় হইতেছে ভাল বুঝিতেই পারিল না। দেহ তাহার থিয়েটরে, মন যে আকাশ পাতালে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে! খানিক শোনে, আবার অন্যমন হইয়া যায়; আবার যখন শুনিতে আরম্ভ করে, তখন পূর্ব্বের কথা কিছুই মনে নাই।

প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল এইরূপে কাটিলে, বিরক্ত হইয়া শরৎকুমার বাহির হইয়া পড়িল। তখন ক্ষুধাটা বেশ অনুভব করিল। আহার করিবার জন্য নিকটস্থ একটা রেষ্টোরাঁর দ্বার পর্য্যন্ত গেল—গিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে বলিল—"আমি ত খেতে যাচ্ছি—কিন্তু টৈবি!—সে কি খেয়েছে?"

তখন সে স্থির করিল, যাই, কল্যকার মত গিয়া দাসীটার কাছে একবার সন্ধান লই।—তৎক্ষণাৎ অম্‌নিবসে আরোহণ করিয়া, রাত্রি সাড়ে দশটার সময় সে মিসেস্ কলিন্সের বাড়ী গিয়া পৌছিল।

আবার সেই দ্বারস্থ বিদ্যুতের বোতামটি টিপিল; আবার একজন দাসী বাহির হইয়া আসিল,—কিন্তু এ গত কল্যকার সে দাসী নহে, অন্য রমণী।

শরৎ তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিল—"আমি সেই কুকুরটির কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম।"

দাসী জিজ্ঞাসা করিল—"কোন কুকুর?"

"সেই যে কুকুরটি কাল আমার সঙ্গে আসিয়াছিল?"

"কি হইয়াছে মেরি"—বলিতে বলিতে মিসেস্ কলিন্স অগ্রসর হইয়া আসিলেন। শরৎকে দেখিয়া বলিলেন—"মিষ্টার বাগ্‌চী!—গুড্ ইভ্‌নিং। আসুন আসুন। বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন?"

"গুড্ ইভ্‌নিং"—বলিয়া শরৎ প্রবেশ করিল। মিসেস্ কলিন্সের সহিত করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিল—"ক্ষমা করিবেন, এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কুকুরটি কেমন আছে, সেইটুকু শুধু দাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইবার অভিপ্রায় ছিল।"

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"উপরে আসুন। অনেক কথা আছে"—বলিয়া তিনি অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন।

অনেক কথা কি আছে শরৎ কিছুই আন্দাজ করিতে পারিল না। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিঁড়ি উঠিয়া, একটি কক্ষে প্রবেশ করিল।

মিসেস্ কলিন্স একটি সোফায় বসিয়া, নিকটস্থ একখানি চেয়ারে শরৎকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

শরৎ বসিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"আমাদের দ্বারা বড়ই অন্যায় হইয়া গিয়াছে, মিষ্টার বাগচী। কি বলিয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না।"

শরৎ শঙ্কিত ভাবে বলিল—"কেন? কি হইয়াছে? টৈবি কি—"

"পলাইয়া গিয়াছে।"

"কখন?"

"আজ বৈকালে পাঁচটার সময়। আমরা কেহই বাড়ী ছিলাম না। ফ্লোরাকে লইয়া আমি সেণ্ট জেমসেস্ হলে কন্‌সার্ট শুনিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, কুকুরটি নাই। চেনটা যেমন বাঁধা ছিল, তেমনি বাঁধা রহিয়াছে, কিন্তু আধখানা ছেঁড়া।"

শরৎ বলিয়া উঠিল—"তবে বোধ হয় আমার বাসাতেই গিয়াছে!"—বলিয়াই সে অনুশোচনায় মরিয়া গেল। ভাবিল, ছি, ছি—কেন ওকথা বলিলাম? যদি গিয়া থাকে, গিয়াইছে; এখনি আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক সঙ্গে দিবে হয় ত!

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহার সে ভাব নিবৃত্ত হইল। মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"না মিষ্টার বাগচী, আপনার বাসায় যায় নাই। আমি তিনবার আপনার বাসায় লোক পাঠাইয়াছিলাম।"

শরৎ বলিল—"তবে কোথায় গেল?"

মিসেস্ কলিন্স কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া, শেষে

বলিলেন—"আমার বোধ হয়, কুকুরটি আর জীবিত নাই।"

শরৎ রুদ্ধশ্বাসে বলিল - "জীবিত নাই! কি করিয়া জানিলেন?"

"বলিতেছি। কুকুরটিকে খুঁজিবার জন্য শুধু যে আপনার বাসায় লোক পাঠাইয়াছিলাম, তাহা নয়। পথে চারিদিকে খবর লইবার জন্যও লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ আন্দাজ ছয়টার সময়, এজোয়ার রোডের মোড়ে একটি শাদা-কালো কুকুর যাইতেছিল। নিকটস্থ একটা কসাইয়ের দোকান হইতে দুইটা বড় বড় কুকুর ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে। সম্মুখের দোকানের লোকেরা বাঁচাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। কুকুরটি রক্তাক্ত কলেবরে মরিয়া সেখানে পড়িয়া ছিল—পুলিস আসিয়া, তাহার গলায় কোন কলার না দেখিয়া, কাহার কুকুর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মিউনিসিপ্যালিটির লোক ডাকিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে।"

শরৎকুমারের বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাম হস্তে কপাল চাপিয়া ধরিয়া মুখ নীচু করিয়া সে বসিয়া রহিল।

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"আপনি এ সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইবেন বুঝিয়াও আপনাকে জানানই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। আমারই দোষে এটি ঘটিল। আমার উচিত ছিল, কল্যই ফ্লোরাকে নিবারণ করা—কুকুরটি তাহাকে লইতে না দেওয়া। কিন্তু তাহা আমি পারি নাই। কুকুরটি কল্য রাতে কিছুই খায় নাই—অদ্য দিনের বেলাও ফ্লোরা তাহার মুখের কাছে প্লেট ভরিয়া নানাবিধ খাদ্য আনিয়া ধরিয়াছিল, তাহা সে স্পর্শও করে নাই। তখনও আমি বলিয়াছিলাম—ফ্লোরা, কুকুরটি না খাইয়া মরিয়া যাইবে, যাহার কুকুর তাহাকে ফিরিয়া দিয়া আয়।—ফ্লোরা কাঁদিতে লাগিল। বলিল—'না মা, কতক্ষণ আর না খাইয়া থাকিবে—ক্ষুধা অসহ্য হইলে খাইবেই। কুকুরটি আমি দিব না।'—তাহার চোখের জল দেখিয়া আবার আমার দুর্ব্বলতা আসিল। কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইলাম।"

মিসেস্ কলিন্স চুপ করিলেন। শরৎ যেমন বসিয়াছিল, তেমনি রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস্ কলিন্স আবার বলিলেন—"যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার ত আর চারা নাই। আপনি আমায় ক্ষমা করিতে পারিবেন কি না আমি খুব সন্দেহ করি।—কিন্তু জানিবেন, আমি এ জন্য বড়ই দুঃখ ও লজ্জা অনুভব করিতেছি। আমাদের কুকুরটিকে আপনি পাঁচমাস প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাহার খোরাকী স্বরূপ আপনাকে টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়া আপনাকে অপমান করিব না। তবে যদি আপনি অনুমতি করেন, আপনার দানস্বরূপ পাঁচগিনি আমি ডগ্‌স্ হোমের * সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দিই।"

শরৎ এতক্ষণে মাথা তুলিল। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।"

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন—"রাত্রি হইয়াছে, আর আপনাকে বিলম্ব করাইব না মিষ্টার বাগচী। গুড্ নাইট্।"

শরৎ দাঁড়াইয়া উঠিল। "গুড্ নাইট মিসেস্ কলিন্স"—বলিয়া, মাতালের মত টলিতে টলিতে সে বিদায় গ্রহণ করিল।

দশ মিনিটের পথ হাঁটিয়া আসিতে শরৎকুমারের আধঘণ্টা লাগিয়া গেল। পা আর চলে না। এক স্থানে ত সে পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছিল। নিকটে একটা বাড়ীর রেলিং ছিল, তাহাই ধরিয়া সে সামলাইয়া লইল।

বাসায় পৌছিয়া, হলে টুপী ও ছড়ি রাখিয়া, মোমবাতিটি হাতে করিয়া উপরে গেল। শয়নকক্ষের দ্বার খুলিয়া—একি!

একি স্বপ্ন না সত্য!

টেবি অক্ষতদেহে ঘরের মাঝখানে শুইয়া রহিয়াছে। শরৎকে দেখিয়া সে কষ্টে তাহার কাছে আসিয়া লেজ

* লণ্ডনে কুকুরের "পিঁজরাপোল" আছে।

নাড়িতে লাগিল। দুই দিনের অনাহারে লম্ফ ঝম্ফ করিবার শক্তি তার তাহার নাই!

"ট্যাব্—ট্যাব্—আমার ট্যাব্!"—বলিতে বলিতে বিস্ময়ে আনন্দে দিশাহারা হইয়া শরৎ তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল। তখনও তাহার গলায় সেই আধখানা চেন ঝুলিতেছে।

কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া শরৎ ল্যাণ্ডলেডিকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। ড্রেসিং গাউনের উপর একটা উলের শাল জড়াইয়া ল্যাণ্ডলেডি উপর হইতে নামিয়া আসিল—বলিতে বলিতে আসিল—"Are you happy now, Mr. Bagchi?" (বাগচী মশায়, এখন খুসী হয়েছেন ত?)

শরৎ বলিল—"ব্যাপারটা কি বল দেখি মিসেস্ জোন্স।"

মিসেস জোন্স তর্জ্জনী হেলাইতে হেলাইতে বলিল—"একবার নহে—দুইবার নহে—তিনবার মিষ্টার বাগচী—তিনবার আমায় মিথ্যা কথা বলিতে হইয়াছে। সাড়ে পাঁচটার সময় বাহিরে যাইব বলিয়া যাই দরজাটি খুলিয়াছি, দেখি টেবি বাহিরে বসিয়া আছে, গলায় আধখানা শিকল। আমাকে দেখিয়া আহ্লাদে লেজ নাড়িতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, চেন ছিঁড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে। কতবার আপনার সঙ্গে রীজেন্টস্ পার্কে গিয়াছে ত! পথ চেনে। আমি উহাকে রান্নাঘরে লইয়া গেলাম। একবাটী দুধ দিলাম, চক্ চক্ করিয়া খানিকটা খাইয়া আর খাইল না। প্লেট ভরিয়া মাংস দিলাম তাহাও ছুঁইল না। রান্নাঘরেই উহাকে রাখিলাম। জানিতাম, এখনি উহাদের লোক খুঁজিতে আসিবে। হইলও তাই। একবার কি মহাশয়, তিন তিনবার আসিয়াছিল। তিনবার আমায় মিথ্যা করিয়া বলিতে হইয়াছে—কৈ কুকুর ত এখানে আসে নাই!"

শরৎ হাসিতে হাসিতে বলিল—"কেন মিসেস্ জোন্স, তুমি মিথ্যা কথা বলিলে কেন?"

"আপনার অবস্থাটা আমি কি বুঝিতে পারি নাই মহাশয়? সে আজ সকালেই আপনার মুখ দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেন? উহাদের কুকুর কিসের? এক পাউণ্ড বা দুই পাউণ্ড দিয়া কিনিয়াছিল বলিয়াই উহাদের কুকুর?—ঈঃ!—টাকাই সব? ভালবাসা কি কিছুই নয়?"

শরৎ বলিল—"তাহা হইলে তোমার মত, টাকা দিয়া প্রাণ কেনা যায় না, ভালবাসা দিয়াই কেনা যায়!"

"নহে ত কি! তাই আমার মত—এবং যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব—ঈশ্বর করুন, ততদিন ঐ মতই আমার যেন থাকে।"

"তাই যেন থাকে। এখন বল দেখি, ঘরে কিছু খাবার টাবার আছে?"

"কেন, আপনি কি খাইয়া আসেন নাই?

"না।"

"My goodness!—সারা দিন উপবাস করিয়া আছেন?—আচ্ছা আমি খাবার আনিতেছি।"—বলিয়া মিসেস্ জোন্স নামিয়া রান্নাঘরে গেল।

খানিক পরে ঠাণ্ডা মাংস, আচার (pickles) এবং রুটি মাখন ও পনির আনিয়া দিল।

শরৎ টেবিলে, টেবি মেঝের উপর—এক সঙ্গেই আহারে প্রবৃত্ত হইল। খাইতে খাইতে, মিসেস কলিন্সের বাটী যাওয়া প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই শরৎ ল্যাণ্ডলেডিকে বলিল।

ল্যাণ্ডলেডি বলিল—"তা, আপনি ও কথা শুনিয়া এত চিন্তিত হইয়াছিলেন কেন? টেবি চেন ছিঁড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে, উহার গলায় চেনও আছে কলারও আছে। যে কুকুর মারা গিয়াছে, তাহার গলায় কলার ছিল না শুনিয়াই ত আপনার বোঝা উচিত ছিল, সে অন্য কাহারও কুকুর। শাদা-কালো কুকুর কি লণ্ডনে এই একটিমাত্র বাস করে মহাশয়?"

শরৎ বলিল—"ঠিক বলিয়াছ মিসেস্ জোন্স! ওটা আমার খেয়ালই হয় নাই।"

সেদিন অবধি শরৎ টেবিকে আর রীজেন্টস্ পার্কে বেড়াইতে লইয়া যায় নাই। হাইডপার্কে গিয়াছে, কেন্‌সিংটন পার্কে গিয়াছে—রেলভাড়া দিয়া রিচ্‌মণ্ড পার্কে, কিউ বাগানে কুকুরকে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছে—কিন্তু রীজেন্টস্ পার্কের মাটী আর মাড়ায় নাই।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

শাহজাদী

(গাথা)

একদা প্রদোষে দিল্লী-অবরোধ পিঞ্জরের পাখী,
সুবর্ণের আস্তরণে গজদন্ত-শিবিকায় ঢাকি,
হয়-হস্তি-পদাতীর পদভরে কাঁপায়ে কোঙ্কণে
সহ্যাদ্রি লঙ্ঘিয়া চলে শাহজাদী পিতার বন্দনে।
হেনকালে অকস্মাৎ সচকিয়া মেদিনী অম্বর
সহস্র মিলিত কণ্ঠে ওঠে রব "হর হর হর" ;
পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে হ্রেষারবে ওঠে ঘোর ধ্বনি
সৈনিকের কটিদেশে কৃপাণের বাজিল ঝঙ্কনি।
চেয়ে দেখে চতুর্দ্দিকে চমকিত দিল্লী-সেনাপতি,
নামিছে মারাঠা সৈন্য অশ্বপৃষ্ঠে বিদ্যুতের গতি।
পর্ব্বতের সানুদেশে মারাঠা যে সমরে দুর্ব্বার,
শতযুদ্ধে শতবার হইয়াছে পরীক্ষা তাহার।
সম্রাট ও শাজাদীর কি উপায়ে বিপুল সম্মান
রক্ষা হবে, বহু চিন্তি সেনাপতি না পেয়ে সন্ধান,
ত্রস্ত সৈনিকের দলে বজ্ররবে কহে ডাক দিয়া—
"মরণ সঙ্কল্প ছাড়া নাহি গতি, দেখিনু ভাবিয়া ;
যাঁর অন্নে এতদিন পালিয়াছ শরীর সবার,
তাঁরি লাগি প্রাণপণ, এর বাড়া গৌরব কি আর !
মারাঠা দস্যুর সনে যুঝিয়া হইব জয়ী রণে,
নতুবা বীরের মত চিরনিদ্রা অনন্ত শয়নে ;
মৃত্যুভয়ে ভীত যদি কেহ থাকে মোর সৈন্যমাঝে,
মোগল উন্নত-শীর্ষ হবে হেঁট আজি সেই লাজে।
স্মরিয়া তৈমুরে আর বাবর বীরত্ব রাখি মনে,
প্রভুর সম্মান তরে অগ্রসর হও সবে রণে।
বীরের সন্তান মোরা,—মাতৃদুগ্ধ করিয়াছি পান,
প্রাণ দিব আজি মোরা সম্রাটের রাখিতে সম্মান।"
নীরবিল সেনাপতি—করে ধরি উলঙ্গ কৃপাণ
দাঁড়াল অসংখ্য সৈন্য সমর্পিতে সংগ্রামে পরাণ।

মারাঠার দলপতি অগ্রসরি, মৃদুমন্দ হাসি,
জলদ-গম্ভীর-স্বরে কহে কথা মোগলে সম্ভাষি—
"আজ্ঞা কর সেনাপতি, দূরে ওই বনস্পতি ছায়ে
বাহকেরা নিয়ে যাক শাজাদীর শিবিকা সরায়ে ;
রণোন্মত্ত সৈনিকের বীভৎস ও বিকট চীৎকার,
আহত আর্ত্তের রব কর্ণে যেন নাহি পশে তাঁর,
সম্রাটের অবরোধে আনন্দে লালিত যেই জন,
তাঁর তরে নহে এই রণক্ষেত্র—কঠিন ভীষণ ;
শাজাদী থাকুন দূরে—জয়াজয় হইলে নিশ্চিত,
করিও, করিব মোরা, সে সময়ে যা হয় বিহিত।"
শতসংখ্য 'মাউলী'রে ডাকিয়া কহিল সেনাপতি,—
"শিবিকা রক্ষণে সবে যাও ত্বরা, যাও দ্রুতগতি।
জয়-পরাজয় আজি স্থিরীকৃত নহে যতক্ষণ,
সাবধানে শাজাদীরে সসম্মানে করিও রক্ষণ।
যুদ্ধশেষে বাঁচি যদি, দেখা পুনঃ হইবে আবার ;
মরি যদি, যেতে দিও শাজাদীরে যথা ইচ্ছা তাঁর।"
ফিরিল অশ্বের মুখ, পুনরপি কাঁপায়ে অম্বর
আকাশে উঠিল ধ্বনি—"হে ভবানী হর হর হর।"

চকিতে শিবিকাদ্বার খুলে গেল নিমেষের তরে ;
দুইটি খঞ্জন আঁখি মারাঠার মুখের উপরে
নিবদ্ধ হইল আসি, বীরের সে সুতীক্ষ্ণ নয়ান
ত্বরিতে দেখিয়া নিল রূপসীর সুচারু বয়ান।
কি আগ্রহভরা এই চারি চক্ষু শুভ সম্মিলন,
কে জানে বিশাল বিশ্বে বিনা সেই অন্তর্যামী জন ?
শাজাদী ভাবিল মনে—"শুনিয়াছি মারাঠা তস্কর,
শুনিয়াছি দস্যু তারা, শুনিয়াছি ক্রূর স্বার্থপর ;
এ যে দেখি বিপরীত ! কে গো এই কান্তিমান বীর,
নিমেষে মধুরকণ্ঠে জিনে লয় মন রমণীর ?
মারাঠা দস্যুই বটে, নতুবা এ মুহূর্ত্তের মাঝে
দিবালোকে হেন চুরি নাহি জানি আর কারে সাজে !"

মোগলের 'দীন্ দীন্', মারাঠার 'হর হর হর'
ছাইল কোঙ্কণ-গিরি, কাঁপাইল মেদিনী অম্বর।

অস্তশিখরীর পারে দিনকর ডুবে ধীরে ধীরে,
সুপ্তিভরা সন্ধ্যা আসে ধূসর অঞ্চলখানি ঘিরে
শান্তি দিতে শ্রান্তজীবে। সে প্রদোষে মারাঠা মোগল
ক্ষিপ্ত-শার্দ্দূলের সম, এ উহার শোণিত-পাগল
আক্রমিছে পরস্পরে; পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর
আকাশের প্রান্ত হতে প্রসারিয়া সুধাসিক্ত কর,
শৈলঘেরা তড়াগের দ্রবীভূত স্ফটিকে শয়ান
খুলিতেছে কুমুদীর নিমীলিত সুচারু নয়ান।
এ হেন সন্ধ্যায় কত জন্মান্তের বাসনা বহিয়া
সমীরণ কত কথা কাণে কাণে যায় যে কহিয়া,
কেবা জানে? শুধু তার আকুলিত উচ্ছ্বাসের সনে
হৃদয়-বাঞ্ছিত ধন চির-প্রিয়ে এনে দেয় মনে;
বিদায় দিয়াছি ওগো কারে যেন জনমের শোধ
তারি কথা আসে মনে, অশ্রুভারে দৃষ্টি হয় রোধ!

সুপ্তি-ঘেরা শ্রান্তিহরা সমাসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায়
অবরোধ-বিহঙ্গিনী নারী যেথা বসি শিবিকায়,
দক্ষিণের মন্ত্রপড়া বায়ু আসি তার কাণে কাণে
অজ্ঞাত কাহার বার্ত্তা দিয়া গেল, সেই তাহা জানে।
জন্মাবধি প্রাসাদের সুবিপুল-বৈভব-লালিতা
আনন্দের আয়োজনে পরিজন-স্নেহে যে পালিতা,
নিমেষের মাঝে তার ইন্দীবর-নিন্দী দু'নয়ন
নিতান্ত বেদনা-ভারে সৃজিবারে চাহে গো প্লাবন!
শত-যন্ত্র কণ্ঠ-গীতে ঝঙ্কারিত দিবস রজনী
সৌধশিরে বাস যার, মারাঠার বজ্রঘোষ ধ্বনি
আজি তার শ্রুতিমূলে মনচোরা বাঁশরীর মত
অপূর্ব্ব পুলকভরে বাজিয়া উঠিছে অবিরত।
অবেধি হৃদয় তার বারবার মানিছে বিস্ময়,
যবন-নন্দিনী আজ মাগে কেন মারাঠার জয়!
সম্পদবেষ্টিত দিল্লী-প্রাসাদ-দুর্গের অবরোধ
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলি সম আজি তার কেন হয় বোধ?
যদি সে শুনিতে পায় মোহন কণ্ঠের মধুস্বর,
চিরদৃষ্টি রহে যদি মারাঠার মুখের উপর—

রাজপ্রাসাদেরে তবে যোড়করে করি নমস্কার,
কোঙ্কণ কুটীর তলে বিছাইত সুখের সংসার।

গত অর্দ্ধ-নিশীথিনী, স্তব্ধ এবে রণ-কোলাহল,
'দীন্ দীন্' 'হর হর' আকাশেরে করেনা পাগল,
অশ্বপদভরে এবে গিরিশৃঙ্গ নহে বিকম্পিত,
আর্ত্তের করুণ-স্বরে বসুন্ধরা নহে সচকিত।
গিরি অরণ্যেরে ঘিরে সুগন্ধী কুসুমগন্ধ ভাসে,
সুনীল গগন মাঝে পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ হাসে।
যেথানে সম্রাট-সুতা উদ্ঘাটিয়া শিবিকার দ্বার
হেরিতেছে সহ্যাদ্রির অতুলন শোভার সম্ভার,
মরাঠার সেনাপতি রণক্লান্ত ক্লিষ্ট দেহ নিয়া
শিবিকার কিছুদূরে সসম্মানে দাঁড়াইল গিয়া;
কহিল বিনম্রস্বরে, "রাজসুতা, কর অবধান,
যুদ্ধে জয়-পরাজয় চিরদিন আছে এ বিধান।
যবন বিজিত আজি, মহারাষ্ট্রে মোর অধিকার;
হিন্দুর আতিথ্য এবে রাজকন্যা করহ স্বীকার।
অদূরে 'পানালা' দুর্গ, যোগ্য নহে তোমার ভবন,
তথাপিও কোন মতে নিশা আজি করহ যাপন।"

"বাদ্শা-নন্দিনী আমি, সে বারতা জান বীরবর?
বন্দিনী করিয়া যদি অত্যাচার কর মোর পর,
রাজরোষ অগ্নিসম প্রবেশিবে রাজ্যের মাঝারে—
ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্র এই অবিলম্বে যাবে ছারে খারে।
কেন এ দুর্ম্মতি বীর?"

"বৃথা এই গঞ্জনা আমারে,
নারী কভু শম্ভাজীর বন্দিনী হইতে নাহি পারে।
বাদশারে নাহি ডরি, স্বাধীন এ মহারাষ্ট্র দেশ,
সন্দেহ-বিহীন মনে দুর্গে মোর করহ প্রবেশ।
কালি প্রাতে যেও তুমি, যথা ইচ্ছা যাইতে তোমার,
সঙ্গে করি নিয়া যাবে চতুরঙ্গ-বাহিনী আমার।
এ কথা জানিও স্থির, যুদ্ধ করি যে ধর্ম্ম কারণ—
নারী প্রতি অত্যাচার সেই ধর্ম্ম করেছে বারণ।

যেখানে নারীর পূজা নাহি, সেথা ধর্ম্ম নতশির,
সেই হতভাগ্য দেশে সম্পদ রহে না কভু স্থির।
হিন্দু মোরা, বীর মোরা, জানি নারী জীবন সম্বল,
সুখের সঙ্গিনী নারী, দুঃখে নারী নির্ভর নিশ্চল,
মিলনে আনন্দ নারী, বিরহীর বক্ষতলে ধ্যান,
জীবন-যাত্রার পথে নিরাময় পরম কল্যাণ ;
আয়ুসূর্য্য বসে পাটে, সন্ধ্যা যবে আসে ঘনাইয়া
স্নেহময়ী রমণীর প্রেমমুগ্ধ একখানি হিয়া
শেষ শয়নের লাগি শ্রান্ত শির রাখিবার তরে
জীবন ভরিয়া যাচে, যাচে নর আকুল অন্তরে ;
দুঃখক্লিষ্ট শ্রান্ত নরে বাহুবন্ধে রাখিবার তরে
বিধাতার আশীর্ব্বাদ নামিয়াছে ধরণীর পরে ;
কল্পবন-পারিজাত সে রমণী নহেক বন্দিনী,
স্বর্গের সম্পদ তারে জানি মোরা, হে রাজনন্দিনী।"

"শম্ভাজী তোমার নাম ? ছত্রপতি শিবাজী-নন্দন,
মহারাষ্ট্র অধিপতি ? লহ বীর নারীর বন্দন ;
বীর্য্যমুগ্ধ রমণীর অকৃত্রিম হৃদয়ের নতি
গ্রহণ করিয়া কর কৃতার্থ হে মহারাষ্ট্রপতি।"

নীরব হইল নারী, চাহিল সে দিগন্তের পানে।
বারবার ফিরে ফিরে বাজিতে লাগিল তার কাণে
নরকণ্ঠে নারী-স্তুতি, অমৃতনিস্যন্দী নবতান—
হৃদয়ের নব তন্ত্রী ঝঙ্কারিয়া আরম্ভিল গান।
একি এ আনন্দবার্ত্তা, ক্ষোভ ক্ষতি দুঃখের সংসারে
বিধাতার আশীর্ব্বাদ সম মোরা ধরণী মাঝারে !
কভু আর শুনি নাই এ অমৃত মধুক্ষরা বাণী
ঝঙ্কারি তোলেনি হেন কেহ মোর হৃদি-তন্ত্রীখানি !
কেগো তুমি বীরবর, মোহন অঙ্গুলি তব দিয়া
ঝঙ্কারিয়া জাগাইলে আজি এই সুপ্ত নারী হিয়া !

ধূলিমুষ্টি সম আজি মনে হয় দিল্লী-রাজশালা
অন্তরের নারী মোর দিতে চাহে তার বরমালা
তব কণ্ঠে বীরমণি, ব্যথাতুর ব্যর্থ এ জীবন
অঞ্জলি ভরিয়া তব পাদপদ্মে করি সমর্পণ
সার্থক করিব এই জন্মভরা ব্যাকুল বেদনা
এ তৃষার্ত্ত হৃদয়ের এই যে গো একান্ত কামনা ;
হে বাঞ্ছিত বীরমণি, শৌর্য্য আর শিষ্ট আচরণে
জাগায়ে তুলেছ ওগো কি দুরাশা অবলার মনে
জানেন অন্তরযামী, রণে বনে বাসনে উৎসবে
এ চির-আনন্দহীনা অভাগিনী চিরসাথী হবে
এ বিপুল আশা তার, বুভুক্ষিত জীবন-সন্ধ্যায়
একান্ত আশ্রিত যেন বাঞ্ছিতের পদছায়া পায়।

সুনীল নলিননিন্দী লাজনম্র মদির নয়ন
শম্ভাজীর মুখ 'পরে কোন মতে করিয়া স্থাপন,
সরম বিহ্বলকণ্ঠে কহিল সে, "হে বিজয়ী বীর,
যে জয় কৃপাণে করে সে কভু না রহে চিরস্থির,
বিজীত রমণী প্রতি হে রাজন্ ! এই শিষ্টাচার
স্থাপিল যে জয়স্তম্ভ, চিরতরে বক্ষে অবলার
রহিবে অটল তাহা লক্ষ সৈনিকের লোহ দিয়া
মোগল বা মারাঠায় যে বিজয় নিয়াছে কিনিয়া
বহু যুদ্ধে বহুবার, কালবশে সে সব বারতা
ভুলিবে সকল লোকে, ভোলে যথা স্বপনের কথা।
আজি শৈল সানুদেশে, গিরি-নির্ঝরের কলস্বনে
রজত-সুশুভ্র এই সুধাময় চন্দ্রিকা প্লাবনে,
কচিৎ বিহঙ্গরবে, মধুগন্ধী পাদপের তলে,
কৃতজ্ঞ এ রমণীর হৃদয়-পুষ্পের দলে দলে
লেখা হ'লো যে প্রশস্তি, সে বিজয়-বারতা রাজন,
ভোলে যদি বিশ্বলোক, এ অধমা রাখিবে স্মরণ।
পরাভব অগৌরবে কোন ক্ষোভ নাহি মনে আজ,
অজ্ঞাত এ পথে মোরে করে ধরে লহ রাজ-রাজ।"

ক্রুদ্ধ রোষে বাদশাহ চাহি দুহিতার মুখ পানে
কহিতে লাগিল, "তৃপ্ত শম্ভাজীর উষ্ণ রক্তস্নানে
আমি আজ, যে রসনা মোর তনয়ারে প্রেমবাণী
কহিতে সাহস করে, তারে আমি দৃঢ়বলে টানি
শতখণ্ড করিয়াছি, কলুষিত যে বাহু তাহার
চেয়েছিল আলিঙ্গন দিল্লী সম্রাটের তনয়ার,

সেই বজ্রাহত দগ্ধ বাহু তার ছিন্ন ছিন্ন করি
দিয়াছি মিটাতে ক্ষুধা শৃগাল গৃধ্রের কাছে ধরি।
জিজ্ঞাসি তোমারে নারী, অয়ি অভাগিনী সুতা মোর
পবিত্র যবনকুলে জন্মি একি কুপ্রবৃত্তি তোর ?
অধম কাফের সে যে, মনে হ'লে অঙ্গ জ্বলে যায়
তারে সমর্পিলি প্রাণ, প্রেম-অর্ঘ্য দিলি তারি পায় !"

ধীরে অবনত শিরে সম্রাটের ভাগ্যহীনা সুতা
বেদনা-জড়িত-কণ্ঠে বিরহের ব্যাকুলাশ্রুপ্লুতা
কহিতে লাগিল বাণী, "হে সম্রাট, পিতা তুমি মোর,
নৃশংস হত্যার পাপে কি শাস্তি ভোগিতে হবে ঘোর
বিধাতার ন্যায় দণ্ডে, জানে তাহা অন্তর্যামী জন ;
মূঢ় নারী আমি, মোর ভাবিলে শিহরি' ওঠে মন !
পতি-পুত্র-হীনা আমি নাহি জানি কেমন সংসার,
রিক্ত লতিকার মত কাটিয়াছে দিবস আমার।
অকস্মাৎ দৈববশে দেখা হ'লো মনোচোর সনে
ফুটিল মন্দার-দাম হৃদয়ের নন্দন-কাননে ;
স্বয়ম্বরা রমণীর বরমাল্য তাঁহারি গলায়
স্বেচ্ছায় সানন্দ মনে পরাইয়া দিয়াছিনু হায় !

হে নৃশংস পিতা মোর, নিজহস্তে স্বীয় দুহিতার
ছিঁড়িলে অসির ঘায়ে সে পেলব প্রেম-পুষ্পহার !
বিধবা কন্যার অশ্রু দেয় পাছে মহা অভিশাপ,
লুকাইয়া রাখি তাই কোনমতে সে মহাসন্তাপ,
বেদনা রুধিয়া রাখি দীর্ণ এই বক্ষতলে মম,
ব্যর্থপ্রেম কেঁদে মরে বাণবিদ্ধ শকুন্তের সম।
তুমি কি বঝিবে তার, স্বার্থ-অন্ধ দিল্লী অধিপতি,
জানেন অন্তরযামী, যিনি বিশ্বে অগতির গতি।
দ্বিচারিণী নহি আমি, পতিহীনা হৃদয় অর্পণ
করিয়াছে স্বামীপদে হে সম্রাট, ক্ষত্রিয় যবন
সে ভেদ কাহার গড়া ? হৃদয়ের পূত প্রেম-হার
যার কণ্ঠে পরায়েছি, সেই যে গো দেবতা আমার।

"আমি ক্ষমিয়াছি দোষ, পিতা তুমি ; বিধাতার ক্ষমা
তোমা তরে মেগে লবে ব্যথাতুর তনয়া অধমা।"

হেমন্ত-পদ্মের মত বিশীর্ণা সে বিধবা রমণী
ধীরে চলে গেল দূরে, সূর্য্য পাটে বসিল অমনি। *

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

শুষ্ক জলাশয়

রুষ্ট রবির চণ্ড-কিরণে বুকের সলিলরাশি,
শুকায়ে গিয়েছে, থেমেছে তরল কল-কল্লোল হাসি।
আসেনা তরুণী লক্ষে আমার কক্ষে গাগরী ল'য়ে,
কলস তাড়নে হরষ লহরী উঠেনা বক্ষ বয়ে।
আর ত মরাল গ্রীবাটি বাঁকায়ে খুঁজিতে আসেনা সাথী
কমলের বুকে ঘুমায়ে ভ্রমর আর না কাটায় রাতি।
মীনের তীব্র পুচ্ছতাড়নে নাহি সে জলোচ্ছ্বাস,
কাজল গভীর সলিল কাহারে আরনা দেখায় ত্রাস।

সয়েছি নীরবে ভাগ্যের এই নিঠুর উপহাসি,
পড়ে আছি এবে বুকে লয়ে মোর বিপুল দৈন্যরাশি।
কিন্তু যখন পিপাসা-আতুর পথিক সুদূরাগত
নিকটে আসিয়া, জল নাই দেখে হইয়া নিরাশাহত
ফিরে যায় হায় ধিক্কারি মোরে নিদারুণ পিপাসায়,
সেই দুঃখে মোর শুষ্ক বক্ষ শতধা ফাটিয়া যায়। +

শ্রীবিজয়মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

* বোম্বাইনিবাসী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম বিশ্রাম মাওজি কর্ত্তৃক সংগৃহীত একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত গুজরাটী ইতিহাসে মূল বিষয়টির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকেই অবলম্বন করিয়া এই গাথাটি রচিত হইয়াছে।—লেখক।
+ একটি সংস্কৃত কবিতাবলম্বনে।

তাজ

স্নেহ মমতার খনি, প্রেমের অমূল মণি,
হে মন্দভাগিনী মমতাজ !
নিতান্ত পাষাণে গড়া তাজ-সতীনের কাছে
হায় তুমি পরাজিত আজ।
প্রাণপণ ভালবাসা একান্ত আগ্রহে যারে
রাখিতে পারেনি দুটি দিন,
পাষাণ বান্ধব ঘেরে সে নাম যে আজো ফেরে,
স্মৃতি তার তাহারি অধীন।

তোমারি প্রেমের সাক্ষী, তোমারে করিয়া জয়
আজো ঐ দাঁড়ায়ে গরবে,
তাজ আর সাজাহান একসাথে বলে লোকে
—মমতাজ ক'জনে বা কবে ?
হৃদয়ের মাঝে যেই প্রেমের গোপন বাসা
সে হৃদয় ক'দিন বা থাকে !
প্রিয়েরে পুষিবে যে বা, পাষাণ হউক সে বা
পাষাণই পাষাণ পৃথ্বী রাখে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী।

সাহিত্য-সমাচার

কবিসম্রাট্ সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "সবুজ পত্রে" প্রকাশিত গল্পগুলি দুইখানি পুস্তকে এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হইতেছে, পূজার পূর্ব্বে বাহির হইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত "চামুণ্ডার শিক্ষা" ও "সুদখোর ও সওদাগর" নামক দুইখানি শিশুপাঠ্য সচিত্র গল্পপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেকখানির মূল্য ॥৵০

রঙ্গমহল, শীশ্‌মহল, নূরমহল প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণেতা শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "লাল-চিঠি" ও "মোতিমহল" নামক দুইখানি সচিত্র উপন্যাস যন্ত্রস্থ। পূজার পূর্ব্বে, না হয় অব্যবহিত পরে, গ্রন্থ দুইখানি প্রকাশিত হইবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত "সৌধরহস্য" উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রণীত "পর্ণপুট" কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং "ঋতুমঙ্গল" নামক একখানি নূতন কবিতার বহি ছাপা হইতেছে, পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

'ভারতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত একখানি নূতন গল্পের বহি যন্ত্রস্থ ; পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত "ইন্দুমতী" নামক একখানি সচিত্র নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১॥০

গ্রাহকগণের প্রতি

আগামী আশ্বিন সংক্রান্তির দিন কার্ত্তিক সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী" আমরা ডাকে দিব। ঐ সংখ্যার জন্য যদি কোনও গ্রাহক নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া ২৫শে আশ্বিন মধ্যে চিঠি লিখিয়া আমাদের জানাইবেন।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী" কার্য্যাধ্যক্ষ।



প্রিয়তম, বিগত-অনুশোচনা ও ভবিষ্যৎ-ভয়-হরণকারী আমার এই জীবনপাত্র অদ্যই তুমি ভরিয়া দাও। কল্য দিবে?—কল্য আমি যে সপ্তসহস্রবৎসরব্যাপী-'গতকল্য'কার মধ্যে হারাইয়া যাইব না তাহা কে বলিতে পারে?-

ওমর খৈয়াম।

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

৮ম বর্ষ | ২য় খণ্ড } কার্ত্তিক ১৩২৩ সাল { ২য় খণ্ড | ৩য় সংখ্যা

মথুরার রাজা

মথুরার রাজা চিনিনি আমরা, আমরা ব্রজের ব্রজবাসী,
মোরা শুধু চিনি প্রাণের কানায়ে, আর চিনি তার সাধা বাঁশী ;
রাখালের মিতা বলে' জানি তারে, আজ দেখি সে যে মহারাজা—
আহা, তাই হোক্—শুভ অভিষেক ! ওরে তোরা জোরে শাঁখ বাজা।
আহিরি গোয়ালা—জানিনি আমরা পূজা উপচার কা'রে বলে,
মোরা শুধু তারে ভাল যে বেসেছি, চোখে দেখে তাই যাব চলে'।
যেখানেই থাক্, যা খুসী তা পাক্, সখা আমাদের থাক্ সুখে,
চোখে চোখে যদি নাই থাকে—থাক্ সুখে দুখে মুখে বুকেবুকে।

রাজসূয়-যাগ আগে নাই থাক্, তবু রাখালেরই রাজা করে'
গোপ-গোয়ালার প্রাণের আসনে নিয়েছি তাহারে কবে বরে'।
রাজসম্মান জানিনি আমরা,তবু তার মান কতখানি,
বৃন্দাবনের বনে বনে বনে প্রাণে মনে মোরা ভাল জানি।
আজি হোক্ রাজা, যত খুসী সাজা,যত খুসী জোরে বাঁশী বাজা,
জীবনে মরণে সে যে আমাদেরি, হোক্ সে তোদের মহারাজা।
মথুরার নাথ হোক্ না সে কেন, মোরা চিনি শুধু ব্রজনাথে—
রাখালের প্রাণে গাঁথা যে সে নাম, আঁকা রাধিকার হৃদিপাতে।

আজি চারিদিকে সান্ত্রী পাহারা, রাজপুরীদ্বারে শত দ্বারী,
ছত্রে চামরে সাজায়েছে তারে সিংহাসনের অধিকারী ;
বন্দী-চারণ-বিরচিত চারু-প্রশস্তি শতমুখে রটে,—
এ নহে অলকা-তিলকা রচনা—এইত রাজার মত বটে !
অক্ষয় খ্যাতি আজি তার সাথী, রমা আজি নিজে অনুগত,
রাখালের গীতি, রাধিকার প্রীতি,—সে কি আর হবে মনোমত ?
তাই শুধু ভাবি, রাজার দণ্ড হাতে পেয়ে, পেয়ে সিংহাসন,
বাঁশী সাথে আজি মোদের না ত্যজে, না ভোলে সাধের বৃন্দাবন !

না গো না বৃন্দা, তুলিস্‌না আর বৃন্দাবনের গত-কথা,
শ্যাম-সমারোহ শুভদিন আজি, সাজে কি কাহারো মনোব্যথা ?
তমালের তলে নয়নের জলে শ্রীমতীর আজি দশা কি যে—
গোপ-গোপিনীর গভীর বেদনা ঢেকে রাখ্‌ আজ মনে নিজে ;
নন্দ যশোদা কোথা শুয়ে ভুঁয়ে, কেমনে কাটায় দিনরাতি ;
'প্রাণের কানাই ! কোথা গেলি'—বলে' কেঁদে কেঁদে ফিরে যত সাথী ;
সাধের গোধন করিছে রোদন, পরশে না বারি দিলে মুখে,
ময়ুরময়ুরী শ্যামা-শুক-সারী উড়িয়া গিয়াছে মনোদুখে।

শ্রীদাম সুদাম—কেন বা সে নাম—দা॰ কি তাদের কারো কাছে !
কানায়ে হারায়ে কোন মতে কোণে কাণা হয়ে কড়ি বেঁচে আছে।
বৃন্দাবন সে বন শুধু আজি—জনহীন, তরু ফলহারা,
কদম্ব শুধু ঝরে' ঝরে' ঝরে' কেঁদে কেঁদে আজি হ'ল সারা !
যমুনার জল বাড়িছে কেবল ব্রজবাসীদের আঁখিজলে,
কালার বিরহ-কালবিষ যেন কালো জলে বহে কলকলে ;
দখিণা বাতাস নাই মধুমাস—এক ঋতু শুধু, বরষা সে—
শুধু অবিরল ঝরিতেছে জল, ঝড় বহে শুধু হা-হুতাশে !

না, না—মিছে ভয়, তা'কি কভু হয় ? সখা কি মোদের যে সে রাজা,
ব্যথিতের সাথে কাঁদে যে আঘাতে, সাজা দিয়ে পায় নিজে সাজা !
বন্ধু যাহারা, ভক্ত যাহারা, অনুরাগী যারা অনুদিনে,
তারা যে সে বিনে পানিহীন মীন, কানু কি তাদের নাহি চিনে ?
আজিকার এই নব রাজসাজ, তাদেরি বাড়াতে লোকমাঝে,
পিরীতি বাঁধন আঁটিয়া বাঁধিতে বিরহেরই ব্যথা বুকে বাজে !
এত আঁখিজল—সে কি নিস্ফল ; বুকের রক্ত মিছে সে কি ?
যত না উচ্চে উড়ুক বিহগ—ধরার বাঁধনে ছাড়াবে কি ?

তাই বলি আজ মহা শুভদিন—বৃন্দাবনের বনচারী
সিংহাসনের অধিকারী আজ, বিশ্বজনের মনোহারী।
চন্দ্র আজিকে সিন্ধু ছাড়িয়া উদিল ঊর্দ্ধে মহাকাশে,
ঐ ললাটিকা মহারাজটীকা ধ্রুবজ্যোতি রূপে পরকাশে।
বৃন্দাবনের বনে বনে যাহা রাধারে ডাকিয়া ফিরিয়াছে,
সে বাঁশী আজিকে বিশ্বরাধারে আপনার করি বরিয়াছে।
ভরিয়া বিমান বন্দনাগান গাহ আজি তবে ব্রজবাসী—
ছড়াক্ বিশ্বে শত শরতের চন্দ্রধবল যশোরাশি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালাদেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন কি প্রকারে বঙ্গীয় সাহিত্য-পঞ্জী রক্ষিত হইত তাহা বলিতে পারি না। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়, মুন্সী আবদুল করিম, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ পুঁথিনবিশগণ হয়ত তাহা অনুমান করিয়া বলিতে পারেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কাষ্ঠখোদিত ব্লক হইতে মুদ্রিত অন্যূন ২০০ বৎসরের পুরাতন একখানি পুঁথির সংবাদ দিয়াছেন। তিনি বলেন, বাঙ্গালার এই মুদ্রণপ্রণালী তিব্বতী বা বা নেপালী পদ্ধতির অনুকরণ (History of the Bengali Language and Literature, Calcutta, 1911, p 849 ; J. A. S. B. April 1913. p. 149 ; Bengal past and present, 1914, Vol IX, P. I. No 17 (July-Sept), p 40)। সে যাহা হউক, হুগলীতে Charles Wilkins যখন পঞ্চানন কর্ম্মকার নামে বাঙ্গলার Caxton-এর সাহায্যে কাঠের খোদাই বাঙ্গালা অক্ষর তৈয়ারি করিয়া Nathaniel Brassey Halhed-এর বাঙ্গালা ব্যাকরণ ছাপিলেন, তখন হইতে বাঙ্গালা অক্ষরে বই ছাপা হইতে সুরু হইল। ইহার পূর্ব্বে ছাপার বাঙ্গালা অক্ষর দেখিবার বড় একটা সুবিধা বাঙ্গালীর ছিল না। তবে Halhed-এর ব্যাকরণের পূর্ব্বে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দুইখানি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক লণ্ডন নগরে প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড বেণ্টো 'প্রার্থনামালা' ও 'প্রশ্নমালা' নাম দিয়া এই গ্রন্থ দুইখানি রচনা করেন। বেণ্টোর পুস্তকের পূর্ব্বে ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে Jesuit পাদরী Jean de Fontenay, Guy Tachard, Etienne Noel ও Claude de Beze, এই চতুর্গ্রন্থকার-লিখিত পুস্তকে * বঙ্গ ও ব্রহ্ম ভাষার অক্ষর ছিল; অতঃপর ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লাইপ্‌জিগে Johann Friedrich Fritz-এর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাধিকার-গ্রন্থে † যেমন ১০০টি ভাষার বর্ণমালা স্থান

---

* এই পুস্তকখানির নাম Observations Physiques et Mathematiques pour servir a l' histoire naturelle, et a la perfection de l' Astronomie et de la Geographie : Envoyees des Indes et de la chine a l' Academie Royale des Sciences a Paris, par les Peres Jesuites"………

† Orientalisch und Occidentalischer Sprachmeister. বাঙ্গালা বর্ণমালার শিরোদেশে লিখিত আছে,—'Alphabotum Bengalicum et Jentivicum.' বিলাতে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুস্তকখানির খুব প্রতিপত্তি ছিল।—G. A. Crierson, Specimens of the Bengali & Assamese Languages, 1913.

পাইয়াছিল, তেমনই কতকগুলি বাঙ্গালা বর্ণমালাও তাহাতে স্থান পাইয়াছিল। এ ছাড়া আরও দুই একখানি বিলাতী গ্রন্থে বাঙ্গালা বর্ণমালার নমুনা খুঁজিলে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারিত।

পর্ত্তুগীজদের বাণিজ্য যখন কোন কোন প্রাচ্যদেশে চলিতেছিল, তখন Nuno da Cunha (১৫২৯-১৫৩৮) তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশের সহিত রীতিমত ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করেন। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রতিবর্ষে একখানি করিয়া পর্ত্তুগীজ জাহাজ বাণিজ্য-ব্যপদেশে চট্টগ্রামে আগমন করিত। ক্রমশঃ Da Cunhaর চেষ্টায় অনেক পর্ত্তুগীজ বঙ্গে বাস করিতে লাগিল। তারপর দুইশত বৎসর চলিয়া যায়;—অতঃপর ধর্ম্মের তথা বাণিজ্যের কোন এক খেয়ালের বশে বাঙ্গালাভাষার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। ফলে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ এ আগষ্ট তারিখে Father Frey Manoel da Assumpcao নামক ঢাকার নিকটবর্ত্তী ভাওয়াল, নগরীর (?) একজন পর্ত্তুগীজ Augustinian মিসনরী বঙ্গভাষা ও পর্ত্তুগীজ ভাষায় একখানি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমতের কথোপকথনচ্ছলে সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তিনি ইহার নাম দেন—"Compendio dos Misterios da Fee, ordenado em lingua Bengalla." * এই গ্রন্থখানি এবং ইঁহার আর দুইখানি গ্রন্থ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন হইতে প্রকাশিত হয়। ইঁহার অপর দুইখানি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় (১) খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমতের প্রশ্নোত্তরী এবং (২) বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান। এই তিন খানি পুস্তকেই বাঙ্গালা কথাগুলি রোমান অক্ষরে লিখিত। ইহার চব্বিশ বৎসর পরে বিলাতে বেণ্টোর বই এবং পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে হালহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ বাহির হয়। এই দুই পুস্তকেই বঙ্গাক্ষরে বাঙ্গালাকথা প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহাদের পর হইতে মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় এতাবৎ সার্দ্ধলক্ষাধিক বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে এবং বহু কল্যাণনিদান ইংরেজের অনুগ্রহে তাহাদের যৎসামান্য পঞ্জীও রক্ষিত হইয়াছে। Adams, Lushington, Blumhardt, Long প্রভৃতি বিলাতী পণ্ডিত বঙ্গ-সাহিত্য-পঞ্জী-রক্ষা কল্পে যথাসাধ্য শ্রমস্বীকার করিয়া সমগ্র বাঙ্গালীজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইঁহাদের পর Calcutta Gazette মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের সাময়িক তালিকা প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-পঞ্জী-রক্ষায় কথঞ্চিৎ সহায়তা করিয়া আসিতেছে। বিদেশীয়-দিগের চেষ্টায় যাহা হইবার তাহা হইয়াছে ও হইতেছে। পরে রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতির চেষ্টায় বঙ্গীয়সাহিত্য-পঞ্জীর কিঞ্চিৎ উপাদান সংগৃহীত হয়।

অতঃপর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ১৩০৯ বঙ্গাব্দ হইতে প্রতি বৎসর বঙ্গসাহিত্যের একটা বিবরণ প্রস্তুত করিয়া

---

* পুস্তকখানির প্রত্যেক বামদিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে "Creper Xaxtrer orth 'bhed" এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে "Cathecismo da Doutrina Christaa" লিখিত আছে। আকার ক্রাউন ১৬ পেজি; পুস্তকখানির বাম দিকের পৃষ্ঠায় রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা এবং দক্ষিণদিকের পৃষ্ঠায় তাহার পর্ত্তুগীজ অনুবাদ আছে। এসিয়াটিক সোসাইটীতে এই পুস্তকের একখণ্ড সংরক্ষিত আছে; কিন্তু তাহা খণ্ডিত। এই গ্রন্থের ৪র্থ পৃষ্ঠায় ভাওয়ালের নাম উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ Bengal Past and Present, 1914, No 17, pp 40—63 দ্রষ্টব্য। অপর দুইখানি গ্রন্থেরও কিঞ্চিৎ আলোচনা ইহাতে আছে। Father Manoel-এর দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম প্রভৃতি এখনও জানা যায় নাই। ইহার তৃতীয় পুস্তকখানির নাম "Vocabularis em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas Partes". ১৫৫৭ Francis Xavier-লিখিত "Catecismo de Doctrina" নামক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমতের একখানি পুস্তক Bustamentee কর্ত্তৃক গোয়ার মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত হয়। ইহার সহিত Father Manoel-এর ১ম গ্রন্থের কি কোন সম্বন্ধ আছে? ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে Fr. J. F. M. Guerin নামক চন্দননগরের St. Louis গির্জ্জার Vicar এই গ্রন্থের একটি সংস্কৃত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার বাঙ্গলা অংশ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

আসিতেছেন। ১৩১১ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষদ্‌গতপ্রাণ পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের উপর এই কার্য্যের ভার ছিল। ১৩১২ সাল হইতে এই বিবরণ প্রস্তুতের ভার আমার উপর অর্পিত হয়। তদনুসারে অদ্য আমি ১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গ-সাহিত্যের বিবরণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে অসম্পূর্ণতা-ত্রুটি থাকিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা; তজ্জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যে কৈফিয়ৎ দিয়াছি, এ বৎসরও আমার সেই একই কৈফিয়ৎ। আমার এই ফর্দ্দে যাঁহারা আলোচ্য বর্ষের সমস্ত লেখকের নাম দেখিতে চাহিবেন, তাঁহারা নিরাশ হইবেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি।

আর একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত, মনে করিতেছি। আপাততঃ সুসঙ্গত কারণে পরিষৎ কোন গ্রন্থের সমালোচনার ব্যবস্থা রাখেন নাই। কাজেই এই বিবরণীতে কোন পুস্তকের সমালোচনা থাকিবে না। তবে এই সাহিত্য বিবরণীতে সাহিত্যের বিভিন্ন-বিভাগ সম্বন্ধে গতি লক্ষ্য করিয়া যা' দুইচারি কথা বলা হয়, তাহারও একটা পরোক্ষ ফল সাহিত্যের উপর ফলে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার একটু আভাষ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সে চেষ্টায় কেহ যদি ত্রুটি দেখেন, তাহা আমার ত্রুটি বলিয়া বুঝিবেন—পরিষদের নয়।

আলোচ্য বর্ষে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত অনূন ৮৭৩ খানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু গত বর্ষের মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা ১২৩৪। তন্মধ্যে যে সকল পুস্তকের নূতন সংস্করণ হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ৩৬১। এগুলির সংখ্যা তালিকাভুক্ত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে প্রকাশিত ৭৫২ খানি পুস্তকের বিষয়ভেদে শ্রেণীবিভাগ করিলে, দেখা যায়—

আলোচ্য বর্ষে,—

কলা বিদ্যায়	১৭	সাহিত্যে	৭০
জীবনবৃত্তান্তে	২০	আইনে	১৫
নাটকাদিতে	৫২	চিকিৎসায়	২০
উপন্যাসে	১৪৫	দর্শনে	১৪
ইতিহাস-ভূগোলে	৪৯	কাব্য ও কবিতায়	৬৭
ধর্ম্ম-বিষয়ে	৭৩	বিজ্ঞানে	১৮
ভ্রমণবৃত্তান্তে	৮	বিবিধবিষয়	১৮৪

মোট ৭৫২ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

খৃষ্টানদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম-পুস্তকগুলি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও তালিকাভুক্ত করা হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত বিভাগের মধ্যে—

ইতিহাস ও ভূগোলের	৪৯	খানির	মধ্যে	৩৫	খানি
সাহিত্যের	৭০	„	„	৫১	„
কাব্য ও কবিতার	৬৭	„	„	২৭	„
বিজ্ঞান-বিষয়ক	১৮	„	„	১২	„
বিবিধ বিষয়ক	১৮৪	„	„	৯৩	„

মোট ২১৮ খানি পুস্তক স্কুলপাঠ্য

(১) কলাবিদ্যা——শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেনের 'হারমোনিয়ম শিক্ষা ও গান শিক্ষা', শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বণিকের 'মৃদঙ্গপ্রবেশিকা' প্রভৃতি ১৭ খানি পুস্তক এই বিভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই পুস্তকগুলি বাহির হইয়া এ বিভাগের গৌরব আদৌ বাড়ে নাই। শুধু হারমোনিয়ম বা মৃদঙ্গ বাজাইয়া কলাবিদ্যার পরিচয় দিলে চলিবে না। 'কৃষক', 'ব্যবসায়ী' প্রমুখ মাসিক পত্রগুলি যে প্রণালীতে কলাবিদ্যার অনুশীলনে সহায়তা করিয়াছে, অন্ততঃ তাহাই অবলম্বন করিয়া লেখকগণ এ বিষয়ে পুস্তকাদি-রচনায় যত্নবান্ হইলে দেশের ও সাহিত্যের কিছু কাজ হইতে পারিত। প্রত্যুত‌ঃ, শিল্পবিষয়ক সাময়িক পত্রগুলির গত বর্ষের চেষ্টা প্রশংসাসূচক না হইলেও নিন্দার্হ হয় নাই। তদ্ভিন্ন অন্যান্য মাসিকপত্রেও কলাবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া এ বিভাগের অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর করিয়াছে।

জীবনবৃত্তান্ত—এবিভাগের ২০খানি গ্রন্থের মধ্যে নাম করিবার মত গ্রন্থ বাহির হইয়াছে দুইখানি। একখানি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ লিখিত "কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী", অপরখানির নাম স্বামী সারদানন্দ সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ"। 'কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী' এই বিভাগের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

অনুবাদ-শাখায় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার লিখিত "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর" অনুবাদ হইলেও এই বিভাগে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এরূপ গ্রন্থ হইতে শিখিবার জিনিষ অনেক পাওয়া যায়। আত্মজীবন-বৃত্তান্ত কিরূপে লিখিতে হয়, এই গ্রন্থ তাহার আদর্শ হইবার উপযোগী।

মাসিক পত্রাদিতে গতবর্ষে যতগুলি জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোমের "মধুস্মৃতি" বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইহা এখনও শেষ হয় নাই—'ভারতবর্ষ'-পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। এ বৎসর যদি এ বিভাগে অন্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত না হইত, একমাত্র 'মধুস্মৃতি'ই ইহার নাম বজায় রাখিতে পারিত।

(৩) নাট্যসাহিত্য—[নাটক, প্রহসন, চুট্‌কী নাটকাদি]—এই বিভাগে ৫২ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের আমরা দুইটি উপবিভাগ করিব। একটিতে থিয়েটারে অভিনীত পুস্তকগুলি এবং অপরটিতে অন্ত নাটকাদির উল্লেখ করিব।

থিয়েটারে অভিনীত বইগুলির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সিংহল-বিজয়' ও 'বঙ্গনারী' উল্লেখযোগ্য। 'বঙ্গনারী' পুস্তকে বঙ্গনারীর বিশেষ কিছু প্রাধান্য, বৈচিত্র্য বা বিশেষত্ব প্রদর্শিত হয় নাই বলিয়া 'বঙ্গনারী'র নামকরণটা তেমন সার্থক হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'বাদশাজাদী' তাহার লেখনীর উপযোগী হয় নাই।

শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় Lyttonএর 'Lady of Lyons' অবলম্বনে 'শুভদৃষ্টি'-নাটক রচনা করিয়াছেন। বিষয়টি ভারতীয় চরিত্রের মধ্য দিয়া বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাবটি ভারতীয় না হওয়ায় কেমন যেন বিসদৃশ হইয়া পড়িয়াছে।

'Merchant of Venice' অবলম্বনে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সওদাগর' এবং শ্রীযুক্ত মনোজমোহন বসু 'সোণায় সোহাগা' লিখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দাশরথি মুখোপাধ্যায় 'কণ্ঠহার' ডিটেক্‌টিভ্‌ আখ্যানমূলক নাটক—বায়স্কোপের filmএর মত ঘটনা-বর্ত্তময়।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বসুর 'হামির' ভাষা ও নাটকীয় art হিসাবে মন্দ হয় নাই।

চুট্‌কী নাটকাদির মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডুর 'রাত-দুপুরে'এ শ্রীযুক্ত মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্যামসুন্দর', 'মানে মানে', শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'হাতের পাঁচ', শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামীর 'গুরু-দক্ষিণা' উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু 'কবীর'-জীবনকাহিনী লইয়া একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছেন।

থিয়েটারের জন্য রচিত হয় নাই, অথবা থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই, এইরূপ নাট্যগ্রন্থের মধ্যে 'ফাল্গুনী' ও 'বৈরাগ্যসাধন' উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ীর 'সাগরের ডাক' বাঙ্গালায় Mystic Dramaর এক সুন্দর নিদর্শন।

বর্দ্ধমানাধিপতির দৃশ্যকাব্য 'শুকদেব' এবং শ্রীমতী কামিনী রায়ের দৃশ্যকাব্য 'অম্বা' অপর দুইখানি উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীমতী হেমলতাদেবীর 'সমাজ বা দেশাচার' নামক ক্ষুদ্র নাটকখানি Ibsenএর ধরণে রচিত একখানি সুন্দর গ্রন্থ, এখানিও অভিনয়োপযোগী।

প্রবাসীতে প্রকাশিত সৌরীন্দ্রবাবুর 'মৃত্যু-মোচন' এবং শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'পিলিয়াস্‌ এবং ম্যালিস্যাণ্ডা' নামক অনূদিত নাটক দুইখানি পুস্তকাকারে বাহির হইলে আদৃত হইবে। এ দুইখানি যে বৈদেশিক নাট্যানুবাদ বিভাগে উপাদেয় পুস্তক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৪) উপন্যাস ও কথাসাহিত্য।—আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগের ১৪৫ খানি গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়খানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' একখানি উপাদেয় উপন্যাস। এখানি ১ম বর্ষ হইতে 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'ছিন্নহস্ত' বিলাতী ডিটেক্‌টিভ গল্পের অনুবাদ।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য লিখিত 'কমলা' একখানি সুন্দর সামাজিক উপন্যাস।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের আধুলি সংস্করণের তিনখানি সুন্দর উপন্যাস বাহির হইয়াছে। প্রথম 'অভাগী'—শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সমাজ সমস্যামূলক উপন্যাস। দ্বিতীয়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্ম্মপাল'—স্কটের ধরণে ইতিহাসের সহিত রোম্যান্‌সের সুন্দর সম্মিলন। ইতিহাসকে এইরূপে মুখরোচক ও লোকপ্রিয় করিবার পক্ষে রাখালবাবুর চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। তৃতীয় উপন্যাস শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ।'

রায় এম্ সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্সের আধুলি সংস্করণে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাস প্রথম গ্রন্থ। এখানি পূর্ব্বে 'যমুনা'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা শরৎবাবুর গৌরব ও কৃতিত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে।

অন্নদাবুকষ্টল হইতেও ঐ সংস্করণের প্রথম পুস্তক 'শুভদৃষ্টি ও অন্যান্য গল্প' বাহির হইয়াছে। এই গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কোম্পানি সুলভ পৌরাণিক চিত্রাবলী গ্রন্থের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়-প্রণীত 'শর্ম্মিষ্ঠা'নামক উপন্যাস প্রকাশিত করিয়াছেন।

এই আধুলি সংস্করণের গ্রন্থাবলী বঙ্গসাহিত্যে নূতন সৃষ্টি।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বাছাইকরা কয়েকটি ছোট গল্প 'পসরা' নামে বাহির হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষালের ছোট গল্পের বই 'বারুণী', শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবীর 'স্তবক', শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরীর 'ব্যথা' এবং শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পরিকথা' আর ৪ খানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রত্নদীপ' পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। ডিটেক্‌টিভ গল্পের মত একটা কৌতূহল ইহাতে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'বিধবার ছেলে' উপন্যাস ও ধর্ম্মকথার অপূর্ব্ব মিশ্রণ।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের ছোট গল্পের বই 'সইমা' ও 'ছোটবউ' নামক উপন্যাস দুইখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক বাহির হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মেজদিদি' 'আঁধারে আলো' ও 'দর্পচূর্ণ' এই তিনটি গল্প একসঙ্গে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'মেজদিদি' গল্পটি তাঁহারই 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলের' হুবহু অনুকরণ। 'দর্পচূর্ণ' গল্পটির প্রথমাংশ বেশ সুন্দর, শেষটা লেখক বড়ই তাড়াতাড়ি করিয়া সারিয়াছেন। 'আঁধারে আলো' গল্পটির উপসংহার ভাগ উজ্জ্বল; গোড়ার অংশটি জঘন্য রুচির পরিচায়ক। শরৎ বাবুর 'পল্লীসমাজ' নামক আধুলি সংস্করণের উপন্যাসাবলীর অন্তর্ভুক্ত উপন্যাসখানি ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লেখকের বড় উপন্যাস অপেক্ষা ভাল হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার 'রমা' চরিত্রে বিন্দুর ছেলের বিন্দুকেই যেন আর একভাবে দেখি। তাঁহার মত সুযোগ্য লেখকের লেখায় এরূপ একই ধরণের চিত্র উপর্য্যুপরি পাইতে কি কেহ ইচ্ছা করেন?

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'উল্কা' ও 'চিত্রদীপ' প্রকাশিত হইয়াছে। উল্কাতে 'উল্কা' ও 'সাজঙ্গী' নামক গল্প এবং চিত্রদীপে নয়টি গল্প আছে। লেখিকা ছোটগল্প রচনায়ও কিছু আর্ট ও মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। 'উল্কা' বড় গল্প বা ছোট উপন্যাস, ধারাবাহিক ভাবে 'মানসী'তে প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনায় সমাসবহুল বাক্যাবলী ব্যবহারের প্রলোভন লেখিকা

সংবরণ' করিতে পারেন নাই। এরূপ রচনা 'সীতার বনবাসের সঙ্গে মানাইত; আজকাল কি শোভন হইবে?

কথা-সাহিত্যের অনুবাদ-গ্রন্থের মধ্যে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের 'কবি-কথা' বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সংস্কৃতের ভাব যথাযথ বজায় রাখিয়া নিখিল বাবু যেরূপ পরিশ্রম করিয়া 'শকুন্তলা' 'মালতীমাধব' প্রভৃতির অনুবাদ করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই প্রশংসার যোগ্য।

অনুবাদশাখায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বাগচীর 'ফরাসী গল্প' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানি এমনই সরল, সহজ, সতেজ অথচ সলীল ভাষায় লিখিত যে ইহা পড়িতে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ফরাসী মূলের প্রত্যেক উক্তির সহিত ইহার সুন্দর সাদৃশ্য বর্ত্তমান। বাঙ্গালা অনুবাদকগণ এই অনুবাদ প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালায় অনেক ভাল অনুবাদ-গ্রন্থ পাওয়া যাইবে।

গত বর্ষের মাসিকপত্রগুলিতেও অনেক উপন্যাস ও ছোট গল্প বাহির হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রথম শ্রেণীর রচনা খুব অল্পই আছে।

'ভারতবর্ষে' শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' চলিয়াছে। ইহা এখনও শেষ হয় নাই। লেখিকা নারী-চরিত্র অঙ্কনে ও বিশ্লেষণে বিশেষ কৃতিত্বসম্পন্না; কিন্তু তিনি রচনা বড় বেশী ফাঁপাইয়া ফেলিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কথা-সাহিত্যে বেশ নাম করিয়াছেন। গতবর্ষ হইতে তাঁহার 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ' নামক একখানি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য নূতন ধরণের উপন্যাস 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইতেছে। উৎকট প্রেমের কথা ছাড়াও যে উপন্যাস লেখা যায়, এই উপন্যাসখানিই তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল হইতে পারে।

গতবর্ষের 'ভারতবর্ষে' ক্ষীরোদ বাবুর 'নিবেদিতা' উপন্যাস শেষ হইয়াছে। ইহা ক্ষীরোদ বাবুর লেখনীর বিশিষ্টতা বা কৃতিত্বের পরিচয় অতি অল্পই দিয়াছে। উপন্যাসখানি টানিয়া বুনিয়া বাড়ান হইয়াছে। চরিত্র-চিত্রণ কি ভাবসম্পদ অথবা ভাষাসৌকর্য্যে ইহা কি 'নারায়ণী'র প্রথিতযশা ঔপন্যাসিকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছে?

'প্রবাসী'তে শৈলবালা ঘোষজায়া নাম্নী নূতন লেখিকা 'শেখ আন্দু' উপন্যাস শেষ করিয়াছেন। লেখিকা bold হইতে পারেন, কিন্তু মাত্র boldnessই কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। সহিস ও মুসলমান মোটরচালকের সহিত শিক্ষিতা বঙ্গবালার প্রেমে পড়ার চিত্রটা কি এতই স্বাভাবিক? এটা সংক্রামক রোগে দাঁড়াইল না কি? পুরুষলেখক না হয় সহিসের প্রেমে-পড়া বাঙ্গালী মেয়ের চিত্র আঁকিয়া বাহাদুরী বোধ করিয়াছিলেন; বাঙ্গালী রমণী হইয়া লেখিকা কিরূপে এই জঘন্য চিত্র অঙ্কন করিলেন? শেখ আন্দুর চরিত্রটি বেশ উজ্জ্বল ও সুন্দর। তাহারই পার্শ্বে মহিলা-অঙ্কিত বঙ্গমহিলার চিত্র ('লাবণ্য' ও 'জ্যোৎস্না', বিশেষতঃ লাবণ্যের চরিত্র) যেরূপ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে ভাষার পিরামিড্ গড়া সকলের পক্ষে সহজ নহে; তাই লেখিকা যেখানেই কথার বুক্নি দিয়া ভাবের খেলা দেখাইতে গিয়াছেন সেই খানেই তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

Vendetta অবলম্বনে 'মনের বিষ' জানকীবল্লভ বিশ্বাস রচিত। ইহাও ক্রমশঃ-প্রকাশ্য। Marie Corelli-র Delicia ও Other Stories পুস্তকে other Stories অংশে যে কয়টি অনবদ্যসুন্দর ছোট গল্প আছে, সে গুলির অনুবাদ বা ভাবাবলম্বনে লিখিত বাঙ্গালা গল্পের আদর এদেশে হয় না কি? উক্ত লেখিকার 'Life Everlasting'এর অনুবাদ করিলে লেখক আরও ভাল করিতেন। Vendetta-র বিষয় আমাদের দেশ-কালপাত্রানুযায়ী নয়।

'ভারতী'তে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্রোতের ফুল' শেষ হইয়াছে, পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। 'চোখের বালির' পর আর এখানির কি দরকার ছিল? স্থানে স্থানে চারুবাবুর বর্ণনা অতীব সুন্দর হইয়াছে। জমীদার বাড়ীর অন্তঃপুর, পুরনারীগণের চরিত্র, জন্মরোগী ছেলেটির মাদুলী ও কবচ-বন্ধনে

বর্মকে ঠেকাইয়া রাখা, নবকুমারের কর্ম্মপ্রবণতা—এ গুলি সুন্দর হইয়াছে। বিপিন-কর্ত্তৃক সদ্যঃপ্রসূত কালীতারাকে স্বগৃহে আনয়ন-ব্যাপারের চিত্রাংশটি Adam Bede-এর Hetty Sonelএর ছায়াবলম্বনে লিখিত হইলেও, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

গতবর্ষের 'ভারতী'তে 'স্রোতের ফুল' ছাড়া সৌরীন্দ্র বাবুর ফরাসী হইতে অনূদিত 'নবাব' উপন্যাসও শেষ হইয়াছে। সৌরীন্দ্রবাবু একে একে অনেকগুলি বিদেশী উপন্যাস অনুবাদ করিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে অনুবাদের আড়ষ্টভাব এখনও তাঁহার রচনাকে জড়াইয়া রাখে।

'মানসী'তে গতবর্ষ হইতে 'জীবনের মূল্য' প্রকাশিত হইতেছে। ইহা এখনও শেষ হয় নাই। প্রভাত বাবু উপন্যাস রচনা অপেক্ষা ছোট গল্পেই অধিকতর পটুত্ব দেখাইয়াছেন। 'জীবনের মূল্য' এখনও পর্য্যন্ত কি চরিত্রাঙ্কনে, কি বিষয়বর্ণনে আমাদের কৌতূহল উদ্দীপন করে নাই।

'নারায়ণে' কোনও উপন্যাস প্রকাশিত হয় নাই। তবে ইহার কথানাট্যগুলি সাহিত্যের আসরে বেশ একটু আন্দোলনের অবতারণা করিয়াছে। ধর্ম্ম, নীতি ও আর্ট হিসাবে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের মত সুযোগ্য লেখক ও সমালোচক এগুলির যে সমালোচনা 'নারায়ণে' করিয়াছেন তাহার পর আর কিছু বলা অনাবশ্যক। বাঙ্গালী পাঠক এ জঞ্জালগুলি কখনই ঘরে রাখিতে পারিবেন না।

গতবর্ষে 'যমুনা'য় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের 'ইন্দুমতী' নামক উপন্যাস বাহির হইয়াছে।

'সবুজপত্রে' গতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাহিরে' উপন্যাস বাহির হইয়াছে।

আজকাল মাসিকপত্রগুলি গল্প ও উপন্যাসের ভাণ্ডারস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এমন মাসিকপত্র বিরল, যাহাতে অন্ততঃ একটিও ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয় না। অনেকগুলিতে একাধিক ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসও বাহির হয়। সাহিত্যের এ অংশটা যে একেবারেই অনাবশ্যক তাহা বলিতে চাহি না, তবে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কিছুরই ভাল নয়। গল্প ও উপন্যাসে পত্রিকার অর্দ্ধেক বা তাহার কিছু কমবেশী ভরাইলে সাহিত্যের অন্যান্য অংশের আলোচনা সম্যক্ হইতে পারে না, ইহা এক হিসাবে সাহিত্যের পক্ষে অহিতকর। অধিকন্তু, সকল গল্প বা উপন্যাস সারবান্ নহে। এই অংশে দিন দিন যে রকম অসার আবর্জ্জনা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান মৃদু-সমালোচন-প্রবর্ত্তনকল্পে বাঙ্গালা সাহিত্যকে 'শিশু সাহিত্য' আখ্যা প্রদান সত্ত্বেও আমাদিগকে বলিতে হয় যে, বঙ্কিমের মত, অক্ষয় সরকারের মত নিরপেক্ষ, নির্ভীক এবং কঠোর সত্যসন্ধ সমালোচনার সময় ও প্রয়োজন আসিয়াছে। বাস্তবিকই আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্য এখন এমন 'শিশু' অবস্থায় আর নাই যে উহা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাইবে। রবীন্দ্রনাথ পুরাতন 'ভারতী'র বক্ষে 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় ও নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকরূপে সমালোচনার যে মানদণ্ড সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন, আজ তাহার স্থানে তাঁহার এই নব-উদ্ভাবিত সমালোচন-প্রণালী ও সাহিত্যের অবস্থার বর্ত্তমান 'শিশু'-অভিধান আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। কয়েকজন লেখক পূর্ব্বে ভাল লিখিতেন, ভাল লিখিতে পারিতেন এবং আমাদের বিশ্বাস এখনও পারেন, কিন্তু 'নূতনত্বে'র খাতিরে, 'নূতন' কিছু করিবার মায়ায় ও মোহে বিদেশী আবহাওয়া এবং আওতার মধ্যে নিজেদের দেশী গাছগুলিকে টানিয়া তুলিয়া লইয়া বিলাতী টবে বসাইতে উদ্যত হইয়াছেন। ফলে যে গাছগুলি পূর্ব্বে দেশের মাটী, দেশের জল হাওয়া, এদেশী সূর্য্যকিরণে স্বাভাবিক গতিতে বাড়িয়া উঠিতেছিল, সেগুলি এখন আধমরা, নির্জ্জীব, সাহিত্যের যাদুঘরে রক্ষণোপযোগী কঙ্কালমাত্র হইয়া উঠিতেছে। বিলাতী হট্‌হাউসে ভারতবর্ষের গাছ স্বাভাবিকভাবে বাড়িতে পারে কি? এই সকল সমস্যা এখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।

আজকাল উপন্যাস-সাহিত্যে Realism বা বাস্তবের

একটা তর্কতরঙ্গ উঠিয়াছে। ইহা লইয়া রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ প্রভৃতির মধ্যে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে ও এখনও চলিতেছে; এপর্য্যন্ত ইহার কোনও একটা সুমীমাংসা হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কথাটা ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য কিছু আছে কি আদৌ নাই, কবি ও ঔপন্যাসিক নিজের খুসিতেই লেখেন এবং নিজের খুসিতে লিখিবার অধিকার তাঁহাদের সত্যই আছে কি না—এ জটিল সমস্যার মীমাংসা এক কথায় হয় না। তবে, 'সাহিত্য-সভা'র গত বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে কাশিমবাজারাধিপতি যে সিদ্ধান্তগুলির অবতারণা করিয়াছেন তাহা নবীন বা প্রবীণ সকল সাহিত্যিকেরই প্রণিধানযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস লিখিয়া এবং তাহারও পূর্ব্বে 'জ্যাঠামশাই', 'শচীশ', 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' এই চারিটি গল্প লিখিয়া কথাসাহিত্যে যে নূতন ভাবের তরঙ্গ বহাইয়াছেন তাহাকে অনেকেই সাহিত্যে সুরমন্দাকিনীর তরঙ্গলীলা বলিতে অসম্মত। কথা উঠিয়াছে যে তিনি অভিশপ্ত, কপিলশাপে ভস্মীভূত বঙ্গসন্তানগণের উদ্ধারের জন্য ভগীরথের ন্যায় গঙ্গা আনয়ন করেন নাই,—উহা বিলাত হইতে আনীত লোণাপানি। আমরা এ বিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

তবে আমাদের সমাজের প্রকৃত দোষ যে-গুলি সে-গুলি লইয়া Ibsen-এর মত নাটক বা ঐ ধরণের উপন্যাস ও গল্প রচিত হউক না, রচনার প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও বিদেশী Ibsenism বা Shavism as it is আনিলে চলিবে কি না, এ সম্বন্ধে সাহিত্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। প্রতীচ্যের পুরুষ ও নারীজীবন সমস্যা, সেখানের গৃহস্থালী-সমস্যা, সে দেশের ধনিদরিদ্র-সমস্যা আমাদের দেশের পক্ষে খাটিবে কি না, সে সকল দেশের ধর্ম্ম, নীতি, আচার-ব্যবহার, ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির ধারা যখন একবিধ, এবং আমাদের অন্যবিধ, এক্ষেত্রে সেদেশের ভাবের ধারা বা সে দেশের সমস্যা লইয়া এদেশের সাহিত্যে চারা-রোপণ চলিবে কি না, ইহা লইয়া আলোচনা চলিতেছে। এই সমস্যার শেষ মীমাংসা কি হইবে তাহার অনুমান এখন দুষ্কর—তবে সুধীগণ এই উপলক্ষে এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, সাহিত্যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, ইহা সাহিত্যে জীবনের লক্ষণ।

প্রেম—বৈচিত্র্যময়। নরনারীর জীবন সমস্যার সোণার-কাঠি—রূপার-কাঠি স্বীকার করি; কিন্তু সে কাঠি দুইটি স্বদেশী কারিগরের হাতে দেশী নিখাদ সোণারূপায় তৈয়ারি হইলে ক্ষতি কি? আমাদের চাষার ঘরে, আমাদের কেরাণীর ঘরে কি 'প্রেম' নাই? কই, সে সকলের উপর উপন্যাস লিখিত হয় না কেন? প্রেম ছাড়া আরও অনেক উপন্যাস লিখিবার উপাদান রহিয়াছে। দেশে শক্তিশালী লেখকের ত অভাব নাই। কই,'Les Miserables' বা David Copperfield'-শ্রেণীর উপন্যাস ত প্রকাশিত হইতেছে না? আজকাল দু'একজন সাহিত্যিক বৈদেশিক সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা এদেশের লেখক ও পাঠকদিগকে সময়ে সময়ে নূতন খাদ্য যোগাইয়া থাকেন। ইঁহারা জর্ম্মান সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য, রুষ সাহিত্য প্রভৃতি লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। কিন্তু Dostoevskyর 'Crime & Punishment,' Idiot প্রভৃতির মত উপন্যাসও বঙ্গসাহিত্যে একখানিও নাই। অন্ততঃ ইহাদের অনুবাদও ত এতদিনে বাহির হওয়া উচিত ছিল। Turgenev-এর 'Smoke' ও অন্যান্য উপন্যাস, Maxim Gorkyর 'Chelkks' ও অন্যান্য গল্পের মত মৌলিক গল্প বা তাহাদের অনুবাদও এখনও প্রকাশিত হয় নাই। Selma Lagerleff, Stindburg, 'Quo Vadis'-রচয়িতা Sienkiewiez প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যের অনেক রথীই ত আমাদের সাহিত্যের নূতন রসভাণ্ডার খুলিয়া দিতে পারেন। সেই সকল ভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটন করিবার মত যোগ্য অধিকারীর ত অভাব নাই।

Anatole France, Gerart Hauptmann বা Ibsen-এর ধরণে—অথচ দেশীভাব ও দেশী সমস্যা লইয়া—সাহিত্য রচনা কি অসম্ভব? বঙ্গ-সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি, বিকাশ ও পূর্ণতাকল্পে ইহারা কি সহায়ক হইতে পারে না?. 'Channings'-এর মত সংসার যুদ্ধের চিত্র, Dickens-এর 'Hard Times' বা Meredith-এর 'Ordeal of Richard Feveril'-এর মত শিক্ষা সমস্যার বিভিন্ন অঙ্গ লইয়া উপন্যাস-রচনা কি বঙ্গসাহিত্যে হইতে পারে না? Thomas Hughes-এর 'Tom Brown's School days' অথবা 'Tom Brown at Oxford' শ্রেণীর উপন্যাস শুধু ছেলেদের কেন, ছেলের অভিভাবকদেরও পক্ষে কি কম চিত্তাকর্ষক? কই এ সকল শ্রেণীর উপন্যাস বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইতে দেখি না ত? বিলাতী দৈনন্দিন জীবনের উপর কত উপন্যাস ও ছোট গল্প রহিয়াছে, আমাদের দেশীয় ভাবের উপযোগী Stindburg-এর 'There's crime and crime'-এর মত নাটক বা বিবাহ-সমস্যা লইয়া লিখিত 'Marriage' নামক গল্প-পুস্তক-শ্রেণীর গল্পপুস্তকও যথেষ্ট আছে, সে-গুলির মত উপন্যাস, নাটক বা কথাসাহিত্য কি বাঙ্গালায় লিখিত হইতে পারে না?

যাহা হউক, আমরা যে কথা বলিতেছিলাম তাহা এই যে, জর্ম্মান সাহিত্য, রুষ সাহিত্য, ফরাসী, সুইডিস নরউইজিয়ান বা আইসলাণ্ডিক সাহিত্য—সকল খনি গর্ভ হইতেই আমরা মণি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গবাণীর মাতৃ-মূর্ত্তিকে অলঙ্কৃত করিতে পারি। যাঁহার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও অনুরাগ আছে, তিনি নিজের সামর্থ্যানুসারে সেইদিকে চেষ্টা করিতে থাকুন, শীঘ্রই আমাদের সাহিত্য বিবিধ নূতন আলোকরশ্মিসম্পাতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

(৫) ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব—এই বিভাগে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবার অনেক নূতন ও প্রয়োজনীয় তথ্যের আলোচনা হইয়াছে। সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অনেকেই ঐতিহাসিক আলোচনার দিকে ঝুঁকিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ-প্রমুখ 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির' সভ্য-বৃন্দের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি এবং 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত দেশের বিভিন্ন অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য জাতিগণের ইতিহাস বেশ উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের পালরাজগণের কথা ঐতিহাসিক-দিগের নিকট নূতন যুগের অবতারণা করিয়া দিয়াছে। 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার বসু ঠাকুরের "বাঙ্গালা নগরী," শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের "রাজতত্ত্ব", 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমা-প্রসাদ চন্দের "পুরাবৃত্ত আলোচনা," শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব",—শ্রীযুক্ত বিধু-শেখর শাস্ত্রীর "বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম কোথা লইতে আসিল" 'নারায়ণে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বৌদ্ধধর্ম্ম" "দুর্গাপূজা" ও "নির্ব্বাণ", 'নারায়ণে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের "শক ও শকাব্দ", শ্রীযুক্ত মহিমা-রঞ্জন চক্রবর্ত্তীর "শ্যামারূপের গড়," 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকের "শিলিমপুরের পাষাণ-প্রশস্তি," 'নোয়াখালী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন-দাসের "পর্ত্তুগীজদস্যু" এবং 'মানসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকের "গুপ্তযুগে বঙ্গদেশ", সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "বর্দ্ধমানের পুরাকথা," শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়ের "শ্রীবিক্রমপুর", শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর 'শ্রীবিক্রমপুর (প্রতিবাদের উত্তর), শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল" শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামীর 'আসামে শ্রীচৈতন্য' গম্ভীরায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের 'মালদহের পল্লীকথা' কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর 'কায়স্থশব্দের নাম নিরুক্তি' বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়-প্রণীত "ঢাকার ইতিহাস (২য় খণ্ড)" শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর সঙ্কলিত "অশোক অনুশাসন", শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত-প্রণীত "প্রাচীন ভারত", শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ

সমাদ্দার-প্রণীত "সমসাময়িক ভারত" (খণ্ড) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত "প্রাচীন মুদ্রা" এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত "প্রাচীন সভ্যতা" এই কয়খানি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় উপন্যাস আকারে এক ইতিহাস লিখিয়াছেন—তাহার নাম দিয়াছেন "কলিকাতা—সেকালের ও একালের"। ইহা এক-খানি সংগ্রহ গ্রন্থ। গবেষণা-মূলক না হইলেও উপ-ভোগ্য।

মৌলবী মোক্তার আহাম্মদ সিদ্দিকে—সিরাজগঞ্জের এক ইতিহাস লিখিয়াছেন। ইহা না লিখিলে কোন ক্ষতি ছিল না।

রোহিণীকুমার রায় চৌধুরীর "বাকলা"র ইতিহাসে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

(৬) সাহিত্য—সাধারণ সাহিত্য ও আলোচনা-শাখায় শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর "বাতায়ন" ও "রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্যালোচনা" বিষয়ক নিবন্ধগুলি এবং "কাব্য পরিক্রমা" উল্লেখযোগ্য।

এ বৎসর সাহিত্য-বিভাগে এক অতি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম—"সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব" লেখকের নাম শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ। কঠোর পরিশ্রম-সহকারে লিখিত এমন সুন্দর গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনেকদিন প্রকাশিত হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে অধিকাংশ মাসিক পত্রেই সাধারণ সাহিত্য-বিষয়ক ভাল প্রবন্ধ কিছু কিছু বাহির হইয়াছে। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্তের 'সাময়িকী', উপাসনায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'আলোচনী', 'গৃহস্থে'র 'আলোচনা' এবং 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবাসীর বিবিধপ্রসঙ্গগুলির মত নির্ভীক সতেজ আলোচনা খুব কমই দেখা যায়। প্রবাসীর দেশের কথা, উপা-সনার পল্লীবাণী ও গৃহস্থের পল্লীকথা অতি প্রয়োজনীয় কথায় পূর্ণ থাকে। প্রবাসীর 'পঞ্চশস্য' ও 'ভারত-বর্ষে'র 'কল্পতরু' ও 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-অংশে দেশ-বিদেশের অনেক জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় তথ্য সঙ্কলিত হয়।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের "বৈষ্ণবপদাবলীর রস-বৈচিত্র্য", শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুরের "মুসলমান গণের সংস্কৃতজ্ঞান", স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের "উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণ" ও 'কৃত্তিবাস' —এই কয়টি গতবর্ষের ঢাকারিভিউও সম্মিলনে প্রকাশিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ।

মানসীতে প্রকাশিত নাটোরাধিপতির অহমিকা-শূন্য অনাড়ম্বর সরল জীবন-স্মৃতিকাহিনী 'শ্রুতিস্মৃতি' নাম দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহার ভাষা নিতান্ত তরল অথবা বিশেষ আড়ম্বর পূর্ণ হয় নাই বলিয়া সাহিত্য-সমাজে আদৃত হইতেছে।

'গৃহস্থে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর 'সমাজ ও সেবা', নারায়ণে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র-নাথ শীলের "হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব," শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষালের "বাঙ্গালার আদি নাটক", শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়' শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে সহমরণ', শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা', শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব," সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়ের 'জঙ্গিপুরের গ্রাম্যশব্দ', মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'সম্বোধন', শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের 'জ্ঞানদাসের পদাবলী' সবুজপত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের 'ঐতিহাসিকতা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত ইহা লইয়া 'সবুজপত্র', 'নারায়ণ', 'উপাসনা' ও অন্যান্য মাসিকপত্রে নানা প্রবন্ধে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। সম্প্রতি প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক নূতন বাঙ্গালা vowel dip-thong চালাইবার প্রয়াসী হইয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, ভাষার প্রাদেশিকতা যদি দোষের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়, তবে কলিকাতার কথিত ভাষা লিখিত

সাহিত্যের ভাষা বলিয়া গণ্য হইবে কি প্রকারে? অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণ সেই কথ্য ভাষাকে লিখিত সাহিত্যে বরণ করিয়া লইবেন কেন? এরূপে Split in the camp-সংসাধন দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নহে।

কাব্য ও কবিতা—আজকাল খণ্ডকবিতারই যুগ। সবুজপত্রে রবীন্দ্রনাথের ও মানসীতে মহারাজ জগদিন্দ্র-নাথের কতিপয় সুন্দর কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'হেঁয়ালি' এবং শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রের 'চীবর' বাহির হইয়াছে। দৃশ্যকাব্যের মধ্যে শ্রীমতী কামিনী রায়ের 'অম্বা' উল্লেখযোগ্য। নারায়ণ-সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশের 'মালা' ও 'অন্তর্যামী' অন্তর্বহিঃ উভয় সৌষ্ঠবেরই অধিকারী। আলোচ্যবর্ষে সত্যেন্দ্রনাথের সম্প্রতি-রচিত কবিতাগুলি 'অভ্র আবীর' ও অনুবাদ-কবিতাগুলি 'মণিমঞ্জুষা'-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এ দুখানিতে কবির অনেক উৎকৃষ্ট কবিতাই আছে। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক 'ভারতবর্ষে', শ্রীযুক্ত কুমুদ-নাথ লাহিড়ী 'উপাসনায়', এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বিভিন্ন মাসিকপত্রে—এই কবিত্রয় অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতা বঙ্গবাণীর চরণে উপহার দিয়াছেন।

এই খণ্ড-কবিতার যুগে এবার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ বসুর 'পৃথ্বীরাজ' নামক এক সুন্দর ঐতিহাসিক মহাকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি ইতি-হাসকে প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়া পৃথ্বীরাজের এবং তৎসঙ্গে হিন্দুস্বাধীনতার পতনের বর্ণনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় দুর্ব্বলতা, এবং তৎসহ জাতীয় নৈতিক অবনতি, স্বার্থ ও দুরাকাঙ্ক্ষা-জনিত ভীষণ পারিবারিক কলহ প্রভৃতি যে যে কারণে হিন্দুদিগের অধঃপতন সঙ্ঘটিত হওয়ায় মুসলমানেরা এদেশ আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, গ্রন্থকার তৎসমুদয় বিশেষভাবে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

রঙ্গব্যঙ্গ ও কৌতুক সাহিত্যে শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদারের 'গোবরগণেশের গবেষণা' ব্যঙ্গ-শাখার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। Humourএর সহিত Sarcasmএর এরূপ সমাবেশ আজকাল অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটকের 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' এবং সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর 'তুফান' রঙ্গকৌতুকে দুখানি উজ্জ্বলমণি।

ভ্রমণ—ভ্রমণ-বিষয়ক পুস্তক ও প্রবন্ধের মধ্যে বর্দ্ধমানাধিপতির 'য়ুরোপভ্রমণ' (১ খণ্ড) উল্লেখযোগ্য। ইহাতে তাঁহার অভিজ্ঞতা, সহৃদয়তা, অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর 'ভারত-বর্ষে' প্রকাশিত 'য়ুরোপে তিনমাস'-শীর্ষক মনোজ্ঞ নিবন্ধ-গুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

ভ্রমণ-শাখায় শ্রীমতী বিমলা দাসগুপ্তার 'নরওয়ে ভ্রমণ' আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তবে ইহার ভাষা ভ্রমণ-কাহিনীর উপযোগী হয় নাই। কোন কোন স্থলে এরূপ অসংযমের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যাহা মহিলার হস্ত হইতে প্রকাশিত হওয়ায় বিস্মিত হইতে হয়। এ বিষয়ে আমরা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'নারায়ণে' প্রকাশিত 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' প্রবন্ধের সহিত একমত।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের দুই খণ্ড 'বর্ত্তমান জগৎ' আলোচ্যবর্ষে ভ্রমণ-সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় গ্রন্থ। পাশ্চাত্য জগতের নূতন নূতন ভাবের পসরা আনিয়া তিনি আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। বিবিধ মাসিকপত্রে প্রকাশিত তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীগুলি চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ।

এবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ভ্রমণের এক চমৎকার, শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় তাঁহার তীর্থভ্রমণের এক রোজনামচা রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রেল-পথ ছিল না; সেই সময়ে ধর্ম্মপ্রাণ যদুনাথ কিরূপ কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আর্য্যবর্ত্তের তীর্থগুলি ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ভ্রমণ করিয়া কি দেখিয়া-

ছিলেন এই গ্রন্থে তাহা এরূপ সুন্দর ভাবে লিখিয়াছেন যে তাঁহার বর্ণনা পড়িলেই তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়। ভ্রমণের এরূপ কোন পুস্তক পূর্ব্বে বাঙ্গালায় প্রকাশিত হয় নাই। পূর্ব্বকালে মুঘলদের কেহ কেহ রোজনামচা রাখিত; এখন সাহেবদের অনুকরণে অনেকে রাখিয়াও থাকেন। কিন্তু সেকালে বাঙ্গালী যে আধুনিক সময়ের মত রোজনামচা রাখিতেন, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম শ্লাঘা ও গৌরবের কথা নয়। আশ্চর্য্য ব্যাপার—সর্ব্বাধিকারী মহোদয় যেমন সমস্ত তীর্থের বর্ণনা করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে অমনই তাঁহার সময়ে প্রসিদ্ধ নগর-গ্রামাদিরও পরিচয় দিয়াছেন। অধিকন্তু সে সময় কোথায় কোন্ জিনিষ পাওয়া যাইত এবং তাহাদের মূল্য কত ছিল তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে তাৎকালীন সমাজের বেশ একটি চিত্র পাওয়া যায়।

আলোচ্যবর্ষে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দের 'মার্কিন যাত্রা' শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাসের 'কেদার-বদরিকা পরিক্রমা' ও শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের 'পরশুরামকুণ্ড ও বদরিকাশ্রম' প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মিত্রও 'প্রবাস-প্রসূন' নামে একখানা ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়াছেন।

অর্থনীতি—অর্থনীতি বিষয়ে শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'দরিদ্রের ক্রন্দন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের ছাত্রগণের কার্য্যকরী শিক্ষা-সমস্যা ও লোকেদের জীবিকার্জ্জন-সমস্যা সাধনের জন্য অর্থনীতি এবং কার্য্যকরী শিক্ষা ও জীবিকার্জ্জনের প্রকৃত উপায়মূলক প্রবন্ধ ও পুস্তকাবলী বঙ্গসাহিত্যে অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ধর্ম্ম ও দর্শন—শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের 'শঙ্কর-দর্শন (২য় ভাগ)' প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে চিন্তাশীলতা ও গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় আছে।

'শঙ্কর ও রামানুজ'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ দর্শনের দিক্ দিয়া বঙ্গসাহিত্যে কিঞ্চিৎ উপাদান দিবার জন্য বহুদিন হইতে পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। আলোচ্যবর্ষে তিনি মথুরানাথ তর্কবাগীশ-কৃত টীকা ও রঘুনাথ শিরোমণি-কৃত দীধিতির বঙ্গানুবাদ সমেত নব্যন্যায়ের অন্তর্গত 'ব্যাপ্তিপঞ্চকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। মথুরানাথের টীকা ও রঘুনাথের দীধিতি পূর্ব্বে ভাষান্তরিত হয় নাই। এই দুইখানির প্রথম অনুবাদ হিসাবে এই গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলির টীকা-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গবাসি সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বেদান্ত, উপনিষদের দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে হইলে টীকা ও ভাষ্যের সাহায্য আবশ্যক। যাঁহারা সংস্কৃত-নবীশ ন'ন তাঁহাদের বোধ সৌকর্য্যার্থ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় কঠোর শ্রমস্বীকার করিয়া এ বৎসর শ্রীভাষ্যের অনুবাদ শেষ করিয়া মূল সহ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভাষ্যের বঙ্গানুবাদ এই প্রথম। শ্রীভাষ্য 'সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী'-ভুক্ত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিত 'উপদেশসাহস্রী'র বঙ্গানুবাদ সহ একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। এই গ্রন্থের অনুবাদও বঙ্গভাষায় এই নূতন।

জন্মভূমিতে শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামীর 'অষ্টাবক্র-সংহিতা' বঙ্গানুবাদ সমেত প্রকাশিত হইতেছে। 'ব্রহ্মবিদ্যা' মাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষালের 'বেদান্ত পরিভাষা'র বঙ্গানুবাদ বাহির হইতেছে। ঐ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ 'বাৎস্যায়ন ভাষ্যে'র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। এই দুইখানি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও বঙ্গভাষায় এই নূতন। ব্রহ্মবিদ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব' শীর্ষক প্রবন্ধ বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। তাঁহার 'ভারতীয় দর্শন' নামে বর্দ্ধমান-সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত অভিভাষণ বিশেষ গবেষণাব্যঞ্জক প্রবন্ধ। 'মানসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেনের 'জন্মান্তর' উল্লেখ্য। নারায়ণে

প্রকাশিত শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্তের 'শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক জৈনমত খণ্ডন', নব্যভারতে প্রকাশিত 'শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য' চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'বৌদ্ধ-ন্যায়', কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর 'শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম' ও শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন'; জগজ্জ্যোতিতে প্রকাশিত 'রিউথান কিমুরা'র 'ভারতবর্ষীয় 'বৌদ্ধদর্শনের ক্রমবিকাশ', শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়ার 'বৌদ্ধদর্শনের ঐতিহাসিকতত্ত্ব'; গম্ভীরায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিশ্রের 'হিন্দুশাস্ত্র' উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞান শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় একাই বঙ্গসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক রচনার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি 'গ্রহনক্ষত্র' নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অতি সহজ ও সরল ভাবে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে নক্ষত্র, নীহারিকা, উল্কা প্রভৃতি অতি সুন্দর ও বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই একখানি গ্রন্থ এবার বিজ্ঞান-বিভাগের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 'বায়ুজগৎ', 'জড়জগৎ' ও 'বৈজ্ঞানিকের আকাশ' বঙ্গসাহিত্যের অপূর্ব্ব সামগ্রী। 'ভারতবর্ষ' এই তিনটি প্রবন্ধ বক্ষে ধারণ করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের 'দেশে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা' নামক বর্দ্ধমানের সাহিত্যসম্মিলনের অভিভাষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নব্যভারতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'হিন্দুদিগের নভোবায়ু-বিজ্ঞান' বিশেষ পরিশ্রমলব্ধ প্রবন্ধ।

প্রাচীন গ্রন্থ—এই বিভাগে সাহিত্য-পরিষৎ আশানুরূপ কার্য্য করিয়াছেন। পরিষৎ এবার শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম-সম্পাদিত ও কবিবল্লভ-বিরচিত 'সত্যনারায়ণের পুঁথি' শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত ৺বিজয়রাম সেন বিশারদ-প্রণীত 'তীর্থমঙ্গল', শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম-সম্পাদিত দ্বিজ রতিদেব-বিরচিত 'মৃগলুব্ধ' ও রামরাজা-বিরচিত 'মৃগলুব্ধ-সংবাদ', মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র-বিরচিত 'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা' এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'পদকল্পতরু' প্রকাশ করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন পরিষৎ এবৎসর একরূপ অসাধ্যসাধন করিয়াছেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ ব্যাস নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া ভারতীয় বহু ভাষার এক 'সঙ্গীতকোষ' গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন। দানবীর লালগোলার রাজাবাহাদুর মহোদয়ের ১২৮০০৲ মুদ্রা-সাহায্যে এই গ্রন্থ সাহিত্য পরিষদ্-গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ আমাদের অমূল্য সম্পদ্।

অভিধান—এবৎসর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের 'বাঙ্গালা শব্দকোষের' চতুর্থখণ্ড পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদের 'বাঙ্গালা শব্দকোষের' পর বৈজ্ঞানিক রীতিক্রমে সঙ্কলিত এই গ্রন্থই বাঙ্গালাভাষার প্রথম অভিধান। প্রথম বলিয়াই ইহাতে নানা ত্রুটির সম্ভাবনা। এই ত্রুটির সম্যক আলোচনা বাঞ্ছনীয়। যোগেশ বাবু অদ্ভুত পরিশ্রমে যে মহৎকার্য্য সম্পাদন করিলেন, সেই আলোচনাই তাঁহার সম্যক্ পুরস্কার দিবে। পরিষৎ এই গ্রন্থ-প্রকাশে ভবিষ্যৎ ভাষাতত্ত্ববিদের মহৎ উপকার করিলেন।

শিশু-সাহিত্য—এ বিভাগে কয়েক বর্ষ হইতে যুগান্তর আসিয়াছে বলিলেই চলে। এমন বৎসর যায় না যে বৎসর অন্ততঃ একশতখানি ছেলেদের পাঠের জন্য সচিত্র বই না বাহির হয়। এ বৎসর শ্রীযুক্ত জলধর সেনের 'কিশোর' (গল্পের বই), শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের 'জুল্‌স্ ভার্ণ' হইতে 'আশীদিনে ভূপ্রদক্ষিণ' ও 'বেলুনে পাঁচসপ্তাহ' এবং শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভূতপত্রী' (গল্পের বই) ও ভারতীতে প্রকাশিত 'নালক' (কথা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নূতনপুথি-সংগ্রহ—গতবর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে নিম্নলিখিত পুথিগুলি সংগৃহীত হইয়াছে—

১। মহাভারতোপাখ্যান নাটক।

২। বিদ্যাবিলাপ নাটক।

৩। মাধবানল কামনন্দলী।

৪। রামচরিত নাটক।

৫। তালাস্থকরণ।

পুথিগুলি নাটক নামে পরিচিত। অবশ্য এগুলি কাব্যশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। এগুলিতে রণজিৎমল্লের ভণিতাযুক্ত বহুপদের সমাবেশ আছে। ভাষা বাঙ্গালা—অক্ষর নেওয়ারী। প্রাপ্তিস্থান নেপাল। সম্ভবতঃ উপরিলিখিত গ্রন্থসমূহ এইরূপ পুথির প্রাচীনতম নিদর্শন।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

মিলন-মাঙ্গলিক

অয়ি চির-আকাঙ্ক্ষিতা মানসী আমার!
অয়ি লক্ষ জনমের মৌন সাধনার
বাঞ্ছিতা প্রেয়সী মোর! জানিনা সে কবে,
কবে সে সৃজন-প্রাতে অতুল গৌরবে,
প্রথম বসন্তদিনে প্রথম উষায়,
তরঙ্গিত বারিধির নবীন বেলায়
মোরা দোঁহে লভিনু জনম। চাহি' ধীরে
স্তব্ধ ম্লান উষালোকে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে
দুজনারে হেরিনু দুজন। চারিপাশে,
নিখিল অম্বরে আর উতলা বাতাসে
বহি' গেল আনন্দের আকুল কম্পন,
শিহরি' উঠিল ধরা, নবীন চেতন
সহসা রোমাঞ্চি' ওঠে শ্যামতৃণ-দলে,
ধরণীর গুপ্ত বক্ষে, মৌন জলস্থলে
অকস্মাৎ ফুটি ওঠে সৃজন আভাষ,—
রূপ-রস-শব্দ-গন্ধে প্রথম বিকাশ
মাতৃত্বের। কলকণ্ঠে জাগিল কানন,
কুসুম মেলিল আঁখি, স্তব্ধ অগণন
তরুলতা রোমাঞ্চিয়া মেলিল মঞ্জরী,
ভ্রমর সে কোন্ কথা বেড়াল গুঞ্জরি'
মালতীর কাণে কাণে। মোরা দোঁহে চাহি'
হেরিনু নিখিলে আর নাহি কিছু নাহি,—
শুধু দুটি কম্প্র হিয়া পুলকচঞ্চল
নিখিল মিলন মাঝে জাগে অবিরল,
আপনারে করিয়া গোপন।

তারপর
কত বর্ষ, কত যুগ, কত জন্মান্তর,
প্রেমের নন্দনবনে পারিজাত সম
দুজনে রহিনু ফুটি', নিত্য অনুপম
আপন বরণে গন্ধে আপনি বিভোর;
সহসা উঠিল জাগি কঠিন কঠোর
নিয়তির অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ! ধীরে ধীরে
আকুল নিঃশ্বাসে আর তপ্ত আঁখি-নীরে
প্রথম গোপন বক্ষে একান্তে বিরলে
বিরহ সে লভিল জনম। পলে পলে
দোঁহাকার মাঝখানে অতল অপার
ব্যবধানে বিরচিল ক্ষুব্ধ পারাবার।
ব্যর্থ সে কাতর কণ্ঠে আকুল আহ্বান,
বিফল সে বাহু মেলি নিত্য অবিরাম
প্রতীক্ষার আঁখিজল। দূরে দূরে দূরে,
অনন্ত গগন-পথে স্তব্ধ মেঘপুরে
জ্যোতিকণা তরঙ্গিত ছায়াপথ ধরি'
কক্ষে কক্ষে উল্কা সম নিরত সঞ্চরি'
প্রেয়সীরে যুগ যুগ করিনু সন্ধান,—
দীর্ঘ সেই বিরহের তবু অবসান
নাহি হল।

তারপর কত জন্মশেষে,
কঠোর তপস্যা করি' প্রিয়ার উদ্দেশে
কত জন্ম জন্মান্তের সাধনার বলে

রাজপুরে লভিনু জনম। পুণ্যফলে
একদা মঙ্গলক্ষণে গোধূলি সন্ধ্যায়
রাজার নন্দন কবে উদ্বাহ-সভায়
লভিল প্রিয়ারে তার। শত জনমের
আকুল পিপাসা তার ক্ষুব্ধ মরমের
নিমেষে জুড়ায়ে গেল, অলক্ষ্যে সবার,
মিলনের অমৃত ধারায়। নাহি আর
সুদীর্ঘ বরষ মাস দীর্ঘ বিভাবরী
শুধু নিজ আকাঙ্ক্ষিতা প্রেয়সীরে স্মরি'
অশ্রু-বিমোচন। শুধু প্রমোদশালায়
মুখোমুখি বসি দোঁহে লতাকুঞ্জ-ছায়
চোখে চোখে আলাপন।

কত বর্ষ মাস
এমনি কাটিয়া গেল; গভীর তিয়াস
তখনো মেটেনি বুকে। একদিন দোঁহে
নিবিড় বাহুর পাশে সুখ-স্বপ্ন-মোহে
ছিনু অচেতন; সুদূর আকাশ মাঝে
শুনিনু স্বপন-ঘোরে মৃদু মৃদু বাজে
মধুর বীণার ছন্দে মরণ আহ্বান
স্নিগ্ধ সুগভীর; তন্দ্রায় বিভল প্রাণ
সহসা নন্দনগন্ধে উঠিল জাগিয়া,
হেরিনু বাহুর পাশে নয়ন মেলিয়া
ফুল্ল-পারিজাত-মালা পীন-বক্ষোপরে,
প্রাণহীনা প্রিয়া মোর; নয়নে অধরে
নাহি' সে জীবন-জ্যোতি; তীব্র হাহাকার
বাহিরিল বক্ষ ভেদি', জনম আবার
কাটিল নয়নজলে মর্ম্মবেদনায়,
সুদূর মিলন মাগি।

তারপর হায়
কত জন্ম তপোবনে, কোন যক্ষপুরে
জনম লভিনু পুনঃ—দূরে—অতি দূরে,
স্বপনের অলকায় মেঘের মাঝায়।
আবার লভিনু বুকে প্রিয়ারে আমার।
আবার হারানু তারে; রাজ-আজ্ঞা ধরি'
সুদূর অলকাপুরে প্রেয়সীরে ছাড়ি'
রামগিরি সানুদেশে লভিনু নিবাস।
প্রথম আষাঢ় দিনে বরষা-আকাশ
পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘস্তর চলিল বাহিয়া
বিরহীর মর্ম্মকথা, বিজনে কাঁদিয়া
কাটিল জনম মোর।

কত জন্ম পরে
উদগ্র সাধনাবলে বিরহ অন্তরে
এসেছে মিলন আজি চির অন্তহীন
দোঁহা মাঝে দোঁহাকারে করিতে বিলীন
প্রেমের অমৃতলোকে। হে প্রিয়া আমার!
অয়ি চিরজনমের চিরসাধনার
মানস-দেবতা মোর! শুধু তোমা পানে
গোপন ভক্তের মত কত ছন্দে গানে
নিশিদিন দিয়াছি অঞ্জলি, আজি তাই
বিপুল হরষে বুঝি আপনা হারাই।
আজি শুধু মনে হয় বুঝি তব মাঝে
অন্তর-বাসনারাজি মূর্ত্ত হয়ে রাজে;
নিখিল বৈচিত্র্যময়ী ধরণী লীলায়
নত হয়ে আছে দুটি চরণ তলায়
ধন্য মানি আপনারে। ওই আঁখিপাতে
ফোটে মর্ম্ম-শতদল বসন্ত প্রভাতে
প্রস্ফুট কমল সম। অমৃত ধারায়
অমর করিলে প্রিয়া প্রেম-অমরায়।
অনাদি প্রেমের আজি অনন্ত মিলন,
তারি সনে লভিয়াছি অনন্ত জীবন।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

পাটলীপুত্র ও ভারতে জরথুস্ত্রীয় রাজবংশ

৩

স্পুনার সাহেব এই কল্পিত ত্রিস্তবকমূর্ত্তিধৃত সভাগৃহের সহিত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞকালীন নির্ম্মিত সভাগৃহের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি ময়দানবকে পারসীক শিল্পী প্রমাণিত করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে ময়দানব যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার নাম যদি "অসুর ময়" ধরা যায় (কারণ সংস্কৃতে অসুর ও দানব একার্থ-বাচক) তাহা হইলে "অসুর মজ্‌দ্" কথাটার সহিত বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়। ডাক্তার টেলার বলিয়াছেন, পূর্ব্বতন পারসীকগণ ও সংস্কৃতভাষী হিন্দুগণ কোন একটা শব্দ যে নিয়মে বিভিন্ন উচ্চারণ করিতেন তাহাতে সংস্কৃতের "মেধা" শব্দ পারস্যে গিয়া "মজ্‌দ্" হইবার কথা। এখন ভারতবাসীরা অনেক ইংরাজী শব্দের জে (j) জেড্ (z) প্রভৃতি অক্ষরের স্থানে নিজ নিজ ভাষায় "য" (y) দিয়া লেখে বা "য়" উচ্চারণ করে। সুতরাং যে পারসীক শিল্পীরা পাসিপোলিসের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা যখন পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিল, তখন তাহারা পাটলীপুত্রবাসীকে বলিল, "এসব প্রাসাদ কি আমরা করিয়াছি? এসব কার্য্য 'অসুর মজ্‌দ্' করিয়াছেন।" অর্থাৎ ঈশ্বরকৃপায় হইয়াছে। পাটলীপুত্রবাসী "মজ্‌দ্" হইতে "ময়" করিয়া ফেলিল। আর যখন "অসুর" কথাটাই "অহুর"-এর সমান, তখন পাটলীপুত্রবাসী ঠিক করিল, "এ সকল প্রাসাদ 'অসুর ময়' নির্ম্মাণ করিয়াছে।" চৈনিক পরিব্রাজকগণ যখন ৭০০ বৎসর পরে পাটলীপুত্রে আসিয়া শিল্পীর নাম খুঁজিতে লাগিল, তখন পাটলীপুত্রবাসী "অসুর ময়ের" পরিবর্ত্তে কেবল "অসুর"-এর নাম করিল। তাহারা ঠিক করিল ভূতে বা দৈত্যদানবে এ সকল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছে, মানুষে করে নাই। আর মহাভারতের গ্রন্থকর্ত্তা পাটলীপুত্রের নাগরিকের নিকট সংবাদ পাইয়া লিখিয়া ফেলিলেন যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসভা "ময় দানব" করিয়াছে।

ময়দানব

ফলে দাঁড়াইল এই,চৈনিক পরিব্রাজক ও মহাভারতকার কেহই সম্পূর্ণ "অহুর মজ্‌দ্" নামটা রাখিতে পারিল না। চীনদেশের লোকে তাহাদের দেশের ভাষায় নামটা একেবারে বদলাইয়া ফেলিয়া বলিল "কিউআই শেন।" আর পাটলীপুত্রবাসী যদিই বা "অহুর" স্থানে "অসুর" রাখিয়াছিল, মহাভারতকার সেটুকুও বদলাইয়া "দানব" করিয়া ফেলিলেন। যদিও স্পুনার সাহেব স্পষ্ট কথাটা খুলিয়া বলেন নাই, তথাপি তিনি হপকিন্স্ সাহেবের মত উদ্ধৃত করায় বুঝা যাইতেছে, তাঁহার মতে মহাভারত মৌর্য্যযুগের পরে লিখিত। সুতরাং হিন্দুরা যদি আপত্তি করেন যে, যুধিষ্ঠির চন্দ্রগুপ্তের অন্ততঃ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার সময়ের শিল্পী ময়দানব কেমন করিয়া চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আপত্তি টিকিবে না। কীথ সাহেব একটা বড় সুন্দর যুক্তি বলিয়াছেন। তিনি বলেন পাটলীপুত্রবাসী কি এমনই ভাষাতত্ত্ববিৎ ছিল যে তাহারা পারসীকদের "অহুর" ও সংস্কৃতের 'অসুর' এক ঠিক করিয়া 'অহুর' স্থানে অসুর উচ্চারণ করিল? কারণ পারসীকগণ উচ্চারণের অসামর্থ্য-নিবন্ধন 'অসুর' স্থানে 'অহুর' করিয়াছে, কিন্তু পাটলীপুত্রবাসী ত অসামর্থ্য-নিবন্ধন "হ" স্থানে "স" উচ্চারণ করিবে না।

যুধিষ্ঠিরের সভায় মূর্ত্তি

যাহা হউক তৎপরে স্পুনার সাহেব মহাভারত হইতে নানা শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে ময়দানব পূর্ব্বে দানবদিগের প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এমন কি যুধিষ্ঠির ময়দানবকে বলিয়াছিলেন, "দানবদিগের প্রাসাদের

অনুকরণ করিয়াই অর্থাৎ পার্সিপোলিসের প্রাসাদের অনুকরণে এখানে সভাগৃহ নির্ম্মাণ কর;" যথা মহাভারতে আছে।—

যত্র দিব্যানভিপ্রায়ান্ পশ্যেম বিহিতাংস্ত্বয়া।
আসুরান্মানুষাংশ্চৈব তাদৃশীং কুরু বৈ সভাং॥

পার্সিপোলিসের প্রাসাদের তথা চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের ত্রিস্তবকমূর্ত্তিধৃত চিত্র যেমন পারস্যে খোদিত আছে, তেমনই তাহার বর্ণনা মহাভারতের মধ্যেও লুক্কায়িত আছে। যথা—

তাং স্ম তত্র ময়েনোক্তা রক্ষন্তি চ বহন্তি চ।
সভামষ্টৌ সহস্রাণি কিঙ্করা নাম রাক্ষসাঃ॥ এবং
স্তম্ভৈর্ন চ ধৃতা সা তু শাশ্বতী নচ সা করা।
দিব্যৈর্নানাবিধৈর্ভাবৈর্ভাসদ্ভিরমিতপ্রভৈঃ॥
অতি চন্দ্রং চ সূর্য্যং চ শিখিনঞ্চ স্বয়ংপ্রভা।
দীপ্যতে নাকপৃষ্ঠস্থা ভর্ৎসয়ন্তীব ভাস্করম্॥

স্পুনার সাহেব প্রথম শ্লোকের "বহন্তি" শব্দের অর্থ করেন "ধারণ করা।" কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে আছে, "ময়দানবের আদেশ অনুসারে অষ্টসহস্র কিঙ্কর ও রাক্ষস ঐ সভার রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং আবশ্যক মত বহন করিয়া উহাকে স্থানান্তরেও লইয়া যাইত।" ময়দানব সভার উপকরণ কৈলাসের উত্তরাংশ মৈনাক সন্নিধানে বিন্দুসরোবরের নিকট হইতে আনিয়াছিল। সেখানকার স্ফটিকময় সভা নির্ম্মাণোপযোগী সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী এবং রাক্ষসরক্ষিত ধন ময়দানব ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করিয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয়, যে সকল রাক্ষস ধন রক্ষা করিয়াছিল তাহারাই সভার উপকরণ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহারাই সভানির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারাই সভা রক্ষণাবেক্ষণ করিত। কিন্তু এরূপ অর্থ করিলে স্পুনার সাহেবের কল্পিত সাদৃশ্য অন্তর্হিত হয়। আবার পরের শ্লোকেও তিনি "ভাবৈঃ" কথাটার অর্থ করিতে চাহেন 'প্রাণীদ্বারা' অর্থাৎ মূর্ত্তিদ্বারা। সুতরাং দাঁড়াইল এই যে যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহও মূর্ত্তিদ্বারা ধৃত হইয়াছিল। স্তবক না হউক একস্তবক মূর্ত্তির মাথায় ছাদ ছিল। অবশ্য মহাভারতকার চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ দেখিয়াই হউক আর বর্ণনা শুনিয়াই হউক, যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহের কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন।

ফা-হিয়ান ও মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় মূর্ত্তি উল্লেখের অভাব

কিন্তু একটা বিষয়ে বিষম সন্দেহ হয়। মহাভারতকার সম্ভবতঃ বর্ণনা শুনিয়াই লিখিয়াছিলেন। স্বচক্ষে দেখিলে তিনি তিন স্তবক মূর্ত্তির কথা নিশ্চয়ই লিখিয়া যাইতেন। আর ইহাও ধরিয়া লইতে হইবে যে মহাভারতকার চন্দ্রগুপ্তের কিছুকাল পরেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যাহা হউক যে সভার বর্ণনা মহাভারতে স্থান পাইল, সেরূপ প্রাসাদের কোনই উল্লেখ মেগাস্থিনিস করিলেন না—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? ফা-হিয়ানও এই প্রাসাদ দেখিয়া গিয়াছিলেন, এমন অত্যাশ্চর্য্য প্রাসাদের সহস্র সহস্র মূর্ত্তির কথা একবারও তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না!

৪

মৌর্য্য কথার অর্থ

চন্দ্রগুপ্তকে হিন্দুরা মৌর্য্য, বলেন কারণ তাঁহাদের মতে তাহার মাতার নাম ছিল মুরা। এই মুরা শূদ্রাণী ও মহাপদ্ম নন্দের স্ত্রী। হিন্দুরা সকলেই চন্দ্রগুপ্তকে নীচকুলোদ্ভব বলিয়া গিয়াছেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণও প্রায় চন্দ্রগুপ্তের সমসময়েই এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কৌন্তেয়, গাঙ্গেয়, পার্থ মাতৃনামে পরিচিত হইলেও স্পুনার সাহেব একথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; তাহার কারণ তিনি চন্দ্রগুপ্তকে পারসীক বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সুতরাং মৌর্য্যশব্দের পারসীক ব্যুৎপত্তি নির্দ্ধারণ করিতে তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছেন।

হখামনিষীয় খোদিত লিপিতে "মর্গু" বলিয়া একটা কথা আছে। আবার কোন পুস্তকে আছে "মর্গু" মার্ভের অধিবাসীর নাম। আবার "মার্ভ" কথাটা মেরু ও মৌর উভয় আকারেই দেখা যায়। সুতরাং পুরাণের মেরু হইল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে আফগানিস্থানের উত্তর দিক্‌বর্ত্তী "মার্ভ" নগর। ইহার নিকটে মেরু চক্ নামে একটি ক্ষুদ্র নগর আছে।

উভয় নগরই "মুর্গব্" নামক এক ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। ষ্টীনের মধ্য-এসিয়ার আবিষ্কারের কথা শুনিয়াও স্পুনার সাহেব বলিতেছেন—এ নগরের যখন কোন প্রসিদ্ধিই নাই তখন ইহা হিন্দুপুরাণের মেরু হইতে পারে না। পার্সিপোলিসের সন্নিকটে মার্ভদশু ও মেশেদ-এ-মুর্ঘাব্ নামক দুইটি সমতল ক্ষেত্র আছে। এইখানেই চন্দ্রগুপ্তের পৈতৃক নিবাস ছিল। তজ্জন্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য উপাধি পাইয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ চন্দ্রগুপ্তের মাতা "মুরা" হইতে "মৌর্য্য" শব্দের ব্যুৎপত্তি স্বীকার না করিলেও মেরু শব্দ হইতে কেহই "মৌর্য্য" শব্দের ব্যুৎপত্তি করিবার কথা মনেও স্থান দেন নাই। কারণ মেরু হইতে মৌর্য্য কিছুতেই হয় না, এজন্য কেহ "মোর" পর্ব্বত, কেহ "ময়ূর" হইতে মৌর্য্য শব্দ হইয়াছে বলিয়াছেন। আর যদি দেখা যায় উভয় ভাষায় একই প্রকার শব্দ আছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ভারতীয় ও ইরাণদেশীয় আর্য্যগণ যখন এক স্থানে ছিলেন তখন হইতে এই শব্দগুলি নানা আচার-ব্যবহার ও প্রবাদের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং "মেরু" শব্দের সমান কথা পারস্যদেশে পাইলেই কি ধরিতে হইবে যে ভারতবাসী এই মেরু শব্দ পারস্য হইতে আনিয়াছে? পুরাণে যেখানে যেখানে মেরু শব্দের উল্লেখ আছে সেইখানেই বুঝিতে পারা যায় মেরু ভারতবর্ষের উত্তর দিকে। পশ্চিমে ইরাণের সহিত ভারতের কখনও কোন সাক্ষাৎসম্বন্ধ ছিল, পুরাণের কোন আখ্যায়িকা হইতে ইহা বুঝিবার উপায় নাই।

চন্দ্রগুপ্ত যে পারসীক ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে—চন্দ্রগুপ্ত পারসীক রাজাদিগের ন্যায় কেশ ধৌত করিতেন ও স্ত্রী প্রহরিণী রাখিতেন। মেগাস্থিনিসের কোন বর্ণনায় প্রথমটির উল্লেখ পাই নাই। দ্বিতীয়টি এত বলবৎ প্রমাণ নহে; কারণ চন্দ্রগুপ্ত সর্ব্বদাই চক্রান্তের ভয় করিতেন, তিনি শয়নকালে কতবার শয়ন-গৃহ পরিবর্ত্তন করিতেন, সুতরাং পুরুষ-প্রহরী অপেক্ষা স্ত্রী রক্ষী রাখাই তিনি সমীচীন মনে করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের পারসীক আচার

মুদ্রারাক্ষসে লিখিত আছে চন্দ্রগুপ্ত শক, যবন, কাম্বোজ বাহ্লীক ও পারসীক সৈন্য সাহায্যে পাটলীপুত্র অধিকার করেন; কিন্তু স্পুনার সাহেব তাঁহার প্রবন্ধে অন্য জাতীয় সৈন্যের নাম উল্লেখ না করিয়া বলিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত পারসীক সৈন্যের সাহায্য লইয়াছিলেন। মুদ্রারাক্ষসে একথার উল্লেখ আছে যে, চন্দ্রগুপ্তের পরম শত্রু নন্দের মন্ত্রী রাক্ষস, পাঁচজন ম্লেচ্ছরাজগণের অন্যতম পারসীকরাজ মেঘাক্ষের সহিত সন্ধিসূত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাতে কি বুঝায় না যে পারসীকগণ অর্থ পাইলেই সকলের পক্ষই অবলম্বন করিত? আর প্রকৃতপক্ষে কি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পারসীক রাজা কেহ ছিলেন? আলেকজান্দারের পারস্যজয়ের পরে হখামনীষীর বংশের সম্পূর্ণ পতন হয়। আলেকজান্দারের সহিত যুদ্ধকালে দেখা গিয়াছে ডেরায়াসের সৈন্যদলে বহু বেতনভোগী গ্রীক সৈন্য ছিল। পারসীক সৈন্যগণ গ্রীকসৈন্য অপেক্ষা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের সৈন্যগণ পূর্ব্বের পারসীকরাজের বেতনভোগী সৈন্য হইতে পারে কিন্তু তাহারা পারসীক জাতি নহে বলিয়াই মনে হয়।

পারসীক সৈন্য

স্পুনার সাহেব বলেন, যখন দেখা যাইতেছে হিন্দুগণ চন্দ্রগুপ্তের কথা প্রায়ই উল্লেখ করেন নাই, কহ্লান ও ৫২ জন রাজার নাম বাদ দিয়াছেন; তখন বুঝিতে হইবে মৌর্য্য বংশ পারসীক বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই।—এ বড় আবদারের কথা। "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ। বংশানুচরিতং চেতি" পুরাণের লক্ষণ বলিয়া কি সকল পুরাণে এক বংশের এক ব্যক্তিরই বর্ণনা দিতে হইবে? সর্গ, বংশ, বংশানুচরিত বর্ণনা করিয়া পুরাণকার বিশেষ উপাসনা, পূজা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতির বর্ণনা করিতেন। পূর্ব্বের আখ্যায়িকাগুলি কোথাও সংক্ষেপ, কোথাও বিস্তারিতভাবে দিবার পরে ভবিষ্যৎ রাজবংশ অর্থাৎ শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য্য, কণ্ব, অন্ধ্র প্রভৃতি

[চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে পুরাণকারের মৌনাবলম্বন]

রাজগণের বর্ণনার স্থান আর থাকিত না। নন্দ ও মৌর্য্য বংশ ত নীচকুলোদ্ভব বলিয়া তাঁহারা অবজ্ঞা করিয়াছেন; কিন্তু কণ্ব বা অন্ধ্রবংশকে ত ঘৃণা করেন নাই; তবে তাঁহাদের বিস্তারিত বর্ণনাই বা করেন নাই কেন? ইঁহাদের বিস্তৃত বর্ণনার অভাবে কি ইঁহাদিগকেও পারসীক বলিয়া ধরিতে হইবে? রাজতরঙ্গিনীকার কহ্লন স্বয়ং কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, "গ্রন্থলোপ নিবন্ধন দ্বিতীয় গোনন্দের পরবর্ত্তী নৃপতির নাম বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে"। সেখানে ত আর পুস্তক সুলভ ছিল না! আর গ্রন্থলোপ না হইলেও কহ্লন কাশ্মীরের রাজগণের বিবরণ লিখিতেন। কাশ্মীর রাজগণের সহিত অন্য রাজগণের সম্বন্ধ না থাকিলে তিনি অন্য রাজগণের উল্লেখ নিশ্চয়ই করিতেন না।

স্পুনার সাহেব বলিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত পারসীক না হইলে আজ কৃষ্ণ শিবের ন্যায় পূজিত হইতেন।—অতি অদ্ভুত কথা বটে। হিন্দু কখনও যোদ্ধাকে পূজা করেন নাই; বরঞ্চ পুণ্যাত্মা ঋষিগণের, দরিদ্র সন্ন্যাসীর চরণে মস্তক নত করিয়াছেন—এখনও করেন। চন্দ্রগুপ্ত কি এমন কোন কায করিয়াছিলেন যাহার জন্য তিনি পূজা পাইবার অধিকারী? ভারতসম্রাট্ যুধিষ্ঠির বা তাঁহার সহোদর ভীমার্জ্জুন পূজা পান নাই; বরং মিথ্যা বাক্য বলার জন্য যুধিষ্ঠির নরক দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া আজও তিনি হিন্দুর মনে জাগিয়া আছেন। অথচ গোপ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ পূজা পাইয়া থাকেন। আর জৈন ইতিহাসে আস্থাস্থাপন করিলে মানিতে হয় যে, চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। অশোক ত বৌদ্ধ ছিলেনই। সুতরাং হিন্দুদিগের মতে ইহাঁরা বিধর্ম্মী। ইহাঁদিগের সম্বন্ধে অধিক বর্ণনা আশা করাই অসঙ্গত। তথাপি আমরা দেখিতে পাইতেছি মৎস্য, বিষ্ণু, ভাগবত ও ভবিষ্যপুরাণে ইঁহাদের বিবরণ আছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চাণক্যের এমনই প্রভাব ছিল যে, মৎস্য-পুরাণকার চন্দ্রগুপ্তের স্থলে কৌটিল্যকেই রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

চন্দ্রগুপ্ত যে পারসীক ইহার যুক্তিগুলি অত্যন্ত ভিত্তিহীন বলিয়া স্পুনার সাহেব চাণক্যকেও পারসীক করিতে চাহেন। তাঁহার যুক্তি এই—

চাণক্য — চাণক্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন—"যিনি তিন বেদ এবং ষড়ঙ্গে বিশেষ শিক্ষিত এবং যিনি অথর্ব্ব বেদানুযায়ী ক্রিয়া-কর্ম্ম দ্বারা দৈব বা মনুষ্যঘটিত বিপদ নিবারণ করিতে পারেন রাজা তাঁহাকেই পুরোহিত করিবেন।" ইহাতে দেখা যাইতেছে যে অথর্ব্ববিদ্ ব্রাহ্মণকে যখন পুরোহিত করিতে বলা হইয়াছে, তখন চাণক্য স্বয়ং অথর্ব্ববিদ্ ছিলেন। আর কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের প্রারম্ভে দেবগুরু বৃহস্পতি ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে প্রথমে নমস্কার করিয়াছেন—এই দুইটির সহিত জ্যোতিষের সম্বন্ধ আছে। অবশ্য ষড়ঙ্গের মধ্যেও জ্যোতিষের নাম আছে। পূর্ব্বের পারসীকগণ জ্যোতির্ব্বেত্তা ছিলেন। আবার অথর্ব্ব-বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড মীডদিগের পুরোহিত জাতি মাজী-দিগেরই অনুরূপ। উপরন্তু কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রের প্রথম শ্লোকেই "আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তাঃ" বলিয়া তিনি বেদের আগে "আন্বীক্ষিকী" বসাইয়া বেদের অবমাননা করিয়াছেন; কারণ আন্বীক্ষিকী শব্দে সাংখ্য যোগ ও নাস্তিকতা বুঝায়। এদিকে আবার অথর্ব্ববেদের অপর একটি নাম অথর্ব্বাঙ্গীরস। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে আঙ্গীরস শাকদ্বীপের একটি বেদ অর্থাৎ ইহা পারসীক বেদ; কেন না শাকদ্বীপটা স্পুনার সাহেবের মতে পারস্য দেশ। ফলে দাঁড়াইল এই যে, চাণক্য পণ্ডিত পারস্যের অন্তর্গত মীডদেশীয় মাজী পুরোহিত বা পারসীক ব্রাহ্মণ!

সাহেব অর্থশাস্ত্রের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেই প্রতীয়মান হয় যে চাণক্য অন্যত্র তিন বেদকেই অধিক সম্মান করিয়াছেন। রাজপুরোহিতের গুণবর্ণনায় প্রথমে তিন বেদের উল্লেখ করিয়া পরে অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। আর চাণক্য এ পুস্তকখানি লিখিবার সময় অন্যান্য পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে সাধারণ লোকেও অথর্ব্ববেদকে বেদ বলিয়া স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কৌটিল্য সাধারণ বিশ্বাসানুযায়ী মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

এখন সকলেই স্বীকার করেন, হিন্দুগণ পূর্ব্ব হইতেই জ্যোতিষের অনুশীলন করিতেন ; সুতরাং যদি কৌটিল্য জ্যোতিষের কথাই তুলিয়া থাকেন তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে তিনি পারসীক ? সাহেব অথর্ব্বাঙ্গীরস শব্দের যাহা অর্থ করিয়াছেন তাহা অশুদ্ধ। অথর্ব্ববেদের মধ্যে পাঁচটি কল্প আছে ; তাহার মধ্যে চতুর্থ কল্পের নাম আঙ্গীরসকল্প। আঙ্গীরস যে শাকদ্বীপের বেদ একথা বিষ্ণুপুরাণে কোথাও পাই নাই। শাকদ্বীপ সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিব।

পেশোয়ারে প্রাপ্ত কতকগুলি অঙ্ক চিহ্নিত (Punch-marked) মুদ্রার সহিত তিনি মৌর্য্য ও হখামনীষীয় উভয় বংশেরই সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহেন। তিনি বলেন যখন মৌর্য্যবংশের বিনা মুদ্রায় চলিবার সম্ভাবনা ছিল না, তখন এগুলি মৌর্য্যদিগেরই মুদ্রা আর এইগুলি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মুদ্রা। মৌর্য্যগণ ইহার পরের কোনরূপ মুদ্রাই ব্যবহার করেন নাই। এই মুদ্রাগুলির কতকগুলিতে একরূপ লাঞ্ছন আছে। এগুলি সকলে এতদিন বলিত সূর্য্য, বোধিদ্রুম শাখা (স্পুনার সাহেব স্বয়ং বলিয়াছেন) চৈত্য, যণ্ড ইত্যাদি। এখন তিনি বলিতে চাহেন, সূর্য্য পারসীকদিগের দেবতা, চৈত্য পারস্যের পাসিপোলিস সন্নিকটস্থ মেরু, যণ্ড পারস্য দেবতা মিথ্রের যণ্ড এবং অন্ত প্রমাণের জন্ম তিনি বলেন পারস্যের সসনীয় বংশীয় রাজগণও যণ্ডমূর্ত্তি তাঁহাদের মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়াছিলেন। আর শাখাটা বোধিদ্রুম নহে—হোম শাখা।

মুদ্রা

এখন স্পুনার সাহেব যেরূপ যুক্তিবলে এগুলিকে মৌর্য্য-মুদ্রা বলিতে চাহেন, তাহা কেহই মানিবেন না। তিনি তাঁহার রিপোর্টের একস্থানে লিখিয়াছেন, "পারস্য রাজের শয়নকক্ষে যেমন সুবর্ণের দ্রাক্ষালতা ছিল, কুমরাহারে তাম্রের পত্রাকার দুএকটি দ্রব্য পাইয়া আমার মনে হইয়াছে এগুলি স্বর্ণমণ্ডিত দ্রাক্ষালতার অংশ।" তাঁহার সেই কুমরাহারে কি কোন মৌর্য্য যুগের অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রা পাইয়াছেন ? আর পারস্যরাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মুদ্রায় একপার্শ্বে ধনুর্ব্বাণধারী ডেরায়াসের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। যে লাঞ্ছনগুলি তিনি পারসীক প্রভাববশতঃ বলিতেছেন,তাহার কোন লাঞ্ছনই পারসীক মুদ্রায় চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। সসানীয় বংশ মৌর্য্যদিগের ৫০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়া যে চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছিলেন,তাহা মৌর্য্যযুগে পারসীক প্রভাববশতঃ হইয়াছে কিরূপে বুঝিব ? হিন্দুর দেবতা শিবের বৃষ ধরিলে আপত্তি কি হয় ? সূর্য্য বা মিথ্র পূজা পারসীক ও ভারতীয় আর্য্য উভয়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যায় যে এগুলি পারসীক প্রভাববশতঃই হইয়াছে, তাহা হইলেই বা কি প্রমাণ হয় ? মুদ্রাগুলি যেস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে ভারতে সেই উত্তর-পশ্চিমাংশ মৌর্য্যযুগের পূর্ব্বে বহুকাল পারসীক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য প্রচলিত থাকায় এরূপ চিহ্ন হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে। যখন দেখিতে পাই, গ্রীকগণ পারসীক-সাম্রাজ্যের প্রভু হইয়াও পূর্ব্বের মুদ্রাই প্রচলিত রাখিয়াছিলেন, তখন যদি কোন ব্যবসায়ী বা রাজা এইরূপ চিহ্ন বজায় রাখিয়া থাকেন তাহা হইলেই কি তিনি পারসীক হইবেন ? বাক্ত্রিয়ার গ্রীকরাজগণের মুদ্রায় রোমের রাজা আগষ্টসের মূর্ত্তি আছে, তাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে বাক্ত্রিয়ার গ্রীকগণ রোমক ? না, ভারতে রোমের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে ভারতবাসিগণ রোমক ? *

স্পুনার সাহেব আর একটি সাদৃশ্য বাহির করিয়াছেন। রাজা ডেরায়াস যেমন পর্ব্বতগাত্রে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, রাজা অশোক তাহার ২।৩ শত বৎসর পরেও ঠিক তেমনই পর্ব্বত গাত্রে তাঁহার অনুশাসন খোদিত করিয়াছিলেন। সাদৃশ্য এ পর্য্যন্ত এক রকম আছে ; কিন্তু বিভিন্নতাও যে নাই এমন নহে। ডেরায়াস তাঁহার কীর্ত্তিকলাপই খোদিত

অশোকানুশাসন

* শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন মুদ্রা" নামক পুস্তকে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

করিয়াছেন; তাঁহার বিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শত্রু দমনের কথা বলিয়াছেন; আর অশোক কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারই করিয়াছেন—অবশ্য স্থানে স্থানে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির কথাও আছে। কিন্তু ডেরায়াস কি অশোকের ন্যায় কোন স্তম্ভে লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন?

যদি মানিয়া লওয়া যায় যে অশোক ডেরায়াসের আজ্ঞাপ্রচার প্রণালীর অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে কি তিনি পারসীক হইলেন? সেকালে যখন গেজেট ছিল না তখন জনসাধারণকে রাজার কিছু বলিবার থাকিলে এইরূপে আজ্ঞা প্রচারই ত খুব সঙ্গত। ব্যক্তি-বিশেষকে কোন অধিকার প্রদান করিলে তাহা ধাতুফলকে খোদিত হইত।

স্পুনার সাহেব যে যুক্তিই প্রয়োগ করুন, এ সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের মৌনাবলম্বন যে প্রধান আপত্তি হইবে, তাহা বুঝিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, "মেগাস্থিনিসের মৌনালম্বন দুই কারণে সম্ভব—মৌর্য্যবংশ পারসীক একথা এত সর্ব্বজনবিদিত যে মেগাস্থিনিস সে কথার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজনমনে করিয়াছিলেন; কিংবা মৌর্য্য পারসীকগণ ভারতবাসীর সহিত এমন মিলিয়া গিয়াছিলেন যে মেগাস্থিনিস তাহা বুঝিতে পারেন নাই।" উভয় যুক্তিই অসার। চন্দ্রগুপ্ত পারসীক ছিলেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত হইলে গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে নীচকুলোদ্ভব না বলিয়া পারসীক রাজ বলিতেন। মুদ্রারাক্ষসেও যখন পারসীক রাজা, পারসীক সৈন্যের কথা আছে তখন হিন্দুগণ তাঁহাকে "বৃষল" "মৌর্য্য" না বলিয়া "পারসীক" বলিতেন। আর যদি চন্দ্রগুপ্ত পারসীক হইয়াও ভারতবাসীর সহিত এমনই মিলিয়া গিয়াছিলেন যে মেগাস্থিনিস তাহা বুঝিতে পারেন নাই, তবে স্পুনার সাহেবের কি এমনই সূক্ষ্মদৃষ্টি যে তিনি ২০০০ বৎসরের পরে তাহা ধরিয়া ফেলিলেন?

মেগাস্থিনিস

৫

স্পুনার সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের নানা স্থানে বলিয়াছেন—পুরাণে, মহাভারতে যেখানে যবন, শক, দানব, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি কথা আছে সেইখানে পারসীকদিগকেই বুঝায়। ভারতবাসীরা য়ুরোপকে বিলাত ইয়ুরোপীয় মাত্রকেই ফিরিঙ্গী বলে, আফগানিস্থানের দিকের লোক মাত্রকেই মোগল বলে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি নরকাসুর ও যবনরাজ ভগদত্ত, কালযবন সকলেই পারসীক ছিলেন। শাক্য বংশ শাকদ্বীপ হইতে আগত জাতিবিশেষ। নন্দবংশ যখন খুব ধনী ছিল, তখন বুঝা যাইতেছে ইহারা গঙ্গানদী বাহিয়া গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের নিকটেই ইংরাজ জাতির ন্যায় বাণিজ্য করিতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করে, নতুবা নন্দবংশ ক্ষত্রিয় হইয়াও কেন ক্ষত্রিয় ধ্বংস করিবে? আর একদল যবন ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া কামরূপে রাজ্যস্থাপন করে। পুরীর মঙ্গলাপঞ্জীতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত যে যবনের উড়িষ্যা আক্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, ফ্লীট সাহেব তাহা অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। স্পুনার সাহেব বলেন এ যবনগণ পারসীক।

মনুর সময়ে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ মগধ ও সৌরাষ্ট্রে গমন করিলে ব্রাহ্মণদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত—ইহার কারণ এসকল স্থানে পারসীকগণ বাস করিতেন। গ্রীয়ার্সন সাহেব ভারতের বর্ত্তমান ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে মধ্য ভারতে যে ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা হইতে তাহার চারিপার্শ্বের প্রচলিত ভাষাগুলি একটু বিভিন্ন, অর্থাৎ মধ্য-ভারতের হিন্দী আর তাহার চতুষ্পার্শ্বের ভাষা বাঙ্গলা, আসামী, উড়িয়া, ও গুজরাটী একটু বিভিন্ন। স্পুনার সাহেব মাগধী হিন্দীকেও এই শেষোক্ত দলে টানিয়া আনিয়া বলিতে চাহেন যে ভাষাতত্ত্বের সহিত মনুসংহিতার কথার যখন ঠিক মিল হইতেছে, তখন অঙ্গ বঙ্গ মগধ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র এবং আসামে পারসীক উপনিবেশ ছিল বলিয়াই এত কাণ্ড।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বলিয়াছেন, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগের সহিত তান্ত্রিকাচারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায় ও আসামের সহিত তান্ত্রিকাচারের সম্পর্ক আছে। আর পারসীক মাজী পুরোহিতগণের ক্রিয়াকাণ্ডও কতকটা তান্ত্রিকাচারের অনুরূপ। সুতরাং পারস্যের সহিত স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। পারসীকদিগের মধ্যে ইষ্টার নামে এক দেবীর নাম পাওয়া যায়।

ইন্দ্রের আদেশে শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর আক্রমণ করিয়া সেখানে ১৬১০০ শত কুমারী ও একুশ লক্ষ কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব প্রাপ্ত হন। এই কাম্বোজ দেশটা উইলসন সাহেবের মতে "পারদ ও পহ্লব"দিগের দেশের নিকটে ও পারস্যের সন্নিকটে। সুতরাং বুঝিতে হইবে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি পারসীক ছিলেন।

আবার বিষ্ণুপুরাণে আছে শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা মগ ও ক্ষত্রিয়েরা মাগধ নামে অভিহিত হয়। আবার মাগধ অর্থে বর্ণশঙ্কর জাতি। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই শাকদ্বীপাগত ক্ষত্রিয়গণকেই পুরাণকার ঘৃণাবশতঃ মাগধ অর্থাৎ বর্ণশঙ্কর বলিয়াছেন। আর মগ কথাটাও পারসীক পুরোহিত "মাজী"র সহিত বেশ মিলিয়া যায়। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকেও মগধকে ম্লেচ্ছপ্রায় জনপদের অন্যতম বলা হইয়াছে।

এখন প্রথম হইতেই এই সকল বিষয় আলোচনা করা যাউক। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেকের ধারণা যে বাক্ত্রিয়ার গ্রীকগণের রাজ্যস্থাপনের পূর্ব্বে ভারতের লোকে গ্রীকদিগকে যবন বলিত না। এ সম্বন্ধে বহু তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকিবে—আমার তাহা জানা নাই; কিন্তু আমার মনে হয় যখন গ্রীকগণ গ্রীসে উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক, এসিয়া মাইনরের পশ্চিম প্রান্তস্থিত গ্রীক উপনিবেশকে আইয়োনিয়া বলিতেন, তখন ইহাও সম্ভব যে, যেস্থান হইতে এই গ্রীকগণ এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়াছিলেন, ভারতীয় আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষেরা সেখানে তাঁহাদের যবন বলিয়াই জানিতেন। গ্রীসেও ভারতীয় আর্য্যগণ গ্রীকগণকে যবন বলিয়াই অভিহিত করিতেন; সুতরাং বাক্ত্রিয়ার রাজ্যস্থাপনের পরেও তাহারা যবন নামেই ভারতবাসীর নিকট পরিচিত হইয়াছিল।

যবন

কৈলাসের উত্তরে মৈনাক পর্ব্বত সন্নিধানে যে স্থানে বৃষপর্ব্বা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা ইন্দ্রপ্রস্থের উত্তর-পূর্ব্ব দিগ্‌বিভাগে। এই স্থানেই রাজা যযাতি দানবরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন। কথিত আছে, এই স্থানেই ভগীরথ তপস্যা করিয়াছিলেন, ইন্দ্র বাসুদেব প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ভবানীপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই যযাতির একপুত্র হইতে যবন, আর এক পুত্র হইতে ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জন্মে। অন্য পুত্র হইতে পৌরব যাদবের উৎপত্তি। আবার দেখা যায় কশ্যপের কয়েকটি পত্নীর মধ্যে কদ্রু, দিতি, অদিতি ও দনুর নাম পাওয়া যায়। কদ্রু হইতে নাগ জাতি, দিতি হইতে দৈত্য, অদিতি হইতে দেবগণ ও দনু হইতে দানবের উৎপত্তি। কাস্পিয়ান হ্রদের সহিত কশ্যপ নামের সাদৃশ্য হইতে মনে করা যাইতে পারে, চীন তাতার হইতে কাস্পিয়ান হ্রদের তীর পর্য্যন্ত ভূভাগে এই সকল জাতির বাস ছিল। তাহারা এক বংশের না হইলেও পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করিত। অন্ততঃ ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতীয় আর্য্যগণ তাহাদের বিভিন্নতা জানিতেন। পুরাণে ও মহাভারতে যেখানেই উল্লেখ আছে, সেই খানেই দেখিতে পাই, তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ আছে। অবশ্য ম্লেচ্ছ কথাটা কোন জাতিবিশেষের নাম নহে। বেদ-বিগর্হিত আচরণ দেখিলেই লোকে পূর্ব্বেও বলিত, এখনও বলে, ম্লেচ্ছাচার। বিষ্ণুপুরাণে শক যবনের সহিত পারসীকগণেরও নাম আছে। মুদ্রারাক্ষসেও শক যবন বাহ্লীক ও কাম্বোজের সহিত পারসীক নাম আছে। সুতরাং ইহা কিছুতেই স্বীকার

পৌরাণিক মতে যবনোৎপত্তি

করা যায় না যে, ভারতবাসী অজ্ঞতাবশে পারসীকগণকে শক যবন প্রভৃতি নামে পরিচিত করিয়াছিল।

বিদেশী জাতির নামকরণে ভারত-বাসীর অজ্ঞতা

বিলাত, ফিরিঙ্গী বা মোগল এই তিনটি শব্দই মুসলমানদিগের। বাঙ্গালীরা ইংরেজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতির পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ করিয়াছিল। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হয় না যে ভারতবাসী আর্য্যগণ নামকরণে ভ্রম করিবে। পূর্ব্বে যে সকল জাতির নাম জানা ছিল, তাহাদের উৎপত্তি-নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। যখন ভারতে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন ভারতেও দ্রবিড়, খস, পারদ, পুলিন্দ, চীন, পৌণ্ড্র প্রভৃতি যোদ্ধার জাতি আছে, তখন তাহাদিগকে ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বলিয়া ধরিলেন! এই উৎপত্তি-নির্ণয়ে ভ্রম থাকিতে পারে, কিন্তু নামকরণে ভ্রম আছে বলিয়া মনে হয় না।

পারসীকগণের সমুদ্র পথে ভারতে আগমন

পারসীকগণের সমুদ্রপথে ভারতে আগমন তাঁহার অনুমান মাত্র।—ইহার কোন প্রমাণ নাই। যখন হথামনীষীয় বংশ ক্ষমতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত, তখনও তাহাদের নিজের যুদ্ধ-জাহাজ ছিল না, ফিনীসীয় বণিকগণই জাহাজ দিতেন। এই জাহাজের সাহায্যেই ডেরায়াস ও জারসীস গ্রীস আক্রমণ করিয়াছিলেন। যখন আলেকজান্দার পারস্য আক্রমণ করেন, তখন পারস্য উপসাগর বা আরব্য সাগরে পারসীকদিগের কোন জাহাজ ছিল না। থাকিলে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাহার উল্লেখ করিতেন। পারস্যের পুরাতন ভগ্নাবশেষের মধ্যে পারস্যরাজের প্রভাব-ব্যঞ্জক বহু চিত্র আবিষ্কৃত হইলেও জাহাজের চিত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। কেবল সিরিয়া দেশে প্রাপ্ত কয়েকটি মুদ্রায় জাহাজের চিত্র আছে, তাহা হইতে মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে বণিকগণ বা নাবিকগণকে পারিশ্রমিক দিবার জন্যই এগুলি সিরিয়ার উপকূলে প্রস্তুত হইয়াছিল। আর যদি বিনাপ্রমাণেই স্বীকার করা যায় যে, পারসীকগণের বাণিজ্য জাহাজ ছিল, তাহা হইলে কি তাঁহাদের কামরূপে বাণিজ্যার্থে আগমন সম্ভব? সেকালে মধ্য সমুদ্র দিয়া কেহ গমন করিত না, সুতরাং কূলের নিকট দিয়া জাহাজ লইয়া পারস্য হইতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিতে হইলে ভারতবর্ষের পশ্চিম ও পূর্ব্বোপকূলে ক্রমান্বয়ে পারসীক উপনিবেশের চিহ্ন থাকিত।

মহাপদ্ম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় ধ্বংসের কারণ

তিনি যখন পুরাণগুলি নাড়াচাড়া করিয়াছেন তখন নিশ্চয় অবগত আছেন যে, যে মহাপদ্ম নন্দ ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন, তিনি প্রকৃত ক্ষত্রিয় নহেন—ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রা গর্ভে তাঁহার জন্ম। সুতরাং মহাপদ্ম নন্দ প্রকৃত ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া যে তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কালাপাহাড় হিন্দুগণের নিকট অবজ্ঞাত হইয়াই হিন্দুর দারুণ শত্রু হইয়াছিলেন। পুরীর মঙ্গলা-পঞ্জীর প্রথমাংশ প্রবাদ হইতে লিখিত, সুতরাং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

যখন মধ্যভারতে আর্য্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে, মগধ বা সৌরাষ্ট্রে অনার্য্যদিগের বাস ছিল। এস্থানে বহু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাদর্শন জন্য পতিত হইয়াছিলেন। সুতরাং যখন এ সকল দেশেও আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হইল, তখন অনার্য্যদিগের ভাষার সংস্রবে আসিয়া এ সকল প্রদেশের ভাষাও একটু বিভিন্ন হইয়া পড়িবে।

তান্ত্রিকাচার

এদেশে একটি প্রবাদ আছে যে বশিষ্ঠ মুনি চীনদেশ হইতে তান্ত্রিকাচার ভারতে আনিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ মনে করেন—যখন মিড-দিগের ধর্ম্মে প্রথমে তান্ত্রিকাচার ছিল না তখন ইহারা সম্ভবতঃ পারস্যরাজ্যের উত্তরাংশস্থিত তুরান জাতির নিকট ইহা শিক্ষা করিয়াছিল। পারসীকদিগের প্রধান দেবীর নাম অনহিত। আর ইষ্টার নাম ফিনিসীয়দিগের আষ্টোরেথ নাম হইতে গৃহীত। অনহিত ইষ্টার প্রভৃতি কোন নামের সহিত তন্ত্রের কোন দেবতার নামের সাদৃশ্য নাই।

স্পুনার সাহেব প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর লইয়া একটু গোল

করিয়াছেন। এখানে ৩টি পৃথক্ বংশ ছিল। এখানকার প্রথম রাজা নরকাসুর। ইন্দ্রের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ ইহাকেই বধ করিয়া ষোড়শ সহস্র পত্নী লাভ করেন এবং নগরে একুশ লক্ষ নহে, একুশ নিযুত কাম্বোজদেশীয় অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উইলসন সাহেব বহুকাল পূর্ব্বে কাম্বোজদিগের দেশ পারদ ও পহ্লবদিগের দেশের নিকট বলিলেও, আজকাল কেহই সে মত গ্রহণ করেন না। গৌড়রাজমালার লেখক সম্প্রতি আধুনিক প্রমাণ-বলে স্থির করিয়াছেন, কাম্বোজ দেশটা তিব্বতের নিকট ছিল। আর যদি কাম্বোজ দেশটা পারস্যের সন্নিকটেই হয় তাহা হইলে কি কাম্বোজদেশীয় অশ্ব রাখিত বলিয়া নরকাসুর কাম্বোজ-দেশবাসী হইবেন? কাম্বোজ ও পারস্য যে এক দেশ নহে তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আমরা অমরকোষে পাই। বিভিন্ন অশ্বের কথায় লিখিত হইয়াছে, "বানায়ুজাঃ পারসীকাঃ কাম্বোজা বাহ্লীকাঃ হয়াঃ।" যাহা হউক, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের দ্বিতীয় রাজা যবনরাজ ভগদত্ত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান কালে ইঁহাকে বলা হইয়াছিল, "আপনি অসুরদিগের সহিত বহুকাল যুদ্ধ করিয়াছেন। আপনি আপনার প্রতাপ এইবার দেখান।" ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যবনরাজ ভগদত্ত অসুর বংশের নিকট হইতে আসাম প্রদেশ জয় করেন। সুতরাং যবন ও অসুর উভয়েই এক নহে।

নরকাসুর ও যবনরাজ

মিডদেশের পুরোহিতগণ মুঘ্ নামে অভিহিত হইতেন; গ্রীকগণ ইহাদিগকে মাজি বলিত; ইহা হইতেই ইংরেজী ম্যাজিক কথাটার উৎপত্তি। যদি শাকদ্বীপের মগ ব্রাহ্মণদিগের সহিত এই মিত্র পুরোহিত মুঘ্ বা মাজি-দিগের নাম সাদৃশ্য থাকিল, তবে পারসীক-সম্রাটের পারস্যে মাগধ নাম থাকিল না কেন? জারক্সীসের অনুশাসনে তিনি "দারিয়াবহুস পুত্র ক্ষায়থিয়" নামে অভিহিত হইয়াছেন কেন? পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ এই "ক্ষায়থিয়" শব্দের অর্থ করেন "রাজা" আর ভারতীয় আর্য্যগণও ক্ষত্রিয় শব্দ রাজাদের প্রতি প্রয়োগ করিতেন। স্পুনার সাহেব এ খোদিত লিপির কোন সন্ধান না লইয়াই কোথায় ডেরায়াসকে "দংখব" বলিয়া লিখিত আছে দেখিয়াছেন। তাহা হইতে তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন "দংখবো" কথাটা "দস্যবঃ" কথার অপভ্রংশ। অর্থাৎ ভারতীয় আর্য্যগণ পারসীক-দিগকেই দস্যু বলিত! ইহার প্রমাণের জন্য তিনি বলিয়াছেন, মনুসংহিতায় বিহার, বঙ্গালা, উরিস্যার অধিবাসী-দিগকে এবং কাম্বোজ, পারদ, পহ্লবদিগকে দস্যু বলা হইয়াছে। এই সঙ্গে কিরাত প্রভৃতি জাতিদিগকেও দস্যু বলা হইয়াছে, তাহাতেও তাঁহার যুক্তি ভিত্তিহীন হয় নাই। আর্য্যেতর জাতি বেদ-বিগর্হিত আচরণ করিলেই ম্লেচ্ছ এবং আর্য্যদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিলেই দস্যু নামে অভিহিত হইত—ইহাও ত সর্ব্ববাদীসম্মত।

পারসীক নাম-সাদৃশ্য

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও অন্যান্য বহুলোক প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, শাকদ্বীপ আর যে স্থানেই হউক পারস্য হইতে পারে না। পৌরাণিক আখ্যায়িকার অন্য কিছু বিশ্বাস্য হউক আর না হউক, দেশ সংস্থানের বিষয়ে এটুকু স্বীকার করিতেই হইবে যে শাকদ্বীপ ও জম্বুদ্বীপের মধ্যে আর পাঁচটি দ্বীপ ছিল কয়েকটি সাগরও ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পারস্যের মধ্যে কোন সাগর নাই, কোন কালে ছিল বলিয়াও প্রবাদ নাই। কেহ কেহ সগদিয়ানা ও সীস্তানকে শাকস্থান বা শাকদ্বীপ বলেন; ইহাও শাকদিগের আদি বাসস্থান বলিয়া বোধ হয় না, কারণ এই সীস্তান ও সগদিয়ানা এবং ভারতের মধ্যে কোন সমুদ্র দূরের কথা, কোন বড় হ্রদ পর্য্যন্ত নাই। তথাপি স্পুনার সাহেব বলেন পারস্যদেশটাই শাকদ্বীপ!

শাকদ্বীপ

মগধ শব্দের দুই অর্থ অমরকোষে পাওয়া যায়—"বর্ণসঙ্কর জাতি" ও "বংশের স্তুতিপাঠক"। মগধের অধিবাসিগণকে মগধ বলা যায়, আবার শাকদ্বীপের ক্ষত্রিয়গণও মাগধ নামে অভিহিত হয়। পারস্য দেশটাই যখন

মগধ

স্পুনার সাহেবের মতে শাকদ্বীপ, আর আধুনিক পারসীকগণ যখন ব্যবসায়ী এবং মনুর মতে যখন মাগধগণ ব্যবসায়ও করিতে পারিত, তখন সবগুলি মিলাইলেই দাঁড়াইল যে পারসীকগণ শাকদ্বীপের মাগধ ক্ষত্রিয়, তাহারা বাণিজ্য করিতে এদেশে আসিয়া বর্ণসঙ্কর জাতি বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং মাগধ জাতির দেশ বলিয়া দেশটার নাম হইল মগধ! তা স্পুনার সাহেব এত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এ সিদ্ধান্ত করিলেন কেন? তিনি ত সোজাসুজি বলিলেই পারিতেন, ব্রহ্মদেশের মগ জাতি শাকদ্বীপের মগ ব্রাহ্মণ; তাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বনের পরে মুসলমানদের ভয়ে মগধ অর্থাৎ মগদিগের দেশ ছাড়িয়া ব্রহ্মদেশে পলায়ন করিয়াছে!

৬

স্পুনার সাহেব চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য অশোককে পারসীক প্রমাণিত করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তিনি বুদ্ধদেবকেও পারসীক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব

তিনি বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার অর্থ শাক্যবংশ শাকদ্বীপ হইতে আসিয়াছিল অর্থাৎ পারস্য হইতে আসিয়াছিল। "দবিস্তাঁ-এ-মজহদিব" গ্রন্থে লিখিত আছে পারসীকগণ গয়াকে তাহাদের তীর্থস্থান বলিয়া দাবী করে। মহাবোধি মন্দিরের মোকর্দ্দমায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় নাই কেন হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ই বুদ্ধ গয়ার মন্দির আপনার বলিয়া দাবী করে।

জরথুস্ত্রের ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সাদৃশ্য

জরথুস্ত্র চারিটি বিষয় প্রচার করিয়া ছিলেন, নিকটতম আত্মীয়াকে বিবাহ করা তন্মধ্যে একটী বিষয়। কথিত আছে শাক্যবংশের স্থাপয়িতৃগণ ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পারসীকরাজ বিশতাস্পও নিজ সহোদরাকে বিবাহ করেন। বুদ্ধ ও জরথুস্ত্রের জন্মকথায় বহু সাদৃশ্য আছে। যথা গৌতম বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে বোধিসত্ব তুষিত স্বর্গে বসিয়া মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। আর জরথুস্ত্রের জন্মের ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে পৌরাণিক আদিম বণ্ডের আত্মা স্বর্গে বসিয়া জরথুস্ত্রের ফ্রবাসী বা আদর্শ মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার কারণ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম গান্ধারে প্রচলিত হইলে বৌদ্ধাবদানের গল্প হইতে জরথুস্ত্রের নামের সহিত এগুলি মিলিয়া গিয়াছে। স্পুনার সাহেবের ইহা মনঃপূত হয় নাই তজ্জন্য তিনি জরথুস্ত্রের আবির্ভাব কালও পিছাইয়া লইয়া যাইতে চাহেন। একটা মত আছে যে, জরথুস্ত্র ৬০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, আর যে বিশতাস্প রাজাকে তিনি স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন সে ডেরায়াস হাইটাস্পিস। তাহা হইলে জরথুস্ত্র প্রায় বুদ্ধদেবের সমকালবর্ত্তী হইয়া পড়েন এবং জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্ম-পুস্তকগুলি বৌদ্ধ সাহিত্যের তুলনায় নিতান্ত আধুনিক বলিয়াই স্পুনার সাহেব একথাও বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। কারণ তাহা হইলে বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে বুদ্ধদেবের জন্মকথা জরথুস্ত্রের জীবনীতে গৃহীত হইয়াছে, ইহাই বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। তজ্জন্য স্পুনার সাহেব জরথুস্ত্রকে ৬০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের বহু পূর্ব্বে পিছাইয়া দিয়া বলিতে চাহেন, বৌদ্ধধর্ম্ম জরথুস্ত্রীয়দেরই প্রকারান্তর। এইজন্যই মহাযানবাদ অর্থাৎ জরথুস্ত্রীয়বাদ উত্তর-ভারতে অর্থাৎ পারসীকগণের মধ্যে সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলিতেছেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের কথা আছে আর জরথুস্ত্রের ধর্ম্মে ৩৩ দেবতার নাম আছে। ঋগবেদেও ৩৩ দেবতার নাম আছে বটে, তবে সে কথাটার উপর বড় জোর দেওয়া হয় নাই!

উভয়ের জন্ম কথায় সাদৃশ্য

তিনি উভয়ের জন্মকথার সাদৃশ্য দেখাইয়া বলিতেছেন, পূর্ব্বে উভয়েই স্বর্গে ছিলেন। জরথুস্ত্রের আত্মা যেমন তাঁহার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, বুদ্ধদেবও তেমনই শ্বেতহস্তীর রূপ ধারণ করিয়া মায়াদেবীর গর্ভে প্রবেশ করেন। জরথুস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে (ফ্রবাসী) লইয়া দেবদূত বহুমন্ ও অশবিহিষ্ট মানব দেহের অনুরূপ দীর্ঘ হোম বৃক্ষের শাখায় স্থাপন করিয়া জরথুস্ত্রের মাতৃগর্ভে স্থাপন করে। জড়দেহ দুগ্ধাদির মধ্য দিয়া এই আত্মা ও দেবতার

সহিত মিলিত হওয়ায় ত্রিবিধ মূলকারণের পবিত্র সম্মিলন ঘটিল। আর গৌতমের যখন জন্ম হয় তখন মায়াদেবী লুম্বিনী উদ্যানে শালবৃক্ষের শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং গর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণ কালে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র গৌতমকে ধারণ করিয়াছিলেন। দুই স্থানে পার্থক্য আছে—শ্বেতহস্তীর কথা ও ত্রিবিধ মূলকারণের সম্মিলনের কথা। প্রথম স্থানে ভারতবাসী কল্পনাবলে শ্বেত হস্তীটি আনিয়াছে, আর দ্বিতীয় স্থানে কল্পনার অভাব দেখা যাইতেছে। উভয়ের জন্মকালে সমস্ত প্রকৃতি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের ন্যায় জরথুস্ত্রও গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া জাতম্পরম্ নামক পুস্তকে লিখিত আছে। কিন্তু সাদৃশ্য পাইলেই স্পুনার সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে জাতম্পরম্ বৌদ্ধ সাহিত্যের তুলনায় নিতান্তই আধুনিক পুস্তক; সুতরাং এস্থলে গৌতমের জীবন কাহিনী জরথুস্ত্রের নামে ভাষান্তরিত হইয়াছে। গৌতম ৩০ বৎসর বয়সে সিদ্ধিলাভ করেন আর জারথুস্ত্রের হৃদয়ে ৩০ বৎসর বয়সেই স্বর্গীয় আলোক প্রবেশ করে এবং তাঁহার আত্মা "অহুর মজ্‌দে"র দর্শন লাভ করে। জরথুস্ত্রের প্রতিকৃতি অতীব বিরল। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় নাই। গ্রীকগণ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ শিখাইলে ভারতবাসী বুদ্ধমূর্ত্তি গড়িতে আরম্ভ করে। ইহার কারণ উভয় ধর্ম্মেই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ। আকবর যেমন বাবর হইতে তৃতীয় পুরুষে হিন্দুদিগের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া হিন্দুদিগের সহিত মিলন করিয়াছিলেন, অশোকও তেমনই বৌদ্ধ ধর্ম্ম অর্থাৎ জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত হইতে তৃতীয় পুরুষে হিন্দুদিগের সহিত মিলন করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব কিন্তু স্পুনার সাহেবের মতে পারসীক ধর্ম্মত্যাগ করিয়া "হেরেটিক" (Heretic) অর্থাৎ ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া 'অবেস্তায়' লিখিত হইয়াছেন।

সম্প্রতি এই কথাগুলির প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কলিকাতায় একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন "শাক বংশ" কথাটার দুইপ্রকার ব্যুৎপত্তি আছে—(১) ভগিনীকে বিবাহ করিতে সমর্থ এই অর্থে শক্ ধাতু হইতে ও (২) শাক বা শালবৃক্ষ হইতে। শাকদ্বীপের সহিত শাক্য বংশের কোন সম্বন্ধ নাই। ভগিনীকে বিবাহ করার কথা ঋকবেদেও লিখিত আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণও এরূপ গল্পের উদ্ভাবন করিয়াছেন, দশরথ জাতকে তাহার প্রমাণ আছে। আকবরের মৃত্যুর ৬০ বৎসর পরে লিখিত "দবিস্তাঁ-এ-মজাহিব্" পুস্তক গয়ার ২২০০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল চারিটি সত্যের বিষয় জরথুস্ত্রবাদে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দের প্রতিবাদ

বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দির লইয়া যে মোকর্দ্দমা হয় তাহাতে হিন্দুগণ প্রকৃতপক্ষে মহাবোধি মন্দির হিন্দুর ধর্ম্মমন্দির বলিয়া দাবী করেন নাই। এই মোকর্দ্দমার বিবরণে লিখিত আছে সিংহল, ব্রহ্ম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ এখানে উপাসনা করিতেন। মুসলমানগণ পর্য্যন্ত এ মন্দিরে অনায়াসে প্রবেশ করে। প্রথম মুসলমান আক্রমণের সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পলায়ন করিলে মহাবোধি মন্দির পরিত্যক্ত ও অজ্ঞাতভাবে পড়িয়া ছিল। বর্ত্তমান মোহান্তের পূর্ব্বপুরুষ জমিদারী স্বত্বে তাহা প্রাপ্ত হন। ইংরেজ রাজত্বে গবর্ণমেণ্ট ভূগর্ভ খনন করিয়া মহাবোধি মন্দির উদ্ধার করেন। মোহান্তের জমীদারীর মধ্যে ছিল বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট সর্ব্ববিষয়ে মোহান্তের অনুমতি লইয়া কার্য্য করিতেন। মহাবোধি মন্দির হইতে কিয়দ্দূরে অশ্বত্থবৃক্ষতলে কয়েকটি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে, এইখানেই হিন্দুগণ পিণ্ড প্রদান করেন। কেহ কেহ বলেন ইহাও মোহান্তের কৌশল।

মহাবোধি মন্দির

মহাপুরুষের জন্ম সম্বন্ধে কাহিনীতে সাদৃশ্য থাকা বিচিত্র নহে। মহাপুরুষের ভক্তগণই এরূপ কৌশল

জন্মকথার সাদৃশ্যে কি প্রমাণ হয়?

উদ্ভাবনের জন্য দায়ী। স্পুনার সাহেব স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, জরথুস্ত্রের সংসার-ত্যাগের কাহিনী বুদ্ধের জীবন-কথা হইতে গৃহীত। যদি স্বীকার করাই যায় যে বুদ্ধ জরথুস্ত্রের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং জরথুস্ত্রের জীবনের কাহিনী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বুদ্ধের জীবন কথায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলেই কি প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধ জরথুস্ত্রমতাবলম্বী ছিলেন? কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের নামে ও জীবন কথায় বহু সাদৃশ্য আছে, তাই বলিয়া কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে কৃষ্ণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কি খৃষ্ট কৃষ্ণের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন? যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের চতুঃসত্য জরথুস্ত্রবাদীদের অজ্ঞাত তেমনই অগ্নির উপাসনা ও ঈশ্বরবাদ বৌদ্ধধর্ম্মে একেবারে নাই।

দুই ধর্ম্মে সাদৃশ্যাভাব

বৌদ্ধধর্ম্মে হিন্দুর ধর্ম্ম ও জরথুস্ত্রের ধর্ম্মের সমন্বয় কি করিয়া হইল? বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরের নাম গন্ধ নাই অথচ অপর দুটি ধর্ম্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। উভয় ধর্ম্মেই অগ্নি লইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মে তাহার কোন চিহ্ন নাই। হিন্দুরা বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের নিন্দাই করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে "মায়া মোহ প্রভাবে অসুরগণ অল্পকালে বেদমার্গাশ্রিত সমুদয় কথা পরিত্যাগ করিল। এই পাপাত্মাদিগের নাম পাষণ্ড। ইহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিলে এক দিনের পুণ্য প্রণষ্ট হয়।" ইহা হইতে কি বুঝিতে হইবে যে জরথুস্ত্রের ধর্ম্ম অপেক্ষা বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দুর নিকট অধিক সমাদর লাভ করিয়াছিল?

বাবর প্রথমে ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপন করেন। আকবর বাবর হইতে ৩য় পুরুষে হিন্দুদিগের সহিত মিলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার্য্য।

৩য় পুরুষে ধর্ম্মত্যাগ

কিন্তু স্পুনার সাহেব ত স্বয়ং বলিয়াছেন—নন্দবংশ পারসীক, তাহারাই প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করে—তবে অশোক নন্দবংশের ৩য় পুরুষ হন কেমন করিয়া? আর চন্দ্রগুপ্ত যে প্রথমে আলেকজান্দারের সহিত ভারতে আসিয়াছিলেন, একথা স্পুনার সাহেব সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই। তিনি একস্থানে প্রশ্ন মাত্র করিয়াছেন, কারণ তিনি জানেন, যখন গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ বহুকথা লিখিয়াছেন তখন একথা তাঁহারা নিশ্চয়ই লিখিতেন।

যে ডেরায়াসের প্রাসাদের অনুকরণে চন্দ্রগুপ্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই ডেরায়াসের প্রাসাদেই বহু-

মূর্ত্তি নির্ম্মাণে নিষেধ

স্থানে অহুর মজ্‌দের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। বুদ্ধদেব এই ডেরায়াসের প্রায় সমসাময়িক। সেই ডেরায়াসের সময়েই যখন অহুর মজ্‌দের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল তখন কেমন করিয়া মানিব যে পারসীকদিগের ধর্ম্মে পূর্ব্বে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ ছিল, এবং তদনুযায়ী বৌদ্ধগণ প্রথমে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে নাই। প্রকৃত কথা এই যে, কোন মহাপুরুষের পরলোকপ্রাপ্তির পরে কিছুকাল অতীত না হইলে তাঁহার দেবত্বপ্রাপ্তি ও প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ ঘটে না।

স্পুনার সাহেব একস্থানে গরুড় ও অহুর মজ্‌দের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। উভয়েরই পক্ষ আছে। কিন্তু

[গরুড় ও অহুর মজ্‌দ]

পার্থক্যটুকু দেখিলে কেহই মনে করিবেন না যে একটি হইতে অপরটির উদ্ভব সম্ভব। গরুড়ের মুখাকৃতি মনুষ্যের ন্যায় নহে, হস্তের পশ্চাদ্দেশ হইতে প্রকৃত পক্ষীর ন্যায় পক্ষ বাহির হইয়াছে। আর অহুর মজ্‌দের মূর্ত্তি ও রাজা ডেরায়াসের মূর্ত্তিতে কোন প্রভেদ নাই। গরুড়ের পা আছে, অহুর মজ্‌দের পা নাই। অহুর মজ্‌দের দুই পার্শ্বে যে পক্ষ কটিতট বেড়িয়া অঙ্কিত আছে, তাহার সহিত পক্ষীর পক্ষের কোন সাদৃশ্য নাই, বরঞ্চ আয়তাকারে দীর্ঘ তালপত্রের সহিত সাদৃশ্য আছে। আবার অহুর মজ্‌দ পারসীকদের সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। আর গরুড় বিষ্ণুর বাহন মাত্র, বিষ্ণুপূজার সহিত কিঞ্চিৎ সম্মান পাইলেও পাইতে পারে। স্পুনার সাহেব আবার এই অহুর মজ্‌দকে অহুর মঘ করিয়াছেন।

স্পুনার সাহেবের কোন চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে বলিয়াই মনে হয় না। বিন্দুর উপর পিরামিড নির্ম্মাণের সহিত তাঁহার চেষ্টার তুলনা হয়।

পল্লীবালা

পড়িছে ঝলসি' কুন্দ অতসী জাতী যূথী
মাধবী গন্ধরাজ,
শেফালিকাগুলি ঝরেছিল আজ পিয়াসায়,
খরতাপে ঐ শুকাতে লেগেছে নিরাশায় ;
তুলসী মাত্র দেবতার পূজা উপচার,
বিল্বপত্র সাজ ;
গৃহের লক্ষ্মী দুলালী গিয়াছে পরঘরে,
এ গৃহ আঁধার আজ ।

ঠাকুরের সেবা হয়ে গেছে আজ চুপি চুপি—
সেটা নাহি বটে বাকী ।
কলসী বাজেনি ঘাটপথে আজ ঘন-ঘন,
কোশাকুশী ঘাট করেনিক আজ ঝনরণ ;
প্রসাদী কুসুম না পেয়ে বাছুর আসে ফিরে
নামায়ে কাতর আঁখি ।
পিতা করেছেন নিজে আহ্নিক আয়োজন
চোখ মুছি থাকি থাকি ।

খোকা খুকীদের হয়নিক আজ নাওয়া ধোওয়া
কে তাদের আজি পুছে ?
ঘরে ঘরে আজ বাজেনিক মল রণঝন
ভিখারী আসিয়া ফিরিয়া যেতেছে ঘন ঘন ;
হরিনাম ঝুলি হয়না সেলাই ঠাকু'মার
সূতা নাহি যায় সূচে ;
খুকীর কপোলে দাগ হয়ে আছে, আঁখিজল
দেয়নিক কেহ মুছে ।

হাম্বা রবেতে গাভীটি ফিরিছে দ্বার দ্বার
গোঠ হতে এসে ফিরে ।
কাকে মাছ লয়, ছাগে খেয়ে যায় চাল ধান,
পায়নিক দাদা আঁচাবার জল, সাজা পান ;
ভুলো আর মেনী ঘুরে ঘুরে কেঁদে হ'ল খুন
গা'য় লোম দুখে ছিঁড়ে ;
খাঁচার-পাখীটি পায়নিক আজ খুট জল—
গলা গেল তার চিরে ।

বসেনি বাড়ীতে চুল বাঁধিবার বৈঠক,
আসেনি পাড়ার দল ।
বালিশের তুলা, আকাচা কাপড় ঘরময়,
বাসন পাত্রে জিনিসপত্রে নয়ছয় ;
আঙিনার তরু পায়নিক আজ বৈকালে
একটি ফোঁটাও জল ;
শিউলি-ছোপান কাপড় দেখিয়া, মার চোখে
জল ঝরে অবিরল ।

ঠাকুরের ঘরে পা ধোবার জল, আলো নাই,
পুরুত লাগায় ধুম ।
খোকা খুকীদের আনেনিক কেহ পূজো বাড়ী,
হয়নি শীতল প্রসাদ নিবার কাড়া কাড়ি;
চাঁদের কপালে টি দিয়ে না যায় আজি চাঁদ—
চোখে নাই কারো ঘুম
কাঁদে তারা আজ—সারাদিন তাদে' বুকে চাপি,
খায়নি যে দিদি চুম্ ।

ললিত কোমল ছোট দুটি বাহু মুঠি বটে,
কম কি ক্ষমতা তার ?
তারে পর করা—লোকে বলেছিল দায় সারা,
ভাবেনিক কেহ এ গৃহ অচল সেই ছাড়া,
সংসার পাতা শিক্ষার ছলে নিল সে যে
বহু জীবনের ভার ।
আজি এ গৃহের শিশু পশু-পাখী তরুলতা
করিতেছে হাহাকার ।

আহা সে যে কোন্ অপরিচয়ের মাঝখানে
বন্দিনী দিবা রাতি,
তথা গৃহভরা হাস্যোৎসব-কলরোলে,
আহত নিয়ত কূলসম নদীকল্লোলে,—
অশ্রু মুছিছে অবগুণ্ঠন অঞ্চলে,
নাহিক ব্যথার সাথী ;
মা হারা তাহার গৃহ কাঁদে হেথা লুটে লুটে,
নিবায়ে ঘরের বাতি ।

শ্রী[illegible]

বিশ্বাসঘাতক

(গল্প)

(১)

মহারাষ্ট্রদেশে ইন্দ্রাণী নদী-তীরে মহাবীর শিবাজীর পর্ব্বতদুর্গ ইন্দ্রায়ণ। দুর্গটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার গঠন-প্রণালী চমৎকার। শিবাজীর অন্যতম দুর্গ রাজমাচি হইতে মহারাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রস্থান রাজগড় দুর্গে যাইতে হইলে ইন্দ্রায়ণের পার্শ্ব দিয়া যাইতে হয়। সুতরাং এই ইন্দ্রায়ণ দুর্গ রাজগড়ের "লৌহদ্বার" বলিয়া পরিগণিত।

শিবাজীর প্রথম এবং বর্ত্তমানে প্রধান শত্রু বিজাপুরাধিপতি, বহুচেষ্টার ফলে রাজমাচি অধিকার করিয়াছেন। এখন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ইন্দ্রায়ণ। মুসলমানেরা যে এই দুর্গটিকে ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিয়া রাজগড়ে যাইবার পথ পরিষ্কার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে তাহা ইন্দ্রায়ণ দুর্গের নবীন অধ্যক্ষ নিত্যজীর অজ্ঞাত নহে। সেই জন্য দুর্গাধ্যক্ষের উৎসাহে ও যত্নে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্গ প্রস্তুত হইয়াছে। জীর্ণস্থানের সংস্কার, দুর্গপ্রাচীরে শান্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, দুর্গস্তম্ভে ও প্রাচীর রন্ধ্রে নবক্রীত কামান স্থাপনা করা হইয়াছে এবং অবরোধকালে দুর্গস্থ সৈনিকমণ্ডলী যাহাতে খাদ্যাভাবে কষ্টভোগ না করে তজ্জন্য নানা স্থান হইতে যথেষ্ট আহার্য্য দ্রব্য-সম্ভার দুর্গভাণ্ডারে আনীত হইয়াছে।

দুর্গরক্ষক নিত্যজী পঞ্চবিংশ বর্ষীয় যুবক—দৈহিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। পদোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সে যখন দুর্গপ্রাচীরের উপরে পাদচারণা করে, তখন দুর্গস্থ সকলে ভাবে, বুঝি ত্রিদিবাগত কোন দেব-নন্দন মহারাষ্ট্রসৈনিক-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তাহাদের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। নিত্যজী শঙ্কটে অবিচলিত, মন্ত্রণায় দক্ষ এবং কূট রাজনীতি ও যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী। আর—সৈনিক জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য-পালনই তাহার জীবনের মহাব্রত। তবু তাহার মন ধর্ম্মের উজ্জ্বলালোকে আলোকিত, তাহার প্রাণ, কোমল কুসুমের মত পেলব, তাহার খ্যাতি সুবাসের মত দিগন্তবিস্তৃত এবং সেই খ্যাতির আধার নিত্যজী আত্মসমর্পণ করিয়াছে—ইন্দ্রাণীনদী-তীরস্থ কৈলাগ্রাম নিবাসী গোকুলজী-দুহিতা পরমাসুন্দরী মীনার চরণকমলে।

মীনা যুবতী, বিহগীর মত আনন্দময়ী, পবনের মত স্বচ্ছন্দচারিণী, চন্দ্রের মত সুহাসিনী এবং জ্যোৎস্নার মত প্রীতিদায়িনী। শুভ্রবসন-পরিহিতা কুসুম-ভূষণা মীনা যখন আগুল্ফবিলম্বিত কুঞ্চিত চিকুরদাম দোলাইতে দোলাইতে ক্ষিপ্রপদে নদীতীরে ভ্রমণ করে, তখন নিত্যজী সেই দেবীপ্রতিমা কমনীয় মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকে। ক্ষুদ্র তরণী আরূঢ়া তরুণী মীনা যখন দুর্গতলে ক্ষেপণীর তালে তালে কোকিল-কণ্ঠে সঙ্গীতালাপ করে, দুর্গের শতকার্য্য ফেলিয়া নিত্যজী তখন সেই প্রাণোন্মাদিনী মূর্চ্ছনার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। নিত্যজী মজিয়াছে;—কিন্তু ধ্যানের দীপ্ত মূর্ত্তি, কল্পনার চিরসহচরী, চিন্তা-রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী মীনাকে মজাইতে পারে নাই,—কারণ মীনা কৃষকযুবা কিষেণজীর প্রণয়মুগ্ধা।

(২)

বহুদিন প্রাবৃটের নিবিড় নীরদজালের অন্তরালে নিজকে গোপন রাখিবার পর অদ্য পূর্ণিমার মহাবাসরে মেঘশূন্য সুনীলাম্বরে চন্দ্র উঠিয়াছে। রজতশুভ্র রশ্মিজাল বীচিমালা-সঙ্কুল তটিনীবক্ষে পতিত হইয়া তাহাকে সৌন্দর্য্যবতী নবীনা কামিনীর মত দীপ্তিময়ী করিয়া তুলিয়াছে। নদীতটস্থ শ্বেত উপলখণ্ডসমূহ সর্ব্বাঙ্গে আলো মাখিয়া জ্যোতিষ্মান;—আর কলনাদিনী উজ্জ্বল স্রোতস্বিনীবক্ষে তরণী আরোহণে দুর্গতলে প্রস্ফুট জ্যোৎস্নাস্নাতা মীনা।

দুর্গপ্রাচীর হইতে নিত্যজী ডাকিল, "মীনা!"

মীনা চমকিত হইয়া ঊর্দ্ধে চাহিল;—দেখিল, প্রাচীর

প্রান্তে দাঁড়াইয়া দুর্গরক্ষক। শশিকিরণ তাহার বহুমূল্য ভূষণসংলগ্ন হীরকখণ্ডে পতিত হইয়া তাহাকে উজ্জ্বলতর এবং রত্নখচিত তরবারি মূলে পড়িয়া তাহাকে অধিকতর আভাময় করিয়াছে। নিত্যজী একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া আবার ডাকিল, "মীনা।" স্বর মধুর, কোমল, মৃদু।

মীনা উত্তর করিল, "কে ? দুর্গরক্ষক !"

নিত্যজী বলিল,—"মীনা, বিজাপুরীসৈন্য দুর্গ আক্রমণ করিতে আসিতেছে,—জানিনা সে যুদ্ধে বাঁচিব কি না ! তাই আজ তোমাকে আমার প্রাণের কথা বলিতে যাইতেছি,—শুনিবে কি ?"

"কি কথা ?"

নিত্যজী নীরবে উর্দ্ধে চাহিল, দেখিল, চন্দ্র হাসিতেছে। নিম্নে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল, বিস্ময়োন্মুখী মীনা তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

ধীরমৃদুস্বরে নিত্যজী বলিতে লাগিল—"মীনা, আমি তোমাকে ভালবাসি। কবে কোন শুভ কি অশুভ মুহূর্ত্তে এই ভালবাসা আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় যেদিন আমি দূরে ঐ প্রস্তর খানির উপর তোমার মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম সেই দিন। মনে পড়ে সে দিনের কথা ?"

"পড়ে।"

"আমি সৈনিক, সুতরাং আমার জীবনের স্থিরতা নাই। প্রাণের এ নশ্বরতা জানিয়াও বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। চেষ্টা করিয়াছিলাম,—কিন্তু মীনা, আমি সফল হই নাই।"

কম্পিতকণ্ঠে মীনা উত্তর করিল, "দুর্গরক্ষক নিত্যজী, আপনি দেবতা। আমরা কখনো আপনাকে মানুষ বলিয়া মনে করি না। কিন্তু কি করিব ! আপনি অপাত্রে ভালবাসা ন্যস্ত করিয়াছেন। আপনার পত্নী হওয়া আমার বড় সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু প্রাণ আমার নহে—তা' যদি হইত—"

নিত্যজীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয় নমিয়া গেল, আর দুই বিন্দু সন্তোগলিত অশ্রু চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল হইয়া তাহার পরিচ্ছদে পতিত হইয়া মিলাইয়া গেল। দুর্ব্বিসহ যাতনায় মুহ্যমান হইয়া ভগ্নস্বরে নিত্যজী ডাকিল, "মীনা।"

নৈরাশ্য মাখা, বেদনার দীর্ঘশ্বাস মিশ্রিত সে আহ্বান শেলের মত মীনার অন্তরে বাজিল। তাহার আর্দ্র নয়ন হইতে দরবিগলিত জলধারা প্রবাহিত হইল। প্রভাতকালীন শিশির-শিক্ত গোলাপের মত অশ্রু-চর্চ্চিত মুখখানি তুলিয়া মীনা বলিল,—"সব বুঝি,—কিন্তু—"

দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে নিত্যজী বলিল—"যাও মীনা, তোমার সুখের পথের কণ্ঠক হইতে চাহি না। পরমেশ্বর তোমাকে সুখী করুন।"

নীরবে অবনত বদনে মীনা চলিয়া গেল। আর দুর্গরক্ষক গতিশীল তরণী আরূঢ়া সেই সুন্দরীর দিকে সাশ্রুনয়নে চাহিয়া রহিল।

(৩)

গুপ্তচর সংবাদ আনিয়াছে যে প্রায় পঞ্চসহস্র বিজাপুরীসৈন্য অনলোদ্গারী কামানসহ সুদক্ষ সেনাপতি পরিচালিত হইয়া বিরাট ঝঞ্ঝার মত ইন্দ্রায়ণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এদিকে নিত্যজীও প্রস্তুত। তাহার অধীন কর্ম্মচারীবর্গ যুদ্ধকুশল, সৈনিকগণ বিশ্বাসী ও পরিশ্রমী, তদুপরি দুর্গস্থ কামানগুলি যমসম।

ইন্দ্রায়ণ দুর্গ প্রকৃতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। তিনদিকে তুঙ্গ-শৃঙ্গ পর্ব্বতরাজি—অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। একদিকে বর্ষাসমাগমে স্ফীতকায়া তরঙ্গিণী ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণীর অপর পারে বৃক্ষমালা পরিবেষ্টিত কৈলাগ্রাম। সুতরাং কৈলা অধিকার করিয়া ইন্দ্রাণী উত্তীর্ণ না হইলে ইন্দ্রায়ণ অধিকার করা অসম্ভব। অধিকন্তু, মহাবীর শিবাজী দুইসহস্র অশ্বারোহী মাওয়ালী সৈন্য লইয়া কৈলা জনপদের অপর পার্শ্বে শিবির সন্নিবেশ করিয়া আছেন। কিন্তু মুসলমানেরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও রণদক্ষ। যেমন করিয়া পারে তাহারা ইন্দ্রায়ণ অধিকার করিবে

ও মহাবীর শিবাজীর উন্নতিমূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণপণ আশার উচ্ছেদসাধন করিবে।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে সংবাদ আসিল, বিজাপুরী সৈন্স ভীমপরাক্রমে মহারাষ্ট্র-বাহিনী আক্রমণ করিয়াছে। দুর্গবাসী সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল;—নিত্যজী ওজস্বিনী ভাষায় তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তাহারা উৎসুক হৃদয়ে সংবাদবাহী দূতের পথপানে চাহিয়া রহিল।

রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—গভীর গর্জ্জনে গগনবক্ষে অশনি নিনাদ হইতেছে, চপলার ক্ষণালোকে চারিদিক মুহুর্মুহু চমকিত। এই দুর্য্যোগেও সতর্ক প্রহরী দুর্গ-প্রাচীরে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে রত। দুর্গরক্ষক নিত্যজী প্রকৃতির ভীম ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া, প্রবল ধারাপাত মস্তকে করিয়া প্রচণ্ড বাত্যায় দেহ ঢালিয়া দিয়া চঞ্চল চরণে চারিদিক পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছে। সহসা ভৈরব শৃঙ্গনিনাদ নিত্যজীর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। নদী সৈকতে, পর্ব্বতগাত্রে, দুর্গপ্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সে শব্দ যুদ্ধস্থান-প্রত্যাগত দূতের আগমন ঘোষণা করিল।

গম্ভীরস্বরে নিত্যজী প্রশ্ন করিল,—"নিশীথে দুর্গ-দ্বারে কে?"

"আমি মদনজী,—প্রভু শিবাজীর পার্শ্বচর।"

"যুদ্ধের সংবাদ কি?"

"যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হইয়াছে। সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ, প্রভু আহত। হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তিনি দুর্গে আশ্রয় লাভের জন্য আসিতেছেন। দুর্গরক্ষক নিত্যজী দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিতে আদেশ দিন,—আমি আহত, শোণিতস্রাবে ক্লান্ত।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিত্যজী নিম্নে চাহিল, কিন্তু রজনীর ঘোরান্ধকারে দূতকে দেখা গেল না। বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল কিন্তু দুর্গপ্রাচীরের ছায়ায় থাকায় দূতের দেহ স্পষ্ট দেখা গেল না। সন্দেহাকুল নিত্যজী ডাকিল —"মদনজী!"

"কি?"

"ক্ষমা করিও,—আজিকার সঙ্কেত কথা কি?"

"শিবাজী।"

দুর্গদ্বার খুলিয়া গেল।

(৪)

রক্তচর্চ্চিত অল্পসংখ্যক মাওয়ালী সৈন্স লইয়া শিবাজী ইন্দ্রায়ণ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। নিজের রণক্লান্তি ভুলিয়া সেই মুহূর্ত্তেই রণসভা আহ্বান করতঃ তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিতে বসিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর শিবাজী বলিলেন, "এখন সম্মুখে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করা অসাধ্য। দুর্গ হইতে তাহাদিগকে বাধা দিতে হইবে। ঝড় বৃষ্টির জন্য মুসলমানেরা এখনও কৈলা অধিকার করে নাই। যদি কোন ক্রমে তাহারা গ্রামটি অধিকার করিতে পারে তবে তাহারা গৃহাদির অন্তরাল হইতে অনায়াসেই দুর্গের উপরে গোলা চালাইতে পারিবে। সুতরাং আমার মতে অদ্যই গোলা বর্ষণ করিয়া কৈলা ধ্বংস করা আবশ্যক।"

কোমলপ্রাণ নিত্যজীর হৃদয় গ্রামবাসিগণের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। অবনত মুখে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈলা অধিবাসী?"

শিবাজী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাঁহার কঠোর তীক্ষ্ণদৃষ্টি অস্বাভাবিকরূপে কোমল হইয়া আসিল। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "বুঝিতে পারিয়াছি নিত্যজী, তোমার প্রাণ দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্য কাঁদিয়া উঠিতেছে। কিন্তু অন্য উপায় নাই। যেখানে দেশের মান যাইতে বসিয়াছে, যে আশা লইয়া ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্র-শক্তি ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া একটু একটু করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, দেশের সন্তান আমি একখানি গ্রামের জন্য সে মান, সে আশা অতল জলে নিক্ষেপ করিতে পারি না। যদি করি—স্বর্গের দেবতা আমার মস্তকে শত অভিশম্পাৎ বর্ষণ করিবেন, ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় আমার নামে সহস্র ধিক্কার প্রদান করিবেন।

মনে করিও না এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ। উত্তরে আর এক দুর্দ্ধর্ষ শক্তি অতি সতর্কতা সহকারে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে। সময়ে সে শক্তিও শ্যেনের মত আমাদের উপর পতিত হইবে। তখন আবার কত গ্রাম নষ্ট করিতে হইবে। যাও নিত্যজী, গ্রামবাসীদিগকে প্রভাত পর্য্যন্ত সময় দাও। তাহারা পর্ব্বতে আশ্রয়গ্রহণ করুক। যদি দিন পাই, আবার তাহাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিব।"

শিবাজী নিস্তব্ধ হইলেন। দুই বিন্দু অশ্রু নয়নচ্যুত হইয়া কক্ষতল চুম্বন করিল। নিত্যজী বলিল,—"প্রভো আপনি পরিশ্রান্ত,—আহত। রাত্রির মত বিশ্রাম করুন। আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।"

সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল—উত্তেজিত স্বরে শিবাজী বলিলেন, "বিশ্রাম! না নিত্যজী, বিশ্রামের সময় এখনও আসে নাই। শিয়রে যাহার কালফণী, তাহার আবার শান্তিলাভের প্রয়াস! আমি এখনই দুর্গ ত্যাগ করিব। যেমন করিয়া পারি মুসলমান বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইব—আমাকে বাধা দিও না।"

নিত্যজী নীরবে কক্ষ ত্যাগ করিল।

(৫)

রাত্রি তৃতীয় প্রহর—আকাশ পরিষ্কার। চন্দ্রোদয়ে চারিদিক উদ্ভাসিত।

শিবাজী দুর্গ ত্যাগ করিয়াছেন; ঘোষকগণ বাদিত্র সহযোগে গ্রামবাসীদিগকে গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছে।

নদীতীরস্থ গ্রামখানি আজি কোলাহলে মুখরিত। আলেয়ার আলোগুলি নাচিতেছে, খেলিতেছে, নিবিয়া যাইতেছে। ক্রমে ক্রমে কোলাহল থামিয়া গেল। পূর্ব্বদিকে উষার জ্যোতিঃরেখা। আর বেশী বিলম্ব নাই।

কামান স্তম্ভের নিকটে নব শিক্ষিত অব্যর্থ সন্ধানী হিন্দু গোলন্দাজগণ পলিতা হস্তে প্রস্তুত। শুধু দুর্গাধ্যক্ষের আদেশ অপেক্ষা। নিত্যজী তাহাদের দিকে ফিরিবামাত্র পশ্চাৎ হইতে নারী কণ্ঠে কে ডাকিল, "দুর্গরক্ষক নিত্যজী।"

চকিতে নিত্যজী ফিরিয়া দাঁড়াইল—দেখিল, দুর্গতলে তরণী আরোহণে একটি রমণী মূর্ত্তি—সে রমণী মীনা।

বিস্মিত হইয়া নিত্যজী বলিল—"মীনা তুমি! গ্রাম পরিত্যাগ কর নাই?"

"না দুর্গরক্ষক। আপনার পৈশাচিক ক্রীড়ার প্রারম্ভ ও তাহার সমাপ্তি দেখিবার জন্য এখনও গ্রামে আছি।"

"আমার পৈশাচিক ক্রীড়া! এ কথার অর্থ কি মীনা?"

"ইহার অর্থ আপনিই ভাল বুঝিতে পারেন। তবে এই মাত্র আমি বলিতে পারি—আপনি আমার প্রণয়লাভে হতাশ হইয়া আমার ভাবী স্বামীর বিনাশ সাধন করিবার জন্যই গ্রামের উপরে গোলা বর্ষণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। আমার ভাবী পতি পীড়িত, স্থান ত্যাগ করিতে অশক্ত।"

আবেগপূরিত স্বরে নিত্যজী উত্তর করিল—"মীনা, তুমি জাননা, তুমি ও তোমার প্রণয়ী আমার কাছে কত আদরের। তোমার জীবনরক্ষার জন্য আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি।"

"তবে এরূপ আদেশ দিয়াছেন কেন?"

"কৈলা ধ্বংস না করিলে বিজাপুর-বাহিনীকে বাধা দেওয়া অসম্ভব।"

দলিতা ফণিনীর ন্যায় মীনা গর্জ্জিয়া উঠিল। সতেজে বলিল—"আমরা মহারাষ্ট্র রমণী,—মরিতে জানি। দুর্গরক্ষক, আপনার আদেশ প্রতিপালিত হউক।"

ক্ষিপ্রকরচালনে মীনা তরণীর মুখ ফিরাইল। ভৎর্সনা-ব্যথিত যুবক ডাকিল—"মীনা!"

ফিরিয়া মীনা উত্তর করিল—"কি?"

ধীরে ধীরে নিত্যজী বলিল—"যাও মীনা, তোমার ভাবী পতিকে বল যতক্ষণ নিত্যজীর দেহে বিন্দুমাত্র শোণিত থাকিবে ততক্ষণ তোমাদের কোন ভয় নাই।"

মীনা চলিয়া গেল—নিত্যজী কাষ্ঠপুত্তলিকার মত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

(৬)

মুসলমান সৈন্য কেল্লা অধিকার করিয়াছে, তাহাদিগকে বাধা দিতে দুর্গ হইতে একটি গোলাও নিক্ষিপ্ত হয় নাই। প্রভাতকালীন পার্ব্বত্য ঘন কুজ্ঝটিকার অন্তরালে শত্রুগণ ইন্দ্রাণীর তীরে কামান বসাইয়াছে, দুর্গবাসী কোন সৈনিকই তাহাদিগের উপর একটি বন্দুকও ছুড়ে নাই। দুর্গস্থ সৈনিক-মণ্ডলী দুর্গাধ্যক্ষের আচরণে স্তম্ভিত; বিপক্ষ মুসলমান সেনাপতি দুর্গরক্ষকের অসতর্কতায় বিস্মিত।

প্রভাতের ঘনাবরণ যখন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করিয়া অপসৃত হইল, নবোদিত সূর্য্যের করজাল যখন নদীবক্ষ উজ্জ্বল করিয়া তীরস্থ মহীরুহ-রাজির পল্লবে পল্লবে আলো ঢালিয়া দিল, সেই সময়ে ভীষণ নাদে শত্রুপক্ষীয় কামান শ্রেণী গর্জ্জিয়া উঠিল, উল্কার মত গোলা আসিয়া দুর্গগাত্রে পড়িতে লাগিল। নিত্যজী দুর্গচত্বরে গোলন্দাজদিগকে আহ্বান করিয়া বলিল—"এই সৈন্যের মধ্যে কে এমন স্থিরসন্ধানী গোলন্দাজ আছ যে, গ্রামের মধ্যে গোলা না ফেলিয়া সুধু নদীতীরস্থ মুসলমান-কামান নিস্তব্ধ করিতে পার?"

দুর্গরক্ষকের আহ্বানে পাঁচজন গোলন্দাজ অগ্রসর হইল। সেই ক্ষণেই দুর্গের কামানসমূহ অনল উদ্গিরণ করিতে লাগিল। দুর্গের গোলন্দাজদিগের অবর্থ্য লক্ষ্যে শত্রুপক্ষীয় একটি কামান স্থানচ্যুত ও অপর একটি চূর্ণীকৃত হইল। কৌশলী বিজাপুরী-সৈন্য অবশিষ্ট তিনটি কামান লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। আবার নূতন করিয়া তাহাদের কামান গর্জ্জিতে লাগিল। দুর্গের গোলন্দাজগণ নিত্যজীর দিকে চাহিল—নিত্যজী গোলাবর্ষণে অনুমতি দিল না।

অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণে মুসলমানেরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাচীরের একাংশে রন্ধ্র করিয়া ফেলিল। এদিকে নিশাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিল। চপলার চমক, বজ্রের আরাব, ঝটিকার শন্ শন্ শব্দ দুর্গস্থ জনগণের মনে ভীতির সঞ্চার করিল। স্থির প্রতিজ্ঞ মুসলমান সৈন্য প্রকৃতির অট্টহাস্যে দৃকপাত মাত্র না করিয়া রন্ধ্রমুখে প্রবেশ করিবার জন্য ইন্দ্রাণী অতিক্রম করিতে লাগিল। দুর্গরক্ষক বাধা দিতে পারিতেছে না—কি জানি যদি অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গোলা গ্রামমধ্যে পতিত হয়!

এইবার মুসলমান-বাহিনী একযোগে দুর্গ আক্রমণ করিল। সহসা গম্ভীর উচ্চস্বরে নিত্যজী আদেশ দিল, "ঐ রন্ধ্রপথ রক্ষা করিতে হইবে। অগ্রসর হও,—আক্রমণ কর।"

মুখে হর হর নিনাদ করিয়া মহাবীর্য্যবান হিন্দু সৈন্য লম্ফে লম্ফে রন্ধ্রমুখে অগ্রসর হইল—সর্ব্বাগ্রে দুর্গরক্ষক নিত্যজী। সম্মুখে রন্ধ্রপথে মুসলমানেরা কামান স্থাপনা করিয়াছে—কামানের পশ্চাতে বন্দুক-ধারী পদাতিক সৈন্য। রণোন্মত্ত নিত্যজী আবার আদেশ দিল—"ঐ কামান দখল করিতে হইবে—সৈন্যগণ, আমার পশ্চাৎবর্ত্তী হও।"

নিত্যজী অগ্রসর হইল—সৈন্যগণ পশ্চাৎবর্ত্তী হইল—আর সেই মুহূর্ত্তে মুসলমান কামান ও বন্দুক এক যোগে রন্ধ্রমুখে অগ্নিবৃষ্টি করিল।

(৭)

দুর্গের এক অপ্রশস্ত কক্ষে তৃণশয্যায় শায়িত নিত্যজী—অর্দ্ধচেতন, আহত; পার্শ্বে কারারক্ষী—সশস্ত্র, জাগ্রত। প্রভাত হইয়াছে। কারাকক্ষের ক্ষুদ্র বাতায়ন-পথাগত ক্ষীণ সূর্য্যরশ্মি কক্ষটি ঈষদালোকিত করিয়াছে।

ঝন্ ঝন্ শব্দে দ্বার খুলিয়া গেল। একজন সৈনিক পুরুষ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ভূতপূর্ব্ব দুর্গরক্ষক নিত্যজী, আপনি কি জাগ্রত?"

ক্ষীণস্বরে নিত্যজী উত্তর করিল, "আপনি কোথায়? শত্রু কি দুর্গ অধিকার করিয়াছে? আমি কি বন্দী?"

সৈনিক পুরুষ সংক্ষেপে উত্তর করিল, "হাঁ, আপনি বন্দী। দরবারস্থলে যাইতে কি আপনার কষ্ট হইবে?"

অতিকষ্টে আহত যুবক তৃণশয্যায় উঠিয়া বসিল,—দেহের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সিংহের মত তেজস্বী নিত্যজী দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,—"আমি প্রস্তুত।" সৈনিক অগ্রগামী হইল,—যন্ত্রণা-কাতর নিত্যজী টলিতে টলিতে তাহার অনুসরণ করিল।

ইন্দ্রায়ণ দুর্গের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে দরবার বসিয়াছে। বিচারপতি মহারাষ্ট্রকুলতিলক স্বয়ং শিবাজী। বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধে আজ দুর্গরক্ষক নিত্যজীর বিচার হইবে। নিত্যজী সব দেখিল, সব বুঝিল। মুহূর্ত্তের জন্য নবীন যোদ্ধার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু কুসুমের মত একখানি নয়নাভিরাম মূর্ত্তি তাহার হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া তাহার প্রাণের চাঞ্চল্য, বুকের কম্পন নিবারণ করিল।

গম্ভীর স্বরে শিবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইন্দ্রায়ণ দুর্গরক্ষক নিত্যজী, বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ আমি তোমাকে কৈলা গ্রামের উপরে গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ দিয়াছিলাম। তুমি সে আদেশ কেন প্রতি-পালন কর নাই?"

নিত্যজী নিরুত্তরে ভূমির দিকে চাহিয়া রহিল। বজ্রনাদে শিবাজী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বিশ্বাসঘাতক?"

ঝন্ ঝন্ শব্দে বন্দী যুবকের শৃঙ্খল বাজিয়া উঠিল,—অবনত শির চকিতে উন্নত হইল, নিমেষের জন্য নয়নযুগল দীপ্তি বর্ষণ করিল, পরক্ষণেই উন্নত শির আবার অবনত হইল, উজ্জ্বল চক্ষু ম্লান হইয়া গেল। ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বন্দী উত্তর করিল—"আমি বিশ্বাস-ঘাতক নহি।"

"মিথ্যা কথা।"

দারুণ রোষে, নিত্যজী তরবারি ধারণের জন্য হস্ত-প্রসারণ করিল। কিন্তু তরবারি কোথায়? বীরের সে চিহ্ন পূর্ব্বেই তাহার পার্শ্বচ্যুত হইয়াছিল। স্মধু শৃঙ্খল ঝন্ ঝন্ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মুখ ফিরাইয়া লইয়া শিবাজী আদেশ দিলেন, "আমি তোমার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলাম।"

প্রহরীবেষ্টিত হইয়া নিত্যজী অকম্পিত পদে দরবার-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিল।

* * * *

দুর্গতলে তরণী আরোহণে মীনা। আজ সে আসিয়াছে নিত্যজীকে ধন্যবাদ দিতে, তাহার অসীম করুণার জন্য।

মীনা ডাকিল, "শাস্ত্রী রঘুজী, দুর্গরক্ষক নিত্যজীকে বল গোকুলজী-দুহিতা মীনা তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী।"

বিস্ময়চকিতনেত্রে রঘুজী মীনার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি সব শোন নাই?"

"শুনিয়াছি। যখন মুসলমানেরা দুর্গ অধিকারের উপক্রম করিয়াছিল তখন প্রভু শিবাজী পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছেন। ইন্দ্রায়ণ দুর্গ আজও মহারাষ্ট্র অধিকারে।"

"আর প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া দুর্গরক্ষক নিত্যজী কৈলাগ্রামে গোলা বর্ষণ করেন নাই, এই অপরাধে অদ্য প্রভাতে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে।"

দুই করে মুখাবৃত করিয়া মীনা তরণীগর্ভে বসিয়া পড়িল।—কর্ণধারবিহীন তরণী স্রোতোবেগে ছুটিয়া চলিল।

শ্রীবামনদাস মৈত্র।

মানস মিলন

নীল আকাশের চারু চন্দ্রাতপতলে
সাগর-অম্বরা
মোহিনী ধরণী নিত্য রেখেছে সাজায়ে
সৌন্দর্য্য-পসরা।
কত বর্ণ কত গন্ধ বিচিত্র সঙ্গীতে
কত আয়োজন,—
মানুষ তবুও শুধু খোঁজে চিরদিন,
মানুষের মন।

এসেছিল যারা হেথা আমাদেরি মত
শত যুগ আগে,
হেরেছে ধরার শোভা-অনন্ত-নবীন—
হেন অনুরাগে।
ভাসিয়া গিয়াছে তারা কোথা কত দূরে
কালের সাগরে,
রেখে গেছে যত প্রেম-বাসনা-বেদনা
মানবের তরে।

কোন্ সে অতীত বর্ষে লিখেছিলা কবি—
সুধাস্যন্দী শ্লোকে,
অভিশপ্ত বিরহীর আকুল আবেগ
নবমেঘালোকে।
কোথা সেই রামগিরি, কোথায় অলকা—
কোথা বিরহিণী,
কোথা সেই মহাকবি, নবরত্নপ্রভা—
কোথা উজ্জয়িনী!

চাহি' নব আষাঢ়ের সজল জলদ-
আবৃত গগনে,
দূরস্থিত প্রণয়ীর চির-ব্যাকুলতা
জাগে আজি মনে।
এমনি বরষাগমে নব জলধর
যুগ যুগান্তরে
বিরহীর বার্ত্তা বহি' প্রিয়ার উদ্দেশে
ধাইবে অম্বরে।

ভরা বাদরের দিনে ভুবন ভরিয়া
বারি বরিষণ,
মত্ত দাদুরীর ডাক, বিজলীর লীলা
ঝঞ্ঝা-গরজন;
মনে পড়ে কোন্ যুগে এহেন ভাদরে
দূর বৃন্দাবনে
শূন্য গৃহে রাধিকার দীর্ঘ দিন রাতি
কেটেছে কেমনে।

বিস্মৃত আশ্বিনে কবে গিরিরাজ-জায়া
ভূমিতল-লীন,
প্রবাসিনী তনয়ার পথ পানে চাহি'
গণেছিলা দিন।
আজি এ আলোক-ফুল্ল শরৎ-প্রভাতে,
আগমনী গানে
স্নেহাতুরা জননীর মরম-বেদনা
বাজে তাই প্রাণে।

বিচিত্র বাসনা-আশা ফুটে উঠে যত
নিভৃত অন্তরে,
কবি চাহে ছন্দে গাঁথি দিতে উপহার
বিশ্বজন-করে।
যুগে যুগে মানবের আত্মনিবেদন,
কাব্য-গীতি-গানে,
বিপুল পৃথিবী পরে মরমীজনের
ফিরিছে সন্ধানে।

ক্ষুদ্র সুখ ক্ষুদ্র দুঃখ নিমেষে মিলায়;
তবু বিশ্বমাঝে
নিখিল মানব চিত্ত-বীণার তন্ত্রীতে
সুর তার বাজে।
সকল সাধনা মাঝে তাই চিরদিন,
মানুষের মন,
অতিক্রমি দেশ কাল মানবের সাথে
মাগিছে মিলন।

শ্রীরজনীমোহন ঘোষ।

নীরবকর্ম্মী রমাপ্রসাদ রায়

উপক্রমণিকা। মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণজালে যখন ভূমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে, উজ্জ্বলতম নক্ষত্রও তখন আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। আমাদের জাতীয় জীবনের যে যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি পিতা রামমোহনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত, সেই যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পুত্র রমাপ্রসাদের প্রতিভার আলোকরশ্মি যে ম্লানভাবে প্রতিভাত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। নতুবা যে অসাধারণ বাঙ্গালী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপূর্ব্ব মনীষা ও অপ্রতিরুদ্ধ অধ্যবসায়ের বলে, জনসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রথমে দেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালীর যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে দেশবাসীর জন্য বিচারপতির পবিত্র সিংহাসন অধিকৃত করিয়া লইয়াছিলেন,—তাঁহার জীবন-কথা, তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী, আজ বাঙ্গালীর নিকট বোধ হয় এত অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইত না; মানব-স্বভাব-সুলভ সহস্র দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও মনীষী রমাপ্রসাদ রায় বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বোধ হয় আমাদের সাহিত্যরথিগণের নিকট হইতে সসম্মান পূজা ও শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতেন না।

জন্ম। ১২২৪ বঙ্গাব্দে ১২ই শ্রাবণ (ইংরাজী ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে) রমাপ্রসাদ রায় জন্ম পরিগ্রহ করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্রের বংশপরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক। আটবৎসর বয়ঃক্রমকালে বালক রামমোহনের প্রথমা স্ত্রীর দেহান্তর ঘটে। পরবৎসর তিনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কুড়মন পলাশিগ্রামে শ্রীমতী দেবী নাম্নী একটি বালিকাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার জীবদ্দশাতেই ভবানীপুরে কৃতনিবাস ৺মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী উমাদেবীকে বিবাহ করেন। মধ্যমা স্ত্রীর গর্ভে প্রথমে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন এবং রাধাপ্রসাদের জন্মের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে, কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম হয়। উমাদেবীর কোনও সন্তানাদি হয় নাই।

জন্মস্থান। রমাপ্রসাদের জন্মস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কিশোরীচাঁদ মিত্র এক-স্থানে লিখিয়াছেন যে, ক্ষীরপাই রাধানগরে রমাপ্রসাদের জন্ম হয়। কৃষ্ণদাস পাল-সম্পাদিত হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রে উহার প্রতিবাদ করিয়া একজন লেখক লিখিয়াছিলেন, খানাকুল কৃষ্ণনগরে রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বোধ হয় রামমোহন রায়ের চরিতকার ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সত্য। নগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"বিধর্ম্মী" বলিয়া "রামমোহন রায় পুত্র (রাধাপ্রসাদ) ও পুত্রবধূর সহিত মাতা (তারিণী দেবী ওরফে ফুল ঠাকুরাণী) কর্ত্তৃক পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া রাধানগরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুর গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করেন। উক্ত বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন।"

মহাপ্রাণ পিতার স্নেহময় ক্রোড়ে বালক রমা-প্রসাদের চিত্তবৃত্তি প্রথম বিকশিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রামমোহন ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭ শে সেপ্টেম্বর দিবসে ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। রামমোহনের ইংলণ্ডগমন কালে রমাপ্রসাদ বালক মাত্র ছিলেন, তথাপি তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে তাঁহার পিতার স্নেহশীল ব্যবহারের আনন্দময়ী স্মৃতি তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়পটে চিরদিন সমুজ্জ্বল ছিল এবং তিনি গৌরব-বিমিশ্রিত আনন্দের সহিত তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট উত্তরকালে তাঁহার পিতার কথা বলিতেন।

শিক্ষা। রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে বালক রমাপ্রসাদ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এই

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং রামমোহনের বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড উইলিয়ম আড্যাম উহার পরিদর্শক ছিলেন। ইংলণ্ড গমনকালে রামমোহন রমাপ্রসাদকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ ও অকৃত্রিম সুহৃদ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। এই সময়ে রমাপ্রসাদ 'পেরেণ্ট্যাল আক্যাডেমি'তে প্রবিষ্ট হন। চিরস্মরণীয় য়ুরেশিয়ান কবি, দার্শনিক ও শিক্ষক হেন্‌রী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রিয়বন্ধু মিষ্টার রিকেট্‌স্ এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই বিদ্যালয় এক্ষণে ডভ্‌টন্ কলেজ নামে পরিচিত। রমাপ্রসাদ কিছুকাল পরে রামমোহন রায় ও ডেবিড্ হেয়ারের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রবেশলাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তাঁহার প্রতিভা বিশিষ্টভাবে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার গভীর পাঠানুরাগ, অবিচলিত অধ্যবসায়, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সহপাঠিগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম অভিভাবক প্রিন্স দ্বারকানাথের সহবাসে তিনি যথেষ্ট মানসিক উন্নতি সংসাধিত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ একস্থানে লিখিয়াছেন—"দ্বারকানাথ ঠাকুরের সবিশেষ সংসর্গ হওয়াতে অতি অল্প বয়সে তাঁহার মনুষ্য পরীক্ষা করিবার ও সহজে দুরবগাহ বিষয় সকল বুঝিয়া লইবার সবিশেষ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।" বাস্তবিক, রমাপ্রসাদের বাল্যজীবনের উপর দ্বারকানাথ যে অপরিমেয় মঙ্গলময় প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহাই যে রমাপ্রসাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান কারণ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ডেবিড্ হেয়ার স্মৃতি-সমিতি। হিন্দুকলেজে পাঠাবস্থায় রমাপ্রসাদ বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ডেবিড্ হেয়ারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। রামমোহন রায়ের পুত্রকে ডেবিড্ হেয়ার পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। রমাপ্রসাদও মহাত্মা ডেবিড্ হেয়ারকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন দিবসে হেয়ার সাহেব পরলোক গমন করিলে উক্ত বৎসর ১৭ই জুন তারিখে কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশ্যে মেডিক্যাল কলেজের গৃহে একটি বিরাট সভা আহূত করেন। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্র, কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তারা হেয়ারের গুণকীর্ত্তন করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অবশেষে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিসমিতি সংগঠিত হয়। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং এই স্মৃতিসমিতির অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।* এই সমিতির চেষ্টায় ডেবিড্ হেয়ারের একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হয় এবং প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সম্মুখে, পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হেয়ার স্কুলের মধ্যস্থিত ভূমিতে স্থাপিত হয়।

রামমোহনের অর্থাভাব। দিল্লীর বাদশাহের কার্য্যানুরোধে ইংলণ্ড গমনকালে রামমোহন বাদশাহ প্রদত্ত 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে সুদূর প্রবাসে যে তিনি অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন একথা বোধ হয় অনেকের নিকটেই এক্ষণে অপরিজ্ঞাত। স্বর্গীয় প্যারিচাঁদ মিত্র প্রণীত রামকমল সেনের জীবনীতে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ডাক্তার হোরেস হেম্যান উইলসনের কতকগুলি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে ডাক্তার উইলসন দেও-

* অন্যান্য সদস্যের নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য :—রাজা কৃষ্ণনাথ রায়, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল সিংহ, হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী, রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, দিগম্বর মিত্র, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র মিত্র, দীননাথ দত্ত, ব্রজনাথ ধর, প্যারীচাঁদ মিত্র। হরচন্দ্র ঘোষ এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন।

িনি রামকমল সেনকে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহা হইতে পাঠকগণ রামমোহনের তাৎকালীন আর্থিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।—

"পূর্ব্বে লিখিত একখানি পত্রে আপনাকে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর কথা লিখিয়াছি। তাহার পর মিষ্টার হেয়ারের ভ্রাতার সহিত আমার সাক্ষাত ও উক্ত বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন হয়। রামমোহন মস্তিষ্কের রোগে প্রাণত্যাগ করেন; তিনি খুব পুষ্টাঙ্গ হইয়াছিলেন এবং যখন আমি তাঁহাকে দেখি তিনি স্থূলকায় হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বদনমণ্ডল অত্যধিক শোণিত-প্রবাহে রক্তিমাভ হইয়াছিল। তাঁহার যকৃৎ রোগ হইয়াছে এইরূপ সকলে অনুমান করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই রোগের জন্যই চিকিৎসিত হইয়াছিলেন—মস্তিষ্কের রোগের জন্য নহে। মানসিক উদ্বেগে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অর্থাভাববশতঃ সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন এবং অত্রত্য বন্ধুগণের নিকট ঋণগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঋণগ্রহণ করিতে নিশ্চয়ই তাঁহাকে যথেষ্ট ক্লেশস্বীকার করিতে হইয়াছিল, কারণ ইংলণ্ডের লোকেরা বরঞ্চ প্রাণ দিতে পারে তথাপি অর্থ হস্তান্তরিত করিতে চাহে না। অধিকন্তু, মিষ্টার স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট (যাহাকে তিনি তাঁহার সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন) তাঁহাকে বাকী বেতন বলিয়া অনেক টাকার দাবী লইয়া অত্যন্ত উত্যক্ত করিতেন এবং তাঁহাকে এই বলিয়া ভয় দেখাইতেন যে যদি তিনি সমস্ত না দেন তাহা হইলে তিনি ইংলণ্ডে প্রকাশিত রামমোহনের পুস্তকাদি তাঁহার (স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণটের) স্বরচিত বলিয়া প্রকাশ করিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি যথার্থই তাহা করিয়াছেন।"

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে মৃত্যুকালে রামমোহন রায় প্রায় তিন লক্ষ টাকা ঋণ রাখিয়া যান।

রমাপ্রসাদের চাকুরী গ্রহণ। রামমোহনের মৃত্যুর পর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সমস্ত ভার রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদের উপরেই পড়িল। রমাপ্রসাদ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষা এবং জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অগ্রজের সহিত পৈত্রিক জমিদারী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের চিরস্মরণীয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক একটি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। রমাপ্রসাদ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে নদীয়ার ডেপুটী কলেক্টর হন এবং পরে ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধমান হুগলী ও চব্বিশ পরগণায় কার্য্য করেন। বাঙ্গালা প্রদেশে তৎকালে এই চারিটী জিলাই কি ঐশ্বর্য্যে, কি বিদ্যাগৌরবে, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই সকল জিলায় কার্য্য করিয়া রমাপ্রসাদ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। জর্জ্জ টয়েন্‌বির "A Sketch of the Administration of the Hoogly District from 1795 to 1845' নামক গ্রন্থপাঠে প্রতীত হয় যে রমাপ্রসাদ কিছুকাল হুগলী জিলায় কালেক্টরের কার্য্যও করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালী এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিবার অধিকার পান নাই। মিষ্টার টয়েনবি লিখিয়াছেন "The first Deputy Collector was Babu Rumapersad Roy, and I find that in 1842 he was in charge of the district during the Collector's illness—the first instance, probably, of a native Deputy Collector being in such charge." বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। এখনও বর্দ্ধমান রাজবাটীতে সযত্ন-রক্ষিত রমাপ্রসাদের সুন্দর তৈলচিত্র তাঁহাদিগের গভীর বন্ধুপ্রেমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেকালে ডেপুটী কলেক্টরদিগের পদ যথেষ্ট সম্মানের ছিল। এই পদের গৌরবরক্ষার জন্য দেশীয় ডেপুটী কলেক্টরগণকে সিবিলিয়ান কলেক্টরদিগের ন্যায় জাঁকজমকে থাকিতে হইত। সুতরাং যাঁহারা প্রভূত পৈত্রিক ধনের অধিকারী না হইতেন এবং অসাধুবৃত্তি অবলম্বন না করিতেন, তাঁহারা এই পদ প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট সম্মান লাভ করিতেন বটে কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে



রাজা রামমোহন রায়

পারিতেন না। 'প্রিন্স' দ্বারকানাথের সহবাসে রমাপ্রসাদের রুচি অতি উচ্চ আদর্শে সংগঠিত হইয়াছিল। একজন অশীতিপর বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার 'আমীরি চাল' ছিল। যতই অধিক মূল্য হউক না কেন তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্যাদিই ক্রয় করিতেন ও ব্যবহার করিতেন। রমাপ্রসাদের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ছিল, সুতরাং তিনি শীঘ্রই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

ব্যবহারাজীব। এই সময়ে প্রখ্যাতনামা প্রসন্নকুমার ঠাকুর সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিয়া প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। রমাপ্রসাদ চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্নকুমারের স্থায় স্বাধীনভাবে ওকালতী করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিলেন। 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রের একজন লেখক লিখিয়াছেন যে রমাপ্রসাদের ওকালতীতে প্রবেশ করিবার সময় একটু গোলযোগ হইয়াছিল। এই সময়ে একটি নূতন নিয়ম প্রচলিত হয়, সেই নিয়মানুসারে প্রধান বিচারপতি জন্ রাসেল কল্‌ভিন্ তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র আনিতে বলেন। রমাপ্রসাদ তাঁহার বন্ধু বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষকে এই বিষয়ে বলিলে, রামগোপাল অবিলম্বে ভারতবন্ধু ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের নিকট গিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন তখন এ দেশের ব্যবস্থাসচিব ছিলেন এবং তাঁহার অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণর স্যর জন্ লিট্‌লারকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন, 'যদি নেলসনের পুত্র নৌ-বিভাগে কর্ম্মপ্রার্থী হইতেন তাহা হইলে কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিফল মনোরথ করিতে পারিতেন? যদি রামমোহন রায়ের পুত্রকে বিচারালয়ে নিজের চেষ্টাতেও অর্থোপার্জ্জন করিতে



রামমোহন রায়ের পৈত্রিক ভিটা

দেওয়া না হয় তাহা হইলে এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের কলঙ্কের বিষয়।" বেথুনের সুপারিসের ফলে রমাপ্রসাদের নাম উকীল-শ্রেণীভুক্ত হয়। প্রথম বৎসর রমাপ্রসাদের তাদৃশ আয় হইল না, কিন্তু চাকুরীতে তিনি যে বেতন পাইতেন, দ্বিতীয় বৎসর ওকালতীতে তাহার দ্বিগুণ আয় হইল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিকট তিনি অনেক সাহায্য লাভ করেন। অন্যান্য পিতৃবন্ধুগণের সাহায্যে রমাপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে আরও উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে প্রসন্নকুমার অবসর গ্রহণ করিলে রমাপ্রসাদ প্রধান বিচার-



দ্বারকানাথ ঠাকুর

পতি মিষ্টার জন রাসেল কল্‌ভিনের সুপারিষে লর্ড ড্যালহৌসী কর্ত্তৃক তাঁহার স্থানে সরকারী উকীল নিযুক্ত হইলেন। এই সময় হইতে তাঁহার আর প্রতিষ্ঠার সীমা রহিল না। তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সমস্ত প্রসার ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইলেন। যেরূপ দক্ষতার ও নিপুণতার সহিত তিনি কার্য্য করিতেন তাহাতে ইংরাজ বিচারকগণ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন। শিক্ষিত বঙ্গবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু মাননীয় জে, আর, কল্‌ভিন্ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। আট বৎসর কাল কলেক্টরের কার্য্য করিয়া জমি ও খাজনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক নিয়মাদিতে তাঁহার অসামান্য জ্ঞান হইয়াছিল। সদর দেওয়ানী আদালতের অধিকাংশ মোকদ্দমাই জমি ও খাজনা সংক্রান্ত। সুতরাং রমাপ্রসাদ অতি সুন্দরভাবে এই সকল মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহার য়ুরোপীয় ও দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরা কিছুতেই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিতেন না। রমাপ্রসাদের অসাধারণ তর্কশক্তি ছিল এবং দুরূহ বিষয়গুলিকেও সরল ও সহজ ভাবে বুঝাইয়া দিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি বাগ্মী ছিলেন না কিন্তু শান্ত ও ধীরভাবে আপনার বক্তব্য বলিয়া যাইতেন, কখনও একটিও অনাবশ্যকীয় কথা বলিতেন না। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে কেহই তাঁহার ন্যায় বিচারশক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেন না। তিনি কিছুতেই উষ্ণ হইতেন না।

সদর দেওয়ানী আদালতের সর্ব্বপ্রধান উকীলরূপে দেশীয় ও য়ুরোপীয় নানা শ্রেণীর নানা প্রকারের ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। সকলেই তাঁহার অমায়িক ও বিনয়নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতেন। এইরূপে তিনি সকল সমাজের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং সকল সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় ও দেশীয় সমাজের মধ্যে বন্ধন স্বরূপ ছিলেন। রাজনীতি-বিশারদ কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন যে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরে আর কোনও বাঙ্গালী রমাপ্রসাদের ন্যায় য়ুরোপীয় সমাজে এতদূর প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

গুণগ্রাহিতা। রমাপ্রসাদ অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। ভবিষ্যতে যিনি হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই মনীষী দ্বারকানাথ মিত্রের জীবন-প্রভাতে রমাপ্রসাদই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা

লাভে সাহায্য করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া গুণগ্রাহী রমাপ্রসাদ তাঁহাকে যে সাহায্য করিয়াছিলেন সে সাহায্য না পাইলে দ্বারকানাথ অত শীঘ্র প্রসিদ্ধি-লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহের বিষয়। দ্বারকানাথের একজন চরিতকার রমাপ্রসাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন :—

"রমাপ্রসাদ বাবু সে সময়ে গবর্ণমেণ্টের সিনিয়র উকীল এবং উকীল-বারের প্রধান ছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহার ক্ষমতা অতুলনীয় ছিল, সুতরাং নূতন উকীলদিগের অনেকে তাঁহার সুনজরে পড়িবার চেষ্টা করিত। রমাপ্রসাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সকলের উপর থাকিত, যোগ্য লোক পাইলে তিনি সন্তুষ্টমনে তাহাকে সাহায্য করিতেন। দ্বারকানাথ বারে প্রবেশের অল্পদিন মধ্যে রমাপ্রসাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন, রমাপ্রসাদ বাবু ইহাঁকে বিশিষ্ট বুদ্ধিমান ও কাজের লোক দেখিয়া অনেক সময় নিজের সহকারী বা জুনিয়ার করিয়া লইতেন।"



রামমোহন রায়ের সমাধি

রমাপ্রসাদেরই চেষ্টায় 'ব্যবস্থা দর্পণ' প্রণেতা দরিদ্র সন্তান শ্যামাচরণ সরকার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান অনুবাদকের পদলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বাবু (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও ওকালতীর প্রথম অবস্থায় রমাপ্রসাদের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন।

রমাপ্রসাদের গুণগ্রাহিতার আর একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মৌলবী (পরে নবাব বাহাদুর) আবদুল লতিফ খাঁ জাহানাবাদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে সেই ডিভিসনের যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত করেন। তিনি জাহানাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবার সময় রমাপ্রসাদের নেতৃত্বে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আবদুল লতিফকে একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তৎকালে অভিনন্দন-পত্র প্রদানের প্রথা এতদূর বিস্তৃতিলাভ করে নাই।

কিন্তু দেশের এইরূপ উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ না করা গুণগ্রাহী রমাপ্রসাদের নিকট দোষাবহ মনে হইয়াছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে রমাপ্রসাদ আবদুল লতিফের উচ্চপ্রশংসা করিয়া তৎসহিত অভিনন্দন পত্রটি প্রেরণ করেন। বিনয়ের অবতার আবদুল লতিফ যে প্রত্যুত্তর দেন তাহার শেষভাগে রমাপ্রসাদকে লিখিয়াছিলেন :—



দ্বারকানাথ মিত্র

"In conclusion allow me to state that if anything could add to the value of the address I am now acknowledging, it is the act of the subscribers in making you the medium of its presentation."

শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহ। দেশে শিক্ষা-বিস্তারে রমাপ্রসাদের অসীম আগ্রহ ছিল। ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট দৃষ্টে প্রতীত হয় যে বাঁশবেড়িয়ায় রমাপ্রসাদ একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। উহাতে বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের শিক্ষা প্রদত্ত হইত। *

শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ এই পাঠশালার শিক্ষক এবং সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ এই বিদ্যালয়ের পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে হিন্দুরীতি অনুসারে বেতন না লইয়া বিদ্যাদান করা হইত।

আলেক্জাণ্ডার ডফ্ প্রভৃতি খ্যাতনামা খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে হিন্দুবালকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত করেন। † রমাপ্রসাদ দেবেন্দ্রনাথকে এই বিদ্যালয় স্থাপনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং এই বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও রাজনারায়ণ বসু উহার পরিদর্শক ছিলেন।

শিক্ষা পরিষদ। কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি শিক্ষা পরিষদ এদেশে বিস্তারের ব্যবস্থা করিতেন এবং শিক্ষাবিষয়ক সকল প্রশ্নের সমাধান করিতেন। রমাপ্রসাদ

* There is an English school at Bansbaria, an ancient seat of Hindu learning, supported by Babu Debendra Nath Tagore and Rama Prasad Ray, the sons of distinguished fathers. It is established for the diffusion of Vedantic principles."

† যাঁহারা এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানিতে চান তাঁহারা ১৮৩৮ শকের বৈশাখের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন।

কিছুকাল এই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে পরিষদকে বহু জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। সে সকল প্রশ্নের সমাধানে মনীষী রমাপ্রসাদের সুচিন্তিত মন্তব্যাদি যে কতদূর সহায়তা করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন যে যুক্তপ্রদেশে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর গুণে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য সেইরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করার ঔচিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে বিবেচনা করিতে বলেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে এই সময়ে রেভারেণ্ড জেম্স্ লঙ্ মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকাদির ও তাহার রচয়িতৃগণের নামের তালিকা সম্বলিত সুপ্রসিদ্ধ রিপোর্ট লিখেন এবং রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি শিক্ষাপরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের সুচিন্তিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে রমাপ্রসাদের এই সকল মন্তব্যাদির (Minutes) পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে রমাপ্রসাদ উহার প্রথম 'ফেলো' বা সদস্য নির্ব্বাচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে তিনি ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রধান সদস্য ছিলেন। এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যও রমাপ্রসাদ যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিলেন।



শ্যামাচরণ সরকার

বেথুন স্মৃতিসভা। শিক্ষা পরিষদের সভাপতি চিরস্মরণীয় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের সহিত রমাপ্রসাদের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য ছিল। বেথুনের মৃত্যুর পর বঙ্গবাসী তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ২২শে অগষ্ট দিবসে মেডিক্যাল কলেজের হলে একটি বৃহৎ সভা আহূত করেন। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি এই সভায় নিম্নোদ্ধৃত প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং বেথুনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে পঞ্চাশ টাকা দান করেন :—

That this meeting desires to record its deep sense of the loss which the cause of education and the general advancement of the people of this country have sustained

by the lamented death of the Hon'ble J. E. D. Bethune. From the day he landed in India to his last hour, his unceasing endeavours and best energies were devoted to the improvement of the Native mind and the elevation of the Native character. For the attainment of these noble ends, he made himself accessible to the humblest individual sacrificing his time, health and money



আবদুল লতিফ খাঁ।

with rare disinterestedness. Not satisfied with his exertions to advance the best interests of man in British India, he made it the project of his hourly thoughts and darling hopes to elevate woman in the social scale by that which only can be effectual to that end, education with an earnestness, a self-devotion and a munificence which will ever live in the recollection of a grateful people.

বেথুন সভা। সম্পাদক ডাক্তার এফ্ জে মোয়েট ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা পরিষদের ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের কতিপয় য়ুরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগিতায় ভারতবর্ষের ব্যবস্থাসচিব ও শিক্ষা পরিষদের সভাপতি পরলোকগত ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মরণার্থে 'বেথুন সোসাইটী' নামক একটি সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অনুরাগ জন্মাইবার এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয়-দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বিষয়ক সংযোগস্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী ও উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন। এই সভা এক্ষণে জীবিত নাই, কিন্তু এককালে ইহার অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল এবং এদেশের অনেক কল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। ডাক্তার ডফ্, ডাক্তার রোয়ার, ডাক্তার চিভার্স, কর্ণেল গুডউইন্, কর্ণেল ম্যালিসন, রেভারেণ্ড ডল, রেভারেণ্ড স্মিথ, হেনরী উড্রো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয়গণ এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র বসু, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সূর্য্যকুমার গুডিব্ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্রলাল সরকার, নবীনকৃষ্ণ বসু, কালীকুমার দাস প্রভৃতি বাঙ্গালী মনীষিগণের বাগ্মিতায় যখন সভাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত তখন উহার কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! গবর্ণর জেনারেল, লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এই সকল পণ্ডিতগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য সভাগৃহে আগমন করিতেন। মধ্যে এই সভা একবার অতি হীনাবস্থায় পতিত হয়। এমন কি, উহা বিলুপ্ত হইবারও সম্ভাবনা হয়। এই সময়ে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে) সভার কয়েকজন হিতৈষী পুরাতন সভ্য সভাকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্‌কে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মত করেন।

ডাক্তার ডফ্ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহের সহিত এই সভার সভাপতিত্ব স্বীকার করেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই উহাকে নূতন জীবনে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কার্য্যের সুবিধার জন্য তিনি এই সভাকে ছয়টী শাখায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক শাখার কার্য্য সুসম্পাদিত করিবার মানসে উপযুক্ত ও বিচক্ষণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। এই শাখাগুলি ও তাহার সভাপতিও সম্পাদকদিগের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য :—

শিক্ষা	সভাপতি—মিষ্টার হেনরী উড্রো সম্পাদক—বাবু রাজেন্দ্র নাথ মিত্র
সাহিত্য ও দর্শন	সভাপতি—মিষ্টার ই, বি, কাউয়েল সম্পাদক—বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ
বিজ্ঞান ও শিল্প	সভাপতি—মিষ্টার এইচ, এস, স্মিথ সম্পাদক—মিষ্টার জে, রীজ্
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতি	সভাপতি—ডাক্তার নরম্যান চিভার্স পরে ডাক্তার ক্রগ্যাম সম্পাদক—বাবু নবীনকৃষ্ণ বসু
সমাজ-বিজ্ঞান	সভাপতি—মিষ্টার জেম্স্ লঙ্ সম্পাদক—বাবু কালীকুমার দাস
এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি	সভাপতি—বাবু রমাপ্রসাদ রায় সম্পাদক—বাবু হরচন্দ্র দত্ত

শেষোক্ত শাখায় এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতি বিষয়ক প্রশ্নাদির আলোচনা হইত। এই আলোচনায় এতদ্দেশীয় সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির প্রয়োজন বলিয়া, (ডাক্তার ডফের কথায়) "a native gentleman of the highest qualification"—রমাপ্রসাদ রায়কে উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ্চ দিবসে বেথুন সভায় মিষ্টার ওয়াইলি নামক একজন য়ুরোপীয় "হ্যানা মুর ও স্ত্রীশিক্ষা" শীর্ষক একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। প্রবন্ধপাঠের পর সভাপতি ডাক্তার ডফ্, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, রেভারেণ্ড মিষ্টার সি, এইচ, এ, ডল্, রমাপ্রসাদ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কালীকুমার দাস, সার বার্ট্ল্ ফ্রেয়ার (পরে বোম্বাইয়ের গবর্ণর) প্রভৃতি এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। রেভারেণ্ড ডল্ এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যে, ধনী ও ক্ষমতাশালী হিন্দুগণ তাঁহাদের গৃহে খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে আপত্তি করিয়া থাকেন শুনা যায়, সেই কথা সত্য কি না। রমাপ্রসাদ ইহার উত্তরে বলেন যে আজিকালি সচরাচর কেহ সেরূপ আপত্তি করেন না। ত্রিশ বৎসর, এমন কি দশবৎসর পূর্ব্বেও এবিষয়ে আমাদের যে সংস্কার ছিল এক্ষণে তাহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে গবর্ণমেণ্ট যথোচিত সাহায্য করিতেছেন না বলিয়াই স্ত্রীশিক্ষা এদেশে তাদৃশ বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিতেছে না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৮ই নভেম্বর দিবসে বেথুন সভায় ডাক্তার ডফ্ ঘোষণা করেন যে পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে রমাপ্রসাদ রায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক শাখার কার্য্য বিবরণী পাঠ করিবেন। কিন্তু কোনও কারণবশতঃ উহা ঐ বৎসর পঠিত হয় নাই। বেথুন সভায় কার্য্যবিবরণী নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় এক্ষণে জানিতে পারা যায় না যে পরে রমাপ্রসাদ কোনও অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন কি না।

কল্‌ভিন স্মৃতিসভা। সদর আদালতের অন্যতম বিচারপতি মিষ্টার জন রাসেল কল্‌ভিন্ রমাপ্রসাদকে খুব স্নেহ করিতেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর হন। সিপাহীযুদ্ধের সময় তিনি যথেষ্ট কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম ও উদ্বেগে জরাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন এবং আগ্রা দুর্গে সমাহিত হন। রমাপ্রসাদ তাঁহার এই পরম উপকারকের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রদর্শনার্থে মেটকাফ হলে একটি সভা আহূত করেন এবং একটি মনোরম বক্তৃতা করেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর জেমস্ কলভিন্, এডভোকেট জেনারেল মিষ্টার উইলিয়ম রিচি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণও এই সভায় বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় দুর্ভিক্ষ। রমাপ্রসাদ নীরবকর্ম্মী ছিলেন, হুজুগ-প্রিয় ছিলেন না। দেশহিতকর সভাসমিতির কার্য্যে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল কিন্তু তিনি নিস্ফল রাষ্ট্রীয় আন্দোলনাদিতে যোগদান করিতে ভালবাসিতেন না বা বক্তারূপে প্রসিদ্ধিলাভের প্রয়াস পাইতেন না। প্রকাশ্য সভাসমিতিতে তিনি যে দুই একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার গভীর চিন্তাশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবের উচ্ছ্বাসে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়কে অভিভূত না করিয়া তিনি সুচিন্তিত মন্তব্যের দ্বারা তাহাদিগের মনকে মুগ্ধ করিতেন এবং তাঁহাদিগকে কর্ম্মে উত্তেজিত করিতেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত নরনারীদিগের সাহায্য কল্পে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২১ শে জানুয়ারী দিবসে চেম্বার অব্ কমার্স সভার গৃহে কলিকাতাবাসী একটি সাধারণ সভা আহূত করেন। এই সভায় রমাপ্রসাদই সর্ব্বপ্রথমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ ও তন্নিবারণের প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

“আমি স্বয়ং অনুধাবন করিয়া যাহা দেখিয়াছি এবং অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে যে সম্বাদ পাইয়াছি তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র প্রাচুর্য্য, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সর্ব্বত্র দারিদ্র্য ও অভাব পরিলক্ষিত হয়। সত্য বটে, স্থানে স্থানে প্রভুত ঐশ্বর্য্যশালী ভূম্যধিকারী পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া পঞ্চাশ বা একশত মাইল দূরে ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল মাত্র অভাব ও দারিদ্র্যে প্লাবিত। এই সভায় একজন একটি কাল্পনিক বিপদের বিষয়ের-- বাঙ্গালার কাল্পনিক দুর্ভিক্ষে কি হইতে পারে সেই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে সেরূপ ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারীদিগের সাহায্যে কোন ফলই ফলিবে না। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি এইরূপ বিপদ আসে তাহা হইলে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বর্ত্তমান সময়ের বা ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ন্যায় উহা তত ভীষণ আকার ধারণ করিবে না। উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় ভূমিকর সংক্রান্ত ব্যবস্থার ফলে সেখানে জমীদারশ্রেণী বিলুপ্ত হইয়াছে -- জমীদারগণ কেবল মাত্র পত্তনীদারে পরিণত হইয়াছেন, এবং যদিও আমি বলিতেছি না যে প্রধানতঃ সেই দেশের ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার দোষেই এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে,তথাপি আমার স্থির বিশ্বাস যে তত্রত্য অধিবাসিগণের সুখ দুঃখের সহিত এই রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থা অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত আছে এবং গবর্ণমেণ্টের এই সকল ব্যবস্থায় সংস্কারসাধন করা অবশ্যকর্ত্তব্য।”

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) *

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

* এই প্রবন্ধ সহ প্রকাশিত জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের চিত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত ব্লক হইতে মুদ্রিত।

একজন বাঙ্গালী সৈনিক

বাঙ্গালী পল্টনের দ্বিতীয় ব্যাচের সহিত ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯১৬ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ কুণ্ডু কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। ইতিপূর্ব্বে ব্রাইটনে লর্ড কিচেনারের ভারতীয় হাঁসপাতালে ষ্টোর-কীপাররূপে কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু এম-এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রথম পুত্র ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম-এর ভ্রাতুষ্পুত্র।



শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ কুণ্ডু



প্রসন্নকুমার ঠাকুর

স্পর্শমণি

(উপন্যাস)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কল্যাণী ও সতীনাথ এ ভালবাসার রূপ অনুভব করিতে না পারিলেও তারাসুন্দরীর কাছে তাহা অজ্ঞাত রহিল না। তিনি চিন্তিত হইলেন। সতীনাথের মুখের উপর বলিতে পারেন না যে তুমি আর আসিও না। এ ছেলেখেলার ফল যে শুভ হইবে না তাহা তিনি বুঝিতেছিলেন। এ ভাবের প্রশ্রয় দিলে কল্যাণীর ভবিষ্যৎ হয়ত নৈরাশ্যের অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া যাইবে। তাই দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন—করা যায় কি? বড়-মানুষের ছেলে, স্বাস্থ্যসুন্দর দেহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী যাহার কণ্ঠে নিজের হাতে বিজয়মাল্য দুলাইয়া দিয়াছেন—তেমন পাত্র কি সহজলভ্য? সে প্রলোভন বড় অধিক, তথাপি তারাসুন্দরীর মত নারীর পক্ষে তাহা জয় করাও কিছু কঠিন নয়। ছেলেটি মা বলিয়া ডাকে, একটু স্নেহ মমতা চায়,জোর করিয়া আপন হইতে চেষ্টা করে—কেনই বা তাহাকে এটুকু না দিবেন? আহা উহার যতই থাক, প্রধান জিনিষ, বাপ মার স্নেহ, তাই যে নাই। মাতৃহারা ছেলেটি যখন মা বলিয়া ডাকিয়া স্বেচ্ছায় ধরা দিতে চাহিল, তিনিও অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাকে কাছে টানিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ভগবানের এই ক্ষণিক দান-টুকু জীবনব্যাপী দুঃখের প্রতিষেধকের কণিকারূপে গ্রহণ করিতে ক্ষতি কি? কঠোর জীবনপথে একটি ছোট ফুল বা মুকুল, এতটুকু স্নেহের নিদর্শন—যাহা আপনা হইতে নিকটে আসে তাহা কি উপেক্ষার জিনিষ? মানুষ সারা জীবনে কতটুকু কিই বা পায় যে ভগবানের এমন অমূল্য দান,-ভক্তি,স্নেহের অর্ঘ্য অহঙ্কারে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে? তারাসুন্দরীর ব্যর্থ অভিশপ্ত জীবনের দ্বারে যে স্নেহ-লোলুপ ভিখারীটি ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার ভিক্ষার যোগ্যতার সম্বন্ধে তাই তাঁহার স্নেহ-পূর্ণ মাতৃহৃদয়ে সন্দেহের কোন প্রশ্নটি পর্য্যন্ত উঠিতে পায় নাই। কিন্তু আগুন লইয়া খেলা যে সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে,মাস কতকের মধ্যেই তিনি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়া নিজের অল্প বুদ্ধিকে মনে মনে ধিক্কার দিলেন।

অনাহূত অযাচিত মেঘে যেদিন ধরণীর মরুবক্ষে বর্ষার প্রথম ধারাপাতের মত সতীনাথ তারাসুন্দরীর কাছে অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব করিয়া বসিল—সেদিন প্রলুব্ধ চিত্তকে অগ্রসর হইতে না দিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের বাধা বিপত্তি স্মরণ রাখিয়া সতীনাথকে তিনি বিবাহের অযৌক্তিকতা বুঝাইয়া সংকল্প হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। বন্যলতা উদ্যান-তরুকে অবলম্বন করিলে তাহা যে প্রীতিকর হয় না, তাঁহার এ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে। সতীনাথ অত কথা বুঝিতে চাহিল না। তাহার তরুণ জীবন, নূতন আশার মাদকতা, জগতে তাহার কাছে তখন ব্যর্থতার লেশমাত্র ছিল না। বাধা বিঘ্ন নিরাশার বোধ জন্মায় নাই। প্রেমের অঞ্জন চোখে দিয়া সে তখন ধরণীর বর্ণে গোলাপের আভা, সূর্য্যালোকে জ্যোৎস্নাকিরণ দেখিতেছিল। পার্থিব লাভ ক্ষতির হিসাব লইবার অবকাশ কোথায়? জেঠা মহাশয়ের তরফ হইতে যে বাধা বিপত্তি আসিতে পারে এ সম্ভাবনাও সে স্বীকার করিল না। হইলই বা কুলীন—জেঠামহাশয় কৌলীন্যপ্রথার বিদ্বেষী, সেও নিজেকে কৌলীন্যের সম্মান দিতে অনিচ্ছুক। ধনী দরিদ্রের পার্থক্য—ও কোন কাজের কথাই নয়। মৃত্তিকাগর্ভেই হীরা মণি গোপন থাকে, সেজন্য তাহা-দের মূল্য কমে না। সতীনাথ যদি জেঠা মহাশয়কে বলে সে কল্যাণী ছাড়া অপর কাহাকেও বিবাহ করিবে না—করিতে পারিবে না—নিশ্চয়ই তিনি বাধা দিবেন না। তিনি যে পুত্রের সুখই খুঁজিয়া থাকেন,বাধা দিবেন কেন?—তাঁহার স্নেহে সে এতটুকুও সন্দিহান নয়।—সতীনাথের মুখে এই সকল যুক্তি শ্রবণ

করিয়া বুদ্ধিমতী তারাসুন্দরীও ভুলিলেন—স্নেহের জয় বুঝি সর্ব্বত্র!

স্নেহের কাছে তাঁহার পরাভব ঘটিল। কহিলেন, যদি রুদ্রকান্ত সম্মত হয়েন—তাঁহার কোন আপত্তিই নাই।

দ্বিধা কিন্তু ঘোচে না—মন মাঝে মাঝে শঙ্কাকুল হইয়া উঠে। জন্মান্তরীন্ কর্ম্মসূত্রে যে অভাগী তাঁহার উদরে স্থান গ্রহণ করিয়াছে,তাহার কপালে এমন স্বপ্নকথা কি কখনও সত্য হওয়া সম্ভব! একদিন সতীনাথকে মনের কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন। কুণ্ঠিত সতীনাথ আরক্ত মুখ নত করিয়াই কহিল, সে ভার তাহার, তাঁহার আদেশ পাইলেই সে কৃতার্থ; যত বড় ঝড় ঝঞ্ঝা, যে কোন প্রবল বাধাই আসুক, কল্যাণীর জন্য সে মাথা পাতিয়া সবই সহিতে প্রস্তুত।

তারাসুন্দরী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। সে মুখে বিশ্বাস ও প্রেমের যে জলন্ত ছবি ফুটিয়াছিল, তারাসুন্দরী তাহাতেই স্থির নিশ্চিত হইলেন। এমন পাত্রে এত সহজে কন্যাদান—এ যে অভাবনীয় সুযোগ! আশা কহিল—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ এমনি অভাবনীয় ভাবেই ঘটিয়া থাকে। নির্জ্জনে আনন্দের অশ্রুজলে মাটি ভিজাইয়া মনে মনে বলিলেন, "তুমিই জান ঠাকুর! কত দুঃখের সান্ত্বনা আমি তোমার কাছে পেয়েচি, তুমি আমায় যা দেবে তাই আমি যেন খুসী হয়ে নিতে পারি। অতিসুখে ধৈর্য্যহারা হয়ে যেন তোমার দান চিনতে ভুলে না যাই।"

নিজের মুখে বিবাহের পাকা কথা কহিবার পর সতীনাথ আর তেমন অসঙ্কোচে তাঁহাদের বাড়ী যাতায়াত রাখিতে পারিল না। সলজ্জ কুণ্ঠায় পা যেন জড়াইয়া ধরে, অগ্রসর হইতে পারে না। এক পা অগ্রসর হইতে গিয়া পাঁচ পা পিছাইয়া আসে। পড়াশুনা কাজকর্ম্ম বিশ্রাম নিদ্রার মধ্যেও সেই মুখখানি জাগিয়া থাকে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে কাছছাড়া করা যায় না। কতদিন মনে হয়, কল্যাণী হয়ত এখন তাহার নিজের ঘরে বই কোলে করিয়া বসিয়া আছে, বইএর পাতা খোলা কিন্তু মন তাহার কোন স্বপ্নরাজ্যে উধাও হইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। সেও কি তাহার কথা ভাবে? এমনি করিয়া তাহার মনও কি দর্শনের লালসায় কাঁদিতে থাকে? সামাজিক বাধা বিয়ের গোল মিটাইয়া কবে সে সম্পূর্ণরূপে নিজের বলিয়া তাহাকে দাবী করিতে পারিবে, কবে তাহার নিরানন্দ গৃহে আনন্দ-প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়া, মরুভূমিতে ফুল ফুটাইয়া নন্দনকাননে পরিণত করিতে পারিবে! কতবার মনে করে, কল্যাণীর পাঠের ক্ষতি হইবার দোহাই দিয়া আবার তাহাদের বাড়ী যাইবে, তেমনি সঙ্কোচহীন আত্মীয়তার অতীত দিনগুলাকে জাগাইয়া তুলিবে। যায়ও তাই, কিন্তু বাড়ীর দরজার কাছে গিয়া আর যেন অগ্রসর হইতে পারে না। কোনদিন সাহস করিয়া নিজে অথবা ভজহরির অনুরোধে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াও পড়ে। তারাসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎও হয়, তিনি বসিতে বলেন, স্বহস্তে তাহার পছন্দমত খাবার তৈয়ারী করিয়া খাওয়ান। কত প্রসঙ্গের অবতারণা করেন; সতীনাথ মুখে তাঁহার কথার উত্তর দেয়, কাণ তাহার সজাগ হইয়া থাকে,চোখ সঙ্কোচে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে সাহস পায় না—এখনি তারাসুন্দরী তাহার চুরী করিয়া চাওয়া দেখিয়া ফেলিবেন! কল্যাণী যেন দেওয়ালের অন্তরালে নিজেকে সাবধানে লুকাইয়া ফেলিয়াছে। যদি দৈবাৎ বহুসতর্ক সাবধানতা স্বত্বেও কোনদিন সতীনাথের চোখে পড়িয়া যায়, সলজ্জ মৃদু হাসিটুকু অধরপ্রান্তে ফুটাইয়া তাড়াতাড়ি সে পলায়ন করে—যেন কতই কার্য্যে ব্যস্ত! বাজনায় সুর ঠিক হইতেছে কি না পরীক্ষা করিতে বলে না, বাগানের কোন্ গাছে কুঁড়ি ধরিল, কোন্‌টিতে ফুল ফুটিল—কিছুই খবর দেয় না। তারাসুন্দরীও অনূঢ়াকন্যার স্বাধীনতার মাত্রা সংযত করিতে রাখিতেন—"একি সাহেব বিবির ঘর যে বিয়ের আগেই সর্ব্বদা একত্র থাকিতে হইবে? ছিঃ!"—তা, কল্যাণীর সেজন্য খুব বেশী ক্ষতি হয় নাই। কারণ সতীনাথ তাহাকে দেখিতে না পাইলেও, তাহার ত সে সুযোগের অভাব ঘটিত না। সে গোপনে লুকাইয়া দেখিয়া লইত। ভাবিত—সে যখন স্বয়ম্বরা হইয়া

মনে মনে তাঁহাকেই বরমাল্য দিয়াছে তখন চোখের দেখায় আর দোষ কি? সতীনাথ যেদিন বিবাহের কথা পাড়িয়া তাহাকে লজ্জায় ফেলিয়া তাহাদের অবাধ শান্তিতে আঘাত তুলিয়াছিল, সেদিন সুখের কি দুঃখের কি একটা অজ্ঞাত ব্যথায় তাহার চোখের জল যেন অসম্বরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন আর সে চিন্তা তাহার মনে ক্ষোভ জাগায় না। এই কয়দিনের ভিতর কেমন করিয়া যে ঐ একটা যাদুমন্ত্র এত বড় বিপ্লব ঘটাইয়া দিল তাহা সে বুঝিতেও পারে না। তবু অন্তঃসলিলা নদীটির মত একটা অননুভূত পুলকানন্দ যেন তাহার দেহ মনে প্রতিনিয়ত ক্ষরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। চোখে মুখে হাসিতে চাহনিতে সেই আনন্দেরই খানিকটা রঙ্গীন আলো ইন্দ্রধনুর মত বিচিত্র বর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। অন্তরে আনন্দের মৃদু শিহরণ নীরবে বহিয়া যাইত—তিনি এইবার তাহাদের আপনার লোক হইবেন। তাঁহার সঙ্গ স্নেহ ভালবাসায় আর কেহ বাধা জন্মাইতে আসিবে না,—সে তাহার কুমারীহৃদয়ের গোপন-লোকবাসী তরুণ দেবতার পদে হৃদয়ের ভক্তি প্রেম প্রীতির নৈবেদ্য সাজাইয়া নীরবে নিবেদন করিয়া দিল। সে গোপন পূজার সাক্ষী রহিল তাহার মন আর অন্তঃরীক্ষে অন্তর্যামী। এখন সে প্রত্যক্ষ রূপে অনুভব করে, রাজকন্যা সাবিত্রীর পক্ষে অল্পায়ু বনবাসীকে পতিত্বে বরণ করা কিছুই আশ্চর্য্য হয় নাই। প্রয়োজন হইলে যমের সহিতও বুঝি যাওয়া যায়।

তারাসুন্দরী কল্যাণীকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ঘরের পাশেই বরের বাড়ী। রুদ্রকান্তের মন ত জানা নাই, বিদ্যার পরীক্ষা দিতে গিয়া কি জানি এই অপরাধে যদি জীবনের পরীক্ষায় সে ফেল্ করিয়া বসে! কল্যাণী দুঃখিত হইল, বলিতে লাগিল—"পরীক্ষাটা হয়ে যাক্ না মা?" সতীনাথও কহিল—"এই কটা মাস বৈত নয়, ওর জন্যে পরীক্ষাটা হবে না?" তারাসুন্দরী সংক্ষেপে কহিলেন—"কাজ নেই।"—ভজহরির মুখে কর্ত্তার প্রকৃতির যতটুকু সংবাদ তাঁহার কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহাতে এসকল বিষয়ে সাবধানতা লওয়াই যে তাঁহার প্রয়োজন। তিনি যে মেয়ের মা, ভাবী বৈবাহিকের মন না বুঝিয়া কেমন করিয়া আর এত খানি স্বাধীনতা গ্রহণ করেন!

এইরূপে কিছুদিন কাটিল। তারাসুন্দরী একদিন সন্তর্পণে সতীনাথকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে এই আষাঢ় শ্রাবণ দুইটা মাস কাটিয়া গেলে, ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক শুভকর্ম্মে পরিত্যাজ্য, মাসত্রয়ান্তে মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণে, জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীনাথের বিবাহের প্রতিবন্ধকতা থাকিতে পারে; তাহা হইলে পৌষের পর সেই মাঘ মাস ভিন্ন আর দিন নাই। মেয়ে রোগা তাই এতদিন রাখা গিয়াছিল, আর কি যায়, এতেই লোকে কত নিন্দাই না করিবে?—কল্যাণীর কৌমারত্ব ঘুচাইবার জন্য যত না, হউক রুদ্রকান্তের কথা ভাবিয়া ভিতরে ভিতরে তারাসুন্দরীর মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল। শুভকর্ম্ম চুকিয়া যতক্ষণে দুহাত এক না হয় ততক্ষণ ভরসা কিসের? ছান্‌লাতলা হইতে বর উঠিয়া যায়—এ ত এখনও প্রধান ব্যাপারই বাকী! সতীনাথ যতই সহজ মনে করুক, তাঁহার যে ভরসা পাইতেও ভরসা করে না। বড় লোকের মতির স্থিরতা সম্বন্ধে তিনি যে যথেষ্টই সন্দিহান। কল্যাণীর মুখের পানে চাহিয়া সে উৎকণ্ঠা হাজার গুণে বাড়িয়া যায়। সে চঞ্চলা বনহরিণী যে ব্যাধের বংশীধ্বনিতে বিদ্ধ হইয়া গতি হারাইয়াছে, মায়ের চোখে তাহা কি আর গোপন থাকে? তাহার অনাবিল উচ্চহাস্য এখন আর অধর প্রান্ত ছাড়াইয়া বাহির হয় না। নয়নেও লজ্জা সঙ্কোচের জড়তা নামিয়াছে। শুভ্রগণ্ডে বসন্তের গোলাপের আভা ফুটিয়া থাকে। ভুলিয়াও সে আর সতীনাথের নাম করে না, অথচ চক্ষু কর্ণ সজাগ হইয়া সেই প্রার্থিত জনেরই আগমন আশায় উৎকণ্ঠিত। পদে পদে কাজের ভুলে তাহার প্রমাণ করিয়া দেয়। তারাসুন্দরী ব্যস্ত হইলেন, ভীতও হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এখন শেষ রক্ষা হইলেই বাঁচা যায়।

বাহিরে ঘন মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া যে প্রলয়ের ঝড় তুলিতে চাহিতেছিল, রুদ্ধদ্বার কক্ষের বিশ্বস্ত অধিবাসীর কর্ণে তাহার কোন সংবাদ পৌঁছে নাই। মুরারির উপর সতীনাথের বড় বেশী শ্রদ্ধা না থাক্ কখনও কোন বিদ্বেষভাবও ছিল না। রুদ্রকান্তের অত্যধিক পক্ষপাতিত্বে তাহাকে সে নিজের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে আনিবার কারণ পর্য্যন্ত অনুভব করে নাই। সতীনাথ ও মুরারির প্রকৃতিগত পার্থক্য তাহাদের দীর্ঘকাল একত্র বাসেও বন্ধুত্ব জন্মাইতে পারে নাই। সতীনাথ যখন বিদ্যামন্দিরের এক একটা সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশোদ্যত, মুরারি যখন ঈর্ষাপূর্ণ কটাক্ষে নিম্নভূমিতে দাঁড়াইয়া তাহার গতি নিরীক্ষণ করিলেও, প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করা ত দূরের কথা, নিকটবর্ত্তী হইতেও চেষ্টা করে নাই। এই অসমকক্ষতাই রুদ্রকান্তের মন হইতে তাহাকে দূরে সরাইয়া ফেলিতেছে এ চিন্তা হইতেও নিতান্ত নির্লিপ্তের মত নিজেকে সে সরাইয়া রাখিল।—"খাও দাও আমোদ কর মনের সুখে, কোন্ দিন যেতে হবে শিঙ্গে ফুঁকে" —এই নীতিই তাহার জীবনের আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাই অধ্যয়নের কঠোরতায় দেহ মন পিষ্ট করিতে সে সম্মত হইল না। পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হইলেই, হয় তাহার কোন কঠিন পীড়ার সূত্রপাত হয়, নয় বাড়ীতে মা বা ভায়েদের তেমনি কোন প্রয়োজন পড়ে—পরীক্ষা দিবার সুযোগই পাওয়া যায় না। হাল ছাড়িয়া দিয়া রুদ্রকান্ত কহিলেন, "আর বিদ্যা শেখার দরকার নাই, জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখ।" মুরারিও নিঃশ্বাস ফেলিয়া অব্যাহতি লাভ করিল। ডাক্তারী পরীক্ষান্তে গৃহে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য পণ্ডিত রাখিয়া সতীনাথ যখন সাহিত্য-উদ্যানের শ্রেষ্ঠ কুসুমগুলির সুরভি গ্রহণে ব্যগ্র, মুরারি তখন সঙ্গীতবাদ্য শিক্ষায় মনোযোগ দিল। রুদ্রকান্ত নিজে সঙ্গীতজ্ঞ, ইহাতে তাঁহার আপত্তি ছিল না; মনে করিলেন, কিছু না-করার চেয়ে তবু কিছু ত করুক।

দুর্ব্বলের পক্ষে প্রবলের এবং আশ্রিতের পক্ষে আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধাচরণ করা যখন সম্ভব নয়, তখন মনে যাই থাক্, মুরারি বাহিরে রুদ্রকান্ত ও সতীনাথকে যথোপযুক্ত স্নেহ সম্মান দেখাইয়া চলিত। রুদ্রকান্তের চোখে কিছুই প্রায় ছাপা থাকিত না—তবু তিনিও স্বীকার করিতেন যে তাহার মনের অন্ত পাইলেন না।

রুদ্রকান্তের বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী উত্তরাধিকারীত্ব সম্বন্ধে মুরারির কোন আশা না থাকিলেও, রুদ্রকান্তের যে তাহাকে প্রয়োজন ছিল, এটুকু সে ভালই বুঝিত। থিয়েটার দেখা, গান বাজনা শোনা, তাস পাসা দাবা খেলা, আবার জমিদারীর গোলোযোগ মিটাইবার জন্য মফস্বলে যাইতে হইলে মুরারিকেই তাঁহার আগে খোঁজ পড়িত। সে ইহাতে খুসী না হইয়া অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত। তবু নিরুপায় ক্রোধের বিষাক্ত জ্বালা অন্তর মধ্যেই নিরুদ্ধ রাখিয়া কর্ত্তার মন যোগাইবার নূতন নূতন মন্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত, কারণ সে আশ্রিত, আশ্রয়দাতাকে খুসী রাখিতে না পারিলে চলিবে কেন? এক এক সময় তাহার মনে হইত, বড় মানুষের মোসাহেবী ছাড়িয়া দিয়া তাহার নিজের মৃৎকুটীরে ফিরিয়া যায়। কিন্তু তাহতেই বা, ফল কি? সেখানকার অন্ন, সেও যে ইঁহারই অবহেলিত দান। তা ছাড়া অভ্যাস বাধা দিতে থাকে। বিলাসিতার বিষ একবার যাহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে সহজে, সে বিষের ক্রিয়া সে আর রোধ করিতে পারে না। এই বিদ্যুতালোক-দীপ্ত সুরম্য হর্ম্মের শত স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করিয়া নন্দীপুরের জঙ্গলাবাসে চির-দারিদ্র্যের মধ্যে নির্ব্বাসন দণ্ড—সে দৃশ্য মুরারি আর কল্পনাতেও আনিতে ইচ্ছা করে না। তাই সে ভুলিয়া থাকিবার জন্য কলিকাতার নানাবিধ অসার আমোদের স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াছিল। রুদ্রকান্ত খবর জানিয়া দুই একবার সতর্কতার ইঙ্গিতও করিয়াছিলেন, মুরারি সে কথা কাণে তুলে নাই।

সতীনাথের মনের নিভৃত নিকুঞ্জে ফাল্গুনের বাতাস যে অত্যন্ত প্রবল ভাবেই বহিতে সুরু করিয়াছে তাহার

সংবাদ সর্ব্বাগ্রে মুরারির কাছেই প্রকাশ পাইল। মলয়ানিলের উৎপত্তি স্থানটুকুর আবিষ্কারেও তাহার কালবিলম্ব ঘটিল না। ঘটনাটিকে সে যে কি ভাবে গ্রহণ করিবে প্রথমে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এ যেন ভগবানের সুযোগ প্রদান। রুদ্রকান্তের অদম্য ক্রোধ ও জেদ্ সে ভালই জানে। সতীনাথের ব্রাহ্মকন্যা বিবাহ নিশ্চয়ই তাঁহার অভিপ্রেত ও অনুমোদিত হইবে না। অথচ সতীনাথ যেরূপ মজিয়াছে, সেও কিছু সহজে কল্যাণীর আশা ছাড়িবে না। এই উপলক্ষে রুদ্রকান্ত ও সতীনাথে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। জেদ বজায় রাখিবার জন্য সতীনাথকে ত্যাগ করাও তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। এমন ঘটনার দৃষ্টান্ত মুরারি দেখিয়াছে। পিতা পুত্রে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়—এ ত পালিত পুত্র! তারপর, কে জানে কি! ভবিষ্যতের দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, তারপর বাধা বিঘ্নহীন আলোকোজ্জ্বল সফলতার কাম্যভূমি। ভবিষ্যৎ যাহাই বলুক, বর্ত্তমানকে অবাধে চলিয়া যাইতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। বুদ্ধিমান মুরারি এ সুযোগ মূর্খের মত ত্যাগ করিবে না। বিষয়টি সালঙ্কারে রুদ্রকান্তের কাণে তুলিয়া কেমন করিয়া সতীনাথের উপর তাঁহার মন চটাইয়া দিবে, এইটুকুই তাহার প্রধান চিন্তা হইয়া পড়িয়াছিল। গরীবের মেয়ে, বড় মেয়ে। তা ছাড়া, সে স্বেচ্ছাচারিণী মাতার কন্যা। স্বামীর ঘর যে করিল না,তাহার কন্যা নিশ্চয়ই স্বামীর মতাবলম্বিনী হইয়া বাধ্য বিনীত হইবে না। মাতা যে স্বধর্ম্মত্যাগিনী নহেন এ পরিচয়টুকুও গোপন রাখা প্রয়োজন। আরও কি কি অলঙ্কার যোগ করিতে পারা যায় তাহাই এখন মুরারির মনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগ্যদেবী যখন যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহার সুবিধার জন্য কোথা দিয়া কি যে অঘটন সংঘটন করিয়া বসেন ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহার ফল দেখিয়া নিজেই অবাক হইয়া যায়।

সতীনাথ যখন নিরুপায়ে মুরারিকেই অবলম্বন করিতে চাহিল তখন এঘটনাটিও তাহার নিজের কাযের অনুকূল বলিয়া মনে হইল। সতী যদি নিজেই কথা তুলিত তবে হয়ত বিপ্লবের পর আবার সন্ধি হইবারও পথ থাকিত—এখন সে আশঙ্কাও বড় রহিল না। মুরারি মনে মনে হাসিল,—বেশ লোকেরই সে সাহায্য চাহিয়াছে।

তারাসুন্দরীর মানসিক উৎকণ্ঠার আভাস পাইয়া সতীনাথের মনে হইল আর বিলম্ব করা চলে না, এইবার জ্যেঠামহাশয়ের কাছে অনুমতি প্রার্থনা প্রয়োজন। প্রয়োজন বলিল, জানাইতেই হইবে,—কিন্তু লজ্জা বলিল, কেমন করিয়া তা হয়? যে বিষয়টা সব চেয়ে সহজ মনে হইয়াছিল, কার্য্যকালে দেখা গেল সেইটাই সব চেয়ে কঠিন। নিতান্ত নির্লজ্জের মত নিজের বিবাহের ঘটকালী নিজে করিবে কি করিয়া? অনেক ভাবিয়া শেষে মুরারির আশ্রয় লওয়াই তাহার সঙ্গত মনে হইল।

মুরারি শুনিয়া অজ্ঞতার ভানে প্রথমটা বিস্ময় এবং শেষে আনন্দ প্রকাশ করিল; কহিল—"সত্যি? আঃ বাঁচলুম! তোমার রকম সকম দেখে ভয় লেগে গেছল; মনে কল্লুম আইবুড়ই বুঝি থেকে গেলে।"

সতীনাথ হাসিয়া কহিল, "এতটা ভয়ের কারণ? আইবুড় না থাকি, খুব বুড়ও যে হইনি তা জোর করেই বল্‌তে পারি। নিজের পথ পরিষ্কার হচ্ছিল না তাই বল?"

মুরারি নিঃশ্বাস ফেলিয়া অভিনয়ের সুর করিয়া কহিল, "ঐ যা বল্লে দাদা! বড় থাকৃতে ত ছোটর হবার কোন আশাই নেই! সেই ভয়েই মরে ছিলুম।"

সতীনাথ উচ্চহাস্যে কহিল, "ঠাট্টা নয় মুরারি, হয়ত তোমার জীবনেও এমন দিন কখনও আস্‌বে, যখন একটি নোলকপরা কচিমুখই"—

মুরারি বাধা দিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "রামঃ! সে

আর এ জন্মে নয়। সাধ করে শিকল পরব,—কেন ? কি দুঃখে ? সেই নোলকপরা মুখের হুকুমে উঠতে হবে,বসতে হবে,সে পাঠশালে বান্দা পড়্‌বে না তা হলপ্ করে বলে দিচ্ছি।"

সতীনাথ তাহার গর্ব্বিত মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি করুণার হাসি হাসিল—ভায়া যদি একবার সেই হুকুম পালনের সুখ বুঝিত, তবে আর স্বাধীনতার বড়াই করিতে চাহিত না! প্রকাশ্যে কিছুই বলিল না।

সতীনাথকে যে কোন ছুতায় আক্রমণ করিতে পারিলেই এখন মুরারি তৃপ্ত হয়। সে তাহাকে সমবয়স্ক মনে করে না, মূর্খ বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করে, মুরারির এমনই বিশ্বাস। তাই আজিকার আনন্দেও সে তাহাকে একটুখানি বেদনা দিবার ইচ্ছায় সকাল বেলার সংবাদ-পত্রে পঠিত সিভিলিয়ানী পরীক্ষোত্তীর্ণ যে ছাত্রদের নাম দেখিয়াছিল, তাহারই মধ্যে যে নামটা স্মরণ হইল সেই নামটা উপলক্ষ করিয়া মুখখানা যথাসাধ্য গম্ভীর করিয়া কহিল, "তা জ্যাঠামশায়কে বলব'খন, সে জন্যে আট্‌কাবে না। বলি, উদিকের মতটত আছে ত?"

তাহাকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষে চাহিতে দেখিয়া সতীনাথ একটুখানি হাসিল। কহিল, "তার জন্যে ভাবনা নেই। আসল বিপদ থেকে তুমি ত এখন উদ্ধার কর ভাই!"

মুরারি পরিহাসের আভাষটুকু প্রকাশ না করিয়া কহিল, "তবে যে গুজব শুনেছিলাম নবীন বাবু তাঁর মেয়ের বিয়ে নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষালের সঙ্গে স্থির করে গেছেন? ছেলেটি বিলেতে সিভিলিয়ানী পাশ দিতে গেছে, ফিরে এলেই বিয়ে হবে? সেটা তবে কাজের কথা নয়?"

সতীনাথ এ সংবাদ জানিত না, শুনিয়া মনের ভিতরটা একটুখানি দুলিয়া উঠিয়া তখনই আবার স্থির হইল। হাসিয়া কহিল, "কে বল্লে তোমায়? ও সব বাজে গুজব, কোন ভয় নেই।"

মুরারি কহিল, "বাঁচলেম, ভয় না থাকলেই ভাল। আমাদের লুচি মণ্ডা বাদ না গেলেই হল, কারণ শাস্ত্র বলেচেন 'মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ'—হাঃ হাঃ কি বল? চল আজ ষ্টারে যাওয়া যাক্, বন্যকুসুম প্লে হবে, ভারী চমৎকার। সেদিন দেখে এসে পর্য্যন্ত মনটা ছট্‌ফট কচ্চে। নায়িকা বনলতা চমৎকার সেজেছিল, চল দেখে আসা যাক। সর্দ্দি হয়েচে? বেশ, আমিও এই গ্যার্ট্ হয়ে বসলুম, কে আমায় জেঠামশায়ের সাম্‌নে নিয়ে যায়, যাক্ দেখি? আমি ওঁর জন্যে বাঘের খাবায় মাথা দেব, আর উনি থিয়েটার দেখে আমায় কৃতার্থ কর্‌তে পারবেন না? জান, জেঠামশাই বলেছেন নিকষ কুলীনের মেয়ে নৈলে বৌ করবেন না?"

মুরারি সতীনাথকে দলে লইবার জন্য অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সে সঙ্গে থাকিলে রুদ্রকান্তের নিকট তিরস্কারগুলা বাঁচিয়া যায়। আর সতী যে পরমহংস হইয়া প্রশংসা কুড়াইয়া বেড়ায় সে পথও তাহার বন্ধ হয়। কিন্তু সতীনাথ তাহার মতে চলিতে একান্তই অসমর্থ। তাই আজ সতীনাথের গরজ বুঝিয়া সে কোট করিয়া বসিল। সতীনাথেরও মুরারিকে চটাইবার সাহস হইল না—তাহাকে খুসী রাখাই যে এখন তাহার প্রয়োজন। অগত্যা সে স্বীকার হইল,"আচ্ছা! তাই যাওয়া যাবে, আর রাগে কাজ নেই।"

মুরারিও তাহাকে আশ্বাস দিল, জেঠা মহাশয়ের মেজাজ বুঝিয়া শীঘ্রই সে কথাটা তুলিবে ও মত করাইয়া লইবে। আশ্বস্ত চিত্তে সতীনাথ উঠিয়া গেল।

মুরারি বর্ণিত নির্ম্মলচন্দ্র নামধারী সমুদ্র পারের প্রতিদ্বন্দীর চিন্তাটাকে সে কিন্তু একেবারে মন হইতে তাড়াইয়া বিসর্জ্জন দিতে পারিল না। কিন্তু সেই সঙ্গে কল্যাণীর বিশ্বস্তমুখ ও তারাসুন্দরীর আশ্বাসবাণী মনে পড়ায় সে হাসিল। সমুদ্রপারের ভাগ্যান্বেষীর আবেদন যতই বলবৎ হউক, এখানে তাহার কোন মূল্য নাই। কল্যাণী যে তাহাকে ভালবাসে—সে যে আর কাহারও হইবে না এ বিশ্বাস নিজের চিত্ত দিয়াই

সে অনুভব করিয়াছে। তাই, অমূলক আশঙ্কাটাকে মন হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রতিশ্রুত মুরারি পরদিন দাবা খেলিতে বসিয়া রুদ্রকান্তের কাছে সতীনাথের দরখাস্ত দাখিল করিল—ব্রাহ্মধর্ম্মী মৃত নবীনমাধবের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য সতী দৃঢ়সংকল্প, সে তাঁহাদের কাছে বিবাহ করিবার জন্য শপথ করিয়া প্রতিশ্রুতও হইয়াছে; সুতরাং জেঠামহাশয়কে দয়া করিয়া অনুমতি দিতেই হইবে।

রুদ্রকান্ত আলবোলার নল মুখে তুলিলেন, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কেবলমাত্র কহিলেন "হুঁ।" তার পর আর তেমন উৎসাহের সহিত খেলা চলিল না। মুরারির কেবলই চাল ভুল হইয়া যাইতে লাগিল; রুদ্রকান্ত কহিলেন "থাক্।" গোবর্দ্ধন কলিকা পরীক্ষা করিয়া পুনরায় নূতন সাজা কলিকা গুড়গুড়ির মুখে বসাইয়া দিয়া গেল। অম্বুরী তামাকের সুগন্ধে ও ধূমে ঘরখানা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং মুরারির ধৈর্য্য পরীক্ষা করিয়া সে ছিলিমটাও ভস্ম হইয়া গেল। রুদ্রকান্ত কোন কথাই কহিলেন না।

বসিয়া বসিয়া অধীর প্রতীক্ষায় মুরারির চিত্ত যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, তখন এক সময় সে খেলার সরঞ্জামগুলা গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িল।

সে চৌকাঠের বাহিরে পা দিলে রুদ্রকান্ত ডাকিয়া বলিলেন, "নিধিরাম বাবুকে শিবরাম চকের মোকর্দ্দমার দলিলপত্রগুলো নিয়ে আসতে বল। বেটা নবাবপুত্তুর, তিরিশজন ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে ডাকতে না গেলে আসা হয় না! চাবকে ঢিট করতে হয় সব বেটাকে।"

তাঁহার ক্রুদ্ধদৃষ্টি মুরারির মুখে বদ্ধ থাকায় চাবুকটা মুরারি সতীনাথ বা নিধিরাম সরকার অথবা কাহার পৃষ্ঠে যে পতিত হইল ঠিক বোঝা গেল না। মুরারি "যে আজ্ঞে" বলিয়া তাড়াতাড়ি "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জন"—এই চাণক্য নীতি অনুসরণ করিল। তাহার গমনশীল মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেলে একটুখানি হাসিয়া রুদ্রকান্ত মনে মনে কহিলেন, "বেটা আমার মনে করে ও ভারী বুদ্ধিমান। ওরে ভ্যাবাকান্ত, এ বড় কেও কেটা নয়—স্বয়ং রুদ্রকান্ত শর্ম্মা। এখানে যে কেউ চালাকী করে জিতে যাবেন তার জোটি নেই। তুমি বেড়াও ডালে ডালে আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। হুঁঃ—সতীর এইবার পাখ্না হয়েচে, উড়তে চায়! কুলীনের ছেলে বেম্ম বিয়ে করবে? আরে খেলে যা! কলেজে পড়ে ছোঁড়াগুলো ঐ বিদ্যেতেই কেবল পাকা হয়।"

কৌলীন্যের প্রতি রুদ্রকান্তের কোন প্রবল অনুরাগের প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে কখনও পাওয়া যায় নাই বরং তদ্বিপরীত ভাবই দেখা গিয়াছে। সমাজ ও জাতি রক্ষার জন্য কৌলীন্য প্রথার সমূলে উচ্ছেদ সাধন যে একান্তই বাঞ্ছনীয়, সকলের পক্ষেই যে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে তাঁহাকে টাউনহলে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেও শুনা গিয়াছে। বন্ধুমহলে বাগ্‌যুদ্ধে তাঁহারই চিরদিন এ বিষয়ে জয় হইয়াছে। তবু আজ সতীনাথের কৌলীন্য মর্য্যাদা লঙ্ঘনের অভিলাষ বুঝিয়া তাঁহার সুষুপ্ত কুলগর্ব্ব সহসা সতেজে মাথা ঝাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিল। "না এ কখনই হতে দেওয়া হবে না। ঘরে যাই করি, গণ্ডীর বাইরে পা দেব কেন?"

সেই সঙ্গে মনে পড়িল, সতীনাথ তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র! ক্রোধে না হউক জেদে সেও বড় কম যায় না। তাহার শরীরেও যে বংশরক্ত প্রবহমান! বাধা দিতে গেলে বিপরীত ফলই সম্ভব। সতীর পিতা ও রুদ্রকান্ত নিজেই তাহার উদাহরণ। বহুদর্শী রুদ্রকান্ত বুঝিলেন, এখানে বিষয়ে বঞ্চিত করিবার ভয় দেখান বৃথা। এখনকার প্রবল মোহে অন্ধ যুবক ভবিষ্যৎ তলাইয়া দেখিবে না, প্রণয়ের উচ্চাদর্শে স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ দেখাইবার এমন সুযোগ সে হয়ত উৎসাহের সহিতই গ্রহণ করিবে। তখন সাধিয়া ডাকা লজ্জাকর হইবে। এক মাত্র উপায়—বুঝাইয়া, স্নেহের দাবী দিয়া নিবৃত্ত করা।

এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধের তৃপ্তির জন্য সেকি তাহার নবযৌবনের আশা-নির্ম্মিত সাধের অট্টালিকা নিজের হাতে ভাঙ্গিতে সম্মত হইবে?—মনে ত হয় না।

তবে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায় কিসে? সে অবোধ, না বুঝিয়া পাহাড় হইতে ঝাঁপ দিতে চাহিতেছে, তাই বলিয়া অভিজ্ঞ রুদ্রকান্ত তাহাকে টানিয়া ফিরাইবেন না? সতী—তাঁহার সতী—একমাত্র যে তাঁহারই ছিল, সে আজ তাঁহার সংসার হইতে সমাজ হইতে বিষয় হইতে মন হইতে দূরে—বহুদূরে—চলিয়া গিয়াছে! কল্পনা নেত্রে রুদ্রকান্ত এই চিত্রটাকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেন; মন হইতে সে চলিয়া গিয়াছে এ চিন্তা অসম্ভব! আর পরস্পর বিরোধী এই সম্বন্ধ-বন্ধনের ফলও যে সুখকর হওয়া সম্ভব নয় তাহাও সুনিশ্চিত। তবে উপায়?

সতীনাথের বিবাহের বয়স হইলেও কেন যে রুদ্রকান্ত তাহার বিবাহ দিবার "গা" করিতেন না, তাহা অপরে না বুঝিলেও, তাঁহার নিজের মনের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। কন্যাভারগ্রস্ত পিতৃসম্প্রদায় হাঁটিয়া হাঁটিয়া তাঁহার বাড়ীর দরজার কাষ্ঠদেহ ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াও ফল পায় নাই। তাঁহার এক কথা—আগে লেখা পড়া শেষ হউক, তাড়াতাড়ি কি? লেখাপড়াও শেষ হইল, তবু কোন ত্বরা দেখা গেল না। পিসিমা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রুদ্রকান্ত কহিলেন, "এখন যাক্ না কেন দুদিন, যা হোক্ একটা ধরে ত দেওয়া যায় না, ভাল মেয়ে পেলে তখন হবে।" অথচ পক্ষবিহীন পরী অপ্সরীদের সংবাদ আসিলেও তাঁহার কোনও ব্যস্ততা দেখা যাইত না।

সতী যে তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও ভালবাসিবে, অপরের হইবে, তাহার স্বার্থ সুখ চিন্তা সমস্তই যে ভিন্ন পথে বহিবে, এ চিন্তা রুদ্রকান্তের অসহ্য। পাত্রাভাবে যে বিরাট স্নেহের ক্ষুধা তাঁহার অন্তর মধ্যেই চিরদিন নিরুদ্ধ ছিল, একমাত্র সতীনাথকেই তিনি সেই স্নেহের কেন্দ্র-রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে অপরের হস্তক্ষেপের কোন অধিকার থাকিতে পারে, এ চিন্তা একদিনও তাঁহার মনে পড়ে নাই। তাই আজ অতর্কিত রূপে কল্যাণী যখন তাঁহার চিরন্তন অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছে বলিয়া রুদ্রকান্তের ধারণা হইল, তখন পুত্রের সকল ত্রুটীর অপরাধ নিক্ষিপ্ত হইল কল্যাণীর মাথায়! সতী তাঁহার নিজের ছেলে, তাহাতে সে সর্ব্বগুণসম্পন্ন, তাহার উপর ত আর রাগ করা চলে না? সেই যাদুকরী রূপের যত না হউক, হাবভাব লীলা চাতুর্য্যে তাঁহার সংসার-জ্ঞানহীন শিবতুল্য সন্তানকে বশ করিয়া ফেলিয়াছে!

রুদ্রকান্তের সংকল্প স্থির হইয়া গিয়াছে। মনের অগোচর পাপ নাই, মানুষ ভাল মন্দ যে কোন কার্য্যকালে তাহার ন্যায় অন্যায় বোধ রাখিয়াই করিয়া থাকে। তাই যুক্তি দিয়া মনের কাছে নিজেকে নির্দ্দোষী সাজাইবার প্রয়োজন হয়। কুলীনপুত্র সতীনাথের কৌলিন্য-মর্য্যাদা উপস্থিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাই রুদ্রকান্তের কাছে দুর্ভেদ্য বর্ম্মের মত একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া গৃহীত হইল। নবীনমাধবের কন্যার সম্বন্ধে তাই কোন সংবাদ লওয়াও তিনি প্রয়োজন মনে করিলেন না। সতীনাথকে ডাকিয়া, সে সমাজ বিগর্হিত কার্য্যে কি সাহসে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে জিজ্ঞাসাও করিলেন না। মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল। শিক্ষিতা বয়স্থা কন্যা, যাহার অঙ্গুলি হেলনে সতী উঠা বসা করিবে—এমন বধূ তিনি ঘরে আনিবেন না। বিশেষতঃ, ইহাকে ঘরে আনিলে, ইহার মাতাও আসিয়া জামাতৃগৃহবাসিনী হইয়া তাঁহার ছেলেকে ভাঙ্গাইয়া পর করিয়া দিবে।

অনেক মা আছেন যাঁহারা ছেলেকে ভালবাসেন—অত্যন্ত প্রবলরূপেই ভালবাসেন—কিন্তু বধূকে সহ্য করিতে পারেন না। মনে করেন, বধূ তাঁহার স্নেহের সম্পত্তি জোর করিয়া বে-দখল করিয়া লইতেছে। কোথা হইতে "উড়িয়া আসা" পরের মেয়ের "জুড়িয়া

বসায়" এই অনধিকার দাবীর উপরে তাই নির্ম্মম ভাবে খড়্গাহস্ত হইয়া সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলেন। মায়ের অধিকার খর্ব্ব করা বধূর সাধ্য নয় এবং বধূর বিধিনির্দ্দিষ্ট প্রাপ্য যে বল প্রয়োগে আটক করা যায় না, তিনিও যে পরের মেয়ে আজ সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, বধূত্বের সীমা ছাড়াইয়া শ্বশ্রূ-স্থানীয়া জননী, একথা একেবারেই ভুলিয়া যান। পুত্রের প্রতি এই যে বিশ্বগ্রাসী স্নেহের দাবী, ইহাতে আত্মবিসর্জ্জনের আনন্দ নাই। 'আমার সন্তানের সুখেই আমার সুখ' এ ভাব না আসিয়া 'আমার সুখের জন্যই ও'—এমনি একটা ভাবই মনে আসে।

সতীনাথের উপর রুদ্রকান্তেরও তেমনি একটা স্বার্থপূর্ণ প্রবল আকর্ষণ ছিল। সতী যে তাঁহাকে না জানাইয়া, নিজে নিজেই বিবাহের ঘটকালী করিয়া পাত্রী পছন্দ করিয়া বসিল, সংকল্প স্থির করিয়া মৌখিক অনুমতি চাহিয়াছে—ইহার অপমান তাঁহার বক্ষে বড় ব্যথা দিয়াই আঘাত করিল। তবু সে সতী—তাহার উপর রাগ করিয়া থাকা যায় না। তাই সন্তান-বৎসলা জননী যেমন নিজের পুত্রের দোষ ত্রুটী দেখিতে না পাইয়া বধূর উপর সকল অপরাধ আরোপ করিতে চান, রুদ্রকান্তের স্বার্থপূর্ণ স্নেহও তেমনি ভাবে কল্যাণীর প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। ছেলের বিবাহ দিয়া বধূ আনিতে হয়, তিনিই আনিবেন; ছেলে নিজে পছন্দ করিবে কি! "কোর্টশিপ" করিয়া ইংরাজের মত বিবাহ হইবে! দেশের হইল কি? এখনকার দিনে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। এ কার্য্য মুরারির দ্বারা হওয়াই সম্ভব ছিল, সতীও এ হাওয়ার হাত এড়াইতে পারিল না! এজন্য তাহাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। যেখানে রম্ভা তিলোত্তমারা তপস্বীর তপস্যা-ভঙ্গের প্রতিজ্ঞায় অবতীর্ণ হয়, সেখানে মানুষ ত ছার, দেবতাদেরও যে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। অপরাধ সতীর নয়, সেই নবীনমাধবের বিদুষী কন্যার—সে যে তপস্বী সতীনাথের তপস্যাভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করিয়াই আসরে নামিয়াছে। এখনও দেখা যাক্!

পরদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়াই সতীনাথ শুনিল তাহাকে মহল "খালাসিয়া" যাইতে হইবে।

সেখানকার প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া জমিদারের খাজনাবন্ধ করায় নায়েবের হুকুমে তাহাদের ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। বিদ্রোহী প্রজারা সদরে জমিদারের নামে নালিশ রুজু করিয়াছে। সেই অশাসিত প্রজাদের সহিত সন্ধি করিয়া বিবাদ মিটাইবার জন্য সতীনাথের সেই দিনই—সেই দিন বলিলে ঠিক্ বলা হয় না—সেই ক্ষণেই রওনা হওয়া প্রয়োজন, নতুবা ট্রেণ ধরা সম্ভব নয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর গাড়ী নাই।

অন্য সময় হইলে হয়ত এই নূতন কাজের অধিকার-লাভে সতীনাথ খুসীই হইত, কিন্তু এখন দুইটি উজ্জ্বল চোখে তাহার চিত্ত আলোকিত, সে আলো ত্যাগ করিয়া অন্ধকার পল্লীবাসে প্রজাশাসন কার্য্যের ভারপ্রাপ্তির সংবাদ তাহার কর্ণে নির্ব্বাসন দণ্ডের মতই কঠোর শুনাইল। সতীনাথ বিস্মিতও হইল। আর একবার একটা ছোটখাটো প্রজা-বিদ্রোহ ব্যাপারে সে একবার নূতন জমিদারী নেত্রকোনায় যাইতে চায়; জেঠামহাশয় তাহাতে শিহরিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন, "বাপরে! সেখানে তোমায় যেতে দিতে পারি! যায় সরকার বেটা যাক্, লাঠি সড়কী চালায় বেটার ওপর দিয়েই যাবে।" সেই কথাটা মনে করিয়া সতীনাথের হাসি পাইল। কাজটা যে কতবড় গুরুতর, জেঠামহাশয়ের নিজে হইতে তাহাকে যাইতে বলাতেই ত প্রমাণ হইতেছে। নিজের মানসিক দৌর্ব্বল্যে সে নিজে নিজেই লজ্জিত হইল। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া রুদ্রকান্তের নিকট বিদায় লইতে গেল। রুদ্রকান্তের আজ আর প্রয়োজন ফুরাইতে ছিল না, সতীনাথের বার বার ঘড়ির পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিও তাঁহার সতর্ক চক্ষু এড়ায় নাই। ট্রেণ ধরিবার নিতান্ত নির্দ্দিষ্ট সময়টুকু মাত্র রাখিয়া তিনি তাহাকে ছাড়িয়া

দিলেন বলিলেন, "গাড়ী জোরে হাঁকিয়ে যেতে হুকুম দিও নৈলে ট্রেণ ধর্‌তে পারবে না।"

বিপিন, খানসামা বাবুর জিনিষপত্র গুছাইয়া পূর্ব্বাহ্ণেই প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সতীনাথ গাড়ীর ভিতর বসিলে, সে কোচ-বাক্সে কোচম্যানের পাশে উঠিয়া বসিল। সতীনাথ ক্ষুণ্নমনে সতৃষ্ণ নেত্রে সেই বর্ষাজল-মলিন লুপ্তপ্রায় নীলবর্ণের ছোটবাড়ীখানার পানেই বৃদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সময় নাই! সময় নাই! একবার বিদায় লইবার, একটা কথা বলিয়া যাইবারও সময় নাই। উপর নীচের সব কয়টা ঘরের জানালাই আজ বন্ধ রহিয়াছে। হয়ত এখনও সে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠে নাই। যখন উঠিবে, সে তখন কতদূরে চলিয়া যাইবে কে জানে? মুরারিকে দেখিতে পাইলেও বলিয়া যাইতে পারিত যে এই আকস্মিক চলিয়া যাওয়ার সংবাদটা যেন তাহাদের বলিয়া আসে। কিন্তু সেও কোথায় গিয়াছে। তারাসুন্দরীর বাড়ীর দরজা তখনও খোলা হয় নাই, বৃদ্ধ ভজহরির হুঁকা হাতে চির পরিচিত মূর্ত্তিটাও আজ গৃহকোণে লুকাইয়া আপনার নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছে। গাড়ী যখন মোড় ঘুরিল ঠিক সেই সময় উপরের একটা জানালা খুলিয়া কাহার অস্পষ্ট মূর্ত্তি যেন দেখা গেল, দূরত্ব হেতু চেনা গেল না। জানালার বাহিরে মাথা বাহির করিয়া কোচমানকে গাড়ী থামাইবার আদেশ দিতে গিয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইল, এবং নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া স্থির হইয়া বসিল।

উভয় পার্শ্বের ঘনবিন্যস্ত সৌধমালা, সদ্যোজাগ্রত কর্ম্মভূমির কল্লোলমুখর-জনতা, গোশকটের পথাবরোধ এবং ঘোড়ার গাড়ী মোটর গাড়ীর যাতায়াত সতীনাথের ধ্যাননেত্র হইতে সেই একখানি মাত্র নিদ্রাচ্ছন্ন রুদ্ধগৃহ এবং তাহারই মধ্যস্থ একটি বিশেষ ব্যক্তির স্মৃতিকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। সহিস গাড়ার দরজা খুলিয়া বাবুর অবতরণ প্রতীক্ষা করিতেছিল, কোচম্যান ঘন ঘন বেল্‌ বাজাইয়া ত্বরা দিতে দিতে "গাড়ী হঠাও গাড়ী হটাও" আদেশকারী পাহারাওয়ালার সহিত বাক্‌-বিতণ্ডা জুড়িয়া দিয়াছিল। বিপিন জিনিষ পত্র সাবধান করিয়া টিকিট কিনিয়া সম্মুখে আসিয়া জানাইল, ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এখনি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িবে।

ক্রমশঃ

শ্রীইন্দিরা দেবী।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবর্ত্তনের ইতিহাস।

পুরাকালে পৃথিবীর জলস্থল-সংস্থান ঠিক কিরূপ ছিল আজিও তাহা নিঃসংশয়ে জানা যায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতেরা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন যুগের যে মানচিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়।

সমুদ্রের উভয়তীরে যে সকল শিলাপঞ্জর (Fossils) লক্ষিত হয় তাহারা সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হইলে এ সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপায় হইতে পারে।

কাম্ব্রীয় যুগের পূর্ব্বে ধরাপৃষ্ঠে কোন জীবজন্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাম্ব্রীয় যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হয় যে সেকালের জল-স্থল-সংস্থান অনেকটা একালের মতই ছিল। সেকালেও উত্তর-আমেরিকা ত্রিভুজাকৃতি মহাদেশই ছিল এবং দক্ষিণাভিমুখে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছিল। তবে ইহার অবস্থান সম্ভবতঃ আর একটু পূর্ব্বে ছিল।

ইউরোপও অনেকটা একালের মতই সমুদ্র ও

উপদ্বীপে বিভক্ত ছিল। তবে ইহারও স্থলভাগের অধিকাংশ আরও একটু পূর্ব্ব দিকে ছিল, এবং এই ভূমিখণ্ড বল্টিক সাগর হইতে মধ্য এশিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যে সমুদ্র ব্রিটিশ দ্বীপের কিয়দংশ আবৃত করিয়াছিল, তাহা দক্ষিণে পূর্ব্ব-সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

• সম্ভবতঃ এশিয়ার প্রধান অংশ তখনই স্থলে পরিণত হইয়াছিল এবং মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরের অনেকাংশ এই স্থলভাগের অন্তর্গত ছিল।

অধ্যাপক ফ্রেচের (Frech) মতে দক্ষিণ গোলার্দ্ধে দক্ষিণ-আমেরিকার সমস্ত উত্তরাংশ ব্যাপিয়া মহাদেশের অনুরূপ এক প্রকাণ্ড দ্বীপ (ব্রেজিল দ্বীপ) বিরাজিত ছিল।

আফ্রিকা উত্তরপূর্ব্বাংশে ইউরোপের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, এবং দক্ষিণে "কেপ্ কলোনি" পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

অষ্ট্রেলিয়ারও কোন কোন অংশ স্থলে পরিণত হইয়া থাকিলেও ইহার অধিকাংশই তখনও সাগরগর্ভে নিমগ্ন ছিল। এই সমুদ্র সেকালে উত্তরে চীন এবং দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ড ছাড়াইয়া দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সুতরাং কাম্ব্রীয় যুগেও স্থলভাগ উত্তরাংশে তিনটি বৃহৎ মহাদেশ এবং তিনটি দ্বীপ বা উপদ্বীপে বিভক্ত ছিল। মহাদেশগুলি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া দক্ষিণে প্রসারিত ছিল, এবং দ্বীপ বা উপদ্বীপগুলি দক্ষিণ-মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উত্তর-ইউরোপ, উত্তর-এশিয়া এবং উত্তর-আমেরিকার দূর বিস্তৃত সমুদ্রজাত পদার্থের স্তর দেখিয়া মনে হয় যে এক সময়ে ইহাদের উত্তরে মহাসাগর ছিল।

এই সময়ে উত্তর-আমেরিকা গ্রীনল্যাণ্ড হইয়া স্পিট্‌স্‌বার্জ্জেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং উত্তর-মহাসাগর ইহার বর্ত্তমান অবস্থানের কিছু পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল।

বর্ত্তমান যুগ এবং কাম্ব্রীয় যুগের জলস্থল সংস্থানের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হইতে পারে যে পৃথিবীর জলস্থল সংস্থান বুঝি চিরকালই একরূপ ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের মানচিত্র আলোচনা করিলে এ ধারণা স্থায়ী হইতে পারে না।

ইতিপূর্ব্বে আমরা পৃথিবীর "টেট্রাহেড্রনের" অনুরূপ আকৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বুঝা যাইবে যে, পৃথিবীর আকার যদি সত্যই টেট্রাহেড্রনের মত হয়, তাহা হইতে ইহার উর্দ্ধাধঃ রেখাগুলির দুই পার্শ্বে যে স্থলভাগ পড়িবে তাহার অবস্থান প্রায় অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

কিন্তু পৃথিবী যখনই তাহার দ্রুত আবর্ত্তনবশতঃ নিজের টেট্রাহেড্রন আকৃতি পরিত্যাগ করিয়া গোলকাকৃতি ধারণ করিবার চেষ্টা করিবে তখনই ইহার উর্দ্ধাধঃ বিস্তৃত ধারগুলি বসিয়া যাওয়ায় ইহার পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত রেখাগুলির দুই পার্শ্বে দূর প্রসারিত নূতন স্থলচক্র ও জলচক্র উৎপন্ন হইবে।

আভ্যন্তরিক আকুঞ্চনের ফলে পৃথিবী পুনরায় পূর্ব্বাকৃতি প্রাপ্ত হইলে মহাদেশগুলিও আবার তাহাদের পূর্ব্বাকৃতি ফিরিয়া পাইবে। সুতরাং এ কারণে জলস্থলের পুনঃ পুনঃ অবস্থানগত পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

পক্ষান্তরে মেরুপ্রদেশগত অবনতি চিরদিন উত্তর মেরুতেই আবদ্ধ থাকিবার কথা নহে। পৃথিবীর একপ্রান্ত বসিয়া গেলে অপর প্রান্ত উন্নত হইবে, একথা সত্য হইলেও অবনতি যে কেবল উত্তর মেরুতেই চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে এমন কোন কথা নাই। সুতরাং এ কারণেও কখনো উত্তর মেরুতে জল এবং দক্ষিণ মেরুতে স্থল এবং কখনো তদ্বিপরীত ব্যাপার ঘটা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

সুতরাং এজন্যও জলস্থলের অবস্থানগত পরিবর্ত্তন ঘটিবার কথা।

পৃথিবীর ভূতত্ত্ব বিষয়ক ইতিহাস হইতে যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহা হইতেও পূর্ব্বোক্ত অনুমানই সমর্থিত হইয়া থাকে। কাম্ব্রীয় যুগের ইতিহাসের সঙ্গে পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসের আলোচনা করিলেই একথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে।

বেলি উইলিস্ সাহেব (Baily Willis) সম্প্রতি পৃথিবীর সিলুরীয় যুগের যে ভূতত্ত্বঘটিত মানচিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার সহিত পৃথিবীর কাম্ব্রীয় যুগের মানচিত্রের তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, উত্তর-আমেরিকায় কাম্ব্রীয় যুগের স্থলভাগ সিলুরীয় যুগে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডের পরিবর্ত্তনও নিতান্ত সামান্য নহে।

অধ্যাপক ফ্রেচের (Frech) অর্ডোভিসীয় যুগের মানচিত্র দেখিলে দেখা যাইবে যে এই যুগের উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধে জলস্থলের অবস্থান বর্ত্তমান কালের ঠিক বিপরীত। উত্তর-মেরুতে মহাদেশ এবং দক্ষিণ-মেরুতে বিশাল মহাসাগর বিরাজিত, এল্‌গোন্‌কীয় উপদ্বীপ (Algonkian peninsula) ব্যতীত উত্তর আমেরিকার প্রায় সমস্তই সমুদ্রাবৃত এবং ইহার বিপরীত দিকে বিশাল স্থলভাগ সমস্ত ভারত-মহাসাগর ব্যাপিয়া উত্তর-অষ্ট্রেলিয়া হইতে আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ-আমেরিকা উত্তর দিকে ক্রমসূক্ষ্ম হইয়া সংকীর্ণ এলগোন্‌কীয় উপদ্বীপের দ্বারা গ্রীনল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত।

কেবল দুইটি বিষয়ে ফ্রেচ্ সাহেবের মানচিত্রকে অশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় :—

ফ্রেচের মতে দক্ষিণ-আমেরিকার দক্ষিণাংশের সীমারেখা অনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু সে সময়ে এই মহাদেশের দক্ষিণাংশ যে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত না হইয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই।

মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে সে সময়ে প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড ছিল এবং সম্ভবতঃ ইহা দক্ষিণে উত্তর-অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার বিপরীত দিকে সে সময়ে দক্ষিণ আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর বিরাজিত ছিল।

ফ্রেচ্ সাহেবের মানচিত্রে এই ভূমিখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই দুইটি ভ্রম সংশোধন করিয়া লইলে দেখা যায় যে, অর্ডোভিসীয় যুগের প্রারম্ভে পৃথিবীর আকার টেট্রাহেড্রনেরই অনুরূপ ছিল। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধে জলস্থলের অবস্থান বর্ত্তমান কালের ঠিক বিপরীত ছিল। উত্তর "অর্ডোভিসীয়" যুগের জলস্থল-সংস্থানের যেরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়, "পূর্ব্ব পেলিওজীয়" যুগের "কার্ব্বনীয়" যুগাংশের শেষভাগে এবং "পার্ম্মীয়" যুগের প্রারম্ভে সেই ব্যবস্থার ঠিক পুনরাবৃত্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময়ে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা হইয়া দক্ষিণ-আমেরিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক মহাদেশের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের "গণ্ডোয়ানা" স্তরের নামানুসারে এই মহাদেশকে "গণ্ডোয়ানা ভূমি" বলা হইত। এই দেশে দীর্ঘ এবং তীক্ষ্ণাগ্র পত্রযুক্ত কাঁটা গাছের ন্যায় এক বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভিদ দেখা যাইত। উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা ইহার নাম দিয়াছেন গ্লসপ্‌টেরিস (Glossopteris)। এই বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভিদের চিহ্ন ধরিয়াই এই মহাদেশের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সময়ে উত্তর আমেরিকা উত্তরে-উত্তর মেরুস্থিত মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং দক্ষিণ-মেরুতে তখন মহাসাগর বর্ত্তমান ছিল।

এই সময়ে অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরেও এক মহাদেশ চীন হইতে উত্তর-মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং একটী অপ্রশস্ত ভূমিভাগ শ্বেতদ্বীপের উত্তর হইতে স্কাণ্ডিনেভিয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল।

পৃথিবীর মধ্যযুগে সমুদ্র-মধ্যে একটা পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন ঘটে। এই আন্দোলনের ফলে সমুদ্র কোথাও স্থলমধ্যে অগ্রসর হয় এবং কোথাও বিপরীত দিকে সরিয়া যায়। ফলে এই সময় অনেকগুলি মহাদেশ ধীরে ধীরে সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়। এইরূপ ঘটনা পৃথিবীর নানা স্থানে একই সময়ে ঘটে। এইরূপ দূরব্যাপী আন্দোলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে।

পৃথিবী "পেলিওজীয়" যুগে যে টেট্রাহেড্রন আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই যুগে আবর্ত্তনকালে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। এবং পৃথিবী ক্রমশঃ পুনরায় গোলকাকৃতি প্রাপ্ত হয়।

ফলে সমুদ্রতল ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়ায় সমুদ্রগুলি অগভীর হইয়া যায়। কাজেই অতিরিক্ত জলরাশির অগভীর সমুদ্রসীমার মধ্যে স্থান না হওয়ায় তাহা স্থলভাগের উপর ছড়াইয়া পড়ে।

এই পরিবর্ত্তনের পর মধ্যযুগের শেষভাগে আর একবার ভীষণ বিপ্লব ঘটে। সম্ভবতঃ এই সময়েই ভূপৃষ্ঠের কিয়দংশ বসিয়া যাওয়ায় উত্তর-আটলাণ্টিক ও উত্তর-মহাসাগরের উৎপত্তি ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীনলাণ্ড হইতে স্কটলাণ্ডের মধ্যে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে।

ইহার কিছুকাল পরে "মিয়োসীয়" যুগে আবার পর্ব্বতগঠন-সংক্রান্ত শেষ গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়।

ভূপৃষ্ঠের বহুদূরব্যাপী আকুঞ্চনের ফলে আল্পস্, হিমালয় এবং তৎসংসৃষ্ট পর্ব্বতরাজির আবির্ভাব হয় এবং আর এক প্রকারের আন্দোলনের ফলে উত্তর-আমেরিকার পশ্চিমাংশস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী, দক্ষিণ-আমেরিকার আণ্ডিস্ পর্ব্বত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম তীরস্থ সুদীর্ঘ গিরিশ্রেণী (আজিও জাপান ও নিউজিলণ্ডের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে যাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়) উৎপন্ন হয়।

ভূগর্ভনিঃসৃত অগ্ন্যুৎপাতের ফলেও ভূপৃষ্ঠের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

"আর্কিওজীয়" যুগের প্রারম্ভে অতি ভীষণ ও বহুদূরব্যাপী অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। পরবর্ত্তী "কাম্ব্রীয়" যুগে এই উপদ্রব অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

"অর্ডোভিসীয়" যুগে আবার পৃথিবীব্যাপী অগ্ন্যুৎপাতের সূত্রপাত হয়। পরবর্ত্তী "সিলুরীয়" যুগে এই উৎপাত কিয়ৎপরিমাণে শান্তভাব অবলম্বন করে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে নব নব স্তররাজি বিন্যস্ত হইতে থাকে।

"ডিভোনীয়" যুগে আবার একবার আগ্নেয় উপদ্রবের আবির্ভাব হয় এবং "অঙ্গারীয়" যুগের প্রারম্ভে স্কটলাণ্ডের দক্ষিণাংশ ব্যতীত অন্যত্র অনেকটা শান্তভাব পরিদৃষ্ট হয়। "অঙ্গারীয়" যুগের শেষভাগে এবং "পার্ম্মীয়" যুগে আগ্নের উপদ্রব আবার নবভাব ধারণ করে। এই সময়ে পৃথিবীর নানা প্রদেশে নব নব পর্ব্বতরাজি উৎপন্ন হয়। ইহার পর আবার বহুকালের জন্য শান্তি স্থাপিত হয়। এই সময়ে "মেসোজীয়" যুগের প্রস্তর সকল স্তরবদ্ধ হয়। ইহার পরে পূর্ব্ব "ক্রিটেশীয়" এবং "ইয়োশীয়" যুগে আবার একবার গুরুতর অগ্ন্যুৎপাতের আবির্ভাব হয়। এই সময়েই ইংলণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে খড়ি মাটির এবং লণ্ডনে মাটির স্তর বিন্যস্ত হয়।

"কেনোজীয়" যুগের প্রারম্ভে (ইয়োশীয় যুগাংশে) আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকায় অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। সম্ভবতঃ এই সময়েই স্কটলাণ্ডের পশ্চিমপ্রদেশস্থ আগ্নেয়গিরিরাজি গঠিত হয়।

ইহার পর আবার কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হয়।

ইহার পরে "মিয়োশীয়" যুগে আবার পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহারই ফলে আল্পীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় পর্ব্বতশ্রেণী সংগঠিত হয়।

ইংলণ্ডের ভূস্তরে এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত চাঞ্চল্য ও বিরামের সুস্পষ্ট ইতিহাস অঙ্কিত দেখা যায়। পৃথিবীতে পর্য্যায়ক্রমে যে মৃদু আন্দোলন ও গুরুতর বিপ্লব ঘটে তাহাই ভিন্ন ভিন্ন যুগে আগ্নেয় উপদ্রবের ন্যূনাধিক্যের কারণ।

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ সঙ্কুচিত হইলেই ভূপৃষ্ঠ কিয়ৎ পরিমাণে নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়ে। কিছুদিন এই পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে চলিতে থাকে এবং ভূপৃষ্ঠের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। কিন্তু আকুঞ্চন ক্রমশঃই যত বাড়িতে থাকে, ততই ভূপৃষ্ঠ বিকৃতাকার ও অস্থির হইয়া পড়িতে থাকে। অবশেষে একদিন গুরুতর বিপ্লবের দ্বারা ভূপৃষ্ঠের এই বিকৃতি ও অস্থিরতা সংশোধিত হয়। এই বিপ্লবের ফলে ভূপৃষ্ঠ কোথাও ভগ্ন কোথাও দীর্ণ এবং কোথাও অবনত হইয়া পড়ে। ভূপৃষ্ঠ অবনত হইলে ভূগর্ভস্থিত পর্ব্বত সমূহের

উপর গুরুতর চাপ পড়ে এবং ইহার ফলে এই সকল পর্ব্বত হইতে অগ্নিস্রাব নির্গত হইয়া ভূপৃষ্ঠের বিদীর্ণ অংশের মধ্য দিয়া বেগে বাহির হইয়া পড়ে। এই কারণে এক এক যুগে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে।

এক সময়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীর আকার ঠিক গোলকের মত এবং আবর্ত্তনবশতঃ পৃথিবী সর্ব্বদাই সেই আকার রক্ষা করিয়া চলে; ইহার আকারের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। একথা যদি সত্য হইত তাহা হইলে পৃথিবীর টেট্রাহেড্রন আকৃতির জন্য ভূপৃষ্ঠের যে সকল পরিবর্ত্তনের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, তাহার কোনটাই সম্ভব হইত না।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে আর কেহই স্বীকার করেন না যে পৃথিবী ঠিক গোলাকার। এক্ষণে সকলেরই বিশ্বাস হইয়াছে যে পৃথিবীর কোন জ্যামিতিক আকার নাই। ইহার আকার বরং কতকটা গোঁজের মত। ইহার মাথার দিকটা (অর্থাৎ সুমেরুর দিকটা) চ্যাপ্টা এবং ইহার নীচের দিকটা (অর্থাৎ কুমেরুর দিকটা) সূচালো। ইহার বিষুবরেখাও ঠিক বৃত্তাকার নহে।

আকারের এইরূপ অসামঞ্জস্যের জন্যই পৃথিবীর আকারগত পরিবর্ত্তন সম্ভব।

অবশ্য বলা বাহুল্য যে ভূপৃষ্ঠে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে তাহা সমগ্র পৃথিবীর পরিমাণের তুলনায় অতি যৎসামান্য। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল এবং এই পরিবর্ত্তনের পরিমাণ ঊর্দ্ধসংখ্যা ১০।১২ মাইল মাত্র। সুতরাং পৃথিবীর পরিমাণের তুলনায় এই পরিবর্ত্তন একপ্রকার নগণ্য।

কিন্তু যে পরিবর্ত্তন সমগ্রের তুলনাই ধর্ত্তব্যই নহে, মহাদেশকে মহাসাগরে পরিণত করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

ভূপৃষ্ঠ কোন সময়েই সম্পূর্ণ স্থির নহে। ইহা সর্ব্বদাই অল্পাধিক আন্দোলিত হইতেছে। এবং এই আন্দোলনের ফলে ইহার কোন অংশ উন্নত এবং কোন অংশ অবনত হইয়া পড়িতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তন অনেক সময়ে অতি সামান্য হইলেও ইহাদের সমষ্টিফল নিতান্ত সামান্য নহে। ভূপৃষ্ঠ এত পরিবর্ত্তনশীল যে অতি সামান্য কারণেই ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ইহার সুমেরুমণ্ডলের কেন্দ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বদা একস্থানে স্থির হইয়া থাকে না—অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে নড়িয়া বেড়ায়। পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে ইহার এক পার্শ্বে বরফ বা বৃষ্টির জলের চাপ বেশী হওয়াতেই এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অধ্যাপক মিলনে ভূকম্পমানের (seismograph) সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বেশী বৃষ্টির পর জাপানের পশ্চিমাংশ বসিয়া যায়।

সার জর্জ্জ ডারউইন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে জোয়ারের সময়ে ইংলিশ চ্যানেলের খাত অতিরিক্ত জলের চাপে কিয়ৎ পরিমাণে বসিয়া যায় এবং জল সরিয়া গেলে আবার উঠিয়া পড়ে।

অধ্যাপক হেকার (Hecker) সম্প্রতি দেখাইয়াছেন যে চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণের জন্য স্থলভাগেও যে জোয়ার ভাঁটা খেলে তাহার পরিমাপ করা অসম্ভব নহে।

মাধ্যাকর্ষণ এবং আবর্ত্তনের প্রভাববশতঃ পৃথিবী সর্ব্বদাই প্রকৃত গোলাকৃতি লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পৃষ্ঠদেশের পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য কিছুতেই ইহার সে চেষ্টা সফল হইতেছে না।

ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

বশিষ্ঠের হোমিওপ্যাথী

রামধন বাবুর বাড়ীতে যে সান্ধ্য আড্ডাটী জমে, সেটীর বিশেষত্ব এই যে, সেখানে আড্ডার উপযোগী সব-রকম জিনিষ চলিলেও, চলে না কেবল একটী জিনিষ—কেহ যে বলিবেন, অমুক দেশে এই নূতন আবিষ্কারটী হইয়াছে—এটী বলা চলে না। যে দেশেই হউক, আর যে কালেই হউক, যাহা কিছু "নূতন" তত্ত্ব বাহির হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, সে সবই আর্য্য ঋষিগণ জানিতেন;—সুতরাং "নূতন" কিছুই বাহির হইবার যো নাই; আর্য্য ঋষিরা তাহার পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তবে যে লোকে একটা তত্ত্ব আবিষ্কার হইয়াছে শুনিলেই, "নূতন, নূতন" বলিয়া চীৎকার করে, সে তাহাদের আর্য্যশাস্ত্রে অজ্ঞতারই পরিচায়ক;—রামধন বাবুর সান্ধ্য আড্ডাটী এই policy সাবধানে রক্ষা করিয়া থাকে। সেখানে কেহ নবাবিষ্কৃত কোন তত্ত্বকে "নূতন" বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গেলে, তাহাকে হাড়গোড়-ভাঙ্গা "দ" হইতে না হউক, দুর্ভেদ্য তর্কজালে পড়িয়া 'থ' হইতে হয়, অনেকবার তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এ হেন আড্ডায় একদিন কথা উঠিল—হোমিওপ্যাথী জিনিষটা নূতন, না, আর্য্যঋষিরাও ইহা জানিতেন?—তখন সকলে চা পান করিতেছিলেন; তবু এত সহজ এবং ধরা-বাঁধা কথার উত্তর তৎক্ষণাৎ না দিয়া ধৈর্য্য-রক্ষা করা কঠিন; সেইজন্য চা'র পেয়ালা হাতেই একজন বলিয়া উঠিলেন—"বিষস্য বিষমৌষধম্ এই শ্লোকেই ত বুঝা যাইতেছে যে, ঋষিরা হোমিওপ্যাথী জানিতেন,—Similia Similibus আর কাহার নাম?"

দেখাদেখি, আর একজনের ধৈর্য্যও অরক্ষণীয় হইয়া উঠিল। তিনিও বলিয়া উঠিলেন—"শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—ইহাও হোমিওপ্যাথিক জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। Similia Similibus জানা না থাকিলে ঐরূপ শ্লোক তৈয়ারি করা একেবারেই অসম্ভব।"

তখন আর এক একজন বলিয়া উঠিলেন—"মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্ এটা কি রকম?"

ইহা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন, এবং বক্তাকে লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করিলেন না বটে, কিন্তু লাঠি যে রোগের ঔষধ, বক্তা যে সেই রোগে বিশেষরূপেই আক্রান্ত এ কথা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে ছাড়িলেন না।

বৃকোদর বাবু এতক্ষণ গম্ভীরভাবে চা পান করিতেছিলেন। তিনি একজন "অ্যামেচার" হোমিওপ্যাথ্। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, টীকি আছে, জামার উপর রুদ্রাক্ষের মালা শোভমান। পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা।

সকলে সোৎসুকনয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন দেখিয়া, তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"চা'টা খেতেই দাও।" চা শেষ করিয়া বৃকোদর বাবু গুড়গুড়ির নলটী অধিকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"দেখ, তোমরা যে কথাটি পাড়িয়াছ, তাহা আমি অনেকদিন পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু অনেকেই তাহা জানেন না। আজ কথাটা পাড়িয়া ভালই করিয়াছ।

"আগে তোমাদের কথাগুলি মিটাইয়া দিই। 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্' হোমিওপ্যাথী, এটা নেহাৎ অর্ব্বাচীনের মত কথা। কারণ, প্রথমতঃ মূর্খতার সহিত লাঠির Similia Similibus সম্বন্ধ নহে,; দ্বিতীয়তঃ, মূর্খতা সারাইবার জন্য লাঠির যে dose প্রয়োগ করা দরকার, তাহাকে বরং অ্যালোপ্যাথী বলিতে পার, কিন্তু হোমিওপ্যাথী ত কোনমতেই নহে। সুতরাং ও কথাটা এ প্রসঙ্গে নিতান্তই অগ্রাহ্য। তারপর, 'শঠে শাঠ্যম্'। ইহাতে হোমিওপ্যাথীর ধ্বনি থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত কারণে অর্থাৎ প্রয়োগমাত্রা বিবেচনা করিলে, ইহাকে হোমিওপ্যাথীর পক্ষ-সমর্থক বলা যায় না। যে যত বড় শঠ, তাহার সহিত যখন ততই অধিক মাত্রায় শাঠ্য না করিলে ভবের প্র্যাক্টিস্ চলে না, তখন ইহাকে কখনই হোমিওপ্যাথীর নির্দ্দেশক বলা যাইতে পারে না। তারপর ঐ 'বিষস্য বিষমৌষধম্'। অনেকের

মুখেই শুনি যে, উহাই আর্য্যদিগের হোমিওপ্যাথী-জ্ঞানের পরিচায়ক। কিন্তু নিঃসন্দেহে আমি এ কথা সমর্থন করিতে পারি না। কারণ, দুই বিষই যে এক জাতীয় অর্থাৎ যে বিষে রোগ, সেই বিষই যে ঔষধ, শ্লোকে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ নাই। এক বিষের ঔষধ বিষান্তর, ইহাও ত হইতে পারে। তাহা হইলে, হোমিওপ্যাথী হইল কৈ ?

"তাই বলিতেছি যে, ঐ সব শ্লোক দ্বারা আর্য্যদিগের হোমিওপ্যাথী জ্ঞান সুস্পষ্ট প্রমাণ করা যায় না। যাহা দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণ করা যায়, তাহা আমি অনেক গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছি। বলিতেছি, শুন;—একদা পুত্র বামদেবকে আশ্রমে রাখিয়া বশিষ্ঠ ঋষি দুইচারি দিনের জন্য স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। এই সময়ে একটী লোক কোন এক সামান্য পাপ-কার্য্যের জন্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা লইতে আসিলে, বামদেব তাহার কৃত কর্ম্মের আদ্যন্ত শুনিয়া ব্যবস্থা দিলেন যে, গঙ্গাস্নান করিয়া, তিনবার রামনাম জপ করিলেই হইবে। বশিষ্ঠের অনুপস্থিতি-কালে তাঁহার আশ্রমে ইহা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। কয়েকদিন পরে বশিষ্ঠ আশ্রমে ফিরিলেন এবং কথায় কথায় শুনিলেন, এক ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা লইয়া গিয়াছে। পাপের কথা শুনিলেন—তাহা সামান্য এবং প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যখন শুনিলেন, গঙ্গাস্নান করিয়া 'তিনবার' রামনাম জপ ! তখন বৃদ্ধ রোষকষায়িত লোচনে বামদেবকে বলিলেন—'পাষণ্ড করিয়াছিস্ কি ? এক বার রামনামে এমন কোটি কোটি পাপ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়, আর তুই কিনা তিনবার রামনাম জপিবার ব্যবস্থা দিলি ! এযে ভয়ঙ্কর heroic dose, বেটা অ্যালোপ্যাথ ! যা, তুই চণ্ডাল হইয়া থাকিবি।' বামদেব নিরুত্তর ; কেবল কম্পিত-স্বরে উদ্ধারের ব্যবস্থা চাহিলে, দয়ার্দ্র ঋষি বলিয়া দিলেন, যে রামনামের বেশী মাত্রা ব্যবহার করায় তোর এই দশা করিলাম, সেই রামের পদরেণু অর্থাৎ infinitesimal dose যখন তুই পাইবি, তখন তোর চণ্ডালত্ব ঘুচিবে। বস্তুত ঘটিয়াছিলও তাই—এই মহাপাপের ফলে বামদেব গুহক হইয়া heroic doseএর ফলভোগ করিতেছিলেন ; পরে রামের পদরেণু-লাভে তাঁহার চণ্ডালত্ব ঘুচে। ইহাই হইল আসল হোমিওপ্যাথ-ব্যবস্থা।"

সকলে রোমাঞ্চিত কলেবর ও উৎফুল্ল হৃদয় হইয়া ঘন ঘন তামাক সেবন করিতে লাগিল—গৃহ নিস্তব্ধ। পরে একটু সামলাইয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া বলিতে লাগিল, বৃকোদর বাবুর কি আশ্চর্য্য সূক্ষ্মদৃষ্টি ও গবেষণা ! রাত্রি হইয়াছে। সভা ভঙ্গ হইবে, এমন সময়ে রামধন বাবু গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বৃকোদর বাবুকে বলিলেন—"ভায়া, তোমাকে অনেকদিন থেকে বল্‌চি, আমেরিকা থেকে একটা এম-ডি—ফেম-ডি আনিয়ে নেও আর একখানা মোটর কর ; তোমার নাবার খাবার সময় থাকবে না। হোমিওপ্যাথীতে যার এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি তার কি আর প্র্যাক্‌টিসের ভাবনা !"

ইতি সকলে নিষ্ক্রান্ত।

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

ব্রজ-কাহিনী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমরা আজি কালি নানা-মন্দির-শোভিত যে স্থানকে বৃন্দাবন বলিয়া জানি, চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন সেখানে কোনরূপ মন্দিরাদি ছিল কি না সন্দেহ। লোকেরও বসতি অতি বিরল ছিল। সেইজন্যই চৈতন্যদেব মথুরার জনকোলাহল হইতে পলাইয়া আসিয়া বৃন্দাবনের পূর্ব্ব দিকে যমুনাতীরবর্ত্তী অক্রূরঘাটে অবস্থান করিতেন। এবং পশ্চিম দিকে নির্জ্জন একটি বৃহৎ তেঁতুল তলায় বসিয়া পূজা অর্চ্চনাদি করিতেন। তাঁহারা তখন যমুনা-বেষ্টিত পঞ্চক্রোশ পরিমিত ভূমিকে রাসমণ্ডল বলিয়া অবধারণ করিয়া

ছিলেন। বৃন্দাবনের পশ্চিম দিকে যমুনাতীরে কালীদহ, প্রস্কন্দন, দ্বাদশাদিত্য, কেশী এবং চীর নামে পাঁচটি ঘাট মাত্র ছিল। কেহ যেন সেগুলিকে পাথরে গাঁথা ঘাট মনে করিবেন না। ঘাটগুলি পরবর্ত্তী কালে বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দিকেই কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইত, সেগুলির নাম এখন বংশীবট, শৃঙ্গারবট অদ্বৈতবট। এতদ্ভিন্ন গোমাটীলা, আদিত্য-টীলা নামে কয়েকটি স্তূপ দেখিতে পাওয়া যাইত। বোধ হয় মামুদ গজনি মথুরা-মণ্ডলে যে সকল মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই ধ্বংসাবশেষ কালে মৃত্তিকা ও বন জঙ্গলে আবৃত হইয়া এইরূপ স্তূপ বা টীলায় পরিণত হইয়া থাকিবে।

চৈতন্যদেবের আদেশে রূপ ও সনাতন গোস্বামী লুপ্ততীর্থসকল উদ্ধার করিতে আসিয়া যে রূপ কৃচ্ছ্র-সাধন ও কঠোর ব্রত-পালন করিতেন তাহার এইরূপ বিবরণ 'চরিতামৃতে' আছে—

"অনিকেতন দুঁহে বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষতলে এক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটি চানা চাবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কন্থা ছিঁড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ কথা নর্ত্তন উল্লাস॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর কৃষ্ণ ভজন চারি দণ্ড শয়ন।
নাম সংকীর্ত্তন প্রেমে সেহো নহে কোন দিন॥
কভু ভক্তিরস শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য কথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন॥"

চৈতন্য চরিতামৃত, ২৯ পরিঃ, ১৯২পৃঃ মধ্যলীলা।

তাঁহারা অনেক বৎসর কোন দেব বিগ্রহ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় কিশোর বয়সে বৃন্দাবনে গিয়া প্রায় ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধনের নিকট রাধাকুণ্ডতীরে বাস করিয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে কখনও চৈতন্যদেবকে দেখেন নাই বটে, কিন্তু রূপ, রঘুনাথ দাস, লোকনাথ, গোপালভট্ট প্রভৃতি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্তগণের মুখে শুনিয়া এবং বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত" স্বরূপ দামোদর প্রভৃতির করচা গ্রন্থ পড়িয়া শেষ জীবনে "চরিতামৃত" গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমরা এইজন্যই তাঁহার গ্রন্থের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছি। তৎপরে শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ হইতে কতকটা বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। নরহরি নিজ গুরুমুখে শুনিয়া ও গোস্বামিগণের পুঁথি পড়িয়া 'ভক্তি-রত্নাকর' রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিকে বৈষ্ণব ইতিহাসের অফুরন্ত খনি বলিলেও চলে।

বৃন্দাবনে এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাতটি দেবালয় প্রধান,—গোবিন্দদেব, মদনমোহন, গোপীনাথ, রাধাদামোদর, রাধারমণ, গোকুলানন্দ ও শ্যামসুন্দর। চরিতামৃতে কেবল প্রথম তিনটির নাম আছে।

শ্রীরাধা সহ শ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধা সহ শ্রীগোবিন্দ চরণ॥
শ্রীরাধা সহ শ্রীল গোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর হয় গৌড়ীয়াগণ সাথ॥
(চৈঃ চ, অন্তঃ ২০ পঃ)

"ভক্তি-রত্নাকরে" অপর চারিটিরও উল্লেখ আছে। সুতরাং এ গুলিকেও প্রাচীন বলিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন 'হিত হরিবংশে'র রাধাবল্লভ, হরিদাস স্বামীর বাঁকে বিহারী, হরিরাম ব্যাসজীর যুগলকিশোর সুরদাসের মদনমোহন, থানেশ্বরী জগন্নাথের মনোমোহন প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণের ঠাকুরও আকবরের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী কোন গ্রন্থকার তাঁহাদের বড় একটা নাম করেন নাই। কেবল "ভক্তমাল" গ্রন্থে তাঁহাদের কয়েকজনের বিবরণ আছে। গোবিন্দদেবের ভূতপূর্ব্ব কামদারের মুখে শুনিয়াছি যে, ইংরাজ রাজত্বের শান্তিময় শাসনের পূর্ব্বে বৃন্দাবনে একশত বড় জোর দেড়শত ঠাকুরবাড়ী ছিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে মথুরামণ্ডল বৃটিশাধিকারে আসিবার পর হইতেই দেবালয়ের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে এবং তৎ-সঙ্গে বাসিন্দার সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে।

আমরা প্রথমে প্রাচীন, দেবালয়গুলির বিবরণ

দিব। পরে, ইংরাজ আমলে নির্ম্মিতগুলির পরিচয় দিব।

গোবিন্দদেব

মদনগোপাল বিগ্রহ প্রথমে আবিষ্কৃত হইলেও গোবিন্দদেব বৃন্দাবনের প্রধান দেবতা। সনাতন ও রূপ গোস্বামী ইঁহাদিগকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশ পরিচয় এইখানেই দিয়া রাখি।

কর্ণাট দেশের অধিপতি জগৎগুরু বিপ্ররাজ নামক ভারদ্বাজ গোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিপ্ররাজের পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের দুই পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর. হরিহর স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপেশ্বরকে তাঁহার রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলে তিনি সপরিবারে পৌরস্ত্যদেশের অন্তর্গত শেখর রাজ্যে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র পদ্মনাভ 'সুরতরঙ্গিণী তটনিবাস' কামনায়, বাঙ্গালা দেশে নবহট্ট (নৈহাটী) গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। বাকলা চন্দ্রদ্বীপে চণ্ডী-চরণ পরায়ণ দনুজমর্দ্দন রাজা (১৪১৮ হইতে ১৪২৭ খৃঃ অঃ) পদ্মনাভকে মহা-সমাদরে নৈহাটীতে থাকিবার জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পাঁচটি পুত্রের নাম পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্রের নাম কুমারদেব। ইনি অতি ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। জ্ঞাতিবিরোধভয়ে ইনি নৈহাটী ত্যাগ করিয়া প্রথমে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে পরে যশোহর ফতেয়াবাদ নামক স্থানে আসিয়া বাস করিলেন।

কুমারদেবের অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে সনাতন, রূপ ও বল্লভ নামক তিন জনের নাম আমরা জ্ঞাত আছি। বল্লভের পুত্র জীব-গোস্বামী রচিত 'বৈষ্ণবতোষিণী' হইতে উপরোক্ত বিবরণ পাইয়াছি। এতদ্ভিন্ন ইঁহাদের বংশীয় রাজেন্দ্র নামে অপর একজন যুবকের নাম গোবর্দ্ধন-ধামে শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি নাকি বৃন্দাবনে যাইয়া কিছুকাল রাধাকুণ্ড তীরে থাকিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল পড়িয়াছিলেন। একদিন রাধাকুণ্ড হইতে মথুরা যাইবার পথে গোবর্দ্ধনের নিকট তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়। রাজেন্দ্রের বিষয় আর কিছু জানা যায় না। গোবর্দ্ধনের নিকট তাঁহার সমাধি আছে। বল্লভের পুত্র জীবও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তাঁহার পর আর কাহারও নাম পাওয়া যায় নাই। এ প্রবন্ধে কেবল রূপগোস্বামীরই পরিচয় দিব। মদনমোহন প্রবন্ধে সনাতন ও রাধা-দামোদর প্রবন্ধে জীব গোস্বামীর জীবনী লিপিবদ্ধ করিব।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাইবার জন্য বহির্গত হইয়া ভ্রমক্রমে গৌড়সন্নিহিত রামকেলী নামক গ্রামে উপস্থিত হন। সেই সময়ে রূপ ও সনাতনের সহিত চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়। তাঁহারা তখন নবাব হুসেন সাহার কর্ম্মচারী। সেইজন্য গোপনে অর্দ্ধরাত্রে আসিয়া চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই সময়ে কথা হইল যে, চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবনে যাইবেন, তখন ইহাঁরাও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। ইহার কিছুদিন পরে রূপ গোস্বামী নিজ দবীরখাস (প্রধান উজীর) পদ ত্যাগ করিয়া গৌড় হইতে আপনার টাকাকড়ি লইয়া নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার অর্দ্ধেক সম্পত্তি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে দান করিলেন। 'এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে' অবশিষ্ট এক চৌঠি ধন 'দণ্ড বন্ধলাগি' সঞ্চয় করিয়া ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিলেন। সনাতনের জন্য দশ হাজার মুদ্রা গৌড়ে মুদি-ঘরে রাখিয়া গেলেন। দুই জন চরের মুখে শুনিলেন চৈতন্যদেব বনপথে বৃন্দাবন গিয়াছেন। তিনিও নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এদিকে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। প্রয়াগধামে উভয়ে সাক্ষাত হয়। চৈতন্যদেব ইঁহাকে নানা উপদেশ দিয়া বৃন্দাবন দর্শনে পাঠাইলেন। রূপ মথুরায় যাইয়া সুবুদ্ধি রায়ের সহিত বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া একমাস কাটাইলেন। রূপের সঙ্গে তৎকনিষ্ঠ বল্লভও ছিল। পরে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসিলেন।—বাঙ্গালা দেশে গঙ্গাতীরে

বল্লভের পরলোক প্রাপ্তি হইল। তিনি নিজ দেশে যাইয়া পারিবারিক সকল বিষয়ে যথোচিত বন্দোবস্ত সমাপ্ত করিলেন। তাহার পর পুরীধামে চৈতন্যদেবের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সেখানে ইনি যবন হরিদাসের বাসায় থাকিতেন। চৈতন্যদেব ইঁহাকে রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি নিজ পার্ষদগণের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। রূপ সুকবি ছিলেন। "বিদগ্ধ মাধব" ও "ললিত মাধব" নামে দুইখানি রাধা-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাটক রচনা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদ-গণকে তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁহারা ইঁহার কবিত্বশক্তির অশেষ প্রশংসা করিলেন। রূপ প্রায় এক বৎসর পুরীধামে ছিলেন। ইহার পর ইনি বৃন্দাবনে যাইয়া শেষ জীবন তথায় কাটাইয়াছিলেন।

ইনিই গোবিন্দদেব আবিষ্কার করেন। সেই বৃত্তান্তটি ব্রজস্থ হরিদাস গোস্বামীর শিষ্য শ্রীরাধাস্বামী গোস্বামীকৃত "সাধন দীপিকা" গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

শ্রীরূপ গোস্বামী, প্রভুর আজ্ঞা পালনার্থ বৃন্দাবনে গৃহে গৃহে, বনে বনে, কোথাও কিছু সন্ধান করিতে না পারিয়া, একদা অতি বিষণ্ণ বদনে যমুনাতটে বৃক্ষতলে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছিলেন। এমন সময়ে একজন পরম সুন্দর ব্রজবাসী আসিয়া তাঁহাকে স্নেহভরে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপ তাঁহাকে সকল কথাই বলিলেন। আগন্তুক তাঁহাকে গোমাটীলা সমীপে লইয়া গেলেন ও বলিলেন, "এই স্থানে একটি গাভীশ্রেষ্ঠ আসিয়া পূর্ব্বাহ্নে দুগ্ধস্রাব করিয়া থাকে, তুমি, যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিতে পার।" তাঁহার কথা শুনিয়া ও মধুর মূর্তি দেখিয়া রূপ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যখন চেতনা পাইলেন তখন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি ব্রজবাসিগণকে ডাকিয়া বলিলেন, শ্রীগোবিন্দদেব এইখানেই আছেন। তাহার পর বালক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া সেইস্থান খনন করিয়া যোগপীঠ মধ্যগত 'কোটী মন্মথমোহন' গোবিন্দদেবের বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। আমরা 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ হইতে এই-রূপ বিবরণ প্রাপ্ত হই। তৎপরে—

শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকট হইতে।
উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারিভিতে॥
গোবিন্দ প্রকট মাত্রে শ্রীরূপ গোঁসাই।
ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইল মহাপ্রভু ঠাঁই॥

(ভক্তিরত্নাকর, ২য় তরঙ্গ, ৯১ পৃঃ)

চৈতন্যদেবও পত্র পড়িয়া পরম আনন্দিত হইলেন। এবং কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী নামক আপন পার্ষদ সমভিব্যাহারে একটি 'নিজ স্বরূপ বিগ্রহ' (নিজের প্রতি-মূর্ত্তি) বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। রূপ গোস্বামীও চৈতন্যদেবের সেই মূর্ত্তিটি লইয়া মহা ভক্তিভরে গোবিন্দদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে সংস্থাপিত করিলেন।

"ভক্তিরত্নাকরে" এই বিবরণটি কত দূর সত্য বলিতে পারি না। কেন না, গোপালভট্টের প্রতিষ্ঠিত রাধারমণ ঠাকুরের পূজারী বংশীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 'সেবা প্রাকট্য ও সিদ্ধিলাভের দিননির্ণয়', নামক একখানি অতি প্রাচীন সূচক গ্রন্থ আছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, সম্বৎ ১৫৯০ (১৫৩৩ খৃঃ অঃ) মাঘ মাসে সনাতন গোস্বামী মহাবনের পরশুরাম চৌবের বাটী হইতে মদনগোপাল বিগ্রহ লইয়া আসেন। ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৯২ সম্বতে (১৫৩৫ খৃঃ অঃ) মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে গোবিন্দদেবের অভিষেক হয়। এই গ্রন্থেই আছে যে, চৈতন্যদেব ১৫৯০ সম্বৎ (১৫৩৩ খৃঃ অঃ) (জয়ানন্দমতে আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে) অপ্রকট হন। কাজেই বলিতে হইবে যে, চৈতন্যদেব গোবিন্দদেবের আবিষ্কার দেখিয়া যান নাই। মদনগোপাল দেবের আনয়নের সাত মাস পূর্ব্বেই তাঁহার তিরোধান ঘটিয়াছিল। ইহার দুই বৎসর পরে যদি গোবিন্দদেবের আবিষ্কার হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার দেখা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সেই জন্যই বোধ হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় গোবিন্দ মদন-গোপাল প্রভৃতি আবিষ্কারের কোন রূপ বিবরণ চরিতা-

মৃত্তে' দেন নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি বৃন্দাবনে কেবল কৃষ্ণমূর্ত্তিগুলিই পাওয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন রাধামূর্ত্তি আবিষ্কারের কথা শুনা যায় না। পুরীধামে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে চক্রবেড় নামক স্থানে লক্ষ্মী নামে একটি মূর্ত্তি পূজিত হইতেন। গোবিন্দ-দেব আবিষ্কার হইলে পর যখন—

বৃন্দাবন গমনের সময় হইল।
তৈত্রি পুরুষোত্তম জানায় জানাইল॥
স্বপ্নাদেশে রাজপুত্র পরম যতনে।
বহুলোক সঙ্গে পাঠাইল বৃন্দাবনে॥
শ্রীরাধিকা ক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবনে গেলা।
গৌড় উৎকলাদি দেশে সকলে জানিলা॥
যে দিবস বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল।
সে দিবস সুখের সমুদ্র উথলিল॥
গোবিন্দের বামে বসাইলা সিংহাসনে।
হইল অদ্ভুত রঙ্গ দোঁহার মিলনে॥
ঐছে ঠাকুরাণীর হইল আগমন।
এ সকল বর্ণিলেন পূর্ব্ব কবিগণ॥
সাধনদীপিকাদিক গ্রন্থে এ বিস্তার।
এ সব যে শুনে প্রেম ভক্তি লভ্য তার॥
(ভক্তিরত্নাকর; ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৬১ পৃঃ)

এইরূপ রাধিকা-প্রেরণ শ্রীচৈতন্য-দেবের তিরোধানের ও গোবিন্দদেবের আবিষ্কারের অনেক বৎসর পরেই ঘটিয়া থাকিবে। কারণ এই প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের নাম উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি না।* আমরা অনেক অনুসন্ধানেও শ্রীরাধাস্বামী গোস্বামী বিরচিত "সাধন দীপিকা" গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই। বৃন্দাবনের অনেকেই ইঁহার নামও শুনেন নাই। সে সময়ে গোবিন্দ—গোস্বামীনাথ—ও মদনমোহনের—

সদা নহে এ তিনের যুগল দর্শন।
একাদশী পূর্ণিমামাবস্থায় নিয়ম॥
সে সময়ে সিংহাসনে বৈসে একত্রেতে।
সে সময়ে যে শোভা উপমা নাই দিতে॥
(ভক্তিরত্নাকর ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৪০৮ পৃ)

তখন এই নিয়ম ছিল—এখন প্রতিদিন যুগলদর্শন হয়। আমরা বৃন্দাবনে শুনিয়া আসিয়াছি যে, এই রাধিকা আগমন উপলক্ষে রূপ গোস্বামী "চাটু পুষ্পাঞ্জলি" নামক রাধিকা স্তোত্র রচনা করেন।

এবার আমরা মন্দিরের কথা বলিব। মথুরা হইতে যে প্রশস্ত রাজপথ বৃন্দাবনে আসিয়াছে, তাহার পশ্চিম পার্শ্বেই গোমাটিলা নামক আন্দাজ ২০ ফুট উচ্চ স্তূপের উপর গোবিন্দদেবের মন্দিরাদি স্থাপিত। গড়ানিয়া পথ দিয়া উপর উঠিতে হয়। সম্মুখেই মানসিংহ নির্ম্মিত পুরাতন মন্দির, বড় বড় লাল জয়পুরী পাথরে নির্ম্মিত, অতি সুচারু কারুকার্য্য-শোভিত। কোথাও এক খানিও কাঠের কড়ি বা বড়গা নাই, সমস্তটাই পাথরে রচিত। মন্দিরটা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দীর্ঘ। এখন কেবল জগ-মোহন ও নাটমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। আরঙ্গজেব ইহার মূল মন্দির ও উপরের পাঁচটি চূড়া একেবারেই ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। জগমোহনের উত্তর ও দক্ষিণ-দিকে দুইটা ছোট মন্দির আছে। পূর্ব্বে যেখানে মূল মন্দির ছিল, তাহার কিয়দংশে একটা ইঁটে গাঁথা ঘর তৈয়ারী হইয়াছে। তাহার ভিতর চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি এবং তৎসঙ্গে গিরিধারী কৃষ্ণমূর্ত্তি ও 'সওয়া মণ শালগ্রাম' রহিয়াছেন। ম্লেচ্ছে মন্দির অপবিত্র করিয়াছিল বলিয়া—এখানে আর গোবিন্দ দেবের স্থাপনা হয় নাই। আরঙ্গজেবের এই মন্দির ভাঙ্গিবার কারণ এই যে, তিনি আগ্রার কোন সুদূর প্রাসাদ হইতে এই মন্দিরের চূড়ার উপর আলোক-শোভা দেখিতে পান। জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন যে, আলোকটা কোন হিন্দু-মন্দিরের উপর হইতে আসিতেছে, তখন তাঁহার প্রাণে হিন্দুধর্ম্মের এই উন্নতি লক্ষণ সহ্য হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার জনৈক ফৌজদার বা সেনাপতি আবদুল নবিকে মথুরা বৃন্দাবন ধ্বংস করিতে পাঠাইলেন। সেনা আসিবার পূর্ব্বেই কয়েকজন হিন্দুরাজ-প্রেরিত চর আসিয়া এই দুঃসংবাদ বৃন্দাবনের পুরোহিত ও গোস্বামীদিগকে জানাইল। তখন তাঁহারা ভয়-ব্যাকুলিত প্রাণে স্ব স্ব

* কেবল পুরী ধামে রাজা প্রতাপ রুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানায় মাত্র নাম আছে।

অভীষ্টদেবকে লইয়া বনপথে পলায়ন করিলেন। পরে সেনারা আসিয়া শূন্য মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া গেল। ব্রজবাসীরা এইরূপ বিবরণ দিয়া থাকেন। আরঙ্গজেবের এইরূপ উপদ্রবটা মথুরাতেই অধিকতর রূপে হইয়াছিল। ইহার নিগূঢ় কারণ ও বিপ্লব বৃত্তান্ত আমরা মথুরা প্রবন্ধে দিব। গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, মদনমোহন প্রভৃতি দেববিগ্রহগুলি জয়পুরের রাজাশ্রয়ে নীত হইয়াছেন।—সেখানে তাঁহাদের রাজসেবা চলিতেছে।

দেবদ্বেষী আরঙ্গজেব মূল-মন্দির ও ইহার পঞ্চচূড়া ভাঙ্গিয়া ক্ষান্ত হন নাই। নাট মন্দিরের ছাদের উপর দরগার আকারে প্রাচীর গাঁথিয়া ইহাকে মস্‌জিদে পরিণত করিয়া স্বয়ং আসিয়া এখানে নামাজ করিয়া গিয়াছিলেন। গ্রাউস সাহেব মন্দির সংস্কার কালে সে প্রাচীরটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

জগমোহনের দ্বারের তিন দিকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার নানামূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। নাটমন্দিরের বারান্দার উপরও স্থানে স্থানে ঘাগরা শোভিত নারী মূর্ত্তিগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সে সকলগুলি আরঙ্গজেবের আদেশে মুণ্ডহীন করা হইয়াছে। এই নাট-মন্দিরে বসিয়া রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—

রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন॥
অশ্রু কম্প গদ গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র রোধ করে বাষ্প না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য যবে পড়ে মনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে॥
(চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা, ১৩ পৃঃ)

এই নাটমন্দিরটি দোতালা, উপরে তিন দিকে থিয়েটারের ড্রেস-সার্কেলের মত মহিলাগণের বসিবার জন্য বারান্দা বাহির করা। কত রাজপুতমহিলা, সম্ভবতঃ জয়পুরের রাজমহিষীরা পর্য্যন্ত, এই বারান্দায় বসিয়া কবি জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী অথবা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও অপরাপর বৈষ্ণব কবি-গণের ভাষা-ভাব-মধুরা অমৃতনিস্যন্দিনী, রাধা-শ্যাম-লীলা-কাহিনী, ভক্তি গদ্ গদ প্রাণে শ্রবণ করিতেন।

গোবিন্দদেবের যখন আরতি হইত, তখন মানসিংহ প্রমুখ বীরবৃন্দেরা করযোড়ে মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া প্রেম-পুলকিত প্রাণে একাগ্রমনে তাহা দর্শন করিতেন ও তদবসানে ভক্তি-বিগলিত-চিত্তে এই নাট-মন্দির তলে লুণ্ঠিত হইতেন। হায়রে, সেদিন কোথায় গিয়াছে!

প্রাচীরের ভিতর দিয়া বারান্দা ও ছাদের উপর পর্য্যন্ত যাইবার গুপ্ত সিঁড়ি আছে। নাটমন্দিরের বাহির দিকেও সুন্দর কারুকার্য্য করা বারান্দা আছে, তথা হইতে বৃন্দাবনের বিমুক্ত শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের চারিদিকে বিস্তৃত ভূমি বেষ্টন করিয়া ছোট ইটে গাঁথা ১৫।১৬ ফুট উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীর বেষ্টিত স্থানকে গোবিন্দদেবের ঘেরা বলে। স্থানে স্থানে কয়েকটা ফটক ছিল। এখন দক্ষিণ দিকে লাল পাথরে গাঁথা ২টা পুরাতন ছত্রী মণ্ডিত নহবৎখানা অতীত কালের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব্বকালে প্রাচীরান্তর্গত প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে হয়ত পুষ্পোদ্যান ছিল। এখন তথায় অনেক বাড়ীঘর তৈয়ারি হইয়াছে। জগ-মোহনের দুই দিকে যে দুটা ছোট ছোট মন্দির আছে, তাহার দক্ষিণ দিকের মন্দিরটির ভিতর 'যোগপীঠ'। সিঁড়ি দিয়া ১২।১৩ ধাপ নামিয়া গেলে একটা সংকীর্ণ অন্ধকার স্থানে যাওয়া যায়। সেখানে দীপালোকে একখানি পাথরের উপর একটি অষ্টভুজা সিংহবাহিনী নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। চরণ চিহ্নও আছে। * ইনি নন্দ দুহিতা যোগমায়া দেবী। উত্তর দিকে যে ছোট মন্দিরটা আছে সেটিতে বৃন্দাদেবী স্থাপিতা ছিলেন। ব্রহ্মকুণ্ড হইতে রূপ গোস্বামী দেবীকে পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এখন বৃন্দাদেবী কাম্যবনে স্থানান্তরিতা হইয়াছেন। শূন্য মন্দিরের ভিতরে আজ কাল ঘুঁটিয়া, কাঠ, কয়লা প্রভৃতি রাখিবার গুদাম হইয়াছে। কি চমৎকার পরিবর্ত্তন!

এই ছোট মন্দিরটার উত্তর দিকের ভিত্তিগাত্রে

হিন্দী বা নাগরী অক্ষরে নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত আছে।

"সংবৎ ৩৪ শ্রীশকবন্ধ আকবর সাহা রাজশ্রী কর্ম্মকুল শ্রীপৃথ্বীরাজাধিরাজবংশ মহারাজ শ্রীভগবন্তদাসসুত শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমানসিংহদেব শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠ* অস্থান মন্দির বনাও শ্রীগোবিন্দদেব কো কাম উপরি শ্রীকল্যাণ দাস আজ্ঞাকারী মাণিকচাঁদ চোঁপাও শিল্পকারি গোবিন্দ দাস দিলবলী কারিগর। দঃ গণেশ দাস বিয়বল।"

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, আকবর বাদশাহের ৩৪ রাজ্যাব্দে (১৫৯০ খৃঃ অঃ) পৃথ্বীরাজাধিরাজ বংশীয় শ্রীভগবন্তদাস-পুত্র শ্রীমানসিংহদেব কর্ত্তৃক এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। এবং নির্ম্মাণ কার্য্যে কল্যাণদাস-আজ্ঞাকারী সর্দ্দার মিস্ত্রী মানিকচাঁদ চোঁপাও শিল্পকারী বা ভাস্কর ছিলেন। দিল্লীবাসী গোবিন্দদাস কারীগর বা রাজ-মিস্ত্রী নিযুক্ত ছিল। গণেশ দাস বীয়ল বোধ হয় মন্দিরের তত্ত্বাবধারক রাজকর্ম্মচারী হইবেন। তাই বোধ হয় তাঁহার দঃ অর্থাৎ দস্তখতের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং গোবিন্দদেবের আবিষ্কারের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে এই মন্দির নির্ম্মাণ হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যাইতেছে। এই মন্দির নির্ম্মাণ সময়ের বিষয়ে আমার একটু খটকা লাগে। যদি এই মন্দির ১৫৯০ খৃঃ অঃ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে "শাকে সিন্ধগ্নি বাণেন্দৌ" (১৫৩০ শকে বা ১৬১৫ খৃঃ অঃ) লিখিত চরিতামৃতে তাহার উল্লেখ নাই কেন? কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের গ্রন্থে গোবিন্দদেবের মন্দির সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখিত আছে যে, রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী—

নিজ্য শিষ্যে কহি গোবিন্দ মন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডল আদি ভূষণ করি দিল॥
(চৈঃ চঃ, অঃ লীঃ, ১৩ পৃঃ)

* এই যোগ পীঠেই নাকি গোবিন্দদেব আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন। তাহার গর্ত্ত আজিও আছে।

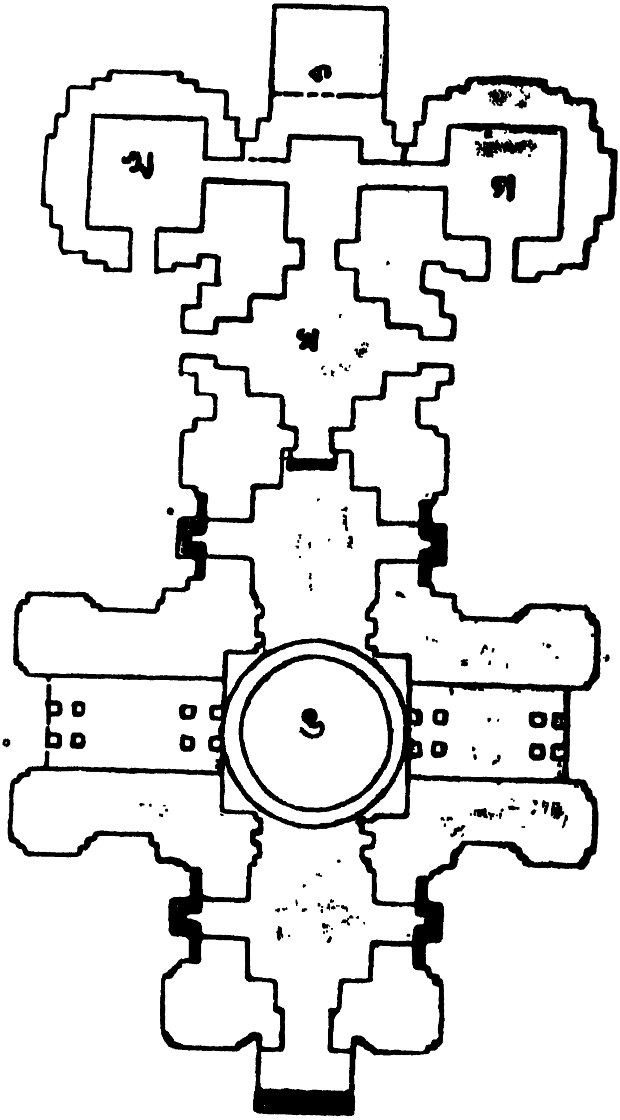
রঘুনাথ ভট্টের এই শিষ্য কে? তিনিই কি মানসিংহ? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কবিরাজ মহাশয় কোথাও একটিবারও মহারাজ মানসিংহের নাম করেন নাই। পরবর্ত্তী কোন বাঙ্গালী গ্রন্থকারেরাও কেহ তাঁহার নাম মুখে আনেন নাই। মানসিংহ বহুলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই মন্দির করিয়া দিয়াছিলেন, এবং ঠাকুর সেবারও বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তথাপি গৌড়ীয় কোন লেখকই তাঁহার নাম করিলেন না কেন? আমরা এ প্রহেলিকার অর্থ বুঝিতে সক্ষম নহি।

রাজা প্রতাপসিংহ রচিত লক্ষ্ণৌনগরে মুদ্রিত "ভক্ত-কল্পদ্রুম" নামক একখানি হিন্দী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আকবর বাদশাহ যখন আগরায় কেল্লা নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন তখন জয়পুরী লাল পাথর আর কাহারও পাইবার হুকুম ছিল না। মানসিংহের অনুরোধে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্ম্মাণ জন্য বাদশাহ বিনা মূল্যে তাঁহাকে লাল পাথর দিয়াছিলেন। কেবল মসলা ও কারিগরদিগের বেতন জন্য মানসিংহের তের লক্ষ টাকা ব্যয় পড়ে, পাথরের দাম কিছুই লাগে নাই।

আরঙ্গজেবের উপদ্রবের পর বহুকাল, পর্য্যন্ত এ মন্দিরটী ভগ্নাবস্থায় পতিত ছিল। এদেশের অনেক রাজারা বৃন্দাবনে নিজ নিজ নাম জাহির করিবার জন্য বিপুল বিত্তব্যয়ে অনেকগুলি মন্দির তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কেহই অতুল ভাস্কর্য্য কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ এই সুন্দর মন্দিরটি সংস্কার করিবার উদ্‌যোগ করেন নাই। দুঃখের কথা বলিতে কি, অবশেষে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মথুরার কালেক্টার গ্রাউস সাহেব এই মন্দিরটির জীর্ণসংস্কার করিয়া দিলেন। এ মন্দিরটি মেরামত করিতে প্রায় আটাশ হাজার টাকা ব্যয় হয়। জয়পুরের রাজারা কেবল পাঁচহাজার টাকা দিয়াছিলেন, বাকী গবর্ণমেণ্ট সরবরাহ করিয়াছেন।

মুসলমান রাজগণ মন্দির চূর্ণ করিয়া বাহাদুরী দেখাইতেন। সুসভ্য বৃটিশরাজ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও গয়া, কাশী, বৃন্দাবন কত স্থানেই না প্রাচীন স্থাপত্য

কীর্ত্তির সংস্কার করিয়া দিতেছেন। এরূপ মহানুভবতা অন্য কোন রাজার আমলে দেখা দূরে থাক, শুনাও যায় না। এই মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ১৬৯৩ সংবৎ (১৬৬৩ খৃঃ অঃ) সাজাহান বাদশাহের রাজত্বকালে রাণা অমর সিংহের পুত্র রাণা ভীমসিংহের রাণী রম্ভাবতী দেবী একটি চারিস্তম্ভ শোভিত সুন্দর ছত্রী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। গ্রাউস সাহেব সেটিকে সারাইয়া পশ্চিম দিকে যে স্থানে মূল মন্দির ছিল সেই স্থানে বসাইয়া দিয়াছেন। স্তম্ভগাত্রে রাণীর নাম লেখা রহিয়াছে। ইহার ভিতর যুগল-চরণচিহ্ন স্থাপিত করিয়া পূর্ব্বস্মৃতি কথঞ্চিৎ রক্ষা করা হইয়াছে। এবং ভাঙ্গা স্থানের বৈসাদৃশ্য কতকটা ঢাকা পড়িয়াছে। এ মন্দিরটির কারুকার্য্য ও গঠনের এত সামঞ্জস্য যে, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দূরদেশ হইতে পর্য্যটকেরা ইহা দেখিতে আইসেন। ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি দেশের মুদ্রিত গ্রন্থে, ভারতীয় ভাস্কর্য্যের আদর্শরূপে এই মন্দিরের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। ভিত্তি বিন্যাসটি (Ground plan) ক্রসের (Cross)



মানসিংহ নির্ম্মিত গোবিন্দদেবের মন্দিরের
ভিত্তি-বিন্যাস

ক—স্তূপ মন্দির এখানে ছিল, এখন রম্ভাবতী রাণীর ছত্রী মধ্যে চরণ-চিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে।
খ— যোগ-পীঠ।
গ— বৃন্দাদেবীর মন্দির।
ঘ— জগ মোহন।
ঙ— নাট মন্দির।

পূর্ব্বে এই পাঁচ স্থানে পাঁচটি চূড়া ছিল।

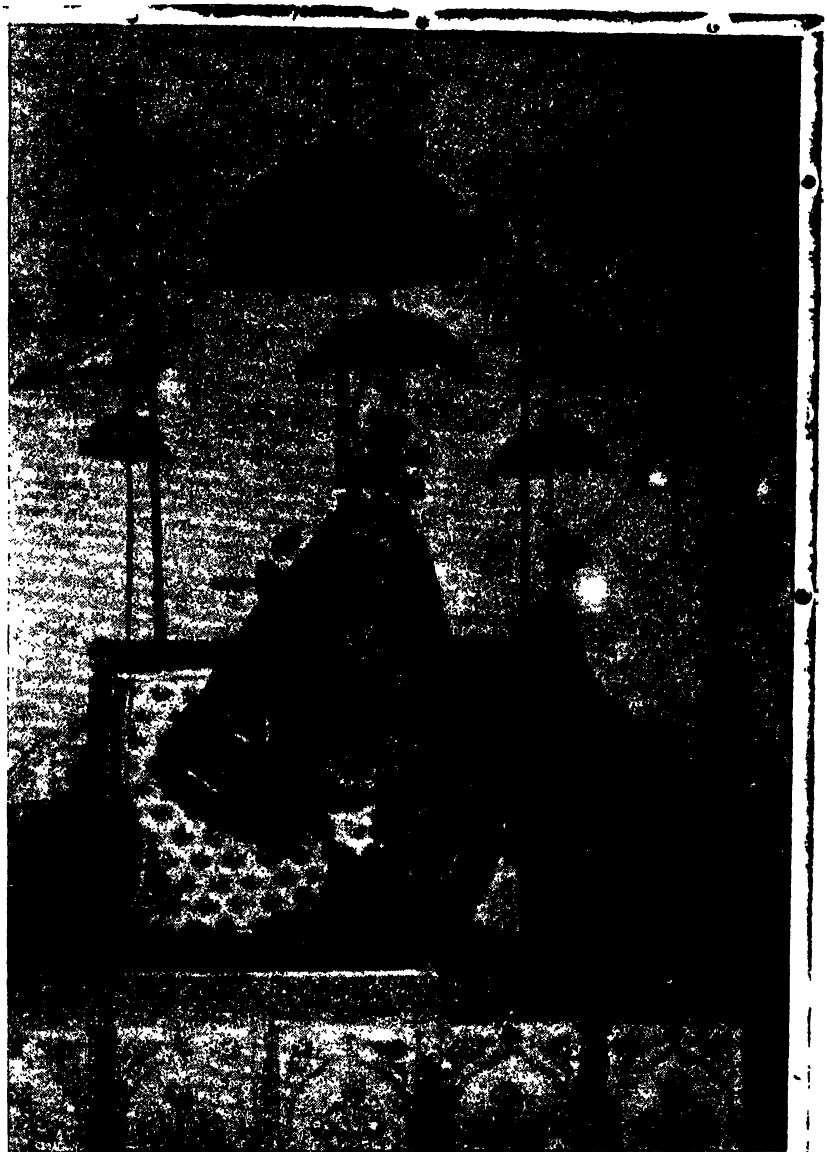
আকারে দেখিয়া তাঁহারা মনে করেন যে, আকবর বাদশাহের সভায় যে সকল খৃষ্টীয়ান জেসুইট্ পাদরীরা আসিত, তাহাদের পরামর্শে বুঝি এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। কেন না, ইউরোপের কতকগুলি::গির্জ্জার ভিত্তি বিন্যাস এই ধরণের ; ইহা তাঁহাদের অনুমান মাত্র। পুরাণ মন্দিরের দক্ষিণে একটু নিম্নভূমিতে, লাল পাথরে গাঁথা একটি ছোট ঘর আছে। পরবর্ত্তীকালে তাহার সহিত আরও ২।১টা ইঁটে গাঁথা ছোট কুটুরী যোজিত হইয়াছিল। আমাদের ব্রজবাসী পেয়ারী লাল টেঁটী-ওয়ালা মহাশয় (এই মন্দিরের সম্মুখে ঘেরার মধ্যে তাঁহার বাটী) সেটিকে রূপ গোস্বামীর বৈঠক বলিয়া পরিচয় দিলেন। সেগুলা এত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে কবে ভূমিসাৎ হয় স্থিরতা নাই!

গোবিন্দজীর নূতন মন্দির।

আরঙ্গজেবের উপদ্রবে গোবিন্দজী প্রভৃতি বিগ্রহগুলি জয়পুরাদিস্থানে প্রেরিত হইলে পর পুনরায় কোন্ সময় এবং কাহা কর্ত্তৃক নূতন প্রতিনিধি ঠাকুর গড়াইয়া বৃন্দাবনে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বহু অনুসন্ধান করিয়াও প্রথমে জানিতে পারি নাই। অবশেষে পূর্ব্বোক্ত 'ভক্তকল্পদ্রুম' গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিলাম যে, দিল্লীপতি মহম্মদ সাহের সময়ে (১৭১৯ হইতে ১৭৪৯ খৃঃ অঃ মধ্যে) দ্বিতীয়বার গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পুরাতন মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে যে নূতন মন্দিরে গোবিন্দজী অধুনা বিরাজ করিতেছেন, সে মন্দিরটি ২৪ পরগনার অন্তর্গত জয়-নগর মজিলপুর গ্রামের সন্নিহিত বহড়ূ বা বড়ুগ্রাম-নিবাসী জমিদার ৺নন্দকুমার বসু মহাশয় ১৮১৯ খৃঃ অঃ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। নন্দকুমার বাবুর বংশধর-গণের মুখে শুনিতে পাই যে, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে হিজলীতে নিমকীর দেওয়ান ছিলেন। রাজকার্য্য ও তৎসঙ্গে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তাঁহাকে জয়পুর, মথুরা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইয়াছিল। তিনি জয়পুরের কোন রাণীর নিকট হইতে প্রত্যুপকার স্বরূপ কয়েক লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। নন্দবাবু পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সেই টাকা পাইয়া তিনি বৃন্দাবন ধামে গোবিন্দ গোপীনাথ ও মদন-মোহনজীর ৩টি ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অধুনা সেই সকল মন্দিরে উক্ত দেবতা-গণের সেবা চলিতেছে।

এ মন্দিরগুলি দেখিতে বাঙ্গালা দেশের চণ্ডীমণ্ডপ বা ঠাকুর দালানের মত। উপরে চূড়া প্রভৃতি কিছুই নাই। দালানের সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। উঠানের উত্তর-পূর্ব্বদিকে দরজা দিয়া একটি মহলে যাওয়া যায়। সেটি মানসিংহের সময়ের রসুই ও ভাণ্ডার মহল। লম্বা লম্বা ঘরগুলির ছাদে কড়ি নাই, খিলান গাঁথা। যতদিন নন্দকুমার বাবুর মন্দির হয় নাই, ১৫০ শত বৎসর এই মহলেই গোবিন্দদেব স্থাপিত ছিলেন। এখন এ সকল গৃহে ভাণ্ডার ও কর্ম্মচারিগণের আবাস হইয়াছে। ইহার পশ্চিমেই নূতন রন্ধনশালা। এ সকল মহলে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ইহারও পশ্চিম দিকে গরু ঘোড়া প্রভৃতি থাকিবার (নাহার বাড়ী) নামক স্থানটাও প্রাচীন কালের নির্ম্মিত।

বাহির দিকের স্বতন্ত্র পথ দিয়া এ মহলে যাইতে হয়। নন্দকুমার বাবু যে নূতন মন্দির করিয়া দিয়া-ছেন, আজকাল নানা দেশীয় ভক্তগণের ব্যয়ে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাড়িয়া গিয়াছে। দালান ও উঠান মার্ব্বেল পাথরে মণ্ডিত হইতেছে। কিছু টাকা দিলেই যাত্রীগণ তাহার উপর নিজ নাম ঠিকানা প্রভৃতি লিখাইয়া দিতে পারেন। মন্দিরের দ্বারগুলিও তাঁহাদের অর্থে রূপার পাতে শোভিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে বেদী বা সিংহাসনের উপর প্রায় ১॥ হাত উচ্চ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত ত্রিভঙ্গ মুরলীধর গোবিন্দদেবের মূর্ত্তিটি নানা-লঙ্কারে ভূষিত। বামে অষ্টধাতু নির্ম্মিতা রাধিকা দেবী ও শালগ্রাম শিলা। এই বেদীর উপরেই একটু দক্ষিণ দিকে সুন্দরানন্দ গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত রাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তির নাম 'চিকনিয়া'। তৎপার্শ্বে স্বতন্ত্র আসনে নিতাই চৈতন্য



যবনবিপ্লব সময়ে বৃন্দাবন হইতে জয়পুরে নীত আদি গোবিন্দজী-মূর্ত্তি

বিগ্রহও স্থাপিত রহিয়াছেন। এখানে অহোরাত্রে পাঁচ বার ভোগ ও সাত বার আরতি হয়। যে মূর্ত্তিটি গোস্বামী প্রভুরা গোবিন্দদেবের প্রতিভূস্বরূপ স্থাপন করিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, সেটি ইংরাজী ১৯১১ সালে চৈত্র মাসে ভাঙ্গিয়া যায়। পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসে অপর একটি নূতন বিগ্রহ প্রস্তুত হইয়াছে। এখন তাঁহারই পূজা চলিতেছে। এই নূতন মন্দিরের প্রবেশদ্বার পার্শ্বে, পুরাতন মন্দিরের একটি ভগ্ন বলদকে একখান চৌকির ভিতর বসাইয়া বলদেব নামে পরিচয় দিয়া অজ্ঞ যাত্রীগণের নিকট হইতে পয়সা আদায় করা হইয়া থাকে। প্রধান মন্দির দ্বারেই এ ছলনা ও প্রবঞ্চনা অতীব লজ্জাকর।

বৃন্দাবনে যে ৭টি প্রধান গৌড়ীয় দেবালয় আছে, তাহার সেবাইত বা পূজারিগণ সকলেই বাঙ্গালী। গোবিন্দজীর পূজারীরা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ওকড়সা গ্রামের ভট্টাচার্য্য বংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। জয়পুরে যে ঠাকুরটি আছেন, সেখানেও ইঁহারা সেবাইত। করৌলী ও বৃন্দাবনে গোপীনাথ ও মদনমোহনের সেবাইতগণ বাঁকুড়া জেলার গঙ্গা গ্রামের ভট্টাচার্য্য বংশীয় সন্তান। ইঁহাদের এখন গোস্বামী পদবী। যাঁহারা জয়পুর ও করৌলিতে সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের ভাষা ও পরিচ্ছদ দেখিয়া সহজে বাঙ্গালী বলিয়া বুঝা যায় না।

গোবিন্দ গোপীনাথ প্রভৃতি দেবগণকে প্রথম দর্শন করিতে গেলে তথায় ভেট বা প্রণামী দিতে হয়। যাঁহারা ৫৲ পাঁচ টাকা বা তদূর্দ্ধ ভেট দেন, তাঁহাদের মস্তকে জড়ির পাড় বসান প্রসাদী লাল বস্ত্রের শিরোপা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ২৷৷০ আড়াই টাকা বা অধিক যাঁহারা ভেট দেন তাঁহাদের মাথায় ও লাল বস্ত্র দেওয়া হয় তাহাতে জরি থাকে না। ইঁহাদের নাম 'লাল যাত্রী।' ২৷৷০ আড়াই টাকার কম যাঁহারা ভেট দেন, তাঁহাদের শিরোপা নাই, কেবল লাড়ু প্রসাদ পাইয়া থাকেন। ভেটের টাকাতেই দেবসেবা ও মন্দিরের অপরাপর ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। গোবিন্দজী বৃন্দাবনে প্রধান বিগ্রহ। ভেট ছাড়া ভূসম্পত্তি হইতে আরও অনেক টাকা আয় আছে। আমরা পরিশিষ্টে উৎসব ও পর্ব্বাদির বিবরণ দিব।

বৃন্দাবনে ফাল্গুন মাসে 'হোলি', শ্রাবণ মাসে 'ঝুলন', কার্ত্তিক মাসে শরতের 'রাস' ও 'অন্নকূট' পর্ব্বোপলক্ষে মহোৎসব হয়। সে সময়ে ভারতের নানাদেশ হইতে অসংখ্য যাত্রীদল আইসেন। তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় বার আনা।

রূপ গোস্বামী বৃদ্ধ বয়সে মাঝে মাঝে রাধাকুণ্ড তীরে আসিয়া রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির সহিত একত্রে থাকিয়া কাব্যামোদে কাল কাটাইতেন। বৃন্দাবনে অবস্থান কালে গোবিন্দজীর সেবা করিতেন। তিনি ১৬ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। *

তিনি যখন কবিতা রচনা করিতে বসিতেন, তখন একেবারেই ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন। তখন বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। একবার একজন 'বিশিষ্ট বৈষ্ণব' আসিয়া তাঁহাকে শূন্য দৃষ্টিতে হাসিতে দেখিয়া আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া ফিরিয়া চলিয়া যান। পরে এই বিবরণ রূপ গোস্বামী জানিতে পারিয়া করযোড়ে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। রূপ গোস্বামী একাধারে বিচক্ষণ রাজ কর্ম্মচারী, সুপণ্ডিত স্বভাব কবি ও প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য বলেন, "শ্রীরূপের হস্তাক্ষর মুকুতার পাঁতি"। তিনি রন্ধন বিষয়ে দক্ষতা দেখাইয়া সনাতন ও অপরাপর বৈষ্ণবগণকে পায়স সেবন করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ভাস্কর-কার্য্যে সুপটু ছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে ৪র্থ তরঙ্গে ১৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, তিনি রাধা দামোদর বিগ্রহটিকে 'স্বহস্তে নির্ম্মাণ' করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীকে পূজা করিবার জন্য দিয়াছিলেন। এত গুণ না থাকিলে কি তিনি অম্বরপতি মানসিংহকে দিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া লইতে পারিতেন ?

"বিশ্বকোষ" অভিধান গ্রন্থে দেখিতে পাই, ইঁহার পূর্ব্ব নাম 'সন্তোষ' ছিল। জন্ম ১৪৮৯ খৃঃ অঃ, মৃত্যু ১৫৬৩ খৃঃ অঃ। রাধা দামোদরের মন্দিরের উত্তর দিকে একটি সুবৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষ তলে ইঁহার সমাধি আছে। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে তাঁহার তিরোধান মহোৎসব হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

* 'হংস দূত,' (পদ্য কাব্য) 'কৃষ্ণজন্মতিথি', 'গণোদ্দেশ-দীপিকা', 'উদ্ধব সন্দেশ', 'স্তবমালা', 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিত মাধব' (নাটক) 'দানকেলি-কৌমুদী', 'দানলীলা-কৌমুদী', 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, 'উজ্জ্বল নীলমণি' 'আখ্যানচন্দ্রিকা', 'মথুরা-মহিমা', 'পদ্যাবলী' 'নাটক চন্দ্রিকা' ও 'গোবিন্দবিরুদাবলী'।

বেলজাম্

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, দুইটা কারণের জন্য ইয়োরোপীয় সকল দেশের মধ্যে বেলজাম্ অতুলনীয় ছিল। প্রথম ইহার ক্ষুদ্রতার তুলনায় শ্রমিক এবং বাণিজ্যিক প্রখ্যাতি; দ্বিতীয় ইহার ঐতিহাসিক ও শিল্পকলা-বিষয়ক ঐশ্বর্য্য।

বেলজামের প্রত্যেক প্রধান সহর ঐতিহাসিক বিভিন্ন যুগের শিল্প বা স্থাপত্য বিস্তার স্মৃতি-চিহ্নে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদের গির্জ্জা এবং যাদুঘর, পৌরমন্দির এবং অন্যান্য স্থানাদি, বিখ্যাত চিত্রকর, ভাস্কর ও স্থপতিদের উৎকৃষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশক কর্ম্মে পরিপূর্ণ। বেলজামের বর্ত্তমান অবস্থা যে কিরূপ বেলজীয়দিগের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার এবং রুচি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও কিছু লিখিবার আছে।

গাঁর (Ghent) আন্তর্জ্জাগতিক ও সার্ব্বভৌমিক প্রদর্শনী সম্বন্ধেও কিছু লিখিব।

লণ্ডন হইতে বেলজাম্ যাইবার সাতটি বিভিন্ন পথ আছে। তাহার মধ্যে ডোভার-অষ্টেণ্ড পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। ইহাই বেলজাম্ রয়্যাল মেল রুট্ (Belgian Royal Mail Route)। এই পথে যাইবার ও আসিবার তিনটি করিয়া ষ্টীমার আছে—দিনে দুইটি এবং রাত্রে একটি। এই পথে সমুদ্র পার হইতে সাধারণতঃ তিনঘণ্টা মাত্র লাগে।



বেলজামের রাজা ও রাণী

তাহা সঠিক বলা এখন সম্ভব নহে। তবে ১৯১৩ সালে আমি যখন বেলজামে গিয়াছিলাম তখনকার অবস্থা বিবৃত করিব। বিবরণের সুবিধার জন্য যেন বর্ত্তমান অবস্থাই বিবৃত করিতেছি এইরূপ লিখিব।

কয়লা, কাচ, লৌহ এবং অসংখ্য অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য যাহা ইহার সাহায্যে প্রস্তুত হয় তাহা এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে ১৯১৩ সালে দুইখানি ষ্টীমার এইপথে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল এবং তাহাতে Frahm system of anti-rolling tanks ব্যবহার করার জন্য সমুদ্র-পীড়া হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। ইংলিশ চ্যানেলে কোন জাহাজে ইহার পূর্ব্বে এরূপ tanks ব্যবহৃত হয় নাই। ডোভার-অষ্টেণ্ড পথে ১৯১২ সালে ১৯৩,০০০ যাত্রী যাতায়াত করিয়াছে এবং প্রতি বৎসরই সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

বেলজাম্ অপেক্ষা অন্য কোথাও রেলভাড়া অধিক সস্তা নহে। অতীব ক্ষুদ্র দেশ হইলেও প্রায় ৩০০০ মাইল রেলপথ আছে। পাঁচ দিন অথবা পনের দিনের জন্য season ticket পাওয়া যায়। ইহা খুবই সস্তা এবং নির্দ্ধারিত দিন পর্য্যন্ত এই টিকেটের সাহায্যে বেলজামের যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যায়। এই টিকেটের অধিকারীর একখানি ক্ষুদ্র ফেটো টিকেটে মারিয়া দিতে হয়, কারণ অন্য কোন উপায়ে একজনের টিকেট অপরে ব্যবহার করিতেছে কি না তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে।

বেলজীয় মুদ্রা বিশেষ গোলমেলে নহে। ৩০, ৫০, ১০০, ৫০০ এবং ১০০০ ফ্র্যাঙ্কের নোট পাওয়া যায়। সোণার ২০ ও ১০ ফ্র্যাঙ্ক পাওয়া যায়। রূপার ৫, ২, এবং ১ ফ্র্যাঙ্ক এবং ৫০ সান্টিম্স ব্যবহৃত হয়।

১৫ টাকা = ২০ সিলিং = ২৫ ফ্র্যাঙ্ক

১ ফ্র্যাঙ্ক = ১০০ সান্টিম্

১ পেনি = ১০ সান্টিম্ (তামার মুদ্রা)।

কিন্তু ১ পেনি অপেক্ষা দেখিতে ঢের ছোট। ২৫, ১০ ও ৫ সান্টিম্ মুদ্রা নিকেলের এবং প্রায় ঐ আকারের রৌপ্যমুদ্রার সহিত যাহাতে ভুল না হয় সেইজন্য মধ্যে গোলাকার ছিদ্রবিশিষ্ট ২ ও ১ সান্টিম্ মুদ্রাও কখন কখন ব্যবহৃত হয়।

ছ) বেলজামে লাগেজের বন্দোবস্ত তত সুবিধাজনক নহে, কারণ ভাড়া খুব কম দিতে হইলেও তাহারা খুব অল্প জিনিষই যাত্রীকে গাড়ীতে লইতে দেয়। সব ভ্যানে দিতে।

প্রত্যেক বড় ষ্টেশনেই ক্লোক রুম্ (Cloak room) আছে। ক্লোক রুমে দ্রব্যাদি রাখিবার খরচ খুবই অল্প —প্রত্যেক দ্রব্যের জন্য দুই পয়সা মাত্র। অন্য সকল স্থানে ইহা অপেক্ষা অধিক।

ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ট্রেণের কয়েকটি গাড়ীতে ছাড়া ধূমপান করা নিষিদ্ধ। থিয়েটার প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে পাইপে তামাকু সেবন ভদ্রতা-বিরুদ্ধ কর্ম্ম; সিগার অথবা সিগারেট ব্যবহার করাই রীতি।

ঐতিহাসিক কথা

রাজা প্রথম লিওপোল্ড ২১এ জুলাই ১৮৩১ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে পার্লামেণ্টে প্রচলিত শাসনপ্রণালী মতে (Constitutional) রাজ্য শাসন করিবেন বলিয়া শপথ করেন।

তাঁহার উত্তরাধিকারী বরাবর তাঁহার প্রজাদের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৬৫ হইতে, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৯ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বেলজামের যত উন্নতি হইয়াছে এরূপ অন্য কোন দেশের হয় নাই।

বর্ত্তমান রাজা যেরূপ মর্য্যাদা ও সর্ব্বসাধারণের অনুমোদনের সহিত শাসনকার্য্য আরম্ভ করেন সেরূপ খুব অল্প রাজাই করিয়াছেন। তাঁহার বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমিকতাও যে কতদূর, সে বিষয়ে বর্ত্তমান যুদ্ধের পর কাহারও আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

১৮৩০ অব্দ হইতে বেলজামের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ এবং বাণিজ্য আঠার গুণ হইয়াছে। লোকহিসাবে ফ্রান্স এবং জার্ম্মানির অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের অপেক্ষা চারগুণ, ইটালী অপেক্ষা সাতগুণ, রাশিয়া অপেক্ষা দ্বাদশগুণ বাণিজ্য অধিক। এবং সকল বিষয় দেখিতে গেলে প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ড অপেক্ষাও অধিক।

আফ্রিকার কংগো প্রদেশ অধিকারের পর উপনিবেশ সম্বন্ধে বেলজাম্ খুবই ক্ষমতাশালী হইয়াছে।

প্রায় সাত শতাব্দী ধরিয়া বেলজামে ললিতকলার উন্নতি হইতেছে। ললিতকলার উন্নতি অর্থে মনুষ্যজাতির উন্নতি। অবশ্য এ স্থলে এ সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। সকলেই জ্ঞাত আছেন, কলাবিদ্যায় Belgian school of art একটা

খুবই উচ্চদরের জিনিষ। কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যই সকল artএর প্রারম্ভ এবং শেষ। Art সম্বন্ধে সত্যের ন্যায় অন্য কিছুই নাই। মানবের কল্পনা যতদূর ইচ্ছা যাইতে পারে কিন্তু প্রকৃতি দ্বারা নির্ম্মিত কোন দ্রব্য অপেক্ষাই অধিক উত্তম হইবে না।

রং এর অনুভূতিই (appreciation of colour) হইতেছে বেলজীয় চিত্রপ্রণালীর বিশেষত্ব। তাহারা যেরূপ দেখে ঠিক সেই রূপই অঙ্কিত করে।

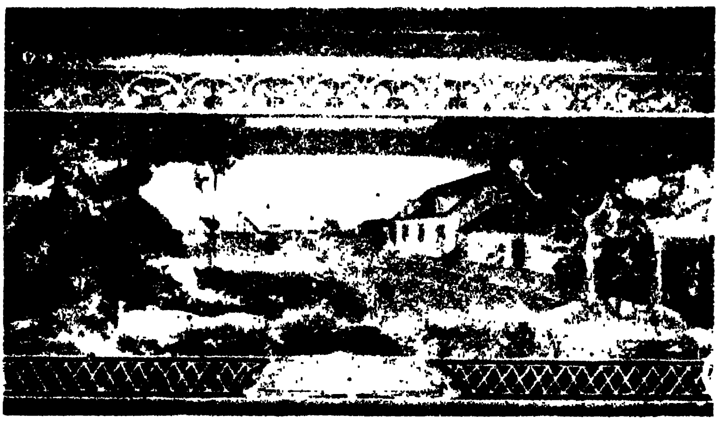
ইউরোপের যখন প্রায় সমস্তই অন্ধকারে আবৃত এবং দাসত্বে পরিপূর্ণ ছিল, তখন ইটালীর সাধারণতন্ত্র রাজ্য অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা একমাত্র বেলজীয়গণ অধিক উপভোগ করিত তাহা বলা যায়।

বেলজামের সাহিত্য সম্বন্ধে এইটুকু উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে ফরাসী, ফ্লেমিশ ও ওয়ালুন (Walloon) ভাষায় ১৮৩০ হইতে ১০০,০০০ অপেক্ষা অধিক বিভিন্ন পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। সকলেই জানেন যে খুব সামান্য লোকও বেলজামে একপ্রকার ভাঙ্গা ফরাসী (Low French) ও Flemish বলে।

২৮শে জুলাই ১৯১৩ সালে লণ্ডনের চেয়ারিং ক্রস্ ষ্টেশন হইতে আমি বেলজাম্ যাত্রা করি। বেলা ২—৫ মিনিটের সময় ট্রেণ ছাড়ার কথা ছিল। ১৷০র পরই ষ্টেশনে পৌছিলাম কারণ তখন holiday season বলিয়া খুবই ভিড় হইবে আশঙ্কা করিয়াছিলাম। ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখি যে লোকের মাথা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। প্লাটফর্ম্মের ধার হইতে যে ৫।৬ লাইন লোক ছিল তাহারাই উঠিয়া ট্রেণখানি ভর্ত্তি করিয়া দিল। সুতরাং আর একখানি Relief train আনিতে হইল। তাহাতেও সব ভর্ত্তি হইয়া গেল। দেখিলাম কয়েকখানি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী চাবি দেওয়া এবং Engaged লেখা। বেশ বুঝা যাইতেছিল যে, সে গাড়ীগুলি কাহারও জন্য বিশেষভাবে reserved ছিল না। Railway Inspectorরা ঘুষের আশা করিতেছিল, কারণ ভারতবর্ষ অপেক্ষা কম ঘুষ চলিলেও ইংলণ্ডেও ঘুষ চলে। ২।১ জন লোক এক শিলিং করিয়া ঘুষ দেওয়ায় দরজা খুলিয়া দিল। সেই সুবিধায় আমিও ঢুকিয়া পড়িলাম। আমাদের গাড়ী ২—১০ মিনিটে চেয়ারিং ক্রস্ ছাড়িল। ৪—৩০ মিনিটে ডোভার হইতে ষ্টীমার ছাড়িল। সামান্য ঝড় হওয়ার জন্য ও বাতাস উল্টা দিকে থাকায় অষ্টেণ্ড পৌছিতে প্রায় রাত্রি ৯টা হইল।

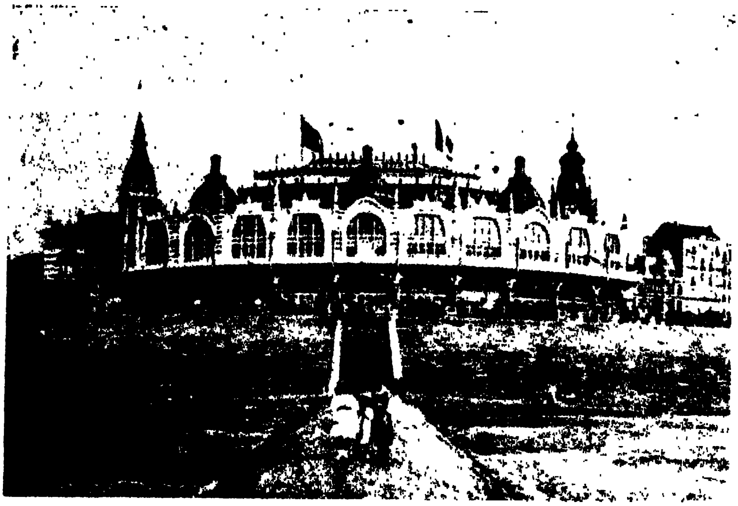
অষ্টেণ্ড

অষ্টেণ্ডে দুইটা পিয়ার (pier) আছে। আমরা যেটিতে নামি সেটা খুব সুবিধাজনক। খুব কাছেই একটি হোটেল ছিল, খুব ভাল না হইলেও মন্দ নহে। সে রাত্রের জন্য সেইখানেই গিয়া উঠিলাম। দেখিলাম বড় কেহ ইংরাজী বলিতে পারে না। কোনক্রমে অর্দ্ধেক ফরাসী ও অর্দ্ধেক ইংরাজীতে তাহাদের বুঝাইলাম কি খাইতে চাই এবং ঘড়ি দেখাইয়া জানাইলাম কটার সময় ট্রেণ ধরিতে হইবে। ভাল বিছানা পাইলেও রাত্রে তত ঘুম হইল না। তখন খুব গরম পড়িয়াছিল। তার উপর জানালার নীচেই ট্রাম্ লাইন। রাত্রি ১১৷০ হইতে সন্ধ্যা অপেক্ষা অধিক



অষ্টেণ্ড পিয়ার

গোলমাল আরম্ভ হইল। বেল্‌জামে, ফ্রান্সের ন্যায়, ঐ সময় হইতে ভোর হওয়া পর্য্যন্ত সকলের উন্মত্ততার সময়। লণ্ডনে ঠিক ইহার বিপরীত। রাত্রি বারটা নাগাদ সবই প্রায় বন্ধ হইয়া যায়।



অষ্টেণ্ড। কুর্শাল প্রাসাদ

অষ্টেণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল স্থানেই আমাদের দেশের ন্যায় একপ্রকার ঝিলমিলি ও জানালা দেখিলাম, সেগুলি বাহির বা ভিতর দিকে খুলিয়া যায়। বোধ হয় খুবই গরম পড়ে বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা।

আমি পরদিন প্রাতে অষ্টেণ্ড ছাড়ি, কিন্তু ফিরিবার মুখে অষ্টেণ্ডে দুইদিন ছিলাম। অষ্টেণ্ড্‌ সম্বন্ধে যাহা লিখিবার তাহা এই খানেই লেখা সুবিধা মনে করি।

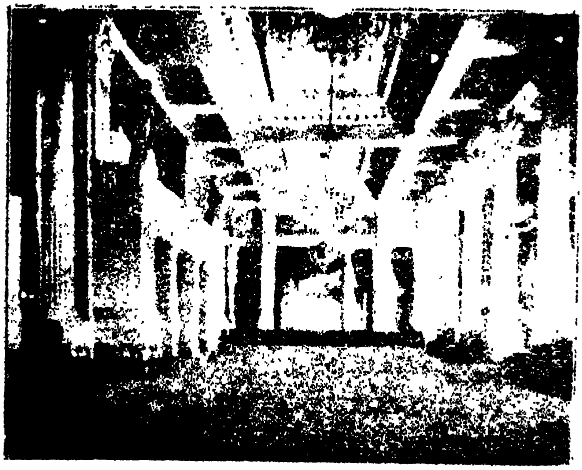
অষ্টেণ্ড্‌কে য়ুরোপের মধ্যে "The Queen of Watering Places" বলে। The Kursaal একটি দ্রষ্টব্য স্থান। এইখান হইতে আরম্ভ হইয়া বরাবর সমুদ্র তীরে ১০ মাইল লম্বা এবং ৪০ ফিট্‌ চওড়া একটি পাথরে বাঁধান রাস্তা আছে। ইহাতে সকল রকম গাড়ী যাইতে পারে, ধারে হাঁটা পথও আছে।

Kursaalএর হলে (Hall) ৬০০০ লোক বসিতে পারে। এখানে জগতের সকল স্থানের সংবাদ পত্রাদি পড়িতে পাওয়া যায়। পৃথক পৃথক গীতবাদ্যের, পত্রাদি লিখিবার ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য ঘর আছে।

গ্রীষ্মকালে স্নানের সময় সমুদ্রতীর একটা দ্রষ্টব্য স্থান। বিভিন্ন জাতীয় জনপ্রবাহকে একসঙ্গে এরূপে স্নান করিতে কখনও দেখি নাই। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের জন্য আলাদা স্থান আছে, কিন্তু যে সকল স্থানে পুরুষ এবং স্ত্রী এক সঙ্গে স্নান করিতে পায় সেখানেই যাহারা স্নান করিতেছে। তাহাদের এবং দর্শকদের যথেষ্ট ভীড়। এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা অনেক কারণে যুক্তিযুক্ত নহে।

Wellington Race Course at the Hippodrome-এর তুলনা য়ুরোপে নাই। মাছের বাজার ও দ্রষ্টব্য। এখান হইতে প্রতি বৎসর ৪০০০ ফ্রাঙ্কের মাছ প্যাক করিয়া রপ্তানি করা হয়।

Blankenberghe আর একটা বিখ্যাত সমুদ্র বিহারের স্থান। সেখানের একটি নাচ ঘরের ছবি দিলাম।

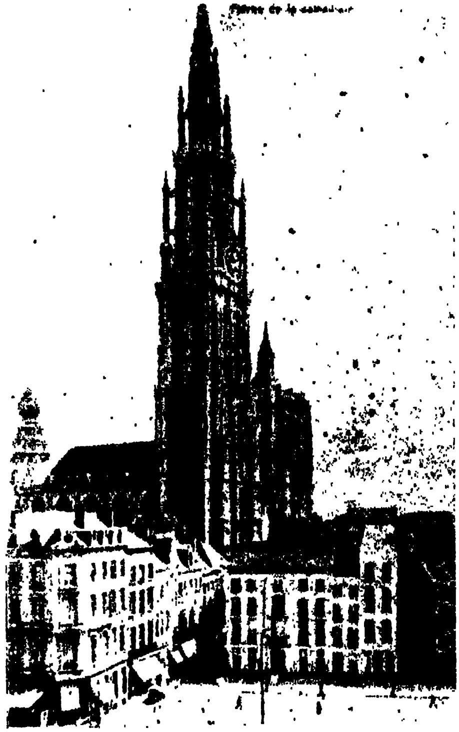


ব্ল্যাঙ্কেনবার্গের নাচঘর

২৯এ জুলাই সকাল ৮—৪৮ মিনিটের ট্রেণে অষ্টেণ্ড্‌ ছাড়িলাম। ৯-৫৭ মিনিটে গাঁ (Ghent)এ পৌঁছিলাম। গাড়ীতে খুবই ভীড় হইয়াছিল।



গাঁ। সেণ্ট বাভো গির্জ্জা



এণ্টওয়ার্প। নোত্র দাম গির্জ্জা

গাঁ, East Flanders এর প্রধান নগরী। সপ্তম খৃষ্টাব্দে গ্রাঁর নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। বেলজীয়ান সকল কেনাল অপেক্ষা Terneusen canal বড় এবং ইহার দ্বারাই গাঁ হইতে সেল্ড (Scheldt) নদীর সাহায্যে সমুদ্রে যাওয়া যায়। বেলজামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুরাতন গৃহাদি এবং স্মৃতিচিহ্ন সকল গাঁতেই দেখিতে পাওয়া যায়।



গাঁ। সেণ্ট বাভো অ্যাবির ভগ্নাবস্থা

সেণ্ট্ বাভোর (St. Bavo's Cathedral) গির্জ্জা বেলজামের মধ্যে একটা খুব বৃহৎ এবং সুন্দর গির্জ্জা। ইহার তিনটি পৃথক পৃথক অংশ আছে। মাটির তলায় গির্জ্জা অথবা crypt, উচ্চ গির্জ্জা অথবা Choir, এবং নীচের গির্জ্জা অথবা lower church.

এই গির্জ্জায় কয়েকটি বিখ্যাত ছবি আছে। তাহার মধ্যে এই তিনখানি উল্লেখ যোগ্য :—

(১) "The Adoration of



এণ্টওয়ার্প। চিড়িয়াখানা

জিনিষও ছিল, তাহার সবিশেষ বিবরণ লিখিতে গেলে স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়।

প্রদর্শনীটি এত বড় হইয়াছিল যে তাহার ভিতরে যাতায়াতের জন্য ট্রেণের বন্দোবস্ত ছিল। একখানি ট্রেণ সর্ব্বদা আনাগোনা করিতেছিল।

সেই দিনই বৈকালে গাঁ হইতে ৫-৫৬ মিনিটের ট্রেণে এণ্ট্ওয়ার্প যাত্রা করি। সেণ্ট্রাল (central) ষ্টেশনে ৭-১৪ মিনিটে পৌছিলাম।

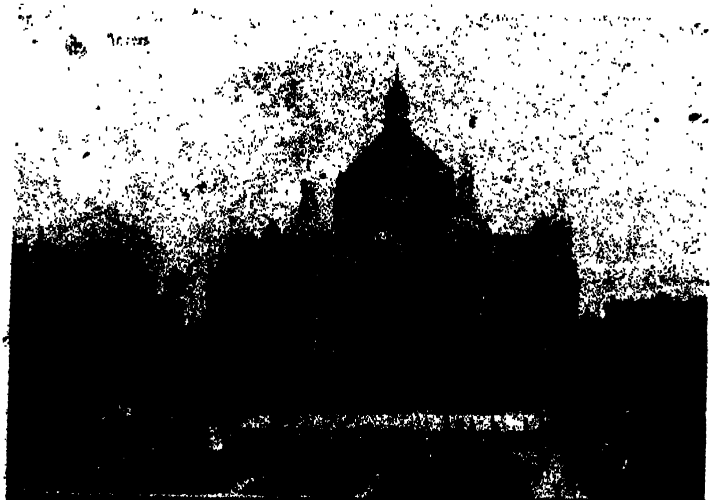
the "Lamb" by the brothers Van Eycke;

(২) "Jesus among the Doctors," by Fr. Powrbens, senior (১৫৪৮—১৫৮১; (৩) "Crucifixion"। সাধারণের ধারণা এই যে, G. Vander Meeren এই ছবি অঙ্কিত করেন। এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে এটা সম্পূর্ণই ভুল ধারণা, যদিও প্রকৃত যে কে এ ছবি অঙ্কিত করেন তাহা কেহ এখনও জানে না।

গাঁকে কেহ কেহ City of Flowers ও বলেন। ১৯১৩ সালের প্রদর্শনীতে সাজান ফুল একটা দ্রষ্টব্য জিনিসও ছিল। এই প্রদর্শনীতে বহু বিভাগের মধ্যে একটি ভারতীয় বিভাগও ছিল, কিন্তু সে কিছুই নয়। আমাদের চেষ্টার অভাবে কিছুই ভাল জিনিস পাঠান হয় নাই; যাহাও পাঠান হইয়াছিল তাহা আগুনে পুড়িয়া গোড়াতেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া অন্যান্য অনেক প্রকার শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দদায়ক

এণ্ট্ওয়ার্প

পরদিন প্রাতে সহর দেখিতে বাহির হইলাম। Cathedral of Notre Dame সকলেরই দেখা উচিত। গথিক গির্জ্জা সকলের মধ্যে এইটি খুবই সুন্দর। ১৩৫২ সালে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের আরম্ভের পূর্ব্বে শেষ হয়। ইহার চূড়া ৪০২ ফিট্ উচ্চ এবং উপরে উঠিতে ৫৫১টি সিঁড়ি আছে। ইহার উপর হইতে বহুদূর দেখিতে পাওয়া যায়—বিশেষতঃ বন্দরটি;



এণ্টওয়ার্প। রেলওয়ে ষ্টেশন

হল্যাণ্ডের একটি গির্জ্জার চূড়াও দেখিতে পাওয়া যায়। গির্জ্জার চূড়ার নীচে ঝুলান একটি বৃহদাকার সুন্দর যীশুখৃষ্ট মূর্ত্তি আছে। বেদীতে কাঠের অতি সুন্দর কারুকার্য্য আছে। ভিতরে Ruben-এর বিখ্যাত ছবি "Descent from the Cross" এবং "The Elevation of the Cross" আছে। দ্বিতীয়টিতে Christ-এর ছবি বেশ হৃষ্টপুষ্ট; অন্যটিতে খুবই রোগা। কথিত আছে যে Rubens ইতালীতে তাঁহার শিক্ষা শেষ করেন এবং এই ছবির একখানি ইতালী যাইবার পূর্ব্বে এবং একখানি পরে অঙ্কিত করেন এবং সেই জন্যই দুইখানিতে এত প্রভেদ। The "Assumption of the virgin" ছবিতে বিখ্যাত চিত্রকরের জীবনী এবং মানসিক প্রবৃত্তি বেশ ভালরূপ বোধগম্য হয়। এই খানেই Francken এর অঙ্কিত "Christ disputing with the sages in the Temple" ছবিখানি আছে। জ্ঞানীব্যক্তিগণের মধ্যে তিন জনের Luther, Calvin এবং Erasmus এর সহিত খুবই সাদৃশ্য আছে, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। অনেকগুলি রঙ্গিল কাঁচের জানালা আছে। ইহার সঙ্গে একটি Philip I of Castille-এর সহিত সন্ধির পর ইংলাণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরী উপহার দেন।

বেলজিয়মের প্রতি সহরেই একটি করিয়া Hotel de Ville আছে। এখানকার হোটেল দ্রষ্টব্য। অবশ্য হোটেল অর্থে কেহ যেন আহারের স্থান না মনে করেন। সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় Public Buildingকেই Hotel de Ville বলে।

এণ্ট্‌ওয়ার্প একটি খুব বড় বন্দর। ১৯১১ সালে ৬,৫৪৬টি ষ্টীমার্ ও ৩৫০টি Sailing Ships এই বন্দরে আসিয়াছিল।

এণ্ট্‌ওয়ার্পে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান হইতেছে ইহার চিড়িয়াখানা। অনেকে বলেন ইয়োরোপের মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর চিড়িয়াখানা। এখানে অনেক দুর্লভ জন্তু ও পক্ষী আছে যাহা অন্য কোথাও রক্ষিত হয় না। দেখিবার বন্দোবস্তও বেশ ভাল। অনেক বিশ্রামের স্থান আছে এবং প্রায় সকল স্থানই গাছের ছায়া হইতে দেখা যায়।

চিড়িয়াখানাটি দেখিবার আর একটি সুবিধা এই যে ইহা Central Station হইতে খুবই কাছে। পরিব্রাজকদের সুবিধা ও সাহায্যের জন্য এই ষ্টেশন হইতে পাঁচ মিনিটের রাস্তার মধ্যে একটি Enquiry Offiice আছে। ষ্টেশনটিই একটি দ্রষ্টব্য স্থান। এরূপ সুন্দর অট্টালিকা এবং প্রথম শ্রেণীর ষ্টেশন অতি বিরল।

এণ্ট্‌ওয়ার্পে এবং প্রায় ছোটবড় সকল বেলজীয় সহরেই বেশ ভাল ট্রাম্ আছে। এখানে একটি English Church আছে; প্রতি রবিবার প্রাতে ১১ টায় ও সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা হয়।

সেইদিন বৈকালে ৫—২৩ মিনিটের এক্সপ্রেস গাড়ী ধরিয়া ব্রাসেল্‌স যাত্রা করিলাম। ট্রেণে পুনরায় খুবই ভিড় হইয়াছিল; অনেক কষ্টে বহুক্ষণ ধরিয়া গাড়ীর হাতল ধরিয়া ঝুলিয়া থাকিয়া ক্রমশঃ ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে উঠিলাম। ট্রেণ কোথাও থামে নাই। একেবারে ব্রাসেল্‌সে ৬টার সময় পৌছিলাম।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীহেমন্তকুমার মিত্র।

নিধিরামের নির্বুদ্ধিতা

(গল্প)

১

নিধিরামের নিজের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই এবং সে যাহা কিছু বিষয় আশয় করিয়াছিল তাহারও প্রায় সমস্তই তাহার স্বোপার্জ্জিত। তথাপি নিধিরামকে চিরদিন দুর্ব্বহ সংসার-ভার বহন করিতে হইত। তাহার সংসারে লোকের অভাব ছিল না। ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, বিধবা ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া, পিসিমাতা—সকলকেই নিধিরাম আপনার সংসারে আশ্রয় দিয়াছিল। যদি নিধিরামকে তাহার সম্পত্তির আয় হইতে কেবল নিজের ও পত্নীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত, তাহা হইলে তাহার যথেষ্ট অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত এবং প্রতিবৎসরই কাদম্বিনী দুই একখানা নূতন অলঙ্কারে আপনার শরীরকে সুশোভিত করিতে পারিত। কিন্তু নিতান্ত "সেকেলে" নিধিরাম অর্থবিজ্ঞানের এই গোড়ার কথাটাও কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। কেহ একথা উত্থাপন করিলে নিধিরাম বলিত, "বাপ মা ভাই বোন—এদেরই যদি না করলাম ত কার জন্যে সংসার! তার চেয়ে ত বনবাসী হওয়াই ভাল!"

স্থূলবুদ্ধি নিধিরাম কিছুতেই বুঝিতে পারিত না যে বাপ মা ভাই বোনকে ছাড়িলেও সংসার বনবাসে পরিণত হয় না; বরং গাড়ী, ঘোড়া, অট্টালিকা, অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যে ও ঔজ্জ্বল্যে আরও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে!

নিধিরামের স্ত্রী কাদম্বিনীর বুদ্ধিও স্বামীর বুদ্ধিরই অনুরূপ ছিল। সেও উপার্জ্জনক্ষম স্বামীর "ঘরণী গৃহিণী" হইয়াও পীড়ার ভান করিয়া শয্যাগত না থাকিয়া, প্রত্যুষ হইতে একপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত অবিরাম পরিশ্রম করিত; এবং দেবর, দেবরপুত্র, ননন্দা ও শ্বশ্রূর সেবাকে নিরবচ্ছিন্ন দয়ার কার্য্য মনে না করিয়া কর্ত্তব্যেরই অঙ্গ বলিয়া মনে করিত। এবং ইহাদের জন্য নিষ্ফল ব্যয়কে সঙ্কুচিত করিয়া দিলে তাহার অলঙ্কারের সংখ্যা ও গুরুত্ব যে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে একথাও তাহার স্থূলবুদ্ধিতে কিছুতেই প্রবেশ করিত না। সে যখন-তখন তাহার দেবরপুত্রদের উল্লেখ করিয়া বলিত— "ওরাই ত বংশের প্রদীপ। আমাদের আর কে আছে?"

কিন্তু অন্ধকার চিরদিন অন্ধকারই থাকিবে ইহা প্রকৃতির নিয়ম নহে। অসভ্যতা অরণ্যের অন্তরালে, গিরির শৃঙ্গে বা মরুভূমির ব্যবধানে যেখানেই আত্মগোপনের চেষ্টা করুক, সভ্যতা তাহার "বেয়নেটে"র গুঁতা এবং জ্ঞানের মশাল লইয়া একদিন তাহাকে আক্রমণ করিবেই। সুতরাং নিধিরাম এবং কাদম্বিনীর অজ্ঞানতাও চিরদিন শান্তিসুখ উপভোগ করিবার অবসর পাইল না। একদিন জ্ঞানের তীব্রজ্যোতি অযাচিতভাবে তাহার উপর পতিত হইয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

২

কাদম্বিনীর এক খুল্লতাতপুত্র কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে গিয়াছিল। বিদ্যাশিক্ষা তাহার কতদূর ঘটিয়াছিল তাহা বলা কঠিন কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্ত আবর্জ্জনাগুলি সে সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছিল।

পাঁচবৎসর পরে সে একদিন এই আবর্জ্জনাগুলি মস্তকে বহন করিয়া তাহার নিভৃত পল্লীভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কাদম্বিনীর খুল্লতাত নিষ্ঠাবান হিন্দু। সুতরাং পুত্রের সভ্যতার তীব্র আলোক তাঁহার প্রাচীন চক্ষুকে কিছু পীড়িত করিল। তিনি আলোক এবং আলোকধারী উভয়কেই চক্ষুর অন্তরাল করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সুতরাং পিতার বিসদৃশ আচরণে পুত্রকে কিছু বিব্রত হইতে হইল।

পাশ্চাত্য সভ্যতা অতি দুর্ম্মূল্য বস্তু। অর্থাভাবে ইহা সম্পূর্ণ অচল। ইহার খেলা হইতে আমোদ প্রমোদ সমস্তই বহুমূল্য। কাজেই পিতার সাহায্য ব্যতীত

সভ্যতার সাধনা পুত্রের পক্ষে অল্পদিনেই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

হরিদাস গ্রামে আসিয়া ২।৪ জন শিষ্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে তাহাদের অবস্থা গুরুরই অনুরূপ; সুতরাং তাহাদের উপর নির্ভর করাও চলিল না।

অবশেষে কল্পনানেত্রকে বহুক্ষণ পীড়িত করিয়া হরিদাস দেখিল এই বিষম দুর্য্যোগে তাহার একমাত্র সম্ভাব্য আশ্রয় নিধিরাম।

নিধিরামের সন্তানাদি হয় নাই এবং তাহার আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল একথা হরিদাসের অবিদিত ছিল না। সুতরাং অগত্যা হরিদাস,ভগ্নীপতির উপর নিজের ভারার্পণ করিতেই কৃতসংকল্প হইল। নিধিরাম পরম সমাদরে শ্যালককে আশ্রয়দান করিল এবং তাহার আত্মীয়েরাও সকলেই কুটুম্বের সম্মান রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

কিন্তু এখানেও হরিদাস আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সদুপায় দেখিতে পাইল না। নিধিরাম একেবারে "সেকেলে"। মাছের মুড়া এবং ঘৃত ক্ষীর ব্যতীতও যে সুসভ্য কুটুম্বের অনেক জিনিষের প্রয়োজন হইতে পারে, ইহা তাহার স্থূলবুদ্ধির অগম্য। কাদম্বিনীর হাতেও একান্ত অর্থাভাব। সুতরাং স্বাবলম্বন শিক্ষারও অবসর অল্প।

সুসভ্য হরিদাস পরিণাম সম্বন্ধে ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু দ্বিতীয় আশ্রয়ও আর নাই। কাজেই হরিদাসকে একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইল।

প্রথম প্রথম সে তাহার ভগ্নীপতিকে লইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তাহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার নানাপ্রকার গুণগান শুনাইল।

আহারাদি সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন ব্যবস্থা স্বাস্থ্যশাস্ত্রের কিরূপ প্রতিকূল, এবং শরীরের নবীনতা রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প উত্তেজক সেবন কিরূপ একান্ত প্রয়োজনীয়, একথা সে যথোচিত যুক্তি ও বাগ্মিতার সহিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নিধিরাম তাহার কথা শুনিয়া কেবল উচ্চহাস্য করিতে লাগিল এবং "এঃ তুমি যে একেবারে সাহেব হয়ে গেছ হে" বলিয়া তাহাকে পরিহাস করিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া হরিদাস নিধিরামকে কিছু কিছু অর্থনীতি-শাস্ত্র শিক্ষা দিতেও চেষ্টা করিল। যদু যেরূপ স্থূলবুদ্ধি তাহার দ্বারা কোন কাজ হইতেই পারে না, সুতরাং তাহার নিষ্কর্ম্মা পরিবারবর্গকে চিরকাল ধরিয়া পালন করা যে কতদূর মূঢ়তা এবং বিপদ আপদের সময়ে অর্থের অভাব কিরূপ সাংঘাতিক—একথা সে নানা উদাহরণাদি সংযোগে নিধিরামের বোধগম্য করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না। নিধিরাম কেবল পরম কৌতুকভরে সুশিক্ষিত শ্যালকের মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে ঘন ঘন তাম্রকূটের ধূমাকর্ষণ করিতে লাগিল।

নিধিরাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া হরিদাস একবার কাদম্বিনীর প্রতি তাহার যুক্তির শরজাল নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক হইল।

সুযোগ বুঝিয়া হরিদাস একদিন দিদিকে বলিল, "দিদি, তোমাদের পয়সা কড়ির দিকে মোটেই নজর নেই। ঘোষজা মশাই ত একেবারে কোন কিছুই দেখেন না, তোমারও তেমনি দশা। দু'পয়সা হাতে না থাকলে এর পর তোমাদের কি দুর্দ্দশা হবে আমি তাই ভাবি।"

কাদম্বিনী বলিল, "কি কোরবো বল। এতবড় সংসার; সবাইকে খাইয়ে পরিয়ে একটি পয়সাও বাঁচে না। টাকা জমবে কি করে?"

হরিদাস বিস্ময়ের ভান দেখাইয়া বলিল "তোমাদের আবার কিসের সংসার? তোমরা ত মোটে দুটি প্রাণী; তোমাদের আবার খরচ কি?"

কাদম্বিনী হাসিয়া বলিল, "তোমার হিসেব ত খুব! আমরা দুটি প্রাণী কি করে? আমাদের বাড়ীতে খেতে দুবেলায় অন্ততঃ বিশজন।"

হরিদাস বলিল, "সে তোমরা যদি রাস্তার লোককে

ডেকে খাওয়াও, তাহলে বিশজন কেন হাজার জন জোটাও কঠিন নয়।"

কাদম্বিনী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। "রাস্তার লোক! দেওর, দেওর-পো, শাশুড়ী ননদ—এরা যদি রাস্তার লোক ত ঘরের লোক কে? ইংরেজি প'ড়ে তোমার মাথা একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে দেখ্‌ছি!"

সুবিধা না দেখিয়া হরিদাস আপাততঃ একথা চাপা দিয়া কাতর ভাবে বলিল, "দিদি এখানে এসে শরীরটা বড়ই খারাপ হ'য়ে গেছে। সহরে অনেক দিন থেকে থেকে চা-খাওয়াটা অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল, সেটা ছেড়ে অবধি সর্দ্দি কাশি আর ছাড়চে না।"

ভ্রাতার অসুস্থতার সংবাদে দুঃখিত কাদম্বিনী কহিল, "তা এ বাড়ীতে ত ওসব সরঞ্জাম কিছু নেই ভাই!—"

হরিদাস বলিল, "সরঞ্জাম সব আমার কাছেই আছে। যোগেনদের বাইরের ঘরে সব যোগাড়ও ঠিক করা আছে। কেবল চা আর চিনিটে আনিয়ে নিতে পারলেই হয়!"

কাদম্বিনী অনেক খুঁজিয়া বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দিয়া দুঃখিত ভাবে বলিল, "আমার হাতে ত কিছু নেই। আপাততঃ এই টাকাটি নাও। তুমি যা বলেছ তা নিতান্ত মন্দ নয়। এঁদের নিতান্ত বাড়াবাড়ি। দু চা'র টাকা হাতে না রাখলেও চলে না!'

প্রসন্নচিত্তে টাকাটি পকেটস্থ করিয়া হরিদাস ভাবিল দিদির দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হওয়া ততটা কঠিন হইবে না।

৩

স্বার্থান্বেষণে মানুষের প্রকৃতিগত। বহুদিনের সাধনা ও অভ্যাসের ফলে ইহার সঙ্কোচ সাধিত হইলেও একবারে ইহার বিলোপ ঘটে না।

সুতরাং প্রথম দিনে হরিদাস তাহার দিদির হৃদয়ের গোপন প্রদেশে স্বার্থের যে ক্ষীণ অঙ্কুরের সন্ধান পাইয়াছে—ক্রমাগত উপদেশের জল ঢালিয়া হরিদাস তাহাকে অবশেষে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইল। কাদম্বিনীর ক্রমশঃ মনে হইতে লাগিল, "হরিদাস যা বলে তা নিতান্ত মিথ্যে নয়। আমার ছেলে নেই পিলে নেই, আমি কার জন্যে দিনরাত খেটে মরি। ভগবান যাদের ছেলে মেয়ে দিয়েছেন তাদের ত আর হাত পা থেকে বঞ্চিত করেন নি। তারা ত অনায়াসেই নিজের কাজ নিজে করতে পারে।

"তা ছাড়া, আপনার লোককে যতদিন 'দাও থোও' ততদিনই আপনার লোক আপনার। অভাবে পড়লে কেউ কারো নয়।

"যতদিন এঁরা আছেন, ততদিনই আমার মান সম্ভ্রম। তার পর (ভগবান না করুন) যদি কখনো দুটি অন্নের জন্যে পরের দুয়ারে হাত পাততে হয়, তখন আর কে আমার খোঁজ করবে?"

কাদম্বিনী ক্রমশঃ তাহার মনের বেদনা নিধিরামের কাছেও আভাসে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হইল না। নিধিরামের মুখে সেই একই কথা—"যদি আপনার লোকেরই কিছু না করলাম ত কার জন্যেই বা রোজগার, আর কার জন্যেই বা সংসার!"

হরিদাসের শিক্ষামত কাদম্বিনী অনেকবার তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে দিনকাল যেরূপ পড়িয়াছে, তাহাতে "বসুধৈব কুটুম্বকং"-এর দিন আর নাই, এক্ষণে "আপনার" কথাটাকে কিছু সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু মূঢ় নিধিরাম কোন প্রকারেই কথাটার নূতন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। সে মুহুর্মুহু ধূমপান করিতে করিতে কথাটার প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু ধূমান্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার যুক্তিজালও অন্ধকারেই আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে লাগিল।

হরিদাস বলিল, "দিদি শুধু কথায় হবে না, একটু পীড়াপীড়ি আরম্ভ কর।"

কাদম্বিনী পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ সে স্বামীর নিকট সকলের নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিল। পিসিমা একবারও তাহার দিকে চাহিয়া দেখেন না,

তাঁর যত টান সবই ছোট বৌএর উপর; ননদের হাত বড় "দরাজ"—সংসারের জিনিসপত্র যাকে তাকে দুই হাতে লুটাইয়া দেন; দেবর দিনরাত আমোদ লইয়াই আছেন—জমি দেখিবার ছলনা করিয়া বোসেদের বৈঠকখানায় তাস পাসা খেলিয়াই কাটান—জমির জিনিসপত্রগুলি পাঁচভূতে লুটিয়া খায়; ছেলেগুলি এক একটি রাক্ষস—যত দাও কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা মেটে না। এত যন্ত্রণা এত উপদ্রব সহিয়া কাদম্বিনী আর কতদিন এ সংসারে থাকিবে! নিধিরাম যদি এই সকল পাপ গলায় করিয়া চিরকাল থাকিতে চাহেন ত থাকুন, কাদম্বিনীকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিন।

নিধিরাম তাহার আশ্রিত আত্মীয়বর্গের সহসা এইরূপ প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের কোনরূপ উপযুক্ত কারণ বুঝিতে না পারিয়া একান্তভাবে হুঁকাটিকেই আশ্রয় করিল—কাদম্বিনীর অনুযোগের কিছুমাত্র উত্তর দিল না। অগত্যা কাদম্বিনীর চক্ষে বারিধারা দেখা দিল—কাদম্বিনী ধীরে ধীরে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ব্যাধ-ভয়-ভীত হরিণের ন্যায় নিধিরাম ত্রস্তপদে অন্দর ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

কিন্তু এখানে হরিদাস তাহাকে নূতন উৎসাহে বীরবিক্রমে আক্রমণ করিল। "অর্থনীতি" "ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য," "আলস্যের প্রশ্রয়"—বাছা বাছা যুক্তি-বাণে নিধিরামকে সে একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া দিল।

নিধিরাম নিতান্ত মূঢ়ের মত কাতরভাবে মুহুর্মুহু তামাকু সেবন করিতে লাগিল।

কিন্তু এরূপ ভাবে "নিজবাসভূমে পরবাসী" হইয়া চিরকাল থাকা যায় না। ঘরে বাহিরে ক্রমাগত তাড়া খাইয়া নিধিরাম একদিন চিরসন্তাপহারিণী হুঁকার আশ্রয় ছাড়িয়া "মরিয়া" হইয়া উঠিল।

বহুদিন ভূতভয়গ্রস্তের মত লুকাইয়া লুকাইয়া থাকিয়া সে একদিন সহসা শয্যাগতা পত্নীর শয়ন-কক্ষে আসিয়া বলিল, "বড় বৌ, ভেবে দেখ্‌লুম তোমার কথাই ঠিক। চিরকাল কেন মিছে ভূতের বেগার খেটে মরি! কাল যদি আমি মরে যাই, ওদের কি হচ্চে না হচ্চে তা ত আর দেখ্‌তে আসব না! ওরা যেমন ক'রে পারে চালাক, এখন আমরা দিন কতক হাত-পা মেলে নির্ঝঞ্ঝাট হই! আমি কালই সদরে গিয়ে এর একটা হেস্ত নেস্ত করে আসব!"

"উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপর"! কাদম্বিনী চক্ষু মুছিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। নিধিরাম তাহার পৈতৃক আমলের ধূলি-ধূসরিত ব্যাগটী পাড়িয়া কাপড় চোপড় গুছাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরেই সমস্ত কথা হরিদাসের কানে উঠিল। হরিদাস আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধির স্বাস্থ্যপান উপলক্ষে সেদিন সন্ধ্যার পর বন্ধুবর্গের পানাহারের কিছু সমারোহ করিয়া ফেলিল!

৪

সপ্তাহকাল হইতে নিধিরাম বাড়ী নাই। বিষয় সম্পত্তির পাকাপাকি ব্যবস্থা করিবার জন্য সে উকীলের পরামর্শ লইতে গিয়াছে।

হরিদাস বিস্তর পরিশ্রম করিয়া সম্পত্তি-বিভাগের একটা খস্‌ড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। উকীলকে দেখাইয়া তাহাই পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

এই খস্‌ড়ার মতে যৎসামান্য পৈতৃক ভূসম্পত্তির অর্দ্ধাংশ যদুনাথ পাইবে। পিসি ও ভগিনী—গোয়াল ঘরের নিকট একখানি ঘর এবং পৈতৃক জমির উৎপন্ন হইতে বার্ষিক ৮ মণ করিয়া ধান পাইবেন। স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি সমস্তই নিধিরামের থাকিবে। এবং হরিদাস তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবে।

আজ নিধিরামের সদর হইতে ফিরিবার দিন। নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত আজ সমস্ত সংসার বিষাদের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। বেলা দেড়প্রহর হইয়া গিয়াছে, এখনও রন্ধনাদির কোনই উদ্যোগ নাই। পিসিমা একমনে বারান্দায় বসিয়া মালাজপ করিতেছেন। যদুর স্ত্রী নিভৃতকক্ষে বসিয়া নীরবে চক্ষুমার্জ্জন করিতেছে। নিধিরামের বিধবা ভগিনী, যদুর কোলের ছেলেটিকে বুকে লইয়া আকাশের

দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। ছেলেরা বাটীর সম্মুখে অশ্বত্থতলে বসিয়া নিম্নস্বরে কথা কহিতেছে। যদু চণ্ডী-মণ্ডপে উঁচু হইয়া বসিয়া অবিরাম তামাক টানিতেছে। তামাক পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, ধুঁয়া মোটেই বাহির হইতেছে না—কিন্তু সেদিকে যদুনাথের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই।

কেবল একা হরিদাস চেঁচামেচি ও ছুটাছুটি করিয়া সমস্ত গৃহকে সজীব করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে।

কাদম্বিনীর মন তেমন ভাল নাই। সে হরিদাসের উল্লাসে কিছুতেই মন খুলিয়া যোগ দিতে পারিতেছে না।

অল্পবয়স্ক শিশুরা বাটী হইতে কোথাও যাইবার নামে উল্লাসে নাচিয়া উঠে, কিন্তু একবার তথায় পৌঁছিলে আর তাহাদের সেস্থান ভাল লাগে না—বাড়ী ফিরিবার জন্য তাহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। কাদম্বিনীরও আজ তেমনি হইতেছিল। একাকী বাস করিবার প্রবল উত্তেজনায় সে এতদিন আশায় ও উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু বিদায়ের সন্ধিক্ষণ যতই নিকট হইতেছিল ততই সে হৃদয়ের মধ্যে কেমন একটা অব্যক্ত ও তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করিতেছিল।

তাহার মনে হইতেছিল, "কেন এত তাড়াতাড়ি করলাম? এরা চলে গেলে আমার বাড়ী অন্ধকার হয়ে যাবে। কাকে নিয়ে আমি সুখী হব? পুঁটির কারো হাতে খেয়ে পেট ভরে না। সে না ভোলালে খোকা কারো কাছে দুধ খেতে চায় না। কালী আর তারার তার কাছে উপকথা না শুনলে ঘুম আসে না! এরা দূরে গিয়া কেমন করে থাকবে?"

কাদম্বিনী যতই ভাবিতেছিল ততই তাহার হৃদয়ে অনুশোচনার তীক্ষ্ণকণ্টক তীক্ষ্ণতর বেদনার সঞ্চার করিতেছিল। অনুতপ্ত কাদম্বিনী ক্রমাগত লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—কখনও সহসা নীরবে দেবরের শিশু-পুত্রটীকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিতেছিল—কখনো গোপনে আপনার মাকড়ি খুলিয়া দেবরকন্যার কাণে পরাইয়া দিতেছিল!

মধ্যাহ্নকালে শুষ্ক মুখে ধূলি-ধূসরিত চরণে নিধিরাম দ্রুতবেগে অঙ্গন মধ্যে প্রবেশ করিল। অপ্রত্যাশিত বিপৎপাতে মানুষ যেমন করিয়া চকিত হইয়া উঠে, নিধিরামকে দেখিয়া বাড়ীর সমস্ত লোক তেমনি সহসা চকিত হইয়া উঠিল।

পিসিমাতা জপের মালা মাথায় ঠেকাইয়া স্থির হইয়া বসিলেন; ভগিনী শিশুকে কোলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; ছেলেরা ভয়ে ভয়ে দ্বারপথে উকি মারিতে লাগিল; কাদম্বিনী দ্বারের অন্তরালে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইল।

অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াই নিধিরাম শুষ্ককণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল—"যদুনাথ।"

যদু ধীরে ধীরে আসিয়া অপরাধীর মত নত মস্তকে সম্মুখে দাঁড়াইল। হরিদাস ছুটিয়া আসিয়া কৌতূহলপূর্ণ মুখে দূরে দাঁড়াইল।

নিধিরাম তাড়াতাড়ি ব্যাগ হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া যদুনাথের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "এই নাও। আর তোমার সঙ্গে আমার কোন সংস্রব রইল না।"

বাড়ীর সকলে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কাদম্বিনীর হৃৎপিণ্ড কে যেন কঠোর মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল।

অশ্রুপূর্ণ লোচনে ধীরে ধীরে কাগজখানি উঠাইয়া লইয়া যদু চক্ষুর সম্মুখে ধরিল। দেখিতে দেখিতে দরদর অশ্রুধারা তাহার গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "দাদা এ কি করেছেন?"

নিধিরাম কঠোর স্বরে বলিল, "আমি চিরকাল তোমাদের আমার গলগ্রহ করে রাখতে পারব না।"

হরিদাসের পক্ষে আর কৌতূহল সম্বরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া যদুর হাত হইতে কাগজখানা ছিনাইয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

কি সর্ব্বনাশ! কাগজখানা রেজিষ্টারি করা দানপত্র। নিধিরাম তাহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি স্বেচ্ছায় যদুকে দান করিয়াছে; নিজের জন্য কিছুমাত্র অবশেষ রাখে নাই!

হরিদাস গভীর বিস্ময়ে নিধিরামের মুখের দিকে

চাহিল। নিধিরাম ঈষৎ হাসিয়া হরিদাসকে বলিল, "আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, তোমরা সহর ঘেঁসা লোক, দেখত কাগজখানা পাকা হ'ল কি না।"

হরিদাস স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কথার উত্তর দিতে পারিল না।

নিধিরাম কাদম্বিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আর কোন ঝঞ্ঝাট রইল না। এখন থেকে আর আমাদের যদুর ভার নিতে হবে না। আমরা স্বচ্ছন্দে যেথানে ইচ্ছা যেতে পারব। এখন চল, যেখানে তোমার ইচ্ছা সেইখানে যাওয়া যাক।"

যদু সহসা নিধিরামের চরণে পতিত হইয়া বলিল, "সে কি কথা দাদা, বিষয় সম্পত্তি সবই আপনার; আমরা আপনার চিরদিনের আশ্রিত। আপনার কাগজ আপনারই থাকুক। আমাদের আপনার স্নেহ হতে বঞ্চিত করবেন না।"

কাদম্বিনী ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর চরণে পতিত হইয়া বলিল, "আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমার দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছিল।"

নিধিরাম কৌতুকপূর্ণ স্বরে বলিল, "এতদিন যদু আমাদের গলগ্রহ হয়েছিল তা' তোমার সহ্য হচ্ছিল না, এখন যদুর গলগ্রহ হয়ে থাকা তোমার সহ্য হবে কি?"

কাদম্বিনী কাঁদিয়া বলিল, "ওগো আমায় আর লজ্জা দিও না। আমি দাসী হয়েও তোমাদের সংসারে থাকতে কষ্টবোধ করিব না।"

দেখিতে দেখিতে দুর্দ্দিনের মেঘ কাটিয়া গেল। পিসিমা ভক্তিভরে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

নিধিরাম ব্যাগ হইতে নানা প্রকার বস্ত্র ও খেলনা বাহির করিল। দেখিতে দেখিতে ছেলেরা মধুলোলুপ মক্ষিকার মত তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

নিধিরামের নির্ব্বুদ্ধিতায় "ভেড়ার শৃঙ্গে" পড়িয়া হরিদাসের তীক্ষ্ণবুদ্ধির "হীরার ধার" সম্পূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই সে আর এ স্থানে অবস্থিতি করা আদৌ সঙ্গত মনে করিল না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

পুরাতন প্রসঙ্গ

(নূতন কল্প)

(৫)

২১এ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩—

অমৃতবাবু বলিলেন, "ন্যাশনাল থিয়েটর ভাঙ্গিয়া গেল। দলাদলির সূত্রপাৎ পূর্ব্বেই হইয়াছিল; এবার পাকাপাকি দুইটা দল দাঁড়াইয়া গেল। ষ্টেজের মাল-পত্তর আমরা কিছুই পাইলাম না। বোধ হয় পাইলাম না বলিলে ঠিক বলা হয় না; আমরা সকলে উপস্থিত থাকিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিলাম যে, ন্যাশনাল থিয়েটরের ষ্টেজ্ গিরীশ বাবুর বাড়ীতে রাখা হইবে।

"অল্পদিনের মধ্যেই সেই ষ্টেজ টাউন্ হলে বাঁধা হইল। আমাদের সহিত এই নূতন থিয়েটরের কোনও সম্পর্ক রহিল না। তাঁহারা নীলদর্পণ অভিনয় করিলেন। দেশীয় হাঁসপাতালের সাহায্যার্থ এই অভিনয় হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল।

"এই কথাটা একটু ভাল করিয়া বলা আবশ্যক। আমি আমার স্মৃতিকথা বলিয়া যাইতেছি; ঠিক যে থিয়েটরের ইতিহাস দিতে বসিয়াছি, তাহা নহে। তবে আমার স্মৃতিকথার অনেকটাই আমার নাট্য-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাই নাট্য-সাহিত্যের ও রঙ্গমঞ্চের বিবরণ হয় ত কিছু বেশী হইয়া পড়িতেছে। আবার নিজের স্মৃতিকথা বলিতে বসিলে হয় ত First Person Singularএর উপর কিছু বেশী জোর পড়িয়া যায়; সেই যে ছেলেবেলায় I by itself I কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, আজও তাহার হাত এড়াইতে পারি নাই। তাই মাঝে [illegible]

করিয়া সেই কেন্দ্রস্থ I-এর অন্য বিষয় দেখিবার অবসর করিয়া লইতে হয়।

এই যে টাউন হলের থিয়েটরের দল, ইহা ত আমাদের সেই ন্যাশন্যাল থিয়েটরের ভাঙ্গা দল; আমাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পরই গিরীশ বাবু এই ভগ্নাংশটিকে ন্যাশন্যাল থিয়েটর নামে রেজিষ্টরি করিয়া লইলেন।

"এই সঙ্গে আমাদের আর একটি দেশীয় অনুষ্ঠানের ইতিহাস জড়িত হইয়া আছে। ডাক্তার ম্যাক্‌নামারা নামে তখন কলিকাতায় চক্ষু-রোগের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। তিনি গিরীশচন্দ্র দাস ও অন্যান্য কয়েকটী বাঙ্গালী ভদ্রলোককে ধরিয়া বলিলেন,—যেমন করিয়া হউক একটা দেশীয় হাঁসপাতালের জন্য কিছু টাকা তুলিয়া দেওয়া চাই। বৃন্দাবন পালের পুত্র রাজেন্দ্র পাল সে সময়ে সখের থিয়েটরের একজন চাঁই ছিলেন। তাঁহারই বাড়ীতে পূর্ব্বে 'লীলাবতী' অভিনীত হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেবের অনুরোধে গিরীশ দাস, রাজেন্দ্র পাল ও অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক টাউন হলে এই থিয়েটরের ব্যবস্থা করিলেন।

"নীলদর্পণ অভিনীত হইল। আমি দুই টাকা দর্শনী দিয়া অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম! যতদূর স্মরণ হয়, গিরীশবাবু নবীনমাধব সাজিয়াছিলেন, মতিবাবু তোরাপ, গোবি (ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর) সৈরিন্ধ্রী, মাধু (শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর) সাজিয়াছিলেন কি না, তাহা আমার এখন মনে পড়িতেছে না।

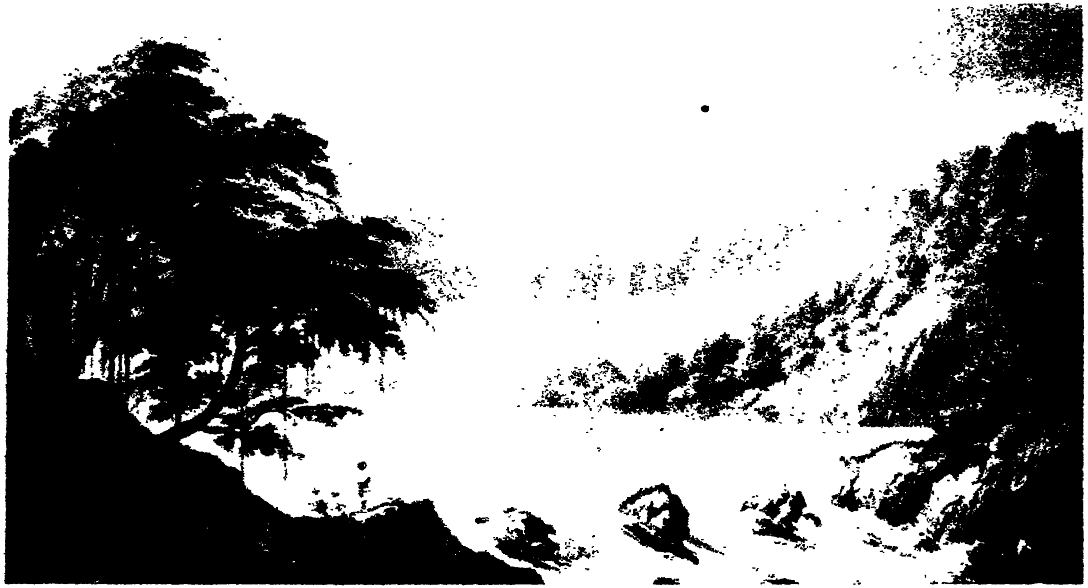
"এইখানে মাধুর কথা কিছু বলিয়া রাখি। আমরা যখন সান্ন্যালদের বাড়ীতে অভিনয় করি, তখন মাধু আমাদের দলে ছিলেন না, বিদেশে পোষ্টমাষ্টারি করিতেন। পোষ্ট-আপিসে চাকরি লইবার পূর্ব্বে সখের দলের অভিনেতৃগণের মধ্যে মাধু প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। আমার যখন নাট্য-জীবনের আরম্ভ হয় নাই, তখন 'সধবার একাদশী'র রামমাণিক্য-ভূমিকায় মাধুর খ্যাতি আমাকে উতলা করিয়া তুলিল। তাঁহার অভিনয় দেখিবার বাসনা আমার মনে অত্যন্ত প্রবল হইল। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হইল না। লীলাবতীতে তিনি ক্ষীরোদবাসিনীর ভূমিকায় সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। সুদূর কাশীতে বসিয়া আমি তাঁহার কৃতিত্বের কথা শুনিলাম; তাঁহার অভিনয় দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না! সান্নালদের বাড়ীতে আমি যখন সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় তালিম দিতাম, তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর মাঝে মাঝে দুঃখ করিয়া বলিতেন—'আহা, যদি মাধু এখানে থাকৃত, কি চমৎকার সৈরিন্ধ্রী হত!' গিরীশ বাবু একদিন আমাকে বলিলেন,—'বাস্তবিক যে নিজে কাঁদতে জানে না, সে পরকে কাঁদাতে জানে না; মাধুর কান্না অন্তরের ভেতর থেকে ফেটে বেরোয়; মাধু কাঁদতে জানে।'

"সে যাহা হউক, সে রাত্রির টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ডাক্তার ম্যাক্‌নামারার হস্তে অর্পিত হইল। এমনি করিয়া মেয়ো হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপনে বাঙ্গালীর থিয়েটর অর্থ সাহায্য করিতে সমর্থ হইল।

"আর একটী কথা আপনি নোট করিয়া লইতে পারেন। যে গোবি একদিন মেয়ো হাসপাতালের উদ্দেশে টাকা তুলিবার জন্য সৈরিন্ধ্রী-বেশে টাউন হলে অভিনয় করিয়াছিল, সে এখন এল্‌বার্ট ভিক্টর হাঁসপাতাল ও কলিকাতার উত্তরাংশে আর একটী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে সফলপ্রযত্ন হইয়াছে। সৈরিন্ধ্রীবেশে গোবিকে আমি ঈর্ষাকষায়িত-লোচনে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার সুন্দর অভিনয় দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম। আজ আমার আনন্দের সীমা নাই।

"আমাদের ষ্টেজ ও সীন ছিল না। ভাঙ্গা দল যখন টাউন্ হলে গেলেন, আমরা পরামর্শ করিলাম 'অপেরা হাউস্' ভাড়া লইয়া প্লে করিতে হইবে। টাউন্ হলে নীলদর্পণ অভিনয়ের কিছু পরেই আমরা লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে মাইকেলের শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয় করিলাম। দুই রাত্রি অভিনয় হইল। অনেকগুলি প্রহসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

—মানসী ও মর্ম্মব



এই প্রহসন-সাহিত্য সম্বন্ধে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। আজ সুধু দুটি একটি কথা আপনাকে বলিতে পারি। ক্যাম্বেল সাহেবের আমলে সব ডেপুটী তৈয়ার করিবার জন্য ইস্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। Botany, Chemistry, আইন, জরীপ করা, সন্তরণ, জিম্ন্যাষ্টিক প্রভৃতি নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিলে তবে সব্ ডেপুটী হইবার সম্ভাবনা হইত। গভর্মেণ্টের সার্কুলার প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই অমৃত-বাজার পত্রিকায় একটি চমৎকার Cartoon বাহির হইল; কয়েকজন জিম্ন্যাষ্টিকের পোষাক পরা বাঙ্গালী যুবক সার গাঁথিয়া দণ্ডায়মান,—তাহাদের কাণে চিম্‌টে, কোমরে শিকল। সব্ ডেপুটী হইবার সমস্ত সরঞ্জাম বর্ত্তমান। আমাদের থিয়েটরের জন্য প্রহসনের সুন্দর মাল মসলা পাওয়া গেল। বেশ মজাদার ফার্স রচিত হইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতেই নেলার সাহেবের ডাক্তারখানা লইয়া আমরা কত হাসি ঠাট্টাই যে করিতাম তাহা বলা যায় না; সাহেবের গলার স্বর, কথা কহিবার ভঙ্গি আমরা সুন্দররূপে অনুকরণ করিয়াছিলাম। তখন অনেক ডিস্পেন্সরিতে মদ্য বিক্রয় হইত; এ সমস্তই আমাদের প্রহসন সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া গেল।

"এই প্রহসন-সাহিত্য অনেকটা আমাদের মুখে মুখে রচিত হইয়াছিল। অর্দ্ধেন্দু, গোবি, গোপাল দাস, মল্লি, নগেন, বেলবাবু ও আমি সকলে মিলিয়া মুখে মুখে একখানা impromptu farce শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে রচনা করিয়া ফেলিতাম।

"আমাদের সেই যৌবনের প্রহসন-সাহিত্যের কথা আলোচনা করিতে বসিয়া আজ অর্দ্ধেন্দুর কথা বড় বেশী মনে পড়িতেছে। 'নব-নাটকে' অর্দ্ধেন্দুর কর্ত্তা-ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া মনে পড়ে; বহুরূপী অর্দ্ধেন্দু-শেখর এই কর্ত্তা সাজিয়া যে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে এখনও আমার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে; আমার দৃঢ় ধারণা, এইটিই অর্দ্ধেন্দুর masterpiece। পূর্ব্বে অক্ষয় মজুমদার এই ভূমিকায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে যথেষ্ট বাহাদুরি দেখাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু অর্দ্ধেন্দু যেন 'কর্ত্তা'কে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। অর্দ্ধেন্দুর মুখে শুনি-য়াছি যে অক্ষয়বাবুর অভিনয় দেখিয়া তাঁহার ঐ ভূমিকায় অভিনয় করিবার সাধ হয়। অক্ষয় মজুমদার তাঁহার আদর্শ ছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার আদর্শকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন। মনোমোহন বসুর প্রণয়-পরীক্ষা নাটকে গুলিখোর জামাই নটবরের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুকে মনে পড়ে। শিশির বাবুর 'নয়শো রূপেয়া'য় ছাতুলাল বেশে অর্দ্ধেন্দুর নিলাম-ডাকা মনে পড়ে। অনেক কথা মনে পড়ে; একদিন ভাল করিয়া অর্দ্ধেন্দুর acting সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলিব; আজ নয়। আজ সুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে আমরা 'বিলাতী বাবু', 'মডেল স্কুল' ও 'উপাধি বিতরণ' প্লে করিয়াছিলাম; অখিল বাবুর ব্যায়াম-ক্রীড়াও সে রঙ্গমঞ্চে দেখান হইয়াছিল।

"সেখানকার নাট্যলীলা আমাদের অল্পদিনের মধ্যেই সাঙ্গ হইয়া গেল; আমরা কালী সিংহের একটা হল্ ভাড়া লইয়া ষ্টেজের প্ল্যাট্ফরম বাঁধিতে লাগিলাম।

"এমন সময়ে কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইবার প্রস্তাব হইল। আমাদের সকলেরই খুব উৎসাহ। অর্দ্ধেন্দু, আমি, নগেন, কিরণ, ক্ষেত্র গাঙ্গুলী, বেল বাবু বিহারী বসু প্রভৃতি সকলেই বিদেশে যাইতে প্রস্তুত। মেয়ে সাজিবার জন্য মহেন্দ্র সিংহ নামে একটী সুন্দর ছেলে পাওয়া গেল। ঢাকার মোহিনীমোহন দাসের নামে একখানি পত্র বলাই সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।

"তখন সপ্তাহে একদিন মাত্র ষ্টীমার গোয়া-লন্দ হইতে ছাড়িত; যেখানে সন্ধ্যা হইত, সেইখানেই জাহাজ নোঙ্গর করা হইত। জাহাজে আহারাদির অসুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঢাকায় যে রাঁধুনি বামুন পাওয়া যাইবে না, তাহা আমরা পূর্ব্বে কল্পনাও করি নাই। শেষে দলের মধ্যে যাঁহারা বেচারা

ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের উপর রন্ধনশালার ভার অর্পিত হইল। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক কালী বাবু আমাদের সঙ্গে ছিলেন; ইনি পরে ঈডন্ হিন্দু হষ্টেলের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন।

"ঢাকার আতিথ্য-সৎকার আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। মোহিনী বাবুর হাতে চিঠি দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি একটি প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। সেই বাগানবাড়ীটী ঠিক বুড়ীগঙ্গার তীরে অবস্থিত। বুড়ীগঙ্গা তখন কূলে কূলে প্রবাহিত। বড় বড় ষ্টীমার ঢাকা সহরের কিনারায় গিয়া লাগিত। রবিবার দিন প্রাতে কলিকাতা হইতে ষ্টীমার ছাড়িলে পরদিন বৈকালে উহা ঢাকায় গিয়া পৌঁছিত।

"ঢাকা সহরে একটি বাঁধা ষ্টেজ ছিল। বেশী কাল-বিলম্ব না করিয়া আমরা সেই ষ্টেজে 'নীলদর্পণ' লইয়া অবতীর্ণ হইলাম; নবাববাড়ীর ব্যাণ্ড ও মোহিনী বাবুর কন্সার্ট আমাদিগকে সাহায্য করিল; সহরের ছোট বড় সকলেই আমাদের অভিনয় দেখিতে আসিলেন—কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অভয় দাস, ডাক্তার কেদার-নাথ ঘোষ, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ রাম্পীনি, পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওয়েদারল্ ও অন্যান্য অনেকে আসি-লেন। এক রাত্রেই আমরা কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম।

"ঢাকায় অবস্থানকালে সেখানকার বড় বড় ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত তত্রত্য স্কুল কলেজের ছাত্র-দিগের যে প্রীতির সম্পর্ক দেখিয়াছিলাম, তাহা শুনিলে আপনি অবাক হইয়া যাইবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার সাহেবকে বাঙ্গালী ছেলেদের সহিত রাস্তায় দাঁড়াইয়া গল্প করিতে দেখিয়াছি।

"প্রায় একমাস আমরা ঢাকায় রহিলাম। অনেক-গুলি নাটকের অভিনয় করিলাম। অর্দ্ধেন্দুকে লইয়া সমস্ত সহর উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আমাদের দেশের থিয়েটরের অন্য কোনও অভিনেতাকে..অমন করিয়া আর কেহ lionise করিয়াছে কি না জানি না।

"বেঙ্গল টাইম্স্ পত্রিকায় আমাদের 'নীলদর্পণ' অভি-নয়ের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা বাহির হইল। আমি একটি ছোটখাটো ফার্স রচনা করিয়া পরদিন সন্ধ্যার পর মুদ্রিত বেঙ্গল টাইম্স্ কাগজে পেণ্ট্‌লান, কোট, টাই প্রভৃতি রচনা করিয়া তদ্দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ষ্টেজের উপর দাঁড়াইয়া প্রাণ খুলিয়া কেম্প সাহেবকে বিদ্রূপ করিলাম। মজা এই যে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ রাম্পীনি ও পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওয়েদারল্ বাঙ্গালী দর্শকবৃন্দের হাস্যতরঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

"আমরা 'হিন্দু ন্যাশনাল্ থিয়েটর' নাম লইয়া ঢাকায় আসিয়াছিলাম। ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। আমাদের দলের খ্যাতির কথা শুনিয়া অপর দলের আমাদের পুরাতন বন্ধুরা ঢাকায় গেলেন। তাঁহারা মোহিনীবাবুর মেজো ভাইয়ের (রাধিকাবাবু) আশ্রয় লইলেন। দুর্ভাগ্য-ক্রমে আগে আমরা আসর লইয়াছিলাম বলিয়া ঢাকায় তাঁহারা আসর জমাইতে পারিলেন না। আমাদেরই বাগানবাড়ীর সন্নিকটে লক্ষ্মীবাড়ীতে তাঁহাদের আড্ডা হইল। তাঁহারা জীবন বাবুর বাড়ীতে থিয়েটর করিলেন।

"এইখানে আপনাকে একটা বিষয়ে একটু সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। আপনার মুখে শুনিতেছিলাম যে এই দলটিকে 'বিশ্বকোষে'র লেখক 'ধর্ম্মদাস বাবুর দল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ন্যাশন্যাল থিয়েটরের কোনও ব্যক্তি যে যাত্রার দলের অধিকারীর মত একটা স্বতন্ত্র দল গড়িয়াছিলেন, তাহা নহে। যে দলে মহেন্দ্র বসু, গোপাল দাস, মতিলাল সুর, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তিনকড়ি বাবু ও ধর্ম্মদাস বাবু ছিলেন, সে দলকে ধর্ম্মদাস বাবুর দল বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে কেন? বরঞ্চ তাহাকে রাজেন্দ্র পালের দল বলিলে সুশোভন হইত।

"প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অনেকেই এক একজন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কেহ কেহ পীড়িত হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদিগকে লইয়া আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। উভয় দলের যে ঠিক মিলন হইল এমন কথা বলা যায় না। কিছুদিন পরে দিঘাপতিয়ার

রাজকুমারের (এখন রাজা প্রমদানাথ রায়) অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ন্যাশন্যাল থিয়েটরের নিমন্ত্রণ হয়। তখন দুই দলের অধিকাংশ লোকই একত্র হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি গেলাম না। নগেন, কিরণ ও আরও কয়েকজন গেলেন না।

"এদিকে ছাতুবাবুর (৺আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরৎবাবু (৺শরৎচন্দ্র ঘোষ) ছাতুবাবুর বাড়ীর সম্মুখের মাঠে একটী নূতন খোলার ঘরে বেঙ্গল থিয়েটর নাম দিয়া একটি নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটরে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল। তিনি বলিলেন—'তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটর খোল; আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া দিব; স্ত্রীলোক না লইলে কিছুতেই ভাল হইবে না।' মাইকেল ও শরৎবাবুর ভগ্নীপতি Mr. O. C. Dutt. (৺উমেশচন্দ্র দত্ত) অগ্রণী হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস দাস ('হরি বৈষ্ণব' নামে ইনি পরিচিত), গিরীশচন্দ্র ঘোষ (হ্যাদাড়্ গিরীশ), দেবেন্দ্র নাথ মিত্র, বটুবাবু (ইনি প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুড়া), প্রিয়নাথ বসু (ছাতুবাবুর ভাগিনেয়), অক্ষয়কুমার মজুমদার প্রভৃতি যোগ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যে চারিজন স্ত্রীলোককে বাছাই করিয়া লওয়া হইল, তাহাদের নাম জগত্তারিণী, গোলাপ (পরে সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী ও শ্যামা।

"১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' লইয়া বেঙ্গল থিয়েটর অভিনয় আরম্ভ করে। এবারে এ ষ্টেজেও মাইকেলের নাটক জমিল না। তাঁহার রচিত 'মায়াকানন' লইয়া যে তাঁহারা অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন এমন কথা বলা যায় না।

"এমন সময়ে মোহান্ত এলোকেশীর ব্যাপার লইয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন হইল; পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই লোকের মুখে ঐ বিষয়ের আলোচনা চলিতে লাগিল। বেঙ্গল থিয়েটর সময় বুঝিয়া 'উঃ মোহান্তের এই কি কাজ!' নামে একখানা নাটক ষ্টেজে খাড়া করিলেন। সমস্ত দেশের লোক যেন সেদিন বেঙ্গল থিয়েটরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। থিয়েটরের কপাল ফিরিয়া গেল।

"তাহার পর প্রতি শনিবার রাত্রে 'মোহান্তের এই কি কাজ' অভিনীত হইতে লাগিল। ধর্ম্মদাস বাবু, নগেন বাবু, ভুবন নিয়োগী ও আমি একদিন বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনয় দেখিবার জন্য থিয়েটরের দ্বারদেশে গিয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া টিকিট কিনিতে পারিলাম না।

"অর্দ্ধেন্দু তখন কলিকাতায় ছিলেন না, নানা দেশ-বিদেশে মিশনরির মত ঘুরিতেছিলেন। একথা আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে চাই যে, থিয়েটরের যদি কেহ কখনও মিশনরি হইয়া থাকেন তাহা হইলে একমাত্র অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি ভিন্ন আর কাহারও নাম করা যায় না। কলিকাতায় বসিয়া আমরা যখন নূতন ষ্টেজ্ করিবার কল্পনা করিতেছিলাম, অর্দ্ধেন্দু তখন বঙ্গের বাহিরে অভিনয়-কলাকে জনসাধারণের আদরের সামগ্রী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

"ইতিমধ্যে আমরা একবার চুঁচড়ায় গিয়া 'মোহান্তের এই কি কাজ' অভিনয় করিয়া আসিলাম। এলোকেশী সাজিলেন ক্ষেত্র গাঙ্গুলী; নগেন, নবীন সাজিলেন; আমি হইলাম এলোকেশীর বাবা।

"এদিকে মহেন্দ্রনাথ দাসের নিকট হইতে জমি ভাড়া লইয়া আমরা গ্রেট্ ন্যাশানাল্ থিয়েটর নাম দিয়া লিউয়িস্ থিয়েটরের অনুকরণে একখানি কাঠের বাড়ী তৈয়ার করিলাম। দেখুন, আমরা তখন ছন্নছাড়া হইয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি। লিউইস্ থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষেরা পুরাতন সুলতানার বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া অন্যত্র নূতন থিয়েটর স্থাপিত করিল। ধর্ম্মদাস, নগেন ও আমি সুলতানার বাড়ীর মডেল দেখিয়া আসিলাম। ধর্ম্মদাস ঐ মডেলের অনুকরণে নূতন থিয়েটরের বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে কখনও কোথাও engineering শেখে নাই। আমি দিবারাত্র তাহার সঙ্গে থাকিতাম। আমরা 'পিট'এর টিকিট কিনিয়া লিউইস্ থিয়েটরের অভিনয়

দেখিতে গেলাম। অতদূরে বসিয়াও ধর্ম্মদাস curtainএ কয় পর্দ্দা কাপড় লাগে তাহা ঠিক করিয়া লইল; কিছুক্ষণ পরে বাজারে কাপড়ের দোকানে গিয়া কাপড়ের বহর দেখিয়া সমস্ত নিজে জোগাড় করিয়া লইল। এই জন্যই আমি বলি যে, ধর্ম্মদাস বাঙ্গালীকে ষ্টেজ নির্ম্মাণ করিতে শিখাইছেন; অর্দ্ধেন্দু ও গিরিশ বাবু বাঙ্গালীকে অভিনয় করিতে শিখাইয়াছেন। এই ষ্টেজ নির্ম্মাণ করাইতে ভুবন নিয়োগীর প্রায় ত্রয়োদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

"সে যাহা হউক, এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটর রহিয়াছে ঐখানে আমাদের নূতন থিয়েটরের ষ্টেজ নির্ম্মিত হইল; কিন্তু কি নাটক অভিনীত হইবে তাহা স্থির হইল না। বেঙ্গলে তখন 'মায়াকানন' লইয়া নাড়াচাড়া করা হইতেছে; জমাট বাঁধিতেছে না। বাজারে এমন নূতন কোনও বই নাই যাহা ষ্টেজের উপর চলনসই হইতে পারে। মহা বিভ্রাটে পড়া গেল। নগেন আমাকে বলিলেন—'তুমি না হয় একটা লিখে ফেল; ঐ মায়াকানন ভেঙ্গে টেঙ্গে একটা যা হয় কিছু তৈয়ার করে দাও।' আমি ও দেবেন্দ্র নামক মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, দেবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—আমরা কয়জন মিলিয়া 'কাম্যকানন' নামে একটা নাকটই বলুন আর Fairy Taleই বলুন রচনা করিয়া ফেলিলাম। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর আমাদের গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটর খোলা হইল। মিঃ উমেশচন্দ্র দত্ত (Mr. O. C. Dutt.) আমাদিগকে বলিলেন—'তোমাদের এই নতুন থিয়েটরের দেয়ালের গায়ে আমি লিখে দিচ্চি যে স্ত্রীলোক অভিনেত্রী বাদ দিয়ে তোমাদের এ থিয়েটর ১৭।১৮ দিনের বেশী চল্‌বে না।' তিনি যাহা বলিয়াছিলেন বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই নূতন ষ্টেজে আমরা নিছক পুরুষ মানুষ লইয়া পূর্ব্বের মত অবতীর্ণ হইলাম।

সে রাত্রে আমাদের থিয়েটর-ভবন দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি সেদিন কাম্যকাননের নায়করূপে অবতরণ করিয়াছি। ষ্টেজের উপরে ভীমা কালীমূর্ত্তি! নৃমুণ্ডমালিনীর সর্ব্বাঙ্গে লাল আলোক-রশ্মি ঈষৎ কাঁপিতেছিল। সম্মুখে চিনির নৈবেদ্য জ্বলিয়া উঠিল। আমি জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিতে-ছিলাম—'মা কি অগ্নিমূর্ত্তিতে আমার পূজা গ্রহণ করিলেন?'......অমনি চারিদিক হইতে 'আগুন! আগুন!' ধ্বনি উত্থিত হইল; দুপ্ দাপ্ করিয়া দর্শক-গণ লাফাইয়া পড়িতে লাগিলেন। Auditoriumএর দিকে চাহিয়া দেখি আমাদের কাঠের বাড়ীর সম্মুখের দেওয়াল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! সেই লেলিহান অগ্নিশিখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ষ্টেজের উপরে আমি চিত্রাপিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। মাথা ঘুরিয়া গেল। সহসা দেখিলাম,—দুই হাতে সেই চঞ্চল লোকের ভিড় ঠেলিয়া ব্যায়াম-বীর অখিল সেই অনলশিখার সম্মুখীন হইয়া ঘুসি ও লাথি মারিয়া মড় মড় করিয়া তক্তা ভাঙ্গিতেছে। আমার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। যে য়ুরোপীয় কন্‌ষ্টেবল্ দর্শকবৃন্দের রক্ষার জন্য সে রাত্রিতে তথায় উপস্থিত ছিল, অন্বেষণ করিয়া তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। জনৎতক বাঙ্গালী যুবক অখিলকে সাহায্য করিল। কাঠের বাড়ীর এক অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হইল।

"বাহিরে দর্শকবৃন্দ একত্র হইয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিল। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, আমাদের শত্রুরা এই কাজ করিয়াছে। বাহিরের লোকেরা 'টিকিটের পয়সা ফিরিয়ে দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মনোমোহন বসু মহাশয় তাহা-দিগকে ভাল কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; তাঁহার কথা তাহারা উড়াইয়া দিল। অর্দ্ধেন্দু তাহাদিগকে একটা বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করিয়া বিফল-কাম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন মিঃ উমেশ চন্দ্র দত্ত ও ভুজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলিলেন—'তুমি যা হয় একটা কিছু বল; ঠাণ্ডা

কথবার চেষ্টা কর।' আমার তখন সেই hero'র বেশ পরা ছিল। ভদ্রলোকদিগের সম্মুখে জোড়হস্তে দাঁড়াইলাম। তাঁহারা চুপ করিলেন। আমি বলিলাম,—'আমার একটি নিবেদন আছে; আপনারা অনুগ্রহ করিয়া শুনিবেন কি?' তাঁহারা বলিলেন—'শুনিব।' আমি ষ্টেজের উপরে হাঁটু গাড়িয়া বসিলাম। বিনীত ভাবে বলিলাম—'আপনারা আমাকে দুটা কথা বলিবার অনুমতি দিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। আজ আমাদের বড় সাধে আগুন লাগিয়াছে; আমাদের দুঃখের গভীরতা আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে একটু চেষ্টা করিবেন কি? কত খরচপত্র সাধ্য সাধনা করিয়া আমরা এই ষ্টেজ্ গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, কত আনন্দে ও উৎসাহে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, আপনাদিগকে তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? আমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়া কেহ এ কাণ্ড ঘটায় নাই। বেশ দেখা যাইতেছে যে, দেওয়ালের গায়ে গ্যাস-বাক্সে চিম্‌নি বসান হয় নাই; তাই উত্তাপের আধিক্য বশতঃ এই অগ্নিকাণ্ড হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। আপনারা জানিবেন, এমন শত্রুতা মানুষে করিতে পারে না। (চারিদিক হইতে 'না, না,' শব্দ ধ্বনিত হইল)। এখন টিকিট-বিক্রয়-লব্ধ পয়সা কেমন করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া যায়? আপনারা সকলেই নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আপনাদের নিকটে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে একদিন আপনারা বিনা পয়সায় আমাদের অভিনয় দেখিতে পাইবেন।'......তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। এখানে বলিয়া রাখা ভাল,—'কাম্যকানন' আর কখনও অভিনয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। সে কাজ ভালই হইয়াছে।

"পরদিন,—১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে—বেলভেডিয়ারে Fancy fair উপলক্ষে আমরা অভিনয় করিলাম।"

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কবে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিব, বারম্বার এই প্রশ্ন করিয়া চিকিৎসকদিগকে উত্যক্ত করিয়া তোলা আমার পক্ষে যত সহজসাধ্য, ইচ্ছানুরূপ অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্যকে আনিয়া হাজির করা চিকিৎসকগণের পক্ষে তত সহজ ছিল না। যতই কাল বিলম্ব হইতে লাগিল, ধৈর্য্যরক্ষা করা আমার পক্ষে ততই কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার বৈদ্য সকলে আমার রোগশয্যার ত্রিসীমানায় প্রাণান্তে যাইতে চাহিতেন না। আমি কখনও রাগ করিয়া কখনও অভিমান করিয়া কোনরূপে আমার দুঃখের দিনগুলি কষ্টে অতিবাহিত করিতাম। সে রাগ, সে অভিমান কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নহে—বোধ করি নিজের দুরদৃষ্টের উপরে এই রাগ, বিধাতার উপর এই অভিমান। চারিদিকে যাহাকেই দেখি, সুস্থ শরীরে সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, আর আমি পূর্ব্ব বা ইহজন্মে কি এমন করিয়াছি যাহার জন্য দীন দুঃখী ভিক্ষান্নজীবী দরিদ্রের পক্ষে সহজ প্রাপ্য যে স্বাস্থ্যটুকু, তাহা হইতে বিধাতা বারম্বার বঞ্চিত করিয়া আমার দুঃখের ভার এমন করিয়া দুঃসহ করিয়া তুলিতেছেন! বিধাতার উপর, শুধু অভিমান কেন, তদপেক্ষা অনেক অধিক চলে। অনেক সময়ে আমরা যখন

সম্মুখস্থ কাহাকেও দোষী করিবার মত না পাই, বা পাইয়াও যাহাকে দোষী করা আমাদের শক্তি এবং সাধ্যে কুলাইয়া উঠে না, তখন ইন্দ্রিয়াদির চির-অবিষয়ীভূত, বেচারা বিধাতাকে লইয়া পড়ি; তাঁহাকে পক্ষপাতী, নির্ব্বিবেকী এবং আরও কত কি কটু-কাটব্য কহিয়া আমাদের গায়ের জ্বালা নিবারণ করিয়া থাকি,—আমিও তাহাই করিতে লাগিলাম। তাহাতে মনের বিষ কতকটা উদ্গিরীত হয় বটে,কিন্তু পণ্ডিতের যে নির্ধনত্ব, উদধিজলের যে অপেয়ত্ব, যুবতীর যে অসৌন্দর্য্য এবং যুবজনের যে স্বাস্থ্যহানির জন্য এত নালিশ দরপেশ হয়, তাহার কিন্তু কোন প্রতিবিধানই করা যায় না। অসময়ে সৌন্দর্য্যহানি না হইতে পারে তাহার জন্য যুবতীকেই পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়; নির্ধনত্ব নিবারণ করিবার জন্য বিদ্যাবিনোদী ধনবানের আশ্রয় অবলম্বন করা পণ্ডিতেরই কর্ত্তব্য; স্বাস্থ্যভঙ্গ না হইতে পারে তাহার উপায় যুবকেই অবলম্বন করিতে হয় এবং হইলে চিকিৎসিত হওয়া এবং ধৈর্য্যধারণ করা তাহারই কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া "নির্ব্বিবেকী বিধাতা" বলিয়া বসিয়া থাকিলে যুবতীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বিধাতা আসিয়া নিবারণ করিবেন না,পণ্ডিতের মুখে অন্ন পিণ্ড তুলিয়া দিবার জন্য তাঁহার মর্ত্ত্যে আগমন-প্রতীক্ষা শাস্ত্রিগণের পক্ষে নিতান্তই নিরর্থক হইবে।

চিকিৎসার ফলপ্রাপ্তির আশায় সময় প্রতীক্ষা না করিয়া বাক্য-মন-ইন্দ্রিয়ের অগোচর-জনকে উদ্দেশ করিয়া কোন কটুভাষণের ফল যে কিছু নাই, তাহা বুঝিতে আমার বহু বিলম্ব হইল না। রোগীকে সকলেই সান্ত্বনা দিয়া থাকে, মিথ্যা করিয়াও রোগ-মুক্তির সময় সন্নিকট জানাইয়া তাহাকে আশ্বাস দেয় বটে, কিন্তু আমার ব্যাধির প্রকৃতি এবং অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসকগণ আমাকে ধৈর্য্যধারণ করিতে বারম্বার বলিতেছিলেন, ন্যূনকল্পে যে সময় লাগিবার সম্ভাবনা আমাকে তাঁহারা জানাইতেন, তাহাতে আমার ধৈর্য্য-ধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিত। আমার নালিশ বিধাতার দরবারে পেশ করিবার জন্য মনকে ওকালতনামা দিতাম, সে যেমন জানে তেমনি করিয়া আরজি লিখিয়া দাখিল করিত। যদিও সত্বর ফল পাইবার জন্য এই মামলা রুজু করা, তবুও দেখিলাম সে আশা আমার সফল হইল না। মোকদ্দমাতেই কোন জোর ছিল না—কিম্বা উকীলের আরজি লিখিবার দোষে আমি ফল পাই নাই সে কথা সেদিনও বুঝি নাই—আজও বুঝি না—ইহার পরেও বুঝিতে পারিব কি না, কি জানি!

অস্ত্রচিকিৎসা হইয়া গিয়াছে, আরোগ্যের পথে দাঁড়াইয়াছি, সে আরোগ্য শীঘ্র আসিতেছে না কেন এই জন্য নিজে অধীর হইয়াছিলাম এবং সকলকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে 'সম্মোহন' ঔষধের প্রভাবে আমাকে হতচেতন করিয়া একবার মাত্র অস্ত্রচিকিৎসাই আমার দুরারোগ্য ব্যাধির পক্ষে যথেষ্ট নহে; তখন জানিতাম না যে ঐ অসীম যন্ত্রণাপ্রদ ব্যাধির উপশমের জন্য আমাকে হত চেতন করিয়া আমার অন্ত্রমধ্যে বারম্বার অস্ত্রাঘাত করিতে হইবে; তখন জানিতাম না যে দুই চারিদিনের জন্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াই অভিলষিত আরোগ্য আমি পাইব না—আমাকে সেই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইতে মুক্তির প্রত্যাশায় নির্ব্বাক মৌন অবলম্বন করিয়া বহু ধৈর্য্যে বহুকাল ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

যখন আশা করিতেছিলাম ব্যাধির ভোগ শেষ হইয়াছে, আসুরিক অস্ত্রচিকিৎসা এবং "সম্মোহন আরকের" প্রভাব-জনিত আপাত-প্রাণনাশের আশঙ্কা বিদূরিত হইয়াছে, আরোগ্য আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে, তখন আবার নূতন করিয়া ব্যাধির যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। সভয়ে চিকিৎসকগণ আমার অভিভাবকদিগকে জানাইলেন যে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অস্ত্র-প্রয়োগ হইবে এবং সেইবারই যে শেষ তাহাও সুনিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। আমার নিকটে সমস্ত কথা যথাযথভাবে কেহ না বলিলেও, রোগযন্ত্রণার আধিক্য হইতেই আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমার ক্লেশভোগের শেষ হয় নাই—তখনও অনেক বাকী। রাজধানীর চিকিৎসকবর্গ, মন্ত্রিসঙ্ঘ এবং অপরাপর লোকেরা যখন গোপন

মন্ত্রণা লক্ষ্য করিয়া এবং আমার মাতাঠাকুরাণীর বিষন্ন মুখচ্ছবি ও সজল চক্ষু দেখিয়া সে ধারণা আমার মনে আরও বদ্ধমূল হইল।

প্রশমিত রোগযন্ত্রণা পুনরায় যখন পূর্ব্ববৎ অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন কলিকাতায় গিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার ইচ্ছা আমি প্রকাশ করিলাম। রোগ সারিয়াও সারিল না; আনুসঙ্গিক ব্যথা বেদনা লইয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আমার মনের মধ্যে কি হইতে লাগিল সে কথা বিশেষভাবে বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই—আমার পাঠক পাঠিকাগণ তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। এ ব্যাধি হইতে উদ্ধার পাইবার আশা আমার মন হইতে একেবারেই তিরোহিত হইল—ভাবিলাম মৃত্যু অবধারিত।

নিশ্চিত অশুভকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়াও যৌবনারম্ভের দিনে জীবনাশা হৃদয় হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিতে কেহ পারে কি না জানি না;—আমি পারি নাই, এবং কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার দ্বারা যে চিকিৎসা করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, চিত্ততলের নিগূঢ় জীবনাশাই তাহার একমাত্র কারণ। মনে হইয়াছিল, কলিকাতার বহুদর্শী ও বিজ্ঞ চিকিৎসক হয়ত আমাকে রোগমুক্ত করিয়া দিতেও পারে; এবং না পারিলেও, পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় লইবার পূর্ব্বে অন্ততঃপক্ষে জানিয়া যাইতে পারিব যে অনুপযুক্ত চিকিৎসকের হস্তে সদোষ-চিকিৎসার ফলে আমার অকালমৃত্যু ঘটিল না।

মানবজীবনে এমন সময় আইসে যখন গৃহে বা প্রান্তরে, শয্যায় বা পথের ধূলায়, স্বজন সমাবৃত হইয়া বা নির্ব্বান্ধব স্থানে নিঃসঙ্গ অবস্থায়,—যেখানে যখন যেমন করিয়া নয়নের শেষ-নিমেষপাত হইয়া যাউক না কেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। জীবনে এমন দিনও আইসে, যখন প্রতিদিনের দিনপাত নিতান্ত আনন্দহীন আয়ুযাপন মাত্র বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেদিনের কথা আজ লিখিতেছি, সেদিনে নরনারী জীবনকে বড় আঁকড়াইয়াই ধরে; সে দিনে চিত্ততলে আশা-আশঙ্কা, বাসনা-কামনার অন্ত থাকে না; সেদিনে ভবিষ্যতের আনন্দময় দিনপাতের আশায় যে কোনও উপায়ে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

কেবল মাত্র আমি আমার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম তাহা নহে, আত্মীয়স্বজন সকলেই মনে করিয়াছিলেন, ঐ ব্যাধিই আমার শেষ ব্যাধি হইয়াছে এবং ঐ ঝটিকাতেই আমার জীবনবর্ত্তিকা অকস্মাৎ অকালে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। আমার মাতাঠাকুরাণী, যিনি আমার শৈশবাবধি পরমস্নেহে আমাকে লালন পালন করিয়াছেন; বহু দুরারোগ্য ব্যাধির দুঃসহ যন্ত্রণার সময়ে যিনি আমাকে, বহুদিন অনাহারে থাকিয়া, বহু রজনী কাটাইয়া, তাঁহার স্নেহকোমল মাতৃহস্তের আগ্রহাকুলিত শুশ্রূষায়, যমের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া জীবনের পথে টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিও ভাবিয়াছিলেন এবারে এই ব্যাধি আমার কালব্যাধি হইয়াছে। একবার রোগ আরোগ্যের পথে আসিয়া আবার বৃদ্ধির মুখে তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিলে এ ধারণা হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক;—বিশেষতঃ স্নেহশীল মাতৃহৃদয় সন্তানের ব্যাধি-পীড়ার সময়ে কি আকুল আশঙ্কায় যমযাতনা ভোগ করে, সন্তানের জননী না হইলে, সন্তানকে লালন পালন না করিলে অপর কেহ তাহার যথাযথ পরিমাপ করিতে পারে না।

"অনিষ্টশঙ্কানি বন্ধুহৃদয়ানি"—ইহার মত সত্যকথা জগতে আর অধিক নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস; কারণ নিজের জীবনে বহুবার বহুপ্রকারে এ কথার প্রমাণ আমি নিজেই পাইয়াছি।

চিকিৎসার্থ কলিকাতা যাইবার প্রস্তাব আমি করিবামাত্র সকলে একবাক্যে সম্মতি দিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া তাহার উদ্যোগ অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। রাজধানীর চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ততদিন পর্য্যন্ত মহারাণীগণ রাজধানী ত্যাগ করিয়া তীর্থস্থান ব্যতীত অন্য কোথাও যাইতেন না,—এমন কি তাঁহাদের

পিত্রালয়ে যাইবার প্রথা ছিল না এবং আজও নাই; পিতৃকুলের যাঁহারা, তাঁহারা রাজধানীতে আসিয়া তাঁহাদের স্নেহের পাত্রীকে দেখিয়া যাইবার অনুমতি মাত্র পাইতেন; কন্যা জামাতা বা দৌহিত্র দৌহিত্রী-দিগকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া স্নেহমিলনের বিমলানন্দের মধ্যে জীবনের দুই একটি দিন কাটাইবার সৌভাগ্যটুকুও তাঁহাদের হইত না। রক্তপট্টাম্বর-পরিহিতা সিন্দুরাঙ্কিত-সীমন্তশ্রী মা আমার যেদিনে কল্যাণী রাজবধূরূপে আমার পিতামহীর আনন্দদুলালী হইয়া সলজ্জপাদ-বিক্ষেপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে, যে দিনের কথা বলিতেছি সেই দিন পর্য্যন্ত, গৃহদেবতার মন্দিরাঙ্গন ব্যতীত রাজাবরোধের চতুঃসীমার বাহিরে পদার্পণ করেন নাই। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজধানীর চিরন্তন নিয়মকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দুরারোগ্য ব্যাধি-পীড়িত সন্তানের সঙ্গে কলিকাতায় আসিবার আন্তরিক ইচ্ছা তাঁহার অন্তরেই দমিত করিয়া মাতৃমনের অকৃত্রিম শুভাশীর্ব্বাদ এবং গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের নির্ম্মাল্য পুষ্প ও তুলসীপত্র সঙ্গে দিয়া এক অনুকূল-তিথি-নক্ষত্র-সমন্বিত দিনের অপরাহ্ণে স্নেহভারাতুর শঙ্কিত হৃদয়ে তাঁহার নিদারুণ রোগক্লিষ্ট সন্তানকে বারম্বার আরোগ্যের আশ্বাস দিয়া সজলনেত্রে বিদায় দিলেন। তাঁহার অন্তরাত্মা সেদিনে কি বলিতেছিল তাহা তিনিই জানিতেন, আর তাঁহারাই জানেন, যাঁহাদিগকে অনিশ্চিত-পুনর্ম্মিলনের মধ্যে পরমস্নেহের একমাত্র জনকে পাষাণে বুক বাঁধিয়া একান্ত অনিচ্ছায় বিদায় দিতে বাধ্য হইতে হয়।

উপযুক্ত দাসদাসী, রাজধানীর প্রবীণ বিজ্ঞ মন্ত্রিসঙ্ঘ, চিকিৎসক প্রভৃতি আমার সঙ্গে চলিল। আত্মীয়ের মধ্যে আমার এক মাতুল (৺বনওয়ারীলাল লাহিড়ী) স্নেহপ্রণুক্ত আমার সহিত কলিকাতায় আসিলেন। এই বনওয়ারীলাল মাতার সহোদর ভ্রাতা ছিলেন না, কিন্তু বাল্যকাল হইতে অনেক সময়ে তাঁহার রাজধানীতেই কাটিয়াছে; মাতা এবং মাতুল উভয়পক্ষের স্নেহ ভক্তি দেখিয়া, তাঁহারা সহোদর সহোদরা নহেন এরূপ ধারণা করা কঠিন হইত।

বনওয়ারী বাল্যকাল হইতেই মাতৃহীন। তাঁহার এই ভগিনীটির নিকট হইতে তিনি প্রচুর পরিমাণে মাতৃস্নেহ পাইয়া আসিয়াছেন। প্রতিদানে বনওয়ারী আমার মাতার পাদপদ্মে প্রচুর ভক্তি এবং ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদিগকে অনেক স্নেহ আদর ভালবাসা, ব্যাধি-পীড়ার সময়ে অনেক সেবা শুশ্রূষা যত্ন দিয়া গিয়াছেন। আজি বনওয়ারী নাই, প্রয়োজনের দিনে আজ চতুর্দ্দিকে চাহিয়া যখন তাঁহার মত কাহাকেও দেখিতে পাইনা, তখন সেই পরলোকগত আত্মীয়টির অভাব কেমন করিয়া অনুভব করি আমিই জানি।

আমার সেই নিদারুণ যন্ত্রণাপ্রদ দুশ্চিকিৎস্য পীড়ার দিনে বনওয়ারী স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; এবং সেদিনে যে সেবা দিয়া গিয়াছেন, ঘনায়মান জীবন-সন্ধ্যায় আজ সেরূপ দুঃসময় যখন আসিবে, তখন আকুল নয়নে চারিদিকে চাহিলে, কাহারও সন্ধান পাওয়া যাইবে কিনা তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন।

পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যার গাড়ীতে যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতে কলিকাতায় পঁহুছিলাম। চলৎ-শক্তিহীন আমাকে কোন রকমে "আরাম কেদারায়" তুলিয়া ষ্টেশনের বাহিরে পাল্কীতে তোলা হইল এবং নির্দ্দিষ্ট বাসায় লইয়া গিয়া রোগশয্যায় শয়ান করাইয়া সেই দিবসই কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগকে আনানো হইল। যে ব্যাধি, তাহাতে অস্ত্রচিকিৎসকেরই (surgeon) প্রয়োজন। মেডিক্যাল কলেজের তদানীন্তন সার্জ্জনদ্বয় Dr Raye এবং Dr Mcleod আসিয়া পুনরায় অস্ত্র-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন; আবার সেই সম্মোহন-আরকের মোহে আচ্ছন্ন দেহের উপর যথেচ্ছ অস্ত্রপ্রয়োগ হইল। আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পুনরায় রোগমুক্তির কামনায় অবিচ্ছেদ শয্যা-সঙ্গের মধ্যে শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

দিন বসিয়া থাকে না সত্য—কিন্তু জ্বালা-যন্ত্রণা, রোগ-শোক, ক্ষোভ ক্ষতির দুঃখদুর্দ্দিনগুলি কেমন করিয়া যে যায়, তাহা যাহার না গিয়াছে সে বুঝিবে

না। বহু বেদনা এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার মধ্য দিয়া আমার সেদিনের দিনগুলি মন্থর-পাদবিক্ষেপে অতি ধীরে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

যৌবনের মাহেন্দ্রলগ্নে অজস্র-আলোক-সম্পাতোজ্জ্বল নীল নিস্তরঙ্গ আকাশগঙ্গায় মন যে সোনার ডিঙ্গা বাহিয়া অজ্ঞাত রত্নহাটের ঐশ্বর্য্যময় বন্দরের উদ্দেশে অসীম আশা লইয়া যাত্রা করিতে চাহে, এ হেন দিনে রোগ-ক্লিষ্ট কৃশদেহ লইয়া মলিন শয্যায় সমাসন্ন অন্তিম-দিনের অপেক্ষায় প্রত্যেক দিনের দিনযাপনের দুঃখ ও নৈরাশ্য যে কেমন করিয়া বুক ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহা যাহার ভাঙ্গে সেই জানে। কোন দিন বা ক্ষীণ আশার দুর্লক্ষ্য রশ্মিরেখার মধ্যে, কোনদিন বা নৈরাশ্যের গভীর-তম অন্ধ অন্ধকারে আমার দিন কাটিতে লাগিল। এমন একদিন দুইদিন নহে, বহুদিন—বহুমাস—সুদীর্ঘ দেড় বৎসর কাল আমি জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে শয্যায় শুইয়া কাটাইলাম। তখন আমার বয়স অনুত্তীর্ণ বিংশতিবর্ষ মাত্র।

একবার মাত্র "সম্মোহন আরকের" বিভীষিকায় আমাদের সমগ্র পরিবার, রাজধানীর আত্মীয়স্বজন, অনুজীবী ও পরিচারকবর্গ সকলেই অতিমাত্রায় ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিবার পর সেই "সম্মোহন" আমার উপর অনেকবার প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং আমার মৃতোপম দেহের উপর বহুবার অস্ত্রচালনা করিবার পর আমি শয্যাত্যাগ করিবার মত বল পাইলাম বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারিলাম না। শয়ন উপবেশন আহার নিদ্রা, অল্প-বিস্তর চলাফেরা—জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী এই সকল কর্ম্ম কোন প্রকারে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল মাত্র,—প্রথম যৌবনারম্ভের শক্তি সামর্থ্য ও স্বাস্থ্য সমস্তই হারাইয়া ক্ষীণ প্রাণ কোন মতে বহন করিতে লাগিলাম। ডাক্তার সাহেবগণ মত প্রকাশ করিলেন যে, চিকিৎসার দ্বারা আর কিছু করা যাইবে না, কালে বয়োধর্ম্মে এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থান-জনিত স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রোগ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।—এরূপ অবস্থায় কলিকাতায় থাকিবার কোন আবশ্যকতা নাই বলিয়া আমি বাড়ী ফিরিলাম।

কঠিন পীড়া এবং কঠিনতর চিকিৎসার প্রভাবে আমার জীবনহানি হয় নাই, ইহাই ভগবানের পরম কৃপা বলিয়া মাতাঠাকুরাণী ঈশ্বরের দয়াকে শিরো-ধারণ করিয়া লইলেন। কিন্তু প্রথম-যৌবন-সমাগমের সূত্রপাতের সময় হইতে পঙ্গুর ন্যায় নির্জ্জীব জীবন যাপনে সন্তুষ্ট থাকিতে আমি পারিলাম না। বসন্তোৎফুল্ল পুষ্পপাদপ পর্য্যাপ্ত-পত্র-পল্লব-সম্ভারে সুশোভিত হইবার পরিবর্ত্তে যদি বজ্রাহত হইয়া কায়ক্লেশে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাতে তাহার সুখ কোথায়? আমারও সেদিন ঠিক সেই অবস্থা। ডাক্তারী চিকিৎসা একরূপ শেষ হইয়াছিল, 'অ্যালোপ্যাথিক' মতে চিকিৎসায় আর কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। আমাদের গৃহ-চিকিৎসক মুর্শিদাবাদের স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র কবিরাজের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রণালীতে চিকিৎসিত হইবার একান্ত ইচ্ছা আমার জন্মিল। তাঁহাকে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে নিতান্ত জিদ্ করিয়া ধরিয়া বসিলাম।

কবিরাজ মহাশয় রাজধানীর বেতনভোগী চিকিৎসক ছিলেন; আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; এবং বোধ করি ডাক্তারের হাত-ফেরতা রোগীর চিকিৎসা করিয়া কোন ফল দেখাইতে পারিলে অন্ততঃপক্ষে যশোলাভ অনিবার্য্য—ইহাই ভাবিয়া আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, বটিকা, পাচন, অরিষ্ট, অবলেহ ও চূর্ণে ঘর ভরিয়া গেল, কিন্তু ব্যাধির দর্পচূর্ণ যে বিশেষভাবে করিতে পারিলেন তাহা মনে করিবার কোন কারণ পাইলাম না।

ডাক্তারী চিকিৎসার অস্ত্রাঘাত বিষম ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিরাজী কটু তিক্ত কষায় লবণ প্রভৃতি রসাত্মক ঔষধগুলিকে গলাধঃকরণ করিতে অতিবড়

বীরত্বের আবশ্যক হয়—সে বীরত্ব আমি দেখাইলাম। ধৈর্য্যের পরিচয় ডাক্তারী চিকিৎসায় দেখাইয়াছি; পরজীবনে প্রার্থিতলাভের প্রত্যাশায় কি পরম ধৈর্য্যের সহিত বৎসরের পর বৎসর ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কাটিয়াছে সে ইতিহাস আমার একমাত্র অন্তর্যামী দেবতাই জানেন—কবিরাজ মহাশয় আমার ধৈর্য্যের দোষ দিতে পারেন নাই। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় বঞ্চিত জনকে 'ঈশ্বরচন্দ্র' নীরোগ করিতে পারিলেন না। অনেক দুঃখ পাইয়া, অনেক যাতনা নীরবে ভোগ করিয়া, মর্ম্মস্থলে বহুবার নিদারুণ অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়া, অনেক কটু তিক্ত কষায় পরিপাক করিয়া ভাবিয়াছিলাম, আমার ভাগ্য দেবতা, আমার অদৃষ্ট-বিধাতা প্রসন্ন হইয়াছেন, আমার দুঃখ বেদনার দুর্দ্দিন বুঝি অবসান হইয়া আসিয়াছে; আমার ব্যর্থ প্রতীক্ষার বেদনাময় দিন এবং বিনিদ্র বিভাবরী আমার বুকের উপর পাষাণের মত আর বুঝি চাপিয়া থাকিবে না, পরম-বাঞ্ছিত পদার্থ বুঝি আমার হস্তপ্রসারের মধ্যে আসিয়া ধরা দিতে উদ্যত হইয়াছে। হায় অদৃষ্ট! বড় আশা আমার এই নৈরাশ্যের মধ্যেই ডুবিয়া গেল,—প্রত্যাশিত ফললাভ আমার কপালে ঘটিল না।

চিকিৎসার প্রারম্ভে মনে হইয়াছিল যেন ব্যাধির বেগ কম হইয়া আসিতেছে, কষ্টের লাঘব হইতেছে, কালে সম্পূর্ণ ফললাভ নিতান্ত দুরাশা নাও হইতে পারে। সমাসন্ন-সিদ্ধির আনন্দমূর্ত্তি অদূরে দেখিয়া দুঃখীর ক্লিষ্টের ব্যাধিতের মনে কত শান্তি এবং কি সান্ত্বনাই যে আসিয়াছিল, তাহা আজ আর লিখিয়া বলিবার শক্তি নাই। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা অগোণে মৃগতৃষ্ণিকায় পরিণত হইয়া গেল। ভাবিলাম, অবশিষ্ট জীবনকালের জন্য বেদনাতুর মন লইয়া এই অকর্ম্মণ্য দেহভার বহন করিতে হইবে।

শ্লোকে শুনিয়াছি, রোগ শোক পরিতাপ বন্ধন ব্যসন —যাহা কিছু, সমস্তই জীবের আত্মাপরাধ-বৃক্ষের ফল। কে কবে অনুষ্টুপ ছন্দে শ্লোকটি লিখিয়া গিয়াছেন জানি না; শ্লোকের তাৎপর্য্য অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ হইতে পারে, কিন্তু জীবনারম্ভের আদি-প্রভাতে আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য সব হারাইয়া অকর্ম্মণ্য জীবনের দুর্ভর ভার বহন করিবার সম্ভাবনা যাহার চক্ষুর সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে, অনুষ্টুপের পাদদ্বয়ে তাহার কোন শান্তি সান্ত্বনার সম্ভাবনা আছে কি?

নিতান্ত আবশ্যকীয় জীবনযাত্রার নিত্যকৃত্যগুলি কোন প্রকারে সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিলাম মাত্র; মনের মধ্যে আমার কি হইতেছিল সেকথা কেবল আমিই জানিতাম। রাজপুরীর চতুঃসীমার মধ্যে কর্ম্মহীন অলস জীবন যাপনই আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার উপর যখন রোগাতুর দেহভার লইয়া অবশিষ্ট জীবন-কাল অকর্ম্মণ্য পঙ্গুবৎ যাপন করিবার সম্ভাবনা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, তখন সমস্তই বড় বিস্বাদ হইয়া গেল,—সে মনো-ভাবের যথাযথ বিশ্লেষণ আজ অসম্ভব। কোন্ জন্মজন্মান্তরীণ পাপানুষ্ঠানের ফলে বাল্যে অন্ধ হইয়াছিলাম জানিনা, কোনরূপে একটি চক্ষু ফিরিয়া পাইয়া যদিই বা কোন প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের একটুখানি উপায় হইল, তাহার পরেই বাতরোগে পঙ্গু হইয়া শয্যার আশ্রয় লইলাম। তখনও বাল্য অতিক্রান্ত হয় নাই, আজীবন পঙ্গু হইয়া থাকিলে ভবিষ্যৎ জীবন কি দুঃসহ কষ্টের মধ্যে কাটাইতে হইত সে ভাবনা ভাবিবার বয়স তখন নহে; করুণাময়ী মা'তার স্নেহ-বাহুর অবলম্বনে সেদিনের দৈনিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইত; ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তখন ভয় পাই নাই। আজ এই জীবনারম্ভের আদিপ্রান্তে পাদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ অন্তর-বিদ্রধি আমার অবশিষ্ট জীবনকালের জন্য কর্ম্মানর্হ করিয়া রাখিবার উপক্রম করিয়াছে ভাবিয়া দিবারাত্র মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। আমার অদৃষ্টাকাশের দিক্‌চক্র পর্য্যন্ত প্রাণপণে বারম্বার দেখিতে লাগিলাম, কোথাও কোন আলোকচ্ছটা দেখিতে পাইলাম না।

কর্ম্মহীন সঙ্গবিহীন দিনরাত্রগুলি পাঠনিরত

হইয়া কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। সেদিনের রোগাতুর দেহ পাঠের শ্রমটুকুও সহ্য করিতে পারিত না। জীবনের দিনরাত্রগুলি আমাকে লইয়া এবং আমি দিনরাত্রগুলিকে লইয়া বিষম বিপদেই পড়িয়া গেলাম। বাল্যকালে অনেকের মুখে শুনিয়াছি, দুঃস্থ দম্পতীর সন্তান আমাকে যখন আমার জীর্ণ কুটীরাবাস হইতে টানিয়া আনিয়া সৌধশিখরে চড়াইয়াছে, ভিক্ষার ঝুলির পরিবর্ত্তে যখন রাজদণ্ড হাতে দিয়াছে, তখন আমার মত ভাগ্যবান আর কে?—আরও শুনিয়া ছিলাম যে, আমার জন্মসময়ে গগনচারী গ্রহনক্ষত্রের সংস্থানও নাকি শুভপ্রদই ছিল, এবং সেই সকলের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াই রাজজ্যোতিষী জগবন্ধু জোর করিয়া আমার প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়াছিলেন। আজ এই দারুণ দুঃখদিনের ঘনায়মান নিবিড়ান্ধকারের মধ্যে বসিয়া আমার মনে হইতে লাগিল যে, হয় ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র (ফলিত জ্যোতিষ) মিথ্যা, নতুবা জ্যোতির্ব্বিদগণ যথার্থ শাস্ত্রার্থ অবগত নহেন। গ্রহ-নক্ষত্রাদির যেরূপ সংস্থানকে তাঁহারা শুভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের ভুল না হইলে, যাহাকে অদৃষ্টবান বলিয়া রাজকুলে স্থান দেওয়া হইয়াছে তাঁহার এমন দারুণ দুরদৃষ্ট কেন? সুসংস্কৃত ও মার্জ্জিত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্যক্ পরিতৃপ্তি দূরের কথা, ভিক্ষান্নজীবী দীনতম দীনেও যে স্বাস্থ্যের সুখ অনায়াসে ভোগ করে, সেটুকুও আমার দুরদৃষ্টের ফলে নিতান্ত অনায়াসলভ্যের মধ্যেও আসিল না! শৈশব হইতে যৌবনারম্ভ পর্য্যন্ত জীবনের যতগুলি বৎসর অতিবাহিত হইল, তাহার মধ্যে একটি দিনও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের আনন্দ আমি পাইয়াছি বলিয়া সেদিনে মনে করিতে পারি নাই।

এইরূপে দুঃখচিন্তার মধ্যে আমার সেদিনের দিনগুলি কাটিতে লাগিল। অনেক সময়ে মনে হইত, 'সম্মোহন আরকের' অতি-প্রভাবে আমার নিমীলিত চক্ষু আর উন্মীলিত না হইলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না;—রুগ্নদেহে কর্ম্মহীন জীবন যাপন অপেক্ষা পরপারের অনির্দ্দেশ-যাত্রা কোন প্রকারেই অবাঞ্ছনীয় নহে। জীবনকে সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতেই হইবে, এ ধারণা জন্মিবার অবসর আমার বাল্য কৈশোর যৌবন ও প্রৌঢ়—কোন সময়েই হয় নাই,—হইল না,—হইবে কি না তাহা যিনি আমার সুখদুঃখ শুভাশুভের বিধাতা তিনিই জানেন।

রোগমুক্ত হইয়া নিরাময় দেহ পাইবার জন্য চিকিৎসার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই—ডাক্তারী, কবিরাজী, হোমিও-প্যাথী যাহা কিছু দেশে এবং বিদেশে প্রচলিত ছিল, একে একে সে সকলেরই শরণাপন্ন হইলাম। ঔষধ সেবন করিয়া, পথ্যাশী হইয়া, অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত দীর্ঘকাল কাটাইলাম; আশানুরূপ ফললাভ আমার দুরদৃষ্টে ঘটিল না। মনুষ্যের চেষ্টা যখন শেষ হয়, তখন অতিমানুষ উপায়ের দিকে মানবের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়া থাকে। যে বিশ্ববিধাতা মানবহৃদয়ে চিরস্থায়ী আশার অবিনশ্বর অঙ্কুর রোপণ করিয়া দিয়া তাহাকে জীবন যাপনের জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ঐন্দ্রজালিকই আবার সেই আশাকে জীবিত রাখিবার জন্য মানবের মনে নানা দুর্ব্বলতার সৃজন করিয়া দিয়াছেন। রোগখিন্ন দেহ যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, নিজের শক্তি সামর্থ্য যখন কোন কাজেই আসে না, তখন হৃদিস্থিত ক্ষীণ আশালতিকা তাহার অঙ্কুরগুলিকে আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ধরে, লোকলোকান্তরের মহৈশ্বর্য্যময় মহামহেশ্বরের চরণতলে আশ্রয় পাইবার জন্য একান্ত আগ্রহে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া করযোড়ে বারবার করিয়া বলিতে থাকে—"নচ দৈবাৎ পরং বলম্।"

আমিও এই সার্ব্বজনীন নিয়মের অধীন হইয়া, পার্থিব চেষ্টার অবসানে আমার দৃষ্টিক্ষীণ অশ্রুনয়নের হীনশক্তি ঊর্দ্ধদিকেই সঞ্চালিত করিলাম। সে সময়ে শারদীয়া পূজা। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—প্রতিদিনের পূজা ও হোমের অবসানে, চণ্ডী পাঠান্তে, পুরোহিত-মুখোচ্চারিত পুষ্পাঞ্জলি দানের মহামন্ত্র একান্ত নিষ্ঠার সহিত বারম্বার উচ্চারণ করিয়া বলিতাম—"আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি

দেবি নমোঽস্তুতে * * * * রোগং শোকঞ্চ দারুণম্ * * * দুর্গে ত্বং হর দুর্গতিম্ ।"

ধরিত্রীর উদ্বেলিত অশ্রুরাশির ন্যায় আশ্বিনের পরিপূর্ণা তরঙ্গিণী যে দিনে তোয়সম্পদের উচ্ছ্বসিত নৃত্যোৎসবে পল্লী-কুলায়ের পাদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে, শরৎ-শেফালির বৃন্তানুবিদ্ধ কাশ-শুভ্রাঞ্চলা বঙ্গসুন্দরী যে দিনে তাঁহার বর্ষাবিধৌত শ্যামসম্পদে সপ্তকোটি নরনারীর নয়ন-মন বিমুগ্ধ করিয়া দিতেছেন, মেঘনির্ম্মুক্ত গগনাঙ্গনের প্রাচীমূলে হৈমবতী শারদ উষার হেমচ্ছটা যে দিনে জল স্থল অন্তরীক্ষ সমস্তই স্বর্ণানুরঞ্জিত করিয়াছে, পরিণত শরচ্চন্দ্রিকার স্নিগ্ধানুসিঞ্চনে সম্বৎসরের বিয়োগ-বেদনাতুর মানব মানবীর মন যে দিনে সমাসন্নপ্রায় প্রিয়মিলনের মধুস্বাদের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে,—সে দিনে যে হতভাগ্যকে একান্ত ঈপ্সিত-লাভের আশায় আগ্রহাকুল অন্তরে দৈবশক্তির আরাধনা করিতে হয়, সে দিন তাহার কি দিন গিয়াছে তাহা বলিবার ভাষা কি খুঁজিয়া পাওয়া যায় ?

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ধ্যানলোক—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২১০।৫ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নবভারত প্রেসে শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ষোলপেজী ।৶০+৬৮+৬ পৃষ্ঠা—মূল্য কাগজে বাঁধা বার আনা, কাপড়ে এক টাকা। গ্রন্থারম্ভে কবির একখানি আলোকচিত্র আছে।

সমালোচ্য কাব্যে সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৪৪টি কবিতা সংগ্রথিত হইয়াছে। সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় "ধ্যানলোকে"র একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

কবিতাগুলি প্রসাদগুণ এবং ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। সর্ব্বত্রই একটা আন্তরিকতা ও দেবতার চরণে আত্মসম্প্রদানের মহতী ব্যাকুলতা দৃষ্ট হয়। কবি তাঁহার দেবতাকে কখন সখা, কখনও প্রভু, কখনও পতিরূপে আকুলভাবে ডাকিতেছেন। এ আহ্বান কৃত্রিম নহে বলিয়াই, সরল প্রাঞ্জল এবং অনাড়ম্বর। বর্ষার পরিপূর্ণ বিলের মত এ পার ওপার ভরাট, আপনাতে আপনি জমাট, ভূমার আনন্দে পবিত্র। কবি একান্ত নিজের জন্য যে "ধ্যানলোক" রচনা করিয়াছেন, সেখানে—

"জীবনে মরণে ফুরাবে না কভু
তোমার খেলা।
* * * * *
অসীমে অসীমে হবে কোলাকুলি
সুধার মেলা।"

কবির এই নবলোকে ভক্ত ও ভগবানের পৃথক্ সত্ত্বা নাই-

"জগতের সব শোভা হাসি গান,
তোমার মনে
না জানি কখন পশেছে আসিয়া
আমার সনে।"

ভক্তের অন্তরে ভগবানের এ অপূর্ব্ব আত্মপ্রকাশ আজ নূতন নয়!—

"কি সুধালে, কি কহিনু, কিছু আজ নাহি পড়ে মনে
কেবলি পড়িনু বাঁধা জন্মে জন্মে জীবনে মরণে।"

দারুণ দুঃখের দিনেও যেমন সমব্যথী দরদীর জন্য চিত্ত চঞ্চল ও আবিল্ল হয়, পরমানন্দের দিনেও ঠিক তেমনি মনে হয়, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে—আপনার জনের মধ্যে আনন্দ বাঁটিয়া না দিতে পারিলে যে চিত্তক্ষোভ কিছুতেই নিবারিত হয় না। তবু এই বাহিরন্তরব্যাপী মিলন সমারোহে আনন্দের আতিশয্যে মাঝে মাঝে আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছে—

"একটুকু পরাণ আমার
না জানি জগত মাঝে লাগিবে কিসের কাযে,
বহিবে কিসের সমাচার?"

কবির সকাতর নিবেদন—

"দূরে ফেলি আর প্রভু রাখিও না দাসে,
এবার ডাকিয়া লও তব পদ পাশে।"

কবির এ দেবতা "হেমন্তের নবীন শিশিরে" "মেঘে ঢাকা গগন মণ্ডলে" "লক্ষ্মীপূর্ণিমায়" "নবোদ্গত আম্র কলিকায় দাক্ষিণ

মলয়ানিলে কুঞ্জে কুঞ্জে প্রসূন মালায়" এবং "মহারাণী ক্ষেমার" "ভিক্ষাপাত্রে" সর্ব্বত্র এক প্রশান্তমূর্ত্তি সর্ব্বত্যাগী প্রসন্ন সন্ন্যাসীর মত বিরাজিত। কবির অন্তর-ক্ষেমাও বলিতেছেন—

"প্রেম হোম-শিখা ;
আত্মারে নির্ম্মল করি শুভ্র জয় টীকা
পরাইয়া দেয় ভালে ; প্রাণের বন্ধন
ঘনাইয়া আনে শুধু প্রাণের মিলন
নিবিড় প্রগাঢ় করি।"

"ধ্যানলোকে"র ইহাই গায়ত্রী।

জীবেন্দ্রবাবু বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্যে সহৃদয় আন্তরিকতার সহিত এমনি করিয়া প্রসাদের ফল্গু বহাইতেছেন। আমাদের মনে হয় ইহাই তাঁহার বিশিষ্টতা।

কনককরেখা—শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ বি-এল্ প্রণীত। ডবলক্রাউন ষোল পেজি ১৭৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।•

ইহা একখানি ছোট গল্পের সমষ্টি, সর্ব্বসুদ্ধ এগারটি গল্প আছে।

অধিকাংশ গল্পের প্লটই আজগুবী, বা অতিমানুষিক। একটিমাত্র উদাহরণ দিই।

"চিকিৎসা" গল্পে নায়িকা নলিনীর "চারি বৎসরের শিশু অমলচন্দ্র সংজ্ঞাশূন্য * * জীবনপ্রদীপ অতি ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল। * * আজ সাংঘাতিক রজনী। ডাক্তার বলিয়াছেন—আজিকার রাত্রি না কাটিলে শিশুর জীবন সম্বন্ধে তিনি কোনও কথা বলিতে পারিবেন না।" "পুত্র মৃত্যুশয্যায়" (পৃঃ ১৬) এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী আসিল। "তাহার বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর হইবে। বর্ণ গৌর" ইত্যাদি। সন্ন্যাসী এবং নলিনী উভয়ের চারি চক্ষের মিলন হইল। দুইজনেই পরস্পরকে চিনিতে পারিল। "সন্ন্যাসীর মাথা ঘুরিয়া গেল * * নলিনী অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে বসিয়া পড়িল।" এ বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না যে নলিনীর সঙ্গে বিবাহ হয় নাই বলিয়াই এ ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়াছে।—তারপর সন্ন্যাসী শিশুকে ঔষধ দিল। "ঔষধ আর কিছুই নহে তাহার বৃন্দাবনবাসী গুরুর পদরেণু মাত্র।" ঔষধ দিয়া সন্ন্যাসী যাত্রার দলের নারদের মত মস্ত একটা বক্তৃতা করিয়া ফেলিল। "এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন হইল। সে দেখিল তাহার 'চন্দনচর্চ্চিত নীল কলেবর' পীতবসন পরিহিত বনমালী আসিয়া ধীরে ধীরে শিশুকে চুম্বন করিলেন। তাহার পর মধুর মুরলী বাজিল। শিশু উঠিয়া নাচিতে লাগিল।" খানিক পরে মুমূর্ষ শিশু বলিল 'মা এ কে * * * মা একে ভাল বাসিস? আমি বাসি।' ইত্যাদি। পুনরপি মূর্খ শিশুটা বলিল "মাকে ভাল বাস?" কোমলকণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিল "যাহার প্রেমে বিশ্বপ্রেম শিখেছি তা'কে ভালবাসি না?"

"অনুবাদে প্রমাদ" আর একটি গল্প—জমাই ঠকান প্রশ্নের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

কোন কোন গল্প সুরুচির গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে। "প্রতিদানে"র দিবাকর, "আশা"র সুরেশ, "রাঙ্গা জামার" বসন্ত প্রভৃতির চরিত্র সুরুচির পরিচায়ক নহে। "নাম মাহাত্ম্যে" সর্দ্দার এবং প্রতাপের মুখে এমন সব কথা বসান হইয়াছে যাহা অত্যন্ত ইতরজনোচিত—ভদ্র সাহিত্যে সেরূপ দুর্নীত ভাষার স্থান আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

"শক বিভ্রাট" গল্পে বিলাত ফেরৎ সমাজের যে চিত্র লেখক আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা অতীব হাস্যকর। তিনি যে কখনও কোনও বিলাত ফেরৎ ব্যক্তিকে বা তাহার পরিবার বর্গের জীবনযাত্রা প্রণালী দেখিয়াছেন—গল্প পড়িয়া তাহা মনে হয় না।

এ গ্রন্থের সমস্ত চরিত্রই গুম্ফ পাকাইয়া বা গোঁফ পাকাইতে পাকাইতে কথাবার্ত্তা কহে—অবশ্য যাহাদের গোঁফ থাকা সম্ভব। 'বিস্মিত' 'পৈশাচিক' 'নারকী' এবং 'নারকীয়' শব্দগুলি পত্রে পত্রে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। সমগ্র গ্রন্থ মধ্যে উক্ত কথাগুলির সদাব্রত খোলা হইয়াছে।

মোটকথা গল্পগুলির যেমন প্লট তেমনি ভাষা তেমনি বলিবার ভঙ্গী।

"ঋতুরাজ।"

সাগরের ডাক। (নাটক)—শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী প্রণীত। গৃহস্থ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৮৪ পৃঃ, মূল্য ।৴•

পাঠক মনে করিবেন না যে এই ৮৪ পৃষ্ঠা সবই লেখা। পাণ চুরুটের দোকানে যেমন খালি সিগারেট বাক্স সাজাইয়া রাখে, এ পুস্তক খানিতেও সেইরূপ কয়েকখানি "ক" "খ" চিহ্নিত ভূমিঠসাদা পত্র আছে। ইহাতে মোট ১২ পৃষ্ঠা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। আর একটি কৌশলে আরও ১২ পৃষ্ঠার অধিক বাড়ান হইয়াছে। সে কৌশলটি এই:—সাধারণ নাটকে বক্তাদিগের নামের পার্শ্বে একটা ছেদ বা ড্যাশ চিহ্ন দিয়া তাহাদের বক্তব্য ছাপা হয়; কিন্তু এই পুস্তকে যে পংক্তিতে বক্তার নাম আছে সে পংক্তির অবশিষ্ট অংশে আর কিছু মুদ্রিত হয় নাই। যখন কাগজ ক্রমে দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে তখন এইরূপ কৌশলে

যিনি অপচয়ের নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন তাঁহাকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ প্রদান করিতে পারা যায় না।

"সাগরের ডাকে"র মলাটের রঙ তরঙ্গময় সাগরেরই মত। তাই সাগরকে যেমন সহজে কেহ বুঝিতে পারে না, এই পুস্তকখানিও সেইরূপ সমস্যা বিশেষ। কবিবর রবীন্দ্রনাথের "অচলায়তনের" পাল্টা জবাবও ইহার মধ্যে আছে। কিন্তু বহুদিন পরে। ব্রাহ্মদের প্রতিও কিঞ্চিৎ কটাক্ষ আছে। শেষে বুঝিতে পারা গেল, নদী যে পথে যাউক সাগরে মিশিবেই, তাই ভগবান্‌কে সর্ব্বত্র সাগর নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি সেই সাগরের ডাকই শুনিয়াছেন, সেই সাগরে যাইবার পথই আবিষ্কার করিয়াছেন, তবে পাল্টা জবাব দিবার প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইলেন কেন? "গৃহস্থের" গৃহে এতদিন নাটক উপন্যাস বা কবিতার স্থান ছিল না। কোন গুণে "সাগরের ডাক"-এর তথায় স্থান হইল?

"ব্রজরাজ।"

কাশীর কিঞ্চিৎ।—(কবিতা)—শ্রীনন্দী শর্ম্মা প্রণীত। কাশী বিশ্বনাথ প্রিণ্টিং ওয়ার্কে মুদ্রিত এবং ১৫৪ নং রামাপুরা, বেনারস সিটি হইতে শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি ১০২ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ।৵০

এই নন্দীশর্ম্মা কে তাহা আমরা জানিনা, কিন্তু যিনিই হউন, তাঁহার হাস্যরসোদ্ভাবনী শক্তি আছে। পুস্তকখানিতে তিনটি দফা এবং একটি "দফারফায়" অনেকগুলি কবিতা পড়িলাম। সেগুলিতে কাশীর বাসিন্দা—বিশেষতঃ বাঙ্গালী বাসিন্দা—এবং কন্‌সেশন-টিকিট-ক্রয়কারী কাশী-দর্শনাভিলাষী বাবুদের বিষয়ে অনেক কথা আছে। "রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম," "ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল," "সারনাথ" হইতে আরম্ভ করিয়া, 'শ্রীষাঁড় মহাশয়' "শ্রীমান বানর" পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই।

লেখক বলিতেছেন—

"বাবুরা কাশীতে এসে সর্ব্বাগ্রে সুধায়—
মাংসের সের কত করে, কোথায় পাওয়া যায়?"

ছুটিতে ক্রমে কাশী যখন বাঙ্গালীতে ভরিয়া গেল তখন

"পার্কে, ঘাটে, রাস্তায়, যাও দশাশ্বমেধ,
ইডেন, বিডন, হেদোর তরে রইবে নাকো খেদ।
সেই ফ্যাসানের চুলছাঁটা, সেই অলষ্টার বুকে,
টাই বাঁধা আর কলার আঁটা, সিগারেট মুখে—
হাতে ছড়ি, চশমা পরা, চোস্ত মোজা পায়—
মুদ্দা যত চিমনীর মত ধোঁ ছেড়ে বেড়ায়।"

আবার একশ্রেণীর লোক, দশাশ্বমেধ ঘাটে, অহল্যা ঘাটে গিয়া সাধু বা 'মহাপুরুষ' খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়ান—

"কোনরূপে ফাঁকতালে হয় অভীষ্টপূরণ
সেই আশে দুটি বেলা ঘাটে হাজির হন।
কেউ চায় এক নিমেষে দেখ্‌বে ভগবান,
সস্তায় মেরে দেবে কিস্তি, এই তার জ্ঞান।
কেউ চায়, দেখতে কোথা স্বর্গের সিঁড়ি—
ভুড়ি মেরে চলে যাবে খেতে খেতে বিড়ি।"—ইত্যাদি।

সন্ধ্যার পর ঘাটে ঘাটে বসিয়া "কন্‌সেসন"—বাবুরা যে সকল আলোচনা ও সংবাদ আদান-প্রদান করেন, তাহারও বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে দুইটি সংবাদ শুনিয়া আমরা কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। একজন বলিয়াছেন—

"খাঁটি ও বিশুদ্ধ বাংলায়, 'বীণাপাণি বধ'
মহাকাব্য, লিখ্‌ছেন নাকি বঙ্গ পরিষৎ।"

আর একজন নাকি মন্তব্য করিয়াছেন—

"এলাহাবাদ এক্‌জিবিসনে গেছলো গঙ্গরজান,
তাতেই খুব বেড়ে গেছে বাংলা দেশের মান।"

যাঁহারা কাশীবাস, তাঁহাদের দুঃখ কবি খুব সহৃদয়তার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকেই শেষ বয়সে কাশীতে গিয়া কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে দিন যাপন করিয়া থাকেন, কিন্তু আলাপী ও আত্মীয়বন্ধুর উপদ্রবে তাঁহাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। "রেল কোম্পানি করেছেন সবার উপকার, কাশীবাস ওঠে কিন্তু গরীব বেচারার।" আপকারের ভূতপূর্ব্ব বড়বাবু উমেশের দুঃখকাহিনীটা একবার শুনুন। যখন চাকরি করিতেন, ৮০্ মাহিনা পাইতেন। খুব আলাপী ভদ্র এবং মিশুক ছিলেন—এক পয়সাও রাখিতে পারেন নাই। এখন কুড়ি টাকা মাত্র পেন্সনে কাশীবাস করিতেছেন। বারো আনায় একখানি ঘরভাড়া করিয়া বাস করেন, বামুন চাকরও নাই। অথচ আত্মীয়, বন্ধু, বন্ধুর বন্ধু প্রায়ই আসিয়া আতিথ্যের দাবী করেন—

"কেউ বা আসেন দুপুর রাতে,—হাঁকাহাঁকির ধুম,
পাড়া পড়সী জ্বালাতন, ভেঙ্গে যায় ঘুম।
এণ্ডা বাচ্ছা শালী শালাজ—গাড়ীর পা-দান ঠাসা—
একটা রাতে খুঁজে বেড়ান উমেশের বাসা।"

একবার এক বন্ধু আসিয়া, উমেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন—

"বুড়ো বয়সে হিসিবি হলে নাকি?
ঠাকুর চাকর সবাইকে যে দিচ্ছ বেশ ফাঁকি!
এই ঘরে ক মানুষ থাকে,—জুতো রাখি কোথা?
টাকাগুলো ভূতেই খাবে, পড়ে থাকবে পোঁতা:

শুনেছি নাকি মাছ মাংস সস্তা হেথা খুব ?
বেশ করে ঝোলটা রাঁধ, দিয়ে আসি ডুব।
রাত্রে শুধু ক্ষীরের লাড্ডু, রাবড়ী, বালুসাই
এই খেয়েই থাকা যাবে, রেঁধে কাজ নাই।'

ফলে, বেচারী উমেশ

"ভেবে কিছু না পায়,
পুরাতন শাল যোড়াটি বাঁধা রাখ্‌তে যায়।"

এই পুস্তকখানিতে আরও অনেক স্থান আছে যাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার মত, কিন্তু আমাদের স্থানাভাব।—যাঁহারা হাসি মস্কারা ভালবাসেন, তাঁহারা যেন বহিখানি কিনিয়া পড়িয়া দেখেন।

(১) চামুণ্ডার শিক্ষা (২) সুদখোর সওদাগর—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা ইউ, রায়ের প্রেসে মুদ্রিত, শ্রীসারদাকুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১৬ পেজি, পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ৮৫ ও ৮৪, হাফ্ বাইণ্ডিং, মূল্য প্রত্যেক খানির ॥৵০

প্রত্যেক পুস্তকের ভিতরে চারিখানি করিয়া একবর্ণ,এবং দুই খানি করিয়া রঙীন ছবি আছে। নীলকালীতে ভাল এণ্টিক কাগজে ছাপা, সুতরাং বহি দুইখানির বাহ্যসৌন্দর্য্য মনোরম।

উভয় পুস্তকের গল্পাংশ শেক্সপিয়রের নাটক হইতে ('চামুণ্ডার শিক্ষা'—"টেমিং অব্ দি শ্রু" হইতে এবং 'সুদখোর সওদাগর',—"মার্চেণ্ট অব ভেনিস" হইতে) গৃহীত। তবে গল্পগুলি দেশী ছাঁচে ঢালা -অর্থাৎ স্থান ও পাত্রগণের দেশীয় নাম দেওয়া হইয়াছে।—সে ভালই হইয়াছে—বাঙ্গালা অক্ষরে য়ুরোপীয় নামযুক্ত গল্প বড়ই কটমট শোনায়, পড়িতে গায়ে যেন জ্বর আসে।

পুস্তকের ভাষা ও রচনারীতি সহজ সরল ও সুখপাঠ্য। সুললিত গল্পের ন্যায় উহা শিশুদিগের চিত্তকে অনায়াসে আকৃষ্ট করিবে। সহজ করিয়া গল্প লেখা বড় সহজ কথা নহে। লেখকের সে চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। 'ছেলে মেয়েদের উপন্যাস' বলিয়া বহি দুইখানিকে তিনি যে অভিহিত করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস তাঁহার সে উদ্দেশ্যও সফল হইয়াছে।

কনক-চাঁপা! (শিশুপাঠ্য গাথা)—শ্রীনিশিকান্ত সেন প্রণীত। কলিকাতা শাস্ত্র প্রচার প্রেসে মুদ্রিত ও মিত্র এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল-ফুলস্ক্যাপ ৮ পেজি ৪৮ পৃষ্ঠা, হাফ বাইণ্ডিং, মূল্য ॥০

লেখক সরল ও সুললিত পদ্যে রাজকন্যা কনক-চাঁপার মনোহর গল্পটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অতি সহজেই ইহা বুঝিতে পারিবে এবং পড়িয়া যথেষ্ট আনন্দও পাইবে। সাতখানি ছবিতে গল্পটি আরও চিত্রাকর্ষক হইয়াছে। ছবি, ছাপা, কগজ—সবই ভাল।

মহর্ষি মনসুর। (জীবনী) শ্রীমোজাম্মেল হক্ প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত এবং ৫এ কলেজ স্কোয়ার, মখ্‌দুমী লাইব্রেরী হইতে মোহাম্মদ মোবারক আলি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১১৪ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা মূল্য ১৲

মোজাম্মেল হক্ সাহেব উৎকৃষ্ট বাঙ্গালায় অনেকগুলি মুসলমানী গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সমালোচ্য পুস্তকখানি সাধারণের নিকট যে আদৃত হইয়াছে, ইহার তৃতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় এ সংস্করণে পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

মহর্ষি মনসুর মুসলমানধর্ম্মে অদ্বৈতমতের প্রচারক। কয়েক বৎসরব্যাপী তপস্যার পর দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া, একদিন তিনি বলিয়া উঠেন, "আনাল হক্" (আমিই ব্রহ্ম)। ধর্ম্মোন্মত্ত সাধক ক্রমে এই মত প্রচার জন্য রাজাজ্ঞায় ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। কয়েক বার অলৌকিক শক্তিপ্রয়োগে তিনি কারাগার হইতে বাহিরে আসেন, আবার স্বেচ্ছায় তথা প্রবেশ করেন। অবশেষে বধ্য ভূমিতে নীত হইয়া সহাস্য বদনে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এই জীবনীখানিতে পড়িবার, বুঝিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক আছে।

কার্ত্তিক চরিত। শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস বি-এ সঙ্কলিত। কলিকাতা কার্ত্তিক প্রেসে মুদ্রিত ও শান্তিপুর সুতরাগড় হইতে শ্রীপাঁচুগোপাল ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত—১৩২২। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১১৫ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য লেখা নাই।

উপক্রমণিকায় লেখক বলেন, "শান্তিপুর সুতরাগড় নিবাসী মোদক জাতির সুযোগ্য প্রতিনিধি শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস মহাশয়ের জীবন কথা লিপিবদ্ধ" করার ছলে তিনি উক্ত গ্রামের মোদক সাধারণের শিক্ষা ও সভ্যতার একটি স্থূলচিত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পুস্তকে মূল্যের উল্লেখ না থাকাতে অনুমান হইতেছে, এ গ্রন্থখানি পাঠক সাধারণের জন্য প্রচারিত হয় নাই। সেই জন্য ইহার সমালোচনা প্রকাশ করা আমরা অনাবশ্যক মনে করিলাম।

সাহিত্য-সমাচার

বিগত ২৪শে ভাদ্র রবিবার সাহিত্য-পরিষৎ-সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ "১৩২২ বঙ্গাব্দে বাঙ্গালা সাহিত্য" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা এই সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে আমরা প্রকাশ করিলাম।

"ভারতী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গল্পগ্রন্থ "পাপড়ি" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত "দশদিন" নামক একখানি সচিত্র ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। ভাদ্র সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে ভুলক্রমে আমরা এখানিকে "গল্পগ্রন্থ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলাম। "দশদিনে"র মূল্য ১।০

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বৈকুণ্ঠের উইল" নামক একখানি নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲

"আঙুর" গল্পগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত পাঁচুলাল ঘোষের "আপেল" নামক আর একখানি গল্পসংগ্রহের পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৸০

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার সঙ্কলিত "সাহিত্য পঞ্জিকা" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। আগামী বড়দিনের অবকাশে বাঁকীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সময়, উপস্থিত প্রত্যেক সভ্যকে অভ্যর্থনা-সমিতি একখণ্ড সেই পুস্তক স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উপহার প্রদান করিবেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বি-এ, এম্ বি সম্পাদিত মেঘনাদবধ কাব্যের একটি নূতন সটীক বিরাট সংস্করণ যন্ত্রস্থ হইয়াছে—পৌষ মাসে প্রকাশিত হইবে।

"সম্বন্ধ নির্ণয়", "কাব্যনির্ণয়" প্রভৃতি প্রণেতা প্রবীণ সাহিত্যিক, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় ৮০ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে সংপ্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "দেশী ও বিলাতী" গল্পগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ এবং "নবীন সন্ন্যাসী" উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য যথাক্রমে ১৸০ এবং ২।০। তাঁহার "রত্ন-দীপ" উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।



মানসী ও মর্ম্মবাণী

৮ম বর্ষ — ২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ ১৩২৩ সাল | ২য় খণ্ড — ৪র্থ সংখ্যা

উরাঁওদিগের ধর্ম্ম

পার্ব্বত্য ছোটনাগপুর প্রদেশে যে দুইটি অসভ্য-জাতির প্রাধান্য এখনও রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে উরাঁও জাতির সংখ্যাই বেশী ; অপরটি মুণ্ডা জাতি। উরাঁও-গণ মুণ্ডাদের পরে ছোটনাগপুরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, ইহা এখন ঐতিহাসিক সত্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের পূর্ব্বেও যে অন্যান্য অসভ্যজাতি ছোটনাগপুরে বাস করিত এবং প্রবলও হইয়াছিল, এমন কথাও আজ কাল শুনা যাইতেছে। যাহা হউক, সে কথার বিচার আপাততঃ অনাবশ্যক, কারণ তাহার অকাট্য প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

উরাঁওগণ অনেক পরিমাণে সভ্য হইলেও এখনও বর্ব্বরতার সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা তাহাদের পালপার্ব্বণেই বুঝা যায়। তাহাদের কাছে পর্ব্ব অর্থে কেবল মদ খাওয়া নাচা ও গাওয়া। কোন কোনও পর্ব্বে তাহারা এত উন্মত্ত হইয়া উঠে যে তখন আর তাহাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। কোনও প্রকার সংযম তখন তাহাদের অসহ্য হইয়া পড়ে। * ইহাদের একটা পর্ব্বের কথা এইখানে বলিয়া রাখি—উরাঁওরা যে এখনও কতটা বর্ব্বর আছে এই পর্ব্বই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। † এই লেখকের অদৃষ্টে উক্ত পর্ব্বের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যেভাবে পরিচয় হইয়াছিল তাহা অনেকটা ঔপন্যাসিক ব্যাপার বলিয়াই মনে হইতে পারে ; কিন্তু ঘটনাটা সর্ব্বতোভাবে সত্য ; অসভ্যতার মাত্রা কতদূর যাইতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্যই এখানে লিপিবদ্ধ হইল। তবে ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, রাঁচি সহরের কাছাকাছি গ্রাম সকলে যে উরাঁওরা বাস করে, তাহারা এই পর্ব্বের অস্তিত্বও ভুলিয়া গিয়াছে।

ব্যাপারটা এই—আমি কোনও সরকারী কার্য্যোপলক্ষে রাঁচি হইতে খুঁটী নামক স্থানে যাইতেছিলাম। বাহক মানুষ রথ পুষ্‌পুষ্‌—অর্থাৎ এই প্রদেশে প্রচলিত এক প্রকার চাকা সংযুক্ত পাল্কী, যাহার উপরেও মানুষ ও জিনিষপত্র থাকিতে পারে। আমার সঙ্গে ঐ পুষ্‌পুষের উপর একটি রাঁচির উরাঁও চাকর ও ৫টা উরাঁও বাহক কুলি ছিল।

* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় প্রণীত "উরাঁও" গ্রন্থ ১৪১—পৃ

† ঐ ঐ ঐ পৃ—২৫৩-৫৪

এই অপূর্ব্ব রথ মন্থর গতিতে চলিতেছে, আমিও নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছি। খুঁটার পথ এত নিরাপদ যে একটা শক্ত লাঠি লওয়াও কেহ প্রয়োজন মনে করি নাই। রাত্রি যখন বারটা আন্দাজ হইবে, তখন একটা ভয়ঙ্কর চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখি, আমার পুষ্‌পুস্‌ ঘেরিয়া প্রায় কুড়ি জন উলঙ্গ ব্যক্তি "গাগা" এইরূপ চীৎকার করিতেছে, এবং প্রত্যেকের হস্তে একটা করিয়া মোটা লাঠি। ইহাদের কি যে উদ্দেশ্য তাহা ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্ব্বেই পুষ্‌পুষের উপর সজোরে লাঠির আঘাত আরম্ভ হইল; কুলিরা বারকতক "বাবু, বাবু" বলিয়া চীৎকার করিয়া গাড়ী ফেলিয়া পলাইল; এবং ক্ষণপরেই সশব্দে গাড়ীর একটা কাঠ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় ঐ লোকগুলা গাড়ী ছাড়িয়া কুলিগুলার পশ্চাদ্ধাবন করিল!

মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া উপরন্থ চাকরকে ডাকিলাম, এবং দুইজনে উর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া প্রায় রাত্রি ৩টার সময় নাচি থানায় আসিয়া খবর দিলাম। যখন রিক্ত হস্তে পায়ে ফোস্কা ও গায়ে ব্যথা লইয়া বাড়ী ফিরিলাম তখন পরিবারবর্গের সান্ত্বনাদানাদির মধ্যে নিজেকে একটা নভেলি ব্যাপারের নায়ক বলিয়াই ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম; কিন্তু ঐ পুলিসগুলা প্রাতঃকালেই এবম্বিধ নায়কত্বের আত্মপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া আমাকে জানাইল যে ঐ ব্যাপার আদৌ ডাকাতি নহে, উহা উরাঁওদিগের "গাগা পিটুনা" অর্থাৎ পশুরোগ নিবারক পর্ব্ব। কৃষ্ণা একাদশীতে অবিবাহিত উরাঁওগণ এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান করে। নগ্নতা ইহার আনুষঙ্গিক, গ্রামের আখ্‌ড়ায় একত্র হইয়া উহারা "গাগা" "গাগা" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে প্রত্যেক গৃহে উপস্থিত হয়, অভিজ্ঞ গৃহস্থগণ সম্মুখে একটা করিয়া হাঁড়ি রাখিয়া দেয়, তাহারা সেইটা ভাঙ্গিয়া ফেলে। এইরূপে গ্রামকৃত্য সমাধা করিয়া তাহারা দল বাঁধিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাহির হইয়া গ্রামন্তরের সীমা পর্য্যন্ত গিয়া লাঠি পরিত্যাগ করে, এবং কতকগুলি কুক্কুটও রাখিয়া আসে। পথে যদি কোনও লোক তাহাদের সম্মুখে পড়ে তাহা হইলে যাবৎ সেই ব্যক্তি "গাগা" বলিয়া তাহাদের চীৎকারের অনুকরণ না করে তাবৎ উহারা তাহার পশ্চাৎ ছুটিবে, কিন্তু মারিবে না। কোনও বস্তু সম্মুখে পড়িলে বিনা বিচারে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাই আমার রক্ষা ও আমার পুষ্‌পুসের দুর্দ্দশা।

আমি তো অবাক্—কেবল মনে হইতে লাগিল যে "কারো বা পোষমাস কারো বা সর্ব্বনাশ।" কিন্তু আমার হস্তে কোনও অস্ত্র থাকিলে সর্ব্বনাশটা যে কোন পক্ষে দাঁড়াইত তাহা ভাবিলেও এখন শিহরিয়া উঠিতে হয়। এ পর্ব্বটা সার্ব্বজনীন নহে তাহা আমার উরাঁও ভৃত্য ও কুলিগণের ব্যবহারেই জানা যাইতেছে, তথাপি অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে অসভ্যদিগের মাঝখানে বাস করিয়া তাহাদের আচার ব্যবহারের খবর না রাখিলে অনেক সময় আমারই মত বিড়ম্বিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, এবং যাঁহারা এই সকল বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন তাঁহারা জনসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এ বিষয়ে এখন অগ্রণী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় আমাদেরই একজন সমব্যবসায়ী। তিনি বিপুল পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া সম্প্রতি "The Oraons" (উরাঁওগণের বিবরণ) প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, এই প্রকার বর্ব্বরতা সত্ত্বেও উরাঁওদিগের একটা ধর্ম্ম আছে। জগতে এমন কোনও অসভ্য জাতিরই পরিচয় পাওয়া যায় নাই, যাহার একটা না একটা ধর্ম্ম নাই। উরাঁওদিগের ধর্ম্ম কি? শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় কহিয়াছেন যে উরাঁওগণ সূর্য্যোপাসক ভূতপূজক, (Sun-worshipping animists) এ বিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত সম্পূর্ণরূপে এক মতাবলম্বী হইতে পারিলাম না। ভূতপূজা তাহাদিগের ধর্ম্মের কাটামো হইতে পারে, কিন্তু এতদতি-

রিক্তও তাহাদের একটা ধর্ম্ম আছে। সেই কথা বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

উরাঁওদের প্রধান দেবতাদিগের নাম, ধর্ম্মিস, পার্ব্বতী বা সীতা, মহাদেব, দেবীমাই ও চাণ্ডী এবং অপ্রধান দেবতার মধ্যে গাঁও দেওতী (গ্রামদেবতা), ও হনুমান উল্লেখযোগ্য। ইহাদের ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে ইহাদের ইতিহাস একটু জানা আবশ্যক। অনেকে উরাঁওগণকে শ্রীরামচন্দ্রের বানর সৈন্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন। এ বিষয় চূড়ান্ত প্রমাণ না পাওয়া গেলেও ঐ মীমাংসা গ্রহণ করিতে বাধা নাই। বিশেষজ্ঞগণের, মতে শ্রীরামচন্দ্রের সাহচর্য্য করার পর হইতেই ইহারা নিজেদের অস্থির জীবনপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে শিখিয়াছিল এবং কোনও একটা স্থলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে স্থল যে কোথায়, তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই, কিন্তু তাহা যে দ্রাবিড়ের কোনও অংশ ইহাই কথঞ্চিৎ নিশ্চয়তার সহিত বলা যায়। এইখানে বলিয়া রাখি যে উরাঁওগণ দ্রাবিড় জাতীয় বলিয়া বিবেচিত। ইহাদের ভাষার সহিত দ্রাবিড়ান্তর্গত কেনারীয় ভাষার বিশেষ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গঠনের সাদৃশ্যও কতক কতক আছে। এখন কিন্তু উরাঁওগণ একটা পৃথক্ জাতি হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা যে বহুকাল বিহারে (প্রাচীন মগধে) বাস করিয়াছিল সে বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। এই ঘটনাই তাহাদের আধুনিক ধর্ম্মমত সংগঠনের প্রধান হেতু।

এ কথা সত্য যে, যখনই তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্বাভ্যাস বর্জ্জন করিয়া আর্য্যগণের সাহচর্য্য আরম্ভ করিয়াছিল, তখন হইতেই তাহাদের উপর আর্য্যদিগের প্রভূত প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। দ্রবিড়দিগের উপর আর্য্যপ্রভাব মুখ্যভাবে মানসিক ও নৈতিক, একথা প্রত্নতত্ত্ববেত্তারা স্বীকার করিয়াছেন। উরাঁওদিগের সম্বন্ধেও যে ইহার অন্যথা হয় নাই তাহা ভাবিবার অনেকগুলি হেতু রহিয়াছে। উরাঁওরা তাহাদিগের প্রাচীন ভূতযোনিতে বিশ্বাসমূলক ধর্ম্ম কোনও দিনই ত্যাগ করে নাই; কারণ আর্য্যদের এমন অভ্যাস কোনও দিন ছিল না যে, বিজিতদিগের আচারাদি জোর করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। বরঞ্চ আবহমান কাল হইতে ঠিক ইহার বিপরীত নিয়মই তাঁহাদের কাছে আদৃত হইত। (মনু ৭, ২০৩)। অতএব আর্য্যবিজয়ের পরেও উরাঁওগণ তাহাদের পূর্ব্ব বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল ও এখনও রাখিয়াছে।

সভ্যতর জাতি কর্ত্তৃক বিজিত অনেক অসভ্যদের মধ্যেই এমনি ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। * ক্রমে ক্রমে উন্নততর ধর্ম্মের ও আচারের সংস্পর্শে উরাঁওগণ যতটুকু উন্নতিভাজন হইতে পারিয়াছে তাহার বেশী উহাদের কাছে আশা করা যায় না।

উরাঁওদিগের প্রচলিত নাম "কোল"। যতই উন্নতি করুক ইহাদের এখনও একটা বিষম দোষ যে ইহারা অতিরিক্ত মাত্রায় পানাসক্ত। ইহাদের শোকে মদ্য, সুখে মদ্য, পর্ব্বে মদ্য সকল কাজেই মদ না হইলে চলে না; তা খাওয়া জুটুক আর না জুটুক। হরিবংশে লিখিত আছে, মহারাজা সগর অন্যান্য ক্ষত্রিয় জাতির সহিত "কোলীসর্প" নামক এক জাতিকে আর্য্যসভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি তাহারা আর্য্যেতর জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। উহাদের কদাচারই ঐ দূরীকরণের হেতু। এই "কোলীসর্প" জাতি "কোল" বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল ইহা অনুমান হয়। উরাঁওগণ নিজেদের বলে "কুরুখ", যদিও এখন ইহাদের উরাঁও নামটাই বেশী প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। করুষদেশ মগধের এক অংশ ছিল তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। মহাভারতে করুষ দেশের ও করুষগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই করুষ দেশের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী ছিল, এবং তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। মনুতে কারুষ বলিয়া এক জাতির উল্লেখ আছে, তাহারা ব্রাত্যবৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

---

* চার্লস স্কোয়ার প্রণীত "কেল্টিক মীথ ও লেজেণ্ড" নামক পুস্তকের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

ইহাদিগকে "কুরুখ" জাতির পূর্ব্বপুরুষ মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। উরাঁওগণ কৃষিকার্য্যকেই জীবনের অবলম্বন বলিয়া জানে।

"কুরুখ" বা উরাঁওগণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে তাহারা প্রথমে বিহারে বাস করিত; তাহার পর তাহারা হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বিহার হইতে বিতাড়িত হইয়া রোটস্ গড়ে (রোহিতাশ্ব গড়) আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানেও তাহারা স্থায়ী হইতে পারে নাই; প্রবল মদ্যাসক্তিবশতঃ ইহারা এখান হইতেও বিতাড়িত হয়। রোটস্ গড় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া তাহারা দলে দলে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করে। সেখানে আসিয়া দেখে যে সেই বন্যপ্রদেশ মুণ্ডাকর্ত্তৃক অধিকৃত রহিয়াছে। উরাঁওরা মুণ্ডাদের অপেক্ষা সভ্যতর ছিল, ফলতঃ উরাঁওগণ অনায়াসে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া মুণ্ডাদিগকে আরও গভীর অরণ্য প্রদেশে দূর করিয়া দিয়া নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করিল। এ স্বাধীনতাও কিন্তু তাহারা বজায় রাখিতে পারে নাই, কারণ অচিরেই ইহারা ও অবশিষ্ট মুণ্ডারা ছোটনাগপুরের মহারাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

শরৎ বাবুর মত এই যে, উরাঁও জাতি ছোটনাগপুরে আসিয়া নিজেদের আর্থিক রাজনৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ে উন্নতি সাধন করিয়াছিল। এরূপ হওয়া আমাদের মতে সম্ভবপর নহে, কারণ ছোটনাগপুরে প্রবেশ করার সময় হইতেই তাহারা সভ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহার পরে যদিও তাহারা পুনরায় কথঞ্চিৎ হিন্দুসভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা যে তাহাদের উপর বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল এমন মনে হয় না। বরঞ্চ এমন মনে করিবার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে যে ছোটনাগপুরের মহারাজার আহ্বানে যে হিন্দু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ছোটনাগপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ক্রমশঃ অবনত হইয়া প্রায় কোলদিগের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চা এখানে একেবারে ছিল না, ধর্ম্মচর্চ্চাও যে বড় একটা ছিল তাহা মনে হয় না। ছোটনাগপুরের মহারাজ নিজে যে কি জাতি ছিলেন তাহা জাতিতত্ত্বজ্ঞেরা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিজেদের নাগবংশীয় ক্ষত্রিয় বলেন, কিন্তু ডাল্টন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে মুণ্ডাবংশ-জাত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মহারাজবংশীয়েরা আপনাদিগকে মুণ্ডা বলিয়া স্বীকার না করিলেও তাঁহারা যে মুণ্ডা প্রতিপালিত একথা স্বীকার করেন। ফলে তাঁহারা কখনই বিদ্যোৎসাহী বা ধর্ম্মোৎসাহী ছিলেন না। এরূপ স্থলে উরাঁও জাতি যে ছোটনাগপুরে আসিয়া কোনও প্রকার আত্মসম্প্রসারণে কৃতকার্য্য হইয়াছিল এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমাদের বিশ্বাস যে, তাহারা যখন ছোটনাগপুরে প্রবেশ করে তখনই তাহাদের ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যাহা কিছু উন্নতি তাহা সাধিত হইয়াছিল, এবং এইখানে আসা অবধি তাহাদের অবনতি সূচিত হইয়াছে।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে, মগধে দীর্ঘকাল বাস করিয়া কোন ধর্ম্মের প্রভাবে তাহারা নিজ ধর্ম্মমত গঠিত করিয়াছিল। আমরা বলিয়াছি যে, তাহারা কোনও দিনই তাহাদের মৌলিক বিশ্বাসগুলি পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু তাহারা যে প্রথমেই আর্য্যধর্ম্ম হইতে প্রচুর পরিমাণে ঋণগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ তাহাদের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রধান দেবতা সীতা বা পার্ব্বতী। এই সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে রাক্ষসগণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব এবং হনুমান্ একজন প্রধান পাত্র। তাহাদের প্রধান দেব ধর্ম্মিস্, ধর্ম্মেরই রূপান্তর; ধর্ম্মও আর্য্যদেবতা, কিন্তু পরে তাঁহার একটু অবস্থান্তর হইয়াছিল। বিহারে বা মগধে এককালে বৌদ্ধধর্ম্ম এত প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল যে সেখান হইতে হিন্দুধর্ম্ম বিতাড়িত না হইলেও, তাহার প্রধানত্ব লোপ পাইয়াছিল একথা ঐতিহাসিক সত্য। এই নিরক্ষর কৃষকদের উপর হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের কতদূর প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারিয়াছিল তাহা জানিবার কোনও উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযানান্তর্গত মন্ত্রযানীরা যখন বৌদ্ধ তান্ত্রিকতন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন তখন সেই ধর্ম্ম উরাঁওদিগের উপর বেশ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ রহিয়াছে।

ধর্ম্মপূজামূলক নূতন ধর্ম্ম কোথায় প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা অভ্রান্তরূপে বলা যায় না, তবে এ অনুমান ভিত্তিহীন হইবে না যে ইহার উৎপত্তি মগধেই হইয়াছিল। মহাযানের উৎপত্তির ইতিহাস হইতে বুঝা যায় যে, হীনযানের কর্ম্মৈকনির্ভরশীল গম্ভীর ধর্ম্ম লইয়া তাহারা অনার্য্য ও আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে কৃতকার্য্য হয় নাই, তাই এই প্রাচীন ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া এই নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি। বলা বাহুল্য যে এই মতের প্রধান অবলম্বন—প্রচলিত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক বিশ্বাস সকল। তাহাই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া মন্ত্রযান মতের গঠন। ধর্ম্মপূজা এই মন্ত্রযানেরই একটি শাখা, ইহা বিশেষজ্ঞেরা স্বীকার করিয়াছেন। বিহারে ধর্ম্মপূজা লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গে ও উড়িষ্যায় এখনও ইহা প্রচলিত আছে। বঙ্গে ডোম ও বাউরি এবং উড়িষ্যায় বাউরি প্রভৃতি এখনও ধর্ম্মপূজায় নিরত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রমাণ করিয়াছেন যে মালদহ প্রভৃতি স্থানে আদ্যের গম্ভীরা বলিয়া যে পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয় তাহা ধর্ম্মপূজারই রূপান্তর। অতএব ইহারা সকলেই বৌদ্ধ উৎসব, যদিও ইহাদের আকার ক্রমশঃই হিন্দুভাব ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মপূজা এখন মহাদেবের পূজায় দাঁড়াইয়াছে, একথায় এখন আর সংশয় করিবার প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থ "শূন্য পুরাণ" দেখিলে জানা যায় যে উহাতে ধর্ম্ম ঈশ্বর স্থানীয়, পার্ব্বতী তাঁহার কন্যা, হনুমান একজন বিশিষ্ট পাত্র, এবং কন্যা পার্ব্বতী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন। ইহাতে ধান্যের জন্ম একটা প্রধান ঘটনা। আদ্যের গম্ভীরায় ধান্যের জন্ম একটা অনুষ্ঠেয় অঙ্গ।

উরাঁওদিগের প্রধান দেবতা বা ঈশ্বর ধর্ম্মিস, ধর্ম্মের ঈষৎ পরিবর্ত্তিত সংস্করণ মাত্র। ইহাদের সৃষ্টিতত্ত্বে পার্ব্বতী অবিকৃত আকারেই রহিয়াছেন, কখনও বা সীতা নামও দেখা যায়। হনুমান, হনুমানের বিহারী সংস্করণ, উরাঁওদের সৃষ্টিতত্ত্বে খুব কাজের লোক। ধর্ম্ম-পূজায় চণ্ডীর কীর্ত্তিগান একটা প্রধান অঙ্গ, উরাঁও-দিগেরও অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্যে "চাণ্ডী" পূজার বিধি আছে। চণ্ডী হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচণ্ডশক্তি রূপে পূজিতা, ধর্ম্মপূজাতেও চণ্ডীর আদর শক্তি হিসাবেই; উরাঁওদিগের কাছেও চণ্ডী শক্তিরূপেই উপাসিতা। বহুবিধ শক্তিলাভের আশায় উরাঁওগণ চণ্ডীর পূজা করে, বিশেষতঃ জনকশক্তি ও মৃগয়ায় পশুহনক শক্তি লাভের প্রয়োজন হইলে "চাণ্ডী" উপাসনা অপরিহার্য্য। এই "চাণ্ডী" উপাসনার পদ্ধতি অনেকটা বৌদ্ধ তান্ত্রিক-তার ভাবগ্রস্ত, নগ্নতা যেন ইহার অত্যাবশ্যক অনুষ্ঠান। "চাণ্ডী" উরাঁওদিগের অতি প্রাচীন দেবতা। শরৎ বাবু মনে করেন যে উরাঁওগণ যখন পশুহনন করিয়া জীবন যাপন করিত, চাণ্ডী তাহাদের সভ্যতার সেই সময়কার দেবতা। কিন্তু চাণ্ডী নাম স্পষ্টতঃ হিন্দু দেবতার নাম—সংস্কৃত মূলক নাম তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এইরূপে তাহারা আরও অনেক হিন্দুদেবতাকে গ্রহণ করিয়াছে—যথা মহাদেব, দেবীমাই, ধরতীমাই, গাও দেওতী ইত্যাদি। "সেবা" "মন্ত্র" "পূজা" প্রভৃতি শব্দ ও ঐ সকল শব্দ-দ্যোতিত ভাব তাহারা স্পষ্টতঃ হিন্দুদের কাছে পাইয়াছে।

উরাঁওদিগের সকল পর্ব্বই কৃষিকার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, কৃষিই তাহাদের একমাত্র কার্য্য। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যতই অবনত হউক, কর্ম্ম চিরদিন তাহার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। তাহারই ক্ষীণ স্মৃতিস্বরূপ এই পতিত জাতি এখনও কৃষিকর্ম্মের আরম্ভে, মধ্যে ও সমাপ্তিতে তাহাদের সকল উৎসবের অনুষ্ঠান করে, এমন কি তাহাদের একটা পর্ব্বের নাম, "করম"। আমরা দেখিয়াছি যে, ধর্ম্মপূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষিকার্য্য বিশেষ আদৃত, এমন কি এই সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় গম্ভীরার ভক্তারা (ভক্তেরা) কৃষিকার্য্যের সকল অঙ্গ অভিনীত করে। উড়িষ্যার ধর্ম্মপূজকেরা এক প্রকার শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করে; উরাঁওগণও এই প্রকার যাত্রার বিশেষ পক্ষপাতী। "যাত্রা" তাহাদের সর্ব্বপ্রধান উৎসব বলিলেও চলে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বঙ্গে ও উৎকলে ডোম, বাউরি কোচ প্রভৃতি নীচজাতিরা যে

ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল উরাঁওরাও সেই ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছিল।

আর একটা কথা—ধর্ম্মের গাজন বা পূজা ক্রমে শিবপূজায় মিশিয়া গিয়াছিল; উরাঁওগণও হিন্দু দেবতাদিগের মধ্যে মহাদেব ও পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়াছে; তাহাদের মধ্যে বিষ্ণুপূজা প্রচলিত নাই, অন্য কোনও হিন্দু দেবতার পূজাও প্রচলিত নাই। ইহা হইতেও অনুমান করা যায় যে উরাঁওগণ ধর্ম্মপূজক সম্প্রদায়ান্তর্গত। ভূতপূজা সকল নীচজাতিরই ধর্ম্মের অঙ্গ; কোচ, প্রভৃতি জাতির গাজনে ভূতনামান একটা প্রধান অঙ্গ; উরাঁওগণও অনেকটা এইরকমেই ভূত নামায়। তাই আমাদের মতে, উরাঁওগণ মহাযানান্তর্গত মন্ত্রযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

সমাজিক সমস্যা

দলাদলি।

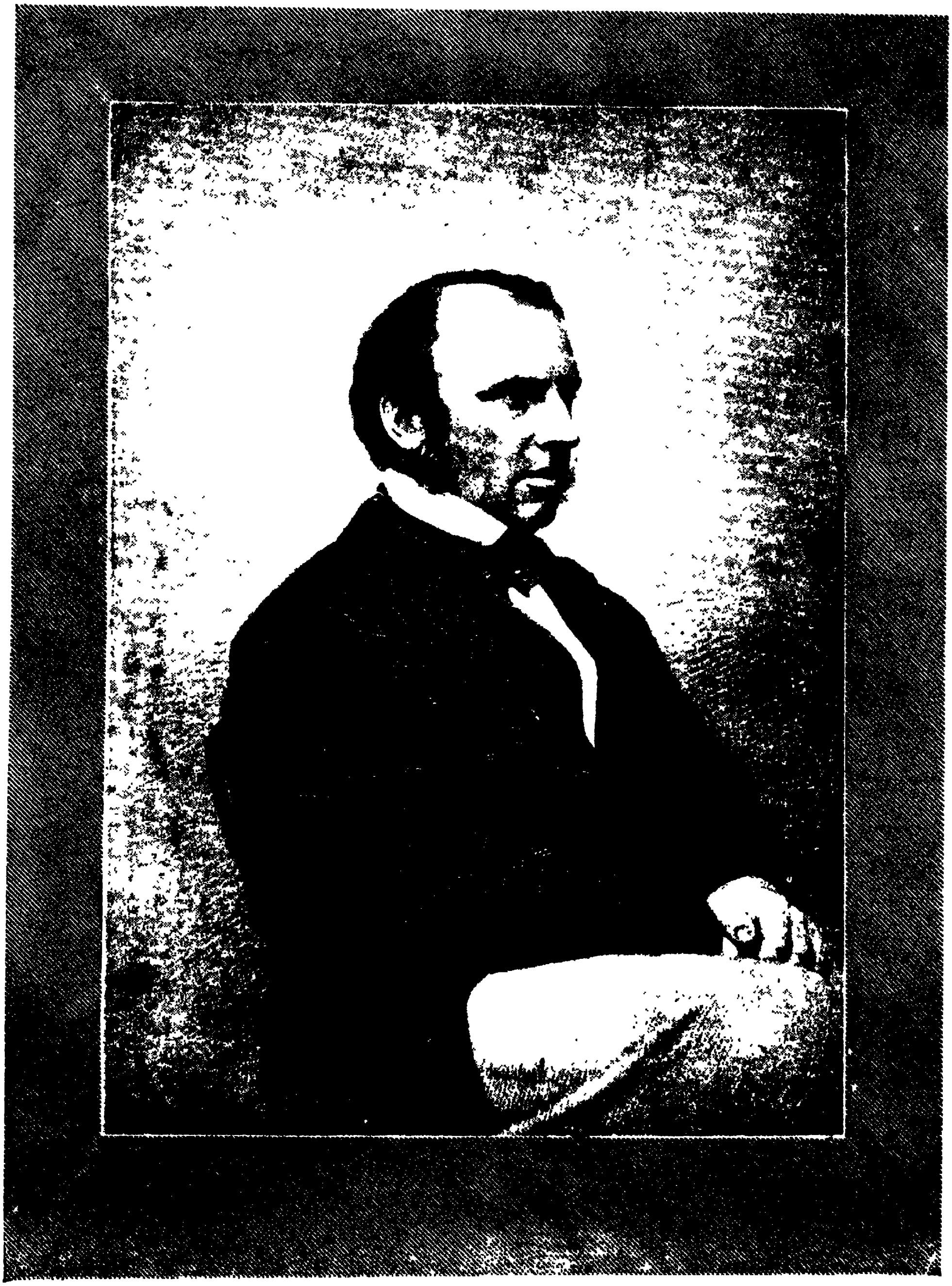
গ্রাম্য দলাদলির সহিত আমাদের সমাজের সকলেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। সুতরাং তাহার বিষয় বেশী বর্ণনা করিবার তেমন প্রয়োজন দেখি না। আজকাল এই দলাদলি যেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমাজের বক্ষে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, তাহাতে সকলেরই প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইবার কথা। সুতরাং ইহার উচ্ছেদ কামনা সকলেরই হৃদয়ে উদিত হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দলাদলি আজকাল গ্রাম্য সমাজ-দেহে একটি প্রধান ক্ষত। গ্রামবাসীর সহিত এই দলাদলির বিকৃতরূপ যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিশেষতঃ যে গ্রাম যত অনুন্নত, সেখানে দলাদলির রাক্ষসী মূর্ত্তি ততই ভয়ঙ্করী। নাগরিকগণের মধ্যে ইহার এই মূর্ত্তির বিকাশ বড় দেখা যায় না, কারণ আজকাল সহরে নগরে সমাজ বলিয়া একটা জিনিস নাই বলিলেই চলে। কিন্তু গ্রামে এখনও সমাজ কতকটা অবশিষ্ট আছে, সুতরাং সেখানে দলাদলিরও প্রাধান্য বর্ত্তমান। গ্রামের লোকেরা যেন দলাদলি না হইলে থাকিতে পারেন না। এমন অনেক গ্রাম দেখিয়াছি যেখানে ৪।৫ ঘর ব্রাহ্মণ, ২।৪ ঘর কায়স্থ আছেন, ইহারই মধ্যে কোথাও দুইদল, কোথাও বা তিনটি!

বাস্তবিক পক্ষেই গ্রাম্য দলাদলির বিকটমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান সমাজহিতকামী ব্যক্তি মাত্রেরই কাম্য বস্তু। তবে তাহাকে দূর করিবার পূর্ব্বে একবার তাহার আদি অবস্থাটা আলোচনা করিয়া দেখা অসঙ্গত নহে। যে সময়ে সমাজে এই দলাদলির প্রবর্ত্তন করা হয়, সে সময় কি উদ্দেশ্য লইয়া সমাজপতিগণ ইহাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য ভাল কি মন্দ, বর্ত্তমানে সে উদ্দেশ্য হইতে ইহার কতদূর বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, ইহাকে সংস্কৃত করিয়া রাখা যাইতে পারে কিনা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা পাইব।

দলাদলিটা যে সমাজের একটি দণ্ড বা শাস্তি তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যে কোনও সমাজ বা প্রতিষ্ঠানই হউক না কেন, তাহার পরিচালনের কতকগুলি নিয়ম প্রণীত হইয়া থাকে। যেখানেই কতকগুলি লোক সমবেত ভাবে কার্য্য করেন, সেখানেই সুশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য পরিচালনের জন্য কতকগুলি বিধি-নিষেধ প্রণয়ন অত্যাবশ্যক বলিয়া পরিগণিত হয়

যখন হইতে মানুষ সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতেই এই বিধি-নিষেধ ব্যবস্থাও প্রণীত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে ও এই সব বিধি-নিষেধ; সামাজিক ব্যাপারেও এই বিধি-নিষেধ। এই নিয়ম সংযমের শৃঙ্খল না থাকিলে ধর্ম্মে ও সমাজে যথেচ্ছাচার প্রবেশ করিয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলে। স্বৈরবৃত্তি যে সমাজে অবাধে চলিতে



লর্ড ক্যানিং ।

পারে সেটা সমাজ নামে পরিচিত হইবার অযোগ্য। এই কারণেই মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায়, মঠে, সমাজে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই এই বিধি নিষেধ, এই নিয়ম সংযম। মানব জন্মকাল হইতে নিজ পরিবারে, পাঠাগারে, সমাজে, কর্ম্মক্ষেত্রে এই বিধি নিষেধের মধ্য দিয়াই নিজ জীবন গঠিত করে।

যেখানে এই বিধি নিষেধের ব্যবস্থা আছে সেখানেই তাহার পালন ও উল্লঙ্ঘনে পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থাও আছে। সমাজপতিগণের দ্বারাই তাহাও নিয়মিত হইয়া থাকে। অধর্ম্ম-অনাচার-দুষ্ট ব্যক্তিকে সমাজের নিকট স্বীয় দুষ্কৃতের জন্য দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়; এই দণ্ড ব্যবস্থাই দলাদলি বা 'একঘরের' জননী। উন্মার্গগামীর সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব রহিত করিয়া তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেওয়াই এই শাস্তির উদ্দেশ্য। সুতরাং এই দলাদলি বা 'এক ঘরে'র ব্যবস্থাটা সমাজের পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রবর্ত্তিত।

যদি সমাজে থাকিয়া, যাহার যাহা ইচ্ছা, সমাজরীতি-বিরুদ্ধ অথবা ধর্ম্মনীতির পরিপন্থী কর্ম্ম করিতে থাকে এবং তাহার জন্য কোনও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে সকল সমাজেই যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। সংসারে অতি কম লোকেই ধর্ম্মভয়ে অকার্য্য হইতে বিরত থাকে; অধিকাংশ লোকেই দণ্ডের ভয়েই অকার্য্য-পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। মুখে আমরা "ঈশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের কৃত অথবা সঙ্কল্পিত সমস্ত কার্য্যই দিব্য চক্ষুতে দর্শন করিতেছেন" ইত্যাদি বাক্য যতই বলি না কেন, কার্য্যতঃ একটি শিশুর দৃষ্টিকে আমরা যত ভয় করি, তাহার শতাংশের একাংশ ভয়ও ঈশ্বরের দৃষ্টিকে করি না। করিলে এ জগৎ স্বর্গেই পরিণত হইত। সুতরাং সমাজের রক্ষণ ও স্থিতির কামনায় এইরূপ শাস্তির ভয় প্রদর্শন ও শাস্তি বিধানের আবশ্যকতা যথেষ্টই আছে। ইহার অভাবে সমাজ থাকিতে পারে না। এই সত্য এতই পরিস্ফুট যে ইহাকে আর দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদীকরণের প্রয়োজন নাই।

সামাজিক পবিত্রতা ও উচ্চ আদর্শ অবিকৃত রাখিতে হইলে যে এইরূপ সামাজিক দণ্ড প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। দলাদলি যখন সেই কার্য্য সাধনের উদ্দেশ্যেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন দলাদলির আসল উদ্দেশ্যকে কখন মন্দ বলিতে পারি না। এইরূপ শাস্তি দলাদলি অথবা একঘরে রূপে সুপ্রযুক্ত হইলে সমাজের কল্যাণ বিধানই করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা সমাজের বিপ্লব বা অধোগতির আশঙ্কা কিছুই নাই। তবে যদি তাহার বুদ্ধির দোষে অথবা স্বার্থের প্ররোচনাতে অপপ্রযুক্ত হয়, তবে সেটা প্রযোক্তারই দোষ, সেজন্য বিধানটিকে অপরাধী করা কথনই সদ্যুক্তি নহে।

দুঃখের বিষয়, কার্য্যক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে তাহাই দাঁড়াইয়াছে। ক্ষমতা এমনই একটা জিনিস যে, উহা হাতে পাইলে অনেক সময়েই মানুষ আপনার ওজন ঠিক রাখিতে পারে না—সুতরাং নিজ খেয়ালের বশে অথবা স্বার্থ নির্ণয় উদ্দেশ্যে অথবা নিজ প্রভুত্ব অযথা বিস্তৃতির অভিপ্রায়ে নানা প্রকারে মানুষ উহার অপব্যবহারে স্বীয় দুষ্টবুদ্ধি কর্ত্তৃক প্ররোচিত হয়। ফলে এইরূপ সব বিষয়ের উৎপত্তি।

ইহা শুধু সামাজিক ব্যাপার নহে, প্রত্যেক বিভাগেই সত্য। এই ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলেই আমরা প্রজা-রঞ্জক রাজার চারি মূর্ত্তি দেখি। আশ্রিত বৎসল প্রভুর রুদ্রতেজের জ্বালাতে তাপিত হই, পিতৃকল্প শিক্ষকের অযথা তাড়নায় পীড়িত হই, পুলিশ প্রভুদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হই আর সমাজপতিরূপে সমাজদ্রোহি-গণের পীড়নে মুহ্যমান হই—সংসার ক্ষেত্রে নানা মূর্ত্তিতেই ইহাকে আমরা দেখিতে পাই, সুতরাং এক সামাজিক ব্যাপারের দোষ দিলে চলিবে কেন?

হিন্দু সমাজের যে সমুদয় বিধি-নিষেধ প্রচলিত আছে, যাহারা সমাজে থাকিয়া তাহা ভঙ্গ করে, তাহাদের উপরে সমাজপতিগণ সামাজিক দণ্ড

প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা নানা প্রকারের। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তিই 'একঘরে' করা। 'একঘরে' হইলে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সহিত সমুদয় সংশ্রব রহিত করা হয়। তাহার ধোবা নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ করা হয়।

লঘু পাপে এই কঠিন দণ্ড প্রযুক্ত হয় না। বিশেষ বিশেষ গুরুতর অপরাধের জন্যই ইহার বিধান। অনেক সময় কাহারও অল্প অপরাধের জন্য দণ্ড দিতে সমাজের মধ্যে দুইদল হইয়া পড়ে। এক এক দল এক এক পক্ষের সমর্থন করে; ইহাতেই দলাদলির সৃষ্টি। কিন্তু 'এক ঘরে'তে কেহই দণ্ডিতের পক্ষ সমর্থন করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি ভ্রষ্ট চরিত্র হইয়াছে, অথবা অখাদ্য ভোজন করিয়াছে অথবা অধর্ম্মী অনাচারীর সংশ্রবে আসিয়াছে, তাহাকে সাবধান করা সত্ত্বেও সে তাহা গ্রাহ্য করে নাই—এইরূপক্ষেত্রে সমাজ তাহাকে ঐ কঠিন দণ্ড বিধান করিতে বাধ্য হয়।

এক সময়ে সমাজের এরূপ শক্তি ছিল এবং সমাজ-পতিগণ অপক্ষপাতে সে শক্তির পরিচালনা করিলে তাহাতে সকলেই ভয় করিত এবং সমাজের ভয়ে অকার্য্য হইতে বিরত থাকিত। সে সময়ে এই দলাদলি ও একঘরে সমাজের পবিত্রতা রক্ষার একটি প্রধান অস্ত্র ছিল। কিন্তু যখন সমাজপতিগণ ন্যায়পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলেন, অপক্ষপাতে বিচার না করিয়া, মুখ চিনিয়া বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই ইহাদ্বারা অনেক সময় নিরপরাধ ব্যক্তি কষ্ট পাইতে লাগিল, অপরাধী সাধু সাজিয়া বাহবা পাইতে লাগিল। সুতরাং লোকের আর সমাজের বিচারের প্রতি আস্থা রহিল না, সমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

সমাজের পঞ্চায়তির দ্বারা সেকালে অনেক বিবাদের মীমাংসা হইত, অনেক অপরাধীর দণ্ড হইত। কথায় কথায় উকীল মোক্তারের প্রয়োজন হইত না এবং অনেক অর্থ মামলা মোকর্দ্দমার অপব্যয় হইতে বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সমাজপতিগণের দোষেই প্রধানতঃ এই শক্তি সমাজের হস্তচ্যুত হইয়াছে। গ্রাম্য দলাদলি ও একঘরেতে ইহার বিকৃত মূর্ত্তিই দেখিতে পাওয়া যায়।

এখনও সমাজের নিম্নস্তরে এই পঞ্চায়তির প্রভাব অনেকটা অক্ষুণ্ণ আছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সামাজিক অনেক সমস্যাই এই পঞ্চায়তির দ্বারা পূরণ হইয়া থাকে। পঞ্চায়তির আজ্ঞা অমান্য করিবার সাহস তাহাদের নাই। যাহারা তাহা করিতে যায় তাহাদিগকে গুরুতর অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হয়।

আমাদের দেশেও ধোপা, নাপিত, কৈবর্ত্ত, জেলে প্রভৃতির মধ্যে এই পঞ্চায়তির প্রভাব এখনও আমরা দেখিতে পাই। তাহারা যে সকল সময়ই ন্যায় বিচার করে তাহা বলিতেছি না; তবে সকলেই তাহা নত মস্তকে গ্রহণ করে বটে।

আমার বিবেচনাতে, যদি আমরা কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া এই দলাদলি ও একঘরের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের উপায় পুনরায় গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে ইহার দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে। দুই চারি গ্রাম একত্র হইয়া একটা সমাজের সৃষ্টি হয়। এই সব গ্রাম হইতে বাছিয়া বাছিয়া যোগ্য লোক নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা একটি সমিতি গঠন করিতে হয় এবং তাঁহাদিগকে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়া এই সব বিচারের ভার অর্পণ করিতে হয়। যাঁহারা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া অথবা অনুরোধে বা খাতিরে পড়িয়া অন্যায়ের সমর্থন করিতে উদ্যত হন, তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ঐ পদ হইতে অপসৃত করিতে হইবে। সেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইতে সমাজের সমুদয় লোক সমবেত হইয়া উক্তরূপে অপরাধীর বিচার করিবে। এইরূপ সব ব্যবস্থা করিলে বোধ হয় দলাদলির বিকৃতরূপ অনেকটা নিরাকৃত হইতে পারে।

আমরা নিজেই দেখিয়াছি, সমাজের উচ্চবর্ণের একজন যে দোষে দুষ্ট বলিয়া সকলেই জানেন, তিনি কোনও দণ্ডভোগ করেন না, কিন্তু তদ্রূপ অপরাধে অন্য একজন অপরাধীকে একঘরে করা হইল। সে বিষয়

প্রতিবাদ করিয়া "কুলের কথা" কেহ বলিতে গেলে তাহার উপর সকলে অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। এরূপ দৃষ্টান্ত গ্রামে গ্রামে এত বেশী দেখা যায় যে গ্রামবাসিগণকে তাহা আর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না। সমাজপতিগণের পরিবার-সংস্পৃষ্ট অথবা আত্মীয়গণনাভুক্ত কেহ কোন বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাহা 'ঢাক' 'ঢাক' করিয়া গোপন করিতে তাঁহারা যেমন উৎকণ্ঠিত, অন্যের সেইরূপ বা তাহার চেয়ে অনেক ছোট দোষের দণ্ডবিধান-কল্পেও তাঁহারা তেমনি উৎসুক এ দৃষ্টান্ত সমাজে বিরল নহে।

সমাজপতিগণের নিরপেক্ষ বিচারের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি না থাকিলেই যে এরূপ ঘটা স্বভাবিক ইহা আর বেশী করিয়া বলা বাহুল্য। ধর্ম্মভয়হীনতাই এই পক্ষপাতের জননী। ধর্ম্মে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা থাকিলে কেহই জ্ঞানতঃ অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতে পারে না। ধর্ম্মের প্রতি আস্থা থাকিলে আর সবই ক্রমে ক্রমে হইতে পারে। যাঁহারা নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ পাপরাশি কেবল ফোঁটা তিলক, কণ্ঠী, ত্রিপুণ্ড্র, রুদ্রাক্ষ এবং কাষায়বস্ত্রাদিতে আবৃত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিও বাল্যকাল হইতেই সে গুণের অধিকারী হইবে। শত উপদেশ এক দৃষ্টান্ত দ্বারা পরাভূত হয় ইহা ধ্রুব সত্য।

এজন্য আমাদের সামাজিক দলাদলি ও একঘরে প্রভৃতিকে ন্যায় ও ধর্ম্ম সম্মতভাবে সুপথে না চালাইতে পারিলে ইহার উপর বিধাতার অভিশাপই বর্দ্ধিত হইবে—তাহা কেবল দরিদ্র নিরুপায়গণের দলনেই প্রযুক্ত হইবে—তেজীয়ানের কাছ দিয়াও ঘেঁসিতে পারিবে না। আবার ইহা যদি একেবারেই উঠিয়া যায়, তাহাতেও সমাজে আরও বেশী উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইবে এবং সমাজ বলিয়া একটা পদার্থই শেষে থাকিবে না। তাই বলি, আমাদের সামাজিকগণের ইহার চারিদিক বিবেচনা করিয়া প্রথাটিকে উদ্দেশ্য-সম্মত পথে পরিচালিত করার চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে কেবল সামাজিক দলাদলিই ছিল কিন্তু আজ কাল নব্য বঙ্গের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দিকেও দলাদলি দেখা গিয়াছে।

এই সব দলাদলি যদিও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই আবদ্ধ, কিন্তু তাহাতেও অন্যায় অনাচারে প্রশ্রয় প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের দলাদলিতে এক পক্ষ অন্য পক্ষের প্রতি নানারূপ মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত দোষারোপ করিতেও সময় সময় কুণ্ঠিত হন না। স্বার্থ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নানারূপ জঘন্য উপায় পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষকে দমন বা জব্দ করিবার চেষ্টাও হইয়া থাকে। নির্ব্বাচন ব্যাপারে ভোট সংগ্রহ রহস্য অনেকেই অবগত আছেন। এসব দলাদলির ব্যাপারে সমাজপতি তো আর গ্রাম্য নিরক্ষর মূর্খেরা অথবা প্রবঞ্চক স্বার্থান্ধ অশেষ দোষাকর ব্রাহ্মণ নহেন। তবে ইহার মধ্যে এসব অন্যায় অনাচার কেন? রামকান্তের দলভুক্ত বন্ধু বান্ধব অনুগ্রহার্থী ও মোসাহেবগণ শ্যামকান্তের দলকে ভোট হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য এক হস্তে তৈলপাত্র এবং অপর হস্তে মুদ্রাধার লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান কেন? যাহারা নির্ব্বাচনার্থী, তাঁহারা নিজ নিজ নাম ও গুণগ্রাম প্রকাশ করিয়া চুপ করিয়া থাকিলেই পারেন—ভোট-দাতাগণ যাহাকে ইচ্ছা ভোট দিন! এ সমস্যা সমাধানের উপায় কি? সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণই যদি এইরূপ করেন, তবে সামাজিকরাই তাঁহাদের এত তীব্র তিরস্কারের ভাগী কেন হন? সকলেই তো মানুষ।

সাহিত্য-সমাজে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও এই দলাদলি। সে রঙ্গমঞ্চেও ইহারই অভিনয়। এক দলে গিয়া বসুন, অপর দলের নানারূপ নিন্দা কুৎসা শুনিতে পাইবেন। এইরূপ সব দলেই! ইঁহাদের মধ্যে আবার এমন লোকও আছেন যাঁহারা একটু হাস্যের লোভে একটু মিষ্ট আপ্যায়িতের লোভে, যখন যে দলে উপস্থিত থাকেন, সেই দলেরই রোচক

আলাপ করিয়া থাকেন ; তাহার ফলে একই ব্যক্তি কখন তাঁহা দ্বারা অতিরিক্ত নিন্দা বা অতিরিক্ত প্রশংসা লাভ করেন। এ দলাদলিটার প্রভাব কলিকাতা সহরের উপরই যে বেশী তাহা বলা বাহুল্য। মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, সর্ব্বদাই তাহা থাকিবে, কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যসেবিগণ পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা দ্বেষ পোষণ করিবেন, দল পাকাইয়া পরস্পরের নিন্দা কুৎসা করিবেন—এটা কি বাঞ্ছনীয় ?

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্পর্শমণি

(উপন্যাস)

নবম পরিচ্ছেদ

জমিদারীতে

প্রজাদের সহিত সন্ধি করিতে সতীনাথকে খুব বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। জমিদারের মিষ্ট প্রকৃতি ও শান্ত ব্যবহারে তাহারা নিজে হইতেই বিদ্রোহের নিশান নামাইয়া লইয়া সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইল। আদালতের বিচার উঠাইয়া লইয়া তাহারা জমিদারকেই বিচারকের আসন দিল। সতীনাথ বুঝিল, অপরাধ প্রজাদের চেয়ে তাহাদের তরফ হইতেই বেশী। গত দুই বৎসর বন্যায় "হাজা" হওয়ায় প্রজারা সরকারে উচিত খাজনা দাখিল করিতে পারে নাই, সময় চাহিয়াছিল। সময়ের পরিবর্ত্তে গোমস্তা তাহাদের ঘরে আগুন দিবার হুকুম দেয়, এবং সে হুকুমও নিমকহালাল বান্দী পাইকদের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তামিল হয়। অনেক গরীবের ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। যাহাদের খড়ের ছাউনি মাটির দেওয়াল, তাহাদের দেওয়াল কবন্ধের মত মস্তকহীনভাবে এখনও খাড়া থাকিলেও, পাকা বাড়ী একেবারে ভূমিসাৎ। এই অন্নকষ্টের দিনে ঘর ত গিয়াছেই, সেই সঙ্গে ঘরের জিনিসপত্র যাহা কিছু ছিল, তাহাও অগ্নিদাহে নিঃশেষিত। প্রাণ বাঁচাইবার ব্যাকুলতায় তখন জিনিষ উদ্ধারের কথা কাহারও মনে পড়ে নাই। প্রজারা প্রায় সকলেই নিরক্ষর কৃষিজীবী এবং অধিকাংশই মুসলমান। কিল খাইয়া কিল চুরির সনাতন নীতি গরীবদের জন্য প্রচলিত থাকিলেও, শান্তিবাদী হিন্দুদের মত নির্ব্বিচারে সেটা গ্রহণ করিতে শক্তিশালী মহম্মদের প্রিয় সন্তানেরা সব সময় সক্ষম হয় না। গ্রামের মধ্যে মাতব্বর প্রজা ফৈজু শেখের পরামর্শে তাহারা জেলা কোর্টে গিয়া নালিশ রুজু করিয়া দিয়াছিল।

সতীনাথের বিচারে প্রজাদের অপরাধ সাব্যস্ত হইল না। যাহাদের ঘর পুড়িয়া গিয়াছিল, জমীদারের তরফ হইতে তাহাদের নূতন ঘর তৈয়ারীর খরচ দেওয়া হইল এবং যথাসম্ভব তাহাদের অগ্নিদাহের ক্ষতিপূরণও করা হইল। পুরাতন গোমস্তা অভিমানে কর্ম্মত্যাগ করিতে চাহিলে সতীনাথ তৎক্ষণাৎ মঞ্জুরী সহি করিয়া, গ্রাম হইতেই একজন কর্ম্মঠ বিশ্বাসী মুসলমানকে সেই পদে নিয়োগ করিল। এই সকল কায মিটাইতে তাহার এক মাসের উপর লাগিল।

গ্রামের অবস্থা দেখিয়া সতীনাথ বুঝিল, ভাল করিয়া বাঁধ দেওয়া ভিন্ন বৎসর বৎসর বন্যা নিবারণের অন্য কোনও উপায় নাই। অনেক গরীবের লাঙ্গলের গরু ভাসিয়া গিয়াছে, পয়সার অভাবে নূতন হেলেগরু কিনিয়া চাষ করিবার ক্ষমতাও নাই। দেশে ধানচালের একান্ত অভাব ; পয়সা নাই, থাকিলেও কিনিতে মিলিত না। না খাইয়া অর্দ্ধেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এখন হইতেই "বুনো ওল" "কচুর গেঁড়ো" শাক পাতা সিদ্ধ করিয়া লোকে খাইতে সুরু করিয়াছে। অবস্থাপন্নের বাড়ী "ভাতের ফ্যানের" জন্য উমেদারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছিল। ফ্যান

খাইয়া যাহারা জীবনধারণ করিতে প্রস্তুত, প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত কলহ-সংগ্রামেও তাহারা চির অভ্যস্ত। "ফ্যান" পরিবেশন করাও গৃহস্থের পক্ষে বিষম দায় হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সতীনাথের পরদুঃখকাতর দয়ালু হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। এমন সময় নিজের স্বার্থ চিন্তা তাহার মত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

সতীনাথ পত্রে সকল কথা বর্ণনা করিয়া জেঠামহাশয়কে লিখিল—সাহায্যের জন্য হাজার কতক টাকা তাঁহাকে খরচ করিতেই হইবে। এমন দিনেও যদি অর্থের সদ্ব্যবহার না হয় তবে সে অর্থ থাকাই অনর্থক। এ বৎসরের খোরাকের জন্য চাউল কিনিবার মত জমীদার সরকার হইতে তাহাদের কর্জ্জ দিতে হইবে। আগামী বৎসরে কমলার করুণা-দৃষ্টি যদি গরীবের উপর পতিত হয়, তবেই তাহারা এই ঋণের কতকটা শোধ করিবে এই সর্ত্ত থাকিবে। এ বৎসরের বাকী খাজনা মাপ করা ভিন্ন উপায় নাই। কুশীদজীবীর হস্তে পড়িলে গরীব লোক ধনে প্রাণে মারা যাইবে।

চিঠি পাঠাইয়া সতীনাথ নিজের লোকজনদের যথা কর্ত্তব্যের জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিল—কিন্তু একেবারে এত টাকার ফর্দ্দ পাইয়া জেঠামহাশয় কি বলিবেন, সে ভয়টুকুও একেবারে গেল না। তিন দিন পরে উত্তর আসিল, টাকা লইয়া গঙ্গারাম পাইক শীঘ্রই যাইতেছে; কায আরম্ভ করা হউক; সতীনাথ এখন উপযুক্ত হইয়াছে, সে যাহা ভাল মনে করে তাহাই করিবে, তাহাতে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই।

চিঠি পড়িয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় সতীনাথের চোখে জল আসিয়া পড়িল। এই জেঠামহাশয়ের পরদুঃখকাতরতায় সময়ে সময়ে সে সন্দিহান হইত! মনে করিয়া নিজে নিজেই সে লজ্জিত হইল।

বাঁধ দিবার কাযে মজুরী দিয়া সতীনাথ দরিদ্র প্রজাদেরই নিযুক্ত করিয়া দিল। অবশ্য যাহারা স্বেচ্ছায় কায করিতে চাহিল তাহাদেরই এই কায দেওয়া হইল। তখনকার অবস্থায়, মজুরের কায না হইয়া যদি "ধাঙ্গড়-মেথরের" কাযও হইত, তাহাতেও ইহারা পশ্চাৎপদ হইত না; খুসী হইয়াই অনেকে কাযে লাগিয়া গেল।

কাযের উৎসাহে সতীনাথ যে কল্যাণীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিল এমন নয়; বরং অনাড়ম্বর শান্তিপূর্ণ প্রকৃতির মুক্ত চন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইয়া তাহার কল্পনা প্রাণময়ী হইয়া আশার স্বপ্নকে সোণার রঙে রাঙাইয়া তুলিতেছিল। কর্ত্তব্যের কঠোরতা কর্ম্মের উদ্দীপনা তাহারই স্মৃতির সুখে মধুরতর করিয়া তুলিতেছিল। সফলতার আনন্দ বহিয়া যে দিন সে কল্যাণীর পাশে গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, সেদিন তাহার অভীষ্ট দেবী কৃতার্থতার পুরস্কারে কখনই তাহাকে বিমুখ করিতে পারিবেন না। কল্যাণীর হৃদয়—তাহার পরার্থপরতা পরদুঃখকাতরতা—সে ত সতীনাথের অজ্ঞাত নয়। এই দীর্ঘ বিরহের দুঃখ তাহারা যে ত্যাগের মধ্যে সহিয়া লইতেছে, ইহাই যেন তাহাদের জীবনের সকল অন্ধকার কাটাইয়া মিলনের আলো জ্বালাইয়া দিতে পারে। সতীনাথ মনে মনে আকাশে সুখের সপ্ততল সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল। এবার কৃতকার্য্যের পুরস্কার দিতে সিদ্ধি নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিবেন। মনে হইল এই যে প্রজাবিদ্রোহ, এ যেন তাহার উপর ভগবানের অনুকূল প্রেরণা, এখানকার হাঙ্গামা সহজে মিটাইতে পারায় জেঠামহাশয়কে সে নিশ্চয়ই খুসী করিতে পারিয়াছে। খুসী না হইলে কখনই তিনি বিনা আপত্তিতে অত টাকা খরচ করিতে দিতেন না। গরীবের অভাব মোচনের জন্য বিধি-নিয়োজিত উপলক্ষ হইবার সুযোগও সে প্রাপ্ত হইয়াছে। কল্যাণীলাভ যে তাহার পক্ষে আর কঠিন নয়, কৃতকার্য্যের সফলতার ভিতর দিয়াই যেন তাহার পূর্ব্বাভাষ সূচিত হইতেছিল। সারাদিন কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া অপরাহ্নে যখন তাহার শ্রান্ত দেহ বিশ্রাম চাহিত, মন তখনও ক্লান্ত হইত না। প্রথম যৌবনের আশা উদ্যম তখন পূর্ণমাত্রায় জাগরিত, নিরাশার ব্যর্থতা সেখানে

ঠাঁই পাইতে পারে না।

বৈকালে নদীতটে বেড়াইতে বেড়াইতে ভবিষ্যতের সুখের চিত্র কল্পনায় আঁকিয়া সে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখে। দূরে ধানের ক্ষেতে রাঙা আলোর ঢেউ তুলিয়া অস্তমান সূর্য্য অপরূপ রূপে ক্ষেতের প্রান্তে ডুবিয়া যান। আপাদমস্তক ফুলে ভরা পত্রবিহীন দলনী গাছের তলায় ঝরা ফুলের শয্যা বিছাইয়া মধুর গন্ধ বাতাসকে মদির করিয়া তুলে। সবুজ পাতা বাতাবী ফুলের গাছে ফুল ফল কিছুই নাই, তবু তাহার দোলনে কত মধুরতা। চাঁদের আলোয় নদীর চড়ায় বালির উপর হীরা মাণিক জ্বলিতে থাকে। নদীর বক্ষে নক্ষত্রের ছায়া তাহারই বৃহৎ অনুকরণে ব্যস্ত। সতীনাথ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে—মনে হয় ধরণীর এত রূপ! সে এতদিন কি অন্ধ হইয়া ছিল? দুই চোখ ভরিয়া দেখিয়া লয় নাই কেন? আকাশে ইন্দ্রধনুর বর্ণ পরিবর্ত্তনের মত মনের রঙ্গিন আলোয় পৃথিবীর বর্ণ তাহার কাছে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বাহিরে তাহারই রূপ রস গন্ধ লইয়া প্রকৃতি সোণার থালে পূজার অর্ঘ্য ধরিয়া রাখিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া আকাশে চাঁদ উঠে, নদীর জলে চাঁদের ছায়া শত খণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়ে, বর্ষার বাতাস কাছারী বাড়ীর সম্মুখে চাঁপা গাছের সদ্য ফোটা ফুলের মিষ্ট গন্ধ বহিয়া আনে। সম্মুখে বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রের পানে চাহিয়া সতীনাথ ভাবে, জীবনটা শুধু স্বপ্ন নয়,—বাস্তব; তাই বাস্তবে এত মধুরতা। কোন দিন বেড়াইতে গিয়া সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। পুকুর পাড়ে, ডোবার ধারে ভেকের দল ঘন কলরবে আরতির বাদ্য বাজায়। বিপিনের হস্তধৃত হরিকেন লণ্ঠনের আলোকে পথ দেখিয়া সে নদীতীর হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসে। প্রদীপ জ্বালিবার তৈলাভাবে সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পল্লীবাসী দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। যাহারা জমীদার বাড়ী বা অন্য কোথাও কাযে আবদ্ধ তাহাদেরও বাড়াভাত ঢাকা-চাপা দেওয়া আছে, বাড়ী আসিলে একবার আলো জ্বালা হইবে। শুক্লপক্ষে এই-টুকুই সুবিধা—তেলের খরচ নাই। চিরদিনের বিশ্রাম-নীতির ভঙ্গকারী আলোকধারীদের দেখিয়া পথের পার্শ্বে সুখশায়িত কুকুরগুলা একবার ঘেউ ঘেউ করিয়া সাড়া দেয়, উঠিয়া বসা প্রয়োজন মনে করে না। শৃগালগুলা ছুটিয়া পলায়। পথের ধারের ফুটন্ত ফুলের গাছ তাহাদের মাথায় ঝরাফুলের অঞ্জলি দেয়, শাখা-বাহুর স্নেহস্পর্শ আদর জানায়। বাড়ী ফিরিয়া মুখে হাতে জল দিয়া আহার সারিয়া আবার সে খাতাপত্র লইয়া সারাদিনের কাযের হিসাব মিলাইতে বসে। উৎসাহে ক্লান্তি তাহাকে ক্লান্ত করিতে পারে না।

বর্ষার পাট পচিয়া পাতা পচিয়া ম্যালেরিয়ার প্রকোপ জাগাইয়া তুলিল। ছেঁড়া লেপ কাঁথা মুড়ি দিয়া ছেলে বুড়া সারারাত্রি জ্বরের কম্পভোগ করিয়া আবার সকাল বেলা উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়। সমর্থ হইলে স্নান আহারও করে, অসমর্থ হইলে উপবাস দিয়া পড়িয়া থাকে। এ যে নিত্যকার ব্যবস্থা—কত আর উপবাস দিবে! ঔষধ ত নাই। সতীনাথ তাহার এতদিনের শিক্ষার পরীক্ষার কাল নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সযত্নে রোগীদের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিল। সকালবেলাটা রোগী দেখিবার সময় নির্দ্দেশ করিল। যাহারা নিতান্ত মানের দায়ে ঔষধ লইতে আসিতে পারে না, সে নিজে তাহাদের বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসে। অনেক রোগীর ঔষধের সঙ্গে পথ্যের ভারও ডাক্তারকে লইতে হয়।

বিনামূল্যের চিকিৎসা ও ঔষধ পাইয়া গরীব লোকে বাঁচিয়া গেল। তাহাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদের স্রোতে পড়িয়া সতীনাথ নিজের কর্ত্তব্যকর্ম্মেও যেন দিশেহারা হইয়া পড়িল। সময় সময় বিরক্তি ভাব সম্বরণ করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠে। চিকিৎসকের আসন গ্রহণ করিয়া বাড়ী ফিরিবার আশু সংকল্প সে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এমন দুর্দ্দিনে যদি লোকের কাজে না লাগিল তবে এ বিফলা বিদ্যা শিখিবার কি প্রয়োজন ছিল। সে ত অর্থোপার্জ্জনের কামনায় বিদ্যাশিক্ষা করে নাই!

সতীনাথ মুরারিকে চিঠিতে সব কথা খুলিয়া লিখিল। উপসংহারে লিখিয়া দিল, প্রয়োজন মনে কর চিঠিখানা

তাঁকে দেখ্‌তে দিও। মনে করিল কল্যাণীও বুঝিবে সে কতবড় প্রয়োজনে তাহাদের মিলনের দিন পিছাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। সে মহৎ-হৃদয়া, তাহার মনের ভাষা পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে অপরাধী করিবে না; সফলতার আনন্দে বিবাহের বিলম্ব তাহাকে পীড়িত না করিয়া আনন্দের তৃপ্তিই প্রদান করিবে। মনে হইত, এই সব সরল প্রাণের কৃত্রিমতাহীন অমল শুভ-আশীর্ব্বাদের পূতধারা তাহাদের জীবনের মঙ্গলগ্রন্থি বাঁধিয়া দিবার স্বর্ণসূত্র। এখন দুঃখ হয়, এত তাড়াতাড়ি আবেদন জানাইয়া না বসিলে আজ কল্যাণীকে চিঠি লিখিবার উপায় তাহার থাকিত। হয়ত উত্তরও পাইতে পারিত।

যেদিন ঘন ঘোর ছায়া ফেলিয়া বৃষ্টিধারা নামিত, বাধ্য হইয়া কায বন্ধ রাখিতে হইত। একমাত্র কল্যাণীর চিন্তাই তাহার সেদিনকার অলস মন্থর দীর্ঘ দিন কাটাইবার সহচর ছিল। কতদিন ইচ্ছা করিত কল্যাণীকে চিঠি লিখিয়া খবর লয়; লজ্জায় সঙ্কোচে পারিত না। তারাসুন্দরী হয়ত এতখানি স্বাধীনতা লওয়া পছন্দ করিবেন না। কল্যাণী কি মনে করিবে কে জানে! সতীনাথের মনে পড়িল, বিবাহের কথা হইবার পর সে আর সাধ্যমত তাহার সাক্ষাতে বাহির হয় নাই। কখনও দেখা হইয়া গেলে সঙ্কোচজড়িত সলজ্জ হাসি ওষ্ঠে চাপিয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িত। সেই লজ্জানম্রা কিশোরীর মোহিনী-মূর্ত্তির স্মৃতি সতীনাথের বিদেশে কর্ম্মক্লান্তি হরণের সঞ্জীবনী-সুধা হইয়া দাঁড়াইল। মুরারিকেও সে কল্যাণীর কথা লিখিতে পারিত না। মুরারি নিজে হইতেই খবর দিত যে তাহারা ভাল আছে; এই ছোট কথাটুকু শুনিবার জন্যই সতীনাথ মুরারির চিঠির উত্তর দিতে একটুও সময় নষ্ট করিত না। এবং তাহার পত্রের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতিদিন পরিচিত ডাক হরকরার পথপানে চাহিয়া থাকিত।

এখানে একটা জিনিষের তাহার বড়ই অভাব বোধ হইতেছিল। গ্রামের মধ্যে স্কুল থাকিলেও সে পল্লীর মধ্যে একটা ছোট খাট স্কুল বা পাঠশালাও নাই। গরীব লোকের ছেলেপুলেরা অত দূরে গিয়া পড়াশুনা করিবার মত সকল ঘরে সুবিধা না থাকায়, ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে ছেলেদের শিক্ষা দিতে পারিত না। সতীনাথ মনে করিল, এ সম্বন্ধে কিছু করা প্রয়োজন। একদিন গ্রামের জনকয়েক মাতব্বর লোককে ডাকাইয়া আনাইয়া সে এই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিল। তাঁহারা কহিলেন, স্কুল হয় ভালই, কিন্তু তাহারা গরীব, বিশেষ-ভাবে ব্যয় বহনে সক্ষম নহেন। সতীনাথ কহিল, অর্দ্ধেক ভার সে লইবে, বাকী চাঁদা করিয়া মাসে মাসে তাঁহাদের তুলিয়া দিতে হইবে। উপস্থিত যতদিন পর্য্যন্ত স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ না হয়, ততদিন জমীদারের কাছারী বাড়ীরই অব্যবহৃত অংশটায় স্কুল বসিবে। হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর ছাত্রই পড়িতে পাইবে। একজন মুসলমান মৌলবী ফার্সী পড়াইবার জন্য, এবং ইংরাজী বাংলা অঙ্কের মাষ্টার গ্রাম হইতেই যোগাড় হইল। বেতন অধিক লাগিবে না। কেবল গ্রামান্তর হইতে একজন সংস্কৃত জানা পণ্ডিত আনাইবার প্রয়োজন। পণ্ডিতও উপস্থিত যতদিন সুবিধা করিয়া লইতে না পারেন, কাছারী বাড়ীতে শয়ন ও আহার পাইবেন, এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। আষাঢ় গিয়া শ্রাবণ আসিয়া কোথা দিয়া তাহারও যে তৃতীয়াংশ জীবনকাল ফুরাইয়া গেল, কর্ম্মব্যস্ত সতীনাথ অনুভব করিতেও পারিল না।

দেশে রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়া যাওয়ায় এবং আরব্ধ কার্য্যাদির সুবন্দোবস্ত হওয়ায় সতীনাথের এইবার বাড়ী ফিরিবার কথা মনে হইল। নবাগত পণ্ডিতটি স্কুল প্রতিষ্ঠার শুভদিন দেখার জন্য পঞ্জিকা দেখিতে দেখিতে কহিলেন, "আজ ২২এ শ্রাবণ, ২৬এ দিন খুব ভাল, ঐ দিনে স্কুলের কায আরম্ভ করাই উচিত।" সতীনাথের মনে পড়িল, ২৬এ শ্রাবণ বিবাহের দিন স্থির করিয়া তারাসুন্দরী রুদ্রকান্তের অনুমতি লইবার জন্য সতীনাথকে অনুরোধ করিয়া-

ছিলেন। আজ ২২এ শ্রাবণ কাটিয়া গেল। সতীনাথ বিবাহের জন্য ত্বরা দিতে ব্যাকুল না থাকিলেও তারাসুন্দরীর উৎকণ্ঠা অনুভব করিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কথাটা পাকাপাকি করিয়া না রাখিলে তিনি হয় ত ধৈর্য্যরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িবেন। মুরারি বর্ণিত নির্ম্মলের নামটাও হঠাৎ সেই সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

সংবাদপত্র পাঠে

এখানকার কাযকর্ম্মের বন্দোবস্ত সমস্তই ভালরকম হইয়া গিয়াছে। এখন আর সতীনাথের উপস্থিত থাকিবার কিছু প্রয়োজন নাই। কর্ম্মচারীদের প্রতি যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া সতীনাথ দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিল। ট্রেণ ধরিবার জন্য মধ্যরাত্রেই পাল্কীতে রওনা হইলে, সকাল ৭টায় ষ্টেশনে পৌছাইতে পারিবে। পাল্কী-বেহারাদের খবর দেওয়া হইল।

সেদিন সারাদিন ধনী দরিদ্র প্রজা কাছারী বাড়ী ভরিয়া রহিল। জমিদারের বিদায়-উৎসবে আলো বাজী নাচ ভোজ কিছুই হইল না! তবু গ্রামবাসীর অকৃত্রিম স্নেহ ভক্তি প্রীতি আশীর্ব্বাদে অভিসিঞ্চিত হইয়া সতীনাথের মনে হইল, এ উৎসবের কোন অঙ্গই হানি হয় নাই। এমন সদয় স্নেহ ব্যবহার বড় লোকের কাছে, বিশেষতঃ দেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক জমীদারের কাছে, তাহারা আর কখনও পায় নাই। দায়ে পড়িয়া বাঁধা বুলী "হুজুর মা বাপ" গরীব বা প্রসাদাকাঙ্ক্ষীদের অনেকবার বলিতে হয় সত্য, কিন্তু সতীনাথকে তাহাদের সত্যই যেন "মা বাপ" বলিয়া মনে হইয়াছিল। যাহারা জমীদারের রোষকেও ভয় না করিয়া আদালতে 'মরিয়া' হইয়া লড়িতে গিয়াছিল, সেই দলের সর্দ্দার ফৈজু শেখের বৃদ্ধা মাতা লাঠি ধরিয়া সতীনাথকে একবার চোখ ভরিয়া দেখিয়া লইতে আসিল। বুড়ী ঘোলা চখের জলে ভাসিয়া "খোদা তালার" নিকটে "বাপজানের" মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া বাড়ী ফিরিল।

দুই মাসের আত্মীয়তায় সতীনাথ যে বড় অল্প কেলিয়া যাইতেছে না তাহা সে নিজেও বুঝিয়াছিল। সহরে চিরদিন বাস করিয়াও একখানা মুখও এ পর্য্যন্ত আপন হয় নাই; কিন্তু এই নিরক্ষর অশিক্ষিত চাষাভূষাদের অন্তরে এত অল্পসময়ের মধ্যে তাহার জন্য এতবড় সম্মানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করা হইয়া গিয়াছে, ভাবিয়া সে মনে মনে কৃতজ্ঞতা অনুভব করিল। সেখানকার মূল্যবান মিষ্টান্ন কদ্‌মা বাতাসা ও নারিকেলের রস্‌করা দিয়া ছেলেদের খুসী করিয়া দেওয়া হইল। একটি অসমসাহসিকা চারিবৎসরের মেয়ে "আজা" বাবুর কাছে "আঙা" কাপড় চাহিয়া বসিয়া অপরাধের শাস্তি স্বরূপ অভিভাবকদের গোপন তাড়না সহ্য করিলেও, আশার ফললাভে ক্ষতির বেদনা অনুভব করিতে পারিল না। সতীনাথ স্কুলের জন্য অবৈতনিক কয়েক জন মাতব্বর ব্যক্তির হস্তে সমস্ত ভার রাখিয়া যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

রাত দুইটার সময় বাহির হইতে হইল, তাই সঙ্গে অধিক লোকের আসিবার সুবিধা হয় নাই। যাহারা মানা না মানিয়া আসিতেছেল, তাহাদেরও সীতানাথ বুঝাইয়া ফিরাইয়া দিল।

বাড়ী ফিরিবার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, মন তাহার ততই যেন কি একটা অস্পষ্ট বেদনার ভারে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। কোথায় সে ফিরিবার উৎসাহ?

সেওড়াফুলী ষ্টেশনের প্লাটফরমে নামিয়া সতীনাথ পায়চারী করিতেছিল। ট্রেণ ছাড়িবার বড় বেশী বিলম্ব নাই। তাহার মনটা ট্রেণের আগেই ছুটিতে চাহিয়াছিল। প্রায় দুইমাস সে বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে, এই দীর্ঘকালের অদর্শন কল্যাণীর মনে কিছুই কি অভাব-ব্যথা জাগায় নাই? সতীনাথের মত নাই হউক, তবুও সে যে তাহাকে ভালবাসে, তাহার মনও যে তাহার জন্য ব্যাকুল, সে ত সতীনাথ নিজের মন দিয়াই বুঝিতেছে। মুরারির পত্রে প্রথম প্রথম তাহাদের খবর পাওয়া যাইত, আজকাল প্রায় মাসখানেক মুরারির পত্রের ভাবও যেন কেমন ছাড়া ছাড়া হইয়া পড়িয়াছে।

শেষপত্রে সে জানাইয়াছে—তাহার বলিবার কথা অনেক আছে কিন্তু বলিতে সাহস পায় না ; সতীনাথের শীঘ্র ফিরিয়া আসা প্রয়োজন।—পত্রের ভাব ও ভাষা যেন প্রহেলিকাপূর্ণ। কি কথা সে বলিতে সাহস পায় না, কল্যাণীর কথাই কি ? সে কি তবে পীড়িত ? পীড়া কি সাংঘাতিক—না না তা কেন হইবে! সতীনাথ মনকে বুঝাইয়া প্রবোধ দিল, হয়ত কোন বৈষয়িক ব্যবস্থার কথা অথবা জেঠামহাশয়ের মেজাজ ভাল নাই, এমনি কিছু হইবে। সতীনাথের অনুপস্থিতি এবং অজস্র অর্থব্যয়ে এইটাই সবচেয়ে সম্ভব বলিয়া তাহার মনে হইল। মনে পড়িল আর একবার কিছুদিনের জন্য সে মেদিনীপুরে যায়, ফিরিয়া আসিলে পিসীমা বলিয়াছিলেন, "সতী তুই বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি। বাবা, তোরে না পেলে তোর জেঠা আর এক মানুষ হয়।" মনকে সে অনেক কথাই বুঝাইতেছিল, তবু অবুঝ মন কিছুতেই বুঝিতেছিল না।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। সবুজ পতাকা হস্তে গার্ড সাহেবের মূর্ত্তি দেখা দিল। সতীনাথ স্বস্থানে যাইতে গিয়া কোন পরিচিত মুখ দেখিয়া থামিয়া পড়িল। একহাতে একটা গ্রীফ্‌ ব্যাগ, অপর হাতে খবরের কাগজ একজন ভদ্রলোক হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া, অপেক্ষাকৃত ভিড়-কম গাড়ী খুঁজিয়া দেখিতেছিলেন। সতীনাথ অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাতখানা ধরিয়া নাড়া দিতেই ভদ্রলোকটি চমকিয়া ফিরিয়া চিনিতে পারিয়া হাসিয়া কহিলেন—"সতীনাথ যে! ভাল ত ? তুমি কোথা থেকে ?"

গাড়ী হুইস্‌ল দিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধৃত হস্তখানায় টান দিয়া ব্যস্তভাবে সতীনাথ কহিল, "মঞ্জু, এস এস এই গাড়ীতে উঠে পড়, ঢের কথা আছে।"

একটুখানি সলজ্জ কুণ্ঠার সহিত মঞ্জুভূষণ কহিল, "আমার ইণ্টারের টিকিট, ফার্ষ্টক্লাসে গোল করবে।"

সতীনাথ তাহার ধৃত হাতখানা ছাড়িয়া দিল এবং দুইজনে ছুটিয়া চলন্ত গাড়ীর ইণ্টার ক্লাসেই উঠিয়া পড়িল। বসিবার স্থান করিয়া লইয়া সতীনাথ কহিল, "তারপর—ওঃ কতকালের পর দেখা মনেই পড়ে না! একটা প্রকাণ্ড যুগ চলে গেছে।"

মঞ্জু হাসিয়া কহিল, "সত্যি, যখন একসঙ্গে আমরা দুজনে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি সে সব এক দিনই গিয়েছে। তারপর অদৃষ্টস্রোতে কে কোন্‌দিকে গিয়ে পড়লুম, এখন আর চোখের দেখাই হয় না!"

সতীনাথও হাসিল, বলিল, "মনে পড়ে ? তখন একদিনও গোলদিঘীর মিলন বন্ধ হইবার উপায় ছিল না। তারপর, এখন কি কচ্চ বল দেখি ?"

মঞ্জুভূষণ মৃদু হাসিয়া কহিল, "যা করা উচিত—আমাদের মত লোকের কি ম্যাজিষ্ট্রেটি আশা কর ? কেরাণীগিরীতে নাম লিখিয়ে দেওয়া গেছে। পাস করতে পারলুমনাও বটে, আর বাবা মারা গেলেন, কাযেই বাড়ী এসে বস্‌তে হল। ভাইগুলি সবই ছোট। তোমার খবর পেয়ে থাকি, তুমি যে পাস করে ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছ তাও কাগজে দেখলুম। বড় খুসী হয়েছি—লক্ষ্মী সরস্বতী একাধারে না হলে কি মানায় ?"

সতীনাথ তাহার স্কন্ধে মৃদু করাঘাত করিয়া কহিল, "যা আর জ্যাঠামো কর্ত্তে হবে না।"

মঞ্জুভূষণ কহিল, "তারপর, আসল লক্ষ্মীর কথা বল, বিয়ে কল্লে কোথায় ? এত বন্ধুত্ব, একটা ফলারের নিমন্ত্রণও কল্লে না ভাই, এমনি করে ভুলে যেতে হয়!"

সতীনাথ হাসিল ; কহিল, "ভুলেছি কিনা, যখন বিয়ে করব তখন প্রমাণই পাবে।"

"সত্যি বিয়ে করনি ?"

সতীনাথ কহিল, "না।"

"কেন, বাংলাদেশে মেয়ের দুর্ভিক্ষ নাকি ? এমন পাত্র বেকার পড়ে, আর কুমারীরা কিনা কেরোসিন জেলে আত্মহত্যা কচ্চে ? হা হত বিধে!"—বলিয়া কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় হাসিয়া কহিল, "না না, বিয়ে করে ফেল। জান ত, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। শেষ

কি আবার জেঠার ধাত পাবে? ও সব বাতাস ছোঁয়াচে।"—বলিয়া সে সজোরে হাসিয়া উঠিল।

সতীনাথও অনুকম্পার হাসি হাসিল। বেচারা সংসারী, লক্ষ্মীর কদরই বুঝে, বীণাবাদিনী বাগ্‌দেবীর কল্পনা মাথাতেও আসে না। সে যে লক্ষ্মীরূপে সরস্বতীকে বরণ করিয়া ঘরে আনিতে চাহিতেছে, একথা এখন ফাঁস করিয়া সব কবিত্ব মাটি করিয়া দিবে না—যথাসময়ে একেবারে তাক লাগাইয়া দিবে। প্রকাশ্যে কহিল, "কৌমার-ব্রত নেবার তেমন সখ্ কিছু আমার নেই।"

তাহার পর দুই বন্ধুতে বরপণ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা চলিল। সতীনাথ খুব উৎসাহের সহিতই এ প্রথার নিন্দা করিতে লাগিল। গরীবের মেয়ের জন্য বরের দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে কথা হইতে হইতে বলিল—"পঙ্কে জন্মালেও পঙ্কজিনীর মূল্য কমে না।"

মঞ্জু বলিল, "সত্যি বল্‌চ সতী, তুমি গরীবের ঘরে বিয়ে করতে রাজি আছ?"

ধাবমান লৌহরথের বাহিরে গাছপালাগুলাও সবেগে ছুটিয়া পশ্চাতে সরিয়া পড়িতেছে। দুই ধারে শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের উপরে সকাল বেলার তরল রৌদ্র কমলার স্বর্ণাঞ্চলের মত জ্বলিতেছিল। কোথাও ঝোপ ঝাপ ডোবা, কোথাও কোন অট্টালিকার দৃশ্য, মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল। কোদালে কাটা মেঘের ভিতর সূর্য্যালোক পড়িয়া পুঞ্জ পুঞ্জ কার্পাস স্তূপের ভিতর দিয়া যেন বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ করিতেছিল।

সতীনাথ দৃষ্টি ফিরাইল। তাহার চোখে হাসির আলো তরুণ সূর্য্যালোকের মতই খেলা করিয়া গেল। বলিল, "বল্লাম ত, ঐ তোমারই ভাষায় বলি, দারিদ্র্য-পঙ্কে পঙ্কজিনীর মূল্য হ্রাস করায় না, আমারও এই মত।"

মঞ্জুভূষণ সাগ্রহে বন্ধুর হস্ত গ্রহণ করিল। কহিল, "তবে কথা দাও, পঙ্কজ দর্শনের জন্য পল্লীগ্রামের পঙ্কিল পুষ্করিণী দেখতে যেতে তোমার কোন আপত্তি নেই?"

সতীনাথ অতি মধুর হাসি হাসিয়া কহিল, "এর উত্তর মুখে নয়, চিঠিতে পাবে।" দুই বন্ধুতে করমর্দ্দন করিয়া ও বিষয়ের আলোচনা ঐখানেই উপসংহার করিল।

মঞ্জুভূষণের শ্বশুরালয় হুগলী। বিশ্বনাথ বাচস্পতি তাহার শ্বশুরের প্রতিবাসী এবং উমাও তাহার অদৃষ্টা নয়। বিশ্বনাথের পৌত্রীর রূপ গুণ ও বিদ্যার খ্যাতি সে শ্বশুরালয়ে যথেষ্ট শুনিয়াছে, এবং কিছু বা দেখিয়াছে। অন্নপূর্ণার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র অন্বেষণে প্রতিশ্রুতও হইয়াছে, তবু এমন দুর্লভজনে সে তাহার দুরাশা স্থাপন করিতে সাহস করে নাই। সতীনাথকে দেখিয়া এবং তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হইল, বিধাতা বুঝি যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলনের জন্যই তাহাকে আজ অতর্কিতভাবে সতীনাথের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। নতুবা দীর্ঘকালের পর এমন ভাবে তাহার সাক্ষাৎ মিলিল কেন? অঘটনঘটন-পটীয়সী মহামায়ার এ মায়ার খেলা নহে কি?

মঞ্জুভূষণ সতীনাথের ভাবে ও কথায় অনেকখানি আশ্বাস পাইয়াছিল। সতীনাথের স্বভাব তাহার অজ্ঞাত নয়। সে যাহা উচিত বলিয়া মনের সহিত মানিয়া লইবে, তাহা সাধন করিবার জন্য অসাধ্যকে সুসাধ্য করিয়া তুলিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এই দৃঢ়তার বলেই সে বরাবর পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়া আসিয়াছে। অন্নপূর্ণার উচ্ছ্বসিত আশীর্ব্বাদধারার অংশ মঞ্জুভূষণ যেন এখনই গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইল।

তাহার পর অনেক অবান্তর আলোচনা চলিল। দেশের কথা, দশের কথা, জমীদার প্রজার সম্বন্ধ, দেশীয় ব্যবসায়ের উন্নতি, শিক্ষা বিস্তার, ছোট বড় অনেক বিষয়েরই আলোচনা হইয়া গেল। সতীনাথের হৃদয়ের পরিচয় আজ যেন মঞ্জুভূষণ নূতন করিয়া লাভ করিল। বয়সে তাহার হৃদয়ের মাধুর্য্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই, তবু সে এখনও যে সংসার-জ্ঞানে অনভিজ্ঞ, তাহা তাহার আশার সফলতায় দৃঢ় বিশ্বাসেই অনুমেয়। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে অকৃত্রিম স্নেহে মনে করিল, "ভগবান তোমায় এম্‌নি করেই সংসারের আঘাত থেকে চিরদিন

যেন বাঁচিয়ে রাখেন। নিরাশার ঝড় খেয়ে খেয়ে বিশ্বাসের মূল যেন আলগা হয়ে না যায়।"

গাড়ী হুগলী ষ্টেশনে থামিলে, মঞ্জুভূষণ আর একবার তাহার বক্তব্য সম্বন্ধে স্মরণ রাখিবার অনুরোধ জানাইয়া, নিজের ঠিকানা দিয়া, সস্নেহে করমর্দ্দন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় অনাবশ্যক বোধে পঠিত সংবাদ-পত্রখানা সঙ্গে লইল না।

যতক্ষণ দেখা গেল, সতীনাথ বন্ধুর গমনশীল মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। তারপর পরিত্যক্ত ইংরাজী সংবাদ পত্রখানা উঠাইয়া লইয়া সংবাদ-স্তম্ভে দৃষ্টিবদ্ধ করিল। সকালে রওয়ানা হওয়ায় আজকার ডাক তাহার কাছে পৌছায় নাই। রিডাইরেক্ট করিয়া সে সব বাড়ী পাঠাইবার জন্য আদেশ দিয়া আসিয়াছে, কিন্তু অদৃষ্ট নামধারী যে অজ্ঞাত শক্তি মানবের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, সতীনাথ চলিয়া আসিলেও তাহার হাত এড়াইয়া আসিতে পারে নাই।

বৈধব্য-যোগযুক্তা বণিক্-দুহিতা বেহুলার নেত্রের কজ্জলাঙ্কিত সর্পমূর্ত্তি যেমন অদৃষ্টের প্রাধান্য রক্ষার জন্য জীবনলাভে বাসর-শয্যায় লখীন্দরের প্রাণ হরণ করিয়াছিল, সেইরূপ মঞ্জুভূষণের পরিত্যক্ত সংবাদপত্রখানা, সতীনাথকে মৃতের তালিকাভুক্ত না করিলেও যে মৃত্যু-জ্বালা দিতে সক্ষম হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। "মিসেস রজার্সের স্বামীর সহিত বিবাহ বন্ধন ছেদন", "শীতের প্রকোপে শিশুর প্রাণবিয়োগ", "বরিশালে দুর্ভিক্ষ", "বর্দ্ধমানে ডাকাতের অত্যাচার"—এমনি কয়েকটা সংবাদের পর বিবাহ শীর্ষকে লিখিত ছিল—

"ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ৺নবীনমাধব মুখোপাধ্যায়ের সুশিক্ষিতা কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী দেবীর সহিত সিভিলিয়ান মিষ্টার নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষালের ২২এ শ্রাবণ নববিধান মতে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভগবান দম্পতীকে সুখে রাখুন।"

একবার দুইবার তিনবার—কতবারই সতীনাথ সেই একটিমাত্র সংবাদের উপর চোখ বুলাইয়া গেল। অক্ষরগুলা ধাবমান দৃশ্যাবলীর মত চোখের উপর দিয়া ক্রমাগত ছুটাছুটি করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল। চোখে সবই যেন অন্ধকার—মনেরও অনুভব-শক্তি স্পন্দহীন। কাগজখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত দেহ কাঁপিতেছিল। ক্ষণেকের জন্য সে যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল।

পাশের বেঞ্চিতে যে ভদ্রলোকটি বসিয়া এতক্ষণ তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, তিনি আসিয়া তাহাকে ধরিয়া শয়ন করাইয়া দিলেন। মূর্চ্ছা বা আচ্ছন্নতা কাটিয়া গেলে সতীনাথের মনে হইল, সে যেন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সে কোথায়, প্রথমে যেন তাহাই ভাবিয়া লইতে হইল। তারপর উঠিয়া বসিয়া, ভূপতিত সংবাদপত্রখানার পানে পুনরায় স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার অনুভব-শক্তি ফিরিয়া আসিল। সে কাগজখানা আবার উঠাইয়া, সেই একটিমাত্র সংবাদের নিশ্চয়তা স্থির করিবার জন্য পুনরায় চাহিয়া রহিল। সতীনাথের বেশভূষা ও মঞ্জুভূষণের সহিত কথাবার্ত্তা শুনিয়া, সে যে বড়লোক, ভদ্রলোকটির এমনি অনুমান হইয়াছিল, তাই একটু কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সঙ্গে কেউ নেই কি? কাগজখানায় কি কোনও অশুভ সংবাদ দেখ্লেন? বড় কাতর দেখ্‌ছি, তাই জিজ্ঞাসা করতে সাহস কল্লেম।"

সতীনাথ উত্তর দিল না। অর্থহীন দৃষ্টিতে লোকটির পানে চাহিয়া রহিল।

পরবর্ত্তী ষ্টেশনে দুবেজী ও বিপিন আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল; তাহার মুখের পানে চাহিয়া দুজনেই চমকিয়া উঠিল, যেন কত বড় কঠিন পীড়া ভোগ করিয়া সে উঠিয়া বসিয়াছে। বিপিন ভয় পাইয়া কহিল, "একি ছোটবাবু, অসুখ কচ্চে আপনার? চলুন, ও গাড়ীতে চলুন।"

সতীনাথ বাধা দিল না, প্রাণহীন কলের পুতুলের মতই সে বিপিনের অনুসরণ করিয়া চলিল। চলিবার শক্তিও যেন নাই, সে টলিতেছিল। যে নূতন যাত্রী

এইমাত্র তাহার পরিত্যক্ত স্থানাধিকার করিয়া বসিয়াছিল, সে সতীনাথের উদ্দেশে কহিল, "মাতাল নাকি? ছোকরার চেহারা যেন রাজপুত্তুর অথচ প্রবৃত্তি দেখ না!" পুরাতন আরোহী বাধা দিয়া বলিলেন, "না, মাতাল নয়, লোকটা বিদ্বান, খুব বড় রকম একটা ঘা পেয়েছে, ফিট হয়ে গেছল, এই কাগজখানাই সে খবর দিয়েছে।" বলিয়া পুনরায় সংবাদপত্রে মনোযোগ দিলেন, কিন্তু কি সংবাদে যে সতীনাথকে এমন অভিভূত করিয়াছিল, দুইজনে মিলিয়া অনেক চেষ্টাতেও তাহা আবিষ্কার করিতে পারিল না।

নবাগত অনেক ভাবিয়া কহিল, "বোধ হয় ছোক্‌রা, একজন এনার্কিষ্ট, ডাকাতের দল ধরা পড়ার খবরটাতেই বোধ হয় ভেব্‌ড়ে গেছে।"

ক্রমশঃ

শ্রীইন্দিরা দেবী।

স্মৃতি-শক্তি

দার্শনিকগণ বলেন, মন শরীররূপ যন্ত্রের সাহায্যে কার্য্য সম্পন্ন করে। (Body is the organ of the mind, the instrument through which it works.) ইহাতে বুঝা যায়, মনই আমাদিগকে বহির্জগতের সমস্ত কার্য্যে নিয়োগ করিয়া পরিচালন করিতেছে। মন কখনও শূন্য থাকিতে পারে না, একটা না একটা ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে। মন কখনও বৃত্তিশূন্য হয় না—কোন বস্তু বা বিষয় লইয়া সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে। এই চিন্তা-ব্যাপারে কতকগুলি বস্তু উপাদেয় বলিয়া প্রেয় হয়, আর কতকগুলি অনুপাদেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। সকল চিন্তাই আমাদের জ্ঞান-মন্দিরে আশ্রয় লইয়া শেষে স্মৃতিরাজ্য অধিকার করে। এই স্মৃতি কোনটি মধুময় হইয়া আমাদের জীবনে আনন্দ আনয়ন করে, আবার কোনটি কঠোরতার আধার হইয়া আমাদের জীবনকে দুঃখময় করিয়া তোলে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই স্মৃতির উৎপত্তি ও মানব-জীবনে তাহার অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

স্মৃতি (স্মরণশক্তি—memory) বলিতে গেলে আমাদের কোন অনুভূত বিষয়জ্ঞান বোঝায়। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে বিষয় অনুভূত হইয়াছিল, পরে সেই বিষয়ের জ্ঞান হইয়াছে। সংস্কার-জন্য জ্ঞান-বিশেষের নাম স্মৃতি বা স্মরণ। যে কোন কার্য্য করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহার সংস্কার হয়; এই সংস্কার চিত্তে আবদ্ধ থাকে। পরে এই সংস্কার জন্য যে জ্ঞান হয় তাহার নাম স্মৃতি। অর্থাৎ অতীতে কোনও ব্যাপার সংঘটন হইয়াছে সে বিষয়ের চিন্তা ও তাহাকে মনে রাখিবার শক্তিকে স্মৃতি বলে। এই স্মরণ-শক্তির প্রভাবে আমরা সংসারে বিচরণ করিতেছি। প্রতি পদবিক্ষেপেই ইহার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। পূর্ব্বজ্ঞানের স্মরণ না থাকিলে আমরা কোন কার্য্যই করিতে পারি না। জীবনের প্রথম দিন হইতে আমরা ধীরে ধীরে নানা প্রকার জ্ঞান সঞ্চয় করি এবং আবশ্যকমত তাহা আমাদের কার্য্যে নিয়োজিত করি। তবে ইহা কি প্রকারে অর্জ্জন, রক্ষণ ও স্বতশ্চলভাবে স্মৃতিপথে আনয়ন করা হয় (acquired, retained and automatically reproduced) সেটা আমাদের চিন্তার বিষয়। এই ক্রিয়ার দ্বারা সেই চিন্তাগুলি আমাদের মজ্জাগত হইয়া দাঁড়ায়। অননুভূত বিষয়ের স্মরণ হয় না; পূর্ব্বে যে বিষয়ের অনুভূতি ছিল তাহারই স্মরণ হয়। "সুখবোধে"

লিখিত আছে যে, গর্ভস্থ বালকের অষ্টম মাসে স্মৃতি-শক্তির উদ্ভব হয়।

অধ্যাপক রিবো তাঁহার স্মরণশক্তির ব্যাধি (Diseases of Memory) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"The secondary automatic actions or acquired movements are the very basis of our every day existence. Thus locomotion, which in many inferior species is innate, must be acquired by man, particularly the power of co-ordination which maintains the equilibrium of the body in any position, through the combination of tactile and visual impressions. In a general way, it may be said that the limbs and other sensory organs of the adult act with facility only because of the sum of acquired and co ordinate movements which forms for each part of the body its special memory, the accumulated capital upon which it lives and through which it acts in the medium of past experience.

"This formation period is one of constant experiment. Acts which seem now a part of our natures were originally acquired with difficulty."

এই ক্রিয়ার দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে স্থূল স্মৃতি (organic memory) ও সূক্ষ্ম স্মৃতির (psychological memory) প্রভেদ অতি অল্প। স্থূল স্মৃতিতে জ্ঞানের অভাব (want of consciousness) পরিলক্ষিত হয়।

আদালতে কোন সাক্ষীকে যখন কোন পূর্ব্ব ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয়, সে আপনার স্মৃতি-শক্তির সাহায্যে আনুপূর্ব্বিক ঘটনাটা বিবৃত করে। কোন বালক যখন জ্যামিতি শিক্ষা করে তখন সে তাহা মুখস্থ করিয়া তাহার ভাষাকে আয়ত্ত করিতে চায় এবং আবশ্যক হইলে তাহাকে স্মরণপথে আনয়ন করে; কিন্তু সে যখন পুস্তকের ভাষা ভুলিয়া গিয়া সে বিষয়ে একটা জ্ঞান উপলব্ধি করে তখন সে সম্বন্ধে অনাবশ্যক চিন্তাগুলি পরিহার করে।

স্মৃতি-শক্তি সকলের সমান হয় না; কেহ তীক্ষ্ণ, কেহ দুর্ব্বল শক্তি লইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। স্মৃতিশক্তি দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—উত্তম ও অধম। উত্তম স্মৃতির লক্ষণ (১) ক্ষিপ্রতা অর্থাৎ কোন বস্তু দেখিবামাত্র তাহাকে স্মরণ করা; (২) স্থায়িত্ব অর্থাৎ অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন বিষয় মনে না করিলেও মনে থাকা এবং (৩) বিশুদ্ধতার সহিত (distinctness) তাহার মনোনয়ন করা। অধম স্মৃতির স্থায়িত্ব বেশীদিন থাকে না। কতকগুলি লোক যেমন শীঘ্র শিক্ষা করে সেইরূপ শীঘ্র বিস্মৃত হইয়া যায়। আবার কতকগুলি লোক অনেক দেরীতে শিক্ষা করে বটে, কিন্তু একবার শিক্ষা করিলে তাহা আর সহজে বিস্মৃত হয় না। আমাদের দেশের ভোজরাজের অদ্ভুত স্মরণশক্তি ছিল; কথিত আছে, তাঁহার ঘোষণা ছিল যে কেহ নূতন শ্লোক পাঠ করিলে লক্ষ মুদ্রা পাইবেন; কিন্তু যে কেহ তাঁহার রাজসভায় শ্লোক পাঠ করিতেন তিনি তাহা একবার শুনিয়া অসাধারণ স্মরণশক্তি-প্রভাবে আয়ত্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেন। কাজেই কেহ আর তাঁহার প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাইতেন না। ইহা ছাড়া স্মরণ শক্তির আরও বিশেষ আবশ্যকতা আছে। অনেকে রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকেন কিন্তু সময়মত হয়ত তাহার আবৃত্তি করিতে পারেন না। তাহা হইলে এই জ্ঞানের আবশ্যকতা কি?

এইরূপ জ্ঞানের দৃষ্টান্ত আমরা প্রায় পরীক্ষালয়ে দেখিতে পাই। পরীক্ষার্থীরা বই মুখস্থ করিয়া থাকে। পরীক্ষা সহজ হইলে আর কোনও গোল বাধে না। কিন্তু প্রশ্নগুলি যদ্যপি একটু গোল-

মেলে হয় তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! মুখস্থকারী ছাত্রদের মাথা খারাপ হইয়া গেল। আর কোনও প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারে না। আমার মনে আছে, আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন আমাদের একজন সহপাঠীর আশ্চর্য্য মুখস্থ করিবার ক্ষমতা ছিল। সে বইয়ের প্রত্যেক লাইন এমন কি কমা, ফুলষ্টপ পর্য্যন্ত মুখস্থ করিয়া ফেলিত এবং পরীক্ষার সময় অবিকল পুস্তকের ভাষা উদ্গিরণ করিয়া দিত। এই মুখস্থর গুণে মাষ্টার মহাশয়েরা তাহাকে বড় আদর করিতেন, বড় ভালবাসিতেন। একবার কিন্তু সে মহা বিপদে পড়িয়া গেল। সেবার আমাদের পরীক্ষক বাহিরের লোক নিযুক্ত হইলেন; তিনি প্রশ্নগুলি ঘোরফের করিয়া দিলেন, তাহাতে সেই বালকটি সমস্ত প্রশ্নের খেই হারাইয়া কোনটির উত্তর লিখিতে পারিল না। আর, তাহার ফলে তাহার 'ভাল ছেলে' নাম ঘুচিয়া গেল।

বাস্তবিক, যে সব বিষয় আমাদের অন্তরে সুস্পষ্ট-ভাবে অঙ্কিত হয় তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয়; কিন্তু যাহাতে অনুরাগ বেশী হয় না তাহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। তবে এই অনুরাগের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার আনুসঙ্গিক কতকগুলি ব্যাপার সংঘটন করা চাই। তাহাতে কৌতূহল প্রদীপ্ত হয়। কোনও ছেলেকে বর্ণমালা শিক্ষা দিতে হইলে সে সহজে শিখিতে রাজী হইবে না, কিন্তু যদি তাহাকে আহার্য্য দ্রব্যের প্রলোভন দেখান হয় তাহা হইলে সে বেশী মনোনিবেশ করিবে। তবে স্মরণশক্তি সকল সময়ে অনুরাগের উপর নিভর করে না। মাদ্রাজ প্রদেশে একটি নয় বৎসরের শিশু গণিতশাস্ত্রে অদ্ভুত বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছে। সে বড় বড় গুণ মুখে মুখে করিতে পারে। মোজার্ট অল্পবয়সে সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়া পাশ্চাত্য-জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

স্মরণশক্তির মূল-ভিত্তি অভিনিবেশ। মোজার্ট তাঁহার অসাধারণ অভিনিবেশের ফলে সঙ্গীত বিদ্যায় অত কৃতী হইয়াছিলেন। লোকে কথায় বলে "কাণা খোঁড়া একগুণ বাড়া"—অর্থাৎ তাহাদের কোনও অঙ্গ বা বৃত্তি বিশেষের হানি হওয়ায় অন্য দিকে অভি-নিবেশ বেশী হয় এবং ফলে তাহাদের স্মৃতিশক্তির বিশেষ বৃদ্ধি হয়। ইহাকে ইংরাজীতে exaltations of memory বা hypermnesia বলে।

উকীল ব্যারিষ্টারগণ লোকের মামলা মকদ্দমার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মরণ রাখেন না, কিম্বা রাখিতে পারেন না—কেবল আইনের কথাগুলির বিষয় ঠিক রাখিয়া মকদ্দমা চালাইয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায় আবার তাঁহারা সাক্ষীকে of convenient memory বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন! স্মরণশক্তি মানব-প্রকৃতির ব্যক্তিগত বিভিন্নতার উপর সম্পূর্ণ নিভর করে। কারণ স্মরণশক্তি যতই তীক্ষ্ণ হউক না কেন, পরিচালনার অভাবে ক্রমে কমিয়া যায়। অধ্যাপক এবিংহস্ স্মরণশক্তির সময়নির্দ্দেশ নানাপ্রকার পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন। আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি, অমুকের নাম মনে রাখিবার আশ্চর্য্য শক্তি আছে; অমুকের সংখ্যা মনে রাখিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে ইত্যাদি। ইহার অর্থ, সকলের সকল বিষয় সমান স্মরণশক্তি হয় না। হয়ত যে কথাগুলি ঠিক মনে রাখিতে পারে, সে সংখ্যা বা দিন তারিখ মনে রাখিতে পারে না। এই তারতম্যের কারণ Congenital constitution বা সহজাত শারীরিক অবস্থা।

পণ্ডিতগণ স্মরণশক্তির উন্নতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার উন্নতি করিতে গেলে আমাদের মানসিক অভিনিবেশের উন্নতি করিতে হয়। অধ্যাপক জেম্‌স্ বলেন, "All improvement of memory consists in the improvement of one's habitual method of recording facts". অর্থাৎ যেরূপ ভাবে আমরা সচরাচর মনোমধ্যে ঘটনার সন্নিবেশ করি, তাহার উন্নতির উপর স্মৃতিশক্তির উন্নতি নির্ভর করে। তাহাতে মনে রাখিবার ক্ষমতা বাড়ে না; শিখিবার

ক্ষমতা বাড়ে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, কোনও বিষয়ে ক্রমাগত মনোনিবেশ করিলে কেবল যে তাহার ছবি মানসপটে অঙ্কিত করি তাহা নহে, তাহার সহিত অন্যান্য অনেক বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপন (association) করিয়া তাহাকে আরও দৃঢ় করিয়া ফেলি।

স্মৃতি মানবজীবনের একটি দুর্লভ গুণ; ইহা ভগবানের একটি শ্রেষ্ঠ দান। এই আজন্মলব্ধ জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধি অনেক সময়ে আমাদের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। কাল ও পাত্রভেদেও ইহার তারতম্য হইয়া থাকে। অনেক সময়ে—আমরা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তখনকার অপেক্ষা আমরা যখন সুস্থ থাকি তখন বেশী স্মরণ রাখিতে পারি।

স্মৃতি আমাদের পক্ষে যেমন আবশ্যক সেইরূপ ইহা আবার সময় ও অবস্থা অনুসারে সুখ বা দুঃখময়। জীবনে সুখের দিনগুলি স্মরণ হইলে কখনও বা আমাদের হৃদয় শান্তি-সুখে ভরিয়া উঠে; কখনও বা স্মৃতির জ্বালায় গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হয়। আবার দুঃখের দিন মনে পড়িলে আমাদের ক্ষতস্থান যেন লবণাক্ত করিয়া তোলে।

মানুষ মাত্রেই একটা না একটা দুর্ব্বহ পারিবারিক দুর্ঘটনায় এক সময় না এক সময় অভিভূত হইয়াছেন। পিতামাতা সন্তান হারাইয়া শোকে উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠেন। স্বামী স্ত্রীর, স্ত্রী স্বামীর, ভ্রাতা ভ্রাতার শোকে মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন; কিন্তু সময়ের কুটিল গতিতে এই স্মৃতি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমশঃ মুছিয়া যায়। সাংসারিক ও মানসিক ব্যাপারেও এইরূপ; আজ আমি ক্রোরপতি, কাল পথের ভিখারী; এই পতনও আমাদের মন হইতে ক্রমশঃ অপসৃত হইয়া যায়। লীলাময়ের এই মায়ার রাজ্যে স্মৃতি একটি আবশ্যক উপাদান।

যখন আমরা কোনও পাপকার্য্য করিয়া তাহার পরিণাম ভোগ করি,তখন আমাদের সেই পাপের স্মৃতি আমাদিগকে সর্ব্বদা দগ্ধ করিতে থাকে, তখন আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতির কোনও উপায় দেখিতে পাই না। ম্যাক্‌বেথ যখন রাজ্যলোভে ও স্ত্রীর প্ররোচনায় রাজা ডনকানকে হত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন, তখন সেই পাপের অগ্নিশিখা দুইজনকেই পোড়াইতে লাগিল। সেই স্মৃতির হাত হইতে কেহই নিস্তার পাইল না। যখন সেই দারুণ স্মৃতির জ্বালায় লেডি ম্যাকবেথ উন্মাদগ্রস্তা হইলেন, তখন ম্যাক্‌বেথ একদিন চিকিৎসককে বলিলেন :—

"Cure her of that :
Canst thou not minister
to a mind diseas'd,
Pluck from the memory
a rooted sorrow,
Raze out the written
troubles of the brain,
And with some sweet
oblivious antidote
Cleanse the foul bosom
of that perilous stuff,
Which weighs upon the heart ?"

এই নিমিত্ত যোগিগণ মহাত্মগণ সংসার পরিত্যাগ করিবার সময় স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ধনরত্ন এমন কি আপনার নাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সংসারবন্ধন ছিন্ন করেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য সংসারস্মৃতির লোপ সাধন। পাছে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইয়া তাঁহার মুক্তিপথে বাধা দেয় সেই ভয়ে তিনি সব পরিত্যাগ করেন। সংসারের স্মৃতি পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলেন।

স্মৃতিশক্তির হ্রাস এবং লোপের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়; ইহাকে স্মৃতির বিকার বলা যায়। ফরাসী অধ্যাপক রিবো তাহার "স্মরণশক্তির ব্যাধি" (Diseases of Memory) নামক পুস্তকে সাধারণ ব্যাধির (General amnesia) বিষয় অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই স্মৃতি-বিভ্রমকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা :—

(1) Temporary (2) Periodical (3) Progressive ও (4) Congenital. ইহাদের উৎপত্তি ও ক্রিয়ার বিবরণ এস্থলে লিখিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বিস্তৃত হইবে বলিয়া বিরত হইলাম। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে এই স্মৃতি-বিভ্রমের একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাই। রাজা দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রমে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার এই বিবাহের কথা একেবার বিস্মৃত হইয়া যান। শকুন্তলা রাজসমীপে আসিয়া বার বার চেষ্টা করিয়াও পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত করিতে না পারিয়া ক্ষোভে ও অভিমানে বলিলেন —"পোরব জুত্তং ণাম দে তহ পুরা অস্সমপদে সহাবুত্তাণ-হিঅঅং ইমং জণং সমঅপুব্বং পআরিঅ এরিসেহিং অক্খরেহিং পচ্চাক্খাউং।"

"পৌরব! আমি সরল হৃদয়া, ভাল মন্দ কিছুই জানি না। তৎকালে তপোবনে সেইরূপ অমায়িকতা দেখাইয়া ও ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন এরূপ দুর্ব্বাক্য কহিয়া প্রত্যাখ্যান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।"

শকুন্তলা যে রাজা দুষ্মন্তকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিলেও তিনি মনে করিতে পারেন নাই, ইহার কারণ দুর্ব্বাসা মুনির অভিশাপ। এটি কবি-কল্পনা হইতে পারে, তবে বাস্তব জগতে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এইরূপ স্মৃতি-বিভ্রমকে temporary amnesia বলে। রাজা দুষ্মন্ত তাঁহার প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক ঘটনাক্রমে দর্শন করিলে অবশেষে এই বিষয়ে ঘটনাগুলি আমূল তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হয়। এই যে অঙ্গুরীয়কের অবতারণা ঋষির অভিশাপের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে, এটাকে psychological fact বা associated idea বলা যাইতে পারে।

কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশী নামক দৃশ্য কাব্যের একস্থানে বলিয়াছেন, "যন্নিমিত্তং পুনর্ভর্ত্তা উৎকণ্ঠিতঃ তস্যা স্ত্রিয়া নাম্না ভর্ত্রা দেবী আলপিতা" অর্থাৎ যাহার নিমিত্ত ভর্ত্তা উৎকণ্ঠিত আছেন, চিত্তের ভ্রমবশতঃ ভর্ত্তা দেবীকে সেই নামে সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। এখানে রাজা উর্ব্বশীর প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি ভ্রমবশতঃ তাঁহার স্ত্রীকে ঐ নামে সম্বোধন করিতেন।

স্মরণ শক্তির হ্রাসের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কিন্তু ইহার বৃদ্ধির কথাও উল্লেখ-যোগ্য। এ সম্বন্ধে কোন সঠিক মতামত প্রকাশ করা কঠিন, কারণ একজনের পক্ষে যেটা বৃদ্ধি, সেটা হয়ত অপরের পক্ষে হ্রাস। অধ্যাপক রিবো বলেন, "General excitation of memory seems to depend entirely upon physiological causes and particularly upon the rapidity of the cerebral circulation. Hence it frequently appears in acute fevers. It is still more common in maniacal excitation, in ecstacy, in hypnotism; sometimes it appears in hysteria and in the early stages of certain diseases of the brain."

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখা যায় যাহাতে স্মৃতিশক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটিয়া থাকে। জলে নিমজ্জমান কোন কোন ব্যক্তি অবশেষে রক্ষা পাইয়া বলিয়াছেন যে, এই জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে তাঁহাদের জীবনের প্রথম দিন হইতে সেই দিন পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার প্রত্যেক ঘটনাটি মুহূর্ত্তমধ্যে যেন তাঁহাদের নয়নপথ দিয়া অতি সুস্পষ্ট ভাবে চলিয়া যায়।

কোন কোন মাদক দ্রব্য সেবন করিলেও নাকি স্মৃতিশক্তির বিকাশ হয়। De Quency তাঁহার Confessions of an English Opium-eater পুস্তিকায় লিখিয়াছেন, "Sometimes I seemed to have lived for seventy or a hundred years in one night. The minutest incidents of

childhood or forgotten scenes of later years, were often revived. I could not be said to recollect them for, if I had been told of them when waking, I should not have been able to acknowledge them as parts of my past experience."

আমাদের জীবনে আর একটি বিভ্রম ঘটে; ইহাতে একটি আশ্চর্য্য মানসিক ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়। কোনও একটা নূতন বস্তু বা দৃশ্য দেখিলে মনে হয় যে তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি এবং তাহা যেন আমাদের চির-পরিচিত। অধ্যাপক Wigan ইহাকে double consciousness বলেন; কেহ বা pseudo-memory বলেন। কোন একটি লোক দেখিলে আমাদের মনে হয় যে তাহাকে বহুপূর্ব্বে দেখিয়াছি। কোনও একখানি পুস্তক পাঠ করিলে মনে হয় বহুপূর্ব্বে তাহা পড়িয়াছি ইত্যাদি।

কোনও পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে defective nutrition বা উপযুক্ত আহার্য্যের অভাবে স্মৃতির হ্রাস হয়।—তবে আমাদের জানা উচিত—

"Progressive amnesia of dementia, old age or general paralysis is caused by an increasing atrophy of the nervous elements. The capillaries and cells undergo degeneration, the latter finally disappear, leaving in their place only ineffective debris."

কুহেলিকাবৃত সুদূর বৈদিক যুগ হইতে অনেক যুগ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে লিখন ও পঠন পদ্ধতি ছিল না, তখন সমস্ত বিষয়ই স্মৃতি-সাহায্যে পুরুষানুক্রমে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া রক্ষিত হইয়াছিল। তৎকালে মানবগণের স্মৃতির ক্ষমতাও অদ্ভুত রকম ছিল। তা না হইলে আজ অবধি আমরা কোনও শাস্ত্রই জানিতে সক্ষম হইতাম না। বেদার্থ-স্মরণে শাস্ত্র হইয়াছে, এইজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম স্মৃতি।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠান-কালে আমরা ভ্রম-প্রমাদ বশতঃ যদি কোনও ত্রুটি করি, তাহা হইলে শ্রীবিষ্ণু নাম স্মরণ করিলে সে দোষ খণ্ডন হইয়া যায় অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধি হইয়া যায়।

স্মৃতি সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।"

সত্ত্বগুণ নির্ম্মলত্ব প্রযুক্ত স্ফটিক মণির ন্যায় প্রকাশক ও শান্ত ভাবাপন্ন। কিন্তু ইহা অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। ভগবান বলেন,

"অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥"

—হে কুরুনন্দন তমোগুণ বর্দ্ধিত হইলে বিবেকভ্রংশ, অনুদ্যম, প্রমাদ ও মিথ্যাভিনিবেশ এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে স্মৃতি সত্ত্বগুণের প্রভাবে যেমন আমাদের হৃদয়ে প্রকাশমান হয়, তেমনি আবার তমোগুণ প্রভাবে লুপ্ত হইয়া যায়। তমোগুণ জীব মাত্রেরই ভ্রান্তি উৎপাদন করে।

আমাদের শাস্ত্রে 'জাতিস্মর' বলিয়া একটি বাক্য আছে। কেহ কেহ জাতিস্মর হইয়া পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারেন। যোগবলে পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। সহজ অবস্থায় হয় না। জড়ভরত জাতিস্মর ছিলেন; তিনি স্বাভাবিক ক্ষমতায় পূর্ব্বজন্মের সমস্ত ব্যাপার অবগত ছিলেন। এই স্মৃতি আমাদের পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের সহিত জন্মজন্মান্ত অতিক্রম করে। তবে কথা উঠিতে পারে যে স্মৃতি যখন মনের ব্যাপার, তখন ইহা আমাদের মৃত্যুর পর অর্থাৎ স্থূল শরীরের ধ্বংসের পর আপনা হইতে লোপ পায় না কেন? আমাদের সংস্কার কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না, ইহা প্রত্যেক জন্মে পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত শুভাশুভ সংস্কার লইয়া পুনরায় পরিদৃষ্ট হয়। জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আমাদের জীবনের কৃতকর্ম্ম সকল পরিস্ফুট হইয়া আমাদের কর্ম্মানুযায়িক জন্মগ্রহণে বাধ্য করে। আমরাও সেই শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া

পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধি পরিচালিত সংস্কার অর্থাৎ স্মৃতি অনুযায়িক কর্ম্ম করিয়া থাকি। আমাদের সংস্কারগুলি সব প্রস্ফুটিত হয় না, অনুষ্ঠিত কর্ম্মানুযায়িক বুদ্ধিরূপ আধারে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। স্মৃতি এক জন্মের ব্যাপার নহে, ইহা জন্মজন্মান্তর আমাদের অনুগমন করে। ফলকথা ইহা জন্মজন্মান্তরের সংস্কার মাত্র ও চিরস্থায়ী।

শ্রীচূণিলাল মিত্র।

মায়া

(গল্প)

তিন বৎসর ভুগিয়া কোলের ছেলেটি যখন গেল, তখন আমি পাগলের মত হইলাম। সেইজন্য তিনি এদেশের রেলের চাকরী ছাড়িয়া দার্জ্জিলিঙের রেলে চাকরী লইলেন, জীবনে প্রথম দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিলাম। মেঘের রাজ্যে গিয়া প্রথম প্রথম বেশ ভালই ছিলাম। দেশটা নূতন ধরণের—ঘর বাড়ী, লোকজন, গাছপালা সমস্তই নূতন ধরণের, এমন কি রেলগাড়ী পর্য্যন্ত নূতন। দুঃখ শোক ভুলিয়া নূতন দেশে মন্দ ছিলাম না। প্রথমে তিনি দার্জ্জিলিঙে ছিলেন, সেখানে অনেক সঙ্গী পাইয়াছিলাম, সময় যে কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত তাহা জানিতাম না।

কিছুদিন পরে তিনি যখন টুঙ্গে বদলি হইয়া আসিলেন, তখন আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। দার্জ্জিলিঙ ষ্টেশনে সাত আটটি বাঙ্গালী চাকরী করিতেন, তাঁহাদের সকলেরই বাসা নিকটে নিকটে, সহরেও অনেক বাঙ্গালী পরিবারের বাস, অনেকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, কোন কষ্ট হইত না। টুঙ্গ ষ্টেশনে কেবল আমরাই ছিলাম, আর কেহ ছিল না। জন দুই তিন পাহাড়ী সিগন্যালম্যান আর কুলি ছিল, তাহারা পরিবার লইয়া নীচে থাকিত। আমি সারাদিন একা বসিয়া থাকিতাম, খোকা ব্যতীত আর কথা কহিবার লোক ছিল না। তিনি ষ্টেশনে একা, সমস্ত কাজ এক জন লোককে করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার একদণ্ড অবসর ছিল না। সারাটি দিনের মধ্যে একবার তিনি আহার করিতে আসিতেন, সেও কেবল মিনিট পাঁচেকের জন্য। সুখের মধ্যে এ লাইনে রাত্রিতে গাড়ী চলে না, সন্ধ্যার সময়ে শিলিগুড়ির শেষ গাড়ীখানি ছাড়িয়া গেলে তিনি বাসায় ফিরিতেন, তখন আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতাম।

টুঙ্গে প্রথম প্রথম কয়দিন যে যন্ত্রণায় কাটাইয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করা যায় না। যাঁহারা নির্ব্বাসনের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। চারিদিকে পাহাড়, যে দিকে দৃষ্টি যায় সেই দিকেই পাহাড়, স্তব্ধ অচঞ্চল ভীষণদর্শন পর্ব্বত, কেবল উপরে নীল আকাশ আর সাদা মেঘ। যখন বাতাস বহিত, তখন চারিদিক হইতে শব্দ উঠিত, মনে হইত যে চারিদিকে গোলমাল হইতেছে, কিন্তু যখন চঞ্চল পবনের গতিও রহিত হইত, তখন মনে হইত যে বুকে অসহ্য ভার, নির্জ্জন কারাগারে বদ্ধ আছি, চারিদিকে পর্ব্বতগুলা তাহার প্রাচীর, আর আমি একা। সম্মুখে হিমালয়ের উচ্চ প্রাচীর আর পশ্চাতে গভীর গর্ত্ত, মাঝে মাঝে ভয় হইত যে হয়ত কোনদিন পিছলাইয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যাইব। দার্জ্জিলিঙ বা শিলিগুড়ি হইতে যখন গাড়ী আসিত, তখন জানালার কাচে মুখ লাগাইয়া

বসিয়া থাকিতাম, গাড়ী ছাড়িয়া গেলেও অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিতাম। রোজই একটি না একটি বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ দেখিতে পাইতাম, তখন মনে হইত যে একবার ছুটিয়া গিয়া দুটা বাঙ্গালা কথা কহিয়া আসি।

দার্জ্জিলিঙের পথে অনেক পাহাড়ী চলে, এখানে মানুষই দেখিতে পাওয়া যায় না। কদাচ কখনও দুই একজন পাহাড়ী পথে দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেশনের নীচে দুইখানি পাহাড়ী গ্রাম আছে, তাহাদের নামগুলি বেশ, 'মহারাণী' আর 'গৌরীগঙ্গা', কিন্তু গ্রামের লোক বড় একটা রাস্তায় উঠে না। কেবল একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোককে মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। সে যখন আসে তখন অনেকক্ষণ ধরিয়া ষ্টেশনের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহার পরে ধীরে ধীরে নামিয়া যায়। দার্জ্জিলিঙে থাকিয়া দুই একটা পাহাড়ী কথা শিখিয়াছিলাম। এক দিন মনে হইল উহাকে ডাকাইয়া দু'টা কথা কই। নানিকে ডাকিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল যে ও গৌরীগঙ্গার যোগিয়া। তাহাকে ডাকিতে বলিলাম, নানি ডাকিতে গেল, এমন সময় পিছনের দুয়ারে দাঁড়াইয়া পরিষ্কার বাঙ্গালায় কে জিজ্ঞাসা করিল, "মা তুমি আমায় ডেকেছ ?" ফিরিয়া দেখি সে গৌরীগঙ্গার যোগিনী।

অনেকদিন একা থাকিয়া শরীর বড়ই খারাপ হইয়াছিল, তখন যদি আমার হাতে পাণের বাটা থাকিত তাহা হইলে দেবীচৌধুরাণীর আবির্ভাবে সাগর বৌয়ের পরিচারিকার মত আমার হাত হইতে তাহা ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া যাইত। সে আমার ভাব দেখিয়া বলিল, "মা আমায় ডেকেছ কেন ? আমার নাম মায়া, যোগিয়া নয়।" তখন আমার কথা ফুটিল, আমি তাহাকে কাছে আসিয়া বসিতে বলিলাম।

সে পাহাড়ী বটে, কিন্তু তাহার দেহে মলার চিহ্ন নাই, মুখ চোখ বড় সুন্দর, বাঙ্গালীর মতই। তাহার বর্ণটি বড় সুন্দর, অনেক পাহাড়ী মেয়ে দেখিয়াছি, কিন্তু এত সুন্দর কখনও দেখি নাই। তখন তাহার প্রথম যৌবন কাটিয়া গিয়াছে, গাল দুইটি এখনও ফুল্ল গোলাপের মত, বর্ণ শুভ্র, ঈষৎ পীত অথচ রক্তিমাভ। পাহাড়ী পোষাকে তাহাকে মোটেই মানাইতেছিল না, আমার মনে হইতেছিল যে একটি সুন্দরী বাঙ্গালীর মেয়েকে পাহাড়ী পোষাক পরান হইয়াছে।

অনেকদিন পরে বাঙ্গালা কথা কহিয়া বাঁচিলাম। সে বড় সুন্দর বাঙ্গালা কথা কয়, তাহাতে কোন বিদেশী টান নাই। জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে সে অনেক বাঙ্গালীর বাড়ী চাকরি করিয়াছে, তাহাদের নিকট বাঙ্গালা শিখিয়াছে। গৌরীগঙ্গায় তাহার বাড়ী, পূর্ব্বে যিনি ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে তাহার আলাপ ছিল। তাঁহারা তাহাকে বড় ভালবাসিতেন, সেইজন্য যখন তাহার বড় মন কেমন করে তখন আসিয়া ষ্টেশনটি একবার দেখিয়া যায়।

রাত্রিতে মায়া চলিয়া গেল। আমি তাহাকে রোজ আসিতে বলিয়া দিলাম। সেই অবধি সে রোজ সকাল বেলায় আসিত এবং সন্ধ্যায় তিনি গৃহে ফিরিলে চলিয়া যাইত। তাহার সংসারে কেহই নাই, পিতা মাতা বহুপূর্ব্বে স্বর্গবাসী হইয়াছেন, দুইটি ভগিনী বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে, তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্বামী বহুদিন নিরুদ্দেশ। আমি ভাবিতাম, এমন স্ত্রী ফেলিয়া তাহার স্বামী কি জন্য নিরুদ্দেশ হইল, কিন্তু ভাবিয়া কোন সদুত্তর মিলিত না।

সেবারে পাহাড়ে বড় বেশী বৃষ্টি হইতেছিল। কাপড় শুকায় না, তাঁহার জুতাগুলা সব ভিজিয়া গিয়াছে, খোকার সর্দ্দি হইয়াছে, খুকীর জ্বর। বিকাল বেলায় আগুন জ্বালিয়া তাঁহার জুতা শুকাইতেছি, এমন সময় দার্জ্জিলিঙ হইতে ডাকগাড়ী আসিল। বড় বর্ষা নামিয়াছে। পাহাড় হইতে সকল লোক নামিয়া যাইতেছে। রোজ একখানির স্থানে তিনখানি ডাকগাড়ী যায়। প্রথম গাড়ীখানি সবে ষ্টেশনের সম্মুখে আসিয়া লাগিয়াছে, এমন সময়ে মায়া ছুটিয়া আসিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে মায়া ?"

সে সময়টা আমার বেশ মনে আছে। বৃষ্টি একটু থামিয়াছে, মায়া খুকীকে কোলে করিয়া গাড়ী দেখাইতে লইয়া গিয়াছে। রাস্তাটি সাদা ধব ধব করিতেছে, উপরে রৌদ্র উঠিয়াছে, পাহাড়ের মাথায় ভিজা গাছগুলি পড়ন্ত রৌদ্রে সোণার বরণ ধরিয়াছে। ষ্টেশনের বাগানে লাল গোলাপগাছগুলাতে তখনও দশ পনেরটা গোলাপ ফুটিয়াছে, নীচে আর একখানা বড় মেঘ জমিতেছে, শীঘ্রই উপরে আসিবে। মায়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "তিনি আমার স্বামী।" আমি তাড়াতাড়ি একখানা জুতা আগুনের কাছে দিয়া জানালার নিকট গেলাম। মায়া যে গাড়ী দেখাইয়াছিল, সেখানি একখানি সেলুন গাড়ী। তাহাতে একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতেছেন, ভিতরে একটি প্রৌঢ়া মোজা বুনিতেছে, আরও দুইটি মেয়ে বসিয়া আছে। এমন সময়ে ঘণ্টা বাজিল, গাড়ী ছাড়িয়া দিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার স্বামী কে মায়া?" মায়া বলিল "উনিই আমার স্বামী।"

তাহার পর মায়া নিজের ইতিহাস বলিল—

তিনটি ঝরণার ধারা যেখানে একত্র হইয়াছে, তাহারই পাশে গৌরীগঙ্গা গ্রাম। উপরে অভ্রভেদী হিমালয়, নিম্নে হিমালয়, চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় অরণ্যমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী। ঝরণার কূলে কূলে শস্যক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ, ইহাই গৌরীগঙ্গা গ্রাম।

গৌরীগঙ্গায় আমার জন্ম, গৌরীগঙ্গার শুভ্রজলরাশি যেখান দিয়া নৃত্য করিতে করিতে উপল-বহুল পথে ত্রিস্রোতায় আত্মসমর্পণ করিতে যায় সেইখানে আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কাটিয়াছে। সারাটি দিন আমি গৌরীগঙ্গার কূলে কূলে বেড়াইতাম, নূতন লোক আমাকে বনদেবী মনে করিয়া দূর হইতে প্রণাম করিত।

মা, রূপই আমার কাল, এই পোড়া রূপের জন্য আজন্ম জ্বলিয়া মরিতেছি, ইহার জন্যই আমার ইহজন্মের সুখ, আশা, ভরসা অতীত ভবিষ্যৎ সমস্ত ভস্ম হইয়া গিয়াছে। আমি পাহাড়ী ভূমিয়ার কন্যা, আমার কিসের দুঃখ? আমাদের দেশে স্ত্রীজাতি স্বাধীন, স্বচ্ছন্দে নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, সমাজের শাসন কঠোর নহে, কিন্তু এই রূপের জন্য আমি আজ অন্যরূপ হইয়া গিয়াছি। রূপও দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল এই ছার দেহখানা কবে ভস্ম হইবে তাহাই ভাবি।

আমার পিতা অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, বাল্যে আমাদের অন্নবস্ত্রের দুঃখ ছিল না। আমি ও আমার দুইটি ভাই বড় সুখেই শৈশব কাটাইয়াছি। আমার জন্য সে সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কেবল আমিই দুঃসহ দুঃখের ভার বহিবার জন্য বাঁচিয়া আছি। আমি সারাদিন পর্ব্বতে পর্ব্বতে গৌরীগঙ্গার আঁকা বাঁকা পথের পার্শ্বে পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াই, কিন্তু সন্ধ্যা হইলে গ্রামে ফিরিয়া যাই। আমার পিতৃগৃহের ভিত্তির উপর একখানি কুটীর বাঁধিয়াছি, আমি রাত্রিগুলি সেইস্থানেই অতিবাহিত করি।

মা, এখন আমি যোগিয়া, গৈরিক আমার বসন, এক সন্ধ্যাও অন্ন জুটে না, কিন্তু আমি ভিখারী নহি। এখনও আমি গৌরীগঙ্গা ও মহারাণীর জমিদার। যেদিন চিতার কোমল শয্যায় এ দগ্ধ হৃদয় অশান্ত অগ্নিশিখার তীব্র তপ্ত আলিঙ্গনে শান্ত হইবে, সেইদিন জানিবে আমার অর্থ কোথায় যায়। সে কাহার অর্থ? এ কাহার সম্পত্তি? আমি কে? বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপারে আমার যে ভাই শান্তির অন্বেষণে গিয়াছে, যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া যে অসীম শান্তির আশ্রয় লাভ করিয়াছে, ইহা তাহার সম্পত্তি।

কৈশোর অতীত হইল, ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ক্রমে গৌরীগঙ্গা গ্রামে আমার অনেক উপাসক জুটিল। তখন পিতা মাতা আমার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই যে আমার অবস্থান্তর হইয়াছে।

পর্ব্বতবাসী চিরদরিদ্র, গ্রামে আমার পিতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনী। আর এক ধনী ছিল, সে বণিক।

তাহার একমাত্র পুত্র সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে কামনা করিত, তাহারই তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আমার আশা ভরসা জ্বলিয়া গিয়াছে। আমি যখন শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া স্থিরনেত্রে বর্ষাজলস্ফীত নির্ঝরিণীর নিপুণা নর্ত্তকী-সুলভ গতি দেখিতাম, তখন সহসা পশ্চাতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস শব্দে চমকিয়া উঠিতাম। দেখিতাম, দূরে চীরগাছের পার্শ্বে নয়নসিংহ পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া আছে। গৌরীগঙ্গার জলে নামিয়া যখন জলপথে চলিতাম, তখন দেখিতাম দূরে বাণবনের অন্তরালে থাকিয়া নয়নসিংহ আমার অনুসরণ করিতেছে। যদি কখনও নদীতীরে স্বচ্ছজলে আমার প্রতিবিম্ব দেখিতাম, তখনই দেখিতে পাইতাম যে পশ্চাতে তাহার তৃষ্ণাতুর নয়নযুগ্ম আমার দিকেই চাহিয়া আছে। তখনও আমি কিছু বুঝিতে পারিতাম না।

বয়সের সহিত সাহস বাড়িল, ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়া বহুদূরে যাইতে আরম্ভ করিলাম। কখনও কখনও উপরে উঠিয়া রেলের ধারে বসিয়া থাকিতাম, সারাদিন রেল দেখিতাম। গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইত, কিন্তু সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে কখনও কোনও দিন আমার ভয় করিত না। আমি জানিতাম যে নয়নসিংহ সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে আছে এবং সে থাকিতে আমার কোনও ভয় নাই। আমার সখীরা আমাকে বিদ্রূপ করিত, সকলেই বলিত যে নয়নসিংহ মায়াকে বিবাহ করিবে। আমি তখন সে সকল কথায় কর্ণপাত করিতাম না। বিবাহ কি জানিতাম না, জানিতেও চাহিতাম না। পিতৃগৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে একথা মনে হইলেও শিহরিয়া উঠিতাম।

একদিন এই পথের ধারে দেবদর্শন মিলিল। তখন ষ্টেশন নূতন হইয়াছে, এক বৃদ্ধ শ্বেতশ্মশ্রুধারী কৃষ্ণকায় বৃদ্ধ ষ্টেশনমাষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। আমি তখন সারাদিন পথের ধারে প্রাচীরের উপরে বসিয়া গাড়ী দেখিতাম, নয়নসিংহ উপরে আর নীচে গুলেল দিয়া পাখী মারিয়া বেড়াইত। ষ্টেশনমাষ্টার বাবু শীতের ভয়ে ঘর হইতে বাহির হইতেন না। রাত্রিতে একা থাকিতে তাঁহার ভয় করিত, কারণ তখন খালাসীরা ষ্টেশনে থাকিত না। একদিন নয়নসিংহকে গুলেল দিয়া পাখী মারিতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন যে বড়-বীর। তখনই তিনি তাহাকে চাকরী দিবার প্রস্তাব করিলেন। নয়নসিংহ আমাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে চাকরী করিবে কি না? নয়নসিংহ চাকরী করিবে কি না তাহাতে কাহার কি যায় আসে? আমি বলিলাম, "যাও।" পরদিন নয়নসিংহ সাতটাকা বেতনে ষ্টেশনমাষ্টার বাবুর দরওয়ান নিযুক্ত হইল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সে আমাকে গ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আবার ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিত।

একদিন ঝরণার কাছে রাস্তার ধারে প্রাচীরের উপর বসিয়া আছি, কলিকাতার গাড়ী তখনও আসে নাই, হঠাৎ দেখিলাম ঝরণার পথে একখানা বড় পাথরের উপর কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া আমার শরীরে রোমাঞ্চ হইল, আমি যেন কেমনতর হইয়া গেলাম। তাঁহার বেশ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত বটে কিন্তু রূপ দেবতার মত। বরফের মত শুভ্র কখনও মানুষের বর্ণ হয়? ইংরেজ সাদা, কিন্তু সে বর্ণ ত এমন নয়, সে যেন ধবল রোগের বর্ণ। কিন্তু আমার দেবতার বর্ণ মধুর, মনোহর, তাহাতে তীব্রতা নাই। এমন বর্ণ, এমন ভ্রমর কৃষ্ণকেশ, এমন সুন্দর মুখ কখনও মানুষের হয়? সেইজন্যই আমার ধারণা হইয়াছিল, আমি মানুষ দেখি নাই, দেবতা দেখিয়াছি। যখন চমক ভাঙ্গিল তখন দেখিলাম ঝরণার গর্ভে কেহ নাই। সেইদিন সন্ধ্যাকালে গ্রামে ফিরিবার সময় নয়নসিংহ বলিল যে বুড়া বাবুর অনেক আত্মীয় স্বজন আসিয়াছে।

তাহার পরদিন কে যেন আমাকে টানিয়া ঝরণার ধারে লইয়া গেল, সারাদিন সেই পাথরের উপর বসিয়া রহিলাম, কিন্তু কেহই আসিল না, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। যখন ফিরিলাম তখন আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। আমার উপরে উপদেবতার নজর হইয়াছে বলিয়া আমার ভাই পরদিন তারাদেবীর মন্দিরে পূজা দিয়া আসিল।

পরদিন আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। তখন বর্ষা কাটিয়া গিয়াছে, নীল আকাশ পরিষ্কার, আবার ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেবদর্শন মানসে আমি সেদিন প্রাতস্নান করিয়া রাশি রাশি ফুল তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। কতকগুলা ফুল মাথায় ও কাণে গুঁজিয়াছিলাম, আর বাকীগুলা কাপড়ে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। সেদিন তিনি পথের ধারে দাঁড়াইয়া নির্ঝরিণীর নৃত্য দেখিতেছিলেন। দেবদারুর সুগন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছিল, উপর পাহাড়ে তুষার রাশির উপর রৌদ্র পড়িয়া তাহা সোণার বরণ হইয়া গিয়াছিল। আমি দূর হইতে প্রণাম করিয়া আমার অর্ঘ্য তাঁহার পায়ের কাছে ছড়াইয়া দিলাম, তখনই ঘূর্ণবায়ু উঠিয়া ছোট ছোট ফুলগুলি তাঁহার চারিদিকে উড়িতে লাগিল। ভয়ে ও ভক্তিতে আমি আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?"

দেবতার সঙ্গে কি কেহ কথা কহিতে পারে? আমি হাতযোড় করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি অনেকক্ষণ আমাকে দেখিলেন, পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?" আমি কম্পিত কণ্ঠে কহিলাম, "মায়া"। সেই প্রথম আলাপ। সেইদিন হইতে আমি তাঁহার হইলাম, এক মুহূর্ত্তে পিতা, মাতা, ভ্রাতা সমস্তই বিস্মৃত হইলাম।

প্রত্যূষে গ্রাম ছাড়িয়া উপরে উঠিতাম। যতক্ষণ ষ্টেশনের দুয়ার না খুলিত, ততক্ষণ রাস্তার ধারে বসিয়া থাকিতাম। তিনি দুয়ার খুলিলে তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতে বাহির হইতাম। পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে উপত্যকায় নির্ঝরিণীর পাশে পাশে, বহুবর্ণের উপলরঞ্জিত নদীবক্ষে সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইতাম, ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে থাকিত না। তিনি থলিয়ায় ভরিয়া আহার্য্য লইয়া যাইতেন, পথে নির্ঝরিণীর পার্শ্বে, অথবা নদীকূলে বসিয়া তিনি আহার করিতেন, পাত্রে যে উচ্ছিষ্ট অন্ন পড়িয়া থাকিত, আমি সানন্দে তাহা খাইয়াই দিন কাটাইয়া দিতাম। কোথা দিয়া যে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল তাহা জানিতে পারিতাম না, কিন্তু নয়নসিংহ ক্রমে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল।

একদিন নয়নসিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে তাঁহার সহিত একা থাকিতে নিষেধ করিল। আমি হাসিয়া তাহার কথা উড়াইয়া দিলাম। তাহাতে সে আরও রাগিয়া গেল এবং কুক্‌রী বাহির করিয়া বলিল, যে বাঙ্গালী তাহার শত্রু সে তাহাকে হত্যা করিবে। আমার বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম। যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম যে আমার মাথা কোলে লইয়া ঘোর কুয়াসার মধ্যে তিনি ভূমিতে বসিয়া আছেন, ষ্টেশনের দুইজন খালাসী নয়নসিংহকে ধরিয়া আছে। কলিকাতা হইতে গাড়ী আসিয়াছে, তাহা হইতে অসংখ্য ইংরাজ বাঙ্গালী আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। পুলিস সেই গাড়ীতে নয়নসিংহকে দার্জ্জিলিঙ লইয়া গেল, গাড়ী ছাড়িয়া গেল তখনও আমি তাঁহার জানুর উপরে শুইয়া রহিলাম, আমার উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। গাড়ী ছাড়িয়া গেল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়া, নয়নসিংহ কি তোমাকে আঘাত করিয়াছিল ?" আমি বলিলাম, "না।"

"তবে তুমি মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলে কেন ?" এইবার আমি বড় বিপদে পড়িলাম। লজ্জা আসিয়া আমার বাক্‌রোধ করিল, তিনি দুই তিনবার আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। লজ্জায় আমার কর্ণমূল ও গণ্ডস্থল লাল হইয়া উঠিল, আমি উঠিয়া বসিয়া মাথার কাপর টানিয়া দিলাম। তিনি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অন্য দিন নয়নসিংহ আমাকে গ্রামে দিয়া আসিত, আজ তিনি আমাকে লইয়া আসিলেন। গৌরীগঙ্গা গ্রামের সীমান্তে একটা বাণগাছের তলায় দাঁড়াইয়া তিনি আমার হাত দুইটি ধরিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়া তুমি আমাকে বিবাহ করিবে ?" আমি লজ্জায় উত্তর দিতে পারিলাম না, কিন্তু তাঁহার নয়ন যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মায়া তুমি কি আমার হইবে ?" তখন আর আমি

থাকিতে পারিলাম না, তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

তাহার পরদিন তিনি আমাকে লইয়া খরসানে গেলেন, খরসানে আমাদের বিবাহ হইল। বিবাহের পরে তিনি আমাকে লইয়া দার্জ্জিলিঙ চলিয়া গেলেন। কয়েকদিন পরে তিনি রেলে চাকরী লইয়া এই টুঙ্গ ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলেন।

মা, এই গৃহ আমার স্বর্গ, আমার স্বামীর সহিত যে কয়মাস বাস করিয়াছিলাম তাহা স্বপ্নের মত, এখন তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এই গৃহ আমার জীবনের কেন্দ্র। মনের আবেগে কতদূর চলিয়া যাই, মনে করি আর আসিব না, কিন্তু কোন্ অদৃষ্ট শক্তির আকর্ষণে আবার এই পথের ধারের ক্ষুদ্র গৃহে আমাকে ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহা বলিতে পারি না। এখন আর এ গৃহ আমার নয়, ইহাতে বাস করিবার অধিকার আর আমার নাই। সেইজন্য যখন আসি তখন দূরে লুকাইয়া দেখি, অবসর পাইলেই গৃহবাসীদিগের সহিত আলাপ করি এবং সেই অছিলায় আমার এই পবিত্র তীর্থমন্দিরে প্রবেশ করি। তাহার পর কত ষ্টেশন মাষ্টার আসিল গেল, সকলেরই পরিবারের সহিত মাগিয়া যাঁচিয়া পরিচয় করিয়াছি। এখন যেমন সারাদিন তোমার গৃহে আসিয়া বসিয়া থাকি, তাহাদের সময়েও এমনই করিয়া এই তীর্থে আসিয়া দিন কাটাইতাম, আর সন্ধ্যার-সুখ স্বপ্ন স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে প্রবল অন্ধকারময় পার্ব্বত্য-পথ দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতাম।

কতসুখে যে সে কয়মাস কাটিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে পারিব না। সে যে স্বপ্ন, ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, স্বপ্ন দূরে সরিয়া গিয়াছে, আছে কেবল তাহার স্মৃতি। যেদিন সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল,সে দিনটা এমনই। সেদিনও আকাশে মেঘ ছিল না, তরতর করিয়া দখিণাবাতাস বহিতেছিল, পথের ধারে বন্য টিয়াপাখীগুলি তারের উপর বসিয়া কিচিমিচি করিতেছিল। আমি পথের ধারে বসিয়া তাঁহার জন্য মালা গাঁথিতেছি, এমন সময়ে কলিকাতার গাড়ী আসিল, আমি ঘরের ভিতর গিয়া লুকাইলাম। গাড়ী ছাড়িয়া গেলে তিনি একখানি পত্র লইয়া ঘরের ভিতরে আসিলেন এবং শয্যার উপরে বসিয়া পড়িলেন। ঐ সেই খাট, ঐ সেই জানালা, এই সেই আমি, ঐ সেই অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী আর অনন্ত নীল আকাশ—সমস্তই আছে, নাই কেবল তিনি, আর আমার সে দিন। এই গৃহের প্রতি ইষ্টক ও কাষ্ঠখণ্ড তাহার সাক্ষী।

পত্র পড়িতে পড়িতে তাঁহার নয়নকোণ হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, তাহা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার মুখে কেবল হাসি দেখিয়াছি, কখনও সে নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখি নাই। পত্রপাঠ শেষ হইলে তিনি চক্ষু মুছিয়া আমায় বলিলেন, "মায়া পড়, যাহা হইয়াছে তাহা ফিরিবার নহে। তোমাকে ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করিয়াছি কেমন করিয়া ত্যাগ করিব।" এই সময় খালাসী আসিয়া বলিল যে কলিকাতার মালগাড়ী আসিয়াছে। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে গেলেন, আমি পত্র লইয়া পড়িতে বসিলাম।

তিনি আমাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। পত্র তাঁহার পিতার :—

"যেদিন শুনিলাম যে রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া তুমি বংশ গৌরব ও শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া নীচ পাহাড়ীর কন্যা বিবাহ করিয়াছ, সেইদিন হইতে তুমি আর আমার পুত্র নহ। আমি জানিয়াছি যে আমার পুত্র হিমালয় ভ্রমণ করিতে গিয়া মরিয়াছে। তোমার গর্ভধারিণীকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা পারি নাই। সে অভাগিনী রমণী, সুতরাং কোমলহৃদয়া, সে তোমাকে ভুলিতে পারে নাই। তোমার জন্য আজি সে মৃত্যু-শয্যায়; সে তোমাকে দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, তাহার উপর যদি তোমার ভক্তি বা মমতা থাকে তাহা হইলে একবার তাহাকে দেখা দিয়া যাইও। আমার গৃহে আসিও না, যদি পাহাড়ীর কন্যাকে ত্যাগ করিতে

পার তাহা হইলে আমার গৃহে প্রবেশ করিও, নতুবা নহে।

তোমার পিতা।"

পত্র পড়িয়া মন কেমনতর হইয়া গেল। আমার জন্য তাঁহার পিতা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমার জন্য তাঁহার মাতা মৃত্যুশয্যায়, আমার জন্য তিনি ঘৃণিত, অপমানিত, দেশত্যাগী, পিতৃগৃহে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই! এসকল কথা ত পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই! আমার স্বর্গ যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, আমার সুখস্বপ্ন ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। চারিদিক অন্ধকার বোধ হইল, ধীরে ধীরে গৃহের বাহির হইয়া, পথের ধারে পাথরের উপর বসিয়া পড়িলাম।

তিনি দেবতা, দয়া করিয়া চরণে স্থান দিয়াছিলেন মাত্র, আমার পূজা করিবার অধিকার আছে। আমার জন্য তিনি সর্ব্বত্যাগী, পিতৃগৃহে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাঁহার মাতা মৃত্যুশয্যায় একবার তাঁহাকে দেখিতে চাহেন। তিনি বলিয়াছেন, "যাহা হইয়াছে, তাহা ফিরিবার নহে।" বার বার কেবল এই কথাই আমার মনে উদয় হইতে লাগিল, পথের ধার ছাড়িয়া ঝরণার ধারে গিয়া বসিলাম।

কেন ফিরিবার নহে! যাহা হইয়াছে তাহা স্বচ্ছন্দে ফিরিবে। আমার জন্য, আমার সুখের জন্য, তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী করিয়া রাখিব, তাঁহাকে চিরজীবন অশান্তি ভোগ করিতে হইবে, তাঁহার পিতা মাতাকে একমাত্র পুত্র ত্যাগ করিয়া থাকিতে হইবে? ছি, হঠাৎ হাসি আসিল, পাথরের ধারে কতকটা জল জমিয়াছিল, তাহাতে আমার প্রতিবিম্ব দেখিলাম। দেখিলাম, চোখে জল মুখে হাসি।

তিনি না আমার দেবতা? আমি না তাঁহার দাসী? আমার জন্য তিনি স্বজন সমাজে হেয় হইয়া থাকিবেন। এ আমার কেমন উপাসনা? এ আমার কেমন ধরণের পূজা? আমি না হিন্দুর কন্যা? গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলাম। লিখিতে লিখিতে চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল, পত্রের কালি শতস্থানে ধুইয়া গেল। পত্র শেষ হইলে তাহা তাঁহার মেজের উপরে রাখিয়া আমার ভূস্বর্গ ত্যাগ করিলাম। তিনি তখন পথের ধারে পাথরের উপরে বসিয়া একমনে চিন্তা করিতেছিলেন, বোধ হয় দেশের কথা, সমাজের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা—আমার হাসি আসিল।

দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মনে মনে বলিলাম, "দেব আমি চলিলাম, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাইও, পিতামাতার নিকটে যাইও। নিশ্চিন্ত মনে স্বজন সমাজে ফিরিও। তুমি সুখী হইও, আমার জন্য ভাবিও না, দুঃখ করিও না, তোমার সুখে আমার সুখ, তুমি যে আমার দেবতা। আমার জন্য তুমি সমাজ ত্যাগ করিয়াছিলে, স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলে, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এতদিন সে কথা আমাকে বুঝাইয়া বল নাই কেন? তাহা হইলে কি তোমার নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিতে দিতাম! দেবতা, তুমি হাসিও, কেহ যেন কখনও তোমার মুখখানি মলিন না দেখে, তোমার নয়নকোণে যেন আর কখনও অশ্রু-বিন্দু গড়াইয়া না পড়ে, তুমি সুখী হইও, তাহা হইলে আমি স্বর্গে যাইব। তুমি আমার দেবতা, তুমি স্বর্গ, তুমি চিন্তা, তুমি ধ্যান। যখন পাষাণের আঘাতে এ দেহ চূর্ণ হইবে তখন যেন মানস চক্ষে তোমার মুখখানি দেখিতে দেখিতে মরি।"

প্রণাম করিয়া উঠিলাম। দূরে পর্ব্বতশৃঙ্গে একখানা প্রকাণ্ড পাথর ছিল, তাহার উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে মানুষ বাঁচে না। ধীরে ধীরে অপরের অলক্ষ্যে সেই পাথরের উপরে উঠিলাম, হাত পা কাপড় দিয়া দৃঢ় করিয়া বাঁধিলাম। মরণের দুয়ারে গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম তখন আবার কে আমাকে ফিরাইয়া আনিল। হঠাৎ মনে হইল আর ত দেখিতে পাইব না, একবার দেখিয়া আসি। ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম যে তখনও তিনি সেইভাবে সেই পাথরের উপরে বসিয়া আছেন।

ফিরিয়া গেলাম। হঠাৎ জীবনে বড় মমতা হইল, মনে হইল বাঁচিয়া থাকি, মরিয়া কাজ নাই, তবুও ত কখনও কোনও দিন অন্ততঃ একবার চোখে দেখিতে

পাইব। আমি জানিতাম যে আমি বাঁচিয়া থাকিতে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, আমি তাঁহার জীবনপথের কণ্টক, সুখের অন্তরায়, সেইজন্য আমি স্থির করিলাম যে আমি মরিব, অথচ বাঁচিয়া থাকিব, জানিবেন যে আমি মরিয়াছি অথচ আমি জীবিত থাকিব। সেই পাথরের উপরে ফিরিয়া গেলাম, তাহার উপরে আমার অলঙ্কারগুলি খুলিয়া রাখিলাম, একখানা বড় পাথরে আমার বস্ত্র জড়াইয়া নিম্নে নিক্ষেপ করিলাম। তাহার পর ঝরণার জলে পা দিয়া বনের ভিতরে লুকাইলাম। তখনও আমার পিতামাতা বাঁচিয়া ছিলেন, সেখানেও গেলাম না, কোন গ্রামেও যাই নাই। টুঙ্গের উপরে একটা গুহা আছে, সেখানে নয়ন সিংহ একরাত্রি যাপন করিয়াছিল, সেকথা কেবল নয়নসিংহ ও আমি জানিতাম। সেই গুহায় রাত্রি যাপন করিলাম।

সেই রাত্রিতেই আমার সন্ধানে লোক বাহির হইল, আমি গুহায় বসিয়া তাহাদের আলোক দেখিতে পাইলাম, তাহারা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বনে বনে আমাকে সন্ধান করিয়া বেড়াইল। প্রভাতে সেই পাথরের উপরে সকলে আমার অলঙ্কার দেখিতে পাইল এবং তাঁহাকে গিয়া সংবাদ দিল। তিনি আসিলেন, তখন আমি সেই পাথরের উপরে বনে লুকাইয়া আছি।

সেই সময়ে মন বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার কাতর কণ্ঠের আহ্বান শুনিয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছিলাম। যখন বনে বনে শৃঙ্গে শৃঙ্গে, তাঁহার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিত আমার নাম প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তখন আমার চিত্ত বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, দেহের প্রতি অণু পরমাণু তাঁহার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইবার জন্য ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছিল, কেবল আমার মন তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। যত কষ্ট, যত যন্ত্রণা কেবল দুই এক দিনের জন্য, তাহার পরে সকলেই ভুলিয়া যাইবে, সকলেই স্থির করিবে যে মায়া মরিয়াছে, এই ভাবিয়া মন বাঁধিয়া রাখিলাম।

দুই একদিন পরে সকলেই স্থির করিল যে আমি মরিয়াছি। দশ পনের দিন তিনি উন্মাদের ন্যায় টুঙ্গ ত্যাগ করিলেন, সেইদিন আমিও টুঙ্গ ত্যাগ করিলাম, তবে তিনি যে পথে গেলেন তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিলাম। বলিয়াছি ত, মাঝে মাঝে ফিরিয়া আসি, এই ভূস্বর্গ দেখিয়া যাই, এই ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া যাই, আবার যেদিকে মন যায় সেই দিকে চলিয়া যাই, এমনি করিয়া অনেক দিন কাটিয়া গেল।

দশ বৎসর পরে এক দিন দার্জ্জিলিঙের বাজারে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। সেদিন বড় অন্ধকার, কুয়াসায় চারিদিক ছাইয়া গিয়াছে, অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। বাজারের উপর দিকে একা পথে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে দেখিলাম সম্মুখে তিনি। দশ বৎসর পরে হইলে কি হয়? আমি একদণ্ডের জন্যও সে মুখ, সে স্বর, সে আকার বিস্মৃত হই নাই, তাঁহার প্রতি রেখা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। তিনি চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু আমি সেইদণ্ডেই চিনিয়াছিলাম। সেই ঘন কুয়াসার আলো-আঁধারে, তাঁহার মুখখানি দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছিলাম, তাঁহার কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র আমার ক্ষুদ্র সুখস্বপ্নের ক্ষুদ্র ইতিহাস, আমার চক্ষুর সম্মুখ দিয়া বিদ্যুৎবেগে একটি বহুবর্ণের চিত্রের মত চলিয়া গেল। তিনি আমাকে একটা বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি উত্তরে বলিলাম যে আমি তাহা চিনি না। তিনি উপরের রাস্তা বহিয়া চলিয়া গেলেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, মনে বড় ভয় হইয়াছিল পাছে তিনি চিনিয়া ফেলেন। তখন আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল, শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতেছিল। তখন যদি তিনি আমাকে স্পর্শ করিতেন তাহা হইলে আমি হয়ত আত্মসম্বরণ করিতেপারিতাম না। তিনি চিনিতে পারিলেন না, তিনি চলিয়া গেলেন, আমার মনের আবেগ ধীরে ধীরে প্রশমিত হইল। হঠাৎ দূরে কাহার পদশব্দ

শুনিতে পাইলাম, কে যেন দ্রুতপদে আমার দিকে আসিতেছে।

সে তিনি। তিনি আকুল কণ্ঠে ডাকিতেছেন, "মায়া, মায়া, এইবার চিনিয়াছি মায়া, ফিরে এস মায়া।" সহসা মনের বল ফিরিয়া আসিল, আমি অন্ধকারে লুকাইলাম। দর্শন মিলিয়াছে, একযুগ পরে তাঁহাকে দেখিয়াছি, ইহাই কি যথেষ্ট নহে? তাঁহার আকুল কণ্ঠের আহ্বান চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পাছে মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে দুই হাতে বক্ষস্থল ধরিয়া রহিলাম। যদি ধরা দিই তাহা হইলে সমস্ত ব্যর্থ হইবে, এতদিনের উদাম সংযম পরিশ্রম সমস্তই বিফল হইবে। মন বাঁধিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে তিনি যখন চলিয়া গেলেন, তখন গৃহে ফিরিলাম।

তাহার পরে সাবধানে পথ চলিতাম, দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, অন্যপথে চলিয়া যাইতাম। সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম যে তাঁহার নয়ন দুইটি সতত আমাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। তাহা দেখিয়া আমার মন বলিল, তিনি জানিয়াছেন আমি মরি নাই বাঁচিয়া আছি। আমিও দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতাম, তাহাতেই আমি পরিতৃপ্ত হইতাম। ক্রমশঃ তাঁহার পরিচয় পাইলাম, তিনি একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার, বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহার যশ দেশে ও বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তিনি বিবাহ করিয়াছেন, তাহাতে দোষ কি? তিনি ত জানিতেন যে আমি নাই, আমি মরিয়াছি।

আরও দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখন যৌবন অতীত হইয়াছে, জরা আসিয়া স্পর্শ করিয়াছে। পিতার মৃত্যু হইয়াছে, ভ্রাতারা সৈনিক, তাহারা দেশত্যাগ করিয়াছে, আবার আসিয়া গৌরীগঙ্গায় বাস করিয়াছি। প্রতি বৎসর তিনি দার্জ্জিলিঙে আসেন, তখন আমিও সেখানে যাই। দূর হইতে তাঁহাকে দেখি, তাহাতেই তৃপ্তি হয়। এখনও মনে বড় ভয় হয়, যদি তিনি স্পর্শ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে হয় ত আত্মসম্বরণ করিতে পারিব না, আমার দেহের সমস্ত অণু পরমাণু বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। তখন যৌবনে যেমন আত্মহারা হইয়া তাঁহার কণ্ঠলগ্না হইতাম, এখনও তেমনি করিয়া তাঁহার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া ফেলিব। ছি—"

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই পার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—"বহিন্, আমরাও হিন্দুর মেয়ে, সকলেই একদিন না হয় একদিন স্বামীপুত্র লইয়া বসবাস করিয়াছি, কিন্তু আমরা কয়জনে স্বামীর মঙ্গলের জন্য, স্বামীর সুখের জন্য, এমন করিয়া আত্ম-জলাঞ্জলি দিতে পারি? আমি ত পারি না।"

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

দৃষ্টি

কহে না সে কোন কথা, চুপ করে' শুধু চেয়ে থাকে,
যুগ্ম-আঁখি যেন দুটি তারা;
মৌন হাসিটুকু সদা মুখখানি ছেয়ে যেন রাখে
অতি সূক্ষ্ম আবরণ পারা।
যত খুসী চেয়ে থাক, দৃষ্টি তার নহে সঙ্কুচিত,
চির সমুজ্জ্বল শিখা খানি—
চেয়ে চেয়ে চেয়ে চেয়ে অবশেষে, আপনি কুণ্ঠিত
ফিরে আঁখি অপরাধ মানি'।
দূরে তবু অতি কাছে, কাছে তবু যেন অতি দূর,
সুগভীর রহস্যের মত,
'অজানা মোহের ঘোরে পরাণেরে করে ভরপুর,
তৃষাতুর, তবু তন্দ্রাহত!
মনে বাসি কত কথা মরমের বলি তার কাছে,
শেষে দেখি, সব ভুলে' যাই—
ব্যথাতুর বক্ষতলে দ্রুততালে রক্ত শুধু নাচে—
মাথা ঘোরে—আপনা হারাই!
একি মায়া, একি মোহ, একি ভ্রান্তি, একি মতিভ্রম,
জাগরণ অথবা স্বপন—
একি সুখ, একি দুঃখ, স্নিগ্ধজ্বালা একি রে বিষম,
পলে পলে একি রে মরণ!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

ব্রজ-কাহিনী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চরিতামৃতে মদনমোহন প্রতিষ্ঠাতা সনাতন গোস্বামীর এইরূপ জীবনী দেওয়া আছে। ইহার মধ্যম ভ্রাতা রূপ গোস্বামী হুসেন সাহা নবাবের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পর ইনি কতকটা উদাসীন ভাবে গৃহে ছিলেন। তখন তিনি প্রায় রাজকার্য্যে ও সাকর মল্লিক বা কোষাধ্যক্ষের পদ অবহেলা করিয়া নিজ গৃহে পণ্ডিতগণকে লইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনা করিতেন। নবাব সরকারে নিজ অসুস্থতা জানাইয়া কর্ম্মে অনুপস্থিত থাকিতেন। নবাব নিজ হাকিমকে ইঁহার রোগ চিকিৎসার জন্য পাঠাইলেন। হাকিম দেখিয়া গিয়া নবাবকে জানাইলেন যে, সনাতনের দেহে তিনি কোন রোগ খুঁজিয়া পান নাই। নবাব স্বয়ং দেখিতে আসিলেন। তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি তোমার রোগ শুনিয়া বৈদ্য পাঠাইয়াছিলাম। সে আমাকে সংবাদ দিয়াছে যে, তোমার শরীরে কোন ব্যাধি নাই। তবে কেন তুমি অলসের ন্যায় গৃহে বসিয়া আছ? তোমার মনোগত অভিপ্রায়টা কি?" সনাতন বিনীতভাবে জানাইলেন "আপনি অন্যলোক দেখুন আমি আর আপনার কার্য্য করিতে সক্ষম নহি।" নবাব নিজ কর্ম্মচারীর মুখে বারবার এইরূপ প্রত্যাখ্যান শুনিয়া তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইলেন। কিয়দ্দিন পরে উড়িষ্যার রাজার সহিত নবাবের গোলযোগ বাধিল। তিনি পুনরায় সনাতনকে আনাইয়া বলিলেন, "আমি উড়িষ্যায় যুদ্ধ করিতে যাইতেছি। তুমি আমার বড় বিশ্বাসী ও কর্ম্মদক্ষ,—চল আমার সঙ্গে চল।" ইহা শুনিয়া—

"তেঁহ কহে তুমি যাবে দেবে দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাই তোমার সঙ্গে যাইতে॥"

(চৈঃ চঃ মঃ লীঃ ২০ পরিচ্ছেদ)

হুসেন সাহা এইরূপ উত্তর শুনিয়া তাঁহাকে কঠোরতর কারাগারে পাঠাইয়া উড়িষ্যাবিজয় জন্য গৌড় হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে রূপের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, প্রভু নীলাদ্রি হইতে বৃন্দাবনে যাত্রা করিয়াছেন, এবং তাঁহার মুক্তির জন্য দশ সহস্র মুদ্রা মুদিঘরে জমা আছে। যেরূপে পারেন তিনি যেন পলাইয়া আইসেন। অনন্যগতি সনাতন এই শেষ উপায় অবলম্বন করিলেন।

কারারক্ষীকে সাত হাজার টাকা উৎকোচ দিয়া ছদ্ম দরবেশ বেশে সনাতন রাত্রিকালে ভেলায় চড়িয়া নদী পার হইলেন। সাধারণ পথ পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তপথে পাতড়া পর্ব্বত পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে পৌছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনুগত একমাত্র ভৃত্য ঈশান ছিল। একদিন রাত্রিতে এক ভুঁঞার বাটীতে তাঁহারা অতিথি হইলেন। ভুঁঞার 'অতিভক্তি' দেখিয়া লক্ষণটা ভাল নয় বুঝিলেন। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট কিছু সুবর্ণ মুদ্রাদি আছে?" ঈশান বলিলেন, "সাতটি মোহর গুপ্তভাবে আনিয়াছি।" সনাতন ভৃত্যকে ভৎর্সনা করিয়া ভুঁঞাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু হে, এই সাতটি মোহর আমাদের নিকট ছিল তুমি ইহা লইয়া আমাদিগকে পর্ব্বত পার করিয়া দাও।" ভুঁঞা হাসিয়া বলিল, "আমার গণৎকার জানাইয়া দিয়াছে যে, তোমার চাকরের নিকট আটটি মোহর আছে। যদি তুমি আপন ইচ্ছায় এই মোহরগুলি না দিতে তবে আজ রাত্রিতে তোমাদিগকে মারিয়া তাহা আত্মসাৎ করিতাম।" ভুঁঞা তাঁহার অকপট ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া চারিজন পাইক সঙ্গে দিয়া পর্ব্বতপথ উত্তীর্ণ করিয়া দিলেন।

এখান হইতে সনাতন ঈশানকে বিদায় করিয়া দিলেন। সমস্ত দিন পথ হাঁটিয়া শ্রান্ত ক্লান্তদেহে হাজীপুরে পৌছিয়া এক বৃক্ষতলে আসিয়া বসিলেন। এদিকে তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত, নবাবের নিকট হইতে তিন লক্ষ টাকা লইয়া হাজীপুরে ঘোড়া কিনিবার জন্য

আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সনাতনের অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইল। তিনি ইঁহাকে বাটী ফিরিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। শেষে যখন কিছুতেই নিরস্ত করিতে পারিলেন না, তখন শ্রীকান্ত তাঁহার শীত নিবারণের জন্য একখানা ভোট কম্বল তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিলেন ও নৌকা করিয়া গঙ্গা পার করিয়া দিলেন।

সনাতন ক্রমে বারাণসীতে আসিয়া পৌছিলেন। অনুসন্ধান করিয়া চন্দ্রশেখরের বাটীর দ্বারে আসিয়া বসিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সেই বাটীর ভিতরে থাকিতেন।

চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "দ্বারে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছে তাহাকে ডাকিয়া আন।"

চন্দ্রশেখর দেখিয়া গিয়া বলিলেন, "দ্বারে ত কোন বৈষ্ণব দেখিতেছি না; একজন দরবেশ বসিয়া আছে। প্রভু বলিলেন, "তাহাকেই লইয়া আইস।" সনাতনের তখন দাড়ি গোঁফ বাহির হইয়া ছদ্মবেশটা এত অবিকল হইয়াছিল যে, বাঙ্গালী হইয়াও চন্দ্রশেখর তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারেন নাই।

তিনি ভিতরে গেলে প্রভু উঠানে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রভু মুসলমান দরবেশকে আলিঙ্গন করিতেছেন দেখিয়া চন্দ্রশেখর আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাহার পর চৈতন্যদেব তাঁহার হাত ধরিয়া পিঁড়ার উপর লইয়া গিয়া নিজ পার্শ্বে বসাইলেন। সনাতন কাতরভাবে জানাইলেন, "আমি যবন সংস্পর্শে অপবিত্র দেহ, আমাকে স্পর্শ করিবেন না।"

"প্রভু কহে তোমায় স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥"

(চৈঃ চঃ মঃ লীঃ ২০ পরিচ্ছেদ)

ইহা বলিয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কয়েকটি জাতিভেদ-বিরোধী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। তাহার একটি এই :—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনো বচনেহিতার্থ
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥

ইহার অনুবাদ এই, যথা—

নৃসিংহদেবকে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, যাহার মন বাক্য চেষ্টা ধন সকলই ভগবানে অর্পিত, তাদৃশ চণ্ডালও ভগচ্চরণারবিন্দ-বিমুখ দ্বাদশ গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কেন না সেই চণ্ডাল নিজবংশ পবিত্র করে। কিন্তু ভূরিগর্ব্বান্বিত উক্তরূপ বিপ্র (আত্মাকেও) পবিত্র করিতে পারে না।

এই সকল উক্তি হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, চৈতন্যদেব জাতি জ্ঞান ও বিদ্যার গৌরব অপেক্ষা ভক্তিরই অধিক সমাদর করিতেন। সে যাহা হউক, প্রভু বলিলেন "পতিতপাবন শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে বিষয়রূপ মহারৌরব হইতে উদ্ধার করিলেন।

সনাতন কহে কৃষ্ণে আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমার কৃপা মানি॥

(চৈঃ চঃ মঃ লী ২০ পরিচ্ছেদ)

তাহার পর সনাতন গঙ্গাস্নান করিয়া নিজ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার গাত্রে বহুমূল্য ভোট কম্বলখানি দেখিয়া একটু কটাক্ষ করিয়াছিলেন। ইহা বুঝিয়া তিনি একজন দরিদ্র বৈষ্ণবকে কম্বলখানি দিয়া তাহার নিকট হইতে একখানি ছেঁড়া কাঁথা লইয়া গায়ে দিয়া আসিলেন। এইরূপ দৈন্য দেখিয়া প্রভু আরও সন্তুষ্ট হইলেন। * কাশীতে দুই মাস থাকিয়া চৈতন্যদেবের নিকট তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্যগুলি শিক্ষা করিলেন।

---

* প্রয়াগ হইতে মথুরা যাইবার পথে যমুনাতীরে জানন পরগণার অন্তর্গত ইটোজা নামক গ্রামে একটি মন্দিরে একখানা কম্বলের পূজা হয়। পূজারীরা বলেন সে কম্বলখানা চৈতন্যদেব কোন দরিদ্রকে দিয়া গিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু কোন গ্রন্থে চৈতন্যদেবের কম্বল দানের কথা পাই নাই। অনেকে অনুমান করেন, এখানা চৈতন্যদেবের অভিপ্রায়মত সনাতন কর্তৃক প্রদত্ত সেই কম্বল। শুনা যায় এ মন্দিরের ব্যয়

এই সময়েই চৈতন্যদেব তথাকার বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রকাশানন্দ স্বামীকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া প্রবোধানন্দ স্বামী নাম দিয়াছিলেন।

তাহার পর সনাতন চৈতন্যদেবের আদেশক্রমে বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। বিভিন্ন পথে গিয়াছিলেন বলিয়া অনুজরূপ ও বল্লভের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি এক বৎসরের উপর বৃন্দাবনে বাস করিলেন। তাহার পর ঝাড়ীখণ্ড পথে আসিয়া পুরীধামে চৈতন্যদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। রূপ তখন বৃন্দাবনে প্রস্থান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার সহিত সনাতনের পুরীধামেও সাক্ষাৎ হয় নাই।

তাহার গাত্রে বড়ই ক্ষত কণ্ডু হইয়াছিল। তিনি মনোদুঃখে স্থির করিয়াছিলেন এ অধম অক্ষম দেহ আর রাখিবেন না। দূর হইতে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া জগন্নাথদেবের রথযাত্রা 'দিনে রথ চাকায় এই ছাড়িব শরীর' মনে মনে ইহা স্থির করিয়াছিলেন। পুরীধামে সনাতনও যবন হরিদাসের বাসায় থাকিতেন। আপনাকে অপবিত্র দেহ মনে করিয়া পাছে জগন্নাথদেবের সেবকগণের সহিত স্পর্শ হয় এই ভয়ে সতত দূরে দূরে অবস্থান করিতেন। তিনি রূপ ও যবন হরিদাস—ইহারা কেহই জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিতেন না। দূর হইতেই মন্দিরকে প্রণাম করিতেন।

যখন সনাতনের সহিত চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হইল তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। গায়ে রসাকণ্ডু ছিল বলিয়া তিনি দূরে পলাইতে চাহিলেন, প্রভু তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষার জন্যই তোমার গাত্রে রসা কণ্ডু দিয়াছেন। আমি যদি তোমাকে ঘৃণা করিয়া স্পর্শ না করি তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কখনই কৃপা করিবেন না।" তিনি আরও বলিলেন, "তোমার এই রসকণ্ডুভরা দেহ ত্যাগ করিবে বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছ; সেটা তোমার মহা ভ্রম।" আমরা এখানে চৈতন্যচরিতামৃত হইতে নিম্নের উদ্ধৃত অংশটুকু দিতেছি। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, সনাতনের দেহ চৈতন্যদেবের কত প্রিয় ও তদ্দ্বারা তিনি কি কি কর্ম্ম সাধন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে?
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে॥
তোমার শরীর আমার প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥
ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নিদ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা প্রবর্ত্তন।
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ॥
নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন
তাহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাহা ধর্ম্ম শিখাইতে নাহি নিজ বলে॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমতে সহিব?

(চৈঃ চঃ অঃ লীঃ ৪র্থ পরিঃ)

উপরি উদ্ধৃত কবিতা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে চৈতন্যদেবই 'কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম সেবা' বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে এ দেশে যে কৃষ্ণপূজা বিরল ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সনাতন ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি ত তাঁহাকে দেহত্যাগের কথা জানান নাই। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাই বুঝি জানিতে পারিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিতেছেন। যাহা হউক, সনাতনও এক বৎসর পুরী-

---

নির্ব্বাহের জন্য জাহাঙ্গীর বাদশাহ দুই খানা গ্রাম জায়গীর দিয়াছেন, আরও একটা কথা এই যে দরবেশ বলিলে মুসলমান সন্ন্যাসীর এক সম্প্রদায় বুঝায় হিন্দু বৈষ্ণবগণের মধ্যেও দরবেশ নামে এক সম্প্রদায় আছে। তাঁহারা বলেন সনাতন গোস্বামী এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। একথা কোন প্রমাণ্য গ্রন্থে পাই নাই তবে সনাতন দায়ে পড়িয়া একবার ছদ্ম দরবেশ সাজিয়াছিলেন এইমাত্র।

ধামে অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে কিরূপ গুপ্ত বিগ্রহগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল সে কথা চৈতন্য চরিতামৃতে নাই। 'ভক্তমাল' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' দেখিতে পাই তিনি মহাবনে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি চৌবের বালককে মদনগোপাল বিগ্রহ লইয়া সখাভাবে ক্রীড়া করিতে দেখিতে পাইলেন এবং চৌবের পত্নীর নিকট হইতে ঐ মদনগোপাল বিগ্রহটি ভিক্ষা করিয়া লইয়া আসিলেন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বনমালী গোস্বামী মহাশয়ের 'সেবা প্রাকট্য ও স্পষ্ট লাভের দিন নির্ণয়' নামক সূচক গ্রন্থে লিখিত আছে, সনাতন গোস্বামী ১৫৯০ সম্বতে (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) মহাবনের পরশুরাম চৌবের নিকট হইতে মদনগোপাল আনিয়া, সেই বৎসর মাঘ মাসে শুক্লাদ্বিতীয়া-দিনে বৃন্দাবনে স্থাপন করিয়াছিলেন ও কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামক একজন পূজারীও নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সনাতন আদিত্যটীলা নামে বৃন্দাবনে যমুনাতীরবর্ত্তী সর্ব্বোচ্চ স্তূপের উপর কুটীর বাঁধিয়া তাহাতেই ঠাকুর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ভিক্ষালব্ধ আটা জলে গুলিয়া গোলা পাকাইয়া আগুনে পোড়াইয়া 'আঙা কড়ি' নামক রুটী তৈয়ারী করিতেন। তাহার সহিত বন্য শাক জলে সিদ্ধ করিয়া মদনগোপালকে ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইতেন। তাহাতে একটু লবণও থাকিত না। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে স্বপ্নে জানাইলেন যে, এইরূপ অলবণ দ্রব্য তিনি খাইতে পারেন না। তাঁহার জন্য শাকাদিতে যেন একটু লবণ দেওয়া হয়। প্রভাতে উঠিয়া সনাতন প্রভুকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দেব, আমি ভিক্ষায় যাহা পাই তাহা দিয়াই আপনার সেবা করি। আমি ভিখারী, লবণাদি কোথায় পাইব? আপনি ত স্বয়ং ইচ্ছাময়, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লউন।"

ইহার কিছুদিন পরে কৃষ্ণদাস কর্পূর নামক একজন মুলতান দেশীয় বণিক নৌকা করিয়া নানা পণ্য সম্ভার লইয়া আগ্রায় বিক্রয় করিতে যাইতেছিলেন।

যমুনার চড়ায় তাহার নৌকা বাধিয়া গেল। কিছুতেই যখন নৌকা ভাসাইতে পারিলেন না তখন সন্ন্যাসী সনাতন গোস্বামীর নিকট আসিয়া শরণাপন্ন হইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি অধম মানুষ, কি করিতে পারি? আমার ঠাকুরটির শরণাপন্ন হও তিনি তোমায় ইহলোকে ও পরলোকে উদ্ধার করিয়া দিবেন।" তখন বণিক ঠাকুরের নিকট আসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম পূর্ব্বক মানত করিল যে, যদি তাহার নৌকা দেবতার কৃপায় গন্তব্যস্থানে নিরাপদে পৌঁছে, তাহা হইলে তিনি এবার যাহা কিছু লাভ করিবেন তাহা দিয়া মদনগোপালের মন্দির ও ভোগাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

পরদিন দৈবপ্রসাদে নৌকা ভাসিয়া গেল। কৃষ্ণদাস কর্পূরও সেইবার আশাতিরিক্ত বিপুল অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞামত বৃন্দাবনে আসিয়া মদনগোপালজীউর একটি সুন্দর মন্দির এবং ভোগাদিরও উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

যে সময়ে সনাতন গোস্বামী ঠাকুরটিকে লইয়া আসেন তখন তাঁহার সহিত রাধিকা ছিল না'। ইহাঁর রাধিকাও পুরীধাম হইতে আইসেন। 'ভক্তি-রত্নাকরে' ৬ষ্ঠ তরঙ্গে এইরূপ রাধিকা প্রাপ্তি বিবরণ আছে—

শ্রীগোবিন্দ যে সময়ে প্রকট হইলা।
সে সময়ে শ্রীমতী রাধিকা নাহি ছিলা॥
ছিলেন শ্রীমদনমোহন প্রভু ঐছে।
সংক্ষেপে কহিয়ে শ্রীযুগল হৈলা যৈছে॥
মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কুমার।
পুরুষোত্তম জানা নাম সর্ব্বাংশে সুন্দর॥
তেঁহো দুই প্রভুর এ সংবাদ শুনিয়া।
যত্নে দুই ঠাকুরাণী দিল পাঠাইয়া॥
বৃন্দাবন নিকট আইলা কতো দিনে।
শুনি সবে পরমানন্দিত বৃন্দাবনে॥
সেবা অধিকারী প্রতি মদনমোহন।
স্বপ্নচ্ছলে ভাঙ্গিতে কহয়ে হর্ষ মন॥

পাঠাইলা দুই মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা ভাবে।
রাধিকা ললিতা দোঁহে ইহা নাহি জানে॥
আগুসরি শীঘ্র তুমি দোঁহারে আনহ।
ছোট শ্রীরাধিকা মোর বামেতে রাখহ॥
দোঁহারে আনিয়া অতি আনন্দ অন্তরে।
আজ্ঞা অনুরূপ কার্য্য করিলা সত্বরে॥

(ভক্তিরত্নাকর ৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৪৫৮ পৃঃ।)

পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না যে, এইরূপে দুইটি মূর্ত্তি মদনগোপালদেবের উভয় পার্শ্ব ভূষিত করিল। এবং তখন হইতেই ইঁহার নাম মদনমোহন হইল। গোবিন্দজীর জন্য যে স্বতন্ত্র একটি মূর্ত্তি প্রেরিত হইয়াছিল সে বৃত্তান্ত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৫৯০ সম্বতে আষাঢ়ী শুক্লাসপ্তমী তিথিতে চৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে। ইহার আট মাস পরে মদনগোপাল বিগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি এ ঠাকুরটির প্রকট বিবরণ জানিতেন না বলিয়াই মনে হয়।

এবার মন্দিরের কথা বলিব। যমুনাগর্ভ হইতে প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ 'আদিত্য টীলা' স্তূপটির উপর মদন-মোহন দেবের পুরাতন মন্দির সংস্থাপিত আছে। দুইটী মন্দির পাশাপাশি সংলগ্ন, দক্ষিণ দিকের মন্দিরটীর গাত্রে বিচিত্র কারুকার্য্য করা প্রস্তরফলকে আগাগোড়া আবৃত। উত্তর দিকের মন্দিরটিরও বোধ হয় সেই-রূপ কারুকার্য্য ছিল, কালবশে পাথরগুলি খসিয়া পড়িয়া এখন ইঁট বাহির হইয়াছে। উভয়ের ভিতর দিয়া যাতায়াতের পথ আছে। উত্তর মন্দিরের সম্মুখে জগমোহন ও নাটমন্দির আছে। এইটি কৃষ্ণদাস কর্পূর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন দক্ষিণ দিকের কারুকার্য্য খচিত মন্দিরটি যশোরপতি প্রতাপাদিত্যের খুড়া বসন্ত রায়, কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহার সম্মুখে জগমোহন বা নাটমন্দির নাই, হয়ত যবন দৌরাত্মে সেগুলি অদৃশ্য হইয়াছে। দুইটি মন্দির হইবার কারণ এই যে, চৈতন্যদেব রূপ ও সনাতনকে তাঁহার জন্য একটি গোপনস্থান রাখিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। অপরটি মদনমোহনের জন্য। এই মন্দিরের বাম দিকে অপর একটি লাল পাথরে গাঁথা তোরণ বা ফাটকের ঘর আছে। সেটি এখনও বেশ মজবুত রহিয়াছে। পূর্ব্বে সিঁড়ি বহিয়া ফাটকের ভিতর দিয়া ঠাকুর দর্শন করিতে যাইতে হইত। এখন দক্ষিণ দিকের মন্দিরের সম্মুখ ভাগে গড়ানিয়া স্থান দিয়া লোকে উপরে আইসে। সম্মুখেই নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি। উত্তর দিকের মন্দিরটি খালি পড়িয়া আছে। তাহার ভিতর এখন রন্ধনাদি হয়।

এ সকল অসংলগ্ন ভগ্নাবশিষ্ট মন্দিরগুলি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বে এখানে আরও কোন কোন ভবনাদি ছিল। এখন কালপ্রভাবে বা যবন দৌরাত্মে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

নাটমন্দিরের উত্তর দিকে একটি সুগভীর ইন্দারা বা কূপ আছে। তাহার নিকটেই একটি ৫।৬ ফুট উচ্চ ইটে গাঁথা ক্ষুদ্র ঘর। এখানকার লোকেরা বলেন, কৃষ্ণদাস কপূরের মন্দির নির্ম্মাণের পূর্ব্বে এই স্থানেই ঝোপড়া বাঁধিয়া, তাহার ভিতর সনাতন গোস্বামী মদন-মোহনের সেবা করিতেন। যমুনার তীর হইতে এই মন্দিরের পোস্তাটি দেখিলে অনুমান হয় যে, পূর্ব্বে সেটি কেল্লার আকারে গঠিত হইয়াছিল। আজকাল কিন্তু তাহা কাল-দণ্ডে চর্ব্বিত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। একটা মাত্র বুরুজ এখনও অবশিষ্ট আছে। মেরামত না হইলে অচিরাৎ পোস্তাটা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। 'চরিতামৃতে' এ মন্দির নির্ম্মাণেরও কোন কথা নাই। ভক্তি-রত্নাকরে ও ভক্তমাল গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কপূরের বিবরণ আছে। দক্ষিণ দিকের যে মন্দিরে নিতাই চৈতন্য বিগ্রহ আছে তাহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া হিন্দী ও বাঙ্গালা উভয়বিধ অক্ষরে এই শ্লোকটি খোদিত আছে। *

"হর ইব গুরুবংশ্যো যৎ পিতা রামচন্দ্রো
গুণীমনিরিব পুত্রো যস্য রাধা বসন্তঃ।

* এই মন্দিরটিও বর্ত্তমান প্রতিনিধি মদনমোহনের চিত্র। গত আষাঢ় মাসের মানসী ও মর্ম্মবাণীতে দেখুন।

স্বকৃত সুকৃত রাশিঃ শ্রীগুণানন্দ নামা
ব্যধিত বিধিবদেতন্মন্দিরং নন্দ সূনোঃ ॥"

অর্থ—শিবতুল্য গুরুবংশীয় রামচন্দ্র যাঁহার পিতা, মণির ন্যায় গুণী রাধা বসন্ত যাঁহার পুত্র, যিনি নিজে অনেক পুণ্য করিয়াছেন সেই শ্রীগুণানন্দ, নন্দনন্দনের এই মন্দির যথাবিধি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এই গুণানন্দ কে? ইহা কৃষ্ণদাস কর্পূরের নামান্তর কি না তাহা কেহ বলিতে পারেন না। তবে এই রাধাবসন্ত নাম দেখিয়া অজ্ঞলোকে ভ্রম ক্রমে বসন্ত রায় বলিয়া থাকে। নতুবা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায়ের বৃন্দাবন ধামে কোন মন্দির নির্ম্মাণের কথা, আমরা কোথাও পাই নাই।

মন্দিরটি উচ্চে প্রায় ৬০ ফুট হইবে। উত্তর দিকের নাটমন্দিরের দ্বারে লেখা আছে "সম্বৎ ১৬৮৪ বর্ষ শ্রাবণ" (১৬২৭ খৃঃ অঃ) আর ও দুই এক স্থানে যাহা লেখা আছে তাহা এত অস্পষ্ট যে পড়া যায় না।

এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে একটি ছোট লাল পাথরে গাঁথা বাংলা ঘরের ভিতর সনাতন গোস্বামীর সমাধি সমীপেই সুমিষ্ট জলপূর্ণ 'সনাতন কূপ'। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে পূর্ণিমা-তিথিতে সনাতন গোস্বামীর তিরোধান দিবসে এখানে মহোৎসব হইয়া থাকে। আওরংজেবের উপদ্রবে বৃন্দাবন হইতে মদনমোহনজী প্রথমে জয়পুরে স্থানান্তরিত হন। তাহার পর জয়পুরপতি আপন শ্যালক করৌলির রাজা গোপাল সিংহকে সনাতন প্রতিষ্ঠিত সেই মূর্ত্তি প্রদান করেন। করৌলিতে রাজনির্ম্মিত মন্দিরে এখনও তাঁহার সেবা চলিতেছে। করৌলির রাজারা আপনাদিগকে যদুবংশের শূরসেন শাখার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বংশ পরিচয় কানিংহামসাহেব লিখিত Archeological Survey of India Vol XX গ্রন্থে আছে।

গোস্বামীগণ কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী কালে প্রতিষ্ঠিত মদন-মোহন দেবের নূতন মন্দিরটি ৺নন্দকুমার বসু মহাশয় ১৮২৩ খৃঃ অঃ পুরাতন মন্দির অপেক্ষা কতকটা নিম্ন-ভূমিতে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এ মন্দিরটি দেখিতে গোবিন্দজীর নূতন মন্দিরের মত। দালান ও সম্মুখে উঠান। দালানে রত্নসিংহাসনের মধ্যে মদনমোহন, দক্ষিণে ললিতা, ও বামে রাধা এবং শালগ্রাম শিলা। স্বতন্ত্র আসনে অল্পদিন প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। পূজা ও আরতির বন্দোবস্ত এবং ভেট দিবার নিয়ম গোবিন্দদেবের ন্যায় সমভাব। এ মন্দিরেরও চারিদিকে প্রাচীরে ঘেরা। এ পাড়াটাকে 'পুরাণো সহর' বলে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় মদনমোহনের মালা প্রসাদ পাইয়া চরিতামৃত রচনা আরম্ভ করেন। 'ভক্তি-রত্নাকর' ও 'ভক্ত মাল' উভয় গ্রন্থেই কৃষ্ণদাস কর্পূরের নাম ও পুরাতন মন্দিরের বিবরণ আছে।

সনাতন গোস্বামী কখনও বৃন্দাবনে কখনও গোবর্দ্ধনে, কখনও মহাবনে, কখনও রাধাকুণ্ডে থাকিতেন। এই সকল স্থানে তাঁহার কুটীর ছিল। তিনি প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রম করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন সাত ক্রোশ পরিক্রমা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন, তখন একজন সুন্দরকায় শিশু আসিয়া তাঁহাকে একখানি শ্রীকৃষ্ণ পদাঙ্কিত পাথর দিয়া তাঁহাকে তাহারাই চতুর্দ্দিক পরিক্রম করিবার উপদেশ দিয়া অদর্শন হইলেন। সনাতন সেই পাথরখানির চারিদিকেই শেষ জীবনে পরিক্রম করিতেন।

ইনি বড় অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। এ প্রদেশের গ্রাম্য লোকদিগের সহিত বেশ মিশিতে পারিতেন। তাঁহারাও ইঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। একবার যে গ্রামে যাইতেন, সেখানকার লোকেরা ইঁহাকে সহজে ছাড়িতে চাহিত না। ব্রজ-মণ্ডলের অনেক গ্রামেই ইঁহার বৈঠক বা আবাসস্থান আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

রূপ ও সনাতন গোস্বামীর বাল্যজীবনের কথা ও কি সূত্রে ইঁহারা হুসেন সাহা নবাবের কর্ম্মচারী হইয়া ছিলেন সে কথা কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাই নাই। তবে

ইহাদের প্রথম বৈরাগ্য সঞ্চারের এই দুইটি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়।

১ম—এক বর্ষা রজনীতে নবাবের আদেশে রূপ পাল্কি চড়িয়া জল প্লাবিত পথ দিয়া রাজভবনে যাইতেছিলেন। পথিপার্শ্বস্থ কুটীরে একজন রজক জলের ঝুপ ঝুপ শব্দ শুনিয়া অপরগৃহে অবস্থিতা তাহার পত্নীকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল "দেখ ত আমাদের কুকুরটা বুঝি জলে পড়িয়াছে।" ধোপানী জবাব দিল "কুকুরটার কি গরজ যে এত বাদলায় জলে নামিবে। সে ত উনান গোড়ায় গরমে শুইয়া আছে। ও কোন বেটা নফর (চাকুরে) মনিব বাড়ী হাজিরা দিতে যাইতেছে।" নিস্তব্ধ রজনীতে এ কথাগুলা রূপের কাণে গেল, ও মর্ম্মে আঘাত লাগিল। তবে কি চাকুরে কুকুর অপেক্ষাও অধম। তিনি কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন।

২য়—সনাতন গোস্বামীর এই আখ্যানটুকু 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে পাওয়া যায়—

একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের বসতবাটী ইঁহাদের নিকট বন্ধক ছিল, তিনি ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া বৃন্দাবনে রূপগোস্বামীর শরণপন্ন হইলেন। রূপ একখানা বটপত্রের গাত্রে কয়টি অক্ষর মাত্র লিখিয়া গৌড়ে সনাতনের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বট পত্রে "যরী-রলা-ইরং—নয়" এই আটটি অক্ষর মাত্র লিখিত ছিল। সনাতন এই সাঙ্কেতিক পত্র পড়িয়া একটি শ্লোক বুঝিলেন—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনস্থিরং
নসদিদং জগদিত্যবধারয়॥

অর্থ—যদুপতির (শ্রীকৃষ্ণের) মথুরাপুরী আজি কোথায় গিয়াছে? রঘুপতি (শ্রীরামের) উত্তর কোশলা (অযোধ্যা) আজি কোথায় গিয়াছে? ইহা ভাবিয়া মনটাকে স্থির করিও। এ জগত তো চিরস্থায়ী নহে, বুঝিও। এই শ্লোকের প্রতিচরণের আদি ও অন্ত্য অক্ষর লইয়া সাঙ্কেতিক পত্রখানি লিখিত হইয়াছিল।

এই শ্লোকটি পড়িয়া সনাতনের মনে বিষয়-বিতৃষ্ণা উদয় হইল। তিনি ব্রাহ্মণের বাটী ছাড়িয়া দিলেন ও তদবধি তাহার মনে বৈরাগ্যোদয় হইল।

ঈশান নাগর রচিত অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে চৈতন্যদেবের বৃন্দাবন গমনের বহুবৎসর পূর্ব্বে অদ্বৈত প্রভু তীর্থ পর্য্যটনকালে বৃন্দাবনে যাইয়া আদিত্যটিলার নিকটস্থ যমুনাগর্ভ হইতে মদনগোপাল বিগ্রহটিকে পাইয়া কিছুদিন একটি কুটীর মধ্যে স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। পরে ম্লেচ্ছগণের (পাঠান) উপদ্রব দেখিয়া একজন চৌবের হস্তে ঠাকুরটিকে সমর্পণ করিয়া দেশে চলিয়া আইসেন। এ কথা কিন্তু ব্রজবাসীরা স্বীকার করেন না। সে যাহা হউক, মদনগোপালজী বৃন্দাবনের প্রথম স্থাপিত বিগ্রহ তাহার প্রমাণ পূজনীয় বনমালী গোস্বামী মহাশয়ের সেবা প্রাকট্য ও ইষ্টলাভের দিন নির্ণয় গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়।

ইনিও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলির নাম। ১। ভাগবতামৃত, ২। সিদ্ধান্তসার, ৩। বৈষ্ণবতোষনি। ৪। লীলাস্তব। ইহা ছাড়া তিনি গোপাল ভট্টের নাম দিয়া 'হরিভক্তি বিলাস' নামে একখানি বৈষ্ণবগণের স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা 'হরিভক্তি বিলাসের' মতেই দেবার্চ্চনা ও ক্রিয়া কলাপ সমাধা করিয়া থাকেন। তাঁহার রচিত আরও দুই একখানি টীকা গ্রন্থ আছে। কীর্ত্তনীয়াগণের মুখে তাঁহার রচিত পদাবলীও শুনিতে পাওয়া যায়। 'ভক্তকল্পদ্রুম' নামক হিন্দীগ্রন্থে দেখিতে পাই, সনাতন গোস্বামী 'সুকুমার দেহ' রূপ গোস্বামী 'স্থূলকায়', বিশ্বকোষ নামক অভিধান গ্রন্থকার বলেন তাঁহার পূর্ব্ব নাম অমর ছিল। সেবা প্রাকট্য গ্রন্থে ইহার জন্ম ১৪৮৮ খৃঃ অঃ। মৃত্যু ১৫৫৮ খৃঃ অঃ। গৃহস্থ ২৭ বৎসর ও বৃন্দাবন বাস ৪৩ বৎসর লিখিত আছে। সুতরাং ইঁহার ৭০ বৎসর বয়সে আকবরের রাজত্বের ২য় বৎসরে মৃত্যু হয়। ইনি ১৫৩৩ খৃঃ অঃ ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে

মদনগোপাল বিগ্রহ মহাবন হইতে বৃন্দাবনে আনিয়া সেই বৎসর মাঘমাসে শুক্লা দ্বিতীয়া দিনে আদিত্য-টিলায় বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। পূজারী কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী আদিত্যটীলায় সর্ব্বোচ্চস্থানে চৈতন্যদেবের বসিবার বৈঠক বলিয়া একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতর চরণচিহ্ন দিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন আজিও জাগরিত রাখা হইয়াছে।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত

জীবোৎপত্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহাদেশ ও মহাসাগর।

পৃথিবীর স্থলভাগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) বৃহদাকার উচ্চভূমি (২) আকুঞ্চিত ভূভাগ (৩) সুবিস্তৃত সমতল স্তররাজি।

বৃহদাকার উচ্চভূমিগুলি পৃথিবীর প্রাচীনতম অংশ। ইহারা পৃথিবীর প্রাচীনতম পর্ব্বতশ্রেণীর অংশ বা তাহাদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহারা চিরদিনই সমুদ্র পৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত আছে এবং কোনকালেই জলমগ্ন হইয়া যায় নাই। সেই জন্যই ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ইহাদের "পৃথিবীর চূড়া" কহিয়া থাকেন।

স্কাণ্ডিনেভিয়া, লারেন্সের ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ, অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাংশ পূর্ব্বব্রেজিলের উচ্চভূমি, এবং আফ্রিকার উষ্ণমণ্ডলের অধিকাংশ এই প্রাচীন ভূভাগের অন্তর্গত।

এই সকল বৃহদাকার চূড়া ব্যতীত পৃথিবীর আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূড়া আচে। পৃথিবীর জীবনকালে তাহাদেরও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

পৃথিবীর কুঞ্চিত অংশগুলি অধিকতর সুবিস্তৃত। পৃথিবীর আদিম যুগে ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পাধিক আকুঞ্চন ঘটিত। ভূপৃষ্ঠের স্থূলতা বৃদ্ধির পর এই কুঞ্চনের পরিমাণ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। উৎপত্তিকালের পূর্ব্বাপরতা অনুসারে পৃথিবীর কুঞ্চিত ভূভাগগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কুঞ্চনজাত প্রাচীন পর্ব্বতগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এবং পার্শ্ববর্ত্তী সমতল স্তরভূমি মধ্যে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ। কুঞ্চনজাত আধুনিক পর্ব্বতগুলি অবিচ্ছিন্ন এবং সুদীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ। ব্রিটানি ও কর্ণওয়ালের গিরিশ্রেণী আর্ডেন্‌স্ ফ্রান্সের মধ্যপ্রদেশস্থ মালভূমি জর্ম্মানির সমতল ভূমি হইতে উত্থিত হার্জ এবং অন্যান্য পর্ব্বত রোহিমিয়ার উচ্চভূমি এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের আপেলেচীয় (Applasian) পর্ব্বতশ্রেণী পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পর্ব্বতশ্রেণীর উদাহরণ স্থল।

আল্পীয় ও হিমালয় গিরিশ্রেণী শেষোক্ত আধুনিক পর্ব্বতশ্রেণীর উদাহরণ। আধুনিক শ্রেণীর পর্ব্বতগুলি প্রায়ই অত্যন্ত আঁকাবাঁকা। পৃথিবীর স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড কঠিন প্রস্তর সকল অবস্থিত থাকায় তাহারা ভূপৃষ্ঠের কুঞ্চনে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। এইজন্য এই সকল গিরিশ্রেণী প্রায়ই বাঁকিয়া যায়।

আল্পীয় পর্ব্বতশ্রেণীর উৎপত্তিকালে স্থলতরঙ্গ এইরূপ কঠিন প্রস্তরস্তূপ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রশান্ত মহাসাগর বেষ্টন কাবেরী গিরিশ্রেণীও আধুনিক গিরিশ্রেণীর উদাহরণ। এই গিরিশ্রেণীর উৎপত্তিকালে স্থলতরঙ্গ তাহাদের সম্মুখস্থ ভূভাগ বসিয়া যাওয়ায় সম্মুখদিকে গড়াইয়া পড়িয়াছিল, কঠিন প্রস্তরখণ্ড দ্বারা কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন প্রস্তরস্তূপ এবং পরবর্ত্তীকালে উৎপন্ন কুঞ্চনজনিত আধুনিক গিরিশ্রেণী—এই উভয়ের ব্যবধানস্থানগুলি প্রস্তর স্তর গঠিত সমভূমিদ্বারা ব্যাপ্ত।

এই সমতল প্রদেশগুলিতে জলস্থলের স্থানবিনিময় বশতঃই মহাদেশগুলির আকার ও গঠন নিরূপিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত ত্রিবিধ ভূমিখণ্ড দ্বারাই (প্রাচীন প্রস্তরস্তূপ কুঞ্চন জনিত আধুনিক গিরিশ্রেণী এবং মধ্যবর্ত্তী সমভূমি) পৃথিবীর মহাদেশ সমূহ সংগঠিত হইয়াছে।

ইউরোপে—ফিন্‌লাণ্ড স্কাণ্ডিনেভিয়া স্কটলাণ্ডের অধিকাংশ এবং আয়র্লাণ্ডের কিয়দংশ—প্রাচীনতম পর্ব্বতের স্তূপাবশেষ অর্থাৎ প্রথমোক্ত উপকরণ দ্বারা গঠিত। পুরাকালে সুমেরুমণ্ডলস্থ যে মহাদেশ ইউরোপের পশ্চিমদিকে গ্রীনলাণ্ড ও স্পিটস্ বার্জেন হইয়া উত্তর আমেরিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সকল প্রাচীন প্রস্তরস্তূপ তাহারই ভগ্নাবশেষ।

পিরেনিস্ পর্ব্বত আল্পস্ পর্ব্বত কার্পেথিয়ান পর্ব্বত এবং বলকান পর্ব্বত (যাহা এক সময়ে কৃষ্ণসাগরের উপর দিয়া ককেশসের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল) দ্বিতীয় উপকরণ বা ভূপৃষ্ঠের আকুঞ্চন সঞ্জাত।

ইউরোপের অবশিষ্টাংশ প্রধানতঃ তৃতীয় উপকরণ বা সমতল স্তরপুঞ্জ দ্বারা গঠিত। ইউরোপের প্রকাণ্ড সমতল হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের সমতলাংশ এবং লম্বার্ডি প্রদেশ এইরূপ স্তরপুঞ্জ রচিত।

এই সমতলের স্থানে প্রাচীর পর্ব্বতশ্রেণীরও স্থানে কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়—বেলজিয়ামের আর্ডেন্‌স্ পর্ব্বত এবং ব্রিটানি কর্ণওয়াল ও দক্ষিণ আয়রলাণ্ডের গিরি- শ্রেণী এইরূপ ভগ্নাবশেষের উদাহরণস্থল।

এশিয়া—বর্ত্তমান কালে ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হইলেও "কেনোজীয়" যুগে ইহা উত্তর মহাসাগর হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র দ্বারা ইউরোপ হইতে বিযুক্ত ছিল।

এশিয়া মহাদেশ নিম্নলিখিত চারিপ্রকার উপাদান গঠিত—

(১) অধ্যাপক সুয়েসের (suess) মতে পশ্চিম সাইবিরিয়ার বিশাল সমতল প্রদেশের পশ্চিমে দক্ষিণ চীনের সঙ্গে যুক্ত "অঙ্গার প্রদেশ" (Anfiaraland) নামে এক প্রাচীন মহাদেশ ছিল। এশিয়ার উত্তর পূর্ব্বাংশের অধিকাংশ এই প্রাচীন মহাদেশের অংশ

(২) অঙ্গার প্রদেশের পূর্ব্বে সাইবিরিয়ার সমতল ভূমি।

(৩) ইহাদের উভয়ের দক্ষিণে কুঞ্চন জাত গিরিশ্রেণী। এই গিরিশ্রেণী প্রধানতঃ ককেশস হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন শাখা গিরিশ্রেণীও নির্গত হইয়াছে। একটি শাখা বঙ্গসাগরের মধ্য দিয়া সুমাত্রা যাভা এবং মালয় উপদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ আরও পূর্ব্বে ইহার সমসাময়িক নিউগিনি প্রদেশস্থ প্রশান্ত মহাসাগর বেষ্টনকারী পর্ব্বতমালার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে।

(৪) হিমালয়ের দক্ষিণে আরব ও ভারতবর্ষের দুইটি প্রাচীন মালদ্বীপ। ইহারা প্রাচীন মহাদেশ গণ্ডোয়ানার ভগ্নাবশেষ।

আফ্রিকার—গঠনে দুইটি মাত্র উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়।

উত্তর আফ্রিকার আটলাস্ পর্ব্বত ইউরোপীয় গিরিশ্রেণীরই অংশ বিশেষ।

দক্ষিণ কেপ্ কলোনি এক সময়ে গণ্ডোয়ানা মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিলেও ইহা আরও দক্ষিণে অবস্থিত এবং ইদানীং সাগরতলগত স্থলভাগের উপকূলাংশ।

উত্তর আমেরিকায়—দুইটি প্রাচীন পর্ব্বত স্তূপ বিরাজিত। একটি ইহার পূর্ব্বদিকে এবং অপরটি ইহার পশ্চিমদিকে অবস্থিত পূর্ব্বদিকে অবস্থিত স্তূপটিই বৃহত্তর। একসময়ে ইহা আর্কটিস্ প্রদেশের পশ্চিমাংশ ছিল এবং এই স্থান হইতে আপলেচীয় (Appalachain) পর্ব্বতশ্রেণী এবং যুক্ত সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ উপকূলভাগ পুনঃ পুনঃ দক্ষিণদিকে নির্গত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান কালে যে খানে রকি পর্ব্বত অবস্থিত, সেই খানেই উত্তর আমেরিকার পশ্চিমস্থ প্রাচীন স্তূপ অবস্থিত

ছিল। ভিন্ন ভিন্ন যুগে এই স্থান দক্ষিণে মেক্সিকাল এবং উত্তর পশ্চিমে আলাস্কা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

এই দুই প্রাচীন স্তুপের মধ্যে সমুদ্র বার বার মেক্সিকাল উপসাগর হইতে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সাগর ভরাট হইয়াই উত্তর আমেরিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে।

আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যের দক্ষিণে আন্টিলিয়া (Antillia) নামে পরিচিত প্রাচীন প্রদেশের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে খড়ির স্তর গঠিত হইবার কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই প্রদেশ বর্ত্তমান ছিল। ভূপৃষ্ঠ পুনঃ পুনঃ বসিয়া যাওয়ায় ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকায়—ব্রাজিল এবং গায়ানা প্রদেশের মালভূমি গঠনকারী উপকরণই সর্ব্বপ্রধান। ইহা প্রাচীন গণ্ডোয়ানা মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তস্থ ভগ্নাবশেষ।

চিলি এবং পেরু প্রদেশের পশ্চিম উপকূলে আণ্ডিস্ পর্ব্বতের পাদদেশে যে অতি প্রাচীন পর্ব্বতপুঞ্জ দেখা যায় এবং উক্ত পর্ব্বতপুঞ্জের পূর্ব্বে যে স্তররাজি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে একসময়ে তৎসংলগ্ন স্থলভাগ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে কিয়দ্দূর বিস্তৃত ছিল, পৃথিবীর মহাদেশগুলির গঠনের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

মহাসাগরগুলির—মধ্যে অধ্যাপক সুয়েস্ যাহাকে টেথিস্ মহাসাগর (Tethys) আখ্যা দিয়াছেন, তাহারই ইতিহাসের সঙ্গে আমরা সমধিক পরিচিত।

এই মহাসাগর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে উত্তর ইউরোপ এবং আফ্রিকার মধ্য হইয়া এশিয়ার উপর দিয়া প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার উত্তরে "অঙ্গার" প্রদেশ এবং "আর্কটিস্" প্রদেশ এবং দক্ষিণে "গাণ্ডোয়ানা" প্রদেশ অবস্থিত ছিল।

বর্ত্তমান কালে পশ্চিমভারতীয় সাগর এবং ভূমধ্য সাগর ইহারই লুপ্তাবশেষ।

টেথিস্ মহাসাগরের উত্তর ও দক্ষিণে যে দুইটি উপসাগর ছিল, সমুদ্রের উপকূল ভূমি বসিয়া যাওয়ায় তাহারাই বিস্তৃত হইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর উৎপন্ন করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বয়ঃক্রম নির্ণয় করা কিছু দুরূহ ব্যাপার। ইহার অভ্যন্তরে যে দূরবিস্তৃত সামুদ্রিক পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যায় তাহারা আমাদের নূতন রক্তবর্ণ বালুকা প্রস্তরের (New Red Sandstone) সমকালে উৎপন্ন। সুতরাং ইহাদের দেখিয়া মনে হয় যে প্রশান্ত মহাসাগরও সম্ভবতঃ তাহাদেরই সমসাময়িক। পক্ষান্তরে ইহার চারিদিকে "কেনোজীয়" যুগের যে পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যায়, তাহাদের দেখিয়া মনে হয় যে ইহা উক্ত পর্ব্বত শ্রেণীরই সমকালে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উর্ব্বরতা

ইতিপূর্ব্বে আমরা পৃথিবীর জীবনেতিহাসের চারি অধ্যায় মাত্রের আলোচনা করিয়াছি।

ইহার জীবনের প্রথম অধ্যায়—ধাতুর্ময় উল্কারাশি একত্র মিলিত হইয়া একটি কঠিন গোলকের উৎপাদন; ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় আভ্যন্তরিক ধাতব পদার্থ হইতে শিলাময় ভূপৃষ্ঠের পার্থক্য সাধন; তৃতীয় অধ্যায় ইহাদের দেহস্থিত জলীয় বাষ্পরাশির সলিলরূপে ঘনীভবন এবং চতুর্থ অধ্যায় ভূপৃষ্ঠস্থ স্থানবিশেষের উন্নতি ও অবনতি বশতঃ মহাদেশ ও মহাসাগরের সংগঠন।

কিন্তু এইখানেই এই জীবনচরিতের অবসান নহে। আজিও পৃথিবী তাহার কুমারী অবস্থা অতিক্রম করে নাই—জীবজননী বসুন্ধরা এখনো জীবলোকের বাসোপযোগী হয় নাই। যতদিন না ভূপৃষ্ঠ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কোমলতা প্রাপ্ত হইতেছিল ততক্ষণ ইহার পক্ষে উদ্ভিদ বা জীবের বাসোপযোগী হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

উদ্ভিদ এবং স্থলচর জীব—উভয়কেই জীবন ধারণের জন্য স্থলের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ কোমল মৃত্তিকাদ্বারা আবৃত না হয় ততক্ষণ কোন উদ্ভিদ ভূপৃষ্ঠে শিকড় বসাইতে পারে না এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত মৃত্তিকার কোন কোন অংশ এমন সূক্ষ্ম না হয় যে তাহা অনায়াসে জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত মৃত্তিকাদ্বারা উদ্ভিদজীবনের পুষ্টি সাধন হইতে পারে না। অধিকাংশ প্রাণীকেই জীবন ধারণের জন্য উদ্ভিদের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাণীজীবনের আবির্ভাবও সম্ভব হয় না।

সুতরাং ভূপৃষ্ঠ ক্রমশঃ কিরূপে উদ্ভিদ ও জীবের বাসোপযোগী হইল অতঃপর আমাদের তাহারই অনুসন্ধান করিতে হইবে। ভূপৃষ্ঠকে চূর্ণ ও কোমল করিবার কার্য্য সর্ব্বপ্রথম বায়ুমণ্ডলস্থিত বাষ্পাদির দ্বারাই আরব্ধ হয়। ইহাদের মধ্যে জলীয় বাষ্প এবং অম্লজনক গ্যাসই প্রধান।

ভূপৃষ্ঠস্থ জল এইরূপ গ্যাসযুক্ত হইয়া যতই প্রস্তর মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে ততই ইহাদের সংস্পর্শে তাহার কিছু কিছু অংশ গলিত হইয়া যাইতে থাকে।

জল প্রস্তর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাত্রে যখন শীতলতা বশতঃ জমিয়া বরফ হইয়া যায় তখন তাহাদের চারিদিকের ভূমিখণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। প্রস্তরের কোন কোন উপাদানের সঙ্গে জলের রাসায়নিক মিলনও ঘটে। এই মিলনের ফলে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন বশতঃ মিলিত পদার্থের যে আকার বৃদ্ধি ঘটে তাহার দ্বারাও প্রস্তর সকল ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া যায়।

অম্লজান এবং অঙ্গারাম্লও এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। অঙ্গারাম্ল নানাপ্রকার মৃত্তিকা এবং লবণাদির সঙ্গে মিলিত হইয়া নানাপ্রকারের যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। চুণ ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

এইরূপে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে উদ্ভিদাদির বাসোপযোগী হয়। জীব ও উদ্ভিদ দেহ প্রধানতঃ অঙ্গার, অম্লজান, যবক্ষারজান, এবং উদযানের সমবায়ে গঠিত।

উদ্ভিদেরা বায়ু হইতে আপনাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় যবক্ষার জান (Nitrogen) সংগ্রহ করে। ব্যাক্‌টিরিয়া নামক আদিম জীবাণু তাহাদের এই কার্য্যের সহায়তা করে। উদ্ভিদ কর্ত্তৃক এই নাইট্রোজেন জীবের খাদ্যোপযোগী পদার্থে পরিণত হয়। সুতরাং এরূপ খাদ্যের জন্য প্রাণীদের উদ্ভিদের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। পক্ষান্তরে আবার কীট এবং মৃত্তিকাস্থিত জীবগণ তাহাদের মল ও মৃতদেহের দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। এইরূপে জীব ও উদ্ভিদের সমবেত চেষ্টায় ক্রমশঃ মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কিন্তু নানাকারণে মৃত্তিকার খাদ্যোপযোগী উপাদান ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ইহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। নানা প্রাকৃতিক উপায়ে এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

মৃত্তিকাস্থিত যে সকল পদার্থের দ্বারা উদ্ভিদের পরিপুষ্টি সাধিত হয় তাহার মধ্যে আল্‌কালি (Alkalies) সোডা, (ক্ষার) পটাশ (সোরা) earth calcium (চুণ) ফস্ফরাস্ এবং গন্ধক প্রধান। পৃথিবীর প্রাচীন গিরিশ্রেণীতে এই সকল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্যাস ও বাষ্পের সাহায্যে পর্ব্বতপৃষ্ঠ চূর্ণ হইয়া যাওয়ায় এই সকল পদার্থ শিথিল হইয়া পড়ে এবং জলের সাহায্যে নিম্নে নীত হইয়া ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের দ্বারাও পৃথিবীর উর্ব্বরতা সাধিত হইয়া থাকে। অগ্ন্যুৎপাতের দ্বারা, চুণ, ফস্ফরাস আল্‌কালি প্রভৃতি ভূপৃষ্ঠে উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং বায়ুর সাহায্যে চূর্ণাকারে দিকে দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। বায়ু ও বৃষ্টির সাহায্যে আগ্নেয়গিরিসকল ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতেও নিকটবর্ত্তী ভূভাগের উর্ব্বরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

এইরূপে পৃথিবীর উর্ব্বরতা উৎপন্ন হয় এবং তাহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রাণের আবির্ভাব।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদেহের সাহায্যে পৃথিবীর উচ্চশ্রেণীর জীবের বাসোপযোগী হইতে পারে না।

কিন্তু পৃথিবীর জড় পদার্থের মধ্যে কি করিয়া প্রাণের আবির্ভাব হইল তাহা বিষম সমস্যার স্থল। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত এ সম্বন্ধে নানাপ্রকারের অভিমত উপস্থিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিনের মতে পৃথিবীতে প্রাণের বীজ সম্ভবতঃ উল্কাপিণ্ডের সাহায্যে গ্রহান্তর হইতে আনীত হইয়াছে। লর্ড কেল্‌ভিনের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ, এই সকল প্রাণবীজ বহুকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং অত্যন্ত শৈত্যেও তাহাদের মৃত্যু হয় না। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রাণের উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহার মীমাংসা হয় না।

অধ্যাপক স্বান্তে আর্হেনিয়াস্ (Svante Arrhenius) এর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এই কথাই খাটে।

তাঁহার মতে উল্কাপিণ্ডের সাহায্য না লইয়াও কেবল "আলোকের চাপে" প্রাণের বীজ একগ্রহ হইতে গ্রহান্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে।

সকল গ্রহেরই অবস্থা এক সময়ে পৃথিবীর অনুরূপ ছিল। সুতরাং যে যে কারণে গ্রহান্তরে জীবনের আবির্ভাব হইতে পারিয়াছিল সেই সেই কারণে পৃথিবীতেও জীবের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং জীবনের রহস্য বুঝিবার জন্য গ্রহান্তরে অনুসন্ধান করায় কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে জড় হইতে জীবের উৎপত্তি অসম্ভব। কিন্তু জড় ও জীবে প্রকৃত পার্থক্য কি তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত দুরূহ। বিস্তর বড় বড় পণ্ডিত এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে জড় ও জীবের মধ্যে আমরা সচরাচর যতটা পার্থক্যের কল্পনা করিয়া থাকি প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মধ্যে ততটা পার্থক্য নাই।

জীবনের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া কোন কোন পণ্ডিত জীবনের বৃত্তি কি তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে তাঁহারা যে যে বৃত্তিকে কেবল প্রাণী জীবনেরই বিশেষত্ব বলিয়া অনুমান করিয়াছেন জড়জীবনেও সে সকল বৃত্তির অধিকাংশেরই সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অধ্যাপক অস্‌বোর্ণ (Osborne) তৎপ্রণীত "সরল প্রাণীদেহতত্ত্ব" (The elements of animal physiology) নামক গ্রন্থে জীবনের নিম্নলিখিত ছয়টি অত্যাবশ্যকীয় বৃত্তির নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

(১) দেহের জীর্ণসংস্কার ও পুনর্নির্ম্মাণ।

(২) শক্তিশোষণ করিয়া কর্ম্ম করিবার ক্ষমতালাভ।

(৩) পরিবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য নিজের তদনুযায়ী পরিবর্ত্তন সাধন।

(৪) অন্যান্য প্রাণী হইতে আত্মরক্ষা।

(৫) পরিণতিলাভ ও সন্তানোৎপাদন।

(৬) স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি।

উল্লিখিত বৃত্তিগুলি প্রাণীজীবনের পক্ষে যে অত্যাবশ্যক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবীর আদিম যুগে ইহাদের মধ্যে সকলগুলির প্রয়োজন হইত বলিয়া মনে হয় না।

পৃথিবীর আদিম জীবের অন্যান্য জীব হইতে আত্মরক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না এবং তাহাদের স্মৃতিবৃত্তির চর্চ্চারও কোন অবসর ছিল না। এতদ্ভিন্ন যে সময়ে পৃথিবী অঙ্গারাম্ল গ্যাস ও ঘনবাষ্পে বেষ্টিত থাকায় ইহার পরিবেষ্টনেরও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিত না। কাজেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য আদিম জীবকে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হইত না। সুতরাং জীবনের আদিযুগে জীবনের কেবল তিনটি মাত্র প্রধান বৃত্তি দেখা যাইত :—

(১) খাদ্য গ্রহণ এবং অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের পরিবর্জ্জন।

(২) খাদ্য হইতে শক্তি সংগ্রহ।

(৩) আয়তন বৃদ্ধির জন্য শরীর বিভাগের প্রয়োজন হইলে বিভক্ত দেহের প্রত্যেক অংশে পূর্ব্ব-ক্ষমতার সংক্রামণ।

ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে পূর্ব্বোক্ত তিনটি বৃত্তিই দানাবদ্ধ জড় কণিকাতেও (crystal) সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান। খাদ্যগ্রহণ ও অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের বর্জ্জন প্রাণীদিগের ন্যায় জড়ের দানারাও করিয়া থাকে। তাহারাও দ্রব পদার্থ (Solution) হইতে নিজের আবশ্যকীয় অংশই গ্রহণ করিয়া থাকে এবং অনাবশ্যকীয় অংশ হয় আদৌ গ্রহণ করে না অথবা গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে প্রাণীদেহ অভ্যন্তর-ভাগে খাদ্যদ্রব্য শোষণ করিয়াই বৃদ্ধি পায় কিন্তু জড়-কণিকায় বাহিরের দিক হইতে নূতন পদার্থ সংযুক্ত হওয়াতেই তাহার পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। একথা সত্য হইলেও কোন কোন জড়কণিকাতেও প্রাণীদেহের অনু-রূপ কার্য্য দেখা যায় এবং বাহিরের শক্তির প্রভাবে তাহারাও প্রায় বৃক্ষাদির আকারই ধারণ করে।

ফরাসী পণ্ডিত লেডাক্ সাহেব (M. S. Leduc) একবার পরীক্ষা দ্বারা এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেন।

তিনি একভাগ চিনি ও একভাগ তুঁতে মিশ্রিত করিয়া ক্ষুদ্র বীজের ন্যায় একটি দানা প্রস্তুত করেন। তাহার পর একটি পাত্রে জলের সঙ্গে শতকরা চারিভাগ জিলাটিন্ (Gelatine) এক হইতে দশভাগ লবণ এবং দুই হইতে চারিভাগ ফেরোসায়ানাইড্ অফ্ পটাশ (Ferrocyanide of Potassium) মিশ্রিত করিয়া দানাটিকে উহার মধ্যে পুঁতিয়া দেন। দানাটি এইরূপে স্থাপিত হওয়ায় তুঁতের সঙ্গে ফেরোসায়ানাইড্ অফ্ পটাশ মিশ্রিত হইয়া দানাটির চারিদিকে একটি যৌগিক পদার্থের (Ferrocyanide of copper) পর্দ্দা প্রস্তুত হইল। এই পর্দ্দার মধ্য দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু চিনি প্রবেশ করিতে পারে না।

জল প্রবেশ করায় দানাটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে ইহা হইতে একটি অঙ্কুর নির্গত হইল এবং ভিতরের দিক হইতে চাপ পার্শ্ব অপেক্ষা উপরের দিকে অধিক হওয়ায় অঙ্কুরটি ক্রমশঃ উপরদিকে বাড়িয়া বৃক্ষকাণ্ডের আকার ধারণ করিল। এই কাণ্ডের কোন কোন স্থান কোন কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় সেই সেই স্থান হইতে শাখা নির্গত হইল। এই সকল শাখা যখন জলের উপর পৌঁছিল তখন আর উপর দিকে না উঠিয়া জলের উপর পাতার ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল। সুতরাং ভিতর হইতে পুষ্টিলাভ করিয়াই এই জড়কণিকা বৃক্ষের আকার ধারণ করিল।

প্রাণী জীবনের দ্বিতীয় বৃত্তি খাদ্য হইতে শক্তি সংগ্রহ করা। এই কার্য্যও জড় পদার্থ কেবল প্রাকৃ-তিক উপায়ে করিয়া থাকে। বরফ গলিবার সময় তাহার অন্তর্নিহিত তাপ শোষণ করে এবং একখণ্ড কয়লা দগ্ধ হইবার সময় অন্তর্নিহিত শক্তি বাহির করিয়া দেয়।

প্রাণীজীবনের তৃতীয় বৃত্তি আয়তন বৃদ্ধির জন্য দেহের বিভাগ আবশ্যক হইলে বিভক্ত দেহে নিজ ক্ষমতার সংক্রামণ।

জড়ের মধ্যেও এ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রস্তর সকল দানাবদ্ধ হইবার সময়ে প্রস্তরের দানা সত্বরেই এমন একটা আকার প্রাপ্ত হয় যে তাহার পর আর তাহার আকার বৃদ্ধি হয় না। উহার উপর বাহির হইতে অন্য উপকরণ ন্যস্ত হইলেও সে আর তাহা গ্রহণ করে না। সে উপকরণ অন্য একখণ্ড প্রস্তর নির্ম্মাণে নিয়োজিত হয়। এই প্রস্তরখণ্ড আবার তাহার পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হইলে তাহার বৃদ্ধি থামিয়া যায় এবং আবার নূতন প্রস্তর উৎপন্ন হইতে থাকে। এইরূপে একটি প্রস্তরখণ্ড পূর্ণাকার প্রাপ্ত হইলেই তাহা হইতে আবার নূতন প্রস্তর উৎপন্ন হয়। এইরূপে প্রাণীজীবনের তিনটি প্রধান বৃত্তিই জড়ের দানাতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং জীবদেহ ও জড়দেহে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা রাসায়নিক উপাদানের বিভিন্নতা জনিত।

সাধারণতঃ খনিজ পদার্থগুলি বালুকা ও মৃত্তিকাময় উপাদানে গঠিত, পক্ষান্তরে জান্তব পদার্থগুলি সাধারণতঃ অঙ্গার, অম্লজান, উদজান, ক্লোরিণ, গন্ধক, ফস্ফরস্, ক্ষার, সোরা, লৌহ, চূণ এবং ম্যাগ্নেসিয়ামের সমবায়ে গঠিত। ইহার মধ্যে অঙ্গার, অম্লজান, উদজানেরই (Hydrogen) পরিমাণ অধিক।

আদিম জান্তব পদার্থগুলি সম্ভবতঃ কেবল অঙ্গার, অম্লজান ও উদজানের সমবায়ে গঠিত হইয়াছিল। ইহারা কোমল ও স্থিতিস্থাপক ছিল এবং জলের সঙ্গে মিলিত হইলে আঠার মত অবস্থা প্রাপ্ত হইত।

সুতরাং এই স্বতঃ উৎপন্ন, উৎপাদনক্ষম, অঙ্গারময় আঠার মত পদার্থের উৎপত্তির ইতিহাসই পৃথিবীর আদিম জীবের উৎপত্তির ইতিহাস।

পৃথিবীর আদিমযুগে জড়পদার্থের মধ্যেই সম্ভবতঃ এইরূপ পদার্থের উৎপত্তির সূচনা হইয়াছিল।

পৃথিবীর আদিমযুগে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত এবং জলসিক্ত থাকিত এবং ইহার চারিদিকের আকাশ ঘন মেঘ ও অঙ্গারক বাষ্পে পরিপূর্ণ থাকায় ইহার শীততাপের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিত না। এই সময়ে অঙ্গার যবক্ষারজান ও ফস্ফরসঘটিত যৌগিক পদার্থ আকাশ, জল ও সমুদ্রতীরকে ওতপ্রোত করিয়া রাখিত। সুতরাং এই সময়ে আকাশস্থিত অঙ্গার ঘটিত যৌগিক পদার্থ যবক্ষারজান, ক্লোরিণ ও ফস্ফরসের সঙ্গে মিলিত হইয়া সমুদ্রতীরস্থ জলসিক্ত কোমল মৃত্তিকার উপরে আঠার ন্যায় পদার্থরূপে সহজেই বিন্যস্ত হইতে পারিত।

আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িত এবং ইহার মধ্যে নানা অস্থায়ী যৌগিক পদার্থ নিহিত থাকায় তাহাদের বিশ্লেষণ জনিত শক্তি বিভক্ত অংশগুলিতে একপ্রকার গতিরও সঞ্চার করিত।

সুতরাং পৃথিবীর আদিম অবস্থায় রাসায়নিক শক্তি বলে যে বিভাগক্ষম, গতিশীল অঙ্গারময় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইত, তাহার প্রকৃতিও উপাদান অনেকটা আদিম জীবেরই অনুরূপ ছিল। সুতরাং এই জটিল পদার্থকেই আদি জীবের জনকরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

যে পদার্থ নিজে অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া পদার্থান্তরের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে তাহাকে রাসায়নিক পরিবর্ত্তক (catalyser) বলা হইয়া থাকে। অম্লজান ও উদজানকে একত্র মিলাইলে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। কিন্তু যদি ইহাদের মধ্যে একটুকরা ছিদ্রময় প্লাটিনাম ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা তৎক্ষণাৎ সশব্দে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। অথচ প্লাটিনামের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে না। এস্থলে প্লাটিনাম রাসায়নিক পরিবর্ত্তকের কার্য্য করে।

সম্ভবতঃ এইরূপ কোন রসায়নিক পরিবর্ত্তকের সাহায্যেই পূর্ব্বোক্ত আঠার ন্যায় পদার্থ হইতে আদিম জীবের অভিব্যক্তি ঘটে।

সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল :—

প্রথমতঃ বায়ুস্থিত অঙ্গারময় যৌগিক পদার্থের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত আঠার ন্যায় জটিল পদার্থের উদ্ভব হয়। তাহার পর রাসায়নিক পরিবর্ত্তকের উৎপত্তি বশতঃ এই পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ বিভাগের দ্বারা তাহাদের মধ্যে এমন একটা শক্তির উদ্ভব হয় যাহা তাহাদের দেহ মধ্যে তাপের সমতা রক্ষা করে, আভ্যন্তরিক প্রবাহের সঞ্চার করে এবং তাহাদের একপ্রকার স্বাভাবিক গতিশক্তি দান করে।

এইরূপে জড়দেহে জীবনের সঞ্চার হয়।

সম্ভবতঃ ফস্ফরসঘটিত যৌগিক পদার্থই এস্থলে রাসায়নিক পরিবর্ত্তকের কার্য্য করিয়া থাকিবে।

জীবনীশক্তিযুক্ত মধ্যবিন্দুর প্রভাব বশতঃই জীব-কোষ ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইতে থাকে। এই মধ্যবিন্দুর প্রধান উপাদান ফস্ফরস্। সেইজন্যই ফস্ফরসকে রসায়নিক পরিবর্ত্তক মনে করিবার কারণ আছে।

এই ফস্ফরস্ আগ্নেয়গিরিতে নানা যৌগিক আকারে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। জলের সঙ্গে এই সকল যৌগিক পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটায় জলাশয় হইতে এইরূপ রাসায়নিক পরিবর্তকের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে।

এই রাসায়নিক পরিবর্তকের প্রকৃত ইতিহাসই জীবোৎপত্তি রহস্যের ইতিহাস।

জীবোৎপত্তির প্রকৃত রহস্যের কোন দিন উদ্ভেদ হইবে কি না বলা যায় না। কারণ আদিজীবের জীবনের ইতিহাস গভীর রহস্যে সমাচ্ছন্ন।

বর্তমান কালে পৃথিবীর কুত্রাপি আদিম জীবের কোনই চিহ্ন লক্ষিত হয় না। যে সকল জীব বা উদ্ভিদের কঠিনাংশ পর্বত গাত্রে রক্ষিত হইয়াছে তাহাদের সময় হইতেই জীবতত্ত্বের ইতিহাসের আরম্ভ। কিন্তু অস্থিহীন কোমল দেহ আদিজীব তাহারও বহু-পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

কাম্ব্রীয় যুগের পর্বত গাত্রে জীবদেহের সর্ব্বপ্রথম চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল দেহাব-শেষের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তৎকালেও জীবদেহ যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তৎকালে মেরুদণ্ডী প্রাণী বা কীটপতঙ্গের উৎপত্তি না হইলেও অমেরুদণ্ডী জীবের অধিকাংশ শ্রেণীই তখনো বিদ্যমান ছিল। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে কাম্ব্রীয় যুগের বহু পূর্ব্বেই পৃথিবীতে জীবসৃষ্টি আরব্ধ হইয়া-ছিল। কাম্ব্রীয় যুগের পূর্ব্বে যে সকল প্রাণী আবির্ভূত হইয়াছিল তাহাদের শরীরে কোন কঠিনাংশ না থাকাতেই তাহাদের দেহাবশেষের চিহ্ন এত বিরল।

সেকালের জীব জন্তুর দেহে কঠিনাংশ না থাকায় দুই প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথমত :—কাম্ব্রীয় যুগের পূর্ব্বে সমুদ্র জলে যে যে উপাদান ছিল তাহা হইতে খোলার জন্য প্রয়োজনীয় কার্ব্বনেট অফ্ লাইম সংগ্রহ করিবার সুযোগ ছিল না।

দ্বিতীয়ত :—সাধারণতঃ আত্মরক্ষার জন্যই জীবদেহে কঠিনাংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কঠিন খোলা শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে এবং কঠিন কঙ্কাল শত্রু হস্ত হইতে পলায়নের উপযোগী দ্রুতগতি প্রদান করে।

সেকালের প্রাণীবৃন্দ সাধারণতঃ নিরামিষাশী হওয়ায় কাহারও আত্মরক্ষার প্রয়োজন ঘটে নাই। এই কারণে সেকালে জীবদেহে কঠিনাংশ উৎপন্ন হয় নাই।

কিন্তু শরীরে কঠিনাংশ সকল সময়ে আত্মরক্ষার জন্যই আবশ্যক নহে, শরীরকে জীবন সংগ্রামোপযোগী দৃঢ়তাদানের জন্যও ইহার প্রয়োজন।

যাহাই হউক ইহা এক প্রকার স্থির যে কাম্ব্রীয় যুগের প্রারম্ভ হইতেই জীবদেহে কঠিনাংশ উৎপন্ন হইতে থাকে। প্রাণী দেহের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বুঝিবার জন্য শরীর বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল প্রমাণ আবশ্যক, সমসাময়িক গিরিগাত্রে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

সুতরাং ভূবিদ্যার অধিকার এইখানেই পরিসমাপ্ত হয়।

পৃথিবীর ক্রমপরিণতির বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার স্থান এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে নাই। বিশেষতঃ বিজ্ঞান রসায়ন, জ্যোতিশশাস্ত্র প্রভৃতির সম্যক আলোচনা ব্যতীত সে সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব অধিকার হইবারও নহে। সেইজন্য আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থে পৃথিবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের মূলতত্ত্বগুলির মাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

আশাকরি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে পাঠকের ধরাসৃষ্টি-রহস্যের সহিত মোটামুটি পরিচয় হইবে এবং অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য তাঁহার মনে উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হইবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

বাঁকিপুর খোদাবখ্‌শ্ লাইব্রেরী দর্শনে

ওগো অয়ি মহাত্মন, হে প্রয়াত চির পুণ্যধাম
ব্রাহ্মণের লহ' এ প্রণাম !
সে কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে সমুদিল তোমার অন্তরে
বিস্মৃতি বিলুপ্ত বাণী গুঞ্জরিল কি নব মন্তরে !—
অকস্মাৎ এ বিশ্বের বিস্মৃতির মহাসিন্ধু হ'তে
মথিয়া তুলিলে একি ইন্দিরারে লোকহিত ব্রতে
অফুরন্ত সুধাভাণ্ডকরা
মানবের যুগান্তের চিরচিত্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা হরা !

শত শত অব্দতল অন্ধকার কন্দর গহনে
নিবসিতেছিল যা' গোপনে,
কেমনে তা' প্রকাশিল শত মুগ্ধ চক্ষের সম্মুখে
সর্ব্বগ্রাসী-ধ্বংসপুরী পরিত্যজি' সুধা পূর্ণ বুকে !
তোমার সোনার কাঠি যাদুবলে অসাধ্য সাধিল
তাহারি খনির মণি কল্পনার নয়ন বাঁধিল !
অহল্যার মত ধূলি শেষ
অভাগা শিল্পীর কত দিলে নব জীবন উন্মেষ।

নিত্যসঙ্গী বাদ্‌শার—রণাঙ্গন ঝঞ্জনার মাঝে,
পলায়নে, পথে, রাজকাযে—
ভাগ্যবান্ হাফেজের সেই মহাকাব্য গ্রন্থখানি,
পবিত্র যা' হুমায়ুন্ শাজাহান্ নিত্যসঙ্গ মানি ;
বাদ্‌শার চিন্তা সাক্ষী, চিত্ত-রক্ষী হয়ে সাধি কায
দিল্লীশ্বর হস্তলিপি সগৌরবে বক্ষে বহে আজ ;
সেই' গ্রন্থ সেই কর-লেখা—
তুমি বিনা হে মহান্ কার ভাগ্যে হ'ত আজ দেখা ?

যে জগদীশ্বর আখ্যা দিল্লীশ্বরে দিল কবি গাথা
ভারতের সে ভাগ্যবিধাতা,
যার কর-লিপি দম্ভে আসমুদ্র হিমাচল ভূমি
একদিন সসম্ভ্রমে নামিয়াছে শির পদ চুমি,
তার চিন্তা, তার লেখা, তার প্রাণ, মুদ্রিত পরশ
দীর্ঘ চারি শতাব্দীর' পরে মোরে করিছে অবশ !
আমি যেন আজি কার নহি
প্রবেশি' প্রসাদ কক্ষে দেখিতেছি গুপ্তবেশে রহি !

কক্ষে কক্ষে জ্বলে দীপ দেয়ালীর সমারোহ নিতি
আসে ভেসে দূরাগত গীতি
সেতার এস্রাজ বীণে সুসঙ্গত সুরে তালে লয়ে
ঠিকরি' প্রাচীর গাত্রে ঝাড়ে মণি কুট্টিমে সভয়ে
তুলে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি—যুবতীর ইঙ্গিতের মত ;
বাদ্‌শা তন্ময় কাব্যে, লুটে গান ভূমে মূর্চ্ছাহত !
বাদ্‌শার বিকুঞ্চিত ভাল,
কভু মৃদু হাসি ফুটে, আঁখি মুদে, কভু গণ্ড লাল।

অলিন্দে অলিন্দে দ্বারে সতর্কিত সর্ব্বত্র প্রহরী
সম চির দিবা-বিভাবরী !
প্রখ্যাত আমীরবর্গ নম্র শিরে অপেক্ষিছে দ্বারে,
উৎকণ্ঠিত শঙ্কাম্লান অধীন নৃপতি অন্য ধারে ;
মরুৎ বাহনে আসে মহালের উল্লাষ আভাষ
নর্ত্তকীর নৃত্যতালে বিলসিছে দখিনা বাতাস ;
বশোরার গুলাব সুরসে
লীলায় এলায়ে পড়ে এলা কুঞ্জে স্বপন রভসে !

ভারতের ভাবী নৃপ শিশুগুলি করতালি দিয়া
করে খেলা গৃহ মুখরিয়া—
পুণ্ডরীক গণ্ডশোভা বহুমূল্য সাঁচ্চা জরী বেশে
অংস-চুম্বী দীর্ঘ চারু পশমের মত চূর্ণ কেশে !
চলিতে গলিছে যেন দাড়িমের মত রক্ত রস
অলক্ষিতে ধরণীতে লাসে যেন লাক্ষার পরশ !
তাড়ে দাসে কভু আঁখি তুলি
সে বঙ্কিম ভ্রূগ্রীবায় কি নেপথ্য রয়েছে আগুলি !

প্রাচীর বেষ্টিত ঝিলে বাহিয়া ময়ূরপঙ্খী তরী
কলহাসে সন্ধ্যাকাশ ভরি'
যৌবন-বণিক্ নারী, পীন বক্ষে ওড়্না সম্বরি'—
(ভূলুণ্ঠিত পেশোয়াজ ক্ষীণ মধ্য সজোরে আঁকড়ি')—
দোলে বেণী, মণি বন্ধে স্বর্ণকুলি ঝঙ্কারে করুণ !
যুবতীর ক্ষেপণীতে জলতলে গুমরে বরুণ !
সাকী পাশে পান পাত্র করে
তীরে তীরে বিলাসের সন্ধ্যারতি প্রতি ঘরে ঘরে।

কোথাও কুটীরে কোন্ বর্ণশিল্পী একাকী বসিয়া
নিজ মন মধুতে রসিয়া
যুগ যুগ ধরি' পটে বর্ণে বর্ণে মাধুরী কলায়
সব ধ্যান মন প্রাণ স'পি' তার চরণ তলায়।
সে অঙ্কিত বাঙ্কিতায় সুসংহত তন্ময় আনন্দ
মূর্ত্ত আজো চিত্রপটে সে শিল্পীর অঙ্গের সুগন্ধ
ধীর শ্বাস, হৃদয় স্পন্দন,
নিস্পলক নেত্রখানি—বিজড়িত ছবির মতন !

শুনিতেছি যেন আমি নকীব চারণ কবি ভাটে
গাহিছে প্রশস্তি পথে ঘাটে ;
নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে আমি মূঢ় হয়ে হেরি সর্ব্ব ঠাঁই,
মোর পরিচিত সব, মোরে কেউ চিনিবার নাই !

সদা পরিবর্ত্তনীল জলনিধি হৃদয়ের মত
বাদ্শার মুখভাব লুকোচুরি খেলিছে সতত ;
হস্তি পৃষ্ঠে শোভাযাত্রা পথে
কি যে কল কোলাহল অগণিত নাগরিক স্রোতে।

কোথাও স্তিমিত কক্ষে মৃদুস্বরে গোপন মন্ত্রণা,
লুক্কায়িত অসির ঝঞ্ঝনা ;
কেহ জপে হত্যা মন্ত্র সবিলাস আলিঙ্গন ছল,
বিম্বাধর হাস্যে কেহ মিশাই'ছে ভীষণ গরল !!
দিবসের শ্রমে শ্রান্ত দৈন্য-পীড় কুটীরে বসিয়া
সদানন্দ কবি রচে যাহাদের স্তব প্রাণ দিয়া
নিতান্ত দুর্ভাগা সেই তারা,
লোভে মোহে মদমত্ত দিবারাত্র সুখশান্তি হারা !

আবিষ্ট আমার একি আচম্বিতে এল জাগরণ
টুটি' গেল দিল্লীর স্বপন !
হে বরেণ্য মুসল্মান্ রচিয়াছ একি মায়াপাশ,
ভরিয়াছ কক্ষে কক্ষে কি সিরাজী মাদক নির্য্যাস ?
ওগো ভাব-ভগীরথ একি গঙ্গা দিলে বহাইয়া
অভিশপ্ত লুপ্ত ভস্মে অভিনব প্রাণ সঞ্চারিয়া !
এ নব-মিশর মৃত্তি-তলে
আছ বুঝি তাই শুয়ে বক্ষে করি মূর্ত্ত পুণ্যফলে !

গয়া। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ভাগলপুর চিত্র

ভাগলপুরের নাম অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। ঘটনাচক্রে একদিন শুনিলাম আমাকে সেখানে যাইতে হইবে। সে আজ এক বৎসরের কথা।

দারুণ গ্রীষ্ম। গিন্নি বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। তুমি সমস্ত বোচ্কা বুচ্কি জিনিষ-পত্র লইয়া আগে রওনা হও। সেখানে পৌছিয়া সব ঠিকঠাক কর, শেষে আমি যাইব।"

"যো হুকুম হুজুর" বলিয়া সেলাম পূর্ব্বক বিদায় লইলাম। রাত্রি ৮টার সময় হাবড়া ষ্টেশন হইতে রেলে চড়িয়া তাহার পরদিন সকাল ৭টার সময় ভাগলপুরে উপস্থিত।

রেলওয়ে ষ্টেশনটি সনাতন। চেহারা হৃদয় বিদারক। প্লাটফরম অপরিষ্কার ও অসমতল। তাড়াতাড়ি চলিতে গেলে পা ভাঙ্গিবার ভয় হয়। ষ্টেশনের বাহিরে হরেক রকমের যান—টমটম, পালকী, ঘোড়া ও গরুর গাড়ী। এখানকার টমটম—পশ্চিমের এক্কা। ঘোড়ার গাড়ীর অবস্থা একটু প্রকাশ করিয়া বলিবার মত। প্রায় সবগুলির রং ও আকৃতি এক। শাদা থার্ড-ক্লাস। দরজা এত ছোট যে আমার মত লোক অতি কষ্টে গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। ভিতরের গদি যেন রামশিলা। অল্পক্ষণ বসিলেই পশ্চাৎ প্রদেশে ফোস্কা হইয়া উঠে। তারপর, যখন ঘোড়া ছোটে, তখন মনে হয় এইবার চাকা খুলিয়া পড়িবে। প্রাণ হাতে করিয়া যাইতে হয়। ঘোড়াগুলা যেন কোকেন সেবী সহুরে গাধা। একেবারে ঘিয়ে ভাজা, হাড় কখানি সার। পশুর প্রতি দয়ামায়ার আইন জারি আছে বটে, কিন্তু ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড় হবার ভয়ে "কারোয়াই' আপাততঃ স্থগিত আছে।

এক মাইল যাইতে না যাইতে দেখি, সহরে 'মেমোরিয়ালে'র ছড়াছড়ি। এখানে এঁর 'মেমোরিয়াল' ওখানে ওঁর 'মেমোরিয়াল'। সর্ব্বসমেত যে কত, তাহার ঠিকানা করিয়া উঠা ভার। আধ ঘণ্টার ভিতর ৫।৭টি 'মেমোরিয়াল' পার হইলাম। এ সব এক উকিল রাজার কাণ্ড। তিনি যদিও পরলোকে গিয়াছেন, তবু 'মেমোরিয়ালের জোরে এখনও ইহলোকে বাঁচিয়া আছেন বলা যায়। পুরাতন মেমোরিয়াল একটির নাম উল্লেখ যোগ্য। সেটা ফ্রিডলাণ্ড সাহেবের নামে। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, মায়া, ও ক্ষমার তারিফ আজও শুনা যায়। ইনি সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সাঁওতাল বিদ্রোহীদের বিচার সাঁওতাল জুরি দ্বারা করাইতেন ও নিজে তাহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

সহরের প্রধান রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও উঁচুনিচু—পাহাড়ে দেশে যেমন হয়। সহরে পাহাড় নাই কিন্তু দেহাতে আছে। মন্দারের নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। তাহা এই জেলায়। ষ্টেশন হইতে সহরে যাইবার দুটি রাস্তা। একটি আদালতের দিকে ও একটি গঙ্গার দিকে গিয়াছে। রাস্তার দুই পাশে ড্রেন ও দুর্গন্ধ। ফ্লসিং একেবারে হয় না। জলের কল আছে কিন্তু জল সব স্থানে যায় না ও কলে সব সময়ে জল থাকে না। এত গরদা যে চোক, কান, নাক, ও মুখ বন্ধ করিয়া না যাইলে বিঘোরে বিহারে অকালে অক্কা পাইবার আশঙ্কা আছে। যখন কোন জবরদস্ত কমিশনার কিম্বা কলেক্টর আসেন, তখন চেয়ার-ম্যান সাহেবের ভাইস্ মহাশয় সাহেব বাহাদুরদের বাড়ী যাইবার রাস্তা জলে ভাসাইয়া দেন ও দু এক ফোঁটা জল এদিক ওদিক ছড়াইয়া আহ্লাদে আট-খানা হন, এবং কৈশর ই-হিন্দ মেডালের স্বপ্ন দেখেন। মিউনিসিপালিটির দৌড় খুব, লম্বে ৯।১০মাইল, চওড়ায় ২।৩মাইল। গরদা কাঁচা পাকা। কতক রাস্তা কাঁচা কতক রাস্তা পাকা। দুয়ের মিশ্রণে এক অদ্ভুত উপাদেয় কাঁচা পাকা গরদা উঠে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া কর্ত্তাদের খোঁজ লইতে ইচ্ছা হইল। চেয়ার-ম্যান ও তাঁহার ভাইস দুজনেই বে-সরকারী—পেশা ওকালতী। লোকে বলে চোক আছে দেখেন না, কান আছে শোনেন না। ঘরে বসিয়া সাধারণের হিত চিন্তা করেন। না হইলে এমন উত্তম ঘোড়ার গাড়ী জারি করিয়া ও এমন গরদা উড়াইয়া মানুষ কমাইবার ফিকির করিবেন কেন? দুজনের মধ্যে বড়ই সদ্ভাব। বেহারী বাঙ্গালী বলিয়া একটুও কিন্তু নাই। যেন রাম লক্ষ্ণণ। রাম যাহা করেন, লক্ষ্ণণ তাহার অনুমোদন করেন। দুজনের রুচিও এক। রাম বড়, কাজেই সাহেব মহলে প্রতিপত্তি বেশী। লক্ষ্ণণের এখনও ততটা হয় নাই।

যে বাসা আমার জন্য ঠিক হইয়াছিল তাহা ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল। বাসায় আসিয়াই দেখি, দুইজন ভদ্রলোক আমাকে 'রিসিভ' করিবার জন্য উপস্থিত। একজন সদরালা ও একজন ডেপুটি। সদরালা সাহেবের পায়ে চটি, গায়ে হাতকাটা জামা। আজকাল অনেক সদরালা কাপড় পরেন না। এক লম্বা জামাতেই

লজ্জা নিবারণ করেন। কারণ যুদ্ধের সময় লোকে কাপড় বুনিয়া সময় নষ্ট করিলে মিউনিশনের অভাব হইতে পারে। কিন্তু এ সদরালা তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদের মত নন। সুতরাং একখানি ছোট ধুতি পরিয়া আসিয়াছিলেন। ডেপুটি সাহেবকে দেখিয়া মনে হইল, সাহেব সবে মাঠে ঘোড়দৌড় করিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়াছেন। এখনও বাসায় গিয়া ড্রেস্ বদলাইবার ফুরসৎ পান নাই। হাতে চাবুক পায়ে পট্টি ও বুট, অঙ্গে কোট ও রাইডিং ব্রিচেস্ অনুসন্ধানে জানিলাম, ইনি যুবা বয়সে ভারি ঘোড় সওয়ার ছিলেন। এখন ঘোড়া কিম্বা কোন চতুষ্পদ জানোয়ার ইহাঁর ঘরে নাই। কিন্তু ঘোড়া চড়ার নেশা ছুটে নাই। দুইজনেই প্রাচীন। আমার আদর সম্ভাষণ ও সাময়িক প্রয়োজনাদির ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ইহাঁদের প্রস্থানের পর আমি স্নান করিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই জঠরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বাজারে জল খাবার আনিতে লোক পাঠাইলাম। লোকটা সন্দেশ, খাজা ও টিক্‌রী লইয়া উপস্থিত হইল। সন্দেশ ধোঁয়া গন্ধ। উদরস্থ করিতে পারিলাম না। খাজা, বর্দ্ধমানের চেয়ে ভাল। টিক্‌রি খাস্তা ও উপাদেয়।

জলযোগ সারিতে না সারিতেই প্লেগের কথা মনে হইল। শুনিলাম এখনও প্লেগ হইতেছে। সুতরাং এ যাত্রা যে পৈতৃক প্রাণ বাঁচাইয়া দেশে ফিরিব, সে আশা বড় কম। যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তিনিই বলেন 'সাবধান।' কিন্তু কোন বিষয়ে সাবধান হইব কেহই বলেন না। প্রাণের ভয়ে দেশী বিদেশী ডাক্তার-, দের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "ইঁদুর হইতে সতত দূরে থাকিবে"—সহরে তিন লক্ষ ইঁদুরের বাস। ইঁদুর বংশ ধ্বংস করিতে না পারিলে প্লেগ সহর ছাড়িবে না। অনেকে জানে না যে এক জোড়া ইন্দুর হইতে বৎসরে ৬৫০ সন্ততি হয়। এমন বংশের ধ্বংস যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। সকলের সহায়তা আবশ্যক। অতএব আমাকেও এবিষয়ে অনুরোধ করিলেন। আমিও ভয়ে একটি মস্ত "হুঁ" বলিলাম। ইঁদুর মারিবার বিষ ঘরে আসিল। রোজ কয়েকটি করিয়া ইঁদুর মারি ও ভরসা বাড়াই বুঝি এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। শুনি, কিছুদিন পূর্ব্বে যে সিভিল সার্জ্জন ছিলেন তাঁর ইঁদুরের ভয় আরও বেশী। বলিতেন যদি বাড়ীর এক ক্রোশের মধ্যে ইঁদুর মরে তবে বাড়ী ছাড়া উচিত। কেহ তাঁহার কথা শুনিত না, বুঝিত না; সুতরাং শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং একদিন বাড়ী ছাড়িয়া অজ্ঞাতবাসে যাইলেন। সেই সময় সহরে দু একজন প্লেগে মরে ও ডাক্তার বাহাদুরের হাতার আধক্রোশ দূরে একটা মরা ইঁদুর দেখা যায়। ডাক্তার সাহেবের সৎসাহসের প্রশংসা সহরে রাষ্ট্র হইল। সাহেব মহলে ক্লাপ পড়িল। ডাক্তার সাহেব ঘরে ফিরিলেন। তাঁহার কাণ্ড দেখিয়া সেবার প্লেগও লজ্জায় পলায়ন করিল!

তিন দিন রাত্রি বাসের পর দুই একটি তথ্য অনুসন্ধানে নির্গত হইলাম। আমার এক বন্ধু বলিয়াছিলেন, "ওহে ভাগলপুরে বড় বড় গাই পাওয়া যায়। আমার জন্য একটি ভাল গাই পাঠাইও।" সহর দেহাত সব ঘুরিলাম। যাহাকে আমরা কলিকাতায় ভাগলপুরী গাই বলি তাহার ঠিকানা কোথাও পাইলাম না। বাঙ্গালায় যেমন ছোট ছোট গাই এখানেও সেইরূপ। বোধ হয় 'গাধার' স্থলে ভ্রমে 'গাই' শব্দ আনাড়ি লোক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানকার গাই বাঙ্গালার চেয়ে আরও জীর্ণ শীর্ণ। দুধও অল্প দেয়। বাঙ্গালার চেয়ে ভাগলপুরের মাটি, জল ও বাতাস ভাল বড় না হইতে পারে। মাটি ত ভালই। কারণ এখানকার তরিতরকারি, ফল, মূল, ফুল বাঙ্গালার চেয়ে ভাল। জল বাতাস যে ভাল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দুর্ব্বল বাঙ্গালী এখানে আসিলে শীঘ্র সবল হয়। রুগ্না ও বন্ধ্যা বাঙ্গালিনী অচিরে সুস্থ ও পুত্রবতী হন। বৎসর পার হইতে না হইতেই এক একটি রত্ন প্রসব করেন। আমাদের পাড়ার মিত্র গিন্নির ৯টি সন্তান, ঘোষগিন্নির ১১টি ও ভট্টাচার্য্যগিন্নির ১৩টি। শুনি এই তিন গিন্নিরা যখন

বাঙ্গালায় ছিলেন তখন তাঁহাদের পুত্র হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভাগলপুরের জল বায়ু সেবন করিয়া ১০।১২ বৎসরের মধ্যে এমন তরক্কি করিয়াছেন।

ভাগ্যবানের দেশ ভাগলপুর। গলিতে গলিতে রাজা, কুমার, জমিদার ও ব্যাঙ্কার। মন্ত্রী পরিষদের ত কথাই নাই। প্রবাদ আছে যে মগধের রাজা জরাসন্ধ এই প্রদেশে সেণ্ট্রাল জেল স্থাপন করিয়া অনেক রাজাকে বন্দী রাখেন। বর্ত্তমান সময়ে মহা-রাজা, রাজা ও কুমার হইয়া ভাগলপুরের আশে পাশে বিরাজ করিতেছেন।

মান্ধাতার আমলে আমার শ্বশুর এদেশে আসিয়া ছিলেন। তাঁহার বাসা কোথায় ছিল, তাঁহার বন্ধুদের কে কে জীবিত আছেন, তাঁহার গুরু স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ীর গ্রীষ্মাবাস কোথায় ছিল এই সব গভীর গবেষণার ভার আমার উপর পড়িল। শ্বশুর মহা-শয়ের বাসা ও তাঁহার গুরুর গ্রীষ্মাবাস কোথায় ছিল সে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণয় করিয়া ফেলিলাম এবং সে সব স্থানের ফটো লইয়া পরে পাঠাইব মনে মনে এমন সঙ্কল্পও করিলাম।

শ্বশুর বাড়ীর কাজ যখন খতম হইল তখন সাধারণ গবেষণায় হাত দিলাম। তাহার নমুনা দিতেছি। অবধান করিয়া শ্রবণ করিলে বাধিত হইব।

ধর্ম্ম—প্রথমে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্ম্মের সমন্বয় এখানে হইয়াছে। হিন্দু, ব্রাহ্ম, থিওসফিষ্ট, জৈন, মুসলমান ও খৃষ্টান সকলেই আছেন ও তাঁহাদের আপন আপন মন্দির আছে। কেহ কাহারও সহিত লড়াই ঝগড়া করেন না।

হিন্দুদের বুঢ়ানাথের মন্দির, যোগশর মহল্লায়। গঙ্গার উপরে প্রতিদিন পূজা পাঠ হয়। এ মন্দিরে আহ্বান নাই, প্রত্যাখ্যান নাই। সকলেরই অবারিত দ্বার। ধর্ম্মটা স্ত্রীলোকেরা এখনও রাখিয়াছেন। বুঝি আর থাকে না। তবে গোড়াটা শক্ত বলিয়া যা ভরসা। কত কত ঘাত প্রতিঘাত চতুর্দ্দিক হইতে আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মটা এখনও খাড়া আছে। পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ পূজা করেন বটে কিন্তু মনটা যেন কোথায় আছে খুঁজিয়া পান না। গঙ্গার উপর পাকা ঘাট। মন্দিরটি ১০০।১৫০ বৎসরের পুরাতন। এ মন্দিরে শিবের একজন Steward আছেন। তাঁহার নাম মোহন্ত মহারাজ। শিব মহাশয়কে বড় বেশী খাওয়ান না, পাছে অগ্নিমান্দ্য হয়। তবে নিজে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কয়েকজন লোক পাঁটার মুড়ির লোভে তাঁহাকে সরাই-বার জন্য মামলা জুড়িয়াছে। মামলাকারীদের ভিতর একজন লোক শিবের 'চড়ুয়া' অর্থাৎ তাঁহার মা বাপ তাঁহাকে শৈশবাবস্থায় শিবের মস্তকে চড়ান। সেই অবধি তিনি শিবের মন্দিরে শিবস্ব হইয়া আছেন। সুতরাং বলেন তাঁহার দাবী অন্যের অপেক্ষা বেশী। এখন মোকদ্দমা হাইকোর্টে বিচারাধীন। শুনিয়াছি এই মন্দিরে প্রতিদিন গাঁজার ভোগ হয় ও অনেক লোকে প্রসাদ পায়।

বুঢ়ানাথের মন্দিরের সন্নিকটে পুরাকালে হিন্দু বিধবারা 'সতী' হইতেন। সতীদের বংশধরেরা ঐ ঐ স্থানে ছোট ছোট স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া পূজা করেন। এ স্থান অতি রম-ণীয়। অতীতের অনেক কথা মনে আসে। যে প্রেমাগ্নিতে শ্রীরাধিকা একদিন নিজের দেহ মন পবিত্র করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে দিয়াছিলেন, সতীরা সেই অগ্নিতেই নিজেদের দেহ ভস্মসাৎ করিয়া সূক্ষ্ম শরীরে পতির পতি জগতের পতির সহিত মিলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ভাবেই আমি সতীর সহমরণ দেখি অন্যে যে যা বলুক।

শিবের স্ত্রী গঙ্গা। মা এখন সশরীরে ভাগলপুরে আছেন। সহর গঙ্গার ঠিক দক্ষিণপাড়ে। নদী গত বর্ষাকাল হইতে সহরের দিকে আসিতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে প্লেগও কমিয়াছে। এই জন্য সাধারণ লোকের গঙ্গার প্রতি এত ভক্তি। আর বৎসর গ্রীষ্মকালে যখন আমি আসি তখন সহর যমুনিয়ার তীরে। গঙ্গা ও যমুনিয়ার মধ্যে 'দিয়ারা' বস্তি ছিল। বোধ হয় মা গঙ্গা সহরে লোকের সভ্যতার জ্বালায় তাহাদিগকে দূরে

রাখিয়া দিয়ারার অসভ্য লোকদিগকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছিলেন। মার মহিমা অনন্ত। সকলে বুঝিতে পারে না। অনেক বৎসর পরে এবার মা একেবারে সহরে আসিয়াছেন। ভক্তেরা বলিতেছে আর ভয় নাই। কারণ শিব মহাশয় এখন আর শীঘ্র মাকে যাইতে দিবেন না। এই মিলনের ফল যে কি হইবে তাহা জ্যোতিষীরা বলিতে পারেন। তবে নদীর দক্ষিণ পাড় যে রকম ভাঙ্গিতেছে তাহাতে বোধ হয় মা ২।৪ খানি ঘর বাড়ী শীঘ্রই উদরস্থ করিবেন। এবার এত খরস্রোত যে হাতি ভাসিয়া যাইতেছে। এত বেগ বুঢ়ানাথ বেচারী আর কতদিন নিজের মস্তকে ধারণ করিয়া সহরকে বাঁচাইবেন? দেবতার সঙ্গে বিজ্ঞানের কথা চলে না। তবে লাগাইতে ক্ষতি কি? আমার বোধ হয় যেবার নদীতে বেশী বাণ হয় সেবার সহরের সব ময়লা ধুইয়া যায় ও গর্ত্তে জল ঢুকিয়া ইঁদুর বংশের নাশ করে। তাই প্লেগ কমিয়া যায়।

সহরের বাহিরে দুটি তীর্থস্থান আছে। সুলতানগঞ্জের গৈবীনাথ ও মন্দারের মধুসূদন। পুণ্যের জোরে এঁদুটিরই দর্শনলাভ করিয়াছি। সুলতানগঞ্জে গঙ্গার মধ্যস্থলে পাহাড়। তাহার উপর গৈবীনাথের মন্দির। প্রবাদ আছে যে এক সাধু প্রত্যহ ত্রিশক্রোশ ভাঙ্গিয়া এই পাহাড়ের তলদেশ হইতে গঙ্গাজল লইয়া গিয়া বৈদ্যনাথের শিবের মস্তকে ঢালিতেন। ভোলানাথ সাধুর এ ভীষণ ভক্তিময় কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, "তোমার এত কষ্ট করিয়া জল আনিতে হইবে না। তুমি যেখান হইতে জল আন আমি সেইখানেই আবির্ভূত হইব।" সুলতানগঞ্জে গঙ্গা উত্তর বাহিনী শিলা সঙ্গমে আরও মাহাত্ম্য বাড়িয়াছে।

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে! ভাগলপুরে আসিয়া তোমার তীরে অনেক সময় কাটাইয়াছি। সূর্য্যোদয়ে, সূর্য্যাস্তে ও চন্দ্রলোকে তোমার রূপের ছটা দেখিয়াছি। বাতাসে রৌদ্রে ও মেঘজালে তোমার রুদ্র সৌম্য ও যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছি। গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শীতে তোমার পূত সলিলাক্ত চরণ স্পর্শ করিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিয়াছি। প্রকৃতি ও মানুষের মনের সহিত যে তোমার এত ভালবাসা তাহা অগ্রে বুঝি নাই। এই জন্য তোমার নামের এত মহিমা। তোমার ইতিহাসে কত সত্য কত রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করা আমার মত অকৃতীর সাধ্য নহে।

মন্দার পর্ব্বত ৭০০।৮০০ ফুট উচ্চ। ইহা বাঁউসির নিকট। বাঁউসি এখন একটি ছোট 'হিল ষ্টেশন'। সেখানে কয়েকজন লোক বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মধুসূদনের অনুগ্রহে বাঁউসিতে এ পর্য্যন্ত প্লেগ হয় নাই। কথিত আছে এক রাজা এই পাহাড়ের নিম্নস্থ তড়াগের জল ব্যবহার করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হন ও কৃতজ্ঞতাসূত্রে পাহাড়ের উপড় সিঁড়ি নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু মন্দার পাহাড়ের উপর মধুসূদন এখন থাকেন না। জৈনেরা পার্ব্বতীয় মন্দিরটি দখল করিয়াছেন। মন্দিরে বিষ্ণুর পাদপদ্ম আছে। পরেশনাথের পরেই জৈনদের এটি একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। এই পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া পুরাকালে দেবাসুরেরা সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। সেই জন্য মনে হয় এক সময় মন্দার সমুদ্রগর্ভে ছিল। এখন অন্যরূপ হইয়াছে। ভূতত্ত্বের ইতিহাস পড়িলে কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়।

ভাগলপুরে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। দেবদেবীর মূর্ত্তিও অনেক। হিন্দুরা পুতুল পূজা করে বলিয়া অনেকে অনেক অযথা কথা বলেন। যাঁহাকে আমরা ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, তাঁহাকেই আমরা পূজা করি। তাঁহার মায়াময় পুতুল ও পট সেইজন্যই প্রস্তুত করি। আমরা ভগবানের মহিমা ও শক্তির ইয়ত্তা করিতে পারি না; কল্পনার সাহায্যে ভগবানের অনন্তরূপ ও শক্তি অনুভব করি ও তাহারই প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করি। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা ও সেই অনন্তরূপ ও শক্তির মহিমা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে অক্ষম। আরও কয়েক কোটি হইলে ভাল হয়।

ভাগলপুরের ব্রাহ্ম সমাজের কথাটা এখন বলি। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাহার ঢেউ ভাগলপুরে অনুমান ১৮৭৫ খৃঃ

অঃ আসে। সুতরাং ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের বয়স এখন প্রায় ৪০ বৎসর। অথচ ব্রাহ্ম সংখ্যা এখানে ২০।২৫ জন লোকের অধিক নহে। এই ২০।২৫ জনের ভিতর ২।৩টি বেহারী আর বাকী সব বাঙ্গালী।

ব্রাহ্মদের প্রথমে সমাজগৃহ ছিল না। ঘরে ঘরে উপাসনা হইত। এখন প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার সময় স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া ব্রাহ্মগণ সমাজে আসেন। অনুমান ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে একজন হিন্দুরাজা সমাজ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রাজার বেশ দূরদৃষ্টি ছিল। যে গৃহ তিনি নিম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ৪০।৫০ জনের উপর দীক্ষিত হইলে আর বসিবার স্থান হইত না। আমি ব্রাহ্মগণের যে বর্ত্তমান সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছি তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। এক সাম্বৎসরিক অধিবেশনে গিয়াছিলাম। বসিয়া বসিয়া উপাসনা হইতেছিল। ইতিমধ্যে আচার্য্য মহাশয় বেদী হইতে বলিয়া উঠিলেন "এস ভাই দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করি।" তখন দেখি,বাজে লোকেরা আস্তে আস্তে চোরের মত সরিয়া পড়িল। শেষ পর্য্যন্ত ২০।২৫ জন রহিল। ঠিক করিলাম ইঁহারা নিশ্চয়ই খাঁটি ব্রাহ্ম। সব ধর্ম্মে আমার সমান আস্থা। তবে ঠিক কথা বলিতে গেলে,যে ধর্ম্মে যত লোক তার তত গায়ে জোর। ইহাকেই বলে "যতোধর্ম্ম স্ততো জয়।"

"সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মের" এখানে এক শাখা আছে। তাহার মন্দির বিক্রমপুরে। মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা কোন গূঢ় কারণে দুই বৎসরের ফর্‌লো লইয়াছেন। সেই সঙ্গে চেলারাও গা ঢাকা দিয়াছেন। এক বৎসরের ভিতর একদিনও পূজা পাঠ দেখি নাই। শুনি, মন্দির এখন ভাড়া খাটিতেছে। মন্দিরের পয়সা হইলে গরীবের দুঃখ মোচন হইবে এই আশায় অনেক বসিয়া আছে।

জৈনদের দুই দল। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। এক বলেন, দশদিকই ভগবানের আবরণ সুতরাং তাঁহার অন্য আবরণ হইতে পারে না। অন্য দল ভগবানকে শ্বেতবস্ত্রে আবৃত করেন। চম্পানগরে ইহঁাদের যে মন্দির আছে তাহার পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে ভগবান বুদ্ধদেবের দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর মূর্ত্তি আছে ও প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। মন্দিরে প্রাতঃকালে গিয়াছিলাম কুঙ্কুম, চন্দন ও পুষ্পের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। মন মোহিত হইয়া গেল। সেখানে হিংসা প্রবৃত্তি নাই সুতরাং মাছি ও পিপীলিকার সমস্যা গুরুতর।

মুসলমানদের এখানে এক প্রাচীন মস্‌জিদ আছে। তাহা মওলানা সাহেবাজ সা ফকিরের নামে। ইহা রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণে। ইহাতে হাজার হাজার মুসলমান প্রত্যহ নেমাজ করেন। পরলোকগত বাবু সূর্য্যনারায়ণ সিংহের খঞ্জরপুর প্রাসাদের সন্নিকটে, গঙ্গাতীরে এক মস্‌জিদ ও কবরস্থান আছে। তাহা অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার ইতিহাস এখনও পাই নাই।

খৃষ্টানদের সহরে ও দেহাতে গির্জ্জা আছে। প্রতি রবিবারে উপাসনা হয়। ইহাদের কোন কথা আমি জানিতে চেষ্টা করি নাই।

সাহিত্য

ধর্ম্মরাজ্য হইতে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া দেখি যে ক্ষেত চাষ অভাবে শুষ্ক প্রায়। মধ্যে মধ্যে দু একজন সখের চাষ দিতে আসেন আর বেগতিক দেখিয়া পশ্চাৎপদ হন। বাজার খারাপ দেখিয়া বড় বড় চাষীরা হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন!

দেশের লোকের খাওয়া পরা শোয়া বসার সঙ্গে সাহিত্যের কিছু সম্বন্ধ আছে। সুতরাং এখানকার সাহিত্যে ডাল ভাত ধুতি চাদরের সাতু লিটি মূঙ্গাই মুরেঠার রুটি কাবাব পাজামা আচ্‌কানের ছায়া পাওয়া যায়।

ভাগলপুরবাসী বাঙ্গালী সভ্যেরা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শাখায় বসিয়া সারাদিন গান করিতেন। বাসা বাঁধিবার সময় পাইতেন না। লোকে মনে করিয়াছিল গান কমিলে, বাসা হইবে। গান ত কমিয়াছে কিন্তু বাসা বাঁধা হয় নাই। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। ইনি বলেন আমি বড়, উনি

বলেন আমিও বড় কেও কেটা নই। দুইটি দল। একদল বলেন যে গণ্যমান্য ব্যক্তির সভাপতি হওয়া উচিত। আর একদল বলেন প্রকৃত সাহিত্যসেবীরই সভাপতি হওয়া উচিত। লক্ষ্মী স্বরস্বতীর দ্বন্দ্বে সরস্বতীর হার হইয়াছে। এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন এইবার শাখাও ভাঙ্গিতে পারে। পরিষদের শাখার এক অধিবেশনে গিয়া দেখি, এক গণ্যমান্য সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন, "আমি এতদিন মাতৃভাষার কোন সেবা করি নাই। সে জন্য বিশেষ লজ্জিত আছি। কিন্তু এখন হইতে সুদে আসলে শোধ দিতে চেষ্টা করিব।" ইহাতেই শ্রোতাদের করতালি পড়িল, আর এত ঘন ঘন ভাবে যে—সভাপতি মহাশয়কে শেষে তাহা বন্ধ করিতে হইল। ভাগলপুরের আসে পাশে অনেক বিষয় দেখিবার ও লিখিবার আছে। অধিকাংশ সভ্যেরা এ সমস্ত ক্ষুদ্র বিষয়ে মন দেন না। বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রের বঙ্গ সাহিত্যে কি স্থান ও কেন তাহার সুদীর্ঘ মন্তব্য মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করেন। কি করিলে তাঁহাদের মত লিখিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা—নাই বলিলেই হয়। অনেক গর্জ্জনের পর মধ্যে মধ্যে এক এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় আর গরমে মানুষ মারা যায়। ক্ষেতের কোনই উপকার হয় না। প্রাকৃতিক জগতে দেখি পক্ষীরা আগে বাসা বাঁধে, তবে ডিম পাড়ে। ভাগলপুর সাহিত্য জগতের পক্ষীরা আগে ডিম পাড়ে কিন্তু বাসা বাঁধে না। সেইজন্য বোধ হয় ডিম ফোটে না। তাই বলি এখন হইতে খড় কুটা যোগাড় করা নিতান্ত আবশ্যক। অট্টালিকা নাই বা হইল পর্ণকুটীর অনায়াসে হইতে পারে। তাহাতেই ডিম ফুটিবে।

হিন্দি সাহিত্যে একজন লোকের যে প্রকার উদ্যম দেখিয়াছি তাহা সাহিত্য পরিষদের ভাগলপুর শাখার সমগ্র সভ্যদের নাই। ইনি "শ্রীকমলা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ভাগলপুর হইতে প্রকাশ করিতেছেন। "শ্রীকমলাতে" সাতু-লিটি চুড়া দহির অধিকন্তু ডালপুরি পাঁপরের সুগন্ধ আছে। একজন চৌবে জমিদার, হিন্দি সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য একটি সুন্দর ও স্থায়ী পুস্তকাগার করিয়া দিয়াছেন।

এখানে একটি পাবলিক লাইব্রেরী আছে। বাঙ্গালীরাই তত্ত্বাবধান করেন। লাইব্রেরীর ঘর নাই, কিন্তু দুয়ার একটি আছে। দুই চারিটি আলমারিতে বই আছে। অধিকাংশ পুস্তক কীট এবং চোরে দখল করিয়াছে। এত কষ্টের এতদিনের ধন নষ্ট হইতেছে দেখিলে মনে বড় আঘাত লাগে।

শিক্ষা

শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। স্কুল, পাঠশালা কলেজ, মাকতাব অনেক হইয়াছে। কিন্তু ছেলে মেয়েদের বিশেষ কিছু হইতেছে না। মাষ্টার প্রফেসার, মৌলভী, গুরু মা সব যেন এক ছাঁচে ঢালা কাহারও দাড়ি গোঁফ নাই। অধিকাংশ শিক্ষক ছেলেদের খোঁজ রাখেন না। ছেলেরা কি করে, কি পড়ে, কাহার সঙ্গে মিশে কোথায় বেড়ায়, কি খেলা করে, তাহার খবরই লন না। অনেকে ছেলেদের নাম ধাম পর্য্যন্ত জানেন না। শিক্ষক ছাত্রের সম্বন্ধ যেন উঠিয়া যাইতেছে। শিক্ষকের ভালবাসা নাই। ছাত্রেরও ভক্তি নাই। কলেজে প্রফেসার মহাশয় গড় গড় করিয়া ছাই ভস্ম কত কি উদ্গার করিয়া যান। যদি কোন ছাত্র দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, তবে প্রফেসার মহাশয়ের গম্ভীর মুখমণ্ডলে ক্রোধের রেখা দেখা দেয়। মাষ্টার মহাশয়ের মেজাজ্ অতটা কড়া নয়। তিনি ছেলেদের আবদার মাঝে মাঝে শোনেন। তবে রৌদ্রে জলে ড্রিল করাইয়া তাহাদের দফা রফা করেন। ড্রিল দেখিয়া মনে হয় যে ইহারা পূর্ব্বজন্মে কোন কনেষ্টবলের কি হাবিলদারের প্র-পৌত্র ছিল। এমন ভঙ্গি করিয়া সেলাম করে ও পা ফেলে, দেখিলে মনে হয় যেন শীঘ্র লড়াই করিতে যাইবে কিম্বা ভব নাট্যশালায় রাবণ বধের রিহার্সাল দিবে। 'কাওয়াইৎ' শিখাইবার জন্য সব স্কুল পাঠশালায় যেমন সুবন্দোবস্ত

আছে পড়াটার বিষয়ে কিন্তু সেরূপ নাই। ড্রিল ফুটবল লইয়া প্রায় সমস্ত দিনটা কাটে। পড়া শুনা নাম মাত্র। কোন বিষয়েই কাহারও ব্যুৎপত্তি নাই। বাপ মা যদি জিজ্ঞাসা করেন ছেলের এমন দশা কেন হইতেছে, শিক্ষক অমনি বলিয়া উঠেন, হইবারই ত কথা। ঘরে মাষ্টার না রাখিলে লেখাপড়া হইতেই পারে না। স্কুলে ত কেবল পিতৃশ্রাদ্ধের নূতন আদব কায়দা শেখান হয়।

ছেলেদের ত এই হাল। মেয়েদের কথা এখন কিছু বলি। বেহারী ও বাঙ্গালী মেয়েদের পৃথক পৃথক স্কুল। বেহারী বালিকা-বিদ্যালয়ের কথা বিশেষ অবগত নহি। বাঙ্গালী বালিকারা মোক্ষদা স্কুলে ও মিশ্‌নরী স্কুলে পড়ে। শিক্ষার রীতিনীতি ইংরাজী ছাঁচের। আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের যেন পৃথক অস্তিত্ব নাই। মেয়েরা অযোধ্যার রাম লঙ্কার রাবণ, অশোকবনের সীতা এমন কি নিকটস্থ চম্পানগরের বেহুলার কথা ভাল করিয়া জানেও না শেখেও না। কিন্তু অনেক বাজে লোকের কথা শিখিয়াছে যাহা তাহাদের কখনও কোন উপকারে আসিবে না। ঘরকন্নার হিসাব রাখিতে পারে না কিন্তু লম্বা গুণ ভাগ কষিতে পারে। পূজা পাঠ ও রন্ধনের দিকেই যায় না। ভাল জামা পরিতে পারে, কিন্তু তাহার সেলাই জানে না। গান শুনিতে চায় কিন্তু গাহিতে পারে না। এই সব কাণ্ড দেখিয়া মনে হয় যে প্রকার শিক্ষাতে সাধারণ বালিকার উপকার হইবে তাহার সম্যক উপলব্ধি এখনও আমাদের হয় নাই। আমাদের দেশের সাধারণ বালিকারা ১২।১৩ না হয় ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে পড়ে। তাহার পরে তাহাদের বিবাহ হয়। ইহাদের সময় অল্প। অসাধারণ বালিকারা বি, এ, এম, এ পাশ করেন। অনেকেই বিবাহ করে না। পুরুষদের মত স্বাধীন ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করেন। ইঁহাদের সময় বেশী। কথাটা হচ্চে যে, এই দুই শ্রেণীর বালিকার শিক্ষা একই প্রণালীতে দিলে কি করিয়া চলিবে? কেহ যেন মনে করিবেন না আমি স্ত্রী শিক্ষার বিদ্বেষী। বলা বাহুল্য, আমি ইহার গোঁড়া পক্ষপাতী। সেই জন্য এই ক' ছত্র লিখিলাম। যে দিন মেয়ে মহাভারত রামায়ণ গীতা সুন্দরভাবে পড়িয়া শুনাইবে, যেদিন ব্যবহারযোগ্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবে, যেদিন রুচিকর খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিবে, সে দিন এই জীবনের Red letter day মনে করিব ও স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা বুঝিব।

এছাড়া আরও দুটি নূতন রকমের বিদ্যালয় আছে। তাহার কথাটাও একটু বলা উচিত। একটি নাথ-নগরের পুলিশ ট্রেনিং স্কুল অন্যটি সাবরের কৃষি কলেজ।

নাথ নগরের ট্রেনিং স্কুলে কনেষ্টবল ও হেডকনেষ্টবল প্রস্তুত হয়। যে উপাদান হইতে এই চিজ গঠিত হয় তাহা সচরাচর ভোজপুর ছাপরা ও বালিয়াতে পাওয়া যায়। ছয় মাস শিক্ষার পর যখন রেক্রুটরা ট্রেনিং হইতে অব্যাহতি পায় ও কাযে যায় তখন ইহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও বিক্রম দেখিয়া অনেকেই অস্থির হন ও বলেন "ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি।"

চাষবাস শিখাইবার জন্য সাবরে কৃষি কলেজ হইয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলেরা পাখার নীচে, বেঞ্চির উপর বসিয়া, টেবিলের উপর হাত রাখিয়া প্রফেসারের লেকচার শোনে ও কৃষিকার্য্য শেখে। পাঠ শেষ করিয়া মনের কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে ও চাকুরির চেষ্টায় এ দোর ও দোর ঘুরে ফিরে বেড়ায়। প্রতি বৎসর ১০।১৫ জন ভর্ত্তি হয়। দুই তিন মাস শিক্ষার পর কেহ কেহ বিদায় লয়। সুতরাং কখন কখন শিক্ষকের সংখ্যা ছাত্রের অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে। তখন শিক্ষকেরা দুই হাত তুলিয়া সরকারকে আশীর্ব্বাদ ও গোজাতির গবেষণা করিতে থাকেন। সেই গবেষণার ফলে ভাল দুধ, ঘি ও মাখন প্রস্তুত হইয়া তাঁহাদের পরমায়ু বৃদ্ধি করে।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে ভাগলপুর স্বর্গ নহে। মর্ত্ত্যলোকে যে যে ব্যাধি আছে তাহার সব-

গুলি এখানে দেখা যায়। এসব দেশে প্লেগ ওলাউঠা ও বসন্তরোগের খুব জোর। যখন রোগ চাগে, তখন এক একটি গাঁ উজাড় হইয়া যায়। জ্বরটা যা একটু কম হয় তাই রক্ষা। বাঙ্গালার মত অধিক কোঁ কোঁ করিতে হয় না। ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম অনেক আছেন। দর্শনীর হার বেশী নয়। ২৲ টাকা দিলেই বড় ডাক্তার আসেন, বসেন ও গায়ে হাত বুলান। এমন সুবিধার স্থান নাই বলিলেই হয়। ডাক্তার দেখিলে ত মৃত্যুর হাত হইতে নিস্তার নাই। কিছু আগে না হয় পরে। অতএব যেখানে ধনে-প্রাণে মারা যাইবার সম্ভাবনা কম সেই স্থানটাই ভাল।

বিচার আচার

বিচার আচার উকিল হাকিমের কথা বলিতে ভয় হয়। মোকদ্দমা মাম্‌লা ঢের কমিয়াছে। লম্বা চওড়া ও বড় বড় উকিলেরা গঙ্গাস্নান ও হরিনামে মত্ত। ইঁহাদের সর্ব্বনাশ, হাকিমদের এখন পৌষমাস। দুগণ্ডা ডেপুটি সব ডেপুটির ভিতর ২॥টা ও ১গণ্ডা সদরালা, মুন্সেফের ভিতর ১॥ টাই সব কাজ সাফ করে। বুড়োরা আপিল শোনে আর জাবর কাটে। যুবাগণ ইয়ারকি দেয় ও ক্ষুধা বাড়ায়।

মামলা কমিয়াছে বলিয়া উকিল বাবুদের দল কমে নাই। বংশ বাড়িয়াই যাইতেছে। 'বহশের কোন কমি নাই। সাবেক দস্তুর পুরোপুরি চলিতেছে। গলা খারাপ হইলেও উকিলেরা 'বহশ' ও চীৎকার ছাড়েন না। উপরন্তু যখন নূতন পেথম ধরিয়া বহশের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করেন, তখন হাকিমের অন্তরাত্মা শুষ্ক হয়। বেকুব হাকিমেরা এই ভয়ে 'বহশ' ও নাচের আগেই মনের কথা আতঙ্কে বলিয়া ফেলেন। বুদ্ধিমানেরা 'বহশ' শুনিবার ভান করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন ও সেই সুযোগে নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহাদের স্কন্ধে চাপে। পরে যখন সব কথা ভুলিয়া যান, তখন রায় প্রকাশ করেন আর উকিল মহলে বাহবা পড়িয়া যায়।

মুখের জোরের কথাটাই বলি। এক ডেপুটি ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়া সপরিবারে তথায় উপস্থিত। কিছুদিন বাসের পর তথাকার মুন্সেফের কুটীরে পদার্পণ করিলেন। মুন্সেফ বাবু ডেপুটি বাবুর এই ভীষণ অনুকম্পায় বড়ই আপ্যায়িত হইয়া বলিলেন "আমার সৌভাগ্য যে আপনার মত মহাশয়ের পদধূলি আমার গৃহে পড়িল।" দুজনে বেশ কথাবার্ত্তা চলিল। কিছুক্ষণ পরে মুন্সেফ বাবু বলিলেন, "এ দেশে ম্যালেরিয়ার বড়ই প্রকোপ। আপনি মধ্যে মধ্যে দুই এক গ্রেণ কুইনাইন খাইবেন।" ডেপুটি সাহেব বলিলেন, "আমাকে কুইনাইন খাইতে হইবে না, আমি ইউরোপীয়ান ষ্টাইলে থাকি। আমার কাছে ম্যালেরিয়া আসিতে পারে না" দুই তিন মাস বাসের পর একদিন সত্য সত্যই ডেপুটি সাহেবের ঘরে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিল। মুন্সেফ বাবু খবর পাইয়া ডেপুটি সাহেবের বাংলায় উপস্থিত। দেখেন, সাহেব, মেম, বাবালোক সকলেই শয্যায় জ্বরে ছট্ ফট্ করিতেছেন। কিন্তু মুখের জোর কাহারও কমে নাই। ডেপুটি সাহেব বলিলেন, "এইবার সারিয়া উঠিলে দেখিব ম্যালেরিয়া কেমন করিয়া এ মহকুমায় আসিতে পারে।" বেকুব মুন্সেফ বাবু মনে করিলেন সাহেব জ্বরের ধমকে প্রলাপ বকিতেছেন। মস্তকে বরফ দিবার ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

হকিয়তের হাকিমেরা পূর্ব্বে বড় বেশী কথা কহিতেন না। বোধ হইত যেন নির্জ্জীব ও নিশ্চল। জোরে পা ফেলিতেন না, পাছে জুতা ছেঁড়ে। জোরে কথা কহিতেন না পাছে ক্ষুধা বাড়ে। বসিয়া বসিয়া নজির ঘাঁটিয়া রায় কিন্তু অকাট্য লিখিতেন। প্রিভি কাউন্সিলিরাও দন্তস্ফুট করিতে পারিতেন না। এখন ইহাঁদের কেহ কেহ ঘটিরামের উপর যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি একজন সদরালাকে জানিতাম। তিনি কখন কোন রকম ব্যায়াম করিতেন না। তিনি বলিতেন রায় লেখা ও নজির ঘাঁটার মত 'হোলসম একসারসাইজ' আর দ্বিতীয় নাই। ইহাতেই যা, খিদে

হয় তাহার অন্ন মেলা ভার। Economics ও Hygiens এ হকিয়তী হাকিমদের এককালে একচেটে দখল ছিল!

ব্যবসা বাণিজ্য

এক সময়ে এই জেলায় নীলের চাষ হইত। এখন সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। ভূমিজ নীলের দর্প বিজ্ঞানের হস্তে চূর্ণ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক নীলে বাজার পূর্ণ। নীলকরের বংশধরেরা এখন জমিদারী ও মহাজনী করিতেছেন।

নীলকরের প্রতিপত্তি বুঝিতে হইলে এখানকার ঘোড়দৌড়ের মাঠ দেখা আবশ্যক। মাঠটি যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। ঠিক যেন গড়ের মাঠ। শুনিয়াছি নীলকরের টাকাকড়ির দৌড় এই মাঠের মত ছিল। কালের কি কুটিল গতি! যেখানে একদিন শত শত শ্বেতাঙ্গ নীলকর হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে বিহার করিতেন এখন সেখানে সহস্র সহস্র গো মহিষ বিচরণ করিতেছে আর তাহাদের পার্শ্বে কৃষ্ণকায় বাবুরা পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও ভক্ষণ করিতেছেন। বায়ু সেবনের স্থান এ সহরে কম। ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছাড়া আর দুইটি মাঠ আছে। স্যাণ্ডিস কম্পাউণ্ড ও করণগড়। স্যাণ্ডিস কম্পাউণ্ডে প্রবেশ নিষেধ ও গড় কনেষ্টেবলদের হাতে। এত বড় সহরে পার্ক না থাকায় আমাকে রাস্তায় রাস্তায় টো টো করিয়া ফিরিতে ও ধূলা খাইতে হয়। মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স মাসে মাসে ৩৷৹ টাকা করিয়া দিয়া থাকি কিন্তু তাহার বদলে কিছুই পাই না। একজন বিজ্ঞ উকীল ভরসা দিয়াছেন যে খেসারতের নালিশ চলিবে। নীলকরের অবনতির পর ব্যবসা বাণিজ্যে মারওয়ারীরা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। বেহারী ও বাঙ্গালী পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। যথা অন্যত্র, তথা অত্র।

লোক

এ দেশের লোকের বিশেষতঃ লালা বাবুদের কথা বলা বড় শক্ত। এঁরা না রাম না রহিম। কি যে বোঝা ভার। কালাপেড়ে ধুতিও পরেন টিকিও রাখেন। গঙ্গাস্নানও করেন ও এক বিছানায় বসিয়া বাইজীর সহিত পান ও তামাক খান। খড়ম পায়ে সন্তর্পণে 'চৌকার' ভিতর ব্রাহ্মণ প্রস্তুত ডাল ভাত উদরস্থ করেন কিন্তু 'কাহার' প্রস্তুত পুরি মাংসের যেথায় সেথায় বসিয়া শ্রাদ্ধ করেন। অধিকাংশ লোক এক বেলা ছাতু এক বেলা ভাত খান আর না হিন্দি না বাঙ্গালা বুলি বলেন। জল হাওয়ার গুণেই হউক কিম্বা অন্য কোন কারণে এখানে অধিকদিন থাকিলে বেহারী বাঙ্গালী হন, বাঙ্গালী বেহারী হন। উন্নত বেহারীরা বাঙ্গালীর মত খাওয়া, পরা, শোয়া, বসা ও কুস্তি করেন। অনেক বাঙ্গালী বিশেষতঃ উত্তররাঢ়ী কায়স্থ বেহারীর চালে চলেন। তাঁহাদের অশন, বসন, রীতি, নীতি আচার, ব্যবহার সমস্ত এদেশের মত। পায়ে নাগরা জুতা, গায়ে মিরজাই, কোমরে মালকোচা বিশিষ্ট ধুতি ও মাথায় পাগ্‌ড়ী। ভক্ষণ ছাতু, বচন ভাঙ্গা হিন্দি, শয়ন খাটিয়ায়। একেবারে হুবহু খোট্টা। বাঙ্গালী যেমন উন্নত হইলে সাহেবের অনুকরণ করেন, বেহারীও তদ্রূপ বাঙ্গালীর অনুকরণ করেন। কেহ কেহ সেইজন্য বলেন বাঙ্গালী বড় বুদ্ধিমান। স্বদেশে ছিলেন বটে, কিন্তু বেহারে থাকিয়া বাঙ্গালীর বুদ্ধি হ্রাস হইয়াছে। কারণ রাহু তাহার অর্দ্ধেক গ্রাস করিয়াছে।

বড় দুঃখের বিষয় যে বেহারী বাঙ্গালী এ দুই জনের ভিতর এখন বিশেষ সদ্ভাব নাই। পূর্ব্বে বিবাহ ও আমোদ প্রমোদে ইঁহাদের প্রীতিভোজন ও মিলন হইত। এখন তাহা উঠিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী মনে করেন তিনি বড়। বেহারী বলেন "কিসে বড়! আমার দেশ, আমার কড়ি, বাঙ্গালী কেন বড় হইবে?" বাঙ্গালী মুখে দড় তাই উত্তর করেন "তোমার গ্রহ ও বুদ্ধির দোষে।" এ হীনতা বেকুবের কথা।

বেহারী বাঙ্গালীকে যেমন বুঝিয়াছেন, বাঙ্গালী বেহারীকে তেমন বুঝেন নাই। কারণ এখন শতকরা নিরানব্বইজন বেহারী মৎস্য ভক্ষণ করিতেছেন। আর

শতকরা নিরানব্বই জন বাঙ্গালী মাছ ছাড়িয়াছেন। মাছেই ত বুদ্ধি! এত আদর যে দুই আনা হইতে এক টাকা মাছের সের হইয়াছে। ফলে বেহারীর বুদ্ধি বাড়িতেছে ও বাঙ্গালীর বুদ্ধি কমিতেছে। আত্ম-সম্মান বেহারী যেমন রাখিতে জানেন, বাঙ্গালী তেমন জানেন না। বেহারী রাজপুত নাম সই করেন "বাবু মেদিনীপ্রসাদ সিংহ।" বাঙ্গালী ক্ষত্রিয় নাম সই করেন "ভবনাথ রায়।" পরের কাছে ভিক্ষা করিবার পক্ষে নিজের উপর নির্ভর করা ভাল। বাহুবলে, বুদ্ধিবলে ও আত্মসম্মানে বেহারী এখন বাঙ্গালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে আর কেন আশঙ্কা?

বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ কেহ এখনও বলেন, "মাছ খাওয়া যেমন সোজা, ধরা তেমন সোজা নয়। তাই যা ভরসা।" ইলিস মাছে 'ফস্‌ফরস্‌' বেশী। ফস্‌ফরস্‌ মস্তিষ্কের খাদ্য। এই মাছ ধরিবার জন্য বেহারীকে বাঙ্গালীর দ্বারস্থ হইতে হয়। রাজমহল ও ধুলিয়ানের বাঙ্গালী জেলেরা আসিয়া এদেশে গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরে তবে বেহারীরা খাইতে পান। এই সামান্য মাছ ধরার দোহাই দিয়া কোন কোন অদুরদর্শী ব্যক্তি সন্দেহ করেন যে আরও কিছুদিন বেহারীকে বাঙ্গালীর উপর নির্ভর করিতে হইবে। আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। মাছ ধরিবার জন্য বেহারীকে এত চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি যে তাহার ফল শীঘ্রই ফলিবে। একজন বাঙ্গালী ও একজন বেহারী এক পুষ্করিণীতে মৎস্য শিকারে যান। বাঙ্গালী বাবু অল্পক্ষণের মধ্যে অনেক মৎস্য ধরেন। বেহারী বাবু ছিপ্‌ লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া একটিও মাছ ধরিতে পারেন না। অবশেষে পুষ্করিণীতে ২০।২৫টা মহিষ নাবাইয়া দেন। মহিষের পৃষ্ঠে লোক চড়িল ও বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। মার খাইয়া মহিষেরা জল তলাতল করিল। আর ভয়ে মাছ উর্দ্ধে লাফাইতে লাগিল। তখন বন্দুক আনিয়া বেহারী বাবু দুই একটি শিকার করেন। একেই বলে যথার্থ শিকার।

তাই বাঙ্গালী, তুমি বাহুবল হারাইয়া বেহারে আসিয়াছ। এখানে আসিয়া বুদ্ধিবল হারাইতে বসিয়াছ। আছে তোমার সম্বল দর্প। অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অন্য পরে কা কথা। সেই জন্য বলি বেহারীকে তুচ্ছ করিও না, বেহারী এখন দৈববলে বলী।

ভাই বেহারী, তুমি এখনও ভাই, বন্ধু, অতিথিকে অন্ন দাও, সংসারের সকলকে লইয়া একত্রে বাস কর। বাঙ্গালীর মত নিজের স্ত্রী পুত্র লইয়া থাক না। বাঙ্গালী তোমার ভ্রাতা ও অতিথি। অতিথির দোষ ধরিতে নাই।

যদি বেহারী বাঙ্গালী স্ব স্ব অবস্থা স্মরণ রাখিয়া চলেন তবে কোন গোল না হইলেও হইতে পারে। ভগবানই জানেন ভবিষ্যতে কি হইবে। তবে উত্তমের অভ্যুত্থান অধমের পতন অনিবার্য্য।

সভাসমিতি

এখানে সভা সমিতি বড় কম নাই। সাহেবদের, বেহারিদের, বাঙ্গালীদের পৃথক পৃথক ক্লাব আছে। বেহার ল্যাণ্ড হোল্ডারস্‌ এসোসিয়েশন ও মস্‌লেম লীগের শাখা আছে। 'ক্লাবে' প্রত্যহ লোক যায় ও বৈঠক হয়। 'এসোসিয়েশন' ও 'লীগের' কায হয় যখন কোন সমস্যা উঠে। সাহেব ও বেহারী ক্লাবে নিঃশব্দে খেলা-ধূলা, আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। বাঙ্গালী ক্লাবে তাহা হইবার যো নাই। এই ক্লাবটার নাম ভাগলপুর 'ইনিষ্টিটিউট'। ইহার সভ্য উকিল, হাকিম, প্রফেসার ও অন্যান্য গণ্যমান্য লোক। আসরটা কিন্তু উকিল ও হাকিমদের হাতে। পূর্ব্বে ইহাতে বেহারীরা যোগ দিতেন। এখনও দু' একজন বাঙ্গালীপ্রিয় বেহারী সভ্য আছেন। তবে শীঘ্রই ইহা খাঁটি 'ডোমিসাইল্ড' বাঙ্গালীর আড্ডা হইবে এরূপ আশা করা যায়। বেহারীরা এক স্বতন্ত্র ক্লাব খুলিয়াছেন, ইহাতে 'ইন্‌ষ্টিটিউটের' ও বাঙ্গালীর কিছু ক্ষতি হইয়াছে। যে দেশে আমরা বাস করিতেছি, যাহার অন্ন ধ্বংস করিতেছি, যাহার পয়সাতে নবাবী করিতেছি, সেই দেশের লোকদিগকে দূরে রাখিতেছি। তাহাদের আচার, ব্যবহার, সাহিত্য, ধর্ম্ম

কিছুই শিখিতেছি না। মধ্যে মধ্যে আমরা বিদেশীদের সম্পর্কে এই সব মন্তব্য প্রকাশ করি ও আস্ফালন করিয়া বেড়াই। 'ইনিষ্টিটিউট' গৃহে বিলিয়ার্ড, টেনিস্, দাবা পাশা ও তাস খেলা হয়। চা, লেমনেড, সোডা ও শাদা জলের ব্যবস্থা আছে। কেবল নাই বন্দোবস্ত হুইস্কির। তার বদলে চুরুট, সিগারেট ও কড়া তামাক পাওয়া যায়। এখানে বৃদ্ধেরা বড় কল্কে পান না। এটি সহরের যত বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও উন্নত যুবাদের মজ্লিস বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এখানে আসিবার ২।৩ দিন পরেই এক বন্ধু আমাকে 'ইনষ্টিটিউট' দেখাইতে লইয়া গেলেন। যাইবামাত্রই চাঁদার বই আমার সম্মুখে আসিল। দেখিলাম অনেকের চাঁদা 'ইনিষ্টিটিউটের' জন্মাবধি বাকি পড়িয়া আছে তবুও নামটি আছে। ভাবিলাম সই করিয়া রাখি। দেওয়া না দেওয়া ত আমার হাত।

এই ইনিষ্টিটিউটে জগতের সমস্ত শুভ অশুভ বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। কেহ ইংরাজীতে, কেহ সংস্কৃতে, কেহ বাঙ্গালাতে এবং অধিকাংশ সভ্য দু' তিন ভাষা মিলাইয়া বুকনি ঝাড়েন। সময়টা জলের মত কেটে যায়। যাহার কিছু কায নাই, তাহার বড়ই সুবিধা। এখানে অনেকক্ষণ বসিলে ও কথা কহিলে পেটের গোলমাল ও ডিস্পেপ্সিয়া থাকে না। ক্ষুধা বাড়ে ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।

ইনিষ্টিটিউটের কর্ত্তৃত্ব তিনজন লোকের হাতে। আচার ব্যবহারে যতদূর বোঝা যায়। স্কুল টুল পড়িয়া বলিতেছি না। তিনজনের মধ্যে একজন ৭॥০ ফুট, একজন ৫॥০ ফুট ও একজন ৪॥০ ফুট। একজন শ্যাম, একজন উজ্জ্বল শ্যাম ও একজন গৌর। শ্যামের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। মুখে সদাই বাঁশী। উজ্জ্বল শ্যাম ও গৌরের মুখে সদাই হাসি মিষ্ট কি কাষ্ঠ—বলিতে পারি না। যখন কোন তর্ক উপস্থিত হয় তখন শ্যামের বংশীবাদনে ও কণ্ঠের স্বরে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হন। এই তিনজন মেম্বরকে আমি বড় ভয় করি। ঠিক কথা বলিতে গেলে 'ইনিষ্টিটিউট' গৃহে অভিনন্দন ও বিদায় উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে জলযোগ হয়। এসব কাজে যোগদান করিতে আমার আলস্য ও ভুল হয় না। তবে প্রত্যহ যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। একজন হাকিমের পদোন্নতি ও স্থানান্তর উপলক্ষে 'ফেয়ার ওয়েল' দেওয়া হয়। পয়সা খরচ কার জানিতে ইচ্ছা হইল। উকিল ভায়ারা বলিলেন "হাকিমের:নশ্বর অসংখ্য। বদলি লাগিয়াই আছে। সুতরাং আমরা এক পয়সা দেই নাই।" হাকিমের দুই এক ভ্রাতা বলিলেন "আমরা দিয়াছি।" এত ভালবাসার কথাটা সহজে বিশ্বাস হইল না। অনেক চিন্তা করিয়া ঠিক করিলাম হাকিম বাবু লোক বড়ই ভাল। কারণ এ বিদায় কেউ তাঁহাকে দেয় নাই। তিনি নিজেই পয়সা খরচ করিয়া বিদায় লইলেন, এই মাত্র।

সঙ্গীতের একটু চর্চ্চা ভাগলপুরে হয়। একটি সঙ্গীত সমাজও আছে ১১।১২ বৎসরের একটি বাঙ্গালী মেয়ে অনেক কালওয়াতের উপর যায়। ইনিষ্টিটিউটে ও সঙ্গীত সমাজে মধ্যে মধ্যে গান হয়। একজন মেম্বর দিগ্গজ গায়ক। তাঁর নাম দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়াছে। 'ইনিষ্টিটিউটে' এর কিন্তু কদর কম। খেয়াল ধ্রুপদ যখন ধরেন তখন মেম্বররা বেগে পলায়ন করেন।

বাঙ্গালী বেহারী মিলিয়া একটি 'বাহাদুরি সমিতি' করিয়াছেন। সভ্যের সংখ্যা আপাততঃ তিন। এক একজন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পৃথক পৃথক অবতার। শূন্যে ইহাঁদের মিটিং হয়। জগতের সমস্ত শুভ অশুভ কর্ম্মে যখন চাঁদা সংগ্রহ করিবার আবশ্যক হয়, তখন অবতারেরা ব্যোমযানে শূন্য হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করেন। এই ত্রিমূর্ত্তি যখন চাঁদার চেষ্টায় লোকালয়ে প্রবেশ করেন, তখন মানুষের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ছলে, বলে, কলে, কৌশলে কায সারিয়া অবতারেরা নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হন। পরে লোকে হায় হায় করিতে থাকে আর স্বর্গে ইহাঁদের 'বাহাদুরির' জন্য দুন্দুভি বাজে। মর্ত্ত্যের অনেক লোকে তাহা শুনিয়াছে।

স্ত্রীলোকদের এখানে একটি সমিতি আছে। ইহাতে

বেহারী স্ত্রীলোক যোগ দেন না। সমিতির মিটিং ও সিটিং প্রত্যহ হয় না। মাসে দুবার—শনিবারে শনিবারে। স্ত্রীলোকেরা পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, পুত্র বাৎসল্য ও পতি-সেবায় এখনও জলাঞ্জলি দেন নাই। তাই মিটিং এত পরে পরে হয়। যখন বঙ্গ-ললনা প্রত্যহ মিটিং করিবেন তখন আমাদের দফা রফা হইবে। একের অভ্যুন্নতির অর্থ অন্যের অবনতি ও সর্ব্বনাশ। স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব অনেক দিনের। গিন্নী বলেন আমি বড়। কর্ত্তা বলেন আমি বড়। কে যে বড় ঠিক করা ভার। বোধ হয় দুইজনেই বড়, যদি সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে পারেন। সমিতিতে স্ত্রীলোকেরা সঙ্গীত, প্রবন্ধপাঠ ও স্ত্রী জাতির উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করেন। গিন্নীরা যখন গান ও বক্তৃতা করিয়া ঘরে ফেরেন, তখন কর্ত্তাদের বুক দশ হাত হয় ও তুচ্ছ উদরের চিন্তা থাকে না। কারণ অবলার মুখের বলের কাছে কোন কিছুই খাড়া থাকিতে পারে না। সমিতির কোন কোন মহিলার লেখা আমার চক্ষুগোচর হইয়াছে, তাহাতে নয়ন সার্থক হইয়াছে। কাহার কাহারও সঙ্গীতের প্রশংসা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার ধ্বনি এখনও এ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। যদি এই মহিলা সমিতি মোক্ষদা বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করেন, তাহা হইলে পুরুষের অবিচার হইতে কোমলমতি বালিকারা রক্ষা পায়। বালিকার ভার মহিলার উপর দিলেই ঠিক হয়। স্ত্রীলোকে নারী চরিত্র যেমন বোঝেন, পুরুষে তেমন পারেন না। তাহার একটি সামান্য উদাহরণ দিব।

এদেশে বেহুলা পূজায় স্কুলের ছেলেরা Half holiday পায়। মোক্ষদা বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েরা কিন্তু এক ঘণ্টারও ছুটি পায় না। এ সমস্ত পূজা ও ব্রতে মেয়েদের স্থান প্রথম। নির্ম্মম পুরুষেরা তাহা কৈ বোঝেন ?

পরিশেষে বক্তব্য, এই নক্সাতে ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্যের অবমাননা না করিবারই চেষ্টা করিয়াছি। মাঝে মাঝে রঙ ফলাইয়াছি মাত্র। সহৃদয় ও রসজ্ঞ ব্যক্তিই একথা বুঝিবেন, আশা করি। অজ্ঞাতসারে যদি কাহারও অন্তঃস্থলের কোন কোণে আঘাত দিয়া থাকি, তাহার জন্য করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করি। ইতি

শ্রীবিজ্ঞচঞ্চু।

সুখীর দুঃখ

(সাদী)

কত মাস গেল, নাহি বরিষণ, জল নাই—জল নাই !
ভবনে ভবনে শুধু হাহাকার, ক্রন্দন সব ঠাঁই।
শস্যের ক্ষেতে তৃণলেশহীন, বৃক্ষে নাহিক ফল,
পত্রবিহীন তরুশাখারাজি শুষ্ক ধরণীতল ;
প্রেমিকের বুকে শুকাইল প্রেম,উৎসে সলিল ধারা,—
নাহি কোথা আর এক ফোটা জল অশ্রুর জল ছাড়া !
হেরি একদিন মহা ধনবান প্রিয় বন্ধুরে মম,
কঙ্কালসার অঙ্গ তাহার শীর্ণ ভিখারী সম,—
বিস্ময়ভরে নেহারি' তাহাই শুধানু তাহারে ডাকি,'—
'কিসের অভাব দিয়াছে ও দেহে দৈন্যের রেখা আঁকি ?'
কহিল বন্ধু—'অন্ধ কি তুমি ? দেখিছ না আজি চেয়ে
অভাবের কালো কুজ্ঝটিকায় দেশ যে গিয়াছে ছেয়ে ?
স্বর্গ দুয়ার রুদ্ধ আজিকে—ফিরে আসে হাহাকার,
স্নেহকরুণার নির্ঝরস্রোতে নামে নাক বারিধার।"
কহিনু আবার—'কি তাহে তোমার বৈভবে অবগাহি ?'
বিষের প্রভাব বিষময় শুধু ঔষধ যেথা নাহি।'
নয়নে হানিয়া ক্রোধের ভ্রূকুটি, তীব্র ঘৃণার স্বরে,
কহিল বন্ধু দৃপ্ত ভাষায়—'কেমনে বোঝাব তোরে ?
আশ্রয়হারা স্বজন যখন মগ্ন অগাধ নীরে,
স্থাণুর মতন কোন দুর্ভাগা নীরব রহে গো তীরে ?
ঢাকিনি এ আঁখি নিজ দুঃখের হীন গুণ্ঠন দিয়া,
শত দুঃখীর মর্ম্মব্যথায় দীর্ণ আমার হিয়া ;
কঙ্কাল সম শীর্ণ এ তনু আপন দুঃখে নহে,—
পরের লাগিয়া এ ব্যথা, অশ্রু পরের লাগিয়া বহে।'

শ্রীপরিমল কুমার ঘোষ।

'সমালোচনা'র সমালোচনা

আজকালকার বাংলা 'মাসিক'-রাজ্যে সমালোচনার যে তুমুল আন্দোলন সাড়া দিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্যে লেখনী-প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা মনে পড়ে। আশা হয়, তাহার মত এ আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্যে Renaissance এর আবির্ভাব-সূচক সানন্দ কোলাহল। আর আশা হয়, এ আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে আমার জীর্ণ কুটীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেই প্রতিভার বাংলা ব্যাপী বিকাশের অপেক্ষা করিবার সময় এক আধটা অর্থশূন্য চাৎকার করিলে তাহা বড় কর্কশ শুনাইবে না। তাই এ অনর্থক উৎপাত!

আজকাল বাংলা সাহিত্য যে উদ্দামগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে যে সমালোচনার সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন, তাহা অনুভব করিয়াই শ্রীযুক্ত মহীতোষকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র আষাঢ়ের সংখ্যায় সাধারণ সমালোচনার কতগুলি দোষ ও সমালোচনার প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কয়েকটি মতের সহিত আমার মতের ঐক্য বজায় রাখিতে না পারায় দুঃখিত হইয়াই কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রার্থনা—তিনি যেন এই অপ্রত্যাশিত 'ঘাড়ে রোঁ' দেখিয়া বিরক্ত না হন।

মহীতোষ বাবুর প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হইল, তাঁহার 'গোড়াতেই গলদ' রহিয়া গিয়াছে। তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন, "কেহ যেন মনে না করেন, আমি একটি বাঁধা-ধরা Canon of art অথবা সাহিত্যের সাধারণ ধর্ম্ম মানিয়া লইয়া বলিতেছি।" কিন্তু তাঁহার এই প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি তাঁহার প্রবন্ধের দেহে Canon of art এর যে সুস্পষ্ট ছাপ মারিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রতি অন্ধ হইতে পারিলাম না। প্রবন্ধটির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক নিয়মাবলী সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তিনি যে "সঙ্কীর্ণতা" হইতে সমালোচকদিগকে সাবধান থাকিতে বলিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার Canon এর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইলে সমালোচকের পক্ষে সে সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইবার কোন উপায় থাকিতে পারে, আমি বিশ্বাস করি না। আমরা তাঁহার এককালীন সঙ্কীর্ণতার বিপক্ষ ও সপক্ষ পোষণের বহু দৃষ্টান্ত পাইব।

তাঁহার সঙ্কীর্ণতার প্রথম আভাস পাইয়াছি, যখন তিনি সমালোচনাকে শুধু 'বিচার' অর্থেই বুঝিয়াছেন। সমালোচনার যে আর একটা অর্থ থাকিতে পারে, এবং জগতে সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেই সর্ব্বসম্মত রহিয়াছে—যাহাকে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'দিব-বিবৃতি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহা তিনি আদৌ মানিতে চাহেন নাই। এই জন্যই যখন তিনি প্রথমে লিখিলেন, বাঙ্গালী সমালোচক "মনে করেন, সমালোচনার অর্থ দোষ প্রদর্শন" এবং তৎপরক্ষণেই ইউরোপের Romantic criticism এর কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "বাংলা সাহিত্যে ও ঈদৃশ সমালোচনার অভাব আছে তাহা নহে" তখনই তাঁহার সমালোচনার পরিষ্কার জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছি। এই দুই প্রকারের সমালোচনাই যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী তাহা তিনি কেন স্বীকার করেন না বুঝিতে পারি না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমালোচনার যে অংশ 'দিব-বিবৃতি' নামে আখ্যাত হইয়াছে, তাহা অনেকেই দুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন; তাই 'বঙ্কিম-ডালনা' 'বঙ্কিম দমে'র উপর আমোদর শর্ম্মার "বঙ্কিম-চর্চ্চরী"র অত তীব্র পরিহাস; তাই বীরবল প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের দল বিদ্বেষ-কটাক্ষে এত জর্জ্জরিত। কিন্তু জগতের সাহিত্যের 'রেজিষ্টারে' যে এরূপ কত সমালোচনার স্থান হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে তাহার কি কোন কারণ নাই, তাহার সপক্ষে কি কোন যুক্তি নাই? একটা চিরপ্রথিত নিয়মের, একটা মনোবিজ্ঞানের সূত্রের বিপক্ষে এরূপ অন্যায় যুদ্ধ কি অবিমৃষ্যকারিতার নিদর্শন

নহে? লেখক বলেন, "প্রকৃত সমালোচক এই দুই প্রকার দোষই পরিহার করিতে চেষ্টা করিবেন।" আমার মতে 'প্রকৃত' শব্দটির বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তিনি নিজেই একস্থানে বলিয়াছেন, "শিব গড়িতে গিয়া বাঁদর গড়া অবশ্য দোষের, কিন্তু বাঁদর গড়াই যাঁহার উদ্দেশ্য, তিনি শিব কেন গড়েন নাই, ইহা লইয়া কলহ করা বৃথা সময়ক্ষেপ মাত্র।" আমিও তাঁহার এই মতের উপর ভার দিয়া বলি, যিনি দিব-বিবৃতি করিতে বসিয়াছেন, তিনি শুধু সেইরূপই করিবেন এবং তাঁহার সমালোচনাও সেই দিক্ হইতেই বিচার্য্য। কাব্যের বেলায় যদি তাঁহার কথা মানিতে হয়, তাহা হইলে সমালোচনার বেলায় তাহা কেন স্বীকার্য্য হইবে না?

লেখক তৎপরে সমালোচনার সঙ্কীর্ণতা কত প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহারই একটি তালিকা এবং তাহাদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশিত পাঁচটি দোষের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থকে তিনি যেভাবে দোষ বলিয়া মনে করিয়াছেন, আমি তাহা স্বীকার করিতে পারি নাই। এক্ষণে আমরা এই তিনটি দোষ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(ক) তিনি 'সংস্কারানুবর্ত্তিতা' দোষকে একটু অত্যধিক তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু এই আক্রমণে আমি কেবল ন্যায়শাস্ত্রের উপর অত্যাচারই দেখিতে পাইয়াছি। লেখক এই দোষের দুইটি রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। (১) সাধারণ সংস্কার "যেমন, দেবাসুর যুদ্ধে দেবতাদেরই চিরকাল জয় হইবে; এই সংস্কার; রাম ও রাক্ষসদের যুদ্ধে রামের সর্ব্ববিষয়ে মহানুভবতা এবং রাক্ষসদের হীনতা প্রভৃতি", এবং (২) সাহিত্যের মধ্যে কেবলই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনুসন্ধান। প্রথম রূপের দোষ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া তিনি লক্ষ্মণ-চরিত হীন বলিয়া মেঘনাদবধকাব্য নিম্নশ্রেণীর এবং সিরাজের চরিত্র অনৈতিহাসিক বলিয়া 'পলাশীর যুদ্ধ' কবিত্বহীন স্বীকার করেন নাই;—"কেননা সাহিত্য সাহিত্য, তাহা ইতিহাস নহে"। তিনি ব্যাকরণ-দুষ্ট সমালোচনাকেও এইরূপে রক্ষা করিতে পারেন,—কেননা সমালোচনা সমালোচনা, তাহা সাহিত্য নহে। স্বীকার করি, যুক্তিই সমালোচনার প্রধান অঙ্গ, কিন্তু তাই বলিয়া যেরূপ উহা ব্যাকরণের প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ ঐতিহাসিক সাহিত্যও কবিত্বের পরাকাষ্ঠা হইলেও ইতিহাসিকে মানিতে বাধ্য। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ঔরঙ্গজেবকে বিচক্ষণ কূটবুদ্ধিশালী না করিয়া সত্যসন্ধ ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির করিলে আমরা তাঁহার লেখনী-চাতুর্য্যের প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারিতাম না। কারণ, ইতিহাসের সামান্য আদ্‌ড়ার (outlines) উপরেই কিরূপে রং ফলাইয়া ও পূরণ করিয়া চিত্রকে জাজ্বল্যমান করা হইয়াছে, ঐতিহাসিক সাহিত্যে তাহাই দেখিতে হইবে। এই জন্যই মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনার সময় আমরা বলিব, "ইহার ভাষা সুন্দর, ভাব সুন্দর, ইত্যাদি; কিন্তু লক্ষ্মণের চরিত্র ঐতিহাসিক সত্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বলিয়া কাব্য কলুষিত হইয়াছে।' সত্যের অপলাপ করিয়া আমরা দোষকে গুণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

দ্বিতীয় রূপটির লেখক যাহা সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার Logic আমি কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারি নাই। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, "যে খসড়া কবির সম্মুখে থাকে, তাহা হয় তো সময়ে সময়ে কোন নৈতিক তত্ত্বও হইতে পারে" কিন্তু আবার, "সমালোচক ইহাঁদের রচনার মধ্য হইতে যে দার্শনিক তত্ত্বটি বাহির করেন, রচনার সময় ইহা যে তাঁহাদের মনের সম্মুখে সেইভাবে ছিল, তাহা নহে।" তারপরই ঝাঁ করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, "অতএব অতিরিক্ত মাত্রায় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কবিতায় খুঁজিতে যাওয়া শ্রেষ্ঠ সমালোচনার লক্ষণ নহে।" ইহা হইতে এই বুঝিলাম,—কবি যে "অস্ফুট, অনির্দ্দিষ্ট ভাবের ক্ষীণ চিত্র" লইয়া তাঁহার কাব্য আরম্ভ করেন, সমালোচনা শুধু তাহাই প্রকাশ করিবে। কিন্তু তিনি নিজেই প্রবন্ধের গোড়ায় লিখিয়াছেন, কবি তাঁহার ভাবকে "কিছুতেই পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারেন না।...... সমালোচক আপনার গভীর সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির ফলে লেখকের হৃদয়ের

এই ভাবকে উপলব্ধি করিয়া পাঠকের সমক্ষে ধরিবার চেষ্টা করেন। ইহা ভিন্ন লেখকের প্রাণের অনেক কথা যাহা হয় তো লেখকেরও অলক্ষ্যে তাঁহার রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে, সমালোচক তাহাকেও ব্যক্ত করেন।" তাঁহার কোন্ মতটি গ্রহণ করিব, তিনি অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিবেন কি? বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দ্রৌপদী-চরিত্রের সমালোচনায় যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার জন্য লেখক এই "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র পৃষ্ঠাতেই বঙ্কিমচন্দ্রকে গালি দিতে প্রস্তুত আছেন কি?

এখানেও সেই একগুঁয়ে সমালোচনা—সেই সঙ্কীর্ণতা, যাহার নামে লেখক বারংবার শিহরিয়া উঠিয়াছেন, সেই দিব-বিবৃতির বিরুদ্ধে হাস্যাস্পদ যুদ্ধঘোষণা। তিনি বলেন, "মিল্টন যেখানেই তত্ত্ব প্রচার করিতে গিয়াছেন, Paradise Lost এর সেখানেই কাব্যের ক্ষতি হইয়াছে।" তিনি কি কাব্যকে শুধু অলঙ্কার শোভিত, স্বর-তান-লয় সংযুক্ত একটা নিরর্থক বাণী বলিয়া মানিয়া থাকেন? বটুকবাবুর মত "সাহিত্যে সংসার মুকুরিত হইতেছে—সাহিত্যে বহুতর জীবনের সমস্যার অল্পবিস্তর সমাধান হইতেছে" *—তাহা কি এইরূপ কতগুলি অর্থশূন্য শব্দ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতে পারে?

(খ) তারপর তাঁহার নৈতিকতা দোষ। তিনি এই দোষের বিচার করিতে গিয়া প্রথমে বলিয়াছিলেন, "আর্টের মূল্য শুধু moralityর দিক্ দিয়াই বিচার্য্য নহে।" কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি এই "শুধু" কথাটি একেবারেই ভুলিয়া দিয়াছেন, যেন নৈতিক বাধ্যতার মধ্যে কাব্য কোনপ্রকারেই আসিতে পারে না। তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বিদ্যাপতিকে উল্লেখ করিয়াছেন। রুচির দিক হইতে বিচার করিলে বিদ্যাপতিকে নাকি পরিবর্জ্জন করিতে হয়।" আমার বিশ্বাস, যাঁহার কামপ্রবৃত্তি দমন করিবার শক্তি নাই, তাঁহার ভ্রমেও বিদ্যাপতি পাঠ করা উচিত নহে। কারণ, উহা তাঁহাদিগের নিকট অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। সুতরাং আমাকে যদি কেহ বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করেন, আমি অসঙ্কোচে বলিব, 'বিদ্যাপতি সাধারণের অপাঠ্য।' কিন্তু তথাপি যে বিদ্যাপতির আদর কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই তাহার কারণ, বিদ্যাপতিতে অশ্লীলতার কিছুই নাই। স্বয়ং ভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে গানে বিভোর হইয়া পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকিতেন, তাহার অবিনশ্বর মাধুরী, তাহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর একজন ডিপ্লোমাধারীর অনুভূতিসাপেক্ষ না হইলেও আমরা তাহা পরিবর্জ্জন করিতে পারিব না। বিদ্যাপতি আমাদের নিকট ভগবৎপ্রেমের সুষমা আনয়ন করিয়াছেন; যদি পাশবিক কামের পূতিগন্ধ আনিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা বড় কবি বলিয়া স্বীকার করিতাম না—কখনই না! লেখক আমাদিগকে আরও অবাক্ করিয়াছেন, নিজেই ইহার বিপক্ষে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া এবং তাহার উত্তর দিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া। সাহিত্যে অশ্লীলতা সমর্থন করিতে এরূপ অপ্রধৃষ্য অধ্যবসায় একজন বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের পক্ষে নিরতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়! তাঁহার কথাতেই প্রশ্ন করি, "তাহা হইলে সৌন্দর্য্যের দোহাই দিয়া সাহিত্যে কি যথেচ্ছ বিষয়ের অবতারণা করা যাইবে? শ্লীলতা বা সুরুচি বলিয়া আর্টে কি কিছু থাকিবে না?" তিনি তাহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা অদ্ভুত এবং 'না-ছুঁই-পানী' রকমের। "আমার মনে হয়" তিনি বলেন, "সাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয়, জগতের যাহা কিছু সমস্তই", কাজেকাজেই তাহাতে কোনরূপ নৈতিক শাসন থাকা উচিত নহে। অদ্ভুত সিদ্ধান্ত বটে! তিনি আরও বলিয়াছেন, "সাহিত্যকে এইপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিলে সে যে একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিবে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কারণ, উদ্দামতা সৌন্দর্য্যের হানিকর, সুতরাং যিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই সংযম অবলম্বন করিতে হইবে।" তাহা হইলে আর নৈতিক সমালোচনার প্রতি এত

* "সমালোচনার বর্ত্তমান স্বরূপ"—শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য—"মানসী ও মর্ম্মবাণী", ভাদ্র, ১৩২৩ সাল।

কটূক্তি কেন? নৈতিক সংযম না থাকিলে সাহিত্যের সৌন্দর্য্যে হানি হয়, যদি তিনি স্বীকারই করেন, তবে তাঁহার পূর্ব্বকথা—কাব্য "যদি সুন্দর হয় তবে তাহাকে art বলিব—তাহার morality যতই নিম্নশ্রেণীর হউক না কেন"—ইহার অর্থ কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব? লেখকের tasteই কিছু জঘন্য, ইহাই শুধু প্রতিপন্ন হইল নাকি?

(গ) লেখক 'সমসাময়িকতা' দোষ বিচারে আবার সেই সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এমার্সন যখন বলেন, The poet is not a contemporary, but an eternal man, তখন তিনি only শব্দটি notএর পর উহ্য রাখিয়াছেন। কবিকে 'Eternal man' হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে 'contemporary' হইতে হইবে। কবির সার্ব্বজনীনতা মধ্যে সমসাময়িকতার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার নহে। সেক্সপীয়রের দার্শনিক তত্ত্বগুলি কি তখন খাটিত না? তাঁহাকে কি সমসাময়িকভাবে বিচার করিলে তাঁহার গভীরতার নিদর্শন পাওয়া যায় না? যে কবি চিরকালের সত্য মানিয়া চলিয়াছেন, তিনি কি তাঁহার সমসাময়িক তত্ত্বগুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন? লেখক বলেন, "যাহা প্রচলিত সমাজের বিরোধী তাহাকেও কেবলমাত্র এই অপরাধে উপেক্ষা করিলে চলিবে না।" আমি বলিব, যাহা প্রচলিত সমাজের চিরন্তন সত্যের বিরোধী তাহাকে কেবলমাত্র সেই অপরাধেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে। ভবিষ্যৎ সমাজের রীতিনীতি অনুসারে কোন কাব্যের সমালোচনা সম্ভবপর নহে। তাহাতে কল্পনাশক্তির ধৃষ্টতা প্রকাশিত হইবে মাত্র। যাহা সমসাময়িকতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তাহা যে সার্ব্বজনীনতার কষ্টিপাথরকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

উপসংহারে বক্তব্য—মহীতোষ বাবুকে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি "যাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন, সমালোচক অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ" এ সত্য আমি ভুলিয়া যাই নাই। তাই তাঁহাকে (লেখককে) অনুরোধ করিতেছি, তিনি তাঁহার সমালোচকের ভ্রমপ্রমাদ দেখিলে তাহা লোকোত্তর ব্যাপার বলিয়া যেন বিস্ময় প্রকাশ না করেন।

শ্রীনরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্মশানের প্রতি

তোমারে দেখিয়া মনে জাগে কত কথা
কত যে বিষাদ স্মৃতি হে মোর শ্মশান!
আত্মীয় স্বজনে ছেড়ে যে গেছে চলিয়া,
সেকি গো তোমার কোলে লভেছে আরাম?
চিরদিন তোমা হেরি' উঠেছি শিহরি',
তুমি যে কোমল এত ভাবি নাই হায়!
সে যে মহা আকর্ষণ কঠিন শৃঙ্খলে
বাঁধিয়া দিয়াছে আজি তোমায়-আমায়!
আসিলে তোমার কাছে এই মনে হয়
সে হেথা ঘুমায়ে আছে; উঠিবে চমকি'
পদশব্দ শুনি মোর; হায় একি ভ্রম!
চরণ চলেনা আর, দাঁড়াই থমকি'।
তেয়াগী মায়ের কোল তোমার কোলেতে
অনন্ত শান্তিতে আজি করিয়া শয়ন,
জগতের কোলাহল পশে নাক হেথা
পরম আরামে তাই মুদেছে নয়ন।
পবন যেতেছে ধীরে পরিমল লয়ে
জাহ্নবীও কলতানে যেতেছে বহিয়া
পাছে তার নিদ্রা ভাঙ্গি' যায় এই ভয়ে
সতর্ক রয়েছে সবে তাহারি লাগিয়া।
হে বন্ধু! নিকটে তব আসি যবে আমি
তাহারি সহস্র স্মৃতি জাগায় পরাণে
বেদনায় হৃদিপিণ্ড ছিঁড়ে যেতে চায়
তপ্ত অশ্রুবিন্দু শুধু ঝরে দু' নয়নে।
দেখ ওগো, যেন তারে না জাগায় কেহ
সাধের এ সুখ-নিদ্রা হতে কভু তার,
যেন তার কোনরূপে নাহি বাজে ব্যথা
তব পদে এইটুকু মিনতি আমার।

শ্রীসরস্বতী দেবী।

বামড়া

সামন্তরাজ বামণ্ডাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত ত্রিভুবন দেব মহোদয়ের একমাত্র কন্যার শুভবিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে আমি শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত বামড়া যাত্রা করি। সুকবি করুণানিধান বাবুরও আমাদের সহিত যাইবার কথা ছিল; কিন্তু কার্য্যগতিকে তাঁহার দু'একদিন বিলম্ব হইবে জানিতে পারিয়া আমরা পূর্ব্বেই রওনা হই। গভীর পরিতাপের সহিত বলিয়া রাখি, আজ আর ত্রিভুবন দেব ইহজগতে নাই। তাঁহার ন্যায় আদর্শ নরপতিকে হারাইয়া বামণ্ডা রাজশ্রী হীন হইয়াছেন সত্য, কিন্তু আশাকরি যে সহানুভূতি গুণে, যে মহা-প্রাণতায় প্রজারঞ্জক ত্রিভুবন দেব গড়রাজ্যের মধ্যে



স্বর্গীয় রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব

একজন আদর্শ নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সমুদয় গুণের সম্যক আলোচনা করিয়া নূতন মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত দিব্যশঙ্কর সুদ্ধলদেব বাহাদুর পিতৃ অনুষ্ঠিত মার্গে বিচরণ করিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

নূতন মহারাজ বাহাদুরের অভিষেক ক্রিয়া আগামী ২৭শে নভেম্বর তারিখে সংসাধিত হইবে। রাজপদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইনি যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রজার সুখোৎপাদনে যেরূপ মনোযোগী হইয়াছেন তাহাতে আমাদের বিশ্বাস ইঁহার পিতামহ ও পিতৃদেবের ধারা ইনি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন —তাঁহাদের অনুষ্ঠিত সাধু কার্য্য সকলের বিস্তৃতি সাধনে যত্নপর হইবেন।



রাজা দিব্যশঙ্কর সুদ্ধল দেব।

ত্রিভুবনদেবের ন্যায় সুকবি ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক রাজপরিবারের মধ্যে বিরল। পর-দুঃখ-কাতর উদারচেতা মহারাজ বাহাদুর দুঃস্থ সাহিত্যিকদিগের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। সাহিত্যের রসপুষ্টির জন্য যেখানে বারিসেচনের আবশ্যক হইয়াছে, সেইখানেই অযাচিত ভাবে তিনি বর্ষণ করিয়াছেন। সাহিত্যের বিমল রসধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি যে কি পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যা'ক্ সে কথা।



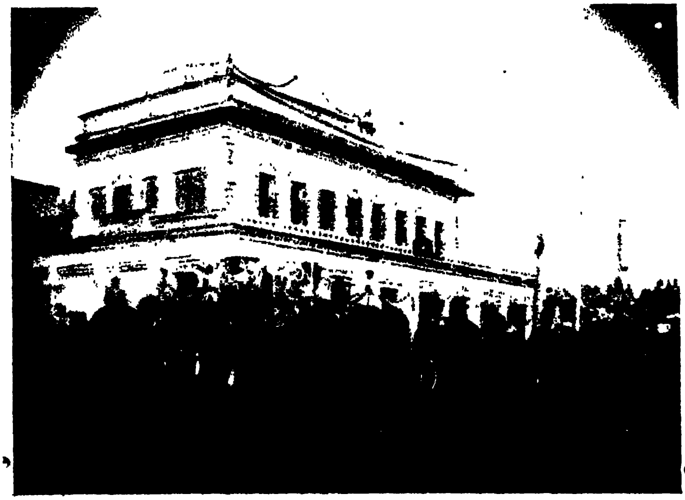
বিবাহের গহনা ক্রয়

বামণ্ডা আঠারগড় এবং মধ্যপ্রদেশের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত ছত্রিশগড়ের মধ্যে অবস্থিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্ররাজ্যের অন্যতম। জেলা সম্বলপুরের অন্তর্গত,এইরাজ্য ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্যপ্রদেশের ইংরাজ শাসনকর্ত্তার অধীনে ছিল। পরে ইহা বঙ্গদেশের শাসন-কর্ত্তার অধীনে আসে। সন্‌ ১৯১২

খ্রীষ্টাব্দে বিহার-উড়িষ্যা লইয়া নূতন রাজ্য গঠিত হইলে বামড়া বিহার-উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে এখানে দু'এক কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাবংশীয় জনৈক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পাটনার স্বাধীন নরপতিরূপে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারই ৫।৭ পুরুষ অধস্তন হটুহমির দেব যখন পাটনায় রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় রম্বাই দেব নামক চৌহানবংশীয় জনৈক রাজা তাঁহাকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। হটুহমিরের নিধনের সহিত পাটনার গঙ্গাবংশ লুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহারই পুত্র সরযূ দেব ভাগ্য বিপর্য্যয়ে বিতাড়িত হইয়া বামণ্ডায় আসিয়া নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। নব-প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "স্যর বাসুদেব জীবনী" হইতে জানিতে পারা যায়, যে "বামণ্ডার কটাঙ্গপানি গ্রামের সুনা নামক কন্দ ও কেলিপদর গ্রামের কণ্ঠাক নামক ভুঁয়া পাটনা হইতে গঙ্গাবংশীয় বালকরাজ সরযূ দেবকে বামণ্ডায় লইয়া আসে। এবং বামণ্ডার অন্তর্গত টিকালিপাড়া গ্রামে, সরগাছের মূলে বালককে "বামণ্ডারাজ" বলিয়া অভিষিক্ত করিয়াছিল। সরমূলে অভিষেক নিবন্ধন বালক রাজার নাম হইয়াছিল সরযূ দেব। * * * অভিষেকের পর সরযূ দেব যে স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, ঐ স্থানের নাম বামণ্ডা গ্রাম থাকায়, সরযূদেবের প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নাম "বামণ্ডাগড়" হইয়াছিল এবং ইঁহার শাসিত ভূখণ্ড বামণ্ডারাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছে।" সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব বাহাদুর সরযূ দেব হইতে অধস্তন অষ্টবিংশ পুরুষ।

বামড়া ষ্টেশন কলিকাতা হইতে ২৯৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একটি ষ্টেশন। রাজ্যটি ২০০০ বর্গ মাইল। সন ১৯১১ সালের আদম সুমারী হইতে জানিতে পারা যায় এখানকার পুরুষের ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৬৯০০৩ ও ৬৯০১৩।



শোভাযাত্রা হস্তী

আমরা বেলা সাড়ে তিনটার সময় গাড়ীতে উঠিয়া পরদিন প্রাতঃকালে ৮টার সময় ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। স্থানীয় তহশীলদার আমাদিগের আদর আপ্যায়নের ত্রুটি করেন নাই। মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া আহারান্তে বেলা ৩টার সময় আমরা রাজধানী দেবগড়াভিমুখে মোটর-যাত্রা করিলাম। দেবগড় এখান হইতে ৫৮ মাইল দূরে। কোন ব্যক্তি ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলে টেলিফোন দ্বারা রাজধানীতে সংবাদ দেওয়া হয়। উত্তর আসিলে তবে তাঁহাকে রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হয়। আর যদি তাঁহাকে অনুমতি না দেওয়া হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অপর ষ্টেশনের ভাড়া দিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অপরিচিত ব্যক্তির প্রবেশ লাভ এখানে একরূপ অসম্ভব। বন জঙ্গলের মধ্যস্থিত সুপ্রশস্ত রাজপথ দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। অদূরে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য সকল আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল। পাহাড়ের ভিতর দিয়া রাস্তা চলিয়াছে। কোথাও মনে হইতেছে অল্পক্ষণ মধ্যেই আমরা পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত



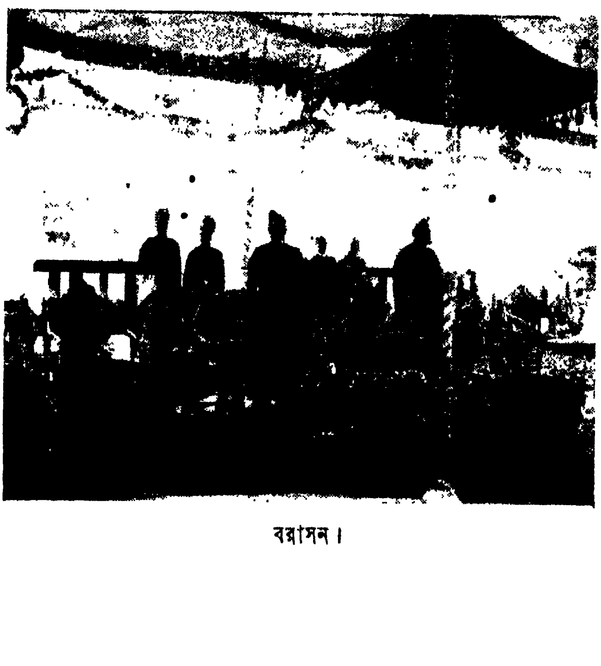
স্বর্গীয় রাজা সার সুঢল দেব, কে, সি, আই ই

হইব, কিয়দ্দূর চলিয়াই আমাদের সে ভ্রম দূর হইতে লাগিল। এই সুন্দর পথের মধ্যে রাজা বাহাদুরের দুইটী কাছারি বাড়ী আছে। এগুলি রাজ-অভ্যাগতদিগের বিশ্রাম করিবার স্থান। আমরা যখন রাজধানীতে উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা ৬টা। রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া বৈদ্যুতিক আলো দেখিতে পাইয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এই ক্ষুদ্র রাজ্যে ৫৮ মাইল বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া নিসর্গ অঙ্ক হইতে আসিতে না আসিতেই বৈজ্ঞানিকের শ্রীহস্তের চিহ্ন দেখিতে পাইব বলিয়া ধারণাই করিতে পারি নাই। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া আবার আদর আপ্যায়ন অভ্যর্থনার পালা পড়িয়া গেল। আমি সাহিত্যিক নহি, আমি গিয়াছিলাম 'রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে'; কিন্তু অমূল্য বাবুর সহিত আমি যেরূপ আদর আপ্যায়ন পাইয়াছি, তাহাতে বড়ই কুণ্ঠিত হইতে ছিলাম। যাহা আমার কোনকালে প্রাপ্য নয়, বা জীবনে আমি কোনদিন পাইবার দাবী করিতে পারিব না তাহাই আমার উপর অযাচিত ভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল। তখন মনে হইতেছিল, কবি সত্যই লিখিয়াছেন,—'পুষ্পাসনে উঠে কীট দেবের মাথায়'।



নাঙ্গা পুলিশ

আহারাদি করিয়া সে রাত্রের মত শয়ন করিলাম। অমূল্য বাবু সেই রাত্রেই রাজদর্শনে গমন করিলেন। প্রাতঃকালে রাজধানী পরিদর্শন করিলাম। মহারাজা স্যর সুচলদেব বাহাদুর-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল ও লাইব্রেরী দেখিবার জিনিষ। রাজপ্রাসাদ দেখিতে অতীব সুন্দর। হস্তীদের শোভাযাত্রা প্রাসাদের সম্মুখেই আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ চিত্র হইতে মনোরম প্রাসাদের একাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার সরকারি বাগান নানাবিধ বৃক্ষ-ফল-পুষ্প সুশোভিত। রাজা বাহাদুরের একান্ত আগ্রহে ও চেষ্টায় নানাদেশ হইতে আনীত নূতন নূতন বৃক্ষ-লতাদির সমাবেশে ইহা উজ্জ্বল-শ্রী ধারণ করিয়াছে। বাগানখানির সৌন্দর্য্য দেখিয়া মহারাজ বাহাদুরের সৌন্দর্য্যজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এখানে অনেকগুলি মনোহর



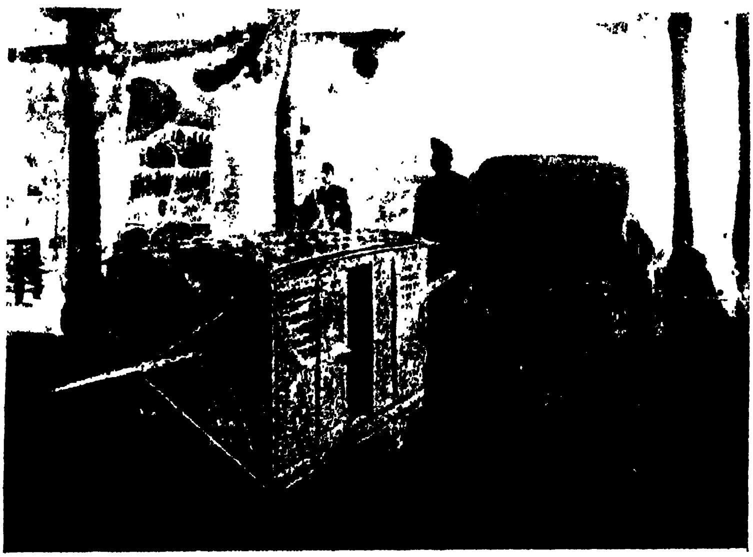
বরাসন।

মর্ম্মরমূর্ত্তি আছে। এগুলি বিলাতীর অনু-করণে দেশীয় শিল্পীর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। মূর্ত্তি-সকল স্বর্গীয় মহারাজ সুচলদেব বাহাদুরের দেশীয় শিল্পের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচায়ক। এ সকল মূর্ত্তি বিদেশীয় ভাস্করদিগের খোদিত মর্ত্তি অপেক্ষা কোনগুণেই নিকৃষ্ট নহে। আমরা আশাকরি এখানকার ভাস্করদিগের সাহায্যে বড় বড় রাজন্যবর্গ যদ্যপি ভাস্করমূর্ত্তি গঠিত করান, তাহা হইলে দেশীয় শিল্পেরও উন্নতি হইবে এবং সহানুভূতির অভাবে শিল্পীর বংশধরেরাও অনন্যোপায় হইয়া জীবন ধারণের জন্য অন্য কার্য্য করিতে বাধ্য হইবে না—শিল্প-প্রতিভার ধারা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

পরদিন করুণাবাবু আসিয়া আমাদের সহিত যোগ-দান করিলেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এখানে একটি পণ্ডিত সভা আহূত হইয়াছিল। তাহাতে কলিকাতাস্থ পণ্ডিত প্রবর উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বক্তা ছিলেন। উড়িষ্যার জনৈক সুপণ্ডিত শ্রীফকিরমোহন সেনাপতি মহাশয়ও বক্তৃতা করেন। তিনি উৎকল ও সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিয়া বেশ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর



দানসামগ্রী হাওদা।



দানসামগ্রী—পাল্কী ও তঞ্জাম

তাঁহাকে 'সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করিয়া প্রতিভার সম্যক আদর করিয়াছিলেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের সম্ভ্রান্ত নৃপতিবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন উপস্থিত হইয়া বিবাহ বাসর অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। রাজাবাহাদুরের জামাতা গড়জাতের অন্যতম সামন্তরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দেব বাহাদুর কালাহাণ্ডাধিপতি। তাঁহার বয়ক্রম ২০ বৎসর। বিবাহ উপলক্ষে কয়দিন যাবৎই নাচগান হইত। কলিকাতার রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানিও অনেকগুলি সুন্দর দৃশ্য দেখাইয়াছিলেন। বিবাহের যৌতুকের কয়েকটি চিত্র আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।



পিতল ও কাঁসার দানসামগ্রী

রাজধানী হইতে ১১ মাইল দূরে কুচিণ্ডা গ্রামে ধানছাটাই করিবার একটি কল আছে। এখানে একটি চিনির কল ও একটি কাপড় বয়নের কল আছে। সমস্ত প্রজাকে বিবাহোপলক্ষে এই কলে প্রস্তুত সুন্দর কাপড় উপহার দেওয়া হইয়াছিল। এ কলগুলি এঞ্জিন সাহায্যে চলিয়া থাকে। রাজধানী দেবগড়ে ও এখানে ২টি কাঠ-চেরাই করিবার কল আছে। এগুলির কার্য্য দেখিয়া আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি।

বামড়ার জেল আর একটি দর্শনযোগ্য স্থান। প্রাচীন প্রথানুসারে বিবাহোপলক্ষে ৩৭ জন কয়েদীকে খালাস দেওয়া হইয়াছিল। কয়েদীদের নির্ম্মিত সিল্ক ও গরদের কাপড়, সতরঞ্চ, চাদর, নানাবিধ ছিট উল্লেখযোগ্য ও দেখিতে অতীব সুন্দর।



হস্তীর দৌড়

এখানে কলের জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাজধানী হইতে একমাইল দূরে অবস্থিত একটি প্রস্রবণ হইতে ষ্টিম সাহায্যে জল আনয়ন করিয়া পর্ব্বতগাত্রে উচ্চস্থানে সুবৃহৎ চৌবাচ্চায় (Tank) জল সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়; এবং এই জলই কলের দ্বারা সহরের সর্ব্বত্র সরবরাহ হইয়া থাকে। কলিকাতায় যেরূপ রাস্তায় কল আছে, এখানেও রাস্তায় সেইরূপ আছে—

অধিকন্তু এখানে স্নান করিবার জন্য ঝাঝরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলিতে গেলে বামড়া কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।

এখানে প্রাথমিক শিক্ষা সকলকেই করিতে হয় (Compulsory Education) ভারতের মধ্যে বরোদা ভিন্ন অন্যত্র এরূপ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সুদুর্লভ। আশাকরি সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া জ্ঞানের পথ আরও সুপ্রশস্ত করিয়া দেন।



ঘোড়দৌড়

রাজা স্যার বাসুদেব ও তৎপুত্র সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের কৃপায় আফিং ও মদ এরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এজন্য রাজা বাহাদুরকে অনেক টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। রাজা বাহাদুরের অমায়িক প্রকৃতি গুণে প্রজারা তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন। অনন্যকর্ম্মা রাজা বাহাদুর বিবাহের মধ্যেও প্রজাদিগের সুখসাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। আমাদিগের ন্যায় নগণ্য লোকের সহিত যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা ও আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন, তাহা জীবনে ওরূপ উচ্চপদস্থ লোকের নিকট অন্যত্র পাইব কি না জানি না।

আমরা যে কয়দিন বামণ্ডায় উপস্থিত ছিলাম, সে কয়দিবস স্বেচ্ছাসেবকদিগের আনুগত্য, ক্লেশ স্বীকার ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। আশা করি নাই উৎকল বালক বাঙ্গালীদিগকে এরূপ সেবা ও যত্ন করিতে পারে। পরিশেষে বামণ্ডাধিপতির প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশ চন্দ্র দাস ও তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত জীবন প্রদীপ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সরল অমায়িক ব্যবহার জীবনে কখনও ভুলিব না। কর্ম্মবীর যোগেশবাবুর কর্ম্ম-প্রবণতা ও সুষ্ঠুভাবে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা সবিশেষ প্রশংসার্হ। ইনি বামড়ার প্রকৃত হিতকামী কিসে বামড়ার উন্নতি হইবে —কিসে বামড়া আপনার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে এই সাধু সঙ্কল্পে প্রণোদিত হইয়া ইনি সকল কর্ম্মে অগ্রগামী।

নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার উপহার লইয়া ১০ই তারিখে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীহৃষীকেশ মিত্র।

ভাষাতীত

প্রণয়ের অভিধান করিয়া নিঃশেষ
ডাকি' তোমা সব মধু সম্বোধন দিয়া,
আজো বঁধু ভাল' করি' গেলনা জানান'
তব তরে কত প্রেম ধরে এই হিয়া।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

নীরবকর্ম্মী রমাপ্রসাদ রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সার। এই সময়ে রমাপ্রসাদ বৎসরে লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। লর্ড ক্যানিং ও সার জন পিটার গ্রাণ্ট রমাপ্রসাদকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কোনও নূতন বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে জটিল প্রশ্নাদি উত্থাপিত হইলে তাঁহারা রমাপ্রসাদের অভিমত জানিতেন এবং অধিকাংশ স্থলে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। Civil Procedure Bill, Rent Bill, Sale law, Penal code, Criminal Procedure, Limitatiou Laws, Income Tax Act প্রভৃতি অনেক আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময় তিনি গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে তাঁহার অভিমত ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভা তাঁহার মন্তব্যের দ্বারা অনেক উপকৃত হইয়াছিল। রমাপ্রসাদ দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের যে বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা তৎকালে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি মিষ্টার বোফোর্টের স্থানে লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সারের পদে নিযুক্ত হন। ইতঃপূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালী এই উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। এই পদের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়াও তিনি ওকালতী করিতেন।

"ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী।" ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। এই সময়ে তিনি বিশ্রামের জন্য মধ্যে মধ্যে আলমবাজার বা রাণীগঞ্জের উদ্যানবাটিকায় সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু রমাপ্রসাদের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে অলস ভাবে সময় অতিবাহিত করা অসম্ভব। তিনি এই সময়ে আইনগ্রন্থাদির টীকা প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেন। এই সময়ে How are we governed নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক অবলম্বন করিয়া তিনি 'ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী' নামক একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। পুস্তকখানি সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে স্বর্গীয় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়নে রমাপ্রসাদকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের আদেশানুসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সার জন পিটার গ্রাণ্ট লর্ড ক্যানিংয়ের অনুমতি লইয়া রমাপ্রসাদকে এই সভার অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত করেন। এই সভায় আরও তিনজন দেশীয় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও অতি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও মৌলবী (পরে নবাব) আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের যোগ্যতায় কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু কোন দেশীয় সদস্যই রমাপ্রসাদের ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ব্যবস্থাপক সভায় রমাপ্রসাদের কার্য্য সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"In the Legislative Council of Bengal to which he was nominated on its formation as a Government member, we may say that he was the only man who shewed mettle at all. He approached the questions before it with an intelligence, an appreciation of public wants and feelings, a sagacity, boldness and an authority that certain knowledge and strong intellect always give, which not only defied opposition in the Council, but challenged admiration out of it."

ক্যানিং স্মৃতিরক্ষা সভা। করুণার অবতার লর্ড ক্যানিংয়ের ভারত পরিত্যাগ কালে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের ব্যবস্থার জন্য দেশবাসিগণ:১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ২৫ ফেব্রুয়ারী দিবসে টাউনহলে একটি বিরাট সভা আহূত করেন। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া একটি মনোরম বক্তৃতা করেন। এই প্রস্তাবে লর্ড ক্যানিংয়ের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তির জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ডের কোনও উপযুক্ত শিল্পীর নিকট বসিতে অনুরোধ করা হয়। কৌতূহলী পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত রমাপ্রসাদের ইংরাজী বক্তৃতাটির মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আমি তৃতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপিত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি এবং অতীব আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব আপনাদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করিতেছি। রাজকর্ম্মচারী বলিয়া এইরূপ সাধারণ সভায় সাধারণ অবস্থায় আমি যোগদান করিতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমি সেরূপ কোনও সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি না। আমার মনে হয় যে কোন ব্যক্তির রাজকর্ম্ম গ্রহণ করিলেই যে তাঁহাকে স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, সকল সৎ ও মহৎ ভাবের অনুভূতি বিসর্জ্জন দিতে হইবে, ন্যায়-পরতা ও মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে বিরত হইতে হইবে এবং যাঁহারা ন্যায়তঃ আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলী প্রদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে এইরূপ যুক্তি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা আজি একটি বিশেষ এবং অসাধারণ কার্য্যোপলক্ষে সমবেত হইয়াছি। শাসনকার্য্যের অবসানে গৃহপ্রত্যাগমনোন্মুখ গবর্ণর জেনারেলকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদানের জন্য এই বিশাল রাজধানীর অধিবাসিগণ যে এই প্রথম সমবেত হইলেন তাহা নহে। বহুবার আমরা এই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বে সম্মিলিত হইয়াছি। কিন্তু মহাশয়গণের স্মরণ থাকিতে পারে যে সেই সকল সভা য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত, য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক আহূত এবং য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। আজি-কার এই বিরাট সভা ভারতবাসীর দ্বারা আহূত। ইহা কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের সভা নহে, শাসক সম্প্রদায়ের ইঙ্গিতে এই সভা আহূত হয় নাই। পরন্তু সমগ্র ভারত-বর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-গণ স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আজিকার এই সুন্দর সন্ধ্যায় ভারতবর্ষের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রকে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন।

"ভদ্র মহোদয়গণ, যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলেও এই ক্ষুদ্র বক্তৃতায় ভারতবর্ষের জন্য লর্ড ক্যানিং যে প্রশংস-নীয় কার্য্য করিয়াছেন তাহার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইত না। সে সকল কার্য্যের পুনরালোচনা করিলে হয়ত আপনারা এমন কিছু দেখিতে পাইবেন না যাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যায় বা হৃদয় বিমুগ্ধ হয়। বিরাট অথবা গৌরব-ময় যুদ্ধ সংঘটিত ও বিজিত হইয়াছে, বিশাল রাজ্যবিস্তৃতি ঘটিয়াছে, তাঁহার শাসনকালে আপনারা হয়ত এরূপ ঘটনার কথা শুনিতে পাইবেন না, কিন্তু মহাশয়গণ, লর্ড ক্যানিং এমন কতকগুলি স্থায়ী উন্নতি সাধিত করিয়াছেন, আপনাদের কল্যাণের জন্য, আপনাদের প্রিয়তম অধিকারগুলি রক্ষার জন্য, ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য, এমন অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য-সমূহ অনুষ্ঠিত করিয়াছেন, যে সে সকলের আলোচনা করিলে আপনারা এবং আপনাদের উত্তরপুরুষগণ ভারতবর্ষের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উপকারক বলিয়া লর্ড ক্যানিংয়ের নাম চিরদিন পূজা করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান দেখিবেন। কোনও জাতির ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই—ভারতবর্ষের সেই মহাসঙ্কট-কালে তিনি কিরূপে আমাদিগকে এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাদের পর আমাকে কি তাহা পুনরায় বিবৃত করিতে হইবে? যখন য়ুরোপীয়দিগের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল, যখন আমাদের কোটি কোটি দেশবাসীর মধ্যে কয়েকজন মাত্র ভ্রান্ত ব্যক্তির নৃশংস কার্য্য তাঁহাদিগকে প্রতিহিংসাগ্রহণে ও বৈরনির্য্যাতনে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন এই মহাপুরুষের অদম্য সাহস, অবিচলিত ন্যায়পরতা, সংযম ও মনুষ্যত্ব অগণ্য নির্দ্দোষীকে অকাল ও কলঙ্কিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল, মহা-রাজ্ঞীর রাজভক্ত লক্ষ লক্ষ প্রজা তাহাদের জীবন ও হৃত সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাঁহারই কৃপায় আজি আমরা এই বৃহৎ সভায় স্বাধীন নাগরিকরূপে বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যের গৌরব লইয়া সমবেত হইতে সমর্থ হইয়াছি। মহাশয়গণ, ইহা তাঁহার শাসনকালের অন্ধকারময় দুর্দ্দিনের কথা—যাহাকে হিন্দুমতে তাঁহার শাসনের লৌহযুগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি তাঁহার শাসনকালের সুবর্ণযুগের কথা—সুদিনের কথা স্মরণ করেন তাহা হইলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে দেশের মধ্যে শান্তি ও ঐক্যস্থাপন এবং ভারতবর্ষের

আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের দ্বারা তাঁহার শাসনকালের শেষ কয়েক বৎসর বিশেষিত হইয়াছে। অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ নীরব এবং কামানের মুখ বন্ধ হইবামাত্র লর্ড ক্যানিং সকলকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে না দেখিয়া (হয়ত অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা সে অবস্থায় দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না) অসাধারণ মহত্ত্বসহকারে ধীর ও শান্তভাবে, রাজভক্ত ও রাজদ্রোহীদিগকে পৃথগীকৃত করিয়া, রাজভক্তদিগকে মুক্তহস্তে পুরস্কৃত এবং রাজদ্রোহীদিগকে ন্যায়পরতা অথবা করুণার সহিত বিচার পূর্ব্বক যথাযোগ্যভাবে দণ্ডিত করিয়া ছিলেন।

"মহাশয়গণ, অযোধ্যার বাজেয়াপ্ত ভূসম্পত্তি প্রত্যর্পণের কথা, সেই প্রদেশের নূতন বন্দোবস্তের কথা, শিশুহত্যা নিবারণের কথা স্মরণ করুন, অথবা স্বধর্ম্মানুসারে এতদ্দেশীয় রাজা মহারাজাদিগের দত্তক পুত্রগ্রহণের প্রতিবন্ধকাদি বিদূরিত করিবার কথা স্মরণ করুন, অথবা বিচারবিভাগের সংস্কারের কথা, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকে জীবন ও সম্পত্তি নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে দিবার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি প্রণয়নের কথা, শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহদানের কথা, অর্থশাস্ত্রসম্মত নিয়মানুসারে য়ুরোপীয় মূলধনের আমদানী করিয়া দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির কথা স্মরণ করুন, এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষার চেষ্টার কথা, ভূমিস্বত্ব ও পতিত জমি বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির কথা স্মরণ করুন, আপনারা দেখিতে পাইবেন যে ভারতবর্ষের কল্যাণই লর্ড ক্যানিংয়ের চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল। তাঁহার শাসনকার্য্যের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ—যাহাকে ভ্রান্তলোকে 'নেটিব' রাজ্যশাসন প্রণালী বলেন সেই জাতীয় রাজ্যশাসন পদ্ধতি প্রচলনের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই পদ্ধতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লর্ড ক্যানিংয়ের শাসনকালেই উহা প্রচলিত হয়। ভূম্যধিকারী এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে, দেশ, জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেশের উন্নতিবিধানের জন্য দায়িত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়া তিনি ভারতবর্ষে একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় সর্ব্বোচ্চ রাজকার্য্যে দেশীয়দিগকে য়ুরোপীয়দিগের সহিত সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি কখনও কল্পনাও করিতে পারিতেন—আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাঁহাদের কি তাহা শুনিবারও সম্ভাবনা ছিল, যে রাজা দিনকর রাও বা রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহের ন্যায় দেশবাসী ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি ও লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের সহিত সাম্রাজ্যশাসন সভায় একত্রে উপবেশন করিয়া সেই অতুল প্রতাপান্বিত শাসনকর্ত্তাদিগকে দেশহিতকর বিষয়ে পরামর্শ দিবেন?

"ভদ্রমহোদয়গণ, এই সকল এবং এইরূপ কার্য্যের দ্বারা লর্ড ক্যানিং মহারাজ্ঞীর সাম্রাজ্যে শান্তি, সুখ, সন্তোষ ও রাজভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য, তাঁহার সদনুষ্ঠান সমূহের স্মৃতিরক্ষার জন্য, তাঁহার বিচক্ষণ এবং উদার নীতি পরিচালিত সৎকার্য্যের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য, আমরা অদ্য এইস্থানে সমবেত হইয়াছি, এবং ইহা আশা করা যায় যে, আমরা অদ্য এই সভায় যাহা করিব এবং সঙ্কল্প করিব তদ্দ্বারা জগতকে দেখাইতে পারিব যে সুশাসনকর্ত্তার সৎকার্য্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে এবং তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে ভারতবর্ষ কখনই পশ্চাৎপদ নহে!

"মহাশয়গণ, যে মহাত্মাকে আমরা শোকাকুলিত হৃদয়ে বিদায় দিতেছি তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত কি নিদর্শন চিহ্ন স্থাপিত হওয়া উচিত তাহা আমি কল্পনা করিতে অক্ষম। কিন্তু যে প্রস্তাবটি আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করা হইতেছে তাহা গ্রহণ করিতে বলিবার সময় আমি আগ্রহের সহিত এই অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা যে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবেন তাহা যেন লর্ড ক্যানিংয়ের উপযুক্ত হয়, তাঁহার মহৎ এবং প্রশংসনীয় কার্য্যের উপযুক্ত হয় এবং ভারতবর্ষ ও তাহার লক্ষ লক্ষ অধিবাসী, যাহাদের প্রতিনিধিরূপে আপনরা এস্থানে সমবেত হইয়াছেন, তাহাদের উপযুক্ত হয়।"

লর্ড ক্যানিংকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার জন্য এই সভায় যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ একজন। রমাপ্রসাদ লর্ড ক্যানিংয়ের স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং স্মৃতিরক্ষার জন্য পাঁচশত টাকা দান করিয়াছিলেন।

গ্রাণ্ট স্মৃতিরক্ষা সমিতি। দুই মাস পরে সর্ব্বজনপ্রিয় লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর সার জন পিটার গ্রাণ্টকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে যে সকল দেশনায়ক তৎসমীপে গমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে রমাপ্রসাদকে দেখিতে পাওয়া যায়। রমাপ্রসাদ তাঁহার

স্মৃতিরক্ষা সমিতির অন্যতম সদস্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি। পূর্ব্বে এদেশে সদর আদালত ও সুপ্রিমকোর্ট নামক দুইটি সর্ব্বপ্রধান বিচারালয় ছিল। সদর আদালত বা কোম্পানীর আদালতে মফঃস্বল কোর্টের মোকদ্দমার আপীল শুনা হইত। এই আদালতের বিচারপতিদিগের দেশের আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন বলিয়া এতদ্দেশীয় বিচারকগণের মধ্যে হইতে ইঁহারা নির্ব্বাচিত হইতেন। সুপ্রিম কোর্টের বা মহারাজ্ঞীর আদালতের বিচারপতিগণ বিলাত হইতে আসিতেন। বলা বাহুল্য এই দুই আদালতের বিচারপতিদের মধ্যে প্রায় মনোমালিন্য ঘটিত। দুইটি বিচারালয় একত্র করিয়া একটি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে একবার উঠিয়াছিল কিন্তু কোন কারণ বশতঃ উহা স্থাপিত করা তখন যুক্তিযুক্ত বোধ হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস উড্ পার্লিয়ামেণ্টে হাইকোর্ট স্থাপনের কথা পুনরায় উত্থাপন করেন এবং বিচারপতি নিয়োগ সম্বন্ধেও নূতন নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। মহাত্মা লর্ড ক্যানিং তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ উদারতার সহিত "expressed a decided opinion that Native Judges, well-trained, were as well qualified as any other persons to take their places by the side of English Judges in the High Court."

রমাপ্রসাদের অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখিয়াই যে লর্ড ক্যানিং তাঁহার এই অভিমত গঠিত করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। লর্ড এল্‌গিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী মাননীয় টি, জে, হভেল-থার্লো (Hon'ble T. J. Hovell-Thurlow) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "The Company and the Crown" নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"On its (High Court) bench two new and startling precedents had been adopted. Natives were to be appointed to this high tribunal, with power to judge our countrymen in criminal as well as civil cases; and, for the first time, natives of high rank became entitled to the same emoluments as their English colleagues. * * * The statutes of the court had been thus liberally framed, bearing in view a man of proved integrity and parts. Ramapersad Roy was a name, at the very sound of which corrupt vakeels or pleaders quitted court. He was without price, and the office had been made for him; but ere the letters patent had reached Calcutta he had died. Shumbhoonath Pundit Roy Bahadoor indeed was found to reap the honours invented for another; but the new High Court went forth shorn of its greatest ornament."

প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও অবশেষে এই বৎসর পার্লিয়ামেণ্টের নূতন বিধি দ্বারা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা মঞ্জুর হইল এবং একজন দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করিবারও আদেশ আসিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। রমাপ্রসাদ অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ ছিলেন না যিনি এই পবিত্র ধর্ম্মাধিকরণে বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন। গবর্ণর জেনারেল লর্ড এলগিন্ তাঁহাকেই এই পদের জন্য মনোনীত করিলেন এবং মাননীয় মিষ্টার হ্যারিংটনকে দিয়া রমাপ্রসাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে ভারত-সাম্রাজ্ঞী তাঁহাকেই এই উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তখন অত্যধিক পরিশ্রম জনিত রোগে রমাপ্রসাদ মৃত্যুশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন। দেশবাসীর ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা দেখিয়া রমাপ্রসাদের আনন প্রফুল্ল হইল। তিনি হ্যারিংটনকে ধন্যবাদ দিয়া স্মিতমুখে

বলিলেন, "আমি এখন উচ্চতর বিচারালয়ের সম্মুখে যাইতেছি। নিয়োগ পত্র লইয়া আমি কি করিব?" *

পরলোক গমন। বাস্তবিক ব্যবস্থাপক সভার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য, লিগ্যালরিমেম্ব্রান্সারের পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য, সদর আদালতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবের কার্য্য, এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের গুরুভারে রমাপ্রসাদ বহুদিন হইতেই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি দিনরাত্রি তিনি কর্ম্মে নিরত থাকিতেন। মানুষের শরীরে কত সহ্য হয়? ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি যকৃৎরোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। ডাক্তার ওয়েব্, ডাক্তার গুডিব্, ডাক্তার ম্যাক্‌রে, ডাক্তার গুপ্ত, সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি সহরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের প্রাণপণ চেষ্টাতেও রোগের উপশম হইল না। বাহির-সিমুলিয়ার বাটী হইতে চৌরঙ্গীতে স্বাস্থ্যকর স্থানে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া চিকিৎসা করা হইতে লাগিল। যখন রোগে শয্যাগত তখনও রমাপ্রসাদ দেশের কথা ভুলেন নাই। তিনি আত্মীয় বন্ধুগণকে সংবাদপত্র পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে বলিতেন এবং জনহিতকর অনুষ্ঠানাদির, সংবাদ লইতেন। যখন ইংলিশম্যানের টেলিগ্রাম লর্ড ক্যানিংয়ের মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া আনিল, তখন রমাপ্রসাদের নয়নে অশ্রু দেখা দিল। গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভারতবর্ষ তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হারাইয়াছে!" সেইদিন হইতে তাঁহার মনে এক-প্রকার ধারণা হইল যে তাঁহারও মৃত্যুকাল আসন্ন। তাঁহার রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাননীয় মিষ্টার হ্যারিংটন, মাননীয় মিষ্টার রেকস্, প্রফেসর লীজ, মিষ্টার কক্রেন্ প্রভৃতি সুপ্রিম কৌন্সিলের সদস্য, হাইকোর্টের জজ, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, হইতে সামান্য ব্যক্তি পর্য্যন্ত রমাপ্রসাদের সকল শ্রেণীর বন্ধু ও প্রতিভাপূজকগণ তাঁহার বাটীতে গিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য সংবাদ লইতে লাগিলেন। কিন্তু দেশবাসীর ও বিদেশবাসীর শ্রদ্ধা, সম্মান, ও প্রীতির আধার, রমাপ্রসাদের কাল পূর্ণ হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট (১৮ই শ্রাবণ ১২৬৯ বঙ্গাব্দে) শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বঙ্গদেশ একটি প্রকৃত সন্তানরত্নহারা হইলেন।

স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা। রমাপ্রসাদের মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশ শোকে কাতর হইয়াছিল। ইংলিশম্যান, হরকরা প্রভৃতি ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপত্রও উচ্চকণ্ঠে তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণের প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'সোমপ্রকাশ' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে প্রতীত হয় যে এদেশে রমাপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনেরও চেষ্টা হইয়াছিল:—

"ঢাকা প্রকাশে বরিশাল হইতে একজন লিখিয়াছেন, তত্রত্য উকীল বাবু বিশ্বেশ্বর দাসের যত্নে তাঁহার বাটীতে রমাপ্রসাদ বাবুর স্মরণার্থ এক চাঁদা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮০০ টাকা উঠিয়াছে, রমাপ্রসাদ বাবুর স্মরণার্থ কি চিহ্ন করা হইবে, সভা এখনও তাহা স্থির করেন নাই। এই টাকা ভারতবর্ষীয় সভার নিকটে প্রেরিত হউক। হরিশ সমাজ-গৃহ * নির্ম্মিত হইলে

---

* অমর কবি দীনবন্ধু তদ্বিরচিত 'সুরধুনী'কাব্যে রমাপ্রসাদের অকালমৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন:—

"আইন পারগ রমাপ্রসাদ প্রবর
সাধিতে স্বদেশ-হিত ছিলেন তৎপর।
প্রথমে বিচারপতি সেই বিজ্ঞ হয়;
অস্তমিত হ'ল কিন্তু না হতে উদয়,
অভিষেক দিনে গেল শমন-ভবনে,
কোথা রাম রাজা হয় কোথা গেল বনে।"

* মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে 'হিন্দু-পেট্রিয়টে'র স্বদেশ প্রেমিক সম্পাদক ৺হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ একটি সমাজগৃহ নির্ম্মিত হউক। Federation Hall যে উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইবার কথা হয় উহাও সেই উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইবার কথা হয়। কালীপ্রসন্ন বাটী নির্ম্মাণের জন্য দুই বিঘা পরিমিত জমি এবং অর্থসাহায্য প্রদান করিতেও সম্মত হইয়াছিলেন। এই সমাজ-গৃহে লর্ড ক্যানিংয়ের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও স্যর জন পিটার গ্রাণ্টের তৈলচিত্র রক্ষিত হইবারও প্রস্তাব হয়। কিন্তু হরিশ স্মৃতি সমিতি অন্তরূপে সংগৃহীত অর্থ-

তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ বাবুর এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি, আরও অধিক টাকা সংগৃহীত হইলে তাঁহার প্রস্তরময়ী অৰ্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি করা কর্ত্তব্য। হরিশ সমাজ-গৃহকে আমাদিগের জাতিসাধারণ স্মৃত স্মরণার্থ গৃহ করা কর্ত্তব্য।"

(সোমপ্রকাশ ১০ই ভাদ্র ১২৬৯)

কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও রমাপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। তাঁহার স্মৃতিচিহ্নের অভাব যে আমাদের জাতীয় কলঙ্কের বিষয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। *

রমাপ্রসাদের উত্তরাধিকারিগণ। রমাপ্রসাদের প্রথমা সহধর্ম্মিণী অতি অল্পবয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রমাপ্রসাদ ৺মৃত্যুঞ্জয় আগমবাগীশের কন্যা দ্রবময়ীকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে সন ১২৫৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন এবং সন ১২৫৭ সালের কার্ত্তিক মাসে কনিষ্ঠপুত্র প্যারীমোহনের জন্ম হয়। ১৩০৩ সালে ১০ই চৈত্র (২২শে মার্চ্চ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে) হরিমোহনের মৃত্যু হয়। তিনি কোনও পুত্রসন্তান রাখিয়া যান নাই, তাঁহার কন্যার বংশধরগণ তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। প্যারীমোহন এখনও জীবিত আছেন। তাঁহারও কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

চরিত্র। রমাপ্রসাদ বিনয় ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ছিলেন। পিতা মাতার প্রতি ভক্তিতে রমাপ্রসাদ আদর্শস্থানীয় ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত প্রকাশিত করিবার তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল। রামমোহনের পরম বন্ধু রেভারেণ্ড উইলিয়ম আডামকে তিনি জীবনচরিত লিখিতে অনুরোধ করেন এবং দশসহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু আডাম সাহেবের ভারতবর্ষে পুনরাগমনের পূর্ব্বেই রমাপ্রসাদ পরলোকে গমন করেন। রমাপ্রসাদ মনীষী ও মনস্বী পুরুষ ছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রে লিখিয়াছেন, "তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি কেবল বুদ্ধিবলেই এতদূর সম্মান, গৌরব ও যথেষ্ট অর্থ (কেহ বলে ২০, কেহ বলে ৩০ লক্ষ টাকা) অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব বিনীত ও নম্র ছিল, এই গুণে কি ইউরোপীয়, কি এদেশীয় অনেক প্রধান লোকের সহিত তাঁহার সবিশেষ আত্মীয়তা ও বন্ধুতা জন্মে।" রমাপ্রসাদের মৃত্যু বিষয়ক যে প্রস্তাব হইতে উপরিলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় রমাপ্রসাদের চরিত্রের দোষ গুলিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"কিন্তু তাঁহার স্বভাবগত একটি অনুষ্কতা দোষ স্পষ্ট লক্ষিত হইত। এই অনুষ্কতা দোষ নিবন্ধনই তাঁহার প্রকৃত মনস্বিতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি কয়েকটি সদ্গুণের অসদ্ভাব ছিল। * * * তাঁহার অল্পমাত্রও সৎক্রিয়াসাহস ছিল না, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পিতা হিন্দুসমাজে খ্যাতিলাভ বাসনা পরিত্যাগ ও অন্য অন্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও স্বদেশের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদিগত দোষ সংশোধন চেষ্টা করিয়া ইহাকে উৎকৃষ্ট অবস্থায় লইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; তিনি অসার, অপদার্থ ও অসতের নিন্দা ও কটুবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া অকুতোভয়ে যে সৎক্রিয়ানুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়া যান রমাপ্রসাদ তাঁহার পুত্র হইয়া কেবল এক সৎক্রিয়াসাহস বিরহে সেই পথের পথিক হইতে পারিলেন না। প্রত্যুত তিনি সেই প্রাচীন পঙ্কময় ভগ্নপথের পথিক হইয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন।"

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যে অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও অদ্ভুত সৎক্রিয়া সাহস দ্বারা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেশাচারের প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া বিবিধ স্বদেশহিতকর সমাজ সংস্কারাদি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদের সেইরূপ তেজ বা সৎক্রিয়াসাহস ছিল না। দেশের কল্যাণকর সকল অনুষ্ঠানের

ব্যয় করিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত "মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

* কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সুকিয়াষ্ট্রীটের একটি ক্ষুদ্র অপরিসর গলির নাম "রমাপ্রসাদ রায়ের লেন' রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাকে রমাপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন বলা যায় না।

সহিত গভীর সহানুভূতিসত্ত্বেও রমাপ্রসাদের সকল কার্য্যেই তাঁহার সংযম, মিতাচার ও রক্ষণশীলতা পরিলক্ষিত হইত। এই রক্ষণশীল ভাব যে তাঁহার গভীর চিন্তা-প্রসূত ইহা অনেকেই বিস্মৃত হইতেন। আমাদের বোধ হয় যে বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা, উদারতা ও বিবেকানুবর্ত্তিতা যিনি আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সমাজসংস্কারপ্রয়াসী সম্পাদক দ্বারকানাথ, রমাপ্রসাদের চরিত্র অতি কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, এমন কি, তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকৃত রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি অবিচার করিয়াছেন। অনেক সময়েই দেখা যায় যে উগ্রস্বভাববিশিষ্ট সংস্কারকগণ নির্ভীকভাবে বিবেকের আদেশ অনুপালন করিতে গিয়া, দেশের চিরানুসৃত আচার ব্যবহারাদি প্রবলভাবে আক্রমণ করিতে গিয়া, এরূপ বাধা প্রাপ্ত হন যে তাঁহাদের অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও শক্তিসত্ত্বেও তাঁহারা ঈপ্সিত সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হন না, অথচ শান্ত ও সংযত-ভাবে সেই সকল সংস্কারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, ধীরে ধীরে সুশিক্ষা দ্বারা কুসংস্কার সমূহ বিদূরিত করিয়া দূরদর্শী নীরবকর্ম্মীরা বিনা বাধায় ক্রমে ক্রমে সমাজে সেই সকল সংস্কার সাধিত করিতে পারেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ন্যায় সমাজসংস্কারকগণও অনেক সংস্কারের প্রবর্ত্তনে ইচ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু অনেক বিচক্ষণ নীরব-কর্ম্মীদের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতভাবে সমাজে সেই সকল সমাজসংস্কার-প্রবর্ত্তনের বাসনা যে বলবতী হইয়া উঠিতেছে একথা কে অস্বীকার করিবে? দূরদর্শিতাজনিত সংযমের ভাব অনেক সময়েই দূর হইতে সৎক্রিয়াসাহসের অভাব বলিয়া অনুমিত হয়।

৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ রমাপ্রসাদের যে সৎক্রিয়া-সাহসের অভাব বা রক্ষণশীলতার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) রমাপ্রসাদ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র, তত্ত্ববোধিনী সভার একজন প্রধান সভ্য এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ন্যাসরক্ষক ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার স্বর্গগতা বিমাতার আত্মার সদ্গতির জন্য হিন্দুমতে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মধ্যমাস্ত্রীর মৃত্যু হইলে রামমোহন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হিন্দু আচারানুসারে জননীর মুখাগ্নি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণীর * মৃত্যুর বহুপূর্ব্বেই রামমোহন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। লোকাপবাদ তুচ্ছ করিয়া, জননী যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন সেই ধর্ম্মের অনুযায়ী আচার-পদ্ধতি অনুসারে মাতৃভক্ত রমাপ্রসাদ তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর আত্মার তুষ্টিবিধান করিয়া যে বিশেষ দোষ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু এই বিষয় লইয়া তখন দেশে মহা আন্দোলন হইয়াছিল। এক-দিকে সংস্কারপ্রিয় ব্রাহ্মগণ রমাপ্রসাদের এই রক্ষণ-শীলতা দেখিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, অপরদিকে অতি রক্ষণশীল হিন্দুদলপতিগণ "বিধর্ম্মী" রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদের হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়ায় যোগদান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। "মুড়িঘাটা"র [পাথুরিয়া ঘাটার] " * * * [খেলাত] চন্দ্র ঘোষ" প্রভৃতি অতি রক্ষণশীল হিন্দু দলপতিগণ রমাপ্রসাদের মাতৃশ্রাদ্ধে বিঘ্ন ঘটাইবার কিরূপ আয়োজন করিয়া-ছিলেন, সর্ব্বত্র এই বিষয় লইয়া কিরূপ আন্দোলন হইয়াছিল, লক্ষমুদ্রা ব্যয়ে অবশেষে রমাপ্রসাদ কিরূপে মাতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় "হুতোম প্যাঁচার নক্সায়," লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে, আমাদের কেবল একটি কথা মনে হয় যে

* রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে Asiatic Journal এ তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত অথচ বহুতথ্যপূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় তাহা পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে, রামমোহন কিছুকাল হইতে তাঁহার কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমতের বিরোধই কি এই সম্বন্ধ বিচ্ছেদের কারণ?—লেখক।

রমাপ্রসাদ উপনিষদের ধর্ম্ম গ্রহণের সহিত হিন্দু-সমাজের চিরানুসৃত আচারাদি পদদলিত] না করিয়া কি আমাদের একটি অমূল্য উপদেশ দিয়া যান নাই? তিনি কি শিক্ষিত হিন্দু-সমাজকে দেখান নাই যে দেশাচার লঙ্ঘন না করিয়াও প্রকৃত ব্রাহ্ম হওয়া যায় এবং ব্রাহ্ম সমাজকে দেখান নাই যে হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে? এই ইঙ্গিত ব্রাহ্মসমাজ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয় রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত উদার ব্রাহ্মসমাজ আজি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় কলুষিত ও গৃহবিচ্ছেদে ভগ্নবল হইয়াছে—ব্রাহ্মসমাজে কদাচারত্যাগী সভ্য অপেক্ষা অনাচারী সভ্যের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। পক্ষান্তরে, হিন্দু সমাজ এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া রমাপ্রসাদকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া যে উদারতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহারই ফলে আজিও আচারনিষ্ঠ হিন্দুর গৃহে গৃহে প্রকৃত ব্রাহ্ম দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, শান্ত ও সংযতভাবে যে সংস্কার ধীরে ধীরে সমাজের হৃদয়ে প্রবেশলাভ করে তাহার ফল বহুকাল স্থায়ী হয়। রমাপ্রসাদ জানিতেন সমাজ ভাঙ্গিলেই সমাজ গঠিত হয় না।

(২) বিধবা বিবাহে রমাপ্রসাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রেও জানিতেন যে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা দ্বারা, বা প্রলোভনের দ্বারা, এতদ্দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা সম্ভবপর নহে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সহিত, সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের সহিত, ভবিষ্যতে ইহা প্রচলিত হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উহার প্রচলন অসম্ভব। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত যে খুব সমীচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু অনেকেই তাঁহার দূরদর্শিতা জনিত অনুদ্ধতাকে সৎক্রিয়া সাহসের অভাব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তীরও প্রচার আছে। 'সঞ্জীবনীতে' কোনও লেখক একবার লিখিয়াছিলেন:—

"শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম বিধবা বিবাহ হয়। তখন কলিকাতার অনেক বড়লোক, এবিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে প্রতিশ্রুত থাকিয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। লজ্জার বিষয় এই যে কেহই উপস্থিত হন নাই। এই বিবাহের পূর্ব্বে তিনি স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রমাপ্রসাদ রায় বলিলেন "আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব, বিবাহ স্থলে নাই গেলাম?" এই কথা শুনিয়া ঘৃণা এবং ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথা বাহির হইল না। তাহার পর দেওয়ালে স্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও।' এইরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন।"

এতৎ সম্বন্ধে ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি "প্রকৃতি"তে লিখিয়াছিলেন—

"আমার পিতৃদেব গোপীনাথ রায় চূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছিলেন, তিনি (রমাপ্রসাদ), বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কহিয়াছিলেন, 'আমার পিতা, সমাজ সংস্কারের কসুর করেন নাই। তাতে তো কোনই ফল ফলে নাই। অতএব আর চেষ্টা পাওয়া বৃথা।' এই বলিয়া বিধবা বিবাহের সভায় যাইতে তিনি অস্বীকৃত হন। বিদ্যাসাগর ও রমাপ্রসাদ বাবুর কথোপকথন সময়ে বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, পণ্ডিত কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অন্যান্য অনেকেই, উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের নিকটেও এই কথাই শুনিয়া আসিতেছিলাম।"

"সংবাদ প্রভাকরে" প্রথম বিধবা বিবাহের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় যে বিবাহস্থলে রমাপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং 'সঞ্জীবনী'র লেখকের গল্পে আস্থাস্থাপন করা যায় না। বিধবা বিবাহে যে রমাপ্রসাদের সহানুভূতি ছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই।

বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ বিষয়েও রমাপ্রসাদ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপ্রণীত 'বহুবিবাহ' নামক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "লোকান্তর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন এবং নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে, যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়।"

রামমোহন যে পথে গিয়াছিলেন রমাপ্রসাদ সেই পথের পথিক হন নাই সত্য। কিন্তু তিনি “প্রাচীন পঙ্কময় ভগ্নপথের” পথিক না হইয়া নূতন পথে চলিলে কি সেই ভগ্নপথের সংস্কার সাধিত হইত? “ভগ্নপথে”র সংস্কার করিতে গেলে কি সেই পথে থাকিয়াই ধীরে ধীরে তাহার উন্নতি করিতে হইবে না?

পিতার তেজস্বিতার অধিকারী না হইলেও যে রমাপ্রসাদ শক্তিমান স্বদেশহিতৈষী ও বুদ্ধিমান নীরব-কর্ম্মী ছিলেন একথা সকলেই জানিতেন। বিদ্যাসাগরের একজন চরিতকার লিখিয়াছেন, “রমাপ্রসাদের মৃত্যু-সংবাদে বিদ্যাসাগর অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, শক্তিপূজকের চিরকালই পূজনীয়। বিদ্যাসাগর প্রকৃত শক্তি-সেবী। রমাপ্রসাদ রায়ও প্রকৃত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তজ্জন্যই তিনি রমাপ্রসাদ বাবুর বিয়োগ জন্য দুঃখিত হয়েন।”

রমাপ্রসাদ যে শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন একথা কে অস্বীকার করিবে? কৈশোরেই তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন। স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমনের সময় সমাজে সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা ও রাজকার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রমাপ্রসাদ নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ছিলেন না কিন্তু তিনি এতগুলি সদ্‌গুণের আধার ছিলেন যে তিনি চিরদিন তাঁহার দেশবাসীর স্মরণীয় থাকিবেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘The Company and the Crown’ নামক সুলিখিত গ্রন্থে লর্ড এলগিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিষ্টার হভেল্-থার্লো রমাপ্রসাদের অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্যকালে ‘প্রিন্স’ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সহবাস নিবন্ধন [illegible], সদালাপী ও মিষ্টভাষী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথের সুরুচিরও তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল গুণে এবং অদ্ভুত আতিথেয়তায় বিমুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহার সহিত অকৃত্রিম সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য য়ুরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুদিগের নামোল্লেখ করা দুঃসাধ্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র, রামলোচন ঘোষ রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ, রেভারেণ্ড সি, এইচ, এ, ডল তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পিতৃবন্ধু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মাতুল মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্রকে তিনি তাঁহার সম্পত্তির এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রমাপ্রসাদের অনন্যসাধারণ মনীষা ও মনস্বিতা, অবিচলিত উৎসাহ ও অধ্যবসায়, অপূর্ব্ব পরিশ্রমশীলতা ও কার্য্যদক্ষতা দেশবাসীর গৌরবময় আদর্শ হওয়া উচিত। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, দেশব্রত গিরিশচন্দ্র ঘোষ তৎপ্রবর্ত্তিত ও তৎসম্পাদিত ‘বেঙ্গলী’ পত্রে রমাপ্রসাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদের চরিত্র সমা-লোচনার উপসংহারে আমরা সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া পুনরায় বলি: “He was second to none of his contemporaries in point of genius, sound legal acquirements, sterling common sense, breadth of view and genuine sympathy for the just rights of the ryots of this Presidency.”

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

"সেখ আন্দু"

(প্রতিবাদ)

বিগত কার্ত্তিক সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশিত "১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গ সাহিত্যের বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে বাৎসরিক হিসাব দাখিল করিয়াছেন, তাহার অংশ বিশেষের সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের ভারপ্রাপ্ত বিবরণ প্রস্তুত-কারক, সুতরাং—অন্ততঃ আমরা মানিয়া লইতেছি,—তাঁহার মতামতের গুরুত্ব অবশ্যগ্রাহ্য, কিন্তু তাঁহার দায়ীত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্যপালনে অসতর্কতার ত্রুটি সম্বন্ধে, তাঁহার নিজের ভাষায় কথিত কৈফিয়তটুকু * উপলক্ষ্য করিয়া, কর্ত্তব্যবোধে আমি এই ব্যবকলনে অগ্রসর হইয়াছি।

উপন্যাস-সাহিত্য-প্রসঙ্গে শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষ-জায়া মহাশয়ার "প্রবাসী"তে প্রকাশিত "সেখ আন্দু" উপন্যাসের পরিচয় দিতে গিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা কি যথার্থ যুক্তিযুক্ত ও ভ্রম-প্রমাদ পরিশূন্য? বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সেখ আন্দু" পাঠে মুসলমান মোটর-চালকের "সহিত" .... প্রেমে পড়ার সংবাদটুকু কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন, তাহা আমরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। সেই জন্য সবিনয়ে প্রশ্ন করিতেছি, "সহিত" শব্দটুকু ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহার অর্থ এবং প্রয়োগের সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁহার একটু ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না কি?

তিনি বক্র-শ্লেষোক্তির সহিত প্রশ্ন করিয়াছেন,—"সহিস ও মুসলমান মোটর-চালকের সহিত শিক্ষিতা বঙ্গবালার প্রেমে পড়ার চিত্রটা কি এতই স্বাভাবিক?" —তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া আমরাও স্তম্ভিত হইয়াছি! তীক্ষ্ণ-দর্শী বিদ্যাভূষণ মহাশয় কি উপন্যাস পাঠে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে লেখিকা উহা স্বাভাবিক বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন? ভাল, তাহাই প্রচার করা যদি লেখিকার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার 'আন্দু' ঘৃণার ধিক্কারে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল, কিসের আক্ষেপে?

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথিত "প্রেমে পড়ার" অভিযোগটা প্যাঁচাল ফাঁদে ঘুরাইয়া দেখিতে গেলে অবশ্য একেবারে 'না' বলিয়া অস্বীকার করিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহা হইলেও লতিকার—অর্থাৎ বিদ্যা-ভূষণ মহাশয় যাহাকে "বিশেষতঃ লাবণ্যের" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—চরিত্র প্রসঙ্গে বচন-বাজির কারদানী দেখাইতে চেষ্টা করা আদৌ সমীচীন নহে; কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, "বিশেষতঃ লাবণ্যের" চরিত্র তাহার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকটনের জন্যই লেখিকা অঙ্কিত করিয়াছেন।—স্ত্রীলোকের জাতিগত বিশেষত্ব প্রকটন করাই যদি লেখিকার উদ্দেশ্য থাকিত, তবে লতিকাকে আমরা কন্যা, স্ত্রী, ভগিনী, মাতা—বা যে কোন অবস্থাতেই হউক—এমনতর অদ্ভুত খাপছাড়া মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইতাম না।

তবে জ্যোৎস্নাকে লইয়া যদি বিচার করিতে বসা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে—এ প্রেম, প্রেম বটে, কিন্তু সেই মামুলী গতে বাঁধা বিলাস বিভ্রমের হাব-ভাব তৃষ্ণা, লালসা এ প্রেমের কোন অংশকে কুৎসিত ও পঙ্কিল করে নাই। এ প্রেমের উদ্ভব আত্ম-বিস্মৃতিতে, এ প্রেমের পরিপালন আত্মদন্দ্বে আত্মত্যাগের চেষ্টায়,—আর এ প্রেমের পরিসমাপ্তি—আত্মজয়ে।—

---

* "এই সাহিত্য বিবরণীতে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে গতি লক্ষ্য করিয়া যা দুই চারি কথা বলা হয় তাহারও একটা পরোক্ষ ফল সাহিত্যের উপর ফলে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার একটু আভাস দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সে চেষ্টায় যদি কেহ ত্রুটি দেখেন তাহা আমার ত্রুটি বলিয়া বুঝিবেন, পারিষদের নয়।"—মানসী ও মর্ম্মবাণী—কার্ত্তিক।

লেখিকা দেখাইয়াছেন, এ প্রেমের চরম বেদনাই, পরম সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ! চোখের জল ও বুক ভরা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসেই ইহা আদ্যন্ত পরিপূর্ণ,—তাই সকলের শেষে আমরা 'আন্দু'র মুখেই স্পষ্ট কৈফিয়ত শুনিতে পাই,—'এ হৃদয়হীন ছেলেখেলায় পরিতাপের কুটুম্বিতা নয়, ...এ প্রাণের গোপনে প্রাণের আদর্শ পূজার উন্মাদ সাধনা,...... !" বিদ্যাভূষণ মহাশয় তথাপি ইহাকে "জঘন্য চিত্র" ঠাহরাইলেন কি হিসাবে বলা কঠিন।

সাহিত্যের বার্ষিক বিবরণ প্রস্তুতকারক মহাশয় দায়ের পাট সারিবার জন্য যথেচ্ছভাবে দুই এক কথা বলিবার উদ্দেশ্য মাত্র সম্বল করিয়া "সেখ আন্দু" প্রভৃতি উপন্যাসের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন কি না তাহা আমরা ঠিক জানি না,—কিন্তু তাঁহার মত ব্যক্তির পক্ষে—কার্য্যকারণ-সম্বন্ধহীন অসংলগ্ন বাক্যালোচনা যে শোভনীয় নহে,এটুকু তাঁহার মনে রাখা অবশ্য উচিত ছিল।

সদৃশ চিত্রাঙ্কনে "বাহাদুরীবোধ"কারী পুরুষ লেখকের সংবাদটুকু "আন্দু" উপন্যাস প্রসঙ্গে না গুঁজিয়া দিলেও বোধ হয় বঙ্গসাহিত্যের কোন মারাত্মক ক্ষতি হইত না, এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পদমর্য্যাদারও বোধ হয় তাহাতে কিছুমাত্র হানি হইত না। বরং এ বিষয়ে তাঁহার ভাষা আর একটু সংযত হইলেই ভদ্রতা ও শিষ্টতা বেশী প্রকাশ পাইত।

সংক্রামক রোগের ভয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয় শঙ্কিত হইয়াছেন দেখিয়া, আমরাও বাস্তবিক বড় দুঃশ্চিন্তায় পড়িয়াছি। এবং বড় দুঃখেই প্রশ্ন করিতেছি যে কেবল মাত্র জাতি, ধর্ম্ম, ব্যবসায় এবং উন্নত সামাজিক মর্য্যাদার গণ্ডীর ভিতরই কি মানবজাতির সমস্ত মানবত্ব, মহত্ত্ব, ও বিশেষত্ব নিহিত আছে? তাহার বাহিরে কি কিছুই নাই—এবং থাকিলেও, তাহার দিকে চক্ষু মেলিয়া দৃষ্টি-পাত করা কি এতই দূষণীয় কাজ? মানবাত্মার সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি, অতৃপ্তি, মর্ম্মবেদনা, এ সকল অনুভূতি কি শুধু বিলাসী ধনী সম্প্রদায়েরই একচেটিয়া? পরিশ্রমী দরিদ্রের আত্মার পক্ষে কি একেবারেই অসম্ভব?

বিদ্যাভূষণ মহাশয় লেখিকাকে bold বলিয়া সার্টিফিকেট্ দিয়াছেন; তথাপি তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, "লেখিকা বঙ্গমহিলা হইয়া বঙ্গমহিলার সম্বন্ধে কেমন করিয়া এই জঘন্য চিত্র অঙ্কন করিলেন?"

তুলনায় সমালোচনা করিতে বসিলে এখনই দেশী বিদেশী এমন অনেক লেখক লেখিকার নাম করিতে পারা যায়, যাঁহারা স্বরচিত কাব্য বা উপন্যাসের নায়িকাকে নিছক দেবীত্বের ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত করেন নাই। কিন্তু তাহার প্রয়োজনীয়তা নাই। এই-টুকু বলিলেই বোধ হয় বুদ্ধিমান পাঠক ও সহৃদয়া পাঠিকাগণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে, রামলীলার অভিনয় কেবল মাত্র রামচন্দ্রকে লইয়া চলিতে পারে না,—আরও অনেককেই প্রয়োজন হয়। রাবণ না থাকিলে, রামচন্দ্র অমন পরীক্ষাসঙ্কটে না পড়িলে,—তাঁহার সেই অতুলনীয় চরিত্রস্ফূর্ত্তি আমরা কি দেখিতে পাইতাম?

তবে একটা কথা—নিজের হাতে নিজের হৃদ্-পিণ্ডের উপর অমন শক্ত জোরে ছুরি চালানর সাহস সকলের থাকে না একথা শতবার স্বীকার্য্য।—এ সাহস যে কঠোর দুঃসাহসিকতা, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে লেখিকার এ দুঃসাহসিকতার উদ্দেশ্যটা কি? ইহা কি বাস্তবিকই কেবল বাহাদুরী, না মর্ম্মান্তিক সন্তাপে মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ?—যাহার অন্তরে আত্মপ্রত্যয়-বোধ জাগ্রত হইয়াছে, অনিষ্টকর আত্মাভিমানের অন্ধপূজা তাঁহার নিকট হয়ত লোভনীয় নহে। সত্য, শিব, সুন্দরের জন্য কল্যাণের চরণে আত্মাভিমান বলি দিতে তিনি হয়ত দ্বিধা বোধ করেন না। "সেখ আন্দু" রচয়িত্রী গতানুগতিকের বিধি সাহস পূর্ব্বক উল্লঙ্ঘন করিয়া ভাল করিয়াছেন কি মন্দ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে যথেচ্ছ মতামত ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে বিদ্যা-ভূষণ মহাশয়ের একটু ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না কি?

মামুলী প্রেমের বাঁধিগৎ আমাদের মগজের মধ্যে এমনই জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছে যে, জগৎ চিরদিন গতানু-

গতিকের পথে চলে নাই, চলিবেও না, এই সত্যটা আজকাল আমরা কোন মতেই ধারণা করিতে পারি না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সেথ আন্দু" উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্যটুকু বাদ দিয়া তাহার হাড় ও চামড়া লইয়াই শুধু নাড়াচাড়া করিয়াছেন। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, বাস্তবিকই কি এ উপন্যাসে দেখিবার বিষয়, বুঝিবার বিষয়, শিখিবার বিষয় কিছুই নাই? "সাহিত্য যুগ ধর্ম্ম অবলম্বন করে বলিয়া ইহা লোকশিক্ষা ও সমাজগঠনের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়"—একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আন্দু উপন্যাসের মধ্যেও আমাদের দেখিবার বিষয় কিছু আছে বৈ কি। দাদাজীর চরিত্রের মধ্যেও কি বিদ্যাভূষণ মহাশয় দেখিবার কি বলিবার মত কিছু পান নাই?

শুধু অংশকে লইয়া অনাবশ্যক তর্ক কোলাহল এবং অসার ও অযৌক্তিক মতামত ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত ব্যক্তির পক্ষে, দায়ীত্বজ্ঞানের মর্য্যাদা স্মরণ রাখিয়া, সমগ্রকে উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা একান্ত উচিত ছিল। শিক্ষিতা বঙ্গমহিলার নিরবচ্ছিন্ন কুৎসা সৃষ্টির জন্যই "সেথ আন্দু" রচয়িত্রী উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সেথ আন্দু" পাঠে কি ইহাই বুঝিলেন?—যদি বাস্তবিকই তাহাই বুঝিয়া থাকেন, তবে ইহা যে একান্তই দুঃখের বিষয় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে আমাদের মনে হয় যে, লেখিকা মহাশয়া নির্ভীক দৃঢ়তার সহিত অসংযত উচ্ছৃঙ্খলতার পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া দেখাইয়াছেন, স্ত্রী হৌক পুরুষ হৌক—ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষা-সার্থকতা গৌরবের জিনিষ, কিন্তু অসার শিক্ষাগর্ব্ব তাহার আত্মার অপমানের হেতু! তাই অলীক কল্পনার ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্যা লতিকাকে আমরা এমন দৃষ্টিবিক্ষোভ ও চিত্তগ্লানি-উৎপাদনকারিণী বেশে দেখিতে পাই। কিন্তু ইহার জন্য লেখিকাকে অপরাধী করা কি ন্যায়সঙ্গত বিধি?

বিশ্বের মানব-প্রকৃতি বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ। মানুষ মন্দ নহে, প্রকৃতির পাকচক্রে মানুষ নিজের হাতে ভালমন্দের শৃঙ্খল পরে এবং খুলে। সংঘর্ষণ ব্যতীত মহত্বের বিকাশও সম্ভবপর নহে। সেই জন্যই 'আন্দু'র পাশে ঐ নারী-চরিত্র দুইটি আমরা আলম্বন-বিভাব ও উদ্দীপন-বিভাবরূপে অঙ্কিত দেখিতে পাই। তথাপি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথিত "জঘন্যতা" আমরা মানিয়া লইতে পারি না। "প্রেমে পড়া" আর উন্নত চরিত্র মাধুর্য্যের গুণমাহাত্ম্যে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে অজ্ঞাতে মুগ্ধ হইয়া পড়া কি একই ব্যাপার? কখনই না!

যদি বলেন, একজন সামান্য শোফেয়ারেক এরূপ মহৎ করিয়া আঁকিয়া লেখিকা ভাল করেন নাই, তবে আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে—জাতি বা ব্যবসায়ের অপরাধে মানুষের ব্যক্তিত্বের গুণগৌরবও নামঞ্জুর হওয়া কখনই উচিত নহে।

আসল কথা, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সংস্কারের উপর ঝোঁক দিয়া, মাত্র সেই আদর্শের পরিমাপে বিশ্বের বিচিত্র্য আদর্শ ও বিভিন্ন বিশেষত্বকে মাপজোক করিতে বসিলে, তাহার ফলে স্বেচ্ছাতৃপ্তিকর বাক্যালোচনা সুন্দররূপে চলিতে পারে, কিন্তু সত্যকার সাহিত্যালোচনা তাহাতে খর্ব্ব ও আহত হয়; সহৃদয় ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

ধ্রুব

(১)

যা কিছু সুন্দর আছে এই বিশ্বমাঝে,—
বসন্ত-শরৎ-সন্ধ্যা-উষায় নিশায়,
কূজনে গুঞ্জনে মন্ত্রে পুষ্প-শষ্প সাজে—
সবই যেন মিশে আছে তব তনিমায়।
যা কিছু মঙ্গল আছে জীবের জীবনে,—
শঙ্খস্বরে, লাজ-বর্ষে, দেবের পূজায়,
সতীর কঙ্কণস্বনে, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে,—
সবই যেন মিশে আছে তব মহিমায়।
যাহা কিছু সত্য আছে নিত্য সনাতন,—
জ্ঞানে, কর্ম্মে, জাগরণে, শাশ্বত তৃষ্ণায়,
লভে যাহা ধ্যানমগ্ন মানস-নয়ন,—
সবই আছে তব পুণ্য প্রেম-গরিমায়।
সত্য শিব সুন্দরের পূত আশীর্ব্বাদ,
মূর্ত্তি ধরি এসেছ কি বিভুর প্রসাদ ?

(২)

আশৈশব সুন্দরের অর্চ্চনার লাগি,
বিন্দু বিন্দু করি অর্ঘ্য করি আহরণ,
সাজানু বরণডালা। রাত্রি দিন জাগি,
প্রেমপুষ্পে গাঁথিলাম মালিকা শোভন।
তুমি এসে দেখা দিলে কল্যাণের রূপে—
সীমন্তে সিঁন্দুর-বিন্দু, পুণ্যশঙ্খ করে,
লাজ-বর্ষে, বংশীস্বনে, মলয়জে, ধূপে
পবিত্র করিয়া গৃহ মঙ্গল-বাসরে।
অর্ঘ্য মাল্য কারে দিব খুঁজিনু যখন,
কল্যাণী আসিলে তুমি পুণ্য দেহ ধরে,
তব পদে নির্ব্বিচারে দিলাম তখন
স্বর্ণমোতি রূপ মোহ ভুলায়নি মোরে।
কোথা তাই পূর্ব্বরাগ, মূর্ত্তা মন্ত্রবাণী
একই দিনে হলে মোর চির-হৃদিরাণী।

(৩)

আমি কোথা ছিনু আর তুমি কোথা ছিলে,
কোথা হতে হলো এই অপূর্ব্ব মিলন ?
ছিলনাক পরিচয়, কেমনে চিনিলে ?
মিলাইয়া দিল বল কোন্ আকর্ষণ ?
শুধু তাই নয় সখি, প্রথম মিলনে
সারা এ জীবন জোড়া সঞ্চিত প্রণয়
সকলি লইলে হরি মুহূর্ত্তের ক্ষণে ;
বিনা পূর্ব্ব আয়োজনে একেবারে জয়।
তাই মনে হয় সখি, তাই মনে হয়,
পরিণয় উৎসবের সুমঙ্গল ক্ষণে,
রম্যবস্তু হেরি আমি গৃহাঙ্গনময়
শুনিয়া মধুর বাঁশী সবই এলো মনে।
পুরা-জনমের স্মৃতি, সবই এলো ফিরে,
পূর্ব্ব মিলনের প্রেম সবই ধীরে ধীরে।

(৪)

প্রাক্তন-জনম-বিস্মৃতা তুমি মোর প্রিয়া,
জীবাত্মার গুপ্ততলে আছিলে নিহিত ;
সহসা সে শুভক্ষণে হৃদয় মথিয়া
অন্তরের অন্তরীক্ষে হইলে উদিত।
প্রেম কাম সুরাসুরে মথিল যখন
আমার জীবনসিন্ধু, উদিলে ইন্দিরা
সঙ্গে ইন্দু পারিজাত কৌস্তুভ রতন,
পিয়ে নিল জয়ী প্রেম অমৃত মদিরা।
সহসা উদিলে তুমি তারাপুঞ্জোপম
জীবন-গগন মাঝে চন্দ্রের পরশে ;
গঙ্গাবক্ষে লক্ষ লক্ষ মরালের সম
শারদ ইঙ্গিত মাত্রে জাগিলে হরষে।
প্রাক্তন-জনম-বিস্মৃতা তুমি মোর প্রিয়া,
ব্যক্ত হলে প্রকৃতির সঙ্কেত লভিয়া।

(৫)

বলেছেন ভর্ত্তৃহরি, "নারীর যৌবন,
অস্থি মজ্জা রক্তমাংস এই সব নিয়া,
তার লাগি এত কেন পিপাসা ভীষণ ?
কেন তার পায়ে দিবে সবই বিকাইয়া ?"

বিরাগী কবির পায়ে করি নমস্কার
জিজ্ঞাসি কবিরে, শুধু রক্তমাংস তরে
করেছি কি তারে মোর জীবনের সার ?
দেবতা সুন্দর যে গো করেছে মন্দিরে !
পঞ্জরের অন্তঃস্থলে যেবা আছে জাগি
তার লাগি অন্ধ দ্বারে মাথা কোটাকুটি ;
দুটি দেহ ব্যবধান টুটাবার লাগি,
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শুধু ভ্রান্ত ছুটাছুটি।
ভোগমগ্ন আলিঙ্গন, বক্ষে নিপীড়ন—
কঠিন প্রয়াসে শুধু তারই অন্বেষণ।

(৬)

না পেলে প্রাণের সাড়া, অস্থিমাংস দ্বারে
তৃপ্তি লাগি কেবা বল যাবে বারে বারে ?
না পেলে প্রেমের সাড়া অঙ্গে অঙ্গ দিয়া
কে জুড়াবে অস্থিমাংসে তৃষাতপ্ত হিয়া ?
দেবতা জাগ্রত যদি না রহে দেউলে,
কে জাগিবে নিশিদিন সোপানের মূলে ?
একেরে মিলেনা বলি, বুকে বুক দিয়া,
লাখ লাখ যুগ ধরি জুড়ায় না হিয়া।
অরূপে মিলেনা হায়, তৃপ্তি নাহি পাই
জনম অবধি রূপ নেহারিয়া তাই।
বাঁশরী বাজায়ে কানু কাননে লুকায়,
আমরা খুঁজিয়া ফিরি লতায় পাতায়,
মানিনা কণ্টকবন স্বণিত পবন—
শ্যামের সন্ধান সবই করেছে নির্ম্মল।

(৭)

অধ্রুবের প্রেমে ডুবি যে আনন্দ পাই
তাই কত তাই কত, তবুও ত হায়
ম্লান হয়, ক্ষয় পায়, হারাই হারাই
নৈরাশ্য ডাকিয়ে দিয়ে কোথায় পলায়।
নিমেষে ফুরায়ে যায় তার নবীনতা
তবু তাহা কি সুন্দর হৃদয়-তর্পণ ?

হে ধ্রুব, তোমার প্রেমে কত সরসতা,
স্মরিতে জাগিয়া উঠে অঙ্গ-শিহরণ।
ক্ষয়হীন, গ্লানিহীন, অশ্রান্ত, নির্ম্মল
সে যে কি আনন্দরস হবে ওগো প্রিয় !
আকণ্ঠ ডুবিয়া যাহে জীবন সফল,
অক্ষুণ্ণ অমৃতরস অনির্ব্বচনীয় ?
তব প্রেম-শিখরেতে চিত্ত যবে যাবে,
নীচের আনন্দ হেরি শুধু হাসি পাবে।

(৮)

ধ্রুব যাহা, নিত্য যাহা, যাহা সনাতন,
সেই শুধু মহাতীর্থযাত্রা-অধিকারী।
অধ্রুবের শক্তি কোথা ? ক্ষুদ্র সে জীবন
কতদূর যেতে পারে পথের ভিখারী ?
মোরা অতি দীনহীন অনিত্য নশ্বর,
প্রেম বিনা আর কিছু নাহিক বৈভব,
দূর তীর্থে যেতে তবু চাহে গো অন্তর ;
বুঝিয়াছি প্রাণে প্রাণে ধ্রুবের গৌরব।
এই প্রেমে দিই যদি ধ্রুব পদতলে
ভৃত্য করি, দাস্য যদি লয় মাথা পাতি ;
তবে স্নেহ লভি তার, বহু সেবা ফলে
যাত্রাপথে তবে তার হতে পারে সাথী।
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে
রাজেন্দ্র সঙ্গমে, তবে যাব তার সনে।

(৯)

ধ্রুবের পিয়াসা যদি জাগে একবার,
তবে সে রহিবে জাগি নিত্য চিরন্তন।
শাশ্বতের লাগি প্রেম, মরণ তাহার
আনিতে পারে না বিশ্বে শতেক শমন।
অধ্রুবের প্রেম—সে ত অধ্রুবেরই স্মৃতি ;
নিমেষে লুকায়ে যায় সরসতা সনে।
নশ্বরের চিতা পরে নশ্বরের প্রীতি
সহমৃতা হয়ে লভে অনন্ত শয়নে।

নীড় হতে নীড়ান্তরে ঘুরি পক্ষিগণ
হারাবে আশ্রয় যবে কালঝঞ্ঝা-বায়,
অনাদি শাশ্বত সেই অনন্ত গগন
তখন করিবে সার নির্ম্মল উষায়।
অধ্রুবে দহিবে যজ্ঞে ধ্রুবানলশিখা;
ধ্রুব সে দাঁড়াবে স্থির পরি ভস্মটীকা।

(১০)

হতাশ হয়োনা বন্ধু, হয়োনা হতাশ,
অধ্রুবের জয়-চিহ্ন হেরি চারিদিকে।
সবাই খুঁজিছে পথ, ধ্রুবের আভাস
পেয়েছে, ফিরিবে তারা ঠেকে ঠেকে শিখে।
পৃথ্বীও বিপুল বটে, কাল নিরবধি,
পড়ে আছে সম্মুখেতে জন্ম জন্মান্তর;
এ জীবনে ভ্রম তার নাহি ঘুচে যদি,
আগামী জীবনে সে ত হবে অগ্রসর।
ভুলিয়াছে কেহ পথ নিঝর সলিলে
অরণ্য ধাঁধায় কারো চলে গেছে রথ;
একে একে সব পথ ভুল জেনে নিলে,
সম্মুখে উঠিবে জাগি সেই ধ্রুবপথ।
ধ্রুব হতে একে একে দূরে গেছে চলে,
অন্তিমে ফিরিবে সবে ধ্রুব পদতলে।

শ্রীকালিদাস রায়।

আমার জীবন

(গল্প)

"আমার এ জীবনকাহিনী আমি লিখিতাম না" —আত্মজীবনচরিত-রচনাকারী অনেকেই এই বাক্যটির দ্বারাই গ্রন্থারম্ভ করেন। লিখিবার একটা না একটা অনিবার্য্য কারণও সঙ্গে সঙ্গে দর্শাইয়া থাকেন। আমি সুতরাং ও পথ পরিত্যাগ করিলাম। পাঠকগণ জানিয়া রাখুন, আমি—খোস মেজাজে বলিতে পারি না—কিন্তু সুস্থদেহে বহাল তবিয়তে এবং বিনা কাহারও অবৈধ উত্তেজনায় (undue influence) আমার এই জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আর একটা কথা। অনেকেরই আত্মচরিত হইতে বিনয়ের সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া এই উপদেশবাণী ফুটিয়া উঠে—"আমার মত কে আছে? তোমরা সকলে আমার মত হইতে চেষ্টা করিবে।" আমার এই কাহিনীর উপদেশ—"সাধু সাবধান—আমার মত কেহ হইতে চেষ্টা করিও না।"—যদি একজন মনুষ্যও ইহা পাঠে সাবধান হয় তবে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এইবার আরম্ভ করি।

এখন আমার মাসিক পত্র উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ হয়ত আমায় চিনিতেই পারিবেন না, তাঁহাদিগের অবগতির নিমিত্ত জানাইতেছি আমি ভূতপূর্ব্ব "অঞ্জলি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ঠিক কত বয়সে এই বঙ্গসাহিত্য-সেবারূপ দুরারোগ্য ব্যাধি যে আমায় আক্রমণ করিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। বয়স কমাইয়া, অতি শৈশবাবস্থায় আমার হৃদয়ে কবিত্বের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল বলিয়া নিরীহ পাঠককে প্রতারণা করিব না। তবে এটা বেশ মনে আছে, স্কুলে খুব নীচে ক্লাশে যখন পড়িতাম, তখন রামায়ণ, মহাভারত ও অন্নদামঙ্গল পড়িয়া পড়িয়া "পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে" পদ্য লিখিতাম বটে। তখন 'কবিতা' নাম চলিত হয় নাই—সমিল পদকে লোকে পদ্যই বলিত। কি যে লিখিতাম তাহা আজ একেবারেই মনে করিতে পারি না, কিন্তু লিখিতাম খুবই। একখানি শ্রীরামপুরে কাগজের খাতা ছিল—তাহাতে

সেগুলি বেশ ভাল করিয়া নকল করিয়া রাখিতাম। এ সময়টা ছিল ভালই। কোন জ্বালা যন্ত্রণা আশা দুরাকাঙ্ক্ষা কিছুই ছিল না। লিখিতাম মাত্র। তাহাও বিশেষ সতর্কতার সহিত—পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে। পড়ার ডেস্কের ভিতর অনেক পুরাতন খাতার মধ্যে আমার সেই পদ্যের খাতাখানা লুকান থাকিত।

বাবা দর্ম্মহাটায় লোহার আড়ত করিয়া বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতেন। কলিকাতায় একখানি বাড়ীও করিয়াছিলেন। আমি ধনীর সন্তান।

আমার নিজের আর ভাই বা ভগিনী কেহই ছিল না। পিতা মাতার অধিক বয়সের একমাত্র সন্তান বলিয়া আমার আদর যত্ন একটু বেশী পরিমাণেই ছিল। না হইবে কেন? প্রৌঢ় পিতামাতার—কত ভাগ্যের আমিই একমাত্র বংশধর! আমার বাঁচাই তাঁদের যে পরম কামনা!

পিতামাতা মনে না কষ্ট পান্, সেই জন্য আমারও প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল, কি করিলে আমি বাঁচিয়া থাকি। সুতরাং বুড়া বাপ মায়ের মুখ চাহিয়া এই দিকেই আমায় অধিক মনোনিবেশ করিতে হইল। লেখাপড়ার সুবিধা হইল না।

বাবা আমায় প্রথমে ত স্কুলেই যাইতে দিতেন না, পাছে একাকী কোনও বিপদ বাধাইয়া বসি। পরে, ঘরের গাড়ীতে চড়িয়া চাকরের কোলে বসিয়া স্কুল যাইতে লাগিলাম। তখন আমি বেশ বড় হইয়াছি মনে আছে, কিন্তু কতবড় তাহা বলিতে পারি না। কারণ, মনে আছে, এই স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা আমাকে "খোকাবাবু এসেছে রে খোকাবাবু এসেছে" বলিয়া নানারূপ পরিহাস করিত। কেহ কেহ "নির্ভীক সমালোচকের" মত রূঢ় ভাষায় বলিত "ধেড়ে ছেলে, আবার কোলে চড়ে আসা হয়েচে।" এই প্রথম ধাক্কা খাইয়া, কোলে বসিয়া আর স্কুল যাইতাম না।

বাপ মায়ের জীবনানন্দ হইয়া দিন দিন বেশ বাড়িয়া চলিলাম। কোনও ভাবনা নাই। পৃথিবীর সমস্ত ছাত্র অপেক্ষা আমার ছাত্রজীবন অনেক বেশী সুখের ছিল। কারণ, স্কুলে বা বাড়ীতে কখনও কেহই আমায় একদিনের জন্যও পড়িতে তাগাদা করেন নাই। এজন্য এখানে আমি আমার শিক্ষকদের নিকটও অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বড় লোকের ছেলের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মত, লেখাপড়াও ধীরে ধীরে নীরবে চলিতে লাগিল। ফলে, এক এক ক্লাসে দুই বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত চলাফেরা করিয়া অবশেষে আমি প্রবেশিকার তোরণদ্বারে পৌঁছিলাম। সে দ্বার পার হওয়া কিন্তু আমার সাধ্যাতীত হইল। সুতরাং স্কুল হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইহার আরও এক কারণ ঘটিল, এই সময়ে পিতার মৃত্যু হয়। তখন আমার বয়স বিশ বৎসর।

আমার দূর সম্পর্কীয় অমূল্য দাদা বহুদিন পরে বাঁকীপুর হইতে বাড়ী আসিলেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম তিনি একজন কবি। কয়েকখানি মাসিকপত্র খুলিয়া নিজ রচনাও আমায় দেখাইলেন। আমি সেগুলিকে "পদ্য" বলিলে তিনি আমায় বুঝাইলেন ও শব্দটা নিতান্ত গ্রাম্য—এখনকার লোকে বলে "কবিতা"। মাসিক পত্রও এই প্রথম দেখিলাম। আমার পিতার আড়তে কখনও উক্ত পদার্থের নামও শুনি নাই।

অমূল্যদাদাই হইলেন সাহিত্যে আমার দীক্ষাগুরু।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবিত্বরূপ এক দুরারোগ্য ব্যাধি বাল্যকাল হইতেই আমার মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিল—এখন সে ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল।

আমি যাবতীয় মাসিকপত্রের গ্রাহক হইলাম। উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর প্রায় সমস্ত মাসিকেই অমূল্য দাদা রচনা পাঠাইতেন।

যে সকল বড়লোকের নাম শুনিতাম, তাঁহাদের লেখাগুলি অতি মনোযোগ সহকারে পড়িতাম; আর খুঁজিতাম, বড়-লেখার সেই লুকানো কলকাঠিটি কোথায়। সেটার যদি একবার সন্ধান পাই, তো আমায় আর পায় কে? কিন্তু সে মায়ামৃগের কোনও সন্ধান পাইলাম না। কাযেই, মাসিক পত্রে প্রকাশিত

কবিতাগুলি আগে পড়িয়া, তাহাদের ভাব, কতক কতক ভাষা, ভাল মনোমত শব্দ চুরি করিয়া আমি কবিতা লিখিতে সুরু করিলাম।

পিতৃবিয়োগের পর একবৎসর গত হইলে আমার বিবাহ হইল। সুন্দরী দেখিয়াই বিবাহ করিয়াছিলাম।

বিবাহের পূর্ব্বে সব কবিতাই মানসী-প্রিয়ার উদ্দেশে রচিত হইত কিন্তু ইদানীং হাতের গোড়ায় পাইয়া বধূর স্কন্ধেই আমার কবিতা চড়িয়া বসিল। সে বালিকা। তখন তাহার বয়স মাত্র একাদশ। সে বেচারী অস্থির হইয়া উঠিল। একা আমার কাছে আসিতে সে আতঙ্কিত হইত—পাছে কবিতা শুনিতে হয়। কলিকাতার বাসায় বসিয়া সে "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল" পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে বিদুষী ঠাওরাইয়া মনে অপূর্ব্ব পুলক ও প্রসাদ অনুভব করিয়াছিলাম। সুতরাং কবিতায় ভাবা, কবিতার স্বপ্ন দেখা—পৃথিবীর যাবতীয় কার্য্যই আমি কবিতায় সম্পন্ন চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

(২)

চারিবৎসরে দুইটি কন্যাসন্তান জন্মিল। চটিয়া স্ত্রীকে কবিতা শোনান বন্ধ করিয়া দিলাম।

ভাল প্রাণের বন্ধু আমার কেহ ছিল না যে প্রাণ খুলিয়া দুটা কথা কই। মাসিকপত্রে আমার লেখা নাই বা প্রকাশ হইল—আমি কবি ত বটে! আমি যে কবি, তখন এ বিশ্বাসটুকু আমার দৃঢ় হইয়াছিল। সুতরাং কবিতা শোনাইবার লোক খুঁজিতে লাগিলাম। আর শুধুতো শোনাইলে চলে না—"কেমন লাগ্‌লো"—এই প্রশ্নের যাহা ভদ্রতাসঙ্গত একমাত্র উত্তর, তাহার মধ্যে যে কি সুধা সঞ্চিত আছে, তাহা আর লেখকশ্রেণীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। নিজের লেখা যত বেশী লোককে নিজে পড়িয়া শোনান যায়, লেখকের তত বেশী চরিতার্থতা। কিন্তু আমার অদৃষ্টে এ তৃপ্তি-সুখ তখন পর্য্যন্ত ভালমত ঘটে নাই। এজন্য প্রাণে সর্ব্বদাই একটা নিদারুণ অস্বস্তি অনুভব করিতাম। দুটি একটি কবিতা রোজই লিখিতাম; কিন্তু লিখিয়া, উক্তরূপে শোনাইবার লোকাভাবে—অমন সুন্দর সুন্দর কবিতা যেন প্রাণহীন বিস্বাদ বলিয়া বোধ হইত।

আবার, শুধু লিখিয়া ফল কি? অমূল্য দাদার মত, ছাপাইবার ব্যবস্থা কেমন করিয়া হয়? ভাল ভাল চিঠির কাগজে, খুব ধরিয়া ধরিয়া,সাধ্যমত স্পষ্ট ও সুন্দর অক্ষরে কবিতাগুলি নকল করিয়া, ২।১টি করিয়া সমস্ত মাসিকপত্রে পাঠাইতে লাগিলাম। ফেরৎ-প্রাপ্তির জন্য অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটও সঙ্গে পাঠাই।

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এমন, অনেক কবিতাই বামদিকের কোণে "অমনোনীত" লিখিত হইয়া ফেরৎ আসে। কোন কোনও কাগজওয়ালা ছাপেনও না, ফেরতও দেন না, টিকিটখানি আত্মসাৎ করেন। তাঁহাদিগকে চিঠির পর চিঠি দিই, উত্তর নাই।

অবশেষে গ্রাহক নম্বর দিয়া কবিতা পাঠাইতে সুরু করিলাম। কাগজ ছাড়িয়া দিবার যখন ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলাম—তখন কেহ কেহ দশটির মধ্যে বাছিয়া একটি ছাপিতে লাগিলেন। প্রাণ বাঁচিল—হাতে স্বর্গ পাইলাম।

বছরু চারেক এইরূপ উমেদারী করিয়াই আমি 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি' হইয়া উঠিলাম—অর্থাৎ বহি ছাপাইলাম। সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল।

সাহিত্যসভায় যাই, সাহিত্যিকদিগকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করি, "বেঙ্গলী"তে সেই সব সংবাদ বাহির হয়, আর বুকখানা দশ হাত হইয়া উঠে। এইরূপে আরও তিনবৎসর কাটিল।

প্রায় সমস্ত সম্পাদকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হইয়াছে। কেহ কেহ আমার নানাবিধ সদ্‌গুণ এবং বিপুল প্রতিভা দেখিয়া, ছোট গল্প লিখিতে উপদেশ দিলেন। অনেক সম্পাদকই বলিলেন—"কবিতা, মশায়, আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি পাই—কিন্তু ছোট গল্পের বড় অভাব। অথচ ঐটেই সবাই পড়ে। আর গল্প নৈলে

মাসিকও চলে না। কবির চেয়ে গল্প লেখকের আদর বেশী।"

বুঝিলাম, কবিতা যতই ভাল হউক না কেন, উদীয়মান কবি ছাড়া সে মধুর অন্য ভ্রমর নাই; কিন্তু গল্প যেমনই হউক, সেটি পড়িবেনা মাসিকপত্রের এমন পাঠক অতি বিরল।

গল্পলেখকদের অধিক আদর? তথাস্তু। কবিতা লেখা ছাড়িলাম। গল্প ধরিলাম।

কবিতা ছাড়িবার আরও কারণ ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যেই আমার চারিখানি কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিতরে যাহাই থাকুক্ না কেন, ছাপা বাঁধাই কাগজ ও আপন আলোকচিত্রে বই কয়খানিকে যতটুকু সম্ভব শোভন করিয়াছিলাম। সুন্দর মরক্কো চামড়ার বাঁধাই—যার মলাটের দামই অন্ততঃ দুই টাকা—আর্ট কাগজে ছাপা, এক পৃষ্ঠার পদার্থকে চারিপৃষ্ঠায় বাঁটিয়া আয়তন বাড়াইয়াও দাম নামে মাত্র একটাকা ধার্য্য করিয়াছিলাম—কিন্তু তথাপি চারিখানি পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থে একখানি পুস্তকের এক-চতুর্থাংশ খরচ পর্য্যন্ত উঠিল না।

বিজ্ঞাপনের কসুর করি নাই। দৈনিক সপ্তাহিক মাসিক—সমস্ত কাগজে কবির ফটো ও বইয়ের ব্লকসহ মাসে মাসে পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছিলাম। সমালোচনাও ভাল রকম হইয়াছিল, কিন্তু হায়রে বাঙ্গলা দেশের "ভবী"গণ! কিছুতেই তাহারা ভুলিল না। আমার বই বিক্রয় হইয়া টাকা উঠিল না বলিয়া যে দুঃখ, তাহা নয়। আমার ইচ্ছা পুস্তক প্রচার—নাম প্রচার! এ দু'য়ের একটিও হইল না এই দুঃখ!

কবিতা দ্বারা যখন উক্ত কার্য্য 'সিদ্ধ' না হইয়া 'দগ্ধ'ই হইল, তখন কবিতা ছাড়িব না কেন?

আর একটা কথা। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা—বিজ্ঞাপন অনুসারে নহে—সত্য সত্যই—শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক, তাঁহারাও জীবনের আদিম বর্ব্বরাবস্থায় কবিই ছিলেন। কবিতাতেই তাঁহাদের হাতে খড়ি। আমার সঙ্গে মিলিয়া গেল। আর কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক—আমার কপালে গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিকের অমর-যশ অলক্ষ্যে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে—আমি দিবালোকের মত পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম। আমি অবধারিত বিখ্যাত ঔপন্যাসিক।

পাঁচবৎসর ক্রমান্বয়ে গল্প লিখিলাম। তাহার অনেকগুলি মাসিক পত্রে বাহিরও হইল।

কবিতার পিণ্ড ছাড়িয়া, গল্পের ষোড়শ করিয়া পাঁচ বৎসর বঙ্গভারতীর মাসিক ক্রিয়া করিলাম। পাঁচখানি গল্পপুস্তকও ছাপিলাম। তবু দেখি, গল্পলেখক বলিয়া আমায় কেহ গ্রাহ্যই করে না। কোনও প্রসঙ্গে গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিকের নাম করিতে হইলে, বহুকাল-শ্রুত পরযশাপহারী সেই কয়জনের নামই করে, আমার নাম কেহ করে না। রাগে অভিমানে আমার হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

(৩)

গত বৎসর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে—এবার পত্নীও স্বর্গারোহণ করিলেন।

চারিটি শিশু কন্যা রাখিয়া পত্নী যখন এমন অকালে চলিয়া গেলেন—তখন দুঃখিত অপেক্ষা বিপন্নই বেশী হইয়াছিলাম। ঘরে আমার বৃদ্ধা বিধবা পিতৃস্বসা ও তাঁহার একটি বিধবা কন্যা ছিলেন, সেই অনেকটা সুবিধা হইল। আমার দিদি শিশুগুলিকে পালনের ভার লইলেন। আমি অকূলে কূল পাইলাম।

একমাস যাইতে না যাইতেই, তাঁহারা আবার আমায় সংসারী হইয়া পুত্রমুখ দর্শনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি সে কথায় একবারে কর্ণপাত করিলাম না।

পত্নীবিয়োগে আমি যে দুঃখিত হই নাই তাহা নহে, —তবে সত্য কথা বলিতে গেলে সে দুঃখটা কাল্পনিকই বেশীমাত্রায় এবং সে শোকপ্রকাশের ভাণও হইল অতিরিক্ত। যদিও সন্ন্যাসী হইয়া লোটা কম্বল লইয়া সংসার ত্যাগ করিবার মৎলব করি নাই, কারণ তাহাতে অনেক বিঘ্ন, তবে পত্নীর

শোকে এই সুযোগে আর একখানি "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" লিখিব, এ প্রতিজ্ঞা শ্মশান হইতে ফিরিবার পথেই করিয়াছিলাম। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই একখানি বহির মত কতকগুলি কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। কতক মাসিকেও ছাপা হইল, বাকী মাসিকের জন্য অপেক্ষা না করিয়া একবারে কাব্যাকারে প্রকাশ করিলাম। পত্নীর নাম ছিল মায়া, কাযেই কাব্যের নাম রাখিলাম "মায়ার ডোর"।

বিপত্নীক হইয়া অন্ততঃ একটি বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইলাম। এতদিনে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, এইবার আমি বঙ্গসাহিত্যে সত্য সত্যই বিখ্যাত এবং অমর হইব। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া জলধর সেন অক্ষয় বড়াল প্রভৃতি কত কত বঙ্গ-ভারতীর বরপুত্র বিপত্নীক —অন্ততঃ প্রথম পক্ষের স্ত্রী কাহারও জীবিত নাই।

আরও ভাবিলাম, এইবার সাহিত্যচর্চায় ষোল আনা মনঃসংযোগ করিবার সুবিধা হইল। সাহিত্যসেবাও একপ্রকার সন্ন্যাস—সুতরাং বিবাহ আর কোনমতেই করা হইতে পারে না।

বয়স আমার তখন ৩০।৩১—পূর্ণ যৌবন, অন্নচিন্তা ছিল না, রক্ত গরম, সবই সাজিত।

যাহা হউক, এই সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আমি একরকম অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াই কাগজে কাগজে "মায়ার ডোর" সমালোচনা করিতে পাঠাইলাম।

ভাবিয়াছিলাম, সকল কাগজেই বহিখানির অজস্র প্রশংসা হইবে। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। অধিকাংশ কাগজেই বহিখানির নিন্দা বাহির হইল।

বুঝিলাম—সাহিত্যের বাজারে আমার বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। ভিতর হইতে হৃদয়দেবতা ঢক্কানিনাদে কেবল আদেশ করিতে লাগিলেন— "বৎস নিরীহ নির্দ্দোষী নবীন, যদি বঙ্গসাহিত্যে যশে অমর হইতে চাও, এ অন্যায়ের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ কর, কর, কর।"

সমস্ত সম্পাদকের প্রতি আক্রোশ আমার বাড়িয়া উঠিল। শান্ত ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে মূলতঃ ইহারাই অধিকতর দোষী।

আমার বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি। প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ অক্লান্তভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছি। ইহা সত্ত্বেও যখন কতকগুলি অর্ব্বাচীন যুবক-সমালোচক আমার লেখাকে যাচ্ছেতাই বলিতেছে, তখন তাহা যে রাস্কেল প্রকৃতি সম্পাদকগণের ইঙ্গিতেই হইতেছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না।

বুক বাঁধিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কাহাকেও লেখা দিবনা—দুয়ারে মাথা কুটিয়া মরিয়া গেলেও, না। দেখি কেমন ঠিক মাসের পয়লা তারিখে তাহাদের কাগজ বাহির হয়! আমার গল্প এবং কবিতার জন্য নিশ্চয়ই আটকাইয়া যাইবে—তখন এই অশরণের শরণ লইতেই হইবে।

এই ভরসায় সম্পাদকদিগকে খুব কড়া করিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। যে যে কাগজে আমার নিন্দা বাহির হইয়াছে, তাহাদিগকে তাদৃশ রচনা প্রকাশ করার জন্য বিস্তর ভর্ৎসনা করিলাম। তাহারা জবাব দিল— "মশায়, অমুককে কি জানেন না? তাঁর লেখা ফেরৎ দিই কি করিয়া? তা ছাড়া, আমরা কোনও লেখকের স্বাধীন মতামতের উপর হস্তক্ষেপ করি না।"

দুইদিন দশদিন বিশদিন একমাস দুইমাস অপেক্ষা করিলাম—একখানা চিঠি পর্য্যন্ত আসিল না। বোধ হয় সবাই চটিয়া গিয়াছে। রাস্তায় কোন সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি কতপ্রকার আলাপ পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা করেন, কিন্তু লেখা চাহেন না। আমার গা জ্বলিয়া যায়। কাযে অকাযে সকালে বিকালে মাসিকপত্র কার্য্যালয়ের সম্মুখ দিয়া অকারণ ব্যস্তভাবে চলিয়া যাই—যদি কেহ ডাকে! উঃ কি অহঙ্কার এই মাসিকপত্র সম্পাদকদের! কি অবিনয়!

সম্পাদকগণের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া কিছুদিন আমার লেখা ছাপা হইল না বটে, কিন্তু আর দু'একটি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বয়স প্রায় চল্লিশ হইলে কি হয়, তখনও বঙ্গসাহিত্যের সেবায় আমার

যুবক-কবির মত অদম্য উৎসাহ, অধীর উচ্চাশা এবং অমিত অধ্যবসায়। তবু কিছুদিন চাপিয়া চুপিয়া কোনও রকমে দিন কাটাইলাম। পরে, দিন যাওয়া যখন দুর্ঘট হইয়া পড়িল—তখন ছোট কন্যা দুটির বিবাহের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলাম। প্রথম দুইটির বিবাহ পূর্ব্বেই দিয়াছিলাম।

ভগবান যাহা করেন, ভালর জন্যই করেন। ভাগ্যে সেই সময়ে এই কার্য্য করিয়াছিলাম—নহিলে আজ কন্যার বিবাহ আমার মহাদায় হইয়া উঠিত।

(৪)

চারিটি কন্যার বিবাহ ও বারখানি "বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ" প্রচার করিতে আমায় ব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ত্রিশহাজার টাকা বাহির করিতে হইয়াছে। সুতরাং মাসিক সুদের হারও বিলক্ষণ কমিয়া গেল। গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া একদমে খরচ অনেকটা কমাইয়া ফেলিলাম। সুবুদ্ধিটা সময় থাকিতেই হইয়াছিল বলিতে হইবে—নচেৎ এই ত পরিণাম! সম্পত্তির মধ্যে তো ব্যাঙ্কের এই অবশিষ্ট বিশহাজার মাত্র টাকা! বড়লোক যে নয়, তার বড়লোক-প্রসিদ্ধি যে কি কষ্টকর, তাহা আমার মত যদি এ পৃথিবীতে আর কেউ থাকেন তো তিনিই বুঝিবেন। এটা না হয় আমি কোনও মতে চাপা দিতে পারি, কিন্তু প্রার্থীর দল তাহা বুঝে না। তাহারা পূর্ব্বপুরুষের মুক্তহস্তে দান সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে অসামান্য উদাহরণ দিয়া বিষম লজ্জায় ফেলে।

কি বিপদেই পড়িয়া গেলাম! না অর্থের দিক হইতে, না যশের দিক হইতে—কোনও দিকেই সুবিধা হইতেছিল না। একমাত্র সান্ত্বনার স্থল ছিল—আমার ভক্তবৃন্দ। তাহারা সন্ধ্যার পর আমার বৈঠকখানায় আসিয়া, আমার যে কোনও কবিতা বা যে কোনও গল্প পড়িয়াই, "অতি চমৎকার, অতি চমৎকার, বাঙ্গলা ভাষায় নূতন—একেবারে প্রথম শ্রেণীর" প্রভৃতি দেশী বিদেশী ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করিত এবং সুললিত অঙ্গভঙ্গি সহকারে সুর করিয়া সেই সকল লেখা পড়িয়া পরস্পরকে শুনাইত। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শেষে আমার পদধূলি লইয়া ধন্য হইত। প্রথম প্রথম আমার কেমন বাধ বাধ লজ্জা লজ্জা ঠেকিত; পরে সেটা অভ্যস্ত হইয়া গেল। চা, চপ্, কাটলেটে প্রতি সন্ধ্যায় আমার দুই তিন টাকা ব্যয় হইয়া যাইত। কিন্তু প্রাণ ধরিয়া ও খরচটা আর কমাইতে পারিলাম না।

ছাপা হয় না, কিন্তু লেখার বিরাম নাই। গল্পে ও কবিতায় খাতার পর খাতা বোঝাই হইয়া উঠিল। আমার এমন সুন্দর রচনাগুলি যখন ঘরে পচিতে লাগিল, তখন আমার প্রধান বন্ধু হিতৈষী ও ভক্ত সুকবি যদুনাথ সান্ন্যালের প্ররোচনায়, কাগজ বাহির করিতে সংকল্প করিলাম।

নিজেও বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলাম যে স্বয়ং সম্পাদক হইলে নিজের লেখা ত ইচ্ছামত ছাপা যাইবে —আর কিছু হউক বা না হউক! ভক্তগণ অভয় দিলেন যে তাঁহারা নিজেরা তো নিয়মিত লিখিবেনই, পরন্তু অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের নিকট হইতেও লেখা সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। গ্রাহক করিবার জন্য তাঁহারা দলে দলে দেশ বিদেশে বাহির হইবেন।

সম্পাদক হইয়া, কত লেখকের কত শত মিনতিপূর্ণ পত্র পাইব, কত লেখা, কত কবিতা, কত গল্প আমার হস্তগত হইবে—আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের সবই ছাপিতে পারি; না করিলে, কোনটা না ছাপিয়া সবই ফেরৎ দিতে পারি, কিম্বা ছিঁড়িয়াও ফেলিতে পারি—সমস্তই আমার ইচ্ছাধীন। নিন্দুকগণের কোনও লেখা আসিলে তৎক্ষণাৎ কটুমন্তব্যের সহিত ফেরৎ দিব! যাকে খুসী ছাপার অক্ষরে গালি দিব অথবা প্রশংসা করিব। শত শত লেখক আমার পরিচয় প্রার্থনায় আমার আফিসে আসিবে—একটু হাসিয়া কথা বলিলে তাহারা কৃতার্থ হইয়া গিয়া—তাহাই আরও পাঁচজনের নিকট গল্প করিবে! কত লোক কত লেখা ছাপিবার জন্য সুপারিস্ করিবে। পথে ঘাটে আমার "অমুক কাগজের সম্পাদক" বলিয়া পার্শ্বস্থ বন্ধুকে চুপি চুপি দেখাইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার

মুখপানে চাহিয়া থাকিবে। লোকে বলিবে, কবি ও গল্পলেখক নবীন বাবু এখন অমুক কাগজের এডিটার!

সুতরাং কাগজ বাহির করাই স্থির হইল।

ছাপাইব কোথা? পরের প্রেসে? ছি! যদু বলিয়াছে, নিজে যদি একটা প্রেস কিনি তো সেই প্রেসে কাগজ ছাপা হয়, বাহিরের কায করিয়া দুপয়সা রোজগারও হয়। কারণ, ছাপাখানার আজকাল যত কদর, এত আর কোন পদার্থের নয়। ম্যানচেষ্টারের ধুতি অপেক্ষাও প্রেসের চলতি বেশী! যাঁহারা বাঙ্গালী সাহেব, ধুতি পরিতে লজ্জিত হন, তাঁহারাও কিন্তু বাংলা লিখিতে বাংলায় বই ছাপাইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

মাধব তো ভরসা দিয়াছে—কাযের যদি অভাব হয় তো পাঁচ বৎসর বিবাহের "প্রীতি-উপহার" ছাপিয়াই প্রেসের খরচ উঠিয়া যাইবে। আমাদের সব বন্ধ থাকিতে পারে, বিবাহ ত বন্ধ থাকিবেনা। আর প্রত্যেক বিবাহেই গড়ে পাঁচখানি করিয়া প্রীতি-উপহার।

সুতরাং প্রেস খরিদও স্থির হইয়া গেল। হিসাবপত্রও হইল। একটি প্রেস দশহাজার ও কাগজের একবৎসরের খরচ পাঁচ হাজার—পনের হাজার টাকা প্রথমেই প্রয়োজন। অধীর উন্মাদনা ও উত্তেজনায় কিছুই ভাবিলাম না—ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া দিলাম।

যদু, মাধব, গোপাল, রামকালী, বিশ্বেশ্বর ইহারা স্বেচ্ছায় আমার সহকারীত্ব গ্রহণ করিল। যদু প্রেসের ও কাগজের ম্যানেজার।

খুব উৎসাহের সহিত গোড়া পত্তন হইল। যদুর বাড়ীর নিকটেই বাড়ী ভাড়া লইয়া প্রেস ও কার্য্যালয় বসাইলাম। আমার বসিবার ঘরে সম্পাদকীয় আফিস হইল। মাসিকের নামকরণ হইল "অঞ্জলি"।

সম্মুখে বৈশাখ মাসও পাওয়া গেল, সুতরাং "অঞ্জলি"র প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। মাসিক একশত পৃষ্ঠার উপর, ৩।৪ খানি পূর্ণপৃষ্ঠা চিত্র এবং তদ্ভিন্ন প্রবন্ধ-কলেবরও মাসে মাসে ২০।২২ খানি ছবি—বার্ষিক মূল্যের হিসাবে একরকম সস্তাই বলিতে হইবে।

"অঞ্জলি"র বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার পর হইতেই গল্প কবিতা প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি মাসিকের রসদ আপনা আপনিই আসিয়া জুটিতে লাগিল। ভাবিলাম, এত সহজ ও সম্মানের পথ ছাড়িয়া আমি এতদিন কোন্ মায়ামৃগের সন্ধানে ফিরিতেছিলাম! এতদিন সম্পাদকগণের দ্বারে দ্বারে নির্লজ্জ ভাবে কি ব্যর্থ উমেদারীটাই না করিয়াছি! আহা, এইটা যদি প্রথমেই মাথায় আসিত, তবে প্রতিভার এই দুর্ব্বহ বোঝা বহিয়া বহিয়া কি মাতৃহারা সন্তানের মত এর দ্বার তার দ্বার ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়? যাক্, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা তো আর ফিরিবে না—ভাবিয়া, সমস্ত শক্তি ও প্রতিভাকে উপস্থিত কার্য্যেই নিযুক্ত করিলাম।

প্রথম তিন চারি মাস তো আমিই "অঞ্জলি"র অর্দ্ধেক ভরাট করিলাম। গল্পে কবিতায় সমালোচনায় আমার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখিনী হইয়া উঠিল। যদু, গোপাল ও মাধব ইহারা তো অবাক্।

মাধব মাসে মাসে প্রাপ্ত কাব্য ও গল্প গ্রন্থাবলীর সমালোচনা করিতে লাগিল। যদু প্রতি সংখ্যায় ২।৩ টি করিয়া কবিতা দিয়া আমায় অশেষ ঋণপাশে বাঁধিতেছিল। আর গোপাল গল্পে হাত পাকাইতে লাগিল। রামকালী ও বিশ্বেশ্বর সবই লেখে। ইহাদের সকলের লেখাই আমি খুব ভাল করিয়া সংশোধন করিয়া দিতাম।

একবৎসর হইয়া আসিল। ছাপা কাগজ ছবি ও লেখা সবই প্রথম শ্রেণীর, তবু গ্রাহকের সংখ্যা তো আশানুরূপ হইল না। মাত্র ৬০০ শত গ্রাহক! বর্ষশেষে যদু হিসাব দেখাইল, আমার প্রায় সাত হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে!

বন্ধুরা বলিলেন, প্রথম বৎসর লোকসান অনিবার্য্য, দ্বিতীয় বর্ষে গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়া খরচ নিশ্চয়ই কুলাইয়া যাইবে, তৃতীয় বর্ষ হইতে লাভ আরম্ভ।

সুতরাং আরও একবৎসর কাগজ চালাইলাম।

দ্বিতীয় বর্ষের চৈত্রসংখ্যা বাহির হইলে যদুর নিকট হিসাব চাহিলাম, যদু হিসাব দেখাইল। খরচ উঠা দূরের কথা, পাঁচ হাজার টাকা লোকসান।

একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। নগদ টাকা তো ব্যাঙ্কেও আর বেশী নাই। তৃতীয় বৎসরও যদি এমনি হয়!

মাধব, যদু ও গোপালকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসিলাম—এরূপ অবস্থায় আগামী বর্ষের কাগজ চালান উচিত কি না। এবং যদি চালাইতে হয় তো কি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, যাহাতে গ্রাহকও বাড়ে, কাগজও জনপ্রিয় হয়।

পরামর্শ অনেকই হইল। আমাদের চিরকাল যাহা হইয়া আসিতেছে, তাহাই হইল। মীমাংসা কোন কথারই হইল না। জুয়া খেলার নেশার মত, "যদি এবার জিতি" এই আশায় আরও একবার চেষ্টা করিয়া দেখি বলিয়া কাগজ চালানই স্থির করিলাম।

(৫)

সেদিন প্রাতে উঠিয়া বৈশাখ সংখ্যার জন্য একটি কবিতা লিখিতে বসিয়াছিলাম। বেলা দশটার মধ্যেই কবিতাটি শেষ হইল। যদু কাছে থাকিলে, আজ সে এটি শুনিয়া নিশ্চয় আমার পদধূলির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত—কারণ কবিতাটি অতি চমৎকার হইয়াছিল। দুই তিনবার পড়িলাম—পড়িয়া নিজেই মোহিত হইয়া গেলাম। ভক্তের অনুপস্থিতিতে নিজের পদধূলি নিজ-মস্তকেই দিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

স্নানাহার সারিয়া, লেডল'র বাড়ী গেলাম পোষাক কিনিতে।

ফিরিবার পথে ট্রামে দেখিলাম, কয়েকজন নব্য যুবক বসিয়া সাহিত্য আলোচনা করিতেছে। আমার কাণটা অমনি সেই দিকেই গেল। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া তাহাদের কথা শুনিতে লাগিলাম।

যে কথা শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্বে হইলে হয়ত এমন করিয়া অকপটে বলিতে পারিতাম না, কিম্বা ঠিক উল্টাই বলিতাম; কিন্তু আর সে প্রবৃত্তি নাই। সত্য কথাই বলিব, কারণ বঙ্গসাহিত্যে অমর হওয়ার আশা আমি নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়াছি।

তাহারা বলাবলি করিতেছিল যে আজকাল শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র "জননী", "সুধা" ও "চন্দ্রাতপ।" আর শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া আট দশ জনের নাম করিল। সে ফর্দ্দের মধ্যে না "অঞ্জলি"র নাম, না আমার নাম!

রাগে অভিমানে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল দুর্ব্বৃত্তদের গাড়ী হইতে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিই অথবা গলা টিপিয়া ভবলীলা একেবারে সাঙ্গ করিয়া দিই। কিন্তু আবার ভাবিলাম, এরূপ করিলে বঙ্গসাহিত্যে তো দূরের কথা, বঙ্গদেশেও আমার জীবনের দিন ঘনাইয়া আসিবে। সুতরাং সে সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলাম।

একজন অবশেষে বলিল, "ওহে আবার দেখেচ? নবীন ভট্চাযি 'অঞ্জলি' বলে একখানা কাগজ বের করেচে।"

অপর ব্যক্তি বলিল—"নবীন ভট্চাযি কে?"

"আরে, তুমি নবীন ভট্চাযিকে চেন না? সে যে একজন গিনিয়াস্—গিনিয়াস্।"

অপর একজন বলিল, "জানি জানি। সে কুটুম্ব যে আমাদের জন্মাবার বহুপূর্ব্বে থেকে লিখ্চে! ট্র্যাশে এতবড় রাইটার আমি এপর্য্যন্ত আর একটিও দেখিনি গিনিয়াসই বটে!"

দুইজনে তো প্রাণ ভরিয়া হাসিলই। আমার মত আরও যাহারা শুনিতেছিল, তাহাদের মধ্যেও কাহারও কাহারও দন্তপংক্তি এই বন্ধুযুগলের অট্টহাস্যের সঙ্গে যুগপৎ বিকশিত হইতে দেখা গেল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "অঞ্জলির প্রোপ্রাইটার কে হে টুনু? গিনিয়াস্ মশায়ই না কি?"

টুনু নামক যুবা বলিল—"নামে—ঐ গিনিয়াস্, কাযে যোদো সায়েল।"

"সে কি রকম?"

"গিনিয়াস মশায় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করে

লোকসান দেন। যোদো সান্নেল সে টাকা নিয়ে গিয়ে নিজের বাক্স ভর্ত্তি করে।"

একজন প্রশ্ন করিল, "কোন যোদো সান্নেল? যে যোদো সান্নেল কবি?"

"আরে হাঁ হাঁ, যোদো কবি। সেই ত কাগজের ম্যানেজার প্রেসেরও ম্যানেজার কি না।"

একজন বলিল, "যোদো এই নবীন ভট্চায্যির মস্ত এক ভক্ত না?"

প্রথমোক্ত যুবক হাসিয়া বলিল, "হাঁ হাঁ। অতি-ভক্ত, অতি-ভক্ত—ওটা কিসের লক্ষণ তা জানই ত!"

"কি রকম, কি রকম!"

এই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে ট্রামের বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল। শাপে বর হইল।

হঠাৎ গাড়ী বন্ধ হইল বলিয়া এদিক ওদিকে একবার চাহিয়া টুনু বলিতে লাগিল—"যোদো ভারি ঝানু ছেলে! সে বুঝি বিনা মৎলবে অমনি চট্ করে একবারে ভক্ত হয়ে পড়ল, ভাবচ? সেই ত আমার কাছে সব গল্প করে। তার উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমটায় কিছু হাত করা। তা দেখলে যে সে বড় কঠিন ঠাঁই। শেষে ভুজুং ভাজুং দিয়ে ঐ কাগজ বের করালে, প্রেস কেনালে। প্রেস থেকে কাগজ থেকে দুবছরে হাজার চার পাঁচ টাকা সরিয়েছে। যদি এক টাকায় কিছু একটা কিনে আনে ত খাতায় লিখে রাখে দেড় টাকা। বাড়ী ফেঁদেছে, প্রায় শেষও হয়ে এল। তৃতীয় বছর অঞ্জলির 'লাভ' থেকে বাড়ী কম্প্লীট করবে বলেছে।"

অপর ব্যক্তি বলিল, "ছি ছি; এটা কিন্তু যোদোর ভারি অন্যায়। মুখের সামনে প্রশংসা করে—অসাক্ষাতে তার সর্ব্বনাশের চিন্তা করা কি ভয়ানক অমার্জ্জনীয় অপরাধ বল দেখি! এবার যোদোর সঙ্গে দেখা হলে তাকে আমি আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব—"

টুনু বাধা দিয়া বলিল—"কোনও ফল হবে না। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। আমিই কি তাকে বলতে কসুর করেছি? সে কি বলে জান? সে বলে—বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ঃ শাস্ত্রবাক্য!"

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। গাড়ী কখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আমি লক্ষ্য করি নাই। যুবকেরা হ্যারিসন রোডের মোড়ে নামিয়া পড়িল।

বাড়ী আসিয়া দেখি, বৈশাখ সংখ্যার একগাদা প্রুফ রাখা রহিয়াছে। সেগুলা সজোরে ছিঁড়িয়া, জানালা গলাইয়া বাগানে ফেলিয়া দিলাম।

দরোয়ানকে ডাকিয়া হুকুম দিলাম—"যদুবাবু আনেসে ফাটক বন্দ্।"

হিসাবের বহিগুলি আনাইয়া, দুই তিন দিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। বিস্তর গলদ। চেক দিয়াছি, তাহা জমা করা নাই। এক খরচ দুইবার তিনবার করিয়া লেখা।

কাগজ বন্ধ করিয়া দিলাম। প্রেস বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম।

একটি সুন্দরী ও ডাগর মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিলাম। একটি পুত্রও হইয়াছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সন্ধ্যাতারা

নিরঞ্জন-নিরালায় নিবিড় আঁধার-ছায়,
এ কুটীর মম,
রবি-শশি-কর রাশি কখন পশেনা আসি,
দিবা নিশা সম !
কদাচিৎ খগবর ঢালি যায় সুধাস্বর
শ্রবণ-বিবরে।
কদাচিৎ মেঘ-গায় চপলা চমকি যায়,
নিমেষের তরে।

অকৃতি অধম হেয়, সকলেরি অবজ্ঞেয়,
সুখ শান্তি হারা,
হেন দীন অভাজনে খুঁজি এলে এ বিজনে
কেন সন্ধ্যাতারা ?
ও পূত উজল আঁখি কি যেন অমৃত মাখি
রয়েছে জাগিয়া,
আমাদের মর্ত্ত্যবাসে কেহ হেন নাহি আসে
আপনা ভুলিয়া !

পাপী কিম্বা পুণ্যবান, ছোট বড় নাহি জ্ঞান—
তুমি সবাকার,
নাহি মান নাহি ভাণ, এমন উদার প্রাণ,
দেখিনা ত আর !
চিরশুভ্র নিরমল, উজলিছ নভস্তল,
কোটী হীরা-ভাতি,
ব্যথিত তাপিত হেন জুড়াইয়া দিলে যেন,
আজন্মের সাথি !

বুঝি—
রাজর্ষি—দেবর্ষি কেবা করিতে বিশ্বের সেবা,
রত্নদীপ জ্বালি,
শিখাইছে চরাচরে, আছে সকলেরি তরে
মমতার ডালি !
এ করুণা অযাচিত, মরতের অজানিত ;
বলিব কি আর—
মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ কিবা দিবে প্রতিদান !
শত নমস্কার।

শ্রীমানকুমারী বসু।

বেলজাম্

ব্রাসেল্‌স

পূর্ব্বে যেরূপ লিখিয়াছি, ৩০শে জুলাই সন্ধ্যা ৬টার সময় ব্রাসেল্‌স পৌছাই। ব্রাসেল্‌স বেলজামের রাজধানী। য়ুরোপে সচরাচর লোকে বলে যে ব্রাসেল্‌স একটি ছোট প্যারিস্। আমার বিশ্বাস, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এখানে প্যারিসের সৌন্দর্য্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কিছুই নাই। প্যারিসের আমোদপ্রিয়তা কতকটা আছে বটে, কিন্তু তাহা এখানে ইতরতার কাছাকাছি পৌছিয়াছে।

ব্রাসেল্‌সে আমি তিনদিন ছিলাম। শেষদিনই আমি সহরটি ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাই।

ব্রাসেল্‌স হইতে রেলে কয়েকঘণ্টা যাইলে বিখ্যাত স্পা সহর। প্রথম দিন আমরা স্পা দেখিতে গেলাম। রাস্তাগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত, সুতরাং খুব বৃষ্টির পর আধ ঘণ্টার মধ্যে সকল স্থান বেশ শুষ্ক হইয়া যায়। এখানকার জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত অতি উত্তম, তাই স্পাতে কোনপ্রকার সংক্রামক রোগ কখনও হয় না।

স্পা, ঔষধগুণসম্পন্ন প্রাকৃতিক প্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত এবং অনেক Table waters সেইখানেই বোতলে ভরিয়া বিভিন্ন দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। এই সব জলে বিশুদ্ধ লৌহ ও কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বেশ সুস্বাদু এবং অজীর্ণতা-নাশক। পূর্ব্বে এই জল লোকে কেবলমাত্র পানই করিত, কিন্তু এখন স্নানের জন্যও ব্যবহৃত হয়। রক্তহীনতা, স্ত্রীরোগ, যকৃত ও স্নায়ুঘটিত রোগসকল এবং অগ্নিমান্দ্যে খুবই উপকারী। প্রায় ১৬টি প্রস্রবণ আছে। প্রত্যেক প্রস্রবণের চতুর্দ্দিকে একটি করিয়া বৃক্ষবাটিকা। এই-সকল এবং অন্যান্য দুই একটি রাস্তা লইয়া অনেকটা স্থান Tour des Fontaines নামে বিখ্যাত। প্রস্রবণের জল-বুদ্বুদসহ উঠিয়া ছোট ডোবার ন্যায় হইয়া জমে। Pouhon নামে একটি বিখ্যাত প্রস্রবণ আছে। পীটর দি গ্রেট বলিতেন যে, কেবলমাত্র ইহারই জলের গুণে ১৭১৭ অব্দে তাঁহার শরীর রোগমুক্ত হইয়াছিল। এতৎসহ যে স্নানাগারের ছবি দিয়াছি তাহা নির্ম্মাণ করিতে ৮০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। এখানে বহুবিধ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

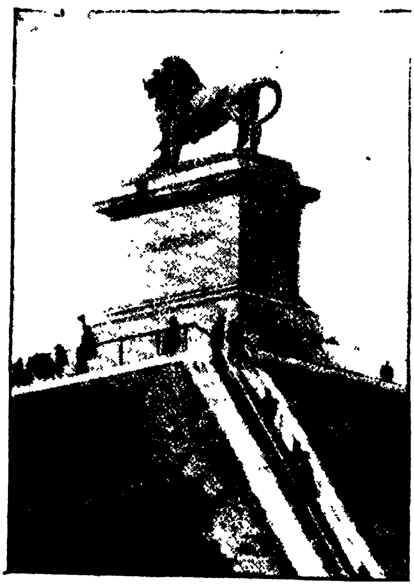


স্পা। স্নানশালার বহির্ভাগ।

স্পার নিকটবর্ত্তী সকল স্থানে বেড়াইবারও খুব ভাল বন্দোবস্ত আছে। বিশেষতঃ যাহারা রাজধানীর কোলাহল-কষ্ট ভোগ করিয়া আসে, তাহাদের পক্ষে এই নিস্তব্ধ স্থানসকলে ভ্রমণ করা বড়ই আরামজনক। প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে একস্থানে আমি একগ্লাস ঝরণার জল পান করিলাম। যখন বুদ্বুদ হইয়া উঠে তখন পান করিতে ঠিক সোডাওয়াটারের মত, কেবল আরও বেশী গ্যাস্ আছে মনে হয়।

সমস্তদিন ভ্রমণের পর অতিশয় ক্লান্ত হইয়া ২—৪৬ মিনিটে ট্রেণ টরিয়া বৈকালে ৫—৫০ মিনিটের সময় ব্রাসেল্‌স পৌঁছিলাম। ব্রাসেল্‌সের কাছাকাছি অনেক দেখিবার স্থান আছে, সুতরাং থাকিবার ও অন্যান্য সুবিধার জন্য সেইখানেই প্রতিরাত্রে ফিরিয়া আসিতাম।

পরদিন প্রাতে ৯—৫০ মিনিটের ট্রেণ ধরিয়া ১০—৩২ মিনিটে Braine l'Allend-এ পৌঁছিলাম। এখান হইতে ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্র দেখিবার বেশ সুবিধা। যাত্রীগণকে লইয়া যাইবার জন্য বড় বড় "কোচ" আছে। একখানিতে অনেকে যাইতে পারে। এইরূপ অনেকগুলি কোচ ওয়াটার্লু যাতায়ত করে। ব্যয়ও অল্প।



ওয়াটার্লু-সিংহ।

ওয়াটার্লুর শান্তিপ্রদ নীল মাঠ দেখিলে ধারণাই হয় না যে এখানে কখনও একটা খুবই বড় যুদ্ধ হইয়াছিল। অবশ্য এখনও স্থানে স্থানে শিরস্ত্রাণের ভগ্নাংশ ও বোতাম খুজিলে পাওয়া যায়। "ওয়াটার্লু সিংহ"

একটা কামান গলাইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। এই কামানটি ফরাসীদের নিকট হইতে যুদ্ধের সময় কাড়িয়া লওয়া হয়। যেখানে প্রিন্স অব্ অরেঞ্জ আহত হন ঠিক সেইখানে এখন এই সিংহটি রক্ষিত হইয়াছে। ইহার উপর হইতে চতুর্দ্দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

Mont St. Jean-এর (যেখানে ওয়েলিংটন তাঁহার Reserve সৈন্য রাখিয়াছিলেন) দুইটি মনুমেণ্ট আছে। দক্ষিণদিকেরটি ওয়েলিংটনের এডিকং কর্ণেল গর্ডনের স্মৃতিচিহ্নরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বামদিকেরটি ৪২ জন হ্যানোভেরীয় সৈনিকপুরুষের জন্য।

ওয়াটার্লুতে একটি খুব পুরাতন বাটী আছে; প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কোনরূপে চাড়া দেখিয়া রাখা হইয়াছে। একদিকের দেওয়ালে একটি কামানের গোলা লাগিয়াছিল; সেটা এখনও সেখানে আছে, নীচে হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। একতলায় একটি ঘরে সামনাসামনি ওয়েলিংটন ও নেপোলিয়নের দুই খানা পুরাতন ছবি আছে, এবং জনপ্রবাদ যে এই ঘরে যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রে নেপোলিয়ন ঘুমাইয়াছিলেন। ঘরটির ছাদ এত নীচু যে হাত তুলিলে হাত ঠেকিয়া যায়।

ওয়াটার্লুতে আর একটি দেখিবার স্থান আছে—The panorama of the Battle, এটি সকলেরই দেখা উচিত। ১৯১২ সালে ইহা অঙ্কিত হয়। বিখ্যাত ফরাশী চিত্রকর Louis Dumolin ইহার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং তিনিই চিত্রকরগণের সাহায্যে ইহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করান। একটি গোলাকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি উচ্চ গোলাকার বেদীর উপর দাঁড়াইতে হয়। যুদ্ধের প্রত্যেক ঘটনা চারিদিকে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধের সময় যেরূপ ছিল, ঠিক সেইরূপই দেখানে হইয়াছে। উহার মধ্যে যখন দাঁড়াইয়াছিলাম তখন যে কিরূপ মনোভাব হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করা সহজ নহে। আর কোথাও এরূপ সুন্দর প্যানোরমা নাই। প্রথম ছয়মাসে প্রায় ৫৪,০০০ লোক ইহা দেখিতে গিয়াছিল।

১—৩১ মিনিটে ওয়াটার্লু ছাড়িয়া ২—৫ মিনিটে ব্রাসেল্‌স পৌঁছিলাম। ব্রাসেল্‌সে দ্রষ্টব্য অনেক আছে, তাহার সকলগুলির বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। সংক্ষেপে দুইচারিটির কথা লিখিব।

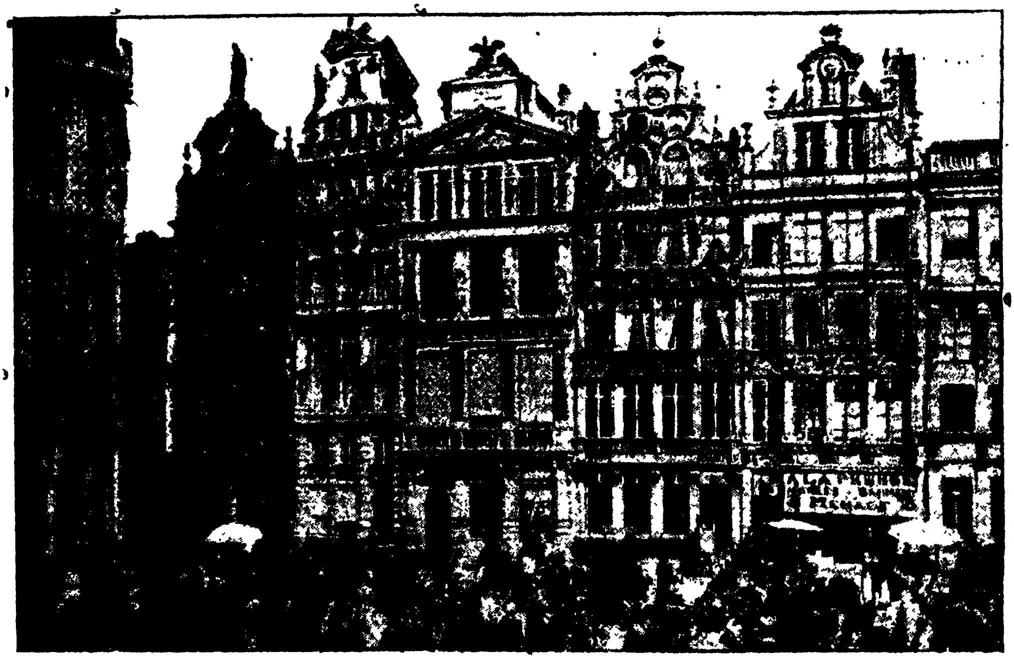


ওয়াটার্লু। গর্ডন ও হ্যানোভেরীয় স্মৃতিস্তম্ভ।

রাস্তাগুলি বেশ বড় বড় ও প্রশস্ত এবং অনেক arcades আছে। ভাড়া গাড়ী ও ট্যাক্‌সি যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের জন্য ট্রাম ছাড়া অন্য আর কোন প্রকার বন্দোবস্ত নাই। ট্রামও তত ভাল নহে। প্যারিসের ন্যায় ব্রাসেল্‌সেও বহুসংখ্যক "কাফে সাঁতাস" আছে। এখানে যেরূপ গোলমাল হয় এবং অন্যান্য যে প্রকারে লোকে আনন্দ উপভোগ করে তাহা না লেখাই কর্ত্তব্য। অবশ্য এগুলি প্রধানতঃ পানাহার করিবার স্থান; ফুটপাথের উপর খোলা যায়গায় কতকগুলি টেবিল ও চেয়ার পাতা; মধ্যে গাছপালা দিয়া একটু সাজান।

এই নগরে অনেকগুলি ভাল ভাল পার্ক আছে। বেঞ্চে বসিলে কোনই গোল নাই, চেয়ারে বসিলে সাধারণ নিয়মানুসারে এক আনা দিতে হয়।

স্থাপত্য হিসাবে Grand Place-এর মত সুন্দর স্থান



ব্রাসেল্‌স্‌। গ্রাণ্ড প্লেস্‌।

য়ুরোপে নাই। এখানকার প্রত্যেক বাড়ীই দেখিবার উপযুক্ত। এখানকার টাউন হল (Hotel de Ville) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহারি চূড়া ৩৬৪ ফিট উচ্চ এবং তাহার উপর ব্রাসেল্‌সের রক্ষক-দেবতা St. Michael-এর মূর্ত্তি গঠিত আছে। ইহার হল এবং বারান্দাগুলিতে অনেক সুন্দর ছবি আছে।

রয়াল লাইব্রেরিতে তিন লক্ষ মুদ্রিত পুস্তক, হস্ত-লিখিত পুঁথি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে। "পুঁথি"বিভাগটি ভাল করিয়া দেখা উচিত। কারণ ইহাতে বিখ্যাত Burgundy Collection আছে; পঞ্চদশ শতাব্দীতে Phillippe le Bon ইহার অনুষ্ঠান করেন।

Rue de la Regene নামক রাস্তায় Conservatiore de Musiqueএ সকলেরই একবার যাওয়া উচিত। গায়ক ও বেহালা-বাদকদের এটি শিক্ষার একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে যে প্রথম পারিতোষিক পায় সে সমগ্র য়ুরোপে খুবই সমাদৃত হয়।

Plais de Justice বিচারালয় একটি অসাধারণ এবং নূতন অট্টালিকা। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে ১৭ বৎসর লাগিয়াছিল। সাড়ে ছয় একর (প্রায় ২০ বিঘা) জমির উপর ইহা দণ্ডায়মান। সংবাদপত্রে পড়া যায় জার্ম্মাণেরা এই Plais de Justiceকে সেনাবাসে পরিণত করিয়াছে। ছবিতে দেখা যায়, ভিতরে কাপড় শুকাইতে দিয়াছে!

এখানে একটি বটানিক্যাল গার্ডেনও আছে। নিকটেই পার্লামেণ্ট ভবন। এই অট্টালিকাটি নূতন কিন্তু দ্রষ্টব্য। ভিতরে একটি গৃহে পাশ্চাত্য সকল দেশের সকল ভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রাদি রক্ষিত আছে। সেগুলি পাঠ ও সারোদ্ধার করিবার জন্য নানাভাষাবিৎ কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত আছে। পার্লামেণ্টে লিবারেল, সোসালিষ্ট এবং কাথলিকদিগের পৃথক পৃথক আসন আছে। ইহাতে ভোট-গণনার সুবিধা হয়।

স্থানাভাবে অন্য ২।১টি দ্রষ্টব্য স্থানের কেবল মাত্র নামোল্লেখ করিব। Porte de Hal, Bois

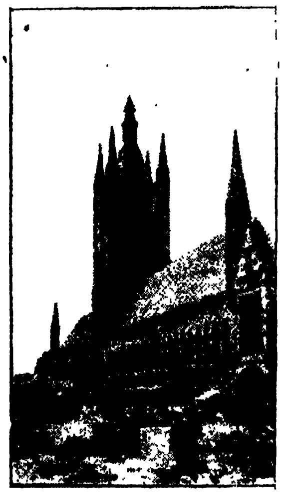
de la Cambre ও Parc de Lacken—এখানে প্রথম লিওপোল্ডের স্মৃতিমন্দির আছে।

২রা আগষ্ট বেলা ১২—৩ মিনিটের ট্রেণে ব্রাসেল্‌স (উত্তর) ষ্টেশন ছাড়িলাম। ২-১ মিনিটে ব্রুজ পৌঁছিলাম।

ব্রুজ্‌

ব্রুজে পদার্পণ করিলেই মনে হয় যে সহরটি বড়ই পুরাতন; ব্রুজ্‌ বেলজ্যমের্‌ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সহর। অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে :—

"In the ancient town of Bruges ;
In the quaint old Flemish city,
As the evening shades descended
Low and loud and sweetly blended,
Low at times and loud at times,
And changing like a poet's rhymes,
Rong the beautiful wild chimes
From the Belfry, in the market
Of the ancient town of Bruges."



ইপ্রে। হল্‌-ও-ত্রাপ্‌।

ব্রুজ্‌কে পুরাতন "ভেনিস্‌ অব্‌ দি নর্থ" বলে। এককালে ব্রুজ্‌ নগর যথেষ্টই সমৃদ্ধ ছিল। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকসংখ্যা ২০০,০০০ ছিল এবং এইখানেই ইংলণ্ডের সমস্ত পশমের ব্যবসায় হইত। এখন ইহার বাণিজ্য প্রায় একেবারেই গিয়াছে। লোকে কেবল ইহার পুরাতন অট্টালিকা ইত্যাদি দেখিতে যায়। ম্যাথিউ আর্ণল্ড অক্সফোর্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "This



ব্রুজ্‌। কে-ড-রোজেয়ার।

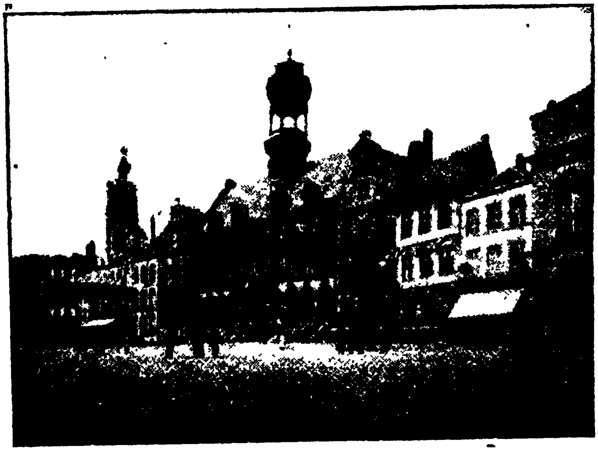
beautiful city, with its dreaming towers, whispering the last enchantments of the middle ages"—ব্রুজ্‌ সম্বন্ধে একথা এখনও বলা যায়।

ব্রুজের গির্জ্জা সমূহের ঘণ্টার শব্দ ইহার আর একটি বিশেষত্ব। সে শব্দ বড়ই ক্লান্ত ও দুঃখপূর্ণ ভাব প্রকাশ করে।

Cathedral of St. Sauveur এবং Stevinএর প্রস্তরমূর্ত্তি ষ্টেশন হইতে অধিক দূরে নয়। Stevin দাশমিক প্রণালীর (decimal system) আবিষ্কারক।

যে বিখ্যাত Belfry লইয়া Longfellow এবং অন্যান্য কবিগণ অনেক লিখিয়াছেন, তাহার ঘণ্টার ধ্বনি ১৫ মিনিট অন্তর শুনিতে পাওয়া যায়।

এখানকার "নোত্র-দাম" গির্জ্জার চূড়া ৪২২ ফিট উচ্চ। এই গির্জ্জার মধ্যে Charles the Bold এবং Mary of Burgundyর সমাধি ও Michael Angelo-নির্ম্মিত "The Vrigin" এর প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। সমাধি দুটীর উপর Charles ও Maryর মূর্ত্তি শয়ানভাবে স্থাপিত।



ম। টাউন হল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত Hopital St. Jeanএ Hans Memlingএর জগদ্বিখ্যাত আসল ছবিগুলি আছে।

লোকে Minne-waterএর সৌন্দর্য্যের অনেক প্রশংসা করে। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রমণীয় বটে। কিন্তু আমার মনে হইয়াছিল যে ইহা একটা অপরিষ্কার নদী। যত ময়লা, জলের উপর ভাসিতেছিল এবং জলের বর্ণও যেন কিরূপ বিশ্রী।

ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিয়া প্রায় এক ঘণ্টার উপর আমায় অপেক্ষা করিতে হয়, কারণ ট্রেণ একঘণ্টার অধিক দেরী হইতেছিল। সেরূপ কষ্টকর সময় আর কোথাও কাটাই নাই। ষ্টেশানের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর অসম্ভব ধূলা ও চতুর্দ্দিকেই থুতু; দুর্গন্ধেরও অভাব ছিল না। আর এরূপ অকর্ম্মণ্য রেল-কুলিও অন্য কোথাও দেখা যায় না, সকল কথাতেই ভুল খবর দেয়।

যাহাই হউক, ৬২০ মিনিটে ট্রেণে উঠিয়া ৬-৪৫ মিনিটে অষ্টেণ্ড পৌছিলাম। এবার অষ্টেণ্ডে দু'দিন ছিলাম।

৫ঠা আগষ্ট ১১॥০ টার সময় অষ্টেণ্ড ছাড়িয়া বৈকাল ৪টা আন্দাজ ডোভারে পৌছি। সন্ধ্যা ৭—১৫ মিনিটে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম।

এইখানে সংক্ষেপে বেলজীয়দিগের সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা হইয়াছিল তাহা লিখিব। খুব অবস্থাপন্ন লোক ছাড়া, পুরুষ এবং স্ত্রী সকলেই অতীব অপরিষ্কার। মনে হয় যেন তাহারা কখনও স্নান করে না। চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদাই এমন কি অনেক ভদ্রলোকও থুতু ফেলে। রাস্তায় গাড়ী এবং লোক যাতায়াতের বন্দোবস্ত লণ্ডন্ অপেক্ষা ঢের খারাপ। লোকে ইচ্ছা করিলে ফুট্‌পাথের উপর দিয়াও বাইসিক্ল চালাইতে পারে! সাধারণ চরিত্র ইংরাজদিগের অপেক্ষা ঢের বেশী খারাপ। মদ্যের ব্যবহার বড়ই বেশী। পানীয় ভাল জল পাওয়া যায় না বলিলেই চলে, বিশেষতঃ অষ্টেণ্ডে। সকলেই প্রায় mineral watersএর উপর নির্ভর করে।

বেলজীয়দের অবশ্য অনেক গুণও আছে। তাহাদের শিল্পরুচি চমৎকার। স্থাপত্য সম্বন্ধেও তাহাদের তুলনা পাওয়া দায়। ইহারা খুবই স্বদেশপ্রেমিক ও সাহসী; কিন্তু তাহাদের Army ও Navy অতি ক্ষুদ্র। জনসাধারণ বেশ আমুদে ও মিশুক। বেলজ্জামের সর্ব্বত্রই সচরাচর যথেষ্ট জার্ম্মান্ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জাতীয় ধর্ম্ম রোমান ক্যাথলিক। কয়লা, লেস্ এবং কাঁচের ব্যবসাই প্রধান। বেলজ্জামে একদল সোসিয়ালিষ্টও আছে। পুরাতন সকল শ্রমশিল্পই প্রায় গিয়াছে; কেবল laceএর কার্য্যটি এখনও আছে এবং ইহা



ম। সেন্ট ওয়াল্ড্র গির্জ্জা



লিয়েজ। রাজবাটীর অঙ্গন।

বিক্রয়ের জন্য ব্রাসেল্‌সে পৃথক বাজার আছে। ক্রীড়ার মধ্যে বল ছোড়া ও বল ধরাই প্রধান—অবশ্য অন্যান্য সকল প্রকার খেলাই কম বেশী আছে।

দক্ষিণ, বিশেষতঃ দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে বেলজাম্‌ খুবই পর্ব্বতময়, অর্থাৎ উচ্চ-নীচ; যদিও যথার্থ উচ্চ পর্ব্বত বড় নাই। তাহারা যাহাকে উচ্চ বলে, আমরা তাহাকে ঢিপি বলি এবং হাস্য করি। অন্যান্য অংশ বেশ সমতল।

এক্ষণে আরও দুই একটি স্থানের—বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য যে সকল স্থান সকলে জানিয়াছে—সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

ইপ্রে

কথিত আছে যে এই Flemish সহরের (Yperen) নাম বিখ্যাত elms হইতে হইয়াছে। Flandersএর এই অংশে অনেক এল্‌ম্‌ আছে; ইহাকে Ypen boomen বলে। ইপ্রের আদি বৃত্তান্ত ঠিক জানা নাই; একাদশ শতাব্দী হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যদিও ইহার নাম জানা ছিল না, স্থানটি কোন ক্রমেই ছোট ছিল না এবং লোকজনও যথেষ্ট ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইপ্রে শিল্পবাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। নূতন নূতন গির্জ্জা এবং অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইতে থাকে। অধিবাসীরা কাপড় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে এবং ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্য করিতে অনুমতি ও অন্যান্য যথেষ্ট অধিকার পায়।

১১৯৭ সালে ইপ্রে একটি খুবই বড় সহর ছিল। ১২৪৭ সালে লোকসংখ্যা ২০০,০০০এর উপর ছিল।

বস্ত্রবয়নশিল্পের খুবই উন্নতি হয় এবং বাণিজ্যের সাহায্যের জন্য নদীগুলিকে গভীর করিয়া দিতে হইয়াছিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আভ্যন্তরীণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়া একশতাব্দী পরে ইপ্রে প্রায় ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার উপর নিকটবর্ত্তী দেশ সকল ইপ্রের কারিগরগণকে সাগ্রহে আহ্বান করায় ইপ্রের শিল্প ব্যবসায়েরও শেষ হয়।

ইপ্রেতে ধর্ম্মবিপ্লবও যথেষ্ট হইয়াছিল। Duke of Alvaর "Reign of Terror"এর সময় অনেক



নামুওরে "মোস্‌" নদী।

অর্থশালী অধিবাসী এবং কারিগর হল্যাণ্ড্ ও ইংলণ্ডে পলায়ন করে এবং এইরূপে ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পের উন্নতি সে সময়ে খুবই হইয়াছিল। এই সব ষোড়শ শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল। সে যুগে "কালাপাহাড়গণ" অধিকাংশ গির্জ্জা এবং সুকুমার শিল্প নষ্ট করিয়া দেয়। যখন ইপ্রে স্পেনের নিকট আত্মসমর্পণ করে (১৫৮৪ খ্রীঃ অঃ) তখন মাত্র ৫,০০০ অধিবাসী ছিল।

তখন হইতে ইপ্রের আর পৃথক ইতিহাস নাই। তখন হইতে বেলজাম যে সকল বিভিন্ন বিদেশীয় জাতির অধীন হইয়াছিল, ইপ্রেও তাহাদের অধীন হয়।

কেহ কেহ বলেন যে Halle aux Draps হইতেছে বেলজামের মধ্যে Ogival styleএ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অট্টালিকা। যাঁহারা ইপ্রে যাইতেন তাঁহারা কেহই এটি দেখিতে ভুলিতেন না। এই অট্টালিকাটি শেষ করিতে দুই শতাব্দী লাগিয়াছিল।

এখানকার টাউন হলটি খুব সুন্দর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহা গঠিত হইয়াছিল; ইহাতে অনেক সুন্দর সুন্দর আসবাব এবং বহুমূল্য ছবি আছে।

ম ছোট ছোট কতকগুলি পাহাড়ের উপর গঠিত। দূর হইতে ইহার চূড়া সকল দেখিতে অতি সুন্দর। চতুর্দ্দশ লুই (Louis XIV) ইহা দুইবার অধিকার করেন। কতকগুলি বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র—Malplaquet,



নামুরে। "মোস" নদী ও কেল্লা।

Jemappes, ম'র খুবই নিকট। বর্ত্তমান যুদ্ধে মতে যে কি হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ম'কে "Educational town" বলে।

ম (Mons)

এখানে অনেকগুলি বিখ্যাত অট্টালিকা ছিল, যুদ্ধের পর কি হইয়াছে বলা যায় না। Hainaut প্রাদেশিক রাজধানী। সহরটী Trouille নদীর উপর অবস্থিত এবং দেখিতে বেশ সুন্দর।

অনতি উচ্চ পাহাড়ের উপর বিখ্যাত Cathedral of Ste. Waudru অবস্থিত। এটি খুবই সুন্দর। ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীতে গঠিত হইয়াছিল, যদিও তাহার পরে ইহার আরও অনেক অংশ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাকে "The pride of Mons" বলে। কোন অজ্ঞাত কারণে ইহার চূড়াটি শেষ করা হয় নাই। ইহার ভিতরে অনেক দেখিবার জিনিস আছে। অনেক সুন্দর খোদাই এবং চিত্রযুক্ত কাচ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালের ন্যায় আজকাল কোথাও চিত্রকাচ হয় না।

লিয়েজ্

সুকুমার শিল্পী, ছাত্র এবং ভ্রমণকারী—সকলের পক্ষেই লিয়েজ্ নগর একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। ইহা Meuse নদীর উপর অবস্থিত। লিয়েজের নিকটবর্ত্তী স্থানে যথেষ্ট খনিজদ্রব্যও আছে।

স্থানাভাবে লিয়েজের ইতিহাস এখানে দিতে পারিলাম না। তবে এটুকু বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে যাঁহারা ইতিহাস-রসিক, তাঁহাদের লিয়েজের ইতিহাস ভাল করিয়া পাঠ করা উচিত।

অনেক পুরাতন গির্জ্জা এখানে আছে। কখন কখন

নবম শতাব্দীতে গঠিত গির্জ্জার অব্যবহিত পার্শ্বেই নূতন কল-কারখানার বিরাট সৌধ চোখে পড়ে।

লিয়েজের প্রধান শ্রমশিল্প লৌহ লইয়া। অন্যান্য আরও অনেক প্রকার শ্রমশিল্পেরও চর্চ্চা এখানে আছে।

লিয়েজের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা Palais des Pionces Eveques। সেখানে পুরাকালে "Prince Bishops"-রা বাস করিতেন। ইহার এক অংশে এই প্রদেশের গভর্ণর বাস করেন এবং এক অংশ আইন আদালতে পরিণত হইয়াছে।



নামুওর। ডেভ্ কেল্লা।

এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় একটি বৃহৎ অট্টালিকা। ১,৪০০ ছাত্র ও অতি সুন্দর পুস্তকাগার আছে। প্রায় ২০০,০০০এর উপর পুস্তকও আছে।

দুর্গচূড়া হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর।

নামুওর (Namur)

নামুওরে পদার্পণ করিলেই মনে হয়, এ সহরটি বড়ই জমকালো। এরূপ ফুল খুব কম স্থানেই দেখা যায়—পার্কে, পথের পার্শ্বে, এমন কি ল্যাম্প-পোষ্টের চতুর্দ্দিকে, বাসগৃহের জানালা এবং বারান্দায়—সর্ব্বত্রই ফুলগাছ।

নামুওর হইতে Meuse নদীতে অতি মনোরম ষ্টীমার ভ্রমণের বন্দোবস্ত আছে। এই পুরাতন সহরটী Sambre ও Meuse নদীর সঙ্গমস্থলে এবং প্যারিস, বার্লিন, পেটোগ্রাড্, দে হেগ্‌ ইত্যাদি হইতে যে সব রেলওয়ে লাইন আসিয়াছে তাহারও সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

বেলজামের অন্যান্য সহরের ন্যায় এখানেও অনেকগুলি অতি মনোরম গির্জ্জা আছে।

এখানে একটি Archeological Museum আছে। দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ এত যত্ন-সহকারে করা হইয়াছে যে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যায় এগুলির মূল্য কত অধিক।

পুরাতন সহরটাতে অনেক দ্রষ্টব্য জিনিস আছে। ইহার বাজারে বাড়ীগুলি এত ঘেঁসাঘেঁসি যে মনে হয় যেন তাহারা স্থানাভাবে এককালে মারামারি করিয়াছিল।

নামুওরে ভ্রমণ করিলে প্রায় চতুর্দ্দিক হইতেই দুর্গচূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গ লইয়া অনেক সংগ্রামাদি হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার বিশেষ অঙ্গহানি হয় নাই।

এখানকার অধিবাসীরা বড়ই ভদ্র এবং ভ্রমণকারীদের সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে নামুওরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায় ; পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বেলজামের সকল স্থানে এরূপ জল পাওয়া যায় না।

নামুওরে ও চতুর্দ্দিকস্থ স্থানসকলে ইতিহাস-বিখ্যাত স্থান যথেষ্টই আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্যও সেগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বেলজাম্ খুব ছোট দেশ হইলেও, এখানে অনেক দেখিবার ও শিখিবার আছে।

শ্রীহেমন্তকুমার মিত্র।

রাজসাহী-স্মৃতি *

হরজটারণ্য-বিহারিণী জাহ্নবীর পতিতপাবনী ধারা ইহার প্রান্তবাহিনী বলিয়াই এ স্থানের মাহাত্ম্য আমার অন্তরকে অভিভূত করিতে পারে না; পুণ্য-শ্লোক রাজন্যবর্গের নামানুকরণে ইহার নাম 'রাজসাহী' হইয়াছে, সেই একমাত্র কারণে এ স্থান আমার হৃদয়ের ভক্তি-প্রীতি তেমন করিয়া আকর্ষণ করে না;—যে কয়টি দিন আমি এখানে যাপন করিয়া গিয়াছি, দুঃখ-শোক রোগ-আরোগ্য ক্ষোভ ক্ষতি বিয়োগ-ব্যথায় পরিপূর্ণ আমার অকিঞ্চিৎকর ব্যর্থজীবনে তেমন দিন আর কখনই আসে নাই—বাল্য কৈশোর এবং যৌবনের আদি প্রান্তের সেই কয়েকটি দিনের আনন্দস্মৃতি আমার বেদনাতুর অন্তরে কি অমৃতরসায়নের প্রলেপ দিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমিই জানি।

দুহিতার সদ্য-মৃত্যুশোক-প্রপীড়িতা অশ্রুপ্লুতা জননীর একমাত্র আনন্দদুলাল আমি, যেদিনে তাঁহার স্নেহবাহুর নিবিড় বন্ধনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্যপালন জন্য অপরিজ্ঞাত ধরণীর ধূলিময় পথে বাহির হইয়াছিলাম, সেদিনের বিয়োগ-ব্যথায় রাজেন্দ্রাণীর ইন্দীবর-নয়ন কেমন করিয়া প্রলয়ের প্লাবন সৃজন করিয়াছিল, তাহা একমাত্র তিনিই জানিতেন; এবং মাতৃক্রোড়বিচ্যুত শিশুর হৃদয় আসন্ন বিচ্ছেদাশঙ্কায় কেমন করিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে ইতিহাস, শিশুহৃদয়ের যিনি অন্তর্যামী তিনিই জানিয়াছিলেন।

একবার চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া আমার দুইটি চক্ষুই একান্ত দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িয়াছিল; শীত-শরৎ-বসন্তাদি ঋতু-পরিশোভিতা নগ-নদী-সরিৎ-সাগর সমন্বিতা এই বিচিত্র ধরণী একদিন আমার চক্ষুর উপর হইতে মুছিয়া গিয়াছিল; শশি-সূর্য্য-তারকার প্রদীপ্ত-দীপকে দিনযামিনী নির্ব্বিশেষে নিরলস প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন অনন্তারতির অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে আমি একান্ত বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিলাম; শেফালিগন্ধাকুলা শারদপূর্ণিমা ও রাস-রজনীর প্রসন্ন নির্ম্মল হাস্য এবং শ্রাবণের অমানিশীথিনীর অবিরল অশ্রুপাত আমার অন্ধনয়নের নিকট সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চিকিৎসার অনিশ্চিত ফলাফলের আশানিরাশায় দোলায়মান চিত্ত লইয়া মাতৃহৃদয়ের স্নেহশৃঙ্খল একদিন মাতাকে স্বেচ্ছায় ছিঁড়িতে হইয়াছিল; রাজাবরোধের চিরন্তন প্রথার নিকট মাতৃহৃদয়কে নতশির হইয়া শিশুর বাহ্যচক্ষুর দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবার জন্য তাহাকে একাকী বিদায় দিতে হইয়াছিল—আর একদিন সেই শিশুর অন্ধকার চিত্ততল তুষারহারধবলা কুন্দেন্দুশঙ্খোজ্জ্বলা শ্বেতাব্জসমাসীনা সরস্বতীর করুণাপ্রসাদে উদ্ভাসিত করিয়া দিবার জন্য যখন তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পাঠাইবার সময় সমাগত হইল, সেই কালের এক স্বল্প-পরিসর শীতার্ত্ত দিবসের মলিন মধ্যাহ্ন আলোক মাতা-পুত্র উভয়ের চক্ষেই কেমন করিয়া নিবিয়া গিয়াছিল, স্নেহকাতর জননীহৃদয় এবং অপরিচিত-পথের যাত্রী ভয়াতুর শিশুর কম্পিত অন্তরই তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ একথা আজ আমাকে বলিতে হইতেছে যে, শিক্ষাপ্রণালী এবং শিক্ষকের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব সংস্কার বারম্বার সেদিনে মনে আসিয়া, আমাকে আশ্বস্ত করে নাই।

গণনা করিয়া দেখিয়াছি, যে দিনের কথা আজ বলিতেছি, উহা ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে দিনে এ সহরে আসিবার জন্য বাষ্পীয় পোত বা শকট কাহারও অপেক্ষা করিত না। পাশ্চাত্য মহাদেশেও পাঞ্চজন্য-শঙ্খস্বননশীল বায়ুরথের সেদিনে ভ্রূণাবস্থা কি না তাহাও বলা কঠিন; সেদিনে "দীননাথ সিংহের" সিংহদ্বারে রোমন্থনপরায়ণ মন্থরগামী বলীবর্দ্দবাহিত বংশ-শকটিকা (মৃৎ নহে) অপেক্ষা করিত; অর্থশীলের পক্ষে নরস্কন্ধমাত্র সুলভ ছিল।

* বিগত ২৮শে কার্ত্তিক Rajshahi People's Association কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে পঠিত।

কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক দশমবর্ষ বয়ক্রমকালে শিশির-ধৌত এক প্রভাতের শুভমুহূর্ত্তে আমি যাত্রা করিয়াছিলাম। আশৈশব-পরিচিত স্নেহের চিরনির্ভর মাতৃ-ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া, বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গীদিগের সাহচর্য্য ছাড়িয়া যাহাকে অপরিচিতের মধ্যে জীবন-যাপনের জন্য যাত্রা করিতে হয়, তাহার অন্তরে বিষাদ-বিন্ধ্যগিরির গুরুভার কেমন করিয়া চাপিয়া বসে, সেই তাহা জানে।

প্রাতে যাত্রা করিয়া এই নগরীতে পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সমাসন্ন রজনীর শ্যামায়মান অন্ধকারে নগরীর প্রান্তবিহারিণী বীচি-বিভঙ্গ-বিহ্বলা পদ্মার পরপারস্থিত শিশির-বাষ্পাচ্ছন্ন শ্যাম বনশ্রেণী যেমন চক্ষের উপর হইতে সেদিন সরিয়া যাইতেছিল, তেমনি স্নেহাশ্রয়বিচ্যুত বালকের কণ্ঠও সেদিনে কেমন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল সে কথা কেবল সেই বালকের হৃদয়-দেবতাই বুঝিয়াছিলেন। তখন বুঝি নাই, বিশ্বের চিরন্তন 'ক্ষয়োপচয়'-নিয়মের বলে নদীতরঙ্গের প্রবলাভিঘাতে এক কূল ভাঙিয়া গেলে তৃণ শস্প-লতা-গুল্ম-বৃক্ষ-বল্লরী সমস্তই পরপারে গিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। ধনধান্য-সুখ-সম্ভোগ-সমন্বিতা নগরী আপাতদৃষ্টিতে ধ্বংসের মধ্যে বিলীন হইতে দেখা যায়, ইহা যেমন সত্য—পরপারের সিকতাময় মরুক্ষেত্রের উপর কাঞ্চনবৃষ্টির সূচনাও ঐ ধ্বংসের মধ্য হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া উঠে তাহাও তেমনই সত্য। মাতৃবক্ষের স্নেহনীড়ভ্রষ্ট মানবক বিষাদাশ্রুপ্লুত মলিনমুখ লইয়া এই নগরীতে প্রথম পাদক্ষেপ করিয়াছিল; যে স্নেহকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতে হইয়াছিল তাহা অমূল্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সম্পূর্ণ অপরিচিত নূতন স্থানের অপূর্ব্বপরিচিত বান্ধব সম্প্রদায়ের নিবিড় স্নেহ অবিরল অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত হইবার যে অধিকার বিধাতা তাহাকে দিয়াছিলেন, তাহার মূল্যও কোটি কোহিনূর।

অনুত্তীর্ণ-শৈশবে যে স্থানে ব্রহ্মচারী-জীবনের কর্ত্তব্য পরিপালন জন্য প্রেরিত হইয়াছিলাম, সমাসন্ন-প্রায় জীবন-প্রদোষের পরিম্লান আলোকে অকৃত্রিম সুহৃদ্‌সঙ্ঘের অপরিমেয় প্রীতির নিবিড় বেষ্টনের মধ্যে আজ যে ভূমিতে আবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, সে ভূমি বিজয় বল্লাল প্রভৃতি একচ্ছত্র নরপালবর্গের কীর্ত্তিকলিত বরেন্দ্রভূমি। এ ভূমির গৌরববার্ত্তা এক দিন দেবভাষায় ছন্দোবদ্ধ হইয়া চিরপ্রোষিত অগস্ত্যকে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছে; এ সেই ভূমি, যে ভূমির পুণ্যমাহাত্ম্যের পরিচয় একদিন তানলয়-সংযুক্ত গোবিন্দগীতিকার মধ্যে ধ্বনিত হইয়া চিরন্তনী বৃন্দাবনলীলার রাগ অনুরাগ পূর্ব্বরাগ বিরহ মিলন মহারাস প্রভৃতির রসমাধুর্য্যে মানবের মনঃপ্রাণ একদিন বিমোহিত করিয়া দিয়াছিল; এ সেই ভূমি, যে ভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থিত বনে-প্রান্তরে কাননে-কান্তারে সরিৎ-সাগরে ভূগর্ভে ভূধরে অতীত গৌরবের পুঞ্জীভূত প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও পাওয়া যায়। কেবলমাত্র সেই অতীত গৌরবের শ্লাঘ্য স্মৃতির জন্য এ ভূমি আমার আদরের ভূমি নহে। শৈশবের শেষ সীমারেখা হইতে যৌবনারম্ভের বাঞ্ছিততম লগ্ন পর্য্যন্ত আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনের বহু সুখ-সৌভাগ্য আশা-নিরাশা ক্ষোভ-ক্ষতি হর্ষ ও বিষাদের স্মৃতি ইহার সহিত বিজড়িত বলিয়া, এ ভূমি আমার নিকট পরম-প্রিয়ভূমি। যদিও এ ভূমি আমার জন্মভূমি নহে, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ইহারই নির্ম্মল অরুণালোকের সহিত যদিও আমার শিশুনয়নের প্রথম পরিচয় হয় নাই, যদিও এই স্থানের অন্তরীক্ষচারী সুস্নিগ্ধ সমীরণ আমার হৃৎস্পন্দনের প্রথম সূচনা করিয়া দেয় নাই, যদিও শৈশবের চিরনির্ভর, সংসারের চিরনির্ভর মাতৃঅঙ্কের স্নেহদুর্গে বসিয়া পর্ব্বরজনীর পরিপূর্ণচন্দ্রমার আকাঙ্ক্ষায় ইহারই নির্ম্মল নীলাকাশের উদ্দেশে আমার শিশুহস্ত বিফলপ্রয়াসে প্রসারিত হয় নাই, যদিও এই ভূমির বিদারিত বক্ষ হইতে উৎসারিত সলিলের বিমলধারা আমার শিশুকণ্ঠের প্রথম তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া দেয় নাই,—তথাপি এই ভূমি আমার নিকট তপোভূমি অপেক্ষা পবিত্র, তীর্থভূমি অপেক্ষাও পুণ্যতর; সর্ব্ব-

ত্যাগী মুমুক্ষু শৈবসন্ন্যাসীর নিকট শিবপুরী বারাণসীর শ্মশানভস্ম যেমন সমাদরের সামগ্রী, ভগবদ্ভক্ত একনিষ্ঠ বৈষ্ণবের নিকট ব্রজসুন্দরের লীলানিকেতন বৃন্দাবনের রেণুকণা যেমন দুর্লভ হইতেও দুর্লভতর, আমার জীবন-প্রভাতের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের এই ভূমি—যে ভূমিতে আজ আবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছি,—তাহার প্রতি ধূলিকণাও আমার নিকট তেমনই পবিত্রতম অপার্থিব পরম পদার্থ।

পুরাকল্পের নিয়মানুসারে যদিও সেদিনে মৌঞ্জী-মেখলা ও গৈরিক ধারণ করিয়া গুরুগৃহে গোচারণ ও সমিধ্-সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলাম না, যদিও উপমন্যুর ন্যায় গুরু-আজ্ঞায় বৎস-মুখনিসৃত দুগ্ধফেন এবং স্বচ্ছন্দ-বনজাত-ফলভোজন হইতেও আমাকে বঞ্চিত হইতে হয় নাই, তথাপি স্বীকার করিতে হইতেছে, মাতৃঅঙ্কে সুখাসীন শৈশবের দিনশেষে পল্লী-নিকেতনের অজস্র করুণাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যেদিন গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, সেদিনে হাস্যমুখে যাত্রা করিতে পারি নাই। আষাঢ়ের বর্ষণসিক্ত মেঘ-ম্লান দিনগুলির মত বিষণ্ণতা আমার মুখে পরি-স্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তরীয়াঞ্চলে বারম্বার অশ্রু-মার্জ্জনার অপবাদ সেদিনে অস্বীকার করিলেও, সত্যের জন্য আজ সে কথা আমাকে অঙ্গীকার করিতেই হইবে। সে দিনে বিয়োগ-বেদনাতুর এই বালককে যাঁহারা তাঁহাদের স্নেহব্যাকুল বাহুবেষ্টনের মধ্যে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অনিন্দিত জীবনের কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া আনন্দলোকে চলিয়া গিয়াছেন। যেখানে দেহ থাকিলেও ব্যাধি নাই, মন থাকিলেও মনঃপীড়া নাই, স্নেহের অবিচ্ছেদ-মিলনে যেখানে বিরহ-বিচ্ছেদের বিভীষিকা নাই, যেখানে রোদনের রূপান্তরসদৃশ নীরস হাস্যদ্বারা ব্যর্থজীবনের হা হুতাশকে ঢাকিয়া রাখিবার সকরুণ উদ্যমের প্রাণপণ প্রয়াস প্রযত্ন নাই; সেই অশ্রুহীন অমরলোকে বয়োবৃদ্ধ অধিবাসীদিগের উদ্দেশে কায়-মনের সভক্তি প্রণতি আমার বদ্ধাঞ্জলি দ্বারা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতেছি; সতীর্থ সহপাঠীগণের নিমিত্ত বন্ধু-হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতিসম্ভার বারম্বার প্রেরণ করিতেছি; আর, আজ যাঁহারা এই আনন্দমিলনের আয়োজন করিয়া, স্নেহের আহ্বানে এই অকিঞ্চনকে তাহার প্রথমা-শ্রমের পুরাতন পুরীতে টানিয়া আনিয়াছেন, মিলন-মহোৎসবের সূচনা করিয়া, এই বয়োভারবক্র ব্যর্থ-জীবনের অবসানপ্রায়-মুহূর্ত্তে, জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে, তাহার ইহসংসারের গোধূলিলগ্নে, তাহার আয়ু অপ-রাহ্ণের ঘনায়মান অন্ধকারাচ্ছন্ন পশ্চিম দিক্চক্রবালে যাহারা শারদসন্ধ্যার সূর্য্যাস্তশোভার সমুজ্জ্বল আলোক-লেখা অঙ্কিত করিয়া দিলেন, সেই সকল একান্ত স্নেহ-পরায়ণ বান্ধবজনকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য আমার বুভুক্ষিত স্নেহের লক্ষবাহু তাঁহাদের দিকে আজ কত আগ্রহে প্রসারিত হইতেছে, তাহা আমার অন্তরদেবতাই জানিতেছেন। আশৈশব-পরিচিত আত্মীয়স্বজনগণের স্নেহপুটের মধ্যে নিরন্তর জীবন যাপন করিতে করিতে অজস্র স্নেহের অকাতর দানসম্ভারকে নিজের প্রাপ্য বলিয়া লোকের ধারণা হয়, না পাইলে ক্ষোভ জন্মে সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহা পাইতেছি, তাহার মূল্য এবং মর্য্যাদা অনেক সময়ে আমরা রক্ষা করিতে ভুলিয়া যাই। যেদিনে সেই স্নেহদুর্গের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম, যেদিনে মাতার স্নেহমন্দাকিনীর প্রচ্ছায়-তট-তরুর আশ্রয় ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল, সেইদিনে বুঝিয়াছিলাম,অযাচিত স্নেহ কি অমূল্য সামগ্রী; এবং আজ বুঝিতেছি, সে স্নেহ কি অনিভিন্ন গভীর এবং কত দীর্ঘস্থায়ী।

সম্বৎসরের অবসানে মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিনে সরস্বতীর আরাধনার্থ ফলপত্রপুষ্পের আহরণ বালকের পক্ষে যে পরম বাঞ্ছিত তাহা যেমন জানিতাম, বসন্ত ঋতুর প্রথম সমাগমদিনে পীতাম্বর পরিধান করিয়া মন্ত্রঃপূত পুষ্পাঞ্জলি সারদার চরণে সমর্পণের আনন্দে বালকের মন কেমন করিয়া একান্ত অধীর হইয়া উঠে তাহাও যেমন জানিতাম, ব্রহ্মযজ্ঞদ্বারা সিতাব্জবাসিনীর নিত্য আরাধনা যে তাদৃশ

আনন্দদায়ক নহে, তাহাও তেমনিই জানিতাম। বর্ণমালার পরিচয়-ব্যপদেশে সে পরিচয় আমি পাইয়াছিলাম। ছত্রিশটি বর্ণের মালা ইন্দ্রপ্রসাদী পারিজাত পুষ্পমালিকার ন্যায় অনায়াসে কণ্ঠে ধারণ করিতে পারি নাই। বর্ণের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিবার ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারা স্বর-ব্যঞ্জনাদি বর্ণের প্রতি তেমন মনোযোগ না দিয়া, এই কৃষ্ণকায় বালকের বর্ণ যাহাতে অরুণরাগরঞ্জিত হইয়া উঠে তৎপ্রতিই সমধিক মনঃসংযোগ করিতেন।

শিক্ষা এবং শিক্ষকের এই সংস্কার লইয়া এই সারস্বতনিকেতনের অভিমুখে একদিন সভয়ে যাত্রা করিয়াছিলাম; কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা অনির্ব্বচনীয়। দেখিলাম, অভীপ্সিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলনৃত্যপরায়ণা কলনাদিনী পদ্মা স্নেহরসসিঞ্চনে যেমন তাহার দুই তীরকে হাস্যোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, পদ্মার তটান্তস্থিত এই নগরীর অধিবাসীজনের হৃদয়ভূমিকেও তেমনি স্নেহ-সরস করিয়া দিয়াছে। পরিণত বয়সে কাশ্মীরের কেশরকুসুমাস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি হইতে মলয় চন্দনদিগ্ধ-সমীরণ-শীতলা কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধুসলিল-ধৌত সোমনাথের ইতিহাস-প্রথিত মন্দিরতল হইতে বৈদেহী-বিরহ-ব্যথিত রামভদ্রের সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত, বহু দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণের বহু সুখদুঃখের স্মৃতি এই বক্ষতলে সঞ্চিত রহিয়াছে; কিন্তু রাজাবরোধের স্নেহকুলায়-পরিভ্রষ্ট এই মানবশিশু রাজসাহীবাসী বান্ধবসম্প্রদায়ের নিকট হইতে অযাচিত স্নেহের পর্য্যাপ্ত ধারা যেমন করিয়া পাইয়া ধন্য হইয়া গিয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। বালকের পৃষ্ঠদেশে বায়ুপথে ভ্রাম্যমান বিভীষিকা-উৎপাদনকারী শব্দশীল বেত্রাগ্রের ঘন-সন্নিপাতই গুরুর দক্ষিণহস্তের দান বলিয়া সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল। তৎপরিবর্ত্তে শিক্ষাগুরুর নিকট হইতে যখন পিতৃস্নেহের অবাধ ধারায় স্নাত হইয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলাম, রোগকম্পিত কলেবরে শিক্ষকের উদ্বিগ্ন মনের দিনযামিনীর চিন্তা ও শুশ্রূষার মধ্যে আশঙ্কাকুলা জননীর মাতৃহৃদয় যখন দেখিতে পাইলাম, সেদিনে এই পিতৃহীন এবং মাতৃঅঙ্ক-পরিভ্রষ্ট বালকের অন্তরাত্মা কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল তাহা এক মুখে বলিবার সাধ্য আমার নাই। সেদিনের পূজ্যপাদ শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকেই আজ স্বর্গলোকবাসী। জননী কর্ত্তৃক শিক্ষার্থ প্রেরিত বালকের শারীরিক মানসিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সম্পাদনার্থ তাঁহাদের চিরনিশ্চল নিরলস ও নিঃস্বার্থ হিতৈষণার কথা যখনই স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখনই উচ্ছ্বসিত অশ্রুর আবেগবশে আমার নয়নের ক্ষীণদৃষ্টি কেমন করিয়া ক্ষীণতর হইয়া আইসে, তাহা কেবল আমিই জানি। অধ্যয়নের নির্দ্দিষ্ট দিনগুলির অবসানে যখন সংসারে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের চরণাশ্রয় হইতে সুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম, তখনও অবিকম্পিতজ্যোতি স্নেহের পঞ্চপ্রদীপ তাঁহাদের হৃদিমণ্ডপে সমভাবেই জ্বলিতে দেখিয়াছি। আজ এই মিলন-মহোৎসবের দিনে তাঁহাদের মধ্যে অনেকের প্রসন্ন-মুখচ্ছবি দেখিতে পাইতেছি না সত্য; কিন্তু লোকলোকান্তর হইতে তাঁহাদের স্নেহাশীর্ব্বাদের পুণ্যধারা যে আমার মস্তকে অবিরলভাবে বর্ষিত হইতেছে, তাহা আমি আমার সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া অনুভব করিতেছি।

প্রাচীন অভিজাতবংশের বংশধরগণকে শৈশবাবধিই কতকগুলি চিরাচরিত পুরাতন প্রথার অধীন হইয়া আয়ুযাপন করিতে হয়; ধূলার ধরণীর মানবশিশু ধূলিতলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু আভিজাত্যের সহিত প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোন প্রকারে সংস্পৃষ্ট হইবামাত্র সর্ব্বংসহা স্নেহময়ী ধরিত্রীর ধূলির সহিত সে শিশুর সমস্ত সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; মমতাময়ী মূক মাতা মেদিনীর স্নেহক্রোড় হইতে তুলিয়া এক নিমেষে মণিমন্দিরের মহোচ্চশীর্ষে তাহাকে বসাইয়া দেওয়া হয়।

বর্ষণস্নাতা নবোদ্ভিন্ন-শষ্পশয্যা, বসন্তের বর্ণবৈচিত্র্যময়ী বনশ্রী, কৌমুদী-সমুজ্জ্বলা ভুবনমেখলা তটিনীর নটনলীলা, পরিপূর্ণ চন্দ্রমার হাস্যসমুজ্জ্বলা কোজাগরনিশীথিনী, মধুমত্ত মধুকরের গুঞ্জনগীতি তাহার

নয়ন-মনকে যেমন করিয়াই কেন আকর্ষিত করুক না, রাজহর্ম্ম্যের কঠিন শিলাতলস্পর্শকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করিয়া শত দৌবারিক-পরিবেষ্টিত রাজকুমারকে রাজশালায় একপ্রকার শৃঙ্খলিত বন্দী হইয়াই কাল-যাপন করিতে হয়। কোন্ জন্মজন্মান্তরীণ পুণ্যবলে জানি না, আমাকে দীর্ঘকাল ঐরূপ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই। বাল্যাবস্থায় শিক্ষার্থ এই রাজসাহীর বিদ্যামন্দিরে প্রবেশলাভ করিয়াছিলাম, সতীর্থ সহপাঠী ও সমবয়স্ক বন্ধুজনের সাহচর্য্যে, তাহাদের সহিত উন্মুক্ত প্রান্তরে বর্ষাবিস্ফারিতা তরঙ্গভঙ্গচপলা পদ্মার বিস্তীর্ণ বালুবেলায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ এবং ক্রীড়াকৌতুকের অনির্ব্বচনীয় বিমলানন্দেই আমার বাল্য কৈশোর কাটিয়া গিয়াছে। বহুবর্ষ পরে যেখানে আজ আসিয়া আবার দাঁড়াইয়াছি, বিদ্যার্থীর এই তীর্থাধিক পবিত্র ভূমিতে দাঁড়াইয়াই আমার কিশোর-মনের নবজাগরণের দিনে এই পুণ্যভূমিসঞ্জাত তরুপল্লবে বসন্তলক্ষ্মীর অপরূপ সম্পদ-শোভা আমার তরুণ নয়নে প্রথম মোহাঞ্জন পরাইয়া দিয়াছিল। দুর্জ্জয় জীবনসংগ্রামের ভৈরব ভেরীনিনাদের মধ্যে নিরাশা ও দুরাশার দুঃখদুর্দ্দিনে বন্ধুজনের যে অকৃত্রিম প্রাণকর প্রীতির মোহন বেণুরব মানবজীবনকে বহনীয় করিয়া রাখে, বন্ধুত্বের সে বংশীধ্বনি আমার কিশোর-মনের কর্ণমূলে এইখানেই প্রথম বাজিয়া উঠিয়াছিল। যে সকল সতীর্থ ও সহপাঠীগণের সহিত বন্ধুস্নেহের পুষ্পরজ্জুর কোমল কঠিন বন্ধনে সুখের কৈশোরে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, আমার একান্ত সৌভাগ্যের বলে আজ তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই আমার চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি। তাঁহাদের এই প্রীতি-পরিবেষ্টনের মধ্যে দাঁড়াইয়া বহুবৎসর পূর্ব্বের পুরাতন সুখস্মৃতি আমার অন্তরতলে কেমন করিয়া জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব? অন্তরের কথার কোন ভাষা নাই,--অন্ততপক্ষে আমার তাহা জানা নাই,—যাহা ভাষা দ্বারা আজ ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, আভাসে তাহা বুঝিবেন, আমার একমাত্র সেই ভরসা।

পুণ্যশ্লোকা মহীয়সী মহিলা ভবানীর বংশধর বলিয়া আপনাদের নিকট হইতে যে গৌরবের অভিনন্দন আমি আজ পাইলাম, আমি তাহার একান্তই অযোগ্য। করীন্দ্রকুন্দচন্দ্রমানিন্দী শুভ্রযশোমণ্ডিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেই বংশের সংস্রবে ভাগ্যবলে আসিয়া আমি ধন্য হইয়া গিয়াছি—আমার এই একমাত্র শ্লাঘা। সেই বংশের উপযুক্ত বংশধররূপে নিজের পরিচয় রাখিয়া যাইবার মত কোন গুণই আমার নাই এবং সাধ থাকিলেও শক্তি-সাধ্য-সামর্থ্য সমস্তেরই একান্ত অভাব। অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী অন্নপূর্ণাস্বরূপিণীর যাহা সহজসাধ্য ছিল, আজ আর কাহারও কি সে সাধ্য আছে! বন্ধ্যার জননী হইবার সুখসাধের মত, আকাঙ্ক্ষার নিষ্ফল বেদনা কেবল চিত্ততলে বারম্বার আঘাত করিয়া যায়—অক্ষমতার ব্যথাকাতর সাশ্রু নয়ন তখন সেই উত্তমতম লোকের অধিবাসিনী ভবানীর উদ্দেশে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে,—"নিষ্ফল বেদনায় কাতর করিয়া, ব্যর্থতার মধ্যে বিদায় দিবার জন্য, তোমার বংশসংস্রবে এ অক্ষমকে কেন আনিয়াছিলে মা?"

যে রাজসাহীর "সার্ব্বজনীন সভা" আজ সর্ব্বজন-সমক্ষে আমাকে অভিনন্দিত করিতেছেন, তাহার সংস্রবে কোন কথা বলিতে গেলেই দীঘাপতিয়ার সর্ব্বগুণাধার সৌম্যমূর্ত্তি প্রিয়দর্শন স্বদেশবৎসল আদর্শ-চরিত্র ভক্তিভাজন রাজা প্রমথনাথের কথা মনে আসিয়া, তাঁহার অকালমৃত্যুর শোকে চিত্ত বিকল হইয়া উঠে। পরিপূর্ণ যৌবনে আরব্ধ কার্য্যসমূহ অসমাপ্ত রাখিয়া, তাঁহার দেশবাসীকে গভীর শোকসাগরে ভাসাইয়া, আত্মীয়স্বজন ও তাঁহার অগণিত বন্ধুবর্গের হৃদয়ে নিদারুণ শেলাঘাত করিয়া তিনি পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে যে স্থান শূন্য হইয়াছে, ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গেল, আজও তাহা শূন্যই পড়িয়া রহিয়াছে। বঙ্গ-দেশের অভিজাতবংশের বংশধরগণ মধ্যে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত আদর্শ পুরুষ তাঁহার জীবমানে কেহ

ছিল না, আজও নাই। কবে কে সে স্থান পূরণ করিবেন, তাহা যিনি সব জানেন সেই সর্ব্বকার্য্য-কারণের নিয়ন্তাই বলিতে পারেন। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যখন উচ্চশিক্ষার গৌরবে গৌরবান্বিত, দক্ষিণ এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে সহরে নগরে যখন উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারকল্পে রাজশক্তি এবং সাধারণের শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে, দেশব্যাপী সেই জাগরণের দিনে উত্তরবঙ্গের অতি বিস্তৃত ভূখণ্ডের অসংখ্য জনসংঘ তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত। যে বরেন্দ্রভূমির একচ্ছত্র অধিপতি লক্ষ্মণসেনের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে সারদার ষোড়শোপচারের পূজারতির শঙ্খঘণ্টারবে প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত একদিন শব্দায়মান ছিল, যে বরেন্দ্রীর পাল-নরপালের চারণ-কবি সন্ধ্যাকরের কলকণ্ঠবিনিসৃত ঐতিহাসিক কাব্যের মধুঝঙ্কার হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়াছে,—এমন একদিন ছিল, যখন সেই বরেন্দ্রীর অধিবাসীবৃন্দ আলস্যবিজড়িত তন্দ্রাতুর নেত্রে শ্বেতাব্জসমাসীনা বীণাবাদিনীর পূজা-হীন ব্যর্থ দিনযামিনী যাপন করিয়াছে। সেই অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন ঘোর দুর্দ্দিনে রাজা প্রমথনাথ দীপহস্তে বাণীমন্দিরের রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাঁহার রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অপরিমেয় অর্থব্যয়ে রাজসাহী কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সমগ্র উত্তরবঙ্গের শ্লাঘার সামগ্রী করিয়া গিয়াছেন।

অশেষ কল্যাণকর, রাজসাহীবাসীর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের নিদান রাজসাহীর 'সার্ব্বজনীন সভা' রাজা প্রমথনাথের আর এক মঙ্গলানুষ্ঠান। তাঁহার জীবিতকালে এই সভা লোক-হিতকর বহুবিধ শুভকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। তাঁহার অকালমৃত্যুর ফলে একদিন এই সভারও মৃত্যু সমুপস্থিত হইয়াছিল। তখন প্রমথনাথের উপযুক্ত পুত্র, আমার পরম বন্ধু সহোদরাধিক, দীঘাপতিয়ার সর্ব্বগুণসমন্বিত বর্ত্তমান রাজা প্রমদানাথ অপ্রাপ্তবয়স্ক বিদ্যার্থী। পিতার অনুষ্ঠিত আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার, পিতার প্রতিষ্ঠিত জনহিতকর সভাসমিতিসমূহের অধ্যক্ষ আচার্য্য প্রভৃতি হইয়া মঙ্গল অনুষ্ঠানগুলিকে জীবিত রাখিবার, সময় তাঁহার তখনও আসিয়াছিল না। সেইজন্য এই সভার তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর আচার্য্য, পরলোকগত প্রসন্নকুমার ভট্টা-চার্য্য প্রভৃতি মহাশয়গণ এই অযোগ্যকে সভাপতির আসনে উপলক্ষ-স্বরূপ বসাইয়া, দেশবাসী অপরাপর বুদ্ধিমান কৃতী ও বিদ্বজ্জনের সহায়তায়, তাঁহারাই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। সেদিনের কার্য্য-কুশলতার জন্য প্রশংসা পুরস্কার যাহা কিছু প্রাপ্য, সে সকল পাইবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র তাঁহারাই। গচ্ছিত ধনসম্পদকে লোকে যেমন রক্ষা করিয়া, প্রাপ্তকালে যাহার ধন তাহারই হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, আমিও তাহাই করিয়াছি। বয়ঃপ্রাপ্ত প্রমদানাথ সংসারে প্রবেশ করিয়া যখন সকল কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন, এই রাজসাহী সভাকেও আমি সেদিনে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হই-লাম।

প্রমদানাথ পিতার কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছেন; স্বয়ং রাজোচিত সমস্ত কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া, দেশের কল্যাণকর নানা অনুষ্ঠান করিয়া,দেশে বিদেশে যশোলাভ করিতেছেন ;—কেবল মাত্র সেই কারণে হর্ষপ্রকাশ করিতেছি তাহা নহে। প্রমদানাথ আমার চক্ষে কেবল-মাত্র রাজা নহেন, সতীর্থ নহেন, সমবয়স্ক নহেন—তিনি আমার সহোদরাধিক বন্ধু। একদিন দুই দিন দুইমাস ছয় মাসের বন্ধু নহেন—আমাদের উভয়ের জীবন প্রভাতে এই বান্ধবতার বীজ রোপিত হইয়াছিল। তাহার পরে, জীবনের বন্ধুর পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে উভয়েরই জীবনের উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, অনেক পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী প্রলয়ের মেঘান্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে, তথাপি আমাদের সেই জীবন-প্রভাতের সংরোপিত প্রীতিলতিকার শ্রীহানি হইতে পারে নাই। আজ আমার জীবনের সমাসন্ন রজনীমুখে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিতে পারি— "বন্ধু, আমার দিন আমি কাটাইয়া দিলাম; জানিয়াও

গেলাম, আমার অবসানের বার্ত্তা পাইয়া তোমার চক্ষু শুষ্ক রহিবে না।"

এই সভায় এমন কয়জন আজ উপস্থিত আছেন, যাঁহারা আমার পল্লীবাসী নহেন, যাঁহারা আমার সতীর্থ বা সহপাঠী নহেন, কিম্বা আমার প্রসন্ন অরুণালোকোদ্ভাসিত জীবন-প্রভাতেও তাঁহাদের সহিত বান্ধবতা সূচনা হইয়াছিল না। বিচিত্র ঘটনাসঙ্কুল আমার এই জীবনের সুখ-দুঃখময় পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাদের অন্তরের স্পষ্ট পরিচয় আমি পাইয়াছিলাম, তাই বন্ধুস্নেহের পরম প্রয়োজনের দিনে আমি তাঁহাদের গভীর প্রীতি ও সমবেদনার সচ্ছায় পাদপতলে আশ্রয় লইয়াছি। সেই আশ্রয়-তরুর শীতল ছায়া এখানেও আমার মস্তকের উপর সঞ্চারিত দেখিয়া, কি আনন্দে এবং কত সুখে আমার সকল বুক ভরিয়া উঠিয়াছে তাহা বলিবার ভাষা আমার নাই।

গতকল্য এই সহরে আসিয়া এক উৎসব-ব্যাপারে আমি যোগ দিয়াছিলাম। অন্বেষণলব্ধ বিগত গৌরবের ইতিহাস-উপাদান সংরক্ষণের জন্য যে মন্দিরের শিলাবিন্যাস বঙ্গের প্রধানতম রাজপুরুষের দ্বারা সম্পাদিত হইল, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কেমন করিয়া কাহার দ্বারা ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত সকলেই অবগত আছেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যে মন্দির অভ্রভেদ করিয়া তাহার স্বর্ণশীর্ষ উর্দ্ধে উত্তোলন করিবে, তাহার উপরে রমার আননানুকারী শরচ্চন্দ্রমার অক্ষয়-কিরণ অবিরতধারে বর্ষিত হইতে থাকুক।

জীবন-বসন্তের পুষ্পিত প্রভাতে আশার আনন্দ-রাগিণীর মধ্যে যেমন করিয়া জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, আজ তাহার অবসানপ্রায় মুহূর্ত্তে দেখিতেছি, নানা দুঃখদৈন্যের ঝড়ঝঞ্ঝায় এবং করকাভিঘাতে হৃদয়ের সে পুষ্পোদ্যান ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ভূমিষ্ঠ হইবার মুহূর্ত্তে শিশু মুষ্টিবদ্ধ করিয়াই এ ধরণীর ক্রোড়ে জন্মলাভ করে; বিদায়লগ্নে, শুনিয়াছি, মুষ্টি খুলিয়া দেখাইয়া যায় সে 'কিছুই পাই নাই, রিক্তহস্তেই এ আশার বাসা হইতে বিদায় লইলাম।' আমাকে তাহা করিতে হইবে না। বাল্যে যাঁহাদের নিকট হইতে অযাচিতরূপে অফুরন্ত স্নেহ পাইয়াছি, আজ এই সমাসন্ন সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে তাঁহারাই ডাকিয়া আনিয়া, স্নেহের দানে আমার শূন্যমুষ্টি পূর্ণ করিয়া দিলেন। যে স্নেহক্রোড়ে আমার পরিশ্রান্ত মস্তক রাখিয়া মরিতে পাইলে, বিশ্বনাথের মোক্ষপুরী বারানসীতে মৃত্যুবাঞ্ছা আমার নিকট তুচ্ছ, সেই খানেই আমার অবসান হউক, কিম্বা বান্ধব-বর্জ্জিত দেশান্তরের পথে প্রান্তরে আমার নয়নের শেষ-নিমেষপাত হইয়া যাউক,—যেখানে যেভাবে যে অবস্থাতেই আমার অজ্ঞাত দেশের অফুরন্ত নিরুদ্দেশ-যাত্রার আরম্ভ হউক না কেন,—জীবনারম্ভের দিন হইতে হৃদয়মন্দিরে যে আরাধ্য দেবতার পূজার্চ্চনা করিতেছি, সেই ইষ্টনামের সহিত আজকার এই আনন্দমিলনের সুখস্মৃতিকে আমার অন্তরতলে শেষতম নিমেষ পর্য্যন্ত সজীব রাখিয়াই দিব।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

চোখের মোহ

বুঝিতে পারনা সখি, কেন মুখপানে
নীরবে চাহিয়া থাকি পলকবিহীন?
কোন্ সে রহস্যমাঝে কিসের ধেয়ানে
মুগ্ধ এই আঁখি দুটি রহে গো বিলীন?
তুমি কি ভাবিছ মনে ও মূরতিমাঝে
আমি শুধু হেরিতেছি রমণী তোমায়?
শুধু মৌন কামনার ব্যথা প্রাণে বাজে,
তাই শুধু চেয়ে থাকি আকুল তৃষায়?

তুমি কি বুঝিবে নারি, ওই আঁখি দিয়া
কি কথা কয়েছ চুপে পরাণে আমার!
কোন্ সে অমৃত-লোকে জেগেছে এ হিয়া,
কোন্ স্বপ্ন-অমরার নন্দন মাঝার!—
আঁখিতে স্বপন ভরি' খুঁজি তোমা তাই;
তোমারি মাঝারে আমি আপনা হারাই!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

সাহিত্য-সমাচার

বিগত ২৭শে কার্ত্তিক সোমবার, বেলা ১১ টার সময় আমাদের গভর্ণর লর্ড কার্মাইকেল বাহাদুর, রাজসাহী নগরে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সভার চিত্রভবন-ভিত্তির শিলাবিন্যাস কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে গভর্ণর বাহাদুর তথায় যাহা বলিয়াছিলেন—তাহার মর্ম্ম এই—"তিন বৎসর পূর্ব্বে রাজসাহীতে আসিয়া, আমি এই অনুসন্ধান সভার কার্য্যের কথা শ্রবণ করি। * * * আপনারা যে সকল আবিষ্কারাদি করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হই—এবং এই সভার দ্বারা যে আরও অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে। আমি তখন আপনাদিগকে এবিষয়ে উৎসাহও দিয়াছিলাম। * * * ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক-অনুসন্ধান-ক্ষেত্র যথেষ্টই আছে—তন্মধ্যে বরেন্দ্রভূমি একটি প্রধান স্থান। আপনাদের অনুসন্ধানেই প্রমাণ হইয়াছে, রাজা হর্ষের মৃত্যুর (৬৫৬ খৃঃ অঃ) পর এ প্রদেশে শতাব্দব্যাপী অরাজকতা উপস্থিত হয়, তাহার পর সাড়ে চারিশত বৎসর, পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্ম্মপাল ও দেবপাল, বঙ্গদেশকে ভারত মধ্যে একটি প্রধান শক্তিশালী দেশ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত এই যুগের ইতিহাসের যাহা উদ্ধার হইয়াছে তাহা কঙ্কালমাত্র; বিগত ছয় বৎসরকাল এই কঙ্কাল-উদ্ধার-কল্পে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সভা যে বিশিষ্টরূপে সহায়তা করিয়াছেন, তাহা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ তাঁহার Early History of India গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। আমার আশা হয়, ক্রমে আপনারা বরেন্দ্রভূমি হইতে সেই লুপ্ত ইতিহাসের আরও অনেক বিষয় উদ্ধার করিয়া, সেই কঙ্কালকে পূর্ণাবয়ব দান করিতে কৃতকার্য্য হইবেন।

"বরেন্দ্রভূমির নানা স্থানে এখন সাঁওতালগণ আসিয়া অকর্ষিত ভূমিতে চাষবাস আরম্ভ করিতেছে। মৃত্তিকা খনন কালে তাহারা পুরাতন স্মৃতির নিদর্শনগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে, এ আশঙ্কা আছে। এরূপ সভ্যগণ নিকটেই রহিয়াছেন। তাঁহারা দেশকেও জানেন, দেশের লোকদিগকেও চেনেন। বিনা বিবাদ-বিসম্বাদে তাঁহারা প্রত্নতত্ত্বালোচনার উপযোগী জিনিষগুলি অশিক্ষিত লোকদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবেন। * * * বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই সভার তত্ত্বাবধায়ক (Director), বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ (যাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ Indo-Aryan Races নামক গ্রন্থ আপনারা অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন) ইহার সম্পাদক—এ দুইজনে এই সভার সুনাম দেশবিদেশে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরামর্শ ব্যতীত এ সভা সাফল্য লাভ করিতে পারিত না; এবং আমার বন্ধু, মিঃ শরৎকুমার রায় যদি মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে এ সভার দ্বারা কিছুই করা সম্ভব হইত না। * * * ইজিপ্টে "সখের প্রত্নতাত্ত্বিক"গণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া কত ভুলভ্রান্তি করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক মাত্রেই অবগত আছেন। ভারতবর্ষেও এরূপ ভুলভ্রান্তি হইয়াছে। যতদিন আপনাদের বর্ত্তমান ডিরেক্টার কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবেন, যতদিন বর্ত্তমান সম্পাদক কার্য্য-পরিচালনা করিবেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আপনাদের কার্য্য ভালরূপই চলিবে। * * * এই সভা সর্ব্বসাফল্য লাভ করুক, ইহাই আমার কামনা। আমি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেলে, আপনাদের প্রকাশিত পত্রিকাদি আমায় পাঠাইবেন, এই অনুরোধ রহিল; কারণ, আপনাদের কার্য্য কিরূপ অগ্রসর হইতেছে তাহা জানিবার জন্য আমি সর্ব্বদাই উৎসুক রহিব।"

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত একখানি নূতন পুস্তক "কুল-পুরোহিত ও অন্যান্য গল্প" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "রক্তগোলাপ" নামে একখানি গল্প গ্রন্থ ছাপা হইতেছে।



ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মল্লিকার ফেলেছ তাহার
পথের ধুলার পরে। রবীন্দ্রনাথ

চিত্রকর শ্রীবীরেশ্বর সেন।

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

৮ম বর্ষ
২য় খণ্ড

পৌষ ১৩২৩ সাল

২য় খণ্ড
৫ম সংখ্যা

মিনতি *

যদি নয়ন-সলিলে ডুবায়ে গোকুল
মথুরায় যাবে কালা,
তবে ব্যর্থ গোপীর হৃদয় শোণিত
তোমার চরণে ঢালা।

নিমজ্জ্য নেত্রাম্বুনি কৃষ্ণ গোকুলং
যদি প্রযায়া মথুরাং পুরী মিতঃ।
ব্রজাঙ্গনানাং হৃদয়াসৃজাস্তদা
নিষেচনস্তৎ পদয়োর্ব্বৃথৈব তে॥

ব্যর্থ তাদের নিশি জাগরণ,
ব্যর্থ মুরলী শোনা,
সঙ্কেত-কাল চাহিয়া, তাদের
ব্যর্থ প্রহর গোণা!

বৃথৈব তাসাং বত জাগরো নিশাং
বৃথৈব তাসাং মুরলীরবশ্রুতিঃ।
প্রতীক্ষ্য সঙ্কেতিতকালমাদরাদ্-
বৃথৈব তাসাং গণনাপি যামিকী॥

ব্যর্থ তাদের রাস-উৎসব,
ব্যর্থ রাধার মান,
কানন-আঁধারে ব্যর্থ তোমারে
কেঁদে কেঁদে সন্ধান।

বৃথৈব তাসাং বত রাসসম্মহো
বৃথৈব রাধাকৃতমানসংগ্রহঃ।
ঘনান্ধকারেঽপি বনে তবেহনং
বৃথৈব তাসাং স্রবদশ্রুলোচনৈঃ॥

* "মানসী" ৬ষ্ঠ বর্ষ, পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় রচিত "মিনতি" শীর্ষক কবিতার সংস্কৃতানুবাদ।—লেখক।

তোমারও ব্যর্থ—কোটাল সাজিয়া
কুঞ্জে পাহারা দেওয়া,
রাধার রাতুল চরণ তোমার
ব্যর্থ মাথায় নেওয়া।

বৃথা তবাপি প্রহরিত্বমীয়ুষো
বিচারণা কুঞ্জকতোরণাগ্রতঃ।
মৃথৈব রাধারমণীয়পাদয়ো-
র্ব্বিধারণং মূর্দ্ধণি তে বতাগ্রহাৎ॥

পড়ে না কি মনে নব কদম্ব-
'কল্পতরু'র মূলে,
প্রিয়জন কাণে কতই সোহাগ
ঢেলেছ হৃদয় খুলে ;

ন কিং তবোদেতি হৃদি প্রবালবৎ-
কদম্বকল্পদ্রুমমূলদেশতঃ।
প্রিয়াজনানাং শ্রুতিষু প্রসেচনং
কৃতং কিয়ন্মুক্তহৃদাদরামৃতৈঃ॥

কতই আদর কত আশ্বাস
কত যে অভয়বাণী—
কতবার করে' বলেছ রাধার
বক্ষে রাখিয়া পাণি—

সমাদরাঃ কত্যপিকত্যথোপুন-
র্ব্বিনোদনাশাঃ কতিধা ত্বয়ার্পিতাঃ॥
কতিপ্রযুক্তা অভয়া গিরস্তথা
নিধায় পানিং বত রাধিকাহৃদি॥

যেওনা নিঠুর ওগো নির্দ্দয়,
যেওনা পরাণ প্রিয় ;
বক্ষে রাখিতে ভার যদি লাগে
চক্ষের দেখা দিও।

ন যাহি হে নিষ্ঠুর হন্ত নির্দ্দয়
প্রয়াহিনাতো বত জীবিতপ্রিয়।
নিধাতুমঙ্কে* যদি ভারশঙ্কিতা
তদা প্রদেয়ং খলু চাক্ষুষেক্ষণম্॥

তুমি যাও যদি—বহিবে না বায়ু,
ফুটিবে না ফুল আর,—
শুধু গোপীর নয়ন প্রবাহ বাড়াবে
নীলজল যমুনার।

যদি প্রযায়া ন সমীরয়িষ্যতে
সমীরণৈর্নো কুসুমৈশ্চভাস্যতে।
পরং প্রবাহেণ বিবর্দ্ধয়িষ্যতে
ব্রজাঙ্গনানেত্রভুবাম্বু যামুনম্॥

শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মা।

---

* ক্বচিৎ সামান্যশব্দোঽপিবিশেষেবর্ত্তত ইতিন্যায়াদ্ভুনাদিকোষলিখিত শরীরসামান্যবচনোঽপ্যঙ্কশব্দ ইহ বক্ষোর্থে বর্ত্ততে॥ তথা চ শিশুপালবধ মহাকাব্যে "হিরণ্যগর্ভাঙ্ক ভুবং মুনিং হরি"রিত্যত্র "উৎসঙ্গাম্নারদোঽজঙ্কে" ইত্যনুসারেণোৎসঙ্গার্থেঽঙ্কশব্দঃ প্রযুক্তঃ। হিরণ্যগর্ভাঙ্ক ভুবমিত্যস্য হিরণ্যগর্ভাঙ্গভূবমিত্যপি পাঠান্তরমস্তি। তৎপাঠেঽপ্যঙ্গশব্দো বক্ষো বচনঃ প্রাগুক্তন্যায়বচনাভ্যাং॥—অনুবাদকস্য

সভ্যতার সংঘর্ষ

ঐতিহাসিক গ্রোট্ স্বরচিত গ্রীস-ইতিহাসের একস্থলে লিখিয়াছেন যে, যদি পারসীকগণ গ্রীসদেশ জয় করিয়া ফেলিত, তাহা হইলে সমগ্র য়ুরোপের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে লিখিত হইত। কারণ, তাহা হইলে, যে গ্রীক সভ্যতার উপর আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, তাহার অস্তিত্ব কোথায় থাকিত? বিদেশীয় বিজেতৃগণের প্রভাব এড়াইয়া গ্রীস তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। ফলে, য়ুরোপ তাহার অত্যুচ্চ দর্শন ও সাহিত্য, শিল্প ও কলা হইতে বঞ্চিত হইয়া স্বতন্ত্ররূপে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে বাধ্য হইত। এক কথায়, য়ুরোপের বর্ত্তমান অত্যুন্নত সভ্যতার অভ্যুদয় সম্ভবপর হইত না। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক এইরূপ সম্ভাবনার কল্পনাতেও বিচলিত হইয়া উঠেন, এবং পারস্যের গ্রীস-বিজয়ের সকল উদ্যম যে ব্যর্থ হইয়াছিল তজ্জন্য তাঁহারা ভগবানকে ধন্যবাদ দেন।

কথাটা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। কারণ, যখনই জাতিতে জাতিতে বিরোধ বাধিয়াছে কিম্বা একজাতি কর্ত্তৃক অপর জাতি আক্রান্ত হইয়াছে, তখনই সভ্যতার উক্তরূপে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া অবস্থাভেদে বিভিন্ন ফল প্রসব করিয়াছে। রোম তাহার বিজিত ভূভাগসমূহে নিজ সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিল। আবার গথ্, হুন প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিগণ যখন প্রবল হইয়া রোমক সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড করিয়া অধিকার করিয়া লইল, তখন তাহারা প্রাচীন রোমক সভ্যতার বিলোপ সাধন করিয়া আপন আপন স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে লাগিল। ইংরাজ জাতিটাও যে অনেকগুলি সভ্যতার সংঘর্ষ বা সমন্বয়ের ফল তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন।

কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে ফল ভালই হইয়াছে। গ্রীস ও রোমের সভ্যতা লাভ করিয়া য়ুরোপ আজ সুসভ্য, উন্নত। এবং গর্ব্বিত য়ুরোপ আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র আপন ধর্ম্ম, আপন সভ্যতা বিস্তার করা স্বীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছে।

অবস্থাচক্রে য়ুরোপের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব অবশ্যম্ভাবিরূপে এখানে ধীরে ধীরে প্রকটিত হইতেছে। আমাদের ভাগ্যবিধাতা ইংরাজ মনে করিতেছেন, তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন মাত্র। আমাদের কিন্তু ঐতিহাসিক গ্রোটের কথাটা একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। কারণ, গ্রীস স্বাধীনতা হারাইলে য়ুরোপের যে দশা হইত, আমাদেরও সেই একই অবস্থায় পড়িয়া সেইরূপ দশা হইতে পারে কি না তাহা ভাবিয়া কি শঙ্কিত হইবার কারণ নাই? তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারহাট্টাগণ যদি জয়লাভ করিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা কি হইতে পারিত তাহা ভূদেব বাবু তাঁহার "স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাসে" দেখাইয়াছেন। এরূপ জল্পনায় এখন আর কোন লাভ নাই। এই দেড়শত বৎসরের ইংরাজ-সংস্পর্শে আমরা কি হারাইয়াছি, কি পাইয়াছি, তাহারই ভালরূপ হিসাব নিকাশ আবশ্যক। কারণ, তাহা হইতে আমাদের ভবিষ্যদ্-গতি কতকটা বুঝিতে পারিব।

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। ইংরাজ-শাসনের পূর্ব্বে মুসলমান সভ্যতা কয়েক শত বৎসর ধরিয়া ভারতের বুকে চাপিয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু পাঁচ-শত বৎসরের মুসলমান অধিকারে ভারতীয় সভ্যতার যতটা পরিবর্ত্তন না হইয়াছে, এই দেড়শত বৎসরের ইংরাজ শাসনে তাহার বহুগুণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাহার কারণ আছে। মুসলমান, হিন্দুর সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইয়াছিল, কারণ সে ভারতেরই বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছিল। আর হিন্দুও একদিকে বাহিরে

যেমন কিয়ৎপরিমাণে মুসলমানের আচার ব্যবহার আদব কায়দা গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে নাই, অপর দিকে তেমনই আবার প্রবলের কবল হইতে নিজের ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ বলে এগুলি আঁকড়াইয়া ছিল। এই সংঘর্ষের প্রারম্ভেই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বাঙ্গালী হিন্দুকে অসংখ্য বিধিনিষেধের জালে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সকল ব্যবস্থা প্রণয়নে 'বাঙ্গালীমস্তিষ্কের অপব্যবহার' হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাই যে হিন্দুকে তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ করিয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। ফলে, মুসলমান শাসন হিন্দুজাতির মধ্যে একটা বাহ্য পরিবর্ত্তন মাত্র আনয়ন করিয়াছিল। আমাদের ভাষায়,পরিচ্ছদে, কোথাও বা কোন সামাজিক প্রথায়—তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে মাত্র, কিন্তু আমাদের সভ্যতার অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই; আমাদের ভাব, চিন্তা বা আদর্শের ধারা অনুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ফল প্রসব করিয়াছে। ইংরাজ প্রথম হইতেই আমাদিগকে নিকৃষ্ট জাতি রূপে গণ্য করিয়াছেন। আমরাও ঘাড় পাতিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। মেকলে যখন বলিলেন, মাত্র এক শেল্ফ্ সুনির্ব্বাচিত পাশ্চাত্য গ্রন্থ সমগ্র প্রাচ্য সাহিত্য ও দর্শন অপেক্ষা মূল্যবান, তখন :তদানীন্তন ইংরাজি-শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুধুরন্ধরগণ তাহা যথার্থ বলিয়া অম্লানবদনে মানিয়া লইলেন। জাতীয় সভ্যতার প্রতি হিন্দুর অশ্রদ্ধা যখন এতদূর গড়াইয়াছিল, তখন তাহারা যে য়ুরোপীয় সভ্যতার অনুকরণই উন্নতির একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিবে তাহা বিচিত্র নহে। সৌভাগ্যের বিষয়, এ ভাব বেশী দিন থাকিতে পায় নাই। শীঘ্রই একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের অতীতের সহিত যে সংযোগ ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল তাহা পুনরায় সংস্থাপিত হইল। আমাদের শাস্ত্রের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা আমরা আবার ফিরিয়া পাইলাম। কিন্তু তখন আমরা সর্ব্বনাশের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি। যখন আমরা বুঝিলাম, 'প্রবল ও বিচিত্র শক্তিশালী য়ুরোপীয় সভ্যতা অতি সহজে আমাদের মনকে অভিভূত করিয়াছে' যখন দেখিলাম, 'আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে', তখন আর তাহা প্রতিরোধ করিবার শক্তি আমাদের ছিল না। যে বিদেশী শিক্ষার সম্মুখে আমরা নতজানু হইয়া মাথা পাতিয়া দিয়াছি তাহা আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। সে তাহার আপন কার্য্য সাধন করিয়া চলিতেছে, আমাদের ইষ্টানিষ্ট ভাবিবার অবসর তাহার নাই। সুতরাং আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস যে অত্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে, সমাজে যে একটা ঘোর আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে, এবং সাহিত্যের সহিত দেশের নাড়ীর যোগ থাকিতেছে না, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

প্রাচ্যের অন্তর্মুখী সভ্যতা এই অবস্থাবিপাকে পড়িয়া পাশ্চাত্যের ভোগসর্ব্বস্ব বহির্মুখী সভ্যতার ছায়ামাত্রে পরিণত হইয়া উঠিতেছে। ঈশ্বরের স্থানে আমরা এখন রজতখণ্ডকে বসাইয়া পূজা করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, একদিকে যেমন পাশ্চাত্যপ্রভাবে আমাদের ভোগবিলাসের লালসা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া অর্থের পশ্চাতে ছুটিতেছি, অপরদিকে তেমনই আবার দিন দিন দেশের দারিদ্র্য বাড়িয়া যাইতেছে, সহস্র চেষ্টাতেও অর্থলাভ দুরূহ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? আমাদের পূর্ব্বের সেই সাদাসিধা চাল চলন আর ভাল লাগে না। ঋণ করিয়াও বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক আমরা এখন হাল ফ্যাসনের মান রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। এই অর্থলোলুপতা ও বৃথাড়ম্বরপ্রিয়তা হইতেই কন্যাযৌতুক আধুনিক বরপণের ন্যায় পৈশাচিক প্রথায় পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে শিক্ষিত অশিক্ষিতে, ধনী দরিদ্রে, ইতর ভদ্রে, এমন একটা দুরতিক্রমনীয় ব্যবধান ছিল না যাহাতে

সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে মেলামেশা অসম্ভব হইয়া পড়ে। গ্রামের ধনী বারমাসে তের পার্ব্বণে ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেন; নিমন্ত্রণ না করিলেও সকলে আসিত, এবং নিজের বাড়ীর ন্যায় কাজ করিত। এইরূপে সকলের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকিত। পণ্ডিতের নিকট অশিক্ষিত জনসাধারণ ব্যবস্থা লইতে যাইত। তিনিও সাদরে তাহাদিগকে ব্যবস্থা বা পরামর্শ দিতেন। গোঁসাই খুড়ো যখন ভাগবত পাঠ করিতেন, তখন 'ভক্তিপ্রাণ চাষা' তাহা শুনিয়া ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিত। কিন্তু এখন আর এরূপ দৃশ্য চোখে পড়ে না। ধনীর দম্ভ শিক্ষিতের অহঙ্কার সাধারণকে তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। এখানেও ঠিক আমরা পশ্চিমেরই অনুকরণ করিয়াছি।

শুধু তাহাই নহে। আমরা ভুলিয়া যাইতেছি, গ্রাম্য জীবনে উল্লিখিত মধুর আত্মীয়তার যে আদান প্রদান চলিত তাহা এখন অদৃশ্য হইয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া দলে দলে লোকে সহরে চলিয়া আসিতেছে। কারণ, গ্রাম্য-জীবন আর কাহারও ভাল লাগে না। সহরই এখন শিক্ষিতের কর্ম্মকেন্দ্র ও ধনীর প্রমোদনিকেতন। সুতরাং গ্রামগুলি ক্রমশঃ পরিত্যক্ত ও শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। যে সকল গ্রাম পূর্ব্বে স্বাস্থ্য, শান্তি ও সৌন্দর্য্যের আলয়স্বরূপ ছিল, এখন তাহাদের অবস্থা এতই শোচনীয় যে সে সব স্থান বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা গ্রামে থাকিলে সকল প্রকারের উন্নতি সম্ভবপর হইত, তাঁহারা ভিটামাটি ত্যাগ করিয়া সহরে বাস করিতেছেন। ঘোর দারিদ্র্য ও ভীষণ ম্যালেরিয়ায় তাঁহাদের গ্রামগুলি উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের কোন দুঃখ নাই। সহরে চাঁদার খাতায় তাঁহারা হাজার হাজার টাকা সহি করিতেছেন; কিন্তু স্বীয় গ্রামের উন্নতিকল্পে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করা আবশ্যক মনে করেন না।

এই গ্রামকেই কেন্দ্র করিয়া কিন্তু আমাদের প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা নাগরিক সভ্যতা, গ্রামের সঙ্গে তাহার সংস্রব বড় ক্ষীণ। সে সভ্যতার প্রধান অঙ্গ বড় বড় কারখানা ও তাহাদের আকাশচুম্বী ধূম্রোদ্গারী চিম্‌নী, বড় বড় অফিস ও তাহার পিপীলিকাবৎ অগণ্য কর্ম্মচারিবৃন্দ। ইহাই এখন আমাদেরও আদর্শ হইয়াছে। আমরাও গ্রাম ছাড়িয়া এই নাগরিক সভ্যতার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছি। আমাদের মধ্যেও পাশ্চাত্যের অনর্থকর Industrialism বা বাণিজ্যনীতি ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করিতেছে। যে সময়ে য়ুরোপের চিন্তাশীল ও মহানুভব ব্যক্তিগণ এই আসুরিক বাণিজ্যনীতির অশেষবিধ কুফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া সভ্যতার অঙ্গ হইতে ইহাকে ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, আমরা ঠিক সেই সময়েই তাহাকেই উন্নতির সোপান মনে করিয়া আগ্রহভরে নিজেদের মধ্যে বরণ করিয়া লইতেছি। সুতরাং আমরা যে আমাদের সভ্যতার বিশিষ্টতা হারাইতে বসিয়াছি, এবং তাহার স্থলে য়ুরোপের সভ্যতার বহিরবয়ব মাত্র আমাদের মধ্যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নব্যতান্ত্রিক বলিবেন, 'তাহাতে আর দোষ হইয়াছে কি, ইহাই ত স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পৃথিবীর সঙ্গে যোগ রাখিতে হইলে আমাদের সভ্যতাকে আধুনিক উন্নত জাতিসমূহের আদর্শানুযায়ী করিয়া লইতে হইবে।' ইহার উত্তরে আমরা বলি,—বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা হইবার নহে। আমাদের ভাগ্য অপরের হাতে; আমাদের সভ্যতা সুতরাং আমাদেরই ভাব ও আদর্শের পথে তাহার পরিণতি ও সার্থকতার সন্ধান কেমন করিয়া পাইবে?

জাপান য়ুরোপের সভ্যতা গ্রহণ করিয়া বড় হইয়াছে, কারণ তাহার একটা নিজস্ব প্রাচীন সভ্যতা ছিল না। কিন্তু তথাপি যতদিন জাপানীরা আপন উন্নতিকে আত্মবৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহিমায় মণ্ডিত করিতে না পারিবে ততদিন তাহাদের মহত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না, এই কথা রবীন্দ্রনাথ সেদিন উহাদিগকে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছেন। চীনাদের সম্বন্ধে আমরা বড় বেশী কিছু জানি

না। তবে উহারা যে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সংস্রব বড় পছন্দ করে না তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এতদিন উহারা অহিফেনের নেশায় নিদ্রা যাইতেছিল। তথাপি উহাদের মধ্যে এমন একটি সঞ্চিত শক্তি আছে যে পাশ্চাত্য জাতিগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও ওখানে স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। উহাদের চরিত্র ও সভ্যতা সম্বন্ধে আমেরিকার অধ্যাপক রীন্শ্ (Reinsch) ষোল বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার World Politics নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন, 'চীন বার বার বৈদেশিক কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াও তাহার প্রাচীন নীতিপথ হইতে একটুও ভ্রষ্ট হয় নাই, বিজেতৃগণই বরং চৈনিক প্রথা ও ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে (The conquerors having instead fallen into Chinese ways and forms) তাহার কারণ, চীন-সমাজ ও সভ্যতার একটি বিশিষ্ট গুণ এই যে, উহা বাহিরের যাহা কিছু আত্মসাৎ করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারে।' (৮৯ পৃষ্ঠা) এতদিন পরে চীন-কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। বিপ্লবের পর চীনে যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা পাশ্চাত্যের অনুকরণে নহে। চীনের রাজতন্ত্রেই উহার বীজ নিহিত ছিল। 'ম্যাণ্ডারিন্' পদবীধারী চীনের শাসকসম্প্রদায় জনসাধারণের মধ্য হইতেই পরীক্ষা দ্বারা গৃহীত হইত। এ সম্বন্ধেও উক্ত অধ্যাপক বলিতেছেন, 'সুশিক্ষিত ম্যাণ্ডারিন্গণ দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালিত হওয়ায় চীনের সমাজ-ব্যবস্থা প্লেটোর আদেশানুযায়ী বলিয়া মনে হয় (This social system is remarkably like the ideal system of Plato's Republic.) চীন পাশ্চাত্যপ্রভাব উপেক্ষা করিয়া নিজের বলে স্বীয় প্রাচীন গৌরব উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। আমরাও কি আমাদের আদর্শানুরূপ উন্নতির পথ আবিষ্কার করিতে পারিতাম না? 'অতীতের যাহা করিয়াছে বড়, করিবে বর্ত্তমান'—কবির এই কথা বর্ত্তমান যুগের অবস্থায় সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের আলোকে কি ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নিরূপণ করিতে সক্ষম হইতাম না?

বৈদেশিক প্রভাবে আমাদের যে একেবারেই কোন উপকার হয় নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু 'বিদেশী শিক্ষার কাছে সমাজের শিক্ষিত লোক হৃদয় মনকে (এমনই) অভিভূত হইতে দিয়াছে,'* যে, আমরা সুফল কুফল বিচার করিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া বসিয়া আছি। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংরাজি প্রভাবের আবহাওয়ায় আমাদের আজ এমন একটি সুপুষ্ট সাহিত্য তৈয়ারী হইয়া উঠিয়াছে, যাহা লইয়া আমরা এখন বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করি; এবং ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের যে মহদুপকার সাধিত হইয়াছে এই সাহিত্যই তাহার প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু সম্প্রতি আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এই সাহিত্যে বিদেশী মাল এত বেশী যে ইহাকে বোধ হয় ঠিক আমাদের জাতীয় সাহিত্য বা দশের সাহিত্য বলা যায় না। এই সাহিত্যে যাঁহার স্থান সকলের উপরে, সেই রবীন্দ্রনাথই ত্রিশ বৎসর আগে এই কথা বুঝিয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালের একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—'এখনকার অধিকাংশ বাংলা বই পড়ে আমার এই মনে হয় যে, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের সময়ে বাংলা দেশই ছিল কি না ভবিষ্যতে এ নিয়ে তর্ক উঠ্তে পারে। * * * পণ্ডিতেরা বল্বেন বঙ্গসাহিত্য একটা কলেজের সাহিত্য, এটা দশের সাহিত্য নয়। কিন্তু সে কলেজটা ছিল কোথায়, এ বিষয়ে কিছুই মীমাংসা হবে না।'† দুই বৎসর পরের লিখিত তাঁহার অপর একখানি পত্রে দেখিতে পাই, 'বাংলার অন্তর্দ্দেশবাসী নিতান্ত বাঙ্গালীদের সুখদুঃখের কথা এ পর্য্যন্ত কেহই বলে নি। ** বঙ্কিমবাবু উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালীর কথা যেখানে

* রবীন্দ্রনাথ।

† ছিন্নপত্র, ৭ পৃষ্ঠা।

বলেছেন সেখানে কৃতকার্য্য হয়েছেন; কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথা বল্‌তে গিয়েছেন, সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ, তাঁরা সকল দেশীয়, সকল জাতীয় লোকই হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতি এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালী আঁক্‌তে পারেন নি।'*

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য সম্বন্ধেও অপরে আজ সেই কথাই বলিতেছে। কিছুদিন হইল বিলাতের 'এথীনিয়ম্‌' নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের উপর এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল,—'ভারতের অন্যান্য কবিগণ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ আমাদের বেশী নিকটে আসিয়াছেন বলিয়াই তিনি আমাদের মন এত বেশী হরণ করিতে পারিয়াছেন; এবং তিনি যে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে আমাদের আদর্শ ও সাহিত্যের প্রকৃতি কিছু কিছু আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই আমাদের এত কাছে আসিয়াছেন, একথা বলিবার অধিকার আমাদের আছে।'* অবশ্য, এই কারণে বঙ্কিম কিংবা রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব একটুও খর্ব্ব হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কিন্তু তথাপি পাশ্চাত্য প্রভাবের এই সুফলটিতে—আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যে বিশেষ আনন্দিত হইবার কারণ আছে কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সংঘর্ষে ভারতে প্রকৃত সুফল যাহা ফলিয়াছে, তাহা কতকটা মধ্যযুগে য়ুরোপে আরব সভ্যতার প্রভাবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। য়ুরোপ যখন ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত তখন আরবের মুসলমান (শ্রীমতী বেসান্তের ভাষায়) carried the torch of science into Europe and laid the foundation there of the revival of learning at the Renaiscenec—জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা তথায় লইয়া গিয়া য়ুরোপের নবজীবনের পত্তন করিয়াছিল। আমাদেরও যখন আত্মরক্ষার্থে বাধ্য হইয়া কুর্ম্মনীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, এবং ফলে কয়েক শত বৎসর দেশ তমসাচ্ছন্ন হইয়া ছিল, তখন ইংরাজ পাশ্চাত্যজ্ঞানের আলোকরশ্মি এদেশে আনিয়া আমাদের নবাভ্যুদয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আরব জাতি য়ুরোপে শুধু আলোক দিয়াই চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল, আপন সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবার অবসর পায় নাই।

তথাপি এখনও আমাদের সম্পূর্ণ নিরাশ হইবার কারণ উপস্থিত হয় নাই। এখনও বোধ হয় এখানে এরূপ লক্ষণ প্রকটিত হয় নাই যাহাতে গ্রীস সম্বন্ধে গ্রোটের আশঙ্কা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রযুক্ত হইতে পারে। হিন্দু মুসলমান আজ একই ভাগ্যসূত্রে গ্রথিত। এই দুই সম্প্রদায় তাহাদের পুরাতন বৈরিভাব ভুলিয়া গিয়া অধুনা একযোগে আত্মোন্নতির জন্য যত্নবান হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

---

* ছিন্নপত্র, ১০ পৃষ্ঠা।

* It is because he is nearer to ourselves than other Indian poets that he has so deeply touched us, and we have the right to say that if he is nearer to us, it is because he has, by conscious and unconscious processes, assimilated something of our standard and of the spirit of our literature. The Athenoeum, May 8, 1915 p. 421.

পয়সার প্রতাপ

(গল্প)

১

হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল নিত্যানন্দ রায়ের খানসামা নিধিরাম দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া, সতর্ক-উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। নিধিরামের ছোট ভাই, দ্বাদশবর্ষীয় বালক,—বাবুর বড় মেয়ের ছেলে বহিবার চাকর 'খুদু' আসিয়া বলিল,"দাদা, কর্ত্তাবাবু তোমায় ডাকছেন।"

বিচিত্র সৌন্দর্য্য-রুচির পরিচায়ক, দৃষ্টি-বিভ্রমকারী বিলাস সভ্যতার আয়োজন উপকরণ সজ্জিত প্রকাণ্ড কক্ষমধ্যে শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর উত্তরার্দ্ধ ঝুঁকাইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া, চেয়ারে বসিয়া নিধিরামের প্রভু ভোগসেবা-পরিপুষ্ট বলিষ্ঠ স্থূলকান্তি নিত্যানন্দ রায় 'তড়াত্তড়' কলম চালাইতেছিলেন। কাছাকাছি কয়খানা চেয়ারে পাঁচ ছয় জন ভদ্র, অভদ্র, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী মক্কেল বসিয়া মামলা সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। ভ্রাতার কথা শুনিয়া নিধিরাম দ্বারের পাশ হইতে কক্ষমধ্যে একবার সশঙ্কিত দৃষ্টিপাত করিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল,"কর্ত্তাবাবু ডাক্‌ছেন? তাইত, বাবুর কাছে মক্কেলরা বসে রয়েছে, যদি এখুনি কোন দরকার পড়ে ত?—আচ্ছা খুদু, কর্ত্তাবাবু কেন ডাকছেন জানিস?"

"জটারামকে হাঁসপাতালে পাঠান হচ্ছে, বাবুর চিঠি নিয়ে তোমায়ও সঙ্গে যেতে হবে,—"

"জটাকে? আহা"—ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিধিরাম বলিল, "রামাকে চট্ করে ডেকে আন দিকি, তাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে যাই।—আহা জটা বোধ হয় আর বাঁচবে না রে।"

অজ্ঞাতে আবার একটা নিঃশ্বাস পড়িল। বাতশ্লেষ্ম-বিকারে সহযোগী ভৃত্য জটারাম মর মর হইয়াছে, হাঁস-পাতাল-পাঠান'র নামে নিধিরাম নিশ্চয় বুঝিল জটার আসন্নকাল সমাগত। তাহার মনে বড় দুঃখ হইতে লাগিল,—আহা বিদেশে বিভুঁইয়ে চিরদিনটা পয়সার জন্য খাটিয়া লোকটা মরিবার সময় স্ত্রী পুত্রের মুখও দেখিতে পাইল না!

খুদু অবিলম্বে গিয়া রামা চাকরকে ডাকিয়া আনিল। নিধিরাম তাহাকে বাবুর হুকুম তামিল করিবার অপেক্ষায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া, জটার ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল।

গৃহমধ্যে উকীলবাবু, মক্কেলদের সহিত আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চিঠি লেখা শেষ করিয়া খামে ঠিকানা লিখিতেছেন, এমন সময় তাঁহার ম্যানেজার বিপিন বাবু কক্ষে ঢুকিয়া সমাগত মক্কেলগণের মুখ তাকাইতে তাকাইতে,—উকীলবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কলকাতা থেকে সৌরীন চক্রবর্ত্তীর টেলিগ্রাম এল।"

খচাখচ শব্দে শিরোনামা লিখিতে লিখিতে তাহারই উপর দৃষ্টিবদ্ধ রাখিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উকীল বাবু বলিলেন, "কি বলে?"

ইতস্ততঃ করিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "বাড়ীখানার কথা—"

গম্ভীর হইয়া উকীল বাবু বলিলেন, "কাল রাত্রে চিঠি লিখে দিয়েছ ত?"

"আজ্ঞে হাঁ, তা লিখে দিয়েছি, কিন্তু ওঁরা আজই রওনা হচ্চেন, কাশীতে তারাপদ বাবুকে বাড়ীর চাবির জন্যে টেলিগ্রাম কর্ত্তে বলেছেন, কেন না মেয়েছেলেরা সঙ্গে যাচ্ছেন পাছে চাবি পেতে দেরী হয় বলে—"

সদ্য লিখিত পত্রখানা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া চোখের সামনে ধরিয়া উকীলবাবু বলিলেন, "বেশ, সৌরীন বাবুকে টেলিগ্রামের কোন জবাব দিতে হবে না, তবে কাশীতে তারাপদ বাবুকে একখানা

টেলিগ্রাম করে দাও যেন সৌরীন বাবু চাবি চাইলে বলে বাড়ী অন্ত লোককে বিলি করা হয়েছে, তারা জিনিসপত্র বাড়ীতে রেখে গেছে, সৌরীন বাবুকে বাড়ী দিতে পারা যাবে না।”

একটু কুণ্ঠিত হইয়া বিপিন বাবু বলিলেন, “যে আজ্ঞে, কিন্তু,— হাজারীমল মাড়োয়ারী শেষ পর্য্যন্ত দেড়শো টাকা দিয়ে বাড়ী ত ভাড়া করবে? আমার সন্দেহ হয়,—শেষে যদি বলে বসে না বাবু পারলুম না, তা হলে বাড়তি কুড়ি টাকার জন্যে সৌরীন বাবুদের একশো তিরিশ টাকা ভাড়াও অনর্থক নষ্ট হবে,—তা ছাড়া ভদ্রলোককে প্রথমে কথা দেওয়া হয়েছিল।”—

চিঠির উপর হইতে চোখ তুলিয়া রুক্ষস্বরে প্রভু বলিলেন, “হয়েছিল তা হবে কি? বেশী বোকো না।”

উদ্ধত প্রভুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর কঠিন হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া,—ব্যবস্থা চাতুর্য্যে সুপণ্ডিত বিপিন বাবু টেবিলের উপরকার চিঠিখানা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ-ছলে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “যে আজ্ঞে—আচ্ছা এ চিঠিখানা রেজেষ্ট্রী ডাকে ডেস্‌প্যাচ্ করতে হবে না?”

“হুঁ”— বলিয়া গম্ভীরভাবে চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া উকীল বাবু মক্কেলগণের একজনের উদ্দেশে বলিলেন, “হাঁা, তার পর, আপনার কথাটা হোক,—ও লোকটা কি বলে?”

মক্কেল বহুক্ষণব্যাপী ধৈর্য্যের সাফল্যে আনন্দে কৃতার্থ হইয়া, সরিয়া নড়িয়া বসিয়া, সবিনয়ে কি একটা কথা বলিবার উপক্রম করিতেছে—সেই সময় বিপিনবাবু, উক্ত লিখিত পত্রখানি টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইবার অছিলায় আরও একটু নিকটস্থ হইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে, যেন কতকটা অপনমনেই বলিলেন, “টেলিগ্রামের কথাটা আর একটু বিবেচনা করে দেখলে হত, বিদেশ বিভুঁইয়ে ভদ্রলোক মেয়েছেলে নিয়ে খামকা নাকাল হবে, অন্ততঃ দিন পনের'র জন্যে বাড়ীখানা দিলে একূল ওকূল দুকূলই বজায় থাকৃত...... .. চূণকামের খরচ বলে তাড়াতাড়ি তিনি আগামী দশ টাকা জমা করে দিয়ে গেলেন; কাজটা......ভাল হবে কি?.........”

কথা আরম্ভ করিতে উদ্যত মক্কেল, বৃদ্ধ বিপিন বাবুর স্বগত উক্তিতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া মাঝখান হইতে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া— রুদ্ধ অপমানে ক্রুদ্ধ উকীলবাবু অকস্মাৎ তর্জ্জনী উঠাইয়া, মহা গর্জ্জনে প্রচণ্ড ধমক ঝাড়িলেন,—“রাস্কেল বিপিন, নিকালো—আবি নিকালো আমার বাড়ী থেকে! কাজের ক্ষেতি করে বক্‌বকানি! এখুনি দূর হয়ে যাও ষ্টুপিড!”

“যে আজ্ঞে”—নিশ্চিন্ত ধৈর্য্যে অবিচল প্রসন্ন মুখে ভদ্রত্বের মর্য্যাদাভিমানী মাননীয় চাকুরে বাবু বৃদ্ধ বিপিনচন্দ্র হাত বাড়াইয়া টেবিলের উপর হইতে পত্রখানা তুলিয়া লইয়া ঠিক পূর্ব্বের মতই সহজভাবে বলিলেন, “ওঁর এ মাসের খরচ পঞ্চাশ, আর উপরি কিছু দিতে হবে না...”

রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া উকীল বাবু বলিলেন— “না।”

বৃদ্ধ একটু বোকা বনিয়া গেছেন, বুঝিলেন যে গোপন রহস্যের সুধা-বাষ্পপূর্ণ ঐ পত্র ও টাকার কথা তুলিয়া তিনি প্রভুর উগ্রতা গলাইয়া মেজাজটা মুঠায় পুরিতে কৌশল করিয়াছেন, তাহা ভুল হইয়াছে। বুদ্ধিমান প্রভু এখন অন্ততঃ মক্কেলগণের সমক্ষে সে তথ্যের এতটুকু আভাস ইঙ্গিত লইয়াও উপস্থিত সময়ে নাড়াচাড়া করিতে অনিচ্ছুক, তাই চতুর বিপিনবাবুর কারদানির চালে তাঁহার মেজাজ জল না হইয়া, উল্টা আগুন হইয়া উঠিয়াছে! থতমত খাইয়া বৃদ্ধ বিপিনচন্দ্র আর একটি কথা না কহিয়া বিজ্ঞ বুদ্ধিমানের মত ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

কাঁচা মগজের সৌখীন চড়ুইগুলা মানের খাতির লইয়া ব্যস্ত, তাহাদের সাধ্য কি যে এমন কড়া মেজাজের চড়া স্বভাবের,—ভাগ্যলক্ষ্মীর তেজস্বী বরপুত্রের নিকট, তিনটা দিত গোলামীর গৌরব বজায় রাখিয়া টিকিয়া থাকে! পাকা মগজের বুদ্ধিমান

বিপিন বাবু নাকি দেখিয়া শুনিয়া সেয়ানা ঘুঘু হইয়া উঠিয়াছেন, তাই অহোরাত্র প্রভুর নিকট—শুধু প্রভুর নিকট কেন, প্রভুর সাহেবী মেজাজের মাননীয় ভৃত্য—অর্থাৎ তাঁহার ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্রদ্বয়ের ইংরেজী কায়দায় উঠা, বসা, দাঁড়ান, হাঁটা, খাওয়া, শোওয়া, ঘুমান স্বপ্ন-দেখা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা-দাতা, ডবল অনার বি-এ পাস, আহার ও বাসস্থান বাদে আশী টাকা মাহিনার গৃহশিক্ষক, ঘোরতর সাহেবী মেজাজের বাঙ্গালী খৃষ্টান মিঃ জেলার্ট সাহেবের নিকটও অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইতে না হইতে ইংরেজীতে রাস্কেলিজম্ ও হিন্দীতে ও উর্দ্দুতে গাধা, গিধোড়, উল্লু শুনিয়া, এবং শূন্যে আস্ফালিত ঘুঁসির কাল্পনিক প্রহার-লাঞ্ছনা সহিয়া—সমস্ত আমলাকে 'যানে দেও' বলিয়া হাসিমুখে সসম্মানে অভিনন্দন করিয়া লইতে দুরন্ত হইয়াছেন। সেই জন্যই আজিও বৃদ্ধ বিপিনচন্দ্র প্রভুর অন্ন পরম পরিতোষে পরিপাক করিয়া এবং নির্ব্বিকার চিত্তে নেয়ারের খাটে নিদ্রা দিয়া প্রভুর কাজ বাজাইয়া, নিমক-হালাল ভক্ত-ভৃত্য-বেশে সদম্ভে নিজের পদমর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন!—এমন দুরূহ কৌশলের কেরামতি কি অন্যের ধাতে সহে! অসম্ভব!—গর্ব্বপ্রফুল্ল বদনে গৃহ হইতে বাহির হইয়া বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ম্যানেজার, মহাশূর প্রভুর গুপ্তসখের কারবারের দস্তুরমত ম্যানেজমেন্ট করিতে চলিয়া গেলেন।

২

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নিধিরাম ভৃত্য, যথাসম্ভব শীঘ্র হাঁসপাতালে পীড়িত সহযোগীকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া; প্রভুর কাছারী যাওয়ার তাকে সময়ের হিসাব রাখিয়া বাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়াছে, কেন না সে-ই প্রভুর পোষাক-কামরায় ভারপ্রাপ্ত বিশ্বাসী ও কর্ম্মদক্ষ ভৃত্য। নিধিরাম উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততার সহিত প্রভুর জুতা, মোজা, প্যান্ট, কোট প্রভৃতি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া প্রভুর হাতে হাতে যোগাইতেছে,—এমন সময় ধীর কোমল চরণক্ষেপে, ক্ষমা সহিষ্ণুতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তির মত, উকীল বাবুর সহধর্ম্মিণী—না, না, ভুল, সহধর্ম্মিণী নয়, সহকর্ম্মিণী বলিলেও সত্যের অপলাপ হইবে বোধ হয়,—অতএব ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং মর্ম্মের সম্পর্ক হইতে বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে,—তাহারই সম্বন্ধ-সন্ধিতে কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে হরিদ্রারঞ্জিত সূতার গ্রন্থিবদ্ধ বিবাহ দ্বারা সাব্যস্ত পত্নী আখ্যায় অভিহিতা নারী,—সরমাসুন্দরী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

জরুরী কাজের তাড়া ভিন্ন তিনি এমন সময় এ কক্ষে বড় একটা প্রবেশ করেন না,—সুতরাং অল্পবয়স্ক যুবক ভৃত্য নিধিরাম,'বড়মা'র কথাটা শেষ হইতে দিবার জন্য, কোটের গায়ে ব্রস ঘসিতে ঘসিতে বাহিরের বারেণ্ডায় চলিয়া গেল।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রথমেই পুত্রের পীড়ার সম্বন্ধে দু একটা কথা হইল। তারপর স্ত্রী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "দ্যাখ কোটালগাঁয়ে তোমার সেই মক্কেলের বিধবা সৎমা'কে আর কেন জব্দ করছ, তার আড়াই হাজার টাকা এবার ফেলে দাও। বামুনের বিধবা, কোন দিন শাপ মন্নিতে কি হবে, আমার ত ভয় করে,—"

রুক্ষভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কঠোর স্বরে উকীলবাবু বলিলেন,"খবর্দ্দার আমার কাছে প্যান্‌প্যানাতে এস না। 'ভয় করে' আমার সামনে থেকে দূর হও।"

এরূপ সম্ভাষণ লাভ ইহাঁর নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবস্থা—সুতরাং কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া মিনতির স্বরে তিনি বলিলেন, "মক্কেলের ভাল মন্দ দেখা অবশ্য উচিত। কিন্তু এটা মামলা খরচের গচ্ছিত টাকা, বিধবা ধার করে দিয়েছে, তার শত্রু সতীন-পোর কথা শুনে এমন ভাবে নাহক অন্যায় করে নেওয়াটা কি......"

তর্জ্জনী উঠাইয়া অধিকতর কঠোর স্বরে স্বামী চোখ রাঙাইয়া বলিলেন, "যেমন মানুষ তেমনি থাক, বেশী বক্ বক্ কোর না। সে টাকা তাকে ফিরিয়ে দেবার মতলব থাকলে এদ্দিন দিয়ে দিতুম। তাকে দেব না বলেই দিই নি, সে কি কর্ত্তে পারে করুক গে,—তুমি খবর্দ্দার এ সবে কথা কইতে এস না!"

প্রভূত উপার্জ্জনশীল, অসীম যশঃখ্যাতিসম্পন্ন

'ইন্দির চন্দোর' স্বামীর পত্নী হওয়ার সৌভাগ্য সুযোগের জন্য চারিদিক হইতে ভাগ্যের স্তুতি শুনিতে শুনিতে সরমাসুন্দরী 'দশের' মাঝে বসিয়া গৌরবের অথই-তলে তলাইয়া যান; কিন্তু স্বামীর কাছে আজীবন-কাল ধরিয়া তিনি এমনই করিয়া কথার পিঠে 'থাক্-দমা' খাইয়া আসিতেছেন,—ইহা আজ নূতন নহে! তিনি ইন্দির চন্দোর স্বামীর বংশধরগণের জননীই হউন, আর যাহাই হউন, তিনি নিজে ত একটি সামান্য ক্ষুদ্র নারী ছাড়া আর কিছুই নহেন! সুতরাং ন্যায়বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত স্বামীকে, অধর্ম্মাচার পরিহারে অনুরোধ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসহ স্পর্দ্ধা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

'যেমন মানুষ তেমনই থাকিবার' উপদেশে উকীল বাবুর স্ত্রীর বোধ হয় সদ্য সদ্য আত্ম-তত্ত্বানুভূতি জাগিল, কেন না সে প্রসঙ্গ একেবারেই ছাড়িয়া দিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, শুষ্ক মুখে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ছেলেদের মাষ্টার আজকাল বড় বেশী রাত করে বাড়ী ঢুক্‌ছেন—খাবার দাবার রোজ রাত্রে নষ্ট হচ্ছে, তাঁকে বোলো—"

চোখ পাকাইয়া উদ্ধতভাবে স্বামী বলিলেন, "কি বলব?"

কুণ্ঠিতা হইয়া স্ত্রী বলিলেন, "যদি বাড়ীতে তাঁর খাবার অসুবিধে হয় তা হলে ....।"

উকীল বাবুর ভ্রূযুগল সহজ হইল। স্ত্রীর কথায় প্রথমটা তাঁহার বিলক্ষণ সংশয় ও ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন বুঝি মাষ্টার মিঃ জেলার্টের 'রাতচরা' রোগের বিরুদ্ধেই তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। কিন্তু এখন তাহা নহে বুঝিয়া আশ্বস্ত হইয়া, পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত গলার কলারে বোতাম আঁটিতে আঁটিতে বলিলেন, "হুঁ, তার জন্যে কাউকে ভাব্‌তে হবে না।"

পরক্ষণেই রুক্ষকণ্ঠে ডাকিলেন, "কিরে, গাউনটা ব্রুস করা হোল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ", বলিয়া ভৃত্য তাড়াতাড়ি কক্ষে ঢুকিল। প্রভু হঠাৎ অত্যন্ত কড়া আওয়াজে বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের সবাইকার মরণ-বাড় হয়েছে, না? কোন কথা বলি না তাই!—এবার জেলার্ট সাহেবের নামে কারুর মুখে যেদিন কোন কথা শুনব, সেদিন চাব্‌কে সিধে করব। জেলার্ট যা খুসী তাই করবে, তোদের বাবার কি?"

শেষের কথাটা যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল, বুঝা গেল না; অথবা মর্ম্মে মর্ম্মে কেহ সে কথা পরিস্কাররূপে বুঝিলেও মুখে কেহ কোন কথা ফুটিলেন না,—কিন্তু বিস্মিত ভৃত্য ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। ব্যাপারটা কি হঠাৎ নিরীহ নিরপরাধ বেচারী কিছুই বুঝিতে পারিল না, সাহস করিয়া কিছু বলিতেও ভরসা হইল না, অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার মনে মনে সন্দেহ ও আশঙ্কা হইল যে, অল্পদিন পূর্ব্বে মামলা উপলক্ষে এলাহাবাদের বাংলোয় বাস-কালীন ইহুদী মেমকে লইয়া প্রভু যে বাড়াবাড়িগুলা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে নিধিরামের অসতর্কতায় যে গোপন কথাগুলা অপর সকলের নিকট ফাঁস হইয়া গিয়াছে—তাহাই বুঝি সম্প্রতি কোন রকমে প্রভুর কাণে উঠিয়াছে, এবং সে বিষয়ের প্রতিই বোধ হয় কটাক্ষপাত করিয়া প্রভু এখন মাষ্টার সাহেবের প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া ইঙ্গিতে শাসনের চাবুক দেখাইতেছেন! ভৃত্য অত্যন্ত জড় সড় হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে আমি—"

"চুপ রাস্কেল।"

ভৃত্য চুপ করিল। প্রভু কোট পরিয়া হ্যাট তুলিয়া সাহেবী কায়দায় পা ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। ভৃত্য আইনের বই নথীর তাড়া প্রভৃতি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়া প্রভুকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিল।

ফিরিয়া, পোষাক কামরা বন্ধ করিতে আসিয়া ভৃত্য দেখিল—প্রভু-পত্নী তখনও সেখানে শুষ্ক ম্লান বদনে দাঁড়াইয়া এটা ওটা লইয়া অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতেছেন। নিধিরাম বলিল, "বড় মা, আপনি কি এ ঘরে এখন থাকবেন?"

"না বাবা, আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি, তুমি চাবি দিয়ে যাও। আচ্ছা নিধি, তুমি সকালবেলা বাবার চিঠি নিয়ে জটারামকে হাঁসপাতালে পৌঁছে দিতে গেছলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"হাঁসপাতালের ডাক্তাররা দেখে কি বল্লেন ? বাঁচবে ত ?"

বিষণ্ণভাবে একটু হাসিয়া ভৃত্য বলিল যে, সবজজ বাবু আইনসঙ্গত বিচারে পনর আনা সাড়ে তিন পাই আশা হাতের বাহির হইয়া না গেলে, সহজে কাহাকেও হাতছাড়া করেন না, সুতরাং মরণের দাখিল না হওয়া পর্য্যন্ত চাকরটাকে হাঁসপাতালে পাঠান নাই—সেই জন্য হাঁসপাতালের কর্ত্তারা জটাকে পরীক্ষা করিয়া দুঃখিত হইয়া বলিয়াছেন যে সবজজ বাবুর ক্যাশে কি মড়া ফেলার খরচটার অনটন পড়িয়াছে ?

শ্বশুরের সুবিচারের খ্যাতি সম্বন্ধে এই কথাগুলা যতই কঠিনসত্য হউক, পুত্রবধূর কাণে ইহা ভাল শোনায় না—সুতরাং বড় মা অর্থাৎ উকীল বাবুর স্ত্রী সে সকল কথার কোন সায় উত্তর না দিয়া, ঈষৎ ব্যথিতভাবে শুধু বলিলেন, "আহা জটাকে তাহলে আসন্ন বিকারে ধরেছে, সে আর বাঁচবে না ! ছাখো নিধি, তুমি বৈকালে হাঁসপাতালে গিয়ে তার খোঁজ নিও। আর, একটা টাকা দেব, ফল টল কিনে দিও। ... ... জটাকে জিজ্ঞেসা করো যে বড় মা বলে দিলেন, তোমার কি খেতে টেতে ইচ্ছে হয় বল, বড় মা তৈরী করে পাঠিয়ে দেবেন।"

তিনি চলিয়া গেলেন। ভৃত্য কৃতজ্ঞ করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "মা গো, তোমারই পুণ্যবলে, ঐ সাক্ষাৎ কলিদেব এত অত্যাচারে অনাচারেও মান প্রাণ বাঁচাইয়া, ভাগ্যবলে ধূলামুঠা ধরিতে কড়িমুঠা ধরিয়া সংসারে আজ ধন্য হইয়াছেন, না হইলে এত উচ্ছৃঙ্খলতা কি মানুষের শরীরে বরদাস্ত হয় !........ ভূত প্রেত পিশাচের দেহেও যে এত শ্রমবৈষম্যের ব্যভিচার সহ্য হয় না !"

প্রভুর সহিত অনেক দিন হইতে নানাস্থানে ঘুরিয়া নিধিরাম অনেক রকমই দেখিয়াছে। নানা স্থানের অনেক জঘন্য কুৎসিত ঘটনাচিত্র—একে একে তাহার মনে পড়িল। ঘৃণায় তাহার নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, ক্ষোভে চিত্ত অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল।... ... দোহাই ঈশ্বর, অন্নের কাঙাল সে, নীচ দারিদ্র্যে পরাধীন ভৃত্য সে, কিন্তু ধর্ম্মের দুয়ারে হলপ পড়িয়া বড় গলায় সে বলিতে পারে যে চরিত্রবলে সে রাজা ! কিন্তু অমন ঘৃণিত চরিত্রহীনতা লইয়া, অত সম্মান সম্পদ বিদ্যা সাধ্য গৌরবে সে এক দিনের জন্যও নিজেকে বিলাসী বড়লোক করিতে চাহে না। তার চেয়ে গ্রাম্য পাঠশালার অল্পশিক্ষিত গরীব কায়স্থের ছেলে সে, দেনার দায়ে ভিখারী সাজিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন করিবে সেও ভাল, তবু—হে ভগবান, তাহাকে ধর্ম্মের সম্মুখে তাজা বুকটাকে গর্ব্বে ফুলাইয়া, মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি দিও। সে শক্তিটুকু যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে কিসের দারিদ্র্য তাহার, কিসের পরাধীনতা তাহার !

ঘর ঝাড়িতে ঝাড়িতে নিধিরাম্‌ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, দূর হউক আর এই কয়টা দিন—যাহার জন্য সে স্বাধীন সম্মানের—তাহার বড় সখের চাষের কাজ ছাড়িয়া এই লক্ষীছাড়া লাঞ্ছনার কাঁচা পয়সার চাকরী করিতে আসিয়াছে, তাহা ত আধা খাইয়া আধা গিয়ায় ঠেকিয়াছে। পৈত্রিক দেনা ত তাহার শোধ হইয়া আসিয়াছে। আর ভয় কি, আর কয়টা মাস চোখ কাণ বুজিয়া খাটিলে,তাহার পর সবই পরিস্কার হইয়া যাইবে। .... একবার দেনাটা পরিস্কার হইলে ত হয় ! তার পর মনীব বাড়ীর অন্নকে নমস্কার করিয়া, ছোট ভাই খুড়ুর হাত ধরিয়া, সে মার ছেলে মার কোলে ফিরিয়া গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে। তাহার পর মনীব বাড়ীর চাকরীর সম্মানটা চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে বটে, কিন্তু জীবন থাকিতে আর এ-মুখো

হইতেছে না। ম্যানেজার বিপিনবাবু বড় চাকরীর খাতিরে বড় ঝড় সহেন, কিন্তু ক্ষুদ্র ভৃত্য সে, তাহার পক্ষে অত বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝনা সহ্য করা পোষায় না!"

ঘড়িতে টং টং করিয়া এগারটা বাজিল। জল খাইবার ফুরসুৎ হইয়াছে বুঝিয়া নিধিরাম পোষাক কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৩)

পরে কয় দিন কাটিয়া গিয়াছে।

আজ দুই দিন হইতে নিধিরাম চাকরের জ্বর হইয়াছে। আদা মিছরি আর মুড়কি চিবাইয়া সে অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রভুর ফরমাসের ইঙ্গিতে দুরন্ত খাটুনি খাটিতেছে। ক্লান্তি এবং অবসাদে সে ভিতরে ভিতরে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার উপর আজ সকালে হাঁসপাতালে সহযোগী জটারাম খানসামার মৃত্যু হওয়ার খবর পাইয়া অবধি মনটাও কেমন খারাপ হইয়া রহিয়াছে, কিছুই যেন ভাল লাগিতেছে না।

শীতের দ্বিপ্রহরে সদর বাড়ীর ছাদে রৌদ্রে বসিয়া নিধিরাম সূচ সুতা ও নানান ধরণের বোতাম লইয়া প্রভুর পোষাকে প্রয়োজন মত দেখিয়া শুনিয়া বসাইতেছিল। শরীর এবং মন বড়ই নিস্তেজ হইয়া আছে,—কিন্তু ব্যবহৃত পোষাকগুলা রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া না তুলিয়া রাখিলে নিস্তার নাই। প্রভু আদালতে গিয়াছেন, পোষাকে ব্রস ঘসিয়া, পাটে পাটে ন্যাপ্‌থলিন্ সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে নিধিরাম ভাবিতেছিল, এইবার একটু নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া ঘুমাইবে—বেলা তিনটার কমে ত হাঁড়ি হেঁসেল উঠিবে না। গয়লার দুধ আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—সকাল হইতে বাড়ীতে কচি ছেলের মায়েরা ষ্টোভে দুধ জ্বাল দিয়া প্রয়োজন মত ছেলেদের একটু আধটু খাওয়াইয়াছেন, বাকী দুধ বামুন ঠাকুর বেলা তিনটার পর হাঁড়ি হেঁসেল তুলিয়া নিকাইয়া, সুবিধা ও অবকাশ মত জ্বাল দিবে, সুতরাং অসুস্থ দাস-দাসিগণ ততক্ষণ পর্য্যন্ত আদা মিছরি খাইয়া ক্ষুধায় টিটাইয়া থাকিতে বাধ্য। মুখফোড় দুঃসাহসী ঝি-চাকরের কেহ কেহ রাগিয়া ঝাঁজিয়া, দুই চারি কথা ঠাকুরকে শুনাইয়া, বড় মার কাণে গোলযোগ তুলিয়া সকাল সকাল দুধ জ্বাল দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া লয়; কিন্তু 'যদি হই দীন, না হইব হীন' প্রতিজ্ঞা-পরায়ণ নিধিরাম সেরূপ কেলেঙ্কারী করিয়া কার্য্য হাঁসিলের পাত্র নহে। সে দরিদ্র ভৃত্য, কিন্তু তাহার মর্ম্মের মধ্যেও জলন্ত যাতনার মত আত্ম-মর্য্যাদার তেজটুকু বজায় আছে। সুতরাং অসুস্থতার মধ্যে প্রভূত পরিশ্রমে ডাহা উপবাস তাহার সহ্য হয়, কিন্তু আহারের বিষয় লইয়া অপর কাহারও সহিত কুকুর বিড়ালের মত খেওয়োখেয়ি করা তাহার সহ্য হয় না! সেই জন্য নিধিরাম ভাবিতেছিল, দুধের অপেক্ষায় রান্নাঘরে গিয়া ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকা অপেক্ষা, নিজের ঘরে গিয়া স্বস্তিতে একটু ঘুমাইয়া সে পরিশ্রমের ক্লান্তিটা কাটাইয়া লইবে, আবার প্রভু আদালত হইতে ফিরিলেই ত উঠিয়া কাজ করিতে হইবে!

পাণ চিবাইতে চিবাইতে, কোঁচড় ভরা জোনারের খই লইয়া নিধির ভাই ক্ষুদিরাম ওরফে খুদু ছাদে উঠিয়া বলিল, "দাদা, ফুলুরীওলী মাগী টাটকা জোনারের খই ভাজছিল, তোমার জন্যে এক পয়সার কিনে নিয়ে এনু, তুমি ত সকাল থেকে কিছু খাওনি—এই কটা খেয়ে ফেল।"

চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া নিধিরাম বলিল, "তুই পয়সা কোথা পেলি?"

এক মুখ হাসিয়া খুদু বলিল, "ভাত খেতে গিয়ে ঠাকুরকে দুধ জ্বাল দেওয়ার জন্যে বলছিলুম, ঠাকুর বল্লে, 'ওঃ ভারি ত দাদার জন্যে দরদ রে, নিজের চরকায় তেল দে।' বড় মা শুনতে পেয়ে বল্লেন, 'কি হয়েছে'। আমি বল্লুম, 'দাদা সকাল থেকে কিছু খেতে পায় নি, তাই বলছি দুধটা জ্বাল দাও।' ঠাকুর বল্লে, 'আমি কি করব মা, রান্না শেষ না হলে কেমন করে দুধ জ্বাল দেব!'"

নিধি চটিয়া গিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "সে ত

ঠিক কথা, ঠাকুরের দোষ কি? রান্না ফেলে রেখে সে কি আমার জন্তে দুধ জ্বাল দেবে? তুই ভারি ঝগ্‌ড়াটে হয়েছিস খুদে! অমন যদি করবি ত এবার বাড়ী গিয়ে দাদার কাছে তোকে রেখে আসব। বিদেশে পরের বাড়ীতে চাকরী করতে হলে 'রুইকে এক পিঠ, ভূঁইকে এক পিঠ' দিয়ে থাকতে হয়। তোর মত নবাবী করতে গেলে চলে না। তারপর, বড়মার কাছে পয়সা চেয়ে নিলি বুঝি?"

ক্ষুন্ন সঙ্কুচিত হইয়া খুদু বলিল, "আমি কেন চাইব, বড় মা নিজেই দিলেন। বল্লেন দুধের এখনও দেরী আছে, তোমার দাদাকে ততক্ষণ কিছু কিনে এনে দাও ......।"

নিধিরাম অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন হইল। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, এনেছিস, আজ খাচ্ছি, কিন্তু খপরদার আর কোন দিন এমন কর্ম্ম করিস নি। ছিঃ, পেটের দায়ে চাকরী করতে এসেছি বলে আমরা কি এতই ছোট লোক!...... বড় বড় ঘরে এমনই সব এলো মার্কুণ্ডে কারখানা, ওতে রাগ করলে কি চলে! তুই জানিস না, ছেলে মানুষ, আর কখনও এমন কাজ করিসনি, বুঝলি?"

খুদু তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল যে সে সবই বুঝিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিল যে আর কখনও এমন গর্হিত কাজ করিবে না। নিধিরাম সন্তুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া খুদু তাহাকে যত্নসংগৃহীত জোনারের খইগুলি খাওয়াইবার জন্য মনে মনে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সদ্য সে প্রস্তাব করিতে সাহস হইল না। একটু ভাবিয়া আহারের মজলিশে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে শ্রুত আলোচনার কথা স্মরণ করিয়া বলিল, "দাদা, বড়দিনের বন্ধে বাবুরা আগ্রা বৃন্দাবনে বেড়াতে যাবেন, 'মিনেজর' বাবুও তাঁর পরিবারকে নিয়ে সেই সঙ্গে তীথি করাতে যাবেন। আচ্ছা, আমাদের মাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না?"

রুষ্টভাবে নিধি বলিল, "কি?"—

কুণ্ঠিত হইয়া খুদু বলিল, "মার কথা বলছি— 'মিনেজর' বাবুর পরিবার যদি যায়, তাহলে আমাদের মাকে নিয়ে যেতে দোষ কি?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত ঘাড় হেঁট করিয়া কোটের গায়ে সজোরে ব্রুস ঘষিয়া—নিধিরাম মুখ তুলিয়া চাহিল। তীব্র স্বরে বলিল, "তুই ছেলেমানুষ বুঝিস না, তাই একথা বল্লি, কিছু বল্লুম না।—কিন্তু মনে রাখিস, আমাদের ভাত নেই তাই জাত খুইয়ে গোলামী করতে এসেছি, তা বলে মেয়েদের ইজ্জত ঘুচিয়ে দিতে আসি নি! মনিবগুষ্টির লেজুড় ধরে মাকে তীথি করান'র চেয়ে, ঘরে বসে চাষের ভাত খাওয়ালে মায়ের বেশী পুণ্যি হবে, মা বেশী স্বোয়াস্তিতে থাকবে। ম্যানেজার বাবুর কথা তুলিস নি, আমার ঘেন্না করে! ...."

খুদু লজ্জায় পড়িয়া চুপ করিয়া রহিল, নিধিরাম পোষাক ঝাড়িয়া পাট করিতে লাগিল।

একজন অন্ধ ভিখারী তাহার সঙ্গীর সহিত সদর বাটীর গেটে প্রবেশ করিল। খুদু কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহাদের আগমনে বাধা দিল না। উকীল বাবু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে ফাঁকতালে এইরূপ দুই একটা ভিখারীর গান তাহারা শুনিতে পায়, তাহাতে কাহারও নিষেধ নাই; বিশেষ বুড়া কর্ত্তাবাবুও তখন অন্তঃপুরে ত্রিতলের কক্ষে ঘুমাইতেছিলেন!

"ভিখ্ মিল্‌বে নেই"—বলিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে ভিখারীকে ফিরাইয়া দিবার জন্য তখন সদর বাড়ীতে কেহ ছিল না; চাকর ও দ্বারবানগণ ঘরে ঢুকিয়া আহারান্তে ধূমপান করিতেছিল, সুতরাং ভিখারীদ্বয় সরাসর অন্তঃপুরের দ্বারে আসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া গান ধরিল:—

"হরি কোনটি তোমার আসল নাম—"

মুহূর্ত্তমধ্যে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের বজ্রদীপ্ত হুঙ্কার শুনিয়া গায়কদ্বয় থতমত খাইয়া নামিয়া গেল। অন্যমনস্ক নিধিরাম চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, বহির্ব্বাটীর

সম্মুখস্থ দ্বিতলের বারেন্দা হইতে, কাল কুচ্‌কুচে চেহারার উপর পেণ্টুল্যান শার্ট চড়াইয়া, তাহার উপর সৌখীন কায়দায় রঙীন্ নেক্‌টাই ব্রেসেস্ আঁটিয়া মিঃ জেলার্ট মাষ্টার সাহেব চশমা চোখে বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া মুখ খিঁচাইয়া ইংরেজীতে গালাগালি করিতেছেন। গায়কদ্বয় তাঁহার বিকট উদ্ধত মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থানের উপক্রম করিল, কিন্তু মিঃ জেলার্ট তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি রাসভনিন্দিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া সাহেবী হিন্দিতে বলিলেন, "ড্যারোয়ান, ড্যারোয়ান, ডুনো রাস্কেলকো কাণ পাকাড়কে নিকাল ডো—"

দ্বারবান প্রতাপ মিশির তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া নিজের ঘরের চারপাই ছাড়িয়া বাহির হইল, এবং সদ্য সুপ্তি-ভঙ্গের সমুদয় বিরক্তি ও ক্রোধ একত্রে পুঞ্জীকৃত করিয়া, অন্ধ ভিখারীর স্কন্ধে প্রচণ্ড ধাক্কা হানিয়া রক্তচক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "চল শালে!—"

অন্ধ সামনে ঝুঁকিয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়া কাতরভাবে বলিল, "যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি,—একটু থাম"—

অসহায় অন্ধ ভিখারীর অকারণ লাঞ্ছনা দেখিয়া, পীড়িত উত্যক্তচেতা নিধিরামের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে রুক্ষস্বরে হাঁকিয়া বলিল,"মানুষটা এখুনি যে পড়ে মরত!—"

দ্বারবান গঞ্জিকারঞ্জিত চক্ষু পাকাইয়া, গম্ভীর নিনাদে বলিল, "আরে সাহেবকো হুকুম—"

নিধির মেজাজটা মোটেই ভাল ছিল না। সে রাগ সামলাইতে না পারিয়া একটু রোখের সহিত-ই বলিয়া উঠিল, "আরে রাখ না তোমার হুকুম, ওরা জানে না গান গেয়েছে, তাই এত তম্বি! আর ওধারে অন্দরের দোতালায় যে খোকাবাবুরা কলের গানে "কওনা কথা মুখ তুলে বউ, দেখ চেয়ে নয়ন তুলে" বাজাচ্ছেন, তাতে বুঝি লেখাপড়ার কিছু হানি হয় না, যত অপরাধ গরীবের!—"

জেলার্ট আসলে ছিলেন, কুচ্‌কুচে কাল বাঙালী এখন প্যাণ্টকোটের মাহাত্ম্যে হইয়াছেন পুরা সাহেব, সুতরাং তাঁহার সাহেবী চাল ন্যায্যমাত্রার পনরগুণ উর্দ্ধে হওয়াই স্বাভাবিক। তাতে ইংরেজী বিদ্যার (?) যশো-গৌরবে তাঁহার অতুলনীয় খ্যাতি, এবং অদ্য বৈকালে স্থানীয় টাউনহলে "মধ্যপ্রদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারিণী" সভার সভাপতিত্ব কার্য্যে নিমন্ত্রিত সবজজ রায় সাহেব বাহাদুরের নিকট হইতে, সভাস্থলে তাঁহার পাঠজন্য সভাপতির নিবেদন না এমনইতর কি একটা মাথামুণ্ড বচন শীর্ষক, বিশুদ্ধ ইংরেজীতে সুললিত শব্দনিচয় সংযোগে,—দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় নির্দ্দেশক সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনার ভার পাইয়া তাঁহার মস্তিষ্ক-কারখানায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর ভিখারী গায়কের সঙ্গীত সংঘর্ষে, প্রবন্ধ রচনার নৈপুণ্য ব্যাপারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং এহেন অবস্থায় নিধিরামের সাদা বাংলা, জেলার্টের ঘূর্ণ্যব্যাত্যা-মধ্যবর্ত্তী রঙীন মেজাজের উপর একেবারে জ্বালাময়ী দীপকের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া দিল। জেলার্ট সক্রোধে বারেন্দার রেলিংয়ের উপর মুষ্টাঘাত করিয়া গর্জ্জিলেন, "হোয়াট ডু ইউ সে ব্রুট্?"

নিধির হাড়ের ভিতর জ্বালা করিতেছিল। সে চাহিয়া দেখিল ভিখারীদ্বয় বাড়ীর সীমানা ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। নিশ্চিন্ত নির্ভীক হইয়া নিধিরাম তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া ভাল করিয়া একবার জেলার্ট সাহেবের মুখপানে তাকাইল। তার পর, তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তরদান অনাবশ্যক বোধে, দৃষ্টি ফিরাইয়া নীরবে নিজের কাজে মনোনিবেশ করিল।

নিঃশব্দ অবজ্ঞার অপমানে আহত জেলার্ট প্রতিহিংসা-প্রজ্জ্বলচিত্তে কটমট চক্ষে নিধিরামের দিকে তাকাইয়া, বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে সেখান হইতে সরিয়া গেল। ভয়সঙ্কুচিত খুদু মৃদুস্বরে বলিল, "মাষ্টার সাহেবের চোখ যেন আলিপুরেরর চিড়িয়াখানার গণ্ডারের চোখ।"

নিধির ধমকে অপ্রতিভ হইয়া খুদু থামিল। নিধির সহযোগী ভৃত্য মোহন খানসামা হাসিতে হাসিতে ছাদে

উঠিয়া সকৌতুকে বলিল, "তোর জয়জয়কার হোক দাদা! আচ্ছা শুনিয়েছিস্। ব্যাটা গজ গজ কচ্ছে কি জানিস? তোর চাকরী খাবে!—"

"খাক না। ওরা সায়েব সুবো মানুষ, ওদের হজম শক্তিটা বড্ড বেশী। ওরা সব পেটে পুরতে পারে, আমার চাকরী খাবে, এ আর বেশী কথা কি? আমায় ত খেতে পারবে না! আমার এক দুয়োর মোদা ত হাজার খোলা। চুলোয় যাক। তুই ভাই এই পোষাকের বোঝাটা নিয়ে আয়ত, পোষাক কামরার দেরাজে সব তুলে ফেলি গে। আর খুদু, তুই এই কলার গুলো—আচ্ছা দাঁড়া, দেখি তোর হাত ময়লা নয়ত?—আচ্ছা হবে, এই কলার গুলো সাবধানে নিয়ে আয়, দেখিস যেন চাপে দোমড়ায় না। আর, আমি এখন বাড়ীতে দাদাকে একখানা চিঠি লিখে গিয়ে শোব।—যদি ঘুমিয়ে পড়ি, মোহন তুই ভাই তাক্‌নিমে করে থাকিস্, বাবু কাছারী থেকে এলেই উঠিয়ে দিবি।"

"তা দেব। হাঁরে দাদা নিধি, তোদের গাঁয়ের সেই চাষা মহাজন বেহারী ঘোষের দেনা সব শোধ করেছিস?"

"কিছু বাকী আছে দাদা, সেইটুকু শোধ হ'লেই গঙ্গা নেয়ে বাড়ী ফিরি!"

"তার একটা সঙ্গীন মামলা বাবুর হাতে আছে না? সে মামলার কি হল?"

"কে জানে দাদা, আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখি না।"

"কিন্তু যাই বলিস দাদা, আচ্ছা ফাঁসুড়ে নচ্ছার লোক তোদের মহাজন! দেড়শো টাকায় উকীল দিয়ে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে মামলা চালাতে পারছে, আর সাড়ে আটশো টাকার জন্যে তোদের দুদিন সবুর দিলে না, নতুন খৎ লিখিয়ে নিয়ে তবে ছাড়লে!"

ক্ষুব্ধ বিষাদের হাসি হাসিয়া নিধিরাম বলিল, "এসা দিন নেহি রহে গা। আর আশীটে টাকা বাকী আছে। এ বছর আর দাদাকে চাষের ধান খড় বিক্রী করতে দিচ্ছি নে—খেটে শোধ করব। ক'টা মাস সবুর কের, তা পর দেনা শুধে, মা কালীকে জোড়া পাঁটায় পুজো দিয়ে, তোদের পেসাদ পাবার নেমন্তন্ন করব। দেনায় কাবু করেছে, কি বলব! না হলে কায়েত-বাচ্চা কি খানসানার কাজে খাটতে আসি রে!"

(৪)

বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ প্রায়।

জলযোগান্তে দাদাকে পত্র লেখা শেষ করিয়া, পত্রখানা ডাকবাক্সে ফেলিবে বলিয়া বিছানার পাশে রাখিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত নিধিরাম বৃথা নিদ্রার চেষ্টায় নির্জ্জন গৃহে ছিন্ন মলিন মাদুরের উপর পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছে—আর বিষাদক্ষিন্নচিত্তে ভাবিতেছে, তাহার নিভৃত পল্লী প্রান্তের ক্ষুদ্র সুন্দর শান্তিপূর্ণ কুটীরখানির কথা!

নিধি অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল। তাহার নিদ্রা চটিয়া গেল। বাড়ীর অনেক কথাই একে একে মনে পড়িতে লাগিল—বার্দ্ধক্য জীর্ণা মাতার কথা মনে পড়িল,—চাষের কাজে স্বাধীন পরিশ্রমী স্নেহশীল অগ্রজের ব্যবহার মনে পড়িল, খুড়ুর ছোট,—মাতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান শিবুর কথা মনে হইল, আর মনে হইল, তারই মাঝখানে সেই অল্পদিন পূর্ব্বের স্বহস্তে শাঁখা সিন্দুর ঘোমটা পরাইয়া—অগ্নি ব্রাহ্মণ সমক্ষে মন্ত্র পড়িয়া স্বগোত্রে উন্নীত করিয়া লওয়া একটি বালিকার কচি মুখ।...অলস নিস্তেজ হৃৎপিণ্ডটা বুকের মধ্যে আনন্দের আরামে পরম উৎসাহে দুলিতে লাগিল। নিধিরাম অতীত এবং বর্ত্তমানকে ডিঙ্গাইয়া ভবিষ্যতের অঙ্কে বিপুল আয়োজন উৎসবের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

প্রফুল্লমুখে মোহন খানসামা ঘরে ঢুকিয়া, মুদ্রিত চক্ষে নিস্পন্দভাবে চিন্তাশীল নিধিকে তাড়া দিয়া বলিল, "ওরে নিধি দাদা, ওঠ্ ওঠ্ ঝপ করে ওঠ্, বাবু তোকে ডাক্‌ছেন!"

"বাবু! এর মধ্যে আদালত থেকে ফিরে এলেন!"—বলিয়া নিধি ত্রস্তভাবে গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। লিখিত

পত্রখানা শয্যানিম্নে চাপা দিয়া বলিল—"এত সকাল সকাল আজ ফিরলেন, কি রকম বল দেখি ?"

মোহন রঙ্গ করিয়া বলিল,"তোর মহাজনের মামলার কথা কি বলেন, আর—"

নিধির রসিকতা করিবার অবকাশ ছিল না, সে তৎক্ষণাৎ পোষাক কামরার চাবি লইয়া ছুটিয়া চলিল। উকীল বাবু তখন বসিবার ঘরে একটা চেয়ারে বসিয়া অত্যন্ত অপ্রসন্ন গম্ভীরমুখে একখানা মোটা আইনের বই খুলিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পড়িতেছিলেন। আজ আদালতে একটা বড় মামলায় হারিয়া এবং বিপক্ষ পক্ষের উকীলের কাছে অপমানসূচক ব্যঙ্গশ্লেষের খোঁচা খাইয়া তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত অসহিষ্ণু উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।—সেই জন্য তিনি অসময়ে আদালত হইতে চলিয়া আসিয়াছেন ; বাড়ীতে আসিয়া পোষাক না ছাড়িয়াই তিনি সেই পরাজিত মামলার কোন বিষয় সম্বন্ধে আইনের যুক্তিসিদ্ধান্ত অনুসন্ধান করিতে বসিয়াছিলেন।

নিধি ঘরে ঢুকিয়া দেখিল,—ইতিমধ্যে কখন মাষ্টার সাহেব আসিয়া উকীলবাবুর কাছে হাজির হইয়াছেন। সে নিঃসংশয়ে বুঝিল, তাহারই বিরুদ্ধে কোন কিছু অভিযোগ লইয়া তিনি বলিতে আসিয়াছেন,—কিন্তু নিজের বিপদাশঙ্কায় পিছু হটা চলে না, নিধি কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া প্রভুর সম্মুখে আসিয়া সবিনয়ে বলিল, "হুজুর আপনার পোষাক কামরার—"

হুজুর দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া রক্তচক্ষে বলিলেন, "সকাল বেলা সাহেবের চা আনতে দেরী করেছিলি কেন শূয়ার ?"

"আমি ত দেরী করিনি হুজুর, আমি ঠিক সময়েই চা এনেছিনু। সায়েব তখন ঘরে খিল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। আমি ডেকে ফিরে গেনু, হয় না হয় মোহনকে জিজ্ঞাসা করুন,—"

"জিজ্ঞাসা !"—অধীর ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উকীল বাবু লাফাইয়া হস্তস্থিত মোটা মলাটযুক্ত আইন পুস্তকের দ্বারা নিধির রগে সজোরে আঘাত করিলেন।

নিধির চক্ষে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখাইল। ঘূর্ণিত মস্তিষ্কে অবসন্ন দেহে সে বসিয়া পড়িল।

ক্রোধোন্মত্ত উকীল বাবু কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া বুটজুতাশুদ্ধ লাথি, দুদ্দাড় শব্দে নিধির পৃষ্ঠে পাঁজরে মস্তকে, যেখানে পাইলেন, সজোরে বসাইতে লাগিলেন। নিধি স্তব্ধ নিঝুমভাবে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল, একটি শব্দও উচ্চারণ করিল না।

প্যান্টালুনের পকেটে হাত পুরিয়া সাহেবী ভঙ্গীতে সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সভ্য গ্রাজুয়েট মিঃ জেলার্ট আসুরিক আনন্দ-দীপ্ত নয়নে, প্রতিহিংসার জয়গর্ব্বে হাস্যপূর্ণ বদনে, সেই নৃশংস কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন ; একবার বলিলেন না, মহাশয় থামুন !

মোহন খানসামা জানিত না যে হতভাগ্য নিধিকে উকীল বাবু কিসের জন্য ডাকিয়াছেন,—সে রহস্য ছলেই মিছামিছি মামলার নাম করিয়া নিধিকে ডাকিয়া দিয়াছিল। সহসা প্রভুর গৃহ হইতে ক্রুদ্ধ গর্জ্জনের সহিত ভীষণ প্রহারের শব্দ পাইয়া, উৎকণ্ঠিত চিত্তে অন্যান্য ভৃত্যের সহিত সে ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দেখিল, যাহা আশঙ্কা করিয়াছে তাহাই ঠিক ঘটিয়াছে, তবে শুধু হাত নহে—পাও চলিতেছে ! প্রভু তখনও নিধির পাঁজরে উপর্য্যুপরি লাথি বসাইতেছেন।

ভৃত্যগণ স্তম্ভিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য হতভম্বভাবে দাঁড়াইল। বাবুর হাত ধরিয়া থামান যায় না, তাহারা নিধিকে টানিয়া সরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সরিবে কে ? নিধি তখন সংজ্ঞাহীন—সম্পূর্ণ অচেতন ! মোহন মরিয়া হইয়া প্রভুকে ঠেলিয়া সরাইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "হুজুর ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন,—নিধি মরে গেছে বোধ হয় !"

যুদ্ধক্লান্ত হুজুর হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। মিঃ জেলার্ট সরিয়া আসিয়া নিধির মাথায় জুতার ঠোক্কর মারিয়া বলিলেন, "মিথ্যে ছল ! ওঠ্ ব্যাটা !"

ভৃত্যগণ নিধিকে টানিয়া ফিরাইল। নিধির চক্ষু তখন কপালে উঠিয়াছে, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে,

মুখের কস বহিয়া ভল্ ভল্ করিয়া রক্ত নির্গত হইতেছে! একজন ভৃত্য ছুটিয়া জল আনিয়া তাহার মুখে দিতে গেল।

মিঃ জেলার্ট বাধা দিয়া বলিলেন, "এইও ষ্টুপিড্, ম্যাটিং করা মেঝেয় জল পড়লে মাটী হয়ে যাবে, একে তোরা অন্য জায়গায় তুলে নিয়ে যা—"

ভৃত্যগণ প্রভুর মুখপানে চাহিল। প্রভু কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখনও তাঁহার মূর্ত্তি ভীষণ। অগত্যা তাহারা সেই মৃতপ্রায় দেহ ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া চলিল। মিঃ জেলার্ট বলিয়া দিলেন, "ওকে বাড়ীর ভেতর রেখে হৈ চৈ করিস্ না, যতক্ষণ না জ্ঞান হয় ততক্ষণ ওকে আস্তাবলের কাছে চোর কুঠরীতে শুইয়ে রাখ—খবর্দ্দার কেউ কোন গোলমাল করিস্ না!"

কেহ কোন গোলমাল করিল না; করিবার কারণও ছিল না—কেন না, ইহা ত বড় লোকের মাথাধরা নয়, ইহা যে গরীবের অন্যায়-অত্যাচার-পীড়িত অভাগা দরিদ্রের জীবনসংশয় কাণ্ড।

ভৃত্যেরা নিধিকে আনিয়া নির্জ্জন আস্তাবলের ঘরে শোয়াইল। মোহন তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অপরাপর ভৃত্যগণ নিজ নিজ কাজে চলিয়া গেল। আর, নিধির স্নেহাস্পদ সহোদর খুড়, ভ্রাতার এই দুর্দ্দশার কথা কিছুই জানিতে না পারিয়া, নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল মনে বাবুর দৌহিত্রকে ঠেলাগাড়ীতে চড়াইয়া বাগানের পাশে হাওয়া খাওয়াইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টাতেও যখন নিধির জ্ঞানসঞ্চার হইল না, তখন সভাস্থল হইতে সদ্যপ্রত্যাগত উকীল বাবুর বৃদ্ধ পিতাকে মোহন সংবাদ দিল; সবজজ বাবু ঘটনার সময় নিদ্রিত ছিলেন, নিদ্রাভঙ্গে সভাস্থলে চলিয়া গিয়াছিলেন, মিঃ জেলার্টের ব্যবস্থানৈপুণ্যে কেহ তাঁহাকে কোন কথা জানাইতে সাহসী হয় নাই; এবং হইতও না বোধ হয়—কিন্তু ভাগ্যক্রমে জেলার্ট সাহেব তখন বাড়ীতে ছিলেন না। উকীল বাবুর বিক্ষিপ্ত মেজাজকে শান্তি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সুধরাইয়া লইবার জন্য 'ঝানু' বুদ্ধিমান জেলার্ট হিতৈষিতা করিয়া তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

স্বভাবতঃ ভীরু সবজজ বাবু অকস্মাৎ এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার বিবরণ শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

ম্যানেজার বিপিন বাবু জরজ্বালা হওয়ার জন্য কয়দিনের ছুটি লইয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন, তিনি থাকিলে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিতেন,—সবজজ বাবু জানিতেন, তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী পুত্রের কত কলঙ্কজনক দায়ধাক্কা, পুরাণ পাকাবুদ্ধি বিপিন বাবু নির্ব্বিবাদে সামলাইয়া লইয়াছেন। অবশ্য ধর্ম্মের নজরে তাহা অপ্রকাশ না থাকুক, কিন্তু পৃথিবীর কাকে কোকিলে তাহা ত টের পায় নাই! সুতরাং গুণবান বিপিন ম্যানেজারের জন্য আজ সবজজ বাবু অত্যন্তই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সমস্ত শক্তি সাহস লোপ হইয়া গিয়াছিল। হিসাবী বিচারবুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভাল মন্দ ঠাহরাইতে না পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ পারিবারিক চিকিৎসককে বাদ দিয়া, যে কোন একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আন।

একজন ভৃত্য ছুটিল। সদ্য এম-বি পাশ করা, সহরের একজন অজ্ঞাতনামা ছোকরা ডাক্তারকে তখনই ডাকিয়া আনিল।

ইতিমধ্যে উকীল বাবু ও মিঃ জেলার্ট সাহেব হাওয়া খাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। উকীল বাবু বসিবার ঘরে গিয়া সমাগত মক্কেলগণের সহিত মামলা সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আর সবজজ বাহাদুর জেলার্টকে ডাকিয়া লইয়া চিকিৎসকের সঙ্গে কম্পিত অবসন্ন পদে রোগীর কক্ষে ঢুকিলেন।

চিকিৎসক রোগীকে যথাযথ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কিসে এ রকমটা হল?"

জেলার্ট অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "কিছুই না, টেবিলের কাছে বসে 'ডাষ্টার' ঝাড়ছিল, হঠাৎ বাবুর

ডাক শুনে ব্যস্তভাবে যেমন উঠতে যাবে, টেবিলের কোণটা বেটক্করে সজোরে মাথায় ঠুকে যাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।"

চিকিৎসক সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন,"শুধু মাথায় ত নয়, বুকেও যে বড় সাংঘাতিক আঘাত লেগেছে। ফুস্‌ফুস ফেটে গেছে মনে হচ্ছে যে!"

গাম্ভীর্য্যের সহিত শিক্ষাভিমানী সভ্য ভদ্রলোক জেলার্ট বলিলেন, "আশ্চর্য্য কি? জিনিসপত্তরশুদ্ধ টেবিলটা হুড়মুড় করে ত বুকের উপর উল্টে পড়েছে, ফুস্‌ফুস্ ফাটাই ত সম্ভব। তা ছাড়া,টেবিলের উপর থেকে আমার ভারি লোহার ডাম্বেল দুটোও একসঙ্গে ওর বুকে আছড়ে পড়েছে। আপনি যদি সে ডাম্বেল দুটোর ভার পরীক্ষা করতে চান, তাও আমি আপনাকে দেখাতে পারি।"

ডাম্বেলের গুরুত্ব-পরীক্ষাবিষয়ে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া চিকিৎসক শুধু একবার অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে জেলার্টের মুখপানে চাহিলেন। তার পর, সবজজ বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিনে,—"চৈতন্য সঞ্চার হওয়া ত দূরের কথা, জীবনের আশাই যে নেই। আপনি সিবিল সার্জ্জনকে খবর দিন, আমি একলা—"

আতঙ্কব্যাকুল দৃষ্টিতে সবজজ বাহাদুর অগ্নিম-অবলম্বন জেলার্টের পানে চাহিলেন। জেলার্ট অবজ্ঞা-ব্যঞ্জক ঔদাস্যের সহিত বলিলেন,"বড় অদ্ভুত কথা বলেছেন ডাক্তার। সামান্য ব্যাপারের জন্য সিবিল সার্জ্জন!"

গম্ভীরকণ্ঠে চিকিৎসক বলিলেন, "সামান্য হলে বলতুম না মশায়, ব্যাপার মারাত্মক।"

কম্পিতকণ্ঠে সবজজ বাহাদুর বলিলেন, "আপনি নিজে যেমন যা পারেন করুন, যত টাকা চান দিতে রাজী আছি, সিবিল সার্জ্জনকে ডাকবার প্রয়োজন নেই।"

"অসম্ভব মহায়। তা হলে আমায় বিদায় দিন। আমি নিজে কিছুই স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে, কোন সাহসে জীবন মরণের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেব? আচ্ছা, আপনার পারিবারিক চিকিৎসককে খবর দিন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে—"

"আচ্ছা আচ্ছা, তাঁকে বরং এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি।" —মরণান্তিক আশঙ্কার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া বৃদ্ধ সবজজ বাহাদুর হাঁপ ছাড়িয়া ত্রাসকম্পিত বক্ষে তখনই জেলার্টকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং চিকিৎসকের বাড়ীতে ছুটিলেন।

নিরুপায় ক্ষোভে মর্ম্মাহত মোহন খানসামা এতক্ষণ একপাশে দাঁড়াইয়া নীরবে সব শুনিতেছিল। জেলার্ট সাহেবের অসঙ্কোচ নিরঙ্কুশ মিথ্যা উচ্চারণের অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়া সে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর নিধিরামের জীবনের আশা নাই শুনিয়া অনুতাপে তাহার বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল। আহা, সেই ত রঙ্গ করিয়া নিধিকে নৃশংস মৃত্যুর মুখে ডাকিয়া দিয়াছিল! সে যদি নিধিকে ডাকিয়া না দিত, কিম্বা গতিক বুঝিয়া যদি বুদ্ধি খাটাইয়া প্রভুর ক্রোধের মুখ হইতে তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া দিত, তাহা হইলে হয়ত এতখানি কাণ্ড ঘটিত না।

সবজজ বাহাদুর বাহির হইয়া গেলে, ব্যাকুলতার আবেগে দুঃসাহসী মোহন, চিকিৎসকের নিকট সমস্ত সত্য কথা খুলিয়া বলিল। তাঁহার দুইটা পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দোহাই ডাক্তার বাবু, ওকে বাঁচিয়ে দিন। ওর বুড়ো মা বাড়ীতে আছে, ছেলেমানুষ পরিবার—আহা লক্ষীছাড়া সেদিনমাত্র বিয়ে করেছে! ওকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে দিন।"

ডাক্তার কয় মুহূর্ত্ত কি ভাবিলেন। তার পর ক্ষুব্ধভাবে অধর দংশন করিয়া বলিলেন, "এর কে কে আছে? এর বাড়ী কোথা?"

"আজ্ঞে হুগলী জেলায় বলরামপুরে ওর বাড়ী। এই দেখুন"—মোহন নিধির ভ্রাতাকে লিখিত সেই পত্রখানি বাহির করিয়া ডাক্তারের হাতে দিয়া বলিল, "ওর বড় ভাইয়ের নাম গৌরহরি দাস, আর ওদের যে

মহাজন, সে আমাদের বাবুর একজন ওঁাদ্রেল মক্কেল—নাম বেহারী ঘোষ। সেও খুব নামজাদা তুঁদে লোক। তাকেও যদি একটু খবর দেওয়া যেত—”

ডাক্তার চিঠিখানা খুলিয়া তাহার উপর একবার দৃষ্টি বুলাইলেন। তার পর কোন কথা না কহিয়া সেখানা পকেটে পুরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। পনের মিনিট পরে তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন, তখনও দ্বিতীয় ডাক্তার আসিয়া পৌছে নাই।

অচেতন নিধির শিয়রে বিবর্ণ ম্লানবদনে উপবিষ্ট মোহনকে ডাক্তার বলিলেন, “দেখো ছোকরা, এ লোকটাকে যদি বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারা যায় ত কথাই নেই; কিন্তু এ যদি মারা যায়, তাহ'লে পুলিশের কাছে, আদালতে তুমি সত্য সাক্ষী দেবে?”

মোহন স্তব্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দুই মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। তার পর দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, “হঁা, দেব ডাক্তার বাবু, যা থাকে কুল কপালে, আমি সত্যি কথা বলব।”

“বেশ। আমি ওদের মহাজনকে টেলিগ্রাম করে এসেছি। তাকে আমি চিনি না, তবে নাম শুনেছি বটে। বেহারী ঘোষ ওর মাকে ভাইকে নিয়ে যত শীঘ্র পারে আস্‌বে। তারা এলেই পুলিশে খবর দেওয়া হবে, আপাততঃ গোলমাল কোর না।”

পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার চৌধুরীকে সঙ্গে লইয়া সবজজ বাহাদুর কক্ষে ঢুকিলেন। প্রবীণ চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করিয়া স্তিমিত নয়নে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন,“হুঁ,চোটটা বড় জবর হয়েছে। জ্ঞানটা যে আজ কালে সহজে ফিরবে তা ত মনে হয় না—”

যুবক-ডাক্তার ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিলেন, “শুধু জ্ঞান কি, বলুন জীবনের আশাও—”

ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া সমর্থনসূচক ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তার চৌধুরী বলিলেন, “হুঁ, সে একই কথা।”

সবজজ বাহাদুর কাতরস্বরে বলিলেন, “আপনারা দুজনে মিলে রাত্রে এখানে থেকে চেষ্টা করে দেখুন, যত টাকা লাগে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।”

বৃদ্ধ ডাক্তার গদগদকণ্ঠে বলিলেন, “আহা, টাকার জন্যে কি হচ্ছে! আপনার মত ভৃত্যবৎসল মহানুভব লোক কি ভূভারতে আছে? সে ত জানি,তবে কি না—আচ্ছা দুজনে মিলে চেষ্টা করে দেখি। পরমায়ু থাকে বাচ্‌বে।”

সবজজ বাহাদুর বাহির হইয়া গেলে যুবক-ডাক্তার বলিলেন, “এমন গুণ্ডার মত বলিষ্ঠ লোকটার, পাথরের মত শক্ত বুক জখম হওয়ার গল্প যা শুনলেন, আপনার কি তাতে বিশ্বাস হয়?”

প্রবীণ ডাক্তারের দেহের প্রচুর রুধির এই বাড়ীর অনুকম্পাতেই সংগৃহীত হইয়াছিল, সুতরাং কৃতজ্ঞতার মর্য্যাদা একটা আছে। তবে সত্যপাসকরা যুবকটি জল পড়ার ভূত নহে, তাহার চোখে ধূলার মুঠা ছড়াইতে গেলে উল্‌টা বিপদ বুঝিয়া, গোপন ইঙ্গিতসূচক হাস্যে ঠোঁট উল্টাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, “ক্ষেপেছ হে! নিত্যানন্দ রায় বিষম গোঁয়ার লোক, রাগের মাথায় কি করতে কি করে ফেলেছে···একবার একটা কোচম্যানকে চড় মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছিল, এও তেমনিতর কিছু বোধ হয়!”

“বোধ হয় নয়,যথার্থই তাই!”—যুবক-ডাক্তার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা যথাশ্রুত বিবরণ করিয়া গেলেন। ডাক্তার চৌধুরী পায়ের উপর পা তুলিয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, “হুঁ, সে আমি আগেই এঁচে নিয়েছি। এখন তোমার আমার পকেটে যা আসে, তাই লাভ!”

যুবক ডাক্তার ভ্রূকুটি করিয়া কষ্টে আত্মদমন পূর্ব্বক বলিলেন, “আপনাকে আনিয়েছি সেই জন্যে—এ ‘কেস’ যখন পুলিশে যাবে তখন আপনাকে সত্যি রিপোর্ট দিতে হবে।”

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বৃদ্ধ ডাক্তার বলিলেন, “পুলিশে মামলা দায়ের করবে কে?”

যুবক ডাক্তার মুহূর্ত্তের জন্য নীরব থাকিয়া বলিলেন, “আমি করব, নরহত্যার ন্যায়সঙ্গত বিচার প্রার্থনার অধিকার সকলেরই আছে—”

বৃদ্ধের মাথা পরিষ্কার হইয়া গেল,—হাওয়া কোন দিক হইতে বহিতেছে বুঝিয়া তিনি অন্তরে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ঘাড় চুলকাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "সেটা কি ভাল হয়, এত বড় ঘরটা, বুঝে কাজ কর। সামান্য একটা চাকরের জন্যে—"

কঠোর ভ্রূভঙ্গি সহ তীব্রস্বরে যুবক ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ মশায়,সামান্য একটা চাকরের জন্যেই!—দারিদ্র্যের দায়ে জঠরজ্বালায় এরা পাগল,—তাই বড় দুঃখেই আপনার আমার মত বড় লোকের স্বার্থের হাড়কাঠে মাথা গলিয়ে এরা পয়সার গোলামী করতে আসে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওর প্রাণটাও আমাদেরই মত মানুষের প্রাণ,—আর ওর বুকটাও আমাদেরই মত রক্তেমাংসে গড়া তাজা বুক! আমাদের কাছে এ সামান্য চাকর—কিন্তু ওর গৃহে ও মাতার পুত্র, স্ত্রীর স্বামী, ভাইয়ের সহোদর!—গায়ের জোরে আসুরিক অত্যাচারে ওর টাট্‌কা নিরেট পাঁজরা বুটের ঠোক্করে গুঁড়িয়ে দেবার অধিকার কারুর নেই,—সে জন্মদাতা পিতাই হোন, আর অন্নদাতা প্রভুই হোন!"

ডাক্তার চৌধুরী ভীতি-স্তম্ভিত নয়নে সহযোগীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। কয় মুহূর্ত্ত পরে আত্মসম্বরণ করিয়া, কাসিয়া বলিলেন—"ভায়া, বড়লোকের সঙ্গে হাঙ্গামা করা কি সহজ কথা?—সদ্য কলেজ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়েছ, রূপেয়া যে কি চীজ্‌ তা এখন বুঝছ না।—ছেলে মানুষ, রক্ত বড়ই গরম—"

যুবক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, রক্ত যেন চিরদিনই এমনি গরম থাকে, ঠাণ্ডা অসাড় কখনো না হয়। আমি যে মানুষ, সে কথা রূপেয়ার মুখ দেখে ভুলে যাবার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়।"

(৫)

সমস্ত দিন রাত কাটিয়া গেল, নিধির জ্ঞান হইল না। বৃদ্ধ ডাক্তার বার বার আসিয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন—যুবক ডাক্তার সমানে বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে নিধি চক্ষুরুন্মীলন করিল,—অর্দ্ধসংজ্ঞালাভে ব্যাকুলভাবে চারিদিক চাহিয়া কষ্টে নিঃশ্বাস টানিতে টানিতে বলিল "বাবু—বাবু কই, পোষাক কামরার চাবি—"

মোহন নিকটে ছিল, সে মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "পোষাক কামরার চাবি ধনার হেপাজতে আছে—"

নিধিরাম কষ্টে বলিল, "বাবুকে বলিস মোহন, বাবুকে বলিস—আমি মাষ্টারকে চা দিতে দেরী করিনি, তিনি বিনাদোষে আমায় মারলেন। ওঃ মোহন, বুক আমার ভেঙ্গে গেছে ভাই, আর আমি বাঁচবো না। খুড়কে—তোরা খুড়কে বাড়ী পাঠিয়ে দিস, সে যেন আর চাকরী না করে,—"

ডাক্তার কাছে আসিয়া পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "ভয় কিহে, ভাল হয়ে যাবে তুমি। তোমাদের গাঁয়ের বেহারী ঘোষকে টেলিগ্রাম করেছি,—তিনি তোমার দাদাকে আর মাকে নিয়ে বোধ হয় আর ঘণ্টা কয়েক পরেই এসে পৌছবেন। মনে স্ফূর্ত্তি কর, মাকে স্ত্রীকে দেখলেই আরাম হয়ে যাবে।"

"আমার স্ত্রী, আমার মা!"—শঙ্কাকুলকণ্ঠে, নিধি সবেগে বলিল, "আমার মা! কেন আপনারা তাঁকে আসতে বল্লেন? কি হয়েছে আমার! আমি বাঁচবো না, নেই নেই,—কিন্তু তার জন্যে আমার মা,—না না আপনারা বারণ করুন, বাড়ীর মেয়েরা কেউ যেন এসে আমার মনীব বাড়ীতে না ঢোকে,—আমি বেঁচে থাক্‌তে,—আমি বেঁচে থাক্‌তে।—আমার মা, আমার মা,—আমার মনীব বাড়ীতে"—উত্তেজনাক্রান্ত নিধি হাঁপাইতে হাঁপাইতে দম বন্ধ হইয়া আবার মূর্চ্ছিত হইল,—আর জ্ঞান হইল না।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর নিধির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া আসিল। বৃদ্ধ ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আর কি দেখব, ভোর চারটের আগেই বোধ হয় সব শেষ হয়ে যাবে।"

বৃদ্ধ ডাক্তার বিদায় লইতে উদ্যত হইলেন। সবজজ

বাহাদুর সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নয়নে দুর্গানাম জপ করিয়াছিলেন, তিনি চিকিৎসকগণের শেষ মন্তব্য শুনিয়া, একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাঁহার আদেশে মিঃ জেলার্ট চিকিৎসকদ্বয়ের পারিশ্রমিক (?) দুই সহস্র টাকার নোট লইয়া আসিয়া, রোগীর গৃহের বারান্দায় কথোপকথনরত চিকিৎসকদ্বয়ের প্রত্যেকের হাতে হাজার টাকার করিয়া গণিয়া দিলেন।

ডাক্তার চৌধুরী মামুলী ধরণের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যের সহিত মুমূর্ষুর সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থার উপদেশ দিয়া, নোটের তাড়া পকেটে পুরিলেন। যুবক ডাক্তার শূন্য পকেটে ডান হাত পুরিয়া, বাম হাতে পুরস্কারের নোট উঁচু করিয়া ধরিয়া, খাড়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পরিষ্কার কণ্ঠে বলিলেন, "এ টাকা তা হলে আপনি আপনার তহবিলে খরচ লিখ্‌বেন কি বলে? নরহত্যা সমর্থনের উৎকোচ বলে?"

বৃদ্ধ ডাক্তার, জেলার্টের মুখপানে চাহিলেন। কুণ্ঠিত ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "ভায়া, অনেক খরচ করে, ছ বছর খেটে মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে এসেছ, এ রকম পাগলামো কল্লে কি মজুরী পোষাবে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না—"

যুবক তীব্রস্বরে বলিলেন, "লক্ষ্মী মাথায় থাকুন, কিন্তু সরস্বতীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করব কোন মুখে? চিকিৎসক যখন হয়েছি, তখন চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, মানুষের কর্ত্তব্য—আমি যথাযথ পালন করতে বাধ্য।"—বলিয়া তিনি রোগীর ঘরে ঢুকিয়া হাঁসপাতালের সরকারী ডাক্তারকে পত্র লিখিতে বসিলেন।

জেলার্ট প্রমাদ গণিলেন, তিনি উর্দ্ধশ্বাসে সবজজ বাহাদুরকে সংবাদ দিতে ছুটিলেন।

ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দে এই সময় একখানা ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী আসিয়া সদর দেউড়ীতে ঢুকিল। একজন পল্লীগ্রামের ভদ্রলোকের সহিত একটি যুবক ও একজন বিধবা স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিলেন। মোহন বলিয়া উঠিল, "ঐ—ঐ—বেহারী ঘোষ আর ঐ বোধ হয় নিধির মা আর ভাই।"

ডাক্তার কলম ফেলিয়া উঠিয়া অগ্রসর হইয়া বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "গোলমাল কোর না, আস্তে এস।"

নিধির দাদা গৌর,—মাতাকে ধরিয়া ধরিয়া লইয়া আসিল। ডাক্তার বাবুর প্রেরিত লোক পূর্ব্বেই ষ্টেশনে গিয়া তাহাদের সমস্ত বিবরণ জানাইয়াছিল। অশ্রুবর্ষণনিরতা জননী পুত্রের মুখের কাছে বসিয়া আর্ত্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "নিধি, বাপ আমার!"

"প্রবেশ নিষেধ" আজ্ঞা প্রাপ্ত খুদু এতক্ষণ অন্যত্র আটক থাকিয়া উদ্বেগে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। এইবার সকলের শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া রোগীর ঘরে ঢুকিল; নিধির দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, "দাদা, ওগো মেজদাদা, মা তোমায় দেখতে এসেছে, একবার চোখ মেলে চাও!"

নিধির তখন বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিশ্রাম জলধারা গড়াইতেছিল। বোধ হয় ভিতরে তখন সজ্ঞানে সে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল। মাতা ও ভ্রাতার ক্রন্দনে সে অতি কষ্টে চক্ষু মেলিল, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারিল না। অর্দ্ধবিস্ফারিত চক্ষে মাতার পাশে একবার যেন কাহার অনুসন্ধান করিল,—তার পর বোধ হয়, কেহ নাই দেখিয়া আশ্বস্তভাবে সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া ধূলায় লুটাইয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন।

যুবক ডাক্তার উপস্থিত কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়া বৃদ্ধ সহযোগীকে খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন, গোলমালে তিনি কখন নিঃশব্দে প্রস্থান করিয়াছেন। মর্ম্মান্তিক আক্ষেপে সজোরে অধর দংশন করিয়া ডাক্তার মুহূর্ত্তের জন্য কি ভাবিলেন। তারপর বেহারী ঘোষের হাত ধরিয়া গৃহের বাহিরে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "মশাই, যে লোকটা মারা গেল, তাদের গ্রামের আপনি একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক, আপনার কি উচিত নয় এই নৃশংস হত্যার বিরুদ্ধে কিছু......"

বেহারী ঘোষ সত্রাসে জিভ কাটিয়া বলিলেন, "বাপরে,—উকীল বাবু আমাদের মা বাপ, ওঁর বিরুদ্ধে কি আধখানা কথা কইতে পারি !"

"স্বার্থের খাতিরে অন্যায় অত্যাচারের শাসনও এমন পুজনীয় !—ধন্যবাদ মশায়,"—ডাক্তার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, নতশিরে অশ্রুমোচনরত গৌরকে বলিলেন, "কি হে, তোমার ত সহোদর, তুমিও কি এই ভদ্র-লোকের মত—"

সদ্য-শোকাহত গৌর কাতরকণ্ঠে বলিল, "মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেবেন না মশাই! আমরা খেতে পাই নে, দেনার দায়ে কাবু হয়ে রয়েছি। বড় আশায় ভাইকে চাকরী করতে পাঠিয়েছিলাম,—এবার ধনে প্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। আর কোন কথা বলবেন না। ভাই ত আমার আর ফিরবে না, অনর্থক জীয়ন্ত যমের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে আর কি করব ? আর, মামলা-খরচই বা পাব কোথা ?"

"আমি দেব। আমার পারিশ্রমিক হাজার টাকা এখনি দিতে রাজি আছি, দেখো, পুলীসে খবর দিই—"

কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিয়া সবজজ বাহাদুর ডাক্তারের দুই হাত ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিলেন —"দোহাই ডাক্তার, মাপ কর, আমি বুড়ো বাপ আছি,—এ বয়সে আমার সর্ব্বনাশ কোর না।—যা হয়েছে, ফিরবে না ডাক্তার; তোমার পায়ে ধরছি ক্ষমা কর। তোমার স্বর্গীয় পিতার কথা মনে কর। আমি বৃদ্ধ, আমার মিনতি রাখ। সন্তানের দুষ্কৃতিই পিতার পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণা। আমি যথেষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করেছি,—দোহাই তোমার, আর—"

ডাক্তার মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইলেন। তারপর স্থির স্বরে বলিলেন, "আপনি ন্যায়ের দণ্ড হাতে করে, আজীবন বিচারাসনে বসে কাটিয়েছেন, আপনিও স্বার্থের খাতিরে নিজের মুখ চেয়ে, পুত্র বলে নরহন্তাকে ক্ষমা করে অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছেন ? ভাল !—আপনি বৃদ্ধ, আমার পিতৃতুল্য মাননীয়, আপনাকে কোন কথা বল্‌তে ইচ্ছা করিনে। কিন্তু আমার পিতার স্মৃতি যখন স্মরণ করালেন, তখন একটা কথা বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি। আমার পিতাও আপনার মত একজন বিচারক ছিলেন; আজ তিনি যদি জীবিত থাকতেন, আর আমি যদি এমনিভাবে প্রভুত্বমদগর্ব্বে অন্যায় অত্যাচারে একটা নরহত্যা করতাম, তা হলে আমার ন্যায়-বিচারক পিতা আজ আমার ন্যায্য বিচারে ফাঁসী দিতে এত-টুকুও ইতস্ততঃ করতেন না।—আজ সেই বিজ্ঞ বিচারকের—আমার স্বর্গীয় পিতার চরিত্রমহত্ত্ব স্মরণ করে,—তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য, আপনার মত পিতার অন্ধস্নেহের অন্যায় অনুজ্ঞা বহনে আমি স্বীকৃত হলাম।—আপনি স্থির হোন, কিন্তু স্মরণ রাখ্‌বেন মশায়, নরহন্তার বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ সম্মান গৌরবের মর্য্যাদা অন্যে নতশিরে বহন করতে পারবে, কিন্তু আমার পিতৃশোণিত যার দেহে বিদ্যমান আছে, সে তাতে চিরদিন ঘৃণাভরে পদাঘাত করবে !—"

এই বলিয়া ডাক্তার নোটের তাড়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

গৌর আড়ষ্ট নির্জ্জীবের মত বসিয়া ছিল। বেহারী ঘোষ তাহার হাত ধরিয়া, মুহ্যমান সবজজ বাহাদুরের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়া বিজ্ঞতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, যা হয়ে বয়ে গেছে, তা ফিরবে না,—কেন অনর্থক দুঃখ ? আপনারা কিছু মনে করবেন না। নিধি গেছে, নিধির ভাই আছে। এরা আপনার গোলামী করে জীবন কাটাবে। কি বলহে গৌর, মহতের আশ্রয়—আর দেনাটাও ত শোধ করতে হবে......"

সহসা কি যেন আতঙ্কের বিভীষিকায় সব-জজ বাহাদুর পিছু হঠিয়া বলিলেন, "না না, আমিই তোমার দেনা শোধ করব বাপু, কিন্তু ওদের কারুর মুখ আর দেখতে পারব না।—ডাক্তারের ফিজের এই নোটগুলো বরং ওদেরই দাও।......আমি আর এখানে দাড়াতে পারব না"·· সবজজ বাহাদুর স্খলিতচরণে টলিতে টলিতে প্রস্থান করিলেন।

'নিধির মাতা গৃহমধ্যে আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন। উপরতলা হইতে মিঃ জেলার্ট হাঁকিয়া বলিলেন, "এইও ড্যারোয়ান, উ লোককো বেয়াদবীসে চিল্লানে দেও মৎ,—উকীল বাবুকে, নিদ্ টুট্ যাতা হ্যায়।"

ডাক্তার তখন গেটের বাহিরে গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছিলেন। মিঃ জেলার্টের গর্ব্বিত কণ্ঠের উচ্চ চিৎকার কাণে পৌঁছিতেই, তিনি দাঁড়াইলেন। মুখ ফিরাইয়া একবার সেই সাহেবী পোষাক পরিহিত কৃষ্ণাঙ্গের দাসত্বগৌরবের দর্পমণ্ডিত বদনের উচ্চ দীর্ঘ দন্তবিকাশ দেখিলেন, একবার সেই অমরাবতী-নিন্দিত, উজ্জ্বল আলোকমালা-সজ্জিত প্রকাণ্ড পুরীর দিকে চাহিলেন,—তারপর সজোরে নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিয়া, গাড়ীতে উঠিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

শ্রী * * *

শ্মশানপারের সন্ন্যাসী

ওগো, শ্মশানপারের সন্ন্যাসী—
তোমার চোখেও অশ্রু বহে,
বিচিত্র কি এর বেশী!

বিসর্জ্জনের আপন বুকের কাছে
যে জন বিজন আসন মেলিয়াছে,
তারও বুকে কিসের ব্যথা বাজে,
হায়, সে ব্যথা কোন্ দেশী!

মোদের বটে ধরার ধূলার সাথে
কাজার বাঁধন ইচ্ছা অনিচ্ছাতে,
সুখের বাধা, দুখের বেদনাতে—
চোখের সলিল শুকায় না—

সকল ছাড়ি' পারের পাড়ির নায়ে
যে জন উঠে' বস্‌ল ধূলো পায়ে,
সেও ধরণীর দুঃখদেনার দায়ে
ধারের কড়ি চুকায় না!

ওপারের ঐ শ্মশানঘাটের পারে,
শেয়ালডাকা শেওড়াবনের ধারে—
নিত্য যেথায় সন্ধ্যা অন্ধকারে
দিনের চিতা শেষ জ্বলে—

সেইখানে ঐ জটাচ্ছটার মাঝে
ভস্মানুলেপ রুদ্র অঙ্গ সাজে,
অক্ষি কারো আজও কি চায় লাজে,
হায়, কে দিবে আজ বলে'?

হায় রে ভাগ্য, হায় রে মানব মন,
ধূলায় তোমার এতই আকর্ষণ,
ত্যাগের মাঝেও নাইক বিসর্জ্জন—
নয়ন তবু চায় পিছে!

হৃদয়—সে যে সহস্রবার করে'
অ-ধরারে রাখ্‌তে চাহে ধরে'—
দুরাশা সে বাঁচ্‌তে চাহে মরে'—
সে কি গো হায় সব মিছে?

মন থাকিলে থাকেই বুঝি আশা,
প্রাণ বুঝি চায় প্রাণের ভালবাসা,
মর্ম্মপাখী বাঁধতে চাহে বাসা
ধরণীরই কোন্‌টিতে,

দেব্‌তা তোমার—সেও বুঝি রে, হায়!
মনের কাছেই ধরা দিতে চায়;
আনন্দ যা',—তা'তেই বুঝি পায়—
এই মরণের গণ্ডীতে!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

গীতায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

(প্রতিবাদ)

মাননীয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কিছুদিন যাবৎ কৃষ্ণকথার ও কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় মন দিয়াছেন। নানা পত্রিকায় ও নানা বক্তৃতায় নানা-ভাবে তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। তিনি নাকি গুরুর কৃপায় কৃষ্ণতত্ত্বের কিঞ্চিৎ সন্ধানও পাইয়াছেন। সত্য হইলে, কৃষ্ণতত্ত্বজিজ্ঞাসু ও তদ্রসপিপাসু ব্যক্তি-দিগের পক্ষে এ বড় সুখের সংবাদ।

বিগত আষাঢ় সংখ্যা "নারায়ণে" "ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা" নামে তাঁহার একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই কিন্তু মনে হয়, শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝাইতে বা কৃষ্ণতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, কৃষ্ণবস্তু ছাড়িয়া, কি একটা অবস্তুর পশ্চাতে উন্মত্তের মত ধাবমান হইতেছেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে এতদবস্থ দেখিয়া কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইয়াই গীতায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও তাঁহার তৎসম্বন্ধীয় উক্তি-বিষয়ে কয়েকটি কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

উপনিষদ্ ও গীতা এই দুইটিই বিপিন বাবুর প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন। এই দুইয়ের মধ্যে, পরমেশতত্ত্ব লইয়া, তিনি এক বিষম ভেদরেখার কল্পনা করিতেছেন। তাঁহার বিবেচনায় গীতায় যে পরমতত্ত্ব আছে, উপনিষদে তাহা নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার এই কল্পনা সর্ব্বথা ভিত্তিহীন। ইহা দেখাইবার জন্য আমরা সর্ব্ব-প্রথমে, গীতার সহিত উপনিষদের যে কি সম্বন্ধ তাহাই প্রদর্শন করিব। তৎপরে বিপিন বাবুর উক্তিগুলির অসারতা ও ভিত্তিহীনতা একে একে প্রদর্শিত হইবে।

বেদ ও উপনিষদ্ আর্য্যদিগের পরম গৌরবস্থল। এই সকল গ্রন্থে যে সকল অমূল্য তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহাদিগেরই অনুগত অর্থ অবলম্বন করিয়া কালক্রমে বিবিধ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। "শ্রুতি"র অন্বর্থ বলিয়াই ঐ সকল গ্রন্থ "স্মৃতি" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাও শ্রুতিরই অন্বর্থ। এই জন্যই ইহা মহতী স্মৃতি বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত ও সমাদৃত। গীতায় কোন কোন স্থলে উপনিষদের বা শ্রুতির বাক্য-গুলি অবিকলই উদ্ধৃত হইয়াছে, কোথাও বা শ্রুতির দুই একটি চরণের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কোন কোন স্থানে উপনিষদের বাক্যগুলিরই তাৎপর্য্যার্থ নানা-ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপ গীতার প্রায় সর্ব্বাবয়বই উপনিষদ্রূপ অস্থিমজ্জায় গঠিত। যাঁহারা উপনিষদ্ ও গীতা উভয় গ্রন্থই অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই তাহা জানেন। তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য আমরা এখানে উভয়-গ্রন্থ হইতেই কতিপয় স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

উপনিষদে আছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

গীতায় ভগবান বলিতেছেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

[সাংখ্যযোগ]

এখানে তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ অবিকলই রহিয়াছে। প্রথম চরণও প্রায় অবিকলই আছে। কেবল দ্বিতীয় চরণটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র।

উপনিষদ্ বলিতেছেন—

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

গীতায় ভগবান ইহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র—

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥

[সাংখ্যযোগ]

এখানে দ্বিতীয়ার্দ্ধ অবিকলই উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথমার্দ্ধেও প্রকৃতভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

উপনিষদ্ বলেন—

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জ্জায়তে যত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ।

"যে ব্যক্তি কাম্যবস্তুসমূহের চিন্তা করিয়া সেই সেই বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে, সে ব্যক্তি সেই সকল কামনা সহ সেই সেই কামভোগোপজীবী লোকে, যেখানে সেখানে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু বাসনাবর্জ্জিত কৃতাত্ম ব্যক্তির সমুদায় কামনা এখানেই বিলীন হয়।"

অপিচ

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ *
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥

"নানাপ্রকার অজ্ঞানতায় অবস্থিত থাকিয়া (অর্থাৎ অজ্ঞানতাপ্রসূত নানাপ্রকার কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত ও আসক্ত থাকিয়া) অজ্ঞানীরা 'আমরা কৃতার্থ হইলাম,' এইরূপ অভিমান করে। সেই অজ্ঞানী কর্ম্মীরা, কর্ম্ম-ফলে আসক্ত থাকে বলিয়া, ব্রহ্মতত্ত্ব সবিশেষ জানিতে পারে না, সেই জন্য তাহাদের কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে তাহারা দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে পতিত হয়।"

উপনিষদের এইসকল স্থলে কর্ম্মফলাসক্তির বা সকামতার অপকৃষ্ট পরিণাম ও নিষ্কামতার উৎকৃষ্ট পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই গীতার—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥

[নিষ্কাম কর্ম্মযোগ]

—ইহা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ভিত্তি।

ভক্তদিগের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির মূল যে বৈরাগ্য, ভগবান তাহার উপদেশ করিতে যাইয়া গীতায়

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥

ইত্যাদি বাক্যের যে অবতারণা করিয়াছেন তাহা ও

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।

ইত্যাদি উপনিষদ বাক্যেরই অনুবাদ বা অন্বর্থ মাত্র।

(শঙ্কর ও শ্রীধর দেখুন)

উপনিষদের এই বাক্যটির অন্বর্থ বা অনুবাদ গীতার ন্যায় পুরাণেও দৃষ্ট হয়। কল্পনায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও অনুবাদ ব্যাপারে, গীতার সহিত তাহার বিলক্ষণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহলোৎ-পাদনের জন্য আমারা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

পুরাণে আছে--

অব্যক্ত মূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ।
বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তর কোটরঃ ॥
মহাভূতপ্রশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ ॥
আজীবঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এতদ্‌ব্রহ্মবনশ্চৈব ব্রহ্মা চরতি নিত্যশঃ ॥
এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা।
ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥

[বাহুল্য ভয়ে অনুবাদ দেওয়া হইল না]

—এই সকল কল্পনা ও ভাব উপনিষদেরই অন্বর্থ মাত্র।

গীতার সারভূত একাদশ অধ্যায়ে যে বিশ্বরূপের বর্ণনা, যে বিশ্বরূপের উপাসনাই গীতার চরম উপদেশ, যে বিশ্বরূপের উপাসকদিগকেই গীতার দ্বাদশাধ্যায়ে 'যুক্ততম ভক্ত' বলা হইয়াছে, সেই 'বিশ্বরূপ' শব্দটিও উপ-নিষদ্ বা শ্রুতিরই সম্পত্তি। বিশ্বরূপের বর্ণনাটিও শ্রুতিরই অন্বর্থ।

উপনিষদ্ বলেন—

* রাগাৎ কর্ম্মফলাসক্তিঃ।

"সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥"
ইত্যাদি।

"অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোঽহকর্ত্তা।"
"স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা।"
"তং বিশ্বরূপং ভুবনেশমীড্যম্।"
"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো
বাহুরুত বিশ্বতস্পাদ।"

—এই সকল শ্রুতি বা উপনিষদ্‌বাক্যের অনর্গ লইয়াই গীতায় বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

পরমার্থসিদ্ধির জন্য ভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া ভগবান্ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে জ্ঞেয় বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও উপনিষদেরই কথা।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
ইত্যাদি

উপরি উক্ত চরণ কয়টি 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদ্ হইতে গীতায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

এইরূপে গীতার যে অংশই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, সেইখানেই দেখিবেন, উপনিষদ্‌ই গীতার অস্থিমজ্জা। বস্তুতঃ গীতা হইতে উপনিষদ্ ও উপনিষদের তত্ত্ব তুলিয়া লইলে গীতার গীতাত্বই থাকে না।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কিন্তু সেই উপনিষদ্ বা শ্রুতিকেই গীতা হইতে হীন ও ক্ষীণ দেখাইবার জন্য ব্যস্ত। তিনি দেখাইতে চাহেন, উপনিষদে যে তত্ত্ব নাই, গীতায় তাহা আছে। তিনি বলিতেছেন, "গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম বলিয়া যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা উপনিষদে ঠিক আছে বলিয়া মনে হয় না।" তাঁহার এই উক্তিটি একটু খুলিয়া বলিলে এই দাঁড়ায় যে, পরমেশতত্ত্ব সম্বন্ধে পুরুষোত্তম বলিয়া গীতা যাহা জানাইয়াছেন, উপনিষদে তাহা নাই। এইখানেই বিপিনবাবুর প্রমাদ। বস্তুতঃ উপনিষদের সার যে ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব, তাহাই আকর্ষণ করিয়া ভগবান্ সরলতর ও মধুরতর করিয়া অর্জ্জুনের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।

গীতামাহাত্ম্যে আছে—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

অর্থাৎ "সকল উপনিষদ্ গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা, পার্থ বৎস স্বরূপ, আর গীতোপদেশের অমৃতবস্তু দুগ্ধ স্বরূপ, সুধীজনে এই দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন।"

[বিপিনবাবুর অনুবাদ, "নারায়ণ" দেখুন]

গাভীর সার যেমন দুগ্ধ, উপনিষদের সারও তেমন পরব্রহ্মতত্ত্ব বা পরমাত্মতত্ত্ব। ইহাই "গীতোপদেশের অমৃতবস্তু" বা গীতারূপ মহদমৃত। এই গীতোপদেশের অমৃতবস্তু বা দুগ্ধ গোপালনন্দম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদরূপ গাভী হইতেই দোহন করিয়াছেন। পুরুষোত্তম বা উত্তমপুরুষ বলিয়া গীতা যাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা উপনিষদেরই সম্পত্তি—গীতার নহে।

উপনিষদে আছে—

"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ।"

"যিনি প্রধানের (অর্থাৎ জগদুপাদানভূত মূলশক্তির) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (অর্থাৎ শরীরের জ্ঞাতা জীবাত্মার) স্বামী, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের নিয়ন্তা এবং সংসারের স্থিতি বন্ধন ও মোক্ষের হেতু।"

"য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায়।"

"যিনি এই জগৎকে সর্ব্বদা নিয়মিত করিতেছেন, যিনি ভিন্ন জগতের শাসক অন্য কেহ নাই,"

"সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"

"যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা,"

"ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে"

"যাঁহার কোন পতি বা নিয়ন্তা নাই,"

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্"

"যিনি ঈশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর"—ইত্যাদি

মহনীয় শ্রুতি সকল যাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাঁহাকেই উত্তমপুরুষ বা পুরুষোত্তম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঘোরতর প্রমাদহেতু বিপিন বাবু তাহা বুঝিতে পারেন নাই দেখিয়া আমরা দুঃখিত।

উত্তমপুরুষ বা পুরুষোত্তম বলিলে যাহা বুঝায়, শ্রুতিতে পরমাত্মা, পরম পুরুষ বা মহান্ পুরুষ পদে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংও

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।"

—এই বাক্যদ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীধরস্বামীও তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। [গীতা দেখুন] বস্তুতঃ এই পুরুষোত্তম বা পরমপুরুষের তত্ত্ব উপনিষদে ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তিত রহিয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা উপনিষদ্ হইতে আরও দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

উপনিষদ্ বলিতেছেন—

ততঃপরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
ঈশং তং জ্ঞাত্বা অমৃতা ভবন্তি॥

তাহা হইতে (অর্থাৎ জগৎ হইতে) শ্রেষ্ঠ, অপরব্রহ্ম হইতেও (হিরণ্যগর্ভরূপী অক্ষর আত্মা হইতেও) শ্রেষ্ঠ [অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ] প্রতিশরীরে বর্ত্তমান, সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, সমুদায় বিশ্বের একমাত্র ব্যাপক, সেই **মহান্ ঈশ্বরকে** জানিয়া সাধক অমৃত হন।

এখানে ক্ষরপুরুষ জগৎ এবং অক্ষরপুরুষ হিরণ্যগর্ভরূপী শ্রেষ্ঠ জীবাত্মা। এই পুরুষদ্বয়ের কথা আছে এবং এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে ভিন্ন, তাহাদিগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহান্ ঈশ্বরের কীর্ত্তন করা হইতেছে। ইহারই অনুবাদ গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ॥

শ্রুত্যুক্ত এই মহান্ ঈশ্বরই পরমাত্মা। ইনিই উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই মহান্ ঈশ্বরকেই আমি বলিয়া—পুরুষোত্তম বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন।

উপনিষদ্ বলিতেছেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ অজ্ঞানের পরপারেস্থিত এই মহান্ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। ইনি ভিন্ন অমৃতত্ব প্রাপ্তির অন্য পথ নাই।

মহতস্তমসঃ পারেস্থিত শ্রুতিগণকীর্ত্তিত এই যে পরপুরুষ আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষ, ইনিই গীতায় পরমপুরুষ বা উত্তমপুরুষ বলিয়া গীত হইয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংও শ্রীমুখে উপনিষদুক্ত এই পুরুষকেই পরমপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন; ভগবান্ বলিতেছেন—

কবিং পুরাণমনুশাসিতারং
অনোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি ও সর্ব্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম (অর্থাৎ অণু হইতেও অণু) যিনি সকলের বিধাতা ও অচিন্ত্যরূপ, যিনি আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ এবং অজ্ঞানের বা অবিদ্যার পরপারস্থিত, যে সাধক মৃত্যুকালে মন একাগ্র করিয়া * * * সেই দিব্য পরমপুরুষকে স্মরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।

এখানে ভগবান সেই শ্রুত্যুক্ত তমসঃপারেস্থিত আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকেই পরমপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন; এবং মৃত্যুকালে (প্রয়াণকালে) পরমগতি লাভের জন্য, এই শ্রুত্যুক্ত পরমপুরুষই স্মরণীয় বলিয়া

উপদেশ দিতেছেন। পরবর্ত্তী "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্" ইত্যাদি বাক্যে ইহাঁকেই সংক্ষেপোক্তিতে ওঙ্কার বাচ্য ব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং মৃত্যুকালের স্মরণীয় ব্রহ্মকেই 'আমি' বলিয়া (অস্মদ্ শব্দের বাচ্য বলিয়া) জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এইরূপ যে পরমপুরুষ বা উত্তমপুরুষের তত্ত্ব উপনিষদে ভূয়োভূয়ঃ নানারূপে কীর্ত্তিত রহিয়াছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদ্ হইতেই যে তত্ত্ব আকর্ষণ করিয়া গীতায় অর্জ্জুনের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উপনিষদে ঠিক আছে কিনা বিপিন বাবুর তাহা মনে হয় না। বিপিনবাবুর মনে নাও হইতে পারে; ভগবান্ কিন্তু স্পষ্টই বলিতেছেন—

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।"

ক্ষর ও অক্ষর এই উভয় পুরুষ হইতে বিভিন্ন আর একটি পুরুষ আছেন, তিনি উত্তমপুরুষ। শ্রুতিগণ ইহাকে পরমাত্মা বলেন। (পরমাত্মেতি উদাহৃতঃ উক্তঃ শ্রুতিভিঃ"—আচার্য্য শ্রীধরস্বামী)। অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন শ্রুতিগণ পরমাত্মা বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন তিনিই সেই উত্তমপুরুষ।

পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিগণ কাহাকে নির্দ্দেশ করেন আমরা তাহা উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

শ্রুতি বলেন—

"এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ, স পরে অক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।"

এই যে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃস্বভাব পুরুষ (ত্বং-পদবাচ্য জীবাত্মা) তিনি অক্ষর পরমাত্মাতে (তৎ-পদবাচ্য পুরুষে) প্রতিষ্ঠিত আছেন।

এই অক্ষর পরমাত্মাই পরংব্রহ্ম।

"স তৎপদার্থ পরমাত্মা পরংব্রহ্মেত্যুচ্যতে"—সর্ব্বোপনিষৎসারঃ।

শ্রুতি বলেন—

"স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।"

হে সৌম্য! যেমন পক্ষিগণ বাসবৃক্ষ আশ্রয় করে, সেইরূপ সেই সমস্তই (অর্থাৎ মন ও মন্তব্য, বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য, চিত্ত ও চেতব্য, অহংবোধ ও তদ্বিষয় ইত্যাদি সমস্তই) পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই পরমাত্মাই পরংব্রহ্ম ("স তৎপদার্থঃ পরমাত্মা পরং ব্রহ্মত্যুচ্যতে)। ভাগবত বলেন ব্রহ্মই পরমাত্মা (ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ—১২শ স্কন্ধ)। বিষ্ণুপুরাণ বলেন ব্রহ্মই পরমাত্মা এবং তিনিই ঈশ্বর (স ব্রহ্ম তৎ পরংধাম পরমাত্মা সচেশ্বরঃ)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,শ্রুত্যুক্ত পরমাত্মাই উত্তমপুরুষ—পুরুষোত্তম। আমরা দেখাইয়াছি শ্রুত্যুক্ত পরমাত্মাই পরমব্রহ্ম; সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্মকেই স্পষ্টতঃ উত্তমপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এবং এই জন্যই তিনি বলিতেছেন "বেদে চ প্রথিতঃ"। কিন্তু ভগবান বলিলে কি হয়? বেদ থাকিলেই বা কি হয়? শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র যখন দেখিতে পাইতেছেন না, তখন ইহা "গীতারই সম্পত্তি।"

যাঁহারা অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন করেন, গীতা ও উপনিষদাদির অর্থ মনন করেন, তাঁহারা সকলেই জানেন পরমাত্মা ও পরংব্রহ্ম একই বস্তু। গীতায় ইনিই উত্তমপুরুষ বলিয়া গীত হইয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংও তাহাই বলেন। তথাপি, জানি না কি জন্য, বিপিন বাবু ইহা বুঝেন না অথবা বুঝিতে চাহেন না। আমরা যতদূর বুঝি, প্রমাদ অথবা অনবধানতাই ইহার প্রধান কারণ। আমরা দেখিতেছি

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"
[গীতা]

এই ভগবদুক্তির অর্থ বুঝিতে গিয়া বিপিন বাবু মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন! তিনি বুঝাইতেছেন—"প্রণবের আবৃত্তির সঙ্গে ব্রহ্মলাভের জন্য অন্য কোনও উপায়ান্তর অবলম্বন করা নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু এখানে

শ্রীকৃষ্ণ ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ করিতে বলিতেছেন।" এখানে 'তাঁহাকেও' এই অংশটিই তাঁহার (বিপিন বাবুর) হৃদয়োত্থ ভ্রান্তিবীজের অঙ্কুর। বিপিন বাবু এখানে ওঁ-পদে যাঁহাকে বুঝায় সেই ব্রহ্ম হইতে মাংপদবাচ্য বস্তুকে পৃথক্ বলিয়া বুঝিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন—"অর্থাৎ কেবল ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মের আবৃত্তি দ্বারা পরম গতি লাভ হয় না, এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান বা স্মরণ আবশ্যক।" এখানেই বিপিন বাবুর সুমহতী ভ্রান্তি। এখানেই তিনি কৃষ্ণবস্তু ছাড়িয়া অবস্তুর সন্ধানে অগ্রসর এবং ইহাই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-কথনের মূলকথা।

বিপিন বাবুর কথার তাৎপর্য্য এই যে, সাধক মৃত্যু কালে (প্রয়াণকালে) মুখে আবৃত্তি করিবেন ওঁ ওঁ অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্রহ্ম এবং মনে মনে স্মরণ করিবেন ব্রহ্ম-ভিন্ন অপর বস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণ, তাহা হইলেই তিনি (সাধক) পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন। ও হরি! বিপিনচন্দ্রের হস্তে হরির কি দুর্গতি! বিপিনচন্দ্রের মুখে এ কি অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকথন! মুখে জপ করিবে হ্রীং দুর্গা হ্রীং দুর্গা আর মনে মনে স্মরণ করিবে ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং কৃষ্ণ! বিপিনচন্দ্রের এ কি অভিনব সাধনতত্ত্ব!!

কৌতুকের বিষয় এই—বিপিন বাবু এই যে নূতন ভাব আবিষ্কার করিয়াছেন, ভগবদ্ভক্তির তাৎপর্য্য কিন্তু আদৌ তাহা নহে। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ভগবদ্ভক্তির তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) ভক্তিযুক্ত হইয়া যাঁহাকে স্মরণ বা ধ্যান করিলে পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বশ্লোকে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তমসঃপরস্তাৎ আদিত্যবর্ণ পরম পুরুষকে অর্থাৎ পরব্রহ্মকে ভক্তিভাবে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে সাধক সেই দিব্য পরম পুরুষরূপ পরমগতিকে প্রাপ্ত হয়। (গীতা ৮ম অধ্যায় ৯।১০ শ্লোক)। তৎপর, বেদবিদ্‌গণব্যাখ্যাত ও বীতরাগ যতিগণলভ্য সেই ব্রহ্মকে সহজে ও নিঃসংশয়িতরূপে প্রাপ্ত হওয়ার উপায় সংক্ষেপে বলিবেন বলিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন। (গীতা ৮ম অঃ ১১শ শ্লোক এবং তাহার ব্যাখ্যা দেখুন)। এবং ঠিক তাহারই পরে ভগবান্ প্রতিজ্ঞাত উপায় বলিতেছেন—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

ভগবান্ উপদেশ করিতেছেন—ব্রহ্মস্বরূপ "ওঁ" এই একাক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তদ্বাচ্য আমাকে (ঈশ্বরকে) স্মরণ করিয়া যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। (ব্রহ্মের বাচক বলিয়া একাক্ষর ওঁকারই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।)

অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন, ব্রহ্মের বাচক বলিয়া ওঁকারই ব্রহ্মস্বরূপ। এই ওঁকারের বাচ্য যে ব্রহ্ম তিনিই আমি। ব্রহ্মের যে একাক্ষর নাম ওঁ—তাহা উচ্চারণ করিলেই আমাকে অনুস্মরণ করা হয়। কারণ এই ওঁ নামের পশ্চাতে আমিই আছি। আমিই এই ওঁ নামের নামী। মৃত্যুকালে আমার (ঈশ্বরের) বাচক 'ওঁ' এই একটি মাত্র অক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলেই জীব আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হয়।

এখানে ওঁকারবাচ্য ব্রহ্মকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমি বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন। সুতরাং এখানে ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ (মাং-পদবাচ্যপুরুষ) দুই-ই এক—অভিন্নবস্তু। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বলিতেছেন—"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽভিধানভূতমোঙ্কারং ব্যাহরন্ উচ্চরন্ তদর্থভূতং মাম্ ঈশ্বরম্ অনুস্মরন্ চিন্তয়ন্ ইত্যাদি"। ভাগবতাচার্য্য ভক্তশিরোমণি শ্রীধরস্বামীও সেই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন—"ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাদ্ ব্রহ্মপ্রতিমাদিবদ্ ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্ ব্রহ্ম, তদ্ ব্যাহরন্ উচ্চরন্ তদ্বাচ্যঞ্চ মাম্ অনুস্মরন্ ইত্যাদি"। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও গীতায় স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন আমি ওঁকার। (৯ম অধ্যায় ১৭শ শ্লোক)

ভাগবত স্পষ্ট ভাষায় এই ওঁকারকে পরমাত্মারই বাচক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন! যথা—

ততোঽভূৎ ত্রিবৃদ্ ওঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥

—অতঃপর সেই শব্দ হইতে ত্রিমাত্রবিশিষ্ট ওঁকার উত্থিত হইল। ইহা স্বতঃই প্রকাশমান্। ইহা ভগবান্ পরমাত্মা ব্রহ্মার বাচক।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টাক্ষরে পরমাত্মাকেই উত্তম-পুরুষ বা পুরুষোত্তম বলিয়াছেন (উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ) এবং তাঁহাকেই 'আমি' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং ওঁকার পুরুষোত্তমেরই (মাং পদবাচ্য পুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরই) বাচক। সেই পুরুষোত্তম অর্থাৎ পরমাত্মাই ব্রহ্মবস্তু। (ভাগবত বলেন ব্রহ্মই পরমাত্মা। বিষ্ণুপুরাণ বলেন ব্রহ্মই পরমাত্মা এবং তিনিই ঈশ্বর—"স ব্রহ্ম তৎ পরংধাম পরমাত্মা সচেশ্বরঃ") অতএব প্রয়াণকালে ব্রহ্মই অনুস্মরণীয়, তদ্ভিন্ন অপর কেহই অনুস্মরণীয় নহে।

তত্ত্বভূমি (theory) ছাড়িয়া সাধনক্ষেত্রে গিয়া দেখুন, সাধক মৃত্যুকালে (প্রয়াণকালে) পরম-গতিলাভের জন্য আত্মা বা ব্রহ্মকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার বর্ণনা ও শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বকথনই যে ভাগবতের উদ্দেশ্য, সেই ভাগবতে দেখুন, পরম ভাগবত শুকদেব রাজর্ষি পরীক্ষিৎকে সমগ্র ভাগবতের সারস্বরূপ কৃষ্ণকথা শুনাইয়া শেষে (মৃত্যুকালে) পরমব্রহ্মকেই স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছেন। শুকদেব বলিতেছেন—

"এবমাত্মানমাত্মস্থমাত্মনৈবামৃশ প্রভো।" (ভাগবত)

মহারাজ, তুমি মনদ্বারা আত্মস্থ আত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মা পরব্রহ্মকে বিচার কর (বিশেষরূপে চিন্তা কর)। (উপনিষদ্ও বলেন—তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ, তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্)

আত্মস্থ আত্মাকে (পরমাত্মাকে) কিরূপে চিন্তা করিতে হয়, শুকদেব পরিক্ষীৎকে স্পষ্টভাষায় সে বিষয়ের উপদেশ দিতেছেন।—

"অহং ব্রহ্ম পরংধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥"

"আমি পরমপদ ব্রহ্ম, পরমপদ ব্রহ্ম আমি, এই-রূপ চিন্তা করিয়া নিরাকার ব্রহ্মে আত্মা যোজনা কর।" (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত অনুবাদ)

এক্ষণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অন্তকালে পরম গতিলাভের জন্য ব্রহ্মকেই ধ্যান বা স্মরণ করিয়া দেহ-ত্যাগ করিতে হয়। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ওমিত্যো-কাক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যে এই উপদেশই দিয়াছেন এবং অনুস্মরণীয় ব্রহ্মকে 'আমি' বলিয়া—অস্মদ্ শব্দের বাচ্য বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মভিন্ন বিপিনচন্দ্রের তথাকথিত কোনও কৃষ্ণকে (মানুষ কৃষ্ণকে বা কোনও অবস্তু কৃষ্ণকে) স্মরণ করিতে বলেন নাই।

অন্যপরে কা কথা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও প্রয়াণকালে বা অন্তকালে পরমাত্মা পরব্রহ্মের সহিত আত্মার যোজনা করিয়া মানুষ-দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তথাচ বিষ্ণু-পুরাণে—

"ভগবানপি গোবিন্দো বাসুদেবাত্মকং পরম্।
ব্রহ্মাত্মনি সমারোপ্য সর্ব্বভূতেষ্বধারয়ৎ॥"
"ব্রহ্মভূতেঽব্যয়েঽচিন্ত্যে...সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।
তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্॥"

"এদিকে ভগবান্ গোবিন্দও সর্ব্বভূতে সমবস্থিত বাসুদেবাত্মক পরব্রহ্মকে ("সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" "সর্ব্বভূতাধি-বাসঃ" ব্রহ্মকেই বাসুদেব বলে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—"সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ। ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥") আত্মাতে সমা-রোপণ পূর্ব্বক ধারণ করিতে লাগিলেন।" (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত অনুবাদ)

সেই ব্যাধ স্বর্গে গমন করিলে পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মভূত অব্যয় ও অচিন্ত্য আত্মাতে (পরব্রহ্মে) নিজ আত্মাকে সংযোজন করিয়া ত্রিবিধ প্রাকৃতিক গতি পরিত্যাগ করিয়া মানুষদেহ ত্যাগ করিলেন।

"অর্জ্জুনোঽপি তদাম্বিষ্য কৃষ্ণরামকলেবরে।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ॥" বিষ্ণুপুরাণ।

"অর্জ্জুনও, কৃষ্ণ ও রামের কলেবরদ্বয় এবং

অন্যান্য প্রধান প্রধান যাদবগণের দেহ সকল অন্বেষণ করিয়া সংস্কার করাইলেন। (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত অনুবাদ)

উপরি-উদ্ধৃত স্থলগুলিতেও স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে প্রয়াণকালে পরব্রহ্মই অনুস্মরণীয়। পরমব্রহ্মই সকলের চরম গতি। ("নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" —উপনিষদ্)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অস্মদ্ শব্দদ্বারা এই পরমব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া তদ্বাচ্য পরমব্রহ্মকেই স্মরণ করতঃ দেহত্যাগ করিতে হয়। ব্রহ্ম ভিন্ন বিপিন বাবুর তথাকথিত কোনও কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হয় না।

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তেও দেখা যাইতেছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও প্রয়াণকালে পরব্রহ্মকেই স্মরণ বা ধ্যান করিয়া তাঁহাতেই নিজ আত্মার যোগ করিয়া মানুষ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রয়াণকালে যে পরব্রহ্মকে ধ্যান বা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলেন, বিপিনবাবু সেই পরমব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে লঘু দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

উপনিষদে যে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, যদিও "গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজকেই সেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন" [বিপিন বাবুর উক্তি, 'নারায়ণ', ১৭৬ পৃঃ] অর্থাৎ যদিও শ্রীকৃষ্ণ অস্মদ্ শব্দদ্বারা সেই ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছেন, যদিও ভগবান উপনিষদ্ বা শ্রুতিকীর্ত্তিত পরমাত্মাকেই পুরুষোত্তম বলিয়া স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহাকেই 'আমি' বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন, তথাপি বিপিন বাবুর তাহাতে বিষমা ভেদবুদ্ধি। এই ভেদবুদ্ধি বা মহতী ভ্রান্তি হেতুই তিনি 'তত্ত্ব' দেখিতে পাইতেছেন না। এই ভেদবুদ্ধি হেতুই তিনি উপনিষদে পুরুষোত্তমতত্ত্ব দেখিতে পান না। তাই তাঁহার প্রশ্ন উঠিয়াছে—

"এই পুরুষোত্তম কে ?"

এবং এই ভ্রান্তিহেতুই তাঁহাকে "বলিতে হয় যে, এই পুরুষোত্তমকথা ও পুরুষোত্তমতত্ত্ব উভয়ই গীতার নিজস্ব ; বেদে বা উপনিষদে এ বস্তু নাই। এই পুরুষোত্তমই গীতার বিশিষ্ট সাধ্য। এই পুরুষোত্তম কে ?" [বিপিন বাবুর উক্তি, 'নারায়ণ', ৯৯ পৃঃ]

বিপিন বাবু বলেন, "বৈষ্ণব শাস্ত্রাদিতে ইহা (এই পুরুষোত্তমতত্ত্ব) খুবই প্রচলিত আছে।" আমরাও পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সেই বৈষ্ণব শাস্ত্র হইতেই দেখাইব—

এই পুরুষোত্তম কে ?

বৈষ্ণবশাস্ত্র-শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

"ততস্তৎ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময়ঃ।
সর্ব্বগঃ সর্ব্বভূতেশঃ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ॥

* * *

স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মণ্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ॥"

"অনন্তর সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে পরমব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময় সর্ব্বগামী সর্ব্বভূতেশ্বর সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর (প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টিকরণে উন্মুখ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন ক্রিয়াবত্তা নাই ; যেমন গন্ধ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মনের চঞ্চলতা জন্মে, পরমেশ্বরের এই ক্ষোভজনকতা সেইরূপ।) হে ব্রহ্মণ্, সেই পুরুষোত্তমই ক্ষোভ্য ও ক্ষোভক।" [পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত অনুবাদ]

এখানে স্পষ্টই সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকেই পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে অন্যত্র আছে—

"ব্রহ্মাক্ষরমজং নিত্যং যথাসৌ পুরুষোত্তমঃ।" ইত্যাদি অক্ষর অজ নিত্য ব্রহ্মই যেমন এই পুরুষোত্তম—ইত্যাদি (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত অনুবাদ)

বৈষ্ণবশাস্ত্রে এইরূপ ভূয়োভূয়ঃ ব্রহ্মকেই পুরুষোত্তম বলিয়া স্পষ্টরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বস্তুতঃ উপনিষদের প্রতিপাদ্য আত্মা বা ব্রহ্মই সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সর্ব্বত্রই এই আত্মা বা ব্রহ্মকেই 'আমি' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রও এই আত্মাকেই পুরুষোত্তম বলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

শুদ্ধঃ সংলক্ষ্যতে ভ্রান্ত্যা গুণবানিব যোঽগুণঃ।
তমাত্মরূপিণং দেবং নতামঃ পুরুষোত্তমম্॥



বংশীধারী

যিনি নির্গুণ ও শুদ্ধ, ভ্রান্তিজ্ঞানে যিনি গুণবানের ন্যায়] সংলক্ষিত হন, সেই আত্মাই—সেই আত্ম-রূপী দেবতাই পুরুষোত্তম। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে আমরা আর একটি মাত্র স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিব সেই পুরুষোত্তম কে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

"ন সন্তি যত্র সর্ব্বেশে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ।
সত্তামাত্রাত্মকে জ্ঞেয়ে জ্ঞানাত্মন্যাত্মনঃ পরে॥
স ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম পরমাত্মা স চেশ্বরঃ।
স বিষ্ণুঃ সর্ব্বমেবেদং যতো নাবর্ত্ততে যতিঃ॥
ঋগ্‌যজুঃ সামভির্মার্গৈঃ প্রবৃত্তৈরিজ্যতেহসৌ।
যজ্ঞেশ্বরো যজ্ঞপুমান্ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

"যাঁহাতে নাম এবং জাত্যাদির কল্পনা নাই, যিনি কেবল জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই পরম ব্রহ্ম, তিনিই পরম ধাম, তিনিই পরমাত্মা এবং সকলের অধীশ্বর, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না। ঋগ্‌ যজু ও সামবেদোক্ত মার্গসকল দ্বারা সেই পুরুষোত্তম (পুরুষশ্রেষ্ঠ) যজ্ঞপুরুষই পূজিত হইয়া থাকেন।" (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত অনুবাদ)

এখানে ত স্পষ্টতঃই সেই নির্ব্বিশেষ পরমব্রহ্মকেই পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। বিপিনচন্দ্রের প্রশ্ন উঠিয়াছে, এই পুরুষোত্তম কে? বিষ্ণুপুরাণ মুক্তকণ্ঠে উত্তর দিতেছেন—সেই নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা পরব্রহ্মই—পুরুষোত্তম।

এইরূপে বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহ ভূয়োভূয়ঃ পরমব্রহ্ম ও পুরুষোত্তমকে একই বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় শ্রুত্যুক্ত পরমাত্মা ও পুরুষোত্তমকে ঠিক একই বস্তু বলিলেও, বিপিনবাবু বলেন, "ইহা স্বীকার করা যায় না"; এই মহাভ্রমের ফলেই তাঁহাকে "বলিতে হয় পুরুষোত্তমকথা ও পুরুষোত্তমতত্ত্ব উভয়ই গীতার নিজস্ব। বেদে ও উপনিষদে এ বস্তু নাই।" পরমব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম শব্দের বাচ্য বস্তুটি তত্ত্বতঃ বুঝিতে না পারিলে তাঁহার এ ভ্রান্তি দূর হইবারও নহে। সদ্‌গুরুর উপদেশ ভিন্ন নিজের খেয়ালে এ তত্ত্ব বুঝা সম্ভব নহে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীরেবতীমোহন রায় চৌধুরী।

পল্লী-নদী

কুটীর পাশে কাননতলে ধানের জমী ঘিরে,
যাচ্ছে আমার পল্লী-নদী সদাই বেয়ে ধীরে।
ভাঙ্‌নধরা কূলে তাহার বুনো ঝাউয়ের চারা,
গর্ত্ত থেকে শালিক সেথা দিচ্ছে মধুর সাড়া।
তারই ঘাটে কল্‌সী তালে নিত্য প্রভাত সাঁঝে,
পল্লী-মেয়ের কাঁকন দুটি করুণ সুরে বাজে।
ভক্তিময়ীর পূজার জবা ভাস্‌ছে তাহার জলে,
দীপান্বিতার প্রদীপমালা শোভে যে তার গলে।

অস্ত-রবির রক্ত আলো তারই ঢেউএর পরে,
লুটিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরে কতই খেলা করে।
ঝড়ের রাতে গর্জ্জ-মুখর তারি বুকের মাঝে,
মত্ত ভোলার রুদ্রতালে প্রলয় বিষাণ বাজে।
গ্রামের শেষে বটের ছায়ে' তারই বালির চরে,
প্রাণের কত পরিজনে দি'ছি চিতার 'পরে।
সে যে আমার বড় প্রিয়, অযুত স্মৃতির সাথী,
তারি তীরে চিত্ত আমার লুঠ্‌ছে দিবস রাতি।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

আফ্রিকার পরিণয়-প্রথা

যে সকল দেশ সভ্যতার খর-করোজ্জল ধরণীর অতি দূরতম অন্ধকারময় কন্দরে অবস্থান করিতেছে, আফ্রিকার কোন কোন স্থান তাহার অন্তর্ভুক্ত। এখনও সেখানে উলঙ্গ নর-নারী বিচরণ করে; এখনও তথাকার অধিবাসীরা স্বীয় সন্তান ভক্ষণ করে; স্বজাতি, স্বদেশী বা প্রতিবেশী, পার্শ্ব-দেশবাসীর হত্যাসাধন করিয়া তাহারা প্রচুর আনন্দ পাইয়া থাকে। এই সকল দেশবাসীর জাতীয় জীবন—জীবনের মূল অঙ্গ বিবাহবৃত্তান্ত জানিতে কৌতূহল হওয়া বিচিত্র নয়। এত অসভ্য যে জাতি, তাহারা পরিণয়কে কি চক্ষে নিরীক্ষণ করে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা লিপিবদ্ধ করিতেছি।



বিবাহ সাজে সজ্জিতা ধনীকন্যা (পশ্চিম আফ্রিকা)

পশ্চিম-আফ্রিকায় অবিবাহিত পুরুষ অতি অল্প। বিবাহ না করা একটা দারুণ, কঠিন অপরাধ স্বরূপ গণ্য। এমন কি, নিতান্ত দরিদ্র বেচারাও কন্যা-পণ দিতে অক্ষম বলিয়া জন-সমাজে হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। সেখানকার অবিবাহিত পুরুষেরা রমণী-রই স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। গৃহস্থালী কাজকর্ম্মগুলি,—যথা রান্না, ঘরঝাঁট দেওয়া,জল তোলা প্রভৃতি—তাহাকেই করিতে হইতেছে বলিয়া তাহার দুঃখের সীমা থাকে না। সে-দেশে নিরাশ প্রণয়ী', 'উদাস প্রেমিক' ও 'নবীন-সন্ন্যাসী' নাই বলিলেও চলে। বিবাহ তাহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম।

এই দেশে কুমারীদের বিবাহযোগ্য বয়স হইলে তাহাদিগকে পতি অন্বেষণে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। য়ুরোপীয় সমাজে এই প্রথা সমধিক প্রচলিত বলিয়াই শুনা যায়। অধুনা আমাদের দেশে কোন কোন উৎসব-আসরে সুন্দরী কুমারীদের সুসজ্জিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া নাকি আরম্ভ হইয়াছে। বালিকারা তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনবগত থাকিলেও, তাহাদের আত্মীয়বর্গ যে সে বিষয়ে খুব উদাসীন, তাহা নহে। কন্যার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া যদি কোনও সুপাত্র আসে, মন্দ কি? কৃতী,



সুসজ্জিত বর (পশ্চিম-আফ্রিকা)

আফ্রিকা-কুমারী ধার-ধোর করিয়া পোষাক-আষাক সংগ্রহ করিয়া, চুল বাঁধিয়া, মুখে বেশ করিয়া চাই ও কাদা মাখিয়া (চুণ ও কালী নয়) রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে। তখন তাহার চক্ষে চঞ্চল চাহনি অঙ্গে সলাজ চকিত বিদ্যুৎ প্রবাহ, চরণে মৃদু গতি, কণ্ঠে নীরব সঙ্গীত—সে তখন ভাবে, ভঙ্গিমায়, ভাষায় দেশের সমস্ত কুমারমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলে—"তোমাদেরই মধ্যে একজন কাহারও জন্য আমার এ উদ্ভিন্ন নব-যৌবন, এ চটুল প্রেক্ষণ, এই সরস ভঙ্গী লইয়া আমি ফিরিতেছি—কে উপযুক্ত আছ—এস, এস।"

বর যুটিতে প্রায়ই বিলম্ব ঘটে না। কুমারী বাগদত্তা না হইলে (অনেক সময় জন্মের পূর্ব্বে কন্যা বাগ্‌দত্তা হইতে দেখা গিয়াছে) রাস্তায় ঘুরিয়া একটি পাত্র মনোনীত করিয়া ফিরিয়া আসে। তখন উভয়পক্ষের মধ্যে পণ ও অন্যান্য বিষয় স্থির হইলে, কন্যার পিতাকে কিছু উপহার পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পণের টাকা মাসে মাসে কিস্তিবন্দীতে দেওয়া চলে। কোথাও কোথাও কন্যার পিতাও জামাতাকে যৌতুক দেয় শুনা যায়—কিন্তু সমস্ত আফ্রিকার মধ্যে কেবল একটি জাতির মধ্যেই এই প্রথা আছে।

বিবাহের পনেরো দিন পূর্ব্বে একদিন নির্ব্বাচিত স্বামীর সহিত কুমারী রাত্রি-যাপন করে। সে একাকী নহে, তাহার দু'চারিটি বলিকা-বন্ধুও সেখানে প্রবেশাধিকার পায়। বিবাহের রাত্রে বাজনা, আলো, নাচ-গান ও সমারোহের ত্রুটি হয় না।

এই দেশের কুমারীগণের বেশ-বৈচিত্র্যের কথা একটু

সুদর্শন ও অকৃতদার যুবক (অবশ্য একেবারেই অপরিচিত ও নিঃসম্পর্কীয় নহে) অতিথি হইলে, পাণ জল মিষ্টান্ন পরিবেষণের ভার অনূঢ়া কন্যাদের উপরই অর্পিত হয়। এবং সযত্ন উপেক্ষায়, অলক্ষ্য হইতে কন্যার নানাবিধ গুণগ্রামের শরসন্ধান চলে। কন্যা গায়িকা হইলে সঙ্গীত, কবি হইলে কবিতার খাতা এবং কলা-নিপুণা হইলে শিল্পকার্য্য—প্রধানতঃ এইগুলিই জ্যানির্ম্মুক্ত তীরের কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাও যে একপ্রকারের শিকার, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। য়ুরোপীয় সমাজে ইহাকেই বোধ হয় husband-hunting বলে।

বলা আবশ্যক। অনূঢ়া কুমারীরা খানিকটা গাছের ছাল ও সূতা মিশাইয়া লম্বা চেটাই বুনিয়া কটি-নিম্নে জড়াইয়া সম্মুখভাগে তাহা ঝুলাইয়া রাখে;—ইহা সতী-আভরণ।

ধনী পরিবারের কন্যাদের সাজসজ্জার ত্রুটি নাই। একটি ধনী কন্যার বিবাহকালীন পরিচ্ছদের চিত্র আমরা দিলাম।

বালিকা বয়সে তাহাদের মুখে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক নানা-বিধ উল্কীর কারুকার্য্য খচিত হইয়া থাকে, বিবাহের পরেও উল্কী পরিতে হয়। এই দুই রকমের উল্কীর বেশ বিভিন্নতা আছে। মুখের উল্কী বালিকার জাতি ও বর্ণের পরিচায়ক; আর বিবাহের পর তাহার উদরে নাভির চতুষ্পার্শে ছবি আঁকিয়া দেওয়া হয়। বঙ্গদেশে হিন্দু-রমণীর বিবাহের পর সীমন্তে সিন্দূর লেপিয়া দেওয়ার রীতি আছে, আফ্রিকার এই উল্কীও সিন্দূরের কাজ করে। সিন্দূর ও উল্কীর পার্থক্য এই যে—হিন্দু সতীর কপাল পুড়িলে সিন্দূর উঠিয়া যায়, আফ্রিকা-ললনার এ চিহ্ন কথ-নই উঠে না—কারণ তাহার কপাল পুড়িবার সম্ভাবনা অতি অল্প। গলায় যতগুলি মালা পরা চলিতে পারে, কোন রমণীর ততগুলি প্রণয়পাত্র থাকা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিরচিত হয়।

পশ্চিম আফ্রিকায় যদিও বালিকারা অধিকাংশস্থলেই চারি পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যেই বাগদত্তা হইয়া থাকে, চৌদ্দ পনেরো বৎসরের পূর্ব্বে তাহাদের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। আফ্রিকার মত উষ্ণপ্রধান দেশে চৌদ্দ পনেরো বৎসর বয়সে বিবাহ—আদৌ বালিকা-বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

এ দেশের মতই বিবাহের পূর্ব্বে "হায়ে-হলুদ", এবং "আইবুড় ভাত" হইয়া থাকে। কুমারীর বন্ধুগণ তাহার হস্তপদ হেনা-রঞ্জিত করিয়া দেয় এবং সকলে একত্র বসিয়া পানাহার করে। বিবাহ দিবসে কন্যার পদদ্বয় এবং বাম হস্তটিতে পুনরায় উত্তমরূপে হেনা মাখাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হয়—নিম্নে প্রদত্ত চিত্রে যে কনেটিকে বসিয়া



এই সুন্দরীর পদদ্বয় ও বামহস্ত হেনা রঞ্জিত হইতেছে

থাকিতে দেখা যাইতেছে, তাহার হাত-পা ঐ কারণে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা।

'গায়ে হলুদে' হেনারঞ্জন প্রথা মহম্মদীয়েরা প্রচলিত করিয়াছে, তৎপূর্ব্বে তৈলম্রক্ষণ চলিত ছিল।

পশ্চিম আফ্রিকার কোন কোন অংশে বিবাহের পর ঘর-জামাই রাখার প্রথা প্রচলিত আছে। তবে বাঙ্গালী ঘর জামাইগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, সে-দেশে জামাইগণ শ্বশুরের কৃপায় 'নবাব-পুত্র' হইবার কিছুমাত্র সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। বিবাহের দু'চার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের ক্ষেতে-খামারে তাহাদিগকে চাষ-আবাদ করিতে হয়—আরও, প্রতি বৎসরেই সাধ্যমত কিছু কিছু উপঢৌকনও দিতে হয়। কলা, নারিকেল তৈল, শুষ্ক মাংস, মদ্য এবং তামাক-ই প্রধান উপহার।

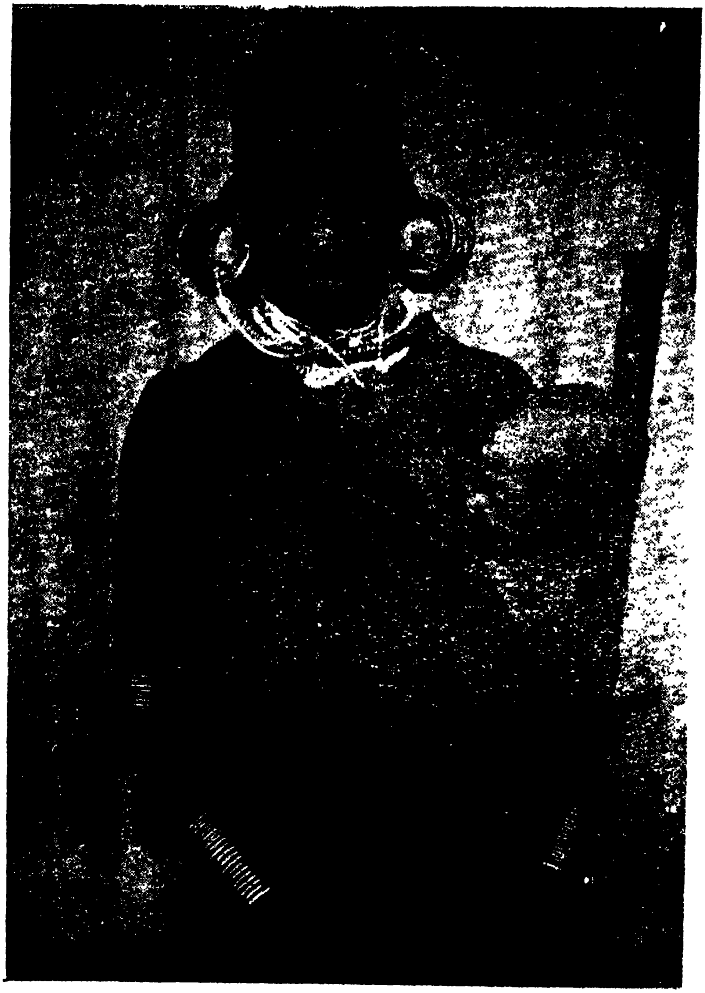
উত্তর আফ্রিকার পরিণয়-প্রণালীতে একটা বিষয়ে বৈচিত্র্য লক্ষিত হইয়া থাকে। মহম্মদীয় ধর্ম্মবিশ্বাসী আরবগণের মধ্যে পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। ইহাদের পর্দ্দা পরপুরুষের সম্মুখে কখনই সরে না। কিন্তু তাহাতে তাহাদের অনুরাগ বা পূর্ব্বরাগ জন্মিবার কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় না। সে কার্য্যে দূতীই সহায়। দূতীরা ঠিক ঘটকী নয়, তাহারা ঘটক ও নল-রাজার হংসশ্রেণীর মাঝামাঝি কোন জীব। তাহারা আসিয়া সবিস্তারে পরস্পরের রূপগুণ ব্যাখ্যা করিতে থাকে। নির্ব্বাচন অবশ্য পাত্রীই করে। পাত্র-নির্ব্বাচন করিয়া কন্যা পিতামাতাকে দিনস্থির করিতে বলে। তাহারা যদি পাত্রটিকে না-মঞ্জুর করে, তবে বিবাহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রক্রিয়া এইরূপ—শবদেহ-ধৌত জল বালিকার সর্ব্বাঙ্গে ছিটকাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ এন্‌গেজমেণ্ট ভঙ্গ হইয়া যায়। আর যদি পাত্র-পক্ষীয়েরা অমত করে, কন্যা তখন পাত্রকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিয়া ফেলিতে পারে। সে একটি দৈব-উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, সেটি এই—সমুদ্র—অভাবে—নদীতীরে যাইয়া, সম্পূর্ণ নগ্নদেহে কন্যা সাতটি ডুব দিয়া সাত ঢোঁক জল খাইয়া ফেলে। এই, ক্রিয়া



বিবাহ-সভা (পূর্ব্ব আফ্রিকা)

শেষ না হওয়া অবধি সে মৌনব্রত ধারণ করে; এবং একমনে সাফল্য-কামনা করিয়া থাকে। তৎপরে হোম যাগযজ্ঞ হয়,—বরপক্ষীয়েরা ভীত হইয়া ছেলের বিবাহে স্বীকৃত হন।

এখানে বিবাহ একটি রাত্রে শেষ হয় না; তিন দিন, তিন রাত্রি লাগে। দ্বিতীয় রজনীতে সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদি হইয়া থাকে। এক রাত্রে কনে স্বহস্তে অতিথি সৎকার করে। ধর্ম্মনিষিদ্ধ হইলেও, এ রাত্রে সুরাপানের মাত্রা নিয়মবদ্ধ থাকে না; এবং এক অতি কদর্য্য হাব ভাব সম্পন্ন নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। সেই নৃত্যশালায় পুরুষের সংখ্যা অতি অল্পই থাকে। কখনও কখনও গৃহ-চিকিৎসক ব্যতীত আর কোন পুরুষই সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। এই নৃত্য এতই কুরুচিপূর্ণ যে নবদম্পতী সেখানে উপস্থিত হইতে কুণ্ঠাবোধ করে। এখানে যে সকল সঙ্গীত হয়, তাহা একেবারে "নব্য আর্টের"ও বহির্ভূত।



বিবাহিতা, অবগুণ্ঠনমণ্ডিতা কিকিউ মহিলা।

বর-কনে বিদায়ের সময় আমাদের দেশে আশীর্ব্বাদের একটি রীতি আছে, এখানে ঐ দ্বিতীয় রজনীতেই আশীর্ব্বাদ হইয়া যায়। সে সময়ের দৃশ্যটি এইরূপ:—কতকগুলি মেহদীপাতা মুখে পুরিয়া কনে নির্ব্বিকার-চিত্তে চিবাইতে থাকে, চতুঃপার্শ্ব হইতে আত্মীয়-স্বজনেরা উপহার ছুড়িয়া তাহাকে মারে। কনের একটি ঝুড়ি থাকে, সেটি প্রায়ই পূর্ণ হইয়া যায়। যদি কাহারও উপহার অল্পমূল্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সভামধ্যে তাহার নাম প্রকাশ করা হয়। বেচারা তখন লোকের উপহাস-দৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি দামী উপহার আনিয়া দিয়া, তবে রক্ষা পায়।

বিবাহরাত্রে যখন বর বিবাহ করিতে আসে, বের্ব্বর জাতির রমণীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে (সেই সময়ের ক্রন্দনকে কুরুরুন্না বলে) তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যায়। বর, কনের বাম দিকে বসিয়া তাহার টুপির উপর রেশমী একখানি কাপড় ঝুলাইয়া দেয়। এই সময়ে পুরোহিত চারিটি হাত এক করিয়া পরস্পরের অঙ্গুরীবিনিময় করিয়া দেন। শুভদৃষ্টি হইয়া গেলে, পুরোহিত ঠাকুর একপাত্র মদ্য তাহাদের

মস্তকে ধরিয়া প্রার্থনা করিতে থাকেন এবং ঢুক্ ঢুক্ করিয়া পান করিয়া পাত্রটি বরকে দেন। বর, পান করিয়া পাত্রটি কনের হাতে দিলে, সে মহাসমারোহে তাহা আছাড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। তখন শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্তমনে পানাহার চলিতে থাকে।

উত্তর আফ্রিকার রমণীগণের মধ্যে সুন্দরীর অভাব নাই। এমন কি সৌন্দর্য্যে তাহারা অনেক জাতির সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য। য়ুরোপীয় অনেক পর্য্যটক elope বলে। চম্পট দিয়া তাহারা গোপনে বসবাস করিতে থাকে। সন্ধান পাইলে কন্যার পিতা, তাহার অবর্ত্তমানে ভ্রাতা—বরের নিকট গিয়া পণ দাবী করে। বর একান্ত অসমর্থ হইলে, বিবাহের প্রথম সন্তানটি দাদামহাশয় বা মাতুল মহাশয়ের প্রাপ্য।

উগণ্ডায় বরকে দুইটি ভোজ দিতে হয়। একটি স্বগৃহে, অন্যটি শ্বশুরগৃহে। সে-দেশে বর শুভদৃষ্টির পূর্ব্বে কনের মুখ দেখিতে পায় না—এ সম্বন্ধে বঙ্গদেশের প্রথা



প্রসাধনরতা জুলু রমণীদ্বয়।

তাহাদের ললিত-সৌকুমার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাহারা মাজিয়া ঘষিয়া, বেশভূষা করিয়া সুন্দরী সাজে না।

পূর্ব্ব আফ্রিকা এবং উগাণ্ডা দেশের বিবাহ কতকাংশ প্রাচীন ভারতের রাক্ষস বিবাহের অনুরূপ। কোন উৎসব সভা হইতে যুবতীটিকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে হয়। তবে ছলে বা বলে নহে—গোপনে। ইংরেজী ভাষায় যাহাকে ঠিক অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। অথচ দেশের কনেরা ক্ষেতে খামারে কৃষিকার্য্য করে এবং বরেরা গৃহকার্য্য করিয়া থাকে। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় কোন কোন অংশে বিবাহের পর দুই বৎসর শ্বশুর মহাশয়ের গৃহে থাকিয়া বরকে চাষবাস করিতে বাধ্য হইতে হয়। ঐ সময়ের পর সে স্ত্রী লইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিতে পায়।

ইহাদের মধ্যে 'মধুচন্দ্র' প্রথা চলিত আছে। কোথাও সাতদিন, কোথাও বা তিনমাস কাল মধুচন্দ্রের

জন্ত অবধারিত। এই সময়ের মধ্যে দম্পতিযুগল ঘরের বাহির হয় না। আত্মীয়-স্বজনেরা তাহাদের আহার এবং সুখ-স্বচ্ছন্দতার বিধান করিয়া যায়।

বিবাহের পূর্ব্বে সে দেশের কুমারীগণ 'স্বাধীন প্রণয়' করিয়া থাকে। বিবাহের পর 'নিত্য নূতন পুষ্পে মধু আহরণ' একেবারেই নিষিদ্ধ। কিন্তু যাহারা যৌবন বিকাশকালে এই সুখ-ভ্রমরের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহারা যে ভবিষ্যতে পূর্ণমাত্রায় সাধ্বী হইয়া ঘরসংসার করিবে, ইহা দুরাশা। প্রায়ই তাহারা একের নিকট হইতে অন্যের নিকট পলায়ন করে। অনুগৃহীত ব্যক্তি স্বামীকে ক্ষতিপূরণ দিলেই তাহার নিষ্কৃতি। স্ত্রী পিতৃগৃহে পলায়ন করিলে, স্বামী তাহার মান ভাঙ্গাইয়া ফিরাইয়া লইয়া আসে; দ্বিতীয়বার পলায়ন করিলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে এবং কন্যার পিতার নিকট হইতে পণ ফিরিয়া পাইবার অধিকারী হয়। অনেক সময় ইহা লইয়া মনান্তর, শেষ খুনোখুনি পর্য্যন্ত হইয়া যায়। এইরূপ বিবাহ-বিচ্ছেদের (divorce) নিয়ম আছে যে, পরিণয়লব্ধ সন্তানসন্ততি পিতার অবশ্য পালনীয়। যদি সন্তান নিতান্ত শিশু হয়, বড় না হওয়া অবধি মাতা পালন করে। আরও শুনা যায়, সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে কাহারও স্ত্রী যদি মরিয়া যায়, তবে শ্বশুর মহাশয় জামাতাকে পণের টাকা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য।

একটি বিবাহিতা অলঙ্কার-পরিশোভিতা পূর্ব্ব-আফ্রিকা-মহিলার চিত্র এতৎসহ সন্নিবিষ্ট হইল। তাহার কাণে এবং গলায় যে সকল অলঙ্কার দেখা যাইতেছে, তাহা সধবার লক্ষণ।

দক্ষিণ-আফ্রিকার এন্‌গেজমেণ্ট প্রথাটি সম্পূর্ণভাবে য়ুরোপীয়। অন্যান্য উৎসব আমোদ ও আনুসঙ্গিক ক্রিয়াদি উত্তর-পূর্ব্ব পশ্চিম আফ্রিকার মতই। এখানে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একখানি কুড়ে ঘর বাঁধিয়া দিলেই হইল।

মৃতা স্ত্রীর স্থান শ্যালিকার অবশ্য প্রাপ্য। শ্যালিকা অল্পবয়স্কা হইলে, তাহার বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত অন্য একটি রমণীকে জামাতার নিকট নিজখরচে পাঠাইতে শ্বশুর মহাশয় বাধ্য হন।

এই কদর্য্য স্ত্রীর ব্যবসায় এবং বহুবিবাহ প্রথা রহিত না হইলে, আফ্রিকা মহাদেশ কখনই সভ্যজগতের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে না।

আফ্রিকার বিবাহ-প্রণালী আলোচনা করিয়া দেখা গেল, বিবাহে ধর্ম্ম বা সভ্যতার আভাসমাত্র ইহাদের নাই।

কালে য়ুরোপীয়দের সংস্পর্শে তাহারা একদিন সভ্যতানুমোদিত প্রথা অবলম্বন করিবে, এইরূপ আশা করা যায়।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

চিরবাঞ্ছিত

অশ্রুভরা মর্ম্মখানি উচ্ছ্বসিছে আবেগভরে—
চিত্তমাঝে অন্তবিহীন অন্ধব্যথা কাহার তরে ?
গন্ধপাগল সন্ধ্যাবেলা সিক্তশীকর ছায়ার মাঝে
চিরদিনের বাঞ্ছিত কে—বিরহ কার বক্ষে বাজে ?
কোন্‌খানে তার শান্তিভরা ছায়ায় ঢাকা কুটীরখানি,
কোন্ পাহাড়ের ঝরণাতলে মর্ম্মরে কার মর্ম্মবাণী ?
কোন্ পথে সে চরণ ফেলে কুটিয়ে তোলে পুষ্পরাশি—
কোন্ গহনে বাঞ্ছিত সে আপন মনে বাজায় বাঁশী ?

কোথায় সে কোন্ সুদূর দেশে শান্ত শীতল নদীর ঘাটে,
সন্ধ্যারতির শঙ্খমুখর তিমিরঘেরা পল্লী বাটে—
কোন্ সেতারের প্রতিধ্বনি উঠে কাহার ঝঙ্কারিয়া
কোন্ অজানা রাগের মোহ-মূর্চ্ছনাতে উচ্ছ্বসিয়া ?
বিশ্ব ভরি' খুঁজে' মরি, নয়ন জলে দৃষ্টিহারা—
চিরযুগের বাঞ্ছিত যে—কোথায় সে মোর সৃষ্টিছাড়া !

শ্রীঅমিয়া দেবী।

স্পর্শমণি

(উপন্যাস)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মা ও মেয়ে।

যে দিন অতৃপ্ত দর্শনাকাঙ্ক্ষা বক্ষে বহিয়া সতীনাথ কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সেই দিন বেলা দশটার মধ্যেই তাহার দেশত্যাগের যে বিবরণ তারাসুন্দরী প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে তাঁহাকে শুধু বিস্মিত নয়, একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। নিত্যকার মত ভোরে উঠিয়া স্নান পূজা সারিয়া তিনি তখন রান্নাঘরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

বাবুর বাড়ীর দুইজন ভৃত্যের নিকট ভজহরি সে সংবাদের অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জানাইল, কথাটা যথার্থ—ইচ্ছা না থাকিলেও জেঠামহাশয়ের হুকুমে তাঁহাকে সুদূর বিক্রমপুরে পত্নী-সংগ্রহে যাইতে হইয়াছে।

সতীনাথের উপর ভজহরির একটুখানি পক্ষপাত-মূলক স্নেহ থাকায়, সে আরও জানাইল, "ছোটবাবু কি রাজী হন্! কাল সারাদিন এই নিয়ে নাকি বাবুর সঙ্গে তুমুল দাঙ্গা হয়ে গেছে। কর্ত্তা বাবুর 'বাঙ্গালে গোঁ'—বল্লেন সে সব হবে টবে না; নিকষ কুলীনের বেটা অঘরে বিয়ে করবে! জাত খোয়াবে! তা যদি করে, তাহলে আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত। এক পয়সা দেবনা। কি করেন, এ রাজিপাটি ত আর ছাড়া যায় না, কাযেই ছোটবাবু দায়ে পড়ে বিয়ে করতে গ্যাছেন। লজ্জায় আর এখানে মুখ দেখাতে পাল্লেন না। মুরারিবাবু তাঁর কেমন ভাই হন্, তিনি এই সব কথা নিজে হতে বল্লেন। কত দুঃখু কল্লেন; আরও বল্লেন, মাঠাক্‌রুণকে বল, যা হয়ে গেল তার ত আর চারা নেই, ওনার অমন মেয়ে, মেয়ের বিয়ের ভাবনা কি? মাঠাক্‌রুণ যদি হুকুম দেন ত আমি নিজেই পাঁচ গণ্ডা পাস করা ছেলে হাজির করে দেব।"—ভজহরি মনে করিয়াছিল মুরারি বাবুর এই সান্ত্বনাতে সেও মাঠাক্‌রুণকে শান্ত করিতে পারিবে। কিন্তু তাঁহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া সে যখন তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, তখন আর সে সম্ভাবিত সান্ত্বনার ভাষা তাহার মুখে ত আসিলই না, মন হইতেও পলাইয়া গেল।

কল্যাণীও শুনিল, সতীনাথ বিক্রমপুরে বিবাহ করিতে গিয়াছে। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল না, মূর্চ্ছাও গেল না। সাধারণতঃ নায়িকারা যাহা করেন, সেরূপ কিছু না করিলেও, তাহার মাথার ভিতর কেমন যন্ত্রণা হইয়া উঠিল। আনন্দ বা দুঃখের আতিশয্যে মানুষ যেমন স্তব্ধ হইয়া থাকে, কিছুক্ষণের জন্য সেও যেন তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিল। বাহিরের হাসিখুসী, কথার আওয়াজ, পথে গাড়ী চলার শব্দ—সমস্তই যেন বহুদূর হইতে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, কিছুই যেন স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল না। তাহার চোখের উপর কেবল এক সুন্দর পুরুষের ছবি যেন তাহারই পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে এমনি মনে হইতে লাগিল।

তারপর ধীরে ধীরে সে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল। তাহার অত্যন্ত ম্লান হাসিটুকু ভজহরির মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়া তাহার চোখের উপর যেন ফুটিয়া উঠিল। কাণে বাজিল, "ভজাদা, আজ বাজার যাবে না? রান্না বান্না হবে কখন, আজ দ্বাদশী যে!"—বলিয়াই কল্যাণী কাযের ছুতায় ঘর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ভজহরি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ভাবিল, "আহা, দিদি আমার ছেলেমানুষ,কিছু ত বোঝে না! যাক, ওনার যে আঁতে ঘা লাগেনি, এই ঢের ভাগ্যি।"—বাজারের জিনিষপত্রের তালিকা না চাহিয়াই সে ধামা ও মৎস্য-পাত্র লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

কল্যাণী রান্নাঘরে গিয়া দেখিল, চুল্লীর আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া কখন নিবিবার উদ্যোগ করিয়াছে

তাঁহার স্থিরতা নাই। খানকয়েক ঘুঁটে ভাঙ্গিয়া উনানের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া কয়লা ঢালিয়া দিল। তারপর দালানে বঁটি পাতিয়া মায়ের জন্য ফল ছাড়াইতে বসিয়াই কল্যাণীর মনে পড়িল, সরবতের চিনি ভিজানো হয় নাই; ভজা কাল আশ্বাস দিয়াছিল সকালে ডাব আনিয়া দিবে, তাহাও ত হইল না। চিনি লইতে আসিয়া সে দেখিল, মা সেইখানে বসিয়া আছেন।

কল্যাণী কাছে আসিয়া ডাকিল, "মা।"

তারাসুন্দরী উত্তর দিলেন না, চাহিয়াও দেখিলেন না।

কল্যাণী এবার তাঁহার হাতখানা টানিয়া নিজের ললাটে বুলাইয়া লইয়া পুনরায় ডাকিল, "মা।"

তারাসুন্দরী চাহিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিবার পর, তাঁহার দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে আবার সহজভাব ফিরিয়া আসিল। কল্যাণীর মাথাটা কোলে টানিয়া লইতেই, মনের বেদনার উচ্ছ্বাস দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টিধারার মতই ঝরিয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কাটিলে, অসহ্য বেদনাটা সহ্যের সীমায় আসিয়া পড়িল।

তিনি যে তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহার 'পরে বড় বেশী ভরসাই রাখিয়াছিলেন! সে আশা যে কত বড়, আজই যেন প্রথম তাহা উপলব্ধ হইল।

কল্যাণী নিঃশব্দে অনেকক্ষণ মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া যখন একবার মুখ তুলিল, তারাসুন্দরী দেখিলেন, তাহার চোখ দুইটাও অল্প যেন লাল হইয়া উঠিয়াছে। কল্যাণী মুখ তুলিয়াই একটুখানি হাসিল। তারপর মায়ের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "চলনা মা, খেতে চলনা। কত বেলা হল দেখ দেখি?"

তারাসুন্দরী একটুখানি সংশয়ের নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তিনি কি তবে ভুল বুঝিয়াছিলেন? সতীনাথ বিশ্বাস ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া কল্যাণীও কি এত সহজেই তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে পারিবে?—তখনই দুঃখের হাসি আসিল। পারুক আর নাই পারুক, তাহার জন্য ত আর বিধাতার আইন বদল হইয়া যাইবে না!

মানুষ গড়ে ও বিধাতা ভাঙ্গেন, এ দৃষ্টান্ত তারাসুন্দরীর জীবনে এই প্রথম নয়। তরুণ জীবনে আশার আলোকে ভবিষ্যতের মোহন ছবি আঁকিয়া তিনি যখন প্রবাসী স্বামীর অধ্যয়ন-সমাপ্তির দিন গণিয়া সুখমিলনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন বিনামেঘে বজ্রাঘাতে ভবিষ্যতের রঙ্গীন ছবি বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার জীবনের সকল সুখসাধের সমাধি হইয়া গিয়াছে। স্বামী বর্ত্তমানেও তিনি স্বামীহীনা হইয়া ছিলেন। আর, সব চেয়ে বিড়ম্বনা, সে মৃত্যুদণ্ড স্বহস্তেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বিধবা পতিহীনা নারী আত্মীয় জনের কাছে সহানুভূতির সমবেদনায় যেটুকু সান্ত্বনা পায়, তাঁহার ভাগে সেটুকুও ঘটে নাই। জীবিতাবস্থায়ও নবীনমাধব তাঁহার আত্মীয়জনের চোখে মৃত হইয়া ছিলেন, সে সংসারে তাঁহার নাম মুখে আনিবার পর্য্যন্ত কাহারও সাহস ছিল না। তারপর, একদিন অত্যন্ত অকস্মাৎ অতর্কিতরূপেই তারাসুন্দরী জানিলেন যে, জীবনের দ্বিধা হইতে তাঁহাকে মুক্তি দিয়া, তাঁহার উপেক্ষিত মহানুভব স্বামী চিরদিনের জন্যই চলিয়া গিয়াছেন। সেদিনের সেই বর্ণনাতীত প্রচণ্ড আঘাত তাঁহার হৃদয়ের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত নড়াইয়া দিলেও, একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে নাই। বিধাতার হস্তনিক্ষিপ্ত অমোঘ দণ্ড যতই কঠোর হউক, তাহা যে তিনি মাথা পাতিয়া লইতে বাধ্য, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এ অভিজ্ঞতা সেই দিনই পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। সেদিনও যখন কাটিয়া গিয়াছে, তখন ভবিষ্যতে যত বড় দুর্দ্দিনই আসুক, তাহাও যে কাটিয়া যাইবে তাহাতে আর তাঁহার সংশয় মাত্র ছিল না।

তাই সতীনাথের ব্যবহার তাঁহার ভাঙ্গা মনের উপর আঘাত করিলেও, নূতন করিয়া আর কিছু ভাঙ্গিতে পারিল না। ঝড় খাইয়া খাইয়া যে

গাছ টিকিয়া আছে, তাহাকে উৎপাটন করা আর ঝড়ের সাধ্য নয়, সে কালেরই প্রতীক্ষা করে।

তবু নিজের জন্য না হউক, মেয়ের জন্য তাঁহাকে ভাবাইয়া তুলিল। সে কুসুম কোমলা বালিকা এত বড় মানসিক আঘাত সহিতে পারিবে কি?

মানুষের ভিতর বাহির যে সমান নয়, বড় অধিক মূল্যেই এ অভিজ্ঞতা তারাসুন্দরীকে ক্রয় করিতে হইয়াছে। সতীনাথ এত দুর্ব্বলচিত্ত! এমন ভাবে সে যে প্রতারণা করিতেও পারে, এ সম্ভাবনার কথা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে উঠে নাই। সতীনাথও এমন ব্যবহার করিতে পারিল? জগতে তবে কিছুই অসম্ভব নয়! তেমন সরল মুখ, তেমন উদার উন্নত ব্যবহার—সে সবই কাপট্যের আবরণ! তাহার বন্ধুত্ব মৌখিক, মুখে সে বলিত কল্যাণীর জন্য জগতের সকল ক্ষতি হাসিমুখে সহ্য করিতে পারে—কিন্তু প্রয়োজনকালে একটা মুখের কথা পর্য্যন্ত জানাইয়া গেল না! চোরের মত লুকাইয়া চলিয়া গেল! একবার ভাবিয়া দেখিল না যে, খেলার ছলে তাঁহাদের কতখানি ক্ষতি করিয়া গেল! এমন করিয়া, আশা দিয়া সে প্রলুব্ধ করিল কেন! নচেৎ কুটীর-বাসিনী দুঃখিনী মায়ের দুঃখিনী কন্যা, জন্মাবধি যে পিতৃস্নেহ পর্য্যন্ত পাইল না, কে তাহার জন্য রাজ্যেশ্বরের কামনা মনে আনিত?

তারাসুন্দরী সতীনাথের উপর রাগ ছাড়িয়া, ক্রমে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার উপর রাগ করিতে লাগিলেন। অচেনা অজানা লোকের প্রতি কেন এমন প্রবল আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিলেন! সে যাই বলুক, কেন তিনি সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া, কল্যাণীকেও আশা দিয়াছিলেন! এ খেলার প্রশ্রয়দাত্রী তিনি নিজেই যে, এখন রাগ করিবেন কাহার 'পরে? অদৃষ্টকে তিনি নিজে হাতে গড়িয়া তুলিয়াছেন, অদৃষ্টের দোহাই দিলেই বা চলিবে কেন? এ যে স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল!

এইরূপ কিয়দ্দিন কাটিল। একদিন মুরারি রুদ্রকান্তের পত্রবাহকরূপে আসিয়া দেখা দিল। সতীনাথের সহিত আত্মীয়তায় তাহার সম্মুখে অসঙ্কোচে বাহির হইলেও, মুরারির সাক্ষাতে বাহির হইতে তারাসুন্দরীর ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ, তাহাদের প্রতি তিনি তখন হাড়ে হাড়ে চটিয়াই আছেন।

ভজহরি বাজারে গিয়াছে, মুরারি অবস্থা বুঝিয়াও নড়িল না। গায়ে পড়িয়া মা বলিয়া ঘরে ঢুকিল।

অগত্যা তারাসুন্দরী ললাট পর্য্যন্ত মাথার কাপড় টানিয়া, তাহাকে বসিবার জন্য আসন দিলেন। রুদ্রকান্তের চিঠিখানা অনিচ্ছায় খুলিয়া পড়িতেও হইল। রুদ্রকান্ত "সবিনয় নিবেদনে" অনধিকার চর্চ্চার জন্য ক্ষমা চাহিয়া, বিনা আড়ম্বরে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—

তাঁহারা নিকষ কুলীন, শ্রোত্রীয়ের ঘরের কন্যা লইতে পারিবেন না; আর আর যে কারণ আছে তাহা বলিবার প্রয়োজন বোধ করেন না; সুতরাং তাঁহাদের আশা ছাড়িয়া বুদ্ধিমতী জননী যেন কন্যার জন্য অন্য সৎপাত্রের সন্ধান করেন; সতীনাথের সান্নিধ্য ত্যাগ করাই তাঁহাদের পক্ষে শুভ, কারণ বালক বালিকা নিজেদের জীবনের লাভ ক্ষতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিলেও, বিজ্ঞ অভিভাবকের দূরদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। জীবন-পথে কণ্টক গুল্ম জন্মিতে দিলে পথ ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়ে। মহানগরীতে বাসস্থানের অভাব নাই, চোখের দূরত্ব মনের দূরত্বসাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। অপ্রিয় সত্য বলিবার এই যে ধৃষ্টতা তিনি গ্রহণ করিলেন এ অপরাধ মহাশয়া নিজগুণে যেন ক্ষমা করেন।

বিনীত নিবেদনের স্বাক্ষরকারীর কঠোর নামটা চীৎকার করিয়া যেন তারাসুন্দরীর আহত হৃদয়ে সজোরে কশাঘাত করিল। পত্রের ভাব ও ভাষা যতই মার্জ্জিত হউক, তাহা যে ক্ষমাপ্রার্থনা নয়, তাহা যে আদেশ—সে কথা অপমানিতা তারাসুন্দরীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তীব্ররোষে তাঁহার ললাটের শিরা-সকল স্ফীত ও ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতে লাগিল।

কিন্তু অগ্নিগর্ভ গিরির মত সে ক্রোধাগ্নি তাঁহাকে

অন্তরের মধ্যেই রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইল। কথার ভিতর যতখানি বিষই থাক, অক্ষরগুলা অগ্নিতপ্ত লৌহশলাকার মত হৃদয়ক্ষতের উপর যতই যন্ত্রণার জ্বালায় বিদ্ধ হউক, মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কল্যাণীর মনের ভাষা তাঁহার চোখের উপর যে ফুটিয়া রহিয়াছে—মেয়ে যে একান্তভাবেই সেই দুর্ল্লভজনেই অনুরাগিণী! যে তাহাকে এত বড় অপমানের ভিতর দিয়া এতখানি বেদনা দিল, অভাগিনী কন্যা এখনও যে তাহাকে একান্ত মনেই ভালবাসে! মায়ের কাছে কল্যাণী স্বীকার করিয়াছে, তাহার পিতার সমাজনীতিই সে গ্রহণ করিবে, সে আজীবন কুমারী থাকিয়া মায়ের সেবা করিবে, বিবাহ সে কখনই করিবে না। এ অবস্থায় সতীনাথের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া যাওয়া ছাড়া তাঁহার আর কিই বা উপায় আছে! গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লওয়াই তাঁহার একমাত্র উপায় বলিয়া মনে হইল। এই সহজ আর উচিত পথ সময়ে গ্রহণ না করার জন্য নিজের প্রতি তাঁহার ঘৃণাও হইতেছিল। মেয়েকে শিক্ষিতা করিয়া সৎপাত্রে দিবার সাধ করিয়াছিলেন—এ তাঁহার সেই অতিলোভের পুরস্কার।

মুরারি যখন নিশ্চয় বুঝিল, সতীনাথের বিবাহবার্ত্তা তারাসুন্দরী বিশ্বাস করিয়াছেন, তখন তাহাতে আরও কিছু অলঙ্কারযোগ করিয়া রসান দিয়া কহিল, "কি জানেন, কুলীনের ঘরে অমন কত হয়। ছেলেরা ত আর কুল ফুল মানে না, কথা দিয়ে বসে থাকে। কর্ত্তারা কুলের গোড়া আগ্‌লাতে চান। তা, সে জন্যে আপনার চিন্তা নেই। সতীদা কথার মানুষ, সে যখন হাঁ বলেছে, তখন না হবে না। সে বাঙ্গালের মেয়ে তার বাপের বাড়ী থাক্‌বে এখন, তাকে নিয়ে কি আর ঘর কর্‌বে? শোনেন নি, সতীদার ঠাকুর্দ্দা মশায়ের বাটটা বিয়ে ছিল।"

তারাসুন্দরী অসহিষ্ণুভাবে কহিলেন, "তাঁকে বল্‌বেন, আমরা কুলীনের ঘরে মেয়ে দিই না।"—বলিয়া তিনি কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মুরারির বিস্ময়।

ভজহরি বাজারের জিনিষগুলা ভিতরে রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বাবু কি বস্‌বেন, তামাক আন্‌ব?"

মুরারি তাহার কথার গুরু-অর্থ বুঝিয়া অগত্যা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "না তার আর দরকার নেই। তা জান ভজু, মাঠাকরুণকে বোল, ওঁর অমন পরীর মত মেয়ে, ও মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা! হুকুম দিলে এই মুরারিই এক্ষুণি পঞ্চাশটা এম-এ বি-এ হাজির করে দিতে পারে। তা জান, বলছিলুম গিয়ে, আমি তাঁর ছেলের মতন। যখন যা দরকার, হুকুম করবেন, এই মুরারি প্রাণ দিয়ে তাঁর কায করে দেব। একজনকে দেখে যেন সবাইকে ভুল বোঝেন না। তা জান, এসব কথা তাঁকে বোল।"

ভজহরি খুসী হইয়া অনুরোধ রাখিবার সম্মতি জানাইলে,মুরারি একবার বক্রকটাক্ষে চারিদিকে চাহিয়া, ঈপ্সিত জনের দর্শন না পাইয়া, শিষ্টাচার-বিগর্হিত স্বরে শিষ্টাচার জানাইয়া চলিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়াও তাহার মনটা অনিশ্চিত সংশয়ের দোলায় দুলিতে লাগিল। উদ্দেশ্যের সফলতার সম্বন্ধে সে আজ অনেকখানি ভরসা পাইয়া আসিয়াছে। তারাসুন্দরী বলিয়াছেন, কুলীনের ছেলেকে তিনি মেয়ে দিবেন না। এই ভাবটা তাঁহার স্থায়ী রাখা চাই। সতীদার উপরে তাঁহার মনকে এমনভাবে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাঁহার বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার জন্য সতীদাকে সকল স্বার্থ ও জেঠামহাশয়ের সহিত কাটাছেঁড়া করিয়া বিশ্বস্ততার প্রমাণ হাতে হাতে দেখাইতে হয়। স্তোকবাক্যে আর চলিবে না—কৌলীন্য গর্ব্ব ও জ্যেষ্ঠতাতের স্নেহত্যাগ করা ছাড়া, কল্যাণী-লাভের তাহার আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই। সবজান্তা মুরারি বুঝিয়াছিল, কল্যাণীর জন্য এসব স্বার্থ সতীনাথ অনায়াসেই বিসর্জ্জন দিতে পারিবে। সে অপরিণামদর্শী,

ভবিষ্যতের আশায় বর্ত্তমান ক্ষতি সহিতে চাহিবে না। মুরারির যথেষ্ট নাটক নভেল উপন্যাসের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল। প্রেমিক নায়কেরা প্রেমের জন্য, এ ত কোন ছার, কত অসাধ্যও সুসাধ্য করিয়া থাকে—সে সব দৃষ্টান্ত তাহার চোখের উপর এখনও জল জল করিতেছে। সতীদা আর এইটুকু পারিবে না?

সতীনাথের প্রেমের গভীরতার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়াই সে আসরে নামিয়াছে। এখন সতীনাথ তাহার প্রণয়ের উচ্চাদর্শ না দেখাইলে চলিবে কেন? জেঠা মহাশয় অবশ্যই কল্যাণীর সহিত বিবাহ দিবেন না। তারাসুন্দরীও আরও স্তোকবাক্যে ভুলিয়া প্রতীক্ষায় থাকিতে রাজি হইবেন না; সতীনাথও কল্যাণীর আশা ছাড়িবে না।

তার পর—তার পরটাতে সে কালনেমির সুবর্ণপুরী ভাগের মত নিজের অংশেই সবটুকু সুযোগ ধরিয়া রাখিল। ছেলে মানুষ সুধীরের জন্য সে ভাবে না, তাহার ক্ষণভঙ্গুর স্বাস্থ্যহীন দেহ যদি টিকিয়াই থাকে, তবু জেঠা মহাশয়ের কাছে সে দেহের মূল্য খুব বেশী নয়। তাই অমীমাংসিত জীবনসমস্যার সুমীমাংসার জন্য মুরারি অধীর আগ্রহে সতীনাথের পথপানে চাহিয়া রহিল। সংশয়ের চেয়ে সত্য ভাল, তা সে যে মূর্ত্তিতেই আসুক। মুরারি ত ডুবিয়াইছে, তাহার ত আশা ভরসা কিছুই নাই। যে তাহাকে ডুবাইল, তাহাকেও কেন সঙ্গে লইবে না? ছোট বেলায় কোন একখানা নীতিপুস্তকে সে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িয়াছিল, "উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" আজ সেই শ্লোকাংশটুকু তাহার মনে পড়িল। সে লক্ষ্মী উপাসনার জন্য পুরুষকারের আশ্রয় লইয়াছে, একবার শেষ পর্য্যন্ত দেখিবে। তার পর, সফলতা লাভ করিতে না পারে,—সন্ন্যাসী হইয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া যাইবে।

নিজের মানসিক বিপ্লবে কয়দিন সে এতই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, নির্য্যাতিতা প্রতিবেশিনীর সংবাদ লইবার অবকাশ পর্য্যন্ত তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। সেদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়াই মনে হইল, তাঁদের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন। মাঝে মাঝে ইন্ধন না যোগাইলে প্রজ্বলিত অগ্নি যদি আবার নিবিয়া যায়, তখন হয়ত আশাপথ চাহিয়া তারাসুন্দরী তাঁহার যুবতী কন্যাকে প্রৌঢ়ত্ব দিতেও সম্মত হইয়া বসিবেন। প্রতিবেশিনীদের সংবাদ লইতে যাইবার জন্য মুরারি ভাল করিয়া আয়নায় মুখখানা দেখিয়া লইয়া, চুল ফিরাইল। রুমালে একটু গন্ধ ঢালিয়া লইল। কাপড় জামা বদলের প্রয়োজন নাই,—তাহা সর্ব্বদাই বাহিরে যাইবার উপযুক্তভাবে প্রস্তুতই থাকে। মনে মনে একটু রাগও হইল। সতীনাথের প্রতি বিধাতার এও একটা প্রকাণ্ড পক্ষপাতিতা! কেন, মুরারির চেহারাখানার উহার সহিত সামঞ্জস্য রাখা হইলে তাঁহার কতটুকুই বা ক্ষতি হইত? ভাবিল, একচক্ষুতায় মানুষ-ক্ষুদ্রকান্তের চেয়ে ভগবানও বড় কম যান না।

প্রতিবেশীর বাড়ীর কাছে আসিয়া মুরারি বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিল। একি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ এবং দেওয়ালের গায়ে "এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে" লেখা রহিয়াছে। মুরারি কাছাকাছি অনেকের কাছেই জিজ্ঞাসাবাদ করিল, কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। ভজহরির বন্ধুমহলে চাকর বাকরদের কাছেও কোন কথা জানিতে পারা গেল না।

এ ঘটনায় মুরারি দুঃখিত অথবা খুসী হইল, ঠিক বলা যায় না। কল্পনা যতক্ষণ কল্পনাই থাকে, ততক্ষণই সে সুন্দর, কিন্তু কল্পনা যখন বাস্তব হইয়া আসে, তখন তাহার মোহ কাটিয়া সত্যের রুক্ষ মূর্ত্তি সমস্ত শোভনীয়তা লুপ্ত করিয়া:দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। সতীনাথের বিরুদ্ধাচরণ যতক্ষণ কল্পনায় ছিল, ততক্ষণ তাহার বিরুদ্ধাচরণের পথে কোন গোলযোগ ঘটায় নাই। রুদ্রকান্ত ও সতীনাথের সংঘর্ষ মুরারির পক্ষে যতই লাভজনক হউক, সে বিপ্লবের অংশ গ্রহণে তাহাকেও ত বঞ্চিত থাকিতে হইবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হইলে গোলাগুলির আঘাত লাগা

কিছুই বিচিত্র নয়। রামেই মারুক আর আর রাবণেই মারুক, হতভাগ্য মারীচের মত তাহার অবস্থাও যেন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতের রঙ্গীন ছবি যতই মনোহারিতায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটুক, বর্ত্তমান তাহাকে যেন ক্রমশই পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। কুরুক্ষেত্রের জ্ঞাতিযুদ্ধে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে তবে না রাজ্যভোগ ?

সতীনাথের ফিরিবার বার্ত্তা বহিয়া যেদিন রুদ্রকান্তের কাছে চিঠি আসিয়া তাঁহাকে হর্ষোৎফুল্ল করিয়া তুলিল, সেদিন মুরারির এতদিনের সঞ্চিত আনন্দের দীপ যেন অকস্মাৎ বর্ষার দমকা বাতাসে এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়াই সতীনাথের মনক্ষোভের কল্পনায় সে যে আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, সে কল্পনাও এখন তাহাকে খুব বেশী খুসী করিতে পারিল না। আসলে, মুরারির চিত্তের কোন দৃঢ়তা ছিল না। সে যেমন অল্পেই উত্তেজিত হইয়া উঠে, অল্পেই আশা পায়, তেমনি অতি সামান্য কারণেই আবার ভরসা হারাইয়া বসে। ঝড়ঝঞ্ঝা এড়াইয়া সুখী লক্কা পায়রার মত ঘুরিয়া বেড়ানই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য। নিজের সাজসজ্জা আমোদ প্রমোদ লইয়াই তাহার দিন কাটিয়া চলিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্র পৃষ্ঠপ্রদর্শনের নীতি এতদিন তাহার আদর্শ থাকায়, পরীক্ষাগারের দ্বারে তাহাকে পদপ্রবেশ করাইতে হয় নাই। সারা বৎসর গাড়ী চড়িয়া স্কুল করিয়া সেই সঙ্কটের মুহূর্ত্তে চিরদিনই সে সরিয়া পড়িয়াছে।

আজও সে সনাতন নীতির কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা গেল না। তারাসুন্দরীর অতর্কিত অন্তর্ধানে সে মনে মনে খুসীই হইল। যাক্, উপস্থিত বিপ্লবের দায় এড়াইল, তার পর সতীদা তাহাদের খোঁজ করিয়া বাহির করিতে পারে, তখনকার আত্মরক্ষার উপায় তখন মিলিবে। সতীনাথের বিবাহ-সংবাদ রটনার কৈফিয়ৎ যদি তাহাকে দিতেই হয়, সে সব দোষ জেঠা মহাশয়ের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবে। তিনি অবশ্যই অস্বীকার করিতে যাইবেন না ; সতীনাথও সে সম্বন্ধে তাঁহার কাছে কৈফিয়ৎ লইতে পারিবে না। এখন ত সে খুঁজিয়াই বাহির করুক, প্রয়োজন হয় মুরারিও না হয় তাহার সাহায্য করিবে। ইহাতে এক ঢিলে দুই পাখীই মরিবে। সতীও হাতে আসিবে, জেঠা মহাশয়ও হাতে থাকিবেন।

উপস্থিত ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। তাই বুদ্ধিমান মুরারি বাহাদুরী লইবার জন্য বিষয়টা রুদ্রকান্তের গোচর করিতে বিলম্ব করিল না। রুদ্রকান্ত শুনিয়া খুসীর চেয়ে বিস্মিতই বেশী হইলেন। এত সহজে কার্য্যোদ্ধার হইবে, তিনি আশাও করেন নাই। শত্রু এত দুর্ব্বল জানিলে তিনি হয়ত নিজের হাতে অস্ত্রধারণও করিতেন না। বহুদিনের পর গৃহে প্রত্যাগত পুত্রের সহিত আশু মনোমালিন্য ঘটিবার প্রবল অন্তরায় নিজে হইতেই সরিয়া যাওয়ায় খুসীই হইলেন। মুরারি এই সুযোগে ম্যাকেবের বাড়ীর ঘড়ি ও নূতন প্যাটার্ণের চেন কিনিয়া আনিলে, মূল্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া চেক সহি করিয়া দিলেন। এবং সারাদিন দাবার বড়ে টিপিয়া টিপিয়া মুরারির প্রাণান্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম ঘটিলেও তাঁহাকে এতটুকু ক্লান্ত হইতে দেখা দেখা গেল না।

বাড়ী ফিরিয়া অপ্রকৃতিস্থ সতীনাথ যখন বিপিনের দ্বারা অসুস্থতার সংবাদে কাহাকেও বিশ্রামে বাধা জন্মাইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিয়া শয়নকক্ষে বিছানার ভিতর আশ্রয় লইল, তখন অপ্রয়োজন বোধে মুরারির মনে কোন দুর্ভাবনাই জাগে নাই। মনে করিল, প্রিয়বর্জ্জিত বাড়ীখানার অবস্থা দেখিয়াই সে বুঝিয়াছে, পাখী শিকল কাটিয়াছে। থাক, দুই দণ্ড কাঁদিয়া লউক।

কিন্তু সারাদিনের মধ্যেও যখন তাহাকে খোঁজ পড়িল না, "কোথা গেল" "কেন গেল" জিজ্ঞাসার পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইল না, তখন বিস্ময়ের সহিত মুরারির চিন্তাও হইল। ব্যাপার কি ? একটা খবর পর্য্যন্ত না ? এতটা বৈরাগ্য ত সম্ভব নয়। একবার মনে হইল, তারাসুন্দরী হয়ত পত্র দ্বারা সকল কথা তাহাকে জানাইয়াছেন। কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া হইবে ? গতকল্যও যে সে

সতীনাথের পত্র পাইয়াছিল। সকল বিষয়ে সে যে অনভিজ্ঞ, পত্রের ভাষায় তাহাই ত প্রমাণ হয়। আর, তারাসুন্দরী তাহার ঠিকানা জানেন না, সতীদা নিশ্চয়ই পত্র লেখে নাই। তবে ?

জল অগ্রসর না হইলে তৃষ্ণাকেই অগ্রসর হইতে হয় ; সতীনাথের নিকট হইতে আহ্বান আসিবার আশা ছাড়িয়া দিয়া মুরারি নিজেই তাহার কাছে গেল, গিয়া বিস্মিত হইল। সতীনাথকে শয্যাগত হা হতোস্মি কান্না-কাটী করিতে দেখা ত গেলই না,বরং তাহাকে টেবিলের উপর সোজা হইয়া বসিয়া একখানা বন্ধ লেফাফায় ডাক-টিকিট আঁটিতে দেখা গেল।

বিস্ময়বিমূঢ় মুরারি একখানা চেয়ার টানিয়া কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল, "অসুখ শুনে ভাব্‌না হল, ভাল আছ ত এখন ?"

সতীনাথ খামের উপর ঠিকানা লিখিতে লিখিতে কহিল, "চমৎকার !"

মুরারি একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কণ্ঠস্বরে কাতরতা মাখাইয়া, সহানুভূতির ভাবে কহিল, "নিজে ও ব্যবসায়ী না হই,তবু বুঝি সব সতীদা। এত বড় বিশ্বাস-ঘাতকতার কায, একি আর তাঁদের মত মহাত্মা লোকের উপযুক্ত হয়েচে !"

কোন বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে, বিষয়ের গুরুত্ব রক্ষার জন্য মুরারি সাধুভাষা ব্যবহার করিত। নহিলে বিষয় হাল্‌কা হইয়া যায় বলিয়াই তাহার বিশ্বাস। সতীনাথ বিপিনকে ডাকিয়া চিঠিখানা ডাকে ফেলিয়া দিবার আদেশ দিয়া, একখানা অনাবশ্যক বই খুলিয়া কহিল, "ও কথা ছেড়ে দাও মুরারি। যিনি যা ভাল বুঝবেন, তা না কর্‌তে পার্‌বেন কেন? তিনি এখন রইলেন কোথায় ? জামাইবাড়ী ?"

প্রশ্নে মুরারি আকাশ হইতে যেন হইয়া মাটিতে পড়িল। তবু বিস্ময়সূচক প্রশ্নটাকে সে ওষ্ঠের বাহির হইতে দিল না। পুস্তকপৃষ্ঠায় বদ্ধদৃষ্টি সতীনাথের নত মুখের উপর বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি স্থির করিয়া সে কহিল, "খবর সব শুন্‌লে কোথায় ? আমি ত ভয়ে তোমায় জানাতেই সাহস করি নি।"

সতীনাথ মুখ না তুলিয়াই তীব্রস্বরে কহিল, "ঐ-টুকুই তোমার বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা। ভয়টা কিসের ? মনে করেছিলে, খবর পেলে বুক ফেটে মরে যাব ?"

তারাসুন্দরীর আকস্মিক অন্তর্দ্ধান সংবাদে, ঠিক অতটা না হউক, উপস্থিত অবস্থার মত সতীনাথকে সুস্থ দেখিবার আশা সত্যই মুরারির ছিল না। তাই বিনা প্রতিবাদে সে নিরুত্তর রহিল। তাহাকে অধিকক্ষণ কৌতূহল সহ্য না করাইয়া সতীনাথ আপনা হইতেই কহিল, "এ ত আর রামা শ্যামার বিয়ে নয়, ম্যাজিষ্ট্রেটের বিয়ে, খবরের কাগজেই খবর দিয়েচে। ভালই হল। মনে একজনকে রেখে বাইরে অন্যের স্ত্রী হওয়া তার উচিত হত না। আমিও সে কর্ম্মভোগের দায় থেকে বেঁচেছি।"—বলিয়া মৃদু হাসিয়া, উঠিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। সে হাসি যে হাসি নয় রোদনের রূপান্তর, মুরারির চোখেও তাহা ধরা পড়িল।

হতভম্ব মুরারি বুঝিতে পারিল না, সে এখন কি বলিবে বা কি করিবে। কল্যাণী ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী ? তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে ? অসম্ভব ! নিজের চোখে দেখিলেও যে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এত বড় অসম্ভব কি কখনও সম্ভব হয় ? তারাসুন্দরীর সে দিনের সেই হতাশাঙ্কিত মুখ তাহার মনে পড়িল। সে মুখ দেখিয়া স্বার্থপর মুরারিরও যে মায়া হইয়াছিল, মিথ্যা বলিতে অনুতাপ হইতেছিল। তিনি যে সতীনাথকে কতখানি বিশ্বাসের সহিত অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে মুখে যে স্পষ্ট করিয়া তাহার সংবাদ লেখা ছিল। তবে এত শীঘ্র এমন অসম্ভব সম্ভব হইল কিসে ? সতীকে বিবাহিত জানিয়া, মেয়ের বিবাহের জন্য চেষ্টা করা অবশ্যই আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট পাত্র আসিয়া জুটিল কোথা হইতে ? এ সংযোগ করিয়া দিল কে ? অবশ্য সতীনাথকে ঈর্ষান্বিত করিয়া দুঃখ দিবার ইচ্ছায় সেও একবার এক নবনিযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট-পদ-

প্রাপ্তের সংবাদ দিয়াছিল। কিন্তু সে ত মিথ্যা। তাহার ত কোন ভিত্তিই নাই। তবে সংবাদপত্র এ মিথ্যা সংবাদ দিবে কেন? তিনিই বা এমন অতর্কিতভাবে অন্তর্হিত হইলেন কেন? তবে সত্যই কি ইহার ভিত্তি আছে? মুরারি মনকে বুঝাইয়া প্রবোধ দিল, ভবিতব্যতা ইহাকেই বলে। এই জন্যই হয়ত, সে উপলক্ষ হইয়া, ইহাদের মিলনপথে প্রতিবন্ধকতা ঘটাইতে চাহিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে একবার সংসারের উপর গভীর বৈরাগ্যে সে গীতাপাঠ ও পূজার্চ্চনায় মন দিয়াছিল। কিন্তু বৈরাগ্য স্থায়ী না হওয়ায় এখন সে সব ছাড়িয়া দিয়াছে। আজ গীতারই একটা বিস্মৃতপ্রায় পদ তাহার মনে পড়িয়া গেল—"নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্।" স্বয়ং ভগবানই এই কথা বলিতেছেন। মানুষ কি নিজে কিছু করে? —তিনি যা করান তাই করা যায়।

সহসাগত ভগবদ্‌বিশ্বাসে সে পুলকিত হইল। পিসিমাও বলেন, "জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।" আজ একথার যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া মন তাহার শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। নিজের অপরাধের ভার নির্ব্বাক বিধাতাপুরুষের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার এমন সুন্দর সুযোগ আবিষ্কার করিয়া সে খুসী হইল। শুধু মুরারি কেন, জগতের এক-তৃতীয়াংশ লোকেই এমন সুযোগ লইতে পাইলে সহজে ছাড়ে না। 'আমার কর্ম্মফল' বলার চেয়ে, 'ভগবানের লেখা' বলিতে আমরা অধিক তৃপ্তি পাইয়া থাকি। যেন আমার কোন দোষই ছিল না, ভগবান আড়ি করিয়া আমার উপর বাদ সাধিতেছেন—এমনি ভাবখানাই ইহার ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকায়, নিরুপায় স্থলে মনও সান্ত্বনা পায়।

রুদ্রকান্ত ও সতীনাথের মধ্যে বিবাদের আশু সম্ভাবনা না ঘটায় উপস্থিত বিপ্লবের দায় এড়াইয়া মুরারি খুসী হইল। বিলম্বেও সে বিপ্লবের সম্ভাবনা আর নাই জানিয়াও, সে এখন খুব বেশী দুঃখিত হইল না। কিছু না হোক্, সতীনাথ ত দিন কতক 'হতাশের আক্ষেপ' গাহিয়া বেড়াক্! সেও নিমিত্তের ভাগী হইল না, ভালই হইল। যেদিক দিয়াই হউক, সতীর ক্ষতি ত হইয়াছে, উপস্থিত ক্ষেত্রে এই-টুকুই তাহার লাভ।

ক্রমশঃ

শ্রীইন্দিরা দেবী।

দুটি পাখী

প্রবাস হইতে বহুদিন পরে গৃহে আসিলাম ফিরে,
লাজে বধূ মোর ঘোমটা টানিয়া পলাইয়া গেল ধীরে;
দেখা হতে দেরী,—বাসনা বড়ই কণ্ঠ শুনিতে তার,
সহকার-শাখে 'বউ কথা কও' করে ওঠে ঝঙ্কার।

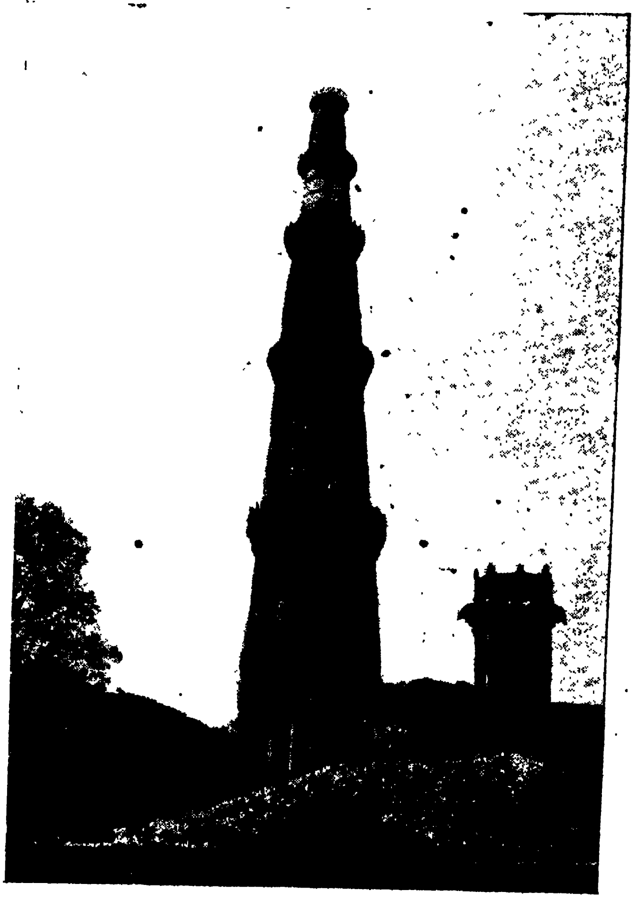
প্রবাসে ফিরিতে, প্রিয়ার নিকট বিদায় লইতে গিয়া,
কঠিন প্রয়াসে পারি না রাখিতে আঁখিজল নিবারিয়া;
'চোখে কি পড়িল' বলি, ছল করি, আঙিনায় আসিলাম,
নিম্বের শাখে 'চোখ গেল' করে পরিহাস অবিরাম।

শ্রীকালিদাস রায়।

কুতব মিনার

কালচক্রের আবর্ত্তনে দিল্লীর ভাগ্যাকাশে কত না পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পৃথ্বীরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী হইতে হিন্দু-আধিপত্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তার পর প্রায় ছয় শত বৎসর কাল এই দিল্লী নগরী মুসলমান জাতির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। এখানে যে সকল সাম্রাজ্যের, যে সকল প্রবলপরাক্রান্ত জাতির উত্থান পতন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সকলেরই কিছু না কিছু কীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মুসলমান নৃপতিগণ হিন্দুরাজগণের দুর্গাদি কীর্ত্তিস্তম্ভের উপর এরূপভাবে তাঁহাদের কৃতিত্ব ফলাইয়া গিয়াছেন, হিন্দু-দেবমন্দিরগুলিকে এরূপে মস্‌জিদে পরিণত করিয়া দিয়াছেন, যে এখন আর সে হিন্দুকীর্ত্তির অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। দিল্লীর জগৎ-প্রসিদ্ধ কুতব মিনার মুসলমান নৃপতিগণ কর্তৃক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও, ইহা হইতে হিন্দু-স্মৃতি একেবারে লোপ পায় নাই; ইহা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই শিল্প-নৈপুণ্য প্রকটিত করিয়া অদ্যাপি জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

এই মিনার বর্ত্তমান শাজাহানাবাদ অর্থাৎ দিল্লী সহরের আজমীর তোরণ হইতে প্রায় ১১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে কুতবুদ্দিন আইবাক নির্ম্মিত 'কাবাৎ-উল্-ইস্‌লাম্' মস্‌জিদ্ এবং চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি হর্ম্ম্য আছে। ১০৫২ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় অনঙ্গপাল যে স্থানে তাঁহার লালকোট দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই মিনারটি সেইস্থানেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা এখন পূর্ব্বাবস্থায় নাই। পূর্ব্বে ইহার সাতটি স্তর ছিল। ভূমিকম্পে উপরকার দুইটি স্তর ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, পঞ্চম স্তরের উপরিভাগ এখন পিতলের গরাদে দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাতটি স্তর সমেত ইহার উচ্চতা প্রায় ৩০০ ফিট ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার উচ্চতা এখন প্রায় ২৪১ ফিট। ইহার সকল স্তরগুলি সমান নহে। প্রথম



কুতব মিনার ও স্মিথ সাহেব নির্ম্মিত গম্বুজ

স্তর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; পরিমাণ প্রায় ৯৮ ফিট। উপরের অন্যান্য স্তরগুলি ক্রমে ছোট হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় স্তর প্রায় ৫৩ ফিট, তৃতীয় স্তর ৪১ ফিট, চতুর্থ স্তর ২৫ ফিট এবং পঞ্চম স্তর পিতলের গরাদে সমেত প্রায়

২৪ ফিট উচ্চ। ইহার ভিত্তিমূল প্রায় ৫০ ফিট এবং শিখরদেশ প্রায় ১০ ফিট পরিমিত। ইহার অভ্যন্তর-ভাগ তলদেশ হইতে উপর পর্য্যন্ত ঘূর্ণায়মান সোপান-শ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। সর্ব্বসমেত ইহার সোপান-সংখ্যা ৩৭৮। তন্মধ্যে প্রথম স্তরে ১৫৬, দ্বিতীয় স্তরে ৭৮, তৃতীয় স্তরে ৬২, চতুর্থ স্তরে ৪১ এবং পঞ্চম স্তরে ৪১টি সোপান আছে।

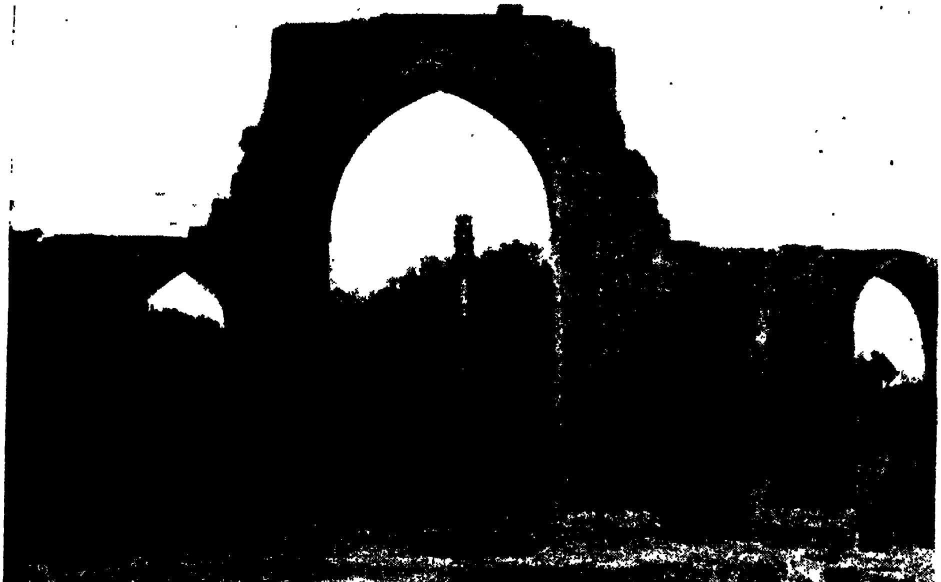
এই মিনারটি কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এ সম্বন্ধে নানা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। 'তারিখ্-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে এই মিনারটিকে সুলতান সাম্সুদ্দিন্ আল্তামাস্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা আছে। কিন্তু ইহা যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। কেন না এই মিনারটি যে তাঁহার পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ফতুহাৎ ফিরোজশাহী' গ্রন্থে এই মিনার 'মজুদ্দিন্-কা-লাট' নামে অভিহিত। সুল্-তান্ মহম্মদ ঘোরীর অপর নাম মজুদ্দিন্। ১১৯৩ খৃঃ অব্দে তিরোরীর যুদ্ধে ইনি পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন, এবং এই কারণেই বোধ হয় ইহা তাঁহারই নামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, মজুদ্দিন্ই এই মিনারের ভিত্তি গঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভুল। ইঁহার দিল্লী বিজয়ের অব্যবহিত পরেই পৃথ্বীরাজের দেবমন্দিরকে 'কাবাত্-উল্-ইস্লাম্' মস্জিদে পরিণত করিতে আরম্ভ করা হয়। যদি ইনি এই মিনারের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে ইহা এই মস্জিদ্গাত্রেই সংলগ্ন থাকিত, দূরে অবস্থান করিত না।

অধুনা ইহাকে কুতব মিনার নামে অভিহিত হইতে দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইহা কুতবুদ্দিন্ আইবাক্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। কানিংহাম সাহেব এ সম্বন্ধে সাধ্যমত প্রমাণও প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি সন্দেহ দূর হয় নাই।

কেহ কেহ বলেন যে সা-কুতব্-ই-দীন্ নামক জনৈক ফকিরের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে, সুল-তান কুতবুদ্দিন কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। ক্যান্‌শ সাহেব এ মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, একজন ফকিরের নামানুসারে ইহার নামকরণ হওয়া অপেক্ষা সুলতান কুতবুদ্দিনের নামানুসারে হওয়াই বেশী সঙ্গত। জানি না ইহার মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে; তবে কেবল নাম দেখিয়াই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। দিলু রাজা দিল্লীর প্রতিষ্ঠাতা নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে এ স্থান যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল। ইহাকে তখন ইন্দ্রপ্রস্থ বলা হইত। তাঁহার পরেও এখানে অনেক প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি রাজত্ব করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখানে এক একটি নূতন সহর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে ফিরোজশাহাবাদ, তোগলাকাবাদ, শাজাহানাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোনও নামই একাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় নাই; সেই দিলুরাজার নামানুসারে, ইহাকে আজও পর্য্যন্ত দিল্লী নামে অভিহিত করা হইতেছে। সুতরাং কুতব-মিনার নাম দেখিয়াই, মিনারটি কুতবুদ্দিন্ আইবাক-নির্ম্মিত, একথা বলা উচিত হয় না; নামকরণ অন্য কারণসম্ভূত হইতে পারে।

আমরা দেখিতে পাই, মুসলমানেরা যে সকল হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলিই বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কি সুলতান আলা-উদ্দিন খিলিজি এই মিনারের অনুকরণে, ইহা অপেক্ষা যে বৃহত্তর মিনার নির্ম্মাণের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও একটি বেদীর উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু কুতব-মিনার একেবারেই ভূমি হইতে উত্থিত, কোনও বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কেবল ইহাই নহে, আমরা আরও দেখিতে পাই যে, এই মিনারের প্রথম স্তরের দ্বার উত্তরাভিমুখ এবং অপরাপর স্তরের দ্বার পশ্চিমাভিমুখ। উত্তরাভিমুখে হর্ম্ম্যাবলীর দ্বার নির্ম্মাণ করাটা যে তখনকার মুসল-মানগণের রীতি ছিল না, তাহা তাঁহাদের মস্জিদাদির দ্বার দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। মুসলমানগণের

প্রধান তীর্থক্ষেত্র মক্কানগরী ভারতের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সে কারণ ইঁহারা হয় পূর্ব্বাভিমুখে, না হয় তদ্বিপরীত পশ্চিমাভিমুখে মস্‌জিদাদির দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। যদি এই মিনার মুসলমান নৃপতিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই একটা বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত এবং ইহার প্রথম স্তরের দ্বারদেশ কখনই উত্তরাভিমুখ হইত না। এই মিনারের সন্নিকটে কতকগুলি ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির গাত্রে যে সকল লিপি খোদিত রহিয়াছে, মিনারের প্রথম স্তরের গাত্রেও সেই সকল লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেও অনুমান হয় যে, এই সকল প্রস্তর-মূর্ত্তি মিনার-গাত্রেই সংস্থাপিত ছিল এবং মুসলমান-নৃপতিগণ তাহারই উপরে তাঁহাদের বিজয়-কীর্ত্তি



কাবাৎ-উল-ইসলামের ভগ্নাবশেষ

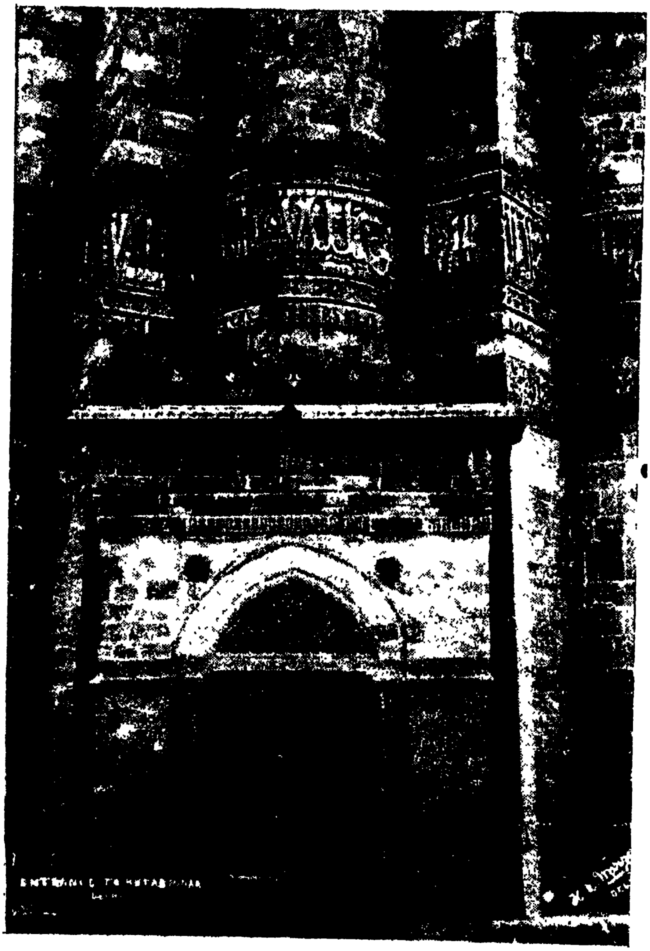
উপরন্তু ইহার প্রথম স্তরের দ্বারদেশের উপরিভাগে রজ্জুর ন্যায় দুই একটি সরু সরু দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুগণের দেবমন্দিরে যেরূপ বড় বড় ঘণ্টা বাঁধা থাকে, পূর্ব্বে এখানেও সেইরূপ ঘণ্টা বাঁধা ছিল। মুসলমান নৃপতি-গণ যে এখানে ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। অবশ্য এ দাগ অন্য কোনও কারণসম্ভূত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার আকৃতি ও অবস্থা দেখিয়া ঘণ্টা বাঁধা থাকার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া মনে হয়।

লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কালক্রমে উহা ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় অথবা অন্য কোনও কারণে, উহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া, ঐ সকল কীর্ত্তিকাহিনী পুনরায় মিনারগাত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মিনার-গাত্র প্রস্তরমূর্ত্তি দিয়া পরিশোভিত করা মুসলমানগণের কখনও রীতি ছিল না, উহা হিন্দুগণেরই চিরপ্রচলিত প্রথা।

এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, এই মিনারের ভিত্তি যে মুসলমান নৃপতিগণ কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল, তাহা কোনও ক্রমেই বিশ্বাস হয় না। 'আসার্-উস্-

সানাদিদ্' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, চৌহান বংশীয় রায়-পিথুরা বা পৃথ্বীরাজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে দিল্লীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার কন্যা সূর্য্যের উপাসিকা ছিলেন। যমুনা নদী সূর্য্যদেবের কন্যা বলিয়া হিন্দুগণের বিশ্বাস, এবং সেই জন্য যমুনাদর্শন সূর্য্যোপাসকদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। হিজিরী ৫৬১ শকে (১১৭৩ খৃঃ অব্দে) পৃথ্বীরাজ যখন দিল্লীতে ধর্ম্মমন্দির ও দুর্গাদি প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়েই তিনি তদীয় কন্যার প্রত্যূষে যমুনাদর্শন ও সূর্য্যোপাসনা করিবার জন্য এই মিনারের প্রথমস্তর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এ কথা সকল ইতিহাসবেত্তা স্বীকার না করিলেও, সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তই আপাততঃ সত্য বলিয়া মনে হয়।

সন্দেহ হইতে পারে, যদি ইহা পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে কুতব মিনার নামে কেন অভিহিত হইল। আরব্য ভাষায় 'কুতব' শব্দের অর্থ উত্তর দিক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হর্ম্ম্যাদির দ্বার উত্তর দিকে করাটা মুসলমানগণের রীতি ছিল না। কুতবুদ্দিন যখন এই মিনারের সন্নিকটে তাঁহার "কাবাত্-উল্—ইস্লাম্' মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করেন, তখন এই মিনারের দ্বার উত্তর দিকে থাকায়, ইহার একটা বিশেষত্ব ঘটে এবং সেই হেতু এই সময় হইতেই ইহাকে "কুতব-মিনার" (অর্থাৎ উত্তর-দুয়ারী-মঞ্চ) নামে অভিহিত করা হয়।



মিনারের প্রবেশদ্বার ও তদুপরি লিখিত কোরাণ সরিফ।

ইহার প্রতিস্তরের গাত্রে মুসলমানগণের শুক্রবারের নমাজ পড়িবার মন্ত্র এবং তৎসঙ্গে যাঁহার আজ্ঞায় ও যাঁহার দ্বারায় ইহার স্তরগুলি নির্ম্মিত বা সংস্কৃত হইয়াছে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়াদি আরব্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা আছে। ইহার প্রথমস্তরের লিপিমালা কালক্রমে অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া যায়। স্মিথ সাহেব উহার সংস্কার করিবার সময় বর্ণমালা গুলিকে স্থানে স্থানে এরূপ ভাবে সংযোজিত করিয়া দেন যে উহা দেখিতে সুদৃশ্য হইলেও, ভাষান্তর্গত কোনও বর্ণে পরিণত হয় নাই। সুতরাং এই লিপিমালা পাঠ করা এখন বড়ই দুরূহ। তবে বর্ণগুলি অনুমান করিয়া যতদূর পাঠ করা যায়, তাহাতে দেখা যায়, এখানে মজুদ্দিন ও কুতবুদ্দিনের বিজয় কাহিনী এবং তৎসঙ্গে 'কাবাত্-উল্—ইস্লাম্' মস্জিদের প্রধান

পুরোহিত ফজিলের নাম লিখিত আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের লিপিমালা হইতে বলিতে পারা যায় যে, সুলতান্ সাম্‌সুদ্দিন্ আল্‌তামাস্ কুতবুদ্দিনের মস্‌জিদ্‌কে বিস্তারিত করিয়া উহার তিন দিকে তিনটী দরজা করিয়া দেন এবং হিজরী ৬১৭ শকে (১২২৯ খৃঃ অব্দে) এই মিনারের উপরকার চারিটি স্তর নির্ম্মাণ করেন। নির্ম্মাণকালে মহম্মদ আমিরকো প্রধান মিস্ত্রী ছিলেন। লিপিমালার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য আরবী বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই লিপি পাঠে জানা যায়, হিজরী ৭৮৬ শকে (১৩৬৮ খৃঃ অব্দে) ফিরোজ শাহা এই মিনারের জীর্ণ স্থানগুলি সংস্কার করান এবং ইহার উপরে দুইটি স্তর নির্ম্মাণ করিয়া ইহার উচ্চতা আরও বাড়াইয়া দেন। কিছুকাল পরে পুনরায় এই মিনারের সংস্কার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। প্রথম স্তরের



প্রথম স্তরের উপরিভাগে স্মিথ সাহেব কর্ত্তৃক সংস্কৃত লিপিমালা

মুসলমান ঐতিহাসিক শামসুরাজ-উকেফ্ বলেন যে, সুলতান আল্‌তামাস্ এই মিনারের উপরকার চারিটি স্তর নির্ম্মাণ করেন বলিয়াই 'তারিখ ই ফিরোজশাহী' গ্রন্থে এই মিনারটি সামসুদ্দিন আল্‌তামাস্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার ভিত্তি তাঁহা কর্ত্তৃক গঠিত হয় নাই বা এরূপ সিদ্ধান্ত উপলব্ধ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল না। ইহার পঞ্চম স্তরের গাত্রে লিপিগুলি আরবী অক্ষরে অথচ পারস্য ভাষায় লিখিত। ইহা যে সময় লিখিত হইয়াছিল, বোধ হয় সেই সময় পারস্য ভাষারই বিশেষ প্রচলন ছিল। কেবল অন্যান্য স্তরের উপরিভাগে লিখিত আছে, হিজরী ৯২১ শকে (১৫০৩ খৃঃ অব্দে) বহ্লোল লদীর পুত্র সেকন্দর শাহার রাজত্বকালে খুবাস্ খাঁর পুত্র ফতে খাঁ এই মিনার সম্পূর্ণ সংস্কার করেন।

বারবার সংস্কার করিলে কি হইবে, ফিরোজ শাহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখা বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না। হিজরী ১১৯৭ শকে (১৭৭৯ খৃঃ অব্দে) ভীষণ ঝড় ও ভূমিকম্পে ফিরোজ শাহা নির্ম্মিত উপরকার দুইটি স্তর এবং পঞ্চম স্তরের কিয়দংশ ধূলিসাৎ হইয়া যায়। হিজরী ১২৪৭ শকে (১৮২৯ খৃঃ অব্দে)

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে মেজর স্মিথ্ সাহেব ইহার সম্পূর্ণ সংস্কার করেন এবং উপরকার দুইটি স্তরের পরিবর্ত্তে তৎপরিকল্পিত একটি নূতন গম্বুজ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন-কালে, স্মিথ সাহেবের এই নূতন গম্বুজটি স্থানান্তরিত করিয়া, পঞ্চম স্তরের উপরিভাগ পিতলের গরাদে দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হয়। এই গম্বুজটি এখন এই মিনারের পার্শ্বে সযত্নে রক্ষিত আছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পরলোকগত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

গয়ার সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র আর ইহলোকে নাই। তিনি পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকে কাঁদাইয়া গত ২রা মে তারিখে, ৫৬ বৎসর বয়সে, অনন্তের পথে চলিয়া গিয়াছেন।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী নৈহাটী গ্রামের বিখ্যাত মিত্র বংশে উপেন্দ্রচন্দ্র ১৮৬০ সালের ২৮ শে মার্চ্চ দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা ভবানী-পুরই তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পিতা ৺যাদবচন্দ্র মিত্র হাইকোর্টের প্রধান অনুবাদক ছিলেন ও তিনি ভবানীপুরেই বাস করিতেন। উপেন্দ্রচন্দ্রের পিতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী বহুকাল হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর উপেন্দ্রচন্দ্রের মাতা নাবালক দুই পুত্র ও তিন কন্যা লইয়া তাঁহাদের নৈহাটীর পৈতৃক বাটীতে আসিয়া বাস করেন। তথায় তিনি অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া তিনটি কন্যার বিবাহ দেন ও দুইটি পুত্রকে লেখাপড়া শেখান। তিনি ১৩০৮ সালের ভাদ্রমাসে পরলোক গমন করেন। একে একে তাঁহার দুইকন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার পশ্চাদ্-গমন করিয়াছেন; সেদিন উপেন্দ্রচন্দ্রও তাঁহাদের সহগামী হইয়াছেন।

উপেন্দ্রচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বুদ্ধিমান ও প্রতিভা-শালী ছাত্র ছিলেন। তিনি হুগলী কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বর্দ্ধমান বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি লাভ করেন। এফ্-এ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তিনি কুচ্‌বিহার রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্বর্গীয় রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, সি-আই-ই মহোদয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা-সুন্দরীকে বিবাহ করেন এবং অত্যল্প দিনেই পুত্রলাভ করেন; কিন্তু সে পুত্রটি সূতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করে।

উপেন্দ্রচন্দ্র এফ্-এ পরীক্ষায় "লাহা" বৃত্তি লাভ করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন ও তাঁহার স্বর্গীয় মাতুল সুবিখ্যাত ডাক্তার ৺ভগবচ্চন্দ্র রুদ্র এম্-এ, এম্-ডি মহাশয়ের বাড়ীতে থাকেন। এখন যে বাড়ীতে শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন কবিরাজ মহাশয় আছেন, তখন ডাক্তার রুদ্র মহাশয় সেই বাড়ীতেই থাকিতেন। উপেন্দ্রচন্দ্র ১৮৮১ সালে বি-এ ও ১৮৮৩ সালে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। ঐ ১৮৮৩ সালেই তিনি বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন আলিপুর জজ আদালতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন ও তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ এটর্ণি শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সাহায্যে উর্দ্দু ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্রচন্দ্রের মাতুল ৺গিরিশচন্দ্র রুদ্র মহাশয় তখন গয়ার চাকরী করিতেন। তিনি তাঁহার ভাগিনেয়কে গয়ার লইয়া যান। তখন ৺উমেশচন্দ্র সরকার মহাশয়

তথাকার সরকারী উকীল ছিলেন। উমেশ বাবু উপেন্দ্র চন্দ্রের শ্বশুর ৺কালিকাদাস দত্ত মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। গিরিশ বাবু তাঁহার বাড়ীর সম্মুখেই থাকিতেন। উমেশ বাবু উপেন্দ্রচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কাজ শিখাইতে লাগিলেন। উমেশ বাবুর সাহায্যে উপেন্দ্রচন্দ্র দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। উমেশ বাবুর মৃত্যুর পরে বিহারী উকীল ৺ভূপসেন সিং গয়ায় সরকারী উকীল হন। ভূপসেন বাবুও উপেন্দ্র-চন্দ্রের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া উপেন্দ্রচন্দ্রকে সাহায্য করিতে লাগিলেন; অবশেষে উপেন্দ্রচন্দ্র স্বীয় বুদ্ধিমত্তা মেধা, মনীষা ও অদম্য উৎসাহ বলে ক্রমে ক্রমে গয়ার উকীলদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিলেন। সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্ম্মপরায়ণতা তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে বড়ই প্রবল ছিল। স্বীয় ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্র, বিশেষতঃ মাতা ও বিধবা ভগিনী, তাঁহার বিশেষ স্নেহ ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্কন্যাগণকে তিনি সযত্নে লালনপালন করিতেন। কাহারও প্রতি উপেন্দ্রচন্দ্রের কর্ত্তব্য পালনের কোন ত্রুটি হয় নাই। মাতা ও ঐ বিধবা ভগিনী যখন যাহা বলিতেন, উপেন্দ্র-চন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেন। সহৃদয়তা, সচ্চরিত্রতা ও স্নেহশীলতা গুণে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বাঙ্গালী, কি বিহারী, সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত ও আন্তরিক ভালবাসিত। তাঁহার কোন নেশা ছিল না। তিনি কখনও তামাকটি পর্য্যন্তও খান নাই। তিনি নির্ব্বিরোধী, নিরপেক্ষ ও শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন; কোন আড়ম্বর বা জাঁক-জমক বা বিলাসিতা তাঁহার চক্ষুশূল ছিল। তিনি খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। কখনও কোন বৈদেশিক দ্রব্য ব্যব-হার করিতেন না। স্বদেশী আন্দো-লনের সময় "আনন্দ ভাণ্ডার" নাম দিয়া, বাড়ীর সম্মুখেই, স্বদেশী দ্রব্যের এক দোকান খুলিয়াছিলেন, তাহা এখনও চলিতেছে। তাঁহার চরিত্রবলে তিনি গয়া ও সন্নিকটবর্ত্তী সমস্ত অধিবাসিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধি-কার করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কেহই কোন কার্য্য করিত না।



পরলোকগত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

এক সময়ে মনীষী স্বর্গীয় লোকেন্দ্র-নাথ পালিত গয়ার ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিলেন। উপেন্দ্রচন্দ্র যেমন তাঁহার প্রতি অসাধারণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, লোকেন্দ্র-

নাথও তদ্রূপ উপেন্দ্রচন্দ্রের গুণে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। মাননীয় বিচারপতি হোমউড্ সাহেব উপেন্দ্রচন্দ্রের গুণগ্রাম দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত সর্ব্বদা বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন।

উপেন্দ্রচন্দ্র গয়ার উকীল সভার সভাপতি, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, লেডি এল্‌গিন জেনানা হাঁসপাতাল কমিটির এবং King Edward VII Memorial কুষ্ঠাশ্রমের সদস্য ছিলেন ও নানা দেশহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল।

উপেন্দ্রচন্দ্রের পারিবারিক জীবন বড়ই সুন্দর ও মনোহর ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে সাংসারিক অর্থ-কৃচ্ছতা ও নানা কষ্ট তাঁহার মাতার হৃদয়কে কিছুমাত্র ম্রিয়মাণ করিতে পারে নাই। তিনি সর্ব্বদা স্নেহ সহকারে সন্তানগণের লালন পালন ও পরিপোষণ করিতেন।

অজয়নদতীরস্থ কাটোয়া নগরে অজয়াসুন্দরী জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার পিতা, তাঁহার নাম "অজয়া" রাখিয়াছিলেন। উপেন্দ্রচন্দ্রের সহিত বিবাহের পরে এক ভগিনীপতি আদর করিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন "অমিয়া"। অজয়াসুন্দরী ঐ উভয় নামেরই সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। কোনও সময়ে উপেন্দ্রচন্দ্রের ঐ ভগিনীপতিকে কর্ম্মসূত্রে ১২।১৩ দিনের জন্য নৈহাটী থাকিতে হয়। তখন অজয়াসুন্দরীর বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ হইবে। নৈহাটীর বাড়ীতে, তাঁহার বৃদ্ধা শাশুড়ী, তাঁহার ছোট ননদ ও তিনি ছিলেন। সাংসরিক অসচ্ছলতা নিবন্ধন প্রায় সমস্ত গৃহকার্য্যই অজয়াসুন্দরীকে করিতে হইত। তখন কার্ত্তিক মাস। তাঁহার নন্দাইকে বেলা ৮টার মধ্যে প্রস্তুত হইয়া কর্ম্মস্থান যাইতে হইত। অজয়া রাত্রি ৪টার সময় শয্যা হইতে উঠিয়া স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া বেলা ৮টার পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইতেন। শীত বা শারীরিক কষ্ট তাঁহাকে কোন ক্রমে পরাভূত করিতে পারে নাই। অজয়াসুন্দরী তাঁহার মা ও ননদদিগকে সহোদরা ভগিনীর মত জ্ঞান করিতেন এবং সকলেই একসঙ্গে, একই সময়ে এক পাত্রে আহার করিতেন। এ পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যও তাঁহাদের কাহারও সহিত কোন প্রকার মনোমালিন্য হয় নাই। এই সুখ সৌন্দর্য্য, এই স্নেহ মমতার শীতলচ্ছায়া ত্যাগ করিয়া উপেন্দ্রচন্দ্রকে গয়ায় ওকালতী করিতে যাইতে হইল। উপেন্দ্রচন্দ্রকে বেশীদিন উহা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে হয় নাই। অত্যল্পকাল পরেই উপেন্দ্রচন্দ্র, তাঁহার মাতুলের মৃত্যু হইলে, তাঁহার মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ছোট ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া, ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে গয়ায় লইয়া যান। এখানে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অজয়াসুন্দরীর হৃদয়ের ও প্রকৃতির ক্রমবিকাশ হইতে লাগিল। অজয়াসুন্দরী উপেন্দ্রচন্দ্রের সংসার সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, অর্জ্জনে শোভাময়ী লক্ষ্মীস্বরূপিণী হইয়া দাঁড়াইলেন। উপেন্দ্রচন্দ্রও অজস্র অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন; চারিদিকে তাঁহার যশোগৌরব ছাইয়া পড়িল।

ইংরাজী ১৮৯৮ সালে আদালত প্রাঙ্গণের উত্তর ভাগে উপেন্দ্রচন্দ্র বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া, ১৩০৭ সালের আশ্বিন মাসে ঐ নূতন বাসগৃহে প্রবেশ করেন। যশোগৌরব, পসার-প্রতিপত্তি, পুত্র কন্যা, ধনধান্য, নানা সুখ সম্পদ লাভের মধ্যাহ্ন কিরণে তখন উপেন্দ্রচন্দ্রের হৃদয় উদ্ভাসিত। তিনি যখন কার্য্যভারে নিষ্পেষিত হইতেন, কর্ত্তব্যের গুরুতর ব্রত পালনে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন তখন তাঁহার পারিবারিক সুখের সমুজ্জ্বল রশ্মি তাঁহার সম্মুখে নিয়ত নিপতিত হইত। তাঁহার পরিশ্রম, পরিশ্রম বলিয়াই বোধ হইত না; তাঁহার সমুদয় ক্লেশই তাঁহার নিকট মধুর বলিয়া অনুভূত হইত। বিশেষতঃ অজয়াসুন্দরীর পবিত্র উদার চরিত্র, ও সুমধুর প্রেম, তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। তাঁহার বিস্তর দাসদাসী ছিল, তাহারা কার্য্য করুক বা না করুক, বা যত দোষই করুক, উপেন্দ্রচন্দ্র বা তাঁহার পত্নী কেহই তাহাদিগকে কিছুই বলিতেন না। কেহ তাহাদের কাহাকেও কিছু বলিলে তাঁহারা বিরক্ত হইতেন ও বলিতেন—"ভগবান আমা-

দিগকে উপলক্ষ করিয়া উহাদিগকে খাওয়াইতেছেন, তোমরা উহাদিগকে কিছু বলিও না।"

উপেন্দ্রচন্দ্রের ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বর প্রীতি তাঁহার গৃহস্থাশ্রমেই অঙ্কুরিত হয়। সেইখানেই ঈশ্বরের প্রীতি "হইয়ে শতধা বিরাজয়ে জননী হৃদয়ে, সতীর প্রেমে" উপলব্ধি করিয়া, ক্রমে ক্রমে উহা বাড়িতে থাকে। কতকগুলি অনুকূল ঘটনা তাঁহার ঈশ্বর-প্রীতি-বিকাশের কারণ হইয়া উঠে। উপেন্দ্রচন্দ্রের অগ্রজ ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, তাঁহার বর্দ্ধমান অবস্থানকালে "প্রেততত্ত্ব" (Spiritualism) বিষয় সম্যক্ আলোচনা করেন। তিনি তাঁহার কয়েকজন সুশিক্ষিত বন্ধুকে লইয়া বর্দ্ধমানে প্রেত সাহায্যে অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছিলেন। ছুটীতে গয়ায় গিয়া সেখানেও প্রেততত্ত্ব বিষয়ে পুনরালোচনা করেন। উপেন্দ্রচন্দ্র নানা অলৌকিক কার্য্য ও ঘটনাপরম্পরা সন্দর্শন করিয়া একান্ত মুগ্ধ হন ও তাহাতে বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। উপেন্দ্রচন্দ্রের ভ্রাতা তাঁহাদের বাড়ীতে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় হরিনাম সংকীর্ত্তনের প্রচলন করেন। ঐ হরিনাম সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেততত্ত্বের অদ্ভুত কার্য্য লোক সমক্ষে প্রচারিত হইতে লাগিল; উপেন্দ্রচন্দ্রের হৃদয়েও ঈশ্বর-প্রীতি, হরিভক্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। উপেন্দ্রচন্দ্র ক্রমে ক্রমে একটি প্রকৃত বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার আকুল প্রার্থনা ও নামে মতি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিতে লাগিলেন।

উপেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার গয়ার বাটীতে কয়েক বৎসর অন্নপূর্ণা পূজা করেন। ঐ পূজার সময়ে চারিদিকে ঢোল পিটিয়া বিস্তর কাঙ্গালী নিমন্ত্রিত হইত; উপেন্দ্রচন্দ্র তাহাদিগকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করিতেন। এই ব্যাপারে জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্, পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, ডেপুটী, সদরালা, মুন্সেফ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী এবং সহরের যাবতীয় ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য পরিদর্শন করিতেন ও যথাযথ ভাবে যাহাতে উপেন্দ্রচন্দ্রের কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে তাঁহারা আন্তরিক সাহায্য করিতেন। অন্নপূর্ণা পূজার সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্রচন্দ্র কয়েক বৎসর দুর্গোৎসবও করিয়াছিলেন। দরিদ্রকে অন্ন ও বস্ত্রদান তাঁহার ঐ দুই পূজার প্রধান অঙ্গ ছিল।

অতিথি-সৎকারে উপেন্দ্রচন্দ্র মুক্তহস্ত ছিলেন। ডাক্তার স্যর রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ভাণ্ডারকর, ম্যাডগাঁউকর প্রভৃতি হইতে যে কোন ব্যক্তি যখনই তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই তিনি "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ" জ্ঞানে তাঁহাদের সেবা করিতেন।

উপেন্দ্রচন্দ্রের হৃদয় স্নেহপ্রবণ ও বাৎসল্যের আধার ছিল। যখন তিনি পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, ভ্রাতুষ্কন্যা,ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাঁহাদের পুত্রকন্যা লইয়া দুই বেলা একত্রে চা খাইতেন ও আহার করিতেন, আহারের সময় ছোট ছেলেমেয়েদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতেন, তখন বড় সুন্দর দেখাইত; তখন যে কেহ উহা দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ ও পরমানন্দিত হইয়াছেন।

গয়ায় তাঁহার বাড়ীতে প্রেততত্ত্ব আলোচনা বিষয়ে দুই একটী কথা এখানে বলিলে বোধ হয় তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেননা,তাহা হইতেই উপেন্দ্রচন্দ্র ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের ধর্ম্মভাব পরিবর্দ্ধিত ও বদ্ধমূল হয়। উপেন্দ্রচন্দ্রের এক ভগিনীপতি তৎসম্বন্ধে যাহা যাহা দেখিয়াছেন তাহাই নিম্নে বিবৃত হইল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই ব্যাপারটি কি তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন।

তিনি বলেন—"আমি ১৩০৭ সালের কার্ত্তিক মাসের প্রথমে, উপেন্দ্রচন্দ্রের গৃহপ্রবেশের অব্যবহিত কাল পরেই আমার মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, ও কন্যাদ্বয়কে লইয়া গয়া ও তথা হইতে কাশী যাইব বলিয়া উপেন্দ্রচন্দ্রকে পত্র লিখি। সেই বৎসরে গয়ায় ভীষণ প্লেগ আরম্ভ হয়। উপেন্দ্রচন্দ্র আমার পত্র পাইয়াই আমাকে টেলিগ্রাফ করেন যে গয়া এখন নিরাপদ নহে, তোমরা আসিও না। আমার পত্র ও তার-

যোগে তাহার উত্তর সম্বন্ধে কাহাকেও, এমন কি তাঁহার মাতাকেও, কিছু বলেন নাই। আদালতে বসিয়াই টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল; সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে দুইজনের trance (মূর্চ্ছা) হইল। একজন নৃত্য ও হরিনাম করিতে করিতে উপেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,"উপেন্, তোর ভগিনী-পতি, ভাগিনেয়ী প্রভৃতি আসিতেছেন; তার করিয়া আসিতে নিষেধ করিলে কি হইবে? আমরাই তাহা দিগকে আনিতেছি। তাহারা তোর তার পায় নাই। বালিকা এখন অমুক স্থানে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছে; আহা! কি সুন্দর! তুই কাল ষ্টেশনে গাড়ী পঠিয়ে-দিস্।" উপেন্দ্রচন্দ্র যে সময়ে যে স্থানে বালিকার সন্ধ্যা-বন্দনাদির কথা শুনিলেন, তাহা হইতে স্থির করিলেন, কোন্ সময়ে আমরা গয়ায় পৌছিব এবং তদনুসারে গয়া ষ্টেশনে লোক ও গাড়ী পাঠাইয়া দেন। আমরা ষ্টেশনে গিয়া দেখি, উপেন্দ্রচন্দ্রের লোক ও গাড়ী আমাদের জন্ম অপেক্ষা করিতেছে। উপেন্দ্রচন্দ্রের সহিত দেখা হইলে তাঁহার মুখে ঐ সমস্ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম ও বলিলাম, আমরা তোমার টেলিগ্রাফ বাস্তবিকই পাই নাই। টেলিগ্রাফ পৌছিবার পূর্ব্বেই আমরা কলি-কাতার বাড়ী হইতে হাবড়া ষ্টেশনাভিমুখে গিয়া-ছিলাম।' আমি দেখিলাম সঙ্কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কেহই কোথাও নাই। আমি শয়নের উদ্যোগ করিতে-ছিলাম, ও কত কি ভাবিতেছিলাম। সম্মুখে একখানি গীতা ছিল, সময়ে সময়ে তাহা উলটাইয়া দেখিতে ছিলাম, এমন সময়ে বাহিরের বড় ঘরের এক-কোণ হইতে বিকট হাস্যধ্বনি উঠিল। দেখিলাম সে আর কেহই নহে, উপেন্দ্রচন্দ্রের পুত্র সুধেন্দ্র। তখন তাহার বয়স আট বৎসর হইবে। সে হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল—'তুই কি ভাবছিস্' বলিয়াই গীতার শ্লোক আওড়াইতে লাগিল। আমি দেখিলাম, যেখানে আমার "গীতা" খোলা, সেইখানেই সেই শ্লোক। তারপরে সেই শ্লোকের নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—"আমি এইরূপ ব্যাখ্যা করি।" আমি এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া সমস্ত শুনিতেছিলাম, এখন বলিলাম—'তুমি কে?' তাহার উত্তর পাইলাম—'তো'র তা জান্‌বার দরকার কি? আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। এমন সময়ে উপেন্দ্রচন্দ্র বাহিরে আসিলেন, আমি তাঁহাকে সকল কথাই বলিলাম।

"তৎপরদিন সন্ধ্যায় সঙ্কীর্ত্তন সময়ে দেখিলাম, বাড়ীর সকলেই বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত তাহাতে যোগ দিয়াছেন। গান করিতে করিতে উপ-রোক্ত দুই জনের ও সুধেন্দ্রের trance (মূর্চ্ছা) হইল। সকলেরই উদ্দাম নৃত্য ও গান। সকলেই নামগানে বিভোর ও উন্মত্ত। যাঁহাদের trance হইয়াছে তাঁহারা পরস্পরকে পূজা করিতেছেন। আবার কখনও হাসি-তেছেন, কখনও নাচিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন। অষ্টমবর্ষীয় বালকের পূজাপদ্ধতি ও তালে তালে নৃত্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কেহই ত তাহাকে শিখায় নাই, তবে কোথা হইতে শিখিল, এ সব কি? ইহার ভিতরে একজন বলিলেন—'যে বালিকা আসিয়া-ছেন, তাঁকে এখানে আন। আমরা তাঁর মুখ হইতে স্তোত্র পাঠ শুনিব।' উপেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার ভাগিনেয়ীকে সঙ্কীর্ত্তন স্থলে আনিলেন। বালিকা আসিবামাত্র যে তিন জনের trance হইয়াছিল, সকলেই আনন্দের ভরে কাঁদিতে কাঁদিতে মা মা বলিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া বালিকার পদধূলি লইতে লাগিলেন। বালিকার স্তোত্র পাঠে তাঁহাদের আনন্দের রোল আরও বাড়িয়া উঠিল; তন্মধ্যে একজন বলিলেন—'তোর বাড়ী পবিত্র কর্‌বার জন্যই এই বালিকাকে এখানে আনিয়াছি, আজ তোর বাড়ী পবিত্র হইল' ইত্যাদি বলিয়া বালিকার পূর্ব্ব-জন্মের কথা উপেন্দ্রের কাণে কাণে বলিয়া দিলেন, ও আরো কত কি বলিলেন, তাহা আমি এপর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। যে কয়েকজনের trance হইত, তাঁহাদের মধ্যে একজন বেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন। এদিকে কালা, নেহাৎ গোবেচারী, বোকা বলিলেও চলে। তিনি তাঁহার কোন আত্মীয়ের ঔষধ আনিবার জন্য একটি কবিরাজের বাড়ী যান। বাহিরে বসিয়া

কবিরাজের জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে পার্শ্বের বাড়ীতে কে সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিল; সেই সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়াই তাঁহার trance হয়। কবিরাজ মহাশয় আসিয়াই তাহা দেখিলেন। তিনি ঐ লোকটিকে জানিতেন। তৎক্ষণাৎ নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন। নাড়ীতে হাত দিবা মাত্র, সেই লোকটি trance এর অবস্থাতেই কবিরাজকে বলিলেন—'নাড়ী দেখ্‌ছিস দেখ্‌. এই দেখ্‌ মৃত্যুর পূর্ব্বের নাড়ী, এই দেখ্‌ নাড়ী নাই।' ইত্যাদি অনেক প্রকার নাড়ীর গতি দেখাইলেন। কবিরাজ আশ্চর্য্য হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,'প্লেগটা কি, তাহার ঔষধই বা কি?' Trance গ্রস্ত লোকটি তাঁহার সদুত্তর দিলেন, কবিরাজ শাস্ত্র মিলাইয়া আশ্চর্য্য হইলেন। ঐ লোকটি trance ভাবাপন্ন হইয়া উপেন্দ্রচন্দ্রের একজন নিকট আত্মীয়কে প্লেগের ঔষধ বলিয়া দেন ও কোথায় সে গাছ গাছড়া পাওয়া যাইবে তাহাও বলিয়া দেন। তিনি সেই ঔষধ তৈয়ার করিয়া সর্ব্বসাধারণকে প্রত্যহ তাহা বিতরণ করিতেন। কতদূর দূরান্তর হইতেও লোক আসিয়া সেই ঔষধ লইয়া যাইত। উপেন্দ্রচন্দ্রের সেই আত্মীয়টির মৃত্যুর পরেও কতলোক ঔষধের জন্ম আসিয়া তাহা না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সেই ঔষধ আর কেহ জানিত না। গয়ায় খুব প্লেগ, উপেন্দ্রচন্দ্র বা কাহারও তাহাতে দৃকপাত নাই। প্রত্যহ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলেই রোগীর শিয়রে গিয়া দাঁড়াইতেন। কিয়ৎক্ষণ হরিনাম শুনাইয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া বাড়ী ফিরিতেন। এইরূপে আমরা আট দশ দিন কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিয়া ও trance ভাবাপন্ন লোকের নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া সে বার বাড়ী ফিরিলাম। তাহার পরে সেই বৎসর পৌষ ও চৈত্র মাসে গয়ায় গিয়া কত কি দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। নৈহাটীতে ঐ সকল লোক লইয়া উপেন্দ্রচন্দ্রের বাড়ীতে তাঁহার দাদার যত্নে ও আগ্রহে কতদিন সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে, নগর সঙ্কীর্ত্তনও হইয়াছে প্রতিদিন কত কি নূতন নূতন অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি অতি সংক্ষেপে কেবল দুই এক কথা বলিলাম মাত্র।"

১৩০৯ সালে শ্রীযুক্ত আনন্দস্বামী নামে একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী গয়ায় উপেন্দ্রচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ যোগী ও পণ্ডিত ছিলেন। কিছুদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া তথা হইতে চলিয়া যান। সেই অবধি trance ভাবাপন্ন লোকগণ সঙ্কীর্ত্তন স্থলে অনাদৃত হন। সঙ্কীর্ত্তন প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে একই গানে হইত। আনন্দস্বামী ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া যান। শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় কবিরাজী ছাড়িয়া ঐ কীর্ত্তনগায়করূপে নিযুক্ত হন। সময়ে সময়ে লীলাকীর্ত্তনও হইত। কীর্ত্তিবাবুর মধুর স্বরে ও গীতি-নৈপুণ্যে উহা বড়ই মধুর, চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়স্পর্শী হইত। উপেন্দ্রচন্দ্রের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ নাম সঙ্কীর্ত্তন চলিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রগণও তাহা বজায় রাখিয়াছেন।

উপেন্দ্রচন্দ্র যে এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন, তাহা তিনি নিজে বা তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেহই তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কোমরের বাত (Lumbago) ছাড়া তাঁহার শরীরে কোন রোগ বা তাঁহার শরীর কোন প্রকার অসুস্থ ছিল না। তিনি বেশ সবল ও হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন। শনিবারেও আদালতে দাঁড়াইয়া কাজ করিয়া আসিয়া, কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিয়া, রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সকলের সহিত গল্প গুজব করিয়া শয়ন করেন। রবিবার প্রত্যূষে Apoplexy ও Paralysis তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া, মঙ্গলবার প্রত্যূষে তাঁহাকে জীবনের পরপারে লইয়া গিয়াছে। আমাদের কাছে উহা আজিও স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। রীতিমত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার মৃতদেহ সৎকারস্থলে লইয়া যাওয়া হয়। বিস্তর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে গয়ায় সকলেই আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহার সম্মানের জন্ম সেই দিন গয়ার দেওয়ানী, ফৌজদারী, রেবিনিউ

আদালত, মিউনিসিপ্যাল আফিস ও স্থানীয় বিদ্যালয়গুলি বন্ধ থাকে। উকীল ও মোক্তারগণের সভা ও গয়া মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার শোকগ্রস্ত পরিবারকে সান্ত্বনাবাদ পাঠাইয়া দেন। উপেন্দ্রচন্দ্র চারিটি পুত্র, দুইটি কন্যা ও বিধবা স্ত্রী রাখিয়া গিয়াছেন।

উপেন্দ্রচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গয়াতে তাহার স্থান অধিকার করিবার আর কোন বাঙ্গালীই নাই। তাহার মৃত্যু উপলক্ষে "বেঙ্গলী" সংবাদপত্র যথার্থ ই বলিয়াছেন—"In these days when unfortunately there is an unhappy feeling in some parts of Behar and among some sections of the Beharee community against Bengalees, the death of such a man is a public calamity, both to Bengal and Behar. He represented all that was best and noblest in the Bengalee character, and the people of Behar saw in him a type of character and a personality, which extorted thier love and respect, and which showed that the Bengalees were after all not so bad as some took them to be"

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

বৈদেশিকী

গরলে অমৃত।

(*"Nineteenth Century," October.*)

জে. ই. বার্কারের "Britain's Coming Industrial Supremacy" শীর্ষক প্রবন্ধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ।

কষ্ট না সহিলে যে কৃষ্ণ মিলে না, ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ে ইহার প্রমাণ আছে। অষ্ট্রিয়ার অত্যাচারের ফলে আধুনিক ইটালীর উদ্ভব; তুর্কির পেষণেই সার্ভিয়া, বুলগেরিয়া ও রুমেনিয়ার উন্মেষ; রুষ-ভীতির প্ররোচনায় জাপানের অভ্যুদয়। ব্যক্তিগত হিসাবে, যুদ্ধ, অমঙ্গলের আকর হইলেও, জাতিগত হিসাবে ইহা কল্যাণপ্রসূ হইতে পারে। প্রকৃতি যে দেশে হাস্যময়ী জননীর মূর্ত্তিতে দেখা দেন, তথাকার লোক ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে; যথায় তিনি কোপনা বিমাতাবৎ আচরণ করেন, তথাকার অধিবাসী আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখে। অকর্ম্মণ্য ও বিলাসী জাতিকে উদ্যমশীল ও সংযমী করিবার জন্য যুদ্ধই একটি প্রকৃষ্ট উপায়। ("Nations are born in war and die in peace. Peace creates sloth, intrigue and dissension. A keen sense of danger is the most powerful unifying factor known to history. ......Wars, though disastrous to individuals, often prove a blessing to nations. They prepare them for the struggle of life both in the military and in the economic sphere...Necessity is the mother not only of invention but of labour and thrift. Herein lies the reason that the countries most blessed by Nature are often the poorest and least progressive.)

মার্কিনেরা সম্প্রতি মধ্য য়ুরোপের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয় নাই বলিয়া য়ুরোপের কয়েকটি জাতি অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছে। কিয়াউ-চাউ হস্তগত করিতে জাপানের যেমন

মাথাব্যথা ছিল, সেইরূপ স্বার্থসিদ্ধির উত্তেজনা থাকিলে, মার্কিনও পরের হাঁড়িতে কাঠি দিবার জন্য ব্যস্ত হইত। বেলজিয়াম, সার্ভিয়া ও ফ্রান্সের বর্ত্তমান ক্লেশে য়ুনাইটেড ষ্টেট্সের ঔদাসীন্য উপলক্ষে লেখক বলিয়াছেন যে, কর্ত্তব্যের সিংহাসনে স্বার্থকে বসাইবার ফল মার্কিনকে নিশ্চয় ভুগিতে হইবে। মার্কিন, ওলন্দাজ, সুইডিশ প্রভৃতি জাতির স্মরণ রাখা উচিত যে, ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পূর্ব্বে বহুবর্ষব্যাপী মহাহবের রুধির প্লাবনেই ইংলণ্ডের জগদ্ব্যাপী বাণিজ্যের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ বাধিয়াই ইংলণ্ডের দ্রুত অবনতির পথে বাধা পড়িয়াছে। ("Great Britain's former industrial predominance was founded not in peace but in war. It was created during the period 1775-1815, spent in colossal wars. The United States may fall a prey to that fatal self complacency and stagnation, from which political and industrial Britain has suffered for decades and from which she has been saved by War".) লাঙ্গুল গুটাইয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকা আপাততঃ সুবিধাজনক হইলেও পরিণামে শোচনীয়।

যুদ্ধের ফলে প্রভূত ব্যক্তিগত ক্ষতি হইলেও জাতিগত লাভ যে সম্ভব, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য লেখক ১৮৬১ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দব্যাপী আমেরিকান গৃহবিরোধের (Civil War) উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সংগ্রামে প্রায় দশ লক্ষ লোক নিহত এবং প্রায় তিন-সহস্র কোটী টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল; কার্পাস, তামাক ও চিনির ব্যবসায় লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; এবং অসংখ্য জাহাজ, নৌকা ও গৃহ চূর্ণ হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে, ১৮৬০ সালে, য়ুনাইটেড ষ্টেটসের জাতীয় সম্পত্তি (National wealth) কিয়দধিক ষোল শত কোটী ডলার (১ ডলার=কিয়দধিক তিন টাকা) ছিল; যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৭০ সালে, উহা তিন হাজার কোটী ডলারে পরিণত হয়। ১৮৬০ সালে য়ুনাইটেড ষ্টেটসের অধিবাসীর সংখ্যা তিন কোটী চৌদ্দ লক্ষ ছিল; ১৮৭০ সালে উহা তিন কোটী পঁচাশী লক্ষ হয়। পঞ্চবর্ষব্যাপী সর্ব্বধ্বংসকারী গৃহবিরোধের পরেও, অল্প দিনের মধ্যে ঐ দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন:—(১) যুদ্ধের সময় য়ুরোপের সহিত আমদানি রপ্তানির সম্পর্ক প্রায় সম্পূর্ণভাবে রহিত হওয়ায়, মার্কিন জাতি বাধ্য হইয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে, তাহার ফলে সিন্ধুকভরা ডলার ও প্রাণভরা উদ্যম এই দুইটি লাভ হয়; (২) প্রায় দশলক্ষ শ্রমজীবী লোকের যুদ্ধে মৃত্যু হওয়াতে, তাহাদের অনুষ্ঠের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কলকব্জা (labour saving machines) নির্ম্মিত হয় এবং সত্বর ধনবৃদ্ধি হয়; (৩) যুদ্ধকালে বাধ্য হইয়া দেশময় রেল পাতিবার বন্দোবস্ত হয় এবং তাহার ফলে একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্যের প্রচার হয়। ("Modern war is carried on by weapons and by machines; it is fought quite as much in the factory as in the field. Necessity forced America to be self-supporting.")

যুদ্ধের অল্পকাল পরেই মার্কিনের লাভের খাতায় অধিক অঙ্ক দেখিয়া ("The Civil War did not impoverish the country but greatly enriched it".) লেখক আশা করেন যে বর্ত্তমান সংগ্রামের পরে, বিলাতেও ঐ প্রকার বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িবে। পুরাকালে কার্থেজ যেমন ফিনিসিয়ার স্থানে "উড়ে এসে জুড়ে" বসিয়াছিল, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পরে মার্কিন সেইরূপ ইংরাজ ও ফরাসীর বাজারে জয় পতাকা উড়াইবে, এই ভয়ে য়ুরোপের অনেকে আকুল হইয়াছে। লেখক বলেন, এরূপ ভয়ের কোনও কারণ নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধ বাধিবার পরে, আমেরিকা হইতে বিলাতে প্রায় তিন শত কোটী টাকার কলকব্জা রপ্তানি হইয়াছে; শিক্ষিত ইংরাজ ও স্কচ যুবক এখন গ্রীক ল্যাটিনের "বুকনি" ছাড়িয়া, জার্ম্মানদিগের ন্যায় শিল্প ও

ব্যবসায় শিক্ষা করিতেছে। অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানি হইতে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও এনামেলের বাসন আসিত, এখন তাহার কিয়দংশ বিলাতেই নির্ম্মিত হইতেছে। কয়েক বৎসর পরে শিল্প ও ব্যবসায়ে, মার্কিনকে বিলাতের নিকট মাথা হেঁট করিতে হইবেই হইবে। ("The United States will discover that the War has destroyed their industrial paramountcy.")।

বিলাত ও য়ুনাইটেড ষ্টেট্‌সের তুলনা করিয়া, লেখক কয়েকটি তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা :—

জনসংখ্যা।

য়ুনাইটেড কিংডম—৪৭, ০০০, ০০০।
ঐ ষ্টেট্‌স—১০৫, ০০০, ০০০।

জীবন বিমা।

য়ুনাইটেড কিংডম—১, ১০০, ০০০, ০০০ পৌণ্ড।
ঐ ষ্টেট্‌স —৬, ২০০, ০০০, ০০০ ঐ।

জাতীয় সম্পত্তি।

য়ুনাইটেড কিংডম—১৭, ০০০, ০০০, ০০০ পৌণ্ড।
ঐ ষ্টেট্‌স —৩৭, ৫০০, ০০০, ০০০ ঐ।

টেলিফোন।

য়ুনাইটেড কিংডম—৭৮০, ০০০।
ঐ ষ্টেট্‌স—৯৫০০, ০০০।

রেলওয়ে।

য়ুনাইটেড কিংডম —২৩, ৪০০ মাইল।
ঐ ষ্টেট্‌স —২৫৪, ৭০০ ঐ।
সমস্ত পৃথিবী ——৬৬৫, ৯০০ ঐ।

অনেক বিষয়েই মার্কিন ইংরাজের অপেক্ষা বড় বলিয়া, লেখক নিম্নলিখিত প্রকারে মনকে আঁখি ঠারিতে বাধ্য হইয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন এক কোটি আটাশ লক্ষ বর্গ মাইল, কিন্তু য়ুনাইটেড ষ্টেট্‌সের আয়তন মাত্র সাড়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষ বর্গ মাইল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত ভূমি কর্ষিত ও সমস্ত খনি আবিষ্কৃত হইলে, এবং উহার সর্ব্বত্র রেল ও খালের সুবিধা করিলে, ইংলণ্ডের ধনদৌলত দেখিয়া, মার্কিন বিস্ময়ে বদন ব্যাদান করিবে। ("We may conclude that the British Empire though actually much poorer is potentially much richer than the United States.")।

ভারতবর্ষ ও চীনের দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন যে, উহারা প্রত্যহ এক শিলিং মূল্যের সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে পারে না, কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে অভ্যস্ত হইলে তাহাদের দৈনিক কুড়ি ত্রিশ টাকার সম্পত্তি তৈয়ারি করিবার সামর্থ্য হইবে। ("An Indian or Chinaman engaged at his home in agriculture produces a shilling worth of wealth per day, while after education in Great Britain and the United States, he can produce 30 or 40 s. daily. Land and natural resources are limited, but wealth production is unlimited")

১৮৭১ হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে, য়ুনাইটেড ষ্টেট্‌স ও জার্ম্মানির লোকসংখ্যা যথাক্রমে পাঁচ কোটী এবং দুই কোটী চুয়াল্ল লক্ষ এই হিসাবে বাড়িয়াছে, কিন্তু সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে শ্বেতকায়ের সংখ্যা ঐ সময়ে মাত্র দুই কোটি পনের লক্ষ বাড়িয়াছে। ইহা ভাবিয়া লেখকের চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। তিনি বলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র, সর্ব্বশ্রেণীর প্রজার বাস ও বাণিজ্য করিবার সুবিধা না দিলে, ভবিষ্যতে ইংরাজকে অপর জাতিগণের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। ("Immigration and Emigration and the question of the inter-imperial trade must be settled imperially and not parochially.")

সেকালের শান্তি, একালের সুবিধা।

("*Hibbert Journal,*" *October.*)।

সুখ কি, সুখী কে, আমরা আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহগণের অপেক্ষা অধিক সুখী কি না, "Are we happier than our forefathers" শীর্ষক প্রবন্ধে ডাক্তার মার্সিয়ার এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

বৃত্তির অনুশীলনেই সুখ। যে যত অধিক বিষয়ে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে পারে, সে তত বেশী সুখী। বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে পারিলে এবং বৃত্তি সম্যক পরিমাণে অনুশীলিত হইলে, সুখের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়। ("The universal condition of happiness is the exercise of faculty in the pursuit of interest. Happiness is wider the greater the number of things in which we take interest. The greater the difficulty, the more strenuous the effort, the greater is the happiness evoked. When a child or an adult is solving a puzzle we get no thanks by offering the solution.")

টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, ষ্টীমার প্রভৃতিতে সেকালের অপেক্ষা একালে সুবিধা যথেষ্ট বাড়িয়াছে; রঞ্জেন আলোক, ক্লোরোফর্ম প্রভৃতির সাহায্যে আধুনিক রোগীর যন্ত্রণা কমিয়াছে; মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে জ্ঞানপ্রচারের চূড়ান্ত আয়োজন হইয়াছে; এখন একটু কল টিপিলেই জল, হাওয়া, আলো সবই পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও আমরা আমাদের অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহগণের অপেক্ষা অধিক সুখশান্তি ভোগ করি কি না, ইহা ভাবিবার বিষয়। ("Convenience and luxury are desirable, but these are not the same as happiness. It may be doubted whether these are necessary ingredients in happiness. Many of our ancestors were happy without our luxuries and conveniences; many of us are unhappy in spite of them.")।

ক্লোরোফর্ম প্রভৃতির সাহায্যে আধুনিক রোগী মারাত্মক যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু পুরাকালে যে প্রকারের রোগী যমের বাড়ীর দরজা ঠেলিয়া হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িত, এখন সেই প্রকারের রোগী, ডাক্তারের কৃপায়, নুলো, খোঁড়া বা কাণা হইয়া অপরের গলগ্রহ হয় ও নামমাত্র বাঁচিয়া থাকে। ("The number of persons who had to dread the surgeon's knife was so small that the general happiness of the community was not affected. Many a life, that is a questionable boon, that in former times would have been mercifully cut short, is now prolonged in years of suffering.") সেকালের লোকে আমাদের অপেক্ষা সমর্থতর ছিল। পুরাকালে চিকিৎসকের দোষে এবং ঔষধের অভাবে অনেক লোক শৈশবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত এবং কেবলমাত্র সবল লোকেই বাঁচিয়া থাকিত। সুতরাং আমাদের অপেক্ষা সেকালের সমাজে কর্ম্মঠ লোকের অনুপাত অধিক ছিল। ("Before the days of Harvey there can have been few long illnesses. Those who did not speedily die of their diseases, died speedily of their physicians. The mortality in the early years of life was very great and the general average of vigour in the community must have been appreciably higher.")

সভ্যজগতে এখন ডাকাতির সংখ্যা কমিয়াছে, কিন্তু শিক্ষিত জুয়াচোরের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়াছে। অন্তর্বিদ্রোহ (civil war) কমিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মঘটের ঘটা বাড়িয়াছে। কথাটা অদ্ভুত শুনাইলেও ইহা

স্বীকার্য্য যে, মরিবার ভয় অপেক্ষা ঠকিবার ভয়ে মানুষ অধিক কাবু হয়। তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, য়ুরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে শিলাবৃষ্টির ন্যায় গোলা বর্ষণের মধ্যেও সৈনিকেরা পরস্পরের সহিত ঠাট্টা তামাসা করিতে ছাড়িতেছে না। ("It is easier to be happy when life is secure, but insecurity of life is no bar to happiness ; nay, in a measure, and to a certain degree, it brings its own sources of satisfaction. It exercises the wit, it sets the faculties agog to evade and counteract the danger. ......It is doubtful whether insecurity of property is not a greater bar to happiness than insecurity of life.

পুরাকালে গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড সর্ব্বত্রই সমাজের অধিকাংশ লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহারা অসুখী ছিল, একথা মনে করা ভুল। তাহারা তথাকথিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ("personal liberty") আস্বাদ পায় নাই বলিয়া, উহার অভাব অনুভব করিয়া অসুখী হয় নাই। কেবল বাঁধনের অভাবই যদি সুখ হয়, তাহা হইলে রবিন্সন ক্রুসোর ন্যায় সুখী কে ? ("In Greece, in Rome, in Saxon and Norman England, the great bulk of the population were slaves in law and slaves in fact. Personal liberty was denied to them, but as they had never known it, they did not miss its absence......Certainly freedom alone will not secure happiness. Who is so free as Robinson Crusoe ?")

শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে, সুখ দুঃখ উভয়েরই অনুভূতি বর্দ্ধিত হয়। জনশিক্ষার ফলে, সেকালের অপেক্ষা একালে সুখদুঃখ অনুভব করিবার শক্তি ও উপায় বাড়িয়াছে। ইহাতে সুখের জমা অপেক্ষা ক্লেশের খরচ বাড়িয়াছে কি না, তাহার হিসাব-নিকাশ করা কঠিন। ("If the capacity to feel pleasure partakes in the general advance of mental faculty, then we have a greater capacity for pleasure than our forefathers. But it must be remembered that along with the increased capacity of feeling pleasure goes the increased capacity of feeling pain, and it is by no means certain that the latter does not outrun the former.")।

সেকালের লোকে ধর্ম্মের জন্য মারামারি কাটাকাটি করিত। এখনকার লোকে ধর্ম্মযুদ্ধকে (crusade) সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক বলিয়া নাক সিঁটকায় বটে, কিন্তু বাণিজ্য ("exploitation") বা রাজ্যজয়ের ("imperialism") ধুয়া ধরিয়া রক্তনদী বহাইতে দ্বিধা বোধ করে না। সেকালের অপেক্ষা একালে সুবিধা বাড়িয়াছে ইহা ঠিক, কিন্তু সুখশান্তি বাড়িয়াছে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে।

প্যালেষ্টাইন

("Quarterly Review," October.)।

"Egypt and Palestine" শীর্ষক প্রবন্ধে, এ. এম্. হিয়াম্‌সান জার্ম্মানির পররাষ্ট্রনীতি ও প্যালেষ্টাইনের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

জার্ম্মান লেখক Dr. P. Rohrbach প্রণীত "Die Bagdadbahn" পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইংলণ্ডকে জখম করিতে হইলে, ঐ গ্রন্থকারের মতে, মিসর হস্তগত করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। ("England can be attacked and mortally wounded by land from Europe only in one place—Egypt.")। তিনি বলেন যে, মিসরে তুর্কির জয়পতাকা উড়িলে, ভারতবর্ষের ছয় কোটী মুসলমান চঞ্চল হইয়া উঠিবে, এবং আফগানিস্থান ও পারস্যে ইংরাজের প্রতিপত্তি কমিবে।

("The conquest of Egypt by a Mahomedan power, like Turkey, would imperil England's hold over her sixty million Mahomedan subjects in India, besides prejudicing her relations with Afghanistan and Persia.") এসিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের মিলনস্থল তুরুস্কে প্রভাব বিস্তার করিয়া, পৃথিবীর সর্ব্ববরেণ্য জাতি হইবার জন্য, জার্ম্মানি প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

প্রবন্ধলেখকের মতে, এক্ষণে যেমন বলকান প্রদেশে রক্তনদী বহিতেছে, কিছুদিন পরে প্যালেষ্টাইনেও তদ্রূপ হইতে পারে। প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত, খৃষ্টানদের বারাণসী, জেরুসিলমে ইংরাজের Anglo-Palestine Bank, জার্ম্মানের Deutsche Palastina Bank, ফরাসীর Credit Lyonnais এবং তুর্কির Banque Ottomane আছে। ফরাসীরা বৈরুট হইতে ডামাস্কস পর্য্যন্ত এবং জাফ্‌ফা হইতে জেরুসিলম পর্য্যন্ত রেল-ওয়ের লাইন পাতিয়াছে। জাফ্‌ফা বন্দরে ইংরাজ, তুর্কি, ফরাসী, জার্ম্মান, রুসিয়ান ও অষ্ট্রিয়ান জাতির পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি হয়। প্যালেষ্টাইনের পশ্চিমে, ভূমধ্য সাগরতীরস্থ হাইফা (Haifa) বন্দর লইয়া য়ুরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে রেষারেষি হইতে ঘুসাঘুসি আরম্ভ হইবে, প্রবন্ধলেখকের এইরূপ আশঙ্কা আছে। তুরুস্কের অধিক স্থলে রেলওয়ের লাইন পাতা হইলে, এবং কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল ও হাইফা হইতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত মালপত্র আমদানি রপ্তানির সুবিধা হইলে, সুয়েজ খাল "কাণা" হইয়া যাইবে। জলপথে লোহিত সাগর দিয়া যে পণ্যসম্ভার যাতায়াত করে, ভবিষ্যতে রেল-সহযোগে তুরুস্কের মধ্য দিয়া তাহার গতিবিধি হইবে। ("Haifa the nearest entrance to the Red Sea and the coast regions of Arabia has other possibilities in future. From Damascus two roads run to Bagdad. The one, the post road, runs due east, almost in a straight line, the other curves to the north passing through Palmyra. The ancient trade with Persia and India which followed these roads, although much diminished, still exists. Some day, when a railway is built along one of these routes, and crossing Persia, connects with the Indian railway system, this trade will return; Haifa will be the port of departure for Europe. It will be the shortest route between Europe and Persian Gulf.")

প্যালেষ্টাইনের আয়তন প্রায় সতের হাজার বর্গ মাইল। ইহার দোকান ও হোটেলের মালিকের অধিকাংশ জার্ম্মান জাতীয়। য়িহুদী ও খৃষ্টান অপেক্ষা প্যালেষ্টাইনে মুসলমানের সংখ্যা অধিক। হিন্দুরা বৃদ্ধ হইলে যেরূপ কাশীবাস করেন, য়িহুদীরা সেইরূপ জেরুসিলম নগরে বা তন্নিকটস্থ গ্রামে বাস করে। য়ুরোপ ও আমেরিকার ধনাঢ্য লোকের অথবা আত্মীয়ের অর্থ সাহায্যে, ইহারা জীবনের শেষ কয়েক বৎসর কাটাইয়া দেয়। কেবল মরিবার জন্য জেরুসিলম তীর্থে আসে বলিয়া প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইহারা উদাসীন।

প্যালেষ্টাইন যে কেবলমাত্র বৃদ্ধ য়িহুদীদিগের পিঞ্জরাপোল তাহা নহে। রুসিয়া, রুমেনিয়া প্রভৃতি দেশে উৎপীড়িত নব্যতন্ত্রের য়িহুদীরা দলে দলে প্যালেষ্টাইনে আশ্রয় লইয়াছে। ("Pogroms in Russia and Roumenia in early eighties directed a stream of emigration to the Holy Land, and in 1882, the year of the massacres, the regeneration of Palestine begins.") ইহাদের বংশধরেরা জাফ্‌ফা ও হাইফার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বাস করিতেছে। প্যালেষ্টাইন দেশের উন্নতি এবং য়িহুদী ধর্ম্মের নবজীবনের জন্য ইহারা বদ্ধপরিকর। ("They feel they have a mission—the regeneration of Palestine; they want to

shew the world what Judaism is and means.") হীব্রু এতকাল সংস্কৃত ও ল্যাটিনের ন্যায় মৃতভাষাগুলির অন্যতম ছিল; প্যালেষ্টাইনের য়িহুদীদিগের চেষ্টায় ঐ ভাষা এখন চলিত ভাষার মধ্যে গণ্য হইয়াছে, উহাতে পুস্তক রচিত ও সংবাদপত্র সম্পাদিত হইতেছে। ("The Jews of Palestine have restored Hebrew to the family of spoken languages and have endowed it with a literature and press, learned as well as popular.")।

প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যতের চিন্তায় অধীর হইয়া, লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইংরাজের অভিভাবকতা-মূলক শাসনতন্ত্র ঐ দেশের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ("We have found that it is essential that the country should be under British protection.")

শ্রীগৌরহরি সেন।

কবি ভগিনী শ্রীমতী কামিনী রায়ের প্রতি

বসন্তে কোকিল যবে ঝঙ্কারিয়া ডাকে কুহু কুহু,
আনন্দে অধীরা ধরা শিহরিয়া ওঠে মুহুর্মুহু,
পাপিয়ার প্রাণচোরা ধ্বনি শুনি শ্যামা দিলে শিস্,
হরষে বিহ্বল হয়ে জাগি উঠে সুপ্ত দশদিশ।

সেই কোকিলের ভাষ, পাপিয়ার উল্লাসের ধ্বনি
কি মধুর কি ললিত, কিন্তু নহে স্বর-শিরোমণি।
রাধাকৃষ্ণ বুলি বলে মনসাধে বসিয়া পিঞ্জরে,
সেই ভক্ত শুকপক্ষী আমার এ কবিচিত্ত হরে।

সর-সোহাগিনী পদ্ম, বুকে যার বুকভরা মধু,
লাল গোলাপের ফুল, রূপরাজ্যে স্বয়ম্বরা বধূ,
বধূর খোঁপার চাঁপা প্রেমিকের চিত্তবিনোদন,
ইহারা সুন্দর বটে—তাই এরা বিশ্ববিমোহন।

আমি কিন্তু ভালবাসি রাশি রাশি শিউলির ফুল,
অর্ঘ্য হয়ে চুমে যাহা দেবতার চরণ রাতুল।
বর্ণ বাসে সমাকুল ভালবাসি কদম্বের ফুল,
মাধবের কর্ণমূলে দোলে যাহা হয়ে যুগ্মদুল।

ভীষণ মধুর কিবা উর্ম্মিরাশি উদ্দাম পদ্মার,
কি আনন্দ-নৃত্যপরা কালিন্দীর নীলিমা অপার,
বিচিত্র জব্বলপুরে কি অপূর্ব্ব নর্ম্মদা-প্রপাত,—
তাই এরা চিরদিন, চিরদিন বিশ্বের আহ্লাদ।

আমি বড় ভালবাসি ডেরাডুনে যেই জল পড়ে,
তপেশ্বর* শিরোপরে এ কি রঙ্গে ঝর ঝর ঝরে,
এ কি সেবা, এ কি সেবা—রাত্রিদিবা দৃশ্য অভিরাম,
নৈমিষ-অরণ্যমাঝে দেবস্তুতি যেন অবিরাম!

চিরদিন চিরদিন চিত্তহরা প্রাণপরশিনী,
গীতিকবিতার ধ্বনি, সুন্দরীর নূপুরশিঞ্জিনী
তালে তালে নাচে যেন রাজহর্ম্ম্যে!—মর্ম্মর ধবল
হরষে তরল হয়, বুকে ধরি আরক্ত উৎপল।

হে সুকবি! আমি কিন্তু ভালবাসি, তোমার ও বীণ,
হরিনাম-তারে গাঁথা, মধুময়, সুন্দর, নবীন।
হে পবিত্রে, সুচরিত্রে, ধন্যা তুমি! দীপ্ত অনুরাগে,
কি ঝঙ্কারে, কি ঝঙ্কারে তারে তারে দেবস্তুতি জাগে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

* টপকেশ্বর মহাদেবের গিরিমন্দির ডেরাডুনের বিচিত্র দৃশ্যাবলীর অন্যতম। ইহা সম্ভবতঃ তপেশ্বর শব্দের অপভ্রংশ।

যশোহরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁ *

বঙ্গের শেষবীর যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে যখন তাঁহার "সোনার যশোহর" মোগল বাদশাহের করতলগত হইল, তখন রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক কচুরায় 'যশোহরজিৎ' নাম ধারণ করিয়া মোগল-অনুগ্রহ-প্রসাদ-ভিখারী রাজন্যরূপে যশোহর রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। কচুরায় নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা চাঁদ রায় যশোহররাজ্য প্রাপ্ত হন। চাঁদ রায়ের পর তাঁহার পুত্র রাজারাম এবং তৎপর রাজারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলকণ্ঠ রাজা হইলেন। রাজা নীলকণ্ঠের আমলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামসুন্দর সম্পত্তি-বিভাগ জন্য প্রস্তাব করেন এবং তজ্জন্য রাজবংশের আত্মীয় কুটুম্ব ও কর্ম্মচারিগণ বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক শত্রুতা গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই গৃহবিবাদ সূত্রেই যশোহরের রাজবংশ দিন দিন অবনতি-পথে অগ্রসর হইয়াছিল। গৃহবিবাদ ব্যতীত রাজবংশ পতনের অন্য কারণও ছিল।

সরফরাজ খাঁ নামক এক ব্যক্তি নীলকণ্ঠের পিতা রাজারামের সময় হইতেই যশোহরের প্রধান কর্ম্মচারি-পদে নিযুক্ত ছিলেন; নীলকণ্ঠ ও শ্যামসুন্দরের বিবাদ-সময়ে সুবিধা পাইয়া এই মুসলমান কালে বিশিষ্ট বিত্ত-শালী হইয়া ঔদ্ধত্যবশতঃ অন্নদাতা প্রভুদিগের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ, জনশ্রুতি ছিল যে বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় কর্ত্তৃক যশোহর প্রতিষ্ঠাকালে শেষ পাঠান নৃপতি দায়ুদের বিস্তর ধনরাশি তাঁহাদের হস্তগত হয়—প্রতাপাদিত্যের সময়েও দেশ বিদেশের বহু লুণ্ঠিত ধনরাশি যশোহরের রাজকোষ কুবের ভাণ্ডারে পরিণত করিয়াছিল। এই ধনবত্তার খ্যাতি প্রযুক্ত যশোহর বঙ্গের তদানীন্তন মুসলমান সুবাদারগণের এবং মগ ও বর্গী দস্যুবর্গের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল।

এই সময় সম্রাট্ শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা সুবা বাঙ্গলার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা টোডর মল্ল বঙ্গের রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রথম বন্দোবস্ত ও সুলতান সুজা দ্বিতীয় বন্দোবস্ত করেন। দ্বিতীয় বন্দোবস্তের ফলে যশোহরের রাজারা বিস্তর সম্পত্তিচ্যুত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। যশোহরের শাসন-দণ্ড তখন দুর্ব্বল হস্তে পতিত; সুতরাং রাজপুরুষ ও দস্যুগণের অত্যাচার নিবারণ যশোহর রাজাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছিল। খলমতি প্রধান কর্ম্মচারী সরফরাজ খাঁ স্বীয় উন্নতির আশায় দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণের সহিত যোগদান করিয়া নানাপ্রকারে যশোহর রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে যশোহরের রাজগণ সুবাদারের উৎপীড়নে, কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় এবং দস্যুর উপদ্রবে দিন দিন নিঃস্ব ও দীনদশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন; ইহার উপর রাজা নীলকণ্ঠের সময় কালীগঞ্জ এবং বসন্তপুরের নিকট সাহেবখালি নামক খাল উন্মুক্ত হওয়ায় প্রতাপাদিত্যের সাধের রাজধানী যশোহরের প্রান্তবর্ত্তিনী যমুনা ইচ্ছামতী মজিয়া যায়; তাহাতে লবণাম্বু সমাগমে যশোহরের জল-বায়ু নিতান্ত দূষিত হইয়া উঠায় রাজা নীলকণ্ঠ ও শ্যামসুন্দর যশোহর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আঁধারমাণিক গ্রামে গুরুদেবের আশ্রয়ে গমন করেন। রাজভ্রাতৃদ্বয় যশোহর ত্যাগ করিলে সরফরাজ খাঁ নবাব উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক কিছুদিন তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার নামানুসারে প্রতাপাদিত্যের লীলাস্থানকে "পরগণা সর্পরাজপুর" নামে পরিবর্ত্তিত করেন। রাজা নীলকণ্ঠ প্রভৃতি যশোহর ত্যাগ করায় সেই অঞ্চল প্রধানতঃ নীচশ্রেণীর মুসলমান ও অন্যান্য ইতর জাতীয় কৃষিজীবীর বাসস্থানে পরিণত হয়। নবাব সরফরাজ খাঁকেও অল্প দিন মধ্যে সেই নগর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

* যশোহর নবম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত।

নবাব ইব্রাহিম খাঁ এই সময়ে বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন। ঢাকায় তাহার রাজধানী ছিল। সুবাদার নিজে ঢাকায় থাকিতেন এবং দেশের শাসন সৌকর্য্যার্থে সুবা বঙ্গদেশকে কতিপয় চাকলায় বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক চাকলায় এক একজন ফৌজদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফৌজদারগণ সুবাদারের অধীন থাকিয়া নিজ নিজ চাকলা শাসন করিতেন। যতদিন যশোহরের রাজগণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, ততদিন যশোহর চাকলার জন্য ফৌজদারের আবশ্যকতা ছিল না। যশোহরের রাজগণই যশোহর চাকলার শাসন করিতেন, কিন্তু গৃহবিবাদ ফলে তাঁহারা ক্ষমতা ও বিত্তশূন্য হইয়া যশোহর ত্যাগ করিলে, সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ নুরউল্লা খাঁ নামক তদীয় একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া যশোহর চাকলায় প্রেরণ করিলেন। তখন যশোহর নগর নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তিনি তৎপরিবর্ত্তে যশোহরের অদূরে স্বীয় নামানুসারে নূরনগর গ্রাম স্থাপন পূর্ব্বক তথায় ফৌজদার নূরউল্লা খাঁ নামে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন। জলবায়ুর পরিবর্ত্তনই যশোহরের পতনের মূল কারণ। নূরনগরও যশোহরের নিকটবর্ত্তী থাকায় ক্রমে তথাকার জলবায়ুও দূষিত হইল এবং নূরনগরও বাসস্থানের অযোগ্য হইয়া উঠিল। এইজন্য নূরউল্লা খাঁ নূরনগরের পরিবর্ত্তে মির্জ্জানগরে তাঁহার এলাকার সদর করিয়াছিলেন। সাধারণে ফৌজদার নূরউল্লা খাঁকে নবাব নূরউল্লা খাঁ বলিত। নূরউল্লা খাঁ যশোহরের ফৌজদার নামে অভিহিত হইলেও তিনি কার্য্যতঃ যশোহর, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও হিজলীর যুক্ত ফৌজদার ছিলেন।

নূরউল্লা যে সময়ে ফৌজদার হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই নানা প্রকার আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলায় যশোহর সরকারের প্রজাবর্গ বড়ই অশান্তি ও উদ্বেগে কাল কাটাইতেছিল—তাই প্রথমেই নূরউল্লা রাজ্য সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

পুঁড়ার জমীদারদিগের আদি পুরুষ মন্ত্রণাকুশল রামভদ্র রায় * নূরউল্লার দেওয়ান ছিলেন। রামভদ্রের পরামর্শে ও জামাতা লাল খাঁ এবং হিসাবনবিস রাজারাম সরকারের সহকারিতায় ফৌজদার নূরউল্লা অতি অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ মিটাইয়া শান্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নূরউল্লা তিন হাজারী মনসবদার ছিলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ, সৈন্য সামন্তের ধার বড় ধারিতেন না, অধিকাংশ সময়েই কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থকর ব্যবসায়ে ব্যপৃত থাকিয়া শান্তশিষ্টভাবে দিন কাটাইতেন—ফৌজের ভার তাঁহার জামাতা লাল খাঁর হস্তেই ছিল।

কিন্তু ভগবান কাহারও অদৃষ্টেই নিরবচ্ছিন্ন সুখশান্তি লখেন নাই! ১১০৭ হিজিরায় (১৬৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে) চেতো বরোদার জমীদার শোভাসিংহের সহিত তদানীন্তন বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের বিবাদ উপস্থিত হইল। শোভাসিংহ প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণরামের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারায় তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে উড়িষ্যার পাঠান দলপতি রহিম খাঁর শরণাপন্ন হন। পাঠানেরা চিরদিনই মোগলের শত্রু; সুতরাং রহিম খাঁ এ সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। হৃদয়ে মোগল রাজ্যের ধ্বংস বাসনা গুপ্ত রাখিয়া তিনি শোভাসিংহের সাহায্যার্থে সসৈন্যে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। সম্মিলিত সৈন্য বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলে রাজা কৃষ্ণরাম সসৈন্যে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে কৃষ্ণরামকে নিহত করিয়া বিদ্রোহী সৈন্য রাজপ্রাসাদ অধিকার এবং সমস্ত ধন রত্ন হস্তগত করিল; রাজা কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎ রায় ব্যতীত রাজপরিবারবর্গের সকলেই বন্দী হইলেন। রাজকুমার জগৎ রায় কোন প্রকারে পলাইয়া ঢাকার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর নিকট সমস্ত অবগত করাইলেন। ইব্রাহিম খাঁ এই ঘটনা সামান্য মনে করিয়া যশোহরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁর উপর

* দেওয়ান রামভদ্রের বংশ এখনও বর্ত্তমান। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি-এল এই বংশের সন্তান।

বিদ্রোহ দমনের জন্য এক পরোয়ানা জারি করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফৌজদার নূরউল্লা যশোহরে আসিয়া সৈন্যসামন্ত হইতে ব্যবসা বাণিজ্যে অধিক মনোনিবেশ পূর্ব্বক যুদ্ধ বিগ্রহের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরং সুবাদারের পরোয়ানা পাইয়া তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। সুবাদারের হুকুম তামিল না করিলেও উপায় নাই—তাই বহু চেষ্টায় যাহা কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহা লইয়া সাহসে ভর করিয়া যশোহর হইতে বর্দ্ধমানাভিমুখে রওনা হইলেন। কিন্তু হুগলী পর্য্যন্ত পৌছিয়াই শুনিলেন বিদ্রোহী দল সেইদিকেই আসিতেছে। এ সংবাদে ফৌজদার অন্ধকার দেখিলেন—তাঁহার যেটুকু সাহস ছিল তাহাও লোপ পাইল। তাড়াতাড়ি হুগলী-দুর্গে আশ্রয় লইয়া নূরউল্লা চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গভর্ণরের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। বিদ্রোহিগণ দূরে থাকিয়া ফৌজদারের অবস্থা সমস্ত বুঝিতে পারায় এবং বণিক সেনাপতি হইতে তাহাদের কোন আশঙ্কার কারণ নাই দেখিয়া সতেজে আসিয়া হুগলী অবরোধ করিয়া বসিল। ফৌজদার সাহেব বিষম বিপদ গণিয়া স্বীয় জীবনরক্ষা করিবার জন্য বড়ই ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। হুগলীর কেল্লায় থাকাও নিরাপদ মনে করিলেন না। অবশেষে রাত্রিকালে গোপনে নৌকা-যোগে গঙ্গা পার হইয়া যশোহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহী হুগলী অধিকার করিল।

হুগলীর ব্যাপারে ফৌজদার নূরউল্লা বুঝিতে পারিলেন যে এখন আর অন্যের হস্তে সৈন্য সামন্তের ভার ন্যস্ত থাকিলে তাঁহার ফৌজদারী গদি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। সৈন্যাধ্যক্ষ লাল খাঁ অধীনস্থ সৈন্যগণের সাহায্যে দেশ মধ্যে অবাধ অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার করিতে থাকায় ফৌজদার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন, তাই হুগলীর পরাজয়ে সৈন্যগণের অকর্ম্মণ্যতা হেতু ধরিয়া লালখাঁর হস্ত হইতে সৈন্যভার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন।

যশোহর—চাঁচড়ার তদানীন্তন রাজা মনোহর রায়ের সহিত নূরউল্লার বিশেষ সখ্য ছিল। উভয়ে উভয়ের বিপদে আপদে সুখে সম্পদে সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। বঙ্গের গৌরব রাজা সীতারাম মনোহর ও নূরউল্লার সমসাময়িক। কিন্তু কি মনোহর কি নূরউল্লা কেহই তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। অথচ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহসও তাঁহাদের ছিল না। দিগ্বিজয় ব্যপদেশে সীতারাম সমুদ্রতীরবর্ত্তী রামপাল নামক স্থানে গমন করিলে সুযোগ পাইয়া নূরউল্লা ও মনোহর তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে ধাবিত হইলেন। সম্মিলিত সৈন্য সবেগে আসিয়া রাজধানীর অদূরবর্ত্তী বুনাগাতি নামক স্থানে ছাউনী করিল। সীতারামের রাজধানী অরক্ষিত ছিল না। দেওয়ান যদুনাথের উপরেই সমস্ত ভার ছিল। বিরুদ্ধ-পক্ষীয় সৈন্যের আগমন সংবাদ পাইয়াই দেওয়ান সসৈন্যে আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিলেন। দেওয়া-নের ক্ষিপ্রকারিতা কৌশল ও সাহস দেখিয়া রাজা ও ফৌজদার বিপদ গণিয়া রাত্রিযোগেই সসৈন্যে বুনাগাতি পরিত্যাগ করিলেন। রামপাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া সীতারাম সমস্ত জ্ঞাত হইয়াই কালবিলম্ব না করিয়া শত্রুদমনে ধাবিত হইলেন। রাজসৈন্য মনোহরের রাজধানী চাঁচড়ার অনতিদূরস্থিত ভৈরবনদের তীরবর্ত্তী নীলগঞ্জে আসিয়া পৌছিলেন। সসৈন্যে সীতারামকে রাজধানীর এত নিকটে দেখিয়া ধন, প্রাণ ও ভয়ে অনন্যোপায় হইয়া মনোহর সীতারামের শরণাপন্ন হইলেন। বন্ধুবৎসল মনোহর সম্ভবতঃ ফৌজদার সাহেবের জন্যও সীতারামকে অনুনয় বিনয় করিতে ত্রুটি করেন নাই। এখানে সীতারামের সহিত মনোহর ও নূরউল্লার এক সন্ধি হইল—কিন্তু সন্ধি হইলে কি হইবে? ইঁহারা সর্ব্বদাই সীতারামের পতনের জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

নূরউল্লা খাঁ অতি শিষ্ট শান্ত ও চরিত্রবান ছিলেন। গুণের আদর করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেন না। যে ধর্ম্মে বা যে জাতির যে আচার তিনি ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন.

উদারভাবে তাহা গ্রহণ করিতেন। কথিত আছে শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও অন্নপ্রাশনাদি ক্রিয়া উপলক্ষে হিন্দুগণ অধ্যাপক পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় প্রদানে পরোক্ষভাবে দেশে অবৈতনিক শিক্ষার প্রচার কল্পে যে সাহায্য করেন, এ প্রথাটিকে স্বসমাজে প্রবর্ত্তিত করিবার মানসে নূরউল্লা তাঁহার পিতার পারলৌকিক কার্য্যোপলক্ষে বহুসংখ্যক হিন্দু অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণপত্র নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকে লিখিত হইয়াছিল।

"খোদা-পাদারবিন্দদ্বয়-ভজনপরঃ
পশ্চিমাস্যঃ পিতা মে
শ্রুত্বা আল্লাল্লেতি বাণীং মুর্শিদনিকটে
মর্ত্ত্যদেহং জহৌ সঃ।
খাসী-মুর্গী-রহিতা কদ্রু-কচু-ভবিতা
মৎ পিতুশ্চালশে খানা
শ্রীশেখো নূরনামা গলধৃতবসনা
শুদ্ধি সম্পাদনীয়া॥"

ইহা অনুবাদ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—খোদার পাদপদ্ম যুগল ভজন-তৎপর আমার পিতা পশ্চিমাস্য হইয়া আল্লা আল্লা বাণী শ্রবণ করিতে করিতে মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার যে চাল্‌শেখানা* হইবে তাহাতে খাসী মুর্গীর অর্থাৎ মাংসের কোন সম্পর্ক থাকিবে না—কদ্রু কচু দ্বারা নিরামিষভাবেই হইবে। অতএব আমি শ্রীনূর সেখ গলবস্ত্র হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে আপনারা উপস্থিত হইয়া এই কার্য্য শুদ্ধভাবে সম্পন্ন করাইয়া বাধিত করিবেন।

অধ্যাপকবর্গের বাসের জন্য তাঁহার বাড়ী হইতে বহু দূরে খোলা ময়দানে এক বৃহৎ সাময়িক আবাস প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেখানে হিন্দু কর্ম্মচারী ভৃত্যবর্গ ব্যতীত আর কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। এমন কি নূরউল্লা নিজেই সেখানে যাইতেন না। ফৌজদারের অমায়িক ব্যবহার, সমদর্শিতা ও উদার ভাবে মুগ্ধ হইয়া নানাদেশের বহু অধ্যাপক পণ্ডিতই তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক মির্জ্জানগরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দান গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এ প্রবাদের মূল্য কি জানি না। তবে স্বধর্ম্মরত, শাস্ত্রজ্ঞ নিষ্ঠাবান হিন্দু অধ্যাপকবর্গ মুসলমানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে মুসলমানের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা যেন গল্প বলিয়া মনে হয়; কিন্তু হউক গল্প—ইহা হইতে আমরা তাৎকালিক মুসলমানের হিন্দু আচার ব্যবহারে প্রীতি এবং হিন্দুর সহিত মুসলমানের মেশামেশির যে চিত্র দেখিতে পাই, সাধারণের চক্ষে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও ঐতিহাসিকের নিকট তাহার মূল্য খুব অল্প বলিয়া মনে হয় না।

ফৌজদার নূরউল্লা কতদিন জীবিত ছিলেন, বহু অনুসন্ধানেও আমরা তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই। তবে তিনি যে বহুদিন ধরিয়া ফৌজদারী শাসনদণ্ড পরিচালন করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন, জনপ্রবাদ ও বহুসংখ্যক ধ্বংসাবশেষ অবিসংবাদেই তাহা প্রমাণ করিতেছে।

নূরউল্লার পর তাহার পুত্র মীর খলিল যশোহরের ফৌজদার হইলেন। দায়েম উল্লা ও কায়েম উল্লা নামক দুই পুত্র রাখিয়া ফৌজদার মীর খলিল উপযুক্ত সময়ে মানবলীলা সংবরণ করেন। পিতার মৃত্যুসময়ে দায়েম উল্লা ও কায়েম উল্লা উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তাৎকালীন রাজবিধানানুযায়ী তাঁহারা কেহই ফৌজদারী গদি পাইবার অধিকারী হন নাই। ভ্রাতৃদ্বয় সাবালক হইলে অস্থাবর সম্পত্তি বিভাগ লইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। এই বিবাদের ফলে ভ্রাতৃযুগল পরস্পর পরস্পরের হস্তে নিহত হন। দায়েম উল্লা, হিদায়েৎ উল্লা ও কায়েম উল্লা, রহমৎ উল্লা নামক এক একটি পুত্র রাখিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর সম্রাটের আদেশানুসারে ভ্রাতৃযুগল বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদে আহূত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার তদানীন্তন সুলতান সুজা খাঁ তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন

* মৃত্যুর পর চল্লিশ দিনের দিন মুসলমানগণের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ঐ উপলক্ষে ভোজকে বঙ্গীয় মুসলমানেরা "চাল্‌শে খানা" কহিয়া থাকেন।

উপযুক্ত বন্দোবস্ত না করায় বা সম্যক মনোযোগ না দেওয়ায় ভগ্নমনোরথ হইয়া কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় ভ্রাতৃদ্বয় মির্জ্জানগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহারা কিছুদিন সংসার চালাইয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের দুরবস্থার কথা অবগত হইয়া চাঁচড়ার রাজগণও অনেকদিন তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে চাঁচড়ার রাজপরিবার অবস্থাহীন হওয়ায় তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মমত খরচ চালাইতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। এই সময়ে তাঁহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে। অবশেষে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আপনাদের অবস্থা জ্ঞাপন পূর্ব্বক পেন্সনের প্রার্থনা করিয়া ভ্রাতৃযুগল যশোহরের তদানীন্তন কালেক্টর সাহেবকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন—

"আমাদের প্রপিতামহ ভারত-সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুধ ভাই ছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে বাঙ্গলার নবাব-নাজিম পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি ভূতপূর্ব্ব নাজিমগণের আবাসস্থান মির্জ্জানগরে অবস্থান করিতেন। নূরউল্লার পুত্র মীর খলিলও নাজিম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মীর খলিলের পুত্র দায়েম উল্লা ও কায়েমউল্লা উভয়েই নাবালক ছিলেন বলিয়া কেহই নবাবীপদ প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু তাঁহারা বিবাদ করিয়া পরস্পর পরস্পরের হস্তে নিহত হন। ইহার পর সুজা খাঁ নবাব হয়েন। তিনি মুর্শিদাবাদে রাজগদি স্থাপিত করিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশে আমরা সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম কিন্তু আমাদের জন্য কোনও বন্দোবস্ত না হওয়ায় আমরা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া মির্জ্জানগরে ফিরিয়া আসিয়াই আমাদের যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ফেলি। আমরা উভয়েই এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। যে রাজা আমাদের প্রপিতামহের নিকট হইতে জমীদারী পাইয়াছিলেন, এতদিন তিনি আমাদের ভরণপোষণের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি নিঃস্ব। তাই আমরা আপনাদের শরণ লইতেছি। হায়, জোসেফের ভাগ্যের ন্যায় মনুষ্যের ভাগ্যও কি পরিবর্ত্তনশীল।"

ভ্রাতৃদ্বয়ের এই দরখাস্ত পাইয়া নিজ মন্তব্য সহ কালেক্টর সাহেব তাহা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। গভর্ণমেণ্ট ভ্রাতৃযুগলের প্রত্যেককে মাসিক ১০০্ টাকা পেন্সন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পেন্সন মঞ্জুর হইয়া আসিতে না আসিতে হতভাগ্য হিদায়েৎ উল্লা মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার অদৃষ্টে আর পেন্সন ভোগ হইল না। রহমৎ উল্লা জীবনের শেষ চারি বৎসর মাত্র পেন্সন ভোগ করিয়া কতকটা শান্তিতে থাকিতে পারিয়াছিলেন। হিদায়েৎ উল্লা ও রহমৎ উল্লার কোনও সন্তান সন্ততি ছিল না।

হিদায়েৎ উল্লা ও রহমৎ উল্লার লিখিত বিবরণ তাঁহাদের বিশ্বাসমতে সত্য ছিল কিনা তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত বংশপরিচয় যে ভ্রমসঙ্কুল ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আওরাঙ্গজেব যে এক সময় তাঁহার দুধ-ভাইকে বাঙ্গলার নবাবী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ইহা সত্য, কিন্তু তাঁহার নাম নূরউল্লা নহে—ফিদৈ খাঁ। ফিদৈ খাঁ ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং নূরউল্লা খাঁ যে নবাব নাজিম ছিলেন না তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়। আবেদন পত্রে যে সুজা খাঁর উল্লেখ আছে, তিনি ১৭২৫ হইতে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার নবাব ছিলেন এ কথাও সত্য। তাঁহার রাজধানী মুর্শিদাবাদে ছিল তাহাও মিথ্যা নয়, কিন্তু আবেদনকারিগণের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যে পদলাভ করিবার চেষ্টা করিয়া শেষে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা মির্জ্জানগরের ফৌজদারের পদ, বাঙ্গলার নবাবী নহে।

মির্জ্জানগর।

নূরনগরের জল বায়ু দূষিত হইলে ফৌজদার নূরউল্লা মির্জ্জানগরে নিজের সদর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন, একথা পূর্ব্বেই উক্ত

হইয়াছে। মির্জ্জানগর বর্ত্তমানে একটি সামান্য গ্রাম মাত্র, কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে যশোহরের তদানীন্তন কালেক্টর ইহাকে জেলার বৃহত্তম নগরত্রয়ের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখন এই মির্জ্জানগর ও ইহার অনতিদূরস্থিত আধুনিক ত্রিমোহিনী গ্রামে ফৌজদারের বাসস্থান, কেল্লা, বন্দীশালা ও ইমামবাড়ী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

নবাব বাড়ী।

ত্রিমোহিনীর অর্দ্ধ মাইল দূরে—কেশবপুর যাইবার রাস্তার পাশে বহুদূরব্যাপী ইমারত ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ আছে। লোকে ইহাকেই নবাব বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। নবাব বাড়ীর ভিতর সমচতুষ্কোণ দুইটি চত্বর বা প্রাঙ্গণ আছে। প্রাঙ্গণদ্বয় একটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত। উত্তর প্রাঙ্গণের উত্তরে ও দক্ষিণ প্রাঙ্গণের দক্ষিণেও উচ্চপ্রাচীর বর্ত্তমান। প্রাঙ্গণ-দ্বয়ের পূর্ব্ব দিকের দুই সারিতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসগৃহাদি দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহগুলির ছাদ খিলান করা, খুব সম্ভবতঃ এই গৃহগুলিতে ফৌজদার সাহেবের ভৃত্যবর্গ বাস করিত। এই সমস্ত গৃহের ভিতর ব্যতীত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার আর দ্বিতীয় পথ নাই। উত্তর প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকেই ফৌজদার সাহেবের নিজের বাসগৃহ—ইহার ছাদে তিনটি গম্বুজ আছে। গৃহের স্থাপত্যসম্পদ জীর্ণ হইলেও গম্বুজ শোভিত ছাদটি এখনও বর্ত্তমান। ফৌজদার সাহেবের বাসগৃহের সম্মুখেই প্রাঙ্গণে একটি চৌবাচ্চা আছে—তাহা ইষ্টক প্রস্তর দিয়া বাঁধান। এই চৌবাচ্চার জলে ফৌজদারের পুরমহিলাগণ স্নানাদি করিতেন। নগর প্রান্তবাহিনী ভদ্রানদী * হইতে যে কৌশল পূর্ব্বক জল উত্তোলন করিয়া ভৃত্যবর্গের বাসগৃহের ছাদের উপর দিয়া চৌবাচ্চা পূর্ণ করা হইত এবং স্নানাবগাহনান্তে ঐ জল ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী যোগে বাহির করিয়া দেওয়া হইত তাহার অনেকটা নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়।

গোর স্থান।

দক্ষিণ প্রাঙ্গণে কয়েকটি কবর দৃষ্ট হয়—বহির্ব্বাটীতে কয়েকটি কবর আছে।

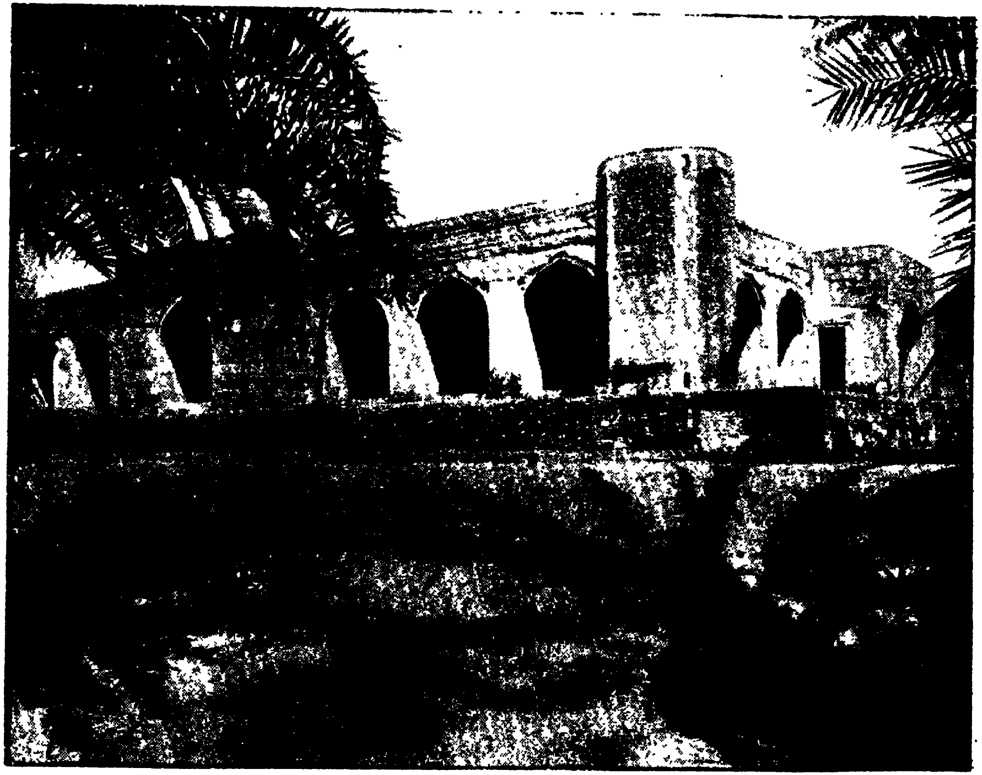
কেল্লা বাড়ী।

নবাব বাড়ীর একমাইল দক্ষিণে নূরউল্লার কেল্লাবাড়ী বা গড়। এই স্থানটি ৬।৭ হাত উচ্চ। সম্ভবতঃ গড়ের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত 'মতিঝিল' নামক গড়খাই হইতে মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া এই স্থানটি উচ্চ করা হইয়াছে। লোকের বিশ্বাস, এই উচ্চ ভূমিখণ্ড প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার কোন চিহ্ন নাই। গড়টি দৈর্ঘ্যে পূর্ব্ব পশ্চিম মুখী এবং পূর্ব্বদিকেই ইহার সদর দরজা ছিল। গড়ের মুখ তিনটি কামান দ্বারা সুরক্ষিত ছিল বলিয়া শুনা যায়। ইহার দুইটি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যশোহরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বোফর্ট (Mr. Beaufort) লইয়া গিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকে বলে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একটি কামান দ্বারা কতকগুলি বেড়ী প্রস্তুত করেন এবং অন্যটী দ্বারা রাস্তা মেরামতের সময় রোলারের (Roller) কাজ করান হইত। শুনিয়াছি শেষোক্ত কামানটি যশোহরের একটি ভদ্রলোক ৩৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। তৃতীয় কামানটী এখনও গড়ের নিকটবর্ত্তী কোনও এক ধান্যক্ষেতে পতিত আছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এ কামানটি "দেব অংশী" হইয়াছে। এক সময়ে ৩০০ শত কয়েদীও একটি হস্তী বহু চেষ্টা করিয়াও নাকি কামানটি উত্তোলন বা স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। কামানটি লৌহ-নির্ম্মিত এবং দৈর্ঘ্যে ৩৷৷০ হস্ত পরিমাণ।

বন্দিশালা।

কেল্লা বাড়ীর সদর দরজার অনতিদূরে বাহির দিকে সারি সারি কতকগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত আঁধার কোঠা আছে। যশোহরের ইতিহাসকার ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব

* ভদ্রানদী বর্ত্তমানে মজিয়া গিয়াছে কিন্তু নূরউল্লার সময়ে উহা বহতা ছিল।



নুরজাহানের সমাধি মন্দির

অনুমান করেন যে ইহাই ফৌজদারের জেলখানা। এই আঁধার কোঠার দুইটির ভিতর কয়েকটা সঙ্কীর্ণ কূপ আছে—বন্দিশালার বাহিরেও একটী সুগভীর বৃহৎ কূপ দৃষ্ট হয়। এই সকল কূপে অপরাধীদিগকে নিক্ষেপ করা হইত। কূপগুলির ভিতর দিকটা এত মসৃণ যে কয়েদীগণের কোন প্রকারেই ইহার গা বাহিয়া উপরে উঠিয়া পলাইবার সুযোগ বা সাধ্য ছিল না।

ইমামবাড়া।

ত্রিমোহিনীর বাজারের নিকটেই ফৌজদারের ইমামবাড়ী বা উপাসনালয়। এই উপাসনালয়ে কখনও ছাদ ছিল কিনা সন্দেহ। একখণ্ড উচ্চ জমীর একটি দেওয়াল এবং দেওয়ালের পূর্ব্বদিকেই একটি লম্বা বেদী ছিল, স্থানটি দেখিলে এইরূপই অনুমান হয়। ভগবদ্ভক্ত ফৌজদার বেদীতে উপবেশন করিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া নমাজাদি করিতেন। দেওয়ালের চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যশোহরের তাৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব (Mr. Westland) দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ১০০ শত বৎসর হয় নাই এই শ্রেণীর ফৌজদারগণের লোপ হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের বহুচিহ্ন লোকলোচনপথবর্ত্তী থাকা সত্ত্বেও ইহার মধ্যেই মির্জ্জানগরের অধিবাসিগণের অন্তর হইতেও তাঁহাদের স্মৃতি একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে—তাই উপরিউক্ত ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, মুর্শিদাবাদের জনৈক নবাব সাময়িক বাসের জন্য এই স্থানে প্রাসাদ ও কেল্লাদি নির্ম্মাণ করিয়া অবসর সময়ে এখানে আসিয়া বাস করিতেন বলিয়া ইহা 'নবাবী বাড়ী' 'কেল্লা বাড়ী' ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলে কিশোর খাঁ নামক একজন অতি দুর্দ্দান্ত মুসলমান জমীদার এখানে ছিলেন—এ সমস্ত তাঁহারই ঘরবাড়ী কেল্লা ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ মাত্র। যশোহর কালেক্টারীর সরকারী নথীপত্র দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, এই প্রদেশে বাস্তবিকই কিশোর খাঁ নামক একজন মুসলমান জমীদার ছিলেন। তাঁহার সমস্ত জমীদারী যশোহরের দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক নীলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। লোকে বলে, এই কিশোর খাঁ, নূরউল্লা খাঁর জামাতা লাল খাঁর বংশধর।

মির্জ্জানগরে আসিয়া নূরউল্লা খাঁ ফৌজের ভার তাঁহার জামাতা লাল খাঁর হস্তে দিয়া, নিজে ব্যবসায় বাণিজ্য লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নবীন যুবক লাল খাঁ অসীম ক্ষমতা হাতে পাইয়া বড়ই অত্যাচারী ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন। লাল খাঁর উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারে গৃহস্থ-বধূগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। ফৌজদারের কাণে একথা পৌঁছিল। কিন্তু তিনি প্রথমে তাহাতে বড় মনোযোগ করিলেন না, কিম্বা দুর্দ্দান্ত লাল খাঁকে শাসন করার ক্ষমতা ও সাহস তখন বুঝি তাঁহার ছিল না। কোনও বাধা না পাইয়া, লাল খাঁর অত্যাচার চরমে উঠিল। অবশেষে ফৌজদারের প্রিয় ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রাজারাম সরকারের সুন্দরী-নাম্নী বিধবা কন্যার উপর লাল খাঁর পাপদৃষ্টি পড়িল। ছলে বলে সরকারঝিকে * বাধ্য করিবার জন্য পিশাচ লাল খাঁ বিধিমতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দুর্দ্দান্ত পশু লাল খাঁর ক্রোধ ও জেদ বাড়িয়া গেল এবং অবশেষে সুন্দরীর বৃদ্ধ পিতা রাজারামকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল।

এইবার ফৌজদার সাহেবের আসন টলিল। তিনি বিশেষ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পশুপ্রকৃতি লাল খাঁকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। লাল খাঁর ঔরসে নূরউল্লার কন্যার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। লাল খাঁর নির্ব্বাসনের পর ফৌজদার সাহেব নিজ শিশু

* 'সরকারঝি' নামক একটি সুবৃহৎ দীঘি সুন্দরীর পিত্রালয় খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামে এখনও তাঁহার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। সে স্মৃতি বড় করুণ। বারান্তরে আমরা তাহা বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইব।—লেখক।

দৌহিত্র বহরম খাঁকে কিছু জমীদারী দিয়া ঐখানেই রাখিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র জমীদার কিশোর খাঁ এই বহরম খাঁর পুত্র।

আমি একে একে ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং স্থানীয় ও দূরবর্ত্তী জনপ্রবাদ এবং কিম্বদন্তী অবলম্বনে "নূরউল্লাখাঁ" শীর্ষক প্রবন্ধ শেষ করিলাম। ইতিহাসের কতটুকু সত্য, কতটুকু কল্পিত, জনশ্রুতির কতটুকু গ্রহণীয় কতটুকু বা ত্যজ্য, সে মীমাংসা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি যাহা পাইয়াছি, তাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, অবিকৃতভাবে এস্থলে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। শেষ বিচারভার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের হস্তে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

দৃষ্টিলাভ

(গল্প)

ললিতার কথা

অদৃষ্ট নিশ্চয়ই সকলের এক নয়,—তাহা হইলে আর লোকে উহাকে অদৃষ্ট বলিবে কেন?

মোটে দুই বৎসর হইল আমার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু ইহারই মধ্যে বিবাহিত জীবনের একটা উৎকট সত্য এমনই ভীষণমূর্ত্তিতে আমার জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া উঠিয়াছে যে, আজ সত্য সত্যই ভাবিতেছি,—আবার যদি এই দুই বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইতাম! কিন্তু যাহা হারাইয়াছি, তাহা চিরকালের জন্যই গিয়াছে। গত যাহা, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, তাই হতাশার একটা বিশাল কালো পাথর বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া জীবনটাকে নিতান্ত দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের গোড়াতেই সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা এমন করিয়া চুরমার হইয়া যাইবে তাহা তো মুহূর্ত্তের জন্যও পূর্ব্বে ভাবিতে পারি নাই। বিবাহিত জীবনে এমন একটা অশোভন ব্যাপারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে তাই বা কে জানিত? এমনভাবে নারীত্বের অবমাননা সহ্য করিবার মত ক্ষমতা তো আমার নাই। তাই আজ মনে হইতেছে এই দুঃখে ক্ষোভে শতধা ছিন্ন হৃদয় লইয়া কি করিয়া জীবন কাটাইব।

দুই একটি সখীর কাছে আমার এই দুঃখের কথা জানাইয়াছি। কিন্তু এমনি কপাল, আমার জীবনেও যে এই ব্যাপারটা থাকিতে পারে ইহা তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। তাহাদেরেই বা কি বলিব! সকলের মত তাহারাও তো বিশ্বাস করে যে আমাদের বিবাহ ভালবাসার বিবাহ। এই ভালবাসার কথা যখন ভাবি তখন আশ্চর্য্য হই। আজ বাস্তবতার কষ্টিপাথরে তথাকথিত ভালবাসার মূল্য জানিতে তো আর বাকী নাই!

অবশ্য সখীদের দোষ দেওয়া চলে না। তাহারা জানিত, তাঁহার সহিত আমার বাবার পরিচয় অনেক দিনের। বিবাহের বছরখানেক পূর্ব্বে হইতে সে পরিচয়টুকু দিন দিন আরও ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ থাকিত। বাবার সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে শ্রাবণের তেমন বারি-ঝর ঝর সন্ধ্যায়ও তাঁহাকে এতটুক শৈথিল্য করিতে কোনো দিন দেখা যাইত না। তাঁহার এত উৎসাহের যে বিশেষ কিছু কারণ ছিল তাহা তো মনে হয় না। কেন না, তাঁহার সম্মুখে আমি কখনো বাহির হইতাম না। হঠাৎ কোনো সময় আসিতে যাইতে হয়তো চকিতে তাঁহার দৃষ্টিপথে একটু পড়িতাম। দিদিরা তাহা লইয়াই কত ঠাট্টা করিত। তাহারা

হলপ করিয়া বলিত যে এই এক মুহূর্ত্তেই আমি তাহার হৃদয়ের সমস্ত রক্ত মন্থন করিয়া দিয়া আসিয়াছি এবং সেই ক্ষণিকের মন্থন হইতে যে সুধাটুক উঠিবে তাহাতেই বেচারা সারাদিন মশগুল হইয়া থাকিবে। ইহা লইয়া দিদিদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে গিয়া হাসিয়া পরাস্ত হইয়াছি। তাহা ছাড়া, মাঝে মাঝে তিনি যখন কলেজ হইতে প্রোফেসারী করিয়া ফিরিয়া আসিতেন,তখন পথে আমাদের বেথুন কলেজের লম্বা গাড়ীর ভিতর হঠাৎ কোনোদিন আমার সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া যাইত। পাশের কোনো মেয়ের প্রশ্নে বুঝিতে পারিতাম, আমি বোধ হয় অলক্ষিতে একটু রাঙিয়া উঠিয়াছি। এবং লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি,তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত মুখে একটুখানি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং চিত্তের চঞ্চলতা পদদ্বয়ের অনাবশ্যক গতিবৃদ্ধিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

আজ সে সব কথা মনে হইলে শুধু একটু ম্লান হাসি আসে।

উভয়েই জানিতাম, আজ বাদে কাল আমাদের বিবাহ হইবে। তাই মনের ভিতর অনেকখানি সুখ-কল্পনা দিন দিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল। বাংলাদেশে ইহাই পূর্ব্বরাগের চূড়ান্ত। কাজেই এমত অবস্থার বিবাহকে উভয় পক্ষেরই বন্ধুবান্ধবেরা ভালবাসার বিবাহ মনে করিবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

গুরুজনদিগের অশেষ আশীর্ব্বাদ ও সমবয়সীদের অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ মাথায় করিয়া নবজীবনে প্রবেশ করিলাম। হাজার জল্পনা কল্পনায় মগজ তখন ভরপুর ছিল। কিন্তু জীবনক্ষেত্রে সেগুলির গোড়াপত্তন হইতে না হইতে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার সেখানে গজাইয়া উঠিল যে, আমার সারা পাঁজর ভাঙিয়া একটা হতাশার নিঃশ্বাস বাহির হইল—হায়, কেন এমন হইল!

সকলেই আশা করিয়াছিল যে আমার জীবন বেশ সুখের হইবে। কেন না, আমার স্বামীর মত মানুষ আজকালকার দিনে হয় না। কোনো দিক দিয়া এক বিন্দু খুঁত ধরিবার কিছু নাই। আমারও সে বিশ্বাসই ছিল; কিন্তু সে ভুল ভাঙ্গিতে বেশী সময় লাগিল না।

সংসারে এক একটা লোক দেখা যায় যাহাকে প্রকৃতি সকল গুণে ভূষিত করিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু চিত্তে এমন একটি দুর্ব্বলতা দিয়া দিয়াছেন যে সেটুকু তাহার সারাটা জীবনকে একটা মহা ব্যর্থতায় পরিণত করিয়া ফেলে। সেই দুর্ব্বলতাটুক কোথা হইতে কিরূপে আসে, তাহা অনেক সময় হয়তো ঠিক বুঝা যায় না; কিন্তু তাহার কার্য্যটা খুবই সুস্পষ্ট; কেন না, উহা চিত্তের অন্যান্য বিশেষত্বের সহিত ভীষণভাবে অসমঞ্জস হইয়া পড়ে।—এইখানেই জীবনের ট্র্যাজেডি।

পৃথিবীতে কোন্ কোন্ জিনিষকে বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্য, শাস্ত্রে নাকি তাহার একটা তালিকা আছে। পুরুষ শাস্ত্রকার রমণীকে সেই তালিকার ভিতর ফেলিয়াছেন। রমণীর অপরাধ, পুরুষের মত মিথ্যা বড়াই করিবার অভ্যাস তাহার নাই।

তথাকথিত শাস্ত্রের বহু বিধানই তিনি চিরকাল হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু জানি না, কোন্ অজ্ঞাত কারণে, বিবাহের পর হইতে নারীর প্রতি শাস্ত্রের এই আদেশই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া তিনি মানিয়া লইলেন, এবং তাঁহার কার্য্যকলাপেও সেই ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল।

শুনিয়াছি,এতকাল তিনি নারীর প্রতি অখণ্ড-শ্রদ্ধার সহিত বন্ধুবান্ধবদের কাছে এমন সকল বক্তৃতা ঝাড়িয়া আসিয়াছেন যে, তাঁহার বন্ধুরা ঠাট্টা করিয়া বলিতেন যে তাঁহাকে কোনো নারী-অধিকার-প্রার্থী মহিলা-সমিতির মুখপাত্র করিয়া দিলে তাহাদের উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু হঠাৎ বিবাহের পর হইতে কেন যে তাঁহার নারীভক্তি এমন করিয়া ঘোর নাস্তিকতায় আসিয়া পরিণত হইল, তাহার কোনও সঙ্গত কারণ তো খুঁজিয়া পাইলাম না। কিন্তু রোগটা যে তাঁহাকে বেশ শক্তভাবেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে সে বিষয় কোনো সন্দেহ করা চলে না। কারণ, দিনে দিনে তাঁহার

আজ আর বেশী কিছু লেখবার নেই। সর্ব্বদা সাবধানে থেকো ও ডাক্তার দেখিয়ো। এখানে সকলে ভাল। উত্তর দিতে যেন দেরী কোরো না। ইতি

কোনো প্রকারে রাগ এবং মনের অবস্থা চাপিয়া রাখিয়া এই চিঠির উত্তর লিখিয়া দিলাম। ললিতার সাহস দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। সরলতার ভণ্ডামির অর্থ যে কি তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না।

কয়েকদিন পরই আমার চিঠির উত্তর পাইলাম। পড়িয়া আমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। চিঠিখানা এইরূপ :—

পুরী।

শ্রীচরণেষু—

তোমার চিঠি পেলেম। তোমার জ্বর এখন সারাদিনই একটু একটু থাকে শুনে ভয়ানক চিন্তিত আছি। আমার এখনই কলকাতা যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু কার সাথে যাব? আর দিন দশেক পর বাবা যাবেন, তখন ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই।

আমাদের এই নূতন সঙ্গীটির পরিচয় চেয়েছ। তাঁর পরিচয় আর কি দেব? তাঁকে তুমি চিনবে না। তাঁর নাম ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। এঁদের সাথে আমাদের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না। এখানে এসে হয়েছে।

হ্যাঁ, প্রত্যেকদিনই ধীরেন বাবু আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যান। বাবা এক আধদিন যান। আমি, লাবণ্য ও ধীরেন বাবু এই তিন জনেই বেড়িয়ে আসি। ধীরেন বাবু সমুদ্রের ধার থেকে নানা রকম ঝিনুক কুড়িয়ে এনে আমার আঁচলে দেন, আমি সেগুলি পরিষ্কার করে একটা কাগজের বাক্সে ভরে রেখেছি। কলকাতায় নিয়ে যাব, তখন দেখবে সেগুলি কি সুন্দর।

হাঁ, ধীরেন বাবু সারাদিনই প্রায় আমাদের এখানে কাটিয়ে দেন। কাল ভারি এক মজা হয়েছিল। আমি দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে আছি; বিকেলে জেগে উঠে যখন খাট থেকে নামব, অমনি কাপড়ে টান লেগে পড়ে গেলাম। চেয়ে দেখি আমার আঁচল খাটের, পায়ার সাথে বাঁধা রয়েছে। দেখেই বুঝতে পারলাম, এ ধীরেন বাবুর কাণ্ড। কখন চুপি চুপি এসে কাজটি সেরে সরে পড়েছেন। এ জন্যে আচ্ছা শাস্তি দিয়েছিলাম তাঁকে।

আজ তবে আসি। অনেক রাত হয়েছে। বড্ড ঘুমও পেয়েছে। এখানে সকলে ভাল। চিঠি পেয়েই উত্তর দিয়ো। চিন্তিত রইলেম। ইতি—

তোমার ললিতা।

রাগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। সরলতার কি ঘোর ভণ্ডামি! যাহাদের আমি সাপের মত ভয় করি, তাহাদের সঙ্গেই কি না!—কি সাহস!… নাঃ, আর দেরী নয়, আজই পুরী রওনা হইতে হইবে। এবার একটু বড় রকমের শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে।…

সন্ধ্যার একটু আগে পুরী আসিয়া পৌছিলাম। একমাত্র সাথী ব্যাগটাকে কুলির মাথায় তুলিয়া দিয়া ত্বরিতপদে শ্বশুরমহাশয়ের বাসার দিকে ছুটিয়া চলিলাম। —পথে দুই একটা লোক অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিতেছিল, বোধ হয় অন্তরের বিষাক্ত অবস্থাটা মুখে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বাসায় আসিয়া দেখি, কেহ নাই। পুরাতন পশ্চিমা ভৃত্য আসিয়া কুলির হাত হইতে ব্যাগটা নামাইয়া লইল। উপর্য্যুপরি তাহাকে কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম। বেচারা ভ্যাবাচেকা খাইয়া কোনোপ্রকারে তাহার বহুক্লেশার্জ্জিত বাঙ্‌লা ভাষায় উত্তর করিল, "বাবু কাঁহা গিছেন তো হামি জানি না। মাই লোক তুনো বেড়াতে গিছেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাই লোককো সাথ কোন গিয়া?"

যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই শুনিতে হইল। সে বলিল, "ধীরেন বাবু গিছেন।"

আর এক মুহূর্ত্ত দেরী না করিয়া সমুদ্রের ধারে ছুটিলাম। একটা কিছু প্রলয় ঘটাইবার উন্মাদনায় যে আমার সারা দেহ মন ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

তখনও ঠিক সন্ধ্যা হয় নাই। সূর্য্য অল্পক্ষণ হইল অস্ত গিয়াছে। আকাশের কোণে দুই একখানা রাঙা মেঘ তখনো ভাসিতেছিল। দূরের মানুষ সহজে চিনিয়া উঠা যায় না। কিছু দূরে দেখিলাম, দুইটি রমণী ও একটি বালক আমার দিকেই আসিতেছে। আর একটু অগ্রসর হইয়াই বুঝিতে পারিলাম যে রমণী দুইটি ললিতা ও লাবণ্য। বেশ বুঝিতে পারিলাম যে তাহারা আমাকে চিনিয়াছে; এবং চিনিয়াই বিরক্তির সহিত মাথা হেঁট করিয়া, চেষ্টাকৃত অন্যমনস্কতার সহিত পথ চলিয়া আসিতেছে।

তাহাদের সম্মুখীন হইলে লাবণ্য যেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল, "একি! নীহার বাবু যে! আপনার না অসুখ? অসুখ নিয়ে হঠাৎ চলে এলেন যে?"

আমি তাহার এই কপট উচ্ছ্বাসে যোগ না দিয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম, "না অসুখ তেমন কিছু নয়।... তোমরা কখন বেড়াতে বের হয়েছিলে?"—কথাগুলি বোধ হয় সহজভাবে বলিতে পারি নাই; আর, আমার দৃষ্টিও বোধ হয় কাহাকে খুঁজিতেছিল।

লাবণ্য আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, মৃদুহাসি চাপিয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে খুঁজ্‌ছেন? ধীরেন বাবুকে?"—বলিয়া সে পার্শ্বস্থ বালককে বলিল, "যাও তো ধীরেন বাবু, তোমার মেসোমশায়কে নমস্কার কর।"

কথা শুনিয়া আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। বলে কি! এতক্ষণ যে সব কঠোর বাক্য ক্রমাগতই মনের ভিতর শাণ দিয়া তীক্ষ্ণ করিয়া লইতেছিলাম, তাহা লাবণ্যের এক কথায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, পৃথিবী কেন দ্বিধা হয় না * * *

সন্ধ্যা তখন তাহার স্নেহের ছায়া ধরণীর বুকে বুলাইয়া দিয়াছে। উপরে উন্মুক্ত আকাশ, সম্মুখে অনন্ত-বিস্তৃত সাগর, আর আমার পার্শ্বে বিধাতার শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি নির্ব্বাক দুইটি রমণীমূর্ত্তি,—তাহাদের সারা অঙ্গ হইতে যেন হাজার ধিক্কারের বাণ আমার উপর বর্ষিত হইতেছিল। নিমেষে আমার দৃষ্টি নিজের অন্তরের দিকে পতিত হইল, দেখিলাম তাহা কত ক্ষুদ্র আর কি জঘন্য। আজ আর নিজেকে প্রবঞ্চনা করিবার উপায় নাই—অন্তরের কুৎসিত মূর্ত্তিটা যেন পর্ব্বতের আকার ধারণ করিয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। মিথ্যা যুক্তি বা অজুহাত দিয়া আজ আর তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিবার যো নাই। মনে হইতে লাগিল, এই যে একটি রমণী তাহার সর্ব্বস্ব দিয়া আমাকে একান্ত আশ্রয় করিয়া আছে, আমি কি তাহার এই ঐকান্তিকতাকে উপযুক্ত সম্মান করিয়া তাহাকে বিন্দুমাত্র আশ্রয় দিতে পারিয়াছি? আমার কলুষিত মন, আমাদের উভয়ের ভিতর এ কি ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে? * * * লজ্জা ও অনুতাপে আমার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল।

কয়েক মিনিট পর সকলের ক্লেশকর নীরবতা ভাঙ্গিয়া বলিলাম, "ললিতা, আমায় ক্ষমা কর। আজ আমার নূতন দৃষ্টিলাভ হয়েছে, আজ আর আমার কিছু বুঝ্‌তে বাকী নেই।"

কোনো কথা নাই। মাথা নীচু করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "বল আমায় ক্ষমা করলে?"

সে শুধু বলিল, "বাসায় চল, হিম পড়ছে।"—চাহিয়া দেখিলাম, মেঘ কাটিয়া গিয়া চাঁদ উঠিয়াছে।

* * * *

তারপর কয়েকদিন পুরীতেই ছিলাম। কিন্তু এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে আমার আর প্রবৃত্তি বা সাহস ছিল না। ললিতা বা লাবণ্যও আর এ কথা তোলে নাই—যেন কিছুই ঘটে নাই, সকলেরই ভাবটা এই রকম ছিল।

কিন্তু একটা চিন্তা আমাকে মাঝে মাঝে একটু

কষ্ট দিতে লাগিল। ললিতা যে এ ভাবে চিঠি লিখিয়া এমন করিয়া আমাকে জব্দ করিবে, এটা আমি কিছুতেই সহজ মনে মানিয়া লইতে পারিলাম না। কিন্তু আর এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইতেছিল না।

আরও কয়েকদিন গেল। ভাবিলাম, সঙ্কোচে থাকা ভাল নয়। তাই একদিন ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু যাহা শুনিলাম তাহাতে বড় দমিয়া গেলাম। নিজের বুদ্ধির উপর এতকাল খুব বিশ্বাস ছিল; দেখিলাম, অতটা বিশ্বাস করা ঠিক নয়।

ললিতা বলিল, চিঠির কথা সে আগে কিছুই জানিত না। সমস্তই লাবণ্যের কাণ্ড। হাতের লেখাও লাবণ্যের। সে শুধু ললিতাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিল যে, দুই সপ্তাহ সে আমার কাছে চিঠি লিখিতে পারিবে না এবং আমার চিঠিও পড়িতে পারিবে না। বাস্তবিক ষড়যন্ত্রের কোনো খোঁজই সে আগে রাখিত না।

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই দেখি, লাবণ্য বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে বলিলাম, "জালিয়াতের কি শাস্তি?"

সে দিব্য সপ্রতিভভাবে বলিল, "ফাঁসি।"

"কোথায় জানলে?"

"কেন নন্দকুমারের—"

"তা'হলে তোমারও—"

সে মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া বলিল, "ফাঁসি হওয়া উচিত। কিন্তু হতে পারে না।"

"কেন?"

"বিচার করে কে?"

"কেন, আদালতের জজ।"

"পুরুষ জজ! যার মাথার ভিতর আপনারই মত মগজ!" * * *

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

প্রবাসীর সুখ

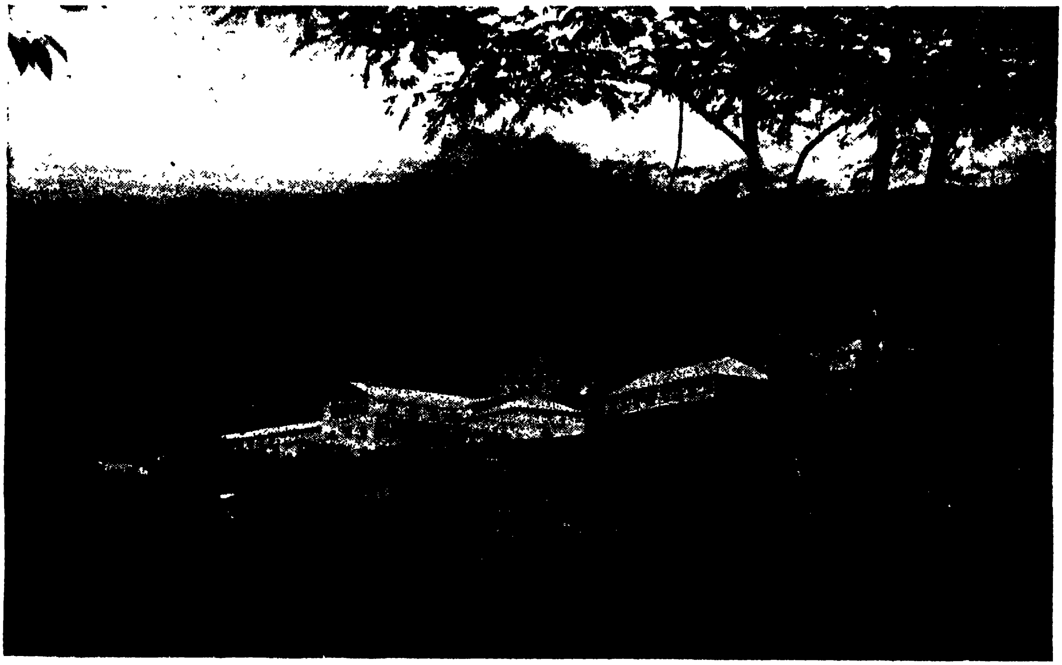
প্রবাস হইতে ফিরি পড়ি গেল চোখে,
মোর লেখা পত্রগুলি পুষ্পগন্ধ মেখে
সাজান রয়েছে যত্নে পালঙ্ক শিয়রে;
প্রিয়ারে পুছিনু হেতু। সুমধুর স্বরে
চারি বৎসরের মোর শিশুপুত্র আসি
জড়াইয়া জানুযুগ কহে হাসি হাসি—
"মা যে রোজ চুমু খায় ওই চিঠি নিয়ে
আরো কিছু চিঠি মারে দিওতো কিনিয়ে।"
লজ্জায় আরক্ত মুখ পলাইলা প্রিয়া,
পুত্র পানে ক্রুদ্ধ আঁখি, দুরু দুরু হিয়া।
প্রবাসের শতদুঃখ তখনি পাশরি
চুমিনু পুত্রের মুখ তুলি অঙ্কোপরি।
কহিনু সম্ভাষি প্রিয়া—"হোয়োনা বিমুখ,
এযে তৃষিতের জল, প্রবাসীর সুখ।"

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

চা

পানীয় দ্রব্যের মধ্যে সুশীতল জলের পরেই বোধ হয় চা'র আসন। একটা সামান্য পানীয় এত অল্প দিনের মধ্যে পৃথিবীতে, বিশেষতঃ আমাদের গরম দেশে, এমন বহুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবা—এমন কি রমণীরা পর্য্যন্ত এখন বাঙ্গালীর ঘরে প্রত্যূষে এক পেয়ালা চা পান করিয়া 'পিত্তরক্ষা' করিয়া থাকেন।

ডাক্তার জন্‌সন্‌ চা পান সম্বন্ধে নিজের একটি অতি সুন্দর হাস্যোদ্দীপক ছবি অঙ্কিত করিয়া বলিয়াছেন—"A hardened and shameless tea-drinker who for twenty years diluted his meals with only the infusion of this fascinating plant; whose kettle had scarcely time to cool; who with tea amused the evening, with tea solaced the midnight and with tea welcomed the morning." অর্থাৎ—আমি একজন পাপিষ্ঠ ও নির্লজ্জ চা-খোর। ক্রমাগত কুড়ি বৎসর যাবৎ এই মনোমুগ্ধকর চা পাতার উষ্ণ তরলসারে আমি আমার প্রত্যেক বারের খাদ্যকে তরল করিয়া লইয়াছি; আমার কেটলিটি কখনও শীতল হইবার সময় পাইত না; চা আমার অপরাহ্নের চিত্তবিনোদক, নিশীথের আরাম, এবং চা পান করিতে করিতেই আমি প্রতি উষাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করিতাম।"—এ প্রকার অনেক 'ডাক্তার জন্‌সন্‌' আমাদের দেশেও আছেন সন্দেহ নাই।



চা-বাগানের ম্যানেজার সাহেবের বাংলা।

চা সম্বন্ধে জানিবার ও শিখিবার অনেক আছে। আমার সামান্য অনুসন্ধানের ফল বন্ধুবান্ধবদিগের উপকারে আসিতে পারে, এই সরল ও নির্দ্দোষ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আজ তাহা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। চা'র

আদি বাসস্থান, জাতি, বর্ণ, উন্নতি-অবনতি, গুণাগুণ, লাভালাভ ও চাষ-ব্যবসায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, সঙ্ক্ষেপে বলিব।

চা'র আদি জন্মভূমি।

একটি মনুষ্যজাতির ইতিহাস লিখিতে হইলে যেমন বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী তাহার আদি নিবাসস্থানের অনুসন্ধান করিতে হয়—জাতিটি কোন্ বৃহৎ জাতির অন্তর্গত, প্রথমতঃ কোন্ দেশে ছিল, তার পরে কোথা হইতে কোথা আসিল,—তাহার উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের মূল সূত্রগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে যেমন এই সকল সরঞ্জামগুলির প্রয়োজন হয়, অন্যান্য জীবজন্তু, গাছগাছড়ার ইতিহাস লিখিতে গেলেও ঠিক ঐ প্রণালীই অবলম্বন করা আবশ্যক।

চা গাছটির বাড়ী কোথায়, আসামে কি চীনদেশে? নামটি খালি চা না হইয়া যদি অনুস্বারযুক্ত হইত, তবে অনায়াসেই আমরা বলিতে পারিতাম উহা হোয়াংহো কিম্বা ইয়াংচিকিয়াং দেশেরই অধিবাসী--বিশেষতঃ যখন প্রায় এক হাজার বৎসর যাবৎ চীনদেশে চা'র চাষ ও কারবার চলিতেছে। ইউরোপীয়ানেরাও বহুকাল যাবৎ ক্যাণ্টন নগর হইতেই আপনাদের দেশে চা'র আমদানী করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ও দীর্ঘ বেণীধারী প্রতিবেশীদিগের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, এতকালের লালিত পালিত ঘরের ছেলেটি আজ পরের হইয়া গেল। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মহা গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন, চা গাছটি সর্ব্ব প্রথম আসাম দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

চা গাছ সম্বন্ধে চীনদেশে বহুকাল যাবৎ অনেক অদ্ভুত কিম্বদন্তী বংশপরম্পরাক্রমে চলিত হইয়া আসিয়াছে। কল্পনাপ্রিয় প্রাচ্যদেশীয় লোকদিগের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে এই বিষয়ে একটি বড়ই রহস্যজনক গল্প উদ্ভূত হইয়াছে। গল্পটি এই—"৫৪৩ খৃষ্টাব্দে রাজা কজুস্বর পুত্র যুবরাজ বোধিধর্ম্ম বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গমন করেন। তিনি কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনের বশবর্ত্তী হইয়া অনিদ্রাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। বহুকাল আপনাকে নিদ্রাসুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়া, পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিন একটি পর্ব্বতের পাদদেশে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। ক্রমাগত চল্লিশ দিন নিদ্রিত থাকিয়া জাগরিত হন। তখন তাঁহার নিজের উপর বড়ই ধিক্কার উপস্থিত হইল, এবং অত্যন্ত বিরক্তির সহিত আপনার চক্ষের পাতার লোমগুলি উপড়াইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। কিছুকাল পরে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় দেখিতে পাইলেন, ঐ লোমগুলি এক একটি ছোট ছোট ঝোপ গাছে পরিণত হইয়াছে। তিনি ঐ গাছের পাতার রসাস্বাদন করিয়া দেখিলেন, চক্ষু দুটিকে খুলিয়া রাখিবার উহার এক অদ্ভুত শক্তি আছে। অবশেষে জানা গেল যে ঐ গাছগুলিই চা গাছ।"

চা পান করিলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এই প্রচলিত মতের সঙ্গে এই গল্পটির যথেষ্ট সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। বোধিধর্ম্ম সম্বন্ধে এই পৌরাণিক গল্পটা অনেক পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি। বেলডন সাহেব যেমন লিখিয়াছেন, গল্পটি এখানে ঠিক তদ্রূপই বিবৃত করা গেল। সে যাহা হউক, বোধিধর্ম্মের চক্ষের লোমে চা গাছের সৃষ্টি না হইয়া থাকিলেও, একথা চীনদেশবাসীরা বিশ্বাস করে যে, তিনিই প্রথম চীনদেশে চা গাছ লইয়া যান। অবশেষে চীনদেশ হইতেই জাপানরাজ্যে এই চা গাছের প্রবেশলাভ হয়। জাপান-প্রচলিত একটি কিম্বদন্তীতেও এই বোধিধর্ম্মের উল্লেখ আছে।

গল্পগুজব ছাড়িয়া দিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যুক্তি বিচার অবলম্বন করিয়াও ইহা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চা'র জন্মস্থান আসামের বনভূমি, চীনদেশ নহে। প্রকৃতির একটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই যে, তিনি যে দেশে যে জিনিষটির প্রথম সৃষ্টি করেন, তাহার পরিপুষ্টির জন্য সেই দেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকাই প্রকৃষ্ট। স্থানান্তরিত হইলে তাহার অবনতির সূচনা হইয়া থাকে। চা গাছটা যে চীনদেশের মাটিতে প্রথম

জন্মে নাই, প্রকৃতির এই নিয়মটিই তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। বড় বড় উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, অধুনা উদ্ভিদ্-জগতে Thea, Bohea, Thea Viridis, Thea Assmica প্রভৃতি যে সকল বিভিন্নজাতীয় চা গাছ দেখা যায়, সেগুলি সমস্তই Thea Assamica নামক এক মহাজাতি হইতে উৎপন্ন। ইহাও কোথাও তদ্রূপ দেখা যায় না। তৃতীয় প্রমাণ—চীন ও জাপান উভয় দেশের কিম্বদন্তীতেই প্রচলিত আছে যে,চা গাছ ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে এবং চীনদেশ হইতে জাপানে নীত হইয়াছিল।

চা'র বর্ত্তমান অবস্থা।

৩৯° ডিগ্রী নর্থ ল্যাটিচুডস্থ জাপান রাজ্য হইতে



চা-ক্ষেত্র।

প্রত্যক্ষ করা যায় যে এই চা গাছ আসামদেশে যেমন সুস্থ সবল ও হৃষ্টপুষ্ট হয়, চীনদেশে তেমন হয় না। আসামে এক একটি গাছ স্বাভাবিক অবস্থায় ১৫ হইতে ২০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। উপরে এক একটি পাতা ৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়! কিন্তু চীনদেশে চা গাছ কেবল মাত্র ৩।৪ ফুট উচ্চ হয় এবং তাহার পাতা ৪ ইঞ্চির বেশী দীর্ঘ হয় না। ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, চা গাছ চীনদেশের মৃত্তিকায় অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, মনুষ্যের দুরধিগম্য আসামের গভীর জঙ্গলেও স্বাভাবোৎপন্ন চা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চীনদেশের

আরম্ভ করিয়া, বরাবর উষ্ণপ্রধান দেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণগোলার্দ্ধের অন্তর্গত জাভা, অষ্ট্রেলিয়া, নেটাল, ও ব্রেজিল পর্য্যন্ত চা'র চাষ বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে আসাম ও তদন্তর্গত কাছাড় ও শ্রীহট্টে, চট্টগ্রাম ও ছোটনাগপুর প্রদেশে, এবং পার্ব্বতীয় স্থানের মধ্যে পাঞ্জাবে কাঙড়া, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে কুমায়ুন, গাড়োয়াল ও দেরাদুনে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নীলগিরিতে, হিমালয় ও তৎপাদদেশস্থ দার্জ্জিলিঙ, টিরাই ও ডুয়ার্সে এবং লঙ্কাদ্বীপে প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। গ্রীষ্মকালের যথেষ্ট

উত্তাপ পাইলে দক্ষিণ ইংলণ্ডেও চা উৎপন্ন হইতে পারে।

চা'র জাতিভেদ।

চা উদ্ভিদ্-জগতের Ternstromiaceae নামক শ্রেণীর অন্তর্গত Camillia-জাতিভুক্ত। বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা বিভিন্ন রকমের সমস্ত চা গাছই Thea Assamica হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহারই অন্তর্গত করিয়া থাকেন। এই চা দুই প্রকার, Thea Bohea অর্থাৎ black tea এবং Thea Viridis অর্থাৎ green tea. ইহা ছাড়া Brick tea নামক এক প্রকার চা মধ্য এসিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়। উহা ভিন্নপ্রকার গাছ হইতে উৎপন্ন না হইলেও, প্রস্তুতপ্রণালীতে ভিন্নরকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু Robert Fortune নামক এক সাহেব ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রমাণ করিয়াছেন যে, এক রকম গাছ হইতেই Black tea ও Green tea প্রস্তুত হইতে পারে। প্রস্তুতপ্রণালীর বিভিন্নতা হইতেই বিভিন্ন নাম দেওয়া যায়। সে যাহা হউক, আমাদের দেশে Green tea প্রায় কেহ ব্যবহার করে না বলিয়া উহার চাষও নাই।

বাণিজ্য ব্যবসায়ে Black tea ও Green tea নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথাঃ—Black Tea—ফ্লাওয়ারি পিকো, অরেঞ্জ পিকো, পিকো, পিকো সাউচঙ্গ, সাউচঙ্গ, কঙ্গু ও বোহিয়া। Green tea—গান পাউডার, ইম্পিরিয়াল, হাইসং, ইয়ং হাইসং, হাইসং সিকন ও কেপার। এক গাছের এক ডালেই বিভিন্ন পাতা হইতে এই সকল বিভিন্ন প্রকারের চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। উপরোক্ত চা সকল ছাড়া নানা রকমের Scented Tea (সুগন্ধি চা) বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। চা'র সঙ্গে বাহিরের সুগন্ধি ফুল মিশ্রিত করিয়াই এই সকল চা প্রস্তুত হয়। চা প্রস্তুত প্রণালীর বর্ণনার সময় ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইবে।

চা গাছ উৎপাদনের উপযুক্ত মৃত্তিকা ও জল বায়ু।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকাতে মিঃ জেমস্ অ্যাপ্‌টন্ নামক অভিজ্ঞব্যক্তি এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহারই অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। চা বাগান সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

উষ্ণ, আর্দ্র, যে স্থানের জল বায়ু সাধারণতঃ প্রায় সর্ব্বদাই সমভাবাপন্ন থাকে ও যেখানে সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, সেই স্থানই চা গাছের চাষের পক্ষে প্রশস্ত। যে জমিতে বালুকা ও সহজে গুঁড়া হয় এমন মৃত্তিকা গভীরভাবে বর্ত্তমান, এবং যে জমির মৃত্তিকার ভিতর দিয়া বৃষ্টির জল সহজেই চুয়াইয়া যাইতে পারে, সেই জমিতে চা গাছ সহজেই পুষ্ট হইয়া থাকে। যে দেশের জমি ঢেউ খেলান (undulating) এবং সর্ব্বদাই বৃষ্টিপাতে আর্দ্র থাকে অথচ জল দাঁড়ায় না, কিম্বা বৃষ্টির জল বাগানের মৃত্তিকা ধৌত করিয়া লইয়া যায় না, তাহাই চা বাগানের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। এই জন্যই চা বাগানের জন্য পর্ব্বতের গাত্র সংলগ্ন ভূভাগ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

চা গাছের জীবনবৃত্তান্ত।

৫৪৩ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ বোধিধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম চীনদেশে চা গাছ লইয়া যান। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ইহা নিঃসংশয়িতরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রায় একহাজার বৎসর যাবৎ চা'র চাষ-ব্যবসায় চীনদেশে প্রচলিত আছে। জাপানে চা'র গাছ প্রথম চীনদেশ হইতেই নীত হইয়াছিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা প্রথম জাভাদ্বীপে চা বাগান প্রস্তুত করেন।

সুবিখ্যাত হাণ্টার সাহেব তাঁহার "Statistical Account of Darjeeling" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,

বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে Mr. Bruce কর্ত্তৃক চা গাছ আবিষ্কৃত হয়। ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরেজদিগের প্রথম যুদ্ধের সময় Mr. Bruce এক বছর যুদ্ধজাহাজের অধ্যক্ষরূপে উত্তর-আসামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি আসামের বন্য-প্রদেশে সর্ব্বপ্রথম কতগুলি স্বভাবজাত চা গাছ দেখিতে পাইয়া তথা হইতে কিছু বীজ ও গাছ সঙ্গে লইয়া আসেন। কিন্তু এন্সাইক্লোপীডিয়া বৃটানিকাতে জেম্‌স্ অ্যাপ্টন্ সাহেব লিখিয়াছেন, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর-দিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া Sir Joseph Banks সাহেব বঙ্গদেশের Economic plants সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তিনি তাহার এই অনুসন্ধান-বিবরণীতে চা গাছকে সমস্ত Economic plantsদের মধ্যে একটি উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন। ইহার পরে, ১৮২০ খৃষ্টাব্দে Mr. David Scott কুচবিহার ও রঙ্গপুর হইতে কতগুলি পাতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট চা পাতা বলিয়া পাঠাইয়া দেন। ঐ পাতাগুলি কলি-কাতাস্থ গভর্ণমেণ্ট বটানিক্যাল গার্ডেন্সের সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট Dr. Wallichকে পরীক্ষা করিতে দেওয়া হয়। তাঁহার পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে সেগুলি Camillice জাতীয় চা গাছ। সর্ব্বশেষে ঐ পাতাগুলি Society of London এ যাইয়া উপস্থিত হয়। ঐ সভার সভ্যগণ বিশেষ অনুসন্ধানের পর উহাকে Assam tea বলিয়া দৃঢ়ভাবে আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। এই অনুসন্ধানের ফলে এবং Captain Francis Jenkinsএর জবরদস্তিতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে Dr. Wallich স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে আসাম দেশ প্রকৃতই খাঁটি চা গাছের জন্মভূমি।



চা বাগানের কুলি রমণী।

তৎপরে ভারতহিতৈষী Lord William Bentinck এ দেশে চা'র চাষ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন; এবং উত্তম বীজ ও চা চাষ সম্বন্ধে সুদক্ষ কয়েকজন কর্ম্মচারীকে চীনদেশে প্রেরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে Captain Francis Jenkinsএর অনুরোধে Lord Bentinckএর কমিটি আসামে চার চাষ হইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এই অনুসন্ধানে আসামের বন্যভূমিতে স্বভাবজাত বহু সংখ্যক চা গাছের আবিষ্কার হয়। হাণ্টার সাহেব বলেন, চা গাছ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেই, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট উত্তর আসামের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরে প্রথম

Experimental garden স্থাপন করেন। লক্ষ্মীপুরে অকৃতকার্য্য হইয়া শিবসাগর জেলার অন্তর্গত জয়পুর নামক স্থানে ঐ বাগানের গাছগুলি স্থানান্তরিত করিয়া নূতন বাগান প্রস্তুত করেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে Assam Tea Companyর নিকট এই বাগান বিক্রয় করা হয়। উল্লিখিত যে সমস্ত মহাত্মাদের যত্ন চেষ্টা ও অনুসন্ধানের ফলে আজ সাহেব মহাশয়েরা প্রচুর অর্থলাভ করিয়া, যথেষ্ট আরাম ও আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, আসামের প্রত্যেক চা বাগানে তাঁহাদের স্মৃতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, চা ব্যবসায়ীদিগের অন্তর হইতে, শুধু কৃতজ্ঞতা কেন, প্রায় সমস্ত উচ্চ ও সুকুমার বৃত্তিগুলিই অন্তর্হিত হইয়াছে। নতুবা যে সকল হতভাগ্য দীন দরিদ্র কুলীরা আপন আপন দেহের শোণিতপাত করিয়া প্রভুসেবা করিতেছে, তাহাদিগকে ধনেপ্রাণে ধ্বংস করিবার জন্য এত আয়োজন দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হইত না। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে উল্লিখিত Assam Tea Company সর্ব্বপ্রথম আসামে চা'র ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

চা'র চাষ।

আমাদের দেশে জল বায়ুর উৎকৃষ্টতা ও জমির উপযুক্ততার জন্য আসাম, দার্জ্জিলিঙ, নীলগিরি প্রভৃতি কতিপয় স্থানই চা চাষের অত্যন্ত উপযোগী। তন্মধ্যে দার্জ্জিলিঙই সর্ব্বোত্তম স্থান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আসামের জলবায়ু সাহেবদিগের শরীরের পক্ষে যেমনই অস্বাস্থ্যকর, দার্জ্জিলিঙ তেমনই স্বাস্থ্যকর। এই জন্যই আসামী চা অতি উপাদেয় হইলেও, দার্জ্জিলিঙে চা'র ব্যবসায় দিনদিনই বিস্তৃতিলাভ করিতেছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে,দার্জ্জিলিঙে অবস্থান কালে, চা'র ব্যবসায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য Consolidated Tea Companyর সুপ্রসিদ্ধ Bloomfield Tea Garden আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানকার এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মুস্তফী মহাশয় অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত আমাদিগকে চা'র চাষ ও প্রস্তুত প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেবের পুস্তকে বিবৃত বিষয় আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হওয়ায়, উহার অনুবাদই এখানে প্রদান করিলাম। "The Field" নামক সংবাদপত্রে চা'র চাষ সম্বন্ধে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রখানি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে "Bengal Statistical Reports"এ পুনর্মুদ্রিত হয়। হাণ্টার সাহেবের পুস্তকোদ্ধৃত ঐ পত্রখানির মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"চা'র জমি পছন্দ করিবার সময় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি রাখিতে হয়। যথা—মাটি,কুলি মজুর সংগ্রহের সুবিধা, নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে বা ষ্টীমার ষ্টেশনে চা পাঠাইবার রাস্তার সুবিধা করা যায় কি না, জমিতে অত্যধিক জঙ্গলে পূর্ণ কি না, সহজে পরিষ্কার জল পাইবার সুবিধা ও স্থানের স্বাস্থ্য,—সর্ব্বশেষ উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ। এখন সকলেই জানেন, চীনদেশের বীজ অপেক্ষা আসামজাত Hybrid বীজই উৎকৃষ্ট। চা বাগানে সাধারণতঃ তিন প্রকার বীজ বপন করা হয়। ১ম—চীন দেশীয় বীজ, ২য়—আসামের স্বভাবজাত চা গাছের বীজ; ৩য়—"Hybrid" বীজ। চীনদেশীয় চা গাছগুলি খর্ব্ব হইলেও অত্যন্ত দৃঢ়কায়,এবং সকল জমিতেই পুষ্টিলাভ করে। কিন্তু আসাম দেশের চা গাছগুলি অতিশয় কোমলপ্রাণ, যেখানে সেখানে পরিপুষ্ট হয় না। বর্ত্তমান সময়ে চীনা ও আসামী গাছের সংমিশ্রণে একপ্রকার শঙ্করজাতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারই নাম Hybrid। এই Hybrid বীজ হইতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বীজ সংগ্রহ হইলে খাস ও বংশদণ্ড দ্বারা সাময়িক একখানা বাংলা ও কুলি মজুরদিগের বাসের জন্য কতগুলি কুঁড়েঘর প্রস্তুত করা উচিত। বর্ষা অবসানে অক্টোবর মাসই এই সকল কার্য্য আরম্ভ করিবার উপযুক্ত সময়।

একশত একর জমীতে প্রায় তিনশত স্ত্রী পুরুষ কুলীর



চা-বাহী কুলি।

পরে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে বৃক্ষমূল শিকড়াদি উৎপাটন করিয়া ফেলা হয়।

তাহার পর সমস্ত জমিতে চারি-ফুট অন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঞ্চি পুঁতিয়া বীজ বপনের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। ঐ সকল স্থানে একফুট প্রশস্ত ও ১৮ ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া, জমির উপরিস্থিত মৃত্তিকা দ্বারা তাহা পূর্ণ করিতে হয়। নবেম্বর মাসের শেষভাগেই প্রায় এই সকল কার্য্য সমাধা হইয়া যায়।

ঐ সকল গর্ত্তের নরম মৃত্তিকার এক ইঞ্চি নীচে তিন চারিটি বীজ বপন করিয়া দিতে হয়। বীজ বপন শেষ হইলে বাগানের পরিদর্শকের বাসোপযোগী বাড়ী ঘর আস্তাবল ও কুলীদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণের প্রতি মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। ঐ সময়ে জমিতে নূতন উৎপন্ন তৃণগুল্মাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার করিতে হয় ও নূতন চারা-গাছের কোনওটি মরিয়া গেলে, নার্সারি হইতে নূতন চারা আনিয়া তথায় স্থাপন করিতে হয়। বীজ

সাহায্য আবশ্যক হইয়া থাকে। ইহারা প্রথমে জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করে। সুবৃহৎ বৃক্ষগুলি সমূলে ছেদন না করিয়া উহার ডাল পালা বাকল ছাঁটিয়া কাটিয়া ফেলা হয়। তার পর তৃণ গুল্মাদি পরিষ্কার করিয়া একস্থানে জমা করিয়া, তদুপরি মধ্যমাকৃতি বৃক্ষগুলি কাটিয়া স্তূপাকার করা হয়। এই স্তূপীকৃত তৃণগুল্ম ও বৃক্ষগুলি সম্পূর্ণ-রূপে শুষ্ক হইলে উহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রথম বারের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে প্রায়ই দেখা যায়, সমস্ত-গুলি সম্পূর্ণ দগ্ধ হয় নাই। যেগুলি বাকী থাকে, পুনরায় একস্থানে স্তূপাকার করিয়া দগ্ধ করা হয়।

রোপণের সঙ্গে সঙ্গে আবার পূরণের জন্য এইরূপ একটি নর্সারিও প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। নূতন জমিতে চা-বাগান প্রস্তুত হয় বলিয়া মৃত্তিকার যথেষ্ট উর্ব্বরতা থাকে, কোনরূপ সার দিবার প্রয়োজন হয় না। কীটা-দির কবল হইতে চারা গাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। মধ্যে মধ্যে গাছের সারির ভিতর গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া চাষ দেওয়া উচিত এবং গাছগুলির গোড়ায় জঙ্গল সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় বৎসরে গাছগুলি চারি পাঁচ ফুট উচ্চ হয়।

তখন সেগুলিকে ছাঁটিয়া, অনধিক বিশ ইঞ্চি দীর্ঘ রাখিতে হয়। এই উপায়ে পত্র আহরণ সহজ হয় ও কর্ত্তিত স্থান হইতে নূতন নূতন ডাল পালার (shoots) বিস্তার হয়। শীতকালে গাছের রস নিম্নগামী হয়, সেই জন্যই ঐ সময় গাছ ছাঁটা অত্যাবশ্যক। এই কার্য্যের জন্য নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত উপযুক্ত সময়। এক মাস কি দেড় মাসের মধ্যেই ঐ গাছের নবোদ্গত ডালগুলি (shoots) ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহাই পাতা তুলিবার প্রকৃষ্ট অবস্থা। গাছের এইরূপ নূতন ডাল বাহির হওয়াকে Flush করা বলে। আট মাস সময়ের মধ্যে প্রায় ১৫।২০ দিন অন্তরই চা গাছগুলি ঐরূপ Flush করে। সাধারণ চা-বাগানে ৫ম বা ৬ষ্ঠ বৎসরে প্রতি একরে প্রায় সওয়া ছয় মণ চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দ্বাদশ বর্ষে প্রত্যেক একরে প্রায় ৯০০ পাউণ্ড অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ১১ মণ চা উৎপন্ন হয়। দ্বাদশ বর্ষেই উৎপন্ন চার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, কিন্তু ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত চা গাছগুলি স্বচ্ছন্দে আমাদিগকে চা যোগাইয়া থাকে।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীঅনন্তনারায়ণ সেন।

গান

(বাউলের সুর)

মিছে তুই ভাবিস মন!
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন।
পাখীরা বনে বনে
গাহে গান আপন মনে;
নাই বা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান অকারণ।
ফুলটি ফোটে যবে
ভাবে কি কাল কি হবে!
(না হয়) তাদের মতন শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি' বিতরণ।
মনোদুখ চাপি মনে
হেসে নে সবার সনে,
(যখন) ব্যথায় ব্যথীর পাবি দেখা,
জানাস্ রে প্রাণের বেদন।
আজি তোর যার বিরহে
নয়নে অশ্রু বহে,
হয় ত তাহার পাবি দেখা, গানটি হ'লে সমাপন।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

জীবনের মূল্য

(উপন্যাস)

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

মুখোপাধ্যায়ের অনুতাপ।

পান্থশালায় জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ যথাসময়ে ত্রিবেণী গ্রামে পৌঁছিল। তাঁহার পকেটে যে চিঠি ছিল, তাহা হইতে পান্থশালার অধ্যক্ষ তাঁহার নাম ধাম অবগত হইয়া সেইদিনই ত্রিবেণীতে মৃতের আত্মীয় স্বজনকে অনুসন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দেন।—কলিকাতায় হরিপদ এবং চন্দ্রগড়ে রাজকুমার এই সূত্রে ত্রিবেণী হইতে সংবাদটা পাইল।

গ্রামে লোকে গোপনে বলাবলি করিতে লাগিল, গিরিশ মুখোপাধ্যায়ই গরীব ব্রাহ্মণের মৃত্যুর জন্য দায়ী; সে যদি আদালতে নালিস করিয়া ব্রাহ্মণকে ভিটামাটী উচ্ছন্ন না করিত, তাহা হইলে এ বয়সে তাঁহাকে ত চাকরির চেষ্টায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না!

লোকে গোপনে এইরূপ বলাবলি করিতে লাগিল, কারণ প্রকাশ্যে বলার সাহস কাহারও নাই। অনেকেই গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের নিকট টাকা ধারে,—যাহারা ধারে না, তাহারাও আশা রাখে যে সময়ে আবশ্যক হইলে টাকা ধার পাইবে। লোকে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিবার কালে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিলেও কথাটা ক্রমে গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের কাণে গেল।

সতীশ দত্তই প্রথমে গিয়া সংবাদ দিয়াছিল।

অনেকের স্বভাব এই যে, কেহ যদি তাহাকে আসিয়া বলে "অমুক তোমার নিন্দা করিতেছিল," তাহা হইলে সংবাদদাতার উপর সে খুসী হইয়া উঠে, ভাবে এ ব্যক্তি আমার বন্ধু, বিপক্ষদলভুক্ত নহে। গিরিশ মুখোপাধ্যায়ও কতকটা এই প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহা সতীশ পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়াছিল।

শুধু নিন্দার সংবাদটা নহে, সতীশ আসিয়া বলিল, সেই নিন্দার প্রতিবাদ করিতে গিয়া অমুকের সঙ্গে তাহার ত প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অমুকের সঙ্গে চিরদিনের জন্য মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, কাহারা কাহারা নিন্দা করে, কোথায়, কি উপলক্ষে এবং কি ভাষায় তাহারা এ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, তাহা "বিতং" করিয়াই সতীশ প্রকাশ করিল।

শুনিয়া গিরিশ মুখোপাধ্যায় প্রথমটা আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"দেখ দেখি লোকের একবার অন্যায়! ভারি সব আমার ধার্ম্মিক রে! আমার পাওনা টাকার জন্যে আমি নালিস করব না? ছেড়ে দেব? যার দিন পূর্ণ হয়েছে, সে মরবে;—তার জন্যে কি আমি দোষী!"

সতীশ দত্ত বলিল—"অদৃষ্টের উপর কারু কি হাত আছে? ওর অদৃষ্টে ছিল ঐ তারিখ ঐ সময় ঐ স্থানে ঐ অবস্থায় মরবে;—সে তাকে মরতেই হবে যে! আপনি নালিস করলেও মরতে হবে, না করলেও মর্‌তে হবে। নৈলে শাস্ত্রই যে মিথ্যা হয়ে যায় মশায়! হুঁঃ—জগদীশ বাঁড়ুয্যে ত কোন কীটাণুকীট—স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু কালের হাত এড়াতে পারেন? দিন ক্ষণটি উপস্থিত হলে, তাঁদেরও মরতে হয়—একটি মিনিট এধার ওধার হবার যো নেই।"

গিরিশ বলিলেন—"তাঁরা ত অমর, তাঁরা মর্‌বেন কি করে?"

সতীশ বলিল—"অমর—এক সৃষ্টিতে অমর। কিন্তু সৃষ্টি কতবার ধ্বংস হয়েছে, আবার কতবার হয়েছে কি না! এক পরব্রহ্ম ছাড়া, আর সকলেই কালের অধীন। বিদ্যাপতি বলেছেন—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা,
তোহে জনমি, পুনঃ তোহে সমায়ত,
—সাগর লহরী সমানা।

সংস্কৃত শ্লোকও রয়েছে—

ব্রহ্মা বিষ্ণুদিনে যাতি বিষ্ণু রুদ্রস্য বাসরে।
ঈশ্বরস্য তথা সোঽপি কঃ কালং লঙ্ঘিতুং ক্ষমঃ॥

—কালকে লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা কারুই নেই।"

সতীশের এই বাক্‌চাতুরীতে গিরিশ মুখোপাধ্যায় সাময়িক সান্ত্বনা কিছু পাইলেন বটে, কিন্তু দুই তিন দিন ধরিয়া এ বিষয়টা মনে মনে তিনি আলোচনা করিলেন। ক্রমে তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ভাবিতে লাগিলেন—"আহা, কেন ব্রাহ্মণের উপর অতটা জুলুম করলাম—নইলে হয় ত এমনটা ঘটত না।"

পূজার ছুটিতে পুত্রদ্বয় নরেন, সুরেন কলিকাতা হইতে বাটী আসিলে মুখোপাধ্যায় সংবাদ পাইলেন, হরিপদ চন্দ্রগড়ে গিয়া পিতার শ্রাদ্ধাদি করিয়া আসিয়াছে। শুনিলেন, রাজকুমারের চাকরিটি বেশ ভাল, তাহাদের অন্নবস্ত্রের ক্লেশ আর নাই;—শুনিয়া মুখোপাধ্যায় কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

জগদীশের বাস্তুভিটা সম্বন্ধে ডিক্রী হইয়াছিল, অগ্রহায়ণ মাসে আদালত হইতে পেয়াদা আসিয়া ঢোল-সোহরৎ ও বাঁশগাড়ি করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দখল দিয়া গেল।

দখল পাইবার পর একদিনও মুখোপাধ্যায় সে দিকে যান নাই। বাড়ীটার কথা মনে পড়িলেই তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিত। মনে হইত, "যাহার সাতপুরুষ ও বাড়ীতে বাস করিয়া গিয়াছে, সে আজ কোথায়! আমি যদি নালিস্ না করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় আজিও ঐ বাড়ীতে সপরিবারে সে বাস করিত। হায় হায়, কেন এমন কায করিয়াছিলাম!"

গোমস্তা ক্রমাগত বলে, "ভিটাখানা পতিত রহিয়াছে, ওটা কাহাকেও বিক্রয় করিলে হইত—মিছামিছি টাকাগুলা আট্‌কাইয়া রহিল।" কিন্তু মুখোপাধ্যায় সে কথায় মনোযোগ করেন না। একদিন গোমস্তা একজন খরিদ্দার আনিয়াও খাড়া করিল। মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"এখন থাক্—এখন বেচ্‌ব না।"

অগ্রহায়ণ গেল, পৌষ গেল, মাঘ মাস আসিল। কয়েক-দিন হইতে আকাশে মেঘ করিতেছে, মাঝে মাঝে তুহিনশীতল বায়ু বহিয়া মানুষ ও পশুপক্ষীর কলেবর কম্পান্বিত করিয়া তুলে।—এইরূপ একটা মেঘলা দিনের বৈকালে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় মোটা একখানা লুই গায়ে দিয়া, পীচের ছড়ি হাতে করিয়া বাবুপাড়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। সতীশ দত্তকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, দরজায় তালাবন্ধ; বোধ হয় সে কোথাও বাহির হইয়াছে। মুখোপাধ্যায় জানিতেন, সতীশ শ্বশুরবাড়ীর কিছু জমিজমা পাইয়াছে, সেখানে ধান্যা-দির বন্দোবস্ত করিবার জন্য অগ্রহায়ণ মাসেই মাতা ও স্ত্রীকে সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছে।

সুতরাং মুখোপাধ্যায় একাকীই গিয়া জগদীশের দরজার তালা খুলিলেন।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উঠান জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। উঠানের প্রান্তে স্থানে স্থানে যে বাখারী ও কাঁটাগাছের বেড়া দেওয়া ছিল, সে সব আর কিছুই নাই। রান্নাঘরের বারান্দার চাল হইতে সমস্ত খড় কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

জঙ্গলের ভিতর সাবধানে পা বাড়াইয়া রান্নাঘরের নিকট গিয়া দেখিলেন, দুই পাটী কপাটই কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। রাঁধিবার দুই তিনটি কালো কালো হাঁড়ি এখনও সাঙার উপর তোলা রহিয়াছে। ঘরের মেঝেয় বিস্তর ছাগলনাদি—বোধ হয় জলবৃষ্টির সময় ছাগলেরা আসিয়া এখানে আশ্রয় লয়।

রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া মুখোপাধ্যায় বড় ঘরের বারান্দায় আসিয়া উঠিলেন। মনে পড়িয়া গেল, এইখানেই পটলির বিবাহ হইতেছিল, এইখানে

দাঁড়াইয়া তিনি পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে যদি তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া থাকেন তবে বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই জগদীশের কন্যার বৈধব্য ঘটিবে। স্মরণ হইল, এই অভিশাপ দিয়াই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্বাস করিতেন যে ব্রাহ্মণকে কেহ যদি গভীর মনঃপীড়া দেয়, তবে কলি-মাহাত্ম্য সত্ত্বেও তাহার অনিষ্ট হইবেই হইবে। মনে মনে তাঁহার গর্ব্বও ছিল যে তিনি একজন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ এবং তিনি যে সে সময় বিশেষরূপ মনঃপীড়া পাইয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ হইল। মনে মনে বলিলেন—"সেই জন্যেই কি জগদীশ ও রকম করে বিঘোরে মারা গেল না কি?—তার কাল পূর্ণ হয়েছিল, সে মরেছে—একথা ঠিক। কিন্তু আমার এমনি কপাল যে আমিই হলাম তার উপলক্ষ!"

তখন মনে মনে তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল,—"পটলিকে যে অভিশাপ দিয়াছি—তাও ত ফলিয়া যাইতে পারে!—আহা,তা যদি হয় তবে ত বড়ই অন্যায় হইবে! রাগের মাথায় তখন ঐরূপ অভিশাপ দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহার কোনও অনিষ্ট হয় এমন ইচ্ছা ত আমার নয়। সে ছেলেমানুষ, সে ত কোনও দোষের দোষী নহে!—হে ভগবান, তাহার যেন কোনও রূপ অমঙ্গল করিও না।"

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে মুখোপাধ্যায় পদদ্বয়ে দুর্ব্বলতা এবং বক্ষে প্রবল স্পন্দন অনুভব করিলেন; তাঁহার ললাটদেশে ঘর্ম্মোদ্গম হইল, মাথা আবার ঘুরিতে লাগিল, সে বারে মূর্চ্ছার পূর্ব্বে যেরূপ হইয়াছিল—ঠিক যেন সেইরূপ। তাঁহার আশঙ্কা হইল, হয়ত আবার বা তেমনি করিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন।

তখন তাড়াতাড়ি তিনি লুইখানা গাত্র হইতে খুলিয়া বামহস্তে লইলেন। কোটের বোতামগুলা খুলিয়া ফেলিয়া, বক্ষোদেশ আংশিকভাবে অনাবৃত করিয়া দিয়া, বারান্দার প্রান্তে উপবেশন করিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, আকাশ মেঘে পরিপূর্ণ, সন্ সন্ করিয়া উত্তরে বাতাস বহিতেছে। সেই ঠাণ্ডা বাতাস বুকে লাগাইয়া, ক্রমে যেন অল্পে অল্পে সুস্থতা বোধ করিতে লাগিলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল এইরূপ অপেক্ষা করিবার পর মুখোপাধ্যায় মহাশয় উঠিলেন। তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে। বাটীর বাহির হইয়া, দরজায় আবার তালা-বন্ধ করিয়া, ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সতীশের বাড়ীর নিকট আসিয়া দেখিলেন, তাহার দরজায় তালা নাই, বৈঠকখানার জানালার ফাঁক দিয়া আলোক নির্গত হইতেছে। মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত পিপাসা পাইয়াছিল, ধূমপানেচ্ছাও বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি সতীশের বারান্দায় উঠিয়া বলিলেন—"বাড়ী আছ নাকি হে!"

সতীশ ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—"কেও?"

মুখোপাধ্যায় দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মাথায় কম্ফর্টার বাঁধিয়া, গায়ে একখানা লেপ জড়াইয়া, তক্তপোষের উপর সতীশ বসিয়া আছে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

সতীশের শীতক্লেশ।

প্রদীপের আলোতে আসিয়া মুখোপাধ্যায়ের মনের ভিতর হইতে কতকটা অন্ধকার যেন কাটিয়া গেল। সতীশের সজ্জা দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন—"কি হে—ভারি শীত লেগেছে না কি?"

সতীশ ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া বলিল—"আসুন—আসুন। শীতে মরে গেলাম মশায়—হি হি হি।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"শীতটে বেজায় পড়েছে বটে। এই কতক্ষণ হল এখান দিয়ে গেলাম। তুমি ত তখন বাড়ী ছিলে না, গিয়েছিলে কোথায়?"

"আজ্ঞে, চা কিন্‌তে।"

"চা কিনতে?—চাও খাচ্চ না কি?"

"নাঃ—রোজ কি আর খাই?—পাব কোথা!

আজকে বেজায় শীতটে দেখে মনে করলাম, যাই, দু পয়সার কিনে নিয়ে আসি। ভিতরের বারান্দায় উনুন জ্বেলে জল চড়িয়ে এসেছি। আপনাকে অবিশ্যি বল্‌তে সাহস করিনে ;—খাবেন ?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত বৈশাখ মাসে কলিকাতায় গিয়া হেমদাদার বাটীতে চা পান আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই মনে পড়িয়া গেল। এই কয়মাসে কত কি যে ঘটিয়া গেল, ভাবিয়া তাঁহার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। বলিলেন—"নাহে, সন্ধে আহ্নিক করিনি এখনও, চা খাব কি! এক গেলাস জল এনে দাও, বড় পিপাসা পেয়েছে। আর, তামাক টামাক থাকে ত সাজ।"

সতীশ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া লেপটা ফেলিয়া দিল। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, শুদ্ধ হইয়া এক গেলাস জল আনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দিল। পরে, ঘরের কোণে বসিয়া তামাক সাজিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণের হুঁকার জল ফিরাইয়া সতীশ যখন আনিয়া দিল, তখন সে কাঁপিতেছে।

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"বস বস, লেপখানা আবার গায়ে দাও।"

সতীশ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"এই যে, চা-টা এনে খাই। খেলেই শীতটে একটু কম্‌বে।"

মুখোপাধ্যায় বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা এনামেলের গেলাসে করিয়া সতীশ চা লইয়া আসিল। বসিয়া পান করিতে করিতে বলিল—"আঃ—প্রাণটা বাঁচল। এখন আর তত শীত করছে না।"

মুখোপাধ্যায় হাসিয়া বলিলেন—"শীতের ওষুধ পেয়েছ ভাল।"

সতীশ বলিল—"ওষুধ ত ভাল ভালই রয়েছে, কিন্তু ভাগ্য যে মন্দ—তার একটারও যে সংস্থান নেই!"

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কি ওষুধ ?"

সতীশ বলিল—"শুন্‌বেন ? আমারই মত হত-ভাগা কোনও একজন কবি কি লিখেছেন শুনুন—

এণাক্ষী নবযৌবনাঃ পরিলসৎসম্পূর্ণচন্দ্রাননাঃ,
কান্তা নৈব গৃহে গৃহে ন চ দৃঢ়ং জাত্যং ন কাশ্মীরজম্।
তাম্বূলং ন চ তূলিকা ন চ পটী তৈলং ন গন্ধাবিলং
সদ্যো গোঘৃতপাচিতা ন বটকাঃ শীতং কথং গম্যতে॥

—কান্তা একটি ছিলেন বটে—যদিও বর্ণনার সঙ্গে মিল হচ্ছে না—চন্দ্রাননা টন্দ্রাননা সে সব কিছুই তিনি নন ;—সে যাই হোক, গেরস্ত ঘরের পাঁচপাঁচি যাও বা একটি কান্তা ছিলেন, তিনিও নেই, বাপের বাড়ী গেছেন। কাশ্মীরী জায়ফল খেলে শরীরটে নাকি বেশ গরম থাকে শুনেছি, কিন্তু এ পাড়াগাঁয়ে পাই কোথা! তাম্বূল—সেটা আছে বটে, কিন্তু সেজে দেবার লোক নেই। বটকাঃ—এক রকম বড়া আর কি—ভাজবার জন্যে আবার তাজা গাওয়া ঘি চাই—তা, গয়লাবাড়ী থেকে না হয় নিয়েই আসতাম, কিন্তু বটকাঃ তৈরি করে দেয় কে ?—দেখুন, এ সব গুলোর মধ্যে একটাও নেই। থাকবার মধ্যে আছে কেবল একখানা ছেঁড়াখোঁড়া তূলিকা—লেপ—তা গায়ে দিয়েই রয়েছি—তাতে কি আর শীত ভাঙ্গে মশাই!"

তাহার রঙ্গ দেখিয়া মুখোপাধ্যায় হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—"ঈস্—সাংঘাতিক অবস্থা!—বউমাকে গিয়ে নিয়ে এস—নৈলে শীতে মারাই পড়বে দেখ্‌ছি।"

সতীশ বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ—এই সরস্বতী পূজোর দু'দিন ছুটি আছে, নিয়ে আসিগে।"—বলিয়া কলিকাটি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া নিজের হুঁকায় বসাইয়া সতীশ ধূমপান করিতে লাগিল।

ধূমপান করিতে করিতে বলিল—"আজ এই শীতে, বাদলে, সন্ধেবেলা বেরিয়েছিলেন কোথা!"

কখন এবং কি জন্য বাহির হইয়াছিলেন, মুখোপাধ্যায় তাহা বলিলেন।

সতীশ বলিল—"ওটা কি বিক্রী কর্‌বেন ?"

মুখোপাধ্যায় কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"বিক্রী—করব না।"

"তবে?—বাগান টাগান একখানা করবেন? বাস্তুভিটের জমিতে বাগান কি তেমন সুবিধে হবে?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"না, বাগান করব না। ও বাড়ীখানা ভেঙ্গে ফেলে, নূতন করে বাড়ী তৈরি করব ভাবছি।"

সতীশ বলিল—"তা মন্দ হবে না। নরেন সুরেন দু ভাই, এর পর দুজনার বনিবনাও হয় না হয়—আখের ভেবে আর একখানা বাড়ী করে রাখা ভাল।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"না হে, আমার ছেলেদের জন্যে নয়।"

"তবে?"

"আছে আমার একটা মৎলব।"

"কি?"

"বলব আর একদিন। তুমি সামনের রবিবারে বিকেলের দিকে যদি এস,তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে একটা পরামর্শ করব ইচ্ছে আছে। আজ উঠি ভাই—রাত হল, গিয়ে-এখন সন্ধে আহ্নিক করতে হবে।"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন।

"চল্লেন?"—বলিয়া সতীশও উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় বাহির হইয়া বলিল—"ঈঃ—ভারি অন্ধকার যে! একটা লণ্ঠন দেব?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখিলেন, অন্ধকারটা খুব বেশী হইয়াছে বটে। বলিলেন—"আচ্ছা, তা দাও একটা বরং। আমি বাড়ী পৌছেই একটা চাকর দিয়ে লণ্ঠনটা ফিরে পাঠাব এখন।"

সতীশের লণ্ঠন লইয়া মুখোপাধ্যায় প্রস্থান করিলেন। সতীশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"বাড়ী করবেন, অথচ ছেলেদের জন্য নয়! তবে কার জন্যে বাড়ী হবে? আমি এই ভাঙ্গা ফুটো বাড়ীতে বাস করি—আমাকেই দেবার ইচ্ছে হয়েছে, না কি, কিছুই ত বুঝিতে পারছি নে। এতদিন ত মোসাহেবী করলাম—দেখি কি হয়।"

আশায় আশায় সতীশ তিন চারিদিন কাটাইল। রবিবার দিন অপরাহ্নকালে গিয়া দেখিল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৈঠকখানায় একাকী বসিয়া চশমা চোখে দিয়া কি একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন।

সতীশ প্রণাম করিয়া বসিয়া বলিল—"কি পড়ছেন? বড্ড যে ছোট লেখা!"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"হ্যাঁ। সস্তা বই, কাযেই ছোট লেখা। এখানি হচ্ছে মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ। পড়েছ?"

"সব পড়িনি। উল্টে পাল্টে দেখেছি বটে।"

মুখোপাধ্যায় কিয়ৎক্ষণ পুস্তকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—"এত ত সংস্কৃত পড়েছ। একটা কথার মানে আমায় বলে দাও ত।"

সতীশ বলিল—"কি কথা? দেখি?"—বলিয়া পুস্তক লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল।

মুখোপাধ্যায় পুস্তক না দিয়া বলিলেন—"বইয়ের দরকার কি? শ্লোকটা হচ্ছে—

দিব্যা স্ত্রী যং প্রবদতি মম স্বামী ভবান্ ভব।
স্বপ্নে দৃষ্ট্বা চ জাগর্ত্তি স চ রাজা ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

—এখানে দিব্যা স্ত্রী মানে কি?"

সতীশ বলিল—"দিব্যা স্ত্রী মানে দেবকন্যা।"

"দেব—কন্যা? তবে স্ত্রী বল্লে কেন?"

"স্ত্রী মানে যোষিৎ, নারী। অবশ্য পত্নী বা ভার্য্যা অর্থেও স্ত্রীশব্দের ব্যবহার আছে বটে। শ্লোকটি আর একবার পড়ুন ত।"

শ্লোকটি দ্বিতীয়বার শুনিয়া সতীশ বলিল—"যদি কেউ স্বপ্ন দেখে যে একজন দেবকন্যা তাকে বলছে, তুমি আমার স্বামী হও, তাহলে সে নিশ্চয়ই রাজা হবে।—মানে ত খুব স্পষ্ট, কোনও গণ্ডগোল ত নেই! আপনার সন্দেহ হল কিসে?"

মুখোপাধ্যায় পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন। পূর্ব্বে সতীশকে নিজ প্রথম পক্ষের স্ত্রী সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখার কথাই বলিয়াছিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যার কথা

প্রকাশ করেন নাই। কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য বলিলেন—"হ্যাঁ—তোমায় যে জন্য ডেকেছিলাম। জগদীশের ঐ বাড়ীখানা ভেঙ্গে নূতন বাড়ী তৈরি করব? না, ওটাকেই ভাল করে মেরামৎ করাব? কি করি বল দেখি।"

সতীশ বলিল—"ও বাড়ীর যে রকম অবস্থা, ওকে মেরামৎ করা মিছে পয়সা নষ্ট। তার চেয়ে বরং—একবারে ভেঙ্গে ফেলেই—"

গিরিশ বলিলেন—"হ্যাঁ। আমিও তাই ক'দিন ভাবছি। আমার মনের অভিপ্রায়টা কি জান?"

সতীশ নীরবে শঙ্কিত নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"দেখ, আমি জগদীশ বাঁড়ুয্যের নামে নালিস করে, তার ভিটেমাটী নীলেমে চড়িয়ে, অবিশ্যি বে-আইনি কিছুই করিনি। তবু কি জান?—মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করে। ব্রাহ্মণ সাত-পুরুষ ধরে ঐ ভিটেয় বাস করেছিল—যদিও আমার সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছে—সে যাক্—কিন্তু—আমি যদি ডিক্রীটে না করতাম, তা হলে বোধ হয় গরীবকে বৈঁচির সেই অতিথশালায় গিয়ে ওরকমভাবে বিঘোরে মারা পড়তে হত না। অবিশ্যি, অদৃষ্টে যার যা আছে তাই হবে, সে কেউ খণ্ডাতে পারে না তা জানি, বুঝি—কিন্তু, আসল কথা তোমায় খুলে বলি ভাই—মন মানে না।"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় নীরবে নতদৃষ্টি হইয়া রহিলেন।

সতীশ বুঝিল, সে যে আশাটি মনে মনে গোপনে পোষণ করিতেছিল, তাহা সফল হইবে না—ইনি অন্য পথে চলিয়াছেন। গলা ঝাড়িয়া, ক্ষীণস্বরে বলিল—"সেটা ঠিকই বলেছেন।"

মুখোপাধ্যায় মুখ তুলিয়া বলিলেন—"আমিও কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে ঘর করি; ব্রাহ্মণের সঙ্গে ও রকম ব্যবহার করাটা ভাল হয় নি। আমি তখন রাগে অন্ধ হয়ে ভারি নিষ্ঠুরের কায করে ফেলেছি। গ্রামের লোকে যে আমায় নিন্দে করে, ঠিক কথাই তারা বলে।"—মুখোপাধ্যায়ের চক্ষুর পাতা যেন ভিজা ভিজা বোধ হইতে লাগিল।

সতীশ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ খানি টানিয়া লইয়াছিল, তাহার একটা পৃষ্ঠায় দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া পাঠছলে নীরব হইয়া রহিল।

মুখোপাধ্যায় বলিতে লাগিলেন—"তাই আমি ভেবেছি কি জান? যে গেছে সে ত গেছেই। তার জিনিষ তাকে ফিরে দেবার আর উপায় নেই। তাই ভেবেছি, বাড়ীখানি মেরামৎ করে হোক, ভেঙ্গে নূতন করে গড়ে হোক, তার বাড়ী তার ছেলেকেই ফিরিয়ে দেব। দানপত্র লিখে রেজিষ্টারি করে দেব। তোমার মত কি?"

সতীশ ভাবিল—ইনি যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা ত করিবেনই। মাঝে হইতে আমি অমত করিয়া কেন বিরাগভাজন হই! বরং ইহাঁর সংকল্পিত কার্য্যের সমর্থন করিলে, ভবিষ্যতের জন্য ইনি হাতে থাকিবেন।—প্রকাশ্যে বলিল—"মুখুর্য্যে মশায়, পায়ের ধূলো দিন।"—বলিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া নিজ মস্তকে দিল।

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"তা হলে তোমার মত আছে?"

সতীশ বলিল—"মত আছে কি না জিজ্ঞাসা করছেন? এ বিষয়ে কারু কি অমত হতে পারে? কিন্তু আপনি অবাক্ করলেন মশাই! যারা আপনার সঙ্গে ও রকম দুর্ব্ব্যবহার করলে, তাদের প্রতি আপনার এত সৌজন্য, এত দয়া! সেই যে পড়া গিয়েছিল—

অঞ্জলিস্থানি পুষ্পানি বাসয়ন্তি করদ্বয়ম্।
অহো সুমনসাং প্রীতির্বামদক্ষিণয়োঃ সমা॥

—অঞ্জলি ভরে ফুল নিলে,ফুল দুটো হাতকেই সমানভাবে সদ্‌গন্ধযুক্ত করে দেয়—তার কছে বাঁ হাত ডান হাত নেই। আর একটা মানেও হয়—যে দক্ষিণ অর্থাৎ অনুকূল, তাকেও যেমন সুগন্ধিত করে, তেমনি যে বাম অর্থাৎ প্রতিকূল, তাকেও তেমনি সুগন্ধিত করে; ভেদবুদ্ধি নেই।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"না হে না, দয়া টয়া কিছুই নয়। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করে পাপ করেছি—এটা কতকটা তার প্রায়শ্চিত্ত আর কি!"

সতীশ বলিল—"ব্রহ্মস্ব হরণ করেছেন!—প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছেন!—তা নিজেকে ছোট করবার জন্যে যা ইচ্ছে হয় তাই বলুন। কিন্তু লোকে তা স্বীকার করবে কেন? নাঃ—এ রকম কেতাবেই পড়া যেত, জ্যান্ত মানুষেও যে এ রকম করতে পারে তা জানতাম না। সাধু-পুরুষের লক্ষণই যে তাই। একটা শ্লোক আছে—

তে সাধবো ভুবনমণ্ডলমৌলিভূতা
　　যে সাধুতাং নিরুপকারিষু দর্শয়ন্তি।
আত্মপ্রয়োজনবশীকৃতখিন্নদেহঃ
　　পূর্ব্বোপকারিষু খলোঽপি হি সানুকম্পঃ॥

—নিরুপকারী—যে কোনও উপকার করেনি, এমন লোকের প্রতি যিনি সাধুতা আচরণ করেন, তিনিই পৃথিবীর শিরোভূষণ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ সাধু। নইলে, 'পূর্ব্বে উপকার পেয়েছি, আবার উপকার পাব';—এ রকম অবস্থায় খলব্যক্তিও ত উপকারীর প্রতি অনুকম্পাযুক্ত হয়।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"হুঃ—উপকার তাঁরা আমার যা করেছেন সে আর কহতব্য নয়!"

সতীশ বলিল—"উপকার! বরং আপনিই তাদের অনেক উপকার করেছেন। এমন সময় গিয়েছে, যখন আপনি টাকা না ধার দিলে, জগদীশের জমিজমাগুলি সব খাজনার দায়ে বিক্রী হয়ে যেত—শেষে খেতে পেত না। সবই ত জানি। তা, সে সব উপকারের প্রত্যুপকার সে করছে ভাল। হবারই ত কথা! পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্—সাপকে দুধ নিয়ে গিয়ে দিন, দুধটুকু খেয়ে সে আপনাকে এক ছোবল বসিয়ে দেবে এখন। খলের স্বভাবই যে তাই!"

গিরিশ বলিলেন—"সে খল কি আমি খল বল্‌তে পারিনে। যা হোক্, যে মরে গেছে তার আর নিন্দে করে কায নেই।—বাড়ীটে তা হলে ভেঙ্গে গড়াই তোমার মত?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"হ্যাঁ। আর দেখ, এ কথা এখন কারু কাছে প্রকাশ কোরো না। বাড়ী করছি না বাড়ী করছি—কার জন্যে, কি বৃত্তান্ত—এ সব যেন কেউ কিছু না জানতে পারে। বুঝলে?"

"যে আজ্ঞে। কাউকে বলব না।"

আরও কিয়ৎক্ষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে স্তুতিবাদ করিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহার পদধূলি গ্রহণান্তর সে রাত্রির মত সতীশ বিদায় গ্রহণ করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রগড়ের চিঠি।

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

পৌষ মাস। কলিকাতা হরিঘোষের গলির একটি দ্বিতলবাটীর খোলা ছাদে কয়েক জন পুর-মহিলা বসিয়া আছেন। তন্মধ্যে একজন স্থূল-কলেবরা প্রৌঢ়া সধবা রমণী রৌদ্রে চুল শুকাইতে-ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া একজন নবীনা, লাইব্রেরী হইতে আনীত একখানা মোটা বাঁধানো উপন্যাস পাঠ করিয়া শ্রোত্রীমণ্ডলীকে শুনাইতেছিল।

নিম্নে রাস্তা হইতে ফিরিওয়ালা হাঁকিল—"জামা চাই, শেমিজ চাই, ভাল ভাল জামা।"

এই সময় আট দশ বৎসরের একটি বালিকা, একটি ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল—"কাকীমা, ঐ শেমিজ-ওলা এসেছে। ডাক্‌ব?"

প্রৌঢ়া এই বাটীর গৃহিণী, পুস্তকপাঠকারিণী তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা কমলা। প্রসব হইবার জন্য মাসখানেক হইল শ্বশুরালয় হইতে আসিয়াছে; বালিকা তাঁহার দেবর কন্যা—ইহারাও সম্প্রতি আসিয়াছে, পশ্চিমে থাকে। অপর মহিলা দুইটি পাশের বাড়ীতে থাকেন ছাদে ছাদে যাতায়াত চলে।

গৃহিণী বলিলেন—"শোন কথা!—ঐ সব জামা শেমিজ মানুষ কেনে?"

বালিকা বলিল—"কেন কাকীমা, বেশ ভাল ভাল জামা শেমিজ আনে ত। নয় দিদি?"

দিদি, বালিকার পানে চাহিয়া, একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"তোর জামা শেমিজের অভাব কি ইন্দু?"

গৃহিণী বলিলেন—"ঐ ত!—যা শুন্‌বে তাই চাবে।—তুই পড়্ মা, পড়়। যা দিকিন ইন্দু, ভাঁড়ার ঘর থেকে আমার পাণের ডিপেটা নিয়ে আয়, আর জর্দ্দার কৌটোটা।"

বালিকা ম্লানমুখে আজ্ঞা পালন করিল। গৃহিণী দুইটা পাণ লইয়া মুখে পুরিয়া, ডিবাটি প্রতিবেশিনীদ্বয়ের নিকট ধরিলেন। তাহার পর জর্দ্দার কৌটা খুলিয়া বলিলেন—"খুব অল্পই আছে দেখ্‌ছি যে!—এই সে দিন আট আনার আনালাম—এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল! এ থেকে জর্দ্দা নিয়ে নিশ্চয় আর কেউ খায়। তুই খাস বুঝি কমলা?"

কমলা বলিল—"না মা, আমি কি ও খেতে পারি? খেলে আমার মাথা ঘোরে।"

মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"মাথা ঘোরে?—না খেয়ে জানলি কি করে মাথা ঘোরে?"

কমলা হাসিয়া বলিল—"একদিন খেয়ে দেখেছিলাম। মাথা ঘুরতে লাগল—সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম বেরুতে লাগল—প্রাণ যায় আর কি!"

"এমন কর্ম্ম করলি কেন মা? আমার বাপের বাড়ীতে সবাই দোক্তা খেত—সেই আমার বদ্ অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল কি না!—এখানে এসেও প্রথম প্রথম দোক্তাই খেতাম। সবাই বল্‌তে লাগল, ছি ছি, পাড়াগেঁয়ে মানুষের মত দোক্তা খাও কেন?—তার পর থেকে জর্দ্দা ধরলাম! তুই যে বছর হলি, সেই বছরই প্রথম উনি আমার জর্দ্দা এনে দিলেন। তাই খাচ্ছি—না খেলে বাঁচিনে। তোমরা শিখনা—খবর্দ্দার খবর্দ্দার। এ বিষ—রীতিমত বিষ"—বলিতে বলিতে কিঞ্চিৎ জর্দ্দা লইয়া গৃহিণী নিজ মুখে ফেলিয়া, কৌটাটি প্রতিবেশিনীদ্বয়ের হস্তে দিলেন।

কমলা বলিল—"খেলে নাকি দাঁত ভারি শক্ত হয় শুনেছি?"

গৃহিণী বলিলেন—"ছাই হয়, আমার মাথা হয়! দাঁত শক্ত হয় ত আমার দুটো দাঁত পড়ে গেল কেন? দাঁত ত শক্ত হয়ই না, উল্টে হাট খারাপ হয়ে যায়।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"হাট কি?"

একজন প্রতিবেশিনী বলিলেন—"হাট—জান না?—আজকাল কতলোকের ত হাট খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

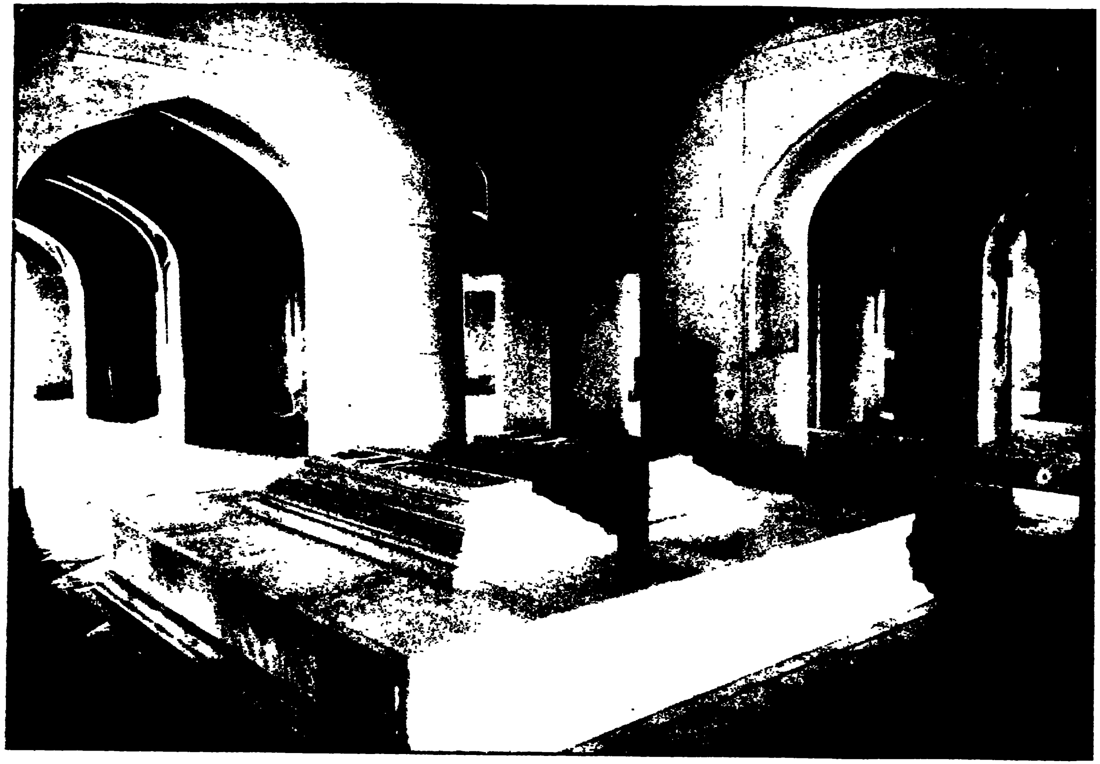
গৃহিণী বলিলেন—"হাট খারাপ হলে মরে পর্য্যন্ত যায়। মানুষের বুকের মধ্যে হাট থাকে, তাই খারাপ হয়ে যায়। ইংরিজি ব্যামো আর কি! সে চুলোয় যাক্, তুই পড়়। তারপর কি হল রে? কোনখানটা হচ্ছিল? ভুলেও গেলাম ছাই!"—বলিয়া তিনি আর কিঞ্চিৎ জর্দ্দা লইয়া মুখে দিলেন।

একজন প্রতিবেশিনী বলিলেন—"নবাব বল্লেন, আমার মেয়ে যদি আমার অমতে ঐ গরীবের ছেলেকে বিয়ে করে, তা করুক, কিন্তু ইহজন্মে এ বাড়ীতে আর ও ঢুকতে পাবে না—ইহজন্মে আর আমি ওর মুখদর্শন করব না। নবাবনন্দিনী সেই কথা শুনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন—এই অবধি হয়েছিল।"

গৃহিণী বলিলেন—"তার পর?"

কমলা পুস্তকখানি লইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ সাহিত্য-চর্চ্চায় প্রায় ঘণ্টা খানেক কাটিল। ক্রমে সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া, একটা উচ্চ অট্টালিকার আড়ালে পড়িয়া গেলেন। কমলা তখন উপন্যাসখানির যে অংশে পৌঁছিয়াছে, সেখানে পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িতা নবাবনন্দিনী তাঁহার ঈপ্সিতজনের সহধর্ম্মিণী হইয়া, ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিয়া তাঁহার জীর্ণ কুটীরে গৃহস্থালী করিতেছেন; স্বামী সামান্য বেতনে চাকরি করেন, সারাদিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাকালে তিনি বাড়ী ফিরিবেন; নমাজের পূর্ব্বে তাঁহার



নুরজাহান—সমাধি মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ

উজু করিবার জল প্রভৃতি ঠিক করিয়া রাখিয়া, রুটি প্রস্তুত করিবার জন্ত স্বহস্তে গম ভাঙ্গিতেছেন।

ইহা শুনিয়া গৃহিণীর মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার কর্ত্তারও আফিস হইতে ফিরিবার সময় হইয়া আসিল, এখনও জলখাবার প্রস্তুতের কোন বন্দোবস্তই হয় নাই। বলিলেন—"থাক্ মা, আজ আর নয়। ঝি এখনও এল না? মাগীকে নিয়ে আর পোষালো না দেখ্ছি। সন্ধে হয়ে এল, এখনও উননে কয়লা পড়ল না—জল টল খাবার হবে কখন?"—বলিয়া তিনি উঠিতে চেষ্টা করিলেন। "শরীরটে হয়ে পড়েছে বিষম ভারি, তার উপরে এই বাত, বসলে আর উঠ্তে পারিনে"—বলিয়া, কন্যার সাহায্যে কষ্টে আঃ আঃ করিতে করিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিবেশিনীগণও আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন।

কর্ত্তা বাড়ী ফিরিয়া, সন্ধ্যার পর জলযোগ ও চা পান করিতেছিলেন। ইঁহার নাম যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নিবাস তারকেশ্বরের নিকট হরিপাল গ্রামে। বয়স ছাপান্ন কিম্বা সাতান্ন বৎসর হইয়াছে, ম্যাকিনন্ মেকেঞ্জির বাড়ী চাকরি করেন। চারিটি কন্যা—সকল গুলিরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পুস্তকপাঠকারিণী কমলা ছাড়া অপর সকলে নিজ নিজ শ্বশুরালয়ে।

যদুবাবু কক্ষমধ্যে একখানি ক্ষুদ্র টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া চা পান করিতেছেন—গৃহিণী নিকটেই একখানি নেওয়ারের খাটে কম্বল পায়ে দিয়া বসিয়া পাণ খাইতেছেন। স্বামীকে নীরব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার মনটা আজ এমন ভার ভার কেন?"

যদুবাবু বলিলেন—"না, ভার হবে কেন!"

"কি ভাবছ অমন করে?"

"ভাবছি যা, তা বলি। একখানা চিঠি আজ আপিসে গিয়ে পেয়েছি—কি করব ভেবে কিছু ঠিক করে উঠতে পাচ্ছিনে।"

গৃহিণী উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিলেন—"চিঠি? কার চিঠি? কোনও মন্দ খবর বোধ হয়!"

কর্ত্তা বলিলেন—"না, মন্দ খবর আর বিশেষ কি? অর্থাৎ—"

"অর্থাৎ মন্দ খবর!—কোথা থেকে চিঠি এসেছে?"

"চন্দ্রগড় থেকে।"

"বিশু ঠাকুরপোর চিঠি? সবাই প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে ত?"

বিশু অথবা বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তার পিস্তুতো ভাই, অনেকদিন হইতে চন্দ্রগড় এষ্টেটে চাকরি করিতেছেন।

কর্ত্তা বলিলেন—"হ্যাঁ—সবাই ভাল আছে; সে সব কিছু নয়। সে একটা প্রস্তাব করেছে—তাই ভাবছি কি করব। দাঁড়াও, চা-টা খেয়ে নিই, চিঠিখানা পড়েই শোনাচ্ছি তোমায়।"

গৃহিণী শঙ্কিত নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—কর্ত্তা চা পান করিতে লাগিলেন। শেষ হইলে, উঠিয়া অদূরে লম্বিত কালো সার্জ্জের চাপকানের পকেট হইতে চিঠি এবং চশমাখানি বাহির করিয়া আনিলেন।

ঝি আসিয়া গড়গড়ায় তামাক দিয়া জলখাবারের রেকাবী ও চায়ের পেয়ালা সরাইয়া লইয়া গেল। ইন্দু ডিবায় করিয়া পাণ আনিয়া দিল। কর্ত্তা বলিলেন—"দরজাটা বেশ করে ভেজিয়ে দিয়ে যাস্ মা—ভারি ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। তোর মা কোথা? রান্নাঘরে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দিদি?"

"দিদিও সেখানে বসে কুটনো কুটছে।"

"তুইও যা, সেখানে বসে থাক্‌গে। গায়ে হিম লাগাস্‌নে।"

বালিকা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কর্ত্তা তখন চেয়ার ও টেবিল গৃহিণীর বিছানার অতি নিকটে টানিয়া, চশমা চোখে দিয়া, চিঠিখানি মৃদুস্বরে পড়িতে লাগিলেন।

চন্দ্রগড়।
ভায়া বক্সার ই, আই আর।
৭ই জানুয়ারি, ১৯১২

শ্রীচরণকমলেষু—

দাদা, বহুদিবসাবধি আপনাদের কুশল সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। ত্বরায় কুশল সমাচার দানে আমাদের চিন্তা দূর করিবেন।

এখানে আমরা সকলে আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে একপ্রকার আছি। মধ্যে ছোটখুকীর হামজ্বর হইয়াছিল, তাহা ভাল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সময় একটু যে কাসির সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা এখনও সারে নাই। প্রতি রাত্রেই খুক্ খুক্ করিয়া কাসে। অ্যালোপ্যাথিক ঔষধে কিছু হইল না দেখিয়া এখন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করাইতেছি।

অন্য যে বিষয়ের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি তাহার সম্বন্ধে বলি। গত বৎসর যখন আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম তখন কথায় কথায় আপনি আমায় বলিয়াছিলেন যে বধূঠাকুরাণীর যেরূপ শারীরিক অবস্থা, তাহাতে তাঁহার পক্ষে গৃহস্থালীর কাযকর্ম্ম করা ক্রমেই কষ্টজনক হইয়া উঠিতেছে; কন্যাগুলির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহারা নিজ নিজ শ্বশুরবাড়ীতে থাকে; যদি দুই দিন গৃহিণী পীড়িত হইয়া পড়েন তবে ভাতজল দিবার দ্বিতীয় লোকটি নাই।—সেই কারণে আপনি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যদি কোনও নিরাশ্রয়া সদ্ব্রাহ্মণ-কন্যা পাওয়া যায়, তবে গৃহিণীর সেবাশুশ্রূষার জন্য আপনি রাখেন। সম্প্রতি এখানে সেইরূপ একটি ব্রাহ্মণকন্যা রহিয়াছে, তাহার সকল বিবরণ আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি, যদি ভাল বিবেচনা করেন তবে তাহাকে আপনার নিকট পাঠাইতে পারি।

তিন বৎসরের উপর হইল, রাজকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক একটি যুবক আমাদের এষ্টেটে চাকরি লইয়া এখানে আসেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী এবং শাশুড়ী ঠাকুরাণী ছিলেন। শুনিয়াছিলাম, এখানে আসিবার কিছু দিন পূর্ব্বেই ত্রিবেণী গ্রামে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল,—তাঁহার শ্বশুরের নাম জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজকুমার বাবু এখানে আসিবার মাস দুই পরেই সংবাদ আসিল, তাঁহার শ্বশুর হঠাৎ জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দেশে ইহাঁদের আর কেহ ছিল না, কেবল রাজকুমার বাবুর শ্যালক কলিকাতায় পড়িত। দেশে গিয়া শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করা নিতান্ত অসুবিধা, বিশেষ রাজকুমার বাবুর তখন নূতন চাকরি, ছুটি পাওয়াও দুর্ঘট, এই সকল কারণে আমরা পরামর্শ করিয়া তাঁহার শ্যালক শ্রীমান হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখানে আনয়ন করি এবং রাজসরকারের সাহায্যে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া এখানেই সম্পন্ন হয়।

কথায় বলে, দুর্ভাগ্য কখনও একাকী আসে না। ভাদ্র মাসে মেয়েটির পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। বৈশাখ মাসের প্রথমে রাজকুমারের কলেরা হইল। এখানে ডাক্তার বৈদ্য তেমন ভাল নাই, তথাপি অবস্থা বুঝিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করা গেল, কিন্তু কালে যাহাকে ঘিরিয়াছে তাহাকে বাঁচাইবে কে? কিছুতেই ছেলেটিকে বাঁচান গেল না। তাহার মা ও স্ত্রীকে লইয়া সে সময়ে এখানে আমরা তিনঘর বাঙ্গালী যে কি বিপন্ন হইয়াছিলাম তাহা আর কি বলিব! মেয়েটির ভাই হরিপদকে টেলিগ্রাম করিয়া আনান হইল। রাজা বাহাদুর সকল অবস্থা শুনিয়া, হরিপদকে তাহার পরলোকগত ভগিনীপতির চাকরিতে বাহাল করিয়া লইলেন, নচেৎ উহাদের পথের ভিখারী হইতে হইত। স্ত্রীর নিকট সে সময় শুনিয়াছিলাম, মেয়েটির নাম প্রভাবতী, বিধবা হওয়াকালীন সে পাঁচমাস অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

হরিপদ চাকরি করিয়া মাতা ও ভগিনীকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। কার্ত্তিক মাসে প্রভাবতীর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তাহাতেই উহারা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়া কোনমতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

বিগত ৺শ্যামাপূজার পরদিন হরিপদর গাত্রময় মায়ের দয়া দেখা দিল। প্রথমে সকলে উহা পানি-

বসন্ত মনে করিয়াছিল, পরে প্রকৃত গুটি বসন্তে দাঁড়াইল। বিষম ছোঁয়াচে রোগ,চারিদিন পরে হরিপদর মাতাও ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। যে দিন সপ্তাহ পূর্ণ হইল, সেদিন হরিপদ ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহার জননীকেও অধিক দিন পুত্রশোক সহ্য করিতে হয় নাই; তিন দিন পরেই তাঁহারও শবদেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইল।

এখন বুঝিতেই পারিতেছেন, অভাগিনী প্রভাবতীর কি অবস্থা উপস্থিত হইল। তাহার মাতার মৃত্যুর দিন তাহাকে আমাদের বাড়ীতে আনিয়া রাখি এবং এ আড়াই মাস সে এখানেই আছে। আপনার বলিতে ত্রিসংসারে তাহার আর কেহই নাই। তাহাদের গ্রামের দুই একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোককে পত্র লিখিয়াছিলাম, যদি কেহ দয়া পরবশ হইয়া মেয়েটির ভার লইতে পারে। কিন্তু এ দায় কেহই স্বীকার করিল না।

অথচ আমার পারিবারিক অবস্থা এমন নয় যে মেয়েটির ভার অধিকদিন আমি বহন করিতে পারি। তাই আপনারই শরণাপন্ন হইলাম। আপনি যদি তাহাকে আশ্রয় দেন তবে বধূঠাকুরাণীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য আর ভাবিতে হয় না। ঈশ্বরেচ্ছায় আপনার অর্থেরও অপ্রতুল নাই।

আমরা বরাবরই দেখিতেছি এবং বাড়ীতেও শুনিতে পাই, মেয়েটি বড়ই ঠাণ্ডা এবং সৎস্বভাব। গৃহকার্য্যে, রন্ধনাদিতে, সেবাযত্নে, কোনও বিষয়েই তাহার কোনও ত্রুটি ধরিবার নাই। তাহার অনেকগুলি সদ্‌গুণ আছে; তথাপি কেন যে ভগবান তাহাকে এ দুরবস্থায় ফেলিয়াছেন, বুঝা কঠিন। ইহা তাহার পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল বলিতে হইবে।

বধূঠাকুরাণীকে আমার শতকোটি প্রণাম জানাইয়া, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে যেরূপ স্থির করেন লিখিবেন। আমি এক মাসের ছুটি পাইয়াছি, ২রা মাঘ বাড়ী যাইব। যদি বলেন তবে সেই সময় প্রভাবতীকে আপনার নিকটে পৌছাইয়া দিতে পারি।

অদ্য এই পর্য্যন্ত। বধূঠাকুরাণীর ও আপনার শরীর এখন কেমন আছে লিখিয়া চিন্তাদূর করিবেন।

ইতি

প্রণত

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

গৃহিণী এতক্ষণ নিস্পন্দভাবে পত্রপাঠ শুনিতেছিলেন। করুণায় তাঁহার দুইটি চোখের পাতা ভিজিয়া গিয়াছিল। পত্র শেষ হইলে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পরিয়া পূর্ব্ববৎ নীরব রহিলেন।

যদুবাবু পত্রখানি খামের মধ্যে ভরিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। গড়গড়ার নলটি উঠাইয়া লইয়া, তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—"এখন কি বল তুমি?"

গৃহিণী বলিলেন—"আমি আর কি বলব!—যা ভাল বোঝ তাই কর।"

কর্ত্তা বলিলেন—"আমি ত বলি, আনান যাক্ মেয়েটিকে। তোমার যে রকম শরীর—একজন এরকম কেউ তোমার কাছে থাকাটা নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। ধর, কমলা এসেছে প্রসব হতে। কি মাসে ওর ছেলে হবে বলছিলে?"

"চৈত্র মাসে।"

"সে সময়, ধর, ইন্দুর মা থাক্‌বেন না, মাঘ মাস পড়্‌তেই ত সুরেন এসে ওঁকে নিয়ে যাবে। কমলার ছেলে হবার সময় তুমি পড়ে যাবে একা। সামলাতে পারবে?"

স্বামী স্ত্রীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া এ বিষয়ে আলোচনা চলিল। গৃহিণী কেবল একটা কথা তুলিয়াছিলেন, মেয়েটি এত অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে—শেষে তাহাকে লইয়া কোনওরূপ বিপদ আপদে না পড়িয়া যাইতে হয়—কারণ এ ভার বিষম ভার। কর্ত্তা বলিলেন—"আমাদের ছোট সংসার—বাইরের লোক কেউ নেই—সে যদি সদ্বংশের মেয়ে হয় তা হলে সে রকম কোনও আশঙ্কার কারণ হবে বলে ত বোধ হয় না।"

গৃহিণী বলিলেন—"সেইটে তা হলে ভাল করে

সন্ধান নাও। কি রকম বংশে তার জন্ম—তার মা, মাসী—অন্য সব আত্মীয় স্বজন কেমন চরিত্রের লোক—খবর নাও আগে। ত্রিবেণী ত বেশী দূর নয়।"

"না, আমাদের আপিসেই ত ত্রিবেণীর দু'তিন জন বাবু চাকরি করে। কালই সন্ধান নিচ্ছি।"

দুই তিন দিনেই অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হইল। আপত্তি-জনক কোনও কিছু পাওয়া গেল না।

গৃহিণী বলিলেন—"বাস্তবিকই সে যখন সদ্বংশের মেয়ে, তখন আর কথা কি! বিশু ঠাকুরপোকে লিখে দিও, যেন আসবার সময় তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।"

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গান

(বাউলের সুর)

মনরে আমার, তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়,
হালে যখন আছেন হরি (তোর)
যেমন ফাগুন তেমনি আষাঢ়।
যখন যুঝ্‌বে তরী স্রোতের সনে,
তুই টানিস্ আরো পরাণপণে ;
যখন পালে লাগ্‌বে হাওয়া, সময় পাবি রে জিরোবার।
মাঝির সেই গানের তানে
চল সাথীর সাথে সমান টানে
চাস্‌নেরে তুই আকাশ পানে, হোক্‌না ফর্‌সা
হোক্‌না আঁধার।
কায কি জেনে কোথায় যাবি,
কখন ঘাটে নাও ভিড়াবি,
কখন গাঙে লাগ্‌বে ভাঁটা, কখন ছুটে' আস্‌বে জোয়ার।
মনে রাখিস্ নিরবধি,
যাহার নাও তারি নদী—
যে ফেল্‌বে তরী বানের মুখে সেই ত তরীর কর্ণধার।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আষাঢ়ের অশ্রুপূর্ণ মেঘম্লান দিনের অবসানে অস্তমান সূর্য্যের ক্ষীণ রশ্মিরেখা যেমন পশ্চিমদিক্-চক্রবালকে মুহূর্ত্তের জন্য অরুণরাগে রঞ্জিত করিয়া তোলে, সম্বৎসরের দুঃসহ দুঃখের পর তিন দিবসের দুর্গোৎসব বঙ্গের সাতকোটি নরনারীর চিদাকাশে ক্ষণিক আনন্দের রক্তরাগ তেমনি করিয়াই আঁকিয়া দিয়া যায়। গিরিরাজমহিষী মেনকা কবে গিরিবালিকা উমার পথ চাহিয়া উৎকণ্ঠায় দিনযাপন করিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু নানা দুঃখ শোক ক্ষোভ ক্ষতি বিচ্ছেদ বিরহে ক্লিষ্ট বঙ্গের বহুকোটি মানবের মন যে দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রিয়-মিলন-সম্ভাবনায় উপবাসী-হৃদয় লইয়া রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহা জানি। বিদেশ-গত সন্তানের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় সমাসন্ন শরতে বিধবা জননীর মাতৃবক্ষের স্বর্গধামে স্নেহমন্দাকিনীর বিমল ধারা অবাধে উৎসারিত হইতে থাকে, প্রোষিত-প্রিয়জনের দুর্ব্বার বিয়োগব্যথায় যে গৃহধর্ম্মচারিণী বৎসর ভরিয়া ব্যর্থ গৃহস্থাশ্রমের গোপন অশ্রুরাশির মধ্যে তাহার দুঃখের নিশা যাপন করিয়াছে, সমাগত শরতের শেফালিগন্ধামোদিত দুর্গোৎসব, তাহার নয়নোৎসব বক্ষের মণি প্রিয়তম ধনকে নিকটে আনিয়া সুদীর্ঘ বিরহের অবসান করিয়া দিবে, সেই আশার আনন্দে দুঃখিনী কত আগ্রহে তাহার অশ্রু মার্জ্জনা করে, তাহা সেই জানে। বঙ্গের চিরাকাঙ্ক্ষিত সেই দুর্গোৎসব আসিল এবং চলিয়া গেল, কে কি পাইল এবং পাইল না, সে হিসাব তাহারাই জানে, আমি সাশ্রুনয়নে গললগ্নীকৃতবাসে যোড়করে পাষাণনন্দিনীর নিকট যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা পাই নাই, সেদিনে শুধু সেই কথাই মনে পড়িতেছিল।

যখন চিকিৎসা প্রায় শেষ হইয়া যায়, দৈবশক্তির নিকট আকুল হৃদয়ের প্রার্থনা একান্ত ভক্তিভরে নিবেদন করা ছাড়া উপায়হীনের আর কোন উপায় থাকে না। আমি সেই উপায়ই অবলম্বন করিলাম। দেবতার চরণতলে প্রার্থিত লাভের কামনা সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় জীবন ভরিয়াই জানাইয়াছি, এই জীবনাপরাহ্নেও হৃদিস্থিত অপরিপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা-গুলির জন্য দেবতার উদ্দেশে ভক্তিভরে ঊর্দ্ধ দিকে নয়ন উৎক্ষিপ্ত করি না, এমন কথা কি বলিতে পারি ? অভি-লষিত বরদান করা না করা অদৃষ্টবিধাতার কৃপাকরুণার উপর নির্ভর করে, প্রার্থী তাহার যাচ্ঞার অঞ্জলি জীবন ভরিয়াই পাতিয়া রাখিবে। ভারতবর্ষের দেবদেবীর বিগ্রহ-কল্পনা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নীরস কাষ্ঠ বা কঠিন পাষাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আমার মনে হয়, ইহা বড় সার্থক কল্পনা। কাষ্ঠকে সরস করিতে বা পাষাণকে দ্রব করিতে যেমন বহু আয়াস করিতে হয়, দেবতার করুণালাভও তেমনি আয়াসসাধ্য, স্থলবিশেষে অসাধ্য হওয়াও বুঝি বিচিত্র নহে। শুনিয়াছি লঙ্কার রাবণ স্বীয়হস্তে তাহার দশমুণ্ড কাটিয়া দেবতার প্রীত্যর্থ অগ্নিতে আহুতি স্বরূপ প্রদান করিয়া তবে ইষ্টদেবতার বরলাভে সফলকাম হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা কঠোরতর তপস্যার মধ্যে সমগ্র জীবন যাপন করিয়াও বাঞ্ছিতলাভ অদৃষ্টে ঘটে নাই, এমন দুরদৃষ্টও জগতে থাকিতে পারে। তাই মনে হয়, কাষ্ঠ বা প্রস্তরে দেবমূর্ত্তির কল্পনা পূর্ব্বগত মনস্বীদিগের নিরর্থক কল্পনা নহে।

যাক্ সে কথা। দেবতা পাষাণ হউন, কাষ্ঠ হউন কিম্বা আর যাহাই হউন, মানুষের নিকট দেবতা দেবতাই। সকল উদ্যম ও সমস্ত অনুষ্ঠান যখন শেষ হইয়া মানবের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার ব্যর্থতা প্রমাণ করে, তখন দুঃখাতুর বেদনাক্লিষ্ট কাতর নয়নের ক্ষীণদৃষ্টি আকাশের দেবতার দিকে বারবার করিয়া প্রসারিত হয়। চিরপিপাসিত চাতক বারিধরের বারিবিন্দু যাচিয়া একান্ত নিষ্ঠার সহিত যেমন ঊর্দ্ধমুখ হইয়া তপস্যা করে, চিরদুঃখী মানব

তাহার চিরজীবনের সাধনার সামগ্রী লাভ করিবার জন্ত দেবদ্বারে তেমনি করিয়াই হাত পাতিয়া থাকে। হত-ভাগ্য চাতকের ভাগ্যে তৃষ্ণাহারী সুশীতল বারির অভি-সিঞ্চন কি সব সময়ে সম্ভব হয়? দুঃসহ গ্রীষ্মের বৈশাখী অপরাহ্ণে বায়ুকোণের নবজলধর-মূর্ত্তি চাতকের তৃষা দীর্ণ ক্ষুদ্রবক্ষে আশার আনন্দ কেমন করিয়া ঢালিয়া দেয়, তাহা নিদারুণ তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ একনিষ্ঠ চাতক ব্যতীত আর কে বুঝিবে? আবার অভিলষিত বিন্দুপাতের পরিবর্ত্তে প্রচণ্ড তাণ্ডবোন্মত্তা উন্মাদিনী কালবৈশাখী যখন বিদ্যুৎ-সহচরীর বিভীষিকাময়ী প্রলয়াগ্নিশিখায় পদাশ্রিত ক্ষুদ্র বিহঙ্গমের হৃদিসঞ্চিত চির-আশার আনন্দকে আতঙ্কে পরিণত করে, ঈশানের প্রলয়ঙ্কর বিষাণরবের ন্যায় মেঘ-সংঘর্ষের বজ্রনির্ঘোষে যখন তাহার কর্ণ বধির করিয়া দেয়, অবিরল করকাভিঘাতে যখন তাহার শীর্ণ দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, সে দিনের ভীষণ নৈরাশ্যময় অব-সানের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর হইয়াই তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—সে দুঃখ তাহার কত বড় দুঃখ, তাহাও সেই জানে।

তথাপি বৃষ্টিধারা-পরিপালিত-প্রাণ চাতকের অন্ত গতি নাই; সে মেঘের দিকে তাকাইয়া যেমন যোড়-করেই জীবনযাপন করে, তেমনি স্বীয় শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেলে দুর্ব্বল মানব দুর্ভেদর্শন তাহার অদৃষ্ট-বিধাতার উদ্দেশে ইষ্টলাভ আশায় যোড়হস্তেই আয়ুযাপন করিয়া থাকে—আশা, যদি দেবতার দয়া হয়! যখন যাহার কাছে শুনিয়াছি, অমুক দেবতার নিকট 'মানত' করিয়া, অমুক দেবতার দর্শন স্পর্শন জনিত পুণ্যে অমুকে তাহার ঈপ্সিতলাভে কৃতার্থ হইয়াছে, আমি তৎক্ষণাৎ সেই দেবতার পূজা, অর্চ্চনা, ভোগ মনে মনে 'মানত' করিয়াছি; অন্তরের অন্তস্তল হইতে বারবার করিয়া সেই দেবতাকে আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্ত প্রাণপণে ডাকিয়াছি। সকাল সন্ধ্যা মধ্যাহ্ন—যখনই নির্জ্জনে বসিবার অবকাশ হইয়াছে, তখনই একান্ত নিষ্ঠার সহিত মনে মনে দেবদ্বারে 'ধর্ণা' দিয়াছি;—পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থিত দুঃখক্লিষ্ট বেদনাতুর আমার অন্তরাত্মা দেবপ্রসাদ যাচিয়া যাচিয়া কেমন করিয়া মাথা খুঁড়িয়াছে, তাহা এই দুর্ভাগার অন্তরাত্মাই জানে। তীর্থে গিয়া প্রত্যক্ষ দেববিগ্রহের সম্মুখে নতজানু হইয়া যোড়করে দেবতার কৃপাভিক্ষা যতদিন না করিতে পারিয়াছি, ততদিন মনে মনেই আমার এই মানস-পূজা চলিয়াছে।

ইচ্ছানুসারে কোথাও গমনাগমন করা আমার পক্ষে নিতান্ত সহজ ছিলনা, সে কথা ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে বহুবার আমার পাঠক পাঠিকাদিগকে জানাইয়াছি। নিতান্ত পরাধীন বঙ্গরমণী যেমন পিঞ্জরবদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় অবরোধের চতুঃসীমার মধ্যে তাহার আয়ুযাপন করে, নববসন্তের বর্ণবৈচিত্র্যময় পুষ্পৈশ্বর্য্য, অসীম শরদাকাশের অফুরন্ত নীলিমা, বীচিবিভঙ্গবিহ্বলা বর্ষাতরঙ্গিণীর নৃত্যোৎসব, অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র খচিত, শশিসূর্য্যোদ্ভাসিত গগনাঙ্গনের অজস্র আলোকসম্পাত বঙ্গবধূর নিকট যেমন দুর্ভেদর্শন, পুরুষ হইয়াও আমার অবস্থা প্রায় তদ্রূপই ছিল। আমাকে অধিকাংশ সময় রাজপুরীর চতুঃসীমার মধ্যেই অনিচ্ছায় কাটাইতে হইত। পাঠ সমাপ্ত করিয়া যখন গৃহে ফিরিলাম, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আমার একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি একরূপ কারাবরুদ্ধের ন্যায়ই কাল কাটাইয়াছি। শারীরিক পীড়ার উপশমের জন্ত চিকিৎ-সকেরা যখন জলবায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতেন বা চিকিৎসার্থ স্থানান্তরে যাইতে হইত, কেবল সেই সময়ে আমি বাহিরে যাইতে পারিতাম, নতুবা বারিপরিপূর্ণ পরিখা পরিবেষ্টিত রাজপুরীর চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর আমার নিকট সুদৃঢ় কারাপ্রাচীরের মতই ছিল।

কলিকাতার চিকিৎসকগণ বলিয়াছিলেন, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসজনিত স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে আমার ব্যাধি সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া সম্ভব, সেই কথা বারম্বার আমার অভিভাবকবর্গকে জানাইয়া স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে যাইবার জন্ত আমার নিরতিশয় ইচ্ছা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। কঠিন পীড়ায় বহুদিন নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, নানারূপ চিকিৎসাতেও আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল

না, চিররোগী হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইতে হইতে পারে, এ আশঙ্কা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, এই সমস্ত কারণে এবারে আমার বিদেশে যাইবার প্রস্তাব তাচ্ছিল্যভরে উড়াইয়া দেওয়া হইল না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কোথায় গেলে ঈপ্সিত ফললাভ করিবার সম্ভাবনা, সেই বিষয়ে বিজ্ঞ বৃদ্ধগণ গম্ভীরভাবে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

এই পরামর্শের বৈঠক নিত্যই বসিতে লাগিল, কিন্তু স্থান আর কাল কিছুতেই স্থির হইতে চাহে না—আমারও ধৈর্য্যরজ্জু আর টেকে না, ছিঁড়িয়া যায় যায় হইয়া উঠিল। মাতা স্বয়ং কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই; না পারিবার তাঁহার যথেষ্ট কারণও ছিল। কোন স্থান কিরূপ, কোথাকার জলবায়ু আমার পক্ষে হিতকর হইবে, তাহা তাঁহার জানিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কারণ তিনি বঙ্গ-বধূ, তাহার উপরে তিনি প্রাচীন অভিজাত রাজকুলের কুলবধূ। দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া রাজবধূরূপে রাজপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তদবধি বহিরাকাশের চন্দ্রতারা পর্য্যন্ত তাঁহার নয়ন-গোচর হয় নাই। সুতরাং স্থান বিশেষের স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণাই থাকিবার কথা নহে। এরূপ ক্ষেত্রে কেমন করিয়া তিনি মতামত প্রকাশ করিবেন? তাঁহাকে বৃদ্ধ মন্ত্রিবর্গ ও হিতৈষিগণের বুদ্ধিবিবেচনার উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছিল। তিনি কেবল এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, যেস্থানেই কেন না যাওয়া হউক, উহা অধিক দূরবর্ত্তী স্থান না হইলেই ভাল হয়। এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। তাঁহার এই সন্তানটি শৈশবাবধি নানাবিধ ব্যাধিপীড়ার প্রকোপে বহুবার বহু যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে এবং প্রতিবারেই কষ্টসাধ্য পীড়ার দায়ে চিকিৎসার্থ তাহাকে মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া দাস-দাসীর সেবা ও পরিচর্য্যার উপর নির্ভর করতঃ আত্মীয়-স্বজনহীন নির্ব্বান্ধব বিদেশে যাইতে হইয়াছে। এবারে এই নিদারুণ ব্যাধির হাত হইতে সম্যক নিষ্কৃতিলাভ এখনও করিতে পারি নাই; এ অবস্থায় দূরতর স্থানে যাইতে দিবার অনিচ্ছা স্নেহপরায়ণা জননী-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কোথায়, কতদূরে, কোন্ বন্ধুহীন দেশের নিঃসম্পর্কিত স্নেহহীন স্বল্পপরিচিত জনগণের সংসর্গে গিয়া ব্যাধি পীড়ার আধিক্যের সময়ে কোন্ নিতান্ত প্রয়োজনীয় সেবাসাহচর্য্যের অভাবে স্নেহের ধন আনন্দদুলাল কি কষ্ট পাইবে, এই ভাবিয়া আকুল হওয়া স্বভাব-কোমলা নারীমাত্রেরই হৃদয়ধর্ম্ম। জননীর পদে অধিষ্ঠিতা হইয়া যিনি তাঁহার স্নেহ-বেষ্টনের মধ্যে আশৈশব পরিপালন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার স্নেহবিহ্বল অন্তরাত্মার নিগূঢ় স্নেহের গভীর তল হইতে কত আশঙ্কাই এমন অবস্থায় মনের দ্বারে আসিয়া দেখা দেয়, তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়?

মাতার ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ়তার কারণ আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম। তাঁহার স্নেহজনিত হৃদয়-দৌর্ব্বল্যে আমার অন্তরতলে গোপন আনন্দের অননুভূতপূর্ব্ব রসধারা বহিয়া যাইত; কিন্তু অতি বিজ্ঞ বৃদ্ধ মন্ত্রিসঙ্ঘ ও হিতৈষী-সম্প্রদায়ের অতি সাবধান পাদক্ষেপে আমার চিত্ত কত অধীর হইয়া উঠিত, সে ইতিহাস কেবল আমিই জানিতাম। পুরাণবর্ণিত দেবতা ও ঋষি কোপানলে কত দৈত্যদানব অসুরগণের ভস্মীভূত হইবার কাহিনী পড়িয়াছি, এ দিনে কেবল আমার সেই কথাই মনে হইত। ভাবিতাম, হায়, আজ হৃদয়ে যে বহ্নি দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতেছে, তাহার এক স্ফুলিঙ্গের কণামাত্র যদি নয়নকোণে বাহির করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই দানব-কুল নির্ম্মূল করিয়া দৈত্যনিসূদন নাম গ্রহণ করিতে এক পল মাত্র সময়ের জন্তও দ্বিধা করিতাম না। কেবল বিচার-বিবেচনা পরামর্শে সময়ের ক্ষতি জন্তই এতখানি রোষবহ্নি আমার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে; ওরূপ হইবার বিশেষ একটি হেতু ছিল, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অতিসাবধানী বিজ্ঞসম্প্রদায় নানা প্রকারের বৈষয়িক ব্যাপারের অনিষ্টাশঙ্কায়

আমার কোথাও যাওয়া তাঁহারা ভয়ের চক্ষে দেখিতেন; এবং সময়ে সময়ে সেই সকল অমূলক আশঙ্কার কথা আমার মাতার গোচরে আনিয়া তাঁহার স্নেহপ্রবণ মনঃস্বর্গেও কালিমার রেখাপাত করিয়া দিবার চেষ্টায় তাঁহাদের ত্রুটি ছিল না। এবারে চিকিৎসকগণের স্পষ্ট নির্দেশ থাকায় এবং প্রত্যক্ষে আমার কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা দেখিয়া বৈষয়িক অনিষ্টপাতের আশঙ্কায় কোন ফল হইবে না বুঝিয়া, আর এক অমোঘ অস্ত্র তাঁহাদের তূণ হইতে বাহির করিলেন, এবং তাহার প্রভাবে চক্রব্যূহ হইতে নির্গমনপন্থায় অনভিজ্ঞ অপ্রাপ্তবয়স্ক এই অভিমন্যুকে নিতান্তপক্ষে চন্দ্রলোকে প্রেরণ করিতে না পারিলেও, কিছুকাল রাজপুরীর চক্রব্যূহমধ্যে আটক করিয়া নিশ্চিন্তমনে কালহরণের পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন। সেই পাশুপত বা একাঘ্নী অপেক্ষাও ফলপ্রদ অস্ত্রটি এই :—কোন এক সুপ্রসিদ্ধ নগরে এক ভক্ত পরিবারের কোনও প্রগাঢ় ভক্তিপরায়ণ লোক নাকি স্বপ্নে এক মহৌষধ পাইয়াছিলেন, যাহার গুণে তিনি সর্ব্বপ্রকার শল্যসাধ্য অন্তর্বিদ্রধি বিনা শস্ত্রপ্রয়োগে অত্যল্প সময়ে আরোগ্য করিয়া থাকেন। রাজধানীর অন্নবিধ্বংসী বংশপরম্পরাগত 'হিতৈষীর' দল বারম্বার এই কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিতে লাগিলেন। দেবদ্বিজে একান্ত ভক্তিপরায়ণা আমার মাতার কর্ণে একথা প্রবেশ করিতে ক্ষণবিলম্বও হইল না এবং তাহার ফলে, অতি অল্পকাল মধ্যে সেই দৈবানুগৃহীত ব্যক্তি তাঁহার স্বপ্নলব্ধ ঔষধিসহ রাজধানীতে শুভাগমন করিলেন্। আমার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তাঁহার আশুফলপ্রদ চিকিৎসার অধীন হইয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে স্বাস্থ্যান্বেষণে যাওয়ার একান্ত বাসনা একপ্রকার ত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরেচ্ছাকেই প্রবল বলিয়া মাথা পাতিয়া লইলাম।

চিকিৎসা চলিতে লাগিল। স্বপ্নলব্ধ অশ্বিনীকুমার-প্রদত্ত ঔষধের বড় একটা সন্ধান পাইলাম না, কিন্তু নানাপ্রকারের লতা-পাতা-গুল্ম-মূল-ফল-বাকলে আমার কক্ষ ভরিয়া উঠিল। চিকিৎসক-প্রবর জানাইলেন যে, তাঁহার ঔষধের বলে ও ফলে অন্তরের বিদ্রধি বাহিরে আসিয়া পড়িবে। তখন তাহার উপর শস্ত্র শল্য খড়্গ যাহা হয়, তিনি স্বয়ং প্রয়োগ করিয়া আমাকে অচিরকাল মধ্যে রোগমুক্ত করিয়া দিবেন।

অনেক বিষয়ে আমি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইলেও, দুয়েকটি বিষয়ে আমার ধৈর্য্য অসীম। ব্যথা বেদনা নীরবে সহ্য করিতে আমার পারগতা অসাধারণ। শিশুকাল হইতেই অনেক রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, জীবনানুভূতির প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে জীবনান্তের শেষ নিমেষ পর্য্যন্ত শরীরাভ্যন্তরের যন্ত্রগুলির অনেক যন্ত্রণার মধ্যে আমাকে দিনযাপন করিতে হইবে বলিয়াই বোধ করি, বিধাতাপুরুষ আমাকে ব্যথাবেদনা সহিবার ক্ষমতা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় দিয়াছিলেন। বিধাতৃদত্ত আমার সেই সহনশীলতার উপর দৈবানুগৃহীত ভিষকপ্রবরের বিভীষিকাময় আস্তাড়ন চলিতে লাগিল। আমি নির্ব্বাক মৌনের সহিত যোড়হস্তে একান্তমনে তাঁহাকেই ডাকিতে লাগিলাম, যিনি "বাঁচান বাচি, মারেন মরি।"

অন্তর্বিদ্রধি বাহিরে আসিল কি না জানিনা, অন্তরের যাহা অন্তরেই থাকিল, বাহিরে আসিল নূতন আর কিছু, যাহার যাতনায় আমাকে নূতন করিয়া 'ত্রাহি মাম্ মধুসূদন' ডাক ছাড়িতে হইয়াছিল।

দৈবশক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ মাতৃহৃদয় স্নেহ-পুত্তলী সন্তানের বেদনাময় কাতরধ্বনি বহুদিন ধৈর্য্যসহকারে শুনিতে পারিলেন না। দৈবশক্তিসম্পন্ন ভণ্ড ভিষককে অচিরকালমধ্যে বিদায় দিয়া ডাক্তারি মতে পুনরায় আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইলেন। ভণ্ডের অদৃষ্টে রাজধাণীর যতগুলি অর্থ প্রাপ্য ছিল, সে তাহা লইয়া চলিয়া গেল। আমার দুরদৃষ্টে বেদনাভোগ যাহা লিখিত ছিল, আমি তাহাই লইয়া আবার কিছুদিনের জন্য বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পরামর্শদাতা

হিতৈষিবর্গের কেহ ঠিক সেই সময়েই তাঁহার মাতৃস্বসা গঙ্গাতীরস্থা হইয়াছেন জানাইয়া, কেহ পিতৃব্যকে নীরস্থ করা দরকার এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, একে একে কিছুদিনের জন্য সকলেই অন্তর্ধান করিলেন। বিবেচনার ত্রুটির জন্য নিরপরাধ সন্তানকে অকারণে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে দেখিয়া স্নেহশীলা মাতার মন কেমন করিয়া তাঁহার বক্ষপঞ্জরের মধ্যে রক্তাক্ত হইয়া মাথা খুঁড়িতেছিল, তাহা তাঁহার সতত সজল চক্ষু দেখিয়া আমার বুঝিতে বাকী ছিল না। রোগের ব্যথায় আমি কতখানি ক্লেশ ভোগ করিতেছিলাম, তাহা আমার শয্যালুণ্ঠিত অসহায় দুর্ব্বল দেহের দৈনন্দিন ক্ষয় দেখিয়া সেবারত স্নেহাকুল মাতৃহৃদয়ের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকে নাই। মাতা পুত্র উভয়েরই দিন নীরব মৌনতার মধ্যে অতিবাহিত হইতে লাগিল। একজন বিবেচনার ত্রুটিজনিত অনুশোচনা ও লজ্জায় নীরব; অপরের নীরবতার কারণ অভিমান। বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে উভয়কে যত নীরব বলিয়াই মনে হউক না কেন, দুই দুঃখী হৃদয় সেদিনে সর্ব্বদুঃখহারীর চরণতলে নীরব আর্ত্ত চীৎকারে কেমন করিয়া হৃদয়ের ব্যথা জানাইতেছিল, তাহা সেই দুইজন ব্যতীত আর কে জানিবে?

রোগে এবং দুঃখে যে ভাবে দিন কাটা সম্ভব, সেইভাবে দিন কাটিতে লাগিল। দৈবানুগৃহীত ভিষকের নিগ্রহে আমার রোগের ক্লেশ যে পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা কমিতে অনেকটা সময় লাগিল। পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইতে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। যখন পুনরায় কায়ক্লেশে চলাফেরা করিবার অবস্থা ফিরিয়া পাইলাম, তখন হিসাব করিয়া দেখিলাম, ব্যাধির সূচনা হইতে সেই দিন পর্য্যন্ত গণনায় সম্বৎসরের অনেক বেশী হইয়া গিয়াছে। অনুত্তীর্ণ-নবমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে চক্ষু-রোগে একবার অন্ধ হইয়া প্রায় দুই বৎসরের অধিক কাল অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল, বাতে পঙ্গু হইয়া একবার বৎসরাবধি বিছানায় পড়িয়া নিতান্ত ক্লেশের মধ্যে দিন কাটিয়াছে; তাহার পরে এই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে এবং 'হিতৈষিগণের' কল্যাণকর পরমর্শ ও মঙ্গলেচ্ছার প্রভাবে বৎসরাধিক কাল কাটিয়া গেল। ইহার উপরে প্লীহা যকৃৎ ম্যালেরিয়া প্রভৃতির প্রভাবে ব্যাধিগ্রস্ত দিনগুলি গণনা করিলে, জন্মমুহূর্ত্ত হইতে সেই সময় পর্য্যন্ত সুস্থ অপেক্ষা রোগক্লিষ্ট দিবসের সংখ্যাই অধিক, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

একদিন সময় বুঝিয়া মাতার নিকট সেই কথা জানাইলাম এবং তাঁহাকে নিতান্ত কাতরভাবে বলিলাম, এতদিন তোমাদের অভিপ্রেত পথে তোমাদের ইচ্ছানুসারে আমাকে চালাইয়া দেখিলে; এবার একবার আদেশ কর, আমার মতে চলিয়া দেখি, অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাই কিনা। কথাগুলি ঠিক কেমন করিয়া বলিয়াছিলাম, চোখমুখের অবস্থা তখন কেমন হইয়াছিল, কণ্ঠস্বরে আমার অন্তরের কাতরতা কতখানি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা এতকাল পরে আজ তেমনিই করিয়া বলিয়া বুঝাইতে পারিব না; তবে প্রায় আজীবন শারীরিক ক্লেশভোগ করিতে করিতে তরুণ বয়সের সরসতা মন হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াই গিয়াছে। যৌবনপ্রারম্ভের আশা আকাঙ্ক্ষা, জীবনের আনন্দ ও উদ্যম সব যেন মন হইতে বিদায় লইয়াছিল। নিতান্ত উপায়হীনের অন্তিম চেষ্টার মত এই শেষ চেষ্টাটা করিবার আদেশ যেন তাঁহার নিকট চাহিতেছি এবং প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপিণী জননীর আশীর্ব্বাদ-বাঞ্ছা করিতেছি, এই ভাবে আমার মনের কথা সেদিন ব্যক্ত করিয়াছিলাম। মাতৃদেবী সেদিনে আর কোনপ্রকার বাধা আমার পথে উপস্থিত করিলেন না, সাগ্রহে এবং সানন্দে আমার ঈপ্সিত পথ অবলম্বন করিতে আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আদেশ দিলেন; বারংবার মাতৃস্নেহোত্থিত সুধাসিঞ্চিত আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া এবং আমার সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার কল্যাণহস্ত স্পর্শ করাইয়া নিরাময় শান্তিমন্ত্র যেন পাঠ করিলেন—সেদিনে আমার অন্তর বাহির যে অসীম আনন্দে বারংবার পুলকাঞ্চিত হইয়া

উঠিতেছিল, তেমন আনন্দ জীবনে মাত্র আর একজনের স্নেহার্দ্র সুধাবাণী ও মঙ্গলহস্তের সুখস্পর্শে লাভ করিয়াছি।

মাতার এই সাগ্রহ, সানন্দ ও স্বেচ্ছাদত্ত আদেশবাণীর বলে হৃদয়ে যেন মহাবল পাইলাম। প্রথম যৌবনারম্ভের আদিমুহূর্ত্ত হইতেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে চিরজীবনের জন্য কর্ম্মানর্হ হইবার আশঙ্কায় আমার সমগ্র চিত্ততল কি বিষতিক্ত ও নিরানন্দ হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। স্বাস্থ্যকর স্থানের জলবায়ু আমার ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়া দিতেও পারে, এ আশার আনন্দ নবীন যৌবনারম্ভের দিনের চক্ষুর সম্মুখে অনাগত সুখের ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈচিত্র্যের লীলা কেমন করিয়া আঁকিয়া আঁকিয়া দেখায়, তাহা আমার পাঠক পাঠিকারা নিজ মন দিয়া বুঝিয়া দেখিবেন। এই এক আনন্দই সেদিনে আমার পক্ষে প্রচুর অপেক্ষাও প্রচুর ছিল। তাহার উপর এই বিচিত্র ভারতভূমির বৈচিত্র্যময়ী নগনদীসরিৎ-সাগরসমন্বিতা অনিন্দ্যশ্রী দেখিয়া আমার ব্যাধিগ্রস্ত ক্ষীণ নয়ন চরিতার্থ হইবে, এই আনন্দ আমাকে ক্ষণে ক্ষণে অধীর করিয়া তুলিতেছিল। ভূগোলে, ইতিহাসে, লোকমুখে বহুদেশের বহুকথা বহুবর্ণনা পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। পুরাণপ্রথিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রপ্রস্থ, সসাগরসাম্রাজ্যের একাধিশ্বর সম্রাটের একনিষ্ঠ প্রেমাবশেষের জন্মনিকেতন আগ্রানগরী, শিখসেনার অবিনশ্বর কীর্ত্তিকেন্দ্র পঞ্জাব প্রদেশ, ভদ্রার্জ্জুনের প্রেমকুঞ্জ রৈবতাচল, রাজপুতবীরত্বের শ্মশানশয্যা অরাবলীর গিরিদরী, কালিন্দীর উদ্বেলিত উর্ম্মিবিধৌত কুঞ্জকুটীরের পরাপ্রীতির বৃন্দাবনধাম, যাদবকুলের শেষশয়ন সমুদ্র-সৈকত প্রভাস, তৈমুর চেঙ্গীস্ বাবরাদি পঙ্গপালের ভারত-আক্রমণ-দ্বার আফ্‌গানভূমির গিরিসঙ্কট—ইহার কাহাকে রাখিয়া কাহাকে দেখিবার জন্য প্রথম যাত্রা করিব, এই ভাবনা আমার বড় ভাবনা হইয়া দাঁড়াইল। দূরদূরান্তরে যাইবার ইচ্ছা মনের মধ্যে পোষণ করিতেছি, একথা কোনপ্রকারে মাতার কর্ণ-গোচর হইলে হয়ত বা আদেশ প্রত্যাহৃত হইতে পারে, সেই ভয়ে মনের ইচ্ছা মনেই রাখিয়া, অনতিদূরে কোন স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে আপাততঃ যাইব এই কথাই মাতাকে পুনঃ পুন জানাইলাম; এবং সময়ে অসময়ে তাঁহার সহিত সেইরূপ পরামর্শই করিতে লাগিলাম।

আমার কুটীরবাসিনী দুঃখিনী জননীর ক্রোড়ে যেদিন আমি জন্মলাভ করি, সেদিন বিমানচারী গ্রহ-নক্ষত্রের দল আমার জন্মলগ্নের কোন্ স্থানে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা তাঁহারাই জানেন, এবং হয়ত বা রাজধানীর জ্যোতির্ব্বিদ্ জগবন্ধু আচার্য্য মহাশয় কথঞ্চিৎ জানিয়াছিলেন; কিন্তু যে গ্রহ যে স্থানে থাকিলে আজীবন কেবল নির্ব্বান্ধব বিদেশের পথে প্রান্তরেই ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, আমার জন্মলগ্নে সেই গ্রহ যে সেই স্থানে অচল অটলভাবে দাঁড়াইয়া, দীন দরিদ্রের সন্তান এই সদ্যোজাত মানবকটির প্রতি অচঞ্চল স্থির দৃষ্টি রাখিয়া দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আর যাহার সন্দেহ থাকে থাকুক, আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। জন্মের অনতিকাল পরেই যাহাকে জন্মভূমি ও মাতার স্নেহ-ক্রোড় ছাড়িয়া বাহির হইতে হইয়াছে, অনুত্তীর্ণ শৈশবেই যাহাকে মাতৃকল্পা ও মাতার অধিক স্নেহশীলা রাজ-জননীর স্নেহবাহুর বেষ্টনের বাহিরে বাহিরে থাকিয়া আয়ুযাপন করিতে হইয়াছে, রোগব্যাধি মৃত্যু বিয়োগ বিচ্ছেদ বেদনা ব্যথায় যাহাকে জীবনারম্ভের দিন হইতে পরিণত প্রৌঢ় পর্য্যন্ত ধূমকেতুর ন্যায় অনির্দ্দিষ্ট বর্ত্মে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইতেছে, তাহার শেষ যে কোথায় কেমন করিয়া হইবে, তাহা যিনি সব আরম্ভ এবং সব শেষের সূচনা ও অবসান জানেন, তিনিই কেবল সে কথা বলিতে পারেন।

বিদেশ গমনের উদ্যোগ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলাম; কিন্তু তখনও নিজমনে স্থির করিতে পারি নাই, প্রথম কোথায় যাইব। ইচ্ছা হইতে লাগিল, পাখীর মত পাখা পাইলে আকাশপথে উড়িয়া, যাহা কিছু দেখিবার আছে এক নিঃশ্বাসে দেখিয়া লই।

ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার স্পৃহা আমার শোণিতের

সহিত সংমিশ্রিত হইয়া আছে বলিয়া আমার মনে হয়। বালককালে যখন ভূগোল পড়িতে আরম্ভ করি, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আফ্‌গানিস্থানের গিরিসঙ্কটের বর্ণনা পড়িলাম। শের খাঁ নামক একজন কাবুলী মেওয়াওয়ালা আমার জন্মের পূর্ব্বেই, কিম্বা আমাকে রাজধানীতে লইয়া আসিবার পূর্ব্ব হইতেই, নাটোরে দোকান করিয়াছিল; কাবুলী মেওয়া বেচিয়া তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। প্রতি শীতের সময়ে সে নানাপ্রকারের কাবুলী মেওয়া ও কাবুল-জাত শীতবস্ত্রের আমদানি করিত এবং সেইগুলি স্থানে স্থানে বিক্রয়ার্থ লইয়া বেড়াইত। রাজবাড়ী তাহার পণ্যবিক্রয়ের একটি প্রধান স্থান ছিল। আমার পিতামহী প্রচুর পরিমাণে কাবুলী মেওয়া ক্রয় করিতেন। রাজধানীর কর্ম্মচারিবর্গ এবং অন্যান্য দাসদাসী, সকলে অল্পমূল্যের পশ্‌মিনা কাপড়, নকল শাল, আলোয়ান, চুসা, তোসা, র‍্যাপার, ফ্ল্যানেল, মোজা ইত্যাদি নিজ নিজ শক্তিসাধ্য অনুসারে ক্রয় করিয়া নিজ নিজ বিলাসবৃত্তি চরিতার্থ করিত, এবং শের খাঁর জীবিকার্জ্জনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিত। দোকনঘরখানি রাজধানীর এলাকার মধ্যেই ছিল। সেই সূত্রে এই দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ, দুর্গমগিরিনিবাসী স্বাধীন শের, রাজধানীর প্রজা বলিয়া নিজকে অভিহিত করিত এবং বালক 'খোকাবাবু'-নামধারী এই বর্ত্তমান লেখকের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে নিজকে সে আবদ্ধ করিয়াছিল। যতবার সে পণ্য লইয়া রাজধানীর ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিত, তাহার বৃহদায়তন ঝোলার মধ্যে ক্ষুদ্র 'খোকাবাবু'র জন্য সে বাদাম, পেস্তা, কোন কোন দিন অপেক্ষাকৃত মূল্যবান আঙ্গুর, আপেল, এমন কি সেকালের দুর্ল্লভদর্শন সরদাও (musk melon) সে আনিত। ফটকের মধ্যে শেরের দীর্ঘ বলিষ্ঠ মূর্ত্তি দেখা গেলেই 'খোকাবাবু' সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই পরিণতবয়স্ক বন্ধুর প্রীতির উপহার গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া বৃদ্ধকে কৃতার্থ করিতে কালবিলম্ব করিত না। এই আদান প্রদানে (শেরের পক্ষে প্রদান এবং 'খোকাবাবু'র পক্ষে আদান) দুই বন্ধুর মধ্যে প্রীতির বন্ধন খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। কোন কোন দিন শেরের সহিত, ভূগোলে পঠিত তাহার দেশের গিরিসঙ্কটের সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য গল্প আরম্ভ করিয়া দিতাম। স্বদেশবৎসল শেরের মুখে তাহার পরম স্নেহের উষর পর্ব্বতমালার জীবন্ত বর্ণনা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতাম। সেও তাহার সাতপুরুষের স্বদেশের বর্ণনা শুনিবার ধৈর্য্যশীল শ্রোতা পাইয়া একমনে আফ্‌গানিস্থানের গিরিগুহা, শৈলসঙ্কট, পার্ব্বত্য নরনারীর সজীব বর্ণনায় বিভোর হইয়া যাইত। সেই বাল্যকালে ভারতের পশ্চিমোত্তর সীমান্ত শৈলমালার বর্ণনা শেরের মুখে শুনিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, একদিন উষ্ট্রপৃষ্ঠে ভারবহনকারী আফ্‌গান 'কাফ্‌লা'র গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া ভারতাগমন, যেমন করিয়াই হউক দেখিতে হইবে।

আজ আমার বিদেশ গমনের পথে আর কোন বাধা না থাকায় মনে হইতে লাগিল, একবার বাহির হইতে পারিলে, মনের ইচ্ছা পূরণ করিবার আর কোন অন্তরায় থাকিবে না। রুগ্ন দেহে স্বাস্থ্যান্বেষণে যাইতেছি, এ কথা একরূপ ভুলিয়াই গেলাম; বহুদিনের পরিপোষিত অন্তরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পথ পরিষ্কার হইল দেখিয়া আমার জীবনসঙ্কট পীড়াকে বিধাতার অসীম অনুগ্রহ বলিয়া তাঁহার চরণোদ্দেশে আমার মস্তক কৃতজ্ঞতায় বারবার অবনত হইয়া পড়িতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

মানব-সমাজ—শ্রীশশধর রায় এম্ এ, বি এল্ প্রণীত। ডিমাই আট পেজী ১৩৬ পৃঃ; মূল্য ১.

সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানি বঙ্গভাষায় প্রথম পুস্তক। যাঁহারা সমাজের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদের এ পুস্তক পাঠ করা উচিত। বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপাদন দ্বারা সমাজের পুষ্টি করিতে হয়। কিন্তু সেই বিবাহ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে না হইলে সমাজের ক্রমশঃ অধোগতি হইবে। বাঙ্গালায় বিভিন্ন জাতি সামাজিক উন্নতির জন্য সভা-সমিতি করিয়া সামাজিক শিক্ষা ও বরপণ নিবারণই মুখ্য উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শশধর বাবুর উক্তিগুলি সকলেরই প্রণিধানযোগ্য! "বিবাহ দিবার সময় বর-কন্যার বংশগত দোষগুণ, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া কার্য্য করিলে সুফল পাইবার আশা করা যায়।" "কোন বংশে অল্প সংখ্যক আর কোন বংশে অধিক সংখ্যক অপত্য হইয়া থাকে। কোন বংশ অল্পায়ুঃ কোন বংশ দীর্ঘায়ুঃ। কাহারও বংশ-পরম্পরাগত পীড়া আছে, কাহারও নাই। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক বিবাহ সংস্কার নিষ্পন্ন হওয়া উচিত।" "যাহারা বংশানুক্রমে রোগগ্রস্ত, কিম্বা মদ্যপায়ী অথবা দস্যু তস্কর নরহন্তা প্রভৃতি সমাজদ্রোহী পরবংশ গঠন করিলে, সে বংশ দেহ ও মনে অবনত হইবেই।" কিন্তু বাঙ্গালী এখন কি করে? কন্যার রূপ ও ধন আর বরের ধন ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকিলেই হইল। বাঙ্গালী বিবাহে আর কিছু দেখে না। শশধর বাবু একটা উপায় বলিয়াছেন, "এ নিমিত্ত প্রত্যেক জাতির মধ্যে যাহারা কৃতি গুণী ও সুস্থ, তাঁহাদিগের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হউক।"

"বিবাহক্ষেত্রের সঙ্কোচে একরক্ত পুনঃ পুনঃ মিশ্রিত হইয়া জাতীয় ধ্বংস উৎপন্ন হইয়া থাকে।" গয়ালীরা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। "বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর সংসর্গে অনেক সময় জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। একজাতীয়গণ—যথা রাঢ়ী বারেন্দ্র—মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, বিবাহক্ষেত্রের বিস্তৃতি নিবন্ধন অপত্যসংখ্যা বর্দ্ধিত ও অপত্যগণ সবল, সুস্থকায় ও উন্নত হইতে পারে। কিন্তু প্রায় সমধর্ম্মীদিগের সংসর্গেই সুফল আশা করা যায়।" একগোত্রে বিবাহ হইলে বিবাহক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইবে বলিয়াই উচ্চ হিন্দুর মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ! কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মধ্যে যোগ বন্ধনে সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

দেহ ও মন লইয়াই মানব। দৈহিক উন্নতির জন্য বংশানুক্রম ছাড়া ব্যায়ামেরও প্রয়োজন। "দেহের প্রতি সমাজের দৃষ্টি রাখিতে হয়। ব্যক্তিগত ব্যায়াম, পরিবারগত উৎসব, জাতীয় ক্রীড়া ও অঙ্গচালন ব্যবস্থা—এ সকল অবশ্য থাকা চাই।" বাঙ্গালীর এ সকলের কিছুই নাই। ফুটবল খেলাটা বালক ও কতিপয় যুবকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশকাল বুঝিয়া ব্যায়াম ও জিমন্যাষ্টিকের আখড়াগুলি উঠিয়া গেল। গাড়ী, ট্রাম প্রভৃতির কল্যাণে আমাদের পাদচালনাও আর নাই।

মনের দুই প্রকার উন্নতি, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। প্রথমটি বিদ্যালয়ে হয়, দ্বিতীয়টির কোন ব্যবস্থাই নাই। বিদ্যালয়ে পূর্ণশিক্ষা হয় না। বুদ্ধি খেলে, ধর্ম্মবুদ্ধি প্রকাশ পায় না। ধর্ম্মহীন সমাজ সমাজই নহে। তাহাতে ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকে। "সমাজের উন্নতির মূল-কারণগুলির মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতির স্থান সর্ব্বোচ্চ। ধর্ম্ম ও নীতি পৃথক নহে; ধর্ম্মই সমস্তের মূল।" "ইতর জীবের সহিত মানবের প্রভেদ ধর্ম্মে। তাই ধর্ম্মের উন্নতিই মানবকে জীবন-সংগ্রামের পশুত্ব হইতে মুক্তিপ্রদান করিবে। শিক্ষা তাহার সহায়তা করিবে। শিক্ষা বলিতে এস্থলে প্রধানতঃ বিজ্ঞান শিক্ষাকেই লক্ষ্য করিতেছি।"

বাঙ্গালী বুঝিয়াছে শিক্ষা অর্থে বিদ্যালয়ের শিক্ষা, তাই নাপিত, ধোবা, কলু, কামার সকলেই আপনার ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া উকীল ও কেরাণীর সংখ্যা বাড়াইতেছে। "এই অনুপযোগীকে অন্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেও সে শিক্ষায় সুফল হইবে না, বরং কুফল হইবে। কারণ তাহার দেহে যদি অসৎ কর্ম্মের শক্তি ও প্রবণতা আচ্ছন্ন থাকে, তবে তাহা শিক্ষা ও সংসর্গ দ্বারা বিকশিত হইয়া সমাজের অনিষ্টজনক হওয়া সম্ভব।" আমাদের সাধু সন্ন্যাসীরা তাই যাহাকে তাহাকে শিষ্য করিতেন না। "এই নিমিত্ত বংশানুক্রমের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সকলকেই একটা বাঁধা নিয়মে নানারূপ শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা অতীব অসঙ্গত।" "কিন্তু শিক্ষা যদি মনকে সংযত, চরিত্রকে উন্নত করিতে পারে, তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সফল হইল। এমন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, কবি অথবা ঐতিহাসিক আছেন, যাহাদিগের চরিত্র দেখিলে মনে হয় যে, ইঁহারা অশিক্ষিত অপেক্ষাও অধম।" "ভাবপ্রধান ও কর্ম্মপ্রধান শিক্ষার মধ্যে সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা বর্ণমালার সাহায্য ব্যতীতও দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাই প্রকৃষ্ট। পুঁথিগত শিক্ষা সমাজের উদ্যম ও সাহস ভাঙ্গিয়া দেয়।" "শিক্ষাও জন্মের উপরই অনেক অংশে নির্ভর করে। যাহার শিক্ষ-

ণীয়তা আছে সেই শিখিতে পারে। "অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই জ্ঞানদায়িনী শিক্ষার উপযোগী। সাধারণের পক্ষে কর্ম্মকরী শিক্ষাই যথেষ্ট।"—এই জন্যই কি শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার ছিল না? পাত্র নির্ব্বিশেষে অবাধ শিক্ষার ফলেই আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র শিক্ষিত দস্যু, তস্কর, নরহন্তার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

"দাসত্ব, প্রভুত্ব ও অর্থ দেহ ও মনকে অবনত করে।" কথাটা শুনিতে নূতন হইলেও খাঁটি সত্য। প্রত্যেক ব্যক্তিই "সামাজিক বেষ্টনী হইতেই জাত হইয়াছেন। তিনি সমাজের নিকট ঋণী; সমাজের মঙ্গল কামনাই সে ঋণ শোধ করিবার একমাত্র পথ। ইহা তাঁহার ধর্ম্ম।" এই কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। সেকালে লোকে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিত, দেবালয় নির্ম্মাণ করিত, পুষ্করিণী কাটাইত, সদাব্রতের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি করিত। এখন আমরা দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইত রূপে নিজের উদর পূর্ণ করি, আর টাকা হইলে গাড়ী-ঘোড়া, স্ত্রীর অলঙ্কার করি। ক্বচিৎ স্যর রাসবিহারী, স্যর তারকনাথ পালিত আমাদের মধ্যে দেখা যায়।

আমরা দুই এক বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। গ্রন্থকার ৩১ পৃঃ বলিয়াছেন, "মানব প্রথমতঃ পশুভাবাপন্ন ছিল। অপর পশুর মৃতদেহে তাহার দেহ পোষণ হইত," আবার ৯৫পৃঃ বলিয়াছেন,"প্রাথমিক অবস্থায় মানব যখন কোন বস্তুই প্রস্তুত বা রন্ধন করিতে পারিত না, তখন উদ্ভিদ্ বা প্রাণীগণের সঞ্চিত পদার্থ তাহার আহার ছিল।"—আমরা এই শেষোক্ত মতই ঠিক বলিয়া মনে করি। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "সৌন্দর্য্যজ্ঞান হইতে পরিচ্ছদের উৎপত্তি, শীতাতপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নহে।" ইহাও আমরা ঠিক বলিয়া মনে করি না। তিনি বলেন, "মৃতব্যক্তির আত্মার কল্পনা হইতেই ঈশ্বরের জ্ঞান হইয়াছে।" মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, প্রভঞ্জন প্রভৃতি প্রকৃতির লীলাখেলা হইতে ও রক্ষা পাইবার প্রবৃত্তি হইতে দেবতার কল্পনা। তৎপরে ঈশ্বরজ্ঞান হওয়া বিচিত্র নহে।

সর্ব্বশেষে একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিব। তাঁহার ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের গ্রন্থে কোনরূপ অশুদ্ধি থাকিলে বহুলোক তাহা শুদ্ধ মনে করিবে। এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত অশুদ্ধ কথাগুলি পাইলাম—"সক্ষম," "স্থায়ীত্ব," "করতঃ" "উপযোগীতা", "জাগ্রত", "তথাপিও", "স্বায়ত্ব", "উচিৎ" "জীত"। ভরসা করি ২য় সংস্করণে এগুলি থাকিবে না।

পুস্তকখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে পঠিত হউক। অনেক শিখিবার বিষয় আছে।

"ব্রজরাজ।"

"ফিজি মে মেরে ২১ বর্ষ" (ফিজি দ্বীপে আমার ২১ বর্ষ।) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তোতারাম সনাঢ্য প্রণীত। আগরা ফিরোজাবাদ ভারতীভবন হইতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০

যখন পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন কুলি প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, সে কুলি প্রথা আজিও নিবারিত হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ আমাদের সার্ব্বজনীন সহানুভূতির অভাব ও দেশব্যাপী আন্দোলনের অভাব। "যাহারা মরিতেছে তাহারা মরুক,আমি ভাল থাকিলেই হইল।" এই চিরন্তন সংস্কার ভারতবাসীর মন হইতে যতদিন না বিদূরিত হইতেছে ততদিন এ কুলিপ্রথা দূর হইবে না। তবে ভারত গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হাত দিয়াছেন, কতক সংস্কারও হইয়াছে, কতক সংস্কার হইবার সম্ভাবনাও আছে এবং দেশ-ব্যাপী না হউক, কিছু আন্দোলন হইতেছে,—এইরূপ সময় আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি। কারণ এই কুলিপ্রথা দাসপ্রথার অপর একটি নাম মাত্র।—ইহা বিংশ শতাব্দীর কলঙ্ক—ভারতবাসীর কলঙ্ক, ইংরাজ রাজত্বেরও কলঙ্ক। যে সকল রোমহর্ষণকারী ব্যাপার ইহাতে বিবৃত আছে তাহা অনেক ভারতবাসীই বিশ্বাস করিবেন না, য়ুরোপ বা মার্কিণবাসীর ত দূরের কথা। তাহা ছাড়া এই পুস্তকের একটি বিশেষ মূল্য আছে। লেখককে আড়কাটিরা ভুলাইয়া কুলি করিয়া লইয়া যায়। লেখক স্বয়ং পাঁচ বৎসর কাল ফিজি দ্বীপে কুলির কার্য্যে যৎপরোনাস্তি কষ্টে কালক্ষেপ করেন। পরিশেষে মুক্তিলাভ করিয়াও ব্যবসা উপলক্ষে তথায় আরও ১৬ বৎসর কাল থাকিয়া অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে অতিরঞ্জিত বা অপরের নিকট শোনা কথা একেবারেই নাই।

সাহিত্য হিসাবেও এ পুস্তকখানি মূল্যবান। ভাষায় এমন একটি স্বচ্ছন্দ গতি আছে যে পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। ভারতবাসীর জন্য যাহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও সহানুভূতি আছে, তাঁহারা এ পুস্তক অত্যন্ত আগ্রহ সহকারেই পাঠ করিবেন ইহা আমার স্থির বিশ্বাস। যাঁহারা অতি সামান্য মাত্র হিন্দি জানেন, তাঁহাদের পক্ষেও পুস্তকখানি পাঠ করা কষ্টকর হইবে না।

পরিশেষে বক্তব্য, এই পুস্তক ভারতীয় সমস্ত ভাষায় ও ইংরাজিতে অনূদিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হওয়া উচিত।

বল্লরী—(কবিতাপুস্তক) শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। ৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"র পাঠকগণের নিকট কালিদাস বাবুর পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কি ছন্দে, কি ভাবে, কি ভাষা লালিত্যে—আমরা সর্ব্বত্রই কবির প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি।

ম্যালেরিয়া নাটিকা—শ্রীপরেশনাথ হোড় প্রণীত। শ্রীতিনুলাল বসু কর্ত্তক ১৪০ নং বাংলাবাজার ঢাকা হইতে হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৴০

এই অমূল্য নাটিকা হইতে অজীর্ণরোগগ্রস্ত কলিকাতা-বাসীর মঙ্গলার্থ নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আদা লবণ খেলে ভোরে
পেটের ক্ষুধা দ্বিগুণ বাড়ে।"

সাহিত্য-হিসাবে পুস্তিকার অপর কোন অংশের সহিত আমাদের কোন সংস্রব নাই।

আরব অমিয়া—(গাথা) শ্রীসেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস্ আলী প্রণীত। মোহাম্মদ আব্বাস্ আলী কর্ত্তৃক ৩৩নং বেণে-পুকুর রোড হইতে প্রকাশিত। ৫৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৶০

আরব দেশের একটি সুন্দর প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে এই গাথা বিরচিত। লেখক ভাবুক, কিন্তু ভাষার উপর তাঁহার দখল নাই, ছন্দটিও অত্যন্ত কটমটে। যথা—

"লইয়া বারি
চলিল ধীরে
দেরি নাহিক করিয়া।"
* * *
ধীরে অধীরে
পিইতে নীরে
চঞ্চল হৃদে চলিয়া।

প্রভৃতি শ্রুতিকঠোর ব্যাকরণদুষ্ট রচনা মার্জ্জনীয় নহে। উক্তরূপ রচনা বোধ হয় প্রতিপৃষ্ঠাতেই পাওয়া যায়। তাহার উপর প্রাদেশিকতা ও মুদ্রাকরের ভ্রমপ্রমাদ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। আশা করি লেখক এ সকল বিষয়ে ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন।

ইন্দুমতী (গার্হস্থ্য উপন্যাস)—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ, প্রণীত। কর্ণওয়ালিস বিল্ডিং হইতে মিত্র এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১॥০

এই গ্রন্থে পাঁচ খানি ছবি আছে—তাহাতে ইন্দুমতীর ও আমোদিনীর মুখে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে, যেন দুইটি যমজ ভগিনী। আকৃতিগত এরূপ সৌসাদৃশ্য থাকা স্বত্বেও প্রকৃতিগত ইহাদের রূপ বিভিন্নতা থাকা ঈশ্বরের সৃষ্টিতে আশ্চর্য্য নহে, ইহা দেখানই বোধ হয় চিত্রকরের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় লেখক তাহা অনুমোদন করেন নাই। একশত চব্বিশ পৃষ্ঠায় যে ছবিখানি আছে তাহা দেখিলে মনে হয়, মনের ভাব বাস্তবিক যেন চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পুস্তক খানির বিজ্ঞাপন সহরময় যেরূপভাবে ছড়ান হইয়াছিল তাহাতে মনে যে কিছু সন্দেহ না হইয়াছিল এমন নহে, এবং সুধী-সমাজে লেখক সুপরিচিত হইলেও পুস্তকখানি সাবধানতার সহিতই পাঠ করিয়াছিলাম। উপাখ্যান ভাগটি নিতান্ত সামান্য ও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত, কিন্তু রচনার ভঙ্গিটি এমন সুন্দর, ভাষা এমন সরল ও সরস, যে পুস্তকটি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, চরিত্রগুলি বেশ ফুটিয়া উঠে নাই। ইহার মধ্যে জ্যোতিনাথের চরিত্রই প্রধান বলিয়া বোধ হইল। ইঁহাকে যথাসম্ভব স্বার্থত্যাগী ও পরোপকারী করিয়া অঙ্কিত করিবার প্রয়াস লেখক পাইয়াছেন কিন্তু কয়েকটী ত্রুটীতে জ্যোতিনাথের চিত্রটি বড়ই বিসদৃশ হইয়াছে। পুস্তক-পাঠে আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, জ্যোতিনাথের সহিত ইন্দুমতীর কোন রক্তের সম্বন্ধ নাই। জ্যোতিনাথ যখন তাঁহার ও ইন্দুমতীর নাম একত্র শুনিলেন, তখন—তিরস্কৃতাই হউক আর লাঞ্ছিতাই হউক—ইন্দুকে তাহার শ্বশুরালয় হইতে একাকী তাঁহার সঙ্গে আনা ভাল হয় নাই—কেননা স্ত্রীলোকের মানের চেয়ে তাহার প্রাণ বড় নহে। তাহার পর পশ্চিমে তাহার সহিত একত্র বেড়ান বা দেখা সাক্ষাৎ করা বিষবৎ বর্জ্জন করা উচিত ছিল। রামলোচন বাবু ইন্দুর পিতাকে বলিয়াছিলেন, "অমন কথা শুনলে পরে কে আর বউকে জায়গা দিতে পারে বলুন"—ইহা কখনই জ্যোতিনাথের অজ্ঞাত ছিল না—আর যদিই ছিল ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কালীশঙ্কর বাবু (ইন্দুর পিতা) এই কলঙ্কবৃদ্ধির প্রশ্রয় দিয়াছিলেন বলিতে হইবে।

এই ভ্রমটি কেন্দ্র করিয়া গল্পটি রচিত, কিন্তু এইরূপ ভ্রম কোন সংসারাভিজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক হওয়া সম্ভবও নহে সঙ্গতও নহে, সুতরাং অমার্জ্জনীয়। তাহার পর, জ্যোতিনাথের অবিবাহিত সময়ে ইন্দুমতী ও জ্যোতিনাথের একত্র বসবাস গার্হস্থ্য উপন্যাসের অনুকূল আদর্শ নহে। 'আতুরে নিয়মোনাস্তি' এই বিধান অনুসারে এই ত্রুটী উপেক্ষা করিলেও, ললিতের পক্ষে এত সহজে আমোদিনীকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দুকে পুনর্গ্রহণ করা আশ্চর্য্য। যেন সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ছেলেখেলা। এই ললিতই ইন্দুকে পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে একটি কথাও

জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করে নাই—বা প্রয়োজন মনে করিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই। আমোদিনীকে পরিত্যাগ করা হইল কোন্ নীতি-শাস্ত্রানুসারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যদিও ইহাতে ললিতের মাতার দোষই বেশী, তথাপি ললিতের নির্লিপ্ততা তাহার সৎসাহসের অভাবজনিত বলিয়াই বোধ হয়। বোধ করি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা-উত্তীর্ণ অধ্যাপক ললিতকে কাপুরুষ অঙ্কিত করা লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না। ইন্দু কলিকা—কলিকাই রহিয়া গিয়াছে, ফুটে নাই। তবে ইন্দুর শ্বশ্রূটি বেশ ঝাঁজাল রকমের—অন্যান্য চরিত্রাপেক্ষা এইটিই যেন ফুটিয়াছে ভাল। বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে এরূপ কলহপরায়ণা আত্মসর্ব্বস্বা রমণী বিরল নহে। পরিণামে ইন্দুতে আশক্তি, তাহাও তাঁহার স্বার্থে আঘাত লাগার ফল, ইহা বোধ করি না বলিলেও চলে।

"অবাসুর"

ভেরী। (কবিতা পুস্তক)—শ্রীমন্মথনাথ দে প্রণীত। কলিকাতা "একমি" প্রেসে এ.রহমান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি; ৫৫ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য লেখা নাই।

বহিখানির ছাপা কাগজ ও বাঁধাই ভাল। মোট ৩৩টি কবিতা আছে। অনেকগুলিই সাময়িক, তাহা হইলেও কবির আন্তরিকতা ও লিপি-চাতুর্য্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম কবিতা God Save the Kingএর অনুবাদে একটি বহুকাল প্রচলিত ভুল সংশোধিত হইয়াছে। বহুকাল হইতে এই ভুল অনুবাদটি প্রচলিত ছিল—

রাণীরে তার হে, চিরায়ু কর হে,
ঈশ্বর।

মন্মথ বাবু "তার হে" স্থানে "রক্ষ হে" করিয়াছেন।

ও পারের কথা। প্রথম প্রবাহ। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন গুপ্ত লিখিত অবতরণিকা সহ। কলিকাতা "কালিকা যন্ত্রে" মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ; ২৬০ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা মূল্য ১৷৹

গ্রন্থকারের নামটি গোপন রাখিয়া অবতরণিকা-লেখক ইঙ্গিত করিয়াছেন যে রচয়িতা একজন সাধক এবং লিখিয়াছেন, "এই কথাগুলি অতীব সহজ, সরল, সরস ও সজীব ভাষায় পত্রের ভিতর দিয়া মুমুক্ষুজীবের বিশেষতঃ অল্পশিক্ষিতা রমণী-কুলের জন্য লিখিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই গুলিই 'ওপারের কথায়' প্রকাশিত হইল।"

এই সাধক সাধনপথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না. কিন্তু পত্রগুলির ভিতর অনেক স্থলে তিনি সুরুচির পরিচয় দেন নাই। বিশেষ বিশেষ স্নেহের পাত্রীকে সাধক মহাশয় আদর করিয়া "ওরে হারামজাদী,' "ওরে ছুঁচো বেটী" "ওরে পাজির পাঝাড়া বেটী" প্রভৃতি সম্বোধনে চিঠি লিখিয়াছেন, —আরও কতকগুলি চিঠিতে এমন সম্বোধন আছে যাহা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। এ সকলের ভিতর যে কি spirituality আছে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। শুনিয়াছি কোন কোনও বড় সাধুর মুখ-খারাপ ছিল, তাই বোধ হয় এই সাধকটিও সেইরূপ হইবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু মুখখারাপ করিলেই কি সাধু হওয়া যায়?—হরি মিলে?—তুলসী-দাস তাঁহার সেই ভুবনবিখ্যাত দোহায় এটুকুও যুড়িয়া দিতে পারিতেন—

মুখ-খারাপ করনেসে হরি মিলে—
তো ময় মেহুনী হোই!

এক একখানা চিঠিতে সাধক মহাশয়ের বিনয়টা অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। অনেক চিঠিতেই নিজেকে তিনি "এ হাবাতে," "এ মূর্খ" প্রভৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ ২৯নং চিঠি হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, ইঁহার কাছে প্রতিদিন এত চিঠি আসে যে উত্তর দিয়া উঠিতে পারেন না. নানা দিগ্দেশ হইতে দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দ আসিয়া সর্ব্বদাই ভীড় করিতেছে, অর্থাৎ তিনি বড় "কেউ কেটা" লোক নহেন।

চিঠিগুলির রুচি সম্বন্ধে বলিয়াছি ; ইচ্ছা ছিল ভাষা ও ভাবের একটু নমুনাও উদ্ধৃত করিয়া দিই। কিন্তু আমাদের স্থানাভাব।

শকুন্তলা। (গীতিনাট্য)—শ্রীসীতানাথ বসু ও শ্রীপ্রমথ-নাথ বিশ্বাস সম্পাদিত। কলিকাতা "কমারসিয়াল প্রেসে" মুদ্রিত। প্রকাশকের নাম নাই। ডিমাই ৮ পেজি, ৯১ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৹

ইহা মূল শকুন্তলার অনুবাদ নহে ; অভিনয়-সৌকার্য্যার্থ স্বাধীন ভাবে রচিত। ভাষাটি বেশ সরল হইয়াছে, অভিনয়কালে সর্ব্ব-সাধারণে বুঝিতে পারিবে।—এবং রসও যে পাইবে বলা বলাই বাহুল্য। গানগুলিও সুরচিত। তিনখানি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির কিন্তু প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

মণিমুক্তা। (কবিতাগ্রন্থ)—শ্রীরসময় লাহা প্রণীত। কলিকাতা "ভিক্টোরিয়া প্রেসে" মুদ্রিত এবং ৭ নং জয়মিত্র ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ২৪ পেজি ৯৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷৹

ইহাতে ৩৪টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে। উপহার কবিতায় লেখক বলিতেছেন যে প্রতীচীর হেমকোষ হইতে মণিমুক্তা আহরণ করিয়া আনিয়া তিনি এ 'মালাগাছি' গাঁথিয়াছেন। কিন্তু কোনও কবিতায় উল্লেখ নাই, কোথা হইতে কোন মণি বা মুক্তাটি তিনি আহরণ করিয়া আনিয়াছেন।

রসময় বাবু পূর্ব্বে হাস্যরসের কবি বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি গভীর বিষয় সকল লইয়াই কবিতা রচনা করিয়াছেন, এবং আমাদের ধারণা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কবিতাগুলি পশ্চিমের ফুলবাগান হইতে আহরিত হইলেও, তিনি প্রত্যেকটিকে দেশীয় সৌরভসম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন, ইহা তাঁহার নিপুণতার পরিচায়ক।

অর্ঘ্য

(১৭ই ডিসেম্বর প্রিয়বন্ধুর জন্মদিনে)

কি দিব তোমার হাতে
ভাবিতেছি আজি প্রাতে ;
নাই নাই, কিছু মোর নাই,

নাহিক ফুলের মালা,
শূন্য পূজার থালা,
তব যোগ্য কোথায় কি পাই ?

জান বন্ধু, প্রিয়তম,
নয়নের অশ্রু মম
দিবানিশি পড়িছে ঝরিয়া ;

বেদনায় রাঙা হিয়া,
আজি বন্ধু তাই দিয়া
অর্ঘ্য দিনু রচনা করিয়া।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

সাহিত্য-সমাচার

আগামী ৯ই, ১০ই ও ১১ই পৌষ বড়দিনের ছুটিতে বাঁকীপুরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" দশম অধিবেশন হইবে। মাননীয় বিচারপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি মহাশয় সম্মিলনের প্রধান সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। তদুপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণটি পাঠ করিবেন, তাহা মাঘ সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে আমরা প্রকাশ করিব।

প্রবীণ সাহিত্যিক, "মধুমালতী" প্রভৃতি উপন্যাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম মহাশয় বিগত ৯ই নবেম্বর দিবসে, তাঁহার কর্ম্মস্থান ডাল্‌টনগঞ্জে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত একখানি নূতন গল্প-গ্রন্থ "সুকুমার" নামে প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকদার প্রণীত "ইন্দুমতী" উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲

প্রবীণ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় চক্ষুরোগগ্রস্ত হইয়া প্রায় আড়াই মাস কাল মেয়ো হাঁসপাতালে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রসিদ্ধ চক্ষু-চিকিৎসক ডাক্তার মেনার্ড সাহেব, তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুটিতে অস্ত্র চিকিৎসা করেন। সম্প্রতি কতকটা আরোগ্য লাভ করিয়া বসুজ মহাশয় বিগত ২৭শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি আরোগ্যলাভ করিলেই "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আবার তাঁহার "শিরোমণি" ও "পুরাতন-প্রসঙ্গে"র রসাস্বাদন করিতে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স তাঁহাদের আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালায় আর একখানি নূতন গ্রন্থ যোগ করিলেন। ইহা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অরক্ষণীয়া" উপন্যাস।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "লালচিঠি" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১॥০



মৃতস্বামী কোলে বেহুলা

চিত্রকর শ্রীবীরেশ্বর সেন

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

৮ম বর্ষ ২য় খণ্ড	মাঘ ১৩২৩ সাল	২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ *

"সাজাইতে মাতৃভাষা, সদা যা'র মনে আশা,
নাশিতে স্বদেশবাসি-অজ্ঞান-তিমির।
জন্মভূমি-জননীর, মুছাতে নয়ননীর,
দিবসযামিনী যার পরাণ অধীর॥
রত্নপ্রসূ বসুধার সে রত্ন-সন্তান।
এ মর-ধরণী 'পরে অমরসমান॥"

সমবেত সভ্যমণ্ডলী, দেখিতে দেখিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন দশম বর্ষে উপনীত হইল। বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ প্রতিবর্ষে, কোন স্থানে সম্মিলিত হইয়া, মাতৃভাষার চরণকমলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন, নানা-রোগ-জর্জ্জর, বঙ্গভূমির প্রিয়সন্তানবৃন্দ, এই সম্মিলনের তিন দিন, আপন আপন সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ,—সমস্ত একপদে বিস্মৃত হইয়া মাতৃভাষার পবিত্র মন্দিরে, সাধকের ন্যায় উপবিষ্ট হন, ইহা বাঙ্গালীর পরম মঙ্গলের কথা, শ্লাঘার কথা। মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন,—যাহার যেটুকু আছে, সে যদি সেইটুকুতেই সুস্থ থাকে, অভ্যুদয়ের দিকে আর না তাকায়, তবে, মনে হয়, বিধাতা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াই, তাহার আর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন না। সংসারী জীবের পক্ষে এ উক্তি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমের ফলে বঙ্গভাষা বর্ত্তমানকালে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে, অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার বিশেষ অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। কেননা, যে সকল গ্রন্থকে স্তম্ভস্বরূপ আশ্রয় করিয়া বঙ্গভাষা এই প্রতিযোগিতা-সঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে অক্ষয়ত্ব লাভ করিতে পারে, এখনও বঙ্গভাষার তাদৃশ গ্রন্থাদি তত

* বাঁকিপুর, দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ

অধিক পরিমাণে উপনিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং আমাদের নীরব হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাতে বঙ্গবাসি-জন-গণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি কামনায় একটা বিক্ষোভ অর্থাৎ একটা তরঙ্গ উত্থিত থাকে, বাঙ্গালী-হৃদয় কোন সময়ের জন্ম নিস্তরঙ্গ, স্রোতোহীন, শৈবালপূর্ণ আবিল জলরাশির ন্যায় হইয়া না পড়ে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নপর থাকিতে হইবে। বঙ্গভাষা-বিষয়িণী আলোচনা দেশের সর্ব্বত্র আরও অধিকতররূপে অরব্ধ করিতে হইবে। আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, অনেকে বলেন, "এই সাহিত্য-সম্মিলনের কোন উপযোগিতা নাই। বর্ষে বর্ষে এতগুলি টাকা ব্যয় করায় ভাষার তেমন কি অভ্যুদয় হইয়াছে? এই দীর্ঘ দশ বৎসরে বাঙ্গালা-ভাষার কোনই ত উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাই না। তবে এ আন্দোলনের আবশ্যকতা কি?"—ইত্যাদি। যাঁহারা এই কথা বলেন, দুঃখের বিষয়, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। অনন্ত কালের সমক্ষে যাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পক্ষে দশ বৎসর বা দশশতবৎসর নিমেষতুল্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। যদি আমরা আমাদের জাতীয়তা সঞ্জীবিত রাখিতে চাই, তবে সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন আবশ্যক। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, বাঁচিবার উপায় উপকরণগুলির প্রতি সর্ব্বদা সতর্কদৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঔদাসীন্যে চলিবে না। যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী-জাতির যদি জগতে কালজয়ী হইবার বাসনা থাকে, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে বঙ্গের জাতীয়-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, বৎসরে একবার কেন, যদি প্রয়োজন বুঝা যায়, একাধিক বারও এতাদৃশ সম্মিলনের অধিবেশন অনভিপ্রেত নহে। চাই উৎসাহ, চাই উদ্যম। আমার মাতৃভাষাকে জগতের বরণীয় করিয়া তুলিব, একা আমি নহি, আর দশজনেও যাহাতে আমার মাকে মা বলিতে পারিলে, নিজেকে ধন্য কৃতার্থম্মন্য মনে করিবে, এমন ভাবে আমার মাকে গড়িয়া তুলিব, প্রাচ্য-প্রতীচ্য-নির্ব্বিশেষে আমার মার অধিকার প্রসৃত হইবে, এইরূপ ধারণা লইয়া যদি আমরা কাজ করিতে পারি, তবে, আজ যাহা স্বপ্ন বা একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা করস্থ আমলকবৎ হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং যাহাতে বঙ্গবাসীর মনে বঙ্গ-সাহিত্য-চর্চ্চার স্পৃহা সতত জাগরূক থাকে. তজ্জন্য, এবং মধ্যে মধ্যে বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণের প্রীতিপ্রণয়ের আদান-প্রদানের জন্য এইরূপ সম্মিলন যে একান্ত আবশ্যক, ইহা অবিসংবাদে বলা যাইতে পারে।

বাঁকিপুর দশম সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃবর্গ সেই মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। যেস্থানে একদিন ভারতের তদানীন্তন একচ্ছত্র সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক বৌদ্ধ সঙ্গীতির আহ্বানপূর্ব্বক মগধের স্মরণীয় মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন,—যে পাটলীপুত্রের পুরাচিহ্ন সমূহের সামান্য একটু অংশ প্রাপ্তির জন্য ঐতিহাসিকগণ সতত উদ্গ্রীব, ভারতের নবীন ইতিহাসের প্রতিপত্রে যে প্রচীন নগরের স্মৃতি বিজড়িত থাকিবে,—সেই পাটলীপুত্রে আজ বঙ্গের সারস্বতসেবকগণ সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহা বাঙ্গালীর বিশেষ শ্লাঘার কথা, এবং অদ্যকার এই দিন, —বঙ্গবাসীর তথা বঙ্গের ভবিষ্য-জাতীয়-ইতিহাসের এক স্মরণীয় বস্তু। পার্থিব ব্যাপারে আজ বঙ্গ এবং বিহারের মানচিত্র পৃথগ্‌ভূত হইলেও, অপার্থিব সারস্বত ব্যাপারে এই উভয় প্রদেশই যে একসূত্রে গ্রথিত, অদ্যকার এই সম্মিলন তাহার অন্যতম নিদর্শন।

এই জাতীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল মনস্বী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহাদের খ্যাতিপ্রতিপত্তির পরিচয় নূতন করিয়া আমি আর কি দিব? সেই সকল সুযোগ্য সাহিত্যরথিগণের স্পৃহণীয় আসনে, আপনারা আমাকে বসাইয়া সেই মহার্হ আসনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে আমাকেও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এইরূপ কার্য্যে,

বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের মহাসম্মিলনে, আমি সভাপতিরূপে কার্য্য করিব। আমি সাহিত্যিক নহি, বঙ্গবাণীর সেবকগণের যে গৌরব, আমি তাহার ভাজন হইবার যোগ্য নহি, ইহা আমি যতটা জানি এবং বুঝি, বোধ হয় অন্যে ততটা জানেন না বা বুঝেন না। বঙ্গের যে সকল কৃতী সন্তান প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণপণে এবং নিঃস্বার্থভাবে বঙ্গভারতীর অর্চ্চনা করেন, সেই সকল মহাত্মাদের কোন কাজে, কোন উপকারে, আমি আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে, চরিতার্থ হই। সভ্যগণ, আপনারা আমাকে সে সুযোগে বঞ্চিত করিয়াছেন। সাহিত্যসাধকগণের সেবা করিতে যাহার অভিলাষ, তাহাকে সাহিত্যসাধন যজ্ঞের ঋত্বিক্‌রূপে মনোনীত করায় উক্ত যজ্ঞের অগৌরব হইয়াছে, এবং তাহার সে সাধেও বাদ সাধিয়াছেন।

প্রথম যৌবনে, যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন ক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল, যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়। আমার মাতৃসমা মাতৃভাষাকে যদি কোনমতে সম্পত্তিশালিনী করিতে পারি, আমার জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু অপলাপে লাভ কি? যে সম্পদ্ থাকিলে, যে শক্তি থাকিলে, মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করা যায়, দুর্ভাগ্য আমি, আমার সে সম্পদ্ বা শক্তি নাই। আমি মধ্যে মধ্যে ভাবিতাম, কবে এমন দিন আসিবে, যখন, আমার শিক্ষিত দেশবাসিগণ আচারে ব্যবহারে, কথায় বার্ত্তায়, চালচলনে প্রকৃত বাঙ্গালীর মতন হইবে। কবে দেখিব, দেশের যাঁহারা মুখপাত্রস্বরূপ, সমাজের যাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাঁহাদের আরাধ্যদেবতা। কবে শুনিব, শিক্ষিত বাঙ্গালী আর এখন বাঙ্গালাভাষায় সর্ব্বসমক্ষে কথা বলিতে বা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, বা বঙ্গবাসী নিজেকে বঙ্গভাষার সেবকরূপে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। আজ ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়, নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্ভূত হয়, যে, সে সুদিন আসিয়াছে, আমার সেই আবাল্যধ্যেয় সুসময় আজ আমার সম্মুখে বর্ত্তমান। একদিকে, দেশের যাঁহারা ভবিষ্যৎ আশার স্থল, যাঁহাদের বিবেচনার উপর বঙ্গদেশের অদৃষ্ট নিহিত, সেই শিক্ষার্থি যুবকগণ আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজভাষার সহিত বঙ্গভাষারও আলোচনা করিতেছেন, আর দু'দিন পরে, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে, তর্জ্জনীহেলনে দেশের লোক-মত পরিচালন করিতে পারিবেন, সেই যুবকবৃন্দ বঙ্গভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার আসন পড়িয়াছে; শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পার্শ্বে আমার বঙ্গের শ্বেতশতদল-বাসিনীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে; আর ঐ দেখ, অন্যদিকে, যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, সৌভাগ্যদেবতার আদরের সন্তান, তাঁহারাও বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বঙ্গের, তথা বঙ্গভাষার, ইহা পরম কল্যাণের কথা। বাঙ্গালীর ইহা পরম মাহেন্দ্র ক্ষণ।

কয়েক মাস পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে আমি জাতীয়-সাহিত্যগঠন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, "দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎপথে লইয়া যাইতে হয়, মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, বাঙ্গালী জাতীকে একটা মহা জাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতেই হইবে। পাশ্চাত্যভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও, যাহাতে বঙ্গের ইতর সাধারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ, আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে, আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ, আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে,

সেই সকল বিষয়, আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, বিদেশীয় আয়ুধেও সন্নদ্ধ হইতে হইবে।" সুতরাং জাতীয় সাহিত্যগঠন সম্বন্ধে অদ্য আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অদ্য আমার প্রধানতঃ বক্তব্য এই যে, শুধু বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যগঠন করিলেই চলিবে না, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বদ্বৃন্দেরও আরাধ্য হইতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে হইবে। এবং সেই চিন্তা-প্রসূত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। তবেই ত বঙ্গভাষা অমরত্ব লাভ করিবে। যদি এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্য গঠিত হয়, এমন সম্পদে বঙ্গসাহিত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর মনীষিগণেরও চিত্ত আমার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আজ যেমন আমরা অনেক অনর্ঘ এবং শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভাষা শিখিতে প্রয়াস করিয়া থাকি, সেইরূপ বঙ্গভাষায় যদি এমন অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয়, আবিষ্কার এবং উপনিবদ্ধ হয়, যাহা কৃতবিদ্য মাত্রেরই সর্ব্বথা অবশ্য শিক্ষণীয়, অথচ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ঐ ঐ বিষয় সমূহ, এতাবৎকাল লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বিদ্বদ্বৃন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন। সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে হইলেই যাহাতে বঙ্গভাষাও অপরাপর ভাষার ন্যায় শিখিতে হয়, না শিখিলে, অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় চিরকালের মত অজ্ঞাত থাকিয়া যায়, সুতরাং অন্য শত ভাষার শিক্ষাতেও পূরা মানুষ হওয়া যায় না, যদি এমনই ভাবে বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করা যায়, তবেই বঙ্গভাষা জগতে চিরস্থায়িনী হইবে, বাঙ্গালার ভাষা জগতের অন্যান্য প্রধানতম ভাষার শ্রেণীতে সমুন্নীত হইবে। অন্যথা বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার গৌরব বাড়িল কৈ? বঙ্গসাহিত্য বলিলেই যাহাতে একটা বিশিষ্ট সাহিত্য বুঝায়, বিশ্বের অন্যতম প্রধান সাহিত্য বুঝায়, এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্যের গঠন করিতে হইবে। কিছুই অসম্ভব নহে। চেষ্টা ও একাগ্রতা থাকিলে এই সংসারে স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করা যায়। কাল অনন্ত এবং পৃথিবী বিশাল, সুতরাং ব্যস্ততার কারণ নাই, ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপপূর্ব্বক, আমার জননী বঙ্গভাষাকে, অনন্তকালরূপী অক্ষয়বটের ছায়াশীতল তলদেশে লইয়া যাইয়া বঙ্গের পূজনীয় ভাষাকে জগতের পূজনীয় করিতে হইবে। বিষয়টা আরও একটু বিশদ করিতে চেষ্টা করা যাক্। একদেশের ভাষা অন্য দেশের লোকের নিকট আদৃত হইবার কারণ প্রধানতঃ দুইটি, একটি রাজনৈতিক কারণ, অপরটি ভাষায় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রাচুর্য্য।

রাজার জাতির ভাষা না শিখিলে, রাজার জাতির ভাষায় বিজ্ঞতালাভ না করিলে, নানারূপ অসুবিধা, সুতরাং বিজিত জাতির বিজেতার ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। ধরিয়া লউন, আমাদের ইংরাজরাজ যদি আজ পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইতেন, তাহা হইলে এই বিশাল পৃথিবীতে ইংরাজীভাষাই প্রধানতঃ প্রচলিত হইত। সেরূপ কোনও সম্ভাবনা আমাদের বঙ্গভাষার নাই, সুতরাং প্রথমোক্ত কারণে বঙ্গভাষা জগতের ভাষা হইতে পারে না। কিন্তু রাজভাষা না হওয়া সত্ত্বেও এমন অনেক ভাষা দেখিতে পাই, যাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীর নিকট অনাদৃত নহে, প্রত্যুত যথেষ্ট আদৃতই হইয়া থাকে। যেমন ইংরাজিভাষা। সমগ্র পৃথিবী ইংরাজের রাজত্ব না হইলেও, অনেক স্বাধীন দেশেও এই ভাষার আদর দেখিতে পাই। এইরূপ রুষদেশীয় ভাষাও এমন অনেক দেশে যথেষ্ট সমাদৃত, যেখানে হয়ত এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে একজনও রাসিয়ান দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের গর্ব্বের কারণ, ভারতবর্ষের স্পর্দ্ধার বিজয়-বৈজয়ন্তী, সংস্কৃতভাষা, অথবা ইউরোপের লাটিন এবং গ্রীকভাষা কোন্ দেশে অনাদৃত? কোন্ মেধাবী ব্যক্তি এই সকল ভাষা শিখিয়া কৃতার্থ হইতে না চান্? ফরাসী ভাষায় যে সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি আছে, তাহার অনুবাদমাত্রে পরিতৃপ্ত হইয়া,

কোন্ আজীবনছাত্র মনস্বী উক্ত ভাষা অভ্যাস না করেন? এই সকলের কারণ কি? ঐ ঐ ভাষায় এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা না শিখিলে, সেই সেই বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ হইয়াছেন, এ কথা অবিসংবাদে স্বীকার করা যায় না। মনে করুন, গণিত এবং রসায়ন শাস্ত্র, রাসিয়ান ভাষায় গণিত এবং রসায়নশাস্ত্রের এত অধিক পর্য্যালোচনা ও গবেষণা আছে যে, সেই সেই শাস্ত্র-ব্যবসায়ীদের পক্ষে সেগুলি অবশ্য দ্রষ্টব্য। যদি কেহ অঙ্ক বা রসায়ন শাস্ত্রে প্রকৃত পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে চান, ঐ ঐ বিষয়ে নিজের যে জ্ঞান-পিপাসা, তাহা সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে চান, তবে তাঁহাকে রুসীয় ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে। অন্যথা সে সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডের, অথবা কেবল ইংলণ্ড কেন, জগতের গৌরব-ভাজন মহাকবি সেক্ষপীয়রের অমৃতময়ী লেখনীর রসাস্বাদ করিবার জন্য কোন্ সুরসিক ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে না চান? রাজনৈতিক কারণ ব্যতিরেকেও রাসিয়ান্ এবং ইংরাজী ভাষার প্রতি এত যে আদর, জ্ঞানার্থীদের এত যে শ্রদ্ধা, তাহার প্রকৃত কারণ হইল, তৎ তৎ ভাষায় ঐ সমুদয় মহার্ঘ বিষয়ের সন্নিবেশ। যদি অঙ্ক এবং রসায়ন বিষয়ে রাসিয়ান্ ভাষা অতটা সম্পন্ন না হইত, বা সেক্ষপীয়র, মিল্টন, বাইরণ প্রভৃতির অপূর্ব্ব কল্পনালোকে, বা নিউটনের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারে ইংরাজি ভাষা সমলঙ্কৃত না হইত, তবে রুষিয়া এবং ইংরাজের অনধিকৃত দেশ সমূহেও এই এই ভাষার কি এত গৌরব কদাচ বৃদ্ধি পাইত? ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞানময় সংস্কৃত ভাষার ইউরোপেও যে এত আদর, তাহার কারণ কি? পরাধীন ভারতের প্রাচীনতম ভাষার প্রভাব স্বাধীন পাশ্চাত্য জগতে যে ভাবে বিস্তারলাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, কালে এমন এক দিন আসিবে, যখন, পশ্চিমের প্রত্যেক বিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কোন না কোন বিষয়ে সম্পূর্ণতালাভের জন্য সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিবেন। কবে, কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে বসিয়া, ক্রৌঞ্চমিথুনের কবি, তাঁহার তপঃসিদ্ধ বীণায় ঝঙ্কার করিয়া গিয়াছেন, আর আজও ঐ দেখ, সকল দেশের সুপণ্ডিত ব্যক্তিই সেই ঝঙ্কার শুনিবার জন্য কান পাতিয়া আছেন। বাল্মীকির রামায়ণ বা ব্যাসের মহাভারত, ভারতের অপৌরুষেয় বেদ-সংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় উপনিবদ্ধ বলিয়া, সকল দেশের জ্ঞান-পিপাসুই এই ভাষায় আস্থাসম্পন্ন। মহাকবি কালিদাস, শিপ্রাতটে বসিয়া যে মোহন বংশীধ্বনিতে ভারতবর্ষ উদ্‌ভ্রান্ত, একেবারে তন্ময় করিয়া গিয়াছেন, আজও সে বাঁশরী-ঝঙ্কারের যেন বিরাম হয় নাই; ঐ দেখুন, ইউরোপের মেধাবী সন্তানগণ, ঐ মনোজ্ঞ সঙ্গীতের রসাস্বাদের আশায়, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতেছেন। এদেশীয় শকুন্তলনাটকের বিদেশীয় কৃত অনুবাদের অনুবাদ পড়িয়াও সুকবি গেটে আত্মহারা হইয়াছিলেন। জগতের অন্যতম প্রধান চিন্তাশীল প্লেটো, ইউক্লিড, পিথাগোরাস, এরিষ্টটল প্রভৃতির মনীষা-সাগরোত্থিত রত্নমালা কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক গ্রীক্ ভাষা এই মরধামে অমরতালাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক আধিপত্যে উল্লিখিত ভাষাসমূহ অকিঞ্চিৎকর হইলেও জ্ঞানের আধিপত্যে, সম্পদের আধিপত্যে ঐ ঐ ভাষা জগতের শিক্ষিত সমাজের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক গগনের চন্দ্র সূর্য্য পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান-মহার্ণবের বেলাভূমিতে ঐ যে সমুদয় প্রাচীন মনীষিগণের সুচিন্তারত্নবিমণ্ডিত সৌধাবলী শির উত্তোলনপূর্ব্বক স্মরণাতীত কাল হইতে দাঁড়াইয়া আছে, জগতের ঐহিকবাদিগণের পরস্পর বাদ বিসংবাদ দর্শনে যেন নীরবে হাসিতেছে,—ঐ সকল মনীষামন্দিরের কোনদিন বিলোপ ঘটিবে না। নানাবিধ বিপ্লবে ভারতবর্ষ ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইলেও, সেই প্রাচীনকাল হইতে বেদাদি রত্নহারে সুশোভিত হইয়া সংস্কৃত ভারতী একই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। যদি সংস্কৃত ভাষায় বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সংহিতা প্রভৃতি উপনিবদ্ধ না হইত, যদি কালিদাস ভবভূতি ভাস প্রভৃতি অমর কবিকুলের শব্দগ্রথিত মণিময়-

হারে সংস্কৃত ভাষা অলঙ্কৃত না হইত, তবে কি আজ এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনেও সংস্কৃত ভাষা এমনই অক্ষতদেহে ভারতীয় সভ্যতার কিরীটরূপে শোভা পাইত? ভাষার অমরত্বের এবং সর্ব্বত্র প্রসারের কারণ হইল, সম্পদ্। যে ভাষায় যত সম্পদ্, যে ভাষা যত অধিক সুচিন্তা-প্রসূত-বিষয়ে বিমণ্ডিত, সেই ভাষার প্রসার জগতে তত অধিক। সে ভাষা যে দেশেরই হউক না কেন, সকল বিদেশীয়েরাই আন্তরিক যত্ন-সহকারে সেই ভাষার সেবা করিয়া নিজেকে ধন্য করিবেন। এইরূপ সংস্কারে হৃদয় দৃঢ় করিয়া, বঙ্গ-ভূমির প্রকৃত সুসন্তানের ন্যায়, আমরা যদি বঙ্গ-ভাষার আলোচনা করিতে পারি, কালে বঙ্গভাষা জগতের শিক্ষণীয় ভাষা হইবে। বঙ্গের গৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ন্যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের বর্ত্তমান মনস্বিগণও যদি, তাঁহাদের জ্ঞানগরিমার সম্পদ্ বঙ্গভাষাতেই উপনিবদ্ধ করেন, এবং উত্তরকালেও যাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালার সারস্বত-রাজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাতেই স্ব স্ব জ্ঞানের চরম ফল লিপিবদ্ধ করিয়া যান,—এবং এইপ্রকারে যদি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা অব্যাহতভাবে প্রচলিত থাকে, তবে এমন এক দিন আসিবেই, যখন বিদেশীয়গণের অনেক কৃতবিদ্যকেই আগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। বাঙ্গালার মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয়ে প্রাবীণ্য লাভ করেন, কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আবিষ্কার, তাঁহাদের চিন্তালহরী, ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া স্ব স্ব মাতৃভাষাতেই প্রকাশপূর্ব্বক জন্মভূমির তথা জননী বঙ্গভাষার গৌরববৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গ-ভাষার আলোচনা করিবেন। অবশ্য তাহাতে বঙ্গ-ভাষা জগতের সর্ব্বত্র একাধিপত্য করিবে না সত্য, কিন্তু রাসিয়ান্ গ্রীক্ লাটিন্ সংস্কৃত ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গভাষাও পৃথিবীর তাবৎ শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম আলোচনীয়রূপে গৃহীত হইবে।

অবশ্য এইরূপ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করা দু'এক দিনে বা দু'দশবৎসরে সম্ভব নহে বা আরম্ভ-মাত্রেই ফললাভের আশা নাই, কিন্তু যদি যথার্থ দেশহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, বঙ্গভাষাকে অক্ষয় করিবার বাসনা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়, মানুষের অনন্য-সাধারণ-কমনীয় নিজের জাতীয়তার ও জাতীয় সাহিত্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ অথবা বর্দ্ধিত করিবার জন্য,—বাঙ্গালী নিজের নিজের জ্ঞান-ধামতার পরিচয়, স্বস্ব উপার্জ্জিত জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্য-সম্ভার, নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করেন, আপাত-যশের সম্মোহনী তৃষ্ণার বশবর্ত্তী না হইয়া স্বদেশের এবং স্বজাতির কল্যাণকামনায় একমাত্র বঙ্গভাষাকেই সেব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে এই দুরূহ বলিয়া প্রতিভাত কার্য্য, ক্রমেই সুকর হইয়া আসিবে। আজ যাহা অসম্ভব মনে হইতেছে, কাল তাহা একান্ত সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইবে। আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার গৌরব-কেতন কালের অক্ষয় গগনে বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর বিজয়প্রশস্তি ঘোষণা করিবে। এই সকল ব্যাপার করিতে হইলে, এই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তীর্থজলে অভিষেকের এবং সংযমের প্রয়োজন। বিনা অভিষেকে বা বিনা সংযমে যজ্ঞবেদিতে উপবিষ্ট হইতে নাই। দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিব, আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের বরণীয় করিব,—আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশজন অন্য মায়ের সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে,—এই প্রকার পবিত্র সঙ্কল্পরূপ গঙ্গাজলে অভিষেকপূর্ব্বক, কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশ অর্জ্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের যাহা কিছু উত্তম যাহা কিছু সৎ উদার অপূর্ব্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিব, বাঙ্গালার সম্পত্তি বাঙ্গালার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, দেশের ধন স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত

করিয়া বিদেশে বিলাইয়া দিব না, এমন করিয়া ধনের উপচয় করিব, বৃদ্ধি করিব, যাহাতে জলধির জলের ন্যায় আমার মাতৃভাষার ভাণ্ডারের সঞ্চিত ধনরাশি, যে যত পারে গ্রহণ করিলেও, কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। উষার অরুণচ্ছটায় যেমন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়, তেমনই আমার মাতৃভাষার আলোকচ্ছটায় পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকিত হইবে, ভাস্বর হইবে। এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ সংস্কারে চিত্ত বলীয়ান্ করিয়া তপস্বীর ন্যায় একাগ্র হৃদয়ে বঙ্গবাণীর সেবা করিতে হইবে। নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। বাঙ্গালার মাটী বড়ই উর্ব্বর। বঙ্গদেশ বড়ই সুজন্মা। অধিকাংশ স্থলই দেবমাতৃক, ক্বচিৎ নদীমাতৃক, আপনা হইতেই বিধাতার কৃপায় বঙ্গে মেধাবীর আবির্ভাব হয়। চিরকাল হইয়া আসিতেছেও। কোথাও বা সামান্য সেচনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সুফল লাভ সর্ব্বত্রই নিশ্চিত। ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস, কুমারহট্টের রামপ্রসাদ, কৃষ্ণনগরের ভারতচন্দ্র, খানাকুলের রামমোহন, পিলের দাশরথি প্রভৃতি এই বঙ্গেরই ছায়াশ্যামল পল্লীবাটের সুস্বাদু ফল। প্রভাকরের ঈশ্বর, আলালের টেকচাঁদ, নীলদর্পণের দীনবন্ধু, কপোতাক্ষীর মধুসূদন এই বঙ্গেরই অলঙ্কার। বিদ্যাসাগর হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম কালীপ্রসন্ন যে বঙ্গভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সে ভাষা বা সেই দেশ কদাচ উপেক্ষণীয় নহে। এখনও, এই ঘোর বিপর্য্যাসের মধ্যেও যে দেশে এবং যে ভাষায় পৃথ্বীরাজের ন্যায় উপাদেয় মহাকাব্য প্রণীত হয়, সে দেশের এবং সেই ভাষার শক্তি যে কত বিপুল তাহা মনস্বিমাত্রেরই সহজে বোধগম্য হইবে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় এমনই একটা সঞ্জীবনী শক্তি আছে, যাহাতে বঙ্গে কোন দিন কৃতীর অভাব হয় না, হইবেও না। যেমন অবস্থাতেই বাঙ্গালীকে ফেলিয়া দাও না কেন, বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌর্ব্বল্য আসে না। বাঙ্গালী অদৃষ্টবাদী। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা পৌরুষহীন নহে। সেকলের উক্তির প্রতিবাদ যখন বিধাতাই বাঙ্গালীর দ্বারা করাইতেছেন, তখন অপরের সে সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক হইলেও একথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, চণ্ডীদাস গোবিন্দদাসের বঙ্গে, রামবসু নিধুবাবুর বঙ্গে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমের প্রবাহ শ্রীচৈতন্যের বঙ্গে কখনও ভাবের বা রসের অভাব হইবে না, প্রাণের অভাব হইবে না। উপাদানের অভাব নাই, কেবল উদ্যোগের অভাব, অনুষ্ঠানের অভাব। এই ত, সামান্য উদ্যোগেই ভীরু বাঙ্গালী বীর বাঙ্গালীতে উন্নীত হইতে চলিয়াছে। যাহাদের ঢক্কায় বাঙ্গালীর ভীরুত্ব নিনাদিত হইত, এখন তাহাদেরই কলমধুর বীণায় বাঙ্গালীর বীরত্ব অনুরণিত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম, আছে সব, মালমসলা কিছুরই অভাব নাই, এখন কেবল জন কয়েক সুশিক্ষিত, কল্পনাকুশল স্থপতি বদ্ধপরিকর হইলেই সঙ্কল্পিত বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে। আজ আমার যে কথা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে। জগতের ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ বঙ্গভাষা অধিকার করিয়া বসিবে। অনতিবিস্তৃত বঙ্গসাহিত্য ক্রমে বিশাল বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইবে।

এই অসাধ্য সাধন করিতে হইলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশেষ সংযমের প্রয়োজন, কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। সভ্যগণ, আপনারা আমাকে এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আমার প্রতি যেমন আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও যদি, আমার ধারণার অনুরূপ, আমার বিবেকের অনুকূল সত্য, কঠোর বলিয়া, সম্প্রদায়বিশেষের স্তুতিনিন্দার দিকে লক্ষ্য করিয়া, প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে আপনাদের প্রদত্ত সম্মানের অপব্যবহার হইবে; তাই, আপাততঃ ঈষদ্ অপ্রিয় হইলেও, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি বলিতে বাধ্য যে, পূর্ব্বোক্ত অসাধ্যসাধন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে, যদি কোন দলাদলি, কোনরূপ বিরোধিভাব থাকে, তবে তাহা পরিহার করিতে হইবে। মতভেদ নিন্দার কথা নহে,

কিন্তু মতভেদ হইলেই যে প্রণয়ভেদ হইবে, আত্মীয়তা-ভেদ হইবে, ইহা ত আমি বুঝি না। বঙ্গভাষা এখনও বঙ্গের বাহিরে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে নাই। এখনও ভারতের বহির্দ্দেশে বঙ্গভাষার বংশীধ্বনি সম্যকভাবে পৌঁছায় নাই। যে ভাবে, যেরূপে আমি বঙ্গভাষাকে গঠিত করিবার কথা বলিলাম, সেই হিসাবে বঙ্গভাষার এই সবে কৈশোর, এরূপ অপরিপক্ক বয়সে, তাহাতে অন্তঃকলহের কীট প্রবেশ করিতে দিলে, অচিরাৎ সমস্ত উদ্যম উদ্‌যোগ পণ্ড,ভস্মসাৎ হইবে। হিমাদ্রির চিরতুষারস্নিগ্ধ অভ্রভেদী কাঞ্চন-জঙ্ঘায় যাহারা পৌঁছিতে চাহে, উপত্যকার কঙ্করময় কণ্টকক্ষেত্রেই তাহাদের ক্লান্তি জন্মিলে চলিবে কেন? মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে, একটা মহাত্যাগ চাই। বিনা ত্যাগে লাভ হইতে পারে না। আমার ভাবিতেও দুঃখ হয়, যে, এই সবে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সানুরাগ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র, আর ইহারই মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি। আমি সানুনয়ে বলি, সনির্ব্বন্ধে বলি, আমরা সকলেই এক মার সন্তান, বঙ্গভূমি এবং বঙ্গভাষা আমাদের সকলেরই জননী, মাতৃপূজায় দীক্ষিত হইয়া, মায়ের মন্দিরে তুচ্ছ অলীক এবং ক্ষণিক যশের প্রলোভনে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ করিতে নাই। বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বহুকোটী বঙ্গবাসী বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিলে তবে ঐ সংকল্পিত সৌধের মাত্র ভিত্তিপ্রোথন হইবে। এইরূপ দুষ্কর কার্য্যে, কঠোর কার্য্যে, বঙ্গে যিনি যতটুকু পারেন, সাহায্য করুন। মায়ের মন্দিরগঠনে সকল সন্তানেরই তুল্য অধিকার। তুল্য অধিকার বলিয়া, প্রত্যেককেই যে তুল্য পরিমাণে দ্রব্যসম্ভার যোগাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যিনি যাহা পারেন, লইয়া আসুন। মাতৃমন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত হউন। আমরা জননী বঙ্গভাষার বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিব। কে কি পরিমাণে মাতৃমন্দিরের দ্রব্যসংগ্রহ করিলেন, ইহার হিসাব নিকাস করিব না, এখন হিসাব নিকাসের সময়ও নহে, করিতে হয়, আমাদের অধস্তন বংশধরেরা তাহা করিবে। আমরা কেবল গড়িয়াই যাইব, কাজ করিয়া যাইব। এই সময়ে, কাহাকেও মনঃপীড়া দেওয়া বা সাময়িক মোহের কুহকে অন্ধ হইয়া আত্মা-ভিমানের চরিতার্থতা বিধান করিতে যাওয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য। কোনপ্রকার অসংযমের আধিক্য হইলেই, এই সঙ্কল্পিত স্বর্ণসৌধের আশা সমূলে ধ্বংস হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করিবার আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইবে। তাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, হে বঙ্গ-সাহিত্যের হিতৈষিবৃন্দ, হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ জাতীয়-সৌধের স্থপতি-বৃন্দ,—ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিরোধ বিস্মৃত হইয়া, একই লক্ষ্যে চিত্ত স্থির করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হউন, সমস্ত ভুলিয়া, আপনা ভুলিয়া,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও মলিন স্বার্থের পুটুলিগুলি দূরে এককোণে সরাইয়া রাখিয়া, একমনে একপ্রাণে কার্য্য করুন,—তবেই ত আপনাদের স্পৃহণীয় মৎস্যচক্র ভেদ করিতে পারিবেন। একই তীর্থের যাত্রী আপনারা, একযোগে অগ্রসর হউন,—ভিন্নপথে বা অপথে যাইয়া সংহতিক্ষয়পূর্ব্বক অবসন্ন হইবেন না।

বাঙ্গালার আজ বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন। বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সকলেরই মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে যে, কি প্রকারে বঙ্গভাষাকে সজ্জিত করিবেন। ধনি-নির্ধন-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই একটা প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে। ইহা পরম মঙ্গলের কথা। যখন "বান" আসে, তখন অনেক আবর্জ্জনাও তাহাতে ভাসাইয়া আনে, সত্য, কিন্তু সেই আবর্জ্জনারাশি তটিনীর উভয় তটেই জমিয়া জমিয়া ক্রমে মাটীতে পরিণত হয়। তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়ে অবশ্য বঙ্গভাষার এই নবীন বন্যায় অনেক আবর্জ্জনাও আসিতেছে, অনেক অপাঠ্য কুপাঠ্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি বিরচিত হইতেছে, সত্য, কিন্তু সেগুলি কদাচ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। যাহা উত্তম, সৎ,

যাহা নির্ম্মল নিষ্পাপ, তাহাই থাকিয়া যায়, তদিতর কালের অতলগর্ভে অচিরেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঐ সকল অপাঠ্য কুপাঠ্য বিষয়ের জন্য বঙ্গভাষার হিতৈষিবৃন্দের তত চিন্তার কারণ নাই। দেশের সর্ব্বত্র, বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বত্র, যথার্থই যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বাল্যে যে সকল উপকথা রূপকথা শুনিতে শুনিতে মাতা বা মাতৃষ্বসার কোলে ঘুমাইয়া পড়িতাম, আজ নগরের রাজপথের উভয় পার্শ্বে যখন সেই সকল গল্প, সেই "সাতভাই চম্পা,"—সেই "পক্ষীরাজ ঘোটক," সেই "শিবঠাকুরের বিয়ে," প্রভৃতি শিশুরঞ্জন কথাসমূহ যথার্থই নয়নরঞ্জন গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে দেখি, তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করি। বটতলায় যে কৃত্তিবাস কাশীদাসের কঙ্কাল রক্ষিত হইত, আজ তাহাতে নবজীবন-সংযোগ দেখিয়া প্রীতিবিহ্বল হইয়া পড়ি। মানুষ যতদিন নিজের সত্বার উপলব্ধি না করে ততদিন প্রকৃত মানুষই হইতে পারে না। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার কি ছিল, কি নাই, কি অর্জ্জন এবং কতটুকুই বা বর্জ্জন করিতে হইবে, এ চিন্তা যে করে না, সে নরাকার হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে নর বলিতে পারি না। বাঙ্গালী এতদিনে নিজের মাকে চিনিয়াছে, মা-নাম যে কি মধুর, মা-নামে যে কত তৃপ্তি, তাহা এতদিনে বঙ্গসন্তান বুঝিতে পারিয়াছে, তাই বাঙ্গালীর প্রাণে একটা নবীন বলের সঞ্চার দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গভাষার প্রতি এই যে একটা দেশব্যাপিনী অনুরক্তির লক্ষণ, ইঁহাকে রক্ষিত এবং ক্রমে বিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। জাতীয় জীবন গঠনের মূলমন্ত্র হইল, জাতীয় সাহিত্য নির্ম্মাণে স্পৃহা। সেই স্পৃহা যখন হৃদয়ে একবার জাগিয়াছে, বঙ্গভাষার প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ জাতির হৃদয়ে দেখা দিয়াছে, তখন আর চিন্তার কারণ নাই। পা'লে যখন বাতাস বাধিয়াছে, তরণী এইবার পক্ষিণীর মত চলিবে, আমাদিগকে শুধু সাবধান হইয়া, হাল ধরিয়া বসিতে হইবে। যাহাতে গন্তব্যের বিপরীত দিকে না যাইয়া পড়ি, সে পক্ষে তত সতর্ক থাকিতে হইবে। আর যখন যতটুকু আবশ্যক, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, আমার তরণীকে অনুকূল বায়ুর বশীভূত করিয়া পরিচালিত করিতে হইবে। যে সময়ে এইরূপ গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত, তখন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতামত লইয়া আত্মবিচ্ছেদ শোভা পায়? যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহাকে সেচনাদির দ্বারা বিবর্দ্ধিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত করিতে হইবে। অঙ্কুরটির মস্তক ভগ্ন করিয়া লাভ কি? আপামরসাধারণের মধ্যে যাহাতে বঙ্গভাষার প্রতি অনুরক্তি জন্মে, আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষার সেবক হওয়া চাই, এই ধারণা যত অধিক বদ্ধমূল হইয়া যাহাতে দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিনের মত থাকিয়া যায়, তৎপক্ষে চেষ্টাপর হইতে হইবে। এই সময়ে ভুলিলে চলিবে না যে, যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন বা হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা বঙ্গভাষার আলোচনা করেন, মাত্র তাঁহাদিগকে লইয়াই বঙ্গদেশ নহে। কোন আলেখ্যের পশ্চাদ্ভাগ বিশেষ দক্ষতার সহিত কল্পিত না হইলে, যেমন মূলচিত্র যতই সুন্দরভাবে অঙ্কিত হউক না কেন, কিছুতেই তেমন মনোরম হয় না, তদ্রূপ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, মুষ্টিমেয় বঙ্গসন্তান, স্বস্ব জ্ঞানগরিমায় যতই বিমণ্ডিত হন্ না কেন, তাঁহাদের পশ্চাদ্দেশে, অথবা চতুর্দ্দিকে ঐ যে কোটি কোটি বাঙ্গালী পড়িয়া আছে, উঁহাদিগকে নিজের সান্নিধ্যে যতদিন শিক্ষিতগণ টানিয়া আনিতে না পারিবেন, ততদিন, বঙ্গের প্রকৃত অভ্যুদয় হইল, স্বীকার করিতে পারিব না। শাখা প্রশাখা, পত্র, পুষ্প-পল্লব প্রভৃতি লইয়াই ত বৃক্ষ, এই সব ত্যাগ করিয়া, মাত্র মূল স্থাণুটিকে কেহ বৃক্ষ বলে না, বা বৃক্ষের আশা ঐ স্থাণুতে চরিতার্থ হয় না। সুতরাং যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালী জাতি একান্ত মুষ্টিমেয় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বঙ্গের সেই অশিক্ষিত জনরাশির মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের

নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, তাহা যত দিন না করিতে পারিব, ততদিন, আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগত শিক্ষাই শিক্ষা নহে, একটি সম্পূর্ণ মানুষ হইতে হইলে অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, অগ্নিতে অনেক পরীক্ষার প্রয়োজন। কেবল অর্থার্জ্জনের জন্যও শিক্ষা নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য—আত্মবিকাশ লাভ করা। হৃদয়ের মার্জ্জনা করা। দর্পণের ন্যায় বিশ্বের প্রতিবিম্ব-গ্রহণে হৃদয়কে সমর্থ করা। এই ভাবে যদি মানুষ একবার তৈরি হইয়া উঠে, ক্রমে একটা জাতি তৈরি হইয়া উঠে, তবে সেই জাতিকে আর পয়সার জন্য লালায়িত বা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। ঐ প্রকারে গঠিত জাতির কোন স্পৃহাই অপরিপূর্ণ থাকে না, অর্থ ত কোন্ ছার। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে চাই, সমাজের প্রাণে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করা। যা কিছু কষ্ট বা পরিশ্রম, ঐ প্রথমাবস্থাতেই, পরে একবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে,—ঐ জাতি আপনিই আপনার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। তখন আর তাহাকে প্ররোচিত করিবার প্রয়োজন হয় না। কষ্ট ততক্ষণ, যতক্ষণ আমি ঠিক বুঝিতে বা ধরিতে না পারি, যে, আমি কি চাই,কোন্ বস্তুটি পাইলে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইবে। যদি একবার আমার সেই অভিপ্রেত বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি, তবে সেই দিকে আমার হৃদয়ের যে গতি হইবে, এমন কেহ নাই যে, সে গতিরোধ করিতে পারে। বাঙ্গালী-জাতির ইতর ভদ্র সকলের মনে একবার কোনক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আমার মাতৃভাষার অভ্যুদয়ের সহিত একসূত্রে আমার নিজের তথা মদীয়জাতির অভ্যুদয় গ্রথিত, বঙ্গদেশের অদৃষ্ট, বঙ্গবাসীর অদৃষ্ট, বঙ্গভাষার ভূয়োবিস্তারের উপর নিহিত। যতদিন বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যন্ত বঙ্গবাণীর বিজয়শঙ্খ নিনাদিত না হইবে, ইতরভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়প্রশস্তি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি না করিবে, ততদিন বঙ্গের জাতীয়সাহিত্যের বিশ্বসাহিত্যে অন্তর্নিবেশ অসম্ভব। যখন ঋতুরাজ বসন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সারা ব্রহ্মাণ্ডটা এক ভাবে,এক উন্মাদনায় বিভোর হইয়া উঠে, একমনে সকলে মধুর বাসন্তীমূর্ত্তির পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। যদি সারা বঙ্গদেশটাকে এক ভাবে একই উন্মাদনায় বিভোর করিয়া তুলিতে পার, তোমার জননী-বঙ্গভাষার ভুবনমোহিনী-মূর্ত্তির বিমলপ্রভায় বাঙ্গালী জনসাধারণের হৃদয় বিভাসিত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে, তোমার দ্বিভুজা বঙ্গভারতী দশভুজার মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর সমক্ষে অবতীর্ণা। দেখিবে,বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে তোমার বঙ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে। "বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলে" পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।

একবার ভাবিয়া দেখ, জন্ম জন্মান্তরে কত পুণ্য করিয়াছিলে, কত তপস্যা করিয়াছিলে, তাই এমন মধুর বাঙ্গালায় আসিতে পারিয়াছ। স্নিগ্ধশ্যামল-কানন-কুন্তলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় যাহাদের দেহ পরিপুষ্ট, বঙ্গের নিত্যনীল-নবীন-নভশ্চন্দ্রাতপতলে শিশিরস্নাত দূর্ব্বাসনে যাহাদের উপবেশন, আর কলকণ্ঠ শুক-কোকিলের মধুর কাকলীতে যাহাদের কর্ণবিবর পরিপূর্ণ, তাহাদের হৃদয়ে কল্পনার অভাব হইবে কেন? সম্মুখে যাহার পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথী, তাহার কণ্ঠ পিপাসায় শুকাইবে কেন? বঙ্গবাসী, তোমাদের কিসের অভাব? তোমরা কাহার চেয়ে কম? কিসে দুর্ব্বল? বেদ উপনিষদ্ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি যাহাদের আদর্শগ্রন্থ, সীতা সাবিত্রী অরুন্ধতী লোপামুদ্রা যাহাদের আদর্শ সতী, রাম যুধিষ্ঠির শিবি দধীচি ভীষ্ম অর্জ্জুন যাহাদের আদর্শ নায়ক, ভরত লক্ষ্মণ ভীম অর্জ্জুন যাহাদের আদর্শ ভ্রাতা, তাহাদের আবার অভাব কিসের? অতীতের বিস্ময়পূর্ণ চিত্রশালা হইতে একবার এই দিকে তাকাও, ঐ দেখ,—তোমাদের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া অক্লান্তশ্রমে, তোমাদেরই পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ কত মনোহর পত্রপুষ্প-পল্লবে, বঙ্গসাহিত্যের মণ্ডপ সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণপাতী যত্নে রত্নমণ্ডপের রত্নবেদিতে আমার রত্নহারবিভূষিতা বঙ্গবাণীর উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। মায়ের মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা

করিয়া গিয়াছেন, তোমাদের এখন পূজায় বসিতে হইবে। বঙ্গ-সাহিত্যসেবিগণ, সদ্ভাবচন্দনে মনঃপ্রাণ চর্চ্চিত করিয়া তোমাদের সাহিত্যমণ্ডপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হও। একবার সাতকোটি বাঙ্গালী সমস্বরে বঙ্গভারতীকে "মা" বলিয়া ডাক—দেখিবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সে ডাকে চমকিয়া উঠিবে। আকাশের গায়ে, সমুদ্রের বক্ষে, পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শিখরে সে ডাকের সাড়া পৌছিবে। বঙ্গভারতী বিশ্বভারতীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন। সাময়িক স্তুতিনিন্দা, বাদ বিসংবাদ, স্বার্থচিন্তা প্রভৃতি একপদে বিস্মৃত হইয়া একবার সাধকের মত, যোগীর মত, ব্রতদীক্ষিতের মত, সংযতভাবে জননী বঙ্গভাষার পাদ-পূজায় প্রবৃত্ত হও, একবার মাতৃ-প্রেমে, জাতীয় প্রেমে, জাতীয় সাহিত্যের প্রেমে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া, সাতকোটি কণ্ঠে, উদাত্ত স্বরে মাতৃভাষাকে "মা" বলিয়া ডাক দাও, বিশ্ব কাঁপাইয়া একবার বল—

তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ
তোমারি তরে মা, সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান॥

—দেখিবে, বিরাট ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিতে মুখর করিয়া, তোমাদের এই আবেগস্খলিত গীতি দিব্যধামে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিবে, স্থলে জলে, পর্ব্বতে কন্দরে, প্রান্তরে কান্তারে বঙ্গভারতীর বীণার অনুরণন হইতেছে, বঙ্গভাষার মধুর বাঁশী সুমধুর লয়ে সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে, চিরনবীনা ধরণী রোমাঞ্চিত হইয়া বাঙ্গালীর দেবতাকে বক্ষে আসন পাতিয়া বসাইতেছেন।

মনে রাখিও, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই, কল্পনার অগম্য স্থান নাই। মানুষের যে কত অসীম শক্তি, তাহা মানুষ নিজে অনেক সময়ে বুঝিতেই পারে না। তাহা যদি পারিত, তবে এই পৃথিবীর দশা এতদিনে অন্যপ্রকার হইত। আমার বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিব, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এই প্রতিজ্ঞার পরিপূরণের জন্য, যাহা সঙ্গত মনে হইবে, তাহাই অসঙ্কোচে করিব। এই মন্ত্রে পরিপূত হইয়া ব্রত আরম্ভ কর। সিদ্ধি হইবে। কালে অমর হইতে পারিবে। বাঙ্গালীজাতি ও তাহার বঙ্গভাষা জগতে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যদি কখনও নৈরাশ্যের ভীষণ মূর্ত্তিতে চমকিয়া উঠ, কালের করাল কশা দর্শনে ভীত হও, তখন তোমারই বরেণ্য কবি হেমচন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া জলদ-প্রতিম-স্বনে তোমার দেশ-বাসীকে শুনাইও—

"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে;
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।"

আর সেই সঙ্গে বলিও—হে বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য-মন্দিরের ভবিষ্য-স্থপতিবৃন্দ,—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে',
বায়ু উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধরে',
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

গীতায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

(প্রতিবাদ—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণ হইতে পরব্রহ্মকে পৃথক্ ও নিকৃষ্ট দেখাইবার জন্য যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তন্মধ্যে 'পুরুষোত্তম' শব্দই সর্ব্বপ্রধান। তিনি বলেন, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নহেন; পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম হইতে অনেক উচ্চ।—কি উপনিষদের প্রমাণ, কি বৈষ্ণবশাস্ত্রের প্রমাণ, কি গীতায় ভগবদুক্তি, এই ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারাই আমরা দেখাইয়াছি যে, সেটি বিপিনচন্দ্রের মহতী ভ্রান্তি! আমরা দেখাইয়াছি, পরব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম একই বস্তু। বিপিন বাবু কি জন্য যে এই ভেদবুদ্ধি পোষণ করেন তাহা জানি না। তাঁহার অভিপ্রায় যাহাই হউক, তিনি তাহার সিদ্ধির জন্য গীতায় একটা সরল সন্ধানও পাইয়াছেন। সেই সন্ধানটি এই—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। ইত্যাদি।

বিপিন বাবু এই ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম শব্দ লইয়া বিষম প্রমাদে পড়িয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"এই শ্লোকের অক্ষর শব্দে পরব্রহ্মকেই বোঝান সঙ্গত।" ["নারায়ণ" ৮৫৯ পৃঃ] আমরা বলি, যদিও জ্ঞানিগণৈকশরণ্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকে পুরুষোত্তম শব্দেই পরব্রহ্মকে বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন, যদিও ভক্তশিরোমণি আচার্য্য শ্রীধরস্বামী পুরুষোত্তম শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন, যদিও বিষ্ণুপুরাণ পুরুষোত্তম শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝিয়াছেন, তথাপি বিপিন বাবুর খাতিরে এই শ্লোকের অক্ষর শব্দে পরব্রহ্মকে বোঝা অন্ততঃ শিষ্টাচার। কেন না, এই শ্লোকের অক্ষর শব্দে যদি পরব্রহ্মকে না বুঝায়, যদি পুরুষোত্তম শব্দই পরব্রহ্মকে বুঝায়, তাহা হইলে যে বিপিন বাবুর শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সর্ব্বনাশ; তাহা হইলে যে পরব্রহ্মকে তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণ হইতে খাট করিয়া দেখান হয় না; তাঁহার শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-কথনই হয় না।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ। ইত্যাদি। এই শ্লোকের অক্ষর শব্দে কাহাকে বোঝা সঙ্গত তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতেছি। স্বরূপতঃ জীবাত্মাও অক্ষর, পরমাত্মা পরব্রহ্মও অক্ষর। শ্রীধর স্বামী বলেন, "ননু জীবোঽপি অক্ষরঃ" "কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা স তু অক্ষর-পুরুষ উচ্যতে বিবেকিভিঃ।" উপনিষদে কোন কোন স্থলে অক্ষর শব্দে জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কোন কোন স্থলে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াও অক্ষর শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এতদুভয়ের ভেদও তাহাতে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদ বলেন, জীবও অক্ষর কিন্তু পরমাত্মা পরব্রহ্ম এই অক্ষর পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" কূটস্থ শ্রেষ্ঠ অক্ষর জীব যে হিরণ্যগর্ভ তাহা হইতেও তিনি (পরমাত্মা) শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মা পরব্রহ্ম সর্ব্বোচ্চ পরম অক্ষর পুরুষ। শ্রীধর স্বামী বলেন, পরমং যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং তদ্ ব্রহ্ম। গীতায় তিনিই উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম বলিয়া গীত হইয়াছেন। তিনি শ্রুতির ভাষায় "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এবং গীতার ভাষায় "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।" শ্রুতি ও গীতার এই অক্ষর পুরুষ জীবাত্মা (কূটস্থ জীবচৈতন্য)। ইনিই দ্বাবিমৌ পুরুষৌ ইত্যাদি শ্লোকের অক্ষর পুরুষ।

সুতরাং দ্বাবিমৌ পুরুষৌ শ্লোকের অক্ষর শব্দে পরব্রহ্মকে বোঝা "সঙ্গত" নহে; বরং সর্ব্বতোভাবেই অসঙ্গত। যেহেতু পরব্রহ্ম "পরতঃ অক্ষরাদপি পরঃ" "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।"

বিষ্ণুপুরাণে ক্ষর অক্ষর ও পুরুষোত্তম এই ত্রিতত্ত্বের

বর্ণনাকালে ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—এই অক্ষর পুরুষ সেই পরমাত্মা পরব্রহ্মের অংশ। তাঁহার উক্তি এই—

"একঃ শুদ্ধাক্ষরো নিত্যঃ সর্ব্বব্যাপী তথা পুমান্।
সোঽপ্যংশঃ পরমাত্মনঃ॥"

—এক নিত্য সর্ব্বব্যাপী পবিত্র অক্ষর পুরুষ আছেন, তিনিও পরমাত্মার অংশ। এই অংশভূত পুরুষ কে? গীতায় ভগবান্ তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন।—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

—জীবভূত যে সনাতন (অর্থাৎ নিত্য অক্ষর) পুরুষ তিনি আমারই (পরমেশ্বর) অংশ। পরমাত্মার অংশভূত এই অক্ষর জীবাত্মাই 'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ' এই শ্লোকে অক্ষর শব্দের বাচ্য।

এই অক্ষর পুরুষ জীবাত্মা হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই পরমাত্মা পরব্রহ্ম। ভগবান বলেন, পরমাত্মাই "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।" পরমাত্মাই উত্তম পুরুষ, "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।" সুতরাং 'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ' এই শ্লোকের অক্ষর শব্দে পরব্রহ্মকে বোঝা সঙ্গত নহে, সম্পূর্ণ অসঙ্গত। এই শ্লোকের অক্ষর পুরুষ পরমাত্মার অংশভূত জীবাত্মা। পরমাত্মা অক্ষর জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি শ্রুতির ভাষায় "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ", গীতার ভাষায় "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ"—তিনিই পুরুষোত্তম।

বস্তুতঃ উপনিষদের তত্ত্বকথাগুলিই ভগবান্ গীতায় সরল সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। উপনিষদই মূল। গীতা তাহার অন্বর্থ বা অনুবাদ মাত্র। ইহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিয়াই শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি গীতার আচার্য্যগণ মূল শাস্ত্রের সহিত (অর্থাৎ উপনিষদের সহিত) সঙ্গতি ও সমন্বয় রাখিয়া অর্থোপদেশ করিয়াছেন। নহিলে উপদেশ (বা ব্যাখ্যা) সমীচীন হয় না—হইতে পারে না। কিন্তু বিপিন বাবু দেখিলেন, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে সমন্বয় রাখিলে ত আর আমার অভিনব আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত হয় না, ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে খাট করা হয় না—আমার অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব কখনই হয় না। তাই তিনি তাঁহার পাঠকবর্গকে তাদৃশ সমন্বয়ের পথ হইতে বাক্‌কৌশলে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"উপনিষদের ও ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে সঙ্গতি ও সমন্বয় রাখিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র না হইয়া, গীতাতে এমন কিছু কিছু তত্ত্বের উপদেশ আছে, যাহা উপনিষদে নাই, এটি স্বীকার করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত না হইলে, গীতা যে ব্রহ্মতত্ত্বের অতীত ও তদপেক্ষা উত্তম ভগবত্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহা অতি স্পষ্টরূপেই ধরিতে পারা যায়।"

চক্ষু বুজিলে এরূপই হয়। "কাণামাছি" প্রকৃত ভাবিয়া কত পুরুষকেই ধরিয়া বেড়ায়। চক্ষু মেলিলেই হাস্যজনক ভ্রমগুলি সব ধরা পড়িয়া যায়। যাঁহারা বিপিন বাবুর শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে চান, তাঁহারা চক্ষু মেলিবেন না—সকলেই এক একবার কাণামাছি সাজুন; বেদ বেদান্ত ও উপনিষদের দিকে চক্ষু মেলিবেন না, চোখ খুলিলেই বিপিন বাবুর তত্ত্বকথা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র আরও বলিতেছেন, "ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে আপনাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া গীতা পাঠ করিলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই উপস্থিত হয় না; ও হইতে পারে না।" বাস্তবিকও তাহাই। শাস্ত্র-সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া গীতা পাঠ করিলে তাহাই হয়। সে বিষয়ে কোন সন্দেহই উপস্থিত হয় না; ও হইতে পারে না। শাস্ত্রসংস্কার লইয়া গীতা পাঠ করিতে গেলেই বিপদ; বেদ বেদান্তের (বা মূলের) সঙ্গে সঙ্গতি ও সমন্বয় করিতে গেলেই যত গোল। আর ওসবের সংস্কার ছেড়ে দিয়ে গীতা পাঠ করিলে কোন গোলই থাকে না; ব্রহ্মতত্ত্বটা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে অনায়াসেই খাট হইয়া যায়।

পাঠকবর্গ একটু অভিনিবেশ করিলেই স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন, উপনিষদ্‌ই রত্নখনি। ভগবদুক্ত ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষের তত্ত্বরূপ রত্ন উপনিষদেরই গর্ভে নিহিত

রহিয়াছে। ইহা গীতার নিজস্ব নহে। ভগবান্ উপনিষদ্রূপ গাভী হইতেই এই ত্রিতত্ত্বরূপ দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়াছেন মাত্র।

উপনিষদে আছে—

"তস্মিংস্ত্রয়ম্"

—সেই পরমব্রহ্মেতে ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা এই ভাবত্রয় বিদ্যমান আছে।

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।"

ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরিতাকে জানিয়াই জীব মুক্ত হয়। ভগবান পরব্রহ্মের যে প্রকৃতি জড়রূপা তাহাই ভোগ্য—তাহাই ক্ষর; পরব্রহ্মের অংশভূত যে কূটস্থ জীব তিনিই ভোক্তা, তিনি অক্ষর। এবং "য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব" যিনি এই জগৎকে সর্ব্বদা নিয়মিত করিতেছেন, "য ঈশ্বরাণাং পরমো মহেশ্বরঃ" যিনি ঈশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর, "ক্ষরাত্মনোবীশতে দেব একঃ" যে অদ্বিতীয় দেবতা ক্ষরপ্রকৃতি ও অক্ষর আত্মাকে (অক্ষর পুরুষ জীবাত্মাকে) নিয়মিত করেন, "যঃ অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" যিনি হিরণ্যগর্ভাদি শ্রেষ্ঠ অক্ষর পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ"—প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ জীবাত্মারও পতি, তিনিই প্রেরয়িতা (সর্ব্বোত্তমপুরুষ)।

এই ভাবত্রয় বা তত্ত্বত্রয়ই ভগবান্ গীতায় পুরুষত্রয়-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষ সেই তত্ত্বত্রয় বা ভাবত্রয়েরই অনুবাদ বা অন্বর্থ মাত্র। গীতা বলিতেছেন—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।"
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥"

ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর (অর্থাৎ জড় প্রকৃতি ও কূটস্থ জীবচৈতন্য) এই দুই পুরুষ আছেন। পরমোৎকৃষ্ট চৈতন্যরূপ আর এক পুরুষ আছেন, যিনি বেদে পরমাত্মা নামে অভিহিত। তিনি অব্যয় অর্থাৎ অক্ষর। তিনি (সেই অব্যয় পরমাত্মা) ক্ষর পুরুষ (জড় প্রকৃতি) ও অক্ষর পুরুষ (জীবাত্মা) হইতে শ্রেষ্ঠ। "ক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" তিনিই ঈশ্বর। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ("যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ") সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন ("য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব") বস্তুতঃ গীতোক্তি উপনিষদুক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র।

গীতায় ভগবান্ অন্যত্র বলিতেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
(মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।)
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়॥

এখানেও সেই ভাবত্রয় বা পুরুষত্রয়েরই কথা। এখানেও জড় প্রকৃতি বা ক্ষর পুরুষ, জীবচৈতন্য বা কূটস্থ অক্ষর অর্থাৎ সনাতন পুরুষ (জীবভূতঃ সনাতনঃ) এবং সকলের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের মূল কারণ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর বা পুরুষোত্তম এই তিনেরই কথা। এখানে প্রথমটি ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমাদি জড় প্রকৃতি, ইনিই "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ" শ্লোকের ক্ষর পুরুষ। দ্বিতীয়টি জীবভূত সনাতন পুরুষ—ইনি পরমাত্মা পরমেশ্বরের অংশ—ইনি সনাতন অর্থাৎ অক্ষর; ইনিই—দ্বাবিমৌ শ্লোকের অক্ষর পুরুষ। তৃতীয়টি স্বয়ং পরমেশ্বর—যাঁহা হইতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন ও যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয় "[যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিঃ, "যস্মাদ্ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে যত্র চৈবাভিবসন্তি" উপনিষদ্] ইনি ক্ষিত্যাদি ক্ষর পুরুষ হইতে এবং অক্ষর পুরুষ জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ। ইনিই শ্রুত্যুক্ত পরমাত্মা পরব্রহ্ম—ইনিই দ্বাবিমৌ পুরুষৌ শ্লোকের উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। এই ত্রিতত্ত্ব উপনিষদের অন্বর্থ মাত্র।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ" ইত্যাদি ভগবদুক্তির ব্যাখ্যায় ভগবদ্ভক্ত শিরোমণি আচার্য্য শ্রীধরস্বামী এই ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তমের তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া

দিয়াছেন। সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা এখানে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। তিনি বলিতেছেন—

"ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরীরাণি, অবিবেকিলোকস্য শরীরেষেব পুরুষত্ব-প্রসিদ্ধেঃ। কূটো রাশিঃ শিলারাশিঃ পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো **ভোক্তা** স তু অক্ষরপুরুষ উচ্যতে বিবেকিভিঃ। এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং অন্যোবিলক্ষণস্তু উত্তমঃ পুরুষঃ। বৈলক্ষণ্যমেবাহ পরমাশ্চাসৌ আত্মা চেতি উদাহৃতঃ উক্তঃ শ্রুতিভিঃ। আত্মত্বেন ক্ষরদচেতনাদ-বিলক্ষণঃ, পরমত্বেন অক্ষরাচ্চ ভোক্তৃবিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি যো লোকত্রয়মিতি। য ঈশ্বরঃ ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ নির্ব্বিকার এব খং লোকত্রয়-মাবিশ্য বিভর্ত্তি পালয়তি।" [বিস্তার ভয়ে অনুবাদ দেওয়া গেল না]

এখানে স্বামী স্পষ্টতঃ পরমাত্মা পরব্রহ্মকেই পুরুষোত্তম বলিয়াছেন। বিপিন বাবু কিন্তু স্বামীর কথা আদৌ মানেন না।

ভগবদুক্ত ক্ষর, অক্ষর ও পুরোষোত্তম এই ত্রিতত্ত্ব আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য আমরা বৈষ্ণব শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। বৈষ্ণব শাস্ত্র এই ত্রিতত্ত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে **ক্ষর পুরুষ** অর্থাৎ প্রকৃতির পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—

প্রোচ্যতে প্রকৃতির্হেতুঃ প্রধানং কারণং পরম্।
ইত্যেষা প্রকৃতিঃ সর্ব্বা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

প্রকৃতিই সমস্ত জগতের কারণ বলিয়া অভিহিত হন। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়রূপিণী।

অক্ষর পুরুষের পরিচয়ে বলিতেছেন—

একঃ শুদ্ধাক্ষরো নিত্যঃ সর্ব্বব্যাপী তথা পুমান্।
সোঽপ্যংশঃ পরমাত্মনঃ ॥

নিত্যস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী এক পবিত্র অক্ষর পুরুষও আছেন। তিনিও পরমাত্মার অংশ মাত্র।—ইনিই জীব। ভগবান্‌ও বলেন,"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন।" [ইনিই দ্বাবিমৌ শ্লোকের অক্ষর পুরুষ]

ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী এই প্রকৃতি অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ এবং এই নিত্য সর্ব্বব্যাপী **অক্ষর পুরুষ** (ইঁহারাই গীতায় "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।) এই দুই পুরুষ হইতে ভিন্ন—এই দুই পুরুষ হইতে উত্তম আর এক পুরুষ আছেন তিনি পরমাত্মা (পরম পুরুষ)। এই পরমাত্মা যে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥

হে মৈত্রেয়! ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী যে প্রকৃতি এবং যে নিত্য সর্ব্বব্যাপী পুরুষের বিষয় তোমাকে বলিলাম, তাঁহারা উভয়েই পরমাত্মাতে লীন হন।—সুতরাং পরমাত্মা এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

এক্ষণে, নিত্য সর্ব্বব্যাপী অক্ষর পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ যে পরমাত্মা, ইনি কে? বিষ্ণুপুরাণ সুস্পষ্ট ভাষায় তাহার উত্তর দিতেছেন—

ন সন্তি যত্র সর্ব্বেশে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ।
সত্তামাত্রাত্মকে জ্ঞেয়ে জ্ঞানাত্মন্যাত্মনঃ পরে।
স **ব্রহ্ম** তৎ পরং ধাম **পরমাত্মা** স চেশ্বরঃ।
স বিষ্ণুঃ সর্ব্বমেবেদং যতো নাবর্ত্ততে যতিঃ ॥

যাঁহাতে নাম ও জাত্যাদির কল্পনা নাই এবং যিনি কেবল জ্ঞান স্বরূপেই অবস্থান করিতেছেন তিনি **ব্রহ্ম** তিনিই **পরমাত্মা** এবং তিনিই সকলের ঈশ্বর। তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না। (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত অনুবাদ)

বিষ্ণুপুরাণ কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, পরমাত্মা ব্রহ্মই পুরুষোত্তম। তাঁহার উক্তি এই—

পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণুনাম্না স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে॥
ঋগ্ যযুঃ সামভির্মার্গৈঃ সর্ব্বমূর্ত্তিঃ স ইজ্যতে।
যজ্ঞেশ্বরো যজ্ঞপুমান্ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ॥

পরমাত্মাই সকলের আধার, তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই সর্ব্বমূর্ত্তি, তিনিই পুরুষোত্তম। তিনিই যজ্ঞেশ্বর তিনিই যজ্ঞপুরুষ। ঋক্ যযুঃ ও সামবেদোক্ত মার্গসকল দ্বারা লোকেরা তাঁহাকেই সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মাকেই পূজা করিয়া থাকেন। পাঠকগণ এক্ষণে সুস্পষ্টই দেখিলেন, পুরুষোত্তম কে? এই পুরুষোত্তম পরমাত্মাই বেদ ও বেদান্তসমূহে বিষ্ণুনামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" ইতি শ্রুতিঃ।

বিষ্ণুপুরাণ আরও স্পষ্ট করিয়া এ কথা বলিয়াছেন—

তদ্ ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্খিভিঃ।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
তদেব ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকো ভগবচ্ছব্দাতস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ॥

বিষ্ণুনামে অভিহিত সেই পরমাত্মাই পরমব্রহ্ম। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদিগের তিনিই ধ্যেয় বস্তু। তিনিই বেদে অতি সূক্ষ্ম ও বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পরমাত্মার সেই স্বরূপই ভগবৎ শব্দের বাচ্য এবং ভগবৎ শব্দ সেই আদি ও অক্ষর পরমাত্মারই বাচক।

উপরি-উক্ত প্রকৃতি, অক্ষর পুরুষ ও পুরুষোত্তম এই ত্রিতত্ত্ব বিষ্ণুপুরাণে একই স্থানে পর পর সন্নিবেশিত আছে। আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য পৃথক পৃথক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। আমরা বিষ্ণুপুরাণে অন্যত্র দেখাইয়াছি—

ব্রহ্মাক্ষরমজং নিত্যং যথাসৌ পুরুষোত্তমঃ।
তথা রাগাদয়ো দোষাঃ প্রয়ান্তু প্রশমং মম॥

অক্ষর অজ ও নিত্য ব্রহ্মই যেমন পুরুষোত্তম, সেইরূপ আমার রাগাদি প্রশম প্রাপ্ত হউক। (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত অনুবাদ)।

বস্তুতঃ উপনিষদ্-প্রতিপাদিত পরমাত্মা পরব্রহ্মই পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম শব্দে পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহাকে বুঝায় না, বুঝাইতে পারে না। এই পুরুষোত্তমতত্ত্ব উপনিষদে কেমন সুন্দররূপে গীত হইয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

উপনিষদ্ গাহিতেছেন—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাদিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ॥
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥
ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন বেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন:চাধিপঃ॥
যস্মাৎ পরং নাহপরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নানীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥
এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি
অথেতরে দুঃখমেবাভিযন্তি॥

যিনি নিত্যদিগের মধ্যে (নিত্য জীব সকলের ও নিত্য আকাশাদির মধ্যে) নিত্য অর্থাৎ যিনি নিত্য বলিয়া জীব সকলের ও আকাশাদির নিত্যতা; যিনি চেতনদিগের মধ্যে চেতন অর্থাৎ যিনি চেতন বলিয়া অন্য চেতনগণ চেতনাবান্, যিনি এক হইয়া সকলের কামনার (কর্ম্মানুযায়ী ভোগ সকলের) বিধান করেন, যিনি

সকলের কারণ—সাংখ্যযোগাদির লক্ষ্য, তাহাকে জানিয়া সাধক অবিদ্যাদি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন।

যিনি ঈশ্বরদিগেরও (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদিরও) পরম মহেশ্বর অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা, যিনি ইন্দ্রাদি দেবতা-গণেরও পরম দেবতা, যিনি পতিদিগেরও (প্রজাপতি-দিগেরও) পতি, যিনি পরম অক্ষর পুরুষ হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সকলভুবনের সম্ভবনীয় সেই দেবতাকে আমরা জানি।

তাঁহার কোন পতি বা নিয়ন্তা নাই; এমন কোন চিহ্ন নাই যদ্দ্বারা তাঁহাকে অনুমান করা যায়, তিনি সকলের কারণ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিপতি যে জীবাত্মা তিনি তাঁহার স্বামী। তাঁহার জনিতা বা স্বামী কেহ নাই।

যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, যাঁহা হইতে ক্ষুদ্র বা মহৎ কিছুই নাই। তাঁহাকে জানিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন; অমৃতত্ব প্রাপ্তির অন্য পথ নাই।

এই নিত্য আত্মসংস্থ পরব্রহ্মই জ্ঞেয়। ইহার পর আর কিছুই জানিবার নাই। যাঁহারা ইহাকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন, কিন্তু অন্যেরা দুঃখই প্রাপ্ত হয়েন।

উপনিষদে পরমাত্মতত্ত্ব—পুরুষোত্তমতত্ত্ব এইরূপ কত সুন্দর ও স্পষ্টরূপে যে বর্ণিত আছে তাহা উপনিষদপাঠী সকলেই অবগত আছেন। জানি না কি জন্য বিপিনচন্দ্র তাহা দেখিতে পান না। পুরুষোত্তম শব্দে যে কয়টি বর্ণ পরপর বিন্যস্ত আছে, তাদৃশ বিন্যাসযুক্ত শব্দের অভাবই কি তাঁহার ঈদৃশ দৃষ্টিহীনতার কারণ?

বিপিনবাবু পরব্রহ্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভেদ দেখাইতে গিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ট দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন, "তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) কেবল সাক্ষী নহেন, তিনি নিয়ন্তা ঈশ্বরও বটেন,"—বিপিন বাবুর এতাদৃশী ভেদপ্রদর্শন-পটুতা দর্শন করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি এত উপনিষদ্ ঘাঁটিয়াও কি বুঝিতে পারেন নাই যে পরমাত্মা পরব্রহ্ম কেবল সাক্ষী নহেন,—তিনিই সকলের একমাত্র নিয়ন্তা—তিনিই সকলের একমাত্র ঈশ্বর,—তিনি ভিন্ন জগতের নিয়ন্তা বা ঈশ্বর আর কেহ নাই।

উপনিষদ্ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন—

"য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায়।"

তিনি (পরব্রহ্ম) এই জগৎকে সর্ব্বদা নিয়মিত করিতে-ছেন। তিনি ভিন্ন জগতের শাসনকর্ত্তা অন্য কেহ নাই।

"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥"

তিনিই বিশ্বের কর্ত্তা, তিনিই বিশ্বের বক্তা, তিনি স্বয়ম্ভু, তিনিই কালের কর্ত্তা, তিনিই গুণী, এবং তিনিই সর্ব্ববেত্তা। তিনিই প্রধানের অর্থাৎ ক্ষর প্রকৃতির ও ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ অক্ষর পুরুষ জীবাত্মার স্বামী। তিনিই সত্ত্বঃ রজঃ ও তমোগুণের নিয়ন্তা। তিনি সংসারে স্থিতি, বন্ধন ও মোক্ষের হেতু।

"য ইমাঁল্লোকানীশতে ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্জনাংস্তিষ্ঠতে সঙ্কোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥"

তিনি এই লোক সকল নিজশক্তিসমূহদ্বারা নিয়মিত করিতেছেন, তিনি সর্ব্বজনের পশ্চাতে বর্ত্তমান আছেন, তিনি সমুদয় ভুবন সৃষ্টি করেন ও পালন করেন এবং প্রলয়কালে সংহার করেন।

"একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্বন্
অস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥"

এই দেব এই ক্ষেত্রে একটি জাল নানাভাবে বিস্তার করিয়া পুনরায় প্রত্যাহার করেন। এই মহান্ ঈশ্বর পুনরায় পূর্ব্ববৎ পতি সকলকে (লোকপালগণকে) সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বাধিপত্য করেন।

শ্রুতি বলেন—

* "স বা আত্মা সর্ব্ববশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি"—সেই আত্মা (ব্রহ্ম) সকলের নিয়ন্তা ; তিনি এই সকল বিশ্ব শাসন করেন।

বস্তুতঃ ভগবান্ পরব্রহ্মই যে সমস্ত বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা ও ঈশ্বর, তিনি যে কেবল সাক্ষী নহেন, তাহা উপনিষদ্ ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মকে খাট করা চাই কি না, তাই বিপিনবাবু চোখে কাপড় বাঁধিয়া তত্ত্বভূমিতে বিচরণ করিতেছেন।

বিপিনবাবু কোন্ কৃষ্ণ হইতে উপনিষদের পরব্রহ্মকে খাট দেখাইতে চাহেন,চক্ষু না বুজিলে তাহা বুঝা কঠিন। উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে "সর্ব্বগত" "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "সর্ব্বেশ্বর" ও বিশ্বরূপ ব্রহ্মকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমি বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবসুত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার একতম বিভূতি মাত্র। এ তত্ত্ব বিশ্বরূপ বর্ণনা-কালে ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি"—বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে আমি বাসুদেব।—বিপিন বাবু কি বিশ্বরূপ ভগবানের এই একতম বিভূতিকে সেই বিশ্বরূপ ভগবান্ পরব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ দেখাইতে চাহেন ?

আমরা বিষ্ণুপুরাণে দেখাইয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ অন্তকালে ব্রহ্মকেই ধ্যান করিয়া মানুষ দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। আমরা দেখাইয়াছি—

ব্রহ্মভূতেঽব্যয়েঽচিন্ত্যে সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনি।
তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম॥
অর্জ্জুনোঽপি তদান্বিষ্য রামকৃষ্ণকলেবরে।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যোজমনুক্রমাৎ॥
বিষ্ণুপুরাণ।

এখানে স্পষ্টই দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ ধ্যাতা এবং ব্রহ্ম ধ্যেয়। যে শ্রীকৃষ্ণ অন্তকালে ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ-ত্যাগ করিলেন, বিপিনবাবু কি সেই ধ্যাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে ধ্যেয় ব্রহ্মকে নিকৃষ্ট দেখিয়া ও দেখাইতে চেষ্টা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে চাহেন ?

উপনিষদ্ ও গীতা পড়িয়া বিপিন বাবুর শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব পাড়তে আরম্ভ করিলেই মনে হয়, এ আবার কোন্ কৃষ্ণতত্ত্ব ? ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, স্বয়ং আত্মতত্ত্ব সরল সুন্দর করিয়া গীতায় নানা ভাবে অর্জ্জুনের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তমাত্রই গীতা পাঠ করিয়া, গীতায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নানা-ভাবে পরিস্ফুট দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। গীতা পাঠ করিলেই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়, অর্জ্জুনের উপদেষ্টা এই শ্রীকৃষ্ণ কে ? ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা।

ভগবান্ স্বয়ংই শ্রীমুখে এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছেন—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।" (গীতা)

সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত যে আত্মা তিনিই আমি। (সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইতি শ্রুতিঃ)

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগৎ"

যিনি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তিনিই আমি। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী আত্মাই আমি। (সর্ব্ব-গতমিতি শ্রুতিঃ)

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যাত।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

সে বস্তু (আত্মা) সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং সকল বস্তু যাঁহাতে অবস্থিত আছে, তিনিই আমি। অর্থাৎ সর্ব্ব-ব্যাপী আত্মা ব্রহ্মই আমি।

এইরূপে যে আমাকে (আত্মরূপী ভগবান্‌কে) দেখে আমি কখনও তাহার অদৃশ্য হই না ; সেও কখনও আমার পরোক্ষ হয় না। অর্থাৎ তাহার প্রতি আমার কৃপাদৃষ্টি সর্ব্বদাই থাকে। (এই তত্ত্ব উপনিষদের অনুবর্ত-মাত্র। উপনিষদ্ বলেন "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যে-বানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে")

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

যিনি অর্থাৎ যে আত্মা ('তৎ' পদার্থ) সর্ব্বভূতে অবস্থিত, যিনি সর্ব্বভূতের সহিত (ত্বং পদার্থের সহিত) এক অর্থাৎ অভিন্ন, তিনিই আমি। যে সাধক আমাকে (পরমাত্মাকে) আপনার সহিত (জীবাত্মার সহিত) অভিন্ন জানিয়া ভজনা করেন, তিনি আমাতেই

অভিন্নরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। (তথা চ শ্রুতিঃ —ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ। তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্, ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ॥” ক্ষর প্রকৃতি ও অক্ষর জীবাত্মা এতদুভয়ের ঈশ্বর যে পরমাত্মা পরব্রহ্ম, তাঁহার সহিত যোগ ও একত্ব বশতঃ অন্তে সম্পূর্ণরূপে সমুদায় মোহ বিনষ্ট হয়। অপি চ, যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতাণি আত্মৈবাভূদ্‌বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বম্ অনুপশ্যতঃ॥)

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়॥

যিনি (যে আত্মা—ব্রহ্ম) সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান (“যদক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে চত্র চৈবাভিযন্তি” ইতি “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইতি চ শ্রুতিঃ)। যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই (“যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ” ইতি শ্রুতিঃ) হে ধনঞ্জয়, **তিনিই আমি**।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক মহেশ্বরম্।

অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

যিনি (আত্মা) কখন ও জন্মেন না সুতরাং যিনি অনাদি পুরুষ, **তিনিই** (অর্থাৎ সেই আত্মা বা ব্রহ্মই) **আমি**। (“ন জায়তে” ইতি শ্রুতিঃ) যিনি (অর্থাৎ যে আত্মা) লোক সকলের মহেশ্বর (“তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্” ইতি শ্রুতিঃ) **তিনিই আমি**। যে সাধক আমাকে (আত্মাকে) জন্মরহিত, অনাদি এবং সর্ব্বলোক মহেশ্বর বলিয়া বোঝেন, মনুষ্যদিগের মধ্যে তিনি সম্মোহরহিত হইয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন।

জীবের যাহা জানিবার বস্তু, যাহা জানিলে জীব মুক্ত হয়, ভগবান্ ভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সেই জ্ঞেয় বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। **সেই জ্ঞেয় বস্তুই তিনি**। ভগবান্ বলিয়াছেন—“মদ্‌ভক্তা এতদ্ বিজ্ঞায় মদ্‌ভাবায়োপপদ্যতে।” আমার ভক্তগণ ইহা জানিয়া (জ্ঞেয়বস্তু রূপে আমাকে অবগত হইয়া) মদ্‌ভাবলাভের অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির (“মদ্‌ভাবায় ব্রহ্মভাবায়” ইতি শ্রীধরঃ) যোগ্য হয়। এখানেও ভগবান উপনিষৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া, আত্মস্বরূপের,অর্থাৎ তিনি যে কি বস্তু তাহার, অতিসুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাহা দেখাইতেছি।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখম্।

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ (গীতা)

সর্ব্বত্র তাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্র তাঁহার নেত্র, সর্ব্বত্র তাঁহার শির ও মুখ এবং সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়; অর্থাৎ তিনি বিশ্বরূপ। তিনি সকল পদার্থ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।

সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

তিনি সকল বস্তুর ভিতরে ও বাহিরে বর্ত্তমান। স্থাবরও তিনি জঙ্গমও তিনি। সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়। দূর হইতেও দূর তিনি। অতি নিকট হইতেও নিকটে তিনি। (তথা চ শ্রুতিঃ— তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্ উ অন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদ্ উ সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥)

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥

তিনি সর্ব্বভূতে অবিভক্তরূপে থাকিয়াও (এক অখণ্ড আত্মারূপে অবস্থান করিয়াও) প্রত্যেক প্রাণীতে বিভক্তের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়েন। তিনিই জানিবার বস্তু। সৃষ্টিকর্ত্তাও তিনি, সংহারকর্ত্তাও তিনি।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সমূহের জ্যোতিঃস্বরূপ (“তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি” শ্রুতিঃ) তিনিই অজ্ঞান বা অবিদ্যারূপ অন্ধকারের পরপারে স্থিত বলিয়া কথিত হয়েন (তমসঃ পরস্তাদিতি শ্রুতিঃ)। জ্ঞানও তিনি, জ্ঞেয়ও তিনি। অমানিত্বমদম্ভিত্বম্ ইত্যাদি জ্ঞান লক্ষণ দ্বারা অধিগম্যও তিনি। তিনি সকলের হৃদয়ে

নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান করিতেছেন। ("সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "সর্ব্বভূতাধিবাসঃ" ইতি শ্রুতিঃ)

ভগবান্ বলিতেছেন আমার ভক্তগণ এই ভাবে আমাকে জানিয়া মদ্‌ভাব লাভের যোগ্য হয়।

এই দেহে দুইটি পুরুষ আছেন। একটি "জ্ঞ" অপরটি "অজ্ঞ"। একটি "ঈশ" অপরটি "অনীশ" ("জ্ঞা জ্ঞৌ দ্বাবীশানীশৌ" ইতি শ্রুতিঃ:) বেদে অতি সুন্দর উপমা দ্বারা ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

"দ্বা সুপর্ণা সভুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তানশ্নন্নন্যোঽভি চাকশীতি ॥"

পরস্পর সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুই পক্ষী একবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন (জীব) সুখদুঃখাদি ফল ভোক্তা, অপরটি (ঈশ্বর) দ্রষ্টা ও নিয়ন্তা।

দেহস্থিত এই পুরুষদ্বয়ের মধ্যে জীব নিয়মিত এবং ঈশ্বর নিয়ন্তা। এই নিয়ন্তা পুরুষ সম্বন্ধেই ভগবান্ বলিতেছেন—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন পুরুষঃ পরঃ ॥

দেহস্থিত এই নিয়ন্তা পুরুষই মহেশ্বর (ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর)। ইনিই বেদে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত। এই পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুই পরম পুরুষ—উত্তম পুরুষ। ইনিই আমি ("অস্মি পুরুষোত্তমঃ" গীতা, তথাচ শ্রুতিঃ এষ (পরমাত্মা) সর্ব্বেশ্বরঃ এষ অধিপতিঃ এষ লোকপাল ইতি)

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

যে বস্তু সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও যে বস্তু বিনষ্ট হয় না, তাহাই (সেই আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুই) আমি। যে সাধক এইরূপে আমাকে দর্শন করেন তিনিই যথার্থদর্শী।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

যে পদ প্রাপ্ত হইলে (অর্থাৎ যে অব্যয় পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে) আর পুনরাবৃত্তি হয় না, যাহাকে চন্দ্র সূর্য্য ও হুতাশন প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাই আমার পরমধাম অর্থাৎ সেই পরমধাম পরমাত্মা বা পরব্রহ্মই আমি। (তথাচ শ্রুতিঃ—ন তত্র সূর্য্যো-ভাতি ন চন্দ্রতারকম্, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়-মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি)

এইরূপে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে নানাভাবে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা যেমন সরল তেমনই সুন্দর। ইহাই—

গীতায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

গীতা পড়িতে পড়িতে সাধকের মনে যখন কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠে, তখন তিনি ভগবানের শ্রীমুখ-নিনাদিত এই মধুর বংশীধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভাব-বিহ্বল ও কৃতার্থ হইয়া যান।

উপনিষদ্ বা শ্রুতিপ্রতিপাদিত পরমাত্মা পরব্রহ্মকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমি বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিপিন বাবু তাহা দেখিয়াও দেখিতে পান না; অথবা জানি না কি জন্য দেখিতে চান না।

যাঁহাকে শুনাইবার জন্য ভাগবতে কৃষ্ণলীলা, সেই রাজর্ষি পরীক্ষিৎ মৃত্যুকালে অধোক্ষজে (শ্রীকৃষ্ণে) চিত্ত সমাধান করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; তথা চ ভাগবতে—

অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে।
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্ ॥

পরমাত্মা বা ব্রহ্মবস্তুই সেই অধোক্ষজ। ভাগবত স্পষ্টাক্ষরে সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

পরীক্ষিদপি রাজর্ষিরাত্মন্যাত্মানমাত্মনা।
সমাধায় পরং দধ্যাবাস্পন্দাসুর্যথা তরুঃ ॥

রাজর্ষি পরীক্ষিৎও বুদ্ধিদ্বারা মনকে আত্মাতে যোজনা করিয়া নির্ব্বাতনিষ্কম্প তরুর ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া পরমাত্মাকে (ব্রহ্মবস্তুকে) চিন্তা করিতে লাগিলেন ("পরম্ আত্মানং দধ্যৌ" ইতি শ্রীধরস্বামী)। এই পরমাত্মা (অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুই) অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ।

মহর্ষি পরীক্ষিৎ মৃত্যুকালে অধোক্ষজকে (শ্রীকৃষ্ণকে) যেভাবে ধ্যান করিয়াছিলেন, আমরা তাহাও দেখাইয়াছি, তাহা এই—

"অহং ব্রহ্ম পরংধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।" ভাগবত। সুতরাং ব্রহ্মই অধোক্ষজ (শ্রীকৃষ্ণ)। রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এ কথাটি একেবারে খুলিয়াই বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই—

"সর্ব্বজীবং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।"

সকলের বীজস্বরূপ যে পরব্রহ্ম তাঁহাকেই কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

বস্তুতঃ, ব্রহ্মবস্তুই পরমতত্ত্ব। ব্রহ্মবস্তুই সর্ব্ব শাস্ত্রের পরম তাৎপর্য্য। ভাগবত বলেন, ব্রহ্মই পরমাত্মা (ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ), বিষ্ণুপুরাণ বলেন, ব্রহ্মই পরমাত্মা এবং তিনিই পরমেশ্বর (স ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম পরমাত্মা সচেশ্বরঃ), গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, পরমাত্মাই উত্তম পুরুষ—পুরুষোত্তম (উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ) এবং পুরুষোত্তমই আমি অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুই আমি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে দেখাইয়াছি—সকলের বীজস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনিই কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত হন। সুতরাং ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন বস্তু। সদ্গুরুর কৃপা হইলেই এ তত্ত্ব বুঝা যায়। এ হেন শাশ্বত ও মধুর ভগবত্তত্ত্বে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্রের বিষমা ভ্রান্তি—বিষমা ভেদবুদ্ধি। সুতরাং আজ অতি দুঃখে আমাদিগকে ভারতচন্দ্রের ভাষায় বলিতে হইতেছে—

কৃষ্ণে ব্রহ্মে করে ভেদ, নর বুঝে নারে,
অভেদ কহে সর্ব্ববেদ।
অভেদ ভাবে যেই, পরম জ্ঞানী সেই,
তাঁরে না লাগে পাপক্লেদ॥

শ্রীরেবতীমোহন রায় চৌধুরী।

প্রতারক

(গল্প)

(১)

দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা সুরমা যখন বুঝিল যে তাহার মা আর বাঁচিবে না, তখন তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্ষুদ্র হৃদয় শোকভারে কাঁপিয়া উঠিল। মুমূর্ষু জননীর গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল, "মা—মা—তোকে ছেড়ে কেমন করে থাক্‌বো, মা?"

জননী তখন মহাযাত্রার যাত্রী হইয়াছেন, স্থির-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "মা নিয়ে কে চিরকাল ঘর করে মা? ছি, এ সময় কি কেঁদে আমার মরণের কষ্ট বাড়াতে আছে?"

বালিকা বুঝিল না, আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুই, কেন যাবি মা?"

"আমার সময় হয়েছে, তাই যাবো মা। সুরমা, মা আমার, তোকে আমি এতদিন ধরে শিখিয়েছি—শোকে দুঃখে অত অধীর হস্‌নে। আমি মর্‌ছি, কিন্তু মর্‌লেই সব ফুরোয় না। আমি স্বর্গে থেকে তোকে দেখ্‌ব। তুই লক্ষ্মী বউ, লক্ষ্মী স্ত্রী, লক্ষ্মী মা হয়ে সংসার করিস্। ভগবান তোর মঙ্গল কর্‌বেন।"

জননীর আশীর্ব্বাদ ফুরাইল, সংসারের সহিত তাঁহার হিসাব নিকাশেরও শেষ হইল।

সুরমা বড় লোকের মেয়ে। তাহার পিতা এলাহাবাদে বড় চাকরি করেন। সে পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। এই বারো বৎসর সে বড় আদরেই প্রতিপালিত হইয়াছিল, কখনও কষ্টের মুখ দেখে নাই। তাই আজ স্নেহময়ী জননীকে হারাইয়া

সে জগৎ অন্ধকার দেখিল। যে মা এক দণ্ডের জন্ম চক্ষুর অন্তরাল হইলে সুরমার প্রাণ বেদনায় ভরিয়া উঠিত, সেই মাকে জন্মের মত বিদায় দিয়া এ দীর্ঘ জীবন সে কেমন করিয়া কাটাইবে!

সুরমা যে তাহার জননীর শুধু স্নেহ আদর পাইয়াছিল তাহা নহে। তাহার মত বালিকার যেরূপ শিক্ষা পাওয়ার দরকার, জননী সেই দিকেই বেশী দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সুরমা জননী হারাইল বটে, কিন্তু জননীর সুখময় স্মৃতি, শুভকরী শিক্ষা, পুণ্যময় আদর্শ তাহার জীবনকে গড়িয়া তুলিতে লাগিল।

পিতার আদরে সুরমা ক্রমে ক্রমে মাতার শোক ভুলিতেছিল। কিন্তু যখন একদিন তাহার পিতা বঙ্গদেশ হইতে এক নবীনযৌবনা রূপসীকে গৃহে আনিয়া সুরমাকে বলিলেন, "এই তোমার নূতন মা,"—তখন সুরমার শোকরাশি আবার দ্বিগুণ বেগে উচ্ছলিয়া উঠিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল। সেই হইতে সুরমার প্রকৃত দুঃখের আরম্ভ হইল।

অভিমানিনী সুরমা শীঘ্র দেখিল, তাহার পিতা তাহাকে আর সেরূপ আদর করেন না। চিরদিন স্নেহছায়ায় যে কুসুম হাসিতেছিল, আজ সহসা সংসারের তাপ সহিতে না পারিয়া সে ম্লান হইল। অনাদৃতা সুরমা আপনার ঘরে বসিয়া বসিয়া কাঁদিত। তার তেমন মা কেন ছাড়িয়া গেল? সংসারে সুরমার আদর করে, এমন যে আর কেহ নাই। সে যে কাহারও আদর না পাইলে বাঁচিবে না!

সুরমা "বিষবৃক্ষ" পড়িয়াছিল। রাত্রে যখন নির্ম্মল আকাশে রাশি রাশি নক্ষত্র ফুটিত, তখন সে আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। তার মা নক্ষত্র হইয়াছেন, সেটা কোন্‌টা? সুরমা ভাবিত, সে কেন কুন্দনন্দিনীর মত স্বপ্ন দেখে না? তার মা কেন নক্ষত্রলোক হইতে নামিয়া আসিয়া তাহার সহিত কথা কহেন না? কেন তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্ম ডাকেন না?

মাতৃহীনা সুরমার মাথার উপর দিয়া তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল। এই তিন বৎসরেই সে সংসারের অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। দুঃখে না পড়িলে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হয় না, মানুষ মানুষ হয় না। সুরমার আর সে বালিকা-সুলভ চাঞ্চল্য নাই; সে অপেক্ষাকৃত স্থির ও গম্ভীর হইয়াছে। সময়ে অসময়ে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সে আর মায়ের জন্ম কাঁদে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুরমা ধনীকন্যা। তাহার শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কিছুই অভাব ছিল না। তথাপি তাহার মনে যে একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল সেটা কিছুতেই ঘোচে না। সে কেবল মনে করিত, তাহার পিতা আর তাহাকে তেমন স্নেহ আদর করেন না। যে সুখ-স্নেহের দিন চলিয়া গিয়াছে, সে দিন কি আর ফিরিবে!

তবে সুরমার একটা আশা ছিল যে, ভাল ঘরে তাহার বিবাহ হইবে। শ্বশুর খাশুড়ীর স্নেহ, স্বামীর ভালবাসা, স্বামীগৃহে "ঘরকন্না"—এই সব লইয়া সে দিবারাত্রি কত আকাশকুসুমের সৃষ্টি করিত; তাহাতে সে বড় সুখ, বড় শান্তি পাইত।

(২)

সুরমার বিবাহের ফুল ফুটিল। একটা ছুটিতে কলিকাতায় গিয়া পিতা তাহার সম্বন্ধ করিয়া আসিলেন। কয়েকদিন পরে পাত্র স্বয়ং আসিয়া মেয়ে দেখিলেন। পছন্দ হইল। কথাবার্ত্তা পাকা হইল। তিনি রূপবান, গুণবান ও ধনী। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মস্থান কলিকাতায়; সুরমা শুনিল, বিবাহের পর স্বামী সেখানেই তাহাকে লইয়া যাইবেন, একবৎসর কাল এখন সে পিতৃগৃহে ফিরিতে পাইবে না। তাহার পিতা এ সম্বন্ধে প্রথমে কিছু আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আপত্তি টিকে নাই।

শুভদিনে সুরমার বিবাহ হইয়া গেল। বর ভিন্ন তাঁহার আর কোনও আত্মীয় স্বজন আসেন নাই—বোধ

হয় বরের আর কেহই নাই। যাহা হউক, গুণবান, রূপবান স্বামী পাইয়া সে বড় খুসী।

স্বামীর সহিত সুরমা কলিকাতায় গেল। তাঁহার বাড়ীতে আর কোনও আত্মীয়-স্বজনকে দেখিল না।

ফুলশয্যার মধুময় রাত্রি। অসীম নির্ভরতার সহিত তাহার বুভুক্ষু হৃদয়, তাহার জীবন যৌবন, স্বামী চরণে উৎসর্গ করিয়া সুরমা নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল।

শেষরাত্রে সুরমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সে কি একটা মধুর স্বপ্ন দেখিতেছিল, সহসা এক উৎকট গন্ধে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু মেলিয়া সুরমা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। এই কি তাহার স্বামী? স্বামীর এক হস্তে মদের বোতল, অপর হস্তে গেলাস্। নেশায় পা টলিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ হইতে মদের গন্ধ বাহির হইতেছে।

সুরমা উঠিয়া বসিল। ভাল করিয়া চোখ রগ-ড়াইয়া দেখিল, কিন্তু সেই বীভৎস মূর্ত্তি স্বপ্নের মত নিমেষের মধ্যে ত মিলাইয়া গেল না!

একি সত্য? তার স্বামী—তার জীবনের চিরা-রাধ্য দেবতা এমন মাতাল? না—না—তা কখনই হতে পারে না। সে যে স্বামীর গরবে গরবিণী হইবার জন্য এই পনেরো বৎসর ধরিয়া তাহার দেহ মন গড়িয়া তুলিয়াছে!

যতীন্দ্র জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সুরমা ঘুম ভেঙ্গেছে?"

সুরমা নির্ব্বাক্।

যতীন্দ্র আবার বলিল, "তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে। তোমার মত সরলা বালিকার আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি, সাদা চোখে তা বল্‌তে পারবো না বলে, একটু খানি মদ খেয়েছি।"

সুরমা তখন কাতর কণ্ঠে বলিল, "ওগো—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অমন করোনা। আমার বড় ভয় করচে।"

যতীন। না, তোমার ভয় নেই—তোমাকে ত আমি মারবো না। আমি এত মাতাল হইনি।

সুরমা। তুমি আমাকে মেরে ফেল, আমি কিছু বল্‌বো না, কিন্তু ও মদের বোতল তুমি হাত থেকে ফেল।

যতীন। মদের বোতল ফেলবো? তবে তোমায় বিয়ে করলাম কেন?

সুরমা। তুমি কি বল্‌ছ, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে।

যতীন। পারবে; এখনও যা বোঝনি, ক্রমে ক্রমে তা বুঝবে।

সুরমার তন্দ্রা তখনও বেশ ছাড়ে নাই। তাহার তখনও মনে হইতেছিল, স্বামী বুঝি রঙ্গ করিতেছেন।

যতীন্দ্র তাহার পর যাহা বলিল, তাহা হইতে সুরমা বুঝিতে পারিল যে, এক জুয়াচোরের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। সুরমার মাথায় যেন বিনা মেঘে সহস্র বজ্রপাত হইল। তাহার আশৈশব কল্পনা-গঠিত সুখের সৌধ এক নিঃশ্বাসে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

তাহার ভাগ্যে এই ছিল? সে বড় হতভাগিনী, নতুবা সেই বয়সে তেমন স্নেহময়ী মাতাকে হারাইবে কেন? পিতা নব প্রণয়িণীর প্রেমে উন্মত্ত, কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিবার—দেখিয়া শুনিয়া কন্যার বিবাহ দিবার অবসর তাঁহার কোথায়! তাই তিনি না দেখিয়া, না শুনিয়া একটা জুয়াচোরের হস্তে সুরমাকে ধরিয়া দিয়াছেন। সুরমা শুনিয়াছিল, যতীন্দ্র ধনীর সন্তান, সচ্চরিত্র, বিদ্বান। এখন সে জানিতে পারিল যে যতীন্দ্র মূর্খ, মাতাল, কপর্দ্দকহীন। যে বাড়ীতে তাহারা রহিয়াছে সে বাড়ী যতীন্দ্রের নয়, যতীন্দ্রের এক মাতাল বন্ধুর বাড়ী। সেই বন্ধুর বাড়ী যতীন্দ্র নিজের বলিয়া সুরমার পিতাকে দেখাইয়াছিল। যতীন্দ্র বলিল, এই রাত্রেই তাহাদিগকে সেই বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্ষোভে সুরমার নিঃশ্বাস আটকাইয়া

আসিতেছিল। সে যতীনকে বলিল, "আমার এমন সর্ব্বনাশ কেন করলে ?"

যতীন্দ্র বলিল, "আগে এতটা ভাবিনি। এখন তোমার মুখখানা দেখে বুঝ্‌চি যে কাষ ভাল করিনি। যা' করে ফেলেছি তার আর হাত নেই। তুমি এলাহাবাদে তোমার বাবার কাছে ফিরে যাও।"

পিতার উপর সুরমার বড় রাগ হইয়াছিল। পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে তাহার আদৌ ইচ্ছা হইল না। সে বলিল, "না—তুমি যাই হও, তুমি আমার স্বামী। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।"

যতীন্দ্র বলিল, "সুরমা, সংসারে আপনার বল্‌বার আমার কেউ নেই, নিজের মাথা রাখ্‌বার একটু স্থান নেই। তোমায় আমি কোথায় নিয়ে যাব ?"

সুরমা বলিল, "তুমি বিয়েতে যে টাকা পেয়েছ,তাতে একটা বাড়ী ভাড়া করে আমরা থাক্‌তে পারবো।"

যতীন্দ্র বলিল, "সেই যৌতুকের টাকাই ত সব সর্ব্বনাশের মূল। যার বাড়ীতে আমরা এখন রয়েছি, মদ খাবার, জুয়া খেল্‌বার জন্যে তার কাছে আমি অনেক টাকা ধার করেছিলাম। সেই টাকার জন্যে সে আমায় জেলে পর্য্যন্ত দিয়েছিল, কিন্তু জেলে দিলেই ত আর টাকা আদায় হয় না।—আমার পৈতৃক সম্পত্তি যা কিছু, তা আমি আগেই ঘুচিয়ে রেখেছিলাম। তাই তোমার বাবাকে ঠকাবার জন্যে সে আমায় সাহায্য করেছে। যে টাকা যৌতুক পেয়েছিলাম, সব আমার এই বন্ধুটিকে দিয়ে আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি। এখন আর সে আমাকে এ বাড়ীতে থাক্‌তে দেবে কেন ?"

সুরমা সব শুনিল। এলাহাবাদে থাকিতেই কলিকাতার জুয়াচুরীর গল্প সে অনেক শুনিয়াছিল। কিন্তু এরূপ ভাবে একজন সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ করিতে পারে এমন লোক যে পৃথিবীতে আছে, তাহার সে ধারণা ছিল না। তাহার স্বামী যে মূর্খ, দরিদ্র, মাতাল—তাহাতে তাহার তত দুঃখ হইল না। কিন্তু স্বামী যে জুয়াচোর—একথা ভাবিতে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু সুরমা তাহার মাতার উপদেশ ভুলিল না। স্বামী যাহাই হউন, স্ত্রীলোকের পক্ষে তিনি দেবতা। স্বামীসেবা করাই রমণীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সুরমা বলিল, "আমার গায়ে অনেকগুলো গহনা আছে। এতে আমাদের কিছুদিন চল্‌বে। ইতিমধ্যে তুমি একটা চাক্‌রীর চেষ্টা দেখ।"

যতীন্দ্র বলিল, "সুরমা, তোমার মত বালিকার আমি কি সর্ব্বনাশটাই করেছি! অনন্ত নরকেও আমার স্থান হবে না।"

সুরমার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। সে বলিল, "তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্য কর যে তুমি আর কখনও মদ খাবে না, কুসংসর্গে মিশ্‌বে না। তোমার চরিত্রের যদি সংশোধন হয়, তবে তোমার সঙ্গে গাছতলাতে বাস করেও আমি সুখী হব।"

যতীন্দ্র সুরমাকে স্পর্শ করিয়া দিব্য করিল।

(৩)

হাতীবাগানে এক খোলার ঘরে ধনীকন্যা সুরমা মাতাল স্বামীকে লইয়া সংসার পাতিয়াছে। তাহার অনেক কায। নিজে ঘর ঝাঁট দেয়, কাপড় কাচে, বাসন মাজে, আবার সময় মত রান্না করিয়া স্বামীকে খাওয়ায়। তাহাতে তাহার কোন দুঃখ নাই। স্বামীর সামান্য সুখের জন্যও প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে সে প্রস্তুত।

যতীন্দ্র তাহার অঙ্গীকার আংশিকভাবে রক্ষা করিয়াছে, সে এখন আর মদ খায় না। কিন্তু জুয়াখেলার নেশা সে কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছে না।

প্রত্যহ আহারাদি করিয়া যতীন্দ্র চাক্‌রীর চেষ্টায় বাহির হয়, আবার সেই সন্ধ্যার পর বাসায় ফেরে।

সুরমা ক্রমে বুঝিল, মাতাল প্রভৃতি পূর্ব্ব বদনামের জন্যই স্বামীর চাকরি হইতেছে না। তাই সে একদিন স্বামীকে বলিল, "চাক্‌রীর জন্যে বৃথা ঘুরে আর শরীর মাটি করতে হবে না।"

যতীন। চাকরি না হলে সংসার চল্‌বে কি করে ? তোমার গহনা বেচা টাকা ত প্রায় ফুরিয়ে এল।

সুরমা। কেন? সে হাজার টাকা এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল কি করে? এ ক'মাসে আমাদের সংসারে খরচ আর কত টাকাই ব্যয় হয়েছে?

যতীন কিছুক্ষণ নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "জুয়া খেলে প্রায় সব টাকাই ত শেষ হয়ে গেছে।"

সুরমা কিয়ৎক্ষণ দুঃখে ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া হইয়া রহিল। শেষে বলিল "তবে এখন উপায়? এ জুয়ার নেশা কি তোমার কিছুতেই কমবে না।"

দুইজনে অনেকক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনা হইল। শেষে যতীন স্ত্রীর গা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, জুয়া সে আর খেলিবে না।

সুরমা। বেশ, এখনও আমার প্রায় হাজার টাকার গহনা আছে, সে গুলো বেচে তুমি একটা ব্যবসা খোল।

যতীন। কিন্তু ব্যবসার যে আমি কিছুই বুঝিনে।

সুরমা। তোমায় কিছু বুঝ্‌তে হবে না, আমি সব ঠিক করে দেব এখন। তোমায় আমি যা কর্‌তে বল্‌বো তা কর্‌তে পার্‌বে ত?

যতীন। হাঁ—তা পার্‌বো।

সুরমা। বেশ, তবে তুমি এই গহনাগুলো স্যাক্‌রার দোকানে বিক্রি করে টাকা নিয়ে এস।

সুরমা তাহার সব গহনাগুলি স্বামীকে আনিয়া দিয়া বলিল, "দেখ, এই গয়নাগুলিই আমাদের যথা সর্ব্বস্ব। এগুলি নিয়ে যেন আর জুয়া খেল না।

যতীন। রামচন্দ্র! আমাকে তুমি এত কাঁচা লোক মনে করেছ?

সুরমা। তা মনে করি। গহনা বা টাকা তোমাকে দিয়ে আমার তিলমাত্র বিশ্বাস হয় না। তবে তোমার জিনিষ তুমি নিজে যদি নষ্ট কর, আমি কি তা বন্ধ করতে পারি?

যতীন কিন্তু এবার কথা রাখিল। গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া এক হাজার টাকা স্ত্রীর হাতে আনিয়া দিল।

হাতীবাগানের সে খোলার বাড়ী ছাড়িয়া যতীন রাস্তার উপর একটি ছোট বাড়ী ভাড়া লইল। বাহিরে একটি কুঠরী ভিতরে একটি কুঠরী ও রান্নাঘর। বাহিরের কুঠরীতে একখানি ছোট রকমের কাপড়ের দোকান খোলা হইল। সুরমা সব খরচপত্র হিসাব করিয়া প্রত্যেক কাপড়ে দাম লিখিয়া রাখিল। সে জানিত, যতীন খরিদ্দারের সহিত দরদস্তুর করিতে পারিবে না। তাই তাহাকে বলিয়া দিল, "কাপড়ে যে দাম লেখা রইল, তার একটি পয়সা বেশী কিংবা কম নিও না। আর ধারে কাকেও কিছু দিও না। ধার দিলে দুদিনে ফেল্ হয়ে যাবে।"

সুরমা সারাদিন সংসারের কায করে, যতীন দোকানে বসিয়া কাপড় বেচে। সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ হইলে সুরমা কেনা বেচার হিসাব তৈয়ারি করে, লাভ লোকসান খতাইয়া দেখে, টাকাকড়ি সামলাইয়া রাখে।

দোকানে একদর, সুরমা বেশী লাভের লোভ করে নাই বলিয়া দরও কম, শীঘ্রই তাহাদের অনেক খরিদ্দার জুটিল। দোকানটি বেশ চলিতে লাগিল। সুরমার প্রাণে আশার ক্ষীণ রেখা দেখা দিল।

কিন্তু যতীন্দ্র এখনও জুয়ার নেশা ছাড়িতে পারে নাই। বৈকালে চারিটা বাজিলেই নিত্য সে দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়, আবার সেই সাতটা আটটার পর ফেরে।

দোকানে যতই বেশী লাভ হইতে লাগিল, যতীন্দ্র ততই জুয়াখেলায় মাতিয়া উঠিতে লাগিল। সে দিন সে অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিল। সুরমার বড় রাগ হইল। সে এত কষ্ট করিয়া দোকানটির উন্নতির চেষ্টা করিতেছে, আর যতীন জুয়া খেলিয়া সব উড়াইতেছে, দোকানটাকে মাটি করিতে বসিয়াছে! সুরমা সেদিন যতীনকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিল।

(৪)

সুরমা বুঝিল, যতদিন হাতে পয়সা থাকিবে ততদিন যতীন কিছুতেই শোধরাইতে পারিবে না। অন্ন বস্ত্রের অভাব হইলে জুয়ার নেশা ছুটিতে পারে।

তাই সে একদিন যতীনকে বলিল, "তোমার দ্বারা দোকান চল্‌বে না।"

যতীন। তা ত বুঝ্‌চি।

সুরমা। তবে দোকানটা তুলে দাও।

যতীন। আমি এখনই রাজি, অত ঝঞ্ঝাট আমার পোষায় না। সেই সকাল থেকে থাকের পর থাক থেকে কাপড় নামান আর গোছান। খদ্দেরে একটা কাপড় কেনে ত কুড়িখানা দেখে! এও কি মানুষে পারে?

সুরমা। মানুষে পারে না ত কাপড়ের দোকান কি হাতী ঘোড়াতে করে?

যতীন। তা, যেই করুক, আমি কিন্তু আর পার্‌বো না।

সুরমা। দেখ, ছেলে মানুষ করার মত করে আমি এই দোকানটাকে দাঁড় করিয়েছি। এটা তুলে দিলে আমি পুত্র শোকের মত ব্যথা পাব।

যতীন। পুত্র না হতেই পুত্রশোক বুঝ্‌লে কি করে?

সুরমা। মেয়ে মানুষ তা পারে। তা বাজে কথা যাক, দোকান যদি তুল্‌তে হয়, ত সময় থাক্‌তে তোলাই ভাল।

সুরমার সাধের সাজান দোকান উঠিয়া গেল। দোকানের কাপড় চোপড়, জিনিষ পত্র সব বিক্রয় করিয়া আবার হাজার টাকাই উঠিল। সুরমা বলিল, "এই টাকাটা পোষ্ট আফিসে রাখ।"

যতীন বলিল, "দিন চল্‌বে কিসে?"

সুরমা। ঐ টাকার সুদে।

যতীন। এক হাজার টাকার সুদ আর কত হবে?

সুরমা। যা হয় তাতেই চালাতে হবে। আমিও ঘরে বসে পরিশ্রম কর্‌লে কিছু রোজগার কর্‌তে পারব।

যতীন। কি কর্‌বে?

সুরমা। কলাই বেঁটে বড়ি করে হাটে দোব। উলের কায কর্‌ব, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জামা মোজা বুন্‌বো।

যতীন। এতে আর কত উপায় হবে? আধ্‌ পেটা খেয়ে থাক্‌তে হবে?

সুরমা। তাই থাক্‌ব। তোমাকে জুয়াখেলাটাও ত ছাড়তে হবে।

যতীন। দেখ সুরমা, তোমার সবই গুণ, কেবল এইটেই দোষ। কথায় কথায় কেবল আমার জুয়া খেলার কথা তোল।

সুরমা। হাঁ, আমার ঐটেই বড় দোষ। কি কর্‌ব বল—মানুষের ত আর সব গুণ থাকে না। যাক্‌, এবার খেতে না পেলেই খেলা ছাড়বে।—এখন এই হাজার টাকা পোষ্ট আফিসে দিয়ে এস। বলো কোম্পানির কাগজ কিনে দিতে।

যতীন্দ্র টাকা লইয়া চলিয়া গেলে সুরমা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ঐ টাকাই তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব। হাতে থাকিলে ও টাকা দুইদিনেই উড়িয়া যাইবে। তখন ত যেমন করিয়া হউক চালাইতেই হইবে! তবে পূর্ব্বে হইতেই সেরূপ কষ্টে চালান ভাল। এই ভাবিয়াই সুরমা টাকাটা পোষ্ট আফিসে পাঠাইল। তবু অসময়ের জন্য কিছু থাকিবে। কিন্তু, যতীন কি সমস্ত টাকা পোষ্ট আফিসে দিবে? তাহার জুয়ার জন্য সে কিছু রাখিবেই রাখিবে। তা রাখুক, কত আর রাখিবে? না হয় ৫০৲ কি ১০০৲! আবার সুরমার ভাবনা হয়, যতীন যদি সমস্ত টাকাটা হারাইয়া ফেলে, কি কোন জুয়াচোরে ঠকাইয়া লয়? না—তার ভয় নাই। যতীন গহনা বেচিয়া সেবার এক হাজার টাকা আনিয়া দিয়াছিল। তবে বিশ্বাস নাই—কখন কি কর্‌তে কি করে ফেলে!

স্বামী কতক্ষণে পোষ্ট আফিসের রসিদ লইয়া ফিরিয়া আসিবেন, সেই অপেক্ষায় সুরমা বসিয়া রহিল। আহারের সময় অতিক্রান্ত হইল, কিন্তু যতীন্দ্র ফিরিল না। সুরমা অস্থির হইল। একবার ঘরের ভিতর যায়, আবার বাহিরে আসিয়া দেখে স্বামী আসিতেছেন কি না। দুপুরের পর বৈকাল, বৈকালের পর সন্ধ্যা

আসিল, কিন্তু যতীনের দেখা নাই। সুরমার মনে কত রকমের আশঙ্কা হইতে লাগিল। স্বামীর কি বিপদই না ঘটিয়াছে! অত টাকা লইয়া তিনি যদি কোথাও জুয়ার আড্ডায় ঢুকেন, কিংবা অন্য কোথাও যান! অত টাকা তাঁহার হাতে দেওয়া ভাল হয় নাই।

যতীন্দ্র যখন চোরের মত চুপি চুপি গৃহে প্রবেশ করিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। সুরমা এতক্ষণ মুখে জল পর্য্যন্ত দেয় নাই, অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় তাহার সারাদিন কাটিয়াছে। তাহার উপর স্বামীর ভাব দেখিয়া আতঙ্কে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "টাকা কি হ'ল?"

যতীন কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "সর্ব্বনাশ করেছি।"

সুরমা বসিয়া পড়িল। আর যে তাহাদের একটি পয়সাও নাই, কাল কি খাইবে তাহার সংস্থান নাই! সে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "টাকাগুলো করলে কি?"

যতীন্দ্র বলিল, "তুমি আধপেটা খাবার ব্যবস্থা করে সব টাকাগুলো পোষ্ট অফিসে দিতে বল্লে। কিন্তু, আমার তা পছন্দ হল না। আমাদের খরচ কি করে চল্‌বে? তুমি আর কত উপায় করবে! আমারও কিছু কর্‌বার ক্ষমতা নেই। তাই একটা মৎলব আঁটলাম। এক হাজার টাকা দিয়ে বিনা কষ্টে একেবারে দশহাজার টাকা পাওয়া যাবে। বড়বাজারে গিয়ে সব টাকাগুলো "তুলো"র খেলায় দিলাম। কিন্তু, বরাত মন্দ—একটা পয়সাও ফিরে পাই নি।

(৫)

সুরমার বড় জ্বর। সে অনেক সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না; শয্যাগ্রহণ করিল।

যতীন্দ্র সুরমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "ডাক্তার নিয়ে আসি।"

সুরমা বলিল, "আর তোমার আদরে কায নেই। এখন আমার মরণ হলেই বাঁচি।"

যতীন্দ্র। তুমি ম'লে আমার কি হবে, সুরমা?

সুরমা। আমি বেঁচে থেকেই তোমার কি হল? দেখ, আমার বড় আশা ছিল, তোমাকে সৎপথে আন্‌ব, তোমাকে মানুষ কর্‌ব। কিন্তু, আমার বরাত মন্দ।—

সুরমা কাঁদিয়া ফেলিল। যতীন্দ্র আবার বলিল, "না সুরমা, তোমার হাতের শাঁখাটা খুলে দাও, আমি একজন ভাল ডাক্তার নিয়ে আসি।"

"আর ডাক্তার আন্‌তে হবে না। আমার মরাই ভাল--আমি ম'লে তোমার মতি ফির্‌তে পারে। মর্‌বার আগে আমার হাতের শাঁখাটা যেন আর খুলো না।"

সুরমা কিছুতেই শাঁখা দিল না। তাহার নিকট আট আনা পয়সা ছিল, তাহাই দিয়া বলিল, "যাও, এই নিয়ে তোমার খাবার ব্যবস্থা করগে।"

যতীন্দ্র। আর, তুমি? তুমি কিছু খাবে না?

সুরমা। না—আমি কিছু খাব না। যদি আমার জন্যে কিছু আন, ফেলে দোব। শুধু শুধু পয়সা নষ্ট করো না।

জ্বরের ঘোরে সুরমা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, তার মা যেন একরাশি নক্ষত্রের মধ্যে বসিয়া, নির্ম্মল আকাশ হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছেন।

সুরমা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া মায়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মাতা আসিয়া সুরমার মাথা কোলে লইয়া বসিলেন। বহুদিনের পর সেই স্নেহময় স্পর্শ কি কোমল—কি মধুর!—সুরমা কাঁদিয়া বলিল, "মা, আর আমি এখানে থাক্‌তে পার্‌বো না, মা। আমার বড় কষ্ট। তুমি আমায় নিয়ে চল।"

স্নেহমাখা স্বরে মা বলিলেন, "না, মা—আর আমি তোমায় এখানে রাখ্‌বো না—আমি তোমাকে নিতেই এসেছি।"

সহসা সুরমার স্বপ্নঘোর কাটিয়া গেল। সে দেখিল সেই জীর্ণ কুটীরে মলিন রোগশয্যায় সে শুইয়া রহিয়াছে। কিন্তু, একি! সে কাহার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া রহিয়াছে? তাহার জননী? না—ও মুখ কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া ত তাহার মনে হয় না। সুরমা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

"আমি তোমার মা।"

"মা?"

(৬)

উপযুক্ত চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় সুরমা শীঘ্রই সারিয়া উঠিয়াছে।—আর সে খোলার ঘর নাই, সে দৈন্যের তাড়না নাই, স্বামীর সে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই! অদ্ভুত ইন্দ্রজালের মত সহসা সব যেন উল্টাইয়া গিয়াছে।

যতীন্দ্র সুরমার সহিত সত্য সত্যই প্রতারণা করিয়াছিল। তাহার মাতলামী, জুয়াখেলা—সবটাই ভণ্ডামি। সে দরিদ্র নহে, বিপুল ধনের অধিকারী। যতীন্দ্র শৈশব হইতেই পিতৃহীন। সে যখন এম্-এ পাস করিল, তখন তাহার মাতা তাহার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম বিবাহ করিতে অস্বীকার করা আজকাল ছেলেদের একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যতীন প্রথমে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইল। মাতা কিন্তু কিছুতেই ছাড়িলেন না। তখন যতীন তাহার মাতাকে বলিল যে, সে বিবাহ করিতে রাজি আছে, তবে বিবাহের পর একবৎসর বধূকে তাহার যেখানে ইচ্ছা সেখানে সে রাখিবে, কেহ কিছু বলিতে পাইবে না। যতীরেন মাতা অগত্যা এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। যতীন ঠিক করিল, একবছর তাহাকে ল' লেক্‌চার attend করিতে হইবে। সেই সময়ে সেতাহার নবপরিণীতা স্ত্রীকে একবার পরখ্ করিয়া লইবে। আজকালকার ছেলদের সবই রোমান্টিক্।

অজ্ঞাতবাস পূর্ণ হওয়াতে যতীনের মাতা বধূকে গৃহে লইয়া আসিলেন।

যথাসময়ে সুরমার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমার সোণার চাঁদ বউকে অত কষ্ট দেবে জান্‌লে কি আমি তোমাকে ছেড়ে দিতাম? আমি মনে করেছিলাম, ইংরিজী পড়ে যতীনের ইংরিজী ধাত হয়েছে। ইংরেজরা বিয়ের পর বউকে নিয়ে কিছুদিন বেড়াতে যায় কি না।"

সুরমা ভাবিল বলি, "মা, আমার স্বামী যে আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, তা'তে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। ভগবান সকলকেই পরীক্ষা করে থাকেন, এটা সকলেরই মনে রাখা উচিত।"—কিন্তু কোন কথা সে ব'লিতে পারিল না, লজ্জায় মুখখানি নীচু করিয়া রহিল।

(৭)

দুপুর বেলায় যতীন্দ্র আপনার ঘরে ঘুমাইতেছিল, সুরমা পা টিপিয়া টিপিয়া সেখানে প্রবেশ করিল। নিদ্রিত স্বামীর সুন্দর মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, সুরমা একটি তরল আল্‌তার শিশি বাহির করিল। পরে তদ্দ্বারা যতীনের কপালে অতি সন্তর্পণে কি লিখিয়া দিল।

যতীনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সুরমা পলাইয়া যাইতেছিল, যতীন তাহার অঞ্চল ধরিয়া ফেলিল। কৃত্রিম কোপ প্রকাশের সহিত বলিল—

"কি হচ্ছিল?"

"কিছু না।"

"মিথ্যা কথা!"

"ইস্, উনি কি আমার সত্যবাদী!"

যতীন হাসিয়া ফেলিল। সুরমা বলিল, "দেখ, তোমার আর ওকালতী করে কায নেই। তুমি থিয়েটারের দলে যাও, খুব নাম কর্‌তে পার্‌বে।"

"যখন কলেজে পড়্‌তুম তখন থিয়েটার অনেক করেছি।"

"কিন্তু এক বছর ধরে মানুষ যে এমন অভিনয় কর্‌তে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। আমার চোখে কি ধূলোটাই দিয়েছিলে!"

"তবে একটা বক্‌সিস্—"

"এই নাও তোমার বক্‌সিস্"—বলিয়া সুরমা যতীনের হাতে একটা আয়না দিল।

যতীন আয়নায় দেখিল, তাহার নিজের কপালে, আঁকা বাঁকা অক্ষরে, তরল আল্‌তায় লেখা আছে "প্রতারক।

শ্রীঅনিলবরণ রায়।

ভাষা সম্বন্ধে দু'একটি কথা

অধিকাংশ বাঙ্গালা শব্দের যে অন্ততঃ দুইটি করিয়া রূপ আছে—একটি সংস্কৃত, অপরটি মৌখিক—এই সাদা কথাটি আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তর্ক বা আলোচনার সময় প্রায়ই ইহা ভুলিয়া যাই বলিয়া অনেক সময়ে আমাদিগকে গোলে পড়িতে হয়। সাহিত্যের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে যিনি যে মতই পোষণ বা প্রচার করুন না কেন, হস্ত ও হাত, মেষ ও ভেড়া, পুস্তক ও বই, পত্র ও পাতা ইত্যাদি উভয় রূপেরই ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকলেই একমত, তাহাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা লেখায় মৌখিক ভাষা ব্যবহার করবার একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহারা যতই বলুন না কেন 'আমরা যে ভাষা মুখে মুখে বলি তাই book-এ book-এ চালাতে চাই', কখনই তাঁহারা স্বরচিত প্রবন্ধাদিতে হস্ত মেষাদি অমৌখিক শব্দের হাত এড়াইতে পারেন না; আবার, যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে বসিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পালন করিতে চাহেন, তাঁহারা 'হাত', 'ভেড়া' প্রভৃতি মানিয়া লইয়াও সন্ধি সমাসে এই সকল শব্দ লইয়া বিপদে পড়েন।

কথা কহিবার সময় মুখে আমরা সকলেই গাছ, পাথর, ঘর, বাড়ী, গরু, বাঘ, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি বলিয়া থাকি; কখনও বৃক্ষ, প্রস্তর, কক্ষ, বাটী, গো, ব্যাঘ্র, সর্প, ভেক অথবা এ গুলির কোন আভিধানিক প্রতিশব্দ প্রয়োগ করি না। যাঁহারা শিক্ষিত এবং কথাবার্ত্তায় বাছিয়া বাছিয়া শব্দ ব্যবহার করেন, তাঁহারাও না। ক্রিয়াপদেও সেইরূপ আমরা কথোপকথনকালে কাঁদা, বাঁধা, দেখা, শুনা, ওঠা, পড়া ব্যতীত কখনও ক্রন্দন, বন্ধন, দর্শন, শ্রবণ, উত্থান, পতন বলি না। বিশেষণ এবং অন্যান্য পদেরও এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা মুখের কথা ও সাহিত্যের ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা কি বলিতে চান যে এই সকল শব্দ-দ্বন্দ্বের সংস্কৃত রূপগুলিকে ভাষা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে হইবে? নহিলে তাঁহাদের মতের সহিত কার্য্যের সঙ্গতি রক্ষা হয় কই? তাঁহাদের মত তাঁহারা নিজেরাই যে মানিতে পারেন না, তাহা এই শ্রেণীর লেখকদের যে কোন রচনা হইতে দেখাইতে পারা যায়। উদাহরণস্বরূপ বর্ত্তমান বর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যা 'সবুজপত্রে' উক্ত পত্রের সম্পাদক 'হিন্দুসঙ্গীত' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই প্রবন্ধটি তথাকথিত মৌখিক ভাষায় লিখিত। কিন্তু আরম্ভেই দেখি, দুইটি ছত্রে 'প্রবন্ধ যুগল' ও 'ঈষৎ' এই দুই অমৌখিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাতা উল্টাইয়া যাইতে থাকিলে, প্রতি পৃষ্ঠাতেই বড় বড় সংস্কৃত শব্দ চোখে পড়িবে; যথা, অশিক্ষিতপটুত্ব, প্রাক্তন, উদ্গীর্ণ, পরিচ্ছিন্ন, পূর্ব্বাচার্য্য, অদ্যাবধি, আলাপাদি বিহীন, আলাপনিবদ্ধ, ইত্যাদি। শুধু 'বিদ্যা' 'জন্য' প্রভৃতি শব্দগুলির স্থলে 'বিদ্যে' 'জন্যে' ইত্যাদি লিখিলেই এবং ক্রিয়াপদগুলিকে মুড়াইয়া হাড়গোড় ভাঙ্গা চলিত পদের উপর ভাষাকে দাঁড় করাইলেই কি মৌখিক ভাষা হয়?

সুতরাং এই মতের বিশেষ কোন মূল্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। শুধু তাহাই নহে। ইহাতে প্রাদেশিকতার বিলক্ষণ প্রশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা থাকায়, এই মতের প্রচলন সাহিত্যের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়াই আমরা মনে করি। কিন্তু ইহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। যে কথা বলিতে এই ক্ষুদ্র আলোচনার অবতারণা করিয়াছি তাহা সংক্ষেপতঃ এই যে, আমাদের ভাষায় অধিকাংশ শব্দের দুইটি করিয়া রূপ আছে, একটি সংস্কৃত, অপরটি হয় প্রাকৃতোৎপন্ন, নয় ভাষান্তর হইতে গৃহীত। এই দুয়ের একটি রাখিয়া অপরটি ত্যাগ করিতে পারা যায় না। এতদুভয়ের উপরই সাহিত্যিক ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে।

দেখা গেল যে, শুধু কথিত ভাষায় প্রবন্ধাদি রচনা সম্ভবপর নহে। সম্ভবপর হইলেও, তাহাতে ভাষার

মাধুর্য্য বা গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইতে পারে না। সকল দেশেই কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে একটা ব্যবধান থাকে। সাহিত্যের ভাষায় প্রয়োজন মত সকল প্রকার শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। এ কথা যাঁহারা মূলতঃ স্বীকার করিয়া লন, তাঁহাদের মধ্যেও একশ্রেণীর লেখকের ধারণা, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা, সুতরাং ইহা সংস্কৃতের সন্ধি সমাসাদির নিয়ম মানিতে বাধ্য। ইহাঁরা যতদূর সম্ভব মৌখিক শব্দের পরিবর্ত্তে আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিতে চেষ্টিত হন। কেহ কেহ নিরুপায় হইয়া যখন খুব সাধারণ দু'একটি চলিত শব্দ গ্রহণ করিয়া ফেলেন, তখন এই সকল অপাংক্তেয় অন্ত্যজ শব্দগুলিকে কোটেশন-গণ্ডীর মধ্যে বসাইয়া সাধু ভাষার মান ও বিশুদ্ধি রক্ষা করেন। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে যাঁহাদের ধারণা এইরূপ, তাঁহাদের লিখিত ভাষায় হয়ত আর সব গুণই থাকিবে, কেবল তাহা ঠিক বাঙ্গালা কিনা সে সম্বন্ধে একটু সন্দেহের উদয় হইবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা দিতে হয়। ইহা অধুনা অন্যতম অবশ্যগ্রহণীয় বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা রচনার আদর্শ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কি মত তাহা আজ পর্য্যন্ত আমরা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রশ্নপত্রে যখন দেখি, রবীন্দ্রনাথের ভাষাও ছাত্রদিগকে শুদ্ধ বা Elegant করিতে বলা হয়, তখন স্কুল কলেজে ভাষা শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আমাদিগকে হতাশ হইতে হয়।

আমরা যখন মাতৃভাষা লইয়া এইরূপ কাণ্ড করিতেছি, তখন বিদেশী আমাদের ভাষা কোন্ প্রণালীতে লিখিতেছে তাহা দেখা যাক্! বীম্স্ তাঁহার স্বরচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণে অক্ষর ও শব্দের মৌখিক উচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া, চলিত প্রয়োগ সমূহের নিয়মাবলী আবিষ্কার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এবং বাঙ্গালার লেখকগণ ভাষাকে অনাবশ্যকরূপে সংস্কৃতানুসারিণী করিয়া তুলিতেছেন, এই কথা বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালার অধ্যাপক অ্যাণ্ডার্সন সাহেব কয়েকবৎসর পূর্ব্বে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় 'একটি প্রবন্ধে আমাদের ভাষার বিশেষত্বসূচক ও ভাবব্যঞ্জক কতকগুলি চলিত প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছিলেন। (তন্মধ্যে 'যারপর নাই' একটি) তিনি বলেন, এই সকল প্রয়োগে বাঙ্গালার যেরূপ ভাবপ্রকাশের সহায়তা হয়, অন্য কোনরূপ উপায়ে তাহা হয় না। আমাদেরও তাহাই মত। কিন্তু সংস্কৃতপণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই 'যারপর নাই' প্রভৃতির স্থলে 'যৎপরোনাস্তি' প্রভৃতির প্রতি অকারণ পক্ষপাতিতা দেখাইয়া, যারপর নাই গোঁড়ামির পরিচয় দিবেন।

ছাত্রদের জন্য যে সকল ব্যাকরণ বা রচনা-প্রণালীর পুস্তক লিখিত হয়, তাহা সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণই খুব বেশী রকম অনুসরণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় এই শ্রেণীর পুস্তকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। কিন্তু প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ একখানিও আমাদের চোখে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমরা কেন বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখি, আমাদের কোন শিক্ষিত লোককেও বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া যায় কেন, এসব কথা ভাবিয়া দেখিলে নিজেদের উপর ধিক্কার জন্মে।" এখনও আমরা ব্যাকরণ সম্বন্ধে 'যে আঁধারে সেই আঁধারেই' আছি। তবে সুখের বিষয় এই, সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়-লিখিত 'বাঙ্গলাভাষা' নামক ব্যাকরণ সম্বলিত যে পুস্তক সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত করিয়াছেন; তাহা আমাদের ভাষা সম্বন্ধে সত্যই একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক হইয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতে বসিয়া যাঁহারা সংস্কৃতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, তাঁহারা সম্প্রতি ভাষার উপর এক নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি করিতেছেন। প্রচলিত শব্দাবলীর মধ্যে যেগুলি তাঁহাদের নিকট অশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, সেগুলির এক দীর্ঘ তালিকা দিয়া তাঁহারা তৎপার্শ্বে সংশোধিত শব্দের এক তালিকা দিয়া থাকেন। এই শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারের ফলে অনেক সম্পূর্ণ

শুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দের যে দুর্দ্দশা হয়, তাহার একটু নমুনা এখানে না দিলে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে না। তালিকাটি এইরূপ :—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনান্তর	মতান্তর বা মনোহন্তর
সক্ষম	সমর্থ
পর্যাটক	পর্য্যাটক
সশঙ্কিত	শঙ্কিত

ইত্যাদি।

মনান্তর অশুদ্ধ হইল কেন এবং সেই অর্থে 'মতান্তর' কিরূপে চলিতে পারে, তাহা বোধ হয় এই শ্রেণীর লেখক ও গ্রন্থকার ব্যতীত আর কেহ বলিতে পারেন না। দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ভিন্নার্থজ্ঞাপক শব্দের একটি অশুদ্ধ বিবেচিত হইবার কারণ বোধ হয় এই যে, এই শ্রেণীর সংস্কৃতপণ্ডিতদের ধারণা মনস্, তেজস্, তপস্, চক্ষুস্ প্রভৃতি সংস্কৃত অস্ ও উস্‌ভাগান্ত শব্দগুলি বাঙ্গালাতেও সর্ব্বদা সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিবে—বিশেষতঃ সন্ধি ও সমাসে; এবং যেমন মনোহর, মনশ্চক্ষুঃ প্রভৃতি পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেইরূপ হয় লুপ্ত অকার দিয়া মনোহন্তর কর, নয় মতান্তর রাখ, এই কথা তাঁহারা বলিতে চাহেন। কিন্তু ইহা কি অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা নহে? বাঙ্গালার এই সকল বিসর্গান্ত শব্দের বিসর্গ খসিয়া গিয়া যে এক একটি স্বতন্ত্র রূপ হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? প্রকৃত পক্ষে, এখানেও আমরা পাশাপাশি দুইটি করিয়া রূপ পাইতেছি। সংস্কৃতঃরূপটির উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় করা হয়, যথা, মনস্বী, তেজস্বী, চক্ষুষ্মান্ ইত্যাদি। কিন্তু সমাসের বেলায় এরূপ কেন বাঁধাধরা নিয়ম খাটে না; সুবিধামত উভয়রূপই গ্রহণ করিতে হয়। কাজেই, একদিকে যেমন মনোরথ, মহামনা, তেজঃপুঞ্জ, তেজোহীন, চক্ষুর্দ্বয়, চক্ষুরুন্মেষ প্রভৃতি সমাসবদ্ধ পদ পাওয়া যাইতেছে, অপরদিকে তেমনই আবার মনান্তর, মনসাধ, তেজশালী, নিস্তেজ, চক্ষুহীন, প্রভৃতি বিসর্গহীন সমাসে সংস্কৃতপণ্ডিতদের আপত্তি করিলে চলিবে না। আমরা 'মনোসাধ' লিখিয়া 'ব্যাকরণকে কাঁদাইতে' চাহি না; কিন্তু তাই বলিয়া মনঃসাধ লিখিতে পারিব না।

এইরূপ সক্ষম, সশঙ্কিত প্রভৃতি শব্দ অশুদ্ধ বলিয়া বরখাস্ত করিবার কারণ নাই। শুধু তাহাই নহে। 'সশঙ্কিত' বলিয়া আমরা যে ভাব প্রকাশ করি, তাহা 'শঙ্কিত' শব্দে ব্যক্ত হয় না। কিন্তু তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও ছাত্রদিগকে বহুবার এই সকল শব্দ সংশোধন করিতে দেওয়া হইয়াছে দেখিয়াছি। সুতরাং সংস্কৃতপণ্ডিতদের বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই সকল শব্দের গোড়ার 'স' সোদর, সবান্ধব প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত 'সহস্য সাদেশঃ' নয়, কিন্তু উত্তম, অত্যন্ত, বিশেষরূপে ইত্যাদি অর্থবাঞ্জক, একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অব্যয় 'সু'র বিকৃতরূপ; অর্থাৎ 'সক্ষম' 'সশঙ্কিত' প্রকৃত পক্ষে 'সুক্ষম (বিশেষরূপে ক্ষম বা সমর্থ)। 'সুশঙ্কিত' (বিলক্ষণ শঙ্কিত)। 'সঠিক' শব্দও এই জাতীয়। যোগেশ বাবুও তাঁহার 'বাঙ্গলা ভাষা' নামক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থের 'ব্যাকরণ খণ্ডে' বক্ষ্যমান পদগুলি উক্তরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এবং ইহাতে দোষ ধরিবার কিছুই দেখিতে পাই না। সুপণ্ডিত, সুকঠিন প্রভৃতিতে সংস্কৃত 'সু' অবিকৃত আছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতেছি, একই উপসর্গ অব্যয়ের দুটি রূপ, সংস্কৃত সু ও তাহার বাঙ্গালা অপভ্রংশ, পাশাপাশি রহিয়াছে।

এইরূপ উদাহরণ আরও দিতে পারা যায়। সংস্কৃতের অভাব বা বিরুদ্ধবোধক উপসর্গ 'অ' বাঙ্গলাতে কোন কোন স্থলে 'আ' হইয়াছে। একদিকে যেমন অচেনা, অজানা প্রভৃতি শব্দে সংস্কৃত উপসর্গ অক্ষুণ্ণ আছে, অপরদিকে তেমনই আবার আধোয়া, আমাজা প্রভৃতিতে ইহার বিকৃতি ঘটিয়াছে। কেহই বলিতে পারে না যে, ইহা সংস্কৃত ঈষদর্থজ্ঞাপক 'আ' উপসর্গ। তদ্রূপ সক্ষম প্রভৃতি শব্দের 'স' ও সহার্থবাচক নহে।

কিছুদিন হইতে দেখিতেছি, কেহ কেহ 'কায' 'ইতঃপূর্ব্বে', 'ইতোমধ্যে' লিখিতে সুরু করিয়াছেন;

এবং উপরে যে সকল আধুনিক ব্যাকরণের কথা উল্লেখ করিয়াছি সে সব পুস্তকেও 'কাজ', 'ইতিপূর্ব্বে' 'ইতিমধ্যে' অশুদ্ধ শব্দের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু 'কাজ' প্রাকৃত 'কজ্জ' হইতে উৎপন্ন, সংস্কৃত কার্য্য হইতে নহে। সংস্কৃতের 'য' প্রাকৃতে প্রায়ই 'জ' হইয়াছে। উচ্চারণ-বৈষম্যই যে ইহার কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'উত্তরচরিতে' সীতা রামচন্দ্রকে 'অজ্জউত্ত' (আর্য্যপুত্র) বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। 'শয্যা'র প্রাকৃতরূপ শেজ; বাঙ্গালাও তাহাই। উদাহরণ, চণ্ডীদাসে 'বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু।' আমরা আধুনিক বাঙ্গালায় যখন শয্যার অপভ্রংশ 'শেয' লিখি না, 'শেজ'ই লিখি, তখন কার্য্যের কথিতরূপ 'কায', কেন হইবে? ইতিপূর্ব্বে, ইতিমধ্যে প্রভৃতি শব্দের 'ইতি' সংস্কৃত 'ইতঃ'র অপভ্রংশ ধরিয়া লইলে ক্ষতি কি? মোট কথা, আমরা পণ্ডিতি ধরণে ইতঃপূর্ব্বে, ইতোমধ্যে বলিতে বা লিখিতে পারি না। যদি চলিত বাঙ্গালা শব্দগুলিকে এইরূপ একদিক হইতে সংশোধিত বা সংস্কৃত করিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে 'পর্য্যটক' 'সৃজন' প্রভৃতি শব্দগুলির নির্ব্বাসন ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের স্থলে 'পর্য্যাটক,' সর্জ্জন প্রভৃতি আনিয়া বসাইতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে ভাষার শ্রাদ্ধ এখনও যখন এতদূর গড়ায় নাই, তখন মিছামিছি মৃত শব্দসমূহের 'ভূত'গুলাকে ডাকিয়া আনিয়া উপদ্রবের সৃষ্টি করায় লাভ কি?

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

যুদ্ধবিমান ও আকাশ রক্ষা

বহুদিন ধরিয়া মানব আকাশমার্গে পক্ষীর বিচরণ দেখিয়া মোহিত হইয়া তাহার ন্যায় উড়িবার কত যে চেষ্টা করিয়াছে তাহা বলা যায় না। আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতে আকাশ ভ্রমণ, আকাশ যুদ্ধ আকাশবিহার প্রভৃতি ব্যোমযানে নানাপ্রকার পরিক্রমণের ব্যাপার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সে সকল দিন এখন আর নাই, সে সমস্ত ব্যাপার এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তা না হইলে আজ আমরা ইউরোপের বিমান (Aeroplanes) দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম না। পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ কেবল যে উড়িবার কল্পনা করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা বিমানের দ্বারা স্বর্গলোক জয় করিয়া পক্ষীর ন্যায় অবাধে বেড়াইবার উপায় করিয়াছেন।

দুই প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে বিহার করিবার উপায় হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটী Heavier than air "অর্থাৎ বায়ু অপেক্ষা ভারি" এবং দ্বিতীয়টী Lighter than air অর্থাৎ "বায়ু অপেক্ষা হাল্কা।" বায়ু অপেক্ষা হালকা অর্থাৎ বেলুনের কথা আলোচনা করা অনাবশ্যক, কারণ, স্কুলের ছোট ছোট ছেলে অবধি জানে যে জল অথবা বায়ু অপেক্ষা যাহা লঘুতর, তাহার জলে বা বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে।

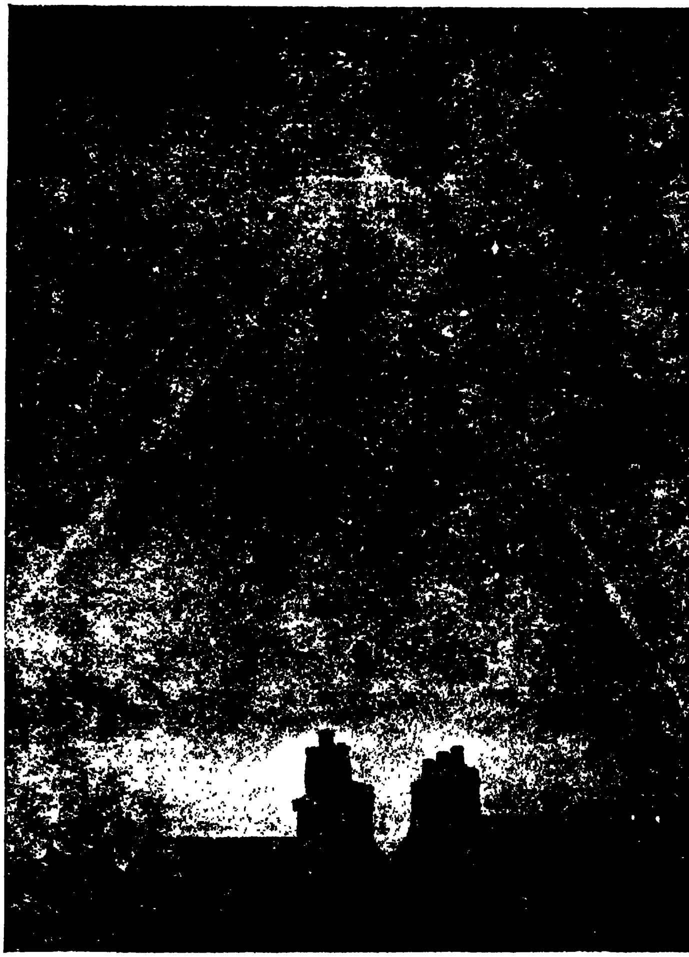
কিন্তু Heavier than air অর্থাৎ হাওয়া হইতে ভারি জিনিষ কিরূপে হাওয়ায় উড়িয়া বেড়ায়? অর্থাৎ আমাদের জিজ্ঞাসা, কি principle এর উপর নির্ভর করিয়া এয়ারোপ্লেন তৈয়ারি করা হইয়াছে? ঘুড়ি কিংবা পাখী বায়ু অপেক্ষা ভারি, কিন্তু যে উপায়ে তাহারা উড়িয়া বেড়ায়, বায়ু-যানগুলিকেও সেই উপায়েই উড়ান হয়।

বর্ত্তমান সময়ে নানাপ্রকার বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। সেগুলি নানাপ্রকার নামে অভিহিত যথা—Biplane, Monoplane, Triplane, Hydroplane, Zeppelin ইত্যাদি।

বর্ত্তমান যুদ্ধে জর্ম্মান জেপলিনগুলি ইংলণ্ড আক্রমণ

করিতে আসিয়া অনেক সময়ে বিপদে পড়িয়াছে, অর্থাৎ anti-aircraft কামান প্রভৃতির দ্বারা Zeppelin-এর জীবন-সংশয় হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, কি উপায়ে জেপলিনের আক্রমণ ব্যর্থ কার্য্য হইবে, শান্তির সময় তাহার পরীক্ষা লওয়া সম্ভব হয় নাই, কেবল অনুমানের দ্বারা ইহার কার্য্য-প্রণালী স্থির করা হইয়াছে। প্রকৃত সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে বিপদমণ্ডল (danger zones) কিংবা anti-air craft অস্ত্রসমূহের কার্য্যকারিতার সীমা জানা যায় না। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কত চলিতে পারে? কাজেই আকাশের বিমানবল, নৌবলের ন্যায় দাঁড়াইয়াছে। নৌযুদ্ধ ব্যাপারে কতক-গুলি পুরাতন জাহাজকে তোপ দিয়া, কামানের ও গোলার বল পরীক্ষা করা হয়; কিন্তু ইহাতে আসলে যে বিশেষ ফললাভ হয় তাহা বলা যায় না। সন্দেহ খানিকটা থাকিয়াই যায়। আকাশে যুদ্ধ-বিমানের পরীক্ষা ব্যাপার অধিকতর সন্দেহসঙ্কুল। একটা যুদ্ধ বিমানকে আকাশে পাঠাইয়া, তাহাকে নিম্ন হইতে গোলা করিয়া পরীক্ষা করা যায় না। চালনীয় (dirigible) বিমান লইয়াও এবম্প্রকার পরীক্ষা অসম্ভব। যুদ্ধের সময় কিরূপ ভাবে বিমান ধ্বংস করা যাইতে পারে, তাহা দেখিবার জন্য Captive Balloons গুলিকে আকাশের নানা স্থানে রাখিয়া নানা প্রকারে গোলা ছুড়িয়া পরীক্ষা লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ সকল পরীক্ষা কোন কাজের হয় নাই। তাহার কারণ, সে পরীক্ষাগুলি বাতাস ও আলোকের অনুকূল অবস্থায় সম্পাদিত।

যুদ্ধবিমান এত দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে লাগিল যে, তাহাতে anti-aircraft measures না লইলে আর উপায় রহিল না; তাই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উপযোগী নানা প্রকার কামান নির্ম্মিত হইল। সেগুলির আকার অতি ভয়ানক হইলেও, কার্য্যতঃ তেমন ফলপ্রদ হয় নাই।



আকাশ হইতে নৈশ আক্রমণ

যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন এই বিমান-ধ্বংসকারী যন্ত্রগুলি, যাহা কত কষ্ট ও অধ্যবসায়ের ফলে নির্ম্মিত হইয়াছিল, নিরর্থক ও অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ইলণ্ড ও ফ্রান্সের গ্রাম ও নগর সকল

আকাশ-বিহারী জর্ম্মাণ যুদ্ধ-বিমানের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইংরাজ ও ফরাসীকে নগর ও উপনগর সকল রক্ষার উপায় করিতে হইয়াছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ির নিমিত্ত অনেক উপায়ই পণ্ড হইয়াছে। নিম্ন হইতে আকাশবিহারী-যুদ্ধ-বিমানকে নিশানা করা বড় কঠিন। তা ছাড়া, সব স্থানে আবশ্যকমত কামানেরও অত্যন্ত অভাব ছিল। প্রথম প্রথম শত্রুর বিমানকে ভয় দেখাইবার জন্য কামান রাখা হইত, কাককে যেমন বন্দুক দেখাইয়া ভয় দেখান হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ।

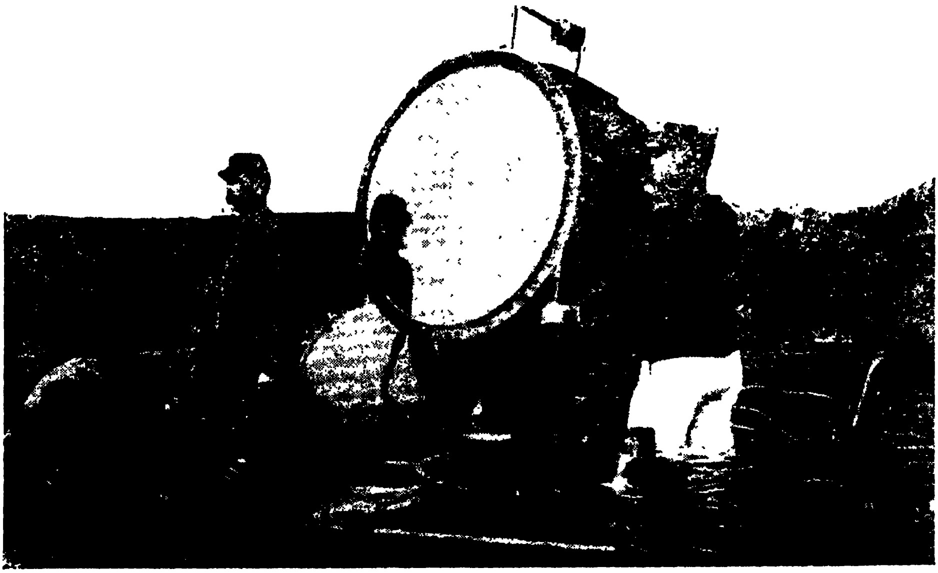
জর্ম্মাণগণ প্যারিস ও লণ্ডন নগরীদ্বয়কে নষ্ট করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আকাশমার্গ হইতে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে যুদ্ধের ব্যাপারে তাহাদের বিশেষ কোনও লাভ হয় নাই, তবে নিরস্ত্র প্রজা ও তাহার সম্পত্তি নষ্ট করাই উদ্দেশ্য। ফরাসীগণ প্রথমেই তাহা বুঝিয়াছিলেন। জেপলিনগুলি প্রথম প্রথম প্যারিস্ অরক্ষিত দেখিয়া, কুহেলিকা-আবৃত আকাশ হইতে ইহাকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিত। এই সময় হইতে প্যারিসে আকাশ-রক্ষার আয়োজন আরম্ভ হইল। বর্ত্তমান ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, প্যারিসের আকাশ প্রদেশ অনেকটা নিরাপদ হইয়াছে।

প্রথমতঃ কোন আক্রমণের উদ্‌যোগ হইলে সেই সংবাদ অবিলম্বে রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিবার ব্যবস্থা হইয়াছে—যাহাতে প্রজাসাধারণ সতর্ক হইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন একটি জেপলিন প্যারিসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন এই সংবাদ লা ফার্টে মিলঁ হইতে প্যারিসে পৌঁছে। এ সময়ে আকাশে বায়ুপ্রবাহ না থাকায় শত্রুবিমানখানি প্রায় প্রতি ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে আগমন করিতেছিল। যেখানে প্রথম উহা দেখা গেল, সেখান হইতে প্যারিসে পৌঁছিতে ৪০ মিনিটের অধিক লাগিবে না। অমনি প্যারিসে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল। এই অল্প [illegible] আত্মরক্ষী ফরাসী বিমানগুলি আকাশে উপস্থিত হইয়া এত জেপলিনকে ভয় [illegible] কুয়াসায় আবৃত থাকায় জেপলিন কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইল। কতকগুলা বোমা ফেলিয়া, বোঁ করিয়া উচ্চে উঠিয়া গেল। জেপলিন যত উচ্চে উঠিয়া উড়িতে পারে, তত আর অন্য কোনও বায়ুযান পারে না। ইহাই জেপলিনের বিশেষত্ব।



প্যারিসের নিকট একটি কর্ণযন্ত্র

ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ এমন কতকগুলি সুন্দর ও সহজ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন যদ্দ্বারা শত্রুর যুদ্ধ বিমানগুলির গতিবিধি অনায়াসে নির্ণয় করা যায়। এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা স্থানে স্থানে Postes d'ecoute অর্থাৎ কৃত্রিম কর্ণের স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে মাইক্রোফোন যন্ত্র সংযুক্ত আছে। আকৃতিতে এগুলি বড় mega-



রাত্রিকালে আকাশমার্গে "সার্চ্চ-লাইট' ফেলিয়া শত্রুবিমান অনুসন্ধান করা হইতেছে

phone কিংবা syren-এর মত দেখায় এবং যেদিকে ইচ্ছা ঘোরান ফেরান যায়।

এই শ্রবণকারী স্তম্ভগুলি (aerial listening-posts) টেলিফোনের তারের সঙ্গে সংযুক্ত। একজন এই যন্ত্র কানে লাগাইয়া বসিয়া থাকেন। অতি সামান্য শব্দ শুনিতে পাইলেই, উহা কোন দিক হইতে আসিতেছে তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম কর্ণগুলি ঘুরাইতে ফিরাইতে আরম্ভ করেন। কাণ যেদিকে রাখিলে শব্দটুকু অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হইয়া আসে, তাহাই শব্দ আসিবার প্রকৃত দিক। দিক্‌টা অনুমিত হইবামাত্র নিকটস্থিত অপরাপর দর্শককে জিজ্ঞাসা করেন—"তোমারা শব্দ পাইতেছ কি? কোন দিক্ হইতে আসিতেছে স্থির করিলে?" এইরূপ পরামর্শের দ্বারা শত্রুবিমানের দিক্‌টা নির্ণীত হইলে, অনুমানের সমরেখায় anti-aircraft শিবিরগুলি হইতে গোলা নিক্ষেপ করা হয়। বিমানখানি অদৃশ্য থাকিলেও শব্দানুসারে তাহার স্থান পরিবর্ত্তন অনুমান করিয়া, গোলা নিক্ষেপ করা হয়। সুতরাং আকাশ পরিষ্কার থাকিলেই আত্মরক্ষা সহজে চলে; কিন্তু যদি কুজ্ঝটিকার আবির্ভাব হয়, যন্ত্রের "কাণে" শব্দ আসিলেও, গোলা চালান তেমন সুবিধা হয় না, কারণ চক্ষে না দেখিলে নিশানা খুব ঠিক হয় না। তবে Listening post হইতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহা নির্ভুল এবং বিশ্বাসযোগ্য।

এই "কর্ণ" যন্ত্রের বিশেষ গুণ এই যে, ইহার দ্বারা আকাশবিহারী জাহাজের গতিবিধি জানিতে পারা যায়, দিনে এবং রাত্রে ইহার কার্য্যকারিতার কোনও প্রভেদ হয় না। দর্শকগণ অভ্যাসবলে এই বিদ্যায় এরূপ পারদর্শী হয়েন যে, কিছুকাল শিক্ষার পর, শতপ্রকার অন্য শব্দের মধ্যে হইতেও এয়ারোপ্লেনের এঞ্জিনের "ধুক্ ধুক্", তাহার পাখা ঘুরিবার "হির্ হির্" শব্দগুলি বাছিয়া লইতে পারেন। এই শব্দ ভাল করিয়া ধরিবার জন্য নানা প্রকার পরীক্ষা করা হইয়াছে, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। Microphonesগুলি দ্বারা অনেক দূর হইতে শব্দ শুনা যায়। যদিও বায়ুস্তর ভেদ করিয়া যাইতে যাইতে শব্দের গতি ও প্রকৃতিতে কতক-

গুলি বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে, তথাপি ইহাতে শ্রবণ-যন্ত্রের কার্য্যকারিতা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় না।

ফরাসীদিগের কার্য্যপ্রণালী এক্ষণে এইরূপ—শত্রু-বিমান জনতাপূর্ণ নগরের নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বে, তাহাকে আক্রমণ করা আবশ্যক ; কারণ একটা সাধারণ এয়ারোপ্লেন, নগরের উপর পৌছিলে, তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট পড়িয়া সহরের তাদৃশ ক্ষতি না হইলেও, একখানা বড় জেপলিন ভাঙ্গিয়া পড়িলে সহরের বিস্তর লোকের প্রাণ ও ঘরবাড়ী নষ্ট হইতে পারে। তাই ফরাসীগণ পক্ষের যে সকল জেপলিন বা অন্যবিধ বিমান আক্রমণার্থ আসে, উহারা সচরাচর ১০,০০০ ফিট উচ্চে বিচরণ করিয়া থাকে। আত্মরক্ষী এরোপ্লেনগুলি মাটি হইতে এত উচ্চে উঠিতে চল্লিশ মিনিট লাগে। জেপলিনকে আক্রমণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এয়ারোপ্লেন অপেক্ষা ইহারা অনেক ঊর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ এবং ঊর্দ্ধগতিও অতি দ্রুত ; আক্রমণকারী এয়ারোপ্লেনকে আসিতে দেখিয়া তাহারা অনায়াসে ঊর্দ্ধে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে।



পর্ব্বতোপরি বিমান ধ্বংসকারী কামান-সজ্জা

বলেন, এই সকল বিমানকে সহরের উপর পৌছিবার পূর্ব্বে কিংবা সহর ছাড়িয়া পলায়নের সময়ই আক্রমণ করা সমীচীন—সহরের উপরে উড়িবার কালে নহে। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে কৃত্রিম কর্ণগুলি বিশেষ উপযোগী।

শত্রুবিমানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য, লণ্ডনে ও প্যারিস প্রভৃতি স্থানে আজকাল এয়ারোপ্লেনের রীতিমত পাহারা বসিয়াছে। সময়মত সংবাদ পাইলে আত্মরক্ষী এয়ারোপ্লেনগুলি আকাশে উঠিয়া শত্রু-পক্ষের বিমানকে, আক্রমণ করিতে পারে। শত্রু-যদি বড় বেগতিক দেখে তাহা হইলে বোঝা পরিত্যাগ করিয়া প্রতি মিনিটে ৪৫০০ ফিট গতি-বেগের সহিত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। অলক্ষিতে আসিয়া সহরের উপর বোমা প্রভৃতি ফেলিয়া হু হু শব্দে কোনও গতিকে একবার বারো হাজার ফিট উপরে উঠিতে পারিলেই সে নিরাপদ। কারণ ভূমি হইতে, অথবা এয়ারোপ্লেন যতদূর উঠিতে সমর্থ, সেখান হইতে, কোনও গোলাই আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই গুণে জেপলিন এয়ারোপ্লেন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পলায়নের



লণ্ডন রয়াল নেভাল ডিভিজনের বিমানধ্বংসকারী কামান গাড়ী



প্যারিসের নিকট আকাশরক্ষী সৈন্ত-শিবির

সময় ইহা খাড়া হইয়া উপরে উঠিয়া পশ্চাদ্ধাবনকারী এয়ারোপ্লেনের উপর বোমা নিক্ষেপ করে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে তাই জেপলিনকে আঁটিয়া উঠা বড় দায়। সুবিধা বুঝিয়া জেপলিনগুলিও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিতেছে। নূতন নূতন জেপলিনে দুই হাজার হইতে তিন হাজার পাউণ্ড ওজনের যুদ্ধোপকরণ থাকে। এক একটী আগুন-বোমার ওজনই ৮০ হইতে ১০০ পাউণ্ড; তদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার মারাত্মক বিস্ফোটক বোমা থাকে। শেষোক্ত বোমাগুলি ভয়ানক ক্ষতিকারক, তবে খোলা যায়গায়, যথা বাগানে কিংবা রাস্তায় পড়িলে তত ক্ষতি হয় না। কিছুর উপর পড়িয়া ঠোকা পাইলেই সর্ব্বনাশ! একবার এইরূপ একটা বোমা একখানি পাঁচতালা বাড়ীর উপর পড়িয়া, ক্ষণমধ্যে তাহাকে ধূলিতে পরিণত করিয়াছিল। খালি জায়গায় পড়িলে, বড় একটা গর্ত্ত করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে।

বোমাগুলি অনেক উচ্চ স্থান হইতে ছাড়িলেই অগ্নি সংযুক্ত হয় না, তাহারা অনেকটা অগ্রসর হইলে তবে তাহাতে আগুন ধরে। ৫০০০ ফিট হইতে ঐরূপ একটি বোমাকে নিক্ষেপ করিলে উহা মিনিটে ৫৫০ ফিট বেগে পড়িতে থাকে।

জেপলিনের এই পলায়নের ক্ষমতা দেখিয়া মনে হয় ইহাকে পরাস্ত করা বিষম ব্যাপার। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ক্রমাগত গোলা ছোড়া ভিন্ন ইহাকে জব্দ করার আর কোনও উপায় নাই। মেশিন গনের গোলা কিংবা শার্পনেল-আঘাতও বিশেষ ফলদায়ক নহে। কোন এয়ারোপ্লেন হইতে এই মেশিন-গন ছাড়িলে, জেপলিনের গাত্রে কেবল গোটাকত ছিদ্র করিতে পারে। এই ছিদ্রের দ্বারা জেপলিনের বিশেষ ক্ষতি হয় না; সামান্য গ্যাস নির্গত হইয়া যায় মাত্র। জেপলিনগুলি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে ইহার gas chamber গুলি ছোট ছোট ও স্বতন্ত্র। প্রত্যেকটীতে স্বতন্ত্রভাবে হাইড্রোজেন-গ্যাসপূর্ণ বেলুন ভরা থাকে। একটা অংশে ছিদ্র হইলে অপর অংশের গ্যাস বাহির হয় না।



প্যারিসের নিকট অন্য একটি আকাশরক্ষী-সৈন্যশিবির

যখন কোন একটি জেপলিন মহাবেগে পলাইয়া যাইতেছে, তখন ইহার গাত্রে শত শত ছিদ্র করিয়া দিলেও কোন ক্ষতি হয় না; ইহা ধীরে ধীরে আপনার গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারে। তবে যদি এক ঝাঁক এয়ারোপ্লেন ইহার সর্ব্বাঙ্গে চতুর্দ্দিকে গুলি দিয়া ছেঁদা করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে ইহা থামিয়া যায় এবং মাধ্যাকর্ষণ বলে সবেগে নিম্নদেশে অবতরণ করিতে থাকে। শীঘ্রই মাটীতে পড়িয়া চুরমার হইয়া যায়।

মেসিন গনের গুলিতে জেপলিনের গ্যাস চেম্বারে ফুটা করিয়া উহার বিশেষ ক্ষতি করিতে না পারিলেও, পরোক্ষভাবে ইহার বিপদ ঘনীভূত হয়। ইহার নাবিকগণ সকলেই ভীত হইয়া পড়ে এবং নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া বিপদের মুখে অগ্রসর হয়। উহার পাখায় কোন গতিকে যদি গুলি লাগে অথবা এঞ্জিন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তবে বিমানখানি সামান্য বেলুনের ন্যায় বায়ুলের ক্রীড়নক হইয়া যায়। গুলিতে জেপলিনের হাইড্রোজেন চেম্বার ছিন্ন হইয়া, বহির্মুখ গ্যাসের সহিত কোন রকমে যদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শ হয়, তাহা হইলে চকিতের মধ্যে মহানিনাদে এঞ্জিনগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া যায়।



এই বেলুন আকাশে উঠিয়া শত্রুর যুদ্ধবিমান পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে

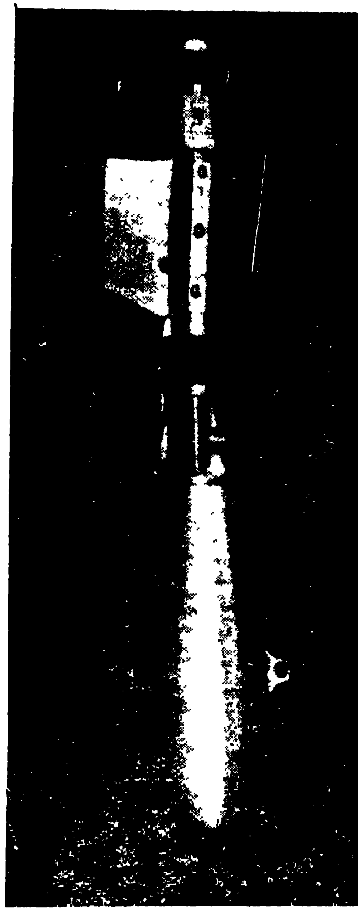
ঊর্দ্ধ হইতে আক্রমণেই জেপলিনের বেশী বিপদ; পার্শ্ব কিম্বা নিম্নস্থিত স্থান হইতে গোলানিক্ষেপও (bombardment) ইহার তেমন ক্ষতি করিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, উপরের অংশে ছেঁদা হইলে বেলুনের সমস্ত গ্যাস অতি সত্বর বাহির হইয়া পড়ে।

বিমান ধ্বংসকার্য্যে Anti-aircraft কামানের কার্য্যকারিতা কিরূপ, বিপক্ষগণের হতাহতের তালিকা পাঠ করিলেই জানা যায়। এয়ারোপ্লেন হইতে আকাশযুদ্ধে কতগুলির মৃত্যু ঘটে সন্দেহ নাই কিন্তু অধিকাংশের মৃত্যু ভূমি হইতেই সাধিত হইয়া থাকে। আজকাল আকাশরক্ষা-প্রণালী রীতিমত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক সারি মাত্র কামানের দ্বারা আকাশমণ্ডল রক্ষিত হয় না, কারণ ইহাতে অনেক স্থান বাদ পড়িয়া যায়। তিন বা চারি সারি কামান এমন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখা হয় যে, নভোদেশের অনেকটা স্থানের সর্ব্বাংশে প্রচুর পরিমাণ গোলা গিয়া পৌছিতে পারে। শত্রুপক্ষীয়েরা এইরূপ

নভোপ্রদেশকে বিপদমণ্ডল (danger zone) কহিয়া থাকে। এই মণ্ডলের মধ্যে তাহাদের বিমান আসিতে সাহস করে না, তবে জেপ্‌লিন্ হইলে, তাহার অনেক উপরে উড়িয়া বেড়াইতে পারে। তাহা করিতে হইলে অনেক গোলাগুলি ফেলিয়া দিয়া জেপ্‌-লিনকে নিজদেহ লঘু করিয়া লইতে হইবে, নচেৎ গুরুভার হেতু উহা সত্বর উপরে উঠিতে পারিবে না, এবং খুব বেশী উচ্চেও উঠিতে অসমর্থ হইবে।

আকাশ রক্ষাকার্য্যে ভূমিস্থিত বড় বড় কামানকে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্তভাবে বসাইলে বিশেষ কার্য্যকর হইয়া থাকে; অবশ্য ইহাদিগকে এয়ারোপ্লেন দ্বারা সাহায্য করিতে হয়। এইরূপে সমবেত শক্তি আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়।

আজকাল কেবল কামান ও গোলার উপর নির্ভর করিয়া কাজ চলিতেছে না। কিছুদিন হইল একপ্রকার আগুন-বোমা (incendiary shell) আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথাস্থানে পৌঁছিয়া ফাটিয়া গিয়া ইহা চতুর্দ্দিকে অগ্নিসৃষ্টি করিয়া থাকে। কতকটা রামায়ণ মহাভারতের অগ্নিবাণ আর কি! এই শেলের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদক দ্রব্য ব্যতীত আরও এক-প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য থাকে যাহাতে শেলটা যথা সময়ে টুকরা টুকরা হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। শেলের সমস্ত ভগ্নাংশগুলি যতদূর অবধি বিস্তৃত হয় আকাশের ততখানি স্থান অগ্নিময় হইয়া উঠে। এই অগ্নিতে শত্রুবিমানের কাঠামো নষ্ট হইয়া যায়, তাহার গ্যাসঘর জ্বলিয়া উঠে এবং এয়ারোপ্লেন হইলে, তাহার পাখা কিংবা তেলের



এই বোমার দ্বারা লেফটেন্যাণ্ট ওয়ার্ণফোর্ড একটি জর্ম্মান জেপলিন ধ্বংস করিয়াছিলেন

বাক্স পুড়িয়া যায়। Aerial torpedo এবং অন্যান্য জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্রও এ মহাযুদ্ধে ব্যবহার হইতেছে। সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া অনাবশ্যক।

শ্রীচুণিলাল মিত্র।

মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ ও ভাষা

কি জড়জগৎ, কি জীবজগৎ,* সর্ব্বত্রই ক্রিয়া ছন্দোময়ী। মানুষের ভাবোচ্ছ্বাসও ছন্দে প্রকাশিত হয়। নিতান্ত অসভ্য জাতিদের মধ্যেও বিজয়োল্লাস, যাহা তাহাদের একমাত্র উল্লাসের বিস[illegible] —তাহাও ছন্দোময় নৃত্যে ও স্বরে প্রকাশিত হইয়া [illegible]। সভ্যজাতিদের মধ্যেও সকল প্রকার ভাবের অভিব্যক্তিতেই, বিশেষতঃ করুণস্বরে ক্রন্দনে, কিম্বা ক্রোধভরে তর্জ্জন-গর্জ্জনে, একটা ছন্দ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। এরূপ হইবারই কথা। ক্রিয়াশীল শক্তির সহিত ক্রিয়াশীল শক্তির বিরোধ ও সংঘর্ষ হইতেই ছন্দের উৎপত্তি।* সৌরজগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের মনোভাবের অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই ঐ নিয়মে ছন্দের উৎপত্তি। মানুষের মনে প্রবল ভাবস্রোত যখন কার্য্যে বা কথায় প্রকাশিত হয়, তখন তাহা ছন্দোনিয়মিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা বাধিত হইয়া, ছন্দেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং ভাবের অভিব্যক্তিতে ছন্দ অনিবার্য্য ও স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক বলিয়াই সুন্দর। সৌন্দর্য্যজনক বলিয়া "ছন্দস্" অর্থে দীপ্তি পাওয়া। ছন্দোবদ্ধ রচনা ভাবকে উজ্জ্বল করে। মাত্রাবিশিষ্ট রচনাই কবিতা এবং বিশেষ বিশেষ মাত্রা, বিশেষ বিশেষ ছন্দ বলিয়া অভিহিত। সঙ্গীতে ও নৃত্যে যাহা "তাল," কবিতায় তাহাই ছন্দ। তাল যেমন সঙ্গীতের ও নৃত্যের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক, ছন্দও তেমনই কবিতার উৎকর্ষক; এমন কি, সুলেখকের হাতে ভাবময়ী গদ্য-রচনাতেও একটা ছন্দ লক্ষিত হয় এবং সেইরূপ গদ্য কবিতার স্বাদবিশিষ্ট ও সুমিষ্ট।

সঙ্গীতাদিতে যেমন মাত্রাই তাল-নির্দ্দেশক, কবিতাতে তেমনই মাত্রাই ছন্দোনির্দ্দেশক। মাত্রাভেদে তাল যেমন নানাবিধ, মাত্রাভেদে কবিতায় ছন্দও তেমনই নানাবিধ। সংস্কৃত কবিতায় মাত্রা উচ্চারণগত অর্থাৎ শব্দোচ্চারণের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে—মাত্রাভেদ এবং মাত্রার বিশেষ বিশেষ সমাবেশ, বিশেষ বিশেষ ছন্দ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং সংস্কৃতে, চরণে চরণে শেষাক্ষরের মিল বা অমিলের সহিত ছন্দের কোন সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ, সংস্কৃত কবিতা "মিত্রাক্ষর" নহে অথচ ছন্দোগুণে কি চমৎকার শ্রবণ-সুখকর!

বাঙ্গালায় "হ্রস্ব-দীর্ঘ" কেবল অক্ষর-গত; উচ্চারণ-গত নয়। সুতরাং বাঙ্গালায় ছন্দও অক্ষরমাত্রিক। উচ্চারণের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতার সহিত বাঙ্গালার প্রায় কোন ছন্দেরই কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল "তোটক" অক্ষরমাত্রিক হইলেও সংস্কৃতানুযায়ী হ্রস্বদীর্ঘ-মাত্রানুসারে নিয়মিত; এবং আরও দুই একটি বাঙ্গলা ছন্দে অক্ষরমাত্রার সহিত উচ্চারণমাত্রাও লক্ষিত হয়। তাহা হইলেও, সাধারণতঃ বাঙ্গালা ছন্দকে অক্ষরমাত্রিকই বলিতে হইবে।

দুই প্রকারে বাঙ্গালায় এই অক্ষরমাত্রিক ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য্য সাধন করা হইয়াছে; যতি স্থাপন করিয়া এবং চরণের শেষে বা যতির শেষে অক্ষরের "মিত্র"তা অর্থাৎ মিল করিয়া। ফলে, বাঙ্গালায় কবিতামাত্রেই মিতাক্ষর, মিত্রাক্ষর এবং নিয়মিত যতি অর্থাৎ বিরাম-বিশিষ্ট। অক্ষরের সংখ্যাভেদে ও যতিভেদে নানাবিধ ছন্দের সৃষ্টি; কিন্তু সর্ব্বত্রই মিত্রাক্ষর।

মিত্রাক্ষর-বিশিষ্ট নানারূপ ছন্দ থাকিলেও, বাঙ্গালায় চতুর্দ্দশাক্ষরী পয়ারেরই আধিপত্য ছিল। বড় বড় কাব্যে ক্বচিৎ রসবিশেষে ত্রিপদী-আদি দ্বারা কিঞ্চিৎ ছন্দোবৈচিত্র্য ঘটান হইত মাত্র। সুতরাং বঙ্গের কাব্য-ভূমি পয়ার-প্লাবিত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পয়ারের প্রসার যখন সকল কাব্যগ্রন্থেই এত বেশী, তখন তাহার নিগূঢ় কারণ অবশ্যই আছে এবং তাহা এই যে, চতুর্দ্দশাক্ষরী মাত্রা ঠিক যেন আমাদের সহজ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাপে গঠিত। উহা পড়িতে সহজ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে খর্ব্ব করিতেও হয় না, দীর্ঘ করিতেও হয় না;

* "Rhythm results wherever there is a conflict of forces not in equilibrium."

—Herbert Spencer.

অর্থাৎ উহার তাল দ্রুতও নহে, বিলম্বিতও নহে ;—উহা সহজ ও স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া, ত্রিপদী, চতুষ্পদী অপেক্ষা ইহাতে মিত্রাক্ষরের জটিলতাও কম ;—দুই চরণে মাত্র। এই জন্য, কি প্রাচীন কি আধুনিক, সকল বাঙ্গালা কাব্যাদিতেই পয়ারের বহুল ব্যবহার লক্ষিত হইয়া থাকে।

আদর্শ মিত্রাক্ষর-পয়ার রচনা করিতে হইলে, ছন্দ সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়—চৌদ্দ অক্ষরে চরণ, চরণদ্বয়ের শেষাংশের উচ্চারণে মিল এবং অষ্টমাক্ষরে যতি অর্থাৎ স্বল্পবিরাম। এই যতি সুশ্রাব্য হইতে হইলে স্বাভাবিক অর্থাৎ শব্দের শেষে হওয়া উচিত। সুতরাং মিত্রাক্ষর-পয়ারে কবির ভাব চারি প্রকার বন্ধনে বন্দী। জেলের কয়েদী, হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী লইয়া যেরূপ ভাবে চলে, তাহাতে একটা ছন্দ নাই বলি না ; তাহাতেও সুন্দর ছন্দ আছে সত্য ; কিন্তু সে ছন্দ স্বাধীন ব্যক্তির চলাফেরার ছন্দ নহে ; তাহা আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক। মিত্রাক্ষরী পয়ারে কবিতাও তদ্রূপ ;—নির্দ্দিষ্ট অক্ষর গণিয়া পা ফেলিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থলে থামিয়া থামিয়া, চরণে চরণে মিল রাখিয়া, একটা সুন্দর ছন্দে চলে বটে ;—কিন্তু আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক। আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক বলিয়াই সুদীর্ঘ পয়ার সজীবতার বৈচিত্র্যহীন একটা একঘেয়ে ব্যাপার। ছোটখাট কবিতায় ভাল লাগিতে পারে ; কিন্তু দীর্ঘ কবিতায় নিদ্রাকর্ষক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "পাখী সব করে রব" ইত্যাদি আদর্শ পয়ার এবং অল্প স্বল্প বলিয়া এমন মিষ্ট লাগে। কিন্তু অল্পস্বল্প না হইয়া, যদি উহা ক্রমাগত চলিত,তাহা হইলে উহার আদর্শত্ব রক্ষা করাও সহজ হইত ন', এবং বৈচিত্র্যহীনতায় উহার মিষ্টত্বেরও হ্রাস হইত। বস্তুতঃ ভাবকে নানাবিধ নিয়মে চালাইতে হইলে, সর্ব্বত্র নিয়ম রক্ষা করা সুকঠিন। যে কোন কাব্য হইতে দীর্ঘব্যাপী পয়ার পড়িলেই দেখা যায়, কোথাও ভ্রষ্ট-মাত্রা, কোথাও ভ্রষ্ট-যতি, কোথাও মধ্যম মিল বা অধম মিল, নয় ত গোঁজামিল। অষ্টমাক্ষরে অথচ একটি শব্দ-শেষে যতিটি হওয়া সব সময়ে সহজ নয়। কাজেই অনেকস্থলে ভ্রষ্ট-যতিযুক্ত পয়ার, ছন্দ বজায় রাখিয়া পড়িতে গেলে "তুমি অন্ন দাকা শীতে" হইয়া দাঁড়ায়।* সুতরাং ছোট কবিতায় মিত্রাক্ষর ভাল লাগিলেও, দীর্ঘব্যাপী রচনায় উহা নানা রকমে ভ্রষ্ট সৌন্দর্য্য হয় এবং শব্দ সম্পন্ন কবির হাতে তাহা না হইলেও, আড়ষ্ট ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কয়েকছত্র অমিত্রাক্ষর কবিতাকে মিত্রাক্ষর পয়ারে পরিবর্ত্তিত করিলেই, মিত্রাক্ষরচ্ছন্দে কবিতা যে কিরূপ আড়ষ্টভাবাপন্ন হয়, তাহা বুঝা যাইবে—

সম্মুখ-সমরে পড়ি বীরবাহু বীর।
অকালেতে যবে গেলা যমের মন্দির॥
কহ দেবী অমৃতভাষিণী সরস্বতি।
কোন্ রক্ষোবীরবরে করি সেনাপতি॥
রাক্ষসাধিপতি পুনঃ পাঠাইলা রণে।
অমর ব্রহ্মার বরে হেন পুত্রধনে॥
কহ কি কৌশলে তারে মারিয়া লক্ষ্মণ।
নিঃশঙ্কিলা দেবেন্দ্রের সশঙ্কিত মন॥
বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি।
আবার ডাকিছে তোমা, হে মাতঃ ভারতি ;
বাল্মীকি মুনিরে দয়া করিলা যেমতি।
রসনায় বসি তার, পদ্মাসন পাতি॥
যবে ক্রৌঞ্চবধূসহ তমসার তীরে।
ত্যজিলা পরাণ ক্রৌঞ্চ নিষাদের তীরে॥
তেমতি দাসের প্রতি দয়া কর, সতি॥
তব পদাম্বুজ-যুগে এ মম মিনতি॥

মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভের কয়েক পংক্তির সহিত উহার ভাব ও ভাষা প্রায় এক হইলেও, মিত্রাক্ষরের বন্ধনে উহা আড়ষ্ট হইয়াছে, স্পষ্টই বুঝা যায়। এই-রূপ আড়ষ্ট ভাব দীর্ঘব্যাপী হইলেই একঘেয়েত্ব অনিবার্য্য।

কবিতাকে এই নিগড়-দায় হইতে মুক্তি দিবার

* "তুমি অন্নদা কাশীতে।"

জন্যই মধুসূদন বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। * সকল দেশের উৎকৃষ্ট কাব্যাদির সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় থাকিলেও, মহাকাব্য-রচনার ছন্দে ও শব্দ-গাম্ভীর্য্যে ইংলণ্ডীয় কবি মিল্টনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি মিল্টনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে ও শব্দ-গাম্ভীর্য্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বাঙ্গালায় ঐ নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, অসামান্য ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, তিনি এ কার্য্য এমন করিয়া সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন যে, আজিও এ ক্ষেত্রে তিনি একেশ্বর ও অদ্বিতীয়।

এখন দেখা যাউক, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষত্ব কিসে?—শুধু বীর বা রৌদ্র রসাদিতে নহে, করুণাদি সকল রসেই উহা যেমন সুন্দর শ্রবণসুখকর, তেমনই রসবর্দ্ধক হইয়াছে কেন? উহাতে মিত্রাক্ষরের মিলের মাধুর্য্য নাই, নিয়মিত যতির ছন্দ-সৌন্দর্য্য নাই, তবুও উহা ভাবোদ্দীপক ও সুমিষ্ট কেন?—

প্রথমতঃ, মধুসূদন যতির খাতিরে কোথাও বাক্যের সঙ্কোচ করেন নাই। তাঁহার কবিতায় দুই চরণেই ভাবটি শেষ করিবার চেষ্টামাত্রও লক্ষিত হয় না। তাহাতে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি কোথাও কোনরূপ বাধা পায় নাই। তাঁহার ভাব ও বাক্য যতির বশে নহে; যতিই তাঁহার ভাব ও বাক্যের বশে। সুতরাং যেখানে ভাব শেষ হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার যতি। একটা কৃত্রিম বন্ধনে ভাব ও ভাষাকে না বাঁধিয়া, ভাব ও ভাষাকে স্বাধীনভাবে চলিতে দেওয়ায়, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর কবিতায় একঘেয়েত্বের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। প্রতি পদেই যতির বৈচিত্র্য। কবি তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই ছন্দ সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন—"I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th, 12th and so on." এখানে "naturally" কথাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাবটি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে যতি হওয়াই "স্বাভাবিক"। পয়ারে নির্দ্দিষ্ট স্থলে যতি স্থাপনের নিয়মে কবিতায় একটা সুন্দর ছন্দ থাকিলেও, অস্বাভাবিকতা আসিয়া পড়ে। ভাবের প্রকাশে স্বাভাবিকতাই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বিশেষত্ব। এই স্বাধীন ছন্দে পদে পদে বৈচিত্র্য আছে বলিয়া দীর্ঘ কবিতাতেও একটা আড়ষ্ট ভাব লক্ষিত হয় না, এবং শুনিতে কর্ণও ক্লান্ত হয় না। সৈন্যগণ যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, নিয়মিত পরিসরবদ্ধ হইয়া, নিয়মিত তালে পা ফেলিয়া চলিয়া যায়, তখন কিয়ৎক্ষণ দেখিতে সুন্দর লাগে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈচিত্র্যহীনতা-বশতঃ তাহা বেশীক্ষণ ধরিয়া দেখিতে হইলে চক্ষুর ক্লান্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মেলায় যখন লোকরাশি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে,—কেহ দ্রুতভাবে, কেহ ধীরে, কেহ হাত নাড়িয়া, কেহ ঘাড় বাঁকাইয়া—নানা লোকে নানা রকমে চলাফেরা করে—লোকরাশির এইরূপ বন্ধনহীন স্বাধীন গতাগতি অনেকক্ষণ দেখিলেও ক্লান্তি-বোধ হয় না। কারণ, ইহাদের চলাফেরা স্বাভাবিক। স্বাভাবিকতায় একটা চমৎকার সৌন্দর্য্য আছে, যাহা কৃত্রিম সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়াকর্ষক। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই স্বাভাবিকতাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। এই স্বাভাবিকতা-গুণেই ইহা

* কবি হেমচন্দ্রের সমালোচক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নিগড় অর্থে চুড়, বলয়াদি অলঙ্কার বুঝিলেন কেন? সকল অভিধানেই ত দেখি, নিগড় অর্থে শৃঙ্খল, বেড়ী ইত্যাদি বন্ধনোপকরণ। বন্ধনে স্বাধীনতা যায়, শোভাও বাড়ে না, বরং কমে। আড়ষ্ট ভাব শোভন নহে। রাজেন্দ্রলালের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিও মিত্রাক্ষরকে "কবিতার নিগড়" এবং উহাকে ভাবের সঙ্কোচক বলিয়াছেন। "সোমপ্রকাশ" সম্পাদক পণ্ডিত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও বলিয়াছেন, "অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতিতে যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনায় তাহা উপযোগী নহে।" (সোমপ্রকাশ, ২৩ শ্রাবণ, ১২৬৭ সাল)।

বীর, রৌদ্র, ভয়ানকাদি রসেও যেমন সেই সেই রসের উৎকর্ষক হইয়াছে, আবার করুণেও এই স্বাভাবিকতা গুণেই উহা তেমনই মর্ম্মস্পর্শী হইয়া, আদর্শ করুণ-রসের সৃষ্টি করিয়াছে। বাস্তবিক, আদর্শ অমিত্রচ্ছন্দের কবিতা স্বাভাবিকতায় ভাবাত্মক গদ্যের ন্যায়, অথচ সঙ্গীতের আস্বাদবিশিষ্ট।

কবি নিজে, যিনি কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য, সকল দেশের সুকাব্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন, এবং সঙ্গীতের আস্বাদও যাঁহাকে মুগ্ধ করিত, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

(Bengali Blank Verse) "if well recited, sounds as much like prose as English Blank Verse sounds like English prose, retaining at the same time a sweet musical impression."

মিত্রাক্ষরী কবিতার ক্রম-পরিণতির দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায় যে, মিত্রাক্ষর ছন্দ, একঘেয়েত্ব নিবারণের নিমিত্ত, শুধু মিত্রাক্ষরতা-মাত্র রক্ষা করিয়া কত রকম বিচিত্র যতিতে, বিচিত্র ছন্দে স্বাধীনতা খুঁজিয়া চলিয়াছে! তাহাতে অক্ষর-মাত্রার কোন নিয়ম নাই; যতিরও কোন নিয়ম নাই। কেবল চরণের শেষে মিল আছে; তাহারও কোন নিয়ম নাই। কাণের সুরে বাঁধা, অথচ ছন্দোময়ী কবিতা, শুনিতেও বেশ মিষ্ট—ছোট ছোট গীতি-কবিতায় একঘেয়ে হইবার সম্ভাবনা নাই,—বেশ লাগে। ইংরাজী গীতি-কবিতাতে এইরূপ বিচিত্র ছন্দের বহুল প্রচলন হইয়াছে—দেখাদেখি আমাদের গীতি-কবিতাতেও এইরূপ অনিয়মিত মিত্রাক্ষর ছন্দ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরাজীর অনুকরণে আর একপ্রকার মিত্রাক্ষর পয়ার প্রচলিত হইয়াছে;—তাহা কতকটা অমিত্রাক্ষরের স্বাদবিশিষ্ট অথচ মিত্রাক্ষর। তাহা চতুর্দ্দশাক্ষরী পয়ার, চরণশেষে মিল আছে; কিন্তু যতি অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায় ভাবানুযায়ী। সুতরাং তাহা আবৃত্তি করিতে, ঠিক অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বাদ পাওয়া যায়; অথচ মিত্রাক্ষর। বলা বাহুল্য, এরূপ কবিতা আবৃত্তিকালে, উহার মিল কাণে তত লাগে না। সুতরাং উহার মিত্রাক্ষরতা তত সার্থক নহে; অথচ এই মিলের জন্য কবিকে কিছু না কিছু বন্ধনে পড়িতে হয়। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, ছন্দের গতি, স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকতার দিকে এবং সেই স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকতা অমিত্রাক্ষর ছন্দে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মিত্রাক্ষরের মিল ও যতির মাধুর্য্যের বিনিময়ে অমিত্রচ্ছন্দের স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকতা ভাবব্যঞ্জনার হিসাবে সমূহ লাভ, ইহা কে না স্বীকার করিবে?

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-ছন্দী কবিতার দ্বিতীয় বিশেষত্ব, তাঁহার অদ্বিতীয় শব্দসম্পদে! উৎসাহ, রাগ, ভয়, বিস্ময়াদি মনোভাব যেমন বিশেষ বিশেষ দৈহিক আড়ম্বরের সহিত প্রকাশিত হয়, কবিতাতে তাহা প্রতিফলিত করিতে হইলে, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, অদ্ভুতাদি রসের প্রকাশে তেমনই তদুচিত বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন। সকল কবিই ইহা বুঝেন। কিন্তু মধুসূদন এ বিষয়ে যেমন মনোযোগী, এমন আর কেহই নহেন। ভারতচন্দ্র কতকগুলি শব্দানুকারী বাক্যের দ্বারা ও দ্রুতগামী ছন্দে "দক্ষযজ্ঞ নাশ" স্বল্পের মধ্যেই সারিয়াছেন; কিন্তু যদি তাঁহাকে আর একটা যজ্ঞ নাশ করিতে হইত, তাহা হইলে শব্দানুকারী বাক্যে কুলাইত কি না, সন্দেহ। মেঘনাদবধ কাব্যে কবিকে নানা স্থানে বীর, রৌদ্রাদি রসের অবতারণা করিতে হইয়াছে। তাহাতে আবার ছন্দোবৈচিত্র নাই। কাজেই তাঁহাকে রসোপযোগী শব্দ চয়ন করিয়া তদ্দ্বারা রসের বিকাশ করিতে হইয়াছে। শব্দ দ্বারাই যখন কবিকে উৎসাহ, রাগ, ভয়, বিস্ময়াদি ভাব সকলকে কবিতায় প্রতিফলিত করিতে হয়, তখন রসোপযোগী শব্দ চয়ন করাই ত কাব্য-শিল্পীর প্রকৃষ্ট পন্থা। মধুসূদন তাহাই করিয়াছেন:—

"——সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,

সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীর-মদে মাতি,
দেবদৈত্যনরত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারি-স্রোতঃ সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণ-যূথ ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজিরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্।" ইত্যাদি

এখানে শব্দগুণে বীরোচিত আয়োজনের এই বর্ণনাটিতে উৎসাহ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে।

"বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে,
স্বর্ণ-ধ্বজ ; ধূমবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে ; বাহিরিল হেষে
তুরঙ্গম ; চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া
চামর, অমর-ত্রাস ; রথীবৃন্দ সহ
উদগ্র, সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূত-বৃন্দ মাঝারে যেমতি
জীমূত-বাহন বজ্রী, ভীম বজ্র করে।
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমা বলী,
অশ্বপতি ; বিড়ালাক্ষ পদাতিক দলে,
মহা ভয়ঙ্কর রক্ষঃ ; দুর্ম্মদ সমরে।"

এখানে বাক্যাড়ম্বরে যুদ্ধায়োজনের শব্দময় আড়ম্বরটি সুন্দর প্রতিফলিত হইয়াছে। যুদ্ধের উৎসাহময় উদ্যোগটী শুধু যে বায়স্কোপের ন্যায় চক্ষের সম্মুখে সজীবভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা নহে ; উহার আনুসঙ্গিক শব্দাড়ম্বরটিও এই শব্দচিত্রে যেন সজীবতা লাভ করিয়াছে—মনে হয় যেন উদ্যোগাড়ম্বরের শব্দটিও যেন কাণে শুনিতেছি। ইহাই ত বাক্যে রসসৃষ্টি,—ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলে মনে যে ভাব হইত, চক্ষু যাহা দেখিত, কর্ণ যাহা শুনিত—বাক্যে তাহাই প্রতিফলিত করা। শব্দাড়ম্বর ব্যতীত এমন আড়ম্বরময় উদ্যোগের কাব্যোচিত বর্ণনা, এমন শব্দচিত্র, আর কিরূপে হইতে পারে ? সরল ভাষা তরল ভাবেরই উপযোগী ; গম্ভীর ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, ভাষাও গাম্ভীর্য্যময় হওয়াই সঙ্গত। শব্দ একটা নির্জীব কাঠের পুতুল নহে, অবহেলার সামগ্রী নহে। উহারও একটা নিজস্ব শক্তি, গুণ ও তদুচিত মর্য্যাদা আছে। নিপুণ শিল্পী সেই শব্দ-শক্তিকে কাজে লাগাইয়া রসোৎকর্ষ সাধন করেন। "গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী" আর "খুব জোরে যেমন মেঘ ডাকে", "দম্ভোলী নিক্ষেপ" আর "বাজ ফেলা", কাব্য-শিল্পে সর্ব্বত্র সমশক্তিসম্পন্ন নহে। ভাবটি যদি অস্পষ্ট গোছের না হয়, আর বাক্যটি যদি নিতান্ত দুর্ব্বোধ না হয়, তাহা হইলে বাক্যাড়ম্বরে ভাবকে কখনই আচ্ছন্ন করিতে পারে না। আবার ভাব যেখানে স্পষ্ট নয়, সেখানে সহজ বাক্যও গাঢ় কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়া থাকে। "কুসুমস্তবক" বলিলেই যে তাহার রূপ, রস, গন্ধ,—সমস্তই আচ্ছন্ন হইয়া গেল, আর "ফুল" বলিলেই যে সব ফুটিয়া উঠিল, ইহা কখনই হইতে পারে না। দুই-ই সমার্থবাচক হইলেও, রসসৃষ্টিতে উহাদের পৃথক স্থান। কোনটিই অবহেলার জিনিস নয় ; অথচ সকল স্থলেই দুইটি নির্ব্বিচারে ব্যবহৃত হইবারও নহে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অমিত্রচ্ছন্দ যথাবিধি আবৃত্তি করিতে না পারায়, প্রথম প্রথম এক শ্রেণীর লোক যেমন এই কাব্যের উপরে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, তেমনই আবার আর এক শ্রেণীর লোক ইহার বাক্যাড়ম্বরে ভীত হইয়া, এই কাব্যখানিকে ঐরূপ বাক্যাড়ম্বরের জন্যই নিন্দা করিয়াছেন; এবং এখনও সেরূপ লোকের একান্ত অভাব নাই। রসবোধ না থাকিলে, কাব্যপাঠে ঐরূপ বিড়ম্বনা হইবারই কথা। ভিন্ন ভিন্ন রসের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কোথা করুণরসের গলদশ্রুলোচন, শিথিলাবনত অঙ্গ ও ক্ষীণস্বর ! আর কোথা রৌদ্র-রসের বজ্রমুষ্টি, রোষ-কষায়িত নেত্র, দীর্ঘায়ত দেহ ও ভীমনাদ ! বাক্যমাত্র যাঁহার সম্বল, তিনি কি একই প্রকার বাক্য দ্বারা এই দুইটি বিভিন্ন প্রকারের ভাবকে মূর্ত্তিমন্ত করিতে পারেন ? কাজেই উপযোগী শব্দের দ্বারাই শব্দচিত্রে বিভিন্ন রস ফুটাইতে হয়। বীর রৌদ্রাদিতে তদুচিত দুঃশ্রব শব্দের দ্বারাই সেই সেই রসের স্বাভাবিক আড়ম্বরময়ী মূর্ত্তিটি ফুটাইয়া তুলিতে হয়। বাক্যে রসমূর্ত্তি-

গঠনে ইহাই স্বাভাবিকতা এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে তাহাই উপদিষ্ট। অলঙ্কারশাস্ত্রমতে বীর-রৌদ্রাদিতে শব্দের "দুঃশ্রবত্ব" গুণ বলিয়া গণ্য।

"রৌদ্রাদৌ তু রসেঽত্যন্তং দুঃশ্রবত্বং গুণো ভবেৎ।"
সাহিত্যদর্পণ।

(টীকা—"আদি শব্দাৎ বীর বীভৎসয়োর্গ্রহণম্।")

বীর, রৌদ্র, অদ্ভুতাদি রসে কবি রসোপযোগী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার কবিতা এমন ওজোগুণান্বিত হইয়াছে এবং অমিত্রচ্ছন্দের স্বাধীনতায় ঐ ওজোগুণ যথেষ্ট পরিপুষ্ট ও প্রসারিত হইতে পারিয়াছে।

আবার দেখুন, যে রসে শব্দাড়ম্বর অশোভন, শব্দাড়ম্বর যে রসকে নষ্ট করে, সেই করুণ ও শান্ত রসে কবির ভাষা কেমন আড়ম্বর-হীন ও রসোপযোগী! সীতা ও সরমার কথোপকথনের ভাষা কি সরল, সহজ ও স্বাভাবিক! বীররসে যিনি লিখিয়াছেন—"গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী", তিনিই আবার করুণরসে লিখিয়াছেন—"পঞ্চবটীবনে মোরা গোদাবরী-তটে ছিনু সুখে।" বাস্তব করুণরসে যখন শব্দাড়ম্বর থাকে না, তখন কবিতায় থাকিলে সাজিবে কেন? ইহাই স্বাভাবিকতা; এবং স্বাভাবিকতাই কাব্য-কলার হিসাবে সুন্দর। "লো সহচরি, এতদিনে আজি ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে আমার!" ইহা শোক-প্রকাশের সহজ ভাষা; অশ্রুধারার সহিত বাহির হইয়াছে; এবং পাঠককেও অশ্রুধারায় সিক্ত করিয়া তুলে। ছন্দের স্বাধীনতার সহিত শব্দসম্পদ না থাকিলে, ভাব-ব্যক্তির এমন সুন্দর স্বাভাবিকতা থাকিত না, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। অমিত্রচ্ছন্দের স্বাধীনতার সহিত এই অসামান্য শব্দসম্পদ যেমন বীর, রৌদ্রাদিতে ওজোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনই করুণ রসে সহজ ও সরল বাক্যের প্রয়োগ প্রসাদগুণের সহায় হইয়াছে। এই রসোপযোগী বাক্য-প্রয়োগেই মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের আর এক মনোহারিত্ব। *

মধুসূদনের শব্দসম্পদের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে ইহাও বলা আবশ্যক যে, তিনি যে শুধু সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডার হইতে রসোপযোগী শব্দ চয়ন করিয়া কাব্য-রসের পুষ্টি করিয়াছেন,তাহা নহে; ইংরাজীর অনুকরণেও তিনি অনেক পদ গঠন করিয়া কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। Hope of Troy-এর স্থানে "রাক্ষস-ভরসা" সুন্দর! এইরূপ "রাঘব-বাঞ্ছা" "কেশব-বাসনা" "অমর-ত্রাস" ইত্যাদি। আবার উপযুক্ত স্থলে তিনি সংস্কৃতের অনুকরণে দীর্ঘ-সমাস-ঘটিত পদও ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই; অথচ সুপাঠকের মুখে তাহা অনেক স্থলেই শ্রবণ সুখকরই হইয়াছে। "কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী" "দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত" পড়িতে কাব্য-পাঠকের রদ-ভঙ্গ হইবার কথা নহে, কাব্য-শ্রোতার কাণেও মন্দ শুনাইবার কথা নহে। ইহা ছাড়া, তিনি বিস্তর ক্রিয়াপদ গঠন করিয়া গিয়াছেন, যেগুলি কবিতায় ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী। ইংরাজীতে বিস্তর বিশেষ্য-বিশেষণ পদ হইতে ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন দেখা যায়। ইহাতে শব্দ-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়া থাকে। মধুসূদনও বিস্তর ঐরূপ ক্রিয়াপদ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন;—তাহাতে কথার সংক্ষেপ হইয়াছে এবং সেইজন্য কবিতায় ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে। "কূজন করিল" স্থলে "কূজনিল", "প্রভাত হইল" স্থলে "প্রভাতিল", "প্রফুল্ল হইল" স্থলে "প্রফুল্লিল", "ছটফট করিয়া" স্থলে "ছটফটি", "তাপিত হইয়া" স্থলে "তাপি", "শান্ত হইল" স্থলে "শান্তিল" "নির্ব্বার করিবে" স্থলে "নিব্বারিবে"—এ সবের দ্বারা কাব্যোচিত শব্দ-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই হইয়াছে। বার-বার "করিল," "হইল" বা "করিয়া", "হইয়া" কবিতায় ভাল শুনাইত না। "হ্রাসো বসুধার ভার" কবিতায়

* দুঃখের বিষয় যে, একশ্রেণীর বিজ্ঞ সমালোচকেরা এ কাব্যে রস-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই জলের মত প্রাঞ্জল ভাষা নাই বলিয়া দোষ ধরেন এবং অধিকতর দুঃখের বিষয় যে, সংস্কৃত-অলঙ্কারশাস্ত্রজ্ঞ কোন কোন পণ্ডিত-সমালোচকও বাঙ্গালা কাব্যে বীর রৌদ্রাদি রস-ব্যঞ্জনায় "পাখীসব করে রব"-এর মত ভাষা চাহেন।

ভাষায় শুনিতে সুন্দর। মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের ভাষায় ইহাও এক নূতন বিশেষত্ব।

তৃতীয়তঃ—মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের আর এক বিশেষত্ব বাক্য বিন্যাসে। গদ্যে বাক্য-বিন্যাস অনেক স্থলেই ব্যাকরণানুযায়ী; ব্যাকরণ যেখানে যে কারকের স্থাননির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সাধারণতঃ সেই নিয়ম রক্ষা করিয়া লিখিলেই সুন্দর গদ্য রচনা হয়। কিন্তু কবিতা ভাবের ভাষা। ভাব যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাই সেই ভাবের স্বাভাবিক ভাষা। এখানে ব্যাকরণের নির্দ্দেশ খাটে না। সকল প্রকার কবিতাতেই সেইজন্য বাক্যবিন্যাস ভাবানুযায়ী; এমন কি, প্রবল ভাবকে ফুটাইতে গদ্যেও অনেক সময়ে ব্যাকরণের নির্দ্দেশ না মানিয়া, ভাবের ভাষাতেই ভাবকে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও, মিত্রাক্ষরচ্ছন্দে অক্ষরের খাতিরে এবং দুই চরণে ভাবশেষ করিতে গিয়া ভাবের ভাষা অনেক স্থলেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং বাক্য-বিন্যাসও সব সময়ে ভাবানুযায়ী না হইয়া স্বাভাবিকতা হারায়। বন্ধন থাকিলেই ইহা অবশ্যম্ভাবী। যে কোন কবির মিত্রাক্ষরচ্ছন্দী কবিতায় ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দে সে সঙ্কোচের প্রয়োজন নাই—দুই চরণে ভাবের শেষ করিতেই হইবে, তাহাও নহে—এবং চরণে চরণে মিল রাখিতে হইবে, তাহাও নহে। সুতরাং ভাব সেই ভাবোচিত স্বাভাবিক বাক্য-বিন্যাসের সহিত ফুটিয়া উঠিতে পাইয়াছে। বাক্য-বিন্যাসের এই স্বাভাবিকতা-গুণে মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দে সকল রসই এমন সুস্বাদ্য। এই বাক্যবিন্যাসের গুণেই তাঁহার বীররসে প্রাণ উদ্দীপিত হয়, রৌদ্ররসে রৌদ্র-মূর্ত্তি যেন চক্ষের সমক্ষে প্রতিভাত হয়, ভয়ানকে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করে, করুণে অশ্রুর উৎস খুলিয়া যায়।

"——হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে,
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে।"

এখানে বাক্যবিন্যাস কি স্বাভাবিক! মিলের বন্ধন নাই, যতির খাতির নাই; লোকে ভাবের ভাষায় যাহার পরে যে কথাটি বলে, সেইরূপ স্বাভাবিক বাক্য-বিন্যাসে ভগ্নদূত কহিতেছে। বাক্যের এই স্বাভাবিক বিন্যাস মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের চমৎকারিত্বের এক নিগূঢ় রহস্য।

আবার দেখুন,—

"রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী;—
"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানব-নন্দিনী আমি; রক্ষকুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম; মেঘনাদ স্বামী;—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?"

এখানে রোষের ভাষায় বাক্যবিন্যাস সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই হইয়াছে। রাগে যে কথাটার পরে যে কথাটা হওয়া স্বাভাবিক, ঠিক তাহাই হইয়াছে। ছন্দের স্বাধীনতা না থাকিলে, সুকবির পক্ষেও সব সময়ে এইরূপ রসানুযায়ী স্বাভাবিকতা রক্ষা করা সুকঠিন।

আরও দেখুন;—

"—সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে,
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি!"

এখানে প্রথমেই "সবিস্ময়ে" পাঠককে সচকিত করিয়া, শেষে "ভীষণদর্শন মূর্ত্তি" বলায় ভীষণদর্শন মূর্ত্তিটী যেন পাঠকের মনে স্থায়ীভাব ধারণ করিয়া অদ্ভুত রসটীকে গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে। "ভীষণদর্শন মূর্ত্তি সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে" বলিলে, রসের পাক একটু কাঁচা থাকিয়া যাইত। অমিত্রচ্ছন্দে কবি অবাধ বলিয়া রসোৎকর্ষক বাক্য-সমাবেশে তাঁহার এমন স্বাধীনতা।

করুণ রসের অভিব্যক্তিতেও বাক্য-বিন্যাসের সুন্দর স্বাভাবিকতা। সেই জন্য মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দ করুণ রসেও চমৎকার রসোৎকর্ষক হইয়াছে।

"রাজ্য ত্যজি বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ-সলিলে মগ্ন; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ?"—ইত্যাদি

ইহা পড়িবার সময়ে মনে হয় না যে, কবির ছন্দোবদ্ধ রচনা পড়িতেছি—মনে হয়, যেন সত্য সত্যই লক্ষ্মণের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুভ্রাতৃবৎসল রাম শোকপ্রকাশ করিতেছেন,—বাক্যের সমাবেশ এমনই স্বাভাবিক! এবং এই স্বাভাবিকত্বেই ইহার মনোহারিত্ব।

"—লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলা স্থলে
আমার! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্য দেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা
বাসন্তি!"

করুণ রসের এই অভিভাষণে বাক্য-বিন্যাসের স্বাভাবিকতাই ইহার সৌন্দর্য্য-রহস্য। অধিক উদাহরণ দেওয়া অনাবশ্যক। কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই বাক্য-বিন্যাসের এইরূপ মনোহারিত্ব জাজ্জ্বল্যমান।

চতুর্থতঃ—মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের আর এক বিশেষত্ব, সংযতভাবে অনুপ্রাস ব্যবহারে। মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই আর এক মধুসূদন, দাশরথি এবং অন্যান্য কবিগণ অনুপ্রাসের এত ছড়াছড়ি করিয়া গিয়াছিলেন যে, এখন তাহার প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার অমিত্রচ্ছন্দের কবিতায় সংযতভাবে অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া পাঠকের কাণে মিত্রাক্ষরের অভাবটী সুন্দররূপে পূরণ করিয়াছেন। তিনি নিজেই তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"I have used more "অনুপ্রাস" and "যমক" than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unmfamiliar with blank verse."

কোন কোন স্থলে একটু দীর্ঘ অনুপ্রাস আছে বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুপ্রাস, ঠিক যেন অলঙ্কারে "ডায়মন্"-কাটার মত, সর্ব্বত্র ঝক্ ঝক্ করিতেছে এবং তাহাতে কবিতাও উজ্জ্বল হইয়াছে। অনুপ্রাসের সুপ্রয়োগ ঠিক যেন ব্যঞ্জনরন্ধনে মিষ্ট-প্রয়োগের ন্যায়। সুপাচকের হাতে উহার প্রয়োগ-মাত্রা এমনই সংযত যে, তাহাতে আস্বাদের উৎকর্ষ হয়, অথচ মিষ্ট দেওয়া হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয় না।

"বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি"
—"কহিলা জনকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে—হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি সখি।"
"কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে"

—এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুপ্রাসে কবিতার আস্বাদ ঠিক সুপাচকের হাতে মিষ্ট দেওয়া ব্যঞ্জনের আস্বাদের মত। ইহাতে মিত্রাক্ষরের মিষ্টত্বের স্থান সুন্দর পূরণ করিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল গুণগুলি একত্র হইয়া মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দী কবিতাকে সুস্বাদু, সুশ্রাব্য ও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। রসানুযায়ী শব্দ-প্রয়োগে ও স্বাভাবিক বাক্যবিন্যাসে উহা সঞ্জীবতাময়; ভাবানুযায়ী যতিতে উহা স্বাভাবিক অথচ সঙ্গীতস্বাদ-বিশিষ্ট; এবং সংযত অনুপ্রাসে উহা সুমিষ্ট ও মনোহর।

শ্রীদীননাথ সান্যাল।



স্পর্শমণি

(উপন্যাস)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ সভা।

রুদ্রকান্ত শুনিলেন, সতীনাথ বাড়ী ফিরিয়াছে। সারাদিন উৎকণ্ঠিত আগ্রহে তাহার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া থাকিয়াও যখন দেখিলেন, সতী নিজে হইতে কাছে আসিল না, তখন নিজেই তাহার সন্ধানে গেলেন। অসুখের খবরের সত্যতায় তাঁহার বিশ্বাস না থাকায়, ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

শয্যাশায়িত বক্ষোবদ্ধহস্ত সতীনাথের চিত্ত ছাদের কড়িকাঠ গণনা বা অঙ্কশাস্ত্রের অপর কোনও দুরূহ মীমাংসায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল কি না বলা যায় না। রুদ্রকান্তের আগমন তাহার গভীর চিন্তা ভঙ্গ করিতে পারিল না। রুদ্রকান্ত কাছে বসিয়া তাহার ললাটে স্নেহহস্ত স্পর্শ করিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। প্রণাম করিতে গেলে জেঠা-মহাশয় বাধা দিয়া কহিলেন, "থাক বাবা।" ললাটের তাপ পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন রোগ শরীরের নয়, তখন একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ঘুমোবার চেষ্টাই কর, ওতেই সেরে যাবে। কাকেও ডেকে দেব কি?"

সতীনাথ তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "দরকার নেই।"—সেই ম্লান হাসিটিতেই রুদ্রকান্ত তাঁহার অনেক অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর পাইলেন।

স্নেহপাত্রকে অনেক সময় আমাদের বাধ্য হইয়াই তাহার ঈপ্সিত পথে চলিতে বাধা দিতে হয়, তাই বলিয়া তাহার ব্যর্থতার ব্যথা কি আমাদের বুকেও বাজে না? কর্ত্তব্যের কঠিন বর্ম্মে চলিতে আঘাত অবশ্যম্ভাবী, তাই তাহার বেদনাদুঃখ সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই।

রুদ্রকান্ত চিন্তিত মুখে বাহিরে আসিয়া মুরারিকে দেখিয়া, অনুবর্ত্তী হইবার ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইলেন। মুরারি তাঁহাকে অনুসরণ করিল।

অন্য কক্ষে আসিয়া রুদ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে মাগী মেয়ে নিয়ে গেল কোথায়?"

'মাগী'-বিশেষ্য-বিশেষিতাকে চিনিতে মুরারির অবশ্যই বাধিল না। সে কহিল, "খবর নিতে গিয়ে দেখলাম, বাড়ীতে তালা দেওয়া, কেউ কিছু বলতে পাল্লে না, বাড়ীওলাও জানে না।"

"ওঃ" বলিয়া রুদ্রকান্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, "আচ্ছা তুমি যাও। ভাল কথা, তোমার মাকে চিঠির জবাব দিয়েছ?"

মুরারি, তাঁহার অনুমতি পায় নাই জানাইলে, তিনি কহিলেন, "বটে! এত বাধ্য? বেশ বেশ, খুসী হলাম। আচ্ছা লিখে দিও, হাজার টাকার একটি পয়সাও বেশী আমি দিতে পারব না। ওরে বাপ্‌রে, পাঁ-চ-হাজার টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেব—আমায় বেচলেও তা আসবে না। কেন রে বাবু, গরীবের মেয়ের অত কেন? জন্ম গেল ঘর নিকিয়ে, এখন হাকিম জামাই এসে প্রণাম না কল্লে আর চলবে না! কাঙ্গালের ঘোড়া-রোগ বড় ভয়ানক রোগ, বুঝলে? লিখে দিও তোমার মাকে।"

মুরারি বিনীতভাবে মুখে "যে আজ্ঞে" বলিয়া সম্মতি জানাইয়া, তাঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া আসিল। মনে মনে সে চটিয়া গেল। "ওঁকে বেচলেও পাঁচ হাজার হবে না" —একচোখো! সতীদা যে কত হাজার জলে দিয়ে এল, তার বেলা বুক কর্‌কর্‌ কল্লোনা ত? এযে আমার বোন্ কিনা, তাই টাকা জলে পড়বে!" ভগিনীস্নেহে মুরারির এ যাবৎ আহার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত না ঘটিলেও, রুদ্র-কান্তের একদেশদর্শিতায় তাহার মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—"ছেলের মুখ শুক্‌ন দেখে মেজাজ গরম হয়ে গেছে। কে মুখ শুখোবার কায করাতে

চেয়েছিল? তখন বলা হল এ বিয়ে হতে পারবে না, যেমন করে হোক বন্ধ কর্। এখন তাল পড়ল আমার ওপর! ভগবান ত আছেন, তিনি ত আর একচোখো নন্। সতী বেম্মই বিয়ে করুক, আর খিষ্টানীই বিয়ে করুক,আমার কি দায় পড়ে গেছল? চোরকে বলেন চুরী করতে, গৃহস্থকে বলেন সাবধান হতে! এখন হাত-ছাড়া হয়ে গেল কি না, তাই যত অপরাধ মুরারির!"

তারাসুন্দরীর প্রতি মনে মনে মুরারি কৃতজ্ঞ হইল। রুদ্রকান্ত-হেন জনের যিনি দর্পচূর্ণ করিতে পারেন, তিনি বড় সামান্যা নারী নহেন। এ বেশ হইয়াছে—এক ঢিলে দুই পাখী মরিয়াছে। সতীনাথের দুঃখে মুরারির মনে যেটুকু সহানুভূতি আসিয়াছিল, রুদ্রকান্তের পক্ষপাতিতার বিষে সেটুকু জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল। কল্যাণীর বিবাহ-সংবাদের অভ্যন্তরে কোন গোলযোগ আছে কিনা জানিবার কৌতূহলটাকে সে তৎক্ষণাৎ বিসর্জ্জন দিল। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ আছে, এমন ভাবটুকুও সতীনাথের কাছে ব্যক্ত করিল না। নির্ব্বাক দর্শকের ন্যায় সকৌতুকে তাহার কার্য্য দেখিতে লাগিল।

পরদিন মঞ্জুভূষণ আসিয়া সতীনাথকে হুগলী লইয়া গেল। সতীনাথ গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে মঞ্জুভূষণ মুরারিকে জানাইল, তাহারা পাত্রী দেখিবার জন্য যাইতেছে, পছন্দ হইলে একেবারে আশীর্ব্বাদ করিয়াই আসিবে। ২৬শে ছাড়া ত আর দিন নাই, মধ্যে চারিদিন বাকী।

গাড়ী হাঁকাইয়া দিলে সতীনাথ মুরারিকে ডাকিয়া বলিল,"মেয়ে নিকষ কুলীনেরই। জেঠা মহাশয়ের ভয়ের কারণ নেই।" শুনিয়া মুরারির বিস্ময় মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিল।

গাড়ী চলিয়া গেলে মুরারি ভাবিতে লাগিল—ছিঃ, সতীদা এত হাল্কা! এই উহার ভালবাসা? দুইদিন সবুর সহিল না! পাছে অকাল আসিয়া বিলম্ব ঘটায়, তাই নিজেই কর্ত্তা হইয়া পাত্রী দেখিতে চলিল। ইহারই প্রেমের গভীরতার শ্রদ্ধায় তারাসুন্দরী প্রতারিত হইয়া কত না আশা করিয়াছিলেন। আহাম্মক সে, সেও যে কত অসম্ভব সম্ভব করিতে চাহিয়াছিল। সতীনাথের চরিত্রের লঘুতার পরিচয় পাইয়া আজ তাহার স্বার্থের ক্ষতিও যেন তুচ্ছ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

নববধূ

অমাদের প্রবীণা গৃহিণীরা নববধূর মুখ দেখিবার পূর্ব্বে স্বর্ণধৌত জলে নিজের চোখ ধুইয়া, বধূর চোখ ধোয়াইয়া, তবে তাহার মুখ দেখিয়া থাকেন। ওষ্ঠে মিষ্টান্ন ও কর্ণে মধু দিয়া তাহার দুরবস্থার একশেষ করিয়া তোলেন। প্রথাটা বর্ব্বরোচিত অসভ্যতা কি না, সে সম্বন্ধে বোধ হয় ভাবিবার কিছু আছে। আজকাল এ প্রথাটাকে কেবল প্রথা-হিসাবে অন্ধ আজ্ঞা-প্রতিপালনের মত ব্যবহার করা হইলেও, ইহার প্রবর্ত্তকের উদ্দেশ্য যে অসাধু ছিল না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এই যে বধূকে সোণার দৃষ্টিতে দেখিবার,তাহার কথাগুলি মধুর মিষ্টান্নের মত মিষ্টরসে শুনিবার জন্য ব্যাকুলতা,—কৃত্রিমতার অন্তর্নির্ব্বিষ্ট এই ভাবটুকু বড়ই মধুর।

ছেলে হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া বড় হইবে, অনেক বাধা বিপত্তি কাটাইয়া বিবাহ করিয়া বধূ ঘরে আনিবে, তবে বধূর মুখ দেখিতে পাইব। সুতরাং বধূ যে বড় অনায়াস-লভ্য হেলার জিনিষ, তাহা নহে। মনুষ্যজন্মে পুত্রবধূর মুখদর্শন কয়জনের ভাগ্যেই বা ঘটিয়া থাকে! পরের মেয়েটিকে ঘরে আনিলেই কর্ত্তব্য ফুরাইয়া গেল না; তাহাকে ঘরের জিনিষটি করিয়া লইতে হইলে, নিজেকেও বিলাইয়া দিতে হয়। ভালবাসার আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট না হইবে কে? পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত ভালবাসার শক্তিতে বশীভূত হয়। ভগবানের সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ মানবেই কি ইহার অলঙ্ঘ্য নিয়ম ব্যর্থ হইবে? 'ভালবাস কেমন'-এর উত্তর, ভালবাস যেমন। ভালবাসা কেবল একতরফা হওয়ার উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য না হইলেও, তাহার সংখ্যা খুব অধিক নয়।

বধূ পরের মেয়ে, সে তোমার বাড়ী আসিয়াই কর্ত্তব্যবোধে যে একেবারে তোমায় ভালবাসিয়া আপন হইয়া যাইবে, এবং বিধিনির্দ্দিষ্ট জীবনপথে সোজা

চলিতে পারিবে, এমন আশা করা সঙ্গত নয়। ইচ্ছা থাকিলেও, সে ইচ্ছার পূরণ হওয়া বড়ই কঠিন। কর্ত্তব্যের ভার তাহার মাথায় চাপাইয়া দাও ক্ষতি নাই, কিন্তু ভারবোধ করিতে দিও না। তবেই সে ক্লান্তিবোধ করিলেও মাথাঝাড়া দিয়া ভার ফেলিয়া দিবে না—অন্ততঃ ভারবহনে ক্লান্ত দেখিলে সাহায্য কর, একটুখানি স্নেহ মমতার সিঞ্চনে তাহার শ্রমক্লান্তি অপনোদন করিতে চাও, দেখিবে সে আপনা হইতেই ভার তুলিয়া লইবে। সেই-ই একদিন 'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর, পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর' বলিতে পারিবে। মিষ্ট কথায় যতটা ফল পাওয়া যায়, রক্তনেত্রে কর্ত্তব্যপালনের উপদেশে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। তোমার মনে প্রচ্ছন্ন অভিমান সঞ্চিত থাকিলেও, সে অজ্ঞ জ্ঞানলাভ করিবে না। তাহাকে তোমার মনের কথা বুঝিতে দেওয়াই তাহার ও তোমার পক্ষে মঙ্গলকর। পরগাছাকে গায়ে জড়াইবার জন্য গাছের যে সহিষ্ণুতা আছে, পরের মেয়েকে আপন করিতে হইলে, আমাদেরও বোধ করি সেইরূপ সহনশক্তির প্রয়োজন। নিমেষের দৃষ্টিতে মনের টান না হইলেও, মুখের মিষ্ট কথার খরচে কোন পরিশ্রম নাই। ভালবাসিব মনে রাখিলে, ক্রমে ভালবাসা পাইতে ও দিতে পারা সম্ভব। আমার দ্বারা হইল না বলিয়া গোড়াতেই যদি হাল ছাড়িয়া দিই, তবে স্রোতের মুখে তরী বান্‌চাল হওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। যে ভাগ্যবতী বধূ জন্মান্তরীণ পুণ্যবলে গুরুজনের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়, তাহার জীবনপথে বিধিদত্ত যতই ঝড়ঝঞ্ঝা আসুক, মানুষের দেওয়া দুঃখের হাত এড়াইয়া সে সুখ শান্তিতে কাটাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে দুর্ভাগিনীর ভাগ্যে সে সুযোগ না আসে, বিধাতা তাহার জন্য স্বহস্তে যতই সুখের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিউন, ভাগ্যগুণে তাহার দুঃখের অন্ত থাকে না।

উমার অদৃষ্টেও এই বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল। জীবনে এই প্রথম সে কলিকাতা দেখিল। হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া সে বিস্মিত হইয়াগেল। কি প্রকাণ্ড ষ্টেশন, কত লোকজন,—যণ্ডেশ্বরতলার বৈশাখী বা ত্রিবেণীর উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির মেলাতেও বুঝি এমন ভীড় হয় না। মাসত্রয়ের ভিতর এইটাই ছিল শেষ লগ্ন, তাই এ তারিখে বিবাহ বড় কম ঘটে নাই। আরও কয়েক যোড়া বরবধূ গাড়ী হইতে নামিল। কাহার কাহরও সঙ্গে বাদ্যভাণ্ডও রহিয়াছে।

তকমা-আঁটা সুসজ্জিত সহিস-কোচম্যান-যুক্ত প্রকাণ্ড ফেটন গাড়ী আমাদের বরবধূর জন্য ষ্টেশনে প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুরারি অমর মঞ্জুর আদেশে সতীনাথ উমার সহিত তাহাতেই উঠিয়া বসিল। পথে দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা শ্রেণী,—সুসজ্জিত বিপণি, ট্রামগাড়ী, মোটর গাড়ী—অবগুণ্ঠনের মধ্যেও উমার বিস্মিত দৃষ্টি আত্মীয়বিরহ-বেদনা ভুলাইয়া ক্ষণেকের জন্য তাহাকে যেন মোহাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। এই কলিকাতা—বাঙ্গালার রাজধানী! ইহার এত শোভা? গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে, পশ্চাতের দৃশ্যাবলী অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, তবু দ্রষ্টব্যের অভাব ঘটিতেছে না। সে যেন যাদুকরের যাদুমন্ত্রে অনবরত ইন্দ্রজাল দেখাইয়া চলিয়াছে। উমা কোনটা ছাড়িয়া কোনটা দেখিবে বুঝিতে পারিতেছিল না।

উদ্যানবেষ্টিত প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটীর ভিতরে গিয়া গাড়ী থামিলে, উমার বিস্ময় সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল। এইখানেই তাহাকে নামিতে হইবে? এই তাহার স্বামীগৃহ? এই রাজপ্রাসাদের বধূ সে, মনে করিয়া নিজের ক্ষুদ্রতায় যেন লজ্জায় জড়ীভূত হইয়া পড়িল। তোরণদ্বারে পত্রপুষ্পের মালা ছিল না, রোসনচৌকী মিলনরাগিণী বাজাইল না। শাঁখ একটা বাজিল বটে, তাহাও অত্যন্ত মৃদুস্বরে। দাস দাসী রঙ্গীন কাপড় পরিয়া না আসুক, তবু তাহাদের উৎসাহের অভাব ছিল না, একমাত্র তাহারাই এ উৎসবের দর্শক।

একজন প্রাচীনা বিধবা এবং লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী পরা একজন বর্ষীয়সী সধবা উমাকে অভ্যর্থনা করিয়া নামাইয়া লইলেন। পিসীমার আদেশে গাড়ীর নীচে রামদীন এক ঘড়া জল ঢালিয়া দিল। ভিতরের দালানে একটি ছোট্ট মেয়ে দুইখানা ইঁট

দিয়া চুল্লীতে এক ভাঁড় দুধ বসাইয়া, নারিকেল পাতার ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছিল—সে জ্বাল বাড়াইয়া দিলে দুধ উথলিয়া পড়িয়া গেল। আদেশপ্রাপ্তা উমা, স্বামীগৃহের সৌভাগ্য উথলিল স্বীকার করিলে তাহাকে উঠানে আনা হইল। অসহিষ্ণু সতীনাথ গ্রন্থিবদ্ধ কৌশেয় চাদরখানা ফেলিয়া দিয়া, উমার সঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টায় বারকতক ইতস্ততঃ করিয়া, নীরবে উমার অগ্রে চলিয়া পিসীমা-নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইল। উঠান যোড়া আলিপনায় পদ্ম ভ্রমর রাজহংস প্রভৃতির চিত্রকলা পুরোহিত নারাণ ঠাকুরের পত্নীর চিত্রবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। অনুষ্ঠেয় বরণাদি তাঁহারই দ্বারা সম্পন্ন হইয়া গেলে, কড়ি খেলা প্রভৃতি বাদ দিয়া সতীনাথ ত্রিতলে জেঠামহাশয়ের কাছে চলিল। উমাকেও তাহার অনুবর্ত্তিনী হইতে হইল।

কার্পেট মোড়া অনেকগুলা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উমা একখানা প্রকাণ্ড কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এইবার কতক ক্লান্তিতে কতক ভয়ে তাহার দেহ যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। এত বড় জাঁকজমকের মধ্যে সে তাহার জীবনে আর কখনও প্রবেশ করে নাই। এখানকার সমস্তটাই যে তাহার অপরিচিত। প্রশস্তকক্ষে একখানা ভেলভেট মণ্ডিত স্প্রিংএর গদিযুক্ত আরাম কেদারায় এক গৌরবর্ণ লোলচর্ম্ম কুঞ্চিতভ্রূ গুম্ফশ্মশ্রুহীন বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন। উমা বুঝিল, ইনিই জেঠামহাশয়, গৃহস্বামী।

সুবেশভূষিত উন্নতকায় সতীনাথের পার্শ্বে লজ্জাকুণ্ঠিতা স্বল্পাভরণা সাবগুণ্ঠনা ক্ষীণাঙ্গী বালিকা বধূটি রুদ্রকান্তের পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল।

রুদ্রকান্তের শরীর মন ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তাঁহার মনে হইল, এমন বিড়ম্বনা, এত বড় অযোগ্য বিবাহ বুঝি জগতে আর কখনও কোথাও ঘটে নাই। সুসজ্জিত গৃহের দুই পার্শ্বে দুইখানা প্রকাণ্ড দর্পণের ভিতর দিয়াও এই অযোগ্য মিলনের বিসদৃশ ছবি প্রকাশ পাইল। বরের চোখেও তাহা অদৃশ্য না থাকিয়া, তাহার মুখে তীব্র বিদ্রূপপূর্ণ মৃদু হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল। সে হাসি যেন বলিতেছিল, কুলগর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেমন বিবাহ করিয়া আনিয়াছি দেখ! সুন্দরী বিদুষী বধূ ঘরে আনিতে বড় যে ভয় পাইয়াছিলে, এখন খুসী হইয়াছ ত?

রুদ্রকান্ত সেদিক হইতে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলেন। বধূর দৃষ্টান্ত অনুকরণে সতীনাথও জেঠামহাশয়ের পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। বিবাহের পর দেবতা পুরোহিত গুরুজন কাহারও কাছে মাথা নত না করিলেও, এই প্রথম সে জেঠামহাশয়ের পায়ে মাথা নত করিল।

রুদ্রকান্ত দুই বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, গভীর স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। আজ আর সে স্নেহের স্পর্শে আলিঙ্গিতের রুদ্ধ অন্তর্জ্বালা নিবারিত হইল না। পুত্রের ম্লান গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া রুদ্রকান্তের মন বাঁকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পানে চাহিয়াও দেখিলেন না। মাটী চাপা যুঁই ফুলটির ভিতর কতটুকু সুগন্ধ কতখানি শোভা লুকান রহিয়াছে, তাহার পরিচয় লওয়া প্রয়োজন বলিয়াও মনে হইল না। ফুলের মালাগাছি যখন জীবন-মূল্যে বিকাইয়াছে, তখন তাহাকে শুধু পরখ করিয়া ফেলিয়া না দিয়া, এতটুকু স্নেহধারা সিঞ্চনে মৃদু সুরভিটুকু গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় কিনা, সে কথা ভাবিয়াও দেখিলেন না। মনে হইল, "এ কি সতীর যোগ্য স্ত্রী? এ যে ওর পা মুছাইবার বাঁদীর যোগ্যও নয়।" কেবল মনে পড়িল না যে, এ অযোগ্যকে এ আসনে আনিয়া বসাইল কে। যে রুদ্রকান্ত, সতীনাথের শিক্ষিতা সুন্দরী পত্নী নির্ব্বাচনে ছেলে হারাইবার ভয়ে আতঙ্কিত হইয়াছিলেন, সেই তিনিই আজ পুত্রের হতাশাঙ্কিত মুখ দেখিয়া নিজের কাছে নিজেই প্রতারিত হইলেন। হায় রে মানুষের স্নেহান্ধ দুর্ব্বল মন, পল্লীপ্রান্তে যে ক্ষুদ্র বনফুলটি আপনার স্নিগ্ধগন্ধে পথবাহীকে সচকিত করিয়া নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া দিতেছিল, সহরের সুরম্য হর্ম্ম্যে বসিয়াও সতীনাথের কর্ণে যাহার সংবাদ পৌছাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, সত্যই তাহার কোন মূল্য আছে কিনা সে সন্দেহ মনে উঠিল না। ক্রোধে ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া মন কেবলই

বলিতে লাগিল, "ছি ছি, সতী এ করিল কি? কত রাজা রায় বাহাদুরের প্রার্থিত পাত্র, রূপে গুণে বিদ্যায় চরিত্রে ধনীগৃহের দুর্লভ রত্ন, কোথাকার কোন অজ্ঞাতনামা চালচুলাহীন টুলো পণ্ডিতের ঘরে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া আসিল! উচ্চ শিক্ষা, আদর্শ—এ সব অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া লোকের কাছে তাঁহার মুখ দেখাইবার পথ পর্য্যন্ত রাখিল না! বন্ধুমহলে পুত্রের এই হীনরুচির বিবাহের বার্ত্তা প্রকাশ করা ত পরের কথা, নিজের কাছে স্বীকার করিতেও যে লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে!—তাই ধুমধামের সমস্ত আশা কল্পনা বিসর্জ্জন দিয়া, বিনা আড়ম্বরে নিতান্ত দীনহীনের মত বিবাহের নিয়ম পর্ব্ব সম্পন্ন করা হইল। বাড়ীর বাহিরে একটা কাকপক্ষীও উৎসব গৃহের উচ্ছিষ্ট পাত্রের সন্ধান পাইল না। কুটুম্বের মধ্যে সকন্যা পুরোহিত গৃহিণী সধবার অধিকার ও নিয়ম পালনের জন্য কেবল দুইদিন থাকিয়া, কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। শোকার্ত্ত পিতৃগৃহ উৎসবের বেশে সাজিয়া উমাকে বিদায় দিয়াছিল। ধনী স্বামীগৃহও আনন্দের অভিনন্দনে গৃহলক্ষ্মীর গৌরব জানাইয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইল না। বালিকা উমা কিন্তু ততটা বুঝিতে পারিল না। গৃহের আটপৌরে সাধারণ সজ্জাই তাহার চক্ষে উৎসব সজ্জা বলিয়া মনে হইল।

কুশণ্ডিকা পাকস্পর্শ প্রভৃতি যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া গেল। কি ভাবিয়া সতীনাথ ইহাতে বাধা জন্মাইল না। রুদ্রকান্ত বধূর জন্য কোন আদেশ না জানাইলেও,অমর ও পিসিমার নির্ব্বন্ধতাতিশয্যে মুরারি দুই একখানা মূল্যবান অলঙ্কার সতীনাথের অর্থে সংগ্রহ করিয়া আনিল। ফুল-শয্যার রাত্রিটাও পত্নীর সহিত একগৃহে ভিন্ন শয্যায় কোন মতে কাটাইয়া, সতীনাথ বিবাহবন্ধন স্বীকার করিয়া লইল। তারপর সম্পূর্ণরূপে পত্নীর সহিত নিজেকে সংস্রবহীন করিয়া লইয়া, বাহিরের মহল আশ্রয় করিল।

পিসিমা বকাবকি করিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন। রুদ্রকান্ত শুনিয়া খুসী হইলেন। ছেলে যে বউএর গোলামীতে ইহারই মধ্যে নাম লিখাইল না—এ ত ভালই; বিশেষতঃ অমন বউয়ের! উহাকে ভালবাসা কি সতীর কর্ম্ম? বিবাহ যে করিয়াছে, এই না উহার চতুর্দ্দশ পুরুষের ভাগ্য!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উমার সুখদুঃখ

অল্পদিনের মধ্যেই উমা বুঝিল, এখানে চলিবার জন্য নিজের হাতে পাথর ভাঙ্গিয়া তাহাকে পথ গড়িয়া লইতে হইবে। এই যে বিদ্যুৎ-আলোকে আলোকিত, দাস-দাসী-পূর্ণ সুসজ্জিত প্রাসাদতুল্য ত্রিতল বাড়ীখানা, ইহার ভিতর প্রাণের কোন সাড়া পাওয়া যায় না। এখানকার পৃথিবী সীমাবদ্ধ, কথা কহিয়া প্রিয়বিরহ-ব্যাকুল চিত্তকে শান্ত করিবার একজন সঙ্গী মাত্র নাই। তাহার মনে হয়, বদ্ধ নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করিবার জন্যও বুঝি যথেষ্ট স্থানাভাব। হাসিবার প্রয়োজন হয় না, চলাফেরা করিবার প্রয়োজনও সংক্ষিপ্ত। স্বামী তাহার সহিত কোন সংস্রব রাখিলেন না। সম্বন্ধের অধিকারে যাঁহার সহিত রাখাইলেন, তাঁহার প্রকৃতির পরিচয়ে উমা স্তম্ভিত হইয়া গেল। রুদ্রকান্তের কোপন স্বভাব বয়সের সহিত ক্রমেই বাড়িতেছিল। বেতনভুক্ চাকর বাকর কর্ম্মচারীরাও বিনা প্রতিবাদে সর্ব্বদা সে স্বভাবের পরিচয় সহ্য করিতে নারাজ। কেহ ছাড়িয়া যায়, কেহ যাইবার ভয় দেখায়। মুরারি আজকাল আর কাছে ঘেঁসিতে চায় না, সুধীরও অনেকটা তাই। উমাই কেবল সর্ব্বং-সহা হইয়া বিনাপত্তিতে মাথা নত করিয়া সকল লাঞ্ছনা সহিয়া লয়। স্বামী-পরিত্যক্তা অনাদৃতা গরীবের মেয়ে কিসের অধিকারে আপত্তি করিবে? তাই উমার সঙ্গ, ভস্ম নিক্ষেপের ভগ্নসূর্পের মত, প্রয়োজন বোধেই রুদ্র-কান্ত পূর্ণ অধিকারে গ্রহণ করিলেন। আকস্মিক নিষ্ফলতার তীব্রবেদনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ক্রুদ্ধ সতীনাথ যে দিল্লীর লাড্ডু ক্রয় করিয়া আনিয়াছে, তাহাকে পরীক্ষা না করিয়াই ঘৃণায়

সে সরিয়া দাঁড়াইল। সতীনাথের মানসিক ক্ষোভের কারণ নিজেকে মনে করিয়া, রুদ্রকান্তের আক্রোশ জন্মিল উমার উপর। তিনি না হয় তারাসুন্দরীকে বিবাহভঙ্গের নোটিস দিয়াছিলেন,—উপস্থিত ইচ্ছা না থাকিলেও, শেষ নিষ্পত্তিও ত করিয়া ফেলেন নাই। বাতাসের গতি দেখিয়া, যেমন বুঝিতেন, ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করিয়া তরী তীরে আনিবার বা বাহিয়া চলিবার হুকুম দেওয়া তাঁহার হাতের মধ্যেই ত ছিল। কোথা হইতে প্রবল বাধা উমা, উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া তাঁহার সোণার ছেলের সারা জীবনটা অসুখ ও অশান্তির আলয় করিয়া তুলিল! অপরাধ তাহার নয় ত কাহার?—তাই উমার স্কন্ধে অপরাধের বোঝা চাপাইয়া নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়া, রুদ্রকান্ত নিশ্চিন্ত চিত্তে তাহার ছল ত্রুটি খুঁজিতে লাগিলেন।

তিনি যে কর্ত্তব্যবোধে তারাসুন্দরীকে কন্যার দ্বিতীয় পাত্র অন্বেষণে মনোযোগী হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন, সে কথা সতীনাথকে খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া সতীনাথ চুপ করিয়া রহিল।

সতীনাথ ভাবিতে লাগিল, কল্যাণীদের কথা। ঝড়-ঝঞ্ঝা যে নিশ্চয়ই উঠিবে, উঠাই যে সম্ভব ও সঙ্গত, সে কথা ত সে তাঁহাদের অজ্ঞাত রাখে নাই। সে যে কল্যাণীর জন্য এই রাজৈশ্বর্য্য প্রয়োজন ঘটিলে অক্ষুব্ধচিত্তে তৃণমুষ্টির মত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, এ কথা ত স্পষ্টাক্ষরেই তাঁহাদিগকে বলিয়াছিল। তাহাকে জানাইবার, তাহার সম্মতি বা অসম্মতি শুনিবার এতটুকু বিলম্বও কি তাঁহাদের সহিল না? বিশ্বাসের কি কোনই মূল্য নাই?

কিন্তু আবার সে ভাবে—তাঁহারা প্রার্থিত নির্ম্মলচন্দ্রের পথ চাহিয়া তাহাকে বোধ হয় কেবল "হাতে রাখিয়া ছিলেন"। নির্ম্মলচন্দ্র তাহার নবার্জ্জিত যশোরশ্মিতে উজ্জ্বল হইয়া, সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া "অক্ষত" মনে ফিরিয়া আসিয়াছে, তবে আর প্রার্থিত বস্তু তাহাকে বঞ্চিত করিবে কেন? তাই, এই একটা ছুতার সুযোগ পাইয়া তাঁহারা অনায়াসে সরিয়া পড়িলেন। মুখের কথাও একটা জানাইয়া গেলেন না। নিদ্রিতের বক্ষে এমন করিয়া ছোরা বসাইতে, কশাইয়েরও বুঝি হাত কাঁপিয়া উঠিত। তাঁহাদের সেটুকুও হইল না। সেই অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের মত স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃশালিনী সারল্যের প্রতিমা, তাহার ভিতরেও এত কপটতা? ভগবান জগতে নারীজাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন কেন? এই নারী? ঋষিরা যাঁহাদের দেবী আখ্যা দিয়াছেন, যাঁহাদের শীতল ছায়ায় বসিয়া সংসার-তাপদগ্ধ জীব শান্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই নারী এমন সর্পিণীর জাতি? ইহাদের চক্ষু, মনের দর্পণ নয়—মুখ, বিশ্বাসের আশ্রয় নয়; জিহ্বা, সত্য উচ্চারণেও অশক্ত। ইহারা জগতের ধ্বংসরূপিণী মহাশক্তির অবতার। ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই।

তবু—সতীনাথের মনের সুদৃঢ় ভিত্তিমূল টলাইয়া একটা ক্ষুদ্র "তবু" যেন মাথা ঠেলা দিয়া উঠিতে চায়; মনে হয়, তবু বুঝি কোথায় কি গোল রহিয়া গেল। কল্যাণী, সেই কল্যাণী। সে কেমন করিয়া এমন কায করিতে পারিল! কল্যাণী অবশ্যই বাচনিক কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইবার শপথ করে নাই, তবু সেই যে বিশ্বাসদীপ্ত জ্ঞানজ্যোতির্ম্মণ্ডিত যুগল নক্ষত্রের মতই চক্ষু দুইটি, তাহারা যে ভাষাতীত অনেক সংবাদই দিয়াছিল। সেও যে ভালবাসে, সেও যে এ বিবাহ-সংবাদে অসুখী নয়, এ সত্য যে তাহারই চোখে মুখে, সলজ্জ হাসিতে, প্রত্যেক গতিভঙ্গিতে সে প্রকাশ করিয়াছে,—আশা দিয়াছে, নৈরাশ্যকে মাথা তুলিতে দেয় নাই। তবে এমন অঘটন ঘটিল কিসে? সুধু পদগৌরবের প্রলোভন,—সে কি এত বড়, যাহার কাছে আত্মা ধর্ম্ম সত্য বিশ্বাস—জগতের যাবতীয় মহৎ মনোবৃত্তি বিক্রীত হইয়া যায়? এতই যদি দুর্জ্জয় সে প্রলোভন,সে কথা এতদিন সে জানিতে দেয় নাই কেন? সমুদ্রপারের অমূল্যনিধির অন্বেষণে সেও ত একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া আসিতে পারিত! হায় নারী, শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা, শুধু পদমর্য্যাদাই চিনিয়াছিলে?

মাঝে মাঝে সতীনাথের ইচ্ছা হইত, একবার নির্ম্মলচন্দ্রের ঠিকানা জানিয়া তাহাকে গিয়া দেখিয়া আসে। কেমন সে ভাগ্যবান পুরুষ, যাহার আবেদন এমন অলঙ্ঘনীয় অনতিক্রম্য? খবর লওয়া কিছু কঠিন নয়। চেষ্টা করিলে সিভিল লিষ্ট হইতে পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে আর প্রয়োজন কি? সে যে নিজের চোখে কল্যাণীকে দেখিয়া আসিয়াছে। নিজের অপরাধের ভারে সে যে ভারাক্রান্ত নয়, সে কথা ত স্পষ্টই বুঝা যায়। সেদিনের সেই নিমেষের দৃষ্টিতেই ত সারাজীবনের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। দণ্ডদাতা নিজে দাঁড়াইয়া দণ্ডিতের ফাঁসী দেখিয়া লইয়াছেন। তবে আর কিসের অনুসন্ধান?—সতীনাথের অধরে একটু মৃদু হাসি দেখা দিল। মনে হইল, তাহার পন্থা অনুসরণে সেও ত অবহেলা করে নাই। মুখের হাসিটুকু চিন্তার সঙ্গেই মিলাইয়া গেল। সকল সমস্যার মীমাংসা সহজ, কেবল এই বিবাহরূপ সমুদ্রমন্থনের স্ত্রীরূপী কালকূটটুকু, নীলকণ্ঠের মত পান করাই যে বিষম সমস্যা! সে ত মৃত্যুঞ্জয় নহে যে, কণ্ঠে ধারণ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা উপলব্ধি হইবে না। ইহাকে এখন ফেলিবে কোথায়? মনকে ভুলাইবার জন্য যুক্তি খুঁজিলে যুক্তিরও অভাব হয় না। গরীবের মেয়ে বড় ঘরের বউ হইয়াছে, ঠাকুর্দ্দার পয়সা খরচ হইল না, ঢের করা গ্যাছে। থাক্ থাক্, সুখে থাক, সতীনাথের কাছে স্নেহ ভালবাসার দাবী আবার কিসের? যে স্বামী তাহার মুখ দেখিতে নারাজ, তাহার কাছে কি জোর করিয়া দাবী করা কাহারও সাজে? সেও অবশ্য এমন হৃদয়হীন স্বামীর সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে পাওয়ার খুসীই আছে।—মনকে বুঝাইবার যুক্তিতর্কের অভাব ছিল না, তবু সমস্যা, অবুঝকে বুঝানর মত দুরূহ হইয়া উঠিতে থাকিল।

স্বামী ও শ্বশুরের মনে এমনই স্নেহ জাগাইয়া রাখিয়াও উমার দিন কাটিতেছিল। অবিমিশ্র সুখ বা একটানা দুঃখ বিধাতা কাহারও ভাগ্যে ঘটান না। উমারও দুঃখের জীবনে সহস্র অসুখ অশান্তির মধ্যেও একটুখানি জুড়াইবার আশ্রয় মিলিয়াছিল। একটি ক্ষুদ্র হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহের স্পর্শে তাহার নিরানন্দ একঘেয়ে অন্ধকার অপরিসর জীবনপথে তরুণ রবির কনকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া, অন্ধকারের গাঢ়ত্ব হ্রাস করিয়াছিল। সে শান্তিসুখের আধারটুকু সতীনাথের ছোট ভাই সুধীর। আজন্ম ক্ষীণদেহ দুর্ব্বল বালকটি, উমার চেয়ে বয়সে খুববেশী ছোট না হইলেও, বুদ্ধি বিবেচনায় অনেকখানি খাটো। শরীরের ক্ষীণতা, ভারচাপা গাছের মত উপরের দিকে তাহাকে মাথা তুলিতে না দিয়া, একটি কুণ্ঠিত করুণ কোমল শ্রীতে তাহার মুখখানি ভরাইয়া রাখিয়াছিল। চেহারাটিও অত্যন্ত ছেলেমানুষের মত, স্বভাবটুকুও তাই। প্রথম দর্শনেই শৈশবে মাতৃহীন স্নেহবুভুক্ষু চিত্তটি সমবয়সী বউদিদির উপর এমন প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইল যে, দুইজনেই বিস্মিত হইল। আনন্দও পাইল। স্নেহাকাঙ্ক্ষী রুগ্ন দেবরটিকে ভগিনীস্নেহে কাছে টানিতে উমার এতটুকুও বাধিল না। বরং অন্ধকারের অতল সমুদ্র তলাইয়া,অবলম্বনের তৃণগুচ্ছটিকে পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

আত্মীয়ের মধ্যে সতীনাথের পিসিমা আছেন। তিনি তাঁহার সংসার লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। তা ছাড়া, ছেলের মনের বাতাস যে কোন্ পথে বহিতেছিল, তাহার খবরও তিনি বড় বুঝিতে পারেন নাই। তিনি নিতান্ত সাদাসিধা মানুষ। সংসারের চিরপরিচিত চিরপ্রবর্ত্তিত নীতিশাস্ত্রের যে আবার উল্লঙ্ঘন চলিতে পারে, সে জ্ঞান তাঁহার ছিল না। বিবাহ করিল, এখন তাহার কর্ত্তব্য সে নিশ্চয়ই পালন করিবে, এই তিনি জানেন। দেখিয়া শুনিয়া ভালঘরের মেয়ে আনিল, বধূও শান্তশিষ্ট বিনীত, ইহাকে লইয়া ঘর করনা করায় কোনওখানে কোনও বাধা ঘটিতে পারে, এ ধারণাই তাঁহার ছিল না। তাই অবসর মত টানিয়া টুনিয়া চুল বাঁধিয়া, স্নানের সময় প্রচুর তৈল লেপনে চুলের যত্ন লইয়া, কাছে বসিয়া অনিচ্ছুককে জোর জবরদস্তিতে খাওয়াইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব

হইতে তিনি মুক্ত হন। সতী তাহাকে কি চোখে দেখে, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও মনে উঠে না। এমন অকারণ কৌতূহল কেনই বা জাগিবে? তাই উমা ও সুধীরের মধ্যে বিনা বাধায় সখ্যতা জন্মিয়া দুইখানি স্নেহাকাঙ্ক্ষী চিত্তকে প্রগাঢ়ভাবে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী করিয়া তুলিবার পথে কোন বাধা পাইল না।

বউদিদির সহিত দাদার ব্যবহার, সুধীরের মত সংসারজ্ঞানহীন বালকের চক্ষেও কেমন বিসদৃশ ঠেকিত। দাদা যে বউদির প্রতি প্রসন্ন নহেন এবং বউদিও যে তাঁহার সংস্রব এড়াইয়া চলেন, এটুকু বুঝিয়া পর্য্যন্ত, সে তাঁহাদের পরস্পরের আলোচনা হইতে হইতে বিরত থাকিত। তাঁহাদের এই বন্ধনহীন দূরত্বভাব তাহাকেও ব্যথিত করিত। দাদার বিবাহের পূর্ব্বে,ভবিষ্যৎ জীবনের যে সুখের ছবিখানা সে আঁকিয়া, তিনজনের একত্র সঙ্গসুখের কল্পনায় মনকে প্রলুব্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেখানাকেও আবার মুছিয়া নূতন করিয়া আঁকিতে হইল। তা হউক, ইহাতে খুব বেশী ক্ষতি হয় নাই। দাদা বউদির সহিত নাই মিশুন, তাহাকে যে কেহ মিশিতে বাধা দেয় না ইহাতেই সে খুসী। বউদির নিকট হইতে দাদার বিরুদ্ধে যখন কোন অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় না, তখন তাহারই বা ও চিন্তার বা আক্ষেপের প্রয়োজন কি?

বন্ধুত্ব গাঢ় হইয়া আসিলে সে যখন উমার অদ্ভুত অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইতে লাগিল, তখন একেবারেই বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে হইল, সতীদা সেদিন অমরের সাক্ষাতে উমাকে যে সব মিথ্যা অপবাদ দিতেছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে অমোঘ প্রমাণপ্রয়োগের দ্বারা একেবারে সে তাঁহার মতটাকে যদি খণ্ডিত করিয়া দিতে পারিত! কিন্তু উমার সহিত এইখানেই যে তাহার বিরোধ। তাহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বা তদ্বিষয়ক কোন আলোচনা না করিবার জন্য সে তাহার কাছে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কাযেই মনের ইচ্ছা মনেই রাখিয়া চুপ করিয়া দাদার নির্ম্মম মন্তব্যগুলা তাহাকে হজম করিতে হয়। অমরবাবু অবশ্য দাদার কথা বিশ্বাস করেন না, তিনি বলিয়াছিলেন,"কক্ষণো নয়,বউদি নিশ্চয়ই লেখা পড়া জানেন।" দাদা বলিলেন, "পণ্ডিতের বাড়ীর মেয়েরা লেখা পড়া শিখলে বিধবা হয়, তাই পণ্ডিতেরা তাঁদের মেয়েদের কেবল ঘর নিকতে বাসন মাজতে আর রান্না করতে শেখান।" সুধীরের ইচ্ছা করিত, সে চীৎকার করিয়া বলে, কখনই তা নয়, বউদির মত লেখা পড়া সেও জানে না। কিন্তু বলিবে কি করিয়া, বউদি যে আড়ি করিবার ভয় দেখাইয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তবু সে চুপি চুপি এক সময় অমরনাথকে জানাইয়াছে,"দাদার কথা শুন্‌বেন্ না,দাদা কিছু জানেন না।" অমরনাথও হাসিয়া সে কথায় সায় দিয়াছিল, এই টুকুই তাহার সান্ত্বনা।

সুধীর উমার কাছে আসিয়া রাগ করিত, কেন সে দাদার কাছে তাঁহার কথা বলিতে পাইবে না। এ ভারী অন্যায়, দাদা খালি খালি নিন্দা করেন, এইবার সে বলিবে।—উমা সলজ্জ অনুযোগের দৃষ্টিতে বলে, "লক্ষ্মীটি ঠাকুরপো, আমার কথা কিছু বোলো না ভাই। বল যদি, জানব তুমি আমায় একটুও ভাল বাসনা।" উমা বুঝিয়াছিল, সুধীরকে বাধ্য করিবার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্ত্র। সে ভালবাসে না, এতবড় অন্যায় অপবাদ কেমন করিয়া স্বীকার করিয়া লইবে, কাযেই তাহাকে বাধ্য হইয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। তবু এই একমাত্র স্নেহতরুর ছায়াটুকু, তা যত ক্ষুদ্রই হউক, দীপ্তরৌদ্রে মাথা বাঁচাইবার এইটুকুই উমার পরম আশ্রয়, ইহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহার বৈচিত্র্যহীন একটানা জীবন বহিয়া যাইতেছিল।

সুধীর ছাড়া আরও এক যায়গায় সে সম্মান ও শ্রদ্ধা যথেষ্টই পাইয়াছিল। উমা বুঝিয়াছিল, মুরারিও তাহাকে স্নেহ করিতে চায়। কিন্তু মুরারির শ্রদ্ধা মনে মনে গ্রহণ করিলেও, প্রকাশ্যে সে তাহাকে উৎসাহ দিত না। স্বামী-পরিত্যক্তার পক্ষে দূরসম্পর্কীয় বয়োজ্যেষ্ঠ দেবরের কতটুকু স্নেহ মমতার

অধিকার চলিতে পারে, সে তাহা জানে না। মুরারি সতীনাথের চেয়ে দুই চারিমাসের বয়ঃকনিষ্ঠ, এই সম্পর্কে সে দেবর। তাই উমা তাহাকে লজ্জা করিয়া অবগুণ্ঠন না দিলেও, কথাবার্ত্তা কহিত না। আবশ্যক হইলে অপরের সাহায্যে কথা বলিত। মুরারি এ জন্য রাগ করিত, অভিমান করিত। কিন্তু উমা বুঝিয়াছিল, মুরারির সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা করা জেঠামহাশয়ের অভিপ্রেত নয়। উমা অনেক সময় রুদ্রকান্তের কাছে থাকে, তাই মুরারিও আজকাল তাহার মূল্যবান সময় বেশী বেশী জেঠামহাশয়ের সঙ্গসুখে কাটাইতে সুরু করিয়াছে। সরলা উমা ইহার অর্থ না বুঝিলেও, ইহা রুদ্রকান্তের চোখ এড়াইল না। চতুরতায় রুদ্রকান্ত মুরারির চেয়ে হাজার গুণ বড়। মুরারিকে দেখিলেই আজকাল তাঁহার জমিদারী সংক্রান্ত পরামর্শ, চিঠিপত্র লেখান এবং দাবার নেশা এমনি অসংযতরূপে বাড়িয়া উঠে যে উমাকে আর সেখানে প্রয়োজনই হয় না। উমা যে মুরারিকে গ্রাহ্যও করে না, এটুকুও রুদ্রকান্ত বুঝিয়াছিলেন, তাই ইহার ঝড় উমাকে সহিতে হয় নাই ; তবে দুইচারিটা ধূলাবালি উড়িয়া চোখে পড়িয়াছিল। মুরারিকে মুগ্ধ করিয়া উমা যে নিজের পাছে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, একদিন কথাচ্ছলে রুদ্রকান্ত এমনি অস্পষ্ট ইঙ্গিত করায় উমা ক্ষুব্ধ হইয়া মুরারির সাক্ষাতে বাহির হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিল। ভিতরের ঘটনা জানা না থাকায়, মুরারি উমার অত্যধিক সাবধানতায় বিরক্ত ও ব্যথিত হইল। মুরারি পাণ ভালবাসে, অনেক সময় পাণের ছুতায় সে বৌঠান বৌঠান করিয়া, উমার শয়ন ঘরে প্রবেশ না করিলেও, বাহির হইতে হাঁকাহাঁকি লাগায়। তাই উমা পাণ সাজিয়া পিসিমার জিম্মায় রাখিয়া আসিতে লাগিল। মুরারি একদিন পাণ চাহিলে সুধীর কহিল, "পাণ কি এ ঘরে থাকে মুরারিদাদা, পিসিমার কাছে যাও।"

মুরারি বিস্মিত হইয়া বলিল, "থাকে না কেন, এই ঘরেই ত থাকৃত ?"

উমার জবাবে সুধীর কহিল, "এসব কার্পেট মোড়া ঘর, নোংরা, তাই আর রাখা হয় না।"

মুরারি "বেশ" বলিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় একবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষে ঘরের অভ্যন্তরভাগে চাহিয়া গেল, নেপথ্যবর্ত্তিনীর মুখখানা দেখাও গেল না। সে মনে মনে রাগ করিয়া বলিল, "এত বোকা আমি তা বলে নই, এটুকু দিতেও তোমার আপত্তি, তবু যদি দেন্‌দার না ইন্‌সলভেণ্ট হোত।" সতীনাথ যে উমাকে চাহে না, একথা শুধু মুরারি কেন, বাড়ীর মশা মাছিটিও জানিয়াছিল। কিন্তু সে যে এক দিনের জন্যও স্ত্রীর সহিত মুখের আলাপ রাখে নাই, এতটা মুরারি বিশ্বাস করিত না। তাই পাছে তাহার ব্যবহারের কোন ছুতা ধরিয়া উমা সতীর কাছে বলিয়া দেয়, এই ভয়ে সে উমার সহিত সাবধানে কথা কহিত। নিজের অবস্থা বিবেচনা করিয়াই উমা সাবধান হইয়া চলিতে চেষ্টা করিত, নতুবা মুরারির সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। বরং স্নেহাকাঙ্ক্ষী আবদার বায়নার দাবী দাওয়া লইয়া মুরারি যখন পিসিমার নিকট তাহার নামে নালিশ আনিত, সে মনে মনে একটু তৃপ্তিই অনুভব করিত। দূরসম্পর্কীয় হইয়াও সে যে আপনার দাবী রাখে, এইটুকুই যে তাহার নিকট যথেষ্ট। সেই সঙ্গে একটুখানি হাসিও আসিত ;— যাঁহাকে লইয়া সম্পর্ক, কেবল তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা 'পর'।

একদিন খানকয়েক স্বর্ণাঙ্কিত রেশমী বাঁধাই উপন্যাসে অনেক চেষ্টায় "বৌঠানকে উপহার" লিখিয়া মুরারি উমাকে বইগুলি দিতে গেল। উমা পিসিমার কাছে বইগুলি ফেরৎ দিয়া মৃদুস্বরে জানাইল, এ সব বইটই সে পড়ে না, সুতরাং লইবে না।

মুরারির আশাহত মুখের পানে চাহিয়া পিসিমার মায়া করিতেছিল। তিনি মুরারির হইয়া ওকালতী করিলেন, "তা বাছা যত্ন করে দিচ্ছে, নেবে না কেন ? না পড়, বাক্‌সয় তুলে রাখ্‌বে, ঘর সাজাবে।"

মুরারি আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "বলুন ত পিসিমা, কেনা যখন হয়ে গ্যাছে, তখন ত আর ফেরৎ যাবে

না-না পড়েন, রেখে দেবেন। তবু দেখলে গরীব দেওরকে মনে পড়বে।"

উমা মৃদুস্বরকে মুরারির শ্রুতিগোচর করিয়া পিসিমাকে কহিল, "জেঠা মশাই রাগ করেন বই ছুঁলে, পিসিমা; ঠাকুরপোকে বল, আমায় মাপ করবেন, আমি নেব না।"

উমা দ্বিতীয় অনুরোধের হাত এড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি স্থানত্যাগ করিয়া যঃ পলায়তি নীতির অনুসরণ করিলে, ক্ষুণ্ণ মুরারি বইগুলি উঠাইয়া লইল। কিন্তু উমার কণ্ঠস্বরে সেই যে ঠাকুরপোকে মাপ করিতে বলিবার জন্য ক্ষুদ্র অনুরোধটুকু ধ্বনিত হইয়াছিল, সে দিনকার অর্থব্যয় ও মনঃক্লেশ নিবারণের এইটুকুই পরম পুরস্কার রূপে গ্রহণ করিয়া সে নীরবে সেখান হইতে চলিয়া গেল। পিসিমা অপ্রসন্ন মুখে ভাঁড়ারের মশলা বাহির করিতে করিতে ভাবিলেন, "বৌয়ের সব বাড়াবাড়ি! এত কেন রে বাপু! দেওর, যত্ন করে দিচ্চে, দরকার থাক্ না থাক্, নে না কেন? জেঠামশায়ের ভয়েই গেলেন! অত ভয় কিসের? কথাতেই ত আছে, অতি বাড় বেড় না ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ছোট হয়োনা ছাগলে মুড়িয়ে খাবে। এত কেনরে বাবু! ঐ জন্যেই ত কেউ মানে না। অত মিন্‌মিনে হলে কি সাজে? ছোঁড়াও তাই গেরাজ্যি করে না। অতি ছোট গাছ, ছাগলেও যে মুড়িয়ে খায়। জোর করে নিজের দখল বুঝে নে। তা নয়, চোরের মত ভয়ে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে এমন ভীতু ত কোথাও দেখিনি! কখনও মুখে একটা রা শুনলাম না।"

ক্রমশঃ

শ্রীইন্দিরা দেবী।

মিলনোৎকণ্ঠা

চুলগুলি আজ অমন করে' বাঁধিস্ না সই টেনে—
অমন খোঁপা বাসেনা সে ভালো,
গঙ্গাজলী ডুরেখানা বল্ না দিতে এনে—
মানায় কি আজ দেহে বসন কালো?

নখের পরে আলতার টোপ দিস্‌না, পায়ে ধরি,
পরতে যেন করেছিল মানা,
কাঁচপোকা-টিপ কায নাই বোন, সিঁদুর টিপই পরি—
কি চায় সে যে—আছে আমার জানা।

বছর ধরে' নাইক দেখা, সময় হলো আজি;
বল্‌না সখি কখন্ হবে সাঁজ?
ছ'মাস হতে গুণছি যে দিন—দেখছি শুধুই পাঁজি,
মুখ তুলে কি চা্‌বেন হরি আজ?

ছ'মাস হ'তে আসছে সে যে—এম্‌নি নিঠুর স্বামী!
বল্ না লো সই কিসে পরাণ ধরি?
যতক্ষণ না নিজের চোখে দেখছি তারে আমি,
ততক্ষণ আর ভরসা নাহি করি।

প্রাণে আমার কত জ্বালা কত যে সংশয়,
সে কি দেখে প্রাণটা কভু খুঁজে'?
হিয়ার মাঝে জাগছে আমার নিত্য কতই ভয়,—
পুরুষ মানুষ কতটুকুন্ বুঝে?

থাক্ গে সে সব, বুঝাব তায় আজকে আঁখিজলে,
নারী-বধের পাপীরে আজ পেয়ে।
মুখখানি আজ সারারাতি রাখ্‌ব চরণতলে,
তুলব না আর—দেখবুনাক চেয়ে।

নইলে সখি—বলিস যদি—কইব না কো কথা,
সারারাতি মুখ ফিরায়ে র'বো ;
নিঠুর সে যে বুঝেনাক অভাগিনীর ব্যথা,
তার কাছেতে নরম কেন হ'বো ?

বলছি বটে—তেম্‌নি করে' কেমনে বা রই,
আসছে সে যে বছরখানেক পরে,
বিদেশ-বাসে হয়ত বড় কষ্টে ছিল সই,—
সোহাগভরে হাতটি যদি ধরে।

হয়ত বা সে রোগে ভুগে শরীরখানা ক্ষীণ,
আগে ছুটি পায়নি কোনো মতে,
অনাহারে হয়ত বা সে আসছে সারাদিন,
কষ্ট অনেক পেয়েছে সে পথে।

তাইত বলি, হয়ত কিছু হবেই নাক কাযে,
কেমন যেন সরম লাগে বড় !
অনেক দিন যে হয়নি দেখা, হয়ত আবার লাজে,
হবো নূতন বউটি জড়সড়ো।

আজকে আমার মাথার যেন ঘুরছে হাজার যাঁতা,
ডাক্‌ছে যে মেঘ বক্ষে গুরু গুরু ;
বুকের কাছে একটুখানি আন্‌না সখি মাথা,
শোন্‌না আমার বুকের দুরু দুরু।

হাত পা কাঁপে চল্‌তে গিয়ে, কেবল পড়ি টলে'
রকম দেখে নিজেই মরি লাজে,
আয় ননদী, শিরটি আমার রাখি লো তোর কোলে ;
পায়ে পড়ি—ডাকিস না আজ কাযে।

হাজার-হাজার নৌক' যে আজ ভিড়ে মনের তটে,
কাণের ভিতর হাজার-হাজার গাড়ী,
প্রতি পায়ের শব্দে আমার ভ্রান্তি কেবল ঘটে,
ঐ বুঝি সে আস্‌ছে ফিরে' বাড়ী।

হাসিস্‌ না বোন—দাঁড়া আগে আসুকই সে ফিরে ;—
আর কি শুধু আশায় আশায় ভুলি ?
হাসিস্‌ তখন, যখন আমি আকুল আঁখিনীরে,
লব তাঁহার চরণধূলা তুলি'।

শ্রীকালিদাস রায়।

স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন

দেবী সরস্বতীর একনিষ্ঠ সাধক সাহিত্যরসরসিক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন্ আজ ইহসংসার হইতে অপসৃত। বিগত ৮ই কার্ত্তিক রোগে তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে। সাহিত্যসম্পর্কে তিনি দুটি-দশটি কবিতা ও দুটি-দুশটি গদ্যরচনামাত্র রাখিয়া গিয়াছেন। এবং সেগুলিও সাহিত্যের দরবারে বিশেষ কোন উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে কিনা তাহা ঠিক বলা শক্ত ; তথাপি তাঁহার নাম যে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন উজ্জল হইয়া থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম সাহিত্য-ব্যবসায়ী পর্য্যন্ত সে কথায় সাক্ষ্যদান করিতে পারিবেন।

একশ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন, যাঁহারা স্বভাবতঃই রচনাশীল ; স্বীয় প্রতিভাগুণে তাঁহারা সাহিত্য-মধুচক্রের রচনাকার্য্যেই তৎপর। তাঁহারা অন্তর-বাহির হইতে ভাবমধু সংগ্রহপূর্ব্বক উত্তরপুরুষের জন্য তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া যান,—সেই তাঁহাদের কায। আর এক শ্রেণী আছেন, যাঁহারা মধুচক্র রচনায় গৌণভাবে সংসৃষ্ট, তাঁহারা মধু আহারণপূর্ব্বক রচনাকার্য্যে মুখ্যভাবে উদ্যোগশীল না হইলেও, প্রথমোক্ত দলকে রচনাকার্য্যে প্রণোদিত ও উৎসাহিত করেন, সঞ্চয়ের স্থানবিন্যাস করেন এবং সতত সজাগ থাকিয়া চক্ররচনাকার্য্যের সহায়তা ও সৌকর্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

প্রিয়নাথ সেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর; এবং এই শ্রেণীর একান্ত আবশ্যকতা আছে। স্বভাবতঃই এই শ্রেণীর সম্পর্ক ও প্রভাব সাহিত্য অপেক্ষা সাহিত্যিকের উপরেই সমধিক। তাই ইঁহারা রসিক, সমজদার, বোদ্ধা বা বড় জোর সমালোচকভাবেই সবিশেষ সম্মানার্হ। কিন্তু দুই-ই চাই, নহিলে রস জমেনা, গান হয় না। "একাকী গায়কের নহে ত গান, মিলিতে হবে দুইজনে; গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে। তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে; বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে, তবে সে মর্ম্মর ফুটে।"—একজন মুখে গান করে, আর একজনকে মনে মনে গাহিতে হয়, "যেখানে প্রাণহীন বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে"। তাই সারদামঙ্গলের কবি ৺বিহারী লাল হইতে আরম্ভ করিয়া নবীনতম কবি কালিদাস পর্য্যন্ত অল্প বা অধিক পরিমাণে ইহাঁর উৎসাহ বা প্রশংসা-ঋণে আবদ্ধ। বয়সের বা ক্ষমতার তারতম্য না রাখিয়া তাই তিনি সকলেরই বন্ধু বা শুভার্থী। প্রতিভা-কেন্দ্র ঠাকুরপরিবারের অনেকেরই তিনি সাহিত্য-সাহচর্য্য করিয়া, তাঁহাদিগকে এবং নিজেকে ধন্য মনে করিতে পারিয়াছেন। এই বঙ্গবিস্তৃত বিপুল সাহিত্য-মজলিসের দূরতম প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন যেখানে যে কেহ রাগলয়ে সুর ধরিতে পারিয়াছে, কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা বা শক্তির অপেক্ষা না রাখিয়াই তখনই তিনি বড় গলায় বাহবা দিয়া উঠিয়াছেন। কাছে পাইলে বন্ধু-ভাবে তাহার পিঠ চাপড়াইয়াছেন এবং সুযোগ পাইলেই আলোচনা, উপদেশ, পরামর্শ প্রভৃতি মিত্রোচিত ব্যবহারে তদীয় কৃত ও কর্ত্তব্যকার্য্যের পন্থা ও প্রণালী সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া নিজে উৎসাহিত হইয়াছেন এবং তাহাকেও উৎসাহিত করিয়াছেন। নানা-ভাবে ও নানা ভাষায় পারদর্শিতা থাকায় এই বন্ধুকৃত্যে তিনি বিশেষ অধিকারও রাখিতেন। তাঁহার এই সাহিত্য বান্ধবতার ব্যবহারে একটা অসাধারণ সরলতা ছিল; একান্ত অকপটভাবেই তিনি নিন্দা বা প্রশংসা করিতে পারিতেন এবং ঐ আন্তরিকতাই বন্ধুজনের নিকট তদীয় বক্তব্যবিষয়ে সর্ব্বদা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিত। বয়সের প্রভেদ তাঁহার এই সাহিত্য-সাহচার্য্যের কখনও অন্তরায় হয় নাই; যুবাবৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে তিনি সকলেরই বন্ধু হইতে পারিতেন। সাহিত্যতীর্থের যাত্রী হইলেই হইল—আর কোন কিছু তিনি দেখিতেন না, দেখিতে জানিতেন না। সাহিত্যের বয়স নাই; সাহিত্যিকের বয়স লইয়া কি হইবে? রসই সব; তাই নিজে সেই রসের রসিক, রসের মর্ম্মী হইয়া ঐ রসের রসিক পাইলেই তিনি একেবারে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ধরিতেন—রসের পাত্রবিচার করিতেন না। 'যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সেই আমার প্রাণ রে'—তাই রসের রসিক হইলেই সে তাঁহার প্রাণ হইয়া পড়িত। মুরুব্বিয়ানা তাঁহার স্বভাবের মধ্যে ছিল না। যাহাকে ভালবাসিতেন, তাহাকে প্রাণ দিয়াই ভাল-বাসিতেন; ওজন করিয়া, হাত রাখিয়া ভালবাসা তাঁহার স্বভাব ছিল না।

তাঁহার আর এক বিশেষত্ব ছিল, তাহা তাঁহার অহমিকাশূন্যতা। অধিকাংশ লোকই এই অহমিকার হাত এড়াইতে পারেন না—বিশেষতঃ সাহিত্যপন্থীরা। যে ভাব, যে কথা ভাল বা নূতন বলিয়া মনে হয়, তাহা নিজে লিখিয়া বা প্রকাশ করিয়া বাহাদুরী লইবার প্রবৃত্তি এই শ্রেণীর লোকের মজ্জাগত। প্রিয়-নাথ সেন তাঁহার কত ভাব কত চিন্তা কত রস যে তাঁহার সাহিত্য-বান্ধবদিগের রচনার মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা তিনি নিজে বিস্মৃত হইলেও, তাঁহাদের বিস্মৃত না হইবারই কথা। সাহিত্যের এই নিঃস্বার্থ 'মহাজনী' তাঁহার প্রাণের ব্যবসায় ছিল। আমার সাহিত্য বড়, আমার সাহিত্য ভাল হইলেই হইল। আমি সেখানে আমল পাই বা না পাই, তাহা আক্ষেপের বিষয় নহে। "ঠাই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি";—আমার ঠাঁই না হউক, আমার কৃত কর্ম্ম—আমার সোণার ধান ত ঠাঁই পাইবে। সে ধান সোনার তরীতে বহিয়া সাহিত্যসরস্বতী একদিন তাঁহার সোনার গোলায়

ভরিয়া রাখিবেন ইহা যে নিশ্চিত।

এই সরস্বতীসেবা তাঁহার ইহজীবনের একমাত্র সাধনা ছিল। ইহা তাঁহার দিবসের চেষ্টা তাঁহার রজনীর চিন্তা, জাগ্রতের ধ্যান, তাঁহার সুপ্তির স্বপ্ন ছিল। তাঁহার হৃদয়পুষ্প দিনে কমল এবং রাত্রে কুমুদ হইয়া সূর্য্য বা চন্দ্ররূপী বাণীচরণ চাহিয়াই নিয়ত উন্মুখী হইয়া থাকিত। কোন কার্য্যই তাঁহার করণীয় নহে, যদি তাঁহার পরমকর্ত্তব্য সরস্বতীসেবা তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয়; অর্থ তাঁহার কাছে নিরর্থক, যদি বাণীবন্দনা তাহাতে সার্থক হইয়া না উঠে; আত্মীয় পরিবারও তাঁহার নিকট প্রিয় নহে, যদি তাঁহার প্রিয়তম সাধনা প্রতিদিন তৎসাহচর্য্যে প্রিয়তর হইবার অবকাশ না পায়। Newman বা Thackerএর দোকানে তাঁহার সঞ্চিত অর্থ প্রাণপণ চেষ্টায় গচ্ছিত রাখিয়াছেন, ব্যাঙ্কেও মানুষ তেমন প্রাণপণে গচ্ছিত রাখে না; দপ্তরীর বাড়ীতে তাঁহার প্রিয়পুস্তকের আচ্ছাদন অলঙ্কার প্রতিনিয়তই প্রস্তুত হইতেছে, Laidlaw বা লাভচাঁদের বাড়ীতে নহে। গৃহ তাঁহার পুস্তকরাশির আবাসস্থান, আলমারিতে পরিপূর্ণ, তাঁহার নিজের সেখানে থাকিবার যতই অসুবিধা হউক। পঞ্চতপার ন্যায় পাঁচদিকে পুস্তক পরিবৃত হইয়া অহরহ তিনি তপস্যামগ্ন, কিন্তু সে তপস্যা কৃচ্ছ্রসাধ্য নহে—তাহা ভূমানন্দের। নিজে 'টাকায় তিনখানা' কাপড় পরিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু হস্তে যে পুস্তক, তাহা বিলাত হইতে বহুমূল্যে বাঁধিয়া আসিয়াছে। শীতবস্ত্র তাঁহার শত ছিদ্র, কিন্তু কীটের সাধ্য কি তাঁহার পুস্তকদেহে একটি ছিদ্র করে! স্পর্শশক্তি তাঁহার এত প্রবল দেখিয়াছি যে, অসংখ্য অর্থক্রীত সংখ্যাতীত গ্রন্থরাজির মধ্যে যে কোন নি গ্রন্থ আঁধারে অনুভবমাত্র করিয়া বলিতে পারিতেন, ইহা অমুক বইয়ের অমুক সংস্করণ। হায় রে! প্রীতি বুঝি এমনি করিয়াই প্রিয়তমকে প্রাণের কাছে পরিচিত করিয়া তুলে। হীনজ্যোতিঃ চক্ষুও বুঝি প্রিয়বস্তুকে দূরে হইতে দেখিয়া তৃপ্ত হইত না, তাই পাঠকালে পুস্তক একেবারে প্রায় চক্ষুসংলগ্ন করিয়াই রাখিত—যেন একান্ত অনুরাগভরে বলিতে চাহিত, "আও, মেরে শিরো আঁখোপে বৈঠো।" * নিবিড় আলিঙ্গনের বাধা বলিয়া রাধা তাঁহার কৃষ্ণকে এই জন্যই বুঝি বক্ষের চন্দন অপসারিত করিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন।

কথা কহিবার ভঙ্গী তাঁহার সাধারণ হইতে একটু স্বতন্ত্র ছিল। সাধারণতঃ কথা খুব বেশী কহিতেন না, কিন্তু যাহা কহিতেন, তাহা খুব আগ্রহ ও তেজের সহিত কহিতেন। একটি বাক্যের অৰ্দ্ধেকমাত্র ভাষায় কহিতেন, বাকী অৰ্দ্ধেক মুখচোখের ভাব বা বিষয়ানুসারে হাসি বা দীর্ঘশ্বাস, গাম্ভীর্য্য বা উচ্ছ্বাসের দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতেন। এই খানিকটা ভাষা ও খানিকটা আভাস একত্র মিলাইয়া তবে তাঁহার বাক্যটি সমাপ্তিলাভ করিত। সাধারণ বিষয়ে তিনি একান্ত স্বল্পভাষী ছিলেন। কাযের কথা যাহাকে বলে, তাহা কোন মতে তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ভাবরাজ্যের, সাহিত্যরাজ্যের কথা ফাঁদিতেন এবং ডাঙায় তোলা মাছ জল পাইলে যেমন ছিটকাইয়া ডুব মারিতে চায়, তেমনি ডুব মারিতে চাহিতেন। সাহিত্যের কথা উঠিলে, পূর্ব্বেকার মানুষটি যেন সহসা একনিমেষে বদলাইয়া গিয়া, ভিতর হইতে আর একটি মানুষ বাহির হইয়া আসিত। তখন তাঁহার উচ্ছ্বাসের আর অন্ত থাকিত না—স্থান কাল পাত্র জ্ঞান থাকিত না—একেবারে মাতিয়া উঠিতেন। কখনও বা কণ্ঠস্বর এমন উচ্চ হইত, হাস্য এমন প্রবল হইত, দীর্ঘশ্বাস এমন মর্ম্মান্তিক হইত এবং মৌন এমন সুগভীর হইত যে, সহসা তাহা নূতন লোকের পক্ষে তাঁহার জন্য আশঙ্কার সৃষ্টি করিত। যাঁহার সহিত কথা হইতেছে, হঠাৎ ঐ হাসি শুনিয়া তিনি হাসিতে ভুলিয়া যাইতেন, কাছে শিশু থাকিলে সে চমকাইয়া উঠিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িত। মূল কথা, তাঁহার অন্তর্নিহিত যে প্রাণশক্তি, তাহা যেন ঐ সাহিত্যালোচনায় একেবারে সজাগ হইয়া উঠিত এবং আশপাশের সকলকে সচকিত করিয়া তুলিত।

* প্রিয়বাবু অত্যন্ত short sighted ছিলেন—বই একেবারে চোখের কাছে লইয়া পড়িতেন।

ফরাসী সাহিত্যের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ঐ সাহিত্যের গদ্যরচনা তাঁহার মতে রচনার আদর্শ—একথা তাঁহার মুখে যে কতবার শুনিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি সাহিত্যরস পাইলে পাত্রবিচার করিতে জানিতেন না। প্রসঙ্গক্রমে যদি Victor Hugoর কথা উঠিল, তবে বুঝিতে হইবে যে সেদিন তাঁহার স্নানাহার বন্ধ, সময়ের পরিমাপ রাখিবারও সময় নাই। Victor Hugo লোক কেমন, তাঁহার মনুষ্যত্ব কত বৃহৎ, দেশহিতৈষণা তাঁহার কত গভীর ও সত্য, তাঁহার গদ্যরচনার মূলমন্ত্র কি, গীতি-কাব্যে তাঁহার বিশেষত্ব কোথায়, Shakespeareএর সহিত তাঁহার প্রভেদ কোন্ জাতীয় ;—সেইখানেই কি শেষ ? তাহা হইলে ত নিস্তার ছিল। Victor Hugo হইতে Guy de Maupassant,Maupassant হইতে Theophile Gautier ; কাহার কি বিশিষ্টতা, কৃতিত্ব কাহার কতখানি—অর্থাৎ শ্রোতার আর সেদিন অন্য কোন কাযকর্ম্মের আশা নাই। Balzac ও Rousseau সম্বন্ধে তাঁহার মত, তাঁহার ভাষায় :—"ঐ 'দেখ কি কাণ্ড! কি অদ্ভুত ঐ Balzac লোকটা! কি ব্যাপার! কি plot, কি বাঁধুনি! কি বিদ্রূপ, কি চাবুক! আর ঐ Rousseau! কি অকুতোভয় সত্যপ্রিয়তা! জায়গায় জায়গায় কি নূতন মত প্রকাশের সাহস—মনে হয়, যেন যে পাতায় উপর লেখা—তা জ্বলে যাবে—এমনি তেজ!" তাঁহার মতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি-হিসাবে কালিদাসের তুলনা নাই, সৌন্দর্য্যরচনায় আর এক মহাজন Keats। Gautierর রচনা কোথাও কোথাও সেই কালিদাসকে approach করিয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের সমবেদনা ও সহানুভূতির আদর্শলেখক Victor Hugo ও Guy de Maupassant। ওরূপ broad sympathy,বেদব্যাস ও Shakespeare ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে Shelley, Keats ও Browning তাঁহার বিশেষ প্রিয়। Shelleyর কল্পনার সুদূরতা ও গভীরতা অনন্যসাধারণ। Shelleyর কাব্য তাহার উধাও-পক্ষে পাঠককে উড়াইয়া এমনি স্থানে লইয়া যায়, সেখানে বাতাস নাই, শুদ্ধ Ether—সেখানে দম আট্কাইয়া আসে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। Swinburne তাঁহার আর এক প্রিয় কবি। সমুদ্র যেমন একক, অনন্ত, অসীম, সঙ্গীহারা, সৃষ্টিছাড়া, তাঁহার সিন্ধুসম্বন্ধীয় সঙ্গীত-গুলিও তেমনি ছন্দরহিত ; জার্ম্মান কবি Goethe তাঁহার মতে শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন।—ইত্যাদি কত রসের কথা, কত ভাবের কথা, কত সাহিত্যের মর্ম্মের কথা পর-পর সম্পর্ক রাখিয়া অবলীলাক্রমে তিনি বলিয়া যাইতেন, যে একসঙ্গে সেগুলি বুঝিয়া লইতে শ্রোতাকে বিব্রত হইতে হইত। অথচ নিষ্কৃতি নাই—একবার যদি তাঁহাকে কোন গতিকে ঘাঁটাইয়াছ, ত 'বৈকুণ্ঠের খাতার' জাঁতাকলে ইঁদুরের মত আট্কা পড়িয়া গিয়াছ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার যে কি ধারণা, কতখানি দরদ তাহা লিখিয়া বোঝান শক্ত। একে প্রতিভার টান, তাহাতে সৌহার্দ্দের আকর্ষণ, তাই রবীন্দ্রনাথের কথা, তাঁহার রচনার কথা, তাঁহার ভাবের উদারতা তাঁহার কল্পনার অসীমত্ব, তাঁহার ভাষার সম্পদ, তাঁহার কত কিছু—বলিতে বলিতে সেই স্বল্পভাষী গম্ভীরবেদী পুরুষ একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। তেমন আন্তরিক সাহিত্য প্রীতি তেমন অকপট রসানুরাগ, তেমন অকৃত্রিম কাব্যপ্রিয়তা জীবনে দেখি নাই, বুঝি আর দেখিবও না।

জ্ঞানান্বেষী, রসপিপাসু, সাহিত্যপ্রিয় সুপণ্ডিত সেই প্রিয়নাথ আজ ইহলোক হইতে অবসর লইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত দারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি বহু টাকার নূতন গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছিলেন। আমাদের ইহা বুঝিয়া উঠিতে বিলম্ব হয়।

এই ক্ষুদ্র লেখক তখন কার্য্যব্যপদেশে কোন এক সুদূর পল্লীতে—সেখানে সংবাদপত্র পর্য্যন্ত পঁহুছেনা, তাই সংবাদ পাইবার সম্ভাবনা বড় ছিল না। তবু, সংবাদ পাইলাম, কারণ সে সংবাদ যে চাপা থাকে না।

সংবাদ পাইলাম, তাঁহার এক দরদী সাহিত্যবন্ধুর নিকট হইতে। সে দরদী বন্ধু, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ। পত্র পাইলাম :—

"যতীন,

"আজ একটি দুঃসংবাদ দিতে বাধ্য হইতেছি। তোমার বন্ধু, আমার বন্ধু, বঙ্গসাহিত্যের বন্ধু, কৃতী-লেখক, বোদ্ধা ও সমালোচক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন আজ কয়দিন যাবৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দেহ-মনে কিছুদিন হইতে যেরূপ অসুস্থ এবং অসুখী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে মৃত্যু নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় হয়ত বা ছিল না। এরূপ দুঃখী জগতে হয়ত আরো আছে, যাহারা মরিতে পাইলে বাঁচিয়া যায়, কিন্তু প্রার্থিত দ্রব্য সমস্তই দুর্লভ—মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়ে দুর্লভ হইয়া দাঁড়ায়। ভোগাভোগের অন্ত না হইলে, সূর্য্যতনয়ও দয়া করেন না। প্রিয়বাবু গিয়াছেন, তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বান্ধবসমাজ, এবং বঙ্গদেশ ও সাহিত্য যে গুণী গুণগ্রাহী রসজ্ঞজনকে আজ হারাইল, কবে কে সে স্থান পূরণ করিবে বিধাতাই জানেন।"

পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। হায়! চিরপ্রয়াণের পূর্ব্বে একবার শেষ সাক্ষাৎও হইল না! সেদিন সমস্ত দিবারাত্রি বুকের মধ্যে যে গুরুভার বোধ করিয়াছিলাম, তাহা আমিই জানি। মনে হইল, প্রিয়বন্ধু ত স্বর্গগত, সেই সঙ্গে সাহিত্যের একটা দিক্‌পাল আজ অন্তর্হিত হইল। ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণাদির মধ্যে তিনি সেই দিক্‌পাল, যাঁহার প্রভাব আমরা প্রবলভাবে অনুভব করি না, কিন্তু যাঁহার স্নিগ্ধ হাস্যে এবং স্মিত সৌন্দর্য্যে সাহিত্যের ক্ষুদ্র গোষ্পদটি পর্য্যন্ত আলোকে পুলকে উচ্ছ্বসিত উল্লসিত হইয়া উঠে।

সাহিত্যযাত্রার পথে তাঁহার শৈশব-সহচর সাহিত্য সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে প্রিয়নাথ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এইখানে তাহা উদ্ধৃত করি।

"এই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনার দ্বারা আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম, যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমাকে কাব্যরচনার বিকাশ চেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্ব্বে 'ভগ্নহৃদয়' পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড় রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্ব্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভাললাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্ব-সাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে, বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি, সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত বলা শক্ত।"

উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে, সাহিত্য-সম্বন্ধে তাঁহার কৃতিত্ব কোন্‌খানে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' ইঁহারই নাম উৎসর্গীকৃত। বন্ধুবর আজ বিদেশে। তাঁহার বই-পাগলা চন্দর-দা আজ ইহলোকের চিরপ্রিয় পুস্তক ফেলিয়া পরলোকপথের পথিক—সেখানে কোন্ জ্যোতিষ্কের আলোকে কোন্ তারায় লেখা গ্রন্থের কোন্ অজ্ঞাত রহস্যের অনন্ত পাথারে আজ নিমজ্জিত কে জানে! প্রিয়বর বন্ধুবর কবিবর আজ তাঁহার এই কথাশেষ বন্ধুর সম্বন্ধে একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

ইংরাজি গদ্য পদ্য রচনাতেও প্রিয়নাথের অসাধারণ

ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ঐ—তিনি বড় লিখিতে চাহিতেন না, কোন বই লইয়া মস্‌গুল্ হইয়া থাকিতেন। এইখানে তাঁহার রচিত একটি ইংরাজি কবিতা উদ্ধৃত করিলে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

AT THE YEAR'S END

The year has found its goal,
Hope finds no work to begin,
Life yawns—a barren waste,
When—when will death close in ?

What sturdy thorns to fight
To win a short-lived rose !
For a doubtful dawn to pass
What nights of sleepless throes ?

A wisp's faint light in front,
Behind—the heaven's dome
Glares red, a beacon fire,
Fed by my burning home.

উক্ত সনেটটি সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট ইংরাজ-সমালোচক ও মনীষী যাহা বলিয়াছেন, শুনিলে আনন্দে বুক ফুলিয়া উঠে। কাব্যরসের বিশেষজ্ঞ প্রবীণ সমালোচক Edmund Gosse এর পত্রখানির কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

Your verses remind me of the English poetry of Goethe, which had similar peculiarities. I am sure you will not mind being compared with so emiment a man.

Believe me, with many thanks for your letter,

Yours sincerely
(Sd.) Edmund Gosse.

Preo Nath Sen Esq.

প্রিয়নাথের মৃত্যুর পর নানা দৈনিক ও মাসিক পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে—সেগুলি অল্লাধিক পরিমাণে বিগত সাহিত্যরসিক সম্বন্ধে শোকবার্ত্তা মাত্র। অগ্রহায়ণ সংখ্যা "সবুজপত্রে" ৺প্রিয়নাথ সম্বন্ধে শ্রীপ্রমথ চৌধুরী-স্বাক্ষরিত একটি ঈষৎ বিস্তারিত মন্তব্য পরিদৃষ্ট হইল। আশা ছিল, পরলোক-গত প্রিয়নাথ সম্বন্ধে ও তাঁহার চিরপ্রিয় সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু রসলাভ ঘটিবে; কিন্তু "সবুজপত্রে"র ক্ষুদ্র সাড়ে চারি পৃষ্ঠা মন্তব্যে একুশটি 'আমি' ও 'আমার' দেখিয়া কণ্টক-লাঞ্ছনাই আমাদের কপালে ঘটিয়াছে একথা বলিতে আজ একান্ত দুঃখের সহিত বাধ্য হইতেছি। পর-লোকগত মনীষীর বিয়োগব্যথা বিবৃত করিবার উপলক্ষে এই 'আমি-আমি'র অহমিকাপূর্ণ আত্মপ্রশস্তি একান্তই অশোভন—এমন কি অসহ্য। শ্মশানবান্ধবতা করিতে বসিয়াও যাঁহারা Ego বা আমিত্ব পরিহার করিতে অক্ষম, বরং সেই শোকাবহ ব্যাপারকে আত্মাভিমান জাহির করিবারই উপায় করিয়া লইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁহাদের আর কি বলিতে পারি ? হায় রে আত্মস্তুতি ! হায় রে হাততালির লোভ !

সুবর্ণবণিক সমাজের মুখপত্র "সুবর্ণবণিক সমাচারে" প্রিয়নাথ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই পরলোকগত মনীষী সম্বন্ধে সুগভীর বেদনার পরিচয় পরিস্ফুট। কেবল উক্ত সমাজ তাঁহার বিয়োগে ব্যথিত নহেন; সমস্ত বঙ্গীয় সমাজ, বিশেষতঃ বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজ, আজ বেদনাতুর। জাতিগত হিসাবে তিনি সুবর্ণবণিক থাকুন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে সু-বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন, একথা যে একেবারেই অত্যুক্তি নহে, ইহা বোধ করি সাহিত্যসমাজের সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বণিকবৃত্তি তাঁহার কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না—কিন্তু তিনি যে সুবর্ণ এবং খাঁটি সুবর্ণ ছিলেন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।



কবিবর রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ সেনকে
'গোড়ায় গলদ' পড়িয়া শুনাইতেছেন :

(৺প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের পুত্রগণের সৌজন্যে)

শুষ্ক কাষ্ঠের আত্মকাহিনী

ফুরায়ে কি এল দিবসের আলো, ঘনায়ে এল কি রাতি ?
সন্ধ্যা এল কি মেঘকুন্তলে ফুটায়ে তারকা-ভাতি ?
বাজায়ে এলে কি সাঁঝের শঙ্খ, পরশি অধরে নিষ্কলঙ্ক,
আবরি আঁচলে, তুলসীর তলে দেখায়ে আসিলে বাতি ?
দেবী লক্ষ্মীর আসন রচিয়া, হে গৃহলক্ষ্মি, এলে অর্চিয়া ?
নিদ্রা বসিল শরণাগতের কমলনয়ন পাতি' ?
প্রাঙ্গণে তব, ওগো অঙ্গনে, জাগিল কি যুথি জাতি ?

আসিলে কি তাই অন্নপূর্ণে, রন্ধনগৃহে তব ?
অমৃত সমান আজি তব দান—মরণে বরিয়া ল'ব।
আমি অভাগ্য কাষ্ঠ নীরস, পাব ও কোমল করের পরশ,
জ্বলিয়া অনলে, মরম-কাহিনী তোমারে খুলিয়া ক'ব,
তোমারে পরশি, মরণের মুখে চেতনা লভিব নব !

দূরে আঙিনায় আমি ছিনু এক সামান্য সহকার ;
জন্মকাহিনী—শৈশব কথা—বল মনে থাকে কার ?
কিন্তু এখনো বেশ মনে পড়ে, নববধূ তুমি আসিলে এ ঘরে ;
অনতি-বাল্যে তখনো আমার দেহে শোভা সুকুমার।
নব কিশলয় পত্র শ্যামল তপন-কিরণে করে ঝলমল,
বর্ণ উজ্জ্বল যেন মখমল—সেদিন আছে কি আর ?
সেই আমি আজ, হায় অদৃষ্ট, শুষ্ক কাষ্ঠ-সার !

মনে পড়ে তব মোহিনী মাধুরী, তুমি চিনিতে না তারে,
চরণ-নূপুর-রুণু-রুণু রোলে চিনিত গো সে তোমারে।
দেখেছি, স্মরিয়া পিতৃভবনে, মন্দাকিনীর ধারা দুনয়নে ;
আবার নিমেষে হাসিটি ফুটেছে আড়ালে হেরিয়া কারে,
কার দুটি আঁখি ঘুরিত ফিরিত তোমারি গো চারিধারে !

মূক আমি হায়, ওগো সুন্দরি, কেমনে তোমারে কব,
সে কি শিহরণ জাগিত হিয়ায় সুখ দুখ দেখি তব।
যতন-লালিতা তুমি যথা ধনি, হেলা অনাদরে আমিও তেমনি,
নবযৌবনে উঠিনু জাগিয়া উল্লাসে অভিনব !

একদা একটি লতা ক্ষীণকায়, কম-তনু দিয়ে ঘিরিয়া আমায়
কহে কাণে কাণে, "তুমি বর মম, আমি তব বধূ হব।"
পিক মুহু-মুহু গাহে কুহু কুহু, কেন তা' কেমনে ক'ব!

তদবধি দোঁহে হয়ষে বিভোর চেয়েছি তোমার পানে;
কখনো দেখেছি তাপসী রূপসী প্রবাসী-প্রিয়ের ধ্যানে।
কভু বা বিমনা চাহি বাতায়নে, ছল ছল ছুটি নলিন নয়নে,
পরিচিত প্রিয়হস্তের বুঝি পরশ জাগিছে প্রাণে!
কখনো ধরিয়া পতি-কর খানি, চাহি আকাশের পানে!

কত পাখী আসি কুলায় রচিয়া, মুখর করিল মোরে!
আমারে ঘেরিয়া বাড়িল লতিকা বেড়ি কত স্নেহডোরে!
একদা সহসা বৈশাখী ঝড় এল উদ্দাম—মৃত্যুদোসর;
সম্মুখ রণ জানেনা অধম; অতর্কিতের ঘায়,
মূর্চ্ছিত হয়ে লতাটিরে লয়ে ভূতলে লুটানু হায়!

কোথা গেল, যারা আশ্রয় বলে' ডালে বেঁধেছিল বাসা?
জীব গড়ে আর ভাঙ্গেন বিধাতা, তবু জীব করে আশা!
আবার চকিতে লভিনু চেতন, বক্ষে বাজিল কঠিন বেদন,
জড়িত যেখানে লতাটি আমার—হায়রে কি ভালবাসা,
মরিবে—তবুও আমারে আবরে, কুঠার-আঘাত ধরে তনু পরে;
চেতনা আমারে ত্যজিল অমনি;—শেষ হয়ে আসে ভাষা,
এক তিলে যায় ফুরায়ে সকলি,—তবুও জীবের আশা!

কি জানি আজিকে জাগিনু কেমন, তব কর-পরশনে;
এই দেখ বালা, সে সাধের লতা ছিন্ন আমারি সনে;
অঙ্গে অঙ্গে আজো সে বাঁধন, —এই ছিল তার প্রাণের সাধন;
নিঠুর দৃশ্য দেখিতে কি শেষে, লভিনু এ চেতনে?
আমিও তোমারে এ আশিস্ করি,— কম-তনু ঘিরে প্রিয়েরে আবরি
তব মনোমত মরণ লভিও জীবনের শেষক্ষণে।
আমারে মুক্তি দেহ কল্যাণি, অনল-সমর্পণে!

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

শিল্পী

(গল্প)

সে ছিল শিল্পী। কঠিন পাথরের উপর ভাব ও সৌন্দর্য্য বন্দী করিয়া রাখাই তাহার কায। পাথর কাটিয়া চাঁচিয়া সে মানস সৌন্দর্য্যকে এমনি করিয়া মূর্ত্তি-দান করিত যে, তাহার কাছে এই বাস্তব বিশ্বের সদা পরিবর্ত্তমান সৌন্দর্য্যকে মাথা নত করিতে হইত।

অল্পদিনের মধ্যেই এই তরুণ শিল্পীর অসাধারণ ক্ষমতার কথা সমস্ত দেশে ছাইয়া পড়িল। তখন নানা দিক হইতে রাজা মহারাজার শতভাবের ফরমাস তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। শিল্পীও একে একে সবাইকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতে লাগিল।

আপন বলিতে শিল্পীর কেহই ছিল না। নিতান্ত একেলাই সে চিরকাল তাহার জীবনটা কাটাইয়া আসিয়াছে। ইহাতেই সে অভ্যস্ত। মানুষের সংসর্গ তাহার কোনও দিন সহ্য হইত না। এজন্য সংসর্গের অভাবও সে কোনও দিন বোধ করে নাই। পৃথিবীর সুখ-সৌন্দর্য্যের সাথে একটা পিপাসা একটা মলিনতা অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত বলিয়া তাহার মনে হইত। নির্ম্মল শিল্পের উপাসক সে, তাই তাহার অন্তর ক্রমে ক্রমে মানুষকে ঘৃণা করিতে শিখিল। সে মনে করিত, পৃথিবীতে যাহা কিছু আনন্দ আছে, সমস্তই সে তাহার শিল্পচর্চ্চার ভিতর খুঁজিয়া পাইবে। তাই ভগবান যেমন তাহাকে মানুষের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, সে নিজেও তেমনি তাহার চতুর্দ্দিকে মানুষের প্রতি একটা বিতৃষ্ণার বেড়া গড়িয়া তুলিয়া একান্ত মনে নিজের প্রিয় কায করিয়া যাইতে লাগিল।

এমনি করিয়া অনেকগুলি বছর তাহার কাটিয়া গেল। কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু শিল্পীর একটানা জীবনে একটা পরিবর্ত্তনের হাওয়া বহাইয়া দিল। সমজদারদের প্রশংসাবাণী ও নব নব পরিকল্পনা-জনিত নিজের উৎসাহ আর তাহাকে তেমন করিয়া মাতাইয়া তুলিতে পারে না। এতকাল সে ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কি অদম্য উৎসাহেই কায করিয়া গিয়াছে! কিন্তু এতকাল পর মাঝে মাঝে তাহার একাগ্রতার সূত্রটি ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল—শ্রান্তি বলিয়া একটা জিনিষের অভিজ্ঞতা তাহার জন্মিতে লাগিল।

এমনি সময়ে একদিন—তখন বসন্তকাল আসিয়া তাহার সোণার কাঠির স্পর্শে পৃথিবীর প্রাণসঞ্চার করিয়া গিয়াছে;—সে তাহার নির্জ্জন গৃহে বসিয়া কায করিয়া যাইতেছিল। তখন সন্ধ্যা—অস্তগত রবির সবটুকু রশ্মি তখনও মুছিয়া যায় নাই। তাহার মনের উপর একটা ভাল-না-লাগার ভাব জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে নিতান্ত নিরুৎসাহ করিয়া তুলিল। সে তাহার কায ছাড়িয়া খোলা জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাসন্তী সন্ধ্যার মদির বাতাস তাহার চোখে মুখে একটা পেলব পরশ বুলাইয়া দিল। সে দেখিল, ঊর্দ্ধে নীল আকাশের প্রান্তে ছোট ছোট মেঘগুলিকে কে যেন প্রাণের রঙ্ দিয়া রাঙিয়া দিয়াছে। আর সম্মুখে, পথে বিচিত্র পোষাক পরিয়া দলে দলে যুবক যুবতী চলিয়াছে। তাহাদের হাত পরস্পর-সংবদ্ধ; গলায় তাহাদের বসন্তের উপহার নানাগন্ধী পুষ্পমালা। তাহাদের হাসি-ভরা মুখ, চঞ্চল চলন, চটুল চাহনি ও অনাবিল হাস্য-পরিহাস শিল্পীর চোখের সম্মুখে একটা লোভনীয় মায়া-পুরী রচনা করিয়া তুলিল। আজ শান্ত সন্ধ্যার পরশ, ফোটাফুলের হাসি, অমুজ্জ্বল আকাশ ও দখিণা বাতাস—সকলে মিলিয়া যেন শিল্পীকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিল,—

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।"

শিল্পদেবী তাহার চোখে যে অঞ্জন লেপিয়া দিয়াছিলেন, এতদিন পর তাহা মুছিয়া গেল। কল্পনার সৌন্দর্য্য ছাড়া যে একটা বাস্তব সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব আছে, এতদিনে সে তাহা অনুভব করিল। এবং বাস্তবতার একটা দুর্জ্জয় আকর্ষণ তাহার প্রাণের উপর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ক্ষুধিত চিত্ত তাহার বুকের ভিতর আজ প্রথম সাড়া দিয়া উঠিল। কল্পনায় সে ডুবিয়া ছিল, আজ বাস্তবতা তাহার সেই ক্ষুধিত চিত্তকে নানা দিক দিয়া টানিতে লাগিল। শিল্পী বুঝিল, বাস্তবতার রস-সিঞ্চনের অভাবে তাহার কল্পনা আজ শীর্ণ, প্রাণহীন।

তাহার ক্ষুধিত প্রাণ আপনা আপনি কেবলই কাঁদিয়া লুটাইতে লাগিল। কিন্তু শিল্পী নিরুপায়। এতকাল সে পৃথিবীর সহিত কোনও সংস্রব রাখে নাই, উহাকে সে বর্জ্জনই করিয়া আসিয়াছে,—আবার কি করিয়া সে পৃথিবীর সহিত যোগ দিবে, নিজের জীবনটাকে অপর দশ জনের মত সহজ সরল করিয়া ফেলিবে, ইহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। অথচ তাহার পিপাসিত রিক্ত চিত্তকে অপর একটি মাধুরীমণ্ডিত প্রাণ দিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা তাহার চিত্তে গুমরিয়া মরিতেছিল। কিন্তু অনভ্যস্ত লাজুক শিল্পী পথ খুঁজিয়া পাইল না।

সৌন্দর্য্যের শিল্পী সে। সৌন্দর্য্যের রাণী একটি রমণী ছাড়া তাহার এই ব্যাকুল প্রাণ কেহ সার্থক করিতে পারিবে না। কিন্তু পৃথিবীর দ্বার তাহার কাছে বন্ধ, তাই কল্পনা-প্রিয় শিল্পী আবার কল্পনার আশ্রয় লইল। সে ভাবিল, পাথর দিয়া এক রমণী-মূর্ত্তি সে গড়িয়া তুলিবে—তাহারই চরণে প্রীতির শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করিয়া আপন হৃদয়ের সব শূন্য ভরিয়া লইবে।

এই মনে করিয়া পরদিন সে নূতন উৎসাহে কাযে লাগিয়া গেল। সকলের সেরা একখানা পাথর বাছিয়া লইল। তারপর অদম্য উৎসাহে ধীরে ধীরে তাহাতে স্বীয় কল্পনার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য গড়িয়া তুলিতে লাগিল।

বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম যখন শেষ হইল, তখন পূর্ণযৌবনা নিখুঁত একটি রূপসী তাহার রূপের ভরা লইয়া শিল্পীর সম্মুখে দণ্ডায়মান! যৌবনশ্রী তাহার সারা অঙ্গে উছলিয়া উঠিয়াছে। শিল্পীর মুখে আবার হাসির রেখা দেখা দিল। একটা অনাবিল আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। নিজের হাতে গড়া তাহার সেই মানসী-প্রেয়সীর রূপমাধুরী তাহাকে পাগল করিয়াছিল। সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিভালবাসা দিয়া দিবস রজনী তাহার পূজা করিতে লাগিল।

শিল্পী এখন আনন্দে ভরপুর। নিত্য নূতন উপকরণে সে তাহার প্রিয়াকে সাজাইতে লাগিল। প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া বাগান হইতে সাজি ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনিত; অতি সযত্নে অনভ্যস্ত অঙ্গুলিগুলি চালাইয়া বিচিত্র রকমের মালা গাঁথিয়া তুলিত। তারপর সে যেমন গভীর প্রেমের সহিত সেই মূর্ত্তির গলায় মালা পরাইয়া দিত, তেমন প্রেমভরে বোধ হয় জগতের কোনও নর, অদ্যাবধি নারী-কণ্ঠে ফুলহার পরায় নাই।

এমনি করিয়া কিছুদিন চলিয়া গেল। কত যে সোহাগের নাম শিল্পী তাহাকে দিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। আর, কতভাবে কত ছন্দে কত কথায় যে সেই পাষাণ-মূর্ত্তিকে সে আদর করিত, তাহা শুনিলে সংসারের লোকের পক্ষে হাসি চাপিয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিত। জীবন্ত নারীর মতই সে তাহাকে চুম্বন করিত, এককণা ধূলি গায়ে পড়িলে কত যত্নে মুছিয়া দিত। সে তাহার প্রণয়ের বাছাবাছা কথাগুলি দিয়া তাহাকে সম্বোধন করিত, কিন্তু পাষাণী-প্রিয়া তাহার কি উত্তর দিবে! সে তাহাকে বোবা বলিয়া পরিহাস করিত; কখনও বা কাতর কণ্ঠে বলিত, "লক্ষ্মীটি আমার, একটিবার কথা বল, শুধু একটিবার; আর কতকাল মান করে থাকবে?" তার পরই হয়ত রাগের ভান করিয়া বলিত, "কথা বলবিনে, দুষ্ট! যা—নাই বল্লি, তোর সাথে আমার আড়ি।"

—এই বলিয়া হয়ত অন্য ঘরে চলিয়া যাইত। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিত, "রাগ কোরো না প্রিয়ে, এই তো আবার আমি এসেছি। তোমার সাথে কি আমার রাগ সাজে? সত্যি রাগ করিনি আমি, এই দেখ আবার তোমাকে চুমো খাচ্ছি।"

এমনি করিয়া একটা নূতন রসের ভিতর দিয়া শিল্পীর কতকগুলি দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু যতই দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, ততই তাহার মনে একটা নূতন অভাবের কালো ক্ষুদ্র মেঘ ক্রমেই পুষ্ট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। অনেক সময় তাহার মনে হইত, আহা সে যদি কথা বলিতে পারিত, যদি সে জীবন্ত হইত, তবে তো তাহাদের কলহাস্যে তাহার এই নীরব নির্জ্জন গৃহখানা আনন্দে ভরিয়া উঠিত! কিন্তু তাহা যে হইবার নয়। তাই তাহার এই নূতন সুখের মালায় মাঝে মাঝে কাঁটা গাঁথিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন শিল্পী হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। তাহার মাথার কাছে একটা জানালা খোলা ছিল—উহার ভিতর দিয়া খানিকটা চাঁদের আলো তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; দূরের একটা পাপিয়ার তান এবং জানালার নীচের বাগানে কোটাফুলের গন্ধ—সমস্ত মিলিয়া তাহার অন্তরের সেই ক্ষুধিত প্রাণীটিকে প্রবলভাবে একটা নাড়া দিল। শিল্পী তাহার প্রিয়াকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একটা আলো জ্বালাইয়া তাহার প্রিয়মূর্ত্তির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। আলোর আভা পড়িয়া শুভ্র মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য শতগুণে বাড়িয়া গেল। শিল্পী আকুল আগ্রহে তাহার অধর চুম্বন করিল; কিন্তু সেই পাষাণ-শীতল অধর, চুম্বনের হর্ষ তাহার ব্যর্থ করিয়া দিল। একটা শিহরণের সহিত শিল্পীর মনে এই চিরন্তন সত্যটা জাগিয়া উঠিল,—হৃদয়ের কদর যে বোঝে, তাহারই কাছে উহা বিলাইয়া দিতে সুখ আছে—উলুবনে মুক্তা ছড়াইলে উলুবনের তো কোনও লাভই নাই, বরং মুক্তারই যা' ক্ষতি।

শিল্পী ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার পাঁজর ভাঙ্গিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল—হায়, সে যদি জীবন্ত হইত!

সে রাত্রে আর তাহার ঘুম আসিল না। গৃহের ও বাহিরের নৈশ নির্জ্জনতা তাহার প্রেমমূক বুকের উপর একটা জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিল। আবার তাহার হৃদয় সঙ্গীর অভাবে ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল।

সময় আর তাহার কাটিতে চাহে না। রাত্রিগুলি এখন তাহার কাছে অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। জগতের লোকের চোখে রজনী তাহার শান্তি ও সুষুপ্তির যাদু-স্পর্শ বুলাইয়া দেয়; কিন্তু শিল্পী সে স্পর্শের প্রভাব আর বুঝিতে পারে না। বসন্তের রাত্রির সকল মাধুরী ও কমনীয়তা তাহাকে আরও বেশী করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। একা একা নির্জ্জন গৃহে ভূতের মত সে তাহার বিনিদ্র রজনীগুলি কাটাইয়া দেয়।

প্রতিদিন একটা নিরাশার দারুণ দুঃখ লইয়া সে শয্যাত্যাগ করে। কোনও কাযে আর সে মন দিতে পারে না, কিছু তাহার ভাল লাগে না। নীরব নিশ্চেষ্টভাবে সে শুধু বসিয়া থাকে।

একদিন এমনি সে বসিয়া আছে, হঠাৎ পথের লোক চলাচলের ভিতর একটা নূতনত্ব তাহার চোখে পড়িল। অমনি তাহার স্মরণ হইল, আজ তাহাদের দেশের প্রেমের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর পূজা। আজ দেশের যত যুবক যুবতী নিজ নিজ কামনা পূরণের জন্য দেবীর মন্দিরে আসিয়া পূজা দেয় ও তাঁহার কৃপাভিক্ষা করে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, অনাদিকাল হইতে এই সহৃদয়া দেবীটি, দেশের যত প্রেমাতুর নরনারীকে তাহাদের শত বাসনা চরিতার্থ করিয়া দিয়াছেন। পরমুহূর্ত্তেই একটা প্রেমিকসুলভ অসম্ভব আশা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল,—যদি দেবী কৃপা করেন, তবে তো তাহার এই পাষাণী-প্রিয়াকে তিনি জীবন্ত করিয়া দিতে পারেন। যদি তাই হয়, তবে তো তাহার

কামনার কিছু থাকিবে না, স্বর্গ কোন ছার!—অন্ধ আশা আসিয়া তাহার কাণে কাণে হাজার আশ্বাসের কথা শুনাইতে লাগিল। সে ঠিক করিল, একবার দেবীর দুয়ারে কপাল ঠুকিয়া দেখিবে, যদি তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়।

শিল্পী, দেবীর অর্চ্চনার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। অতি নিষ্ঠার সহিত স্নান করিয়া আসিল। তারপর বাসন্তী রঙের একটি নূতন পোষাক পরিয়া ও সুবাসিত অঙ্গরাগ মাখিয়া প্রসাধন কার্য্য শেষ করিয়া লইল। তারপর নানা পত্র পুষ্প আহরণ করিয়া একটি সুচারু গুচ্ছ রচনা করিয়া লইল। আশা ও আশঙ্কায় প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয় দুলিতেছিল।

বিদায়ের কালে সে একবার তাহার পাষাণী-প্রিয়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে যে কি অসম্ভব আশার পাগল হইয়া চলিয়াছে, তাহার হৃদয়ে তখন সেই ভাবই প্রবল হইয়া উঠিল। প্রাণটা তাহার বড় দমিয়া গেল।

কিন্তু মূর্ত্তির দিকে চাহিতেই, আশার গুঞ্জনধ্বনি তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। সে দেখিল, সবই তো তাহার মানবীর মত—সেই চোখ, সেই মুখ, সেই দেহ, সেই সব,—কিন্তু সেই নিটোল দেহের ভিতর ভাবগ্রাহী একটি হৃদয় নাই, আর নাই তাহার মুখে বাণী! শিল্পী ভাবিল, এই পরিপূর্ণ দেহটির ভিতর একটা জীবন পূরিয়া দেওয়া দেবতার পক্ষে এমন কি অসম্ভব! কত অসম্ভব কায তো তাহাদের দেশের দেবতারা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছেন।

চিরকাল প্রেমের একটা লক্ষণ জগতের লোকে দেখিয়া আসিয়াছে যে, অসম্ভব বলিয়া একটা জিনিষের অস্তিত্ব সে কখনও মানে না। এই তরুণ প্রেমিকটির হৃদয়েও সেই লক্ষণটি বিরাজ করিতেছিল। তাই শিল্পী বুকভরা আশা লইয়া দেবীর মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল।

গলায় তাহার ফুলের মালা ও হাতে একটি ফুলের তোড়া, সে উহাই দেবীর চরণে উৎসর্গ করিয়া তাহার নিবেদন জানাইবে। নীরবে সে মন্দিরের একপাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মন্দির তখন লোকে ভরা—যাহার যা বাঞ্ছা ছিল, সমস্ত দেবতাকে জানাইতেছিল। এই এত লোকের ভিতর দেবীর সম্মুখে বসিয়া তাহার অন্তরের বাসনা নিবেদন করিতে শিল্পীর মন সরিল না—এত লোকের ভিতর তাহার হৃদয় যে একনিষ্ঠ হইবে না! সে একধারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। এ যে তাহার জীবন মরণ সমস্যা, যেমন তেমন করিয়া কায সারিলে তো তাহার চলিবে না!

একে একে সকল পূজার্থিগণ চলিয়া গেলে, শিল্পী ধীরে ধীরে আসিয়া দেবীর সম্মুখে আসন করিয়া বসিল। পাশেই তাহার ধূপ ধূনা জ্বলিতেছিল। সে আরও খানিকটা ধূপধূনা নিক্ষেপ করিল। সুগন্ধী ধূম কুণ্ডলাকারে উঠিয়া ঘর ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। তারপর নিমীলিত লোচনে আকুল প্রাণের গভীর নিষ্ঠার সহিত সে তাহার আকাঙ্ক্ষা দেবীর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া, তাঁহার কৃপাভিক্ষা চাহিল।

চক্ষু মেলিয়া সে দেখে, ঘর ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—দেবীর মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে না।

সে চমকিয়া উঠিল,—তবে কি দেবী তাহার প্রার্থনা পূরণের জন্য তাহার পাষাণ-প্রেয়সীর কাছে চলিয়া গিয়াছেন?

একটু পরেই ধূম অপসৃত হইলে, দেবীর মূর্ত্তি দেখা দিল। এবার দেবীর মুখে শিল্পী যেন আশ্বাস ও সান্ত্বনার ছবি দেখিতে পাইল। দেবীকে প্রণাম করিয়া, আশা ও আশঙ্কায় দোদুল্যমান মন লইয়া শিল্পী ত্বরিতপদে গৃহাভিমুখে চলিল।

গৃহে প্রবেশ করিতেই তাহার বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। আর এক মুহূর্ত্ত পরেই হয়তো তাহার চক্ষের সম্মুখে স্বর্গের মোহন ছবি ফুটিয়া উঠিবে, নয়তো হতাশার অনন্ত নরকযন্ত্রণা তাহাকে চাপিয়া ধরিবে।

শঙ্কিতহৃদয়ে কম্পিত হস্তে দ্বার খুলিয়া সে তাহার দয়িতার গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু প্রবেশ করিয়াই সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল! তাহার পাষাণ-

প্রতিমা যে সেখানে নাই! তবে কি দেবী তাহাকে জীবিত করিয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন! হায়, এতকাল তাহার যে ক্ষুদ্র আশ্রয়টুকু ছিল, আজ বুঝি তাহাও লুপ্ত হইল! কোন দেবতার অভিসম্পাত তাহার লাগিয়াছে!—হতাশায় শিল্পী হাওয়ায় মিলাইয়া যাইতে চাহিল।

কিন্তু এমন সময় তাহার পাশের ঘরের পর্দা সরাইয়া এ কি মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল!—স্মিত-বদন, উৎসুক আঁখি, উন্মুক্ত হৃদয়, সারাদেহে নব-জীবনের চঞ্চলতা—অতুলন রূপ! শিল্পী শুধু মুগ্ধ, স্তব্ধ, মূক!—আনন্দের আতিশয্যে সারাদেহ তাহার রোমাঞ্চিত, নয়ন পলকহীন, দেহ শিথিল।

* * *

শিল্পী বলিল, "বল, আমায় বল, কি করে তুমি জীবিত হলে? পাষাণী ছিলে, কেমন করে প্রাণ পেলে?"

শিল্পীর কাণে বীণার ললিতঝঙ্কার প্রবেশ করিল, —"কিছু আমি জানি না! প্রথম যখন আমার চেতনা হল, চেয়ে দেখলাম এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী নারী আমার সম্মুখে। তিনি বল্লেন, 'তোমাকে যে মূর্ত্তিদান করেছে, সেই শিল্পী তোমাকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভাল-বাসে। প্রকৃত প্রেমের জয় চিরকাল হয়ে থাকে, নইলে বিশ্বে প্রেমের অস্তিত্বই থাকত না। তাই তোমাকে জীবনদান করে শিল্পীর প্রেমের সার্থকতা করলাম। তুমিও তাকে অকপট ভালবাসা দিয়ে ধন্য করে দিয়ো। মনে রেখ, প্রেমহীন নীরস জীবন—সে জীবনই নয়।' এই বলে তিনি অদৃশ্য হলেন। সেই অবধি আমি তোমাকে নানান ঘরে খুঁজছি।"

শিল্পীর চোখে মুখে পুলকোচ্ছ্বাস দেখা দিল। বাহুপাশে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া এতদিনকার তপ্ত হৃদয় আজ সে শীতল করিল। *

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

* বিদেশীয় পৌরাণিক গল্প হইতে।

চা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চায় পাতা তোলা ও প্রস্তুত প্রণালী।

চা গাছ flush করিয়া আহরণোপযোগী হইলেই বহুসংখ্যক কুলী ঐ কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিতে হয়, এবং তাহাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি বড় ঝুড়ি যোগাড় করিতে হয়। কোমল হস্তে পাতা তোলা ভাল হয় বলিয়া স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণই এই কার্য্যের বেশী উপযোগী। সর্ব্বাপেক্ষা কচি, কোমল ও রসাল পাতা হইতেই চা প্রস্তুত হয়, এবং এই সকল গুণের তারতম্য অনুসারেই বিভিন্ন প্রকার চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। একটি নূতন ডগায় (shoot) যদি ছয়টি পাতা পাওয়া যায়, তবে ঐ পাতার সর্ব্বোচ্চটি হইতে ক্রমনিম্ন গুণানুসারে নিম্নলিখিত প্রকারের চা সকল প্রস্তুত হয়।—

১ম—ফ্লাওয়ারী পিকো, ২য়—অরেঞ্জ পিকো, ৩য়—পিকো, ৪র্থ—পিকো সাউচঙ্গ, ৫ম—কঙ্গু, ৬ষ্ঠ—বহিয়া। পাতাগুলি পৃথক করিয়া তুলিতে হইলে ব্যয় ও সময় অত্যন্ত বেশী লাগে বলিয়া এক সঙ্গে তুলিয়া, প্রস্তুত করিবার সময় বিভিন্ন প্রকারের চা পৃথক করিয়া লওয়া হয়।

অপরাহ্নে সমস্ত কুলীদিগের নিকট হইতে চা পাতা

বুঝিয়া লইয়া ওজন দেওয়া হয়। তৎপরে প্রথমে পাতাগুলি শুষ্ক করিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। এই জন্য বাঁশের চাটাই বা লোহার তারের ট্রে (tray) ব্যবহৃত হয়। উহার উপর পাতাগুলি বিছাইয়া শুষ্ক করা হয়। ইহাকে withering বলে। কাঁচা পাতা মুঠা করিয়া ধরিলে একরকম কড়কড়ে শব্দ হয়, কিন্তু শুষ্ক হইলে আর তাহা হয় না। কাঁচা পাতাকে একটু বাঁকাইলেই ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু শুষ্ক পাতা ভাঙ্গে না। পাতা প্রয়োজন মত শুষ্ক হইয়াছে কি না জানিবার পক্ষে এই দুইটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যাহারা এই কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর অন্য কোনরূপ প্রমাণ আবশ্যক হয় না। অতি সহজেই তাঁহারা বুঝিতে পারেন। পরিষ্কার রৌদ্রের দিন হইলে এক বেলাতেই পাতার withering কার্য্য শেষ হয়। না হইলে একটু দেরী হয়। বর্ত্তমান সময়ে যন্ত্রের সাহায্যেই প্রায় সকল কার্য্য সাধিত হয়। চা ঘরে লোহার তারের লম্বা লম্বা ট্রে একটার উপর আর একটা আলমারীর তাকের মত সাজান থাকে। ঐগুলির উপর পাতা বিছাইয়া যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস করা হয়। তাহাতে পাতাগুলি অতি শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়।

চা প্রস্তুত প্রণালীর দ্বিতীয় প্রক্রিয়া rolling অর্থাৎ গুটানো। পূর্ব্বে কুলীগণ হস্তদ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন করিত। কিন্তু এখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড rolling machine দ্বারা অতি সহজে এবং অল্প সময়ে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

চা প্রস্তুত প্রণালীর তৃতীয় প্রক্রিয়া Fermentation অর্থাৎ গাঁজাইয়া লওয়া। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় ও কঠিন প্রক্রিয়া। Rollingএর পর পাতাগুলি বড় বড় তাল পাকাইয়া ferment করিতে হয়। ঠিক কোন্ সময়ে fermentation সম্পূর্ণ হয় তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা ভালরূপ জানা যায়। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় যে উপযুক্তরূপ fermented হইলে এই পাতার বলগুলির ভিতরটা মরিচা ধরার মত লাল হইয়া উঠে। তৎপর ঐ বলগুলি ভাঙ্গিয়া পুনরায় চাটাইর উপর বিছাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। কিছুক্ষণ পরে পাতাগুলির রং কালো হইয়া উঠে, তখন ঐগুলি জড় করিয়া পুনরায় বিছাইয়া আরও কিছুক্ষণ শুকাইতে হয়। প্রখর রৌদ্রে একঘণ্টা বা তদপেক্ষা কম সময়েই এই কার্য্য সমাধা হয়। তৎপরে সমস্ত পাতাগুলি পুনরায় তারের ট্রের উপর বিছাইয়া কয়লার আগুনের উপর স্থাপন করা হয়। এই সময়ে পাতাগুলি বারম্বার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হয়। এইরূপ করিতে করিতে পাতাগুলি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া ক্রমে কোঁকড়াইয়া যায়। তখন পাতাগুলি একটু টিপিলেই ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। এইখানেই চা প্রস্তুত শেষ হইল। তারপর তারের ছোট বড় নানা রকম ছিদ্র বিশিষ্ট চালুনিতে (Sieves) ফেলিয়া বিভিন্ন প্রকারের চা বাহির করিয়া লওয়া হয়। সূক্ষ্মতম পাতাগুলিই সর্ব্বোত্তম, এবং তদপেক্ষা স্থূল পাতা ক্রমে ক্রমে তন্নিম্নস্থান অধিকার করে।

উপরোক্ত উপায়ে যে চা প্রস্তুত হয় তাহার নাম কালো চা অর্থাৎ Black Tea। অনাবশ্যক বোধে "সবুজ চা" বা Green Tea প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ পরিত্যক্ত হইল। Green Tea ভারতবর্ষে প্রস্তুত বা ব্যবহার হয় না। ঐ চা জাপান দেশে প্রস্তুত হইয়া United Statesএ যায়। সে দেশের অধিবাসীরা প্রচুর পরিমাণে উহার ব্যবহার করিয়া থাকে। এই Black Tea ও Green Tea ব্যতীত আরও দুই প্রকার চা আছে,—Brick Tea ও Scented Tea।

Brick Tea।—ভাল চা হইতে পরিত্যক্ত ছিন্নভিন্ন পাতা অথবা বড় বড় পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল একত্র করিয়া নানা আকারে জমাট বাঁধা হয়। মধ্য এসিয়ার অধিবাসীরা দুগ্ধ, লবণ ও মাখন প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া এই Brick Tea প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে।

Scented Tea, সুগন্ধি চা।—বহু সুগন্ধি ফুল, তৈয়ারী চার সঙ্গে, কিছু ফুল কিছু চা এইরূপ ভাবে স্তরে স্তরে একটি বাক্সে সাজাইয়া, বাক্সের মুখ খুব শক্ত

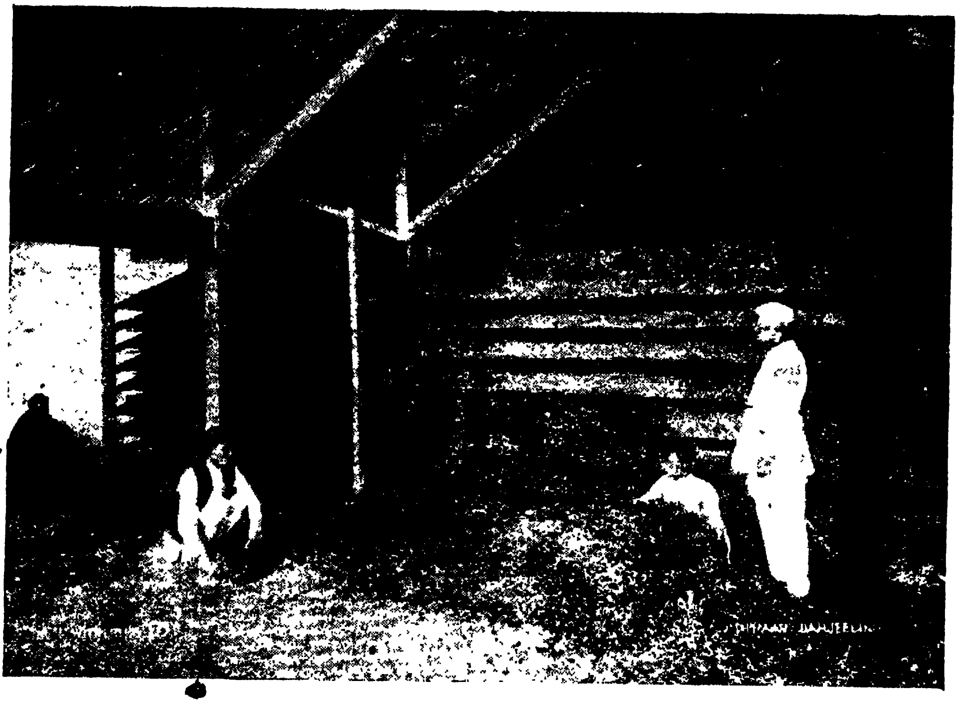
করিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। দুই তিন দিন এভাবে রাখিয়া পরে বাক্স খুলিয়া ফুলগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। কখনও কখনও ফুলের গুঁড়া চা'র সহিত একেবারে মিশ্রিত করা হয়। এই সকল ফুল অনেক সময়েই বিষাক্ত থাকে বলিয়া এই সুগন্ধি চা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। চীনদেশবাসীরাই এই চা প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ, কিন্তু তাহারাও বলিয়া থাকে যে উত্তম চা'কে সুগন্ধি করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। সুগন্ধি চা যে উৎকৃষ্ট চা নহে ইহাই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

চা'র ভাল মন্দ।

উৎপাদন ও প্রস্তুত প্রণালীর পার্থক্যে চীনদেশের চা ভারতীয় চা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। চীনদেশে গৃহস্থদের সামান্য সামান্য জমীতে চা গাছ উৎপন্ন হয় এবং পাতা তুলিয়া মাত্র শুষ্ক করিয়া ঐ পাতাগুলিই বাজারে বিক্রয় করা হয়। যাহারা গাছের নূতন পাতা হইতে চা প্রস্তুত প্রণালী জানে তাহারা ঐ পাতা ক্রয় করিয়া উপযুক্ত প্রণালী মত চা প্রস্তুত করিয়া ব্যবসাদারের নিকট বিক্রয় করে। এই ব্যবসাদারেরা নানাস্থান হইতে রাশীকৃত চা ক্রয় করিয়া বিদেশে চালান দেয়। ঐ প্রণালীতে প্রথমে চা পাতাকে ও পরে তৈয়ারী চা'কে হস্তান্তরিত হইবার জন্য অনেক সময় অপেক্ষা করিতে হয় এবং ব্যবসাদারেরা চা-গুলি খোলা অবস্থায় গুদামজাত করিয়া রাখে। ইহাতে চা'র গুণ অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত করিতে হইলে পাতা তুলিয়াই কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়, এবং প্রস্তুত হইলেই বায়ুহীন টিনের (air tight) বাক্সে বন্ধ করিয়া পুনরায় কাঠের বাক্সে ভরিয়া বিদেশে চালান দেওয়া হয়। চীনদেশের আর একটি অপকৃষ্ট নিয়ম এই যে, সেখানে বিভিন্ন সময়ের



কুলিগণ ক্ষেত্র হইতে চা তুলিয়া আনিয়াছে। কে কত চা তুলিল, ওজন করিয়া লওয়া হইতেছে।



চা-পাতা শুকাইয়া লইবার জন্য থাকে থাকে সাজানো হইতেছে।

ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সময়ে পাতা তোলা হয়। ইহাতে উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত হইতে পারে না। ভারতবর্ষে এক সময়ে এবং এক সঙ্গেই চা'র পাতা তোলা হয়। ইহা ভিন্ন চীনদেশে নানারূপ বাহিরের পদার্থ মিশ্রিত করিয়াও চাকে অত্যন্ত দূষিত করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় চা-করেরা বর্ত্তমান সময়ে চা সম্বন্ধে এই নিন্দনীয় দুর্ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন কি না তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে আপাততঃ এ বিষয়ে লোকের মনে কিছু কিছু সন্দেহ উপস্থিত যে না হইয়াছে একথা বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, চীনদেশে প্রচলিত Lictea তে যে নানা প্রকার আবর্জ্জনা মিশ্রিত হইয়া থাকে তাহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। চা'র সঙ্গে অনেক সময়ে লোহা ও কয়লার গুঁড়া, ভুষি, নানাপ্রকার পাতার গুঁড়া, সোপ ষ্টোন, কেটাচু. ব্ল্যাক লেড, হর্থর্ণ ও উইলো প্রভৃতি ঘাস মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করা হয়। চা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে এই সকল দূষিত চা চিনিয়া লওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কাষ্টম হাউসে অনেক সময়েই এই সকল চা ধরা পড়িয়া যায়।

বর্ণ, উজ্জ্বলতা, সুগন্ধ, পাতার কোঁকড়ান ও সমতা প্রভৃতি দেখিয়া অনেক সময়েই অভিজ্ঞ লোকেরা ভাল চা বাছিয়া লইতে পারেন। কিন্তু পান করিবার জন্য চা প্রস্তুত হইলে ভাল মন্দ সহজেই অনুভব করা যায়। অবশ্য এ বিষয়েও কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

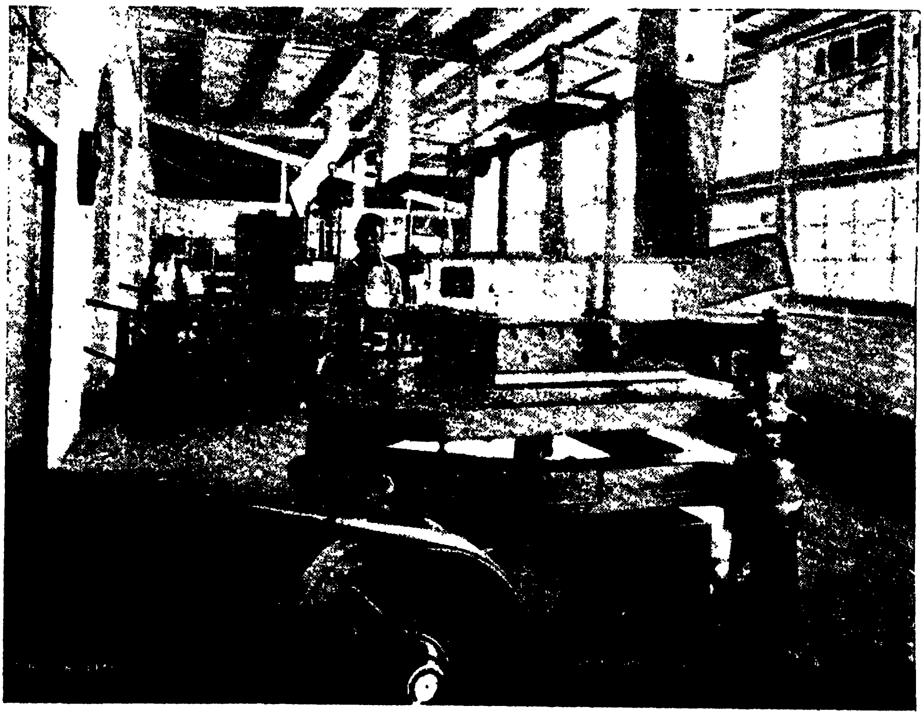
Colonal Money বলেন :—

"The darker the liquid, the stronger the tea. The nearer the approach of the infused leaf to a uniform salmony brown, the purer the flavour. Black tea of good quality should yield a clear bright blue liquor, emitting a subdued fragrance, and in taste it should be mild, bland and sweetish with an agreeable astringency."

চা'র রসায়ন।

এ বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া আমার অধিকার-বহির্ভূত কার্য্য। তবে ভাল কথা রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া লোকের কাণের কাছে ধরিলেও উপকার হইতে পারে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, এবং আমার প্রবন্ধটির কোন অঙ্গের অসম্পূর্ণতা না থাকে এই আন্তরিক কামনায় Mulder সাহেবের চা'র বিশ্লেষণটি Encyclopoedia Britannica হইতে সংগ্রহ করিয়া সহৃদয় পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিতেছি।

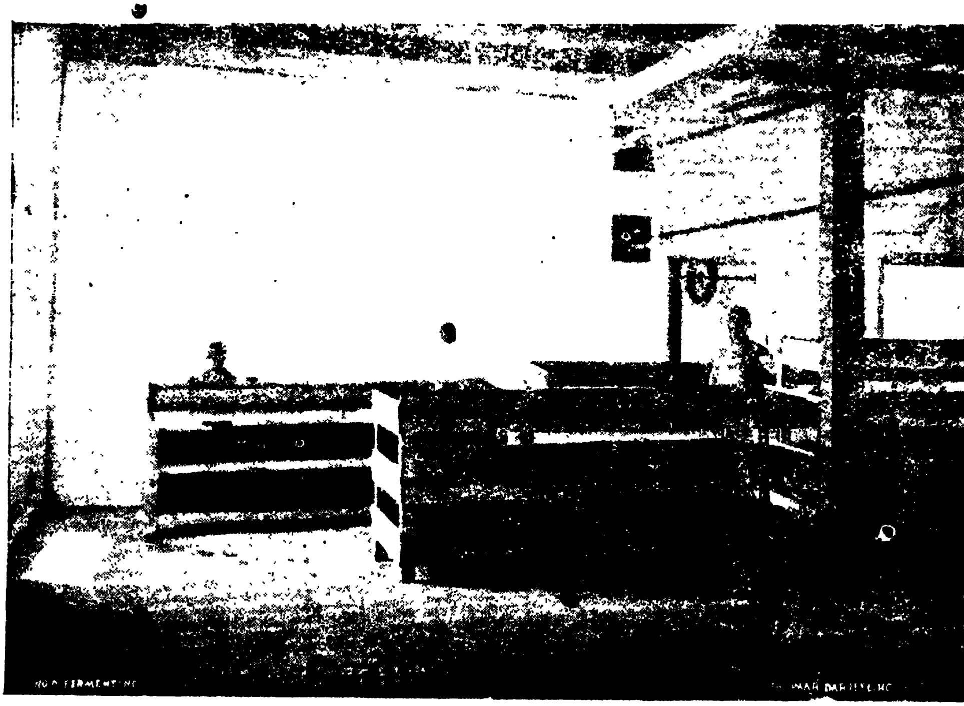
চায়ে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি বর্ত্তমান আছে যথা :—Volatile oil, chlorophyll, wax, resin, gum, tannin, theine, extractive matter, colouring matter, albumen, ও woody fibre। নূতন চায়ে Volatile oil যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। ইহাতে চা অত্যন্ত সুস্বাদু হয় এবং স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে উহা বলকারক ও উত্তেজক। চা প্রস্তুত করিয়া শীঘ্র শীঘ্র দুগ্ধ মিশ্রিত না করিলে বাষ্পের সঙ্গে Volatile oil উড়িয়া যায়। সেইজন্যই বোধ হয় সাহেব-বাড়ীর চা প্রস্তুত প্রণালীতে, পেয়ালায় আগে দুধ ঢালিয়া পরে চা ঢালিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, theine জিনিষটা শরীরের টিসু (tissue) গুলির ক্ষয় নিবারণ করে। চায়ে বিদ্যমান tannin জিনিষটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। উহা স্নায়ুমণ্ডলীর বড়ই অনিষ্ট করে, ও কোষ্টবদ্ধতা দোষ জন্মায়। সেই জন্য চা বেশীক্ষণ ভিজাইয়া না রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র ঢালিয়া পান করা উচিত। এই tannin জিনিষটা চামড়াতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কোন এক ব্যক্তি একবার রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "যিনি রোজ এক পেয়ালা চা খান, তিনি বৎসরে এক যোড়া চটিজুতা খাইয়া থাকেন।"



এই কলে শুষ্ক চা-পাতা ফেলিয়া সেগুলিকে গুটাইয়া লওয়া হয়।

শরীর ও মনের উপর চা'র ক্রিয়া।

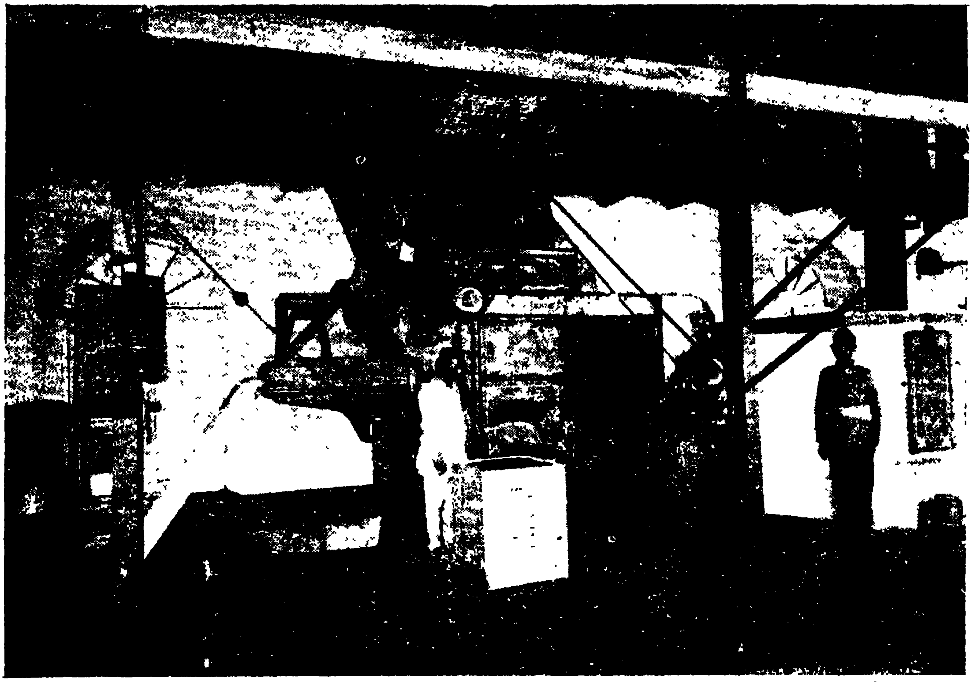
আমাদের দেশে চা'র ব্যবহার দিন দিন যে রকম বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই এই বিষয়টি বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। যাহাদের বংশে কেহ কখনও চা স্পর্শ করে নাই, তাহাদের সভ্যতার খাতিরে বা রসনার তৃপ্তির জন্য, কিম্বা বন্ধু-



এখানে গুটানো চা-পাতা রাখিয়া সেগুলিকে ফার্ম্মেন্ট করা হয়।

প্রীতির অনুরোধে, সহসা পরিবারের মধ্যে এই নূতন জিনিষটির প্রচলন করিবার পূর্ব্বে, বিশেষ করিয়া অতিশয় সতর্কভাবে ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, চা-ব্যাধি ম্যালেরিয়া-ব্যাধি অপেক্ষা নাছোড়বান্দা। একবার অধিকার স্থাপন করিলে ছাড়ান দুঃসাধ্য। পশ্চাতে অনুতাপ না করিয়া, অভ্যাসটিকে প্রকৃতিগত করিবার পূর্ব্বেই যথেষ্ট সাবধান হওয়া উচিত। মদিরাপানের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে বরং মদিরাসক্তদিগের হস্ত হইতে কখনও কখনও আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়, কিন্তু চা পানের বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিলে চা পানাসক্ত দল অট্টহাসিতে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া এমনই আক্রমণ করিবেন যে, তাঁহাদের হস্তে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইবে।

যাহা হউক, আমার মত সামান্য ব্যক্তির মতামত ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই কয়েকটা বড় বড় মতের দোহাই দিয়া, কিয়ৎপরিমাণে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া লই। ইংলণ্ডে যখন প্রথম চার ব্যবহার প্রচলিত হয় তখন দেশশুদ্ধ লোক উহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। শুনা যায়, একজন সাহেব তাঁহার বন্ধুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আমি আশা করি তোমার মত ধার্ম্মিক খৃষ্টানের টেবিলে এই ঘৃণিত চা'র জল কখনই স্থান পাইবে না।" এটা অবশ্য প্রথমাবস্থার রাগের কথা। সেই ইংলণ্ডেই এখন ঘরে ঘরে চা'র এমন প্রভাব যে, সাহেব বিবিরা প্রত্যূষে এক পেয়ালা গরম চা পান না করিলে শয্যাত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু Jonas



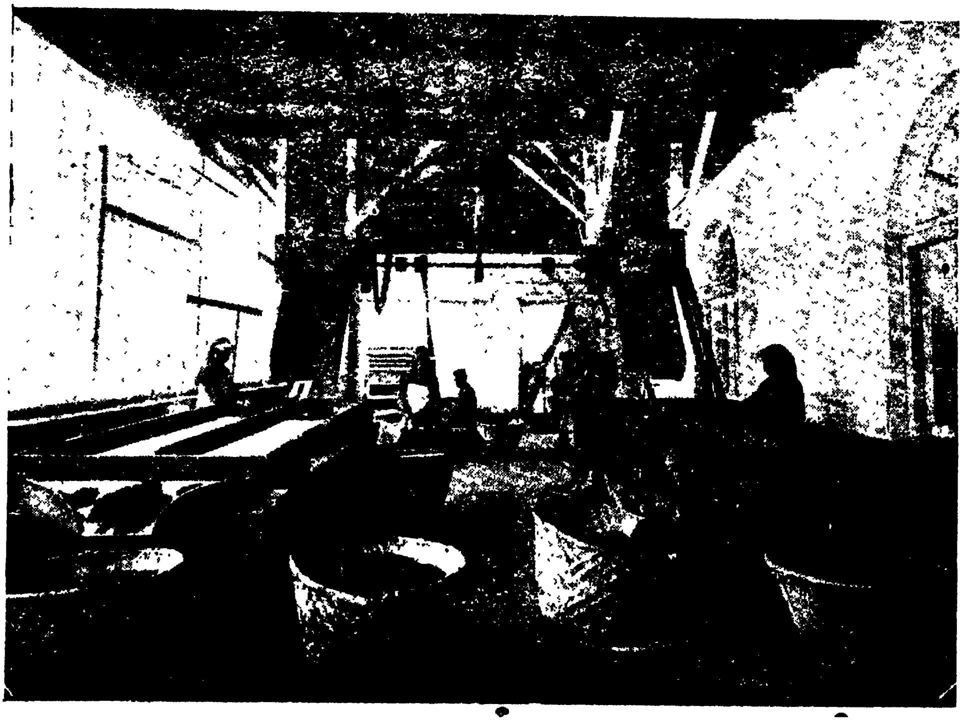
এই কলে ফার্মেণ্ট-করা চা-পাতাগুলিকে আবার শুকাইয়া লওয়া হয়।

Hanway সাহেব ধীরভাবে বলিয়াছেন; "Men seem to have lost their stature, and women their beauty. What Shakespeare ascribed to the concealment of love, is in this age more frequently occasioned by the use of tea." (বর্ত্তমান যুগে পুরুষগণ তাঁহাদের দীর্ঘ অঙ্গসৌষ্ঠব ও রমণীগণ তাঁহাদের লাবণ্য হারাইয়া ফেলিতেছেন। সেক্সপিয়ার যাহাকে অন্তর্নিহিত প্রণয়ের ফল বলিয়া মনে করিতেন, বর্ত্তমান সময়ে খুব সম্ভবতঃ তাহা চা পানেরই ফল)।" Dr. Johnson আপনাকে একজন hardened ও shameless tea drinker বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

James Apton সাহেব বলেন,—"Tea taken in excess produces cerebral excitement, sleeplessness and general nervous irritability. The tannin contained in its infusion interferes with the flow of saliva, diminishes the digestive activity of the stomach and impedes the action of the bowels. In this view, the large quantity of strong tea used by the poor and especially the sedantive poor, while serving to blunt the keen tooth of hunger, must work incalculable havoc with the digestive and nervous system of the consumers." (অতিরিক্ত মাত্রায় চা পান করিলে অনিদ্রা ও মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা উপস্থিত হয়। চা'র মধ্য হইতে যে 'ট্যানিন' নামক পদার্থ নির্গত হয়, তাহা পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যের জন্য নিঃসৃত লালার গতিরোধ করে। পাকস্থলীর পরিপাক-শক্তি নষ্ট করে এবং অন্ত্রের ক্রিয়াকে বাধা দেয়। দরিদ্রেরা, বিশেষতঃ যাহারা সর্ব্বদা বসিয়া বসিয়া কায করে, যে কড়া চা পান করে, তাহাদ্বারা তাহাদিগের ক্ষুধার তীব্রতা নাশ হয় বটে, কিন্তু চিরজন্মের

মত পরিপাক-শক্তি ও স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়।

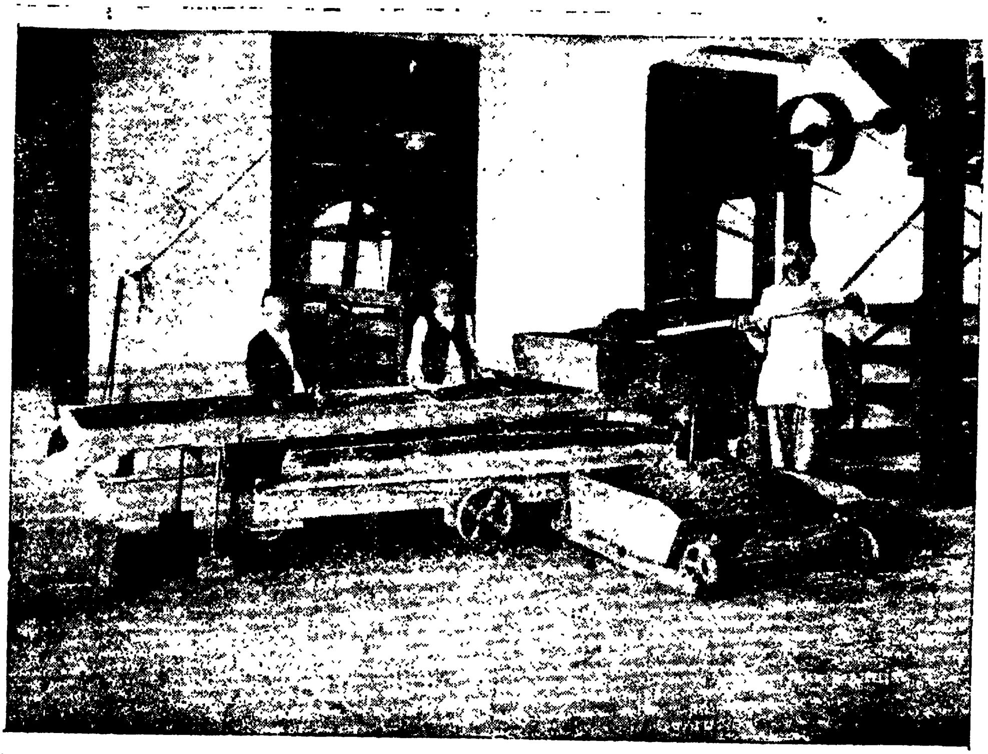
Apton সাহেবের এই "অতিরিক্ত চা পান" কথাটা শীত প্রধান দেশের পক্ষে প্রযুজ্য। আমাদের দেশের মত গরম দেশে "অতিরিক্ত" কথাটা বাদ দেওয়াই ভাল। সে দেশে শুধু দরিদ্রেরা অজ্ঞতা হেতু কড়া চা পান করে, কিন্তু এদেশে ধনী দরিদ্র সকলেই অত্যন্ত কড়া চা পান করিয়া থাকে। ট্যানিন বাহির হইয়া না যায় এই জন্য সাবধানে চা প্রস্তুত করিতে আমাদের দেশে কয়জনে জানে? প্রায় আধিকাংশ দেশী চা'র দোকানেই দেখিতে পাওয়া যায়, হয় চা'র পাতা ও জল একসঙ্গে দিয়া পাত্র উনানের উপর চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, নতুবা সকালে ৭টার সময় চা ভিজাইয়া, সেই পাত্রেই ক্রমান্বয়ে গরম জল ও চা'র পাতা দিয়া বেলা ১০।১১টা পর্য্যন্ত খরিদ্দারদিগকে চা সরবরাহ করা হইতেছে। অনেক গৃহস্থ বাড়ীতেও এইরূপ বন্দোবস্তই দেখা যায়। চা মস্তিষ্কের উপর শক্তি প্রয়োগ করিয়া উহার অকারণ ও অস্বাভাবিক উত্তেজনা উপস্থিত করে।* সেই জন্যই চা-খোরেরা স্বাভাবিক স্বপ্নশূন্য নিদ্রাসুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। এই উষ্ণপ্রধান দেশে, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষে ও কঠোর জীবন সংগ্রামের জন্য মস্তিষ্ক বিকৃতি, অন্ততঃ উহার কিঞ্চিৎ উষ্ণতা, সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। মস্তিষ্কের উত্তেজনার এত আয়োজন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আবার চা খাইয়া উত্তেজনা বৃদ্ধি করা নিতান্তই বাতুলতা। অজীর্ণরোগীর পক্ষে চা পান বিষস্বরূপ। চা-পায়ীরা অনেকেই কোষ্ঠবদ্ধতার যন্ত্রণায় অস্থির থাকেন। যকৃতের ক্রিয়া ভালরূপ না হইয়া, স্নায়ুমণ্ডলীর ঘোর বিকৃতি জন্মে, এবং হৃৎপিণ্ডের স্নায়বীয় বিকৃতির জন্য অতি অল্প উত্তেজনাতেই হৃৎকম্প (palpitation) উপস্থিত হয়। যে সকল পিতা মাতা চা পান করিতে করিতে আদর করিয়া খোকা খুকীর



বিভিন্ন প্রকারের চা বাছাই করা হইতেছে।

মুখে এক এক চামচ দিয়া আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাদেরও একটু সাবধান হওয়া উচিত। শিশুদিগের অতি সামান্য কারণেই যকৃতের পীড়া উপস্থিত হয়। স্নায়বীয় বিকৃতি অতি ভয়ানক জিনিষ, উহাতে না হইতে পারে এমন ব্যারাম নাই। উহা মানুষকে অকালবৃদ্ধ করিয়া ফেলে। অনেক সময়ে দেখা যায়, স্নায়বীয় বিকৃতির জন্য অনেক সময়ে অল্পবয়সেই বৃদ্ধের মত হস্ত পদ এবং সমস্ত শরীরের কম্পন উপস্থিত হয়। এবং গরম করার কোনও সুযুক্তিপূর্ণ হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না। যে দেশের অধিবাসিদিগের জন্য প্রকৃতি প্রচুর পরিমাণে সুশীতল ডাবের জলের ব্যবস্থা করিয়াছেন ও মানবের অভিজ্ঞতা নানা প্রকার সুরসাল সরবতের সৃষ্টি করিয়াছে, সেদেশের লোক বৃথা গরম চা খাইয়া মুখ পোড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে ভাবিলে বড়ই কষ্ট হয়।

চা খাইলে ম্যালেরিয়া হয় না এ কথাটা বড়ই



চা বাছাই করিবার আর একটি প্রক্রিয়া।

অত্যন্ত সাহসী লোকেরাও অনেক সময়ে অস্বাভাবিক রকম ভীরু হইয়া পড়েন। অজীর্ণরোগীরা প্রায়ই একটু বিমর্ষভাবাপন্ন হইয়া থাকেন ; এবং এই বিমর্ষতা হইতেই মেলাঙ্কোলিয়া (melancholia) হাইপোকণ্ড্রিয়া (Hypochondria) প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে একটু গরম হইবার জন্য চা খাওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু আমাদের এই গরম দেশে অস্বাভাবিক উপায়ে অকারণে শরীরটাকে অসার। তাহা হইলে আর তিরাই ও ডুয়ার্সে ও আসামের অধিকাংশ চা বাগানে, যেখানে অসংখ্য চা গাছে অপরিমিত চা জন্মিয়া থাকে, এবং যে দেশের লোকেরা যথেষ্ট চা পান করিয়া থাকে, সেখানে ম্যালেরিয়া জ্বরে গ্রামকে গ্রাম উচ্ছন্ন যাইত না। আমাদের দেশেও কলসী কলসী চা খাইয়াও অনেকে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না, বরং যকৃৎকে বিকৃত করিয়া অকালমৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। কঠোর



এই ঘরে চা প্যাক করা হয়।

শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের পর একটু চা পান করিলে নিস্তেজ শরীর মনে বেশ একটু উত্তেজনা আসে তাহা সত্য। কিন্তু অস্বাভাবিক উত্তেজনার পরেই একটা অবসাদ উপস্থিত হয়, সে কথা সকলেই জানেন। সেটা শরীরের পক্ষে একেবারেই মঙ্গলজনক নহে। আমাদের দেশে অনেকেই প্রাতে শুধু এক পেয়ালা গরম চা উদরস্থ করেন। ইহা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। খালি পেটে ঐরূপ গরম তরল দ্রব্য পড়িলেই পাকস্থলী অত্যন্ত উত্তেজিত হয়, ফলে অনেকের বমনস্পৃহা প্রবল হইয়া উঠে। সাহেবেরা কখনই শুধু চা খান না, চায়ের সঙ্গে কিছু খাদ্যদ্রব্য, অন্ততঃপক্ষে এক খানা বিস্কুটও খাইয়া থাকেন। আমরা চা খাওয়াটা অনুকরণ করিয়াছি কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করি নাই। অনেক সময়ে মনে হয় আমাদের অর্থাভাবই ইহার কারণ। কিন্তু আবার যখন দেখি, রুটি বিস্কুটের পরিবর্ত্তে একটু মোহনভোগ বা অন্ততঃপক্ষে এক পয়সার মুড়ি হইলেও চলে, তখন অজ্ঞতাই যে ইহার কারণ তাহা না বলিয়া আর উপায় কি ?

চা পানের যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিলাম, শীতপ্রধান দেশে উহার অনেকগুলিই আবার গুণে পরিণত হয়। আমাদের দেশে চা পান একটা অনাবশ্যক বিলাসিতা মাত্র। ইহার উপকারিতা অতি সামান্য বলিয়াই আমি ইহার নিরবচ্ছিন্ন দোষ প্রদর্শন করিলাম। উৎকৃষ্ট চা'র ভিতরেই এই সকল অপকারের বীজ নিহিত আছে, নিকৃষ্ট চা যে কিরূপ অনিষ্টকারী তাহা সহজেই অনুমেয়। যাঁহারা নিতান্তই চা পান না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহাদেরও বিশেষ সন্ধান করিয়া উৎকৃষ্ট চা ক্রয় করিয়া অত্যন্ত সাবধানে উহা প্রস্তুত করিয়া পান করা উচিত। দরকার হইলেই গলির মোড়ের মুদী দোকান হইতে এক পয়সার ভেজাল দেওয়া বাসী ময়লাধরা চা ক্রয় করিয়া আনা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। W. Gordon Stabbs C. M. M. D.

R. H. অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে এই বলিয়া তাঁহাদের পুস্তকের উপসংহার করিয়াছেন, "Blessed Tea, we add, may its influence extend."

আমি বলি, "হে চা! তুমি আমাদের বাগানেই ধন্য হও, তোমাকে দূর হইতে প্রণাম করি, আমাদের মুখের কাছে আসিও না।"

চা গাছের ব্যাধি, চাবাগানের কুলিসংগ্রহ ও চা'র ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকল আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।

শ্রীঅনন্তনারায়ণ সেন।

পত্র-লেখা

খোলা চুল পিঠে ফেলা—লিখিতেছে চিঠি,
ভুলিয়া নিখিল বিশ্ব অবনত দিঠি;
ক্ষুদ্র পরিমাণ শুভ্র কাগজের 'পরে
মর্ম্মের মালাটি যেন গাঁথিছে আখরে।

অংশে গণ্ডে বাহুপাশে—ঘেরি চারিধারে
লুণ্ঠিত চিকুরভার। পুঞ্জিত আঁধারে
বক্ষতলে চাপি যেন লুকাইতে চায়
অন্তরের ধনটিরে কুন্তল প্রচ্ছায়।

চরণ-কমল দুটি আলসে হেলায়
লুটাইছে শয্যাপ্রান্তে চারু ভঙ্গিমায়,
নীলাম্বরী শাড়ীটির পাড়টি ঘুরিয়া
গিয়াছে তাহারি কাছে আবেশে মরিয়া।

আলম্বিত তনুলতা শুভ্র শয্যাতলে,
অচঞ্চল শান্তশোভা; চলে কিনা চলে
বক্ষতলে শ্বাস বায়ু; সর্ব্বদেহমনে
প্রাণের যা-কিছু চিহ্ন ফুটে সে লেখনে।

ফাল্গুনের অপরাহ্ণ। আতপ্ত সমীর
আসে মুক্ত বাতায়নে, বেদনা অধীর
বহি নিম্বফুল-বাস। ঝাঁঝাঁ করে দিক
প্রকৃতি রচিছে স্বপ্ন মুগ্ধ নির্ণিমিক।

একি হ'ল? সন্ধ্যা সে কি এল এরি মাঝে!
মলিন আননপদ্ম, ছায়াচ্ছন্ন সাঁঝে,
হেলায়ে কোমল বাহু-মৃণালের 'পরে
সহসা চাহিলা শূন্যে দূর দিগন্তরে।

আঁখি হেরি মনে হয়, লক্ষ্য নাহি তার—
শূন্যদৃষ্টি ভেদ করি চলেছে আঁধার।
চাহ মুখে—বুঝিবে সে মন সেথা নাই
মূর্ত্তিমান তবু সেথা মনের বালাই—

উদাস করুণ দৃষ্টি নিরাশায় ভরা;
ব্যর্থতার বেদনায় পরিম্লান জরা
বিষাদপাণ্ডুর মূর্ত্তি। তবু প্রাণপণে
কারে যেন বাঁধিবারে চাহিছে লিখনে।

অন্ধ হয়ে এল দিন সন্ধ্যা-অন্ধকারে,
চক্ষু চলেনাক আর—তবু শূন্য পানে
চেয়ে আছে মুগ্ধদৃষ্টি—হায় অভাগিনী
এ লিপি কি হবে শেষ? সম্মুখে যামিনী।

মুক্ত বাতায়ন-পথে দক্ষিণা বাতাস
আম্রফুলগন্ধাতুর, ফেলে দীর্ঘশ্বাস!
দূরে—বনান্তরে কোথা নিঃসঙ্গ পাপিয়া
কাহারে কাঁদিয়া ডাকে থাকিয়া-থাকিয়া!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

জীবনের মূল্য

(উপন্যাস)

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

উৎসবের আয়োজন।

সতীশের সহিত পরামর্শের পরদিনই মুখোপাধ্যায় মহাশয় মিস্ত্রী ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মিস্ত্রী গিয়া জগদীশের বাড়ীখানি সর্ব্বাংশে পরীক্ষা করিয়া, আসিয়া বলিল, বাড়ী ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে তিনহাজার টাকা ব্যয় পড়িবে, মেরামৎ করাইলে হাজার বারোশত টাকায় হইতে পারে। মুখোপাধ্যায় আবার একদিন গিয়া বাড়ী দেখিয়া, উত্তমরূপে মেরামতের আদেশই করিলেন।

সপ্তাহ পরেই কায আরম্ভ হইয়া গেল। বৈশাখের মাঝামাঝি মেরামৎ শেষ হইল। একদিন হুগলি গিয়া রীতিমত ষ্ট্যাম্পকাগজে হরিপদ'র নামে বাড়ীখানির দানপত্র লেখাইয়া, সেখানি গিরিশ রেজিষ্টারি করিয়া লইলেন। সতীশ দত্ত ছাড়া গ্রামের আর কেহই এ ব্যাপার জানিল না।

জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা ৮টার সময় একখানি উড়ানি চাদর কাঁধে ফেলিয়া ছাতাহস্তে মুখোপাধ্যায় বাহির হইলেন। পথে কাদা, রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও আকাশে মেঘ রহিয়াছে। এ বৎসর ইতিমধ্যেই এ অঞ্চলে বর্ষা নামিয়াছে।

প্রথমে মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বকথিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। তাঁহার দ্বারে গিয়া ডাকিলেন—"দাদা—ভট্চায দাদা—বাড়ী আছেন কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বাহির হইয়া আসিয়া জানাইল, তিনি বাড়ী নাই, বাজারে গিয়াছেন।

মুখোপাধ্যায় সেখান হইতে বাহির হইয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূরে চলিয়াই মাধব চক্রবর্ত্তীর বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। রাস্তা হইতে দেখিলেন, তাহার বৈঠকখানা-ঘর খোলা রহিয়াছে। ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলেন। বারান্দায় উঠিয়া দেখিলেন, ভিতরে তক্তপোষের উপর, ফ্ল্যানেলের জামা গায়ে দিয়া মাধব চক্রবর্ত্তী বসিয়া চা পান করিতেছে।

ইঁহাকে দেখিবামাত্র চক্রবর্ত্তী—"প্রাতঃপ্রণাপ, প্রাতঃপ্রণাপ—বুকুম্মে বশায় যে—আশুন আশুন"—বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল।

মুখোপাধ্যায় হাসিতে হাসিতে তাহার সহিত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"এই গ্রীষ্মে ফ্ল্যানেল গায়ে দিয়েছ, চা খাচ্ছ—সর্দ্দিটে আবার বেড়েছে না কি হে?"

মাধব ইঁহাকে চৌকিতে বসাইয়া বলিল—"আর বল্‌বেল্ না—বল্‌বেল্ না। একদিল, বশাই, রাত্রে ভারি গরব হয়েছিল, তাই বাথার কাছে জালালাটা খুলে শুয়ে ছিলাব। রাত্রে কখল বৃষ্টি এসেছে, জাল্‌তেও পারিলি, গায়ে ঠাল্‌ডা বাতাস লেগেছে—সেই দিল থেকে সর্দ্দি বশাই—কিছুতেই আর ছাড়ছেলা। কি করি বলুল্ ত!"

গিরিশ বলিলেন—"ও ভাল হয়ে যাবে, সামান্য একটু সর্দ্দি। আর সব খবর ভাল ত?"

"অগ্যে হ্যা। আপলার বাড়ীর সব বোগ্‌গল?"

"হ্যাঁ ভাই, সব মঙ্গল। ছেলে দুটি গ্রীষ্মের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হওয়ায় বাড়ী এসেছে। আচ্ছা মাধব, তোমার মনে পড়ে কি, বছর খানেক হল, তুমি আমায় একদিন বলেছিলে, নরেন সুরেনের বিয়ে দিন?"

"হ্যা—খুব বোলে আছে। কোথাও সব্বল্ধ কল্লেল লাকি?"

"করেছি। দুটি ছেলেরই বিয়ের সম্বন্ধ করেছি। ভগবান যদি করেন ত এই মাসের শেষাশেষিই শুভকার্য্য হয়ে যাবে।"

"বেশ বেশ। তা, কোথায় ঠিক হল ?"

"খলসিনীতে। খলসিনীর সর্ব্বেশ্বর গাঙ্গুলীর নাম শুনেছ কি ? তিনি এখন গত হয়েছেন। তাঁরই বাড়ীতে। সর্ব্বেশ্বর গাঙ্গুলীর দুই ছেলে। যিনি বড়, তিনি দেশেই থাকেন, বিষয় সম্পত্তি দেখেন। ছোটবাবু বক্সারে থাকেন, সেখানে মুন্সেফী চাকরি করেন। বড় ভায়ের মেয়ের সঙ্গে নরেনের, ছোটভায়ের মেয়ের সঙ্গে সুরেনের সম্বন্ধ হচ্ছে।"

"মেয়ে দুটি দেখেছেল ? পছন্দো হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, দুটিকেই দেখেছি। পছন্দও হয়েছে। তাঁরাও কলকাতায় গিয়ে ছেলে দুটিকে দেখে এসেছেন।—বল্‌তে গেলে সবই প্রায় ঠিক ঠাক। আজ বিকেলের গাড়ীতে তাঁরা আসবেন, নরেন সুরেনকে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন। তাই তোমাকে বল্‌তে এসেছি ভাই। তুমি বেলাবেলি যাবে—যা কর্‌তে কর্ম্মাতে হয়—করবে। রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে একবারে বাড়ী আসবে।"

মাধব চক্রবর্ত্তী বলিল—"বেশ বেশ। এ ত অতি আনন্দের কথা দাদা। আসবো বৈকি—নিশ্চয় আসবো। তারা কে কে আস্‌বেন, আশীর্ব্বাদ করতে ?"

"বোধ হয় দুই ভাই-ই আসবেন। বক্সারে যিনি মুন্সেফ, তিনি মেয়ের বিয়ের জন্যে সম্প্রতি ছুটি নিয়ে বাড়ী এসেছেন শুনেছি। পরিবার টরিবার ত আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।—তা হলে, এখন উঠি ভাই—ভুলো না, এস বেলাবেলি।"

মাধব বলিল—"ভুলবো ? এ কি ভোলার কথা দাদা ? বাবুলের ছেলে, কলার ভুলবো ? ঠিক আসবো দাদা। এখন উঠলেন তা হলে ? আচ্ছা, প্রনাপ।"

সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাজারের দিকে অগ্রসর হইলেন। সতীশ দত্তের বাড়ী ছাড়াইয়া, প্রায় কালীতলার কাছাকাছি পৌছিয়া দেখিলেন, গামছায় "বাজার" বাঁধিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফিরিতেছেন। ইহাঁকে দেখিতে পাইয়াই তিনি হাঁকিলেন —"গিরিশ ভায়া যে! চলেছ কোথায় ?"

"আজ্ঞে, আপনারই খোঁজে। প্রণাম। আপনার বাড়ী গিয়েছিলাম—শুন্‌লাম আপনি বাজারে বেরিয়েছেন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—"কেন, খবর কি ?"

"খলসিনীর তাঁরা আসছেন আজ, পৌনে পাঁচটার গাড়ীতে। আশীর্ব্বাদ করবেন। তাই, আশীর্ব্বাদের সময়টা স্থির করে দেবার জন্যে—"

"আশীর্ব্বাদের সময় আর কি! পৌনে পাঁচটার গাড়ীতে আসছেন—ছ'টার পর গোধূলি লগ্নে আশীর্ব্বাদ হবে—উত্তম সময়।"

"হাঁ।—তা, আপনাকে না জিজ্ঞাসা করে ত—"

"ঠিক কথা। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করেছ। আমি হলাম তোমাদের পুরোহিত। পুরোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করেই যজমানের সকল কায করা উচিত। মুন্সেব বাবু কি এসেছেন বক্সার থেকে ?"

"হাঁ, এসেছেন। তিনিও বোধ হয় আসবেন।—বিবাহের দিনস্থিরটাও আজকেই করে ফেলতে হবে।—আপনার পাঁজিপুঁথি নিয়েই যাবেন একবারে। এই মাসের শেষাশেষি যদি ভাল দিন পাওয়া যায়—"

কথা কহিতে কহিতে ইহাঁরা সতীশ দত্তের বাড়ীর নিকট আসিয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ উভয়ের কাণে গেল—"এ কি একি একি! দুই দাদা যে একসঙ্গে! প্রাতঃপ্রণাম।"

উভয়ে দেখিলেন, সতীশ দত্ত তাহার বৈঠকখানার বারান্দায় হুঁকা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সতীশ বলিল—"আসুন—আসুন—তামাক ইচ্ছে করে যান। তৈরি তামাক।"

সতীশের আমন্ত্রণে উভয়ে তাহার বারান্দায় গিয়া উঠিলেন। সতীশ চট্ করিয়া ভিতর হইতে একখানা মাদুর আনিয়া বারান্দায় বিছাইয়া দিল। উভয়ে উপবেশন করিলে, সতীশ কলিকাটা 'ঢালিয়া সাজি'তে বসিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"ওহে সতীশ, এত ত উদ্ভট জান, তামাকের উপর একটা উদ্ভট্ বলদিকিন শুনি।"

সতীশ বলিল—"সর্ব্বনাশ!—আপনার কাছে?—আপনি হলেন রীতিমত টোলে পড়া পণ্ডিত; আমি ত কেবল ফাঁকিবাজ। আপনি বলুন, শুনি।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"না, তুমি ফাঁকিবাজ কেন হবে? তোমার বেশ পড়াশুনো আছে। আচ্ছা, আমি একটা বলছি—তুমি জান বোধ হয় সেটা। কিন্তু তোমাকে আর একটা বলতে হবে।"

সতীশ বলিল—"যে আজ্ঞে, চেষ্টা করব।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—

"তাম্রকূটং মহদ্‌দ্রব্যং শ্রদ্ধয়া দীয়তে যদি।
অশ্বমেধফলং তস্য টানে টানে ভবিষ্যতি ॥

—এবার তুমি একটা বল। নতুন হওয়া চাই কিন্তু।"

সতীশ তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—"আচ্ছা, একটা বলি। কিন্তু, আপনার কাছে নতুন হবে কিনা বলতে পারিনে—অত বিদ্যে পাব কোথায় দাদা? আর একটা শ্লোক আছে—

"বিড়ৌজাঃ পুরা পৃষ্টবান্ পদ্মযোনিং
ধরিত্রীতলে সারভূতং কিমস্তি।
চতুর্ভির্মুখৈরিত্যবোচদ্ বিরিঞ্চি-
স্তমাখুস্তমাখুস্তমাখুস্তমাখুঃ ॥"

শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাহা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—"বেশ—বেশ। বেঁচে থাক সতীশ। এ শ্লোকটি নতুন বটে। বেশ শ্লোক।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"কি হল, কি হল? ওর মানেটা কি হল?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"বল ত হে সতীশ, শ্লোকটি আর একবার বল ত।" সতীশ ধীরে ধীরে শ্লোকটি পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল; ভট্টাচার্য্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—

"বিড়ৌজাঃ কিনা ইন্দ্র, পদ্মযোনিং কিনা ব্রহ্মাকে পুরাকালে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—পৃথিবীতে সারভূত বস্তু কি? হাঁ—থামো সতীশ, একটু থামো—এর ব্যঞ্জনাটুকু বুঝিয়ে দিই গিরিশকে। ইন্দ্র, জিজ্ঞাসা করলেন ব্রহ্মাকে। কেন?—বৃহস্পতি রয়েছেন, মহাপণ্ডিত, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন না;—অগ্নি, বরুণ, পবন—সর্ব্বদাই এঁদের পৃথিবীতে যাতায়াত,—এঁদের কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন না; আঁর সকল দেবতাকে ছেড়ে, ইন্দ্র, ব্রহ্মাকেই জিজ্ঞাসা করতে যান কেন?—বল গিরিশ, কেন?"

গিরিশ কড়িবাঁধা ব্রাহ্মণের হুঁকাটি হাতে করিয়া কলিকার অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। উত্তরদানে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলে ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"আরে মুখ্যু, দেখতে পাচ্ছ না, ব্রহ্মা যে সৃষ্টিকর্ত্তা! তিনি নিজে হাতে পৃথিবীকে তৈরী করেছেন যে! পৃথিবীর মধ্যে সারভূত জিনিষ কি, তিনি বল্‌তে পারবেন না ত কি রামা শ্যামা বল্‌তে পারবে?—হ্যাঁ, তারপর কি সতীশ? চতুর্ভির্মুখৈঃ—ব্রহ্মা চার মুখে উত্তর করলেন—তমাখুঃ তমাখুঃ তমাখুঃ তমাখুঃ। চার বার বল্‌বার তাৎপর্য্য কি?—ব্রহ্মা চার মুখে চার বেদ বলেছিলেন কিনা। সে বেদ যেমন সত্য, একথাও তেমনি সত্য। অর্থাৎ কিনা—"

গিরিশ হুঁকাটি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—"খান দাদা।"

ভট্টাচার্য্য তামাক টানিতে টানিতে কথা শেষ করিলেন—"অর্থাৎ কিনা, তামাক যে পৃথিবীর মধ্যে সারবস্তু, অত্র সন্দেহো নাস্তি। বুঝেছ ত?—দেখ্‌লে একবার শ্লোকের বাঁধুনি!"

সতীশ তামাক-হাত ধুইয়া, কবাটের উপর ঝুলানো গামছাখানিতে হাত মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল—"এতখানি বেলায় বেড়াতে বেরিয়েছেন যে মুখুয্যে মশায়?"

গিরিশ বলিলেন—"তোমায় নেমন্তন্ন করতে এসেছি।"

"নেমন্তন্ন? কবে? কবে?"

"আজ। বিকেলে এস। রাত্রে খাবে।"

সতীশ নৃত্যের ভঙ্গিতে বলিল—"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—বেশ, বেশ। ব্যাপারটা কি বলুন দেখি?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ।

"তুমি কি বিপ্র যে কলায়ের নাম শুনে নৃত্য করছ? পাপাত্মা!"

সতীশ বলিল—"কেন ভট্‌চায মশায়? বামুনের চেয়ে কায়েথের কি ক্ষিধে কম?—বরং ঢের বেশী। আমি শ্লোক আউড়ে প্রমাণ করে দিতে পারি।"

ভট্টাচার্য্য রহস্তের গন্ধ পাইয়া বলিলেন—"কি শ্লোক, বলই না শুনি।"

সতীশ বলিল—"শ্লোকটা হচ্ছে—

কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুরামিষশঙ্কয়া।
অন্ত্রাণি যন্ন ভুক্তানি তত্র হেতুরদন্ততা॥

—কায়েথ যখন মাতৃগর্ভে ছিল, তখন মার মাংস যে খেয়ে ফেলেনি, তার একমাত্র কারণ, তখনও তার দাঁত ওঠেনি।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"দূর মুখ্যু! ওর কি ঐ মানে?"

সতীশ বলিল—"তবে?"

"ওর মানে, কায়েথ জাত এতই লোভী, যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে না করতে পারে এমন কাযই নেই।—এই হল এর ধ্বনিতার্থ।"

সতীশ বলিল—"তা ভট্‌চায্যি মশায়, আমরা ত কায়েথ নই, আমরা ত ক্ষত্রিয়। এ জন্মে যাই হই, আমার বোধ হয়, আর জন্মে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম; নৈলে এমন কলাহারপ্রীতি আমার এল কোথা থেকে?—মুখুয্যে মশায়, ব্যাপার কি?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"ব্যাপার গুরুতর। এই ত সবে আজ আরম্ভ। এখন ধারাবাহিক ফলার—কিছু দিন ধরে। নরেন সুরেনের বিয়ে—আজ তাদের আশীর্ব্বাদ।"

গিরিশ মুখোপাধ্যায় বিবাহ-সম্বন্ধের সকল কথা সতীশকে বলিলেন। সতীশ বলিল—"বক্সায়?—সেই যেখান দিয়ে চন্দ্রগড় যায়?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"তা জানিনে, চন্দ্রগড় যায় কি সূর্য্যগড় যায়। তুমি বেলাবেলিই এস,—এই সাড়ে তিনটে, চারটের মধ্যেই—বুঝেছ? হয়ত বা তোমায়, তাদের আন্‌তে ষ্টেশনেও যেতে হতে পারে।"

"আজ্ঞে, তা যাব, বেলা চারটের মধ্যেই পৌঁছব।"

অতঃপর ভট্টাচার্য্য সমভিব্যাহারে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিদায় লইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মুন্সেফ্ বাবু।

অপরাহ্ণ সময়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন;—ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মাধব চক্রবর্ত্তী, পাড়ার নিত্যানন্দ রায়, দুর্গাদাস অধিকারী, পূর্ণ মজুমদার প্রভৃতি। সতীশ দত্তও আছে, তাহাকে ষ্টেশনে যাইতে হয় নাই; মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং গাড়ী লইয়া ভবিষ্যদ্ বৈবাহিকদ্বয়কে আনিতে গিয়াছেন।

আকাশে আর মেঘ নাই। রৌদ্র খট্ খট্ করিতেছে। অনেকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়াছেন, ঘন ঘন হাতপাখা নাড়িতেছেন। বৈঠকখানার পশ্চাতে বাগানে কলমের আমগাছে বড় বড় আম ধরিয়া রহিয়াছে, জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে। কোন কোন আমে বেশ রঙ ধরিয়াছে, বাকীগুলি এখনও সবুজ। মাঝে মাঝে জানালা দিয়া একটু বাতাস আসিতেছে, তখন আমের সুগন্ধ পাওয়া যাইতেছে। আমগাছগুলির পানে চাহিয়া মাধব চক্রবর্ত্তী বলিল—"যদি ক্রিয়া কর্ম্ম করতে হয়, তবে এই সময়ই ভাল। আম না পাকলে ফলারই বৃথা।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"খুব পাকা কথা বলেছ মাধব।"

তিন চারিটা বাঁধা হুঁকায় অনবরত তামাক চলিতেছে। মাঝখানে রূপার থালে পাণ রাখা ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে নিঃশেষিত হইয়া গেল। পূর্ণ মজুমদার হাঁকিলেন—"ওহে, আর গোটা কতক পাণ নিয়ে এস না।"—শুনিয়া সতীশ দত্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া পাণের থালা তাহার হাতে দিল।

কিছুক্ষণ পরে ছক্কড় গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ শুনা গেল। ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"ঐ বোধ হয় আসছে তারা।"—সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। দুই আসন্ন-বৈবাহিককে লইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় নামিলেন। চামড়ার ব্যাগ হস্তে রেশমী চাদর ও পঞ্জাবী পিরাণ পরিহিত টেরিকাটা একজন খানসামাও কোচবাক্স হইতে নামিল।

ভদ্রলোক দুইটিকে সঙ্গে লইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৈঠকখানায় আসিলেন। একজনের বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে, রংটি একটু ময়লা, দেহটি ক্ষীণ, বোধ হয় মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া হয়। অপর ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের নীচেই আছে বলিয়া বোধ হয়, রংটি জ্যেষ্ঠের অপেক্ষা উজ্জ্বল, গোলগাল চেহারা।

যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি প্রবেশ করিয়াই হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন—"ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।"—অপর সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায়, বৈবাহিকদ্বয়কে সমাদর করিয়া বসাইলেন। যিনি বয়ঃকনিষ্ঠ, তিনি বসিয়াই বলিলেন—"ভারি পিপাসা পেয়েছে—এক গেলাস জল যদি আনিয়ে দেন।"—অমনি সতীশ দত্ত প্রভৃতি জল জল করিয়া হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিয়া দিল।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বসিয়া, অভ্যাগতদ্বয়কে সকলের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিয়া ইহাঁদের কাছে গিয়া বসিয়া কথোপকথনে ব্যাপৃত হইলেন। অপর সকলে শ্রোতৃরূপেই বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সূর্য্যাস্তের সময় উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"এইবার গোধূলি লগ্ন হয়ে এল। এখন শুভকর্ম্মটা সম্পন্ন করে ফেলুন।"

আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য অন্তঃপুর হইতে রূপার রেকাবীতে করিয়া ধান্য দূর্ব্বা ও চন্দন আনীত হইল। শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃদ্বয় আসিয়া লজ্জা-বনতমুখে সভায় উপবেশন করিল। যথাবিধি আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল।

আশীর্ব্বাদের পর, বিবাহের দিনস্থির করিবার কথা উঠিল। মুন্সেফ্ বাবু বলিলেন—"আমি একমাস ছুটি নিয়ে এসেছি। তার পাঁচদিন ত আজ কেটেই গেল। একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির শুভকর্ম্মটা হয়ে গেলেই ভাল। তারপর আমার একবার কলকাতার যেতে হবে, হাইকোর্টের জজেদের সঙ্গে দেখা শুনা করতে হবে কি না!"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"আমরা ত যখন বলবেন তখনই প্রস্তুত। আপনাদের হয়ে উঠলেই হল। এই মাসেরই শেষাশেষি হয়ে যাক্ না।"

মুন্সেফ্ বাবুর দাদা বলিলেন—"তাতে আমাদের আপত্তি নেই। দুই ভায়ের বিয়ে ত একদিনে হতে নেই। উপরোউপরি দুটো দিন পেলেই বোধ হয় আপনাদের সুবিধা। একবারে দুটি বউ নিয়ে বাড়ী আসতে পারেন।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"সেই হলেই ত উত্তম হয়।"

মুন্সেফ্ বাবু বলিলেন—"দাদা ঐকথা আন্দাজ করেই পাঁজি দেখিয়েছেন। এ মাসে ২৫শে ২৬শে দুটো দিন আছে। যদি আপনাদের মত হয় ত—"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজ পঞ্জিকা হাতে করিয়াই লইয়া গিয়াছিলেন। বলিলেন—"কোন্ কোন্ দিন বল্লেন? ২৫শে আর ২৬শে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কিয়ৎক্ষণ পঞ্জিকা দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"তা, ও দুটি ভাল দিনই বটে। তবে ২৬শে শনিবার পড়ে যাচ্ছে—শনিবারটা তেমন ভাল নয়। তা হোক্—রাত্রিতে বারদোষ নেই। ন বার-দোষাঃ প্রভবন্তি রাত্রৌ বিশেষতোঽর্কাবনিভূশনীনাং। গিরিশ, তুমি মত দিতে পার।"

গিরিশ মত দিলেন। দিনস্থির হইয়া গেল।

মুন্সেফ্ বাবুর দাদা বলিলেন—"এখনও পনেরো ষোল দিন রয়েছে। সবই ঠিক হয়ে যাবে। কোন্ গাড়ীতে আপনারা বরযাত্র নিয়ে এখান থেকে রওনা হবেন বলুন দেখি?"

বরযাত্রা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। মুন্সেফ্ বাবুর দাদা তখন উঠিতে চাহিলেন। বলিলেন—"যদি এখন অনুমতি হয় ত—"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"বিলক্ষণ! একটু মিষ্টি-মুখ না করে—"

দাদা বলিলেন—"পৌনে ন'টায় আমাদের গাড়ী কিনা—আবার দেরী হয়ে না যায়—"

সতীশ দত্ত বলিল—"না না, দেরী হবে কেন? এই ত মোটে সাতটা। দেড়ঘণ্টা সময় রয়েছে এখনও। আমরা আপনাদের জলটল খাইয়ে, ষ্টেশনে ঠিক সময়ে গাড়ী ধরিয়ে দিতে পারলেই ত হল!"

দাদা বলিলেন—"হ্যাঁ ভায়া, সেইটি দেখো। গাড়ী না ফেল হই।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্তঃপুরে গিয়া তাগিদ করিয়া আসিলেন। সতীশ তাঁহাকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল—"কতদূর?" মুখোপাধ্যায় উত্তর করিলেন—"আধ ঘণ্টার মধ্যেই বসাতে পারব।"

মুন্সেফ্ বাবু ইহাঁদের নিকট হইতে অল্প একটু দূরে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার অতি নিকটেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও নিত্যানন্দ রায়। কথায় কথায় মুন্সেফ্ বাবু বলিলেন—"দেখুন, হরিপদ বলে এই গ্রামের একটি ছেলেকে আপনারা কেউ চেনেন?"

মুখোপাধ্যায় ও সতীশের চক্ষু মুহূর্ত্তমাত্র কাল দৃষ্টি বিনিময় করিল।

নিত্যানন্দ রায় বলিলেন—"কোন্ হরিপদ? কার ছেলে, শুনলে বুঝতে পারি।"

মুন্সেফ্ বাবু বলিলেন—"কার ছেলে তা বলতে পারি নে। হরিপদ বাঁড়ুয্যে। এই গ্রামে তার বাড়ী। তার এক ভগ্নীপতি ছিল, তার নাম রাজকুমার চাটুয্যে। সে ছেলেটি চন্দ্রগড় রাজার ষ্টেটে চাকরি করত।"

মুখোপাধ্যায় কাণ খাড়া করিয়া রহিলেন।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—বুঝেছি। জগদীশ বাঁড়ুয্যের ছেলে হরিপদ। বাবুপাড়ায় তাদের বাড়ী ছিল। কেন মুন্সেব বাবু, হরিপদ'র কি হয়েছে?"

মুন্সেফ বাবু বলিলেন—"হরিপদ'র কিছু হয় নি। তার সেই ভগ্নীপতিটি, রাজকুমার, মাসখানেক হল মারা গেছে। আহা, শুনলাম নাকি বেচারী নতুন বিয়ে করেছিল, বছরও ফেরেনি।"

অনেকেই "অ্যাঁ? বলেন কি?" "আহাহা" বলিয়া উঠিলেন।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"মারা গেছে? বটে? আপনি কোথা শুনলেন?"

মুন্সেফ বাবু বলিতে লাগিলেন—"সে অনেক কথা। মাস খানেক হল, সরকারী কাযে আমার মফস্বলে যেতে হয়, ঐ চন্দ্রগড়েরই দিকে। যেতে আসতে তিন চার দিন লাগবে, গাড়ীভাড়া করেছিলাম। যেদিন বেরুব, ঐ হরিপদ হঠাৎ আমার কাছে এসে উপস্থিত। নিজের পরিচয় দিয়ে বল্লে, তাকে চন্দ্রগড়ে যেতে হবে, কিন্তু গাড়ী পাচ্ছে না; আমি চন্দ্রগড়ের রাস্তায় যাব শুনে আমার কাছে এসেছে। বল্লে—যদি দয়া করে আপনার গাড়ীর কোচবাক্সে চড়ে আমায় যেতে দেন, আমার বড় বিপদ।—ছেলেটির চেহারা দেখে আমার ভারি মায়া হল। জিজ্ঞাসা করলাম —কেন তোমার কি বিপদ হয়েছে?—সে আমায় একখানি টেলিগ্রাম দেখালে। চন্দ্রগড়ের একজন বাঙ্গালী কলকাতায় তাকে তার করেছে। তাতে লেখা আছে, তোমার ভগ্নীপতি হঠাৎ কলেরায় মারা গেছে, শীঘ্র এস। টেলিগ্রাম পড়ে ছেলেটির মুখপানে চাইলাম। দেখলাম তার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে। আমি তাকে আমার বাসায় স্নান করিয়ে, খাইয়ে, গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেলাম। পথে যেতে যেতে সে যা সব বল্লে, আশ্চর্য্য ব্যাপার মশাই।"

পূর্ণ মজুমদার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্লে?"

মুন্সেফ্ বাবু বলিলেন—"বল্লে যে এই রাজকুমারের সঙ্গে তার বোনের বিয়ে হবার আগে, গ্রামের কোন্ এক বুড়ো তাকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছিল। তার সঙ্গেই বিয়ে হবে, পূর্ব্বে একরকম স্থিরও হয়েছিল। তখন ঐ হরিপদই, মাঝে পড়ে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে, ঐ

রাজকুমারকে এনে চুপি চুপি বোনের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছিল। যখন কন্যা সম্প্রদান হচ্ছে, সেই সময় সেই বুড়ো নাকি কেমন করে খবর পেয়ে, উন্মাদের মত ছুটে এসে সেখানে ঢোকে, আর পৈতে ছিঁড়ে শাপ দেয় যে ব্রাহ্মণকে তোমরা যেমন নিরাশ করলে, তোমাদের মেয়ে এক বছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে যাবে।—আশ্চর্য্য কথা মশাই, ছেলেটি বল্লে, অবিকল তাই হয়েছে। এক বছর পূর্ণ হবার আগেই মেয়েটি বিধবা হয়েছে।—আচ্ছা, এ সব ঘটনা আপনারা কিছু শোনেন নি? সে বুড়োটা কে মশাই? সর্ব্বনেশে বুড়ো!"

বৈঠকখানা একবারে নিস্তব্ধ। সূচিপতনেরও শব্দ শুনা যায়।

সতীশ চাহিয়া দেখিল, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখখানি শাকবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সহসা সে বলিয়া উঠিল—"মুখুয্যে মশাই, এঁদের আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে। জল টল খাবার গুলো তৈরি হল কিনা ভিতরে গিয়া দেখিগে চলুন, একবার তাড়া দিয়ে আসা যাক্।"—বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া, একপ্রকার টানিয়াই পার্শ্বের দ্বার দিয়া অন্তর্হিত হইল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল পরে সতীশ বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"আপনারা গা তুলতে আজ্ঞা করুন। সব প্রস্তুত।"

সকলকে সঙ্গে লইয়া সতীশ অন্তঃপুরে গেল। বারান্দায় স্থান হইয়াছে। নিমন্ত্রিতগণ বসিয়া চর্ব্ব্যচোষ্য ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। নরেন সুরেন দুই ভাই পরিবেষণ করিতে লাগিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিয়ৎক্ষণ পরে একবার আসিয়া সকলের, বিশেষতঃ কুটুম্বগণের সহিত সৌজন্য করিয়া, আবার অদৃশ্য হইলেন।

আহারান্তে বৈবাহিকদ্বয় ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঠিকা গাড়ীখানা অপেক্ষা করিতেছিল। মুন্সেফ্ বাবুর দাদা, মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

সতীশ বলিল—"তাঁর মাথাটা বড় ধরেছে, শুয়ে আছেন। তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।"

দাদা বলিলেন—"মাথা ধরেছে? শুয়ে আছেন?—তবে থাক্ থাক্—তাঁকে কষ্ট দিওনা।"—বলিয়া সতীশের হস্তধারণ করিলেন।

উপস্থিত সকলেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাথা ধরার কারণ বেশ বুঝিতে পারিল।

সতীশ বলিল—"আমি আপনাদের সঙ্গে ষ্টেশনে যাই চলুন—গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।"

মুন্সেফ্ বাবু বলিলেন—"না না—আপনি কষ্ট করবেন না। আমরা ঠিক যেতে পারব এখন।"—বলিয়া তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে প্রণাম ও দক্ষিণান্ত করিয়া, ভৃত্যগণকে পুরস্কার দিয়া, উপস্থিত ভদ্রলোকগণের নিকট বিদায় লইয়া অগ্রজের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ভদ্রলোকেরাও নিজ নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সতীশ আবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, একবারে দ্বিতলে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শয়ন কক্ষে উপনীত হইল। মেঝের উপর স্থাপিত একটি লণ্ঠন মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। খোলা জানালার কাছে, খাটের উপর মুখোপাধ্যায় শুইয়া আছেন।

সতীশ তাঁহার বিছানায় বসিয়া বলিল—"ও'রা চলে গেছেন দাদা। আপনাকে ডাকতে আসছিলাম, তা ও'রাই বারণ কল্লেন; বল্লেন,তাঁর শরীর অসুস্থ, শুয়ে থাকুন, তাঁকে কষ্ট দিও না।"

মুখোপাধ্যায় কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"সতীশ, আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? হায় হায় হায়, কি মহাপাপই করেছি! নরকেও যে আমার স্থান হবে না!"

সতীশ বলিল—"ওকথা আপনি কেন বলছেন দাদা? আপনার পাপ কিসের? ওরকম মনে করা আপনার ভ্রম—মহাভ্রম। যাঁর কায, তিনি করেছেন, আপনি আমি কে? আপনি জ্ঞানবান হয়ে ও রকম অজ্ঞানের মত কথা বলছেন কেন? একটু ঘুমুতে

চেষ্টা করুন দেখি, ঘুমোলেই মাথা ধরাটা সেরে যাবে। আফিং খেয়েছেন ?"

"না। ভুলে গেছি।"

"অন্যায় করেছেন। তাই মাথা ধরা সারছে না। কৈ ? কৌটোটা কোনখানে থাকে ? এই যে। নিন্।"

মুখোপাধ্যায় বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। অহিফেন সেবনান্তে আবার শয়ন করিলেন। সতীশ বসিয়া পাখা নাড়িয়া তাঁহার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাবতী আশ্রয় পাইল।

আজ ৩রা মাঘ। হরিঘোষের ষ্ট্রীটের বাড়ীতে, বেলা সাড়ে সাতটার সময় রেকাবীতে একটু গরম মোহনভোগ এবং ধূমায়মান চায়ের পেয়ালা সম্মুখে লইয়া যদুনাথবাবু তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ তোমার কোমরের ব্যথাটা কেমন আছে ?"

গৃহিণী সবেমাত্র মুখ ধুইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া কর্ত্তার জন্য পাণ সাজিতে বসিয়াছিলেন।—বাড়ীতে অন্য স্ত্রীলোকেরা রহিয়াছে, কিন্তু আর কাহারও সাজা পাণ কর্ত্তার পছন্দ হয় না। স্বামীর প্রশ্নে উত্তর করিলেন—"আজ কতকটা কম।"

কর্ত্তা বলিলেন—"তা হলে ঐ কাঁটাপুরের সিদ্ধ মলমটার গুণ আছে বলতে হবে। একদিন মালিস্ করেই যখন ফল পাওয়া যাচ্ছে—"

গৃহিণী বলিলেন—"রোসো। দুদিন আরও দেখ। অমন ত কমবেশী বরাবরই হয়।"

কর্ত্তা বলিলেন—"না, ও মলমটি ভাল। অনেকের মুখে ওর সুখ্যাতি শুনেছি। রোজ দুপুর বেলা ঘণ্টাখানেক ধরে মালিস করিয়ো। অবহেলা কোরো না। ভাল কথা, আজ ৩রা মাঘ—আজ বেলা সাড়ে ১১টার গাড়ীতে বিশু এসে পৌছবে—মনে আছে ত ?"

"হ্যাঁ, মনে আছে। কাল দুধ-ওলাকে বলে রেখেছি আজ দু'সের দুধ বেশী আন্তে।"

"বেশ করেছ। বিশুরা দু'তিন দিনের বেশী বোধ হয় থাকবে না—একমাস বই ত ছুটি নয়।"

এই সময় কমলা আসিয়া প্রবেশ করিল। পিতার কথা শুনিয়া বলিল—"মা, এবারেও কাকাবাবু কি আমাদের সবাইকে থিয়েটার শুন্তে নিয়ে যাবেন ?"

গৃহিণী বলিলেন—"সে আমি কি করে জানব মা ? আমি কি জ্যোতিষ জানি ?"

কমলা বলিল—"না মা, এবারও বোলো আমাদের নিয়ে যেতে।"

"তুই বলিস্। সেবারে তুই-ত—"

কমলা বলিল—"সেবারে যখন এসেছিলেন, তখন আমি ছোট ছিলাম; বায়না নিয়েছিলাম, সেজেছিল। এখন বুড়ো মাগী হয়েছি—এখন কি আর সাজে মা ? তুমিই বোলো।"

গৃহিণী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"শোন মেয়ের কথা। উনি বুড়ো মাগী হয়েছেন, আর আমি বুঝি দিন দিন কচি খুকী হচ্ছি ?"

কর্ত্তা বলিলেন—"না না, থিয়েটরে যাবার কথা কেউ যেন তোমরা তুলো না! এতগুলি লোককে থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া—টিকিটের দাম আছে, গাড়ীভাড়া আছে—কম টাকা খরচ! সে বেচারীর উপর জুলুম কোরো না।"

কমলা বলিল—"জুলুম কেন করবো বাবা ?—তবে কাকা কি কাকীমা যদি আপনা হতে বলেন—তখন—"

পিতা বলিলেন—"হ্যাঁ, তখন সে দেখা যাবে। এখন, তুই এক কাষ দিখিন। বাণ্ডিলে বাঁধা খান-কতক লেপ তোষক বের করে দে, ঝি সেগুলো ছাদে নিয়ে গিয়ে রোদ্দুরে দিক। যারা আসছে, তাদের বিছানা টিছানা দিতে হবে ত।"

কমলা বলিল—"যাই বাবা, মাকে আগে চা এনে দিই।"

গৃহিণী পাণসাজা শেষ করিয়া ডিবা ভরিয়া কর্ত্তাকে দিয়া, কন্যাহস্ত হইতে চা-পূর্ণ পাথরবাটী লইলেন। ইনি চীনা পেয়ালায় চা পান করেন না, উহাকে ম্লেচ্ছাচার জ্ঞান করেন। পূর্ব্বে, গৃহিণী মোটেই চা পান করিতেন না। শরীরে বাতাশ্রয় করিবার পর, প্রাতে ও সন্ধ্যায় চা পান করিবার জন্য কর্ত্তা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। স্নান ও পূজা আহ্নিক সারিবার পূর্ব্বে চা পান করিতে প্রথমটা গৃহিণী খুবই আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ত্তা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, ঔষধ, দুগ্ধ, তাম্বুল প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষ আছে যাহা পূজা আহ্নিকের পূর্ব্বে সেবন করিলে দোষ নাই; চা যখন বাতব্যাধিতে উপকারক, তখন উহা ঔষধ বলিয়াই ধর্ত্তব্য।—সেই অবধি গৃহিণী প্রাতেও চা পান করিতেছেন।

চা সেবন করিয়া, জর্দ্দা সহ কয়েকটা পাণ মুখে দিয়া, পার্শ্বস্থিত জলচৌকির উপর ভর দিয়া কষ্টে-স্থষ্টে গৃহিণী দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"যাই, দেখিগে রান্নাবান্নার কি হয়েছে। বলি হাঁ্যা গা, সেই মেয়েটি যে আসছে, প্রভাবতী না কি তার নাম, তা সে কি আলোচাল খায়, না সিদ্ধচাল খায়?"

কর্ত্তা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"কি করে জানব? আমি কি 'জ্যোতিষ' জানি?"

"নাঃ—তুমি জ্যোতিষ জানবে কেন? যত জ্যোতিষ জানি আমি!"

"ছেলেমানুষ বিধবা হয়েছে, সিদ্ধ চালই খায় বোধ হয়।"

গৃহিণী বলিলেন—"তাই সম্ভব বটে। কিন্তু বলা ত যায় না। চারটি আলোচালও রাঁধিয়ে রাখি। কি জানি, যদি সিদ্ধচাল না-ই খায়? সেই ঠিক দুপুর বেলা, গেরস্তবাড়ী এসে বাছা দুটি ভাত পাবে না!"

স্নানাহার করিয়া বেলা সাড়ে দশটার সময়ে কর্ত্তা আপিস চলিয়া গেলেন।

কমলা বলিল—"মা তুমি নেয়ে ফেল; নেয়ে, পূজো টুজোগুলো এই বেলা সেরে নাও; নইলে তাঁরা এসে এড়লে, ভারি দেরী হয়ে যাবে।"—কন্যার পরামর্শ মত কার্য্য করিতে গৃহিণী প্রবৃত্ত হইলেন।

বেলা যখন প্রায় সাড়ে বারোটা, তখন দুইখানি গাড়ী বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। একখানিতে কর্ত্তা ও তাঁহার দুই পুত্র, অপরখানির সমস্ত খড়খড়ি বন্ধ। বিশ্বেশ্বর বাবু গাড়ী হইতে নামিয়া, স্ত্রীলোক-গণকে নামাইলেন। ঝি সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সে বাবুকে বৈঠকখানায় বসিতে বলিয়া মেয়েদের অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর বাবুর স্ত্রী অগ্রে অগ্রে গিয়া গৃহিণীকে প্রণাম করিলেন। "এস ভাই, এস" বলিয়া গৃহিণী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। খোকা খুকীকে কোলে লইয়া চুমা খাইলেন। পথে কোনও কষ্ট হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সহসা দ্বারের বাহিরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, থান কাপড় পরিয়া, দুই বৎসরের একটি শিশুকে কোলে লইয়া, একটি মেয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঐটি বুঝি প্রভাবতী? এস মা, এস। তুমি ওখানে অমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস ভিতরে এস।"

কোলের শিশুটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্কিতভাবে ধীরে ধীরে প্রভাবতী প্রবেশ করিয়া, বিশ্বেশ্বরপত্নীকে ইঙ্গিতে ছেলে ধরিবার জন্য অনুরোধ জানাইল।

বিশ্বেশ্বরের স্ত্রী খোকাকে কোলে লইলে, প্রভাবতী গৃহিণীকে প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া, চক্ষু দুইটি অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গৃহিণী তাহার মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চাহিয়া রহিলেন। মেয়েটির অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"এই বয়সে তোমার এমন দশা হয়েছে!—আমার কমলার চেয়েও অল্প বয়স যে!"

কন্যার সহিত এই মন্দভাগিনীর তুলনার ভাষা মুখ দিয়া নির্গত হওয়া মাত্র, অমঙ্গলশঙ্কায় গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে নারায়ণ স্মরণ করিয়া, অশ্রুবদ্ধ

কণ্ঠে বলিলেন—"কি করবে মা, যেমন কপাল করে ভারতে এসেছিলে, তেমনি হয়েছে। কেঁদ না, চুপ কর। এইটি তোমার খোকা বুঝি? আয় খোকা, আমার কোলে আয়।"—বলিয়া তিনি খোকাকে কোলে লইলেন। খোকা ইতিমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

খোকা এই অপরিচিতা রমণীর কোলে যাইয়া, কোল হইতে নামিবার জন্য উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। "মার কাছে যাবি?"—বলিয়া গৃহিণী খোকাকে তাহার জননীহস্তে সমর্পণ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার খোকার নাম কি?"

প্রভা বলিল—"ওর নাম সুশীলকুমার।"

"সুশীলকুমার? বেশ বেশ। আহা, বেঁচে থাকুক।—হাঁগা সুশীল বাবু, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে? দুধ খাবে?"

বিশ্বেশ্বরের স্ত্রী বলিলেন—"হাঁ দিদি, দুধ খাবে। বোতলে বাসি দুধ ছিল, তাই একটু সকালে খেয়েছে। আমার খুকীও দুধ খাবে। ঘরে দুধ আছে ত বেশী?"

"হাঁ, আছে বৈ কি। কমলা, কড়াই থেকে বাটী করে দুধ ঢেলে নিয়ে আয় ত মা।"

খোকা খুকীর দুধ খাওয়া হইলে, তাহাদের মাতৃগণ স্নান করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন।

তিন দিন পরে বিশ্বেশ্বর সপরিবারে দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রভাবতী, বিশ্বেশ্বরের স্ত্রীর নিকট গিয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল—"দিদি, আমার কি হবে?"

বিশ্বেশ্বর-পত্নী নিজ অঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন—"'ঈশ্বর' আছেন, ভয় কি?—যাঁদের কাছে তোমায় রেখে চল্লাম, তাঁরা কেমন লোক, এ তিনদিনে কতক বুঝেছ ত? গিন্নীর সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে তোমার বিষয়ে; তোমার উপর ওঁর ভারি মায়া হয়েছে। থাক এখানে, কোনও কষ্ট হবে না। খাবার পরবার, কি এই রকম কোনও কষ্ট, তা হবে না। তবে, আর যে কষ্ট, যতদিন বেঁচে থাকবে, সে ত আছেই। নারায়ণের ইচ্ছেয় সুশীল যদি বাঁচে, তবে একদিন হয়ত কতক দুঃখ ঘুচবে।"

প্রভা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, আবার কবে আসবে?"

"আবার দেশে আসতে দু তিন বছর হবে ভাই। দু বছর তিন বছর অন্তর একবার করে দেশে আসি।"

"এখানে আসবে?"

"সব বারে যে এখানে আসি তা নয়। কোন কোনও বার আসি, আবার কোন কোনও বার একবারে দেশেই যাই।"

"এবার যখন আসবে, তখন এখানে এস দিদি, তোমার পায়ে পড়ি। নইলে ত দেখা হবে না।"

"আচ্ছা, তা আসব। তোমাকে দেখে যাব।"

বিশ্বেশ্বর সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন।

কিছু দিন পরে কমলা একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিল। গৃহিণী অধিকাংশ সময়ই আঁতুড়ে বসিয়া কাটাইতে লাগিলেন। সংসারের সমস্ত কাযকর্ম্ম প্রভাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। একদিন গৃহিণী কর্ত্তার সাক্ষাতে বলিতেছিলেন—"প্রভা যদি না আসতো, তা হলে আমার কি দুর্গতি যে হত বলা যায় না।"

তিন মাস পরে কমলা মেয়ে কোলে করিয়া নিজ শ্বশুরালয় চলিয়া গেল। প্রভা, এই গৃহের কন্যাস্থানীয়া হইয়া বাস করিতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় পাঁচটি বৎসর কাটিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রায়শ্চিত্তের পরামর্শ।

অগ্রহায়ণ মাস; একটু একটু শীত পড়িয়াছে। একদিন রবিবারে, বেলা সাড়ে সাতটার সময়, ভবানীপুর চাউলপটি রোডের একটি দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে, খড়খড়ি বন্ধ একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের পার্শ্বে দেওয়ালে আঁটা একখানা তক্তায় লেখা আছে—"নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, উকীল হাইকোর্ট।"—গাড়ী হইতে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, এক অবগুণ্ঠনবতী রমণীসহ নামিয়া পড়িলেন। ভদ্র-

লোকটি গাড়োয়ানকে বলিলেন—"গাড়ী রাখ্‌খো। কালীঘাট যানে হোগা।"—ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত, চুনাপুকুর লেনের সেই হেমচন্দ্র ঘোষাল। গিরিশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র নরেন্দ্রনাথ এখন হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছে; তাহারই এ বাড়ী। কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ এখানে নাই। সে কলেজের প্রোফেসারি লইয়া কুচবেহার গিয়াছে। তাহার স্ত্রী এখানেই। নরেনের দুই কন্যা ও একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ছোট বধূর এখনও ছেলেপিলে হয় নাই।

সদর দরজা খোলাই ছিল। বৈঠকখানা-ঘরে উকীল বাবুর মুহুরী এবং তিন চারিজন মক্কেল বসিয়া ছিল। হেমবাবু স্ত্রীর সহিত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই, চটিজুতার শব্দ করিতে করিতে নরেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। "জেঠামহাশয় এসেছেন? জেঠাইমাও যে দেখছি!"—বলিয়া অগ্রসর হইয়া সে ইঁহাদের পদধূলি লইল।

হেমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বাবা কেমন আছেন?"

নরেন্দ্র বলিল—"বাবা আজ একটু ভাল আছেন। কাল রাত্তির থেকে জ্বরটা একটু কমেছে।"

"কোন ভয় নেই ত?"

"মধ্যে একদিন অবস্থা খুবই খারাপ দাঁড়িয়েছিল বটে। তবে ডাক্তার বলেন এখন আর কোন ভয় নেই। কিন্তু বাবা তা বিশ্বাস করতে চান না।" হেমবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন--"হ্যাঁ নরেন, বউমারা কেমন আছেন? ছেলেপিলে ভাল আছে ত?"

নরেন্দ্র বলিল—"সবাই ভাল আছে জেঠাই মা।"

হেমবাবু বলিলেন—"সুরেনের চিঠি পেয়েছ? সে ভাল আছে?"

"হ্যাঁ। সেও ভাল আছে। আসুন, উপরে চলুন।"

"চল। তোমার চিঠি পেয়ে, আমার একটু ভাবনাই হয়েছিল বাবা। গিরিশ আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?"

নরেন্দ্র বলিল—"তা ত জানিনে জেঠামশাই। বাবা যেমন বল্লেন, আমি তেমনি আপনাকে লিখে দিলাম।"

নরেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইঁহারা দুইজনে দ্বিতলে গিয়া উঠিলেন। একটি সুপরিসর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পালঙ্কে উপরি-উপরি তিন চারিটি বালিসে ঠেসান দিয়া, পায়ের উপর একখানি আলোয়ান চাপাইয়া গিরিশ বসিয়া রহিয়াছেন। পার্শ্বে একটি টেবিলের উপর রেকাবীতে মিশ্রী ও বেদানা, ঔষধের শিশি ও থার্ম্মমিটার। নরেনের ছোট ছেলেটি ঘরের মধ্যে বল্ খেলিয়া বেড়াইতেছে।

"কেমন আছ ভায়া?"—বলিয়া হেমবাবু গিয়া গিরিশের হস্তধারণ করিলেন।

"আজ একটু ভাল আছি দাদা, বস। এই যে, বউ ঠাকরুণকেও এনেছ দেখছি। বউঠাকরুণ, প্রণাম হই, —বস।"

হেমবাবু বলিলেন—"আমি কি তোমার বউ-ঠাকরুণকে এনেছি? উনি আপনিই এসেছেন। আমি আস্‌বো শুনে উনি একবারে নাছোড়বান্দা হয়ে পড়লেন।"

বউঠাকুরাণী নরেনের পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"কেন, আসবো না কেন? আজ কত বচ্ছর ঠাকুরপোকে দেখিনি। উনি ভবানীপুরে এসেছেন, কাণেই শুনেছি। একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে না? তাই বল্লাম, আমাকেও নিয়ে চল; ঠাকুর-পোকে দেখে আসি; আর, কাছেই কালীঘাট, মা কালীকেও একবার দর্শন করে আসি।"—বলিতে বলিতে তিনি পালঙ্কের নিকটে আসিলেন। গিরিশের ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"এখন আর জ্বর নেই ত?"

গিরিশ বলিলেন—"পাঁচদিন পাঁচরাত্রি জ্বর ভোগের পর, কাল রাত্রে জ্বরটা ছেড়েছে।"

বধূঠাকুরাণী বলিলেন—"কিন্তু ভাই, তোমার শরীর এ কি হয়ে গেছে? তুমি যে একেবারে বুড়ো হয়ে পড়েছ! তোমার দাদার চেয়েও তোমায় বয়সে বড় দেখাচ্ছে যে!"

গিরিশ বলিলেন—"দাদার সঙ্গে কি আমার তুলনা বউঠাকরুণ? কত তোয়াজে তুমি রেখেছ ওঁকে! দাদার কথা আলাদা।"

বধূঠাকুরাণী বলিলেন—"না ভাই, ঠাট্টা নয়। এত শীগ্‌গির তুমি বুড়ো হয়ে যাবে, এ আমার ধারণাই ছিল না।"

নরেন্দ্র ইতিমধ্যে একখানা চেয়ার সরাইয়া আনিয়া পালঙ্কের নিকট রাখিয়াছিল। সে বলিল—"বসুন জেঠাইমা, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন?"

"না বাবা—আগে যাই, বউমাদের দেখে আসি। কোথা? কোন ঘরে তাঁরা?"—গিরিশের পানে চাহিয়া বলিলেন—"আমি বউমাদের দেখে আসি ভাই, তোমরা দুজনে গপ্প কর।"—বলিয়া তিনি নরেন্দ্রের সহিত বাহিরে গেলেন।

হেমবাবু গিরিশের একখানি হাত নিজ হাতের মধ্যে লইয়া বসিয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমায় ডেকেছ কেন গিরিশ, বিশেষ কোনও কথা আছে কি?"

"হ্যাঁ দাদা, অনেক কথা আছে।"

"কি বল দেখি।"

"বল্‌বো দাদা, একটু নিরিবিলিতে বল্‌বো।"

হেমবাবু বলিলেন—"একটা কায করি না। নরেনকে পাঠিয়ে দিই, গিন্নীকে, বউমাদের নিয়ে কালী-দর্শন করিয়ে আসুক্। আমরা ততক্ষণ কথাবার্ত্তা কই।"

"তা—পাঠাও।"

হেমবাবু বিছানা হইতে নামিয়া, "ওগো, শুন্‌ছ" বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। স্ত্রীকে বলিলেন—"কালীঘাটে যাবার ইচ্ছে থাকে ত এই বেলা হয়ে এস না। নরেন বাবাজী, যাও, তোমার জেঠাইমাকে দর্শন করিয়ে আন। আর, বউমারাও যদি যেতে চান—"

হেমচন্দ্র-গৃহিণী বলিলেন—"বউমারা ধরেছেন, এই খানেই আমাদের খেয়ে যেতে হবে। আমি বল্লাম, শ্বশুরের অসুখ, তোমরা নিজেরাই ব্যস্ত রয়েছ বাছা—তা তাঁরা শুনছেন না। কি বল?"

হেমবাবু বলিলেন—"তা, বউমারা যা হুকুম করবেন তাই হবে।"

"বড় বউমা আমার সঙ্গে যাবেন কালীঘাটে। তাঁর মেয়ে দুটি, ছেলেটিও সঙ্গে যাবে। কিন্তু ছোট বউমা যেতে চাইছেন না; বল্‌ছেন আমি থাকি, রান্না বান্নার যোগাড় করে রাখি।"

"যে রকম সুবিধে হয়, তাই কর।"—বলিয়া হেম-বাবু পুনরায় রোগীর শয়নগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ইঁহারা চলিয়া গেলে পর, হেমবাবু চেয়ারখানিতে বসিয়া বলিলেন—"কি কথা বল দেখি?"

গিরিশ বলিলেন—"আজ আট বৎসর হল, আমি একবার বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছিলাম, তোমার মনে আছে ত?"

"হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি। তারপর, সে মেয়ের অন্যত্র বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তাও শুনেছিলাম।"

"আর কিছু শোন নি?"

হেমবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"আর—কি? বিশেষ আর কিছু শুনিনি বোধ হয়। হয়েছিল কি?"

"তা হলে গোড়া থেকে বলি শোন"—বলিয়া আরম্ভ করিয়া, পটলিকে নেবু বাগানে দেখা, তজ্জনিত তাঁহার গোপন চিত্তচাঞ্চল্য, পরে স্বপ্নদর্শন, ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক স্বপ্ন-ব্যাখ্যা, বিবাহ করিবার জন্য নিজের উন্মত্ততা, কথা স্থির হইয়া যাওয়ার পর তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, বিবাহ সভায় গিয়া পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশাপ দেওয়া, মোকর্দ্দমা করিয়া জগদীশকে ভিটা মাটী উচ্ছন্ন করা, পরে গৃহহীন জগদীশের শোচনীয় মৃত্যু, অবশেষে মেয়েটির বৈধব্য সংবাদ পাওয়া—সমস্তই গিরিশ বর্ণনা করিলেন।

হেমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারপর, কি হল মেয়েটির?"

পরবর্ত্তী সংবাদও গিরিশ তাঁহার বন্ধ্যারম্ভ বৈবা-হিকের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন—মাতা ও হরিপদ'র মৃত্যুর তিন চারি মাস পরে পটলি যে কলিকাতায় আসিয়াছে, ম্যাকিনন্ মেকেঞ্জির বাড়ীর যদুনাথ গাঙ্গুলীর গৃহে পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, শিশুপুত্র

লইয়া সে যে দিনযাপন করিতেছে, তাহাও জানিতেন। সে সকল কথাও হেমবাবুকে জানাইলেন।

হেমবাবু বলিলেন—"ভারি দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই।"

গিরিশ বলিলেন—"দুঃখের বিষয় নয়?—কিন্তু সে জন্যে আমি তত উতলা হইনি। দুঃখ ত পৃথিবীতে অধিকাংশ লোকেরই আছে; কিন্তু আমি ত সে সকল দুঃখের হেতু নই। এটা যে আমারই আপন হাতে গড়ে দেওয়া দুঃখ। আমিই যে এটি ঘটিয়েছি। মহা-পাপের কায করেছি। এজন্যে, সময়ে সময়ে আমার মন বড়ই খারাপ হয়ে যায় দাদা। মধ্যে, অসুখটা যখন খুব বেড়ে উঠেছিল, ভাবছিলাম, যে মহাপাপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত না করে গেলে, সেখানে জবাব দেব কি বলে?—এবার ত সামলে উঠেছি। কিন্তু বুড়ো হয়েছি—বয়সে খুব বুড়ো না হই, শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। আর ক'দিন? কোনদিন ডাক আসে, বলা যায় না। মরবার আগে, এ পাপের কিছু একটা প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে চাই দাদা। কি করি বল ত।"

হেমবাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন—"তুমি অভিশাপ দিয়েছিলে বলেই যে সে বিধবা হয়েছে, এমন কিছু কথা নয়। তার অদৃষ্টে ছিল, সে বিধবা হয়েছে—কষ্টে পড়েছে। তোমার অভিশাপটা—ওটা কাকতালীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আর কি!—তবে, এজন্যে তোমার মনে যখন খট্‌কা উপস্থিত হয়েছে, এ অবস্থায় মেয়েটির দুঃখ যেটুকু ঘোচাতে পার, তা করলেই প্রায়শ্চিত্ত হল।"

গিরিশ বলিলেন—"সেই কথাই ত ভাবছি। কি করা যায় বল দিকিন। জগদীশের বাড়ীখানা, যা নীলেম করে নিয়েছিলাম, তা বেশ করে মেরামৎ টেরামৎ করিয়ে হরিপদ'র নামে দানপত্র লিখে রেজিষ্টারি করে রেখেছি। হরিপদ'র ত আর কেউ নেই, পটলির ছেলে, তার ভাগ্নেকেই ও বাড়ী অর্শাবে। এখন আমার ইচ্ছে—কিছু টাকা যদি—"

হেমবাবু বলিলেন—"তার আর ত কেউ নেই—বয়সও অল্প—বিধবার হাতে বেশী টাকা দেওয়াটা কি তেমন—"

গিরিশ বলিলেন—"যাঁর বাড়ীতে সে আছে, শুনেছি তিনি খুব ভদ্রলোক—তাঁর স্ত্রীটিও খুব ভাল। তাকে মেয়ের মত যত্ন করেই তাঁরা রেখেছেন। কিন্তু ধর, রক্তের কোনও সম্বন্ধ ত নেই—কোনও দাবী ত নেই। যদুবাবু যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন। তারপর মেয়েটি অন্নবস্ত্রের কষ্টেও ত পড়তে পারে। সেটা যাতে না হয়—"

"তবে, যা মনে করেছ, সেই কায করাই ভাল। কিছু টাকা তাকে দাও।"

"আমার ইচ্ছে, একদিন গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে, টাকাগুলি দিয়ে আসি। আচ্ছা, আমি যদি দেখা করতে চাই, তারা কি দেখা করতে দেবে না? আমাদের গ্রামেরই ত মেয়ে—আর, আমি ধর, তার বাপের বয়সী—কোনও দোষ আছে কি?"

"নাঃ—দোষ আর কি। দেখা করায় তারা বাধা দেবে বলে মনে হয় না।"

"তবে দাদা, তুমি একটি কায কর। যদু গাঙ্গুলী কোথায় থাকে, কোথায় এখানে তার বাসা, তার ঠিকানাটি আমায় সংগ্রহ করে দাও। ম্যাকিনন মেকেঞ্জির বাড়ীর যদুনাথ গাঙ্গুলী—বুঝলে? ঠিকানাটি বোধ হয় অনায়াসেই তুমি সন্ধান করে দিতে পারবে?"

"অনায়াসে। কালই আপিসে গিয়ে, লোক পাঠিয়ে আমি তাঁর ঠিকানা আনিয়ে নেব এখন।"

বেলা দশটার পর কালীঘাট হইতে সকলে ফিরিয়া আসিলেন। স্নানাহার করিয়া, অপরাহ্নকালে হেমবাবু সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দেখা হইবে কি?

যদুনাথ বাবু প্রভাতিক চা পান করিতে করিতে গৃহিণীকে বলিলেন—"আজ আপিস নেই, আজ আমাদের ছুটি।"

গৃহিণী বলিলেন—"কেন? আজ কি?"

"আজ আখেরী চাহার সম্বা। মুসলমানী পর্ব্ব।"

"ছুটি, তা ভালই হয়েছে। কয়েকদিন থেকেই নবান্ন করব করব মনে করছিলাম—আজ তা হলে করি।"

"বেশ ত। কর।"

"শুধু কর বল্লেই ত হয় না। আমার যা যা জিনিষ দরকার, সব আনিয়ে দাও।"

"কি কি চাই ফর্দ্দ দাও না—এনে দিচ্ছি তার আর কি!"

গৃহিণী প্রভাকে ডাকিয়া বলিলেন—"প্রভা, কাগজ পেন্সিল নিয়ে আয় ত, মা। আজ নবান্ন হবে, কি কি জিনিষ চাই, আমি বলে যাই, তুই লেখ।"

প্রভা কাগজ পেন্সিল লইয়া আসিল। গৃহিণী, একটি ছোট খাট ভোজের ফর্দ্দই লেখাইতে লাগিলেন।

যদু বাবু বলিলেন—"এ যে বড় ঘটার নবান্ন দেখ্‌ছি গো!"

গৃহিণী বলিলেন—"ঘটা আর কি গো! আজকাল ত কলকেতার এই রকমই হয়েছে। এখন কি আর সেকালের সেই ভিজে আলোচালে কলা আর গুড় মেখে নবান্ন হয়!"

ফর্দ্দ লইয়া, ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া যদু বাবু বাজার করিতে গেলেন। প্রভার ছেলে সুশীলকুমারও তাঁহার সঙ্গ লইল। গৃহিণী বলিলেন—"প্রভা, তুই এই বেলা নেয়ে নে। আমি ততক্ষণ পাণগুলো সেজে ফেলি।"

স্নানান্তে প্রভা সেইমাত্র বাহির হইয়াছে, বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভিজা চুলগুলি গামছায় মুছিতেছে, এমন সময় সদর দরজা হইতে শব্দ আসিল—"গাঙ্গুলী মশাই বাড়ী আছেন?"

ঝি যথারীতি ভিতর হইতে হাঁকিল—"বাবু বাড়ী নেই।"

আবার শব্দ আসিল—"বাবু কোথা গেছেন?"

ঝি বলিল—"বেরিয়েছেন।"

"দরজাটা খোল দিকিন।"

ঝি একটু বিরক্ত হইয়া,গৃহিণীর পানে চাহিয়া বলিল —"কে মিন্সে? বাবু বাড়ী নেই, তবু দরজাটা খোল দিকিন!"

"ওগো শুনছ, আমি অনেক দূর থেকে আসছি। বাবু না আসা পর্য্যন্ত বৈঠকখানায় বসব।"

গৃহিণী বলিলেন—"জিজ্ঞাসা কর্ না, কোথা থেকে আসছেন।"

ঝি হাঁকিল—"কোথা থেকে আসচেন আপনি?"

"আমার বাড়ী ত্রিবেণী। এখন আসছি ভবানীপুর থেকে। বাবুর কাছে বিশেষ দরকার আছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"ত্রিবেণী? প্রভা, তোদের দেশের লোক। যা ঝি, বৈঠকখানা খুলে লোকটিকে বসাগে। আর, নাম জিজ্ঞাসা করে আসিস্।"

ঝি দরজা খুলিয়া ফিরিয়া আসিলে প্রভা জিজ্ঞাসা করিল—"কে, ঝি?"

"বুড়ো।"

"নাম জিজ্ঞাসা করিস্ নি?"

"শোন কথা! আমার বাপের বয়সী, ভদ্দর নোক, বুড়ো মানুষ—আমি নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"কি বল্লেন?"

"বল্লেন—আমি এখন বসলাম। তোমাদের বাবুর তামাক খাকে ত বরং সেজে আন এক ছিলিম।"

লোকটি কে, কি জন্য আসিয়াছেন, জানিবার জন্য প্রভার মনে একটা কৌতূহল জন্মিল। ত্রিবেণী—তাহাদের সেই ত্রিবেণী—আর তাহাদের ত্রিবেণী কিসের? ত্রিবেণীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধই ত জন্মের মত ঘুচিয়াছে। প্রভা ভাবিতে লাগিল—"কে লোকটি? চেনা লোক নিশ্চয়—নহিলে আসিবেন কেন?—কি বলিতে আসিয়াছেন কে জানে!"

ঝি ব্রাহ্মণের হুঁকায় তামাক সাজিয়া বৃদ্ধকে গিয়া দিল। গিরিশ হুঁকা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ বাছা, প্রভাবতী বলে একটি মেয়ে এ বাড়ীতে থাকে?"

ঝি বলিল—"থাকে।"

"কেমন আছে?"

"ভাল আছে।"

"তার বাপ, মা, ভাই, স্বামী—সবাই মরে গেছে। প্রভা কি এখনও কাঁদে কাটে?"

ঝি বলিল—"হ্যাঁ—তা—কখনও কখনও—"

"তার একটি ছেলে ছিল যে। কি নাম তার?"

"সুশীলকুমার।"

"সে কোথা?"

"সেও বাবুর সঙ্গে বাজারে গেছে।"

এদিক ওদিক চাহিয়া গিরিশ নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা ঝি, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—প্রভা কি এ বাড়ীতে কিছু কষ্টে আছে?"

ঝি বলিল—"কেন গো? কষ্টে থাক্‌বে কেন? যারা ভদ্দরলোক হয়, তারা কি আর মানুষকে কষ্ট দেয়?—আপনি এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আপনি কি পেরভা দিদির কেউ হন?"

"না ঝি। কেউ হইনে। কেউ না। আমি অমনিই জিজ্ঞাসা করছি।"—বলিয়া গিরিশ একমনে ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঝি গিয়া গৃহিণীকে, প্রভাকে সকল কথা বলিল। ইহাতে প্রভার কৌতূহল আরও বাড়িয়া উঠিল। গৃহিণী বলিলেন—"বোধ হয় তোমার বাবার কোনও বন্ধু টন্ধু।"

গিরিশের তামাক ছিলিমটি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; শালখানি পায়ে ঢাকা দিয়া, চৌকির উপর বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে জানালা দিয়া, মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছেন বাবু আসিতেছেন কি না।

এইরূপ কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর, বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সাত বৎসরের একটি ছেলে দেখিয়া গিরিশ বুঝিলেন, এইটিই সুশীলকুমার।

গিরিশ চৌকি হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"মশায়েরই নাম কি যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়? আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।"

ভৃত্য সুশীলকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যদুবাবু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায়ের নাম কি? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

নাম ও ধাম শুনিয়া যদুবাবুর ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীর নিকট তিনি প্রভার সমস্ত ইতিহাসই শুনিয়াছিলেন। এ নামটাও তাঁহার স্মরণ ছিল। বলিলেন—"এখানে কি প্রয়োজন আপনার?"

যদু বাবুর কণ্ঠস্বরে বিরক্তির খাদ যেটুকু মিশানো ছিল, তাহা গিরিশের বুকের মধ্যে গিয়া বাজিল।

গিরিশ বলিলেন—"আপনি—আমার—নাম—কি পূর্ব্বে শুনেছেন?"

"শুনেছি।"

"আমি কত বড় পাপী—কত বড় নরাধম—সবই তা হলে আপনি জানেন?"—গিরিশের স্বর কম্পিত।

এ কথা শুনিয়া যদু বাবু চমকিয়া উঠিলেন। না—এ ত পাপী নরাধমের মত কথা নহে।—তিনি আগন্তুকের মুখের পানে চাহিলেন। দেখিলেন, বার্দ্ধক্যরেখাঙ্কিত সে মুখে নিষ্ঠুরতার কোনও চিহ্ন নাই—ললাটে অবাধ সরলতা, চক্ষুযুগলে কোমল করুণা, ওষ্ঠে একটা ব্যাকুলতা যেন বলি বলি করিতেছে—'আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর।'

যদুবাবুর মনটা একটু নরম হইল। তিনি বলিলেন—"আমি সবই জানি, অর্থাৎ প্রভার যা যা হয়েছিল, সকল কথাই আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি।"—বলিয়া সেই তক্তোপোষের উপর বসিলেন।

গিরিশ বলিলেন—"আপনি সবই শুনেছেন? না যদুবাবু, আপনি এখনও সব শোনেন নি। আপনি শুনেছেন যে প্রভাকে আমি অভিশাপ দেওয়াতে, তার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।—কিন্তু সে অভিশাপ, প্রভার কপাল পুড়িয়ে এসে, আমাকে আজ এই আট বছর যে কি পোড়ান্ পুড়িয়েছে, তা ত আপনি শোনেন নি। আমায় যত বুড়ো আজ আপনি দেখছেন, বয়সে আমি তত বুড়ো নই যদু বাবু। মনের কষ্টে আমায় এমন বুড়ো করে ফেলেছে। আমার খেয়ে

সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই। একটা কচি মেয়ে, যে কোনও দোষের দোষী নয়, যে আমার কোনও অনিষ্ট করেনি—তার এই সর্ব্বনাশ আমি কেন করলাম!—ক্রোধ, মানুষের একটা রিপু। সেই রিপু একমুহূর্ত্তের মধ্যে আমাকে কি হিংস্র পশুতেই পরিণত করে ফেলেছিল! হিংস্র পশু কি বলছি—তারও অধম। সাপ—কেউ তার গায়ে হাত না দিলে সে কামড়ায় না। বাঘ—যাকে খাবার, তাকে একেবারেই গিলে ফেলে, সারাজীবন ধরে কাউকে দগ্ধে দগ্ধে মারে না"—বলিয়া তিনি দুই হস্ত দিয়া মুখাচ্ছাদন করিলেন।

যদুবাবু কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। কিছু না বলিলে চলে না, তাই বলিলেন—"মুখুয্যে মশাই, আপনি উতলা হবেন না। যা হয়ে গেছে, তা ত আর ফিরিবে না। মানুষের ত হাত নয়।"

গিরিশ মুখ তুলিলেন। বলিলেন—"ফেরে না, এই ত মুস্কিল। সে যাই হোক, আজ আমি এখানে যে জন্যে এসেছি, তা আপনাকে বলি। আপনার কোন ও কাযের ব্যাঘাত করছিনে ত?"

"না, আজ আমার ছুটি, আপিস নেই।"

"তা জানি, তাই আজ এসেছি। আমি এসেছি কি জন্যে, তা বলি। মেয়েটির যা সর্ব্বনাশ করবার তা ত আমি করেইছি। আমার দ্বারা তার যতটুকু ক্ষতিপূরণ হতে পারে, তা করবার চেষ্টাতেই এসেছি।"—বলিয়া তিনি নেকড়ায় বাঁধা কাগজগুলি খুলিতে লাগিলেন। সেগুলি যদু বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, এইগুলি প্রভাকে দিয়ে যাই। আপনি অবিশ্যি তাকে নিজের মেয়ের মত করে প্রতিপালন করছেন, তার কোনও কষ্ট নেই—তা জানি। ভগবান তাকে একটি ছেলে দিয়েছেন, ছেলেটি যদি বাঁচে, তবে প্রভার দুঃখ ঘুচবে। ছেলেটি বড় হলে তার লেখাপড়ায় ব্যয় আছে, কতরকম ব্যয় আছে, তাই এই পাঁচহাজার টাকা প্রভাকে আমি দিয়ে যেতে চাই। আর, তার বাপের যে বাড়ীখানি আমি কেড়ে নিয়েছিলাম, সে খানিকে মেরামৎ করিয়ে, প্রভার ভাইয়ের নামে দানপত্র লিখে রেখেছি। সে বংশে এখন আর ত কেউ নেই—ঐ ছেলেটি। ওর মামার সম্পত্তি ওই পাবে। এই কাগজখানিও তাই প্রভাকে দিতে এসেছি।"

যদুবাবু কাগজগুলি গিরিশের হাতে দিয়া বলিলেন——"তা, এ ত বেশ ভাল কথা।"

গিরিশ বলিলেন—"তা হলে—প্রভার সঙ্গে একবার আমার দেখা হতে পারে কি?"

যদু বাবু একটু ভাবিলেন। শেষে বলিলেন—"আমার অবিশ্যি কিছুমাত্র আপত্তি নেই। প্রভা রাজি হলেই হল।"

গিরিশ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি রাজি হবে যদুবাবু?"

যদু বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"সন্দেহ।"

গিরিশও কিছুক্ষণ ভাবিলেন। শেষে বলিলেন—"আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন। যদি সে রাজি হয়, উত্তম। না রাজি হয়, এগুলি আপনার কাছেই রেখে যাই।"

যদু বাবু মনে মনে ভাবিলেন, "প্রভা ইঁহার নাম শুনিলে সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হয় এমন বোধ হয় না। অথচ বৃদ্ধ এগুলি তাহারই হাতে দিয়া যান, সেই ভাল। আমার হাতে দিয়া গেলে হয়ত ইঁহার মনে একটু সংশয় থাকিয়া যাইবে, কি জানি সেগুলি প্রভার কাছে পৌঁছিল, না আমিই আত্মসাৎ করিয়া লইলাম।"—তাই প্রকাশ্যে বলিলেন—"দেখুন গিরিশ বাবু, আমার বিশ্বাস, আপনার পরিচয় আগে থেকে শুনলে প্রভা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না। যদি অনুমতি করেন, তবে তাকে এই মাত্র বলি, তোমাদের গ্রামের একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তোমার বাপের বন্ধু, তোমায় দেখতে এসেছেন।—তারপর তার সঙ্গে দেখা হলে, যা বলবার করবার—আপনি তা বলবেন করবেন।"

গিরিশ বলিলেন—"বেশ, এ পরামর্শ ভাল। আপনি তা হলে অনুগ্রহ করে—"

"এই যে আমি যাচ্ছি"—বলিয়া যদুবাবু উঠিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবনের মূল্য।

ঝি বৈঠকখানায় আসিয়া গিরিশকে বলিল—"বাবু, আপনি উপরে চলুন।"

"উপরে যাব? আচ্ছা।"—বলিয়া গিরিশ কম্পিত হস্তে নোট পাঁচখানি এবং দলিলটি একত্র গুটাইয়া বাম-হস্তে লইলেন। দক্ষিণ হস্তে ছড়িটি লইয়া, ঝির পশ্চাৎ পশ্চাৎ, খট্ খট্ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

ঝি একটি কক্ষের দ্বার তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। প্রবেশ করিয়া গিরিশ দেখিলেন, টেবিলের কাছে কয়েকখানি চেয়ার, একখানিতে যদু বাবু বসিয়া রহিয়াছেন। ইহাঁকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"আপনি বসুন গিরিশ বাবু। প্রভাকে আমি এই ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি—আমি এই পাশের ঘরেই থাকব এখন।"

গিরিশ বসিলেন না; যদুবাবু বাহির হইয়া গেলে, খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রাজপথের পানে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে, নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রভা আসিয়া সেই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। প্রভা, গিরিশের পানে চাহিয়া রহিল, চিনিতে পারিল না। গ্রামে থাকিতে সে সর্ব্বদা যে তাঁহাকে দেখিত, এমন নহে; দূর হইতে কচিৎ কখনও দেখিয়াছে; সেও আজ আট বৎসর হইয়া গেল।

গিরিশ হঠাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হইল, বিষাদের একখানি প্রতিমা গড়িয়া কে যেন সেখানে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। আট বৎসর পূর্ব্বে, নেবুবাগানে এলোচুলে প্রভাতালোকে প্রভাকে যেমন দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তিই তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। প্রভা মাথায় আর একটু উচ্চ হইয়াছে, বর্ণ পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর,—যে ছিল কিশোরী, সে এখন পূর্ণ যুবতী। জানা না থাকিলে ইহাকে প্রভা বলিয়া গিরিশ হয় ত চিনিতেই পারিতেন না।

ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ করিয়া গিরিশ, প্রভার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাহার মুখের পানে চাহিয়া অতি কোমল করুণ স্বরে বলিলেন—"তুমি প্রভাবতী?"

প্রভা কথা কহিল না, অবনত দৃষ্টিতে কেবল সামান্য শিরশ্চালনা করিয়া জানাইল যে তাহাই বটে।

"তুমি আমায় চিনতে পার?"

অস্ফুটস্বরে প্রভা বলিল—"আজ্ঞে না।"

"আমার বাড়ী ত্রিবেণী। তোমার ছেলেটি কৈ?"

"ভাত খাচ্ছে।"

গিরিশ তখন, গাত্রবস্ত্রের মধ্যে হইতে কম্পিত বামহস্তখানি বাহির করিয়া, কাগজগুলি দক্ষিণ হস্তে লইয়া, প্রভার নিকট সেগুলি ধরিয়া বলিলেন—"এ-গুলি তুমি নাও দেখি।"

কি কাগজ তাহার ঠিকানা নাই; লইবে কি না, প্রভা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। গিরিশ বলিলেন—"নাও—নাও—কিছু মন্দ জিনিষ নয়। খুলে দেখ, কি।"

প্রভা সংশয়-কম্পিত হস্তে কাগজের তাড়াটি লইল। দুই হস্তে সেগুলি খুলিয়া ধরিয়া বলিল—"এ—ত—নোট। কিসের টাকা এ?"

গিরিশ বলিলেন—"গুণে নাও—দেখ—পাঁচখানি নোট আছে। হাজার টাকার করে' এক-একখানি। আর, ঐ যে অন্য কাগজখানি দেখ্‌ছ, ওখানি দলিল, তোমাদের বাড়ীর দলিল।"

প্রভা বলিল—"এ নোট আপনি আমায় কেন দিচ্ছেন? আপনি কে?"

গিরিশ বলিলেন—"এ নোট তোমায় দিচ্ছি—তুমি রেখে দেবে। দেখ, চিরদিন কিছু মানুষের সমান যায় না। মানুষের বিপদ আপদ আছে, সময় আছে, অসময় আছে। এ টাকাগুলি অসময়ে তোমার কাযে লাগতে পারে। ছেলেটি হয়েছে—ওটিকে মানুষ করতে হবে ত?"

প্রভা এবার একটু বিরক্ত হইয়াই যেন বলিল—"তা ত বুঝলাম। কিন্তু আপনিই বা কে, আর এ সব আমায় দিচ্ছেনই বা কেন? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি নে!"

গিরিশ বলিলেন—"তুমি আমায় চিন্‌তেই যখন পারনি, কি বলেই বা নিজের পরিচয় দিই! আমি আর কে? আমিই তোমার সর্ব্বনাশের মূল। আমিই তোমাদের গ্রামের গিরিশ মুখুয্যে।"

প্রভার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। নোটের বাণ্ডিল তাহার অজ্ঞাতেই মেঝের উপর পড়িয়া গেল। তাহার গৌরবর্ণ অকলঙ্ক ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল।

প্রভার ভাবভঙ্গি দেখিয়া গিরিশের আশঙ্কা হইল, তাহার ফিট্ না হয়! যেমন ভাবে গুছাইয়া যাহা যাহা বলিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সমস্তই উলট পালট হইয়া গেল। সে সকল কথা কিছুই আর তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না। নিজ বক্তব্য তাড়াতাড়ি সারিয়া লইবার অভিপ্রায়ে বলিয়া ফেলিলেন—"দেখ, জন্মমৃত্যু ঈশ্বরাধীন ঘটনা, মানুষের কোনও হাত এতে নেই। সময়ে সময়ে মানুষ উপলক্ষ হয় মাত্র। তোমার এই সর্ব্বনাশে আমিই যে উপলক্ষ হলাম, সেইটেই বড় আক্ষেপের বিষয়।"

তখন গিরিশের বোধ জন্মিল, এ কথাগুলি ত তাঁহার বলিবার অভিপ্রায় ছিল না; তাঁহার আন্তরিক কথাও ত এ নয়। লোকে তাঁহাকে সান্ত্বনাছলে এত দিন যাহা বলিয়াছে, যাহা তিনি এতদিন নিজেই গ্রহণ-যোগ্য বিবেচনা করেন নাই, সেই কথাই বলিয়া ফেলিয়াছেন যে!

প্রভা বলিল—"মন্দ নয়; নিজে আপনি যা করেছেন, তা ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। মন্দ নয়।"

গিরিশ দেখিলেন, প্রভার মুখমণ্ডলে রক্তরাগ প্রতি-মুহূর্ত্তে স্পষ্টতর হইয়া আসিতেছে। তাহার ওষ্ঠযুগল স্পন্দিত হইতেছে, নাসিকার স্ফীতি আরম্ভ হইয়াছে, চক্ষুতারকা জল্ জল্ করিয়া উঠিতেছে। তাহার এই ভাবান্তর দেখিয়া গিরিশের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক আরও গোলমাল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন—"সে যাই হোক, আমার দ্বারা তোমার যে অনিষ্ট হয়েছে, তারই যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ করার জন্যে, এই পাঁচহাজার টাকা আমি এনেছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র রোষে, ঘৃণায়, অপমানে তাহার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া বড় বড় ফোঁটা ঝরিয়া পড়িল।

নোটের তাড়া তখনও তাহার পদতলে পড়িয়া। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, প্রবল পদাঘাতে সে তাড়া সে দূরে ফেলিয়া দেয়।

কিন্তু তাহা সে করিল না। নিজে কয়েকপদ পশ্চাতে হটিয়া, গ্রীবা উন্নত করিয়া বিদ্যুদ্দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল—"কি!—আপনি যাকে বধ করেছেন, তার জীবনের এই মূল্য ধরে দিতে এসেছেন আমায়? আপনার ঐ টাকা আমি স্পর্শ করব? অসময়ের কথা কি বলেছেন আপনি? যদি না খেতে পেয়ে আমি মরেও যাই—আমার ছেলে যদি আমার চোখের সামনে খেতে না পেয়ে মরেও যায়, তবু আপনার টাকা, গোখ্‌রো সাপের বিষের তুল্য আমি মনে করব।"

প্রভার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সেই অবস্থায়, কোনও ক্রমে কক্ষ হইতে সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সমাপ্ত।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

চিঠি

আমায় কেন লিখছ না কো চিঠি ?
বল তো আমি থাকি কেমন করে ?
বুকের ব্যথা—বুঝ্‌তে যদি সেটি,
এমন করে রইতে না তো সরে'।
যেদিকে চাই, কেবল ফাঁকা লাগে,
কাজের মাঝে পাইনে আমি দিশা,
এক নিমিষের কাজ ছিল যা' আগে,
আজ তাহাতে কাট্‌ছে দিবা নিশা।
দুটি আখর লেখ ওগো লেখ,
আজ্‌কে আমি কি হয়েছি দেখ !

বায়ু বয়ে আস্‌ছে হু হু হু হু,
হাহা করে উঠ্‌ছে আমার প্রাণ,
দিক্ বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে কুহু,
আমার বুকে বাজে না তার তান।
সারাটি দিন কাটে কিসের টানে,
কি যে ভাবি, নিজেই নাহি বুঝি,
এখন যাহার জলের মত মানে,
একটু বাদে অর্থ তারি খুঁজি !

কত কি যে ভাব্‌না এসে পড়ে,
অমঙ্গলের দেখ্‌ছি ছায়া কত,
কান্না আমার উঠ্‌ছে কেঁপে ডরে,
ঝড়ের আগে স্তব্ধ পাখীর মত।

অসুখ কিছু হয়েই যদি থাকে ?—
সে ব্যথা মোর কেমন ক'রে স'বে ?
না—না, আমি ভাব্‌তে নারি তা যে,
তোমার খবর—কে আজ মোরে ক'বে ?

সাতটি দিন যে আছি চিঠির আশায়,
সাতটি যুগ সে হচ্ছে আমার মনে ;
সইছি যা' তার ভাষা নেইকো ভাষায়.
অভিমানই জাগ্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে।
তুমিও আজ গেলে আমায় ভুলে' ?
এমনতর কেমন করে হ'লো ?
হৃদয় আমার উঠ্‌ছে ফুলে দুলে,
কেমন করে' রইলে তুমি বলো ?

পত্র তোমার পত্র শুধু নয়,
শরীর দিয়ে—হৃদয় দিয়ে গড়া,
আমার সাথে কতই কি যে কয়,
মূর্ত্তি হয়ে দেয় সে যেন ধরা।
দেখ্‌লে তারে তোমায় পড়ে মনে,
চুম্বনে তার—চুমি তোমার মুখে ;
বক্ষে তারে চাপি' পরাণপণে,
মনে ভাবি পেলাম তোমার বুকে !

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

বন্ধু-সমাগমে

আছিল গো অভিশপ্তা সারা ধরা, যেন ভিখারিণী !
বিদ্যুৎ-ত্রিশূল হস্তে অকস্মাৎ বর্ষা ভৈরবিণী
উচ্চারিল মহামন্ত্র ! ধরা হোলো কুসুমকুন্তলা ;
পরিল ময়ূরকণ্ঠী, ফুলহার, ফুলের মেখলা।

হে বন্ধু, আমিও ছিনু অভিশপ্ত ! আজি কি উতলা
দরশহরষে তব ! সারা দেহে চমকে চপলা !
আতঙ্কে আপনা পানে চাহি, চাহি, ছিনু আঁখি বুজে,
নেত্র মেলি এ কি হেরি ? হাসে বিশ্ব সবুজে সবুজে !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

শ্রুতি-স্মৃতি

দ্বিতীয় খণ্ড

ভ্রমণ।

রাজধানীর জ্যোতির্ব্বিদের নির্দ্ধারিত লগ্ন সমাগত হইল। সেই শুভলগ্নে আমি শালগ্রামশিলা শুক্লধান্ত পুষ্প-মালা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া এবং গৃহদেবতাকে প্রণাম করতঃ মাতৃপদবন্দনা করিয়া যাত্রা করিলাম। রাজধানীর জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে সুবিধামত লগ্ন স্থির করিয়া লওয়া কঠিন ছিল না। পুরাকালে ভারতবর্ষে যখন একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনের জন্ম রেলগাড়ী বা বাষ্পীয়পোত ছিল না, তখনকার দিনে সিদ্ধি-অমৃত তিথ্যমৃত প্রভৃতি যোগ এবং মাহেন্দ্র প্রভৃতি লগ্নের জন্য লোককে অপেক্ষা করিতে হইত কিনা জানি না, কিন্তু যে দিনে পরের যান বাহনে ভাড়া দিয়া পরের অভিপ্রেত সময়ে যাত্রা করা ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না, তখন হইতে দেখিয়া আসিতেছি, আমাদের জ্যোতিষী পণ্ডিত মহাশয়েরা ঠিক গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বেই লগ্ন স্থির করিয়া দেন—প্রাচীন রীতি অনুসারে গর্গের মতে 'গৃহান্তরে', ভৃগুর আজ্ঞায় 'সীমান্তরে', বশিষ্ঠের আদেশে 'নগরপ্রান্তে' গিয়া আশ্রয় লইবার প্রয়োজন হয় না; যিনি যে দিনের ঠিক যে সময়ে যে গাড়ীতেই যাত্রা করিতে চাহেন, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলি ভদ্রসন্তানের সুবিধার জন্য নিতান্ত ভাল-মানুষের মত তাহাদের সংস্থান তৎক্ষণাৎ বদলাইয়া যথাস্থানে দাঁড়াইয়া যাত্রাকারীর উপর সস্মিত শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকেন; এবং দেখা যায় যে, যাত্রার শুভলগ্ন এবং রেল ছাড়িবার নির্দ্ধারিত ঘণ্টা মিনিট আশ্চর্য্যভাবে মিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের ষ্টেশন হইতে সেদিনে ডাকগাড়ী রাত্রি ৪টার সময়ে ছাড়িত, জ্যোতির্ব্বিদ মহাশয়কে শুভলগ্ন দেখিয়া দিবার কথা জানানে, তিনি কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দিকে যাত্রার দিন দেখিতে হইবে?" আমি বলিলাম, "দক্ষিণ।" ইহার অধিক আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। তিনি কাগজ কলম জন্মপত্রিকা প্রভৃতি লইয়া বহু অঙ্কপাত করিলেন, বহু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের ফল একত্র করিয়া তাহার মধ্য হইতে বহু কল্পিত অঙ্ক বাদ দিয়া, বহু অঙ্ক যোগ করিয়া, তাঁহার চিন্তারেখাঙ্কিত ললাট উর্দ্ধে তুলিয়া, কুঞ্চিত ভ্রূমধ্যস্থলে তাঁহার দৃষ্টি বহুক্ষণ আবদ্ধ রাখিয়া, কয়েকবার আকাশের দিকে নয়ন উৎক্ষিপ্ত করিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন, "আপনার সুবিধা হইবে কি না জানিনা, লগ্ন ত শেষ-রাত্রেই ভাল দেখিতেছি।" তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে প্রভাতের কিছুপূর্ব্বে ডাকগাড়ী ছাড়িয়া যায়; পশ্চিমে কোথাও যাইতে হইলে কলিকাতা বা নৈহাটী হইয়া যাওয়াই আমাদের পক্ষে সুবিধা এবং দূরে যাইতে হইলে দ্রুত-সঞ্চরমান মেল ট্রেণই আমি পছন্দ করিব—এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াই লগ্নটি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু ভাবটা এমনিই দেখাইলেন যেন শুভ-লগ্ন কাহারও আজ্ঞায় বা অনুরোধ উপরোধে সুবিধা-জনক সময়ে স্থির করা যায় না, জ্যোতির্ব্বিদ ব্যক্তি-বিশেষের অধীন হইলেও, অন্তরীক্ষচারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কাহারও বেতনভোগী নহে;—যদি নির্দ্ধারিত মুহূর্ত্ত আপনার মনোনীত না হইয়া থাকে, তাহার জন্য আমি দায়ী নহি, সুবিপুল শূন্যবিহারী বৃহৎকায় রবি সোম মঙ্গলাদিকে সুবিধামত স্থানে সরাইয়া লইয়া যাওয়া জ্যোতির্ব্বিদের অসাধ্য; আমি কি করিব, অগত্যাই এই অসুবিধার সময়কেই জ্যোতিষের হিসাবে শুভ সময় বলিতে হইতেছে।—জানি না, পরলোকগত জ্যোতিষীর প্রতি অবিচার করিতেছি কি না। হয়ত বা তিনি তাঁহার অধীত জ্যোতিষের নিয়মানুসারে যথাজ্ঞানতঃ যাত্রার সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন, সুবিধাজনক সময়ের

সহিত উহা মিলিয়া যাওয়ায় দুষ্টমতি আমি তাঁহার প্রতি এই বিদ্রূপের কটাক্ষপাত করিতেছি। যদি তাহাই হয়, তবে সেই পরলোকপ্রবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উদ্দেশে আমি যোড়করে ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। কিন্তু কেবল এই একবার নহে; ইহার পরে আরও অনেকবার তাঁহাকে দিন দেখিতে বলিয়াছি, এবং তাঁহার শুভদিন নির্ণয় করিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতার গুণে দেখিয়াছি, প্রতিবারেই শুভমুহূর্ত এবং ডাক এক্‌স্‌প্রেস ও প্যাসেঞ্জার গাড়ীগুলি ছাড়িবার সময় আশ্চর্য্যভাবে মিলিয়া গিয়াছে। ইহা কি গুণে হইত জানিনা। জ্যোতির্ব্বিদের কৌশল, জ্যোতিষ্কের করুণা বা আমার কপাল—কিম্বা ইহার মধ্যে কোনও দুইটি বা তিনটির সমষ্টিফল—কে জানে?

নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিলাম। ষ্টেশনে গিয়া নির্দ্ধারিত গাড়ীখানির মধ্যে আমার বিছানা বিছাইয়া লইলাম। রাত্রি অধিক ছিল না, কিছুদূর গিয়াই 'সাঁড়াঘাটে' ষ্টীমারে চড়িতে হইবে, শয়ন করিয়া নিদ্রার চেষ্টা বৃথা, সুতরাং প্রভাতের অরুণলেখার প্রতীক্ষায় গাড়ীতে বসিয়া পূর্ব্বদিকে আমার হীনজ্যোতি নির্নিমেষ নেত্রের আগ্রহাকুল দৃষ্টিকে একান্তভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। বঙ্গদেশ চিরশ্যামল, বিশেষতঃ আমাদের উত্তরবঙ্গের রাজসাহী এবং পাবনা জেলার তৃণ-পত্র-ফল-শস্য-সমন্বিত পল্লীভবনগুলির মনোহর শ্যামশোভা নয়ন-মনের উপরে যে অপূর্ব্ব অমৃত প্রলেপের কাজ করে, তাহা যাঁহারা রাজসাহী পাবনায় একবারও গিয়াছেন,তাঁহারাই জানেন। বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে একজাতীয় বৃক্ষবিশেষের প্রাচুর্য্যে দর্শকের নয়ন-মনকে কিছুকাল পরে ক্লান্ত করিয়া তোলে, কোথাও স্বল্পচ্ছায় তালীবনশ্রেণী,কোথাও বিরলানাতপ খর্জ্জুরকুঞ্জ দিক্‌চক্রবাল পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকিয়া দর্শকের ক্লিষ্ট নয়নকে পীড়া দেয়, কিন্তু রাজসাহী পাবনা প্রভৃতি পদ্মাবিধৌত নদীমাতৃক প্রদেশের পল্লীনিকেতনে তৃণশস্যশষ্পাস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের এবং বিচিত্র ফলভারনম্র অনাতপ ছায়াতরু ও কুসুমসম্ভারসমলঙ্কৃতা বনবল্লরীর অপূর্ব্ব শ্রীসম্পদ যে না দেখিয়াছে, তাহাকে উজ্জয়িনীর রাজকবির ছন্দোময়ী ভাষায় "লোচনৈর্ব্বঞ্চিতোঽসি" বলিলে অধিক বলা হইল বলিয়া আমি মনে করি না।

যে সময়ে আমি জলপ্রাকার পরিবেষ্টিত রাজধানীর কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলাম, উহা শীতের অন্তিম অন্তর্দ্ধানীর অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত। কুসুমাকর বসন্তের অভ্যাগমনের অগ্রদূত পলাশপুষ্পের সমাগমে বনভূমি সেদিনে প্রথম প্রেমসমাকুলা তরুণীর সরমারুণ গণ্ডের ন্যায় রক্তরাগরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সে দিনে নব বসন্তের নবোদ্ভিন্ন পীতাভ-হরিৎ পত্ররাজির মধ্য হইতে নবাগত কিংশুকের আরক্তিম আভা সুন্দরী প্রিয়ার ক্ষৌমবসনান্তরালস্থিত স্তনান্তরবিলম্বী রক্তমাণিক্যের কণ্ঠহার-দ্যুতি দর্শকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে বারম্বার আনিয়া ধরিতেছিল। প্রভাতপবনে রেলবর্ত্মের উভয় পার্শ্বস্থিত বনভূমি হইতে পত্র-পল্লবের মর্ম্মরধ্বনি যেন প্রিয়সমাগম-প্রতীক্ষায় বিফলমনোরথা বিরহিণী বনলক্ষ্মীর মর্ম্মান্তিক দীর্ঘশ্বাসের মত কাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল—যেন কত কালের কত গভীর গোপন ব্যথা নীরবে বহন করিয়া ধৈর্য্যময়ী বনশ্রী যোগাসনে বসিয়াছিল, আজ এই নববসন্তের প্রথম স্পর্শে তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, রজনীর শেষ-যামের নিভৃত মুহূর্ত্তে অন্তরতলের নির্ম্মম বেদনা সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে কাহার নিকট নিবেদন করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—কে জানে?

যে সকল ষ্টেশনে থামিতে থামিতে বাষ্পীয় শকট অগ্রসর হইতেছিল, সে সকল স্থান জীবনে আরও দুই একবার দেখিয়াছি। দেখিবার মত বিশেষ কিছু সে সকল স্থানে ছিল না। তথাপি কারামুক্তির বিমল আনন্দে আজ আমার মন। বক্ষপঞ্জরের মধ্যে নৃত্য করিতেছে। যাহা-কিছু চক্ষুর সম্মুখে পড়িতেছিল, সবই যেন কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমি নিতান্ত বালকের মত সমস্তই যেন আমার বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্র দিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিতেছিলাম। সপ্তাশ্ববাহিত স্যন্দনে সূর্য্যদেব যখন

রক্তরাগমণ্ডিত হইয়া প্রাচীমূলে দেখা দিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমাদের গাড়ীখানি শীতের শেষের নিস্তরঙ্গ পদ্মাতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। ষ্টীমারে পদ্মা পার হইয়া অপরপারে পুনরায় গাড়ীতে চড়িতে হইবে—কুলী মজুর টিকিট্‌কলেক্টর মালবাবু ষ্টেশন মাষ্টার জাহাজের কাপ্তান খালাসী সারেঙ্গ বালবৃদ্ধ বনিতা শিশু সবল সক্ষম অক্ষম—সকল প্রকারের যাত্রীর ভিড়ে নদীতীরস্থ চালাঘরের ষ্টেশনখানি লোকে লোকারণ্য। আমি আমার বাক্স পেট্রা প্রভৃতি লইয়া কুলীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিলাম এবং সঙ্গীয় ভৃত্য কয়জনকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে বলিয়া, আমার নির্দ্দিষ্ট পথে আমি ষ্টীমারে গিয়া চড়িলাম। পঠদ্দশায় রাজসাহী হইতে বাড়ী গমনাগমনে ষ্টীমারে বহুবার চড়িয়াছি, আসাম ভ্রমণ সময়েও ষ্টীমারে অনেক সময় কাটাইতে হইয়াছে, কিন্তু আজকার এই ষ্টীমার-যাত্রার সময়ে খালাসীর জল মাপিবার সঙ্কেত শব্দ "তিন বাঁম মেলে এ-এনা," "সাড়ে চার বাঁ য়াঁ য়াঁ ম্" আমার কাণে যেমন মিষ্ট লাগিয়াছিল, বসন্তবাহার পিলু বারোঁয়া যোগিয়া রামকেলী পূরবী বা ললিত—ইহার কোনটাই তেমন সুললিত হইয়া আমার কাণে কোন দিনও বোধ করি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে নাই। কারামুক্তির বিমল আনন্দে মন আমার আজ হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে, সে বিশ্ব সংসারের সমস্তের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া, বিশ্বের সমস্তই আজ উপভোগ করিবার জন্ম উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে আজ বাধা দেয় এমন সাধ্য কার?

ষ্টীমার পরপারে গেল। আবার সেই জনতারণ্য ভেদ করিয়া আমার তৈজসপত্র কুলীর মাথায় চাপাইয়া, আমার নির্দ্দিষ্ট গাড়ীখানির উদ্দেশে রওনা হইলাম। সেখানিকে আমার কষ্ট করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হইল না; রেল আপিসের জনৈক কর্ম্মচারী সেই গাড়ীখানির দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমাকে সযত্নে গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দিয়া, আমার দ্রব্যসামগ্রী তুলিবার সাহায্যও যথেষ্ট পরিমাণে করিলেন, এবং সর্ব্বশেষে আমার আর কোনও প্রয়োজন আছে কি না জানিবার জন্ম বারম্বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমার আর কোনও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এই বারম্বার সস্নেহ প্রশ্নে, তাঁহার প্রয়োজন যে কি, তাহা আমি বুঝিলাম; এবং তাঁহার সে প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া দিবামাত্র তিনি কোন্ পথে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন তাহা আমি জানিতেও পারিলাম না। কিছুকাল পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বৈদ্যনাথে 'মানত' পূজা দিতে যাইবার সময়ে এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কলিকাতা হইয়া হাওড়া ষ্টেশনে পশ্চিমের গাড়ী ধরিয়াছিলাম।—এবার সেই জন্ম নৈহাটী পর্য্যন্ত টিকিট করিয়াছিলাম, মনে মনে ইচ্ছা ছিল ঐ পথে হুগলীর প্রসিদ্ধ রেল সেতুটি দেখিয়া যাইব। যথাকালে নৈহাটী ষ্টেশনে গাড়ী পহুঁছিল। আমি ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া ক্ষুদ্র সহরটির একটী দোকান ঘরে সে বেলার মত অবস্থান এবং আহারাদির আয়োজন করিয়া লইলাম। এবারেও আমার সঙ্গে আমার চির-সঙ্গী ভৃত্য নবীনচন্দ্র ছিল এবং পুরাণ প্রথিত "বল্লভের" স্থলাভিষিক্ত ভীমকায় ঈশান দাদাও আমার সঙ্গে ছিল। সুতরাং আহারাদির উদ্যোগ অনুষ্ঠান এবং রন্ধন আমাকে করিতে হয় নাই। আমি দোকান ঘরে রেল-পথের পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল পরে সুস্থকায় সবল মানুষের মত গঙ্গাস্নানে বাহির হইলাম। বলা বাহুল্য, আমার অসুস্থ শরীরে তাদৃশ আচরণ নবীনচন্দ্র নীরবে সহ্য করে নাই। কিন্তু তাহাকে বুঝাইলাম যে রোগীর ন্যায় আচরণ ত্যাগ করিলে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ত্বরায় ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং সেও আর তেমন জোরে বাধা দিতে পারিল না। বস্তুতও দেখিলাম, দীর্ঘকাল ঔষধ সেবন করিয়া এবং পথ্যাশী হইয়া আমি আরোগ্যের পথে যেটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলাম, পরিখা পরিবেষ্টিত রাজগৃহের কারা-প্রাচীরের বাহিরে সুস্থের ন্যায় আচরণে অতি অল্পকালে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ফল পাইলাম। বেলা দশটার সময় নৈহাটী পঁহুছিয়াছিলাম, সমস্ত দিন এই স্থানে কাটাইলাম, অপরাহ্নে গাড়ীভাড়া করিয়া একবার

রেলসেতু দেখিতে গেলাম। সে দিনে পয়সা দিয়া সেতুর উপরে গমনাগমন করা যাইত। আমি নির্দ্দিষ্ট ফিসের পয়সা রেলকর্ম্মচারীর 'কেবিনে' জমা দিয়া, সেতুর প্রায় মাঝামাঝি পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গেলাম। গঙ্গাবক্ষে এই লৌহ-সেতুর উপরে দাঁড়াইয়া সূর্য্যাস্তের পরমরমণীয় শোভা দেখিয়া মন আমার আনন্দে ভরিয়া উঠিল। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর শীকরসম্পৃক্ত বায়ু আমার সুদীর্ঘ রোগক্লিষ্ট সর্ব্বাঙ্গে যেন স্নেহহস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিল। সে দিনের সে স্মৃতি আজও আমার মনে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবার সময়ে আমরা দোকান-গৃহে ফিরিলাম। রাত্রির গাড়ীতে পশ্চিমে রওনা হইব স্থির ছিল, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই ঈশান পক্ক লুচি তরকারী এবং মিষ্টান্নে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন সমাপন করিয়া মন্থর গতিতে রেলষ্টেশনে যাত্রা করিলাম। জিনিষ-পত্র ষ্টেশনের কুলী আসিয়া ইতিপূর্ব্বেই লইয়া গিয়াছিল। বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার সময়ে অদূরে কোথাও স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইব এই কথা ছিল, কোথায় যাইব নিশ্চিতরূপে সে কথা কাহাকে বলি নাই এবং নিজের মনেও স্থির করিয়া রাখি নাই—সকল কার্য্যের মধ্যে সমস্ত দিন ধরিয়া মনের মধ্যে সে কথাটা বারবার তোলাপাড়া করিয়াছি, কিন্তু নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই; ষ্টেশনে আসিয়া একখানি Time table কিনিলাম, Time tableএর সবশেষে যে সকল স্থানের লোভনীয় বর্ণনা লিখিত ছিল তাহাই একমনে পাঠ করিতে লাগিলাম এবং Platformএর ভিত্তি গাত্রে যে সকল বিজ্ঞাপনের বিচিত্র ছবি আঁটা দিয়া লাগানো ছিল তাহাই দেখিতে লাগিলাম। একস্থানে যে প্রকাণ্ড একখণ্ড কাগজে নানা স্থানের নাম, গাড়ীর সময় এবং মাশুলের পরিমাণ লেখা থাকে, তাহাই দেখিতে উঠিয়া গেলাম। গিয়া তাহার পার্শ্বেই দেখিলাম, ভারতের চরমতীর্থ পরমদেবতা বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার আনন্দ নিকেতন বারাণসীর রঙ্গীন চিত্র একখানি ভিত্তি-গাত্রে টাঙ্গানো রহিয়াছে। দেখিলাম, অসংখ্য সোপান বাহিয়া অগণিত নরনারী স্নানার্থ ভাগীরথীর পুণ্যনীরে অবতরণ করিতেছে। তাহার পশ্চাতে দূরে সংখ্যাতীত মন্দির, মস্‌জিদ্, মিনার প্রভৃতির অভ্রভেদিশীর্ষ অনন্ত-দেবের চরণোদ্দেশে আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বারাণসীর চিত্র অঙ্কিত দেখি নাই, ছবিখানি দেখিয়াই স্থির করিলাম, এ দেহমনের আর্ত্তি লইয়া বিশ্বেশ্বরের চরণতলেই আশ্রয় লইব। সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বজনবিদিত শ্লোকার্দ্ধ আমার মনে পড়িল—"যেষামন্যাগতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ"—কেবল মনে পড়িল তাহাই নহে, আমার অজ্ঞাতসারে এই শ্লোকার্দ্ধ আমি বড় করিয়া আবৃত্তি করিলাম এবং এই অচিন্তিতপূর্ব্ব অনিচ্ছাকৃত আবৃত্তিকে শুভ সূচনা ভাবিয়া সকল দ্বিধা চিন্তা ভাবনা মন হইতে অপসারিত করিয়া, কাশীর টিকিট কিনিবার জন্য নবীনচন্দ্রের নিকট হইতে টাকা চাহিলাম। কোথায় যাওয়া হইবে তাহা পূর্ব্বে স্থির ছিল না; সুতরাং সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার টিকিট লওয়া হইবে? বেশী দূরে গিয়া কাজ নাই, এমন কোন স্থানে যাওয়া হউক যেখানে ডাক্তার এবং ঔষধ পাওয়া যায়; বৈদ্যনাথে পেটের ব্যথায় সেবারে যে কষ্ট গিয়াছে তেমন যেন আর না হয়, সে কথা কিন্তু আগেই মনে করাইয়া দিতেছি।" আমি কহিলাম, "নবীন, কোথায় যাওয়া তোর ইচ্ছা?" সে বলিল, "আমার আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি? যেখানে গেলে শরীর ভাল হয় সেই খানেই যাওয়া উচিত, তবে এইটুকু দেখিতে হইবে যে ঔষধপত্র ডাক্তার কবিরাজের অভাবে কষ্ট-ভোগ করিতে না হয়—শরীর ত আপনার ভাল নয়, আর এই দীর্ঘকাল নানাকষ্ট শরীরের উপর দিয়া গিয়াছে।" আমি কহিলাম, "কাশী যাইব স্থির করিয়াছি।" সে উৎসাহিত হইয়া উত্তর করিল, "সে ভাল কথা; কাশী তীর্থ বটে, সহরও শুনিয়াছি বড়, এবং আমাদের দেশের বহুলোক কাশীতে থাকে আমি জানি। সেই ভাল, কাশীর টিকিটই কিনুন।"

প্রভুভৃত্যের পরামর্শ স্থির হইয়া গেলে, আমি গিয়া কাশীর টিকিট লইলাম এবং যথাকালে বর্দ্ধমানে কাশীর গাড়ী ধরাইয়া দিবার জন্য নৈহাটী হইতে যে গাড়ী ছাড়ে,

সেই গাড়ীতে গিয়া চড়িয়া বসিলাম। বর্দ্ধমানে অধিক রাত্রিতে গাড়ী পৌছিবে এবং ডাক গাড়ীতে জনতা অধিক হয়, সুবিধা মত গাড়ী খুঁজিয়া লইতে হইবে, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শয়ন করিবার ব্যবস্থা আর করিলাম না। গাড়ীর বাতায়নের নিকটে বসিয়া অবসন্ন বসন্তের আগমন প্রতীক্ষায় মৌন মেদিনীর অন্তরের উল্লাস আকাশ বাতাস এবং বনফুলের লঘুবাসের মধ্য দিয়া আমি অন্তের অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলাম।

রাত্রিতে যথাকালে গাড়ী বর্দ্ধমানে আসিল। সে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া কাশীর গাড়ী পাইতে কিছু বিলম্ব ছিল, আমি ওয়েটিং রুমে আশ্রয় লইলাম। ভৃত্যবর্গকে জিনিষপত্র প্ল্যাটফর্ম্মে রাখিবার আদেশ দিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পশ্চিমের ডাকগাড়ী আসিল। ষ্টেশনে মহা হৈ রৈ পড়িয়া গেল। আমি জন-শূন্য গাড়ীর কামরা খুঁজিয়া পাই কি না সেজন্য কিছু চিন্তিতই ছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে Oudh & Rohilkhand এর গাড়িখানি একেবারে জনহীন অবস্থায় হাওড়া হইতে আসিয়াছে, কেরোসিনের দীপ্ত দীপালোকে দুইখানি গদি আঁটা বেঞ্চ এবং দুইখানি আরাম কেদারার মত কিম্ভূতকিমাকার আসন তাহাদের বাহুবিস্তার করিয়া হৃদয়াসন পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছে দেখিলাম। এই বর্ষীয়সী শয্যা সদ্যোগৃহ-কারামুক্ত বিংশবর্ষবয়স্ক "অক্রুবানকে" হৃদয়ে স্থান দিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল কি না জানি না, সে কথা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই স্বামীহীনার এই স্বামিত্বে নিজকে বরণ করিয়া ফেলি-লাম। তাহার প্রসারিত আলিঙ্গনপাশে ধরা দিয়া সে রাত্রি আমার পরমসুখে কাটিয়াছিল একথা বলা বাহুল্য; তবে রোহিলখণ্ডের এই বর্ষীয়সী বাসকসজ্জা রমণী বঙ্গীয় যুবকের সঙ্গলাভে সুখী হইয়াছিল কি না সে কথা সেই বলিতে পারে। আজ বাষ্পীয় শকট যেরূপ দ্রুত চলিয়া কলিকাতা হইতে ১২।১৩ ঘণ্টার মধ্যে কাশী গিয়া হাঁপ ছাড়ে, আমি যে দিনের কথা বলিতেছি সেদিনে উহার গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর ছিল এবং পথের মধ্যে অনেকস্থানে দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিয়া জল কয়লা বদলাইয়া আরোহী যাত্রীদিগকে স্থানে স্থানে নামাইয়া নূতন যাত্রী তুলিয়া তবে মোগলসরাই-এ গিয়া দাঁড়াইত, এবং সেখানে গাড়ী বদল করিয়া পুনরায় কাশী অভিমুখে রওনা হইতে কিছু বিলম্ব হইত। আমি যে গাড়ীতে যাইতেছিলাম উহা একটানা দিল্লী অভিমুখে যাইবে। সে গাড়ী মোগলসরাইয়ে যখন গিয়া পহুঁছিল, তখন বিহঙ্গকাকলি যদিও আসন্ন প্রভাতের আগমনী সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে, তথাপি আকাশের অন্ধকার একেবারে বিদূরিত হয় নাই। দিল্লীর ট্রেণ চলিয়া গেল, Oudh and Rohilkhand-এর যে গাড়ীখানিতে আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম সেখানিকে খালাসীগণ মহা কলরবে ঠেলিয়া ঠেলিয়া, যেখান হইতে কাশীর গাড়ী ছাড়িবে সেই প্ল্যাটফর্ম্মে লইয়া গিয়া কাশীর টেণের সঙ্গে জুড়িয়া দিল। আজ বোম্বাই মান্দ্রাজ পাঞ্জাব এবং নাগপুর লাইনে অনেক বড় বড় ষ্টেশন হইয়াছে, কিন্তু সে দিনে মোগলসরাই ষ্টেশন খুব বড় ষ্টেশনের মধ্যে পরিগণিত ছিল। আমি প্রভাতবায়ুর সুখস্পর্শে জাগরিত হইয়া ষ্টেশনের বিরাট প্ল্যাটফর্ম্মের উপরে পাদচারণ করিতে লাগিলাম। সেই ট্রেণে কাশীযাত্রী নরনারীর সংখ্যাও কম ছিল না। দূর দাক্ষিণাত্যের দৃঢ়কায় "দক্ষিণী", পঞ্চনদীর দশ-তীরবাসী শিখাশ্মশ্রুধারী "পঞ্জাবী", মরু মেবারের "মাড়োয়ারী" প্রভৃতি নানা দেশবিদেশের কাশীযাত্রীর দল গাড়ীর প্রতীক্ষায় সেই প্ল্যাটফর্ম্মে বসিয়া তাহাদের নিজ নিজ দেশভাষায় নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। অরুণালোক-পুলকিত বিহঙ্গকূজনের সহিত নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত অসংখ্য নরনারীর কণ্ঠকূজন সম্মিলিত হইয়া সে দিনের প্রভাতের আকাশকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। রাজধানীর চতুঃসীমার মধ্যে বহুদিন ধরিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছি, কেবল কারাবাসের ক্লেশ নহে, ব্যাধি পীড়ার নির্ম্মম অক্রমণও এ দেহের উপরে কম হয় নাই; ব্যাধিগ্রস্ত দেহে নিঃসঙ্গ একেশ্বর জীবনের বিষম দৌরাত্ম্য যে বহুদিন

ধরিয়া সহ্য না করিয়াছে, সে আমার সে দিনের দুরবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। দুশ্চিকিৎস্য পীড়ার নিদারুণ যাতনা, রোগশয্যায় একাকী পড়িয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভোগ করিয়াছি এবং বারম্বার মনে হইয়াছে যে, দীনতম দীনের সহিত যদি আমার অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া লইবার সুযোগ বিধাতা আমায় দিতেন, তবে আমার ভবিষ্যৎ রাজপদে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এ "জরাসন্ধের কারাগৃহ" হইতে বাহির হইয়া যাইতে আমি এক তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিতাম না। বিদ্যালয় হইতে সমাবর্ত্তনের পর বাড়ী ফিরিয়া যে কর্ম্মহীন অলস আয়ুযাপনের মধ্যে আমার দিন কাটিতে আরম্ভ করিল, জীবনারম্ভের সূত্রপাতের দিনে তাহা কাহারই প্রীতিপদ হইতে পারে না; সেই আলস্যের মধ্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য দেশ-ভ্রমণের প্রস্তাব যতবার করিয়াছি, রাজধানীর "হিতৈষী" (?) বর্গের নানা কল কৌশল ও ছলে আমার সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। আমার অভিভাবক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা নানা অমূলক আশঙ্কায় ভীত হইয়া আমাকে রাজধানীর চতুঃসীমার বাহিরে যাইতে দেন নাই। নিতান্ত রোগকাতর দেহে যখন চিকিৎসার্থ বা বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কোথাও যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সময়েই মাত্র বাহির হইবার আদেশ পাইয়াছি। নতুবা সুখ দুঃখ ভোগাভোগ যাহাই কেন হউক না, কর্ম্মহীন অলস বিন্ধ্যাচলের ন্যায় গুরুভার মন্থরগামী দিন ও বিনিদ্র বিভাবরীগুলি জগবন্ধুর রথচক্রের মত আমার পঞ্জরাস্থিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া বুকের উপর দিয়া অতিবাহিত হইত; এবং সে দুর্ব্বার বেদনা অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত স্তব্ধ মৌনতার মধ্যে প্রাণপাত চেষ্টায় আমি সহ্য করিতাম। বসন্তের আগুনভরা ফাগুনের দিনে বর্ণে গন্ধে গীতে, দক্ষিণের মন্দবাত সঞ্চরণে ও কলিকার কর্ণকুহরে লুব্ধ মধুপের মৃদুগুঞ্জরণে, মেঘনির্ম্মুক্ত নীলাকাশের সুবর্ণ আলোক-সম্পাতে ও কুঞ্জকাননে পুলকাকুল বৃক্ষবল্লরীর পর্য্যাপ্ত মঞ্জরীসম্ভারে প্রকৃতিলক্ষ্মীর অন্তরোল্লাসের শুভবারতা যেমনি স্থল জল অন্তরীক্ষ সর্ব্বত্র হইতেই পাওয়া যায়; তেমনি যৌবনারম্ভের বসন্ত বাসরে হৃদিনিকুঞ্জের পুষ্প-বিতানে আশামঞ্জরীর কত অজস্র বিকাশই যে হয় তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়! সে দিনে চক্ষুর সম্মুখে কত অজস্র আলোকই যে স্পন্দিত হইতে থাকে, শ্রবণবিবরে কত 'ললিত' 'বিভাস' ও 'আশাবরী'ই যে মীড় মূর্চ্ছনায় বাজিয়া বাজিয়া ওঠে, কল্পনার দক্ষিণ পবন কত স্বর্ণচম্পক ও নাগকেশর, কত মল্লিমালতী ও বকুল মাধবীর সুবাস বাহিয়া আমাদের মনের সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত করিয়া তুলে, তাহা বলিবার কি ভাষা আছে? অন্তর মনের সেই পুষ্পসমাগম দিনে সার্থক আশা ও আকাঙ্ক্ষার আনন্দময় দিন-যাপন ত দূরের কথা, যাহাকে দিনযামিনীর সবগুলি দণ্ডপলমুহূর্ত্ত রোগাতুর দেহে একেশ্বর জীবনের নিঃসঙ্গতার নির্ম্মম দৌরাত্ম্যের মধ্যে কোনমতে আয়ু-যাপন করিতে হইয়াছে, সে আজ কারা-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া বিশ্বপ্রকৃতির অতুলন ও অফুরান সৌন্দর্যসম্ভারের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তিদান করিয়াছে, রাজনিবাসের হৈমকুলায়িকার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সে তার চিরাভিলষিত চংক্রমণের সুযোগ আজ পাইয়াছে,—আজ তাহার যে আনন্দ তাহা ভাষার সামগ্রী নহে, আভাসে বুঝিবার বস্তু—মনের সেই পরিপূর্ণ আনন্দে সে আজ দুই চক্ষে যাহা দেখিতেছে, তাহাই তাহার নিকট অভিনব। রেলপথযাত্রীর অতি তুচ্ছতম দিনকৃত্যও সে অভিনিবেশ সহকারে দেখিতেছে; এবং সেই দেখার মধ্যে আজ সে যে আনন্দ পাইতেছে, তাহার বিংশতিবর্ষ পরমায়ুর মধ্যে তেমন আনন্দ সে আর কখনও পায় নাই।

দেখিতে দেখিতে পরিপূর্ণ প্রভাতের নির্ম্মল আলোক চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেই সুন্দর আলোকে সদ্য-শিশিরস্নাতা সিক্তবসনা প্রকৃতির পরিপূর্ণ রূপমাধুরী আমার নয়নে কি সুন্দর যে বোধ হইল, তাহা আর কি বলিব। আমি বাষ্পীয়-শকটের বাতায়নে একান্তে বসিয়া প্রকৃতিরাণীর সেই অনবদ্য রূপরাশি আমার

হৃদয়মন দিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

যথাসময়ে কাশীর ট্রেণ ছাড়িল। মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি হইতে বহু নরনারীর সমবেত কণ্ঠে "জয় কাশী বিশ্বনাথকি জয়," "জয় মাই অন্নপূর্ণা রাণী কি জয়" শব্দে আমি যেন সুপ্তোত্থিতের মত চমকিয়া উঠিলাম। আগে কখনও এদিকে আসি নাই, সুতরাং ঐকান্তিক ভক্তিবেগে কাশীযাত্রীর কণ্ঠোচ্চারিত বিশ্বেশ্বরের এই জয়গীতি শুনিবার, পূর্ব্বে আমার কখনই অবসর হয় নাই—এই প্রথম। চীৎকার ত অনেক শুনিয়াছি, ভক্তির ভাণ অনেক দেখিয়াছি, নগরকীর্ত্তনের মধ্যে ভক্তিবেগে ভক্তের দেহে স্বেদ রোমাঞ্চ বেপথু দেখিয়াছি, একান্ত ভক্তির উচ্ছ্বাসে 'দশা' ধরিতেও দেখিয়াছি। কিন্তু এই আবালবৃদ্ধ-বনিতা, সুস্থ অসুস্থ, ভোগী রোগী, গৃহী সন্ন্যাসী, পণ্ডিত মূর্খ সকলকে একত্র সমস্বরে এমন ঐকান্তিক ব্যাকুলতা ও নির্ভরপরায়ণতার সহিত "জয় বিশ্বনাথ কি জয়" রবে মহাব্যোম পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। শত শতাব্দীর এই কাশী, সর্ব্বজন-পরিত্যক্তের একমাত্র আশ্রয় বিশ্বেশ্বরের মহাশ্মশানের আনন্দ-কানন এই বারাণসী, লক্ষ কোটী মানবমানবীর ভক্তি-অশ্রু-ধৌত এই মরণমঙ্গল শিবপুরী ভারতবাসীর হৃদয়ের কোন্ স্থানটি অধিকার করিয়া আজ সহস্র-সহস্র-সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা যেন এই এক "জয় বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাকি জয়" রবে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায় মনে হইল। আমিও উচ্চকণ্ঠে 'জয় বিশ্বনাথ' বলিলাম কি না তাহা আজ আমার মনে নাই, তবে আমার অন্তরের অন্তর যে একান্ত ভক্তিভরে বিশ্বদেবতার জ্যোতির্লিঙ্গের উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণত হইল, তাহা আজও মনে আছে। আজ কাশী ষ্টেশনেই গাড়ী গিয়া দাঁড়ায়, সে দিনে রাজঘাটে ষ্টেশন ছিল। গঙ্গার উপরে রেল যাইবার জন্য পুল নির্ম্মিত হয় নাই, যাত্রীরা পদব্রজে নৌকার পুলের উপর দিয়া গঙ্গা পার হইয়া ত্রিশূলস্থা শিব-পুরীর রজরেণু স্পর্শ করিতে পাইত—কিন্তু সে ছিল ভাল। ভক্তিবিহ্বল হৃদয় লইয়া প্রভাতের অরুণালোকে উদ্ভাসিত, অসিবরুণা-মধ্যস্থ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, অসংখ্য মন্দিরচূড়া-সমন্বিত সদানন্দের আনন্দ-পুরীর সন্দর্শন-লাভ হইত। স্নেহ-গেহ-হীন, রোগক্ষীণ, ব্যথাবেদনাতুর, বিয়োগ-বিচ্ছেদকাতর জনের এই শেষ আশ্রয়, শ্মশান-ভস্ম-ভূষিতাঙ্গ ভোলানাথের মুক্তি-পুরীকে নির্ম্মল প্রভাতে গঙ্গার পরপারে দাঁড়াইয়া যোড়করে প্রণিপাত করিতে পারিত।

এই স্থানেই যাত্রী ধরিবার জন্য পাণ্ডার দল আসিয়া পূর্ব্ব হইতেই মজুত হইয়া থাকে। চিতাভস্ম-ভূষিত-ললাট মল্ল-বেশধারী বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানীর দল একহাতে লাঠি, এবং অন্য হাতে কাহার কে কবে কাশী আসিয়াছে বা কাশী "পাইয়া" গিয়াছে তাহার বিবরণযুক্ত থেরুয়াবান্ধা খাতা; এই খাতার মধ্যে পূর্ব্বপুরুষগণ বংশধর উত্তরপুরুষের উদ্দেশে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বা আদেশ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন খাতার মালিককেই পৌরহিত্যে নিযুক্ত করা হয়। বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ "বটুক পাঁড়ে" এবং তদীয় ভ্রাতার পাণ্ডা বা গুণ্ডার দল মল্লকচ্ছে যষ্টি-হস্তে শিকার সন্ধান করিয়া ষ্টেশনভূমি কম্পিত করিয়া তুলিতেছে; প্রত্যেক যাত্রীর দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে অসংখ্য পাণ্ডা—কেহ যাত্রীকে তাহার খাতা খুলিয়া দেখাইতেছে, অপর প্রতিদ্বন্দ্বীর দল সেই পাণ্ডাকে তাহাদের হস্তস্থিত যষ্টি দেখাইতেছে, সোর গোল হাঁক ডাক গলাবাজিতে ও গালাগালিতে যাত্রীহৃদয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাস কোন্ দূর দুরান্তরে পলাইয়া যায় তাহা বিশ্বের অন্তরাত্মদৃক্ বিশ্বেশ্বরই জানেন।

আমি জানিতাম রাজধানীর পাণ্ডা কে, কিন্তু তাহার নিকট ধরা দেওয়া আমার কোনমতেই অভিপ্রেত ছিলনা। নাটোরের রাজকুলবধূ পুণ্যশ্লোকা প্রাতঃ-স্মরণীয়া ভবানীর কীর্ত্তিকাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। বারাণসীধামে যাঁহাকে দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া সকলে জানে, যে চিরধন্যা রাজেন্দ্রাণী নিত্য শিবমন্দির নিত্য

কূপ এবং নিত্য বসতবাটী প্রস্তুত করাইয়া উৎসর্গ করিয়া নিত্য ব্রাহ্মণকে দান করিয়া গিয়াছেন, চাতুর্ম্মাস্যায় লক্ষ দণ্ডীকে যিনি আহার এবং আবাস যোগাইয়া অক্ষয়পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, পঞ্চক্রোশীর সমগ্র বাপী তড়াগ কূপ বিশ্রামভবন সমস্তই যাঁহার পুণ্যকীর্ত্তির সাক্ষ্য আজও দান করিতেছে, যাঁহার উৎসর্গীকৃত ভূসম্পত্তির উপস্বত্ববলে শাক্ত বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার পূজা ভোগ আরত্রিক ও নীরাজনা আজও নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই পরমপুণ্যবতী নারীকুলপূজ্যা ভবানীর বংশের পিণ্ডাধিকারী বারাণসীতে আসিয়াছে জানিলে কাশীবাসী জনমণ্ডলী তাহার নিকট হইতে ব্যয়সাপেক্ষ পুণ্যানুষ্ঠান প্রত্যাশা করিবে। কিন্তু অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী ভবানীর জীবমানে যে ঐশ্বর্য্য আরব্যোপন্যাসের কাহিনীর মত লোকে শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইত এবং সেই বিপুল ঐশ্বর্য্যের বলে যাহা সে দিনে সম্ভব ছিল, আজ সে সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কাশীতে প্রকাশ্যভাবে যাওয়া এবং তথায় বাস করা আমার ইচ্ছা ছিল না ; এবং সেই জন্য আমি রাজধানীর পাণ্ডার কোন অনুসন্ধান করিলাম না। উপস্থিত পাণ্ডাগণের মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিরীহ বলিয়া মনে হইল, আমি তাহাকেই আমার পৌরহিত্যে বরণ করিবার অভিলাষ জানাইয়া, আমার বাসোপযোগী স্থান ঠিক করিবার জন্য তাহাকে বলিলাম। অপেক্ষাকৃত নিরীহ পাণ্ডা মোহনপ্রসাদের প্রতি আমার সদয় ব্যবহার দেখিয়া প্রসিদ্ধ বটুক পাঁড়ে এবং তাহার ভ্রাতার পক্ষের দলবল একত্র হইয়া আমাকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া ধরিল এবং উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল :—

"অন্নদাতা লাখোঁ বাঙ্গালী কাশীজীমে আতেঁ হেঁ, আউর সবকোই বটুক পাঁড়ে ইয়া উন্‌কে ভাইসাহেবকা যাত্রী হোতেঁহেঁ। আপ হিন্দুস্থানী মহাল্লামে যানে চাহতেঁ হেঁ এ ক্যায়সে হো সক্‌তা, ঔর হাম লোগোঁকো লিয়ে বড়ি সরম কি বাত হোগি আপ হিন্দুস্থানী মাহাল্লামে ঠয়রেঁ তো।"

আমি কহিলাম, "ইয়ে রাজি খুসী কি বাত হ্যা। হামারা খুসী হাম মোহনকা যাত্রী হোঙ্গে, ইস্‌মে তোম ক্যা কর্ সক্‌তে হো ?"

বটুকের দলস্থ "যাত্রাওয়ালা" নামধারী দৈত্যাকৃতি এক গুণ্ডা বিনীতভাবে কহিল, "নাই হুজুর, আপ্‌কো কুছ্ নাহি কর্ সক্‌তেঁহে, মগর মোহনকা সাথ ইস্ মাম্‌লেকা ফয়সলা কোই রোজ হামারা হোগা।"

কাশীর পাণ্ডা গুণ্ডার বহু কীর্ত্তিকাহিনী আমার শুনা ছিল। অর্থশালী লোকবলবিশিষ্ট ও বলশালী গুণ্ডার সহিত নির্ধন বেচারা মোহন কোনপ্রকারেই পারিয়া উঠিবে না, এই ভয়ে মোহনের জন্য কিছু চিন্তিত হইলাম এবং আমি কিঞ্চিৎ ভীতভাবে তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইলে, সে তাহার ঈষদুদ্ভিন্ন গুম্ফের উপরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিচতুষ্টয় ফিরাইয়া গোঁফে 'চাড়া' দিবার ভাব দেখাইল এবং বটুকের দলভুক্ত সেই ভীমকায় বলিষ্ঠ লোকটির প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণদৃষ্টি এমনি ভাবে নিক্ষেপ করিল, যাহার অর্থ—"তোমারা যো জী চাহে তোম্ করো, তুম্ য়্যায়সা দশ্ বিশ্‌কো লিয়ে পরওয়া হাম্ থোড়াই রাখতাহুঁ।" আমার বয়স তখন অনুত্তীর্ণ বিংশতিবর্ষ হইবে, মোহন ২২।২৩ বৎসরের অধিক বয়স্ক নহে ; তাহার গৌরকান্তি, সুঠাম অথচ বলব্যঞ্জক দেহশ্রীর মধ্যে এমন একটি কমনীয়তা ছিল যাহা দেখিলে মোহনকে নিতান্ত হীনবংশসম্ভূত মনে হয় না ; এই পরিপূর্ণ যৌবনশ্রী-সমন্বিত ব্যায়াম-বলদৃপ্ত তরুণ যুবার শান্ত সাহসিকতায় এবং বটুকের দলস্থ লোকের ঔদ্ধত্যে মোহনের প্রতি আমি নিতান্তই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম এবং তাহাকেই কাশীর পাণ্ডা স্থির করিয়া তাহার সহিত পথে বাহির হইবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলাম। মোহন বটুকের ভাড়াটিয়া গুণ্ডার দিকে তাহার বাম চক্ষুর প্রান্ত দিয়া আর একবার অবজ্ঞার চাহনি চাহিয়া লইল ; এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহার খাটো কোর্ত্তার বুকপকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র বাঁশী বাহির করিয়া দুইবার সজোরে ফুঁ দিল। সেই বংশীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে ৮।১০ জন বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী মির্জ্জাপুরী পাকা বাঁশের লাঠিহাতে

আসিয়া মোহনকে যোড়করে আভূমি নত হইয়া নমস্কার জানাইল এবং আমার জিনিষপত্রগুলি নিকটস্থ কয়জন কুলীর মাথায় চাপাইয়া, আদেশ প্রতীক্ষায় মোহনের দিকে পুনরায় সসম্ভ্রমদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মোহন মৃদুকণ্ঠে কহিল "নয়া হাবেলি"—বুঝিলাম তাহার অনুজীবিদিগকে কোনও এক নূতন বাড়ীতে আমার জিনিষপত্র লইবার এই আদেশ হইল। পরক্ষণে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া করযোড়ে কহিল, "পা ধারিয়ে মহারাজ।" এই মহারাজ সম্বোধনে আমি প্রথমে একটু চমকিত হইলাম, পরক্ষণেই মনে হইল ইহা পশ্চিম-দেশীয় শিষ্টাচার মাত্র; আমার যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিয়া ঐরূপ সম্বোধন করিল তাহা নহে।

পাণ্ডা বিভ্রাটে এতক্ষণ গঙ্গার পরপার হইতে শিব-পুরীর অপরূপ শোভা দেখিবার অবসর আমার ভাল করিয়া হয় নাই; মোহনের সঙ্গে ষ্টেশনঘর হইতে বাহির হইয়া গঙ্গাতীরে পুলের নিকট দাঁড়াইলাম। চক্ষু তুলিয়া যাহা দেখিলাম, সে পর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্যসম্ভার আমার ক্ষীণ-জ্যোতি একটিমাত্র নয়নে ধরিয়া রাখিবার সাধ্য কি আমার আছে? যাহা দেখিলাম তাহা দেখিবামাত্রই 'পক্ষী' কবিবিরচিত গানের চরণ মনে আসিল— "ধরাতে ধরে না রূপ, নয়নে কি ধরা যায়।" অসি ও বরুণা নাম্নী দুই ক্ষীণধারা স্রোতস্বিনীর মধ্যে মুক্তি-প্রবাহরূপিণী নিস্তরঙ্গ সুরতরঙ্গিণীর স্বচ্ছ সলিল-ধারা সুধীরে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে; শিশির শেষে সমাসন্নবসন্তের সমুদিত সূর্য্যকিরণে স্বর্ণশীর্ষ দেব-মন্দিরের অপরূপ বর্ণবৈচিত্র্য দর্শকের নয়ন সম্মুখে কি অপূর্ব্ব মায়ালোক সৃজন করিয়া তুলে, তাহা না দেখিলে বর্ণনায় বুঝাইবার শক্তি কাহারই নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

শীতে

তুহিন শীতল রাতে,
ধরণীর বুকে আসিল কে নামি'
ঘন কুয়াসার সাথে?
পল্লবদল করে নাই তার অর্চ্চনা,
কুঞ্জ কাননে স্তব্ধ পাখীর মূর্চ্ছনা,
নিবিড় তিমিরসিক্ত আজিকে ধরণী
শিশির অশ্রু পাতে।

হিমের দেশের রাণী,
নিশার তুষার রচা অঞ্চল
আননে দিয়েছে টানি'।
অঞ্জন আঁকা গগনের নীল কাজলে
তনু ঢাকা তার কুয়াসাধূসর আঁচলে
হিম যামিনীর হিমানী সিক্ত
শীতল পরশ খানি।

ফুল্ল ছিল যে ধরা,
আজ করকারাশির করলাঞ্ছিত
কুটিল কুহেলি ভরা!
পদ্মের বনে মুগ্ধ ছিল যে দৃষ্টি
আঁধারিয়া ছিল এ কোন্ তুহিন-বৃষ্টি,
মন্ত্র কাহার চম্পক বনে
আনিয়া দিয়াছে জরা!

একি মরণ কাঠির মায়া—
দিকে দিকে আজ ছড়ায়ে দিয়াছে
জড়তাবিধুর ছায়া!
কুজ্ঝটিকার কুটিলতা ভরা আস্য
অধরে কি তার জড়িত নিঠুর হাস্য,
শীতল তুষার জমা কি সে বুকে
কুয়াসামগ্ন কায়া!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

হামির—(ঐতিহাসিক উপন্যাস)—শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ডবল ক্রাউন ষোলপেজি, ২০০ পৃষ্ঠা; ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲

গ্রন্থকার মহাশয়ের বর্ণনাশক্তি ও রসবোধ আছে, তবে অনেকস্থলেই রসিকতা স্থান কাল অবস্থা ও পাত্রের বিপর্য্যয়ে কিছু অশোভন ও অসংলগ্ন হইয়া [illegible] পরিচ্ছেদে "ছয়জন অশ্বারোহীর তীরবেগে" ছুটিয়া চলিয়া চলিতে যখন "গতিবেগের অনেক হ্রাস হইয়া পড়িল", তখনকার সেই রহস্যালাপ। দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদে অপরিচিতা ফুলওয়ালী ও শান্তার আলাপ। এইরূপ আরও কয়েকস্থানে দেখা গেল।

উপন্যাসখানিতে ঘটনা-সমাবেশ আছে, তবে অনেকগুলি অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, ফুলওয়ালীর প্রাসাদ-প্রবেশ, ছদ্মবেশ, শিবানীর কারাপ্রবেশ প্রভৃতি। ঘটনার ঘাত-সংঘাতে চরিত্র ফুটানোই সবচেয়ে শক্ত; গ্রন্থকার একবারে সেই শক্ত পথই অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই এমন বিড়ম্বিত হইয়াছেন।

চপলাকে কপালকুণ্ডলার ছাঁচে গঠিত করার, এমন কি চপলা চরিত্রের অবতারণারই, আমরা কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। ষোড়শবর্ষীয়া অনূঢ়া চপলার পক্ষে গভীর রাত্রে, নিবিড় অরণ্যমধ্যে জলধরের সঙ্গে হাস্য পরিহাস ও কথা কাটাকাটির দৃশ্য একেবারে নিতান্ত মামুলী নভেলীয়ানা।

এই গ্রন্থে এক দেশভক্ত সন্ন্যাসীর অবতারণা করা হইয়াছে—এই সন্ন্যাসী আবার চিতোরবংশের বংশধর। ইঁহাকে সন্ন্যাসী না করিলেও যে কোনও ক্ষতি হইত, তাহা আমাদের মনে হয় না। এইরূপ নানা অকারণ বাহুল্যে গ্রন্থখানি তেমন জমে নাই, কোনও চরিত্রও তেমনি ফুটিতে পায় নাই। সকল চরিত্রের মধ্যেই একটা অসমসাহস ও অনৈসর্গিক বুদ্ধিবল এবং সর্ব্বত্রই যেন অনুকূল দৈব কাষ করিতেছে। তাই ছায়াবাজির ছবির ন্যায় সবই পাঠকের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায়—কোথাও মানুষের কথা পড়িতেছি বলিয়া বোধ হয় না।

গ্রন্থকার মহাশয় পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করাইবার জন্য একটি অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। শীঘ্র কোথাও কোনও পাত্রপাত্রীর নাম উল্লেখ করেন নাই। এক পরিচ্ছেদে কেহ আসিল, তাহার তিন চারি পরিচ্ছেদ পরে তাহার নাম। এতদ্বারা কৌতূহল কাহারও বর্দ্ধিত হইবে কি না বলিতে পারি না—আমাদের তো নিতান্ত বিরক্তিই বোধ হইয়াছিল। নাম না থাকায় সেই পাত্র পাত্রীদের কথাবার্ত্তা ক্রিয়াকলাপ ভুলিয়াও যাইতে হয়। ঘোষজ মহাশয় আবার যদি উপন্যাস লেখেন, তবে বাংলার [illegible] পাঠকদিগকে এই উপায়ে আর যেন জব্দ না করেন।

লেখকের ভাষা মার্জ্জিত; বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আছে, রোমাঞ্চ রচনার শক্তিও দেখিতেছি—তথাপি যে তাঁহার এ উপন্যাসখানি জমে নাই, ইহা দুঃখের বিষয়। রাতারাতি বঙ্কিমচন্দ্র হইবার দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া, একটু বুঝিয়া সুঝিয়া, স্বভাবানুযায়ী করিয়া যদি তিনি লেখার অভ্যাস করেন, তবে ক্রমে তাঁহার রচনা জনসমাজে আদৃত হইবে আশা করা যায়। তাই আমরা এতগুলি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করিলাম।

"ঋতুরাজ।"

জীবন বীমা।—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। কলিকাতা লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোল পেজি, ১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য /০

ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিব মাননীয় মিষ্টার ক্লার্ক, ব্যবস্থাপক সভায় যে "ইনসিওরেন্স বিল" পেশ করিয়াছিলেন, তাহারই সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা এই গ্রন্থের মুখবন্ধ হইয়াছে। মূল প্রবন্ধে লেখক বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, সকলেরই জীবন বীমা করিয়া রাখা উচিত। "মনুষ্যমাত্রেরই" পক্ষে না হউক, মধ্যবিত্ত সকল গৃহস্থলোকের পক্ষে সাধ্যানুসারে জীবনবীমা করা যে একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অবকাশ। (কতিপয় সন্দর্ভ)—শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত। চুঁচুড়া "মহামায়া যন্ত্রে" মুদ্রিত, কাঁঠালপাড়া সাহিত্য-সম্মিলনী হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোল পেজি, ৮৪ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ।০

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ বিশারদ মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকারকে "বালক রামসহায়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ "কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে তাঁহাকে প্রথম শিক্ষার্থীর জন্যই গ্রন্থ লিখিতে হইয়াছে।"—একটু প্রবীণ, একটু পাকা হইয়া তারপর প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য গ্রন্থ লিখিলেই ভাল হয় না কি? ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক